# বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪ - ১৯৭১

# বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪ - ১৯৭১

১ম খণ্ড রাজনৈতিক ইতিহাস

২য় খণ্ড অর্থনৈতিক ইতিহাস

৩য় খণ্ড সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস

# বাংলাদেশের ইতিহাস
## ১৭০৪-১৯৭১

প্রথম খণ্ড

## রাজনৈতিক ইতিহাস




মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৪০০/ডিসেম্বর ১৯৯৩

শব্দগ্রন্থন : বীণাপাণি প্রেস, ১২/১এ বলাই সিংহ লেন, কলকাতা ৭০০০০৯

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩ হইতে
পি. দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রোগ্রেসিভ আর্ট কনসার্ন, ১৫৯/১-এ বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলকাতা-৭০০০১২ হইতে অনিল হরি কর্তৃক মুদ্রিত

## দ্বিতীয় সংস্করণ

# সম্পাদকের কথা

আমরা আনন্দিত ও গর্বিত যে, বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১) বিদ্বৎ সমাজে আদৃত হয়েছে। এর প্রথম সংস্করণ (শোভন ও সুলভ) নিঃশেষিত হয়েছে অল্প সময়ের মধ্যেই। গ্রন্থের ইংরেজি দ্বিতীয় সংস্করণের কাজ আগে শুরু হওয়ায় এর বাংলা ভাষ্যের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে বিলম্ব ঘটেছে এবং এর ফলে বাজারে বেশ কিছুকাল বইটি অপ্রাপ্য ছিল। এজন্য বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি ও সম্পাদকীয় পর্ষদ ও আমার পক্ষ থেকে দুঃখ প্রকাশ করছি।

বর্তমান সংস্করণটি আরো সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রথম সংস্করণে যেসব দিক অপর্যাপ্তভাবে আলোচিত হয়েছে বা মোটেই আলোচিত হয় নি সেগুলি বর্তমান সংস্করণে নিরসনের চেষ্টা করা হয়েছে। যেসব লেখা পুনরাবৃত্তিমূলক বা কম প্রাসঙ্গিক বলে গণ্য হয়েছে সেগুলি প্রত্যাহার করে বেশ কয়েকটি নতুন অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে। অন্যান্য অধ্যায়গুলো পর্যালোচনা করে আরো সাবলীল করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় যেসব লেখক, পর্যালোচক আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। একইসঙ্গে বাছাই প্রক্রিয়ায় যেসব পণ্ডিতের লেখা প্রত্যাহার করা হয়েছে তাঁদের প্রতি আমরা সবাই ক্ষমাপ্রার্থী।

মোট ৫১ জন পণ্ডিতের ৬৪টি লেখা নিয়ে বর্তমান সংস্করণ। জ্ঞানের ক্ষেত্রে তিন খণ্ডের এ সুবিশাল গ্রন্থ কতটুকু অবদান রেখেছে এর মূল্যায়ন প্রয়োজন। এ মূল্যায়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় এখন পর্যন্ত গ্রন্থটি সুধি সমাজে সমাদৃত আছে বলে মনে হয়। এটা গ্রন্থের সঙ্গে জড়িত সকলের সাফল্য বলতে হবে।

বর্তমান সংস্করণের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির কাউন্সিল, প্রকাশনা কমিটি ও গ্রন্থের সম্পাদনা কমিটির কাছে। তবে এ সংস্করণ প্রকাশনায় যিনি সর্বাধিক সময় দিয়েছেন, ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করার জন্য নিজ উদ্যোগেই দিনরাত পরিশ্রম করেছেন তিনি হলেন প্রকাশনা কনসালটেন্ট জনাব মোহাম্মদ ইব্রাহিম। তিনি আমার নিজের কাজকে বহুলাংশে সোজা করে দিয়েছেন। তার প্রতি আমি সাতিশয় কৃতজ্ঞ। কম্পিউটার অপারেটর জুলফিকার আলী ভূট্টো ও দেলোয়ার হোসেন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। বিশেষ করে জুলফিকার আলী ভূট্টো অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তৈরিতে। তাদের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ। এশিয়াটিক প্রেসের স্বত্বাধিকারী জনাব আবদুল হাই ও কামরুল হাই বইটি যেন সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয় সেজন্য সব সময় তৎপর ছিলেন। গ্রন্থের সহ সম্পাদক অধ্যাপক সাজাহান মিয়া তার কর্তব্যনিষ্ঠা দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

# সম্পাদনা পর্ষদ

**সভাপতি**
অধ্যাপক আবদুল করিম

সদস্য

অধ্যাপক ওয়াকিল আহমদ
অধ্যাপক কে. এম. মোহসীন
অধ্যাপক হারুন-উর- রশীদ
অধ্যাপক সৈয়দ গিয়াসউদ্দিন আহমেদ
অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম
অধ্যাপক শরীফ উদ্দিন আহমেদ

**সম্পাদক**
অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম

সহ সম্পাদক
অধ্যাপক সাজাহান মিয়া



# রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপট

সিরাজুল ইসলাম*

১৭০৪ সালে সুবা বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হয়।[১] এ ঘটনার ঐতিহাসিক গুরুত্ব এই যে, এর ফলে বিগত শত বর্ষে মুগল রাজধানী ঢাকাকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলা যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব লাভ করেছিল তার অবসান ঘটে। মুগল সেনাবাহিনী, সুবাদারি প্রতিষ্ঠানাদি, আমির-ওমরাহ, প্রশাসনিক শ্রেণী, বিপুল আমদানি-রপ্তানি প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে এ অঞ্চলে যে প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিল তার অবলুপ্তি ঘটে রাজধানী স্থানান্তরের ফলে।[২] পূর্ব বাংলা পরিণত হয় মুগল সাম্রাজ্যের এক অবহেলিত প্রান্তিক অঞ্চলে। অপর দিকে, ঢাকার ধ্বংসস্তূপের উপর নতুন মহানগরী হিসেবে আবির্ভূত

* অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. আনুষ্ঠানিকভাবে রাজধানী স্থানান্তরের কাজ হঠাৎ করে সংঘটিত হয় নি। বাংলার সুবাদার যুবরাজ আজিমুদ্দিনের (আজিম-উশ-শান নামে সমধিক পরিচিত) সঙ্গে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়াদিতে মতৈক্যে পৌঁছুতে ব্যর্থ হয়ে দীউয়ান মুর্শিদকুলী খান (পূর্ব নাম কারতালাব খান) ১৭০২ সালে তাঁর দীউয়ানি দপ্তর মকসুদাবাদে (মুর্শিদকুলীর পরবর্তীকালে এর নাম হয় মুর্শিদাবাদ) সরিয়ে নেন। আজিম-উশ-শান ১৭০৩ সালে তাঁর দপ্তর জাহাঙ্গীরনগর (ঢাকা) থেকে পাটনায় স্থানান্তরিত করার জন্য সম্রাটের নির্দেশ পান। ১৭০৪ সালে এই স্থানান্তরকরণ সম্পন্ন হয়। দেখুন, Abdul Karim, *Dacca the Mughal Capital*, (Dhaka 1964), 17

২. মুগল আমলের ঢাকা সম্পর্কে আরো তথ্যের জন্য কতিপয় উত্তম সহায়ক গ্রন্থ হচ্ছে : Sharif Uddin Ahmed, *Dacca—A Study in Urban History and Development*, (London 1986), Sharif Uddin Ahmed (ed ), *Dhaka : Past Present Future*, (Dhaka 1991), A H. Dani, *Dacca* (2nd ed Dhaka 1962), S. M. Taifoor, *Glimpses of Old Dhaka*, (Dhaka 1952); Charles D'Oyly, *Antiquities of Dacca*, (London 1824-30), Sayid Aulad Hasan, *Notes on the Antiquities of Dacca*, (Dhaka 1912).

হয় মুর্শিদাবাদ।[৩] অতএব, ১৭০৪ পূর্ব বাংলার ইতিহাসে একটি অতি তাৎপর্যপূর্ণ তারিখ। স্বাধীন নবাবি যুগেরও গোড়াপত্তন হয় এই সনে, যখন দীউয়ান মুর্শিদকুলী খান সুবা বাংলার প্রকৃত স্বায়ত্তশাসকে পরিণত হন। সুতরাং এই গ্রন্থের প্রারম্ভিক কাল হিসেবে ১৭০৪ একটি যুক্তিসঙ্গত মাইলফলক। এই গ্রন্থের সমাপ্তি ১৯৭১ সালে, যখন সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়পর্ব শুরু হয়।

নবাবি আমল থেকে বাংলাদেশের অভ্যুদয় পর্যন্ত এ দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে প্রধান প্রধান ধারা-প্রবণতাগুলো সনাক্তকরণ ও বিশ্লেষণ বর্তমান গ্রন্থের মূল লক্ষ্য। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আঠারো শতককে সমান দু'ভাগে ভাগ করা যায়—এর প্রথমার্ধে নবাবি শাসনের উত্থান ও বিকাশ এবং দ্বিতীয়ার্ধে নবাবি শাসনের পতন এবং বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠা। গোটা উনিশ শতক ছিল ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদের উন্মেষপর্ব। বিশ শতকের রাজনীতির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিকগুলো হচ্ছে বৃটিশবিরোধী আন্দোলন, শাসনতান্ত্রিক বিকাশ, মুসলিম ও হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতির অবনতি এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা এবং পরিশেষে বাংলা ও ভারত বিভাগ।[৪] বিভাগোত্তর যুগের রাজনীতির লক্ষণীয় দিক হচ্ছে মুসলিম জাতীয়তাবাদের বদলে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের শোচনীয় এবং চূড়ান্ত পরাজয় ছিল আসলে মুসলিম জাতীয়তাবাদেরই পরাজয়। বাঙালি জাতীয় সত্তা সংরক্ষণের প্রতিজ্ঞা প্রথম প্রকাশ পায় ভাষা আন্দোলনে ও মুসলিম লীগের পরাজয়ে এবং সবশেষে ছয় দফা আন্দোলনে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করি যে বাংলার অর্থনীতি আঠারো শতকের প্রথমার্ধে ছিল বেশ সচ্ছল। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প এবং কৃষিক্ষেত্রে তখন বাংলাদেশ যথেষ্ট সমৃদ্ধি অর্জন করেছিল বলে মনে হয়। কিন্তু সে উঠতি অর্থনীতি অধোগতি লাভ করে পলাশীর

---

৩. রাজধানী অন্যত্র স্থানান্তরিত হলেও ঢাকা গৌড় বা রাজমহলের রূপ পরিগ্রহ করে নি। বরং পূর্ব ভারতের প্রধান অভ্যন্তরীণ ব্যবসাকেন্দ্র হিসেবে ঢাকা তার ভূমিকা অব্যাহত রাখে। সকল বিদেশী বাণিজ্যিক কোম্পানি ঢাকাতে তাদের ব্যবসাকেন্দ্র চালু রাখে এবং বিচারকাজ ও রাজস্ব আদায়ের জন্য মুগল সরকার ঢাকায় যথাক্রমে একজন ফৌজদার ও একজন নায়েব নাজিম নিযুক্ত রাখে। নির্বাসিত ব্যক্তিগণসহ রাষ্ট্রীয় ভাতাপ্রাপ্ত মুগল অভিজাত শ্রেণীর বহু সদস্য সেসময়ে ঢাকায় বসবাস করতেন। সরকারি দপ্তর ও স্থাপনাসমূহ উঠে যাওয়ার দরুন ঢাকা যদিও বেশ কোনঠাসা হয়ে পড়ে, তথাপি বাংলার অন্যান্য রাজধানী শহরগুলো পূর্বে প্রায় অনুরূপ অবস্থার চাপে যেভাবে অস্তিত্বহীন হয়ে পড়েছিল, ঢাকা তাদের ভাগ্য বরণ করে নেয় নি। আরো বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন, Sharif Uddin Ahmed (ed.) *Dhaka : Past Present Future*

৪. রাজনীতির সাম্প্রদায়িকীকরণ ও এর ফলাফল বিষয়ে তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাকর্ম হচ্ছে : David Page, *Prelude to Partition : The Indian Muslims and the Imperial System of Control*, (Delhi 1982); Harun-or-Rashid, *The Foreshadowing of Bangladesh : Bengal Muslim League and Muslim Politics 1936-1947*, (Dhaka 1987); and C. H. Philips and M. D. Wainwright (ed.), *The Partition of India, Policies and Perspectives 1935-1947*, (London 1970).

পর থেকে। পলাশীর পূর্বে বাংলাদেশ ছিল একটি বিরাট রপ্তানিকারক দেশ। এ দেশের রপ্তানিবাণিজ্যে যোগদান করেছে বৃটেনসহ পশ্চিম ইউরোপের প্রায় সকল নৌ-বাণিজ্যের দেশ। কিন্তু ইংরেজ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাংলার অর্থনীতিতে বিপর্যয় দেখা দেয়। ইংরেজদের অত্যাচার ও লুণ্ঠন নীতির ফলে অর্থনীতি এমন সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়ে যে ১৭৬৮ সনের পর ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ক্রমাগত দুর্ভিক্ষের ফলে দেশের লোকসংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে, লোকশক্তির অভাবে কৃষিক্ষেত্র জঙ্গলে পরিণত হয়। ১৮২০ সাল নাগাদ বাংলাদেশ রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে বিশ্ববাজার থেকে বিদায় নেয় এবং আমদানিকারক দেশ হিসেবে বৃটিশ সাম্রাজ্য-অর্থনীতির লেজুড়ে পরিণত হয়।

কোন দেশের রাজনীতি ও অর্থনীতিতে যখন এমন ওলটপালট ঘটে, তখন এর প্রভাব থেকে সে দেশের সমাজ ও সংস্কৃতি মুক্ত থাকতে পারে না। নবাবি আমলে দেশে একটি নব্য অভিজাত শ্রেণী গড়ে উঠেছিল। এই শ্রেণীর সদস্য ছিল উচ্চবর্ণের হিন্দুরা। নবাবি আমলের আমলাতন্ত্রে, ভূমি নিয়ন্ত্রণে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে মুসলমান, বিশেষকরে স্থানীয় মুসলমানের অংশ ছিল নামেমাত্র। ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার ফলে নতুন রাষ্ট্রকাঠামোতে নবাবি আভিজাত্যের অস্তিত্ব অসঙ্গতিপূর্ণ হয়ে পড়ে। অতএব, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রব্যবস্থাধীনে নবাবি আভিজাত্যের পতন ঘটে। এর অবশ্যম্ভাবী প্রভাব পড়ে দেশের শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে। গড়ে উঠে নতুন সমাজব্যবস্থা। কিন্তু কোন্ সে ব্যবস্থা? রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতিতে এই যে ব্যাপক পরিবর্তন, এর সঠিক সনাক্তকরণ ও মূল্যায়ন দরকার, নচেৎ যেসব ঘটনাপ্রবাহ ও পরিবর্তন বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটিয়েছে সেগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনুধাবন করা সম্ভব নয়।

## দুই

স্পষ্টত, নবাবি যুগে বা প্রাক-নবাবি যুগে যদিও বাংলাদেশ ছিল, কিন্তু আধুনিক অর্থে কোন বাঙালি জাতি ছিল না। তখন আমাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বিশ্ববাদী, জাতীয়তাবাদী নয়। দেশের অধিনায়ক নিজেকে তখন বাংলা বা ভারতের রাজা বলে গণ্য না করে বরঞ্চ বিশ্ববাদশাহ্ বলে গণ্য করতেন। তাঁদের উপাধি ছিল জাহাঙ্গীর, শাহজাহান, আলমগীর, শাহ আলম ইত্যাদি। এসব উপাধির আক্ষরিক অর্থ বিশ্বরাজা। প্রকৃত অর্থে বিশ্বরাজা না হলেও মুগল বাদশাহদের মনোভঙ্গি ছিল বিশ্বজনীন। বাদশাহকে আনুগত্য প্রদান করলে বিশ্বের যে-কেউ তাঁর রাজ্যে বসবাস করতে পারতো, এমনকি রাষ্ট্রীয় দায়িত্বও লাভ করতে পারতো। মাড়োয়ারি পুঁজিপতি ফতেহ চাঁদ জগৎ শেঠ বা বিশ্বব্যাংকার উপাধি লাভ করেন বাদশাহের কাছ থেকে, কারণ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে ফতেহ চাঁদের সাহায্য ও মুগল সরকারের প্রতি তাঁর আনুগত্য বাদশাহকে প্রীত করেছিল। তেমনিভাবে পলাশীবিজেতা রবার্ট ক্লাইভ বাদশাহের কাছ থেকে উপাধি পান 'সাবুদ জং' অর্থাৎ সমরে শক্ত।[৫] বিদেশী হিসেবে পলাশী পরিবর্তনে

৫. Abdul Majed Khan, *The Transition in Bengal 1756-1775*, (Cambridge 1963), xii

ক্লাইভের ভূমিকাকে দিল্লীর সম্রাট কোন রকম বৈদেশিক হস্তক্ষেপ বলে গণ্য করেন নি। সমকালীন বাঙালি অভিজাত শ্রেণীও তা মনে করে নি। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই মুগল রাজ্যে অবস্থান করতে পারতো, আনুগত্য সাপেক্ষে রাষ্ট্রীয় দায়িত্বও লাভ করতে পারতো এবং এ দেশে আগমন-নির্গমন ও অবস্থানের জন্য কোন সরকারি পূর্বানুমতির প্রয়োজন ছিল না। এর জন্য বাদশাহ ও নবাবের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন ছিল যথেষ্ট। কুঠি স্থাপন করে স্থায়ীভাবে এ দেশে বসবাস ও ব্যবসা-বাণিজ্য করার জন্য ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ, দিনেমার সবাইকে শর্ত সাপেক্ষে ভূমি দান করা হয়েছে। দেশে বিদেশীদের এহেন অবস্থানকে মুগল সরকার কখনো এর সার্বভৌমত্বের প্রতি হস্তক্ষেপ বা হুমকি স্বরূপ গণ্য করে নি।[৬] বাংলার বড় বড় বাজার ও গঞ্জগুলোতে বিদেশীরা অবাধে ব্যবসা-বাণিজ্য করতো। সমকালীন অন্য কোন এশীয় দেশে বিদেশীদের এমন অবাধ বিচরণের অনুমতি দেয়া হতো না। যেমন, চীনে বিদেশীরা শুধু ম্যাকাও দ্বীপে ব্যবসা করতে পারতো, কিন্তু দেশের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করতে পারতো না। মুগল সরকারের বিশ্বজনীন নীতি দেশের জনগণের মধ্যেও ছিল বিদ্যমান। দেশের মানুষ তাদের স্বরূপ প্রকাশ করেছে ধর্ম, বর্ণ, জাতগোষ্ঠী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে, বাঙালি বা ভারতীয় জাতি হিসেবে নয়। শাসক শ্রেণীর সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগির কথা জনগণ চিন্তা করে নি। তাদের চিন্তা ছিল, শাসক যেই হউন, তাদের ধর্ম, বর্ণ ও জীবনযাত্রায় কোন আঘাত না আসলে সে-শাসককে তাদের মেনে নিতে কোন আপত্তি নেই। মুগল নবাবদের বিরুদ্ধে এ দেশবাসীর কোন আপত্তি ছিল না, কেননা তাঁদের অধীনে দেশের ধর্ম, বর্ণ, আচার-অনুষ্ঠান পালিত হয়েছে নিরাপদভাবে, কোন অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ ছাড়াই। অর্থাৎ ধর্ম, বর্ণ ও সমাজব্যবস্থার নিরাপত্তা দিলে যেকোন বিদেশী শাসককে মেনে নিতে দেশবাসীর কোন অসম্মতি ছিল না। এক কথায়, সার্বভৌমত্ব ও জাতিসত্তার ব্যাপারে মুগল সরকার যেমন ছিল বিশ্বজনীন, দেশের জনগণও ছিল তেমনি।

আমরা যখন ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক এ দেশে রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রশ্নটি আলোচনা করি, তখন মুগল সরকারের উদারনীতি এবং সরকারের প্রতি জনগণের মনোভঙ্গিটি অবশ্যই বিবেচনা করা দরকার। পনেরো শতকে ভৌগোলিক আবিষ্কারের সূত্রপাত থেকেই পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন নৌ–শক্তি পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন শুরু করে। কিন্তু ঐ সব উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছিল নব আবিষ্কৃত জনবসতিশূন্য জায়গায়। কোন একটি সভ্য সমাজকে পরাভূত করে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রথম উদাহরণ ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক বাংলা বিজয়। এটা হয়তো

---

৬. সম্রাট শাহ আলমের কাছ থেকে ইংরেজরা যে দীউয়ানি ফরমান লাভ করেছিল (১৭ আগস্ট, ১৭৬৫), তাতে বলা হয়েছে, "এই আনন্দময় মুহূর্তে জারি করা হলো আমাদের রাজকীয় ফরমান, যা অপরিহার্য আনুগত্যের দাবিদার এবং এই ঘোষণা অনুযায়ী ইংরেজ কোম্পানির ব্যবসায়িক যোগাযোগ ও কর্মতৎপরতার সুবিধার্থে...আমরা বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের দীউয়ানি...তাদেরকে বিনামূল্যে উপহারস্বরূপ প্রদান করলাম।" Ramsay Muir, *The Making of British India 1756-1858*, (Pakistan reprint 1969), 84.

সম্ভব হয়েছিল রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে মুগল সরকার ও দেশের জনগণের বিশ্বজনীন মনোভঙ্গির কারণে। চীন সরকার বিদেশীদের দেশের অভ্যন্তরে বসতি স্থাপনের অনুমতি দেয়া দূরে থাক, ম্যাকাও দ্বীপ ছাড়া অন্য কোথাও অনুপ্রবেশ করতে দিত না। কিন্তু মুগল সরকার এবং জনগণ যেকোন বিদেশীর দেশে অবস্থানে, এমনকি তাকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব প্রদানেও কোন আপত্তি করে নি।

মুগল সরকারের 'মুক্তদ্বার' নীতি ছিল এমনই উদার যে, পর্তুগীজ ও ইংরেজদের সঙ্গে নিয়মিত যুদ্ধ করার পরও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলে তাদেরকে দেশে অবস্থান করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় যে দীর্ঘ চার বছরকাল (১৬৮৬-৯০) ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে নৌ-যুদ্ধ করার পরও ১৬৯০ সালে মুগল সরকার কোম্পানিকে কলকাতায় বাণিজ্যবসতি স্থাপন করতে সনদ প্রদান করে এবং ১৬৯৮ সালে কলকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর—এ তিনটি গ্রামের জমিদারি স্বত্ব প্রদান করে। অধিকন্তু ১৬৯৮ সালে কোম্পানিকে কলকাতায় দুর্গ স্থাপনের অধিকার পর্যন্ত প্রদান করা হয়। মুগল রাজ্যের অভ্যন্তরে কলকাতায় গড়ে উঠে একটি সশস্ত্র ও স্বশাসিত বিদেশী বসতি। বিদেশীদের এহেন সুযোগ-সুবিধা প্রদান সমকালীন অন্য কোন প্রাচ্য দেশে ঘটে নি। প্রশ্ন উঠে, কেন বিদেশীদের এত সব সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়েছিল? যুক্তি দেয়া যেতে পারে যে অবাধ বাণিজ্য এবং বিদেশী অভ্যাগতদের জন্য দেশকে উন্মুক্ত রাখা ছিল এ দেশের একটি রাজনৈতিক ঐতিহ্য। বৈদেশিক বাণিজ্যে বিদেশীদের যোগদানের ফলে সরকার প্রভূত রাজস্ব লাভ করে। কিন্তু চীনের ম্যাকাও-এর মতো একটি নির্দিষ্ট জায়গা থেকে বিদেশীদের ব্যবসা করার অধিকার দিলে হয়তো সরকারি আয় কম হতো না। বিদেশী বণিকদের অবাধে দেশের অভ্যন্তরে বাণিজ্য করার অধিকার প্রদানের একটি বিশেষ কারণ হতে পারে এই যে, এর ফলে দেশের শাসক শ্রেণীর লোকেরা বিদেশীদের ব্যবসায় অংশী হয়ে পুঁজি বিনিয়োগ করতে পারতো এবং পুঁজি বিনিয়োগ ছাড়াও বিদেশী বণিকদের কাছ থেকে বিপুল অংকের পেশকাশ, নজরানা ও পুরস্কার গ্রহণ করতো। বিদেশী বণিকদের কাছে অতি উচ্চহারে সুদে টাকা লগ্নি করতেন স্থানীয় শাসকরা। এমনকি দেশের সুবাদার পর্যন্ত সুদে টাকা লগ্নি করতেন। সুবাদার শাহ শুজা, মীর জুমলা ও শায়েস্তা খান বিদেশী কোম্পানিগুলিতে টাকা লগ্নি করেছেন এবং মোটা অংকের নজর ও পেশকাশের বিনিময়ে বিদেশীদের বসতি স্থাপনের অনুমতি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেছেন।[৭]

যুক্তি দেয়া যায় যে ১৭৬৫ সালে কোম্পানি যে রাজ্যের অধিকারী হয়, তা বস্তুত ১৬৯০ সনে স্থাপিত কলকাতা বসতিরই সম্প্রসারিত রূপ। এই ধরনের বিশ্লেষণ আপাতদৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য। তবে স্বীকার করতে হবে যে ইংরেজদের মতো অন্যান্য ইউরোপীয় বণিক গোষ্ঠীগুলোরও বসতি ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও সেগুলো কিন্তু রাজ্যে রূপান্তরিত হয় নি। বৃটিশ ছাড়া অন্যান্য বাণিজ্য কোম্পানিসমূহ বাংলায় বাণিজ্য ক্রমশ কমিয়ে বা স্থিতিশীল

---

৭. *History of Bengal*, Vol II, (Dhaka University 1948), 402; Abdul Karim, *Murshid Quli Khan and His Times*, (Dhaka 1963), 3.

রেখে প্রাচ্যের অন্যান্য অঞ্চলে ব্যবসায়ী কর্মকাণ্ড বিস্তার করে। অপরপক্ষে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ক্রমশ বাংলায় বাণিজ্যে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে থাকে এবং এর সঙ্গে বৃদ্ধি পেতে থাকে এ দেশের রাজনীতির প্রতি তাদের আগ্রহ। কেউ কেউ যুক্তি দেন যে পলাশীর মাধ্যমে এ দেশে ইংরেজ আধিপত্যের মূল কারণ ইউরোপে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ, যে যুদ্ধে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স বিশ্বে তাদের স্ব স্ব আধিপত্য কায়েমে মেতে উঠেছিল। তাঁদের মতে পলাশীর যুদ্ধ ছিল সপ্তবর্ষ যুদ্ধের একটি প্রাচ্য অঞ্চলীয় লড়াই। এ লড়াইয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গে ফরাসীদের প্রভাব নস্যাৎ করা। পলাশী ঘটনার ফলে ইংরেজের এ উদ্দেশ্য চূড়ান্তভাবে সফল হয়েছিল।

বাংলায় ইংরেজ আধিপত্য বিস্তারের পটভূমি হিসেবে এসব ব্যাখ্যার যথেষ্ট মূল্য রয়েছে। আন্তঃসামুদ্রিক যোগাযোগব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয় আঠারো শতকে। এর ফলে বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহ একে অপরের উপর এমনভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে যে এক দেশের ঘটনা আরেক দেশের উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করে। যেমন. বাংলায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে এর প্রভাব অচিরেই অনুভূত হতো লন্ডন, প্যারিস, আমস্টার্ডাম বা অন্য সব দেশে, যারা বাংলাদেশের পণ্য আমদানি করতো। এই প্রভাবের ধরন ছিল পণ্য সরবরাহে অপ্রতুলতা এবং অবশ্যম্ভাবী মূল্যবৃদ্ধি। দুর্ভিক্ষের ফলে উৎপাদনব্যবস্থা ব্যাহত হতো এবং এর প্রভাব থেকে বাংলার সঙ্গে বাণিজ্যরত কোন দেশই রেহাই পেতো না। এমনিভাবে ইউরোপেও কোন যুদ্ধবিগ্রহ বাধলে বা সামুদ্রিক বাণিজ্যপথে কোন বাধাবিপত্তি সৃষ্টি হলে এর প্রভাব অল্পকালের মধ্যেই বাংলার অর্থনীতিতে অনুভূত হতো। হাট-বাজার-গঞ্জে চাহিদা হ্রাস পেতো এবং এর ফলে-বাজারমূল্যে নিম্নগামী প্রবণতা দেখা দিত। একদিকে লন্ডনে যেমন ঢাকা-মুর্শিদাবাদের মহাজনদের উচ্চ সুদের হার সম্পর্কে আলোচনা হতো, তেমনি এ দেশের ব্যবসায়ী মহলেও আলোচিত হতো বৃটিশ সরকার কর্তৃক বাংলার রপ্তানিপণ্যের উপর উচ্চ শুল্কহার আরোপের কথা।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এহেন পারস্পরিক সম্পর্ক যেখানে এত ঘনিষ্ঠ, সেখানে শুধু ইংরেজদের কলকাতা বসতিকে এককভাবে পলাশী ঘটনার জন্য দায়ী করা যায় না। আমাদের ধারণা, পলাশী যুদ্ধের কারণসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মুর্শিদাবাদ দরবারের রাজনীতি। এই যুক্তির কিছু ব্যাখ্যা দরকার। আধা-স্বাধীন নবাবি শাসনের *একটি লক্ষণীয় দিক ছিল প্রশাসনিক কাঠামোতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন*। সুবাদারি যুগে সুবা বাংলার প্রধান প্রধান পদগুলির কর্মকর্তা সরাসরি নিযুক্ত হতেন বাদশাহ কর্তৃক এবং বাদশাহের কাছে তাঁদের জবাবদিহি করতে হতো। তাছাড়া সুবা-সরকারের অন্যান্য পদ পূরণের জন্য ইরানী-তুরানী অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা কেন্দ্রীয় সরকারের সুপারিশক্রমে এ দেশে এসে প্রাদেশিক আমলাতন্ত্রের উপরি অংশ দখল করতো।[৮] এই ধারার বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে নবাবি আমলে। মুর্শিদকুলী খানের আমল থেকে দেশী হিন্দু অভিজাত

৮. আরো বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন, Paramatma Saran, *The Provincial Government of the Mughals 1526-1658*, (Allahabad 1951).

শ্রেণীর ব্যক্তিকে নিয়ে উচ্চ আমলাতন্ত্র গঠনের প্রবণতা দেখা যায়। এই প্রক্রিয়ায় দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন সূচিত হয়। নবাবি রাষ্ট্রকে শক্ত ভিত্তিতে স্থাপন করার জন্য সরকার বিদেশীদের বদলে প্রশাসনে ব্যাপক হারে দেশী মুৎসুদ্দি নিয়োগনীতি গ্রহণ করে। নবাবের উপদেষ্টা পরিষদে শুজাউদ্দিন খানের (১৭২৮-৩৯) সময় থেকে দেশী সদস্যরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। আলিবর্দী ও সিরাজউদ্দৌলার শাসনামলে উচ্চ আমলা ও মন্ত্রীদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু অভিজাত শ্রেণীর লোক। ভূমি নিয়ন্ত্রণে জমিদার শ্রেণীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় নবাবি আমলে। নবাবদের পৃষ্ঠপোষকতায় এক শ্রেণীর ভূস্বামী রাজা-মহারাজা উপাধি প্রাপ্ত হন এবং তাঁরা দেশের রাজনীতি ও অর্থনীতিতে প্রবল প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন। এই পরিবর্তন ঘটেছে নবাবদের প্রত্যক্ষ সমর্থনেই।[৯]

মুর্শিদকুলী খান এবং তাঁর পরবর্তী নবাবদের অধীনে আরেকটি অতিশয় প্রভাবশালী শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে। এরা হচ্ছে দেশের রপ্তানিবাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত বণিক শ্রেণী। দেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য এবং ব্যাঙ্কিং থেকে এই বণিক শ্রেণী অগাধ সম্পদের অধিকারী হয়।[১০] মুর্শিদকুলী খান এই নব্য ধনী বণিক শ্রেণীকে রাজ্য পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে সুযোগ দেন। তাদেরকে নিয়ে তিনি একটি বাণিজ্যিক অভিজাত শ্রেণী গড়ে তোলেন। এই বাণিজ্যিক অভিজাত শ্রেণী অধিকতর শক্তি লাভ করে নবাব সুজাউদ্দিন ও আলিবর্দী খানের আমলে।[১১] শিক্ষা ও সম্পদে বণিকরা ছিল সনাতন মুগল অভিজাত শ্রেণীর চেয়ে অধিক অগ্রসর এবং চরিত্রগতভাবে ইউরোপীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনুরূপ। ইউরোপীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মতো সদ্য উত্থিত বঙ্গীয় ধনাঢ্য শ্রেণীও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে অধিক ভূমিকা পালনের প্রয়াস পায়। ক্ষমতা লাভের লক্ষ্যে এই শ্রেণী প্রয়োজনে সনাতন অভিজাত শ্রেণীর সঙ্গে আঁতাত করে। এই আঁতাতের মাধ্যমেই তারা প্রথম সরফরাজ খানকে উৎখাত করে শুজাউদ্দিন খানকে মসনদে বসায় এবং পরে আলিবর্দী খানকেও অনুরূপভাবে ক্ষমতা অর্পণ করে। এমনিভাবে নব্য বাণিজ্যিক ও প্রশাসনিক অভিজাত শ্রেণী দীর্ঘকাল রাজনির্মাতার ভূমিকা পালন করতে করতে তাদের ইউরোপীয় প্রতিপক্ষের মতো হয়তো একদিন সামরিক আভিজাত্যের পতন ঘটিয়ে গণতান্ত্রিক উত্তরণের পথ সুগম করতে পারতো। কিন্তু এই সম্ভাবনা তিরোহিত হয় ঔপনিবেশিক হস্তক্ষেপের ফলে। বাণিজ্যিক-প্রশাসনিক এলিট শ্রেণী কি পূর্বে অনুধাবন করতে পেরেছিল যে ইংরেজকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়ালে একদিন এদের হাতে তাদের পরাজয় বরণ করতে হবে? এলিট শ্রেণী কি বুঝতে পেরেছিল যে কোম্পানি আসলে এ দেশে রাজ্য কায়েমের প্রস্তুতি নিচ্ছে? বলাবাহুল্য যে এমন আশঙ্কা চক্রান্তকারীদের কারো মধ্যেই জাগে নি। সাত সমুদ্রের ওপার থেকে এসে ওরা এ দেশে রাজ্য স্থাপন করতে পারে এমন

৯. Shirin Akhtar, *The Role of Zamindars in Bengal 1707-1772*, (Dhaka 1982)

১০. K. M Mohsin, *A Bengal District in Transition Murshidabad 1765-1793*, (Dhaka 1973), chapters 5 and 7

১১. Orme Mss—India VI, 1500-1502, এতে নবাব আলিবর্দী খানের আমলের মন্ত্রী ও মুৎসুদ্দিদের তালিকা বিদ্যমান।

ভাবনা কারো মধ্যেই জাগে নি। এর কারণ ইউরোপীয় ও বিশ্ব ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে এদের নিদারুণ অজ্ঞতা। তবে প্রশ্ন হলো, সুবা বাংলায় কোম্পানির রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার রোধ করা কি আদৌ সম্ভব ছিল ?

প্রশ্নটি ঐতিহাসিকভাবে অতি গুরুত্বপূর্ণ। সুবাদারি আমলে সুবা বাংলা নিয়ন্ত্রিত হতো দিল্লী থেকে। প্রশাসনে বাঙালির ভূমিকা ছিল গৌণ। সুবার সকল দায়িত্বপূর্ণ পদ অলঙ্কৃত করেছে মুগল সামরিক আভিজাত্যের সদস্যরা। প্রশাসনিক দায়িত্ব থেকে বাঙালিদের দূরে রাখা হয়েছে। কিন্তু মজার ব্যাপার, নবাবি প্রশাসনে যখন বাঙালিদের অন্তর্ভুক্ত করার নীতি গ্রহণ করা হয়, তখন শুধু হিন্দু এলিট শ্রেণী থেকে রাষ্ট্রীয় মুৎসুদ্দি-আমলা নিয়োগ করা হয়, স্থানীয় মুসলমানদের আগের মতোই প্রশাসন থেকে দূরে রাখা হয়। যেমন, আলিবর্দী প্রশাসনের উচ্চ আমলা-মুৎসুদ্দিদের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি ছিল হিন্দু এলিট শ্রেণীর লোক, কিন্তু স্থানীয় মুসলমান একজনও না। ভূমি নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের বেলায়ও ছিল একই চিত্র। জমিদার শ্রেণীর মধ্যে প্রায় সবাই ছিল হিন্দু। বণিক শ্রেণীর মধ্যেও প্রায় সবাই ছিল হিন্দু।[১২] দায়িত্বপূর্ণ পদ থেকে দেশী মুসলমানদের দূরে রাখা কি নবাবদের সচেতন নীতি ছিল? প্রশ্নটির উত্তর থেকে পরবর্তীকালে হিন্দু-মুসলমান বৈষম্যের কিছু ব্যাখ্যা বেরিয়ে আসতে পারে। যদি মনে করা হয়, নবাবই সচেতনভাবে স্থানীয় মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় ভূমিকা পালন থেকে দূরে রেখেছেন, তাহলে পরবর্তীকালে হিন্দু-মুসলমান বৈষম্যের জন্য ঔপনিবেশিক শাসনকে এককভাবে দায়ী করা যাবে না। তখন ঐ বৈষম্যের শেকড় খুঁজতে হবে প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগ থেকে। হান্টারের বক্তব্য ঠিক নয় যে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে এ দেশের মুসলমানরা রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। আসলে বঞ্চিত হয় হিন্দু এলিট শ্রেণী, যারা ছিল নবাবি শাসনের বড় সুবিধাভোগী শ্রেণী। তবে ঔপনিবেশিক যুগের নব্য অভিজাত শ্রেণী উচ্চবর্ণের হিন্দু হওয়ায় পুরানো হিন্দু অভিজাত শ্রেণীর পতনের ঘটনাটি এতটা সাড়া জাগায় নি যতোটা মুসলিম অভিজাত শ্রেণীর পতন চোখে পড়েছে।

## তিন

লক্ষণীয় যে প্রাচ্যদেশে ইউরোপীয় কোম্পানিসমূহ বাণিজ্য পরিচালনা করেছে সামুদ্রিক উপকূলে অবস্থিত বিভিন্ন বাণিজ্যবসতি থেকে। সমুদ্র ছিল এদের সাধারণ মাধ্যম। স্থানীয় রাজনীতি নিয়ে এরা কখনো মাথা ঘামায় নি। কিন্তু এই নিয়মের ব্যত্যয় ঘটেছে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বেলায়। ইংরেজরাই সর্বপ্রথম বাণিজ্যবসতির সীমানা অতিক্রম করে এ দেশে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। অথচ এ ধরনের রাজ্য স্থাপনের কোন পূর্বপরিকল্পনা বৃটিশ সরকার বা কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলী কেউই করে নি। সমকালীন রাজনৈতিক ও

১২. M. A. Rahim, *Social and Cultural History of Bengal*, (Karachi 1967), Vol. 2, 168-174. এই গ্রন্থে বিভিন্ন পদ এবং পদাধিকারীর তালিকা স্থান পেয়েছে।

ভৌগোলিক প্রেক্ষাপটে বৃটিশ সরকারের প্রাচ্যে কোন রাজ্য স্থাপনের প্রয়োজন ছিল না, আর এহেন রাজ্য প্রতিষ্ঠা বাণিজ্যিক দিক থেকে কোম্পানির জন্যও ছিল অলাভজনক। বস্তুত পলাশী যুদ্ধের পর থেকে কোম্পানির বাংলা-বাণিজ্য ক্রমাগত ক্ষতির সম্মুখীন হয়, যদিও প্রাক-পলাশী যুগে কোম্পানির ব্যবসা পরিচালিত হয়েছে অত্যন্ত লাভজনকভাবে। তথাপি কেন কোম্পানি রাজনৈতিক আধিপত্য কায়েম করলো ? পণ্ডিতগণ প্রায় সবাই একমত যে বাংলায় রাজ্য স্থাপনের পরিকল্পনা করেছে আসলে কোম্পানির ভারত মহাসাগরীয় কর্মকর্তাবৃন্দ। নিজেদের ব্যক্তিগত ব্যবসার প্রসারের জন্য ঐ কর্মকর্তারা এ দেশের রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে। রাতারাতি ধনী হবার আকাঙ্ক্ষা থেকেই তারা এখানে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ স্থাপনের প্রয়াস পায়। তাদের পরিকল্পনা সফল হয়েছিল। তারা সবাই অগাধ সম্পদের অধিকারী হয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করেছিল। বৃটেনে এই হঠাৎ ধনকুবেরদের বলা হতো 'নবব'। কিন্তু বাংলার ভাগ্যে কি ঘটলো ? 'নবব'দের অত্যাচার, শোষণ, লুটপাটের ফলে তিন দশকের মধ্যে বাংলা শ্মশানে পরিণত হয়। জগৎ শেঠ পরিবার সহ সকল ব্যবসায়ী ও ব্যাঙ্কিং পরিবার নিঃস্ব হয়ে পড়ে; রাজা-মহারাজা-জমিদার সমাজে ধস নেমে আসে, নবাবি যুগের সৈন্য, আমলা-মুৎসুদ্দিরা বেকারে পরিণত হয়। বেশি রাজস্ব আদায়ের লোভে দেশের জোত-জমি সব নিলামে বন্দোবস্ত করা হয়। রায়তের উপর নিলামদারেরা চালায় লাগামহীন অত্যাচার। সংস্কারের অভাবে রাস্তা, সেতু, হাট ও বাজার-গঞ্জগুলি এক করুণ রূপ ধারণ করে। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ ছাত্র-শিক্ষানবিশশূন্য হয়ে পড়ে। ঘন ঘন আকাল-দুর্ভিক্ষের ফলে জনসংখ্যা দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে এবং এর সরাসরি প্রভাব পড়ে দেশের কৃষি ও শিল্পের উপর। যে বাংলা ছিল সমকালীন বিশ্বের একটি অন্যতম ধনী দেশ, সে দেশ কোম্পানির দুঃশাসনের ফলে তিন দশকের মধ্যেই দারিদ্র্যের অতল গহ্বরে নিপতিত হয়।

কোম্পানির এই লুটপাটের নায়ক ছিল এর কর্মকর্তারা। সমকালীন ধীর যোগাযোগব্যবস্থার কারণে এরা কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলী এবং বৃটিশ সরকারকে অনবহিত রেখে এই নির্মম লুটপাটের বেসাতি চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল। তাছাড়া সমকালীন বৃটিশ জনমত ছিল ভারত সম্পর্কে অতিশয় উদাসীন। অমানবিক অত্যাচার-উৎপীড়ন এবং সীমাহীন দুর্নীতি অবলম্বনের দায়ে ওয়ারেন হেস্টিংস-এর বিচার হয়েছিল বৃটিশ পার্লামেন্টে। ঐ বিচারে তাঁর বিরুদ্ধে এডমান্ড বার্কের বক্তৃতা, যুক্তি-তর্ক এতই মর্মস্পর্শী ছিল যে সেগুলি রীতিমতো উঁচু মানের সাহিত্যে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু সে সাহিত্য সমকালীন বৃটিশ জনমতকে সামান্যই প্রভাবিত করতে পেরেছিল। ভারত বিষয় সম্পর্কে বৃটিশরা ছিল নির্বিকার, নিরাসক্ত। ওদের ঔদাসীন্য ছিল এতই চরম যে ভারত বিষয়ে আলোচ্যসূচি থাকলে পার্লামেন্টে কোরাম বজায় রাখাই ছিল ভার। ভারত সম্পর্কে পার্লামেন্টে এহেন অনীহা, দুই দেশের মধ্যে বিরাট দূরত্ব এবং পরিচালকমণ্ডলীর মধ্যে নানা কায়েমি স্বার্থগোষ্ঠীর অবস্থান প্রভৃতির ফলে কোম্পানির স্থানীয় কর্মকর্তারা লাগামহীন লুণ্ঠনের সুযোগ লাভ করে এবং সে সুযোগ এরা পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে। কিন্তু আশ্চর্যের

বিষয়, এদের পাশবিক অত্যাচার, শোষণ ও লুণ্ঠন সম্পর্কে কোম্পানি আমলের ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ সবাই ছিলেন নিশ্চুপ, যদিও এরা পূর্ববর্তী মুসলিম শাসকদের 'অত্যাচার' আবিষ্কার করেছেন এবং বর্ণনা দিয়েছেন ফলাও করে।

ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র একদিনে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র গঠনে প্রথম দৃশ্যমান পদক্ষেপ ছিল কোম্পানি কর্তৃক বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দীউয়ানি লাভ (১৭৬৫)। তবে দীউয়ানি লাভের পরেও কোম্পানি এ দেশে রাজ্য স্থাপনের ব্যাপারে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ছিল। দীউয়ানি গ্রহণের মূল উদ্দেশ্য ছিল এ দেশের রাজস্ব থেকে কোম্পানির ভারত ও চীন-বাণিজ্যের পুঁজি সংগ্রহ করা এবং এ দেশে পণ্য ক্রয়ের জন্য ইউরোপ থেকে রৌপ্য আমদানি বন্ধ করা। মোট কথা, একটি রাজ্য পরিচালনার জন্য কোম্পানি প্রস্তুত ছিল না। তাছাড়া, একটি প্রাইভেট বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের বিদেশে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা ছিল বৃটিশ শাসনতন্ত্রের পরিপন্থী। অধিকন্তু, মুগল সরকারের সনদপ্রাপ্ত হয়ে এ দেশে বাণিজ্যরত অন্যান্য ইউরোপীয় কোম্পানিসমূহ তাদের সমকক্ষ ইংরেজ কোম্পানিকে শাসক হিসেবে মানতে যাবে কেন? এসব বাস্তব অসুবিধা বিবেচনা করে কোম্পানি সরাসরি দীউয়ানি শাসন পরিচালনা না করে মুগল প্রশাসনের মাধ্যমে আধিপত্য বজায় রাখার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। দীউয়ানি গ্রহণের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল রাজস্ব আদায়, রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগ নয়। অতএব ১৭৬৫ সালে দীউয়ানি লাভ করে ক্লাইভ এবং তাঁর সহযোগী ভেরেলস্ট যে প্রশাসনব্যবস্থা অনুসরণ করেন, তা ছিল মূলত মুগল প্রশাসনকাঠামো অক্ষত রেখে কোম্পানি কর্তৃক উপর থেকে শুধু সংগৃহীত রাজস্ব বুঝে নেবার নীতি। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার এ পর্বকে বলা যায় ইঙ্গ-মুগল যৌথ শাসন। এর উদ্দেশ্য ছিল প্রশাসনে হস্তক্ষেপ না করে দেশের উদ্বৃত্ত রাজস্ব হস্তগত করা, কোম্পানির কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত ব্যবসা ও সুযোগ-সুবিধার প্রসার ঘটানো এবং এ দেশের রাজস্ব দিয়ে কোম্পানির বাণিজ্যিক বিনিয়োগ সুনিশ্চিত করা। ১৭৭৩ সালের *রেগুলেটিং এ্যাক্ট* ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই পদক্ষেপের পটভূমি হিসেবে কাজ করেছে কোম্পানির কর্মকাণ্ডে চরম অব্যবস্থা, ব্যবসায়ে ক্রমবর্ধমান ক্ষতি এবং ১৭৬৯-৭০-এর মহাদুর্ভিক্ষ। কোম্পানি কর্তৃক এ দেশে একটি রাজ্য স্থাপন এর লক্ষ্য ছিল না।[১৩] সক্রিয়ভাবে এহেন রাজ্য স্থাপনের চিন্তা প্রথম করেছেন ওয়ারেন হেস্টিংস। হেস্টিংস-এর পরিকল্পনা আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদিত হয় *পীট্স ইন্ডিয়া আইনে* (১৭৮৪)। এই আইনের অধীনে একটি ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের জন্য কার্যকরী একটি স্থায়ী প্রশাসনিক কাঠামো নির্মাণের জন্য গভর্নর জেনারেল হিসেবে লর্ড কর্নওয়ালিসকে নিয়োগ করা হয়।

১৩. Preamble to the Regulating Act, 1773 এর পূর্ণ শিরোনাম হচ্ছে : *An Act for establishing certain Regulations for the better Management of the Affairs of the East India Company as well in India as in Europe*

ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়ায় কর্নওয়ালিস প্রশাসন (১৭৮৬-৯৩) ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের স্বরূপ কি হবে এবং কিভাবে তা শাসিত হবে এ সম্পর্কে তাত্ত্বিক ভিত্তি এবং বাস্তব পন্থা উদ্ভাবন করে কর্নওয়ালিস সরকার। ১৭৯০ সালে তিনি ৪২টি রেগুলেশন জারি করেন। সমগ্র প্রশাসন ও বিচারব্যবস্থার নীতিমালা নির্ণীত হয় উক্ত ৪২টি রেগুলেশনে। বৃটিশ বিচারব্যবস্থার আদলে তিনি একটি নিরপেক্ষ আদালত স্থাপন করেন এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন পুলিশব্যবস্থা প্রবর্তন করেন।

রাজস্ব শাসন ছিল কর্নওয়ালিস ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। রাষ্ট্রের প্রধান আয়ের উৎস ছিল ভূমিরাজস্ব। দক্ষ ভূমিরাজস্ব সংগ্রহের উপর নির্ভরশীল ছিল ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের সম্ভাব্যতা। অতএব কর্নওয়ালিস সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করেন ভূমিব্যবস্থার উপর। ১৭৮৬ সাল থেকে অনেক আলোচনা-পর্যালোচনার পর অবশেষে ১৭৯৩ সনে কর্নওয়ালিস *চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত* নামে তাঁর বিখ্যাত ভূমিনীতি ঘোষণা করেন। এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে সফল করা এবং সমুন্নত রাখার জন্যই প্রণীত হয় বিচার ও পুলিশ ব্যবস্থা। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে এসে বৃটিশ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র কাঠামোগত পূর্ণতা লাভ করলো। যদিও ১৭৯৩ সনের পরও এই রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয় নি, তবুও এহেন পদক্ষেপ ছিল নেহাতই একটি কূটনৈতিক চাল। ১৭৯৩ সাল থেকে কোম্পানিই যে ছিল এ দেশের সর্বময় কর্তা এ সম্পর্কে কোন দেশী বা বিদেশীর মনে সংশয় ছিল না। কর্নওয়ালিস তাঁর জাতির জন্য যে মহা অবদান রেখেছেন এর স্বীকৃতিস্বরূপ বৃটিশ জাতির কাছ থেকে লাভ করেছিলেন বীরের সম্মান। কিন্তু আমাদের বাঙালি জাতির দিক থেকে তাঁর কর্মকাণ্ডের মূল্যায়ন কিভাবে করা যায়?

ঐতিহাসিকভাবে কর্নওয়ালিসের ব্যবস্থাসমূহের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক গুরুত্ব অপরিসীম। একটি প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী দেশ হিসেবে বাংলার ছিল নিজস্ব রীতিনীতি, প্রথা-প্রতিষ্ঠান, যা হাজার বছর ধরে বাঙালি সমাজকে একীভূত রেখেছে, দিয়েছে ঐক্য ও একটি পরিচয়। কিন্তু কর্নওয়ালিস এই সমাজকে ভিন্নভাবে পুনর্গঠিত করতে চেয়েছেন এবং এর জন্য তিনি প্রণয়ন করেন নতুন নতুন আইন-কানুন ও প্রতিষ্ঠান, যেসবের চূড়ান্ত রূপ হচ্ছে *চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত*। কর্নওয়ালিসী ব্যবস্থা এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে বহু পরিবর্তন আশা করা হয়েছিল এবং ইপ্সিত পরিবর্তন যেন অবশ্যই আসে সে লক্ষ্যে কর্নওয়ালিস প্রবর্তন করেন একটি দক্ষ শ্বেতাঙ্গ প্রশাসন। তিনি প্রশাসনের সকল দায়িত্বপূর্ণ পদ থেকে দেশীদের উৎখাত করে ইউরোপীয়দের দায়িত্ব প্রদান করেন। ইউরোপীয় প্রশাসকদের জন্য ধার্য হয় অতি উচ্চ বেতন। এহেন ব্যবস্থা থেকে কি রাজনৈতিক ফল আশা করা যেতে পারে সহজেই অনুমেয়। একটি দেশ যদি অন্য একটি দেশের স্বার্থে শাসিত হয়, এর সকল সম্পদ যদি ঐ দেশে পাচার করা হয় এবং যদি এর সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিয়ে জনগণকে অজ্ঞতার অন্ধকারে নিক্ষেপ করা হয়, তা হলে এই বিজিত জাতির চূড়ান্ত পরিণতি কি হতে পারে?

কোম্পানি আমলের শেষ অব্দি প্রশাসন ছিল মহা বর্ণবাদী। শ্বেতাঙ্গদের নিয়ন্ত্রণে ছিল গোটা প্রশাসন। বর্ণবাদী নীতি অনুসরণে সুবাদারি শাসকদের চেয়ে কোম্পানি শাসকরা ছিল অনেক বেশি কট্টর ও নির্মম। সুবাদারি আমলে দেশীয়দের জন্য উচ্চ রাষ্ট্রীয় পদ খোলা না থাকলেও সাধারণ প্রশাসনিক দায়িত্ব থেকে তাদের দূরে রাখা হয় নি। কিন্তু কোম্পানি আমলে অতি নিম্নবর্গের কায়িক বা আধাকায়িক কাজ ছাড়া বাকি সব প্রশাসনিক দায়িত্ব অর্পিত হয় শ্বেতাঙ্গদের হাতে। নবাবি আমলে বর্ণবাদী নীতি অনুসৃত হয় নি। মুগল এবং দেশীয়দের সংমিশ্রণে গঠিত হয়েছিল নবাবি প্রশাসন। ক্লাইভ, ভেরেলস্ট, এমনকি হেস্টিংসও নবাবি নীতি অনুসরণের পক্ষপাতী ছিলেন। ক্লাইভ আর্থিক ও রাজনৈতিক সাফল্য অর্জন করতে চেয়েছিলেন কোম্পানিকে মুগল শাসনকাঠামোর অঙ্গ হিসেবে রেখে, অর্থাৎ সাম্রাজ্যের অধীনে থেকে কোম্পানি কর্তৃক সম্রাটের অনুগত দীউয়ান হিসেবে অবস্থান নেবার পক্ষপাতী ছিলেন তিনি।[১৪] ইঙ্গ-মুগল যৌথ শাসন (১৭৬৫-৭২) ক্লাইভের সৃষ্টি। স্থানীয় শাসক শ্রেণীর সঙ্গে ইংরেজদের উঠাবসা ও লেনদেন একদিনের নয়। পলাশীর শত বছর আগে থেকেই ইংরেজরা এ দেশে ব্যবসায়িক লেনদেন শুরু করে। স্থানীয় বণিক ও আমলা শ্রেণীর সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। বানিয়া ও মহাজন শ্রেণীর লোকেরা কোম্পানির ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগ করে। কোম্পানি ও দেশী বানিয়া-মুৎসুদ্দি শ্রেণীর মধ্যে দীর্ঘকাল আদানপ্রদানের ফলে এদের মধ্যে পরম বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠে। ইংরেজদের প্রতি পলাশীর চক্রান্তকারীরা আস্থাশীল ছিল বলেই তো এদের চক্রান্তে কোম্পানিকে জড়ানো হয়েছিল। ইতিপূর্বেও নবাব বদলের চক্রান্ত হয়েছে। শুজাউদ্দিন খান এবং আলিবর্দী খান চক্রান্তের মাধ্যমেই সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। কিন্তু তখন কোন বিদেশী শক্তির সাহায্য চাওয়া হয় নি। কিন্তু পলাশী চক্রান্তে কোম্পানি জড়িত হয়েছে একটি ভিন্ন প্রেক্ষাপটে। সিরাজউদ্দৌলাকে উৎখাত করার ব্যাপারে কোম্পানি ও দেশী কুচক্রীদের স্বার্থ ছিল অভিন্ন। এ কথা মনে করার কোন কারণ নেই যে বানিয়া-মুৎসুদ্দিরা পলাশী পরিবর্তন এনেছিল নিজেদেরকে ইংরেজের অধীন করার জন্য। প্রকৃতপক্ষে এদের অভিলাষ ছিল মুর্শিদাবাদ দরবারে নিজেদের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করা, এবং সে লক্ষ্যেই তারা কোম্পানির সহযোগিতা কামনা করেছিল। এমনকি চক্রান্তকারীরা কোম্পানির সঙ্গে সমভিত্তিতে ক্ষমতা ভাগাভাগি করে নিতেও প্রস্তুত ছিল। পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে মুগল শাসনতন্ত্রে বিদেশীদের ক্ষমতায় অন্তর্ভুক্ত করা মুগল ঐতিহ্যের পরিপন্থী ছিল না। উচ্চাভিলাষী আমির, বানিয়া-মুৎসুদ্দি ও জমিদারেরা সম্মিলিতভাবে সিরাজউদ্দৌলাকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্রে মেতেছিলেন তাদের নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য, সুবাকে ইংরেজ রাজত্বের অধীনস্থ করার জন্য নয়। অপরদিকে কোম্পানি স্থানীয় রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করেছে মূলত অন্যান্য ইউরোপীয় প্রতিযোগীদেব বাংলা বাণিজ্য থেকে উচ্ছেদ করার জন্য। প্রতিযোগীদের সরিয়ে ইংরেজের প্রতি সহানুভূতিশীল একজন নবাবের অধীনে বাংলার রপ্তানিবাণিজ্য কোম্পানির একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণে আনা ছিল রবার্ট ক্লাইভের লক্ষ্য। অতএব, যতোদিন ক্লাইভ ফোর্ট উইলিয়মের গভর্নররূপে এ দেশে

---

১৪. Abdul Majed Khan, *The Transition in Bengal*, 105

ছিলেন, ততোদিন তিনি ইঙ্গ-মুগল যৌথ শাসন অক্ষুণ্ন রাখার চেষ্টা করেন। কোম্পানি ও নাবালক নবাবের পক্ষে সৈয়দ মোহাম্মদ রেজা খান ছিলেন রাজ্যপরিচালক। ১৭৭২ সাল পর্যন্ত রেজা খান কোম্পানি ও নবাবের প্রতিনিধিরূপে ক্লাইভের পরিকল্পনা অনুসারে রাজ্যশাসন পরিচালনা করেন।

কিন্তু রেজা খানের শাসন স্বাধীন নিয়ন্ত্রণ হারাতে শুরু করে ক্লাইভের প্রত্যাগমনের পর থেকে। ১৭৬৭ সনে প্রত্যেক জেলায় একজন করে ইউরোপীয় সুপারভাইজার নিয়োগের মাধ্যমে শুরু হয় দেশে সরাসরি কোম্পানিশাসন প্রবর্তনের প্রক্রিয়া। রেজা খানকে উৎখাত করার অজুহাত হিসেবে ইঙ্গ-মুগল যৌথ শাসনের কল্পিত কুফল নিয়ে কোম্পানি মহলে আলোচনা শুরু হয় এবং অভিযোগ করা হয় যে রেজা খান প্রশাসনে অদক্ষ ও দুর্নীতিপরায়ণ। অত্যাচার, অদক্ষতা ও দুর্নীতির দায়ে রেজা খানকে পদচ্যুত করার জন্য কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলীর কাছে সুপারিশ করা হয় এবং তদনুসারে ১৭৭২ সালে ইঙ্গ-মুগল যৌথ শাসনের বিলুপ্তি ঘটিয়ে সরাসরি কোম্পানিশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

## চার

মুগল রাজত্ব উৎখাত করে কোম্পানিরাজ্য প্রতিষ্ঠা একটি বিরাট রাজনৈতিক পরিবর্তন বটে। কিন্তু এর প্রতি দেশের জনগোষ্ঠীর প্রতিক্রিয়া কি ছিল ? কোম্পানিশাসনের প্রাথমিক যুগে বর্বরোচিত অত্যাচার, লুণ্ঠন ও শোষণ, ইঙ্গ-মুগল যৌথ শাসনের অবসান করে একটি শ্বেতাঙ্গ সরকার স্থাপন, পশ্চিমা মডেলের বিচার ও ভূমিব্যবস্থা প্রবর্তন, কৃষকের অধিকার বিলুপ্তি প্রভৃতি ঔপনিবেশিক কার্যকলাপ নিশ্চয়ই দেশের সনাতন আর্থ-সামাজিক কাঠামোর উপর চরম আঘাত হেনেছিল, ওলটপালট করে দিয়েছিল সকল প্রচলিত প্রতিষ্ঠানাদিকে। স্বাভাবিক কারণেই অনুধাবন করা যায় যে ভুক্তভোগী গোষ্ঠীসমূহ কোন না কোন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। কি ছিল সে প্রতিক্রিয়া ? এ প্রতিক্রিয়ার সমীক্ষা থেকে পরিস্ফুট হয়ে উঠবে কালান্তর যুগের রাজনীতির ধারা ও প্রকৃতি। কলকাতা ফোর্ট উইলিয়ম কর্তৃপক্ষ ও কোম্পানি কর্তৃপক্ষের মধ্যে যোগাযোগের দলিলপত্রাদি বিশ্বাস করলে স্বীকার করতে হবে যে দেশবাসীরা নতুন প্রভুর শাসনে পরম সুখে কালাতিপাত করছিল এবং তারা বৃটিশ শাসনকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছিল।[১৫] আসলে কি তা ঠিক ? এই সব তথাকথিত দলিলদস্তাবেজ কতটুকু নির্ভরযোগ্য ?

সমকালীন সরকারি দলিলপত্র থেকে আমরা জানি কিভাবে মীর জাফর ইং অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তাদের নাগপাশ থেকে মুক্তিলাভের জন্য গোপনে কূ

১৫. ১৮০১ সালে সকল জেলা জজ ও কালেক্টরের কাছে একটি প্রশ্নমালা বিতরণ করা হয়। তাতে জেলা কর্মকর্তাদের কাছ থেকে জানতে চাওয়া হয়, 'নেটিভ'রা নতুন শাসকগোষ্ঠীর প্রতি আনুগত্য পোষণ করে কি-না। উত্তরে সকল কালেক্টর, জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট একবাক্যে জানান যে বৃটিশ শাসনের অধীনে এসে জনগণ অত্যন্ত সুখী বোধ করছে। দেখুন, *Civil Judicial Proceedings*, 8 July 1802, No 76, (India Office Records, — IOR)

তৎপরতা শুরু করেছিলেন এবং কিভাবে এই অপরাধে তিনি সিংহাসনচ্যুত হন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত নবাব মীর কাশিমও অনুরূপভাবে ইংরেজের ধ্বংসাত্মক প্রভাব থেকে মুক্ত হবার জন্য জীবনের শেষ শক্তিটুকু দিয়ে সংগ্রাম করেছেন এবং বক্সারের যুদ্ধে চূড়ান্ত পরাজয়ের পর দেশত্যাগ করে অযোধ্যার এক অজানা স্থানে মৃত্যুবরণ করেন। মহারাজা নন্দকুমারকে মিথ্যা অভিযোগে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলতে হলো, কারণ তিনি দেশ থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করার জন্য নবাবের হয়ে বিদেশী শক্তিসমূহের সমর্থন আদায়ের জন্য গোপনে কূটনৈতিক তৎপরতা চালিয়েছিলেন। রেজা খান আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন ১৭৬৫ সালের ব্যবস্থা বজায় রাখার জন্য, কিন্তু সে প্রচেষ্টায় তিনি ব্যর্থ হন। ১৭৬৫ সাল থেকে একের পর এক যাঁরা নবাব হয়েছেন তাঁদের প্রত্যেকেই কোম্পানির বিরুদ্ধে চুক্তিভঙ্গের অভিযোগ এনেছেন এবং কোম্পানিকে অনুগত দীউয়ান হিসেবে আচরণ করার জন্য হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। এমনকি নবাবেরা বৃটিশ পার্লামেন্টে পর্যন্ত দূত পাঠিয়েছেন কোম্পানির বিশ্বাস ও চুক্তিভঙ্গের সমস্যা তুলে ধরার জন্য। কোম্পানি কর্তৃক ব্যবসা-বাণিজ্যে অন্যায় হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে জগৎ শেঠ পরিবার বহু প্রতিবাদ করেছেন। সনাতন সরকারব্যবস্থা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে এসব তৎপরতা কখনো তলিয়ে দেখা হয় নি। অথচ এসব ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ ও ব্যাখ্যা ছাড়া ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র গঠনের প্রাথমিক পর্বের ইতিহাস রচনা সম্ভব নয়। একথা মনে করা মোটেই ঠিক হবে না যে ইংরেজরা সম্পূর্ণ বিনা বাধায় এ দেশে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র গঠন করেছে।

কোম্পানি রাজ্য কায়েম করেছিল মূলত রাজস্ব সংগ্রহের জন্য, এ দেশের রাজস্ব থেকে কোম্পানির বাণিজ্যপুঁজির ব্যবস্থা করতে। স্বভাবত ঔপনিবেশিক সরকারের প্রথম যোগাযোগ ঘটে জমিদারদের সঙ্গেই। বলাবাহুল্য, পলাশীর পটপরিবর্তনের সময় প্রধান জমিদারগণ মুখ্য ভূমিকা পালন করেন এবং ঐ পরিবর্তনের মাধ্যমে তারা অবশ্যই বিশেষ সুবিধা লাভের প্রত্যাশা করেছিলেন। জমিদারদের সে প্রত্যাশা কতটুকু পূরণ হয়েছিল ? দেখা যায় যে দীউয়ানি লাভের পর থেকে কোম্পানি ক্রমাগত জমিদারদের উপর রাজস্বদাবি বৃদ্ধি করে চলে। পঞ্চসনা বন্দোবস্তকালে (১৭৭২-১৭৭৭) জমিদারি নিলামে চড়ানো হয়। জমিদার শ্রেণীর অধিকাংশই সর্বোচ্চ নিলামদার কর্তৃক উৎখাত হয়। পরবর্তীকালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অপারেশনে জমিদার শ্রেণীর একটি বিরাট অংশ সমূলে ধ্বংস হয়ে যায়। একটি নতুন নিলামদার ভূস্বামী শ্রেণীর উদ্ভব হয় পুরাতন অভিজাত জমিদার শ্রেণীর ধ্বংসস্তূপের উপর।[১৬] এই সব ওলটপালটে ভুক্তভোগী জমিদার সমাজের প্রতিক্রিয়া কি ছিল ? কোম্পানির রাজস্ব দলিলপত্রে বিপুল পরিমাণ আরজিপত্র পাওয়া যায়, যেগুলি সাক্ষ্য দেয় যে জমিদারগণ কোম্পানিশাসনাধীনে ছিল ভীষণ অসন্তুষ্ট। ঐসব আরজিতে জমিদারগণ প্রায়শই ক্ষোভের সাথে অভিযোগ করে যে তারা মুগল শাসনামলে ছিল সুখী ও সমৃদ্ধিশালী, কিন্তু বৃটিশের অধীনে তারা অতি অসহায় এবং ধ্বংসের মুখোমুখি। আরজি ও আবেদন-নিবেদনে সহানুভূতি না পেয়ে অনেক জমিদার বিদ্রোহ

১৬. বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন, Sirajul Islam, *Permanent Settlement in Bengal A Study of its Operation 1790-1819*, (Dhaka 1978)

ঘোষণা করে এবং কোম্পানিশাসন উৎখাতের জন্য অস্ত্র হাতে নেয়। অবশ্য এসব বিদ্রোহ ছিল নেহাতই আঞ্চলিক এবং অতিশয় অসংগঠিত, কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এখানে কয়েকটি বিদ্রোহের কথা উল্লেখ করা যায়, যেমন, ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (১৭৭০-১৭৯০), রংপুর কৃষক বিদ্রোহ (১৭৮৩), চাকমা বিদ্রোহ (১৭৭০-১৭৮৭), বরিশালে বলাকী শাহের বিদ্রোহ (১৭৯২), ময়মনসিংহে পাগলপন্থী বিদ্রোহ (১৮২৩-১৮৩৩), তিতুমীরের বিদ্রোহ (১৮৩১) ইত্যাদি।[১৭]

গৃহত্যাগী ফকির-সন্ন্যাসী ও সাধারণ রায়ত শ্রেণী শ্রেণীগতভাবে ভিন্ন হলেও ধর্মীয় কারণে এদের মধ্যে ছিল নিবিড় সম্পর্ক। সম্পর্কের ভিত্তি ছিল রায়তের পক্ষে মুষ্টিভিক্ষা দান ও ফকির-সন্ন্যাসীদের পক্ষে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক পথ প্রদর্শন। কোম্পানিশাসনে ফকির-সন্ন্যাসীরা ছিল বিক্ষুব্ধ, কারণ সরকার এদের মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহ বেআইনী ঘোষণা করে। এদিকে প্রতি বছর খাজনার হার বৃদ্ধির ফলে রায়তশ্রেণীও ছিল অসন্তুষ্ট। অতএব বৃটিশবিরোধী তৎপরতায় ফকির-সন্ন্যাসী ও রায়তের মধ্যে সংহতি থাকা স্বাভাবিক।

উল্লেখ্য যে ১৮৫৭ সালের সিপাহি অভ্যুত্থানে গ্রামের মানুষ অভিজাত শ্রেণীর ডাকে সাড়া দেয় নি। এর মাত্র দু'বছর পর কৃষকরা ইউরোপীয় নীলকরদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুললে সমাজের অভিজাত ও শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ঐ সংগ্রামে সংহতি ঘোষণা করে নি।[১৮] এই সব ঘটনা সমাজের শ্রেণীগত মেরুকরণেরই ইঙ্গিত দেয়। ১৮৭০-এর দশকের এবং পরবর্তীকালের ব্যাপক কৃষক অসন্তোষ ও বিদ্রোহ ছিল সামাজিক শাসক শ্রেণী ও উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দৃষ্টিতে পরম অরাজকতার লক্ষণ, সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা ভঙ্গের ভয়াবহ ইঙ্গিত। ১৮৯৫ সালে কংগ্রেস সভাপতি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে বলেন, "এই সব আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গকারীদের কার্যকলাপে সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের ভূমিকা খুবই বিরল। যারা বিত্তবান, যাদের হারাবার কিছু আছে তারা এই অরাজকতার ঝুঁকি নিতে পারে না। যারা সর্বহারা, যাদের কিছুই হারাবার নেই, যারা অবিরাম অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে রত, শুধু তারাই লড়াই করার ধৃষ্টতা দেখাতে পারে এবং দেখাচ্ছেও বটে।"[১৯] ভীতিবিহ্বল ভূস্বামী ও এলিট শ্রেণী কৃষক অসন্তোষকে মহাবিপজ্জনক গণ্য করেছিল সন্দেহ নেই। ১৮৯৬ সালে কংগ্রেস সভাপতির ভাষণে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয় : "সামনের দিনগুলোতে আমাদের দেশের জন্য সব চেয়ে বড় বিপদ হবে কৃষক আন্দোলন। এই আন্দোলন উদরজ্বালার, আর কোন আন্দোলনই এই উদর-আন্দোলনের চেয়ে বেশি মারাত্মক হতে পারে না।"[২০] উচ্চমধ্যবিত্ত ও সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যবধান ছিল এতই

---

১৭. দেখুন, এই খণ্ডের পঞ্চম অধ্যায়ে সিরাজুল ইসলাম রচিত প্রবন্ধ, "অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে প্রতিরোধ আন্দোলন এবং বিদ্রোহ"।

১৮. কৃষক প্রতিরোধ আন্দোলনের চরিত্র সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন, R Guha, *Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India*, (New Delhi 1983)

১৯. A M Zaidi (ed ), *Congress Presidential Addresses*, Vol. I (New Delhi 1986), 263

২০. ঐ, ৩৫৪।

বিশাল এবং গরিব জনগোষ্ঠী ছিল এমনই নেতৃত্ববিহীন যে কৃষক অসন্তোষ কখনো এর স্থানীয় গণ্ডি অতিক্রম করে কোন জাতীয় আন্দোলনে রূপান্তরিত হতে পারে নি। কারণ, অভাব ছিল কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের। দেশে ও সমাজের শ্রেণীবিন্যাসে উচ্চ ও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে ব্যবধান কিছুটা কমে আসে বিশ শতকের দ্বিতীয় সিকিতে, যখন সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্তনের ফলে জনসাধারণের দাবিদাওয়ার প্রতি উচ্চ শ্রেণীর রাজনীতিকরা অধিকতর সহানুভূতিশীল হয়ে উঠে। নির্বাচনী রাজনীতিতে ক্ষমতার মই জনসমর্থন, বৃটিশ রাজের অনুকম্পা নয়। অতএব সে মই শক্তভাবে নির্মাণ করার জন্য প্রতিটি রাজনৈতিক দল প্রজামুখী কর্মসূচি ঘোষণা করে এবং একই সঙ্গে গড়ে তোলে দলের কৃষক-প্রজা ফ্রন্ট। কৃষক-প্রজার সমর্থন লাভের জন্য শুরু হয় আন্তঃদলীয় প্রতিযোগিতা, তোলা হয় গণমুখী শ্লোগান—যেমন, 'লাঙ্গল যার জমি তার', 'সবার জন্য ডাল-ভাত, শক্ত কর প্রজার হাত', 'বিনা খেসারতে জমিদারি প্রথা বিলোপ কর', ইত্যাদি।

কোম্পানিশাসনের প্রাথমিক যুগে বৃটিশবিরোধী আন্দোলন সম্পর্কে আমাদের কিছু জিজ্ঞাসা রয়েছে। আমরা জানি যে নবাবি শাসনের সবচেয়ে বড় সুবিধাভোগী শ্রেণী ছিল উচ্চবর্ণের হিন্দু বানিয়া, মুৎসুদ্দি, বড় জমিদার এবং সর্বোপরি প্রশাসনিক আমলাগোষ্ঠী। উচ্চবর্ণের হিন্দুদের নিয়ে একটি সুসংগঠিত আমলা শ্রেণী গঠন নবাবি শাসনের অন্যতম সৃষ্টি। প্রশাসনযন্ত্রে হিন্দু আমলার অন্তর্ভুক্তি এত দ্রুত ঘটছিল যে নবাব আলিবর্দী খানের শাসনামলে হিন্দু আমলা শ্রেণী প্রশাসনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। প্রশাসনে হিন্দুদের অন্তর্ভুক্তি ছিল নবাবদের রাষ্ট্রনীতির একটি প্রশংসনীয় দিক। এতে প্রশাসনের সঙ্গে হিন্দুরা একাত্ম হতে পেরেছিল এবং হিন্দু-মুগল একত্রিত হয়ে নবাবি রাষ্ট্র গঠনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু নতুন রাষ্ট্র গঠনের এই প্রক্রিয়ায় স্থানীয় মুসলমানদের অনুপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্র ও রাষ্ট্রীয় আভিজাত্য থেকে স্থানীয় মুসলমানদের দূরে রাখা হয়েছিল। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত স্থানীয় মুসলমান সমাজ স্বভাবতই হিন্দুদের থেকে অনেক পিছিয়ে পড়ে। এটা সত্য যে নবাবি রাষ্ট্রের সামরিক ও বিচার বিভাগ নিয়ন্ত্রিত হতো মুসলমান কর্তৃক, কিন্তু ঐ মুসলমানগণ ছিলেন অস্থানীয় অভিজাত শ্রেণীর। রাষ্ট্র পরিচালনায় স্থানীয় মুসলমানের অনুপস্থিতির একটি সনাতন ব্যাখ্যা এই যে শিয়া মতাবলম্বী নবাবগণ সুন্নী বাঙালি মুসলমানদের অবহেলার চোখে দেখতেন। এ ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কারণ, রাজনৈতিক কারণে যদি হিন্দুদের প্রশাসনে অন্তর্ভুক্ত করা যায়, তা হলে একই কারণে স্থানীয় মুসলমানদেরও প্রশাসনে অন্তর্ভুক্ত করা যেতো।

প্রশাসনে স্থানীয় মুসলমানদের প্রায় অনুপস্থিতির একটি ব্যাখ্যা হতে পারে যোগ্য প্রার্থীর অভাব। যদি তাই হয়, তবে আবার প্রশ্ন উঠে, যোগ্য লোকের অভাব কেন ? শত শত বছরের মুসলিম শাসন কি তা হলে স্থানীয় মুসলমান জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে কোন অবদান রাখে নি ? স্থানীয় মুসলমানদের মনীষা উন্নয়নে পদক্ষেপ না নেয়া কি মুসলিম শাসকগোষ্ঠীর কোন সচেতন নীতি ছিল ? নবাবি শাসনের আগেই দেশের ভূমিনিয়ন্ত্রণ হিন্দুদের হাতে চলে যায়। এই অবস্থা আরো মজবুত হয় নবাবি যুগে। বিশেষকরে, রাজা-

মহারাজা উপাধিধারী বড় বড় হিন্দু জমিদার পরিবারগুলি ছিল নবাবদেরই সৃষ্টি। অনুরূপভাবে, নবাবি শাসনের অনেক আগে থেকেই মধ্য ও নিম্ন স্তরের সরকারি পদগুলি সীমাবদ্ধ ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে। নবাবি যুগে এসে তারা আরো সুবিধা লাভ করে এবং বেসামরিক আমলাতন্ত্রের প্রায় গোটা অংশই তারা নিয়ন্ত্রণ করে। ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাঙ্কিং, হাট-বাজার সবই চলে আসে হিন্দুদের নিয়ন্ত্রণে। সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, মুসলমান আমলে স্থানীয় মুসলমান সম্প্রদায় ছিল রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত, স্বাভাবিকভাবেই হিন্দুদের চেয়ে অনেক পশ্চাৎপদ।

সংক্ষেপে এ কথাই বলতে হয় যে, নবাবি যুগে ক্ষমতা ভাগাভাগি হয় মুগল ও এলিট হিন্দুদের মধ্যে। সুতরাং ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্র ও প্রশাসন যখন শুধু শ্বেতাঙ্গদের নিয়ে গঠিত হয়, তখন এর ভুক্তভোগী ছিল মুগল ও হিন্দু এলিট শ্রেণী। স্থানীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য ঔপনিবেশিক শাসন ছিল এক প্রভু থেকে অন্য প্রভুর অধীনে বসবাস। হারাবার মতো তাদের কিছুই ছিল না। হিন্দু অভিজাত আমলা শ্রেণী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হারিয়ে গুরুত্বহীন অবস্থায় নিপতিত হয়। অর্থনৈতিক অঙ্গনে মহা জগৎ শেঠ পরিবারসহ সকল ধনিক-বণিক নিঃস্ব হয়ে পড়ে। দেশের অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে ইউরোপীয় এজেন্সি হাউজগুলি।[২১] চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বেশ আগেই জমিদার শ্রেণী আর্থিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং এই বন্দোবস্তের চাপে বহু জমিদার পরিবার ধ্বংস হয়ে যায়। এদের জমি হস্তান্তরিত হয়েছে বেশির ভাগই ইজারাদার ও নিলামদারের কাছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এত সব মর্মান্তিক বিপর্যয়ের পরও ভুক্তভোগীরা ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকে মেনে নেয়। অবশ্য ভুক্তভোগী অভিজাতদের মধ্যে অনেকে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রব্যবস্থার অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন, কিন্তু সে প্রতিবাদ ছিল নেহাতই মৃদু ও মুষ্টিমেয় লোকের ; আরজি-আবেদন করে তারা নতুন রাষ্ট্রসৃষ্ট রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তবে তারা বৃটিশ শাসনের প্রতি অনানুগত্য প্রকাশ করেন নি।

কিন্তু বৃটিশ শাসনের অন্যায়-অবিচারসমূহ প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছেন সাধারণ কৃষক শ্রেণী। অধিকার আদায়ের জন্য রায়ত বা কৃষক শ্রেণী প্রয়োজনে সশস্ত্র আন্দোলনসহ সব রকম কলাকৌশল প্রয়োগ করে। পাবনা কৃষক বিদ্রোহ (১৮৭৩), তুষখালী কৃষক বিদ্রোহ (১৮৭২-৭৫) ও ফরায়জী আন্দোলন ১৮৮০-এর দশক থেকে সরকারের উদার নীতি অবলম্বনের পটভূমি তৈরি করেছে। অথচ ঐ সব প্রতিরোধ আন্দোলনে প্রাক্তন অভিজাত শাসক শ্রেণীর ভূমিকা ছিল অতি গৌণ বা অনুপস্থিত। ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ অতি সহজেই অভিজাত শাসক শ্রেণীকে পর্যুদস্ত করেছিল। কিন্তু আঞ্চলিক কৃষক অসন্তোষ নিয়ন্ত্রণ করতে সরকারকে সব সময়েই সমঝোতার পথ বেছে নিতে হয়। আগেই উল্লেখিত হয়েছে যে, গ্রামীণ কৃষক সমাজ ছিল একটি ভিন্ন জগত। এদের ছিল নিজস্ব রীতিনীতি, রেওয়াজ, বিশেষ অধিকার ও দায়দায়িত্ব। এগুলি সযত্নে সংরক্ষণ করতো গ্রামীণ সমাজ।

২১. K M Mohsin, *Murshidabad*, 262

গ্রামীণ প্রথা-প্রতিষ্ঠানের উপর আক্রমণ আসলে তা প্রতিহত করতে তারা কুণ্ঠাবোধ করে নি। আক্রমণকারী জমিদার বা সরকার যেই হোক না কেন, অধিকার সংরক্ষণে কৃষকরা ছিল অকুতোভয়, অবিরাম সংগ্রামী। ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (১৭৬০-১৭৮৭) হতে শুরু করে উনিশ শতকের শেষ ভাগের দেশব্যাপী ব্যাপক কৃষক অসন্তোষ থেকেই আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি। কিন্তু এই সব বিদ্রোহ এবং রাষ্ট্র-রায়ত সম্পর্কের উপর ঐতিহাসিকগণ এ পর্যন্ত খুব কমই আলোকপাত করেছেন। অধুনা নিম্নবর্গের উপর গবেষণায় বিশেষ ভূমিকা রাখছেন এক শ্রেণীর পণ্ডিত, যাঁরা নিজেদেরকে 'সাবালটার্ন' বা নিম্নবর্গের পণ্ডিত বলে অভিহিত করেন। 'নিম্নবর্গের' পণ্ডিতগণ গবেষণাক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন সন্দেহ নেই।

ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে প্রতিষ্ঠিত শাসক শ্রেণী অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, কিন্তু পরম সুবিধা লাভ করেছিল নব্য বাবু শ্রেণী। পড়ন্ত অভিজাত শ্রেণী ছিল নতুন শাসন সম্পর্কে সমালোচনামুখর, কিন্তু নব্য আমলা শ্রেণী ছিল অত্যধিক অনুগত ও উদ্দীপ্ত। কালান্তর যুগের ওলটপালটের মধ্যে পুরাতন শাসক শ্রেণী তলিয়ে গেলেও নব্য বাবুরা লাভ করেছিল অভূতপূর্ব সুযোগ-সুবিধা। অতএব বৃটিশের প্রতি এদের অনুরাগ ছিল অসীম। কিন্তু এই অত্যুৎসাহী শ্রেণীর ব্যাপ্তি ছিল কলকাতাভিত্তিক কতিপয় বানিয়া পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তবে ১৭৯৩ সনে কর্নওয়ালিসী ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর নতুন নতুন সুবিধাভোগী শ্রেণীর আবির্ভাব হয়, যেমন উকিল, মোক্তার, মুনসেফ, কালেক্টরেট আমলা, শহুরে বাড়িওয়ালা ও সরবরাহকারী, নতুন জমিদার, ইজারাদার, মধ্যস্বত্বভোগী ইত্যাদি। ১৮৩০-এর দশকে ইংরেজির মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তন এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানে অধিক হারে দেশী লোকদের নিয়োগনীতি গ্রহণের ফলে একটি প্রশাসনিক মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিকাশ লাভ করছিল। এদিকে সরকারি বৃত্তের বাইরেও কতিপয় সেক্টরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছিল, যেমন, নৌ-পরিবহন, অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্য, অর্থকরী ফসলের বাজার ইত্যাদি। সদ্য উদ্ভূত মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল প্রাক-ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা সম্পর্কে অত্যন্ত সমালোচনামুখর। এদের দৃষ্টিতে বৃটিশ শাসন ছিল এ দেশবাসীর জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। বৃটিশভক্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সদস্যরা এসেছে সমাজের বিভিন্ন স্তর ও অবস্থান থেকে এবং বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অবস্থানের লোক এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যেমন, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র গঠনের প্রাথমিক পর্বে ইংরেজদের সান্নিধ্যে এসেছে বানিয়া শ্রেণী এবং এরাই আধুনিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গোড়াপত্তন করে। নতুন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় দেশীয় বণিক শ্রেণীর অবস্থান দুর্বল হয়ে যাওয়ায় অনেকে ব্যবসা থেকে পুঁজি প্রত্যাহার করে ভূমিতে বিনিয়োগ করে। ভূমি নিয়ন্ত্রণে পুঁজি বিনিয়োগের সুযোগ এনে দেয় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। 'সূর্যাস্ত আইন'-এর আওতায় বিপুল পরিমাণ ভূসম্পত্তি হস্তান্তরিত হয় এবং এর অধিকাংশই ক্রয় করে প্রাক্তন জমিদারি আমলা ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর লোক। গ্রামীণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রথম পুরুষ ঐ নিলামদার ভূস্বামীগণ। কর্নওয়ালিসী ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর সৃষ্টি হয় জেলা ও প্রদেশভিত্তিক অফিস-আদালত, উকিল-মোক্তার, জেলাভিত্তিক শিক্ষা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এবং এগুলিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে মফস্বল শহর ও শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণী।

নগরভিত্তিক মধ্যবিত্ত শ্রেণী পশ্চিমা কায়দায় নিজেদের সংগঠিত করতে থাকে। সনাতন নিয়মে ধর্ম ও বর্ণভিত্তিক সংগঠন পরিহার করে নব্য মধ্যবিত্তরা শ্রেণী ও পেশাভিত্তিক সভা-সমিতি ও সংগঠন গড়ে তুলতে তৎপর হয়। এসব সঙ্ঘের একটি সাধারণ লক্ষ্য ছিল বৃটিশ জাতি ও বৃটিশ শাসনের প্রশংসা করা এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার পক্ষে জনমত সৃষ্টি করা। পত্র-পত্রিকা, পুস্তক প্রভৃতির মাধ্যমে এরা পাশ্চাত্য চিন্তা, জীবনধারা অনুকরণ দ্বারা দেশের স্থবির অবস্থার মধ্যে গতি সঞ্চারের চেষ্টা করে।[২২] পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য ধীকল্প (ideas) দ্বারা অনেকে এমন গভীরভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়ে যে তারা প্রায় অন্ধভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতার জয়গান করতে থাকে। তথাকথিত 'নব্য বাংলা' (Young Bengal) নামে এক যুবগোষ্ঠী প্রাচ্য সভ্যতার প্রতি এমন বৈরী হয়ে উঠে যে এদের চোখে যা-কিছু প্রাচ্য সবই জড় এবং প্রত্যাখ্যানযোগ্য ঠেকতো। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির পক্ষে এদের অন্ধ অনুকরণকে অনেকে ভুল করে বাংলার জাগরণ বা রেনেসাঁ বলে আখ্যায়িত করেছেন। আসলে নব্য বাংলাদের এই আচরণ ছিল রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ের প্রয়াস, রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি নয়। প্রত্যাখ্যাত জমিদার ও ক্ষয়িষ্ণু অভিজাত শ্রেণী, ওহাবী, ফরায়জী এবং অন্যান্য প্রতিরোধকারীরা কখনো বৃটিশ শাসনকে স্বীকৃতি দেয় নি। তাদের দৃষ্টিতে ফিরিঙ্গি শাসন ছিল অবৈধ এবং এই অবৈধ শাসন উৎখাতের জন্য তারা ছিল তৎপর, যদিও অত্যন্ত অসংগঠিতভাবে। তাদের প্রতিরোধ তৎপরতাকে রাজনৈতিক অসচেতনতা বা পশ্চাৎপদতা বলে আখ্যায়িত করা নিতান্তই একপেশে সিদ্ধান্ত এবং এই সিদ্ধান্ত দিয়েছে ইংরেজ এবং তা অন্ধভাবে গ্রহণ করেছে ইংরেজপন্থী পাশ্চাত্য শিক্ষিত পেশাদার শ্রেণী। ফিরিঙ্গি প্রতিরোধকারী সনাতন জাতীয়তাবাদীদের বড় জোর অবাস্তব পরিকল্পনাকারী বলা যেতে পারে, কিছুতেই তাদেরকে রাজনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ বা অসচেতন বলা যায় না। এরা চেয়েছিলেন ফিরিঙ্গিরাজ উৎখাত করে পূর্বতন সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে এবং এই অসম্ভব উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে তারা সব রকম ত্যাগস্বীকার করেছেন, স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছেন। ফিরিঙ্গি সরকারকে উৎখাত করে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা ছিল সমকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একটি অতি বিলাসী চিন্তা। কিন্তু তবুও তাদের বৃটিশবিরোধী তৎপবতা ছিল অব্যাহত। অপরপক্ষে, বৃটিশপন্থী বাবু শ্রেণী এবং নব্য ভূস্বামী ও ব্যবসায়ী শ্রেণী বৃটিশ শাসনের দীর্ঘায়ু কামনা করে, যদিও বৃটিশ শাসকরা ছিল বর্ণবাদী শোষক ও উৎপীড়ক এবং যদিও বর্ণবাদী বৃটিশ শাসনাধীনে দেশী সভ্যতা-সংস্কৃতি পদদলিত হয়। বৃটিশ সিভিলিয়ান ঐতিহাসিকগণ বৃটিশের অনুগত বাবুদের প্রশংসা করেছেন রাজনৈতিকভাবে সচেতন শ্রেণী হিসেবে। অর্থাৎ আনুগত্য ছিল 'সচেতনতা'র লক্ষণ। আর প্রতিরোধকারী সনাতন জাতীয়তাবাদীরা আখ্যায়িত হন রাজনৈতিকভাবে 'অসচেতন' ও 'পশ্চাৎপদ' শ্রেণী হিসেবে। স্বাধীনতাকামীদের কার্যকলাপের এ ধরনের ব্যাখ্যা অবশ্যই বিজ্ঞানসম্মত নয়। মার্কিনীরা বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের প্রতিরোধ করেছে বলে প্রতিরোধকারীদের রাজনৈতিকভাবে

২২. Rajat Sanyal, *Voluntary Associations and the Urban Public Life in Bengal (1815-1876)*, (Calcutta 1980), 232-34.

অজ্ঞ বা পশ্চাৎপদ বলা হয় না, তবে একই ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধকারী বাঙালিদের রাজনৈতিকভাবে অজ্ঞ বলা হয় কেন ? স্পেনীয়রা আরবি শিখতে চায় নি, কারণ তারা তাদের দেশের মাটিতে আরব শাসন মেনে নেয় নি। এটা কি স্পেনীয়দের রাজনৈতিক অজ্ঞতা না সচেতনতা ? একই প্রশ্ন উঠে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে দেশীয়দের প্রতিরোধ আন্দোলনের বেলায়। দেশের সভ্যতা-সংস্কৃতি-স্বাধীনতা রক্ষার্থে বিদেশী দখলদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলন রচনা করা রাজনৈতিক অজ্ঞতার পরিচয় হতে পারে না। তবে এটা যখন পরিষ্কার হয়ে উঠলো যে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বৃটিশ শাসন উৎখাত একেবারেই অসম্ভব, তখন প্রতিরোধকারীরা ক্রমশ বৃটিশ শাসনকে স্বীকার করে নেয় এবং বাস্তবতার তাগিদে বৃটিশ ব্যবস্থার মধ্যে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টা করে। তবে বৃটিশবিরোধী মনোভাব অনেকের মনে এমন শক্তভাবে দানা বেঁধে উঠেছিল যে তারা ইংরেজি শিক্ষাকে ধর্মের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলে এবং মনে করে যে ইংরেজি শিক্ষাগ্রহণ ধর্মের পরিপন্থী।

## পাঁচ

উনিশ শতকের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহে দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এর একটি হচ্ছে ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাংগঠনিক পরিপক্বতা অর্জন এবং অপরটি হচ্ছে মুসলিম আত্মসচেতনতা ও তৎপ্রসূত মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদী মনোভঙ্গি। পূর্বে শুধু বহিরাগত অভিজাত মুসলমানরা নিজেদেরকে পূর্বতন শাসক শ্রেণীর সঙ্গে সনাক্ত করতো এবং এ দেশীয় সাধারণ মুসলমান রাজনীতি এবং আত্মপরিচয়ের ব্যাপারে ছিল উদাসীন ও অনাসক্ত। কিন্তু উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে এদের মধ্যে এই মর্মে এক ধরনের জাতিগত চেতনার উন্মেষ হয় যে এ দেশের সকল মুসলমানই হচ্ছে এককালের শাসক শ্রেণী এবং বর্তমানে অবনত এবং তাদের মতে এই অবনতির জন্য সমভাবে দায়ী এক দিকে হিন্দু জমিদার ও বাবু শ্রেণী, অপর দিকে বৃটিশ রাজ। একটি কল্পিত ধারণা নিয়ে মুসলমানরা গর্ববোধ করতে থাকে যে এরা যখন ছিল শাসক, হিন্দুরা তখন ছিল তাদের অধস্তন প্রজা। এহেন মনোভাবের কারণে মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সংহতির বদলে সৃষ্টি হয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা। বাঙালি মুসলমানদের মনে প্রতীতি জন্মে যে তারা পূর্বতন শাসক শ্রেণীর জাত এবং এই ধারণা তাদের মধ্যে এমন আত্মপ্রত্যয় সৃষ্টি করে যে মুসলমানদের অতীত গৌরবময় ভূমিকা সম্পর্কে তাদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারলে পুনরায় তারা শাসক জাতিতে পরিণত হতে পারে।

বাঙালি মুসলমানরা যে পুরানো শাসক শ্রেণীর অন্তর্গত এহেন দাবি প্রাক-বৃটিশ যুগে উঠে নি, উঠলে মুগল অভিজাত শ্রেণী যে সে দাবি ধৃষ্টতা বলে উড়িয়ে দিত এতে কোন সন্দেহ নেই, কেননা মুগলরা কখনো বাঙালি মুসলমানদের অভিজাত শ্রেণীর মর্যাদা দেয় নি। ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি কিভাবে নবাবি আমলে শাসক শ্রেণীর অধীনে স্থানীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থ অবহেলিত হয়েছে এবং কিভাবে দেশীয় উচ্চবর্ণের

হিন্দুদের সঙ্গে আঁতাত করে মুগলরা আপামর জনগোষ্ঠীর উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছে। স্থানীয় মুসলমানরা ছিল অবহেলিত, কারণ পেশাগতভাবে এরা ছিল কৃষক, তাঁতী, কারিগর, ধোপা, মাঝি ইত্যাদি। আভিজাত্যভিত্তিক রাষ্ট্রকাঠামোতে এই নিম্নবর্গের পেশাজীবীদের অবস্থা ছিল শোচনীয়। পদানত প্রজা হিসেবে এরা শাসক অভিজাত শ্রেণীর প্রতি প্রদান করেছে প্রবৃত্তিজাত আনুগত্য। এমনিতরো আনুগত্য প্রদর্শন করেছে অন্যান্য সম্প্রদায়ের অবনত শ্রেণীও। প্রতিবেশী হিসেবে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এরা শান্তিপূর্ণ ও হৃদ্যতাপূর্ণ সহাবস্থান বজায় রেখেছে। ধর্ম ভিন্ন হলেও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি, রেওয়াজ, খাবার, বেশভূষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য ছিল অলক্ষণীয়। অতএব উচ্চ মহলের ন্যায় রাষ্ট্রের নিম্নপর্যায়েও ছিল পরম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। তবে উচ্চ মহলে এই সম্প্রীতির কারণ ছিল রাজনৈতিক, আর নিম্নস্তরে ছিল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক। নিম্নবর্গের মানুষ গঠন করে একটি ভিন্ন জগৎ। উৎপাদন এবং রাজস্ব প্রদান ছিল এদের কাজ। এদের উদ্বৃত্ত উৎপাদনের উপর জীবিকা নির্বাহ করেছে অভিজাত শাসক শ্রেণী। সুতরাং শ্রেণীগত আধিপত্য বজায় রাখার তাগিদে উৎপাদক শ্রেণীকে এমনভাবে বিন্যস্ত ও নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে যেন এরা অভিজাত শাসক শ্রেণীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও অনুগত থাকে।

তা হলে, বাঙালি মুসলমানরা নিজেদেরকে পূর্বতন 'শাসক শ্রেণীর' বংশধর গণ্য করলো কেন এবং কিভাবে ? এ মনোভাবের বিকাশের উৎস ছিল মূলত দুটি। এদের একটি বৃটিশ শাসনের অভিঘাত। কর্নওয়ালিসী ব্যবস্থার পূর্ব পর্যন্ত, এমনকি এর কিছুকাল পরও রাষ্ট্রের বিচার বিভাগ ছিল মুসলমানদের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণে। তা ছাড়া রাষ্ট্রের অন্যান্য উচ্চ পদগুলিরও অধিকাংশই নিয়ন্ত্রণ করতো মুসলিম আমলারা। এমনকি মধ্য ও নিম্নস্তরের রাষ্ট্রীয় পদসমূহে মুসলমানদের হিস্যা ছিল লক্ষণীয়। কিন্তু এরা প্রায় সবাই ছিল অভ্যাগত অভিজাত মুসলমান, এদের মধ্যে স্থানীয় বাঙালি মুসলমানের সংখ্যা ছিল বিরল। কর্নওয়ালিসের সার্বিক শ্বেতাঙ্গ প্রশাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর উক্ত চাকুরিজীবী অভ্যাগত মুসলমানদের পতন ঘটে। চাকুরিজীবী ছাড়াও বহু অভিজাত মুসলমান পরিবার ছিল, যারা দীর্ঘকাল এ দেশে বসবাস করে এ দেশের স্থায়ী বাসিন্দায় পরিণত হয়েছে। সম্রাট কর্তৃক প্রদত্ত লাখেরাজ বা নিষ্কর ভূমি ছিল এদের ভরণপোষণের মূল উৎস। কিন্তু উনিশ শতকের শুরু থেকে ব্যাপক হারে লাখেরাজ জমি বাজেয়াপ্ত করে ঐ জমির উপর কর আরোপ করা হয়। ফলে লাখেরাজদারদের স্বার্থ দারুণভাবে ক্ষুণ্ন হয়। তবে একথা মনে রাখা দরকার যে শ্বেতাঙ্গ প্রশাসন প্রতিষ্ঠা এবং লাখেরাজ জমি বাজেয়াপ্তকরণ অভিযানের ফলে পরিসংখ্যানগতভাবে অভিজাত মুসলমান শ্রেণীর চেয়ে হিন্দুরা ক্ষতিগ্রস্ত হয় বেশি। তবুও মুসলমানদের ক্ষতি বেশি চোখে পড়ে এজন্য যে এক শ্রেণীর হিন্দু ভূমিনিয়ন্ত্রণ ও অন্যান্য পেশা থেকে চ্যুত হলেও আরেক শ্রেণীর হিন্দু এসে সে শূন্যতা পূরণ করেছে। কিন্তু মুসলমানদের ক্ষেত্রে তা ঘটে নি। এরা শুধু হারিয়েছে, এদের মধ্য থেকে অন্য কোন শ্রেণী এ শূন্যতা পূরণ করে নি। অতএব বৃটিশ শাসনাধীনে সাম্প্রদায়িকভাবে অধঃপতনের প্রশ্নটি

শুধু মুসলমানদের বেলায় প্রযোজ্য। অধঃপতিত হয়ে অভিজাত মুসলমানরা সাধারণ মুসলমানদের সঙ্গে একাত্ম হবার তাগিদ বোধ করলো। অতএব উনিশ শতকের শেষার্ধে মুসলমান সম্প্রদায়ের পুনর্জাগরণ শুরু হলে অভিজাত ও অনভিজাত সকল মুসলমান নিজেদের একটি বঞ্চিত জাতি হিসেবে গণ্য করে এবং এই ঐক্যবোধকে জোরদার করার জন্য মিথ তৈরি করা হয় এই মর্মে যে বাংলার মুসলমানরা একদা ছিল 'শাসক জাতি' এবং তাদের হৃত গৌরব ফিরে পেতে হলে চাই ঐক্যের ভিত্তিতে জাগরণ।

বাংলার মুসলমানদের নিজেদেরকে প্রাক্তন শাসক শ্রেণীর সদস্য হিসেবে গণ্য করার আরেকটি উৎস হচ্ছে ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন। বাংলাদেশে ইসলাম প্রবর্তনের বিশেষ ধারা এবং সরকারি নীতির ফলে স্থানীয় মুসলমানদের আচার-অনুষ্ঠান ও রীতিনীতিতে মূল ইসলামের অনুশাসন পালিত হতো খুব কম। বাঙালি মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির উপাদান ছিল খুব লক্ষণীয়। এক কথায়, আচার-অনুষ্ঠানের দিক থেকে এরা ছিল আধা হিন্দু, আধা মুসলমান। কিন্তু এদের জীবনধারা থেকে হিন্দু উপাদান উচ্ছেদ করে খাঁটি মুসলমানী উপাদান অনুপ্রবিষ্ট করার জন্য মুগল সরকার চেষ্টা করে নি। এ দেশের মুসলমানদেরকে হিন্দু সংস্কৃতিভুক্ত রাখার মধ্যে একটি রাজনৈতিক চিন্তা ছিল ক্রিয়াশীল। তা এই যে মৌল ইসলাম প্রবর্তিত হলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মৌলবাদভিত্তিক ধর্মীয় দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হবে এবং ফলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট হবে। সাম্প্রদায়িক সহনশীলতা বজায় রাখতে না পারলে এই হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ভূখণ্ডে নবাবদের পক্ষে শান্তিপূর্ণভাবে রাজত্ব করা সম্ভব নয়। অতএব বঙ্গীয় ইসলামকে রাজনৈতিক কারণে মিশ্রিত রাখার পক্ষপাতী ছিলেন নবাবি শাসকরা। স্থানীয় মুসলমানদের মধ্যে মূল ইসলাম সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির কোন সক্রিয় নীতি গ্রহণ করা হয় নি। ফলে বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ ছিল বহুলাংশে হিন্দু আচার-প্রথা দ্বারা প্রভাবিত। এদিকে হিন্দুদের উপরও মুসলিম সুফি-সাধকদের প্রভাব ছিল লক্ষণীয়। ফলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় নি। ধর্মীয় সহনশীলতা ছিল আঠারো শতকের রাজনীতির বড় বৈশিষ্ট্য। তবে অভ্যাগত ইরানী-তুরানী মুসলমানরা কখনো স্থানীয় ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান দ্বারা প্রভাবিত হয় নি এবং নিজেদের ধর্মীয় রীতিনীতিও স্থানীয় মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে নি। এক কথায়, ইরানী-তুরানী মুসলমান, স্থানীয় মুসলমান এবং হিন্দু সমাজের সকলেই একে অপরকে প্রভাবিত না করে নিজ নিজ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নিয়ে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি অনুসরণ করে। অভিজাত মুসলমানরা যদি কখনো মনে করতো যে ইসলাম বিপন্ন, তা হলে তারা ইসলাম রক্ষার জন্য সরকারের শরণাপন্ন হতো, কিন্তু কখনো স্থানীয় মুসলমানদের ধর্মীয় দ্বন্দ্বে জড়াতো না।[২৩] তবে এমন পরিস্থিতি নবাবি আমলে খুবই কম লক্ষ্য করা যায়। ইসলাম রক্ষার নামে অভ্যাগত ও স্থানীয় মুসলমানরা মৈত্রী গঠন করেছে উনিশ শতকের শেষার্ধে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাবে গ্রামাঞ্চলে একটি মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণী সৃষ্টি হয় এবং এই শ্রেণীর অধিকাংশ ছিল স্থানীয় মুসলমান। পাট অর্থনীতি প্রবর্তনের ফলে গ্রামে একটি ধনী কৃষক শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। মধ্যস্বত্বাধিকারী ও ধনী কৃষকদের সমন্বয়ে গঠিত গ্রামীণ মধ্যবিত্ত শ্রেণী ক্রমশ রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ

২৩. P. Hardy, *The Muslims of British India*, (Cambridge 1972), 58.

হয়ে উঠে। অভিজাত মুসলমানদের জাতীয় রাজনীতিকে শক্তিশালী ও অর্থপূর্ণ করার জন্য গ্রামীণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। অতএব উনিশ শতকে মুসলিম সংস্কার আন্দোলনে নেতাগণ আভিজাত্যের বদলে মুসলিম ভ্রাতৃত্বের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করেন। মুসলিম নেতৃত্বের দৃষ্টিভঙ্গিতে এই পরিবর্তন ঐতিহাসিকভাবে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে একদিকে যেমন মুসলিম সম্প্রদায়ের ঐক্যের পথ প্রশস্ত হয়, অপরদিকে স্থানীয় পর্যায়ে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে ফাটল ধরার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

ইসলাম ধর্মসংস্কার আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল বঙ্গীয় মুসলিম সমাজের আচার-অনুষ্ঠান থেকে হিন্দু প্রভাব দূর করা। হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের সংশ্লেষণ রাজনৈতিক ঐক্যের জন্য শুভ হলেও ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনের পথে ছিল একটি বড় অন্তরায়। বঙ্গীয় ইসলাম চর্চায় হিন্দু উপাদানকে মুসলিম সংস্কারবাদীগণ বেদাত বা অনৈসলামিক ঘোষণা করে ঐগুলি মুসলমানদের জীবনযাত্রা থেকে দূর করার আহ্বান জানান। অপর দিকে হিন্দু সমাজেও অনুরূপ সংস্কারবাদী আন্দোলন শুরু হয়। হিন্দু সংস্কারবাদীগণ বৈদিক ও পৌরাণিক ধর্মব্যবস্থার উপর জোর দেন এবং হিন্দু ধর্মচর্চা থেকে পরবর্তীকালে সৃষ্ট আচার-অনুষ্ঠান-বিশ্বাস দূর করার জন্য আন্দোলন শুরু করেন। সংস্কার আন্দোলনের ফলে উভয় ধর্মের মধ্যে যে সংশ্লেষণী প্রতীকসমূহ ছিল সেগুলি ক্রমশ বিলুপ্ত হয়। হিন্দু সমাজে মুসলমানী আচার-অনুষ্ঠান আর মুসলমান সমাজে হিন্দুয়ানি আচার-অনুষ্ঠান পালনের দীর্ঘকালের ঐতিহ্য বিদূরিত হলো এবং এর সঙ্গে ভেঙ্গে গেল উভয় ধর্মাবলম্বীর মধ্যে সবচেয়ে শক্ত মিলন-সেতু।

যদিও উনিশ শতকের শেষ নাগাদ সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতাবাদের সকল উপসর্গ লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা তখনো এতটা অনুভূত হয় নি। তখনো হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কে লক্ষণীয়ভাবে কোন অবনতি ঘটে নি। মুসলিম জাগরণের অন্যতম নেতা স্যার সৈয়দ আমির আলি (১৮৪৯-১৯২৮) তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলেন :

> সে যুগে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে কোন তিক্ততা ছিল না। সম্পূর্ণ শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে তারা এক সঙ্গে বসবাস করেছে, এক সঙ্গে কাজ করেছে। নামাজের সময় মসজিদের পাশ দিয়ে হিন্দু মিছিল গেলে মুসল্লীরা তেড়ে আসে নি। অপর পক্ষে বকরা ঈদে কোরবানিকে কেন্দ্র করেও হিন্দুরা কোন তুলকালাম কাণ্ড করে নি। এক কথায়, ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিকে কেন্দ্র করে কোন দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয় নি। যদি কোন বিরোধ দেখা দিত তা হতো নিতান্তই জাগতিক বা প্রতিবেশীজাত ব্যাপার নিয়ে। যেমন মুসলিম প্রতিবেশীর হাঁস-মুরগী হিন্দু প্রতিবেশীর আঙ্গিনায় গিয়ে কিছু নষ্ট করলো, হলো কিছুক্ষণ বাক-বিতণ্ডা, এমনিতরো বিরোধ। কিন্তু ওসব প্রতিবেশোদ্ভূত সমস্যা কখনো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকর হানাহানির রূপ নেয় নি। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিবেশ বিনষ্ট হয় সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচন নিয়ে। ঐ ইস্যু সৃষ্টির পূর্ব পর্যন্ত হিন্দু-মুসলমানদের সুপ্রতিবেশীসুলভ সম্পর্কে চিড় ধরে নি। পৃথক নির্বাচন ইস্যু থেকেই বিরোধ শুরু। এক পক্ষের আধিপত্য, অপর পক্ষের তলিয়ে পড়ার ভয় পৃথক নির্বাচন অব্দি ছিল না।[২৪]

২৪. Syed Razi Wasti, *Memoirs and Other Writings of Syed Ameer Ali*, (Delhi 1985, reprint), 18

১৯৪৭ সালের দেশবিভাগের পর থেকে পণ্ডিতগণ একটি সমস্যার উপর বিস্তর আলোকপাত করেছেন। সেটি হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদ। কিভাবে হিন্দু-মুসলমান সুসম্পর্ক পরিহার করে সাম্প্রদায়িকতার জালে জড়িয়ে গেল, কিভাবে মুসলিম সম্প্রদায় বিচ্ছিন্নতাবাদী হয়ে উঠলো এ নিয়ে অনেক লেখালেখি হয়েছে। কিন্তু যতোই এ বিষয়ে নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা হচ্ছে ততোই একটি বিষয় আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে আসছে। সেটি হচ্ছে আন্তঃসম্প্রদায়ভিত্তিক সরকারি চাকুরি বিষয়ক পরিসংখ্যানের উদ্দেশ্যমূলক বিশ্লেষণ। দেখানো হয়েছে যে, যদিও বাংলায় মুসলমানরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ, কিন্তু সরকারি-বেসরকারি সুযোগ-সুবিধায় তাদের উপস্থিতি ছিল অতি নগণ্য। রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধার সিংহভাগ ভোগ করেছে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়। এই বৈষম্যে মুসলমানরা আরো বিচলিত হয়ে উঠলো যখন দেখা গেল যে, সুযোগ দেয়া সত্ত্বেও তারা যোগ্যতার অভাবে সে সুযোগ গ্রহণ করতে অপারগ। এমনও দেখা গেছে, মুসলমানদের অগ্রাধিকার দিয়ে বিভিন্ন সরকারি পদ পূরণের বিজ্ঞপ্তি দেয়ার পরও প্রার্থী পাওয়া যায় নি, কারণ কাঙ্ক্ষিত যোগ্যতাসম্পন্ন লোকের অভাব। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে মুসলমানদের অগ্রাধিকার দেওয়া সত্ত্বেও ১৯৩০-এর দশক পর্যন্ত মাত্র গুটিকয়েক মুসলমানকে শিক্ষক নিয়োগ করা সম্ভব হয়েছিল। এদের মধ্যে আবার বেশিরভাগই ছিলেন অবাঙালি।

মুসলিম জাতীয়তাবাদী নেতাগণ চাকুরিক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান বৈষম্য প্রদর্শন করতে সম্প্রদায়ভিত্তিক পরিসংখ্যান দিয়েছেন, কিন্তু সম্প্রদায়ভিত্তিক শিক্ষাগত যোগ্যতার ব্যাপারে তারা নীরব। দায়িত্বশীল পদের জন্য যোগ্য মুসলিম প্রার্থী হিন্দু প্রার্থীর তুলনায় ছিল নগণ্য। হিন্দু গ্র্যাজুয়েটদের অভিযোগ ছিল এই যে, তাদের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তাদের চেয়ে অল্প যোগ্যতা নিয়ে মুসলমানরা সরকারি চাকুরি পেয়ে যাচ্ছে, কিন্তু অধিকতর যোগ্যতা নিয়ে হিন্দুরা পিষ্ট হচ্ছে বেকারত্বের জাঁতাকলে। যোগ্যতাসম্পন্ন মুসলমানদের স্বল্পতার একটি নজির পাওয়া যায় নবাব সলিমুল্লাহর জমিদারির আমলাদের তালিকা থেকে। সলিমুল্লাহ ছিলেন মুসলিম জাতীয়তাবাদের বড় প্রবক্তা। কিন্তু তাঁরই জমিদারির আমলাদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান বৈষম্য ছিল আরো করুণ। ১৯০৭ সালে তাঁর জমিদারির দায়িত্বপূর্ণ পদে আসীন আমলার মোট সংখ্যা ছিল ৩৭১ এবং এদের মধ্যে মাত্র পঁয়তাল্লিশ জন আমলা ছিল মুসলমান।[২৫] দেখা যায় যে যোগ্য মুসলমান প্রার্থীর অভাবে এমনকি কলকাতা মাদ্রাসার ব্যবস্থাপনা (১৯১৭) পর্যন্ত হিন্দু কর্মচারীদের হাতে ন্যস্ত ছিল। এর অধ্যক্ষ ছিলেন একজন ইউরোপীয়।[২৬] ১৯০৫ সালে মোট ৩০২১ জন ছাত্র এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। এদের মধ্যে মাত্র ১৮৮ জন ছিল মুসলমান। শিক্ষাক্ষেত্রে এই বৈষম্য অবশ্যম্ভাবীভাবে প্রভাব ফেলে নিয়োগক্ষেত্রে। তবে বৃটিশের বদান্যতায় শিক্ষার নিরিখে মুসলমানদের যা প্রাপ্য ছিল, বাস্তবে এর চেয়ে অনেক বেশি তারা লাভ করে। অতএব এটা

২৫. Sirajul Islam (ed.), *Fazlul Huq Speaks in Council 1913-1916*, (Dhaka 1976), 9

২৬. Bengal Legislative Council Proceedings, 7 August 1917, Vol. XLIX, 516 reply to question asked by A. K. Fazlul Huq.

সন্দেহাতীত যে চাকুরিক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক বৈষম্যের মূল কারণ শিক্ষায় মুসলমানদের পশ্চাৎপদতা। সাম্প্রদায়িক বৈষম্য প্রমাণের জন্য চাকুরিতে নিয়োজিত লোকের সম্প্রদায়ভিত্তিক পরিসংখ্যান পরিবেশনের উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ রাজনৈতিক।

শিক্ষা ও নিয়োগে হিন্দু-মুসলমান বৈষম্যের কারণ যাই হোক না কেন, এটা মনে করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই যে এই বৈষম্য শুধু বৃটিশ আমলেই বিদ্যমান ছিল। আগেই বলা হয়েছে যে, নবাবি আমলেও হিন্দু জাতি ছিল শিক্ষাদীক্ষায় স্থানীয় মুসলমানদের চেয়ে অনেক অগ্রসর এবং তখনো রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধায় স্থানীয় মুসলমানদের হিস্যা ছিল অতিশয় নগণ্য। মুসলমানদের প্রাধান্য ছিল কৃষি, মজুরি, মাছ ধরা, তাঁত বোনা ও অন্যান্য শ্রমক্ষেত্রে। যা হোক, অভিজাত মুসলিম রাজনৈতিক জনগণকে তাদের ঐতিহাসিক অবস্থান সম্পর্কে সঠিক কোন ধারণা না দিয়ে 'শাসক জাতি' ভাবমূর্তিকে চাঙ্গা করে তোলার জন্য এ মর্মে তাদের সামনে একটি বিকৃত তত্ত্ব তুলে ধরা হয় যে তারা ছিল একদা শাসক শ্রেণীর সদস্য এবং তাদের বর্তমান অবনতির জন্য দায়ী হিন্দু আধিপত্য। বৃটিশ সরকার কর্তৃক এই তত্ত্বকে ফলাও করে প্রচারের উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু-মুসলমানে বিভেদ সৃষ্টি করা এবং সে সুযোগে ঔপনিবেশিক শাসনকে আপদমুক্ত রাখা। ঐতিহাসিকদের উচিত 'শাসক শ্রেণী'র তত্ত্বকে খুঁটিয়ে দেখা এবং চাকুরি সংক্রান্ত পরিসংখ্যানকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা। কারণ চাকুরি সংক্রান্ত পরিসংখ্যান জনমনে দারুণ রেখাপাত করেছিল এবং ঘটনাপ্রবাহে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছিল।

চাকুরিক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান আকাশ-পাতাল বৈষম্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে মুসলিম জাতীয়তাবাদী নেতৃবর্গ বিরাট বিরাট পরিসংখ্যান-সারণি তৈরি করে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করেন। ঐ সব সারণি সম্বলিত পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ করে জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করা হয়। ঐ সব সারণিতে সম্প্রদায়ভিত্তিক চাকুরির পরিসংখ্যান মেলে, কিন্তু বেকারত্বের পরিসংখ্যান মেলে না। শিক্ষিত বেকারের সংখ্যার তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যাবে, হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে বেকারত্বের সমস্যা ছিল অনেক বেশি প্রকট। কারণ হিন্দুদের মধ্যে শিক্ষার হার ছিল অনেক বেশি। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যদি শিক্ষার হার সমান থাকতো, আর চাকুরিবাজার যদি হিন্দুদের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণে থাকতো, তাহলে বৈষম্যমূলক নীতির তত্ত্ব দাঁড় করানো যেতো। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সরকারি চাকুরি পেতে পারে এমন শিক্ষিতের মধ্যে বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল হিন্দু। অতএব স্বাভাবিকভাবেই চাকুরিবাজারেও ছিল তাদের আনুপাতিক প্রাধান্য। বৈষম্য আলোচনায় শিক্ষাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফলক হিসেবে ব্যবহার করা উচিত। হিন্দু এবং মুসলমান সম্প্রদায় যদি সমহারে শিক্ষিত হয়, শুধু তখনই সম্প্রদায়ভিত্তিক চাকুরি-সারণি অর্থবহ হতে পারে, নচেৎ নয়। দুঃখের বিষয় হচ্ছে, বিশ শতকের প্রথম সিকি পর্যন্ত মুসলমান শিক্ষিত লোকের সংখ্যা ছিল মুষ্টিমেয় এবং তদনুপাতে চাকুরিপ্রাপ্ত মুসলমানের সংখ্যাও ছিল সীমিত। তবে এ কথা জোর দিয়ে বলা যায় যে শিক্ষিত মুসলমানরা শিক্ষিত হিন্দুর চেয়ে আনুপাতিক হারে বেশি সরকারি চাকুরি লাভ করেছে। সে দিক থেকে বলা যায় যে মুসলমানরা ছিল কিছুটা

সুবিধাভোগী। অনগ্রসর মুসলিম সমাজকে অগ্রসর হতে অধিকতর আগ্রহী করে তোলার লক্ষ্যে মুসলমানদেরকে সীমিত হারে হলেও অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। এই পদক্ষেপ অবশ্যই শিক্ষিত হিন্দুরা সহজে মেনে নিতে পারে নি। হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের অবনতিতে এই অগ্রাধিকার সমস্যাটি বেশ অবদান রেখেছে। বৃটিশরা মুসলমানদের চাকুরি দিতে চাচ্ছে আর শিক্ষিত হিন্দুরা তা মেনে নিচ্ছে না—এটা মুসলমানদের কাছে ছিল ভীষণ পীড়াদায়ক। মুসলমানদের মধ্যে ধারণা সৃষ্টি হয় যে হিন্দুরা মুসলমানদের উন্নয়ন চায় না। আসলে সমস্যাটি মুসলমান-হিন্দুর নয়, সমস্যাটি প্রতিযোগিতার। সমভিত্তিতে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ না হয়ে কেউ সুবিধা লাভ করলে বঞ্চিতেরা স্বাভাবিক কারণেই অসন্তোষ ব্যক্ত করে। অগ্রাধিকারটি নিম্নবর্ণের হিন্দুদের বেলায় প্রযোজ্য হলেও একই প্রতিক্রিয়া হতো, যা হয়েছে বিভাগোত্তর ভারতে।

## ছয়

স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানের ঐতিহাসিক উৎপত্তি সম্পর্কে পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের মধ্যে একটি বিতর্ক আছে। অনেক অত্যুৎসাহী জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিক মনে করেন যে পাকিস্তানের শেকড় অনেক গভীরে প্রোথিত। তাঁদের মতে, পাকিস্তানের উৎপত্তি সন্ধান করতে প্রাচীনতম ভূতাত্ত্বিক যুগে গমন না করলেও অন্তত সিন্ধু সভ্যতা অব্দি পেছনে যেতে হবে। তবে নমনীয় জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে, পাকিস্তানের উৎস হচ্ছে আট শতকে 'সিন্ধুতে' আরবদের উপস্থিতি। সিন্ধুবিজয়ের মাধ্যমে আরবরা এ দেশে এসে ইসলাম প্রবর্তন না করলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হতো না—এই তাঁদের যুক্তি। পাকিস্তান রাষ্ট্রের শেকড়ের গভীরতা সম্বন্ধে তাঁরা দ্বিমত পোষণ করলেও একটি ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি ছিল অবশ্যম্ভাবী। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং বৃটিশ রাজ যতোই ভুল-ভ্রান্তি বা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিক না কেন, পাকিস্তানের উদ্ভব ছিল অপ্রতিরোধ্য।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের অবশ্যম্ভাবিতা তত্ত্বের উল্টোপিঠে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের অভিমত হচ্ছে এই যে, পাকিস্তান সৃষ্টি ভারতীয় জাতীয়তাবাদের একটি বড় ধস এবং এই ধস ঠেকানো যেতো যদি রাজনীতিকগণ প্রজ্ঞার পরিচয় দিতেন। সব ঐতিহাসিক ঘটনারই বিভিন্ন দিক থাকে এবং নানা বিশ্লেষণের অবকাশ থাকে। কিন্তু ঘটনা একবার ঘটে গেলে তা আর পাল্টানো যায় না। অতীতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা যায়, কিন্তু তা পরিবর্তন করা যায় না। অতীতের ঘটনা সর্বাংশে সত্য। অতএব এটা না করে ওটা করলে এই ঘটনা ঘটতো না—এ ধরনের মনোভঙ্গি ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে নেতিবাচক।

হারুন-অর-রশিদ ১৯০৬ থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত মুসলিম অভিজাত ও উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজনীতির ধারা ও ক্রমবিকাশ অতিশয় দক্ষতার সাথে তুলে ধরেছেন।

তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে মুসলিম নেতৃত্ব বিভিন্ন সময় ও পরিস্থিতিতে বিভিন্নভাবে আচরণ করেছে এবং কিভাবে তারা হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়েছে। তিনি আরো দেখিয়েছেন কিভাবে বঙ্গীয় মুসলিম নেতৃত্ব অবাঙালি নেতৃত্বাধীনে চলে যায়। তিনি কংগ্রেস ও মুসলিম রাজনীতি বিশ্লেষণ করে এর দুর্বলতাসমূহ উন্মোচন করেছেন এবং ব্যর্থতার বর্ণনা দিয়েছেন।[২৭] হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক উন্নয়নে একের পর এক সুযোগ পণ্ড হয়ে যায়। লখনৌ চুক্তি (১৯১৬), খেলাফত-অসহযোগ আন্দোলন (১৯১৯-২২) এবং বেঙ্গল প্যাক্ট (১৯২৩)—সবই ছিল সম্পর্ক উন্নয়নের সুবর্ণ সুযোগ। রশিদ মনে করেন, এই ব্যর্থতা দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্ক আরো তিক্ত করে তোলে এবং এরই শেষ পরিণতি ১৯৩৭ সালের প্রজা-লীগ কোয়ালিশন, যার ঐতিহাসিক ফল ছিল সুদূরপ্রসারী।[২৮] এ. কে. ফজলুল হককে লীগের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে পাবলে ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব উত্থাপনের পরিস্থিতির হয়তো উদ্ভব হতো না। বজলুর রহমান খান ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত মুসলিম নেতৃত্বের কার্যকলাপ ব্যাখ্যা করে মন্তব্য করেন যে, তখন পর্যন্ত এরা ছিল রাজনৈতিকভাবে ভীষণ অসংগঠিত ও লক্ষ্যহীন। কাউন্সিল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য এরা দল তৈরি করতো। নির্বাচনের পর পরই ঐসব দল বিলুপ্ত হয়ে যেতো। খানের মতে, ঐসব দল গঠিত হতো শুধুই ক্ষমতা লাভের জন্য। যেভাবেই হোক ক্ষমতায় যাওয়া ছিল তখনকার রাজনীতির মুখ্য উদ্দেশ্য।[২৯] খান দেখিয়েছেন যে, ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত নেতারা শুধুই নিজের ও নিজ পরিবারের স্বার্থকে সমুন্নত রেখেছেন, জাতীয় স্বার্থকে নয়। সাইমন কমিশনও মুসলমান নেতৃত্ব সম্পর্কে অনুরূপ মন্তব্য করে।

বিভিন্ন সভা-সমিতি-সংগঠনের মাধ্যমে জাতীয় সচেতনতা পুষ্টি লাভ করছিল উনিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকেই। এই সকল সংগঠন ছিল বেশিরভাগই পেশাভিত্তিক এবং যেহেতু ঔপনিবেশিক শাসনের প্রথম পর্বে নবউত্থিত পেশাজীবীরা ছিল প্রায় সবাই হিন্দু, সেহেতু ঐসব সংগঠনও ছিল মূলত হিন্দুদের দ্বারা গঠিত। এ কথা ঠিক যে এই সব সংগঠনই ছিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের (১৮৮৫) শেকড়। অজস্র সভা-সমিতি-সংগঠনের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হচ্ছে *জমিদারি এসোসিয়েশন* (১৮৩৭), *বেঙ্গল বৃটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি* (১৮৪৩), *সোসাইটি ফর দি প্রমোশন অব ন্যাশনাল ফিলিং* (১৮৬৬), *হিন্দু মেলা* (১৮৭৫) এবং *ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন* (১৮৭৬)। হিন্দু সংগঠনের বিপরীতে মুসলমানরাও প্রতিষ্ঠা করেছে অনুরূপ সমিতি, যথা, *মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি অব ক্যালকাটা (১৮৬৩), ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন* (১৮৭৭) ও স্থানীয় পর্যায়ে অসংখ্য আঞ্জুমান। কিন্তু এসব সংগঠনের সম্মিলিত ধারা কংগ্রেসের মতো কোন কার্যকর রাজনৈতিক দল তৈরি করতে পারে নি। বলা যেতে পারে যে, এই সব

২৭. Harun-or-Rashid, *Foreshadowing of Bangladesh*, 1-30

২৮. ঐ, ৫১-৫৯।

২৯. Bazlur Rahman Khan, *Politics in Bengal 1927-1936*, (Dhaka 1987), 24

জাতীয় ও স্থানীয় মুসলিম সংগঠনেরই চূড়ান্ত ফল নিখিল ভারত মুসলিম লীগ (১৯০৬)। কিন্তু বস্তুত এসব সংগঠন ছিল কোন না কোন ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠা প্রতিষ্ঠান। আদর্শ ও নির্দিষ্ট কর্মসূচির অভাবে এগুলি ব্যক্তিকেন্দ্রিক অবস্থান অতিক্রম করে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের রূপ নিতে পারে নি। ফলে মুসলিম সংগঠনগুলি তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিন্দু নিয়ন্ত্রিত সংগঠনগুলির ন্যায় জাতীয় প্রতিনিধিত্বশীলতা অর্জন করতে সক্ষম হয় নি। সাংগঠনিকভাবে হিন্দু ও মুসলিম সংস্থাগুলির মধ্যে পার্থক্য এই যে, হিন্দু সংগঠনগুলির নেতৃত্বে ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণী আর মুসলিম সংগঠনের পুরোভাগে ছিল অভিজাত শ্রেণী। দল হিসেবে মুসলিম লীগ কিছুটা প্রতিনিধিত্বশীল হলেও প্রথম থেকেই এর মধ্যে দেখা দেয় চরম কোন্দল ও পারস্পরিক প্রতিযোগিতা। ফলে কংগ্রেসের মতো লীগও রাজনীতিতে কোন কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে নি। বাংলায় মুসলিম লীগ শক্তি অর্জন করতে থাকে ১৯৩৭ সালের নির্বাচন থেকে। মুসলিম সম্প্রদায়ের দলীয় রাজনীতিতে যে আনাড়িপনা লক্ষ্য করা যায়, কৃষক প্রজা পার্টির ব্যাপারেও তাই লক্ষ্য করি। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আগমন ঘটেছিল এই দলে। কিন্তু ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে যে আংশিক সাফল্য অর্জন করা গিয়েছিল তা অচিরেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এ. কে. ফজলুল হক কৃষক প্রজা পার্টির একাংশ নিয়ে যোগদান করেন মুসলিম লীগে এবং অপর অংশ নেতৃত্ব-সঙ্কটে পড়ে ক্রমশ নামমাত্র দলে পরিণত হয়।

সাংগঠনিকভাবে মুসলিম লীগ ১৯৩৭-এর পূর্ব পর্যন্ত কখনো কোন শক্তি অর্জন করতে পারে নি, আর কৃষক প্রজা পার্টির সাংগঠনিক কাঠামোও ছিল অতিশয় দুর্বল এবং ব্যক্তিনির্ভর, যেজন্য ব্যক্তির বিদায়ে দলও বিলুপ্ত হয়ে গেল। প্রশ্ন জাগে, বঙ্গীয় মুসলিম নেতৃত্বের সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণ কি? এ প্রশ্নের ত্বরিৎ উত্তর হচ্ছে, পেশাদার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ক্ষুদ্রত্ব। অভিজাত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজনীতির সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য ভিন্নতর। মুসলিম নেতৃত্বে অভিজাত শ্রেণীর আধিপত্য প্রবল থাকায় ব্যক্তিত্ব ও পরিবারকে অতিক্রম করে দলের সাংগঠনিক ভিত মজবুত করা যায় নি, যেমনটি সম্ভব হয়েছিল কংগ্রেসের বেলায়। বঙ্গীয় মুসলিম সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আয়তন ক্ষুদ্র থাকায় সনাতন আশরাফ-আতরাফ বিভক্তি থেকে রাজনীতি মুক্ত হতে পারে নি। সংখ্যালঘিষ্ঠ আশরাফ শ্রেণী সংখ্যাগরিষ্ঠ আতরাফ শ্রেণীর স্বার্থের কথা প্রচার পর্যন্তই সীমিত রাখে, কার্যত আশরাফ শ্রেণী কখনো গণপ্রতিনিধিত্বশীল সরকারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য তৎপর ছিল না। প্রতিনিধিত্বশীল সরকার মানে সাধারণ নেতৃত্বের কাছে অবধারিত ক্ষমতা হস্তান্তর এবং জনগণকে ক্ষমতার উৎস করা। এর কোনটাই অভিজাত নেতৃত্বের কাছে অভিপ্রেত ছিল না। অভিজাত শ্রেণীর কাছে এটা পরিষ্কার ছিল যে, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকাঠামোয় তাদের যে সুবিধাজনক অবস্থান তা তিরোহিত হবে যদি ক্ষমতার উৎসস্থল বৃটিশ রাজ থেকে জনগণের কাছে স্থানান্তরিত হয়। বৃটিশ রাজের ব্যবস্থায় তারা সরকারের নমিনেশনে আইনসভা ও অন্যান্য সংস্থায় ক্ষমতা লাভ করেন। অতএব তাদের স্বার্থ নিহিত ছিল ঔপনিবেশিক নমিনেশনব্যবস্থায়, নির্বাচনব্যবস্থায় নয়, আন্দোলনের রাজনীতিতেও নয়। সুযোগ-সুবিধা লাভের সন্ধানে মুসলিম অভিজাত শ্রেণীর আনুগত্যের রাজনীতি উনিশ

শতকের অনুগত হিন্দু ভদ্রলোক শ্রেণীর রাজনীতির সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশের ফলে ঐ ভদ্রলোক রাজনীতি কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে বিশ শতকে। কিন্তু মুসলিম রাজনীতির বেলায় তেমনটি ঘটে নি। মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আয়তন ছিল অনেকটা অভিজাত শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতার উপর নির্ভরশীল।

মুসলমানদের মধ্যে আন্দোলনের রাজনীতির সূত্রপাত হয় ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে এবং এর ক্ষেত্র মূলত পূর্ববঙ্গ। পূর্ববঙ্গীয় মুসলমানরা অনুভব করে যে বঙ্গবিভাগের মাধ্যমে পূর্ব বাংলা কলকাতার সর্বগ্রাসী প্রভাব থেকে মুক্ত হলে নানাভাবে তাদের কল্যাণ সাধিত হবে। এই অনুভূতি আরো ঘনীভূত হয় বিভাগোত্তর স্বদেশী আন্দোলনের বাড়াবাড়ির ফলে। বঙ্গবিভাগের পক্ষে আন্দোলন শুরু করে স্যার সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে পূর্ব বাংলার মুসলমানরা। আন্দোলনের রাজনীতিতে এটাই ছিল তাদের প্রথম অভিজ্ঞতা। পূর্ববঙ্গীয় মুসলমানদের এই আন্দোলন ছিল কংগ্রেস তথা হিন্দুদের বিরুদ্ধে। তবে এ থেকে এরা যে অভিজ্ঞতা লাভ করে তা অভিজাত রাজনীতির আনুগত্যের ধারাকে বেশ দুর্বল করে দেয়। অধিকার আদায়ের জন্য মুসলমানরা হিন্দু, সরকার, এমনকি বৃটিশের অনুগত মুসলিম অভিজাতদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার কৌশল আয়ত্ত করে নেয়। কৃষক প্রজা পার্টির দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন ঐ কৌশল প্রয়োগেই সম্ভব হয়েছিল। হিন্দু ভদ্রলোক এবং মুসলিম অভিজাত শ্রেণীর আনুগত্যের রাজনীতিতে যে ক্রমশই উগ্রপন্থীদের আক্রমণের উপক্রম হচ্ছে তা অনুধাবন করেই তারা হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের শ্লোগান তোলে। লখনৌ চুক্তি (১৯১৬), অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলন, বেঙ্গল প্যাক্ট প্রভৃতি ছিল ঐক্যপন্থীদের আপ্রাণ প্রয়াস। কিন্তু এগুলি ছিল নেহাতই ক্ষমতা ভাগাভাগির রাজনীতি—রাজনৈতিক এলিটদের মধ্যে ক্ষমতা ভাগাভাগি। এই সব চুক্তি উভয় সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং স্বার্থকে সমুন্নত রাখার উদ্দেশ্যে করা হয় নি, যেজন্য এই সব চুক্তি উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য স্থাপনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়।[৩০]

বঙ্গীয় রাজনীতির নেতৃত্বে লক্ষণীয় পরিবর্তন শুরু হয় ১৯২০-এর দশক থেকে। ১৯৩০-এর দশকে সব দলেই নেতৃত্বের গঠনে গুণগত পরিবর্তন আসে। সব দলেই মধ্যবিত্ত নেতৃত্বের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা এখন কোন একক ব্যক্তিত্বের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না, তা এখন বৃহত্তর গ্রুপের উপর ন্যস্ত। আরেকটি গুণগত পরিবর্তন হচ্ছে সংগঠনের জেলা ইউনিট নেতাদের প্রভাব বৃদ্ধি। পূর্বে জেলাভিত্তিক নেতাগণ অপেক্ষায় থাকতেন কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের জন্য, কিন্তু এখন জেলা-প্রতিনিধি হিসেবে কেন্দ্রীয় সম্মেলনে তারা তাদের অভিমত বিবেচনার জন্য কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের উপর প্রয়োজনীয় চাপ সৃষ্টি করেন।[৩১] জেলাভিত্তিক নেতাদের দুই গ্রুপে ভাগ করা যায়। একটি গ্রুপ প্রতিনিধিত্ব করে ভূস্বামী শ্রেণী ও অন্যান্য পেশাজীবীদের স্বার্থের, আর অন্যটি প্রতিনিধিত্ব করে সাধারণ কৃষক, প্রজা, কারিগর ও মজুর শ্রেণীর স্বার্থের।

৩০. Enayetur Rahim, *Provincial Autonomy in Bengal*, (Rajshahi 1981), 34

৩১. ঐ, ৫৩।

ভূস্বামী ও অন্যান্য পেশাদার শ্রেণীর অধিকাংশ ছিল হিন্দু, আর কৃষক-প্রজার অধিকাংশ ছিল মুসলমান। অতএব বিপরীতমুখী স্বার্থগোষ্ঠী হিসেবে উক্ত দুই গ্রুপের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল অবশ্যম্ভাবী। সাম্প্রদায়িকভাবে অভিন্ন হলেও এই দ্বন্দ্ব এড়ানো হয়তো সম্ভব ছিল না। আমরা দেখতে পাই, বিভিন্ন গ্রুপের নেতাগণ তাদের নিজস্ব স্বার্থগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করছেন অন্ধভাবে। ভূস্বামীদের স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করছেন ভূস্বামীদের প্রতিনিধিগণ, আর কৃষক-প্রজার কথা বলছেন তাদের প্রতিনিধিগণ। দুই গ্রুপের নেতৃবর্গ মূলত দুই সম্প্রদায়ের বিধায় শ্রেণীস্বার্থজনিত দ্বন্দ্ব আরো তীব্রতর হয়ে উঠে এবং ক্রমশ তা উগ্র সাম্প্রদায়িকতায় রূপ নেয়। এই সাম্প্রদায়িকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে বিভিন্ন আইন প্রণয়নকালে। যেমন, বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব (সংশোধন) আইন (১৯২৮) এবং প্রাইমারি এডুকেশন বিল ১৯৩০—এ দুটি বিল কাউন্সিলে আলোচনা এবং এর উপর ভোটাভুটির সময় দেখা যায়, দলবল নির্বিশেষে সকল মুসলমান সদস্যগণ বিল দুটির পক্ষে রায় দেন এবং এর বিপক্ষে ভোট দেন হিন্দু সদস্যগণ। ১৯৩২ সালের কমিউনাল এওয়ার্ড সকল মুসলিম সদস্যের সমর্থন লাভ করে আর এর চরম বিরোধিতা করে হিন্দু সদস্যগণ। এমনিভাবে ১৯৩৫ সালের ঋণসালিশী বোর্ড বিলের পক্ষে ভোট দেন মুসলিম সদস্যগণ এবং বিপক্ষে ভোট দেন হিন্দু সদস্যগণ। ভোট প্রদানে এই প্রবণতার ব্যতিক্রম থাকলেও এ কথা জোর দিয়ে বলা যায় যে, নেতৃবর্গের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা দেখা দেয় অতি নগ্নভাবে। সব সমস্যাকে নেতাগণ সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে শুরু করেন। ১৯২৮ সাল পর্যন্ত অনেক বঙ্গীয় মুসলমান কংগ্রেস রাজনীতিতে যুক্ত থাকলেও ১৯৩৭ সাল নাগাদ মুসলমানদের কংগ্রেসভুক্ত থাকা প্রায় বিরল হয়ে উঠে। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত সিটের সংখ্যা ছিল ১১৯। যেকোন দলের মুসলমান সদস্য সংরক্ষিত সিটের জন্য প্রতিযোগিতা করতে পারতো। কিন্তু দেখা যায়, ১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে সংরক্ষিত সিটে প্রতিযোগিতা করার জন্য মাত্র একজন মুসলমান প্রার্থী কংগ্রেসের টিকেট প্রার্থনা করেন। এ সময়ে সাম্প্রদায়িকতার একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় যে, বিভিন্ন দলের প্রথম সারির নেতাদের চেয়ে দ্বিতীয় সারির নেতারা অনেক বেশি সাম্প্রদায়িক, অনেক বেশি উগ্র। জাতীয় নেতাগণ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা উচ্চারণ করলেও আঞ্চলিক নেতারা ছিলেন আপোসহীনভাবে সাম্প্রদায়িক। দলীয় নীতি নির্ধারণে জেলাভিত্তিক নেতাদের প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে বৃদ্ধি পায় সাম্প্রদায়িকতা। ১৯৪০ সালের মধ্যে হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায় ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণে এসে উপনীত হয়। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির যুগ পেরিয়ে সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব ও দাঙ্গার যুগে প্রবেশ করে বাংলার রাজনীতি।[৩২] ১৯৩৫ সালের শাসনতন্ত্রসৃষ্ট রাজনৈতিক ধারা অব্যাহত থাকলে '৪০-এর দশককে হয়তো বলা যেতো গণপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকার বিকাশের যুগ। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তা ঘটেনি। ঘটেছে অন্তঃ ও আন্তঃদলীয় সংঘাত, সংঘর্ষ, ক্ষমতার লড়াই, দুর্ভিক্ষ, দুর্নীতি, দাঙ্গা এবং পরিশেষে দেশবিভাগ।

৩২. Harun-or-Rashid, *Foreshadowing of Bangladesh*, 43

১৯০৫ সালের বঙ্গবিভাগকে হিন্দু নেতৃত্ব 'বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদ' বলে ঘোষণা করেছিল এবং লাগাতার আন্দোলনের মাধ্যমে সে অবাঞ্ছিত বিভাগ রদ করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু ঐ হিন্দু নেতৃত্বই আবার ১৯৪৭ সালে বঙ্গবিভাগ দাবি করলো এবং সে দাবি মোতাবেক বাংলা ভাগ হলো। বঙ্গীয় রাজনীতির এই ঐতিহাসিক পরিবর্তন নিগূঢ় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের দাবি রাখে। বাঙালির মধ্যে বাংলাকে ভাগাভাগি করা কি রোধ করা যেতো না? হাজার বছর ধরে গড়ে উঠা এই বাংলাকে দুই টুকরো করে দু'টি আলাদা রাষ্ট্রের অঙ্গীভূত না করে একে একটি অখণ্ড স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা করা কি সম্ভব ছিল না? দেশবিভাগের বিকল্প হিসেবে একটি ফেডারেল বা কনফেডারেল ভারত রাষ্ট্র গঠন করা কি সম্ভব ছিল না? এই সব সৌখিন প্রশ্ন করা হয় আসলে ১৯৪০-এর দশকের ঘটনাপ্রবাহকে সামনে রেখে। সময়ের দিক দিয়ে আরেকটু এগিয়ে গিয়ে একই প্রশ্ন তোলা যায় ১৯৩০-এর দশকের রাজনীতি নিয়ে। ১৯৩৫ সনের শাসনতন্ত্রের শুধু প্রাদেশিক শাসন সংক্রান্ত অংশ কার্যকর করা হয়। কংগ্রেসের বিরোধিতার দরুন ফেডারেল অংশ অকার্যকর থাকে। মুসলিম লীগ ফেডারেল অংশকে সমর্থন দিয়েছিল। উক্ত শাসনতন্ত্রের ফেডারেল কাঠামো কার্যকর করে দায়িত্বশীল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা গঠন করা সম্ভব হলে ১৯৪০ সালে হয়তো লাহোর প্রস্তাব উত্থাপনের প্রয়োজন পড়তো না।

ফেডারেল সরকার গঠনে ব্যর্থতার জন্য কংগ্রেস সর্বাংশে দায়ী। কংগ্রেসের ভুল থেকেই জন্ম নিল ১৯৪০-এর পাকিস্তান প্রস্তাব। কংগ্রেসের অবিমৃষ্যকারিতার পুনরাবৃত্তি হলো ১৯৪৬ সনের কেবিনেট মিশন পরিকল্পনা পরিত্যাগের মাধ্যমে। কেবিনেট মিশন পরিকল্পনার ব্যর্থতা জিন্নাহর পাকিস্তান পরিকল্পনার সাফল্যের কারণ হলো। মুসলিম লীগের ন্যায় কংগ্রেসও যদি উক্ত পরিকল্পনা মেনে নিত, তাহলে আদৌ পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হতো কিনা তাতে সন্দেহের অবকাশ আছে। কংগ্রেসের ভুলের মাশুলই পাকিস্তান। কংগ্রেসের ভুলকে ব্যঙ্গ করে জিন্নাহ বলেন, "পাকিস্তান আমি এনেছি একজন ব্যক্তিগত সচিব ও একটি টাইপরাইটারের সাহায্যে।" এই উক্তি উদ্ধত তবে সঙ্গত। তাঁর Direct Action নীতির ফলে যে রক্ত ঝরেছে তা টাইপরাইটারের কালির সঙ্গে তুলনীয় নয়। জিন্নাহর দম্ভোক্তি নেপোলীয়নের সেই আত্মপ্রসাদকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনি প্যারিসের রাস্তায় ফ্রান্সের রাজমুকুট ধূলিধুসরিত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন এবং তরবারীর আগা দিয়ে কুড়িয়ে নেন। জিন্নাহর পাকিস্তান এমন কুড়িয়ে পাওয়া কিছু নয়। তবে একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে কংগ্রেসের প্রত্যেকটি ভুল পদক্ষেপের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন জিন্নাহ। জিন্নাহর প্রজ্ঞা ও প্রতিজ্ঞার কাছে কংগ্রেসের ঔদ্ধত্য হার মেনেছিল।

কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মর্মান্তিক সংঘাতের পরিণতি হিসেবে বাংলা ও পাঞ্জাব দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। সাম্রাজ্যের বড়লাট তাতে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করেন। বাংলার জনগণ তাদের জন্মভূমির এই বিভাজন চায় নি, এ ধরনের বিভাজনের জন্য তারা প্রস্তুতও ছিল না। এই বিভাজনকে তাদের উপর বাইরে থেকে চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। এক

কথায়, পাকিস্তানকেও জোর করেই তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। কেননা, বাঙালি মুসলমানরা মূল লাহোর প্রস্তাবের ধারণার ভিত্তিতে পাকিস্তান চেয়েছিল। কিন্তু জিন্নাহর মস্তিষ্কপ্রসূত একক ট্রানকেটেড পাকিস্তান তারা চায়নি, যা জিন্নাহ তাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছিলেন একেবারে শেষ মুহূর্তে।

কাজেই বাঙালিদের জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থেকে যায় এবং লাহোর প্রস্তাবভিত্তিক পাকিস্তান থেকে স্বতন্ত্র এক পাকিস্তানে তাদের রাজনৈতিক ভূমিকার ব্যাপারে তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। তাদের প্রত্যাশিত পাকিস্তান ছিল এমন একটি রাষ্ট্র, যার অন্তর্ভুক্ত অংশগুলো থাকবে পরস্পর স্বাধীন এবং এদের আঞ্চলিক অখণ্ডতা থাকবে অটুট। বিভাগপূর্ব বাংলার শিল্পোন্নত এলাকা হাতছাড়া হওয়ায় এবং পূর্ববঙ্গের স্বায়ত্তশাসন থেকে বঞ্চিত হওয়ায় পূর্ব বাংলার জনগণ ও তাদের নেতৃত্বের ব্যাপক হতাশা সত্ত্বেও তারা পাকিস্তানের কল্যাণে আন্তরিকভাবে নিবেদিত হয়েছিল। দুস্তর প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার অভিজ্ঞতা বাংলার মানুষের রয়েছে, ইতিহাসে তার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। একইভাবে ' ট্রানকেটেড একক পাকিস্তানের' প্রতিকূলতাকে মেনে নিয়ে পূর্ববঙ্গের মানুষ নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাদের সেই প্রয়াস পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে একই প্রেরণা জাগিয়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছিল।

পাকিস্তানের দুই অংশের অংশীদারিত্বের ব্যাপারটি প্রথম থেকেই অসামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের সংগঠনকাঠামো ও-প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি নির্মাণ করতে গিয়ে গণতান্ত্রিক নীতিমালাকে খাটো করা হয় এবং শীর্ষ নেতারা বিভিন্ন পর্যায়ে পারস্পরিক মতবিনিময় ও আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে নীতি নির্ধারণ না করে সরকারি আদেশ জারি করে দেশ শাসন করতে থাকেন। ফলে তাঁদের নির্দেশাবলীর অধিকাংশেই দূরদৃষ্টি ও বাস্তববুদ্ধির অভাব পরিলক্ষিত হয় এবং এজন্য তারা ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের প্রতিরোধের সম্মুখীন হন। পাকিস্তানের সূচনায় সরকারি আদেশের বিরুদ্ধে সংগঠিত ভাষা আন্দোলন ছিল এ ধরনের প্রতিরোধের একটি নজির। সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা বাংলার পরিবর্তে উত্তর ভারতের ভাষা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করাটা কি যুক্তিসঙ্গত, সুবিবেচনাপ্রসূত বা বাস্তবসম্মত ছিল ? উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণের বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে উঠে তার ফলাফল হয় সুদূরপ্রসারী। রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা বণ্টনের ক্ষেত্রে অবিরত বৈষম্য এবং রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে তার ফলাফল পূর্ব পাকিস্তানের সচেতন নাগরিকদের মনে গভীর হতাশা ও অসন্তোষের জন্ম দেয়। শেষ পর্যন্ত আন্তঃপ্রদেশ বৈষম্য দূরীকরণের প্রশ্নে পশ্চিম পাকিস্তানীদের সমর্থন লাভের প্রয়াস বিফলে যাবে বলে স্থিরনিশ্চিত হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ পাকিস্তান কনসেপ্ট-এর সামগ্রিক বাস্তবায়নযোগ্যতায় বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। পাকিস্তানের স্বপ্ন যদি আদৌ থেকেও থাকে, তা সম্পূর্ণভাবে পাঞ্জাবের রাজনৈতিক ও সামরিক কায়েমি স্বার্থের কুক্ষিগত হয়েছিল। এত দ্রুত ও অযৌক্তিকভাবে পূর্ব পাকিস্তান ও

পশ্চিম পাকিস্তানের সম্পর্কের অবনতি ঘটে যে, এ বিষয়ে লন্ডন টাইমস-এর ভবিষ্যদ্বাণী অচিরেই সত্য প্রমাণিত হয়। লন্ডন টাইমস ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, যেদিন পাকিস্তানের জন্ম হবে, তার পরের দিনই তার মৃত্যু অবধারিত। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তখন অর্থ ও সমরাস্ত্র দিয়ে পাকিস্তানকে সমর্থন দান করতে এগিয়ে আসে। এ পরিপ্রেক্ষিতে জেনারেল আইয়ুব খানের নেতৃত্বে শুরু হয় সামরিক শাসন (১৯৫৮)।

আইয়ুব আমলের অবাস্তব কল্পনাময়, পরিবর্তনশীল ও এক ব্যক্তির আদেশনির্ভর একটি দশক পাকিস্তানের সমাজ ও অর্থনীতিতে নতুন মাত্রা যুক্ত করেছিল। এ আমল দ্রুত পুঁজিসঞ্চয়, উচ্চ সামাজিক সচলতা ও পার্থক্যকরণ, রাজনৈতিক অবদমন, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্য এবং রাজনৈতিক দলগুলোর সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক প্রদেশমুখী মেরুকরণ দ্বারা বিশেষভাবে চিহ্নিত। যে পাকিস্তান মুসলিম লীগ ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা এবং যা ১৯৫০-এর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিম অংশের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করেছিল, তা পূর্ব পাকিস্তানে কার্যত বিলুপ্ত হয়ে যায়। এছাড়া অন্য যেসব রাজনৈতিক দল তখনো তাদের ওয়ার্কিং কমিটির মাধ্যমে সমগ্র পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করে যাচ্ছিল, তারাও অন্য প্রদেশে অর্থবহ কর্মতৎপরতা বন্ধ রেখে অবিমিশ্র প্রাদেশিক প্লাটফর্মে পরিণত হয়। এভাবে নিজ প্রদেশের বিষয়ে জনমত গড়ে তোলার জন্য রাজনৈতিক দল ছিল, কিন্ত সামগ্রিকভাবে পাকিস্তানের স্বার্থে কথা বলার জন্য কেউ ছিল না, সাংগঠনিকভাবে কথা বলার জন্য কোনো কেন্দ্রীয় নেতাও ছিল না। ষাটের দশকের গোড়ার দিকে পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য শুধু মার্কিন সেনাবাহিনী ও আমলাতন্ত্রই অবশিষ্ট ছিল।

এমন পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের সামরিক শাসকচক্র পাকিস্তানী চেতনাকে পুনরুজ্জীবিত করার আশায় শেষ উপায় হিসেবে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু এই যুদ্ধ (১৯৬৫) থেকে কাঙ্ক্ষিত সুফল পাওয়া গেল না। বরং এর পরিবর্তে এই ক্ষতিকর যুদ্ধ রাষ্ট্রকে সমস্যার গোলকধাঁধায় নিমজ্জিত করে, যা থেকে বেরিয়ে আসার ব্যর্থ চেষ্টা করেন 'শক্তমানব' আইয়ুব খান। এই যুদ্ধ এযাবৎ অজ্ঞাত সেই সত্যটির প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করে যে, পাকিস্তানের তথাকথিত অপরাজেয় প্রতিরক্ষাব্যবস্থায় পূর্ব পাকিস্তান অত্যন্ত প্রান্তিক ও নাজুক অবস্থানে ছিল। এই সত্য উদঘাটন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে বিশেষভাবে মর্মাহত করে, কারণ তাদের প্রদত্ত কর থেকেই পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা বাবদ খরচের বৃহত্তর অংশ আসতো।

আত্মমর্যাদাসম্পন্ন কোনো জনগোষ্ঠীই প্রতিরক্ষাহীন অবস্থায় বাস করতে পারে না। পূর্ব পাকিস্তান ইতিমধ্যেই ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক বৈষম্য ও রাজনৈতিক অবদমনের কারণে অত্যন্ত অসুখী ছিল এবং এর সাথে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটার মতো যুক্ত হয় প্রতিরক্ষাহীনতার বিষয়টি। এর ফলে গণআন্দোলন শুরু হয় এবং সকল শ্রেণীর জনগণ তথা রাজনীতিক, পেশাজীবী, ছাত্র, কৃষক ও শ্রমিকগণ সমভাবে এতে অংশগ্রহণ করে।

উদ্ভূত সংকট উত্তরণের জন্য এবং রাষ্ট্রকে অংশীদারিত্বের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ তথা পূর্ব পাকিস্তানী নেতৃত্ব একটি ফর্মুলা নিয়ে এগিয়ে আসে। এটি ছিল ছয় দফা সম্বলিত স্বায়ত্তশাসন ফর্মুলা। এই ফর্মুলার স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমান একে যথাযথভাবেই বাঙালিদের মুক্তিসনদ বলে অভিহিত করেছিলেন। কিন্তু উচ্চাভিলাষী সেনাবাহিনী ও আমলাতন্ত্রের উপর নির্ভরশীল পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃত্ব স্বায়ত্তশাসনের ধারণাকে তথা সুবিচার, স্বাধীনতা ও স্বনির্ভরতার ভিত্তিতে নবায়িত অংশীদারিত্বের উপর পাকিস্তানের রাজনৈতিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠার ধারণাকে মেনে নিতে অস্বীকার করলো। তদুপরি কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনমত মুজিবের স্বায়ত্তশাসন তত্ত্বকে পূর্ব পাকিস্তানের চূড়ান্ত বিচ্ছিন্নতার পদক্ষেপ বলে গণ্য করলো। সুতরাং স্বায়ত্তশাসনের দাবি খারিজ করা এবং এ দাবি নিয়ে আন্দোলনকারী নেতাদের কারারুদ্ধ করে তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্রের অভিযোগে হয়রানিমূলক বিচারের ব্যবস্থা করা তাদের নৈতিক দায়িত্ব বলে তারা মনে করলো। সারা বিশ্ব জুড়ে ভিন্ন মতাবলম্বী নেতারা সম্ভবত একঘেয়ে শান্তির পরিবেশের চেয়ে দমনমূলক পরিবেশে অধিকতর ভালো কর্মতৎপরতা দেখাতে পারেন। যুগমানব হিসেবে আবির্ভূত শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিচরিত্রে একজন ফজলুল হকের মানসিক ক্ষিপ্রতা ও রসবোধ, একজন ভাসানীর বর্ণাঢ্যতা ও রোমাঞ্চ এবং একজন সোহরাওয়ার্দীর জ্ঞান ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা না থাকতে পারে, কিন্তু এমন কিছু গুণ তাঁর মধ্যে ছিল যা তাঁকে অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী করেছিল। বাংলার জনগণ তাঁকে অত্যন্ত স্বদেশভক্ত ও সম্মোহনী শক্তিসম্পন্ন একজন নেতা বলে গ্রহণ করে। কারণ তাঁর মধ্যে তারা খুঁজে পেয়েছিল এমন একজন বিরল ধরনের নেতাকে, যিনি ছিলেন সাহসী, বিচক্ষণ, আত্মপ্রত্যয়ী, আপোসহীন, অনমনীয়, প্রচলিত ব্যবস্থার বিরোধী, দরদি ও অবিচল। আইয়ুব এবং আইয়ুবপরবর্তী আমলের দমনমূলক রাজনীতিতে জাতির ত্রাণকর্তা হিসেবে তিনি আবির্ভূত হন। তাঁর কণ্ঠস্বর তথা আওয়ামী লীগের কণ্ঠস্বর অচিরেই সমগ্র জাতির কণ্ঠস্বরে পরিণত হয়। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে কারাগার থেকে মুক্তিলাভের পর তিনি কেবল আওয়ামী লীগ নয়, সমগ্র জাতির অবিসম্বাদিত নেতায় পরিণত হন। এক স্বতঃস্ফূর্ত গণঅভিষেক অনুষ্ঠানে মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি প্রদান করা হয়। এটি ছিল নেতার প্রতি তাঁর প্রাপ্য সম্মান প্রদর্শন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাঁর ছয় দফার প্রতি জনগণের সমর্থন চাইলেন এবং জনগণ নির্দ্বিধায় এ সমর্থন প্রদান করে। নির্বাচনে মাত্র দুটি আসন ছাড়া সব ক'টি আসনে তাঁর মনোনীত প্রার্থীরা জয়লাভ করেন। কিন্তু তাঁর স্বায়ত্তশাসন পরিকল্পনা সম্পর্কে কেন্দ্রের ঘোরতর আপত্তি ছিল। যখন কেন্দ্র ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে নানা টালবাহানা শুরু করে, তখন শেখ মুজিব এ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং তা প্রকাশ্যে ঘোষণা করার জন্য ৭ মার্চ ১৯৭১ রমনা রেসকোর্সে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) আয়োজিত জনসভায় জাতির উদ্দেশে ভাষণ দানের সংকল্প গ্রহণ করেন। এই ভাষণে সংখ্যাগুরু দল আওয়ামী লীগের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর ঠেকিয়ে রাখার জন্য কেন্দ্রের নানা কৌশল ও ছলনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে এবং পাকিস্তানে শাসনক্ষমতার অংশীদার হয়ে থাকা আর সম্ভব নয় বলে তাঁর স্থিরপ্রতীতির কথা জানিয়ে

তিনি জাতির উদ্দেশে বজ্রগম্ভীর আহ্বান জানান প্রত্যেক গ্রাম এবং প্রত্যেক গৃহ থেকে পাকিস্তানী শাসকচক্রকে প্রতিরোধ করার জন্য এবং হাতের কাছে যে অস্ত্র আছে তা নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য। তিনি এই বলে তাঁর ভাষণ শেষ করেন : "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।" এতে কি কোন সন্দেহের অবকাশ আছে যে, শেখ মুজিবের ঘোষণা স্বাধীনতার ঘোষণা ছিল না ? তাঁর ঘোষণার মধ্যে শব্দগত বা ভাবগত কোন অস্পষ্টতা নেই। মূলত এই ভাষণে ছিল গুরুতর এক প্রতীকী ব্যঞ্জনা, যেমনটি ছিল বোস্টন টি-পার্টির ভাষণ, যা আমেরিকান বিপ্লবের ডাক দিয়েছিল; কিংবা টেনিসকোর্ট শপথ অনুষ্ঠানের ভাষণ, যা থেকে ঘোষিত হয়েছিল ফরাসীবিপ্লবের অগ্নিশপথ।

এখানে বিদগ্ধ পাঠক কিছু প্রশ্ন তুলতে পারেন, যার জবাব এখনো আমাদের জানা নেই। পাকিস্তানের কনসেপ্ট প্রত্যাখ্যান করে এবং সার্বিক প্রতিরোধ অন্দোলনের ডাক দিয়ে (এজন্য জাতি যতো অপ্রস্তুতই থাকুক) শেখ মুজিব অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেছিলেন। এটা কি ইতিমধ্যে তাঁর ঘোষিত স্বাধীনতা সরকার কর্তৃক মেনে নেয়ার লক্ষ্যে পরিচালিত হয়েছিল নাকি তা আসন্ন আলোচনা বৈঠকে সফলভাবে তাঁর ছয় দফাভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন প্রস্তাব উত্থাপনে নিজেকে সক্ষম করার জন্য তাঁর রাজনৈতিক শক্তি আরো বৃদ্ধি করার কৌশল ছিল ? যদি স্বাধীনতার লক্ষ্যে এ আন্দোলন পরিচালিত হয়ে থাকে, তা হলে এটা কি পরবর্তী আলোচনার বিষয় ছিল ? আর যদি তা না হয়ে থাকে, তা হলে কি আমাদের বিশ্বাস করতে হবে যে ৭ মার্চের ঘোষণা ছিল একটি কাব্যিক উক্তি মাত্র ?

তবে তাঁর ঘোষণা কাব্যিক উক্তি হোক বা না হোক, জনগণ বিশ্বাস করেছিল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যা বলেছিলেন এবং 'জয়বাংলা' ধ্বনি দিয়ে রাজপথে যে আন্দোলন রচনা করেছিলেন এবং আলাপ-আলোচনার দ্বারা মীমাংসা করা যায় না এমন যে বিষয়টি নিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য বাংলার নেতৃত্বকে বাধ্য করেছিলেন, তা হচ্ছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা। নেতা জনমত সৃষ্টি করেন এবং জনমত সৃষ্টি করে ইতিহাস। শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে যে জনমত তৈরি হয়েছিল তাকে বুলেট দিয়ে স্তব্ধ করা যেতো না, এমনকি স্বয়ং বঙ্গবন্ধুর দৈহিক অনুপস্থিতি দ্বারাও তাকে স্তব্ধ করা যেতো না। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের শেষ রাতে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর কঠোর আঘাতের জবাবে বাংলার সামরিক ও বেসামরিক জনগণ পরের দিন ২৬ মার্চ স্বাধীনতাযুদ্ধ শুরু করে। যুদ্ধ পরিচালনার দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় এই যে প্রকৃত স্বাধীনতাযুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন একজন সামরিক নেতা, পরবর্তীকালে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মেজর জিয়াউর রহমান।



# সুবা বাংলা : সরকার ও রাজনীতি

আবদুল করিম*

সম্রাট আকবর কর্তৃক বাংলার একাংশ বিজয়ের পর সুবা বাংলা মুগল সাম্রাজ্যবাদী শাসনব্যবস্থায় একটি প্রশাসনিক একক হিসেবে গড়ে ওঠে এবং আঠারো শতকের শেষ নাগাদ পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে। এই সময়কালে সুবা বাংলার ভৌগোলিক অবস্থান ও অভ্যন্তরীণ প্রশাসন এবং কেন্দ্রের সাথে এর সম্পর্কের লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটে। সাম্রাজ্যের কেন্দ্রের অধীনে একটি প্রশাসনিক একক হিসেবে এই সুবার কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা শুরু করার পূর্বে এর ভৌগোলিক সীমানা পরিবর্তনের বিবরণ প্রদান করা প্রয়োজন, কারণ আঞ্চলিক পরিবর্তন অভ্যন্তরীণ প্রশাসন এবং সুবার সাথে কেন্দ্রের সম্পর্কের উপর সরাসরি প্রভাব বিস্তার করে।

আবুল ফজল সুবা বাংলার ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে নিম্নরূপ বিবরণ দেন[১] :

> গড়হি[২] থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত সুবা বাংলার দৈর্ঘ্য চার শ' ক্রোশ[৩] ; উত্তরে পর্বতমালা থেকে সরকার মান্দারণের[৪] দক্ষিণ সীমা পর্যন্ত প্রস্থ দুই শ' ক্রোশ। উড়িষ্যা সুবা বাংলার সঙ্গে যুক্ত হলে দৈর্ঘ্য আরো তেতাল্লিশ ক্রোশ এবং প্রস্থ আরো তেইশ ক্রোশ বৃদ্ধি পায়। সুবা বাংলার পূর্ব

---

* অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রাক্তন উপাচার্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

১. আবুল ফজল, *আইন-ই-আকবরী*, ২য় খণ্ড; এইচ. এ জেরেট কর্তৃক অনূদিত এবং স্যার যদুনাথ সরকার কর্তৃক সংশোধিত; ৩য় সংস্করণ, কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি ১৯৭৮ (পরে *আইন* ২য় রূপে উল্লেখিত), ১২৯-১৩২। এখানে হুবহু অনুবাদ না করে সারাংশ দেয়া হয়েছে।

২. গড়হি অর্থাৎ তেলিয়া গড়হি বা তেলিয়াগড়। এটি বিহার ও বাংলার সীমান্তে অবস্থিত। এর উত্তরে গঙ্গা নদী এবং দক্ষিণে রাজমহল পর্বতমালা। প্রাচীন এবং মধ্যযুগে পশ্চিম দিক থেকে বাংলায় প্রবেশের মুখে এখানে একটি দুর্গ ছিল এবং এটি একটি অত্যন্ত সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। এখানে একটি দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আছে এবং এর ভিতর দিয়ে পূর্বভারতীয় রেলপথ চলে গেছে।

৩. সাধারণভাবে এক ক্রোশ সমান দুই মাইল বা তার কিছু বেশি।

৪. মান্দারণ হুগলী জেলায় অবস্থিত। সুলতানি আমলে প্রায় সময় মান্দারণ বাংলা ও উড়িষ্যার সীমানা নির্ধারণ করতো।

সীমান্তে সমুদ্র, উত্তর ও দক্ষিণে পর্বতমালা এবং পশ্চিমে সুবা বিহার। পূর্ব দিকে অবস্থিত ভাটি এলাকা এই প্রদেশের (বাংলার) অন্তর্ভুক্ত। ভাটির পাশেই ত্রিপুরা পার্বত্য জাতির বাস, এই দেশের রাজারা মাণিক[৫] উপাধি গ্রহণ করেন। সুবা বাংলার উত্তরে কোচ দেশ; কামরূপ ও কামতা[৬] কোচ রাজার অধীন; এই রাজ্যের সীমান্তেই আসাম অবস্থিত। এর পাশেই নিম্ন তিব্বত এবং এর বামে খতা (চীন) দেশ।[৭] সুবা বাংলার দক্ষিণ-পূর্বে আরাকান এবং এই দেশেই চট্টগ্রাম বন্দর[৮] অবস্থিত।

আবুল ফজলের বক্তব্যে সামান্য তথ্যগত ভুল আছে। তিনি বলেন যে, সুবা বাংলার পূর্বে সমুদ্র, কিন্তু তা সত্য নয়। বাংলার পূর্ব সীমান্তে ত্রিপুরা রাজ্য অবস্থিত। সুবা বাংলার পূর্বে যে ত্রিপুরা রাজ্য অবস্থিত ছিল তা আবুল ফজলের জানা ছিল, কারণ তিনি বলেন যে, বাংলার পূর্ব অংশে ভাটি এবং ভাটির পাশেই ছিল ত্রিপুরা। কিন্তু তবুও সীমানা দেয়ার সময় তিনি ভুল করে বাংলার পূর্ব সীমান্তে সমুদ্রের কথা বলেছেন। বাংলার দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে যে আরাকানের অবস্থিতি এবং চট্টগ্রাম বন্দর যে আরাকানের অধীনে ছিল তাও আবুল ফজল জানতেন। কিন্তু বাংলার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ দেয়ার সময় তিনি চট্টগ্রাম থেকে গড়হি পর্যন্ত সুবা বাংলার সীমান্ত দিয়েছেন। সুবা বাংলার দক্ষিণ দিকে সারা সীমান্ত জুড়ে সমুদ্র, কিন্তু আবুল ফজল বলেছেন পর্বতমালা। তিনি হয়তো সুন্দরবনকে পর্বতমালা বলেছেন। তাঁর সময়ে সুন্দরবন বর্তমানের তুলনায় অনেক বেশি জঙ্গলাকীর্ণ ছিল সন্দেহ নেই (কিন্তু সুন্দরবন পর্বতমালা নয়), এবং সুন্দরবনের পরেই যে সমুদ্র তা বোধহয় আবুল ফজলের জানা ছিল না। আবুল ফজল যখন *আইন-ই-আকবরী* লেখা শেষ করেন (১৫৯৩ খৃঃ)[৯], তার এক যুগ আগে সুবাব্যবস্থা চালু হয় এবং মুগল শাসনকাঠামোয় বাংলাকে সুবার মর্যাদা দেয়া হয়। কিন্তু সেই সুবা বাংলায় মুগল কর্তৃত্ব ছিল খুবই দুর্বল এবং সেই দুর্বল

৫. ত্রিপুরার রাজাদের ইতিহাস *রাজমালায়* উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাংলায় একজন সুলতান (আমরা মনে করি সুলতান শামস উদ্দিন ইলিয়াস শাহ) ত্রিপুরার রাজাদের মাণিক্য উপাধি দান করেন। এই উপাধিধারী প্রথম রাজার নাম রত্ন-ফা বা রত্নমাণিক্য। (শ্রীবাজমালা, ১ম খণ্ড, কালিপ্রসন্ন সেন কর্তৃক সম্পাদিত, ৬০-৭১। আরো দেখুন, আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস (সুলতানী আমল)*, ২য় সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৮৭, ১৬৯।

৬. পশ্চিমে করতোয়া নদী থেকে পূর্বে বনাস (মনসা) নদী পর্যন্ত ভূভাগকে কামতা এবং বনাস নদীর পূর্ব তীর থেকে ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম তীর পর্যন্ত ভূভাগকে কামরূপ বলা হতো। কোচ রাজ্যকে *বাহরিস্তান-ই-গায়বী*-তে কামতার সঙ্গে অভিন্ন রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। মির্জা নাথন, *বাহরিস্তান-ই-গায়বী*, এম. আই. বোরাহ কর্তৃক অনূদিত এবং আসাম সরকার কর্তৃক প্রকাশিত (পবে *বাহবিস্তান* রূপে উল্লেখিত), ১৯৩৬; ১ম খণ্ড, ২৪৯-২৫২; ২য় খণ্ড, ৮০৬-৮০৭, টীকা নং ১৫, ১৬।

৭. এশিয়াবাসীর কাছে চীনদেশ প্রায় এক হাজার বছর ধরে খিতাই বা খতা নামে পরিচিত ছিল, ইউরোপীয়রা তা অনুসরণ করে ক্যাথে (Cathay) লিখে। *The book of Su Maro Polo*, ed. by Henry Yule, 2nd edition, Introduction, II, *Encyclopaedia of Islam*, Vol II, 737, (under Kara Khitai)

৮. আকবরের সময় চট্টগ্রাম বন্দর আরাকানের অধীনে ছিল, কিন্তু তবুও আবুল ফজল চট্টগ্রামকে সুবা বাংলার অন্তর্ভুক্ত করেন।

৯. আবুল ফজল চার খণ্ডে আকবরের ইতিহাস লেখার পরিকল্পনা করেন এবং তার পরিশিষ্টরূপে এক খণ্ডে আকবরের শাসনব্যবস্থা এবং প্রতিষ্ঠানাদির বিবরণ লেখার সিদ্ধান্ত নেন।। আকবরের রাজত্বের ৪২তম বর্ষে *আকবরনামা'র* খসড়া আকবরের সম্মুখে পেশ করার আগে চারবার সংশোধন করা হয়। *আইন-ই-আকবরী* ১৫৯৩ সালে শেষ হয়, পরে বেরার বিজিত হলে আরো কিছু সংযুক্ত কবা হয়। *আইন-ই-আকবরী*, ১ম খণ্ড, হেনরি ব্লখম্যান কর্তৃক অনূদিত, (কলকাতা ১৮৭৩), Lin. C H Philips (ed.), *Historians of India, Pakistan and Ceylon*, (Oxford 1961), 144-45

কর্তৃত্বাধীন সুবা বাংলার আয়তনও ছিল অনেক কম। তাই আবুল ফজল প্রদত্ত সুবা বাংলার ভৌগোলিক বিবরণ সামান্য পরিবর্তন করে গ্রহণযোগ্য হলেও মুগল সুবা বাংলার আয়তনের প্রথম সীমা এবং পর্যায়ক্রমিক সম্প্রসারণ আলোচনাসাপেক্ষ।

১৫৭৬ সালের ১২ জুলাই তারিখে রাজমহলের যুদ্ধে বাংলার শেষ আফগান সুলতান দাউদ খান কররানী মুগলদের বিরুদ্ধে চূড়ান্তভাবে পরাজিত হন এবং তাঁকে হত্যা করা হয়।[১০] এরই সঙ্গে বাংলার আফগান স্বাধীন সালতানাতেরও অবসান হয় এবং বাংলাদেশ, অন্তত কাগজে-কলমে, মুগল সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। রাজধানী তাঁড়া[১১] মুগলদের হস্তগত হয় এবং সেখানে মুগল সেনাপতি খান জাহান অবস্থান নেন। কিন্তু রাজধানী অধিকৃত হলেও সারা বাংলা মুগল আধিপত্য স্বীকার করে নি; বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে আফগান সেনানায়কেরা ও বাংলার ভুঁইয়ারা আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। দাউদ কররানীর দুইজন মন্ত্রী কতলু লোহানী এবং শ্রীহরি বিশ্বাসঘাতকতা করে দাউদ খানের চূড়ান্ত পরাজয়ের আগেই মুগল সেনাপতি খান জাহানের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে এবং রাজমহলের যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ না করে দাউদের পতনে সাহায্য করে। পুরস্কারস্বরূপ কতলু লোহানী উড়িষ্যায় এবং শ্রীহরি যশোরে কয়েকটি পরগনা লাভ করে নির্বিঘ্নে শাসন করার সুযোগ পায়।[১২] এই দুইজন স্বপক্ষত্যাগী মুগল বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। পরে কতলু লোহানী উড়িষ্যায় মুগলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং মাঝে মাঝে বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হলেও জীবনের শেষ পর্যন্ত মুগলদের শান্তিতে উড়িষ্যা দখলে রাখার সুযোগ দেয় নি। শ্রীহরি আজীবন মুগলদের প্রতি অনুগত থাকে। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র প্রতাপাদিত্য প্রথমে মুগলদের অনুগত থাকে, কিন্তু জাহাঙ্গীরের আমলে ইসলাম খান চিশতী প্রতাপাদিত্যকে অন্যান্য বিদ্রোহ দমনে তাঁকে সাহায্য করতে আদেশ দিলে প্রতাপাদিত্য বিদ্রোহ করেন। প্রতাপাদিত্য এখন বুঁঝতে পারেন যে, মুগল শক্তি স্থায়ীভাবে বাংলা গ্রাস করবে। কিন্তু যুদ্ধে প্রতাপাদিত্য চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়ে আবার মুগল বশ্যতা স্বীকার করে নেন। উড়িষ্যা ও যশোর বাদ দিলে দাউদ কররানীর হত্যার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহের দাবানল জ্বলে ওঠে। বিদ্রোহীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে শত্রুর মোকাবেলা করলে বাংলার ইতিহাস হয়তো অন্যভাবে লিখিত হতো, কিন্তু বিদ্রোহীরা বিচ্ছিন্ন অবস্থাতেই মুগলদের বিরুদ্ধাচরণ করে। সম্রাট আকবর একের পর এক সেনাপতি পাঠান, কিন্তু অনেক যুদ্ধ করেও তিনি সারা বাংলায় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হন।

১০. আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস* (সুলতানী আমল), ২য় সংস্করণ, ঢাকা ১৯৮৭, ৩৮৩-৮৪।

১১. এটি মুসলিম ঐতিহাসিকদের তান্ডা (Tanda)। সোলায়মান কররানী ১৫৬৪ সালে গৌড় থেকে রাজধানী তাঁড়ায় স্থানান্তর করেন। তাঁড়া গৌড়ের দক্ষিণ-পশ্চিমে ভাগীরথীর অপর পাড়ে অবস্থিত ছিল। প্রাচীন তাঁড়া নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে।

১২. কতলু লোহানীর বিশ্বাসঘাতকতার কথা নিয়ামতুল্লাহর '*তারিখ-ই-খানজাহানি ওয়া মখজন-ই-আফগানা'য়*' এবং শ্রীহরির বিশ্বাসঘাতকতার কথা রামরাম বসুর *'প্রতাপাদিত্য চরিত্র'* গ্রন্থে পাওয়া যায়। নিয়ামতুল্লাহ বলেন, "Katlu Lohani, Daud's Commander-in-Chief, forming a reasonable connection with Khan Jahan, promised to take such a posture on the day of battle as to render Daud's defeat unavoidable, on condition that some porganas should be settled on him." (Dorn, *History of the Afghans*, Vol 1, 183)

বাংলার স্বাধীনচেতা ভুঁইয়া এবং পরাজিত আফগান সেনাপতি ছাড়া বাংলার মুগল সৈন্যদের বিদ্রোহও আকবরের সময় বাংলা বিজয়ের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। ১৫৭৯ সালে বাংলা ও বিহারস্থ মুগল সেনানায়কেরা আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ঘোড়ার দাগ দেয়ার নিয়মের (branding regulations) কড়াকড়ি আরোপ, জাগির ভূমি-রাজস্বের হিসাব নিরীক্ষণে কড়াকড়ি, যুদ্ধরত সৈনিকদের ভাতা (field allowance) হ্রাসকরণ ইত্যাদি কয়েকটি কারণে মুগল সৈন্যরা বিদ্রোহ করে। কিন্তু সবচেয়ে বড় কারণ ছিল ধর্মের ব্যাপারে আকবরের বাড়াবাড়ি অর্থাৎ দীন-ই-ইলাহী প্রবর্তন। বিদ্রোহী মুগল সৈনিকেরা একজন সুবাদারকে (মুজাফফর খান তুরবতী) হত্যা করে, আকবরের ভাই কাবুলের শাসনকর্তা মির্জা হাকিমকে দিল্লীর সিংহাসনে বসাবার পরিকল্পনা করে। বিদ্রোহীরা মির্জা হাকিমের পক্ষে বাংলায় একটি বিদ্রোহী সরকার গঠন করে, মির্জা হাকিমের নামে খোতবা পাঠ করে, বিদ্রোহী নেতাদের উচ্চ পদ ও উচ্চ মনসব দান করে এবং জাগির ও খিলাত ইত্যাদি খুশিমতো প্রদান করে।[১৩] নিজ সৈন্যদের বিদ্রোহ দমনে আকবরের বেশ কয়েক বছর সময় লাগে। কিন্তু মাসুম খান কাবুলী প্রমুখ কয়েকজন বিদ্রোহী সেনাপতি আত্মসমর্পণ না করে বাংলার ভুঁইয়া এবং আফগানদের সঙ্গে মিলিত হয়ে জীবনের শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করে। বাংলার ভুঁইয়াদের মধ্যে ভাটির বারো ভুঁইয়া, বিশেষকরে বারো ভুঁইয়ার নেতা ঈশা খান মসনদ-ই-আলা, শ্রীপুর-বিক্রমপুরের কেদার রায়, আফগানদের মধ্যে খাজা উসমান আফগান এবং মুগল বিদ্রোহী সেনাপতিদের মধ্যে বাবা খান কাকশাল ও মাসুম খান কাবুলীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ফলে শাহবাজ খান ও মানসিংহের মতো দক্ষ সেনাপতিদের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও বাংলায় মুগল আধিপত্য বিস্তারের আশা পূর্ণ হওয়ার আগেই আকবর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আকবরের আমলে যে এলাকায় মুগল আধিপত্য স্থাপিত হয় তার সীমানা মোটামুটি এভাবে নির্ধারণ করা যায় : উত্তরে ঘোড়াঘাট, দক্ষিণ-পশ্চিমে সাতগাঁও ও বর্ধমান, পূর্বে করতোয়া নদী এবং বগুড়া জেলার শেরপুর মুর্চার বরাবর একটি সমান্তরাল এলাকা এবং পশ্চিমে রাজমহল। সুতরাং এই ছিল আবুল ফজলের *আইন-ই-আকবরী* লেখা সমাপ্ত হওয়ার সময় পর্যন্ত মুগল সুবা বাংলার সীমানা।[১৪]

সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়ে ১৬০৮ সালে ইসলাম খান চিশতী বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হয়ে আসেন। তিনি ঐ সালের জুন মাসের প্রথমদিকে রাজধানী রাজমহলে[১৫] এসে

---

১৩. আবুল ফজল, *আকবরনামা*, ৩য় খণ্ড, হেনরি বেভেরিজ কর্তৃক অনূদিত, ৪৪৯-৪৫০ (পরে *আকবরনামা* ৩য় রূপে উল্লেখিত)।

১৪. স্যার যদুনাথ সরকার বলেন : "The effective control of the Mughal emperor was, however, confined to very narrow limits, and did not stretch far beyond the capital city and the few fortified posts set up by the imperial faujdars throughout the country." J. N. Sarkar (ed.), *History of Bengal* Vol II, (Dhaka 1948), 235 পরে *HB* II রূপে উল্লেখিত।

১৫. রাজা মানসিংহ ১৫৯৫ সালে বাংলাব রাজধানী রাজমহলে স্থানান্তবিত করেন। বাজমহলেব পূর্ব নাম ছিল আকমহল বা আগমহল। রাজমহল জেলা গঙ্গা নদীর তীরে উত্তর-দক্ষিণে প্রায় চল্লিশ মাইল বিস্তৃত; রাজমহল শহর গৌড়ের বিশ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত ; রাজা মানসিংহ এই শহর প্রতিষ্ঠা করেন এবং সম্রাটের নামানুসারে এর নাম দেন আকবরনগর।

পৌঁছেন এবং বাংলা জয় করার এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই পরিকল্পনার তিনটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমত, তিনি বুঝতে পারেন যে, বাংলায় মুগল আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করতে হলে বাংলার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান নিয়ে বিদ্রোহীদের সর্বাত্মক আক্রমণ করতে হবে এবং বিদ্রোহীদের স্বস্তি দেয়া যাবে না যাতে তারা ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বা সময় নিয়ে নতুনভাবে শক্তি সঞ্চয় করার সুযোগ না পায়। রাজধানী রাজমহল বাংলার একেবারে পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। ইসলাম খান বুঝতে পারেন যে, এই পশ্চিম প্রান্তে অবস্থান নিয়ে সুদূর ভাটি অঞ্চলে যুদ্ধ পরিচালনা করা বা যুদ্ধে ঈপ্সিত ফল লাভ করা সম্ভব নয়। তাই তিনি রাজমহল থেকে রাজধানী সরিয়ে বাংলার মধ্যবর্তী স্থানে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং ঢাকাকে নতুন রাজধানীর জন্য নির্বাচন করেন। ঢাকায় রাজধানী স্থাপিত হয় এবং সম্রাটের নামানুসারে তিনি এর নামকরণ করেন জাহাঙ্গীরনগর। দ্বিতীয়ত, ইসলাম খান চিশতী বুঝতে পারেন যে, নদীমাতৃক বাংলায় শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধে সাফল্য লাভ করতে হলে শক্তিশালী নৌবহর প্রয়োজন। আকবরের সময়েও নৌবহর ছিল এবং সেই সময়েও নৌবাহিনী ভাটি অঞ্চলে যুদ্ধ করে। কিন্তু আকবরের নৌবাহিনীর প্রধান ভাটির যুদ্ধে বিশেষ সুবিধা করতে পারেন নি। সম্রাটের প্রতি শাহ্ বরদীর আনুগত্যও সব সময় সন্দেহের উর্ধ্বে ছিল না।[১৬] ইতিমধ্যে শাহ বরদী মৃত্যুবরণ করেন। এই জন্য ইসলাম খান চিশতী নৌয়ারা বা নৌবাহিনী শক্তিশালী করার পরিকল্পনা করেন। তৃতীয়ত, ইসলাম খান চিশতী পরাজিত ভুঁইয়াদের দ্বিতীয় বার বিদ্রোহ করার সুযোগ দেন নি। এই বিষয়ে পূর্ববর্তী মুগল সেনাপতিদের নীতির সঙ্গে তাঁর নীতির কোন মিল ছিল না। পূর্ববর্তী সেনাপতিরা পরাজিত ভুঁইয়ারা বশ্যতা স্বীকার করলেই তাদেরকে নিজ নিজ এলাকার শাসনভার ফিরিয়ে দিতেন; এই সুযোগে তাঁরা নতুনভাবে শক্তি সঞ্চয় করার এবং অবস্থা অনুকূল দেখলেই বিদ্রোহ করার জন্য তৈরি হতেন। তাঁরা বার বার বিদ্রোহ করতেন এবং বার বার তাঁদের মোকাবেলা করতে হতো। এতে লোক ও সম্পদ তো ক্ষয় হতোই, মুগল অগ্রগতিও ব্যাহত হতো। কিন্তু ইসলাম খান চিশতী বশ্যতা স্বীকারকারীদের নিজ এলাকায় ফেরত না পাঠিয়ে সুবাদারের সেনাবাহিনীর সঙ্গে রেখে দিতেন এবং অন্য বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য পাঠিয়ে দিতেন। ফলে বাঙালিরাই বাঙালিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হতো এবং তারা ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সুযোগ পেতো না। এভাবে বিদ্রোহীদের সংখ্যা ক্রমশ কমে গিয়ে শেষ পর্যন্ত লোপ পায়।[১৭]

ইসলাম খান চিশতী রাজমহলে পৌঁছেই বাংলার পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে সম্রাটের কাছে নিম্নরূপ প্রতিবেদন পাঠান :

> এই প্রদেশের শাসন সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চপদস্থ অফিসারদের যত্নবান হওয়া উচিত এবং সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত। দীউয়ানের পদটি একজন অত্যন্ত সৎ লোককে দেয়া হোক। ইহতিমাম খান, যিনি একজন দক্ষ অফিসার, তাঁকে অথবা তাঁর মতো একইরূপ দক্ষ অফিসারকে

১৬. *আকবরনামা*, ৩য়, ৩৭৬।

১৭. J N Sarkar (ed.), *History of Bengal*, 234.

নৌবাহিনীর কর্তা এবং গোলন্দাজ বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করা হোক। পূর্ববর্তী সময়ের দুর্নীতিপরায়ণ ও বিশ্বাসঘাতক অফিসাররা, যারা এই প্রদেশে চাকুরির জন্য অনুপযুক্ত, তাদের প্রত্যাহার করা হোক।[১৮]

জাহাঙ্গীর অনতিবিলম্বে এই সুপারিশ গ্রহণ করেন এবং ইহতিমাম খানকে নৌবাহিনীর অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। ইহতিমাম খানকে নির্দেশ দেয়া হয় তিনি যেন পূর্ববর্তী সুবাদার মানসিংহের অধীনস্থ সকল সৈন্য ও কামান, জাহাঙ্গীর কুলী বেগ নির্মিত কামান, রোহতাস দুর্গে অবস্থিত কামান এবং গোলাবারুদ ইত্যাদি হস্তগত করে বাংলার দিকে রওনা হন। ফলে বাংলার নৌয়ারা বা নৌবাহিনী অত্যন্ত শক্তিশালী করে গড়ে তোলা হয়।

ইসলাম খান চিশতীর তিনটি পরিকল্পনাই অত্যন্ত ফলপ্রসূ প্রমাণিত হয়। ঢাকায় রাজধানী স্থাপিত হওয়ার মাত্র চার বছরের মধ্যে নৌবাহিনীর সাহায্যে ভাটি সহ মেঘনা নদী পর্যন্ত সকল ভূভাগ মুগল অধিকারে আসে। বাংলার ভুঁইয়ারা সকলেই একের পর এক মুগল বশ্যতা স্বীকার করে নেন। এমনকি,বারো ভুঁইয়ার নেতা ঈশা খানের ছেলে মুসা খানও আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন।[১৯] মুগল বিদ্রোহীদের সকলেই বশ্যতা স্বীকার করে[২০], এমনকি দুর্ধর্ষ আফগান খাজা উসমানও যুদ্ধ করে প্রাণত্যাগ করেন। জাহাঙ্গীরের আমলেই সুবাদার ইবরাহিম খান ফতেহ জঙ্গ ফেনী নদী পর্যন্ত মুগল সীমানা বিস্তৃত করেন। তিনি ত্রিপুরাও জয় করেন, কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যে ত্রিপুরা আবার হাতছাড়া হয়ে যায়।[২১] কিন্তু তখনো আবুল ফজল বর্ণিত এলাকা 'তেলিয়াগড় থেকে চট্টগ্রাম' সুবা বাংলার অধীনস্থ হয় নি। চট্টগ্রাম বিজিত হয় ১৬৬৬ সালে আওরঙ্গজেবের সময়ে অর্থাৎ দাউদ কররানীর পতনের (১৫৭৬ খৃঃ) ঠিক নব্বই বছর পরে।

ভৌগোলিক নিরিখে বৃটিশ বাংলার সঙ্গে সুবা বাংলার সম্পূর্ণ মিল ছিল না। জাহাঙ্গীরের সময় থেকে বাংলার উত্তর-পূর্ব সীমান্তে কোচ, কামতা, কামরূপ ও আসামে মুগলরা বারবার অভিযান চালায়, বহু যুদ্ধ হয়, মাঝে মাঝে কিছু অংশ বিজিত হয় আবার হাতছাড়া হয়ে যায়। এভাবে অনেক দিন চলে। শেষ পর্যন্ত কোচ, কামতা, কামরূপ ও আসামের হাজো পর্যন্ত বিজিত হয়। শেষদিকে এই সীমা মোটামুটি স্থিতিশীল হয়। শাহজাহানের একখানা শিলালিপি হাজো থেকে আবিষ্কৃত হয়।[২২] ঐ লিপি থেকে বোঝা

১৮. *Baharistan*, Vol. I, 3-4

১৯. ইতিপূর্বে ১৫৯৯ সালে ঈশা খান মৃত্যুবরণ করেন।

২০. আফগান বিদ্রোহীদের নেতা মাসুম খান কাবুলীও ইতিপূর্বে ১৫৯৯ সালে পরলোকগমন করেন। মাসুম খানের পুত্র মির্জা মুমিন মুসা খানের সঙ্গে যোগ দিয়ে ইসলাম খান চিশতীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন, কিন্তু তাঁরা কেউ টিকতে পারেন নি।

২১. আবদুল করিম, 'জাহাঙ্গীরের আমলে মুসলমানদের ত্রিপুরা রাজ্য বিজয়', *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৯১, ১১-৩৯।

২২. Shams-ud din Ahmad *Inscriptions of Bengal*, Vol. IV (Rajshahi 1960), 280-84

যায় যে, মুগল আমলের শেষ পর্যন্ত 'আমলা আসাম' নামে জাগির পূর্বসীমান্তের প্রতিরক্ষাব্যয়ের জন্য নির্ধারিত ছিল।[২৩] শুজাউদ্দিন মুহাম্মদ খানের সময় ঢাকার নায়েব নাজিম দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী খান আবার ত্রিপুরা জয় করেন।[২৪] ফলে বর্তমান ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্ত পর্যন্ত এলাকা মুগল সুবা বাংলার অন্তর্ভুক্ত হয়। ত্রিপুরার বিজিত অংশকে রৌশনাবাদ নাম দেয়া হয়। মুগল আমলে বিহারের ভাগলপুর এবং পূর্ণিয়ার কিছু অংশ সুবা বাংলার অন্তর্ভুক্ত ছিল।[২৫] মেদিনীপুরের ঘাটাল-এর উত্তর অংশ বাংলা এবং দক্ষিণ অংশ উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত ছিল।[২৬] কিন্তু আঠারো শতকে মুর্শিদকুলী খান মেদিনীপুরকে বাংলার সঙ্গে সংযুক্ত করেন।[২৭] অতএব, মুগল সুবা বাংলার সীমানা আমরা এভাবে নির্ধারিত করতে পারি :

উত্তরে পর্বতমালা, উত্তর-পূর্বে আসামের হাজো, পূর্বে ত্রিপুরা, দক্ষিণে সমুদ্র, দক্ষিণ-পূর্বে আরাকান,দক্ষিণ-পশ্চিমে উড়িষ্যা এবং পশ্চিমে বিহার।

আবুল ফজলের আর একটি বক্তব্যও প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন যে, উড়িষ্যা সুবা বাংলার সঙ্গে যুক্ত হলে এর দৈর্ঘ্য-প্রস্থ আরো বেড়ে যায়। তাছাড়া পলাশী যুদ্ধের সময় বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার শাসনভার একই ব্যক্তির উপর ন্যস্ত ছিল—এর তাৎপর্যও বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। আকবরের সময় উড়িষ্যা প্রশাসনিকভাবে বাংলার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল, কারণ বাংলা ও উড়িষ্যা একই সঙ্গে বিজিত হয় এবং একই সেনাপতি উভয় অঞ্চলে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য নিযুক্ত হন। উড়িষ্যার আফগান বিদ্রোহীরা তাড়া খেয়ে মেদিনীপুরের ভিতর দিয়ে বাংলার সীমানায় প্রবেশ করতো। সুতরাং সামরিক প্রয়োজনেই বাংলা ও উড়িষ্যা বিজয়ের কাজ একই সঙ্গে সম্পন্ন করতে হতো। কিন্তু বিজয় সম্পূর্ণ হলে মুগল প্রাদেশিক শাসনকাঠামোয় উড়িষ্যাকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দেয়া হয়। তা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে উড়িষ্যা বাংলার সুবাদারের অধীনে থাকতো। জাহাঙ্গীরের সময়ে সর্বপ্রথম উড়িষ্যাকে স্বতন্ত্র সুবার মর্যাদা দেয়া হয় এবং হাশিম খান প্রথম সুবাদার নিযুক্ত হন ১৬০৭ সালে। ১৬২০ সাল পর্যন্ত উড়িষ্যার স্বতন্ত্র মর্যাদা বিদ্যমান থাকে, কিন্তু ১৬২১ সালে বাংলার সুবাদার ইবরাহিম খান ফতেহজঙ্গ একই সঙ্গে উড়িষ্যার দায়িত্ব লাভ করেন; তিনি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আহমদ বেগ খানকে উড়িষ্যায় তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন।[২৮] ১৬৪২ সালের মার্চ মাসে

২৩. *Fifth Report, Appendix* 4, 189-91

২৪. গোলাম হোসেন সলীম, *রিয়াজ-উস-সালাতীন*, আবদুস সালামের ইংরেজি অনুবাদ, ২৯৯। ১৭২৮ সালের ১৫ এপ্রিল থেকে ১৭৩৪ সাল পর্যন্ত ২য় মুর্শিদকুলী খান ঢাকার নায়েব নাজিম ছিলেন, এই সময়ের মধ্যে তাঁর সেনাপতি মীর হাবিব ত্রিপুরা জয় করেন। Abdul Karim, *Dacca the Mughal Capital*, (Dhaka 1964), 21.

২৫. *HB II*. 235

২৬. ঐ, ২০১।

২৭. Abdul Karim, *Murshid Quli Khan and His Times*, (Dhaka 1963), (পরে *MQK* রূপে উল্লেখিত), 76

২৮. জাহাঙ্গীর, *তুজক-ই-জাহাঙ্গীরী*, রোজার্স ও বেভেরিজ-এর ইংরেজি অনুবাদ (পরে *তুজক* রূপে উল্লেখিত), ২০২।

বাংলার সুবাদার যুবরাজ শাহ্ শুজাকে একই সঙ্গে উড়িষ্যার সুবাদারি দেয়া হয়।[২৯] ১৭১৪ সালে মুর্শিদকুলী খান উড়িষ্যার সুবাদার বা নাজিম নিযুক্ত হন। এর আগেই তিনি বাংলার দীউয়ান এবং অনুপস্থিত সুবাদার মীর জুমলার নায়েব বা প্রতিনিধিরূপে বাংলার সুবাদারের দায়িত্বে ছিলেন। ১৭১৭ সালে মুর্শিদকুলী খান নিজে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন।[৩০] সুতরাং ১৭১৭ সালে বাংলা ও উড়িষ্যার সুবাদারির দায়িত্ব একই লোকের হাতে ন্যস্ত হয়। মুর্শিদকুলী খান তাঁর জামাতা শুজাউদ্দিন মুহাম্মদ খানকে উড়িষ্যায় তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। মুর্শিদকুলী খানের মৃত্যুর পর ১৭২৭ সালে শুজাউদ্দিন মুহাম্মদ খান মুর্শিদাবাদের মসনদ দখল করেন এবং বাংলা ও উড়িষ্যা উভয় প্রদেশের সুবাদারি লাভ করেন।[৩১] তিনি প্রথমে তাঁর পুত্র মুহাম্মদ তকী এবং পরে জামাতা দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী খানের মাধ্যমে উড়িষ্যা শাসন করেন।[৩২] সম্রাট মুহাম্মদ শাহ ১৭৩৩ সালে শুজাউদ্দিন মুহাম্মদ খানকে বিহারের সুবাদার নিযুক্ত করেন। এই প্রথম বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার শাসনক্ষমতা একই ব্যক্তির দায়িত্বে অর্পণ করা হয়।[৩৩] শুজাউদ্দিন মুহাম্মদ খান শাসনের সুব্যবস্থার জন্য বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যাকে চারটি প্রশাসনিক বিভাগে বিভক্ত করেন, যেমন (১) পশ্চিম ও মধ্য বাংলা এবং উত্তর বাংলার কিছু অংশ; (২) ঢাকা বিভাগ, দক্ষিণ বাংলা এবং সিলেট ও চট্টগ্রাম সহ পূর্ব বাংলা এবং উত্তর বাংলার বাকি অংশ; (৩) বিহার বিভাগ এবং (৪) উড়িষ্যা বিভাগ। একটি উপদেষ্টা পরিষদের সাহায্যে সুবাদার নিজে প্রথম বিভাগ শাসন করতেন; অন্য তিনটি বিভাগে তিনি নায়েব বা প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন, কিন্তু সকলের উপর স্বীয় কর্তৃত্ব বহাল রাখেন। বিহারে আলিবর্দী খানকে, ঢাকায় প্রথমে দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী খানকে এবং পরে সরফরাজ খানকে এবং উড়িষ্যায় প্রথমে মুহাম্মদ তকীকে এবং পরে দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী খানকে নায়েব বা প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হয়।[৩৪] ১৭৪০ সালে আলিবর্দী খান সরফরাজ খানকে পরাজিত ও হত্যা করে মুর্শিদাবাদের মসনদ দখল করেন। তিনিও বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদার নিযুক্ত হন। তিনি শুজাউদ্দিন মুহাম্মদ খানের মতো নিজে মুর্শিদাবাদে অবস্থান নিয়ে ঢাকা, বিহার ও উড়িষ্যায় প্রতিনিধি নিযুক্ত করে দেশ শাসন করেন।[৩৫]

সুবা বাংলার ভৌগোলিক বিবর্তন আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, আকবরের সময় বাংলা ও উড়িষ্যার অধিকৃত এলাকার আয়তন ছিল অতি সীমিত। সে কারণে বাংলা ও উড়িষ্যা দু'টি সুবা হলেও একই সুবাদারের অধীনে থাকে। প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা আকবরের সময় বিধিবদ্ধ এবং সমন্বিত হলেও মুগল সুবা বাংলা পূর্ণতা লাভ করে জাহাঙ্গীরের সময়ে। জাহাঙ্গীর, শাহজাহান ও আওরঙ্গজেবের সময়ে সুবা বাংলার উপর

২৯. *HB II*, 332, note.

৩০. *MQK*, 48.

৩১. *HB II*, 422-23.

৩২. ঐ।

৩৩. ঐ, ৪২৫।

৩৪. নায়েব বা প্রতিনিধিরা নিজ নিজ এলাকায় নওয়াব নামে পরিচিত হন, নওয়াব নায়েব শব্দেব বহুবচন।

৩৫. *HB II*, 442

সম্রাটের দৃঢ় কর্তৃত্ব ছিল, কিন্তু আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার প্রশ্নে কয়েকটি ভ্রাতৃযুদ্ধের অভিঘাতে মুগল কেন্দ্রীয় শক্তি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে; সৈন্যবাহিনীসহ অনেক সেনাপতি নিহত হয়; রাজকোষ শূন্য হয়ে পড়ে এবং সাম্রাজ্যের নানা অঞ্চলে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ফলে শাসনক্ষমতা দুর্বল ও অনভিজ্ঞ লোকদের হাতে পড়ে। এই সময় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং উচ্চপদস্থ অফিসারগণ নিজেদের ক্ষমতা রক্ষার কাজে অধিক সময় ব্যয় করতেন। এই সময় থেকে পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত সুবা বাংলার শাসনব্যবস্থায় কিছু প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, বাংলার সুবাদারেরা প্রায়ই কর্মক্ষেত্রে অনুপস্থিত থাকতেন এবং প্রতিনিধির মাধ্যমে শাসন চালাতেন। আওরঙ্গজেবের শেষ বয়সে শাহজাদা আজিমউদ্দিনের (আজিম-উশ-শান) সময় থেকে এই প্রবণতা শুরু হয় এবং ১৭১৭ সালে মুর্শিদকুলী খানের সুবাদার নিযুক্ত হওয়া পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। এই সময়ে শাহজাদারা দিল্লীর সিংহাসনের প্রতি দৃষ্টি রাখতেন। বাংলার শাসনের প্রতি তাঁদের বিশেষ নজর থাকতো না। একমাত্র ধন-সম্পদ লাভের আশায় তাঁরা বাংলায় সুবাদারি আঁকড়ে থাকতেন। কারণ আসন্ন উত্তরাধিকারের যুদ্ধে অর্থের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। দ্বিতীয়ত, একাধিক সুবার শাসনভার একই ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত হতো। একার পক্ষে একাধিক সুবার শাসনকাজ চালানো সম্ভব না হওয়ায় তাঁরা একটি কেন্দ্রীয় স্থানে অবস্থান করে বিভিন্ন সুবায় নায়েব বা প্রতিনিধি নিযুক্ত করতেন। নায়েবরা নিজ নিজ এলাকায় নওয়াব নামে পরিচিত ছিলেন এবং তাঁরাও অর্থলিপ্সু হয়ে পড়েন। এঁদের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব তো ছিলই না, বরং সুবাদার বা নাজিমের পক্ষেও এত অর্থলিপ্সু লোকের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা সম্ভব হতো না। তাছাড়া নাজিমের পুত্র বা নিকট-আত্মীয়রা নায়েব বা প্রতিনিধির দায়িত্ব পেতো। ফলে অপত্যস্নেহে অন্ধ নাজিম নায়েবদের কার্যকলাপে বিশেষ তদারকি করতেন না। তৃতীয়ত, সুবা প্রবর্তনের মূলনীতি ছিল নিজামত এবং দীউয়ানি শাসন পৃথকীকরণ। নাজিম ও দীউয়ান নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে স্বাধীন ছিলেন, উভয়ে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হতেন এবং উভয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দায়ী থাকতেন। এই পৃথকীকরণ নীতি আকবর থেকে আওরঙ্গজেবের সময় পর্যন্ত বলবৎ থাকে। কিন্তু আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর এই ব্যবস্থা পরিবর্তিত হয়,একই ব্যক্তি নাজিম ও দীউয়ান উভয় পদে নিযুক্তি পেতে থাকেন। একই ব্যক্তি নিজামত ও দীউয়ানির দায়িত্ব প্রাপ্ত হওয়ায় শাসনের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়, ক্ষমতা হয় এক ব্যক্তির কুক্ষিগত এবং স্বাভাবিক কারণেই ক্ষমতার অপব্যবহার হতে থাকে। চতুর্থত, মুগল সম্রাটেরা অর্থের লোভে সুবাদার বা নাজিম নিযুক্ত করা শুরু করেন। প্রত্যেক নাজিম সম্রাট ও উজিরদের দরবারে নিজ নিজ উকিল বা প্রতিনিধি প্রেরণ করতেন এবং তাঁদের মারফত নজরানা-উপঢৌকন পাঠিয়ে সম্রাট ও উজিরদের অনুগ্রহ লাভ করতেন। কোন নাজিম মারা গেলে সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের উকিলরা কেন্দ্রীয় রাজধানীতে তৎপর হয়ে উঠতো এবং যাঁর উকিল সম্রাটের অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হতো তিনিই নাজিম পদে নিযুক্তি লাভ করতেন। ১৭২৭ সালে শুজাউদ্দিন মুহাম্মদ খান এবং ১৭৪০ সালে আলিবর্দী খান প্রথমে যুদ্ধ করে মসনদ দখল করেন। তাঁরা সম্রাটের নিযুক্তি লাভ করেন ক্ষমতা দখল করার পর। সম্রাট নিযুক্তি দিয়ে শুধু জবরদখলকারীর ক্ষমতা আইনসম্মত করে দেন। ১৭২৭ সালে শুজাউদ্দিন মুহাম্মদ খান এবং তৎপুত্র সরফরাজ

খানের মধ্যে যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দিলে বা ১৭৪০ সালে আলিবর্দী খান সুবাদার সরফরাজ খানকে পরাজিত ও হত্যা করলেও সম্রাট বা কেন্দ্রীয় সরকার সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকেন। এই নিষ্ক্রিয়তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

উত্তর ভারতে মুগল অধিকার ও কর্তৃত্ব সন্তোষজনকভাবে স্থিতিশীল হলে আকবর শাসনব্যবস্থা পুনর্গঠন এবং প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থার সমন্বয় সাধন করেন। তিনি রাজত্বের ২৪তম বর্ষে অর্থাৎ ১৫৭৯-৮০ সালে সারা সাম্রাজ্যকে ১২টি সুবায় বিভক্ত করেন এবং সুবার সুশাসনের জন্য বিভিন্ন পদ সৃষ্টি করেন। *আকবরনামায়* এই কর্মকর্তাদের বিবরণ এভাবে উল্লেখিত হয়েছে—১ জন সিপাহসালার, ১ জন দীউয়ান, ১ জন বখশী, ১ জন মীর আদল, ১ জন সদর, ১ জন কোতওয়াল, ১ জন মীর বাহর এবং ১ জন ওয়াকিয়ানবিশ।[৩৬] *আকবরনামায়* সুবার শাসনকাঠামো দেয়া হলেও সুবাগুলির নাম দেয়া হয় নি। নাম ও সংখ্যা বিস্তারিতভাবে দেয়া হয়েছে *আইন-ই-আকবরীতে*।[৩৭] সুবাগুলির নাম এলাহাবাদ, আগ্রা, অযোধ্যা, আজমীর, আহমেদাবাদ, বিহার, বাংলা, দিল্লী, কাবুল, লাহোর, মুলতান এবং মালওয়া। পরে বেরার, খান্দেশ ও আহমদনগর অধিকৃত হলে সুবার সংখ্যা দাঁড়ায় পনেরোটি। উড়িষ্যা ও কাশ্মীরকে সুবার মর্যাদা দেয়া হলে সুবার সংখ্যা হয় সতেরোটি। *আইন-ই-আকবরী*তে প্রত্যেক সুবার শাসনকাঠামো, কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য, প্রশাসনিক বিভাগসমূহের নাম, রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারণ (assessment) ইত্যাদি খুঁটিনাটি বিবরণও পাওয়া যায়। প্রথম সুবাব্যবস্থা প্রবর্তনের সময় উড়িষ্যা বাংলার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। আবুল ফজল বলেন :

> This (Orissa) was formerly a separate state...His Majesty apportioned it into five Sarkars viz., Jalesar, Bhadrak, Katak (Cuttack), Kaling Dandpat and Raja Mahandrah. These five are now included in the province of Bengal.[৩৮]

সুবাব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা একটি সুবায় পরিণত হয়। পি. সারন সুবাগুলিকে প্রধান এবং অপ্রধান (major & minor) রূপে ভাগ করেছেন। তিনি বলেন :

> These provinces varied greatly in status according to their extent and resources, or military and strategic importance. In view of their importance and status, they

---

৩৬. *আকবরনামা*, ৩য়, ৪১২-১৩। "One of the occurrences was the division of the wide tract of India into twelve portions ... He distributed the territories according to suitable limits and laid out the garden of creation by appropriate methods. And he made it over to liberal and righteous guardians ... In this way did he make fitting division of the wide and fertile land of India, and in every province he appointed a Viceroy Sipah-salar, a Diwan, a Bakhshi, a Mir Adal, a Sadr, a Kotwal, a Mir Bahr (Admiral) and a Recorder (waqianavis)."

৩৭. *আইন*, ২য়, ১২৯। "His majesty apportioned the Empire into twelve divisions, to each of which he gave the name of Subah and distinguished them by the appellation of the tract of country or its capital city. These were Allahabad, Agra, Oudh, Ajmer, Ahmadabad, Behar, Bengal, Delhi, Kabul, Lahore, Multan, Malwah, and when Berar, Khandesh and Ahmadnagar were conquered their number was fixed at fifteen."

৩৮. *আইন*, ২য়, ১৩৮।

> may be classified into 1. major provinces and 2. minor provinces. Perhaps there were no definite rules for such classification. Nevertheless, the imperial government adopted, in regard to each individual province, administrative measures, such as the appointment of governors and other high officials in keeping with the status of that province. The charge of the major provinces was given to princes and nobles of the highest rank. Of the fifteen Subahs of Akbar's Empire the twelve original ones came under the category of major provinces, although among them too there were senior and junior grades.[৩৯]

আয়তন, সীমান্তরক্ষা সহ অন্যান্য সামরিক ও প্রশাসনিক গুরুত্ব বিবেচনায় সুবাগুলির মধ্যে মর্যাদার তারতম্য থাকা অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু এই তারতম্য মাত্রাগত, প্রকারগত নয় (difference of degree, not of kind)। প্রশাসনিক কাঠামোতে, রাজস্ব নির্ধারণ বা আদায়ে, প্রশাসনিক কর্মকর্তা নিয়োগে বা অন্য কোন ক্ষেত্রে সুবাগুলির মধ্যে কোন পার্থক্য বা তারতম্য ছিল না। একই আইন-কানুন দ্বারা প্রত্যেক সুবা পরিচালিত হতো। সঙ্গত কারণেই আয়তনে বড় এবং সামরিক গুরুত্বপূর্ণ সুবাগুলিতে যুবরাজসহ অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদার (মনসবের) অধিকারী সেনানায়কদের সুবাদার নিয়োগ করা হতো। এই কারণে সুবাগুলিকে মেজর বা মাইনর সুবায় বিভক্ত করা যায় না। সুবা বাংলাকে মেজর বা 'প্রধান' সুবা রূপে প্রমাণ করার জন্য পি. সারন দু'টি যুক্তি উত্থাপন করেছেন : (১) তিনি বলেন যে, ১৬১১ সালে সম্রাট জাহাঙ্গীর বাংলার সুবাদার ইসলাম খান চিশতীর সুপারিশক্রমে রাজা টোডরমল্লের পুত্র রাজা কল্যাণকে উড়িষ্যার সুবাদার নিযুক্ত করেন। (২) তিনি বলেন যে, ১৬১৮ সালে (প্রকৃতপক্ষে ১৬২১ সাল) বাংলার সুবাদার ইবরাহিম খান ফতেহজঙ্গ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আহমদ বেগ খানকে উড়িষ্যার সুবাদার নিযুক্ত করেন।[৪০] ১ নং তথ্য সঠিক, *তুজক-ই-জাহাঙ্গীরীতেই* তা পাওয়া যায়। কিন্তু ১৬১১ সালে এক বিশেষ কারণে সম্রাট বাংলার সুবাদারের সুপারিশ গ্রহণ করেন। বাংলা বিজয়ের সকল সুযোগ-সুবিধা সুবাদারের অনুকূল করার উদ্দেশ্যে সম্রাট বাংলার সুবাদারের সুপারিশক্রমে বাংলার সকল কর্মকর্তা নিয়োগ করেন। যেহেতু বাংলা বিজয়ের সঙ্গে উড়িষ্যা বিজয়ও সম্পৃক্ত ছিল, সেহেতু ১৬১১ সালে বাংলার সুবাদারের সুপারিশে উড়িষ্যার সুবাদার নিয়োগ করা যুক্তিযুক্ত, সঙ্গত এবং বোধগম্য। কিন্তু পি. সারনের ২ নং তথ্যটি সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে। মির্জা নাথনের সাক্ষ্যে দেখা যায় যে, সম্রাট উড়িষ্যার সুবাদার নিযুক্তিতে বাংলার সুবাদারের সুপারিশ গ্রহণ করেন নি। মির্জা নাথন দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেছেন :

> সুবাদার ইবরাহিম খান ফতেহজঙ্গ তিন লক্ষ টাকা পেশকাশ বা সালামির বিনিময়ে এবং তাঁর বেগমের সুপারিশে জালহির খানকে উড়িষ্যার সুবাদার নিযুক্ত করেন। কিন্তু আহমদ বেগ খান

---

৩৯. P. Saran, *The Provincial Government of the Mughals*, 2nd edition, (Bombay 1973), (পরে P. Saran রূপে উল্লেখিত), ৬৪-৬৫।
৪০. ঐ, ৬৭, টীকা নং ৫৪।

সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের কাছে এই বিষয়ে প্রতিবাদ জানান, ফলে নূরজাহানের হস্তক্ষেপে[৪১] সম্রাট আহমদ বেগ খানকে উড়িষ্যার সুবাদার নিয়োগ করার জন্য সুবাদার ইবরাহিম খানকে নির্দেশ দেন।[৪২]

যাহোক, সুবা বাংলার শাসনকে কেন্দ্রীয় সরকার অত্যন্ত গুরুত্ব দিত। বাংলার সুবাদারি পদ খালি হলে বিহারের সুবাদারকে বাংলার সুবাদার নিয়োগ করার প্রথা আকবরের সময় থেকে, এমনকি সুলতানি আমলেও প্রচলিত ছিল। ইসলাম খান চিশতীও প্রথমে বিহারের সুবাদার ছিলেন এবং বিহার থেকেই তাঁকে বাংলায় পাঠানো হয়। বিহারের সুবাদারিকে বাংলার সুবাদারি লাভের প্রথম পদক্ষেপ (stepping stone) রূপে গণ্য করা হতো। বাংলার সুবাদারি লাভ করাকে পদোন্নতি মনে করা হতো এবং বাংলার সুবাদারি লাভের সঙ্গে সঙ্গে মনসবও বৃদ্ধি পেতো। দ্বিতীয়ত, মুগল সরকারি দলিল-দস্তাবেজে কয়েকটি একত্রীকৃত সুবাকে সুবার বদলে 'আয়ালত' বলা হতো। দক্ষিণ ভারতের সুবাগুলি যখন আওরঙ্গজেবের অধীনস্থ করা হয়, তখন এই সুবাগুলিকে একসঙ্গে 'আয়ালত' বলা হতো।[৪৩] 'আয়ালত' শব্দটি 'আউয়াল' বা 'প্রথম' থেকে উদ্ভূত। সুতরাং মুগল রেকর্ডে 'আয়ালত' শব্দ দ্বারা বোধ হয় প্রথম সারির শাসিত সুবা বুঝানো হতো। আবুল ফজল *আইন-ই-আকবরীতে* বাংলাকে বরাবরই সুবা বলেছেন, কিন্তু '*আকবরনামায়* মাঝে মাঝে বাংলার জন্য 'আয়ালত' শব্দ ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়।[৪৪] তৃতীয়ত, আওরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষ পাদ থেকে বাংলার বাৎসরিক রাজস্ব মোটামুটি এক কোটি টাকা সম্রাটের জন্য বেশ স্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ফলে সম্রাটের কাছে সুবা বাংলার গুরুত্বও বৃদ্ধি পায়।

প্রথম মুগল বিজয়ের সময় বাংলার রাজধানী ছিল তাঁড়ায়। প্রতিকূল আবহাওয়ার দরুন ঐতিহাসিক রাজধানী গৌড় (সুলতানি আমলের লখনৌতি) আগেই পরিত্যক্ত হয়। মুগল সেনাপতি মুনিম খান খানান তবুও কিছুদিন গৌড়ে অবস্থান নেন। কিন্তু ঐ এলাকা মহামারীতে আক্রান্ত হয়। এতে অনেক সৈন্যক্ষয় হয় এবং মুনিম খান নিজেও মৃত্যুবরণ করেন।[৪৫] খান জাহান এবং তাঁর সেনাপতিরা তাঁড়ায় অবস্থান নেন এবং যুদ্ধ পরিচালনা করেন। কিন্তু ১৫৯৫ সালে রাজা মানসিংহ তাঁড়া থেকে রাজধানী রাজমহলে সরিয়ে নেন। আবুল ফজল বলেন যে, মানসিংহ বাংলায় এসে রাজধানী স্থাপনের জন্য এমন একটি স্থানের কথা চিন্তা করেন যা নৌ-আক্রমণ থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থিত এবং তিনি

৪১. *বাহরিস্তান*, ২য় খণ্ড, ৬৩৪।

৪২. আহমদ বেগ খান ছিলেন নূরজাহান এবং ইবরাহিম খান ফতেহজঙ্গ উভয়েরই ভ্রাতুষ্পুত্র।

৪৩. I. H. Qureshi, *The Administration of the Mughal Empire*, (Patna 1979), 228, note 7

৪৪. আবুল ফজল, *আকবরনামা*, ৩য় খণ্ড, মূল ফার্সি, ২৬৬। বেভেরিজ অনুবাদ করেছেন government (*আকবরনামা*, ৩য়, ৩৬৮), সুতরাং অনুবাদ থেকে মূল শব্দটি বোঝা যাবে না।

৪৫. মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে মুনিম খান তাঁড়ায় ফিরে আসেন, কিন্তু মাত্র দশ দিন পরে ১৫৭৫ সালের ২৩ অক্টোবর তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। *আকবরনামা*, ৩য়, ২২৬।

আকমহল (রাজমহল)-কে নির্বাচিত করেন। শীঘ্রই এখানে একটি সুন্দর শহর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মানসিংহ এর নাম দেন 'আকবরনগর'।[৪৬] কিন্তু রাজমহল নৌ-আক্রমণ থেকে মোটেই নিরাপদ ছিল না,কারণ রাজমহলও নদীর তীরে অবস্থিত। তবে আবুল ফজলের ভাষায় রাজমহল 'কিছুটা নিরাপদ' ছিল, কারণ ভাটি থেকে রাজমহলের দূরত্ব অনেক। রাজধানী সরাবার আসল কারণ বোধহয় এই যে, মানসিংহ হয় বাংলায় বিদ্রোহীদের মাঝে অবস্থান করতে সাহস করেন নি, না হয় বাংলার আবহাওয়া তিনি পছন্দ করেন নি।[৪৭] কিন্তু ইসলাম খান চিশতী আবার সামরিক কারণে রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় স্থানান্তর করেন। ঢাকা প্রায় একশত বছর ধরে রাজধানীর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকে। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে প্রথমে শাহ শুজা এবং পরে শাহজাদা আজিমউদ্দিন যথাক্রমে রাজমহলে ও পাটনায় অবস্থান নেন। শাহ শুজা ঢাকায় 'বড় কাটরা' নামে খ্যাত একখানি বিরাট প্রাসাদ নির্মাণ করেন, কিন্তু তিনি রাজমহলে চলে গেলে এই প্রাসাদ[৪৮] কাটরারূপে ব্যবহৃত হতে থাকে। সম্রাটের অনুমতি নিয়েই শুজা রাজমহলে যান[৪৯]। কিন্তু তিনি রাজমহলেও সন্তুষ্ট ছিলেন না, তাঁর রাজমহলে বসবাসের স্মৃতি সুখকর ছিল না।[৫০] তিনি পাটনার কিছু অংশ তাঁকে দেয়ার জন্য সম্রাটকে অনুরোধ জানান, কিন্তু তাঁর অনুরোধ রক্ষা করা হয় নি। শাহজাদা আজিমউদ্দিন (আজিম-উশ-শান) ১৭০৩ সালে ঢাকা ত্যাগ করে পাটনায় অবস্থান নেন। দু'জনেই রাজনৈতিক কারণে ঢাকা ত্যাগ করেন। শাহ শুজা পিতার মৃত্যুর পর দিল্লীর সিংহাসনের প্রতি লালায়িত ছিলেন, সুতরাং রাজধানীর কাছাকাছি থাকাই তিনি শ্রেয় মনে করেন। আজিমউদ্দিন দীউয়ান মুর্শিদকুলী খানের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়েন। মুর্শিদকুলী খান (তখন তাঁর উপাধি ছিল কারতালাব খান) সম্রাটের খুবই বিশ্বাসভাজন ছিলেন। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে দীউয়ানি পরিচালনা করেন। অন্যদিকে আজিমউদ্দিনের দৃষ্টি ছিল অর্থ-সম্পদের দিকে। তিনি জানতেন যে, তাঁর পিতামহ আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারের যুদ্ধ অনিবার্য এবং এই যুদ্ধে তাঁর পিতার[৫১]

৪৬. *আকবরনামা*, ৩য়, ১০৪২-৪৩।

৪৭. মানসিংহের আগে বাংলায় ৩ জন সুবাদার (মুনিম খান, খান জাহান এবং উজির খান) স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন এবং ১ জন (মুজাফফর খান তুরবতী) নিহত হন। একজন সুবাদার ভগে (খান আজম) বাংলায় আসেন নি। মানসিংহও বাংলায় তাঁর দুই পুত্রকে হারান, একজন দুর্জন সিংহ বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হন এবং অন্যজন হিম্মত সিংহ কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। তাছাড়া বহিরাগত অনেকেই বাংলার আবহাওয়া পছন্দ করতো না, এমন অনেক প্রমাণ আছে।

৪৮. বহিরাগত অস্থায়ী ব্যবসায়ীদের (travelling merchants) থাকার স্থানকে কাটরা বলা হতো।

৪৯. *HB* II, ৩২৪ সম্রাটের চিঠি দ্রষ্টব্য। স্যার যদুনাথ সরকার সম্রাটের চিঠির অনুবাদ করে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, কিন্তু চিঠির উৎস তিনি উল্লেখ করেন নি। এই চিঠিতে দুটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রথমত, এতে বোঝা যায়, মুগল সম্রাট বা কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন স্থানের অবস্থান সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত থাকতেন; দ্বিতীয়ত, সম্রাট সুবাগুলির সুশাসনের দিকে লক্ষ্য রাখতেন।

৫০. Sarkar (ed.), *History of Bengal*, 334

যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন হবে। এই জন্য তিনি অর্থলোভী হয়ে পড়েন এবং যেভাবে পারেন টাকা আদায় করতে থাকেন, এমনকি 'সওদা-ই-খাস' নামে একচেটিয়া ব্যবসা শুরু করেন। ফলে মুর্শিদকুলী খানের সঙ্গে তাঁর বিরোধ বাধে, কারণ মুর্শিদকুলী খান তাঁর সকল অপকর্ম সম্পর্কে সম্রাটকে অবহিত করেন। সম্রাট সুবাদার আজিমউদ্দিনকে পাটনায় অবস্থান নিতে আদেশ দেন এবং মুর্শিদকুলী খানকে মকসুদাবাদে দীউয়ানি স্থানান্তরের অনুমতি দেন। ফলে ১৭০৩ সালে দীউয়ানি অফিসসমূহ মকসুদাবাদে স্থানান্তরিত হয়। মুর্শিদকুলী খানের নামানুসারে মকসুদাবাদের নাম হয় মুর্শিদাবাদ। পরে মুর্শিদকুলী খান নিজে সুবাদার নিযুক্ত হলে তিনি আর ঢাকা ফিরে যান নি, মুর্শিদাবাদই অবশেষে প্রাদেশিক রাজধানীতে পরিণত হয়।

সুবা বাংলার চারটি রাজধানীর প্রত্যেকটিই নদীর তীরে অবস্থিত—রাজমহল গঙ্গার তীরে, তাঁড়া ও মুর্শিদাবাদ গঙ্গার ভাগীরথী শাখার তীরে এবং ঢাকা বুড়িগঙ্গার তীরে অবস্থিত। নৌ-পথে যাতায়াতের সুবিধা এই স্থানগুলিতে রাজধানী স্থাপনের প্রধান কারণ। নৌকাই ছিল মধ্যযুগে বাংলায় যোগাযোগেব প্রধান উপায়। নৌয়ারা বা নৌবাহিনীর যৌক্তিকতা আগেই বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় কারণ ছিল বাণিজ্যিক সুবিধা। মধ্যযুগে প্রধানত নৌকার সাহায্যে বাণিজ্যিক পণ্য পরিবহন করা হতো। তাই একদিকে ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র ছাড়া যেমন শহর গড়ে উঠে না, তেমনি ব্যবসা-বাণিজ্য ও ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং শুল্ক আদায়ের জন্য রাজধানী নদীর তীরে অবস্থিত থাকা বাঞ্ছনীয় ছিল। ইসলাম খান চিশতীর সময় ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তরের সামরিক গুরুত্ব আগেই আলোচনা করা হয়েছে। মুর্শিদকুলী খানের সময় অর্থাৎ আঠারো শতকের প্রথম থেকে ঢাকার তুলনায় মুর্শিদাবাদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। প্রথমত, এই সময় উড়িষ্যার দীউয়ানি ও সুবাদারি মুর্শিদকুলী খানের দায়িত্বে অর্পিত হয়। ফলে ঢাকার অবস্থান বাংলা ও উড়িষ্যা সংযুক্ত প্রদেশের এক প্রান্তে পড়ে যায়। মুর্শিদাবাদ ছিল দুই প্রদেশের মধ্যবর্তী স্থানে। মুর্শিদাবাদ থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে উড়িষ্যার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত শাসন করা সহজতর হয়ে উঠে। দ্বিতীয়ত, সতেরো শতকের শেষে এবং আঠারো শতকের প্রথম দিকে ইউরোপীয় বণিক কোম্পানিগুলির বাণিজ্যকুঠি ভাগীরথী নদীর তীরে হুগলী বন্দরের সন্নিকটে স্থাপিত হয়। দেশের বহির্বাণিজ্য অনেক বৃদ্ধি পায়, এবং দেশে ইউরোপীয় ও অন্যান্য দেশের বণিকদের আমদানিকৃত অভাবিতপূর্ব সম্পদ কাঁচা সোনা ও রূপার আকারে প্রবেশ করতে থাকে। অর্থনৈতিক কারণে (এবং প্রতিরক্ষার কারণেও) এই কোম্পানিগুলির ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অন্যান্য কর্মকাণ্ডের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। মুর্শিদাবাদ হুগলী বন্দর এবং ইউরোপীয় কুঠিগুলির কাছাকাছি অবস্থিত। ঢাকার তুলনায় মুর্শিদাবাদ থেকে তাদের নিয়ন্ত্রণ করা অনেক সহজ ছিল। সুতরাং প্রশাসনিক প্রয়োজনেই রাজধানী স্থানান্তরিত হলো। বিশেষত মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থানান্তর মুর্শিদকুলী খানের দূরদৃষ্টির পরিচায়ক।

---

৫১. তাঁব পিতা শাহজাদা মুয়াজ্জম, পবে সম্রাট শাহ আলম বাহাদুর শাহ আওবঙ্গজেবেব মৃত্যুব পর উত্তরাধিকারের যুদ্ধে আজিমউদ্দিনের পিতা জয়লাভ করেন, কিন্তু তাঁর পিতাব মৃত্যুব পব উত্তরাধিকাবেব যুদ্ধে তিনি (আজিমউদ্দিন) তাঁব বড় ভাই জাহান্দবেব কাছে পবাজিত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন.

সুবা এবং সুবার প্রশাসনিক কাঠামোর রূপরেখা উপরে বর্ণিত হয়েছে। আকবর তাঁর রাজত্বের ২৪তম বছরে সর্বপ্রথম সাম্রাজ্যকে সুবায় বিভক্ত করেন এবং ঐ সময়েই বাংলা একটি সুবায় পরিণত হয়। সুবাগুলির জন্য এক রকম প্রশাসনিক কাঠামো প্রবর্তিত হয়। তবে সুবা বাংলার জন্য কোন পৃথক কাঠামো ছিল না। প্রত্যেক সুবায় একজন সিপাহসালার (বা সুবাদার বা নাজিম), একজন দীউয়ান, একজন বকশী, একজন সদর, একজন কাজি, একজন কোতওয়াল, একজন মীর বাহর এবং একজন ওয়াকিয়ানবিশ-এর পদ সৃষ্টি করা হয়। *আইন-ই-আকবরীতে* পৃথক পৃথক আইনে এদের প্রত্যেকের দায়িত্ব ও কর্তব্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে।[৫২] তাছাড়া কর্মকর্তাদের অবগতির জন্য মাঝে মাঝে কেন্দ্রীয় সরকার নীতিমালা প্রণয়ন করে কর্মকর্তাদের কাছে পাঠাতো, এগুলিকে বলা হতো দস্তুর-উল-আমল (administrative manual) বা প্রশাসনিক আইন-কানুন। *আইন-ই-আকবরীতে* প্রদত্ত আইনসমূহ পাঠে দেখা যায় যে, দেশের সুশাসন, কৃষির উন্নতি, কৃষকদের উৎসাহ দান, নতুন নতুন ভূমি কৃষিযোগ্য করা এবং রাজস্ব বৃদ্ধির প্রতি মুগল সম্রাটের সজাগ দৃষ্টি ছিল। প্রাদেশিক শাসনের শীর্ষে ছিলেন প্রাদেশিক শাসনকর্তা। তাঁকে আকবরের সময়ে 'সিপাহসালার', সতেরো শতকে 'সুবাদার' (বা সংক্ষেপে সুবা) এবং আওরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষদিকে 'নাজিম' বলা হতো। মুগল শাসনের শেষ পর্যন্ত নাজিম শব্দটিই চালু থাকে, যদিও সুবাদার শব্দটি কোন সময় একেবারে বাদ যায় নি। এই পদবিগুলি তাৎপর্যবহ। 'সিপাহসালার' মানে সেনাপতি। মুগল শাসনের প্রথমদিকে রাজ্য জয় করা এবং সম্রাটের অধীনে রাখাই ছিল সিপাহসালারের প্রাথমিক দায়িত্ব। সেই সময়ে সেনাপতিত্বই ছিল তাঁর প্রধান ভূমিকা। তিনি রাজ্য শাসন করতেন, কিন্তু এই ভূমিকা ছিল গৌণ, রাজ্য থাকলে তো রাজ্য শাসন। এই কথাটি বিশেষকরে বাংলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সুবাব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার পর পদবিরও পরিবর্তন হয় এবং তা সুবাদার-এ পরিণত হয়। সুবাদার অর্থ সুবার রক্ষক বা শাসক। কিন্তু 'নাজিম' পদবিই প্রাদেশিক শাসনকর্তার প্রকৃত পরিচয় বহন করে। 'নাজিম' শব্দের অর্থ কার্যনির্বাহক, অর্থাৎ 'নাজিম' ছিলেন নির্বাহী কর্মকর্তা; সামরিক ও বেসামরিক উভয় ক্ষেত্রেই তিনি প্রদেশ বা সুবার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ছিলেন। 'নাজিম' শব্দের মধ্যে শাসন এবং সুষ্ঠু শাসনের একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে সুবাদারেরা সম্রাটের 'নায়েব' বা প্রতিনিধিরূপে সুবা শাসন করতেন। বাংলায় তাঁরা নওয়াব (নায়েব শব্দের বহুবচন) নামে পরিচিত ছিলেন। ইউরোপীয়রা শেষ পর্যন্তও তাঁকে সুবাদার (সংক্ষেপে সুবা) এবং নেবব (নওয়াব) রূপে অভিহিত করতো। এতে মনে হয়, মুগল সরকারি দলিলপত্রে 'নাজিম' পদবি প্রবর্তিত হওয়ার পরও জনগণের কাছে তাঁরা সুবাদার বা নওয়াব নামেই পরিচিত ছিলেন। সম্রাটের পক্ষে সুবাদার প্রদেশ বা সুবা শাসন করতেন এবং সুবার সাধারণ শাসন, প্রতিরক্ষা এবং ফৌজদারি বিচারের ভার তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল। প্রদেশের সাধারণ তত্ত্বাবধানের ভারও সুবাদারের হাতে ন্যস্ত ছিল।

---

৫২. *আইন*, ২য়, ৩৭-৫২

সুবাদার নিযুক্তির পর সম্রাট নিজে সুবাদারকে তাঁর পদের বিশিষ্ট চিহ্ন বা তক্‌মা (insignia of office) পরিয়ে দিতেন এবং উপযুক্ত সম্মান ও উপহারাদি সহকারে কর্মস্থলে পাঠিয়ে দিতেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে সুবাদারকে তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে উপদেশ সম্বলিত লিপি (instrument of instructions) দিয়ে দিতেন। *আইন-ই-আকবরী* এবং বিভিন্ন ফরমানে প্রাপ্ত তথ্যে এসম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। এই উপদেশাবলীকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় :

(১) এতে সুবাদারের দায়িত্ব, কর্তব্য, ক্ষমতা, অধিকার ও সীমাবদ্ধতা লিপিবদ্ধ থাকতো।

(২) এতে সুবাদারের কার্যপ্রণালী, তাঁর ব্যক্তিগত ও সরকারি ক্ষমতার ব্যবহার, চালচলন এবং আচার-আচরণ সম্পর্কে বিশেষ উপদেশ থাকতো।

(৩) এতে সুবাদারের অধীনস্থ কর্মকর্তাদের সুবাদারের প্রতি অনুগত থাকার এবং সুবাদারের কাজে সহযোগিতা করার আদেশ-নিষেধ ও উপদেশ লিপিবদ্ধ থাকতো।

এই উপদেশাবলী সংক্ষেপে নিম্নরূপ[৫৩] :

প্রথমে শাসন ব্যাপারে সম্রাটের নীতি ও আদর্শ ব্যক্ত করে সেই নীতি ও আদর্শ বাস্তবায়নে নবনিযুক্ত সুবাদারের যোগ্যতা ও গুণাগুণ বর্ণনা করা হয়। এর পরেই সুবাদারের দায়িত্ব ও কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়। এতে বলা হয় যে, সেনাবাহিনী ও জনগণ সুবাদারের আদেশ ও নির্দেশের অধীন এবং তাদের সকলের কল্যাণও সুবাদারের ন্যায়বিচারের উপর নির্ভরশীল; তাই কোন কারণেই, কোন অবস্থাতেই সুবাদার জনগণের উন্নতি ও অগ্রগতির ব্যাপারে উদাসীন থাকতে পারবেন না। সুবাদারের কর্তব্য ও দায়িত্ব ছিল ব্যাপক এবং এগুলি ছিল জনগণের উন্নতি, অগ্রগতি এবং অধীনস্থ কর্মকর্তাদের কাজের তদারকির সঙ্গে সম্পৃক্ত। এতে ন্যায়বিচার ও বিচারকাজ দ্রুত সম্পন্ন করার উপর এবং জনগণকে হয়রানি না করার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। বিচার করার সময় শুধু সাক্ষী ও শপথের উপর নির্ভর না করে সরেজমিনে তদন্ত করার উপদেশ দেয়া হয়। আরও বলা হয় যে, শাস্তি দেয়ার সময় সুবাদারের উদার ও ক্ষমাশীল হওয়া উচিত। বলা হয় যে, কোথায় সামান্য তিরস্কার শাস্তির চেয়ে বেশি কার্যকর হবে তা সুবাদারকে পরখ করতে হবে। অন্যান্য সব ব্যবস্থা ব্যর্থ হলেই শুধু অপরাধীকে আঘাত করা, শৃঙ্খলিত করা বা হাতকড়া দেয়া যেতে পারে। সাধারণভাবে সুবাদার কাউকে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারবেন না; তিনি কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার উপযুক্ত মনে করলে ঘটনার সম্পূর্ণ বিবরণ সম্রাটের কাছে পাঠাতে হবে এবং সম্রাটের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে তিনি বাধ্য থাকবেন। কিন্তু সুবাদার সাম্রাজ্যের স্বার্থের তাগিদে কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যুক্তিযুক্ত মনে করলে এবং মৃত্যুদণ্ড দিতে দেরি হলে সাম্রাজ্যের সমূহ ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে তখনই কেবল মৃত্যুদণ্ড দিতে পারবেন, কিন্তু সব ক্ষেত্রেই সম্রাটকে তা অবহিত করতে হবে।

---

৫৩. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, P. Saran, *Provincial Government*, 178-79

সুবাদার কোন সময়, কোন অবস্থাতেই সম্রাটের অনুকরণে আচার-আচরণ করতে পারবেন না, যেমন সম্রাটের অনুকরণে দরবারে বসা, ঝারোকা দর্শন দেয়া, উচ্চ আসনে বসা, সৈন্যদের সালাম গ্রহণ করা, অন্ধ করা বা বিকলাঙ্গ করার মতো শাস্তি দেয়া, হাতি খেলা উপভোগ করা, অধীনস্থ কর্মকর্তাদের কুর্নিশ বা সিজদা দিতে বাধ্য করা এবং বাইরে গেলে বাদ্য বাজানো সুবাদারের জন্য নিষিদ্ধ ছিল।

সুবার শাসনে সুবাদারের নীচেই ছিল দীউয়ানের স্থান। ইতিহাসে দীউয়ান শব্দটির অর্থ ও তাৎপর্য ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। অর্থ ও প্রয়োগে দীউয়ান-এর মতো আর কোন শব্দের এত পরিবর্তন দেখা যায় না। আব্বাসী খেলাফতে দীউয়ান দ্বারা একটি প্রশাসনিক বিভাগ বা বর্তমান মন্ত্রণালয়কে বুঝাতো। দিল্লীর সুলতানি আমলেও দীউয়ান শব্দটি এই একই অর্থে ব্যবহৃত হতো। মুগল আমলে দীউয়ান প্রশাসনিক বিভাগ বা মন্ত্রণালয়কে না বুঝিয়ে রাজস্ব বিভাগের উজির বা মন্ত্রীকেই শুধু বুঝাতো। অনুরূপভাবে কেন্দ্রে যেমন দীউয়ান ছিলেন, তেমনি প্রদেশ বা সুবায়ও রাজস্ব বিভাগীয় কর্তাকে দীউয়ান বলা হতো। পরে অবস্থা এমন হয় যে, সম্পত্তি বা জাগির ইত্যাদির রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মকর্তাকে দীউয়ান বলা হতে থাকে। এমন কি কালক্রমে জমিদারগণও দীউয়ান নিযুক্ত করতে থাকেন।

সুবায় সুবাদারের নীচে দীউয়ানের স্থান হলেও দীউয়ান সুবাদারের অধীনস্থ ছিলেন না। সুবাদারের মতো দীউয়ানও কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হতেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দায়ী থাকতেন। দীউয়ান ছিলেন প্রাদেশিক রাজস্ব ও অর্থ বিভাগের কর্তা; কৃষি উন্নয়ন এবং কৃষকদের উন্নতি বিধানের দায়িত্বও ছিল দীউয়ানের। যেহেতু রাজস্বব্যবস্থা প্রাথমিকভাবে ভূমির সঙ্গে সম্পৃক্ত, সেহেতু দীউয়ান গ্রাম থেকে রাজধানী পর্যন্ত সকল স্তরের শাসন বিভাগের (administrative unit) সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং এই বিশাল কর্মকাণ্ডের জন্য তাঁর অধীনে অনেক কর্মকর্তা ও কর্মচারী ছিল। বিভিন্ন প্রকারের ভূমিরেকর্ড দীউয়ানের অফিসে সংরক্ষিত হতো। দীউয়ানি বিচারের দায়িত্বও ছিল দীউয়ানের উপর ন্যস্ত। সঙ্গত কারণেই সদরের কাজের উপর দীউয়ানের কিছু তদারকির অধিকার ছিল। পরে দেখা যাবে যে, প্রাদেশিক সদরের সুপারিশক্রমে আলেম, সুফি ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের ভূমি দান করা হতো। সুতরাং ভূমির সঙ্গে সম্পৃক্ত বিষয়গুলি দীউয়ানের গোচরে আনা হতো। সাধারণ প্রশাসন এবং রাজস্ব ও অর্থ প্রশাসন পৃথকীকরণ মুগল শাসনব্যবস্থার এক উজ্জ্বল দিক।

সুবাদারের মতো দীউয়ানের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কেও উপদেশাবলী (instrument of instructions) দেয়া হতো। এতে দেখা যায় যে, দীউয়ান কৃষি উন্নয়নের জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করবেন, কোষাগারের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন এবং যথাযথ অনুমোদন ছাড়া কোষাগার থেকে কোন অর্থ কেউ নিতে পারবে না। সম্রাটের অনুমোদন ছাড়া কোন

অতিরিক্ত কর, সেচ, আবওয়াব ইত্যাদি আরোপ করা নিষিদ্ধ করা হয়, দীউয়ানকে এই বিষয়ে বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখার আদেশ দেয়া হয়। রাজস্ব সংক্রান্ত হিসাব সংরক্ষণ, নিরীক্ষণ এবং আমিলদের কার্যকলাপের প্রতি দৃষ্টি রাখাও দীউয়ানের কর্তব্য ছিল। কোন আমিল কর্তব্যে অবহেলা করলে বা দুর্নীতিপরায়ণ হলে তাকে অপসারণের সুপারিশ করার দায়িত্ব ছিল দীউয়ানের। আমিলের অবহেলায় কোন এলাকায় রাজস্ব অনাদায়ী থাকলে সহজ কিস্তিতে শতকরা পাঁচ ভাগ হারে তা আদায় করার জন্য দীউয়ানকে নির্দেশ দেয়া হতো। তকবী (কৃষিঋণ) যথাযথভাবে আদায় করাও দীউয়ানের কর্তব্য। তাছাড়া রাজস্ব সংক্রান্ত নানা ব্যাপারে দীউয়ানকে উপদেশ দেয়া হতো। যেসকল রেকর্ডপত্র বা দলিল-দস্তাবেজ দীউয়ানের দপ্তরে সংরক্ষণ করা হতো এবং যেসকল দলিল-দস্তাবেজ প্রাদেশিক দীউয়ানকে কেন্দ্রীয় দীউয়ানের কাছে পাঠাতে হতো, তার ফিরিস্তি দেখেই দীউয়ানের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়।[৫৪] দীউয়ানের দপ্তরে নিম্নরূপ দলিল সংরক্ষণ করা হতো :

(১) প্রশাসনিক বিভাগসমূহ (নিজামত) সম্পর্কে কাগজপত্র, খালসা বিভাগীয় রাজস্বের দলিলপত্র, খতিয়ান ইত্যাদি, রাজস্ব নির্ধারণ, রাজস্ব আদায় এবং রাজস্ব আদায়ের খরচপত্রের হিসাব-নিকাশ সম্বলিত রোজনামচা ও আওয়ারিযা।[৫৫]

(২) জাগির মহালের রেকর্ড এবং বিভিন্ন কর্মকর্তার বেতন-ভাতার হিসাব-নিকাশ। এই রেকর্ডে প্রত্যেক পরগনা বা মহালের রাজস্ব, সাইর[৫৬] ইত্যাদির হিসাবপত্রও থাকতো।

(৩) প্রত্যেক পরগনায় কূয়ার হিসাব।

(৪) ইনাম[৫৭], গ্রাম-মাতব্বর, কানুনগো, মুকদ্দমের কমিশনের হিসাবপত্র (নিরিখনামা-ই-আজনাস)। সাইর মহালের রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়ের হিসাবপত্র এবং এগুলির রোজনামচা।

৫৪. ঐ, ১৭৮-৭৯। এটি পাঠে জানা যায় মুগল শাসনব্যবস্থা কত ব্যাপক ও বিস্তৃত ছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এসব রেকর্ড বা দলিলপত্র আমাদের হস্তগত না হওয়ায় এ বিষয়ে আধুনিক গবেষকদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত।

৫৫. রোজনামচা—দৈনিক আয়ব্যয়ের হিসাব; আওয়ারিযত—বিবরণসহ দেনাপাওনার হিসাবপত্র, স্থিতিপত্র বা ব্যালেন্সশীট।

৫৬. সাইর : রাজস্ব দুই ভাগে বিভক্ত ছিল—মাল ও সাইর; ভূমিরাজস্বকে মাল বলা হতো, কিন্তু ভূমিরাজস্ব ছাড়া অন্য সব প্রাপ্যকে এক সঙ্গে সাইর বলা হতো। সাইর-এর মধ্যে ছিল—বহির্বাণিজ্যের আমদানি-রপ্তানির উপর শুল্ক, অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যপণ্যের উপর শুল্ক, টাকশালের আয়, ব্যাঙ্কার বা সুদী ব্যবসায়ীদের উপর আরোপিত কর, কর্মকর্তা, জমিদার এবং অন্যদের দেয় পেশকাশ, নজরানা, সালামি ইত্যাদি।

৫৭. ইনাম শব্দের অর্থ পুরস্কার, ভূমি দান করলে বলা হতো *মদদ-ই-মাআশ* বা জীবিকাভাতা; মুগল আমলে ভূমি দানের জন্য সয়ূরগাল শব্দ ব্যবহৃত হতো, তবে *মদদ-ই-মাআশ* শব্দও পাওয়া যায়। সাধারণত আলেম, সুফি ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের *ইনাম* বা *মদদ-ই-মাআশ* দিয়ে পুরস্কৃত করা হতো।

প্রাদেশিক দীউয়ানের দফতর থেকে কেন্দ্রীয় দীউয়ানের দপ্তরে নিম্নরূপ তওয়ামির বা ফাইলগুলি পাঠানো হতো :

(১) বর আসদ— এগুলি আমিলরা তৈরি করতো এবং এতে থাকতো সকল খরচপত্রের পরে সরকারের নীট আয়ের হিসাব।

(২) বরখাস্তকৃত ও নতুনভাবে নিযুক্ত আমিলদের তালিকা।

(৩) জামানত সংক্রান্ত সার্টিফিকেট।

(৪) আওয়ারিযা (স্থিতিপত্র বা ব্যালেন্সশীট) এবং মুতাসিবা বা আমিল, জমিদার এবং মনসবদারদের কাছ থেকে প্রাপ্য অর্থের হিসাব।

(৫) বার্ষিক আদায়ী এবং অনাদায়ী রাজস্বের হিসাব।

(৬) পরগনা থেকে আমিল ও অন্যদের বিভিন্ন সময়ে বা বিভিন্ন বিষয়ে পেশকৃত দরখাস্তসমূহ।

(৭) আমিল বা অন্যান্যদের পরওয়ানা বা অন্যান্য দলিলপত্রের নকল।

(৮) দানকৃত সম্পত্তির ফরমান, প্রধান সদরের চিঠিপত্র, দানকৃত সম্পত্তির তালিকা ও বিবরণ, ফরমান লাভকারী লোকদের মৃত্যু হলে তাদের সম্পত্তির হিসাব।

(৯) কোষাগারের রোজনামচা বা দৈনিক আদান-প্রদানের হিসাব।

(১০) মনসবদারদের তালিকা, মনসবদার ও আজাদী সৈন্যদের বার্ষিক, মাসিক এবং দৈনিক বেতন ও তাদের আদান-প্রদানের হিসাব-নিকাশ।

(১১) টাঁকশালের হিসাব-নিকাশ।

(১২) প্রাদেশিক দীউয়ান এবং মহাফেজখানার হিসাব-নিকাশ।

প্রাদেশিক বকশী কেন্দ্রীয় বকশী বা মীর বকশী (বা বকশী-উল-মুল্ক) দ্বারা নিযুক্ত হতেন। বকশীর কাজ ছিল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সৈন্যবাহিনী তদারক করা। মনসবদাররা তাঁদের মনসবের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেন কিনা তা দেখার দায়িত্বও ছিল বকশীর। মনসবদারদের নির্দিষ্ট সংখ্যক ঘোড়া ও সৈন্য রাখতে হতো। সুতরাং ঘোড়ার দাগ দেওয়ার দায়িত্বও বকশীর উপর অর্পিত ছিল। কোন জাগিরদার মৃত্যুবরণ করলে বকশী তাঁর জাগিরের কর্তৃত্ব গ্রহণ করতেন। বকশীর অনুমতি ছাড়া কোন মনসবদার তাঁর কর্মস্থল ত্যাগ করতে পারতেন না। এক কথায় সৈন্য বিভাগের তদারকিই ছিল বকশীর প্রধান কাজ।

সদরের দায়িত্ব ছিল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানাদি তদারক করা এবং আলেম, সুফি ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের পুরস্কার ও জীবিকা-ভাতা দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সদরের কাছে সুপারিশ করা। অত্যন্ত জ্ঞানী ও ধর্মপরায়ণ লোকদের এই পদে নিয়োগ করা হতো। পুরস্কারপ্রাপ্ত ও সম্পদপ্রাপ্ত লোকদের তালিকা তাঁর কাছে থাকতো। দানকৃত সম্পদের ব্যাপারে তিনি দীউয়ানের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন।

কাজি বিচারের দায়িত্বে নিযুক্ত থাকতেন। কোন কোন সময় একই ব্যক্তি কাজি ও সদর উভয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করতেন। কাজি নিযুক্তি লাভের পরে তাঁর পূর্ববর্তী কাজির কাছ থেকে দলিলপত্র গ্রহণ করতেন। এই দলিলগুলি থাকতো সম্পত্তি, এতিম, বিয়ে-শাদি ও উত্তরাধিকার বিষয়ক। নতুন কাজি দায়িত্ব নেয়ার পরই কয়েদিদের খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য আদিষ্ট হতেন এবং কয়েদিদের পুনর্বিচার করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হতেন। কাজি সাধারণত মসজিদে বা তাঁর নিজের বাসস্থানে বিচারকাজ সমাধা করতেন। তাই বিচার হতো খোলামেলা। কাজি নিজের নিকট-আত্মীয় ছাড়া কারো কাছ থেকে কোনরূপ উপহার বা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারতেন না। কাজিকে ফরিয়াদি ও আসামি উভয় পক্ষের প্রতি সমান ব্যবহার করতে হতো। এমনকি তিনি কারও প্রতি উদারতা দেখাতে পারতেন না। সাক্ষীদেরও কাজি সাহায্য করতে পারতেন না। বিচারালয়ে যাওয়ার সময়েও তাঁর পদমর্যাদার দিকে লক্ষ্য রাখতে হতো। প্রদেশ বা সুবায় যেমন কাজি নিযুক্ত হতেন, সরকার ও পরগনায়ও তেমনি কাজি নিযুক্ত হতেন এবং সুবার কাজির মতো সরকার ও পরগনার কাজিরও একই ধরনের দায়িত্ব ছিল। তবে স্মরণ রাখা দরকার যে, কাজির কর্মক্ষেত্র ছিল ধর্মীয় এবং সিভিল বা বেসামরিক বিচারাদিতে সীমাবদ্ধ, ফৌজদারি ও দীউয়ানি বিচার যথাক্রমে সুবাদার ও দীউয়ানের উপর ন্যস্ত ছিল।

নিম্নলিখিত কাজগুলিও কাজির দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল[৫৮] :

(১) মামলা-মোকদ্দমার বিচার ও মীমাংসা করা;

(২) মামলার রায় বাস্তবায়ন করা;

(৩) পাগল ও অপ্রাপ্তবয়স্ক, যারা স্বীয় সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে না, তাদের সম্পত্তির অভিভাবক নিযুক্ত করা (Court of Wards);

(৪) ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি নির্বাহ করা এবং তত্ত্বাবধান করা;

(৫) উইল সম্পাদন করা এবং কাজে পরিণত করা;

(৬) বিধবাবিবাহের দায়িত্ব নেয়া;

(৭) শরীয়ত-আইন অনুসারে শাস্তি বাস্তবায়ন করা;

(৮) রাস্তা ও ইমারতের তত্ত্বাবধান করা যাতে কেউ অননুমোদিত বাড়িঘর তৈরি করে এগুলির ক্ষতি সাধন করতে না পারে (কোতওয়ালের দায়িত্বের মধ্যেও তা পাওয়া যায়);

(৯) বিচারালয়ের নিম্নপদস্থ কর্মকর্তাদের কাজ তদারক করা, যাদের কাজি নিজে নিযুক্ত ও বরখাস্ত করতে পারতেন;

(১০) যেখানে জাকাত ও ছদকা আদায়ের জন্য কোন পৃথক কর্মকর্তা থাকতো না, সেখানে কাজিকে ঐ দায়িত্বভার নিতে হতো।

৫৮. P Saran, *Provincial Government*, 321

তথ্যের অভাবে বিচার বিভাগের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা দুষ্কর। তাছাড়া ধর্মীয় ও বিচার বিভাগের জন্য চারজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার নাম পাওয়া যায়, যেমন কাজি, সদর, মীর আদল এবং মুফতি। *আইন-ই-আকবরীতে* কাজি ও মীর আদল সম্পর্কে আলোচনায় দেখা যায় যে, কাজি ও মীর আদল-এর দায়িত্ব ও কর্তব্য প্রায় একই রকম—একজন আরেক জনের সম্পূরক বা পরিপূরক। মীর আদল যে বিচার বিভাগেই নিযুক্ত হতেন তা *আইন-ই-আকবরীতেই* জানা যায়। এতে বলা হয়েছে : "If capacity and vigour are not to be found united, he should appoint two persons, one to investigate whom they call as Qazi, the other the Mir Adl to carry out his finding."[৫৯] সুতরাং মীর আদলকে কাজির সহায়ক কর্মকর্তা বলে মনে হয়। সদরের সঙ্গে বিচার বিভাগের কোন সম্পর্ক ছিল না। সদরের দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন, এর সঙ্গে কাজির দায়িত্ব ও কর্তব্যের কোন মিল নেই। মুফতি ইসলামী আইনে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি। যদুনাথ সরকার বলেন :

> The qazi was the chief judge in criminal suits, and tried them according to Muslim Law... assisted by a mufti, who consulted the old Arabic books on jurisprudence and stated the abstract law bearing the case, the qazi pronounced the sentence[৬০]

কিন্তু মুফতিকে নিয়মিতভাবে নিযুক্ত কোন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা বলে মনে হয় না। কাজি প্রয়োজন মনে করলে কোন বিশেষজ্ঞের (যাদের মুফতি বলা হয়ে থাকে) সাহায্য নিতে পারতেন। পি. সারন বলেন :

> He (Mufti) was a sort of unofficial legal referee recognised by public opinion ..Any one who was, by common agreement, ranked among the learned, recognised to be an authority on religious law, was called a mufti. His assistance was sought in all cases coming within the pale of religion on which the law was not clear to the judges of the court, and the mufti's duty was only to state the law applicable to the case under reference.[৬১]

অতএব কাজি, মুফতি ও আদল বিচার বিভাগের সঙ্গে সম্পৃক্ত; কাজি তদন্তকাজে, মুফতি আইন ব্যাখ্যায় এবং মীর আদল বিচারের রায় প্রদানের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার যে, বিচার বিভাগে কাজির নাম যেমন সর্বক্ষেত্রে পাওয়া যায়, তেমন মীর আদল বা মুফতির নাম সর্বক্ষেত্রে পাওয়া যায় না, কদাচিৎ দেখা যায় মাত্র।

৫৯. *আইন*, ২য়, ৪৩।

৬০. J N Sarkar, *Mughal Administration*, 2nd edition, (Calcutta 1963), 26

৬১. P Saran, *Provincial Government*, 325-326

কোতওয়াল কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হতেন। তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল শহরে। *আইন-ই-আকবরীতে* কোতওয়াল-এর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে একটি পৃথক আইন লিপিবদ্ধ আছে।[৬২] এতে বলা হয় যে, এমন লোক কোতওয়াল নিযুক্ত হবেন যে দক্ষ, অভিজ্ঞ, ধৈর্যশীল এবং উদার। শান্তি রক্ষাই কোতওয়ালের প্রধান দায়িত্ব। কোতওয়ালের অন্যান্য কাজও শান্তি রক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই জন্য কোতওয়ালকে শহরে পাহারা দেয়ার, বিশেষ করে রাত্রে পাহারা দেয়ার ব্যবস্থা করতে হতো। কোতওয়ালকে বর্তমান কালের পুলিশের সঙ্গে তুলনা করা যায়। তাঁকে শহরের সকল গৃহের তালিকা এবং রাস্তা-ঘাটের খবরাখবর রাখতে হতো। এছাড়াও চুরি-ডাকাতি বন্ধ করা, শহরের পরিবেশদূষণ বন্ধ করা, সামাজিক দুর্নীতি বন্ধ করা এবং সতীদাহ নিবারণ করা কোতওয়ালের দায়িত্ব ছিল। উত্তরাধিকারীবিহীন সম্পত্তির যত্ন নেয়া এবং সুষ্ঠুভাবে তা বিলি করা, কবরস্থান, শ্মশান ও কসাইখানা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করা এবং এগুলির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখাও কোতওয়ালের দায়িত্ব ছিল। শহরে নতুন আগমনকারী এবং শহর থেকে বহির্গমনকারীদের তালিকা রাখাও কোতওয়ালের দায়িত্ব ছিল। বাজার নিয়ন্ত্রণও কোতওয়ালের দায়িত্ব ছিল। বাজারের লোকেরা ওজন ঠিক রাখে কিনা, মূল্য স্থিতিশীল রাখে কিনা, স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রার মূল্য ঠিক রাখে কিনা ইত্যাদি দেখার দায়িত্বও ছিল কোতওয়ালের। এমনকি, বেকারদের জন্য কর্মসংস্থানের দায়িত্বও ছিল কোতওয়ালের। এসব কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য কোতওয়ালের অধীনে প্রয়োজন মতো কর্মচারী থাকতো। শহরের বাইরে মাঝে মাঝে থানা প্রতিষ্ঠা করা হতো। থানার প্রাথমিক দায়িত্ব ছিল গ্রামে শান্তি রক্ষা করা।[৬৩]

মীর বাহর ছিলেন নৌবাহিনীর অধ্যক্ষ। মীর বাহর প্রধানত সামরিক কারণে নিযুক্ত হতেন। তাঁর কোন প্রশাসনিক ক্ষমতা ছিল না। বাংলায় ভৌগোলিক কারণে নৌবাহিনীর গুরুত্ব অনেক বেশি ছিল এবং মুগলরা শেষ অবধি নৌয়ারা প্রতিষ্ঠান বহাল রাখে।

ওয়াকিয়ানবিশ শব্দের অর্থ সংবাদ বা ঘটনার লেখক। দিল্লীর সম্রাটগণ প্রদেশের বা প্রত্যন্ত অঞ্চলের খবরাখবর নেয়ার জন্য বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। সুলতানি আমলেও এরকম সংবাদ সংগ্রহের ব্যবস্থা ছিল। তবে সুলতানি আমলে সংবাদ সংগ্রাহকদের বলা হতো বরীদ। মুগল আমলে তাদের ওয়াকিয়ানবিশ এবং পরে সওয়ানিহনবিশ, খুপিয়ানবিশ ইত্যাদি নানা নামে অভিহিত করা হতো। এই পদ সৃষ্টি করার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল প্রদেশ বা সুবার বিভিন্ন কর্মকর্তার কার্যকলাপ সম্পর্কে গোপনে সংবাদ সংগ্রহ করা, যাতে কোন কর্মকর্তা বেআইনী কাজে লিপ্ত হলে বা কর্তব্য পালন করার সময় সীমা লঙ্ঘন করলে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যায়।

৬২. *আইন*, ২য়, ৪৩-৪৫।

৬৩. P Saran, *Provincial Government*, 335

ওয়াকিয়ানবিশ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে অবস্থান নিয়ে ঐ দফতরসমূহের কাজ এবং দপ্তরের কর্তাগণ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে বকশীর কাছে পাঠাতেন এবং বকশী এই সব সংবাদ গ্রন্থিত করে কেন্দ্রীয় দপ্তরে পাঠাতেন। কিন্তু পরে গোপন সংবাদ সংগ্রাহক নিযুক্তির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়ায় সওয়ানিহনবিশ (বা খুপিয়ানবিশ, খুপিয়া শব্দের অর্থ গোপন) নামে সংবাদ সংগ্রাহক পদের সৃষ্টি করা হয়। তারা গোপনে বিভিন্ন দপ্তরের সংবাদ সংগ্রহ করতো, এমনকি প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে সংবাদ সংগ্রহ করে কেন্দ্রে পাঠাতো। কিন্তু কালক্রমে প্রকৃত কর্মপদ্ধতিতে দেখা যায় যে, এই গোপন সংবাদ সংগ্রাহকরাও তাদের সংবাদ গোপন রাখতে পারতো না। তখন হরকারো নামে আর একটি গোপন তথ্যসংগ্রাহকের পদ সৃষ্টি করা হয়। এভাবে ওয়াকিয়ানবিশ, সওয়ানিহনবিশ (বা সওয়ানিহনিগার বা খুপিয়ানবিশ) এবং হরকারো এই তিন প্রকার সংবাদসংগ্রাহকের পদ সৃষ্টি করা হয়। এর একটি সুফলও ছিল—তিনটি পৃথক পৃথক প্রতিবেদন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পৌঁছতো এবং কেন্দ্রীয় সরকার তিনটিই পরখ করে প্রকৃত তথ্য বের করার সুযোগ পেতো। সংবাদসংগ্রাহকদের স্বাধীনভাবে তথ্য সরবরাহ করার সুযোগ থাকায় কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বানোয়াট বা মিথ্যা সংবাদ সরবরাহে তারা বাধাস্বরূপ কাজ করতো। মুগল আমলের শেষদিকে এই সমস্ত সংবাদসংগ্রাহকের পরিচিতি দাঁড়িয়ে যায় আখবারনবিশ বা সংবাদলেখক হিসেবে।

মুগল বাংলার শাসনকাঠামো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বাংলার শাসনের প্রতি সম্রাট বরাবর সতর্ক ও সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। সুলতানি আমল থেকে বাংলা একটি বিদ্রোহী প্রদেশ নামে পরিচিত ছিল। বাংলার প্রাদেশিক শাসনকর্তারা (প্রথমে মুকতা, পরে ওয়ালী এবং আরো পরে হাকিম নামে অভিহিত) সুযোগ পেলেই দিল্লীর সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতো। জিয়াউদ্দিন বরানী বাংলায় বারবার বিদ্রোহের তিনটি কারণ নির্দেশ করেন : (১) দিল্লী থেকে বাংলার দূরত্ব, (২) বাংলার বিস্তীর্ণ আয়তন এবং (৩) যাতায়াত, যোগাযোগ এবং সংবাদ আদান-প্রদানের অসুবিধা। এই কারণে বরানী বাংলাকে বলগাকপুর বা বিদ্রোহী অঞ্চল নামে অভিহিত করেন।[৬৪] আবুল ফজলও বাংলাকে বলগাকখানা বলে অভিহিত করেন।[৬৫] প্রাক-মুগল যুগে দিল্লীর কোন কোন সুলতান এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন। সুলতান শামসউদ্দিন ইলতুতমিশ লখনৌতি রাজ্যকে (তখন বাংলা নামের প্রচলন হয় নি, বাংলা লখনৌতি রাজ্য নামে পরিচিত ছিল) দুই ভাগে ভাগ করে দুই জন শাসনকর্তা (মুকতা) নিযুক্ত করেন। সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক সুশাসনের জন্য বাংলাকে তিন ভাগে ভাগ করেন--লখনৌতি, সাতগাঁও ও সোনারগাঁও এবং প্রত্যেক বিভাগের জন্য পৃথক পৃথক শাসনকর্তা নিয়োগ করেন।[৬৬] সুলতান মুহাম্মদ

৬৪. জিয়াউদ্দিন বরানী, *তারিখ-ই-ফিরুজশাহী*, মূল ফার্সি, (কলকাতা ১৮৬২), ৮২।

৬৫. *আকবরনামা*, ৩য়, ২৫৬।

৬৬. জিয়াউদ্দিন বরানী, *তারিখ-ই-ফিরুজশাহী*, ৪৫৪।

বিন তুঘলকও এই ব্যবস্থা বহাল রাখেন। কিন্তু তবুও তাঁর সময়েই (অবশ্য সাম্রাজ্যের সকল দিকে বিশৃঙ্খলার কারণে) বাংলা স্বাধীন হয়ে যায়। শের শাহ আরো এক ধাপ অগ্রসর হন। তিনি প্রথমে খিজির খানকে বাংলার শাসনকর্তা (হাকিম) নিযুক্ত করেন। কিন্তু খিজির খান শের শাহ কর্তৃক পরাজিত সৈয়দ বংশীয় সুলতান গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহের মেয়েকে বিয়ে করেন, চৌকীতে (উচ্চ মঞ্চ) বসা শুরু করেন এবং বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপ চালাতে আরম্ভ করেন। শের শাহ এই সংবাদ পেয়ে তাড়াতাড়ি বাংলায় এসে খিজির খানকে পদচ্যুত করেন এবং বাংলার শাসনকাঠামোর বিকেন্দ্রীকরণ করেন। তিনি সারা বাংলাকে কয়েকটি জাগিরে বিভক্ত করে অনেক জাগিরদার নিযুক্ত করেন। তিনি কাজি ফজিলত নামের এক জন জ্ঞানী ব্যক্তিকে সকল জাগিরদারের উপরে আমিন নিযুক্ত করেন। কিন্তু আমিনের কোন শাসনক্ষমতা ছিল না। জাগিরদারদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে আমিন তা মীমাংসা করতেন।[৬৭] সুতরাং শেব শাহের বাংলা শাসনে বিকেন্দ্রীকরণ সম্পূর্ণ হয়। যদিও শের শাহ এর পরে বাংলায় আর কোন সময় আসেন নি, তবু তাঁর জীবিতাবস্থায় বাংলায় আর কোন বিদ্রোহও হয় নি। শের শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ইসলাম শাহ পুনরায় বাংলাকে একক শাসনে আনয়ন করে তাঁর স্বগোত্রীয় এবং নিকট-আত্মীয় মুহাম্মদ শাহ সূরকে বাংলার শাসনকর্তা (হাকিম) নিযুক্ত করেন। ইসলাম শাহের মৃত্যুর পর কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতা এবং অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে মুহাম্মদ শাহ সূরের অধীনে বাংলা আবার স্বাধীন হয়ে যায়।[৬৮]

মুগল সম্রাটরাও বাংলার বিকেন্দ্রীকরণ করেন নি, বরং সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশের ন্যায় বাংলাকেও একটি একক সুবার মর্যাদা দেন। কিন্তু মুগল সম্রাট এবং কেন্দ্রীয় সরকার সুবাদারদের কার্যকলাপের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে এবং সম্রাটের নিকট জনকে বিশ্বস্ত সুবাদার নিযুক্ত করে পূর্বোক্ত সমস্যার সমাধান করেন। মুগলদের এই সমাধান বেশ ফলপ্রসূ হয়। অত্যন্ত উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন (মনসবদার) সেনাপতিকেই বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করা হতো। বাংলায় নিযুক্ত সুবাদারদের অনেকেই সম্রাটের নিকট-আত্মীয় বা অন্যভাবে সম্রাটের পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন। তিনজন যুবরাজ (শাহ শুজা, শাহজাদা আজম খান এবং শাহজাদা আজিমউদ্দিন) বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন। আকবরের সময় সুবাদার (তখন সিপাহসালার) খান আজম মির্জা আজিজ কোকা আকবরের দুধভাই ছিলেন। আকবর প্রায়ই বলতেন যে, খান আজম ও তাঁর মধ্যে দুধের নদী প্রবাহিত।[৬৯] রাজা মানসিংহ বৈবাহিক সূত্রে আকবরের আত্মীয় ছিলেন। আকবর তাঁকে ফরজন্দ (ছেলে) উপাধি দেন। জাহাঙ্গীরের আমলে বাংলার প্রথম সুবাদার কুতুবউদ্দিন খান কোকা ছিলেন শয়েখ সলীম চিশতীর দৌহিত্র এবং জাহাঙ্গীরের খেলার সাথী। ইসলাম খান চিশতী ছিলেন শয়েখ সলীম চিশতীর পৌত্র, জাহাঙ্গীরের সমবয়সী এবং জাহাঙ্গীর তাঁকে ফরজন্দ

---

৬৭. M. A. Rahim, *The History of the Afghans in India*, (Karachi 1961), 164; *HB* II, 177

৬৮. Rahim, ঐ, 165; *HB* II, 179

৬৯. আবুল ফজল, *আইন-ই-আকবরী*, ১ম খণ্ড, হেনরি ব্লখম্যান কর্তৃক ইংরেজিতে অনূদিত, ৩৪৩-৪৪।

(ছেলে) ডাকতেন। জাহাঙ্গীরের সময় শয়েখ সলীম চিশতীর পরিবার সম্রাটের পরিবারের সঙ্গে বিশেষভাবে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ ছিল।[৭০] ইসলাম খান চিশতী ও কাশিম খান চিশতীর সুবাদারি আমলে শয়েখ সলীম চিশতীর আত্মীয়রা সুবা বাংলার বিভিন্ন পদে নিযুক্ত হন, ফলে তাদের প্রভাব বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। আবার কাশিম খান চিশতীকে অযোগ্যতার অপরাধে অপসারণ করা হলে বাংলার শাসনে চিশতীদের প্রভাব লোপ পায়। কাশিম খানের স্থলে নূরজাহানের ভাই ইবরাহিম খান ফতেহজঙ্গকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করা হয়। এই সময় আবার বাংলার শাসন ব্যাপারে নূরজাহানের পরিবার ও আত্মীয়দের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। শাহজাহানের রাজত্বের প্রথমদিকে কয়েকজন ইরানী মনসবদার বাংলার সুবাদারি লাভ করেন। মনে হয়, শাহজাহানের শ্বশুর এবং প্রধান উজির আসফ খানের প্রভাবেই তাঁরা নিযুক্তি লাভ করেন। অবশ্য তাঁরা নিজেরাও সুবাদার হিসেবে অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দেন। এর পরেই আসেন যুবরাজ শাহ শুজা। তিনি আওরঙ্গজেব কর্তৃক বিতাড়িত হওয়া পর্যন্ত একটানা বিশ বছর বাংলার সুবাদার ছিলেন। আওরঙ্গজেবের আমলের প্রথম সুবাদার মীর জুমলা সম্রাটের অত্যন্ত বিশ্বস্ত ছিলেন। অল্পদিন পর তাঁর মৃত্যু হলে আওরঙ্গজেব তাঁর মাতুল শায়েস্তা খানকে সুবাদার নিযুক্ত করে বাংলায় পাঠান। শায়েস্তা খান কয়েক জন পুত্র নিয়ে বাংলায় আসেন এবং পুত্রদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করেন।[৭১] দুই কিস্তিতে শায়েস্তা খান চব্বিশ বছর বাংলার সুবাদার ছিলেন। মাঝে তাঁর অনুপস্থিতিকালে সুবাদার হয়ে আসেন যুবরাজ মুহাম্মদ আজম। তিনি এক বছরের কিছু বেশি সময় বাংলায় ছিলেন। শাহজাদা আজিমউদ্দিন (আজিম-উশ-শান) বাংলার সুবাদার ছিলেন প্রায় পনেরো বছর। সুতরাং দেখা যায় যে, জাহাঙ্গীরের সিংহাসন লাভ থেকে শাহ আলম বাহাদুর শাহের মৃত্যু পর্যন্ত (১৬০৫-১৭১২ খৃঃ) একশত সাত বছরের মধ্যে যুবরাজেরা সুবাদার ছিলেন প্রায় ছত্রিশ বছর, সম্রাটের মাতুল সুবাদার ছিলেন প্রায় চব্বিশ বছর, সম্রাটের শ্যালক (ইবরাহিম খান ফতেহজঙ্গ) সুবাদার ছিলেন প্রায় সাত বছর। শয়েখ সলীম চিশতীর পৌত্র ও দৌহিত্র সুবাদার ছিলেন প্রায় দশ বছর একুনে মোট সাতাত্তর বছর; বাকি ২৯/৩০ বছর যাঁরা সুবাদার ছিলেন তাঁদেরও কেউ কেউ কোন না কোনভাবে সম্রাটের পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন। মুগল সম্রাটদের এই নীতি যে অত্যন্ত শুভ হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। সারা মুগল আমলে কোন সুবাদার সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে এমন কোন প্রমাণ নেই। সুবাদার ইবরাহিম খানের সময় (১৬৮৯-১৬৯৮ খৃঃ) শোভা সিংহ ও রহিম খান আফগানের বিদ্রোহ এবং মুর্শিদকুলী খানের সময় সীতারাম জমিদারের বিদ্রোহ ছিল মুগল সম্রাটদের জন্য অতি তুচ্ছ ব্যাপার। তাদের বিদ্রোহ দৃঢ়ভাবে দমন করা হয়।[৭২]

---

৭০. জনশ্রুতি আছে যে, শয়েখ সলীম চিশতীর দোয়ায় যুবরাজ সেলিম (জাহাঙ্গীব)-এর জন্ম হয়। তাই দুই পরিবারের বন্ধুত্ব অতি ঘনিষ্ঠ ছিল।

৭১. এই বিদ্রোহ এবং পরিণতির জন্য দেখুন, *MQK*. ১-২; ৪৯-৫৩।

৭২. ঐ, ২১৪-১৫।

এখানে স্মরণ রাখা দরকার যে, মুগল সম্রাটরা যুবরাজ এবং নিকট-আত্মীয়দের মাধ্যমে সুবা বাংলা শাসন করলেও যুবরাজ বা নিকট-আত্মীয়দের কার্যকলাপের প্রতি তাঁরা সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন, আত্মীয়তা তাঁদের কর্তব্য থেকে বিচ্যুত করতে পারে নি। সুবাদারদের বিরুদ্ধে অযোগ্যতা ও দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেলে সম্রাট সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নিতেন। জাহাঙ্গীরের সময় সুবাদার ইসলাম খান চিশতী সারা বাংলাদেশ (চট্টগ্রাম ছাড়া) মুগল অধিকারে আনার পর এতই দাম্ভিক হয়ে পড়েন যে, তিনি সম্রাটের অনুকরণে সম্রাটের বিশেষ অনুষ্ঠানাদি (prerogatives) নিজে করতে থাকেন। তিনি সামরিক কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন, ঝরোকার মতো উচ্চ আসন তৈরি করেন এবং অধস্তন কর্মকর্তাদের নীচ থেকে তাঁর প্রতি সালাম জানাতে এবং কুর্নিশ করতে আদেশ দেন। যেসব উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা তাঁর আদেশ অমান্য করেন তাঁদের তিনি বন্দি করার আদেশ দেন।[৭৩] জাহাঙ্গীর খবর পেয়ে ইসলাম খানের প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট হন। পারিবারিক ও ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব সত্ত্বেও জাহাঙ্গীর ইসলাম খানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেন। সম্রাট অন্য একটি কারণে ইসলাম খানের মনসব কমিয়ে দেন।[৭৪] তিনি ইসলাম খানের স্থলে সুজাত খানকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন। কিন্তু ইসলাম খানের সৌভাগ্যবশত সুজাত খান দুর্ঘটনায় মারা গেলে তিনি এই অপমান থেকে রক্ষা পান। সম্রাট একখানি ফরমান পাঠিয়ে ইসলাম খানকে রাজকীয় বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ থেকে নিবৃত্ত করেন।[৭৫] অবশ্য অল্প দিনের মধ্যে ইসলাম খান মৃত্যুমুখে পতিত হন। সম্রাট জাহাঙ্গীর ইসলাম খানের ভাই এবং পরবর্তী সুবাদার কাশিম খান চিশতীকে প্রথমে মগদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভের মিথ্যা সংবাদ সরবরাহ করার অভিযোগে তিরস্কার করেন।[৭৬] পরে অধস্তন কর্মকর্তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার অভিযোগে তিনি তিরস্কৃত হন।[৭৭] সবশেষে জাহাঙ্গীর কাশিম খানকে অযোগ্যতার অপরাধে পদচ্যুত করেন।[৭৮] এক্ষেত্রে পারিবারিক বন্ধুত্ব বা ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব সম্রাটকে কর্তব্যচ্যুত করতে পারে নি। শাহজাদা শুজা পিতার কাছে বারবার আবদার করেও পাটনার কিছু অংশ তাঁর সুবাদারিভুক্ত করতে পারেন নি। আওরঙ্গজেব তাঁর মাতুল শায়েস্তা খানকেও রেহাই দেন নি। শায়েস্তা খানের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ ছিল।[৭৯] তাই সম্রাট তাঁকে প্রত্যাহার করে নেন। গোলাম হোসেন সলীমের মতে, শায়েস্তা খানের বিরুদ্ধে অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয় এবং সম্রাট শায়েস্তা খানকে পুনরায় বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করে

৭৩. *এই ফরমানের পাঠ মির্জা নাথনের বাহরিস্তানে* পাওয়া যায় (*বাহরিস্তান*, ১ম খণ্ড, ২১৩-১৪)।

৭৪. *বাহরিস্তান*, ১ম খণ্ড, ৩৭৪-৭৫।

৭৫. ঐ, ৩৭৬।

৭৬. ঐ, ৪১৯।

৭৭. সাকী মুস্তাদ খান, *মাসির-ই-আলমগীরী*, স্যার যদুনাথ সরকার কর্তৃক অনূদিত, ১৭০,২৩৪।

৭৮. গোলাম হোসেন সলীম, *রিয়াজ-উস-সালাতীন*, আকবরউদ্দিন কর্তৃক *বাংলার ইতিহাস* নামে বাংলায় অনূদিত, (ঢাকা ১৯৭৮),১৭৬।

৭৯. *HB* II, 394

পাঠান।[৮০] শোভা সিংহ ও রহিম খান আফগানের বিদ্রোহের সময় নিষ্ক্রিয় থাকার অপরাধে সুবাদার ইবরাহিম খানকে পদচ্যুত করা হয়।[৮১] আওরঙ্গজেব তাঁর পৌত্র সুবাদার আজিমউদ্দিনের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। আজিমউদ্দিন ঢাকায় এসে 'সওদা-ই-খাস' নাম দিয়ে ব্যবসা শুরু করেন এবং দীউয়ান মুর্শিদকুলী খানের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন। আওরঙ্গজেব এ সংবাদ পেয়ে আজিমউদ্দিনকে তিরস্কার করেন এবং তাঁকে ঢাকা ত্যাগ করে পাটনায় অবস্থান নেয়ার আদেশ দেন। সুতরাং আওরঙ্গজেবের মৃত্যু পর্যন্ত মুগল সম্রাট এবং কেন্দ্রীয় সরকার সুবা বাংলার শাসনের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতেন এবং কঠোরভাবে প্রাদেশিক কর্মকর্তাদের কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করতেন।

মুগল আমলে প্রত্যেক সুবাকে কয়েকটি সরকারে এবং প্রত্যেক সরকারকে কয়েকটি পরগনা বা মহালে বিভক্ত করা হয়। *আইন-ই-আকবরী*তে সুবা বাংলাকে উনিশটি সরকারে এবং প্রত্যেক সরকারকে বেশ কতগুলি পরগনা বা মহালে বিভক্ত করার কথা উল্লেখ আছে। পরগনা বা মহালই ছিল শাসনের সর্বনিম্ন ইউনিট বা এলাকা। অবশ্য গ্রামে পঞ্চায়েত ছিল। পঞ্চায়েত ছিল জনগণের দ্বারা গঠিত এবং জনগণের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের কাজে নিয়োজিত। কিন্তু পঞ্চায়েত রাজস্ব আদায়ে এবং রাজস্বের ব্যাপারে ছোটখাটো বিরোধ নিষ্পত্তিতে সরকারি কর্মকর্তাদের সহায়তা দিলেও এবং মুগল শাসনে পঞ্চায়েত স্বীকৃত হলেও পঞ্চায়েত মুগল শাসনকাঠামোর অংশ ছিল না। সুবা বাংলার প্রশাসনিক সরকারের নাম পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রধান শহরের নাম অনুসারে সরকারের নামকরণ করা হয় এবং সরকারের সীমানা নির্ধারণেও ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক সীমারেখার প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয়। সরকারের শাসনকাঠামোও সুবার অনুকরণেই তৈরি হয়েছিল, যেমন—সাধারণ ও সামরিক শাসনকর্তা ছিলেন ফৌজদার; রাজস্ব ও অর্থবিভাগীয় কর্মকর্তা ছিলেন আমলগুজার; কাজি ও কোতওয়াল পদবির কর্মকর্তাও সরকারে ছিলেন। সরকার নামটি পূর্ব থেকে, বিশেষ করে আফগান সুলতানদের আমল থেকে চালু ছিল। কিন্তু ফৌজদার ও আমলগুজার পদবি মুগলদের সৃষ্টি। শের শাহের আমলে সরকারের শাসন বিভাগীয় কর্মকর্তা ছিলেন 'সিকদার-ই-সিকদারান' (প্রধান সিকদার) এবং রাজস্ব বিভাগীয় কর্মকর্তা ছিলেন 'মুনসিফ-ই-মুনসিফান' (প্রধান মুন্সিফ)। *আইন-ই-আকবরীতে* ফৌজদার ও আমলগুজারের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে পৃথক পৃথক আইন সন্নিবেশিত হয়েছে।[৮২] ফৌজদারের কর্তব্য ও দায়িত্ব ছিল (১) সাধারণ শাসন, (২) রাজস্ব এবং (৩) শান্তিরক্ষা বা পুলিশী ও সামরিক দায়িত্ব এবং আমলগুজারের কাজ ছিল দীউয়ানের অনুকরণে রাজস্ব আদায় করা। ফৌজদারের রাজস্ব সংক্রান্ত দায়িত্ব ছিল শুধু অনাদায়ী রাজস্ব আদায়ে আমলগুজারকে সহায়তা করা। কিন্তু ফৌজদারের প্রধান দায়িত্ব ছিল সরকারের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং জমিদার-

৮০. *আইন*, ২য়, ৪১-৪২; ৪৬-৫০।

৮১. *বাহরিস্তান*, ১ম খণ্ড, ৪; P Saran, 181, টীকা নং ৮৫।

৮২. উপরে ৮০ এবং ৮১ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

জাগিরদারদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা। পরগনাই ছিল মুগল শাসনের সর্বনিম্ন কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইউনিট। যেহেতু রাজস্ব বা অর্থ যেকোন সরকারের (গভর্নমেন্ট অর্থে) ধারক ও রক্ষক এবং রাজস্ব ও অর্থপ্রাপ্তির উৎসও ছিল পরগনা বা মহাল, সেহেতু পরগনা শাসনের গুরুত্বও ছিল সমধিক। শের শাহের সময়ে সিকদার, আমিন ও কানুনগো ছিলেন পরগনার প্রধান কর্মকর্তা। অবশ্য তাঁরা খাজনাদার (কোষাধ্যক্ষ), পাটওয়ারি এবং আরো অনেক কর্মচারীর সাহায্য লাভ করতেন। মুগল আমলেও এই পদবিগুলি বহাল ছিল। সিকদারের প্রধান দায়িত্ব ছিল পরগনার সাধারণ শাসন ও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং আমিনকে রাজস্ব আদায়ে সাহায্য করা। আমিনের দায়িত্ব ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ কৃষি ও কৃষকদের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। ভূমি পরিমাপ করা, জরিপ করা, রাজস্ব নির্ধারণ করা এবং আদায় করা সবগুলিই প্রাথমিকভাবে আমিনের দায়িত্ব ছিল। আগেই বলা হয়েছে, প্রত্যেক সরকার ও পরগনায়, বিশেষত শহরে কাজি ও কোতওয়ালও নিযুক্ত হতেন। এই সব ইউনিটে ওয়াকিয়ানবিশও (বা সওয়ানিহ্নবিশ বা খুপিয়ানবিশ) নিযুক্ত থাকতেন। সিকদারের কর্তব্য যথাযথভাবে পালনের সুবিধার্থে পরগনায় প্রয়োজনমতো থানাও স্থাপিত হয়। সুতরাং মুগল প্রাদেশিক শাসনকাঠামোকে আড়াআড়িভাবে দুই ভাগে ভাগ করা যায় : ১. সাধারণ ও সামরিক শাসন—সুবাদার, বকশী, ফৌজদার ও সিকদার; ২. রাজস্ব প্রশাসন—দীউয়ান, আমলগুজার ও আমিন। অন্যদের দায়িত্ব ছিল তাদের দায়িত্বের পরিপূরক। মীর বাহর, কোতওয়াল, সদর, কাজি, ওয়াকিয়ানবিশ স্ব স্ব নির্ধারিত কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করতেন।

আগেই বলা হয়েছে যে, সুবাদাব ও দীউয়ান উভয়ে স্ব স্ব দায়িত্ব পালনে স্বাধীন ছিলেন, কেউ কারো অধীনে ছিলেন না। ফলে সুবাদারি ও দীউয়ানি বিভাগের কর্মকর্তারাও স্ব স্ব দায়িত্বে স্বাধীন ছিলেন। মুগল শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতার ভাগাভাগি বা সুবাদারি ও দীউয়ানি কর্মকর্তাদের স্বাধীনতার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল—(১) ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ এবং (২) সুবাদার কর্তৃক ক্ষমতা কুক্ষিগত করা বা অর্থ আত্মসাৎ করার বিরুদ্ধে ব্যবস্থাগ্রহণ। এই ব্যবস্থার কুফলও যে ছিল না তা নয়। এই নিয়ে কোন কোন সময় সুবাদার ও দীউয়ানের মধ্যে মনোমালিন্যও ঘটতো। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার বা সম্রাট যতদিন কঠোর ছিলেন এবং দৃঢ়ভাবে শাসন পরিচালনা করতেন, ততদিন সুবাদার ও দীউয়ানের মধ্যে মনোমালিন্য প্রকট রূপ ধারণ করতে পারে নি বা প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থায় গোলযোগ সৃষ্টি হতে পারে নি। এরকম মনোমালিন্যের সংবাদ সম্রাটের গোচরীভূত হলে সম্রাট যথাযথ তদন্তের ব্যবস্থা করে কোন একজনকে বা উভয়কে শাস্তি দিতেন, এমনকি অপরাধীকে পদচ্যুত করতেন। সুবা বাংলায় এ ধরনের কয়েকটি প্রমাণ পাওয়া যায়। জাহাঙ্গীরের সময় ইসলাম খান চিশতীর সুপারিশে দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত দীউয়ান উজির খানকে প্রত্যাহার করা হয়।[৮৩] শায়েস্তা খানের সুবাদারি আমলে দীউয়ান সম্রাটের কাছে সংবাদ দেন যে, সুবাদার (শায়েস্তা খান) তাঁর কার্যকালে মোট এক কোটি বত্রিশ লক্ষ টাকা তাঁর পাওনার

৮৩. *HB* II, 402-405

অতিরিক্ত গ্রহণ করেছেন। শায়েস্তা খান দ্বিতীয় কিস্তিতে সুবাদার থাকাকালে দীউয়ান সম্রাটকে জানান যে, সুবাদার বায়ান্নো লক্ষ টাকা অতিরিক্ত খরচ করেছেন। শায়েস্তা খানকে এজন্য জবাবদিহি করতে হয়।[৮৪] দীউয়ান কারতালাব খানের (পরে মুর্শিদকুলী খান) রিপোর্টের ভিত্তিতেই আওরঙ্গজেব তাঁর পৌত্র ও সুবাদার আজিমউদ্দিনকে বাংলা ছেড়ে পাটনায় অবস্থান নিতে আদেশ দেন।[৮৫] অধিকাংশ সময় সুবাদার ও দীউয়ানের সম্পর্ক ভাল ছিল এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করেন। তবে আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরে মুগল কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল হয়ে পড়লে এবং দীর্ঘকাল সুবাদারের কর্মস্থলে অনুপস্থিতির ফলে দীউয়ানের ক্ষমতা বেড়ে যায়। পরে এমন হয় যে, একই ব্যক্তিকে সুবাদার ও দীউয়ান উভয় পদে নিযুক্ত করা হয়। ফলে সুবাদারি ও দীউয়ানি শাসন পৃথকীকরণের মুখ্য উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়।

সুবা বাংলাকে উপরোক্ত সরকার ও পরগনায় বিভক্তির বিবরণ, সরকার ও পরগনার নাম এবং প্রত্যেক পরগনায় নির্ধারিত রাজস্বের পরিমাণ *আইন-ই-আকবরীতে* বিস্তারিতভাবে পাওয়া যায়। একে বলা হয় 'টোডর মল্লের বন্দোবস্ত' এবং তা তৈরি করা হয় ১৫৮২ সালে। কিন্তু তখনো সারা বাংলা মুগল অধিকারে যায় নি। বাংলার বিস্তীর্ণ ও অধিকাংশ এলাকা মুগল কর্তৃত্বের বাইরে ছিল। টোডর মল্লের বন্দোবস্তে উল্লেখিত সরকার চাটগাঁও মুগল অধিকারে আসে বন্দোবস্তের চুরাশি বছর পর। সুতরাং প্রশ্ন উঠে, টোডর মল্লের বন্দোবস্তের ভিত্তি কি ছিল? আকবরের রাজস্ব নির্ধারণের নীতি ছিল (১) ভূমির মাপ ও আয়তন নির্ধারণ, (২) উর্বরাশক্তির প্রকারভেদে কর্ষিত ভূমির মূল্যায়ন এবং (৩) উৎপন্ন শস্যের এক-তৃতীয়াংশ রাজস্ব নির্ধারণ। স্বভাবতই এই ব্যবস্থার জন্য কৃষিভূমির আয়তন

৮৪. *MQK*, 74 মুকুন্দরাম তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে রাজস্ব বিভাগীয় কর্মকর্তা কর্তৃক প্রজাদের অত্যাচারের কথা নিম্নরূপে উল্লেখ করেন :

"উজীর হৈল রায়জাদা বেপারি-ক্ষত্রিয় খেদা
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে হৈল বৈরি
মাপে কোণে দিয়া দড়া পনর কাঠায় কুড়া
নাহি শুনে প্রজার গোহারি।
সরখেল হৈল কাল খিল ভূমে লিখে লাল
বিনি উপকারে খায় ধুতি
জোতদার হৈল যম তঙ্কায় আড়াই আনা কম
পাই লভ্য লয় তঙ্কা প্রতি।

এই কাব্য রচিত হয় ১৫৮৪ সালে আকবরের রাজত্বকালে। কিন্তু রাজস্বকর্মকর্তাদের অত্যাচার আকবরের সময়ের আগেই হয়। কারণ, রাজস্বকর্মকর্তাদের অত্যাচারে মুকুন্দরাম দেশত্যাগ করে অন্যত্র চলে যান এবং অনেক দিন পরে তাঁর কাব্য রচনা করেন। সুকুমার সেন মনে করেন যে, মুকুন্দরাম ১৫৪৪ খৃস্টাব্দের কিছুকাল পরে দেশত্যাগ করেন। সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ, ৫ম সংস্করণ (বর্ধমান সাহিত্য সভা ১৯৭০), ৫৩১, ৫৩৮।

৮৫. খালিসা অর্থ সরকারের প্রত্যক্ষ শাসনের অধীন এলাকা।

এবং উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ নির্ধারণই ছিল প্রাথমিক শর্ত। বাংলার অধিকাংশ এলাকা অনধিকৃত থাকায় টোডর মল্লের পক্ষে এর কোনটিই করা সম্ভবপর ছিল না।[৮৬] সুতরাং বাংলায় টোডর মল্লের বন্দোবস্তের ভিত্তি ছিল প্রকৃত আয়তন বা উৎপাদন নির্ধারণ নয়, অন্য কিছু। অর্থাৎ দৃঢ়ভাবেই বলা যায় যে, টোডর মল্ল পূর্বতন সরকারের দলিল বা রেকর্ডের ভিত্তিতেই বাংলায় ভূমি-বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলা যায় যে, উপরোক্ত সরকার এবং পরগনা বিভাগগুলিও পূর্বতন সরকারের দলিলের ভিত্তিতেই করা হয়। আগে বলা হয়েছে যে, দাউদ খান কররানীর মন্ত্রী শ্রীহরি মুগল সেনাপতি খান জাহান এবং টোডর মল্লের কাছে গোপন দলিলপত্র হস্তান্তর করেন। শ্রীহরি ছিলেন মন্ত্রী, তাঁর দুই পিতৃব্যপুত্রের একজন বসন্ত রায় ছিলেন দাউদ কররানীর সময় খালিসা বিভাগের কর্তা ও কোষাধ্যক্ষ (খাজানাদার), আর একজন শিবানন্দ ছিলেন কানুনগো দপ্তরের প্রধান কর্মচারী। সুতরাং টোডর মল্ল বাংলার রাজস্ব সংক্রান্ত যাবতীয় দলিলপত্র শ্রীহরি ও তাঁর পিতৃব্যপুত্রদের কাছ থেকে পান এবং এই দলিলপত্রই যে টোডর মল্লের ভূমি-বন্দোবস্তের ভিত্তি ছিল তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। সুতরাং মুগল প্রাদেশিক শাসনকাঠামোর মধ্যে একটা মিল ও ঐক্য রক্ষার চেষ্টা থাকলেও অন্তত রাজস্ব প্রশাসনে ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক কারণে বাংলায় একটি নিজস্ব ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। কাঠামোগতভাবে সকল সুবার মধ্যে মিল থাকলেও প্রকৃতিগতভাবে বাংলার ভূমিব্যবস্থায় যথেষ্ট অমিল ধরা পড়ে।

৮৬. সতীশচন্দ্র মিত্র, *যশোহর-খুলনার ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, (কলকাতা ১৩২৯ সন), ৮৩।



# পলাশী যুদ্ধ ও সিরাজউদ্দৌলা

সুশীল চৌধুরী*

প্রাক-ঔপনিবেশিক বাংলার ইতিহাসে সিরাজউদ্দৌলার স্বল্প সময়ের রাজত্বকাল (১০ এপ্রিল ১৭৫৬ থেকে ২৩ জুন ১৭৫৭) একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। পলাশীর যুদ্ধ (২৩ জুন ১৭৫৭) তরুণ নবাবের শুধু পতনই ঘটায় নি, এতে বাংলার স্বাধীন নবাবি আমলের অবসান ঘটে এবং সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের সূচনা হয়। প্রকৃতপক্ষে পলাশীর ঘটনাই ভারতবর্ষে ইংরেজ সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করে। কেবল বাংলায় ক্ষমতাসীন হবার পরেই ইংরেজরা পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন অঞ্চলে নিজেদের ক্ষমতা সম্প্রসারণের সুযোগ পায়। তখনকার প্রায়-সমসাময়িক একজন ফার্সী ঐতিহাসিক যথার্থই উপলব্ধি করেছিলেন যে, পলাশীর পরেই বাংলার প্রকৃত নিয়ন্ত্রণক্ষমতা ইংরেজদের হাতে চলে যায়।[১]

বহুদিন ধরে ঐতিহাসিক মহলে সিরাজউদ্দৌলা, পলাশী ও ইংরেজদের বাংলা বিজয় সম্বন্ধে কতগুলো বক্তব্য স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে চলে আসছে। এ বক্তব্যগুলো হলো—সিরাজ এতই দুর্বিনীত, দুশ্চরিত্র এবং নিষ্ঠুর ছিলেন যে তাতে রাজ্যের অমাত্যবর্গ শুধু নয়, সাধারণ মানুষ পর্যন্ত তাঁকে ঘৃণার চোখে দেখতো; ইংরেজ কোম্পানির সঙ্গে যে বিবাদ ও সংঘর্ষের পরিণতি হিসেবে সিরাজ বাংলার মসনদ পর্যন্ত হারালেন, তার জন্য প্রধানত দায়ী সিরাজউদ্দৌলাই; মীর জাফরই পলাশী চক্রান্তের নায়ক এবং তাঁর বিশ্বাসঘাতকতার জন্যই পতন হয়েছিল বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবির। আবার অধুনা অনেকের ধারণা,

---

* অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. Karam Ali, "Muzaffarnamah", tr. Jadunath Sarkar in *Bengal Nawabs*, (Calcutta 1952), 78

ইংরেজদের বাংলা বিজয় একটি 'আকস্মিক' ঘটনা, এর পেছনে ইংরেজদের কোন 'পূর্ব-পরিকল্পনা' ছিল না। পলাশী যুদ্ধের ব্যাখ্যা হিসেবে বলা হচ্ছে, সিরাজউদ্দৌলা নবাব হয়ে প্রভাবশালী শাসকগোষ্ঠীকে তাঁর প্রতি বিরূপ করে তোলার ফলে বাংলায় যে অভ্যন্তরীণ সঙ্কট দেখা দেয়, তার শেষ পরিণতিই পলাশী যুদ্ধ। ইংরেজদের বাংলা বিজয়ের যাথার্থ্য প্রমাণের চেষ্টায় সম্ভবত কোন কোন ঐতিহাসিক প্রাক-পলাশী বাঙালি সমাজের দ্বিধাবিভক্ত একটি চিত্রকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে খুবই সচেষ্ট। এঁদের বক্তব্য—পলাশী যুদ্ধের প্রাক্কালে বাংলার সমাজ প্রধানত দু'টি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে বিভক্ত ছিল। মুসলমান শাসকের নিপীড়নে নির্যাতিত সংখ্যাগুরু হিন্দু সম্প্রদায় মুসলমান নবাবের অধীনতা থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য কোন ত্রাণকর্তার প্রত্যাশায় অধীর হয়ে পড়েছিল এবং ইংরেজদের জানিয়েছিল সাদর অভ্যর্থনা।

উপরোক্ত বক্তব্যগুলো কতটা সঠিক এবং তথ্য ও যুক্তিনির্ভর, তার সূক্ষ্ম এবং নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ প্রয়োজন। সম্প্রতি ইউরোপের বিভিন্ন মহাফেজখানায় যেসব নতুন তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেছে, সেসবের পাশাপাশি আগের জানা তথ্য ও সমসাময়িক ফার্সী ইতিহাস ও বাংলা সাহিত্যের পুনর্বিচার করে সমগ্র বিষয়টির পুনর্মূল্যায়ন সম্ভব। বর্তমান আলোচনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখা যাবে, উপরের অধিকাংশ বক্তব্যই সঠিক নয়; বরং নির্ভরযোগ্য তথ্য দিয়ে বক্তব্যগুলোকে খণ্ডন করা যায়।

## বিচার্য বিষয়

আলোচনার সুবিধার্থে বিচার্য বিষয়গুলো পরিষ্কার করে বলা প্রয়োজন। প্রথমত, ঐতিহাসিকরা (এবং সমসাময়িক লেখকরাও বটে) একমত যে, নবাব হবার আগে তরুণ সিরাজউদ্দৌলা এতই নির্মম, নিষ্ঠুর এবং দুশ্চরিত্র ছিলেন যে, সবাই আলিবর্দী খানের পরে সিরাজের নবাব হওয়ার সম্ভাবনায় শঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। সিরাজের এই 'কদর্য' চরিত্র শুধু সাধারণ মানুষকে নয়, অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রায় সবাইকে সিরাজের প্রতি বিরূপ করে তুলেছিল। কাশিমবাজারের তদানীন্তন ফরাসী কুঠির প্রধান জঁা ল (Jean Law) লিখেছেন, "নবাব আলিবর্দী খানের মৃত্যুর আগে সিরাজ শুধু শ্লথচরিত্র ছিল না, অমানবিক নিষ্ঠুরতারও অনেক পরিচয় দিয়েছে।"[২]

দ্বিতীয়ত, অনেক ঐতিহাসিকের মতে, ইংরেজ কোম্পানির সঙ্গে নবাবের যে বিবাদ ও সংঘর্ষ হয়েছিল, তার জন্য সিরাজউদ্দৌলাই প্রধানত দায়ী। এ সংঘর্ষের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ঐতিহাসিক এস. সি. হিল (S.C. Hill) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে[৩] "নবাবের ক্ষমতাগ্রহণের উদ্দেশ্য বা কারণ" এবং "নবাবের প্রদর্শিত অজুহাতের" পার্থক্য চিহ্নিত

২. Law's Memoir, in S. C. Hill, *Bengal in 1756-57*, Vol. III, (London 1905) 62
৩. ঐ।

করেছেন। হিলের মতে, এই সংঘর্ষের কারণগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রধান হলো সিরাজউদ্দৌলার 'দম্ভ' (vanity) এবং 'অর্থলিপ্সা' (avarice)। ইংরেজদের বিরুদ্ধে সিরাজের অভিযোগ ছিল : ইংরেজরা ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গকে সংস্কার করে দুর্ভেদ্য করে তুলতে চেয়েছে, দস্তক বা রপ্তানিশুল্ক না দিয়ে বাণিজ্য করার যে বিশেষ সুবিধা ইংরেজ কোম্পানিকে দেয়া হয়েছিল তার যথেচ্ছ অপব্যবহার করেছে এবং নবাবের অপরাধী প্রজাদের কলকাতায় আশ্রয় দিয়েছে। হিল এসব অভিযোগকে ইংরেজদের আক্রমণ করার জন্য নবাবের 'মিথ্যা ছলনা' বলে উড়িয়ে দেন।[৪]

তৃতীয়ত, এ বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত যে, পলাশীতে মীর জাফরই আসল বিশ্বাসঘাতক। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সিরাজউদ্দৌলাকে হটিয়ে বাংলার মসনদ অধিকার করার মতলবে মীর জাফর ইংরেজদের সঙ্গে পলাশী-চক্রান্তে যোগ দিয়েছিলেন। বাংলায় মীর জাফর নামটাই বিশ্বাসঘাতকতার প্রতীক। এখনো এই নাম বিশ্বাসঘাতকের সমার্থক শব্দ।

আবার অতি সাম্প্রতিক লেখাতেও বলা হচ্ছে যে, ইংরেজদের বাংলা বিজয়ের কোন পরিকল্পনাই ছিল না, তারা নবাবকে হটানোর কথা নিজে থেকে ভাবেই নি। ইংরেজদের কার্যকলাপের পেছনে নাকি "রাজনৈতিক অভিসন্ধির চেয়ে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যই ছিল মূল প্রেরণা"। লব্ধপ্রতিষ্ঠ এক ঐতিহাসিক খুব সম্প্রতি লিখেছেন যে, প্রথমদিকে ইংরেজদের লক্ষ্য ছিল 'নিতান্তই সীমিত'; কিন্তু তারা যখন উপলব্ধি করলো যে, বাংলায় একটি বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী বর্তমান, তখন তাদের লক্ষ্য আস্তে আস্তে প্রসারিত হলো।[৫]

সবশেষে এবং একদিক থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রাক-পলাশী বাঙালি সমাজের দ্বিধাবিভক্ত চিত্র। কোন কোন ঐতিহাসিকের বক্তব্য, পলাশী যুদ্ধের প্রাক্কালে বাংলার সমাজ হিন্দু এবং মুসলমান এই সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দ্বিধাবিভক্ত ছিল। মুসলমান নবাবের অত্যাচারে জর্জরিত সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা মুক্তি চাইছিল মুসলমান শাসন থেকে এবং তাই তারা ইংরেজদের স্বাগত জানাতে ছিল প্রস্তুত। এ মতবাদের প্রধান প্রবক্তা এস. সি. হিল। ইংরেজদের সঙ্গে সিরাজউদ্দৌলার যে সংঘর্ষ বাধে, হিলের মতে তার অন্যতম কারণ মুসলমান শাসনের প্রতি হিন্দুদের অসন্তোষ।[৬] স্যার যদুনাথ সরকার সোজাসুজি এ ধরনের কথা না বললেও হিন্দুদের উদ্ধৃতি দিয়ে ইঙ্গিত দিচ্ছেন যে, মূলত হিন্দুরাই মুসলমান শাসনের পরিবর্তন চাইছিল। সাম্প্রতিককালে ব্রিজেন গুপ্ত বাংলার দ্বিধাবিভক্ত

৪. ঐ, Vol. I, iii.

৫. Peter Marshall, *Bengal—The British Bridgehead : The New Cambridge History of India*, (Cambridge 1987), 77, 91, আরো দেখুন, C. A. Bayly, *Indian Society and the Making of the British Empire*, (Cambridge 1987), 50; Rajat Kanta Ray, "Colonial Penetration and the Initial Resistance: The Mughal Ruling Class, the English East India Company and the Struggle for Bengal, 1756-1800", *Indian Historical Review*, Vol. XII, nos 1-2, July 1985—January 1986, 7, 8, 11, 12

৬. S. C. Hill, *Bengal*, Vol. I, XXIII, iii

৭. Brijen K. Gupta, *Sirajuddaulah and the East India Company*, 1756-57, (Leiden 1962), 48

এই সমাজের কথা বলতে গিয়ে প্রায় হুবহু হিলের বক্তব্যকে তুলে ধরছেন। তিনি লিখছেন যে, "ইংরেজরা বুঝতে পেরেছিল, বাংলার রাজনৈতিক জীবনে ফাটল ধরেছে এবং জনসাধারণ শাসকশ্রেণীর প্রতি বিরূপ হয়ে পড়েছে। তাই তারা নবাবের কর্মচারীদের প্রতি উদ্ধত মনোভাব গ্রহণ করেছিল।"[৭]

## সিরাজউদ্দৌলার চরিত্র

ইতিহাসের প্রচলিত ধারণায় শুধু নয়, মননশীল লেখকদের ভাষ্যেও সিরাজউদ্দৌলা দুশ্চরিত্র, নিষ্ঠুর ও লম্পট হিসেবে চিহ্নিত। সন্দেহ নেই, সমসাময়িক বিদেশী পর্যটকের বিবরণ ও ফার্সী ইতিহাসে সিরাজের এরকম চরিত্রই চিত্রিত। কিন্তু আমাদের বক্তব্য, ইংরেজদের সঙ্গে সিরাজের সংঘর্ষের কারণ খুঁজতে গিয়ে বা পলাশী-চক্রান্তের স্বরূপ উদঘাটনে নবাব হওয়ার আগে সিরাজ-চরিত্রের এই 'অন্ধকার' দিক খুঁটিয়ে দেখার খুব একটা প্রয়োজন নেই। যদি তর্কের খাতিরে এটা প্রয়োজনীয় ধরেও নেয়া হয়, তা হলে সঙ্গে সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে, বাংলার সব নবাবই একই চরিত্রদোষে দুষ্ট। দুশ্চরিত্র আর নিষ্ঠুর কেউ কম ছিলেন না। তাহলে শুধু সিরাজউদ্দৌলাকেই কেন 'বদ চরিত্রের' জন্য দোষী করার প্রচেষ্টা ? মুর্শিদকুলী খান থেকে আলিবর্দী পর্যন্ত বাংলার সব নবাবই নিষ্ঠুরতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। শুজাউদ্দিন ও সরফরাজ দু'জনেই দুশ্চরিত্র ছিলেন।[৮] সেক্ষেত্রে সিরাজউদ্দৌলার প্রতিই কেন এ বিশেষ অপবাদ ? এগুলোকে পলাশী-চক্রান্ত ও ইংরেজদের বাংলা বিজয়ের যথার্থতা প্রমাণ করার জন্য উদ্দেশ্যমূলক প্রচার বলে সন্দেহ করা কি খুবই অমূলক ?

আমাদের এ বক্তব্য সিরাজ-চরিত্রের সাফাইচেষ্টা নয়। নবাব হবার আগে দুশ্চরিত্রের অপবাদ সিরাজকে দেয়া যায় না বা নবাব হিসেবে সিরাজ খুবই মহান ছিলেন এটা মোটেই আমাদের বক্তব্য নয়। যুক্তি অন্যত্র। আমাদের প্রশ্ন——নবাব হবার পরেও কি সিরাজ আগের সেই চরিত্রের লোক ছিলেন ? তাঁর মধ্যে কি কোন পরিবর্তন এসেছিল বা তাঁর কি চৈতন্যোদয় হয়েছিল ? নবাব হবার পরেও কি তিনি আগের মতো উদ্ধত, শ্লথচরিত্র, নিষ্ঠুর আর নির্মম ছিলেন ? ইতিহাসে এর সোজাসুজি সাক্ষ্য-প্রমাণ কিছু নেই। তবু এখানে ওখানে ছোটখাটো কিছু তথ্য, কিছু ইঙ্গিত থেকে একটা ধারণা আমরা করতে পারি। নবাব হিসেবে (যদিও স্বল্প সময়ের জন্য) সিরাজউদ্দৌলার আচরণ ও কার্যাবলী বিশ্লেষণ করেও আমরা একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি। এখানে একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তথ্য আমাদের মনে রাখতে হবে। সিরাজ-চরিত্রের যে 'কদর্য' দিকটার দিকে সবাই অঙ্গুলি নির্দেশ করছেন, তা কিন্তু সিরাজউদ্দৌলা নবাব হবার আগের চরিত্র। নবাব হবার পরে সিরাজ-চরিত্রের এ 'অন্ধকার' দিকটার সোজাসুজি কোন তথ্য বা প্রমাণ কিন্তু

---

৮. ঐ, 30.

৯. Peter Marshall, *Bengal*, 75, 78, Rajat Kanta Ray, 'Colonial Penetration', 7, 14.

অপ্রতুল। এর কারণ সম্ভবত নবাব হবার পরে সিরাজউদ্দৌলার স্বভাব এবং আচরণে পরিবর্তন।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, অতি সাম্প্রতিক লেখাতেও সিরাজকে 'জেদি, একরোখা' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, তাঁর 'মেজাজি, রাগী স্বভাবের' উপর জোর দেয়া হয়েছে। লব্ধপ্রতিষ্ঠ এক ঐতিহাসিক আবার সিরাজউদ্দৌলার 'নিষ্ঠুরতা, উচ্ছৃঙ্খলতা ও উন্মাদ স্বভাবের' গল্পকে 'পরাজিতের মরণোত্তর পুরস্কার' বলে অভিহিত করেও সত্য ঘটনা কি তা এড়িয়ে বলেছেন, "সত্য যাই হোক না কেন, সিরাজউদ্দৌলা মোটেই আলিবর্দীর যোগ্য উত্তরাধিকারী ছিলেন না।"[৯] নবাব হবার পরে সিরাজউদ্দৌলার মধ্যে যে একটা পরিবর্তন এসেছিল তা আমরা জানতে পারি ইংরেজ কোম্পানির কর্মচারী স্ক্র্যাফটনের লেখা থেকেই। স্ক্র্যাফটন লিখেছেন, আলিবর্দীর মৃত্যুশয্যায় সিরাজ মদ্য স্পর্শ করবেন না বলে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন।[১০]

এমন পরিবর্তন যে অসম্ভব নয় (যদিও নাটকীয় হতে পারে) এবং তার যে সম্ভাবনাও ছিল সেটা আমাদের জানাচ্ছেন সেই মঁসিয়ে জাঁ ল, যিনি প্রধানত সিরাজ-চরিত্রের কদর্য রূপটি তুলে ধরেছেন। তবে তিনি এটাও স্পষ্ট করে বলেছেন যে, সিরাজের এই যে চরিত্র তা নবাব আলিবর্দীর মৃত্যুর আগের। তাঁর বক্তব্য বেশ তাৎপর্যপূর্ণ : "সাধারণ লোক ভাবতো, সিরাজ নবাব হয়ে অনেক বেশি মানবিকতার পরিচয় দেবে।"[১১] তিনি নিজেও আশা করেছিলেন যে, হয়তো "সিরাজ একদিন (নবাব হবার পরে ?) সজ্জনে পরিণত হতে পারেন।" তাঁর এরকম বিশ্বাসের কারণও ছিল—তিনি মন্তব্য করেন, "তরুণ নবাব নওয়াজিস মুহম্মদ খান[১২] সিরাজের চেয়ে বেশি বই কম দুশ্চরিত্র ও উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন না, কিন্তু পরে সর্বজনপ্রিয় হয়ে উঠেন।"[১৩]

এবার নবাব হবার পরে সিরাজের আচরণ বিশ্লেষণ করা যাক। মঁসিয়ে ল'র লেখা থেকে স্পষ্ট যে, সিরাজউদ্দৌলা ফরাসীদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্নই ছিলেন।[১৪] ফরাসীদের প্রতি কোন রকম নিষ্ঠুরতা বা উগ্রতা তিনি দেখান নি। তাঁর দুই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী (এবং মসনদের দাবিদার) ঘসেটি বেগম ও শওকত জঙ্গের প্রতি সিরাজ কেমন আচরণ করেছিলেন ? নবাব হওয়ার আগে তাঁর যে চরিত্র আমরা দেখেছি, তার সঙ্গে মিলে যায় এমন হঠকারিতা বা অবিবেচনাপ্রসূত কিছু কি তিনি করেছিলেন ? আমাদের উত্তর কিন্তু একদম 'না'। সিরাজউদ্দৌলা তাঁর পয়লা নম্বর শত্রু ঘসেটি বেগমকে (যিনি সিরাজকে

১০. Luke Scrafton, *Reflections on the Government & ca of Indostan*, (London 1760), 54

১১. Law's Memoir, S C. Hill, *Bengal*, Vol. III, 162

১২. ঘসেটি বেগমের স্বামী, সিরাজউদ্দৌলার খালু এবং ঢাকার নবাব।

১৩. Law's Memoir, S. C Hill, *Bengal*, Vol. III, 162

১৪. ঐ, 163.

১৫. Yusuf Ali Khan, *Tarikh-i-Bangala-i-Mahabatjangi*, tr., Abdus Subhan, (Calcutta 1982), 118

নবাব হিসেবে একেবারে চান নি এবং সিরাজ যাতে নবাব হতে না পারেন তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা-চক্রান্ত করেছিলেন) যেভাবে 'বুঝিয়ে সুঝিয়ে শান্তির সঙ্গে' বাগ মানিয়েছিলেন তা *তারিখ-ই-বাংগালা-ই-মহব্বতজঙ্গী*-এর লেখক ইউসুফ আলি খানও তারিফ না করে পারেন নি।[১৫] শওকত জঙ্গ অবশ্য অনেক বেশি শক্তিশালী ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে সিরাজকে অস্ত্রধারণ করতে হয়েছিল। সিরাজ তাঁকে পরাভূত করে মসনদে নিজেকে নিষ্কণ্টক করেছিলেন। ইংরেজদের সঙ্গেও কিন্তু সিরাজউদ্দৌলা প্রথমে শান্তিপূর্ণভাবে আপোস-মীমাংসার চেষ্টা করেছেন, পরে একদিকে অস্ত্রধারণ ও অন্যদিকে কূটনীতির মাধ্যমে সমস্যার একটা মিটমাট করতে চেয়েছেন।

কাশিমবাজারের ইংরেজ কুঠির প্রধান উইলিয়ম ওয়াটস সিরাজউদ্দৌলা "ক্ষমতা এবং ধন-সম্পত্তির প্রাচুর্যে কিঞ্চিৎ বেসামাল" বলে যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা হয়তো সত্যের অনেকটা কাছাকাছি। কিন্তু পনেরো মাসের স্বল্প রাজত্বকালে সিরাজ কোন পাগলামি, অর্বাচীনতা বা নিষ্ঠুরতার পরিচয় যে দেন নি ঐতিহাসিক দলিল-দস্তাবেজ থেকে তা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করা যায়। পাশাপাশি এটাও সত্য যে, সিরাজউদ্দৌলা নবাব হিসেবে, দেশের শাসক হিসেবে নিজেকে জাহির করার চেষ্টা করেছেন। এ দেশে ব্যবসা করতে এসে নবাবের কর্তৃত্বকে অস্বীকার করার মতো কোন ঔদ্ধত্য সিরাজ সহ্য করতে চান নি। উইলিয়ম ওয়াটসের মতে, সিরাজউদ্দৌলা বিদেশী বণিকগোষ্ঠীর কাছে প্রত্যাশা করেছেন যে, তারা নবাবের আদেশ বিনা দ্বিধায় মেনে নেবে। কিন্তু তাই বলে সিরাজ সর্বক্ষণ 'যুদ্ধংদেহি' মনোভাব দেখিয়েছেন, এমন কথা ঠিক নয়। যে তরুণ 'উগ্র বদমেজাজ' এবং 'নির্মম নিষ্ঠুরতার' জন্য কুখ্যাত, তিনি কিন্তু নবাব হওয়ার পর কাশিমবাজারের ইংরেজ কুঠির অবরোধ ও আত্মসমর্পণের পরে পরাজিত ইংরেজদের প্রতি 'উদার মানবিকতাপূর্ণ' ব্যবহার করেছেন, এ তথ্য কাশিমবাজার কুঠির এক ইংরেজ কর্মচারীরই।[১৬] কাশিমবাজারের পতনের পর ওয়াটস আর কোলেটকে শুধু সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে কলকাতা যাত্রা করতে হলো—তাও বন্দি হিসেবে নয়। খুব সম্ভবত সিরাজ এভাবে কলকাতার গভর্নর ড্রেকের উপর চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছিলেন যাতে ড্রেক নবাবের সঙ্গে একটা শান্তিপূর্ণ মীমাংসায় আসেন। কাশিমবাজারে ইংরেজদের বিষয়-সম্পত্তির উপর সিরাজ হাত পর্যন্ত দেন নি, শুধু ওখানকার অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ বাজেয়াপ্ত করেছিলেন। সিরাজ-চরিত্র সম্বন্ধে উইলিয়ম ওয়াটসের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য : "নিজস্ব স্বভাবের দিক থেকে সিরাজউদ্দৌলা অত্যন্ত নিরীহ ও ভীতু প্রকৃতির লোক ছিলেন।"[১৭] স্ত্রী লুৎফুন্নেসার প্রতি সিরাজের গভীর ভালবাসা ও মদ্যপান না করার প্রতিশ্রুতি রক্ষার মধ্যে কিন্তু বদচরিত্রের লক্ষণ কিছু পাওয়া যায় না।

১৬. Brijen K Gupta, *Sirajauddaulah* 57.

১৭. Watts to his father, 13 August 1757, S C Hill, *Bengal*, Vol II, 467

## সিরাজউদ্দৌলা ও ইংরেজদের মধ্যে সংঘর্ষের কারণ

ইদানীং ঐতিহাসিকরা বাংলার নবাব ও ইংরেজদের মধ্যে সংঘর্ষের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলার চেষ্টা করছেন যে, আঠারো শতকের প্রায় প্রথম থেকে বাংলার নবাবের সঙ্গে সামরিক অভিজাত শ্রেণী, ব্যবসায়ীগোষ্ঠী ও জমিদারদের যে নতুন জোটবদ্ধতা তৈরি হয়েছিল এবং যা আলিবর্দী পর্যন্ত বাংলার নবাবি শাসনের মূল ভিত্তি ছিল, সিরাজউদ্দৌলার সময় তা ভেঙ্গে পড়ে এবং তার ফলে বাংলার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 'সঙ্কট' ঘনীভূত হয়।[১৮] আর এ সুযোগে ইংরেজরা বাংলায় নিজেদের প্রাধান্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়। এটা ঠিকই, ১৭৫৬-৫৭ সালে বাংলায় যে 'সঙ্কট' দেখা দেয় তা সম্যক উপলব্ধি করতে হলে বাংলার নবাব ও ইংরেজদের মধ্যে কি সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল তা ভাল করে বুঝতে হবে। এ সম্পর্ক আবার অনেকটা নির্ভর করতো একদিকে বাংলায় ইংরেজ কোম্পানির ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যদিকে কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসার সমৃদ্ধির উপর। কিন্তু যে সমস্ত বিশেষ ঘটনা বা বিষয়কে কেন্দ্র করে নবাব ও ইংরেজদের মধ্যে সংঘর্ষের উৎপত্তি, সেগুলো ভাল করে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন যাতে এ সংঘর্ষের প্রকৃত কারণগুলি সুস্পষ্ট হয়ে উঠে।

আমরা আগেই বলেছি, ইংরেজদের সঙ্গে সিরাজউদ্দৌলার বিরোধ ও সংঘর্ষের কারণ হিসেবে হিল সবচেয়ে বেশি দায়ী করেছেন নবাবের 'দম্ভ' এবং 'অর্থলিপ্সা'কে। নবাব হওয়ার আগে সিরাজ-চরিত্রে আত্মম্ভরিতা ছিল, সে বিষয়ে আমরা সন্দেহ প্রকাশ করছি না। কিন্তু ইংরেজ কোম্পানির সঙ্গে নবাব সিরাজউদ্দৌলার আচরণ বা ব্যবহারে এমন কোন তথ্য দেখানো অসম্ভব যাতে প্রমাণ করা যায় যে, সিরাজের দাম্ভিকতাই ইংরেজদের সঙ্গে বিরোধের অন্যতম কারণ। আর ইংরেজ কর্মচারীদের লেখা থেকেই সহজে দেখানো যায় যে, সিরাজের অর্থলিপ্সা যদি থেকেও থাকে, তা কিন্তু কোনভাবেই এ সংঘর্ষের জন্য দায়ী নয়। অন্যদিকে আমাদের কাছে এমন অনেক তথ্য-প্রমাণ আছে যা থেকে দেখানো যায়, যদি কোন একটি কারণকে এ সংঘর্ষের জন্য দায়ী করা যায়, তা হলো কলকাতার ইংরেজ গভর্নর ড্রেকের কঠিন ও অনমনীয় মনোভাব। হিল কিন্তু এ সংঘর্ষে ড্রেকের ভূমিকা সম্বন্ধে নীরব।

অধুনা ঐতিহাসিকদের মধ্যে যদিও পিটার মার্শাল বলছেন যে, কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কাউন্সিল নবাবের সঙ্গে "মিটমাট করার জন্য কোন বিশেষ প্রচেষ্টা গ্রহণ করে নি", তবু তিনি এবং ক্রিস বেইলি এখনো হিলের অনুকরণে এ সংঘর্ষের জন্য সিরাজউদ্দৌলাকেই বেশি করে দায়ী করছেন।[১৯]

১৮. Peter Marshall, *Bengal*, 56, 63, Rajat Kanta Ray, 'Colonial Penetration', 6.

১৯. কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার এই যে এখানে মার্শাল East Indian Fortunes (Oxford 1976) সম্পর্কে তাঁর অবস্থান পরিবর্তন করেছেন। তিনি লিখেছেন: "The avalanche was set in mot on by Siraj-ud-daula's attack on Calcutta in 1756" (259). But Chris Bayly still holds that the dispute "escalated when the Nawab Siraj-ud-Daula attempted to expel all the English from Bengal and its riches." Bayly, *Indian Society*, 46.

*ক. সিরাজউদ্দৌলার 'দাম্ভিকতা'*

সিরাজউদ্দৌলা হয়তো দাম্ভিক ছিলেন—এত অল্প বয়সে যিনি নবাব হয়েছেন, তাঁর পক্ষে এটা এমন কিছু অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এখানে আমাদের মূল প্রশ্ন—নবাব হওয়ার পর ইংরেজদের প্রতি সিরাজ কি কোন দাম্ভিকতা দেখিয়েছিলেন ? নবাব সিরাজউদ্দৌলার দম্ভ বা ঔদ্ধত্য ইংরেজদের সঙ্গে সংঘর্ষের জন্য কতটা দায়ী তা তলিয়ে দেখা প্রয়োজন এবং তার জন্য কিছুটা ইতিহাস পরিক্রমণ দরকার। নবাব হওয়ার আগে থেকেই সিরাজ ইংরেজদের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন বলে যে অভিমত আছে, তার সত্যতা বিচারসাপেক্ষ। তা যদি সত্য হতো, তাহলে ইংরেজ কোম্পানির কর্মচারীরা ১৭৫২ সালের সেপ্টেম্বরে সিরাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আসার পর লিখতো না যে, তারা যুবরাজের কাছে ওলন্দাজ বা ফরাসীদের চাইতেও বেশি আদর-অভ্যর্থনা পেয়েছে।[২০] কিন্তু তারপর সিরাজ ক্রমে ক্রমে সন্দেহ করতে শুরু করলেন, ইংরেজরা তাঁর মসনদ লাভের বিরোধিতা করতে পারে। নবাব হওয়ার পর তাঁর সন্দেহ আরো বেড়ে গেল যে, ইংরেজরা সক্রিয়ভাবে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের সাহায্য করছে। তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে বলা যায়, এ সন্দেহ খুব অমূলক নয়। মঁসিয়ে জাঁ ল'র লেখা থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, ইংরেজরা সিরাজের বিরোধী দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখছিল এবং আশা করছিল যে, সিরাজউদ্দৌলা নবাব হতে পারবে না। সেজন্য তারা কোন কার্যোপলক্ষে নবাবের দরবারে যেতো না।[২১] তিনি আরো জানাচ্ছেন, ইংরেজরা ঘসেটি বেগম ও শওকত জঙ্গের সঙ্গে একটা সমঝোতায় আসার দ্বারা সিরাজউদ্দৌলাকে তাদের প্রতি আরো বিরূপ করে তুলেছিল।[২২] সমসাময়িক আরেকজন ফরাসী পর্যবেক্ষকও এ অভিমত সমর্থন করেছেন।[২৩] এমন কি হলওয়েলও বিশ্বাস করেছিলেন যে, সিরাজের বিরুদ্ধে ঘসেটি বেগমের দলের সাফল্যের সম্ভাবনা খুবই বেশি।[২৪] *সিয়ার-উল-মুতাখেরিন*-এর রচয়িতা ও শওকত জঙ্গের উপদেষ্টা ঐতিহাসিক গোলাম হোসেনও নিশ্চিত ছিলেন যে, সিরাজের বিরুদ্ধে সিংহাসন দাবির লড়াইয়ে শওকত জঙ্গ ইংরেজদের সাহায্য পাবেন।[২৫]

এসব প্ররোচনা সত্ত্বেও সিরাজ ইংরেজদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করেছিলেন ? তিনি যদি দাম্ভিক হতেন এবং তাঁর দাম্ভিকতাই যদি সংঘর্ষের অন্যতম প্রধান কারণ হতো (যেটা হিল জোর দিয়ে বলেছেন), তাহলে তাঁর প্রধান দুই শত্রুকে পরাভূত করার পরই তিনি ইংরেজদের উপর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তৎপর হতেন। কিন্তু সিরাজ তা করেন নি।

২০. Bengal Public Consultations (henceforth B. P. C ), Range 1, Vol. 25, f 251, 18 September 1752
২১. Law's Memoir, S. C. Hill, *Bengal*, Vol. III, 162.
২২. ঐ, 163-64.
২৩. ঐ, 219.
২৪. Holwell to the Court of Directors, 10 August 1757, *Ibid*., 349.
২৫. Ghulam Husain Khan, *Sier-ul-Mutaqherin*, tr. Nata Manus (Raymond Mustafa), Vol II, (Calcutta 1902), 198-99 (henceforth *Sier*).

সিংহাসনে আরোহণ করার ক'দিন পরে সিরাজ কলকাতায় ইংরেজ কোম্পানিকে চিঠি লিখে অনুরোধ জানালেন রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণ দাসকে তাঁর হাতে প্রত্যর্পণের জন্য। কৃষ্ণদাস রাজবল্লভের আনুমানিক ৫৩ লক্ষ টাকার ধন-সম্পদ নিয়ে কলকাতায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। ঘসেটি বেগমের একান্ত বিশ্বস্ত অনুচর রাজবল্লভ ছিলেন ঢাকার রাজস্ব বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত। ঘসেটি বেগমের প্রয়াত স্বামী ঢাকার নবাব নওয়াজিস মুহম্মদের সময় রাজস্ব বিভাগে রাজবল্লভ ছিলেন সহকারী। আলিবর্দীর মৃত্যুর আগেই রাজবল্লভের বিরুদ্ধে সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করার অভিযোগ আনা হয়। ভয় পেয়ে রাজবল্লভ তাঁর ধন-সম্পদসহ পুত্র কৃষ্ণদাসকে সপরিবারে কলকাতা পাঠিয়ে দেন। আলিবর্দীর মৃত্যুর মাস খানেকেরও আগে (১৩ মার্চ ১৭৫৬ সালে) কৃষ্ণদাস কলকাতা পৌঁছে গেলেন।[২৬]

প্রথম চিঠি পাঠাবার কয়েক সপ্তাহ পরে সিরাজ কলকাতায় আরেকটা চিঠি পাঠিয়ে জানালেন—ফোর্ট উইলিয়ম কেল্লাকে সুসংহত ও দুর্ভেদ্য করে তোলার জন্য যেন নতুন করে কিছু করা না হয় এবং ইংরেজরা ফোর্ট উইলিয়মে যে প্রাচীর ও অপসারণীয় সেতু সম্প্রতি বানিয়েছে তা যেন ভেঙ্গে ফেলা হয়। ইংরেজ গভর্নর ড্রেক সিরাজের প্রথম চিঠিকে শুধু উপেক্ষাই করলেন না, দ্বিতীয় চিঠির বাহক, মেদিনীপুরের ফৌজদার রাজা রামের ভাই নারায়ণ সিংহকে গুপ্তচর অপবাদ দিয়ে তাড়িয়ে দিলেন। অথচ তৎকালীন কলকাতার সবচেয়ে ধনী ও সমৃদ্ধ ব্যবসায়ী উমিচাঁদই নারায়ণ সিংহকে পরিচয়পত্র দিয়ে ড্রেকের কাছে পাঠিয়েছিলেন। সিরাজের দ্বিতীয় চিঠির উত্তরে ড্রেক বেশ কিছুটা সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন ইউরোপের সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ যদি ভারতবর্ষেও বিস্তার লাভ করে, তাহলে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা নবাবের সাধ্যে কুলোবে কি-না।[২৭] এ চিঠি পেয়ে সিরাজউদ্দৌলার সন্দেহ আরো ঘনীভূত হলো যে, ইউরোপীয়রা, বিশেষকরে ইংরেজরা দক্ষিণ ভারতে মাত্র কয়েক বছর আগে যেভাবে নিজেদের রাজনৈতিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেছে, বাংলায় তার পুনরাবৃত্তি করতে পারে। নারায়ণ সিংহকে বিতাড়নের খবর পেয়ে উইলিয়ম ওয়াটস শঙ্কিত হয়ে লিখছেন :

> যে মুহূর্তে আমি (নারায়ণ সিংহের) ব্যাপারটি জানতে পারলাম, তখনই আমি নবাবের উচ্চ পদাধিকারী এ কর্মচারীকে এভাবে অপমান করার ফল কি হতে পারে তা ভেবে আতঙ্কিত হয়ে পড়লাম, কারণ তরুণ নবাবকে ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যে কিঞ্চিৎ বেসামাল মনে হয় এবং সে আশা করতো তার আদেশ লোকে বিনা দ্বিধায় মেনে নেবে।[২৮]

২৬. পত্রটি ১৭৫৬ সালের ১৫ এপ্রিল কলকাতায় পৌছে। ড্রেকের বিবরণ দেখুন, Hill, *Bengal*, Vol. I, 125. ঢাকায় অবস্থানকালে রাজবল্লভ দুই কোটিরও অধিক টাকা সঞ্চয় করেছিলেন বলে হিসাব পাওয়া যায়, দেখুন, Hunter, *Statistical Account of Bengal*, Vol. V, 125; Drake to Fort William Council, January 17-25, 1757, Hill, *Bengal*, Vol. III, 136; Holwell to Court of Directors, 10 August 1757, *Ibid.*, Vol. III, 248.

২৭. Drake's Narrative, Hill, *Bengal*, Vol. I, 125; Holwell to the Court of Directors, 30 November 1756, Hill, *Bengal*, Vol. II, 8.

২৮. Watts to Court of Directors, 30 June 1757, Hill, *Bengal*, Vol. III, 332.

এর পরের ঘটনাবলীর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সিরাজ এতসব সত্ত্বেও দম্ভসূচক বা হঠকারিতার কোন কাজ করেন নি। প্রায় সমসাময়িক ঐতিহাসিক গ্রন্থ *মুজাফফরনামার* লেখক করম আলির তথ্য অনুযায়ী মীর জাফর, রায়দুর্লভ, খোজা ওয়াজেদ প্রমুখের নেতৃত্বে একদল নবাবকে পরামর্শ দিলেন ইংরেজদের প্রতি দৃঢ় কূটনীতির সঙ্গে প্রয়োজনে অস্ত্রধারণের নীতি অবলম্বন করতে।[২৯] সেই পরামর্শ অনুযায়ী সিরাজউদ্দৌলা প্রখ্যাত আর্মেনীয় ব্যবসায়ী খোজা ওয়াজেদকে ইংরেজদের সঙ্গে আপোস-মীমাংসার দৌত্যে নিযুক্ত করলেন। ওয়াজেদের দৌত্য কিন্তু নিষ্ফল হলো। ইংরেজ গভর্নর ড্রেক খোজা ওয়াজেদকেও অপমান করে কলকাতা থেকে বিতাড়িত করলেন। উইলিয়ম ওয়াটসের লেখা থেকে জানা যায়, খোজা ওয়াজেদ চারবার কলকাতায় ইংরেজদের সঙ্গে দেখা করে নবাবের সঙ্গে একটা মিটমাটের চেষ্টা করেছিলেন। ইংরেজরা তাঁকে এই বলে শাসিয়েছিল যে, এরকম প্রস্তাব নিয়ে তিনি যেন আর কলকাতায় আসার চেষ্টা না করেন।[৩০]

খোজা ওয়াজেদ যখন নিষ্ফল দৌত্যে ব্যস্ত, সিরাজউদ্দৌলা তখন দুর্লভরাম ও হাকিম বেগকে আদেশ দিলেন কাশিমবাজারের ইংরেজ কুঠি অবরোধ করতে। শওকত জঙ্গের বিরুদ্ধে অভিযান করার জন্য তিনি নিজে পূর্ণিয়া রওনা হলেন। রাজমহলে পৌঁছে ইংরেজদের উদ্ধত আচরণের খবর পেয়েই সিরাজ ত্বরিতগতিতে কাশিমবাজার অভিমুখে যাত্রা করলেন। বিনা যুদ্ধে কাশিমবাজার ইংরেজ কুঠির পতন হলো। কুঠির প্রধান উইলিয়ম ওয়াটস সিরাজের নির্দেশে এক শর্তাধীন চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেন[৩১] এবং ওয়াটস ও কোলেট নবাবের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে কলকাতা অভিমুখে রওনা হলেন।[৩২] সিরাজউদ্দৌলা কাশিমবাজার ইংরেজ কুঠির গোলাবারুদ ও অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া আর কিছুই বাজেয়াপ্ত করেন নি। কোন লুটতরাজ বা হত্যাকাণ্ড হয় নি, কোন নিষ্ঠুরতাও না। সুতরাং ইংরেজদের সঙ্গে আচরণে এ পর্যন্ত নবাব সিরাজউদ্দৌলার কোন দাম্ভিকতা বা ঔদ্ধত্যের পরিচয় আমরা দেখতে পাচ্ছি না। বস্তুতপক্ষে সংঘর্ষ চলাকালীন সময়েও এমন কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।

২৯. Karam Ali, *Muzaffarnamah*, 63-64, quoted in Brijen K. Gupta, *Sirajauddaulah*, 52.

৩০. Watts and Collet to Fort St. George Council, 16 July 1756, Hill, *Bengal*, Vol. I, 58.

৩১. চুক্তির শর্তাবলী দ্র., Brijen K. Gupta, *Sirajauddaulah*, 55.

৩২. উইলিয়ম টুক-এর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে ওয়াটস নবাবের পা জড়িয়ে ধরে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। সাম্প্রতিক ঐতিহাসিকগণ এ বর্ণনা সত্য বলে গ্রহণ করেছেন (দ্র. রজত রায়, 'Colonial Penetration', 9-10 )। এ বিবরণের বিশ্বাসযোগ্য ভিত্তি আছে বলে মনে হয় না। অন্য কোন ইউরোপীয় বা ফার্সী ঐতিহাসিকের বিবরণে এমন রসালো গল্পের উল্লেখ পাওয়া যায় না। টুক যে অতিরঞ্জিত বিবরণ দিতে অভ্যস্ত ছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর আরেকটি বিবরণে। এতে তিনি বাংলায় ইংরেজদের ক্ষতির পরিমাণ ২২,৫০০.০০ টাকা বলে উল্লেখ করেছেন; কিন্তু সরকারি হিসাব মোতাবেক প্রকৃত ক্ষতির পরিমাণ ছিল ৭,৬৪৪.০০ টাকা। (Brijen K. Gupta, *Sirajauddaulah*, 80).

*খ. সিরাজউদ্দৌলার 'অর্থলিপ্সা'*

সিরাজউদ্দৌলার অর্থলিপ্সাকে এস. সি. হিল ইংরেজদের সঙ্গে সিরাজের সংঘর্ষের অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে যতোই দেখাতে চান না কেন, সমসাময়িক কোন নথিপত্রে কিন্তু এর প্রমাণ পাওয়া দুষ্কর। এখানে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়, সিরাজ অর্থলোলুপ হলে কাশিমবাজার কুঠির পতনের পর ইংরেজদের সব ধন-সম্পত্তি আত্মসাৎ করতে পারতেন। কিন্তু সিরাজ তা করেন নি। ইংরেজদের কাছ থেকে কোন অর্থও তিনি দাবি করেন নি। ওয়াটস যে শর্তাবলীতে সই করেছিলেন তাতেও কোন অর্থের উল্লেখ ছিল না—ছিল শুধু ইংরেজদের বিরুদ্ধে সিরাজের অভিযোগগুলোর কথা। সাধারণত এরকম ক্ষেত্রে বাংলার সব নবাবই বিদেশী বণিকদের কাছ থেকে কিছু অর্থ আদায় করতেন। সিরাজউদ্দৌলা তাও করেন নি। সিরাজের অর্থলিপ্সা যে কোন অবস্থাতেই এ সংঘর্ষের জন্য দায়ী নয় এবং সিরাজ যে সত্যিই একটা শান্তিপূর্ণ মীমাংসা চেয়েছিলেন, তা কোম্পানির কর্মচারী ওয়াটস ও কোলেটের লেখা থেকেই সুস্পষ্ট : "নবাব যে একটা আপোস-মীমাংসা চেয়েছিলেন তার প্রমাণ এই যে, তিনি যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম ছাড়া কাশিমবাজারে কোম্পানির অন্য কোন জিনিসে হাত পর্যন্ত দেন নি।"[৩৩] অবশ্য এটা ঠিক যে, কলকাতা আসার পথে ওয়াটস ও কোলেটের কাছে নবাবের দীউয়ান ও সেনাপতি দুর্লভরাম অর্থের কথা বলেন। কলকাতা দখল করার পর মুর্শিদাবাদ ফেরার পথে সিরাজউদ্দৌলা ওলন্দাজদের কাছ থেকে সাড়ে চার লক্ষ টাকা ও ফরাসীদের কাছ থেকে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা নজরানা গ্রহণ করেন। কলকাতার ইংরেজ কোষাগারে সিরাজ মাত্র চল্লিশ হাজার টাকার মতো পান। এখানে স্মর্তব্য, বাংলার সব নবাবই কোন যুদ্ধ জয়ের পর বা এ রকম উপলক্ষে বিদেশী বণিক ও দেশীয় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে প্রথাগত নজরানা আদায় করেছেন—নজরানার পরিমাণ অনেক ক্ষেত্রে আরো বেশি হয়েছে।

সিরাজউদ্দৌলার কলকাতা আক্রমণের ফলে ইংরেজ কোম্পানির যে ক্ষতি হয় (আনুমানিক সাড়ে ষোল লক্ষ টাকা) তা মূলত সংঘর্ষের সময় অগ্নিকাণ্ডের জন্যই।[৩৪] লুটতরাজও অবশ্য হয়েছিল, কিন্তু ইংরেজ কোম্পানির ঐতিহাসিক রবার্ট ওরমে'র মতে, তার জন্য দায়ী রাজা মানিক চাঁদ, পরে সিরাজ তাঁকে এজন্য কারাদণ্ড দেন। কলকাতা লুণ্ঠনের জন্য মানিকচাঁদ দশ লক্ষ টাকা জরিমানা দিয়ে মুক্তি পান।[৩৫] সিরাজের বিরুদ্ধে অর্থলিপ্সার অভিযোগ যে কত অসার এবং তা যে সংঘর্ষের জন্য একেবারেই দায়ী নয়, তা সম্প্রতি জানা গেছে লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে রক্ষিত এক অজ্ঞাতনামা ইংরেজ লেখকের পাণ্ডুলিপি থেকে। উক্ত লেখক স্পষ্ট বলছেন : "বাংলার সুবাদার যা চেয়েছিলেন

৩৩. Watts and Collet to Fulta Council, 8 July 1756, Hill, *Bengal*, Vol. I, 61.

৩৪. ১.৬৫ মিলিয়ন বলে প্রাক্কলিত, দ্রষ্টব্য, Brijen K. Gupta, *Sirajauddaulah*, 81.

৩৫. Robert Orme, *History of the Military Transactions of the British Nation in Indostan*, Vol II, (London 1803), 147.

তা মোটেই অর্থ নয়—অর্থের ব্যাপারটা ছিল নিতান্তই গৌণ, তিনি আসলে চেয়েছিলেন ইউরোপীয়রা নিজেদের সুসংহত করার জন্য দুর্গগুলিকে যেভাবে দুর্ভেদ্য করে তুলছিল তার সম্পূর্ণ অবসান।"[৩৬] এমনকি, যে হলওয়েল সিরাজের প্রতি মোটেই সদয় ছিলেন না, তার ব্যাপারও প্রমাণ করে যে সিরাজ মোটেই অর্থলিপ্সু ছিলেন না। কলকাতার পতনের পর যখন হলওয়েলকে বন্দি হিসেবে নবাবের সামনে উপস্থিত করা হলো, তখন তিনি নবাবকে জানালেন যে, যুদ্ধের ফলে তাঁর ব্যক্তিগত অনেক ক্ষয়ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও তিনি নবাবকে ভাল পরিমাণ টাকা দিয়েই তাঁর মুক্তি কিনতে পারেন। সিরাজ উত্তর দিয়েছিলেন : "হলওয়েলের টাকা থাকলেও তা তাঁর কাছেই থাক; ওঁর অনেক যন্ত্রণাভোগ হয়েছে; ওঁকে মুক্তি দেয়া হোক।"[৩৭] এ ঘটনা থেকে একটা জিনিস সুস্পষ্ট যে, সিরাজের অর্থলিপ্সা তেমন কিছু ছিল না এবং অন্তত কিছুটা মানবিকতাও তাঁর মধ্যে ছিল।

*সিরাজউদ্দৌলার অভিযোগ ন্যায়সঙ্গত, নাকি শুধু মিথ্যা ওজর?*

আমাদের কাছে যেসব তথ্য-প্রমাণ আছে, সেগুলো বিশ্লেষণ করার পর সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে, ইংরেজদের বিরুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলার যেসব অভিযোগ সেগুলো খুবই ন্যায়সঙ্গত এবং সেগুলোকে কোনমতেই নবাবের 'মিথ্যা ওজর' বলে উড়িয়ে দেয়া যায় না। তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করেই ইংরেজদের বিরুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলার অভিযোগ—(১) ফোর্ট উইলিয়ম কেল্লার সংস্কার এবং সেটাকে দুর্ভেদ্য ও সুসংহত করার প্রচেষ্টা, (২) দস্তকের (বিনাশুল্কে বাণিজ্য করার অনুমতিপত্র) যথেচ্ছ অপব্যবহার, এবং (৩) নবাবের অপরাধী প্রজাদের কলকাতায় আশ্রয়দান। খোজা ওয়াজেদকে ইংরেজদের সঙ্গে আপোস-মীমাংসার দৌত্যে নিয়োগ করার পর তাঁকে লেখা একটা চিঠিতে সিরাজ তাঁর অভিযোগগুলো স্পষ্ট করে তুলে ধরেন।[৩৮] এ অভিযোগগুলোকে কেন্দ্র করেই যেহেতু ইংরেজদের সঙ্গে সিরাজউদ্দৌলার সংঘর্ষ বাধে, সেজন্য এগুলো আদৌ ভিত্তিহীন কিনা সেটা খুব সতর্কতার সঙ্গে বিচার করে দেখতে হবে। তখনকার সরকারি নথিপত্র থেকে এটা স্পষ্ট যে, সব ইউরোপীয় কোম্পানিই এ সময় তাদের কেল্লাগুলোকে সুসংহত ও দুর্ভেদ্য করে তোলার প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিল। সতেরো শতকের শেষদিকে মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনার জমিদার শোভা সিংহের বিদ্রোহের সময় বাংলার নবাব ইউরোপীয় কোম্পানিসমূহকে তাদের কেল্লাগুলো শক্তিশালী করে তোলার যে ঢালাও অনুমতি দেন, তার সুযোগ নিয়ে ইংরেজ কোম্পানি তাদের কেল্লাগুলো দুর্ভেদ্য করে তুলছিল।[৩৯] আবার মারাঠা আক্রমণের সময় ইংরেজরা ফোর্ট উইলিয়মে গেরিনের উদ্যানের দিকটাতে দুর্ভেদ্য

৩৬. Mss. Eur. D. 283, f. 283, India Office Library, London. এই পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, মৎলিখিত নিবন্ধ, "Sirajauddaulah, English Company and Plassey — A Reappraisal", *Indian Historical Review*, Vol. XIII, nos. 1-2, July 1986-January 1987, f. n. 34.

৩৭. Holwell's Narrative, Hill, *Bengal*, Vol. III, 152.

৩৮. Siraj to Wazid, 1 June 1756, *Ibid.*, Vol. I, 4.

৩৯. S. Chaudhuri, *Trade and Commercial Organization in Bengal, 1650-1720*, (Calcutta 1975), 39-40.

প্রাচীর ও অপসারণীয় সেতু তৈরি করে এবং ফোর্ট উইলিয়মের চারদিকে পরিখা খনন করে নেয়। এর পরেও লন্ডন থেকে কোম্পানির পরিচালকরা নির্দেশ পাঠায় "নবাবের অনুমতি নিয়ে বা অন্য কোন উপায়ে" ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গকে আরো শক্তিশালী করে তুলতে।[৪০] বাংলায় নবাবের কর্তৃত্বকে ইংরেজরা এ সময় কি রকম তাচ্ছিল্য এবং অবজ্ঞা করতে শুরু করে ড্রেককে লেখা উইলিয়ম ওয়াটসের চিঠিই তার প্রমাণ। ওয়াটস লিখেছেন, "নবাব আলিবর্দীর হয়তো নজরেই পড়বে না যে আমরা কলকাতাকে দুর্ভেদ্য করে তুলছি। সুতরাং নবাবের অনুমতি নেবার কোন প্রয়োজন নেই, তাড়াতাড়ি কাজ শুরু করা উচিত।"[৪১] ড্রেক ও ফোর্ট উইলিয়ম কাউন্সিল নবাবের অনুমতির তোয়াক্কা না করে কলকাতাকে আরো দুর্ভেদ্য ও শক্তিশালী করে তুলতে কাজ শুরু করে দিল।

অধুনা কয়েকজন ঐতিহাসিকের বক্তব্য, ইংরেজরা ফরাসীদের আক্রমণের ভয়েই কলকাতার দুর্গ সুসংহত করছিল। কিন্তু কোর্ট অব ডিরেক্টরসকে লেখা ফোর্ট উইলিয়ম কাউন্সিলের চিঠি এ বক্তব্যের অসারতা প্রমাণ করে। কাউন্সিল লন্ডনে লিখে যে, দুর্গ শক্তিশালী করা হচ্ছে 'দেশীয় শত্রুর' বিরুদ্ধে কাজে লাগানোর জন্য।[৪২] এসব তথ্য থেকে সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে, ইংরেজরা বাংলার নবাবের অনুমতি না নিয়েই ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ দুর্ভেদ্য করে তুলছিল। দক্ষিণ ভারতে ইংরেজ ও ফরাসীদের কর্মকাণ্ড দেখে এবং বাংলার মসনদের জন্য প্রতিযোগিতার কথা মনে রেখে সিরাজউদ্দৌলা স্বাভাবিকভাবেই ইংরেজদের এ প্রচেষ্টায় উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন, এ বিষয়ে পূর্বোল্লেখিত আমাদের ঐ পাণ্ডুলিপির অজ্ঞাতনামা লেখকের বক্তব্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ :

> নতুন সুবাদার তাঁর রাজ্যে ইউরোপীয়দের স্বাধীন ক্ষমতা দেখে শঙ্কিত হয়ে পড়েন এবং তাদের ক্ষমতা হ্রাসে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। এদের মধ্যে ইংরেজরা সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী বলে তারাই তাঁর ন্যায়সঙ্গত নীতির প্রধান লক্ষ্য হয়ে পড়ে। তিনি প্রতিজ্ঞা করেন, ইংরেজরা যদি জাফর খানের (মুর্শিদকুলী খান) সময় তারা যেভাবে বাংলায় ব্যবসা-বাণিজ্য করতো সে অবস্থায় ফিরে না যায়, তা হলে তিনি তাদের ক্ষমতাই শুধু হ্রাস করবেন না, তাদের বাংলা থেকে বিতাড়িত করবেন। এটা স্পষ্ট যে, সিরাজউদ্দৌলার প্রধান ও আসল উদ্দেশ্য ছিল কলকাতার দুর্গ ও যুদ্ধসরঞ্জাম ধ্বংস করা।[৪৩]

দস্তকের অপব্যবহার সম্বন্ধে সিরাজউদ্দৌলার অভিযোগও ভিত্তিহীন নয়। ইংরেজ কোম্পানির নথিপত্রে অসংখ্য প্রমাণ আছে যে, কোম্পানির কর্মচারীরা দস্তকের যথেচ্ছ অপব্যবহার করছিল। এই দস্তক বা বিনাশুল্কে বাণিজ্য করার অনুমতিপত্রের সাহায্যে কোম্পানির কর্মচারীরা শুধু নিজেদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শুল্ক ফাঁকি দিত না,

৪০. Court of Directors to Fort William Council, Despatch Book (henceforth D. B.), Vol. III, 16 January 1752, India Office Library, London.
৪১. Watts to Drake and Fort William Council, B. P. C., Vol. 28, 15 August 1755.
৪২. C. R. Wilson, *Old Fort William in Bengal,* Vol. II, (London 1906), 31; See Bayly, *Indian Society,* 50.
৪৩. Mss. Eur. D. 283, *Fort William*, f. 26.

এমনকি অর্থের বিনিময়ে এ দস্তক দিয়ে এশীয় ব্যবসায়ীদের বাণিজ্যও শুল্কমুক্ত করে দিত, যার ফলে রাজ্যের যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতি হতো। কারণ এর ফলে বাণিজ্যশুল্ক বাবদ ন্যায্য প্রাপ্য রাজস্ব থেকে রাজ্য বঞ্চিত হতো। কোম্পানির কর্মচারীরা অবশ্য দাবি করতো যে, ১৭১৭ সালে মুগল সম্রাট ফররুখশিয়র যে ফরমান বা আদেশপত্র ইংরেজ কোম্পানিকে দিয়েছিলেন [৪৪], তাতে শুধু কোম্পানির আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য নয়, কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যকেও রপ্তানিশুল্ক থেকে রেহাই দেয়া হয়েছিল। এ দাবি কিন্তু একেবারেই ভিত্তিহীন ও অসঙ্গত। যে উদ্দেশ্য ও পরিপ্রেক্ষিতে ঐ ফরমান দেয়া হয়েছিল, তা বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ১৭১৭ সালের ফরমান কিন্তু শুধু কোম্পানির আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যকেই শুল্ক থেকে অব্যাহতি দিয়েছিল, কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যকেও তা বহিঃশুল্ক থেকে রেহাই দিয়েছিল একথা বলা কোনক্রমেই সঠিক নয়।[৪৫]

ফলে মুর্শিদকুলী খানের সময় থেকে এ নিয়ে কোম্পানির কর্মচারীদের সঙ্গে বাংলার নবাবের প্রায়ই বিবাদ-বিসংবাদ লেগে থাকতো। কখনো কখনো এ বিবাদের সুযোগ নিয়ে নবাবের আদেশে কোম্পানির বেচা-কেনা একদম বন্ধ করে দেয়া হতো। বিরোধ যখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতো, তখন কোম্পানি নবাব এবং তাঁর অমাত্যদের মোটা নজরানা দিয়ে তা মীমাংসা করে নিত। আমাদের অজ্ঞাতনামা লেখক এ সম্বন্ধে বলছেন : "কোম্পানির দস্তকের অপব্যবহার নবাবের হাতে ন্যায্য হাতিয়ার তুলে দিয়েছিল যাতে নবাব ইচ্ছে করলে কোম্পানির বেচা-কেনা বন্ধ করে দিতে পারতেন।" তিনি আরো বলছেন : "দস্তকের যথেচ্ছ অপব্যবহারের ফলে নবাব কোম্পানির কাছ থেকে মোটা টাকা আদায় করার সুযোগ পেয়েছিলেন—এভাবে টাকা আদায় করাটা নবাবের বেশি বাড়াবাড়ি বলা যায় না।"[৪৬] সুতরাং দেখা যাচ্ছে, দস্তকের অন্যায় অপব্যবহারের কথা সিরাজউদ্দৌলা প্রথম তোলেন নি। সম্ভবত সিরাজ এ অবৈধ ও বেআইনী ব্যবস্থার অবসান ঘটাতে চেয়েছিলেন এবং তাই হয়তো কোম্পানির কর্মচারীরা শঙ্কিত হয়ে পড়েছিল যে,তাদের রাতারাতি বড়লোক হওয়ার সবচেয়ে সহজ ও লোভনীয় উপায়টি এবার বন্ধ হয়ে যাবে।

দস্তকের অপব্যবহার এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, তা দেখে আমাদের অজ্ঞাত-নামা লেখক মন্তব্য করছেন, "কি লজ্জাকর বেশ্যাবৃত্তিই না চলছে দস্তক নিয়ে।"[৪৭] তিনি জানাচ্ছেন, দরবারের গুপ্তচররা "দস্তক নিয়ে এ বেশ্যাবৃত্তির" খবর রোজ দরবারে পৌঁছে দিত।[৪৮] এখানে মনে রাখা দরকার, সিরাজউদ্দৌলা কিন্তু একেবারে মৌলিক প্রশ্ন যেটা, সেটা তখন তোলেন নি। কোম্পানির কর্মচারীরা যে দস্তকের ভাওতা দিয়ে নিজেদের ব্যক্তিগত ব্যবসার শুল্ক ফাঁকি দিত সেটা জেনেও সিরাজউদ্দৌলা সে অবৈধ অধিকারকে

৪৪. ফরমানের বিধানসমূহ দ্র., S. Bhattacharyya, *The East India Company and the Economy of Bengal*, (London 1954), 28-29.

৪৫. S. Chaudhuri, *Trade*, 42.

৪৬. Mss. Eur. D. 283, ff. 15, 25.

৪৭. ঐ, f. 15.

৪৮. ঐ, f. 25.

চ্যালেঞ্জ করেন নি। সিরাজ শুধু কোম্পানির কর্মচারীরা যে মোটা টাকার বিনিময়ে দস্তকের মাধ্যমে এশীয় ব্যবসায়ীদের শুল্ক ফাঁকি দেয়ার ব্যবস্থা করে দিত তাতেই আপত্তি জানিয়েছিলেন এবং এভাবে রাজ্যের যে রাজস্বহানি হচ্ছিল তা বন্ধ করতে চেয়েছিলেন। আমাদের পাণ্ডুলিপির অজ্ঞাতনামা লেখক জানাচ্ছেন[৪৯] :

> সিরাজউদ্দৌলা ঘোষণা করেছিলেন, তাঁর কাছে যেসমস্ত রসিদ আছে তা থেকে তিনি প্রমাণ করতে পারবেন যে, ইংরেজরা ফররুখশিয়রের ফরমান পাওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত এশীয় ব্যবসায়ীদের বাণিজ্যকে কোম্পানির দস্তকের মাধ্যমে শুল্কমুক্ত করে বাংলার নবাবকে তাঁর ন্যায্য প্রাপ্য দেড় কোটি টাকার রাজস্ব থেকে বঞ্চিত করেছে।

সুতরাং এসব তথ্য থেকে খুব স্পষ্ট বোঝা যায় যে, দস্তকের অপব্যবহার সম্বন্ধে সিরাজউদ্দৌলার যে অভিযোগ তা খুবই যুক্তিসঙ্গত এবং যথার্থ, কোনক্রমেই তা নবাবের 'মিথ্যা ওজর' নয়।

নবাবের কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে নবাবের অপরাধী প্রজাকে কলকাতায় আশ্রয়দানের একটি প্রকৃষ্ট নমুনা কৃষ্ণদাসের ঘটনা। নবাব আলিবর্দীও এরকম অবৈধ আশ্রয় দানের জন্য ইংরেজ কোম্পানির কাছে কয়েক বারই জোর প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন।[৫০] তথ্য-প্রমাণ থেকে যথেষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়, কৃষ্ণদাসকে আশ্রয়দানের পেছনে ইংরেজদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল এবং সিংহাসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিপ্রেক্ষিতে সিরাজ ন্যায়সঙ্গতভাবেই কৃষ্ণদাসকে নবাবের হাতে প্রত্যর্পণের দাবি জানিয়েছিলেন। কাশিমবাজারের ইংরেজ কুঠির প্রধান উইলিয়ম ওয়াটসই গভর্নর ড্রেকের কাছে কৃষ্ণদাসকে কলকাতায় আশ্রয়দানের জন্য সুপারিশ করেছিলেন। ওয়াটসের ধারণা ছিল, ঘসেটি বেগমের দল, যার অন্যতম প্রভাবশালী সদস্য ছিল কৃষ্ণদাসের-পিতা রাজবল্লভ, তারা মসনদ দখলের লড়াইয়ে নিশ্চিত সাফল্য লাভ করবে। কিন্তু আলিবর্দীর মৃত্যুর ঠিক আগে ওয়াটস বুঝতে পারলেন যে, সিরাজের উত্তরাধিকার সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই এবং তিনি গভর্নর ড্রেক ও ফোর্ট উইলিয়ম কাউন্সিলকে জানিয়ে দিলেন যে, এ অবস্থায় কৃষ্ণদাসকে কলকাতায় রাখা মোটেই সমীচীন হবে না। ড্রেক কিন্তু তাতে কর্ণপাত করেন নি যদিও কাউন্সিলের দুই সদস্য হলওয়েল ও ম্যানিংহামও একই অভিমত প্রকাশ করে বলেন যে, এ অবস্থায় কৃষ্ণদাসকে কলকাতায় রাখা বুদ্ধিমত্তার কাজ হবে না, কারণ তা হলে নতুন নবাবের সঙ্গে কোম্পানির বিরোধ বাধতে পারে।[৫১] অবশ্য হলওয়েল ক'দিন পরেই মত পাল্টেছিলেন, কেননা তখন বাজারে গুজব উঠে যে, ঘসেটি বেগমের দল সিংহাসন দখল করতে পারে। তাই হলওয়েল বলছেন : "কৃষ্ণদাসকে এ সময় কলকাতা থেকে বের করে দেয়া কোম্পানির স্বার্থের দিক থেকে ক্ষতিকর হতে পারে।"[৫২] যাহোক এটা সুস্পষ্ট যে, কৃষ্ণদাসকে আশ্রয় দিয়ে ইংরেজরা শুধু নবাবের কর্তৃত্বকেই অমান্য এবং অবজ্ঞা করে নি, নবাবের শত্রুদের সঙ্গে চক্রান্তেও জড়িত হয়ে পড়েছিল। সুতরাং নবাবের অপরাধী প্রজাকে অন্যায়ভাবে আশ্রয়দানের যে অভিযোগ ইংরেজদের বিরুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলা করেছিলেন, তা খুবই ন্যায়সঙ্গত।

৪৯. ঐ।
৫০. Brijen K. Gupta, *Sirajauddaulah.*, 38-39.
৫১. Holwell to Court of Directors, 30 November 1756, Hill, *Bengal*, Vol. II, 5
৫২. ঐ।

*সিরাজউদ্দৌলার অভিপ্রায়—গভর্নর ড্রেকের মনোভাব*

সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে অভিযোগ—বাংলা থেকে তিনি ইংরেজদের তাড়াতে চেয়েছিলেন। এস. সি. হিল হয়তো এটাকেই নবাবের 'নির্বুদ্ধিতার' চূড়ান্ত ভেবেছেন। ঐতিহাসিকমহলে এ ধারণা এতদিন ধরে এতই স্বতঃসিদ্ধ বলে গৃহীত হয় যে, ক্যামব্রিজের অধ্যাপক ক্রিস বেইলি তাঁর অতি সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থে বলছেন, "সিরাজউদ্দৌলা বাংলা থেকে সব ইংরেজদের তাড়াবার চেষ্টা করেছিলেন।"[৫৩] কিন্তু আমাদের কাছে যা তথ্য আছে তা থেকে এ অভিযোগ ভ্রান্ত প্রমাণ করা যায়। খোজা ওয়াজেদকে লেখা চিঠিতে (২৮ মে ১৭৫৬) সিরাজউদ্দৌলা তাঁর অভিপ্রায় খুব পরিষ্কার করে জানিয়েছেন :

> ইংরেজরা আমার রাজ্যে থাকতে চাইলে তাদের দুর্গগুলি ভেঙ্গে ফেলতে হবে, পরিখা ভরাট করে দিতে হবে এবং নবাব জাফর খানের (মুর্শিদকুলী খান) আমলে যে শর্তে তারা বাণিজ্য করেছে সেই শর্তেই তাদের এখন ব্যবসা করতে হবে। তা না হলে আমার রাজ্য থেকে তাদের বহিষ্কার করা হবে। তারা যেন মনে রাখে, আমিই এ রাজ্যের নবাব।…ইংরেজরা যাতে পূর্বোক্ত শর্তগুলো মেনে নিতে বাধ্য হয়, সে ব্যবস্থা করার ব্যাপারে আমি বদ্ধপরিকর।[৫৪]

এর কিছুকাল পর ওয়াজেদকে লেখা দ্বিতীয় চিঠিতে (১জুন ১৭৫৬) সিরাজ আরো বলছেন : "ইংরেজরা যদি তাদের উপরোক্ত আচরণগুলো সংশোধন করবে বলে কথা দেয়, তাহলে আমি তাদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করবো এবং তাদেরকে আমার রাজ্যে থাকতে দেবো।"[৫৫] এ চিঠিগুলো থেকে এটা স্পষ্ট যে, সিরাজউদ্দৌলা আসলে চেয়েছিলেন ইংরেজরা যেন তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও কাজকর্মকে ১৭১৭ সালের ফরমানের শর্তগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে এবং ফরমানে বাণিজ্যের যেসব সুবিধা দেয়া আছে সেসবের যেন যথেচ্ছ অপব্যবহার না করে। সিরাজ যে ইংরেজদের বাংলা থেকে তাড়িয়ে দিতে চান নি সেটা ফোর্ট সেন্ট জর্জের (মাদ্রাজ) গভর্নর পিগটকে লেখা তাঁর চিঠিতে সুস্পষ্ট : "সুবা বাংলায় ইংরেজ কোম্পানির ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করা বা এখান থেকে ইংরেজদের তাড়িয়ে দেয়া মোটেই আমার অভিপ্রায় নয়।"[৫৬] আমাদের অজ্ঞাতনামা লেখকও বলছেন : "ইংরেজরা যদি জাফর খানের আমলে যে শর্তে বাণিজ্য করতে সে শর্তেই আবার ব্যবসা করতে রাজি না হয়, তাহলে সিরাজউদ্দৌলা বাংলায় তাদের ক্ষমতা হ্রাস করতে এবং বাংলা থেকে তাদের বহিষ্কার করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন।"[৫৭]

নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের যে সংঘর্ষ ও নবাবের কলকাতা দখলের আগের যে ঘটনাপ্রবাহ, তা বিশ্লেষণ করে এ সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, গভর্নর ড্রেকের কঠোর ও অনমনীয় মনোভাব শেষ পর্যন্ত এ সংঘর্ষকে অনিবার্য করে তুলেছিল। ইংরেজ কোম্পানির কর্মচারীদের লেখা থেকেই আমাদের বক্তব্যের প্রচুর সমর্থন পাওয়া যাবে। কাশিমবাজার থেকে কলকাতা অভিযানের পথে ওয়াটস দুর্লভরামের সঙ্গে মিটমাটের আলোচনার বিবরণ

---

৫৩. C. A Bayly, *Indian Society*, 46
৫৪. Siraj to Wazid, 28 May 1756, Hill, *Bengal*, Vol 1, 3
৫৫. ঐ, 4
৫৬. Siraj to Pigot, 30 June 1756, *Ibid.*, 196.
৫৭. Mss., Eur D. 283, f. 26

দিয়ে ড্রেককে এক গোপন পত্র লিখেছিলেন। কিন্তু ওয়াটস জানাচ্ছেন যে, "ড্রেক তাতে কোন সাড়াই দেন নি। বরং নবাবের সঙ্গে মীমাংসায় যেতে ড্রেক একেবারেই নারাজ।"[৫৮] খুব সম্ভবত ড্রেক ভেবেছিলেন, নবাবের অভিযোগগুলো ইংরেজদের বাংলা থেকে বিতাড়নের এবং তাদের ধন-সম্পত্তি দখল করার মিথ্যা অজুহাত। তাই ড্রেক চেয়েছিলেন সামরিক শক্তি প্রদর্শন ক'রে নবাবকে কাবু করতে। ওয়াটস, কোলেট ও বেটসন আবার ৩১ মে ড্রেক ও ফোর্ট উইলিয়ম কাউন্সিলকে লিখিত পত্রের মাধ্যমে অনুরোধ জানালেন 'নবাবকে' আপোসের সুরে একটি চিঠি লিখতে। ড্রেক সেটাও অগ্রাহ্য করলেন। এদিকে কলকাতার ধনী ব্যবসায়ী উমিচাঁদ ও খোজা ওয়াজেদের কলকাতা প্রতিনিধি শ্রীবাবুর আপোসচেষ্টা ড্রেকের আগ্রহের অভাবে ব্যর্থ হলো। কাশিমবাজার কুঠি অবরোধ এবং ইংরেজদের শর্তাধীন আত্মসমর্পণে ড্রেক খুবই ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। শ্রীবাবুকে ড্রেক নাকি বলেছিলেন, সিরাজ যতো তাড়াতাড়ি কলকাতা আক্রমণ করবেন ততোই মঙ্গল, তা হলে ড্রেক তাঁর পছন্দসই নবাব সিংহাসনে বসাতে পারবেন।[৫৯]

শ্রীবাবু দ্বিতীয় বারের প্রচেষ্টায় ১০ জুন ড্রেককে দিয়ে সিরাজউদ্দৌলার কাছে একটা *চিঠি লেখাতে সক্ষম হলেন, কিন্তু সে চিঠিতে যদি সমঝোতার কোন সুর থেকেও থাকে* তা ড্রেকই বানচাল করলেন ঐ একই দিনে থানা ও সুখসাগরে নবাবের দুটো ছাউনি আক্রমণ করার আদেশ দিয়ে।[৬০] নবাবের সঙ্গে একটা চূড়ান্ত বোঝাপড়ায় ড্রেক যে দৃঢ়সঙ্কল্প, তা ওয়াটস ও কোলেটের চিঠির (১২ জুন, তারা তখনও নবাবের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে কলকাতার পথে) যে উত্তর ড্রেক দিচ্ছেন তা থেকে সুস্পষ্ট : "কাশিমবাজারে কোম্পানির যে অবমাননা হয়েছে, তার পরে ইংরেজরা নবাবের সঙ্গে কোন সমঝোতায় আসতে একেবারেই নারাজ।"[৬১] আপোস-মীমাংসার শেষ চেষ্টা করেছিলেন ফরাসী কোম্পানির প্রাক্তন কর্মচারী ও তখন নবাবের গোলন্দাজ বাহিনীর অধিনায়ক মার্কি দ্যা সা জাঁক (১৩ জুন)। ড্রেক এ প্রস্তাবের উত্তর দিয়েছিলেন, জাঁক যেন নবাবকে ছেড়ে ইংরেজদের পক্ষে চলে আসেন। সুতরাং উপরের আলোচনা থেকে সিদ্ধান্ত করা ভুল হবে না যে, ড্রেকের মারমুখো ও অনমনীয় মনোভাব ইংরেজদের সঙ্গে নবাবের ১৬ জুনের সংঘর্ষকে অনিবার্য করে তুলেছিল। ইংরেজ কোম্পানির কর্মচারী রিচার্ড বেচারের মন্তব্য এখানে প্রণিধানযোগ্য:

> এ কথা কি কখনো কল্পনা করা যায় যে কোন রাজার (দোষী) প্রজাকে একদল বিদেশী বণিক আশ্রয় দেবে?...কিংবা তাঁর দূতকে অপমান করলে রাজা সেই অপমান নির্বিবাদে মেনে নেবেন?...দূতকে (অপমান করে) তাড়িয়ে দেয়াটা সারা পৃথিবীতেই রাজার অবমাননা বলে গণ্য হবে...।[৬২]

৫৮. Watts & Collet to Court of Directors, 16 July 1756, Hill, *Bengal,* Vol I, 103.
৫৯. Watts & Collet to Court of Directors, 17 July 1756, ঐ, 116-17.
৬০. ঐ।
৬১. ঐ, 104
৬২. Bengal Letters Received, Vol. 23, f. 460, India Office Library, London, Richard Becher to Roger Drake, 22 March 1757.

## পলাশী-চক্রান্ত

ক. *মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতা*

পলাশী-চক্রান্তের নায়ক মীর জাফরই এবং তিনিই আসল বিশ্বাসঘাতক—এ ধারণা বহুল প্রচলিত। বাংলায় মীর জাফর নামটাই বিশ্বাসঘাতকতার প্রতীক হয়ে গেছে—ওটা বিশ্বাসঘাতকতার সমার্থক শব্দ। এ ধরনের বিকৃত মনোভাব সমাজে প্রচলিত হয়েছে এই ধারণা থেকেই যে, পলাশী-চক্রান্ত এবং পলাশী যুদ্ধে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবের পরাজয়ের জন্য দায়ী শুধু 'বিশ্বাসঘাতক' মীর জাফরই। সুতরাং শুধু মীর জাফরই 'বিশ্বাসঘাতক' বলে যে ধারণা প্রচলিত তা কতটা ঐতিহাসিকভাবে সত্য, তার তথ্যভিত্তিক বিচার-বিশ্লেষণ খুবই প্রয়োজন।

এখানে বলে নেয়া দরকার, মীর জাফর পলাশী-চক্রান্তে যোগ দিয়েছিলেন এবং পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন এটা খুবই সত্য—এটাকে অস্বীকার করার কোন চেষ্টা এখানে করা হচ্ছে না। যে মূল প্রশ্নের উত্তর আমরা খুঁজছি তা হলো, মীর জাফরই কি একমাত্র ব্যক্তি, যিনি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন বা পলাশী-চক্রান্তের আসল নায়ক ছিলেন? বস্তুত আমাদের কাছে এমন তথ্য-প্রমাণ আছে যা থেকে সন্দেহাতীতভাবে বলা যায়, পলাশী-চক্রান্তের মূল নায়ক জগৎশেঠরা, মীর জাফর নয়। ইংরেজরা প্রথমে সিরাজের স্থলে নবাব হিসেবে ইয়ার লতিফ খানকে[৬৩] বসানোর চেষ্টা করেছিল; কিন্তু শেষপর্যন্ত তারা জগৎশেঠদের মনোনীত প্রার্থী মীর জাফরের[৬৪] দিকে ঝুঁকলো, কারণ তারা জানতো, জগৎশেঠদের সাহায্য ছাড়া বাংলায় কোন রাজনৈতিক পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে না। মঁসিয়ে জাঁ ল পরিষ্কার বলছেন : "আমি ভাল করেই জানি, বাংলায় এ ঘটনার পেছনে মূল প্রেরণা জগৎশেঠদের। ইংরেজরা যা করেছে তাদের সমর্থন ছাড়া তা করতে তারা কখনো ভরসা পেতো না।"[৬৫] সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বিশ্বাসঘাতকতার দায় শুধু মীর জাফরের নয়—জগৎশেঠদের দায় মীর জাফরের চাইতে বেশি বই কম নয়।

আসলে ইতিহাস পরিক্রমায় একটু পিছিয়ে গেলেই দেখা যাবে যে, আঠারো শতকের প্রথমার্ধে বাংলার সব ক'টা রাজনৈতিক পালাবদলে জগৎশেঠরাই মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে। এ সময়কার রাজনীতিতে পটপরিবর্তনের চাবিকাঠি ছিল জগৎশেঠদের হাতেই। মঁসিয়ে ল লিখছেন, "অনেক দিন ধরে বাংলায় যেসব রাজনৈতিক বিপ্লব হয়েছে সেগুলোর প্রধান হোতা ছিল তারাই (জগৎশেঠরা)।" রবার্ট ওরমে এমন সন্দেহও প্রকাশ করেছেন যে,

৬৩. ওরমে তাৎপর্যপূর্ণভাবে বলেন, "Seths had long been connected with Mir Jafar who although despised the wretched character of Surajah Dowla, dreaded the excesses of it" Robert Orme. *History*, Vol. II, Sec. I, 148.

৬৪. S. C. Hill, *Bengal*, Vol. III, 185.

৬৫. S. C. Hill, *Three Frenchmen in Bengal*, (London 1903), 77.

জগৎশেঠরাই নবাব সিরাজউদ্দৌলা সম্বন্ধে ইংরেজদের আসল উদ্দেশ্য বের করার কাজে ইয়ার লতিফ খানকে নিযুক্ত করেছিলেন।[৬৬] রবার্ট ক্লাইভের লেখা চিঠিপত্র দেখার পর সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে, পলাশী-চক্রান্তের পেছনে সবচেয়ে বড় শক্তি ছিল জগৎশেঠরাই। ১৭৫৭ সালের ৩০ এপ্রিল ক্লাইভ লিখেছেন : "কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি এ চক্রান্তের নেপথ্যে থাকলেও আসল নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জগৎশেঠ নিজেই।" ঐ বছরের জুন মাসে ক্লাইভ জগৎশেঠ সম্বন্ধে আবার জানালেন :

> ...যেহেতু তিনি তিনটি সুবার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ধনসম্পত্তির মালিক এবং সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি, এবং যেহেতু মুগল দরবারেও তাঁর যথেষ্ট প্রতিপত্তি, সেহেতু স্বাভাবিকভাবেই বাংলার নবাবের সঙ্গে ব্যাপারগুলো নিষ্পত্তির জন্য তাঁকেই যোগ্যতম ব্যক্তি হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছে।[৬৭]

তবে এখানে বলা প্রয়োজন, মঁসিয়ে জাঁ ল মন্তব্য করেছেন যে, "মোহনলাল যদি সুস্থ থাকতেন এবং স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতারহিত না হতেন, তাহলে জগৎশেঠদের চক্রান্ত এত সহজে সফল হতো না। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, মোহনলাল কিছুদিন ধরে এবং বিশেষকরে চরম বিপদের এই মুহূর্তে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন।" করম আলিও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, মোহনলালকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়েছিল।[৬৮]

খ. *পলাশী-চক্রান্তে ইংরেজদের ভূমিকা*

ইদানীং ঐতিহাসিকদের মধ্যে পলাশী-চক্রান্তে ইংরেজদের ভূমিকা সম্পর্কে আশ্চর্য রকমের ঐকমত্য দেখা যাচ্ছে। এঁদের বক্তব্য—পলাশী সম্বন্ধে ইংরেজদের কোন 'পূর্বপরিকল্পনা' ছিল না। এ চক্রান্তের উদ্ভব বা বিকাশে ইংরেজদের কোন ভূমিকাই নেই; মুর্শিদাবাদ "দরবারের অন্তর্দ্বন্দ্বই ইংরেজদের অনিবার্যভাবে বাংলার রাজনীতিতে টেনে এনেছিল।"[৬৯] কিন্তু পলাশী-প্রাক্কালীন ঘটনাবলী এবং আমাদের কাছে যেসব তথ্য-প্রমাণ আছে সেগুলোর সূক্ষ্ম ও নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ করে স্পষ্টত দেখা যাবে, ইংরেজরাই পলাশীর মূল ষড়যন্ত্রকারী। সিরাজউদ্দৌলাকে হটিয়ে অন্য কাউকে মসনদে বসাবার ব্যাপারে তারাই সবচেয়ে বেশি উৎসাহ যুগিয়েছিল। শুধু তাই নয়,পলাশী যুদ্ধের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত প্রধান প্রধান দেশীয় চক্রান্তকারী যাতে শেষ পর্যন্ত ষড়যন্ত্রে যুক্ত থাকে, সেজন্য ইংরেজরা বরাবর চেষ্টা করেছে।[৭০] এসব ষড়যন্ত্রকারীর মধ্যে অধিকাংশই খোলাখুলিভাবে কোন পক্ষ

৬৬. Robert Orme, *History*, Vol II, Sec I, 148

৬৭. Clive to Pigot, 30 April 1757, Hill, *Bengal*, Vol II, 457, 468, Clive to Select Committee, 30 June 1757, quoted in Bayly, *Indian Society*, 50.

৬৮. Law's Memoir, S. C Hill, *Bengal*, Vol III, 190, Karam Ali, *Muzaffarnamah*, 70

৬৯. Peter Marshall, *Bengal*, 91; Bayly, *Indian Society*, 50; Rajat Ray,' Colonial Penetration', 7, 11, 12

৭০. উদাহরণ স্বরূপ দেখুন, Law's opinion of Durlabh Ram, Law's Memoir, Hill, *Bengal*, Vol. III, 191

নিতে চায় নি, তাদের উদ্দেশ্য ছিল যে দল শেষ পর্যন্ত জিতবে সেই দলে ভিড়ে যাওয়া। আমাদের এ বক্তব্যকে এ দেশীয় ষড়যন্ত্রকারীদের দোষ স্খালনের প্রচেষ্টা হিসেবে ধরে নেয়া ভুল হবে। মুর্শিদাবাদ দরবারের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একটি অংশ তরুণ নবাব সিরাজউদ্দৌলার প্রতি বিরূপ হয়ে একটা চক্রান্ত করেছিল, এ কথা আমরা অস্বীকার করছি না। কিন্তু আমরা যে বক্তব্যে জোর দিচ্ছি তা হলো, ইংরেজদের নেতৃত্বেই পলাশী-চক্রান্ত পূর্ণ অবয়ব পেয়েছিল এবং খুব সম্ভবত ইংরেজদের কার্যকর অংশগ্রহণ ছাড়া এ চক্রান্ত পরিপূর্ণ রূপ নিয়ে নবাবের পতন ঘটাতে পারতো না। মঁসিয়ে জাঁ ল পরিষ্কার জানাচ্ছেন ইংরেজরা কিভাবে নবাবের প্রতি বিরূপতার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে এবং বুদ্ধিমানের মতো ঠিক জায়গায় টাকা ছড়িয়ে দরবারের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের হাত করেছিল।[৭১]

বস্তুতপক্ষে ফোর্ট সেন্ট জর্জ কাউন্সিল ক্লাইভ ও ওয়াটসনের নেতৃত্বে অভিযানকারী সৈন্যদলকে বাংলায় পাঠাবার সময় যে নির্দেশ দিয়েছিল (১৩ অক্টোবর ১৭৫৬) তার মধ্যেই পলাশী-চক্রান্তের বীজ নিহিত ছিল। এই নির্দেশের মধ্যেই অভিযানের উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, শুধু "কলকাতা পুনরুদ্ধার" এবং "যথেষ্ট পরিমাণ ক্ষতিপূরণ আদায়" অভিযানকারী দলের উদ্দেশ্য হবে না, "বাংলার নবাবের অত্যাচারে বিক্ষুব্ধ বা নবাব হওয়ার মতো উচ্চাভিলাষী কোন শক্তি বা গোষ্ঠীর সাথে যেন তারা গোপন আঁতাত করার চেষ্টা করে"।[৭২] শেষদিকের অংশটুকুর তাৎপর্য বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। মাদ্রাজ থেকে রওনা হওয়ার আগেই ক্লাইভ লিখেছেন, সিরাজউদ্দৌলা 'দুর্বল শাসক' এবং "তাঁর দরবারের বেশিরভাগ লোকই তাঁর প্রতি বিরূপ"।[৭৩] দরবারের মধ্যে এই যে অসন্তোষ তা নিয়েই, ক্লাইভের ভাষায়, ইংরেজরা "রাজনীতির দাবা খেলায় বাজিমাৎ" করেছিল[৭৪] এবং এভাবেই তারা ষড়যন্ত্র পাকাপোক্ত করে শেষ পর্যন্ত পলাশীতে নবাবের পতন ঘটিয়েছিল। ক্লাইভ যখন তাঁর পিতাকে লিখছেন, "বাংলায় এ অভিযান সফল হলে আমি বিরাট কিছু করতে পারবো", তখন নিশ্চয়ই ক্লাইভ একেবারে কল্পলোকে বাস করছিলেন না। ক্লাইভ এবং ওরমে দু'জনেই স্কটের বাংলা বিজয়ের বিশদ পরিকল্পনার কথা জানতেন—এসংক্রান্ত পাণ্ডুলিপিটি মাদ্রাজেই ছিল। ১৭৪৯-৫০ সালের শীতকালে ক্লাইভ যখন কলকাতায় এসেছিলেন, বাংলার অগাধ ঐশ্বর্য তখন ক্লাইভের মনে যথেষ্ট দাগ কেটেছিল। তাঁর ব্যক্তিগত ব্যবসার এক সহযোগী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, বাংলায় যদি যুদ্ধ লাগে তাহলে ক্লাইভ রাতারাতি মহা বড়লোক হয়ে যাবেন।[৭৫] এই পরিপ্রেক্ষিতে মাদ্রাজের উপকূল অঞ্চলের পরিস্থিতির জন্য বাংলা থেকে তাঁকে সেখানে সরিয়ে নেয়া হতে পারে বলে ক্লাইভের যে উদ্বেগ তা সহজেই বোধগম্য হয়।[৭৬]

---

৭১. ঐ, 185

৭২. *Records of Fort St. George, Diary & Consultation Books*, Military Dept 1756, Madras, 1913, 330, Orme Mss., Vol. 170, f. 99, India Office Library, London, Hill, *Bengal*, Vol I, 239-40

৭৩. Orme Mss, O V, Vol. 6, f 1500, India Office Library, London

৭৪. Clive to his father, 5 October 1756, Hill, *Bengal*, Vol I, 227

৭৫. Pour's Collection, Box 20, John Brown to Clive, 27 February 1752, quoted in Mark Bence - Jones, *Clive of India*, (London 1974), 93

৭৬. Hill, *Bengal*, Vol. I, 228

নবাবের বিরুদ্ধে ক্ষোভ বা অসন্তোষ ষড়যন্ত্রের উপযুক্ত পরিমণ্ডল তৈরি করতে পারে হয়তো, কিন্তু ষড়যন্ত্র দানা বাঁধার পক্ষে শুধু সেটাই পর্যাপ্ত নয়। সেজন্য দরবারের বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী সম্বন্ধে ইংরেজদের সঠিক ধারণা লাভের প্রয়োজন ছিল। অংশত সেটা নির্ণয় করার জন্যই ইংরেজরা হুগলী আক্রমণ করে (৯ জানুয়ারি, ১৭৫৭)। ফোর্ট উইলিয়ম কাউন্সিলের চিঠি (৩১ জানুয়ারি, ১৭৫৭) থেকে তা সুস্পষ্ট :

> নবাবের সৈন্যদের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার করা এবং বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর লোকজনকে আমাদের দলে যোগদানে উৎসাহিত করার জন্য হুগলী শহর দখল ও ধ্বংস করা এতটা জরুরি হয়ে পড়েছিল...এতে আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়েছে বলে বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে।[৭৭]

এমনকি ১৭৫৭ সালের মার্চ মাসেও ইংরেজরা যখন চন্দননগরের অবরোধ নিয়ে ব্যস্ত, তখন ফোর্ট উইলিয়ম কাউন্সিলের সিলেক্ট কমিটি কাশিমবাজারে উইলিয়ম ওয়াটসকে নির্দেশ দিচ্ছে "জগৎশেঠরা ইংরেজদের পক্ষ যাতে সমর্থন করে তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে"।[৭৮]

কোন কোন ঐতিহাসিকের বক্তব্য[৭৯], বাংলার মসনদ দখলের জন্য বরঞ্চ এ দেশীয় ষড়যন্ত্রকারীরাই ইংরেজদের সাহায্য চেয়ে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। কিন্তু কোম্পানির কর্মচারীদের লেখা খুঁটিয়ে পড়লে সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে, ইংরেজরাই নিজেদের 'পরিকল্পিত বিপ্লব' ঘটাবার জন্য বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে। ক্লাইভের বিশ্বাসভাজন জন ওয়ালস্‌কে কাশিমবাজার থেকে স্ক্র্যাফটন ৯ এপ্রিল লিখেছেন :

> ঈশ্বরের দোহাই, একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী আমাদের এগোতে হবে। ...ঘটনাস্রোত যদি অন্যদিকে মোড় নেয় (বিরোধের দিকে ?) সেটা ভেবে এখন থেকে আমাদের ব্যবস্থা নেয়া দরকার; মিঃ ওয়াটসকে এ বিষয়ে একটু ইঙ্গিত ও সামান্য উৎসাহ দিলেই সে একটি দল তৈরি করতে লেগে যাবে, যেটা বিপদের সময় কাজে লাগবে। কোম্পানির অনুগত একজন নবাবকে (বাংলার মসনদে) বসাতে পারলে ব্যাপারটা কোম্পানির পক্ষে কি গৌরবজনকই না হবে![৮০]

স্ক্র্যাফটন ১৮ এপ্রিল আবার ওয়ালস্‌কে লিখেছেন, ইয়ার লতিফ খানকে নতুন নবাব হিসেবে বসাবার প্রস্তাব দিয়ে[৮১] ওয়াটসকে লেখা ২৬ এপ্রিলের চিঠিতে ক্লাইভ এ পরিকল্পনা সমর্থন করেছেন। এদিকে ২৩ এপ্রিল ফোর্ট উইলিয়মের সিলেক্ট কমিটিতে সিরাজউদ্দৌলাকে সরিয়ে অন্য কাউকে নবাব করার নীতি সরকারিভাবে গৃহীত হলো।[৮২] আবার ঐ একই দিনে ক্লাইভ সিলেক্ট কমিটিকে অনুরোধ করলেন স্ক্র্যাফটন যাতে মুর্শিদাবাদে থাকতে পারেন তার অনুমতি দিতে। কারণ ক্লাইভ ওখানে "স্ক্র্যাফটনের উপর

৭৭. Bengal Council to the Secret Committee, 31 January 1757, Bengal Letters Record, Vol. 23, f. 205.
৭৮. Select Committee to William Watts, 14 March 1757, Orme Mss., India V, f, !275; Orme Mss., O V. 170, f. 397, India Office Library, London
৭৯. উদাহরণ স্বরূপ দ্র. Ghulam Husain Khan (*Sier*); Robert Orme, *History*, and recently Rajat Ray, 'Colonial Penetration'.
৮০. Scrafton to Walsh, 9 April 1757, Hill, *Bengal*, Vol. III, 343.
৮১. Scrafton to Walsh, 18 April 1757, *Ibid.*, Vol. II, 342-43
৮২. ঐ, 368

কিছু জরুরি কাজের ভার দিতে চান।"[৮৩] এ কাজটা যে "দরবারের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বাজিয়ে দেখা" সেটা আন্দাজ করে সিলেক্ট কমিটি ক্লাইভের অনুরোধে সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল। কমিটি ২৮ এপ্রিল প্রস্তাব দিল : "কর্নেল ক্লাইভ যেন নবাবের প্রতি দরবারের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মনোভাব এবং এ নবাবকে সরিয়ে অন্য কাউকে মসনদে বসানোর পরিকল্পনায় তাদের প্রতিক্রিয়া জানার জন্য উপযুক্ত লোককে নিয়োগ করে।"[৮৪] সুতরাং ওয়াটস ও স্ক্র্যাফটন ইংরেজদের 'পরিকল্পনায়' দরবারের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমর্থন লাভের কাজে উঠে পড়ে লেগে যান।

রবার্ট ওরমের প্রদত্ত বিবরণে জানা যায় যে, "মীর জাফর নবাবের প্রতি বিরূপ হয়েছেন বলে খবর পেয়ে" ক্লাইভ ওয়াটসকে মীর জাফরের সঙ্গে "বন্ধুত্ব স্থাপন করতে" নির্দেশ দেন।[৮৫] ওরমে আরো জানান, দরবারের ক্ষোভ ও অসন্তোষ পরিমাপ করতে ওয়াটস ও স্ক্র্যাফটনই উমিচাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন, এর পরই উমিচাঁদ নবাবের পদস্থ অমাত্যদের নিকট নিয়মিত যাতায়াত শুরু করেন।"[৮৬] ফলে ২৩ এপ্রিল ইয়ার লতিফ খান ওয়াটসের সঙ্গে গোপন আলোচনায় বসার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ওয়াটস তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে উমিচাঁদকে নবাবের এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী সেনাপতির সঙ্গে কথা বলতে পাঠান। ইয়ার লতিফ উমিচাঁদের কাছে তাঁর নবাব হওয়ার বাসনা ব্যক্ত করেন এবং জানান যে, রায়দুর্লভ ও জগৎশেঠরা তাঁকে সমর্থন করবেন। ওয়াটস এ প্রস্তাব সঙ্গে সঙ্গে লুফে নিলেন এবং ক্লাইভকে এ কথা জানালেন। ক্লাইভও সত্বর সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। কিন্তু যুদ্ধ, নিরন্তর পরিবর্তন এবং সুযোগসন্ধানীদের স্বার্থসিদ্ধির এই যুগে মসনদের আরেকজন প্রার্থী রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হলেন। ওরমে যদিও বলছেন, মীর জাফর কলকাতার আর্মেনীয় ব্যবসায়ী খোজা পেট্রুজের মাধ্যমে তাঁর প্রস্তাব ইংরেজদের কাছে পাঠান, ওয়াটস নিজে তাঁর পিতাকে পরে লিখেন যে, তিনি "নিজেই মীর জাফরের সঙ্গে যোগাযোগ করেন"; মীর জাফর "খুব আগ্রহভরে আমার প্রস্তাবে সায় দেন এবং আমাদের সহায়তায় নবাব হওয়ার বিনিময়ে যেকোন যুক্তিসঙ্গত শর্তাবলীতে স্বাক্ষর করতে রাজি হন।"[৮৭] খুব সম্ভবত ইংরেজরা বুঝতে পেরেছিল, শুধু ইয়ার লতিফের নামে তারা তাদের 'কঠিন কার্যোদ্ধার' করতে পারবে না। তাই তারা তাকে ছেড়ে মীর জাফরের দিকে ঝুঁকলো, কারণ মীর জাফর শুধু সবচেয়ে ক্ষমতাশালী সেনাপতিই নন, তাঁর পক্ষে জগৎশেঠদেরও সমর্থন আছে। কলকাতায় সিলেক্ট কমিটিও মীর জাফরকে নতুন নবাব করার সিদ্ধান্ত নিল এবং ওয়াটসকে মীর জাফরের সঙ্গে চুক্তির শর্তাবলী চূড়ান্ত করার দায়িত্ব দেয়া হলো।

৮৩. Select Committee Consultations, 23 April 1757, Orme Mss., India V, f 1212, Orme Mss., O. V. 170, f. 222, India Office Library, London.

৮৪. Orme Mss., India V, f 1214.

৮৫. Robert Orme, *History*, Vol. II, Sec. I, 148.

৮৬. ঐ।

৮৭. ঐ, 149; Watts to his father, 13 August 1757, Hill, *Bengal*, Vol. II, 467.

কিন্তু পলাশী-চক্রান্তের তখনো অঙ্কুরাবস্থা। মীর জাফর এ ষড়যন্ত্রে তখন পর্যন্ত পুরোপুরি সামিল হন নি। তাই ক্লাইভ ২ মে ওয়াটসকে লিখেন মীর জাফরকে যেন আশ্বস্ত করা হয় যে, উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই, ইংরেজরা নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে দেশ থেকে বিতাড়িত করার মতো যথেষ্ট ক্ষমতা রাখে এবং ক্লাইভ নিজে তাঁর একজন সৈন্যও জীবিত থাকতে মীর জাফরকে পরিত্যাগ করবেন না।[৮৮] এদিকে সিলেক্ট কমিটিও অস্থির হয়ে পড়ে এবং ১৭ মে স্ক্র্যাফটনকে নির্দেশ দেয় মীর জাফরের সঙ্গে একটা গোপন বৈঠক করে "আমাদের পরিকল্পনাকে কিভাবে রূপায়িত করা যায় তার একটা ছক তৈরি করতে, আমাদের দাবিগুলো যে এমন কিছু বেশি নয় তা তাঁকে ভাল করে বোঝাতে…এবং আমাদের কথার যে কোন নড়চড় হবে না এবং তাকে যে আমরা নবাব করতে বদ্ধপরিকর সে সম্বন্ধে তাকে নিশ্চিত করতে।"[৮৯] কিন্তু কোন চুক্তি স্বাক্ষরিত না হওয়াতে ওয়াটস প্রায় ক্ষেপে যান। মীর জাফর ৩০ মে থেকে মুর্শিদাবাদে ছিলেন, তা সত্ত্বেও ওয়াটস মীর জাফরের সঙ্গে কোন চুক্তি সম্পাদন করতে পারেন নি। অত্যন্ত বিরক্ত ও হতাশ হয়ে ওয়াটস ৩ জুন লিখছেন, "এসব অস্থিরচিত্ত, মিথ্যাচারী, মেরুদণ্ডহীন বদলোকের উপর নির্ভর না করে ইংরেজরা নিজেরাই সবকিছু করতে পারতো।"[৯০] ব্যাপারটা নিয়ে লোকেরা প্রকাশ্যে বলাবলি করছে দেখে ক্লাইভও চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন এবং বর্ষা আরম্ভ হওয়ার আগেই ক্লাইভ অভিযানটি শেষ করতে চেয়েছিলেন। অবশেষে ওয়াটস ৫ জুন মীর জাফরকে দিয়ে লাল ও সাদা কাগজে দু'টি চুক্তি সই করাতে সক্ষম হন: লাল কাগজের চুক্তিটি, যাতে নবাবের কোষাগারের পাঁচ শতাংশ উমিচাঁদের প্রাপ্য বলে বলা আছে, তা নিছক প্রবঞ্চনা মাত্র। এতে ওয়াটসনের সই ক্লাইভের জ্ঞাতসারেই জাল করা হয়েছে বলে সন্দেহ করা হয়। নবাব পদে উমিচাঁদের মনোনীত প্রার্থী ইয়ার লতিফকে বাদ দেয়ার ফলে উমিচাঁদ নবাবের সম্পদের যে ভাগ চেয়েছিলেন, সেটাকে ফাঁকি দেয়ার জন্যই ক্লাইভের এই চাতুরী। অবশ্য রাজবল্লভ সাদা কাগজের চুক্তি সম্বন্ধেও আপত্তি জানালেন এই বলে যে, চুক্তির চাহিদা মেটাবার মতো টাকা নবাবের কোষাগারে নেই। তাঁকে নবাবের সম্পদের পাঁচ শতাংশ দেবার প্রতিশ্রুতিতে তাঁর আপত্তি আর রইলো না।

চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পরেও কিন্তু সিলেক্ট কমিটি তাদের 'বিপ্লবের' পরিকল্পনা রূপায়ণের ব্যাপারে খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লো। ১১ জুন কমিটি আলোচনা করলো "তখনই কি সোজা মুর্শিদাবাদ অভিমুখে অভিযান করা সমুচিত হবে, না কি মীর জাফরের কাছ থেকে আরো বিস্তারিত তথ্যাদি পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা হবে।" কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে মত প্রকাশ করলো যে, "মীর জাফরকে মসনদে বসাবার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার জন্য এর চেয়ে সুবর্ণ সুযোগ আর আসবে না।" কারণ আর দেরি করলেই সিরাজউদ্দৌলা

৮৮. Clive to Watts, 2 May 1757, Hill, *Bengal*, Vol. II, 373.

৮৯. Orme Mss., India V. f. 1228; Orme Mss, O. V. 170, f. 265

৯০. Hill, *Bengal*, Vol. II, 397.

ষড়যন্ত্রের ব্যাপারটি জেনে ফেলতে পারেন। তখন মীর জাফরকে তৎক্ষণাৎ সরিয়ে দেয়া হবে এবং ফলে "আমাদের পুরো পরিকল্পনাই বানচাল হয়ে যাবে"। ইংরেজদের তখন "দেশের সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধে একাই লড়াই করতে হবে।"[৯১] কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ক্লাইভ ১০ জুন পলাশী অভিমুখে যাত্রা করেন।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা সুস্পষ্ট যে গোলাম হোসেন ও জাঁ ল'র যে বক্তব্য অধিকাংশ আধুনিক ঐতিহাসিক সহজে ও নির্বিবাদে গ্রহণ করেছেন সেটা, অর্থাৎ মুর্শিদাবাদ দরবারের সব গণ্যমান্য ব্যক্তি ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা নবাবের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে তাঁকে সরাতে অত্যন্ত আগ্রহী ছিল—তা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। এমন কি দুর্লভরাম পর্যন্ত খোলাখুলিভাবে কোন পক্ষে যোগ দিতে উৎসাহী ছিলেন না। তাদের অনেকেই ওঁৎ পেতে বসে ছিল যে দল শেষ পর্যন্ত জয়ী হবে সে দলে ভিড়ে যাওয়ার জন্য।[৯২] তা ছাড়া আমরা যেসব তথ্য-প্রমাণ বিশ্লেষণ করেছি তা থেকে এটাও পরিষ্কার যে, অন্য ষড়যন্ত্রকারীদের চেয়ে ইংরেজরাই তাদের 'নিজেদের বিপ্লবের পরিকল্পনাকে' কার্যকর করার জন্য বেশি তৎপর হয়ে পড়েছিল এবং পলাশী-চক্রান্ত মোটেই এ দেশীয়দের মস্তিষ্কপ্রসূত নয়।

**রাজ্যজয়, আধা-সাম্রাজ্যবাদ ও ব্যক্তিগত ব্যবসা**

১৭৫০-এর দশকের শুরুতে বাংলায় বাণিজ্যে নিয়োজিত ইউরোপীয় বণিকেরা সম্পদশালী বাংলাদেশকে জয় করার বিষয় প্রকাশ্যে আলোচনা করতো। ফরাসী কোম্পানির বুসি বা ইংরেজ কোম্পানির ওরমে কিংবা ভাড়াটে ইংরেজ সৈন্য কর্নেল মিল সবাই নিশ্চিত ছিলেন যে, 'বাংলা বিজয় আসন্ন' এবং এই দেশে 'প্রভুত্ব করা' অত্যন্ত সহজ ব্যাপার।[৯৩] এটা মোটেই 'দিবাস্বপ্ন' ছিল না। ইংরেজ কোম্পানির কর্মচারী স্কটের দৃষ্টান্ত থেকেই বোঝা যায়, ইউরোপীয়দের অনেকেই এটা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতো। বস্তুত কলকাতায় ইংরেজ কোম্পানির প্রধান ইঞ্জিনিয়ার স্কট আঠারো শতকের পঞ্চাশের দশকের প্রথমদিকে বাংলা বিজয়ের এক বিশদ পরিকল্পনা পর্যন্ত তৈরি করে ফেলেছিলেন। তাতে এ 'গৌরবময় ঘটনায়' কোম্পানি কি পরিমাণ লাভবান হবে তার বিস্তারিত বর্ণনা ছিল। স্কট জোর দিয়ে বলেছিলেন, "বাংলা জয় করতে পারলে ইংরেজ জাতির প্রভূত লাভ হবে" এবং এ রাজ্যজয়ের ফলে "শুধু যে আমাদের সুনাম ও খ্যাতি পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে তা নয়, আমাদের বিপুল জাতীয় ঋণ শোধেরও ব্যবস্থা হবে।"[৯৪]

৯১. Select Committee Consultations, 11 June 1757, Orme Mss., India V. II. 1232-33, *Bengal*. Orme Mss., O. V. 170, ff. 256-57

৯২. Law's Memoir, Hill, *Bengal*, Vol. III, 198

৯৩. বিস্তারিত দ্র. মৎলিখিত নিবন্ধ, "Sirajauddaulah."

৯৪. Orme Mss., O. V. 12, ff. 1487-91, India Office Library, London

ক্লাইভ স্কটের বাংলা বিজয়ের পরিকল্পনার খসড়া মাদ্রাজে অবশ্যই দেখেছিলেন এবং বাংলা অভিযানের পূর্বে লন্ডনে নিশ্চয়ই অর্থহীনভাবে একথা লেখেন নি যে, "আমি খুবই আশা করছি যে কলকাতা অধিকার করেই এই বিজয় অভিযান শেষ হবে না, এতে এই অঞ্চলে কোম্পানির বিষয়-সম্পত্তি ও জমিজমার আগের চেয়ে আরো সুবিধাজনক এবং স্থায়ী একটা ব্যবস্থা করতে আমরা সক্ষম হবো।"[৯৫]

এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, কলকাতা পুনরুদ্ধার ও আলিনগরের চুক্তির (৯ ফেব্রুয়ারি ১৭৫৭) পর ক্লাইভ তাঁর পিতাকেই শুধু তাঁর 'ভারতের গভর্নর জেনারেল' হওয়ার গোপন উচ্চাভিলাষের কথা জানিয়েছিলেন এবং তাঁকে ব্যাপারটি অত্যন্ত গোপনীয়তা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে সামলাতে বলেছিলেন।[৯৬]

একটু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলেই রাজ্যবিজয় সম্বন্ধে বাংলায় কোম্পানির কর্মচারীদের মধ্যে একটি স্পষ্ট মতলব ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা লক্ষ্য করা যায়। আসলে আঠারো শতকের চল্লিশের দশকের শেষদিকে ও পঞ্চাশের দশকের প্রথমদিকে ইংরেজ কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসা-বাণিজ্য চরম সঙ্কটের সম্মুখীন হয়। এ কারণে তাদের ব্যক্তিগত ব্যবসার স্বার্থেই বাংলায় রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার তাদের জন্য প্রয়োজনীয় ছিল। অবশ্য এই সময় কোম্পানির বাণিজ্য ব্যক্তিগত ব্যবসার মতোই সমস্যাসঙ্কুল পরিস্থিতিতে পড়েছিল। তবে তুলনামূলকভাবে, ফরাসীদের ব্যক্তিগত ব্যবসার অভাবনীয় উন্নতি হওয়ায় ইংরেজ কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসা-বাণিজ্য বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রবার্ট ওরমের ১৭৫১ সালের বক্তব্যে দেখা যায়, কলকাতার ব্যক্তিগত ব্যবসায় শুল্কের পরিমাণ (consulage) ভীষণভাবে কমে গিয়েছিল। কলকাতার এক বাসিন্দা ক্যাপ্টেন ফেনউইক ১৭৫২ সালে লিখেন, "ফরাসীরা এখন তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের শীর্ষে পৌঁছেছে।" ওলন্দাজ কোম্পানির নথিপত্রে বাংলার বন্দরে ভিড়েছে এমন বিদেশী জাহাজের যে তালিকা পাওয়া যায় তা থেকে এই উক্তিগুলোর পরিসংখ্যানগত সাক্ষ্য মেলে।[৯৭] ১৭৫৪ সালে যেসব ইংরেজ জাহাজ কলকাতা বন্দরে ভিড়েছিল তাদের মোট সংখ্যা ২০; সেগুলোর মধ্যে ১২টা ছিল কোম্পানির নিজস্ব জাহাজ আর মাত্র ৮টা ছিল যারা ব্যক্তিগত ব্যবসা করতো তাদের। সেক্ষেত্রে এ বছরেই বাংলায় ফরাসী জাহাজ এসেছে ২৭টি। সেগুলোর মধ্যে ২২টিই ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে লিপ্ত, আর ৫টি মাত্র ফরাসী কোম্পানির নিজস্ব জাহাজ ছিল। আবার ১৭৫১ সালে বাংলায় আগত ইংরেজ জাহাজের মোট ভারবহনক্ষমতা ছিল ৭৪২০ টন, তার মধ্যে ৫০২০ টন ছিল ব্যক্তিগত ব্যবসায় যারা লিপ্ত তাদের। আর ১৭৫৪ সালে ফরাসী জাহাজের মোট ভারবহনক্ষমতা ছিল ১০,৪৫০

৯৫. Clive to Secret Committee, London, 11 October 1756, quoted in Michael Edward, *The Battle of Plassey*, (London 1963), 77.

৯৬. Clive to his father, 23 February 1757, Hill, *Bengal*, Vol. II, 243.

৯৭. Robert Orme to Mr. Robbins, 10 May 1751, Orme Mss., O. V. 12, f 83, Capt. Fenwick's letter, 1752, Orme Mss., India, VI, f 111vo, India Office Library, London

টন, এর মধ্যে ব্যক্তিগত ব্যবসায় নিযুক্ত জাহাজের মোট বহনক্ষমতা ছিল ৭৪৫০ টন এবং পরিসংখ্যানগত তথ্য থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, পঞ্চাশের দশকের প্রথমার্ধে ফরাসীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যের যে প্রভূত উন্নতি হয়েছিল তার ফলে ইংরেজদের ব্যক্তিগত ব্যবসার যথেষ্ট ক্ষতি হয়।[৯৮] সুতরাং কোম্পানির কর্মচারীদের সঙ্কটাপন্ন ব্যক্তিগত বাণিজ্যস্বার্থকে পুনরুদ্ধার করার জন্য ফরাসীদের বিতাড়ন এবং রাজ্যজয়ের মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রয়োজন ছিল। তাতে শুধু যে আন্তঃএশীয় এবং অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ব্যবসার স্বার্থরক্ষারই উন্নতি ঘটবে তা নয়, উৎপাদনক্ষেত্রে সরবরাহ, হাট-বাজার, ব্যবসায়ী, বস্ত্রশিল্পী ও অন্যান্য কারিগরদের উপর সার্বিক নিয়ন্ত্রণও নিশ্চিতভাবে বৃদ্ধি পাবে। এ তথ্য শুধু যে পূর্বোক্ত সমীক্ষায়ই ধরা পড়েছে তা নয়, তৎকালীন কোম্পানির কর্মচারীদের বিবৃতি ও কাজকর্মের মধ্য দিয়েও তা প্রকাশ পেয়েছে। স্কটের বাংলা বিজয়ের পরিকল্পনা, ফ্রাঙ্কল্যান্ড ও ম্যানিংহামের ক্লাইভকে লেখা চিঠি (১ সেপ্টেম্বর ১৭৫৩), যাতে ইংরেজ বাণিজ্যের, বিশেষকরে ব্যক্তিগত ব্যবসার ক্রমাবনতির কথা করুণভাবে বর্ণিত হয়েছে, কোম্পানির বেচা-কেনায় দাদনি থেকে গোমস্তা ব্যবস্থায় পরিবর্তন[৯৯], নবাবের প্রতি ফোর্ট উইলিয়ম কাউন্সিল ও গভর্নর ড্রেকের অনমনীয় এবং মারমুখো মনোভাব—এ সবই ইংরেজদের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের অভিপ্রায় নির্দেশক। সিলেক্ট কমিটির মিটিং-এ মীর জাফরের সঙ্গে চুক্তির শর্তাবলী কি হবে তা আলোচনার সময় রিচার্ড বেচার জোর দিয়ে বলেছিলেন যে, বাংলায় ইংরেজ কোম্পানির কর্মচারীদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা চুক্তির শর্তাবলীতে রাখতে হবে, কারণ তাঁর মতে "তারাই পুরো ব্যাপারটা (নবাবকে হটিয়ে অন্য কাউকে বসাবার পরিকল্পনা) চালু করেছিল।" এ থেকে ইংরেজদের অভিপ্রায় সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না।[১০০]

এ প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, যদিও লন্ডনে কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলী বা বৃটিশ গভর্নমেন্ট বাংলা বিজয়ের কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ দেয় নি, তথাপি তারা এর বিরোধিতাও করে নি। সমকালীন ধীরগতির যোগাযোগব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে কোম্পানির কর্মচারীরা রাজ্যজয়ের মতো সিদ্ধান্তও গ্রহণ করে এবং পরিচালকমণ্ডলী তা মেনে নেন। এইসব কর্মচারীর একমাত্র লক্ষ্য ছিল ব্যক্তিগত বাণিজ্যের মাধ্যমে সমৃদ্ধিশালী হয়ে ইউরোপে ফিরে গিয়ে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে বাকি জীবন অতিবাহিত করা। সে লক্ষ্য অর্জনের পথে সঙ্কট বা বিপদ দেখা দিলে তারা তখন কোম্পানির স্থানীয়

৯৮. ওলন্দাজদের বাণিজ্য জাহাজের রেকর্ড থেকে প্রাপ্ত তথ্য। ১৭৫১ সালের হিসাবের জন্য দেখুন, Vereenigde Oost-Indische Compagnie (henceforth V. O. C.), earlier Koloniaal Archief (henceforth K. A.), V. O. C. 2754 (K. A. 2646), f. 227; for 1754, See V. O. C. 2829 (K. A. 2721), ff. 294-94vo, 296vo-297, Algemeen Rijksarchief, The Hague.

৯৯. দ্রষ্টব্য, মৎলিখিত নিবন্ধ, "Merchants, Companies and Rulers — Bengal in the 18th Century", *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, Vol. XXXI, February 1988, 82-89 for changeover from *dadni* to *gomasta* system.

১০০. Richard Becher's evidence, 1st Report, Select Committee, 1772, *Report*, iii, 145, quoted in Peter Marshall, *East Indian Fortunes*, 164.

ক্ষমতা বা শক্তি প্রয়োগ করার চেষ্টা করতো। বাংলায় ১৭৫৬-৫৭ সালে আসলে অনুরূপ ঘটনাই ঘটেছিল।

## ইউরোপীয় বাণিজ্য, সোনা-রূপার আমদানি ও পলাশী যুদ্ধ

সাম্প্রতিককালে পলাশী যুদ্ধ সম্বন্ধে বলা হচ্ছে, আঠারো শতকের প্রথমার্ধে ইউরোপীয় বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত হিন্দু ব্যবসায়ী ও মহাজন শ্রেণীর অভ্যুত্থানের আলোকেই এর ব্যাখ্যা করা উচিত। ঐতিহাসিক এস. সি. হিল বহু আগেই এই ইঙ্গিত করেছিলেন। অধুনা ব্রিজেন গুপ্ত এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, ভারত-ইউরোপীয় সামুদ্রিক বাণিজ্যের ফলে বাংলার "হিন্দু ব্যবসায়ী শ্রেণীর স্বার্থ ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোর স্বার্থের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়েছিল।"[১০১] এই বিশেষ শ্রেণীই বাংলায় ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করেছিল। অতি সম্প্রতি পিটার মার্শাল এবং সি. এ. বেইলী বাংলায় ইউরোপীয় বাণিজ্যের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এঁদের মোটামুটি বক্তব্য—এ সময় ইউরোপের সঙ্গে বাংলার ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক যোগাযোগ হওয়ায় এবং এ বাণিজ্যের পরিমাণ অনেক বেড়ে যাওয়ায় বাংলার ব্যবসায়ী ও বাণিজ্যিক শ্রেণীর স্বার্থ ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোর সঙ্গে জড়িয়ে যায়। আঠারো শতকের প্রথমার্ধে বাংলা থেকে ইউরোপে রপ্তানির (প্রধানত নানা রকমের কাপড়, রেশম বা সিল্ক ও সোরা) পরিমাণ হঠাৎ অনেক বেড়ে যায়। আবার ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোর মধ্যে ইংরেজ কোম্পানিই ঐ শতকের তৃতীয় দশক থেকে অন্যদের পেছনে ফেলে বাংলায় সবচেয়ে বেশি বাণিজ্য করতে শুরু করে। বিদেশী কোম্পানিগুলো বাংলা থেকে জিনিসপত্র কেনার জন্য সোনা-রূপা আমদানি করতো। কারণ, তাদের দেশের জিনিসের তেমন চাহিদা বাংলায় ছিল না। আবার বাংলায় সোনার চাহিদা বিশেষ ছিল না বলে রূপার আমদানি হতো সবচেয়ে বেশি। পূর্বোক্ত ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে, ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোর, বিশেষকরে ইংরেজদের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের ফলে হিন্দু (এবং জৈন) ব্যবসায়ী সম্প্রদায় বেশ লাভবান হতে থাকে এবং তার ফলে তাদের সঙ্গে ইংরেজদের একটা ঘনিষ্ঠ অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে উঠে। তাঁদের মতে, বাংলায় ইউরোপীয়রাই বাণিজ্যের জন্য সবচেয়ে বেশি সোনা-রূপা আমদানি করতো এবং এই বাণিজ্যের ফলেই বাংলার ব্যবসায়ী ও মহাজন সম্প্রদায়ের সঙ্গে ইউরোপীয়দের নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হয়।[১০২] এমনকি বেইলী এ কথা বলেছেন যে, বাংলায় "ব্যবসায়ী ও জমিদারদের স্বার্থ ইউরোপীয়দের ভাগ্যের সঙ্গে এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল" যে, কলকাতা থেকে ইংরেজদের তাড়ানোর ব্যাপারটা তারা "সহ্য করতে পারছিল না" এবং সেজন্যই পলাশীর ঘটনাটি ঘটলো।[১০৩]

১০১. Brijen K. Gupta, *Sirajauddaula*, 32.

১০২. Peter Marshall, *Bengal*, 65,67; Bayly, *Indian Society*, 49.

১০৩. Bayly, ঐ, 50.

এ ধরনের বক্তব্য আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিগ্রাহ্য মনে হলেও এগুলোর ঐতিহাসিক যথার্থতা সম্বন্ধে প্রশ্ন থেকে যায়। উপরোক্ত বক্তব্যে দুটো গুরুত্বপূর্ণ জিনিস স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নেয়া হচ্ছে, যার সত্যতা নিয়ে আধুনিকতম গবেষণা গভীর সন্দেহ ব্যক্ত করছে। প্রথমত, পলাশীর প্রাক্কালে বাংলার অর্থনৈতিক জীবনে ইউরোপের সঙ্গে ব্যাপক বাণিজ্যই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কে. এন. চৌধুরী (১৯৭৮) এবং ওম প্রকাশ (১৯৮৫) প্রমুখের গবেষণাগ্রন্থ থেকে এ ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক।[১০৪] এসব ঐতিহাসিকের বক্তব্যে যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করে সম্প্রতি শিরীন মুসভি একটি প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে, প্রকৃত ঘটনা আসলে অন্যরকমও হতে পারে। ইউরোপীয়রাই একমাত্র সোনা-রূপা এনে বাংলায় ব্যবসা করছে এবং সবচেয়ে বেশি পরিমাণে এ মূল্যবান বস্তু আমদানি করছে এমন নাও হতে পারে।[১০৫] ইউরোপের বিভিন্ন মহাফেজখানায় সম্প্রতি যেসব তথ্য পাওয়া গেছে তা থেকে একটা চিত্র পরিষ্কার হয়ে উঠে যে, আঠারো শতকের মধ্যভাগেও অর্থাৎ প্রাক-পলাশী বাংলায় এশীয় ব্যবসায়ীদের মোট বাণিজ্যের পরিমাণ ইউরোপীয় বাণিজ্যের চেয়ে আরো অনেক বেশি ছিল। বাংলা থেকে প্রধান দু'টি রপ্তানিসামগ্রীর (বস্ত্র ও রেশম) ক্ষেত্রে ইউরোপীয়দের চেয়ে এশীয় বণিকদের যে অধিকতর ভূমিকা ছিল এটা পরিসংখ্যান দিয়ে প্রমাণ করা যায়। ১৭৪৭ সালে ঢাকা থেকে বস্ত্র রপ্তানির যে তালিকা পাওয়া যায় তাতে দেখা যাচ্ছে, এশীয়দের (আর্মেনীয়দের অন্তর্ভুক্ত করে) অংশ ছিল দুই-তৃতীয়াংশ, সে তুলনায় ব্যক্তিগত বাণিজ্য নিয়েও ইউরোপীয় বণিকদের অংশ ছিল মাত্র এক-তৃতীয়াংশ।[১০৬] ওলন্দাজ সূত্র থেকেও বস্ত্র রপ্তানিতে এশীয় ব্যবসায়ীদের প্রধান ভূমিকার কথা জানা যায়। হল্যান্ডের রাজকীয় মহাফেজখানায় রক্ষিত ওলন্দাজ কোম্পানির নথিপত্র থেকে দেখা যাচ্ছে, ১৭৪২ সালে ওলন্দাজ ছাড়া এশীয় ও অন্যান্য ইউরোপীয়রা ৭৬ লক্ষ টাকা লগ্নি করেছে বস্ত্র ব্যবসায়ে। এর মধ্যে ইংরেজ ও ফরাসীদের মোট বিনিয়োগের পরিমাণ (ওলন্দাজদের বাদ দিলে অন্যান্য ইউরোপীয়দের মধ্যে এদের বস্ত্র ব্যবসাই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ ছিল) ২৫ থেকে ৩০ লক্ষের বেশি হতে পারে না।[১০৭] রেশম রপ্তানির ক্ষেত্রে অবস্থাটা আরো সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়। ১৭৪৯ সাল থেকে ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত সময়ে এশীয় বণিকরা প্রতি বছর গড়ে ৪৮ লক্ষ টাকা মূল্যের রেশম রপ্তানি করেছে বাংলা থেকে। তার মধ্যে সর্বোচ্চ পরিমাণ হলো ১৭৫১ সালে ৬৬ লক্ষ টাকা মূল্যের রেশম। এটা ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোর মোট রেশম রপ্তানির চেয়ে অনেক বেশি তো বটেই, এমনকি এ সময় ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোর মোট রপ্তানির (বস্ত্র, রেশম, সোরা

১০৪. K. N. Chaudhuri, *The Trading World of Asia and the English East India Company*. (Cambridge 1978); Om Prakash, *The Dutch East India Company and the Economy of Bengal*. 1630-1720. (Princeton 1985).

১০৫. Shireen Moosvi, "The Silver Influx, Money Supply, Prices and Revenue Extraction in Mughal India", *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, Vol. XXX, 1987, 92-94

১০৬. Taylor's Report, Home Misc. Series, 456F, ff. 93-95, India Office Library, London.

১০৭. V. O. C. 2849 (K. A. 2741), 27 October 1755, ff. 188vo-189. The "Memorie" of Director Taillefert.

সব জিনিস মিলিয়ে) মূল্যের কাছাকাছি।[১০৮] সুতরাং ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোর বাণিজ্যই বাংলায় অর্থ সমাগমের প্রধান উৎস—এ বক্তব্য মেনে নেয়া কঠিন। তেমনি কঠিন ইউরোপীয় বাণিজ্যের সঙ্গে পলাশী যুদ্ধের নিগূঢ় সম্পর্কের কথা মেনে নেয়া।

দ্বিতীয় যে বক্তব্যটি স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে ধরে নেয়া হয়েছে তাতেও সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। বক্তব্যটি হলো, প্রাক-পলাশী বাংলার বিশিষ্ট ব্যবসায়ীদের মুনাফার মোটা অংশই আসতো ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোর, বিশেষকরে ইংরেজদের সঙ্গে তাদের বাণিজ্যিক লেনদেনের মাধ্যমে। ইউরোপীয় বাণিজ্যকে যদি ব্যবসায়ী, ব্যাঙ্কিং শ্রেণী ও জমিদারদের আয়বৃদ্ধির (এবং সেজন্য তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধির) প্রধান উৎস বলে প্রমাণ করা যায়, তবেই শুধু বলা যেতে পারে যে, ইউরোপীয়দের ভাগ্যের সঙ্গে বাংলার উপরোক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু আমরা একটু আগেই দেখিয়েছি, প্রাক-পলাশী যুগেও বাংলার অর্থনৈতিক জীবনে ইউরোপীয় বাণিজ্যই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নয়, এশীয় বাণিজ্যের পরিমাণ এবং মূল্য তার চেয়ে অনেক বেশি। সুতরাং এ ব্যবসায়ী এবং ব্যাঙ্কিং শ্রেণী বাংলায় ইউরোপীয় বা ইংরেজদের অবলম্বন করেই প্রতিপত্তিশালী হয়েছে—এ কথা বলা যায় না। এই শ্রেণীর সম্পদ পুঞ্জীভবনের (এবং তা থেকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠার) প্রধান উৎসগুলি বিশ্লেষণ করলেই আমাদের বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যাবে। পলাশী-চক্রান্তের এ দেশীয় তিন প্রধান হোতা তিন বণিকরাজ—জগৎশেঠ, উমিচাঁদ এবং খোজা ওয়াজেদের মোটা মুনাফার উৎস ইউরোপীয় বা ইংরেজদের সঙ্গে বাণিজ্যিক লেনদেনের মাধ্যমে কিনা সেটা দেখলে ব্যাপারটা আরো স্পষ্ট হবে।[১০৯] ১৭৫৭ সালে লিউক স্ক্র্যাফটন (Luke Scrafton) মুর্শিদাবাদ থেকে জগৎশেঠদের বার্ষিক আয়ের যে হিসাব পাঠিয়েছেন, তা থেকে দেখা যায়, তাদের বাৎসরিক মোট আয় ৫০ লক্ষের মধ্যে টাঁকশাল (যেটা জগৎশেঠদের একচেটিয়া অধিকারে ছিল) থেকে আয়, বাট্টা এবং বাণিজ্যিক ঋণের সুদ থেকে মোট আয় খুব বেশি করে ধরলেও ১৫ থেকে ২০ লক্ষ টাকার বেশি ছিল না।[১১০] এবং আমরা একটু আগে যা বলেছি তার পর বিশ্বাস করার কোন কারণ নেই যে, টাঁকশাল বা বাট্টা থেকে যা আয়, তার সবটাই ইউরোপীয় বাণিজ্যের ফলে সোনা-রূপা আমদানির জন্যই শুধু সম্ভব হয়। তেমনি উমিচাঁদ ও খোজা ওয়াজেদের সঙ্গে ইউরোপীয় বা ইংরেজদের ব্যাপক বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল ঠিকই, কিন্তু তাদের আয়ের মূল উৎস ছিল সোরা, লবণ প্রভৃতির একচেটিয়া ব্যবসা। উমিচাঁদ আফিম ও শস্যের একচেটিয়া কারবারেরও চেষ্টা করেছিলেন। খোজা ওয়াজেদের নিজস্ব বেশ কয়েকটি জাহাজ ছিল, যেগুলো হুগলী বন্দর থেকে সুরাট, লোহিত সাগর ও পারস্য উপসাগরে বাণিজ্য

১০৮. B. P. C, Range 1, Vol. 44, Annex to Consult. 19 June 1769.

১০৯. এদের ব্যবসায়িক তৎপরতা সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন, মৎলিখিত নিবন্ধ, "Merchants, Companies and Rulers", 90-103.

১১০. Luke Scrafton to Col. Clive, 17 Dec. 1757, Orme Mss., India, XVIII, f 5043, Eur G. 23 Box 37, India Office Library, London. জগৎ শেঠের বার্ষিক আয়ের বিস্তারিত হিসাব দ্র., মৎলিখিত নিবন্ধ, "Merchants, Companies and Rulers", 96

করতো।[১১১] এসব তথ্য জানার পরে কিন্তু বাংলার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও ব্যাঙ্কিং শ্রেণীর স্বার্থ ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোর ভাগ্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল—এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন।

## প্রাক-পলাশী বাংলার দ্বিধাবিভক্ত সমাজ

আগেই বলা হয়েছে, প্রাক-পলাশী বাংলার দ্বিধাবিভক্ত সমাজের তত্ত্ব দেন এস. সি. হিল। তাঁর বক্তব্যকে বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য হিল সমসাময়িক দু'জন ইউরোপীয়—জাঁ ল এবং স্কট-এর মতামত থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন।[১১২] সন্দেহ নেই, এ উদ্ধৃতিগুলোতে আঠারো শতকের মধ্যভাগে বাংলার সমাজ দ্বিধাবিভক্ত ছিল বলে স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। হিলকে অনুসরণ করে ব্রিজেন গুপ্ত প্রাক-পলাশী বাংলার দ্বিধাবিভক্ত রূপ তুলে ধরায় যত্নবান। তাঁরা দু'জনেই বলছেন, পলাশী যুদ্ধের আগে বাংলার সমাজ হিন্দু-মুসলমান এই সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, মুসলমান শাসনে অতিষ্ঠ হয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা মুসলমান নবাবের শাসনাবসান কামনা করছিল। আঠারো শতকের মাঝামাঝি বাংলার এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে সমাজের কোন দ্বিধাবিভক্ত চেহারা (যার ফলে ইংরেজদের বাংলা বিজয় সহজ এবং যুক্তিসঙ্গত হয়) চোখে পড়ে কিনা তা দেখার আগে সমাজের এই দ্বিধাবিভক্ত চিত্র আঁকার পেছনে ইউরোপীয়দের কোন বিশেষ উদ্দেশ্য কাজ করেছে কিনা তা আমাদের বিচার করে দেখতে হবে। বস্তুতপক্ষে আঠারো শতকের মধ্যভাগে অনেক ইউরোপীয়ই বাংলা বিজয়ের স্বপ্ন দেখেছিল এবং এ জয় অনায়াসলভ্য বলে মনে করতো। তাদের লেখা থেকেই তাদের এ মনোভাব পরিষ্কার বোঝা যায়।[১১৩]

সুতরাং বাংলা বিজয় যখন ইউরোপীয়দের মুখ্য উদ্দেশ্য, তখন সে অবাধ বিজয়ের যাথার্থ্য প্রমাণে যদি তারা বাংলার দ্বিধাবিভক্ত সমাজের চেহারা খুঁজে বের করতে চায়, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এ পরিপ্রেক্ষিতে মসিয়েঁ ল বা স্কটের মন্তব্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলেই মনে হয় এবং সে কারণেই ওগুলোকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া যায় না। আমরা আগেই দেখেছি, সিরাজউদ্দৌলার কলকাতা দখলের পর মাদ্রাজ থেকে ক্লাইভ ও ওয়াটসনকে কলকাতা অভিযানে পাঠানোর সময় যে নির্দেশ দেয়া হয়, তা থেকে স্পষ্ট যে বাংলা ইংরেজদের সাম্রাজ্যলোলুপতার শিকার হবে। এ নির্দেশে বলা হয়েছিল নবাবের দরবারে বিরোধী গোষ্ঠী বা নবাব হবার জন্য উদগ্রীব এমন কারো সঙ্গে যেন সংযোগ স্থাপন করা হয়। এভাবেই ষড়যন্ত্রের বীজ ছড়িয়ে পড়লো। শাসকশ্রেণীর এক ক্ষমতালোভী দল ও ইংরেজদের মিলিত ষড়যন্ত্রের শিকার হলেন সিরাজউদ্দৌলা—সম্প্রদায়ভিত্তিক দ্বিধাবিভক্ত বাঙালি সমাজের জন্য এটা ঘটে নি। আঠারো শতকের প্রথমার্ধে বাংলার

---

১১১. বিস্তারিত দেখুন, ঐ, 101.

১১২. S. C. Hill, *Three Frenchmen in Bengal*, 120; S. C. Hill, *Bengal in 1756-57*, Vol I, XXIII, In.

১১৩. দ্রষ্টব্য, মৎলিখিত প্রবন্ধ, *"Sirajauddaullah, English Company and Plassey Conspiracy"*.

ইতিহাসে বিশেষ ধরনের একটি ধারা লক্ষণীয়। একজন নবাবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে একটা আতঙ্কজনক অবস্থার সৃষ্টি হয়। নতুন নবাবের হাতে ক্ষমতাচ্যুত হবার ভয়ে শাসকশ্রেণীর ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। নবাবের মৃত্যুর পর এই পরিচিত ধারাই দেখা যাচ্ছে ১৭২৭, ১৭৩৯-৪০ এবং ১৭৫৬-৫৭ সালে। ১৭২৭ বা ১৭৩৯-৪০ সালের পটপরিবর্তনে যেমন দ্বিধাবিভক্ত সমাজের প্রশ্নই আসে না, ১৭৫৬-৫৭ সালের ঘটনায়ও সে প্রশ্নের অবতারণা অবান্তর।

এটা খুবই আশ্চর্যজনক যে, আলিবর্দী বা সিরাজউদ্দৌলার সময় অধিকাংশ উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ও জমিদার হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও ঐতিহাসিক মহলে প্রাক-পলাশী সমাজের দ্বিধাবিভক্ত রূপ অবাধ স্বীকৃতি পেয়ে এসেছে। লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি ও হল্যান্ডের রাজকীয় মহাফেজখানায় ঠিক প্রাক-পলাশী বাংলার উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ও জমিদারদের দু'টি তালিকা পাওয়া যায়। রবার্ট ওরমের তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে, আলিবর্দীর সময় (১৭৫৪ সালে) দীউয়ান, 'তন্-দীউয়ান', 'সাব-দীউয়ান', বকশী প্রভৃতি সাতটি গুরুত্বপূর্ণ পদের মধ্যে ছয়টিই হিন্দুরা অলঙ্কৃত করেছে,একমাত্র মুসলমান বকশী হলেন মীর জাফর। আবার ১৯ জন বড় জমিদার ও রাজার মধ্যে ১৮ জনই হিন্দু।[১১৪] বাংলায় ওলন্দাজ কোম্পানির প্রধান ইয়ান কারসেবুমের (Ian Kerseboom) তালিকাতেও (১৭৫৫ সাল) নায়েব দীউয়ান রায় রায়ান উমিদ রায়ের নেতৃত্বে হিন্দুদের একচ্ছত্র প্রাধান্য লক্ষ্য করি।[১১৫] ১৭৫৪-৫৫ সালের এই যে চিত্র, নবাব সিরাজউদ্দৌলার সময় তার কোন পরিবর্তন হয় নি। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায়, মুসলমান রাজত্বে হিন্দুরা মুসলমানদের চাইতেও অনেক বেশি সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল। আঠারো শতকের মাঝামাঝি রাজ্যের প্রশাসনযন্ত্রে হিন্দুপ্রাধান্য এত বেশি ছিল যে তা দেখে রবার্ট ওরমে মন্তব্য করেন :

> তাঁর [আলিবর্দীর] রাজত্বকালে হিন্দুদের প্রাধান্যই ছিল সবচেয়ে বেশি। শাসনযন্ত্রের প্রতিটি বিভাগেই এটা লক্ষ্য করা যায়। হিন্দুরা এত যত্নের সঙ্গে সব কাজকর্ম দেখতো যে তাদের অজান্তে বা তাদের হাত ছাড়া কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজই হতো না।[১১৬]

নবাব সিরাজউদ্দৌলার সময় এই হিন্দুপ্রাধান্য সর্বক্ষেত্রে আরো বেড়ে যায়। তরুণ নবাবের সবচেয়ে বেশি বিশ্বাসভাজন ছিলেন দু'জন হিন্দু—মোহনলাল ও মীর মদন।[১১৭] সুতরাং এসব তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাক-পলাশী বাঙালি সমাজ হিন্দু ও মুসলমান এই সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছিল—এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন।

বাংলার সমাজ যদি সত্যিই দ্বিধাবিভক্ত হতো, তা হলে সমসাময়িক বাংলা সাহিত্য ও ফার্সি ইতিহাসে তার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যেতো। কিন্তু সে রকম কোন ইঙ্গিত

১১৪. Orme Mss., India, VI, ff. 1500-1502.
১১৫. V. O. C 2849 (K. A. 2791), ff 125-126
১১৬. Robert Orme, *History*, Vol. II, Sec. I, 127-128.
১১৭. Yusuf Ali Khan, *Tarikh-i-Bangala-i-Mahabatjangi*, 130-132

আমরা তৎকালীন সাহিত্য বা ইতিহাসে পাই না। সমাজের উঁচুতলায় কিছুটা টানাপড়েন নিশ্চয় থাকতে পারে, জমিদার বা শাসকশ্রেণীর মধ্যে ক্ষমতা দখলের লড়াই চলতেই পারে। কিন্তু সেগুলো হিন্দু-মুসলমান বিভেদমূলক চেতনা থেকে উদ্ভূত নয়—তাদের মূল শ্রেণীগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থের সংঘাত। বাংলায় হিন্দু ও মুসলমান, বিশেষকরে এই দুই সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষ বহুদিন ধরে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দের মধ্যে পাশাপাশি বাস করে এসেছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে এই দুই ধর্ম ও সংস্কৃতির সমন্বয়ের যে চেষ্টা অনেক দিন ধরে চলছিল, আঠারো শতকেও তা বজায় ছিল। শুধু তাই নয়, আঠারো শতকের মাঝামাঝি এই দুই ধর্ম-সংস্কৃতির সমন্বয় চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল। এ সময় মুসলমানরা হিন্দু মন্দিরে পূজা দিচ্ছে আর হিন্দুরা মুসলমানদের দরগাতে সিন্নি দিচ্ছে—এটা ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা।[১১৮] দুই ধর্ম আর সংস্কৃতির সমন্বয়প্রচেষ্টা থেকেই সত্যপীরের মতো নতুন 'দেবতা'র জন্ম, যে 'দেবতা' দুই সম্প্রদায়ের মানুষেরই পূজ্য।[১১৯] ভারতচন্দ্রের 'সত্যপীর' কবিতা এ মিলনপ্রচেষ্টার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।[১২০] এডওয়ার্ড সি. ডিমক (Edward C. Dimmock Jr.) একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে, মধ্যযুগের (পনেরো থেকে আঠারো শতক পর্যন্ত) বাংলা সাহিত্য পড়ে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পরের প্রতি কোন রকম 'গভীর বিদ্বেষের' পরিচয় পাওয়া দুষ্কর।[১২১] দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহিষ্ণুতা ও বোঝাপড়ার চমৎকার নিদর্শন আঠারো শতকের মধ্যভাগের কবি ফৈজুল্লার 'সত্যপীর' কবিতা, যেখানে "যে রাম, সেই রহিম" এমন অভিব্যক্তি সোচ্চার।[১২২] সুতরাং বাংলা সাহিত্য থেকে যেসব তথ্য পাওয়া যায়, তাতে বাঙালি সমাজের দ্বিধাবিভক্ত রূপের কোন পরিচয় মেলে না।

## শাসকশ্রেণীর চক্রিদলের কাছে সিরাজউদ্দৌলা সর্বনাশের প্রতীক ?

সিরাজউদ্দৌলা নবাব হওয়ার পর প্রথম থেকেই এটা স্পষ্ট যে, সামরিক অভিজাত শ্রেণী, ব্যবসায়ী গোষ্ঠী ও জমিদারদের নিবিড় জোটবদ্ধতা বাংলার নবাবের পূর্ণ ক্ষমতার উপর যে চাপ সৃষ্টি করেছিল, সিরাজ তা মেনে নিতে মোটেই রাজি ছিলেন না। সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় অবশ্য দেখানো হয়েছে যে, এই জোটবদ্ধতার কোন সাংগঠনিক ভিত্তি ছিল না, এটা ব্যক্তিগত স্বার্থকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল, যার ফলে এটা বেশি দিন স্থায়ী হতে পারে নি।[১২৩] সে যাই হোক, সিরাজউদ্দৌলা নবাব হয়েই

১১৮. D C Sen, *History of Bengali Language and Literature* (Calcutta 1911), 793

১১৯. ঐ, 396-97

১২০. ভারতচন্দ্র, "সত্যপীরের কথা", *ভারতচন্দ্র রচনাবলী*, (কলকাতা ১৯৬৩)।

১২১. Edward C Dimock, Jr, "Hinduism and Islam in Medieval Bengal", in Rachel Van M. Baumer (ed), *Aspects of Bengali History and Society*, (New Delhi 1976), 2.

১২২. আহমদ শরীফ, *মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ*, (ঢাকা ১৯৭৭), ৪২৩।

১২৩. এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, মৎলিখিত নিবন্ধ, "Sirajauddaullah, English Company and Plassey Conspiracy"

সামরিক ও বেসামরিক উভয় শাসনব্যবস্থা নতুন করে ঢেলে সাজাতে শুরু করেন।[১২৪] মোহনলাল, মীরমদন ও খাজা আবদুল হাদি খানের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ এই নতুন ব্যবস্থার ইঙ্গিত বহন করে। এঁদের বিরুদ্ধে 'অপদার্থ চালিয়াত' এবং সিরাজের 'অযোগ্য দোসর' বলে যে অভিযোগ করা হয় তার খুব একটা ভিত্তি নেই। মোহনলাল যে সুদক্ষ শাসক ও যোদ্ধা এবং সিরাজের ঘনিষ্ঠ শুভার্থী ছিলেন, তার প্রমাণ পূর্ণিয়া অভিযান ও পূর্ণিয়ার শাসনব্যবস্থা পুনর্গঠনে মোহনলালের অবদান এবং পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে সব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সিরাজের পক্ষে তার অসমসাহসিক যুদ্ধ।[১২৫] মঁসিয়ে জাঁ ল অবশ্য মোহনলালকে "সবচেয়ে বড় বদমাশ" বলে অভিহিত করেছেন (সম্ভবত সিরাজউদ্দৌলা ইংরেজদের চন্দননগর আক্রমণে বাধা না দেয়ায় এবং মুর্শিদাবাদ থেকে ল'কে চলে যেতে বাধ্য করায় রাগে ও হতাশায় তিনি এই মন্তব্য করেছেন, কারণ এসবের জন্য মোহনলালই দায়ী বলে তিনি ভেবেছিলেন)। তবে একই সঙ্গে মোহনলালকে তিনি "জগৎশেঠদের চরম শত্রু" এবং "জগৎশেঠদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারার মতো একমাত্র ব্যক্তি" বলে স্বীকার করেছেন।[১২৬] বীর যোদ্ধা হিসেবে মীরমদনের দক্ষতা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না এবং মঁসিয়ে ল একমাত্র তাঁর উপরই অনেকটা নির্ভর করেছিলেন। খাজা আবদুল হাদি আগেই (আলিবর্দীর রাজত্বের শেষদিকে) নবাবের সৈন্যবাহিনীতে যে 'বিরাট জালিয়াতি ও প্রবঞ্চনা' চলছিল তা প্রকাশ করেন (এ দুর্নীতির মাধ্যমে 'মুৎসুদ্দি ও জমাদারদের' সঙ্গে মীর জাফর এবং খাদিম হুসেন খানও 'প্রচুর পরিমাণ অর্থ আত্মসাৎ' করেন) এবং তা বন্ধ করার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিজের কর্মদক্ষতা ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন।[১২৭]

আসলে সিরাজউদ্দৌলার মতো বেপরোয়া তরুণ নবাব হওয়ায় শাসকশ্রেণীর সংখ্যাগরিষ্ঠ চক্রিদল, যাদের মধ্যে ব্যবসায়ী, জমিদার, রাজকর্মচারী সব শ্রেণীর লোকই ছিল, তারা সবাই ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে। আগের নবাবদের আমলে এই বিশেষ শ্রেণীই সম্পদ পুঞ্জীভবনে লিপ্ত ছিল। এখন তাদের উৎকণ্ঠা জাগে যে, সিরাজউদ্দৌলা হয়তো তাদের সম্পদ পুঞ্জীভবনের পথগুলো বন্ধ করে দেবেন। জগৎশেঠরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল তাদের নিজস্ব কারণে। এর সঙ্গে একটি প্রচলিত গল্পের কোন সম্পর্কই নেই। কোন কোন আধুনিক ঐতিহাসিক বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে তাঁদের সুবিধামত এ গল্প ব্যবহার করেছেন। গল্পটি হচ্ছে : *জগৎশেঠ নবাবের আদেশে ব্যবসায়ী ও জমিদারদের*

১২৪. Karam Ali, *Muzaffarnamah*, 61; Ghulam Husain Salim, *Riaz-us-Salatin*, tr Abdus Salam, Delhi (reprint) 1975, 364, Peter Marshall, *Bengal*, 75, M Mazibor Rahman, "Nizamat in Bengal", M Phil Thesis, J. N U 1988

১২৫. *Sier*, II, 186-88, 216, 218; Karam Ali, *Muzaffarnamah*, 65, 70, *Riaz*, 364, Rajat Ray 'Colonial Penetration', 7

১২৬. Law's Memoir, Hill, *Bengal*, Vol III, 190

১২৭. J N Sarkar, *Bengal Nawabs*, 127

কাছ থেকে তিন কোটি টাকা তুলে দিতে অস্বীকার করলে সিরাজউদ্দৌলা নাকি প্রকাশ্য সভায় তাঁর গালে চড় মারেন। এই গল্পের উদ্দেশ্য পরিষ্কার। জগৎশেঠরা সিরাজউদ্দৌলাকে সরিয়ে অন্য কাউকে নবাব করতে বদ্ধপরিকর হয়ে পড়ে। তাই তারা এ গল্প প্রচার করে। কিন্তু এটা নেহাতই কল্পকথা—এর কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই।[১২৮] জগৎশেঠরা বিপুল পরিমাণ বিষয়-সম্পদ পুঞ্জীভূত করেছিল পূর্বতন নবাবদের প্রদত্ত টাঁকশাল ব্যবহার, বাট্টা ধার্য করা ও খাজনা আদায়ের একচেটিয়া অধিকার থেকে। নবাব আলিবর্দীর অনুগ্রহে উমিচাঁদ সোরা, শস্য ও আফিমের একচেটিয়া ব্যবসা করেছিলেন। আর্মেনীয় ব্যবসায়ী খোজা ওয়াজেদের সোরা ও লবণের একচেটিয়া কারবারও ছিল দরবারের আনুকূল্যে। সুতরাং ব্যবসায়ী ও মহাজন শ্রেণী, বিশেষকরে বড় ব্যবসায়ীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়লো পাছে সিরাজউদ্দৌলা তাদের সম্পদ পুঞ্জীভূত করার পথগুলো বন্ধ করে দেন, একচেটিয়া ব্যবসার আনুকূল্য তুলে নেন। মীর জাফর, রায়দুর্লভ, ইয়ার লতিফ প্রভৃতি অভিজাত অমাত্যবর্গ এই ব্যবসায়ী শ্রেণীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তা ছাড়া তাদেরও আশঙ্কা ছিল, সিরাজউদ্দৌলার মতো দুঃসাহসী তরুণ এমন কিছু করতে পারেন যাতে তাদের অনুকূলে ক্ষমতার যে ভারসাম্য তা নষ্ট হয়ে যাবে এবং তাতে তাদের সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। ইয়ার লতিফ জগৎশেঠদের কাছ থেকে মাসোহারা পেতেন এবং মীর জাফর জগৎশেঠদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন বলে রবার্ট ওরমে যে মন্তব্য করেছেন তা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, ব্যবসায়ী শ্রেণীর সঙ্গে অভিজাত সামন্তদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। এই অভিজাত অমাত্যদের মাধ্যমেই ব্যবসায়ীরা নবাবের দরবারে তাদের প্রভাব বিস্তার করতো। সুতরাং এই ব্যবসায়ী ও সামন্ত শ্রেণী উভয়েই ভীত এবং সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো যে তাদের সম্পদ পুঞ্জীভূত করার পথে সিরাজউদ্দৌলা মূর্তিমান প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবেন। কারণ তরুণ বয়সের সিরাজ হিতাহিত বিবেচনা না করে সংহারমূর্তি ধারণ করতে পারেন এমন একটা উদ্বেগ তাদের মধ্যে জেগেছিল।

সৈন্যাধ্যক্ষের পদ থেকে মীর জাফরের অপসারণ, রাজা মানিকচাঁদের কারাদণ্ড এবং সর্বোপরি আলিবর্দীর একান্ত বিশ্বস্ত ও প্রভূত ক্ষমতাশালী হুকুম বেগকে দেশ থেকে বিতাড়নের মধ্যে শাসকশ্রেণীর চক্রিদল বিপদসঙ্কেত পেয়ে যায়। এসব ঘটনা এবং নতুন এক অভিজাত সামন্ত গোষ্ঠীর (মোহনলাল, মীরমদন ও রাজা আবদুল হাদি যাদের প্রতিনিধি) সঙ্গে তরুণ নবাবের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ প্রত্যক্ষ করে শাসক শ্রেণীর ক্ষমতাসীন

১২৮. উদাহরণ হিসেবে দেখুন, চড় মারার গল্পটি প্রচার করেছিলেন মি. ফোর্থ, সম্ভবত ওলন্দাজ ডিরেক্টর মি. বিজডাম তাঁকে এ কথা জানিয়েছিলেন। আমি ওলন্দাজদের রেকর্ডপত্রে বিজডামের লেখায় এ তথ্য পাই নি। ফার্সী বা ইউরোপীয় উৎসেও এর কোন উল্লেখ নেই। এ ঘটনা সত্য হলে অন্য কোন সমসাময়িক পর্যবেক্ষক তা উল্লেখ করতেন। ফোর্থের গল্প দেখুন, *Bengal Secret and Military Consultations, Select Committee Consultations, Proceedings*, Range A, Vol 1, 5 September 1756, ff 73-74, India Office Library, London

গোষ্ঠী হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়লো। বস্তুতপক্ষে সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে আলিবর্দীর ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের বিশেষ বনিবনা ছিল না। তাই তাঁরা সিরাজ নবাব হওয়ার পর নতুন পরিস্থিতিতে, বিশেষকরে ক্ষমতাবিন্যাসে নিজেদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে পড়েছিলেন। সিরাজ যে এঁদের উপর আঘাত হানতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবেন না তার প্রমাণ আলিবর্দীর খুব ঘনিষ্ঠ হুকুম বেগকে দেশ থেকে বিতাড়ন। হুকুম বেগ আলিবর্দীর কাছে প্রশ্রয় পেয়েছিলেন এবং কুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন জোর করে ও অন্যায়ভাবে অর্থ আদায়ের জন্য। তা ছাড়া কয়েকটি পণ্যদ্রব্যের একচেটিয়া ব্যবসাতেও হুকুম বেগ লিপ্ত ছিলেন। ইয়ান কারসেবুমের তথ্য অনুযায়ী হুকুম বেগ ছিলেন মুর্শিদাবাদের 'ক্ষমতাশালী পাচোত্রা দারোগা'।[১২৯] এহেন শক্তিশালী হুকুম বেগকে দেশ থেকে বিতাড়ন দরবারের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার করেছিল। তাছাড়া মীর জাফরের অপসারণ ও মানিকচাঁদের কারাদণ্ডে নতুন নবাবের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এঁদের মনে সন্দেহের কোন অবকাশ রইলো না। তাঁদের সন্দেহ আরো ঘনীভূত হলো যখন মোহনলাল, মীরমদন, খাজা আবদুল হাদি খান প্রমুখ অভিজাত শ্রেণীর নতুন এক গোষ্ঠীকে সিরাজউদ্দৌলা তাঁর শাসনযন্ত্রের নানা বিভাগে প্রাধান্য দিতে শুরু করলেন। এঁদের সঙ্গে আগের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর তফাত—এঁরা এখনো সম্পদ পুঞ্জীভবনে লিপ্ত নয়। স্বাভাবিকভাবেই রাজা দুর্লভরাম পছন্দ করতে পারেন নি যে তাঁর কাজকর্মের তদারকি করবেন মোহনলাল; মীর জাফর সহ্য করতে পারেন নি যে খাজা আবদুল হাদি খান তাঁর জায়গা নেবেন। জগৎশেঠ, উমিচাঁদ, খোজা ওয়াজেদ প্রমুখ বণিকরাজরা ভয় পেয়েছিলেন এই ভেবে যে, তাঁদের সম্পদ পুঞ্জীভূত করার সহজ রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে।-সুতরাং সিরাজউদ্দৌলাকে হটানো প্রয়োজন যাতে ক্ষমতার যে ভারসাম্য তখন ছিল তা নষ্ট হয়ে না যায়, ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর সম্পদ পুঞ্জীভবনের সহজ পথ রুদ্ধ না হয় এবং নতুন কোন গোষ্ঠী এসে যেন শাসকশ্রেণীর চক্রিদের একচ্ছত্র আধিপত্যের অন্তরায় হয়ে না দাঁড়ায়।

এই সব সত্ত্বেও ইংরেজদের সক্রিয় সংযোগ ছাড়া হয়তো পলাশী বিপর্যয় সম্ভব হতো না। সিরাজউদ্দৌলা নবাব হওয়ায় ইংরেজদের স্বার্থও বিশেষভাবে বিঘ্নিত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিল। সিরাজ সিংহাসনে আরোহণ করায় ইংরেজ কোম্পানি ততোটা না হলেও কোম্পানির কর্মচারীরা ভীষণভাবে শঙ্কিত হয়ে পড়লো, পাছে নতুন নবাব তাদের দুই 'কল্পতরু—নিজেদের ব্যক্তিগত ব্যবসা ও দস্তকের যথেষ্ট অপব্যবহার' সমূলে বিনাশ করে বসেন। আমরা আগেই দেখেছি, সিরাজউদ্দৌলা নবাব হয়েই ইংরেজ কোম্পানির কর্মচারী কর্তৃক দস্তকের অপব্যবহার বন্ধ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। অর্থের বিনিময়ে এই দস্তকের মাধ্যমে তারা এশীয় ব্যবসায়ীদের বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার ব্যবস্থা করে দিচ্ছিল

১২৯. ওলন্দাজ ডিরেক্টর ইয়ান কারসেবুম হাকিম বেগের নিম্নরূপ পরিচয় প্রদান করেছেন : "Daroga van de Pansjoutra of tholplaatsen" and "een grote favoriet van den Nawab", V. O. C. 2849 (K. A. 2741), ff 125vo-127vo.

এবং এতে রাজ্যের প্রভূত রাজস্বহানি হচ্ছিল। যদিও এই দস্তক বিক্রি করে কোম্পানির কর্মচারীরা মোটা মুনাফা লুটতো, তথাপি তাদের ত্রাসের আসল কারণ হচ্ছে সিরাজ তাদের বিনাশুল্কে ব্যক্তিগত ব্যবসার সুযোগ বন্ধ করে দেবেন—এই আশঙ্কা। শুল্ক ফাঁকি দিয়ে এ ব্যক্তিগত ব্যবসাই ছিল রাতারাতি বড়লোক হওয়ার সবচেয়ে সহজ পথ এবং এটা যতো অন্যায়ই হোক না কেন, তারা এটা ছাড়তে মোটেই রাজি ছিল না। গভর্নর ড্রেক থেকে শুরু করে সব ইংরেজ কর্মচারীই এই ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিল এবং কেউই এর মতো লাভজনক ব্যবসা ছাড়তে চায় নি। সুতরাং ইংরেজরাও চাইছিল সিরাজউদ্দৌলাকে হটাতে। তাই শাসকশ্রেণীর চক্রিদলের সঙ্গে হাত মেলাতে ইংরেজরা এগিয়ে এল।

## পলাশী যুদ্ধ

সিলেক্ট কমিটির প্রস্তাব অনুযায়ী ক্লাইভ ১৩ জুন কলকাতা থেকে মুর্শিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করলেন এবং ১৯ জুন কাটোয়া পৌঁছলেন। কর্নেল কুট তার আগের দিনই কাটোয়া দখল করে নিয়েছিলেন। ক্লাইভ কিন্তু ষড়যন্ত্র সফল করার জন্য কিভাবে কাজে অগ্রসর হবেন মীর জাফরের কাছ থেকে তার কোন নির্দেশ তখনো না পেয়ে প্রায় দিশেহারা হয়ে পড়লেন। ১৯ জুন তাই ক্লাইভ কলকাতার সিলেক্ট কমিটিকে লিখছেন, "আমাদের বর্তমান পরিস্থিতিতে কিভাবে যে এগুবো তা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।"[১৩০] আসলে মীর জাফর 'নিরপেক্ষ থাকা' ছাড়া অন্য কোন প্রতিশ্রুতিই কিন্তু ইংরেজদের দেন নি। ক্লাইভ ২১ জুন সমরবিষয়ক উপদেষ্টা কমিটির সভা ডাকলেন ভবিষ্যৎ কর্মসূচি ঠিক করতে। স্থির হলো, তক্ষুণি 'কার্যকরী আর কিছু' করা হবে না। ২২ জুন অপরাহ্নে ক্লাইভ মীর জাফরের কাছ থেকে 'বহু প্রতীক্ষিত' চিঠি পেলেন এবং সে চিঠিতে মীর জাফর ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে আগের চেয়ে অনেক বেশি উৎসাহ দেখালেন। চিঠি পেয়েই ক্লাইভ পলাশী অভিমুখে রওনা হলেন এবং মধ্যরাত্রির পরে সেখানে পৌঁছে গেলেন। নবাবের সৈন্যবাহিনী তার আগেই পলাশীতে তাঁবু ফেলেছিল।

২৩ জুন প্রত্যুষে নবাবের সৈন্যরা তাঁবু ছেড়ে মাঠে সুসজ্জিতভাবে ছড়িয়ে পড়লো। এদের সাজসজ্জা, আড়ম্বর এবং চারদিকে উত্তোলিত পতাকা দেখে স্ক্র্যাফটন একটু অবাক হয়ে গিয়েছিলেন এবং মন্তব্য করেছিলেন, সিরাজউদ্দৌলার সৈন্যবাহিনী "ভীষণ জাঁকজমকপূর্ণ ও ভয় পাইয়ে দেবার মতো"।[১৩১] পলাশীতে নবাবের যে শিকারগৃহ ছিল তার ছাদ থেকে ক্লাইভ এই দৃশ্য দেখে একটু হতোদ্যম হয়তো হয়েছিলেন। সকাল ৮টা নাগাদ 'তথাকথিত যুদ্ধ' শুরু হলো। নবাবের সৈন্যবাহিনী যেভাবে এগোচ্ছিল তা দেখে

---

১৩০. Quoted in Mark Bence Jones, *Clive of India*, 135.

১৩১. Luke Scrafton, *Reflections on Government*, 85.

ক্লাইভ ইংরেজদের 'নিশ্চিত জয়' সম্বন্ধে ভরসা পেলেন না এবং 'দিনের বেলা যথাসম্ভব আক্রমণ প্রতিরোধ করে' রাতে কলকাতা ফিরে যাওয়ার কথা ভাবলেন। এটা ঠিক, পলাশীর ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও সিরাজউদ্দৌলার অবস্থা সাংঘাতিক খারাপ কিছু ছিল না; তাঁর পক্ষে বেশ কয়েকজন দক্ষ ও অনুগত সেনাপতি এমন অবস্থায়ও যুদ্ধ করতে ছিলেন প্রস্তুত। মীরমদন, মোহনলাল এবং আরো ক'জন সেনাপতির নেতৃত্বে নবাবের সৈন্যবাহিনী বেশ বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করছিল এবং সাঁ ফ্রের অধীনে নবাবের গোলন্দাজ বাহিনী শত্রুর উপর ক্রমাগত গোলাবর্ষণ করে যাচ্ছিল। আধঘণ্টার মতো উভয় পক্ষের গোলাবর্ষণের পর দেখা গেল, ইংরেজদের মধ্যে ১০ জন ইউরোপীয় ও ২০ জন সেপাই নিহত বা আহত হয়েছে। নবাবের সৈন্যবাহিনীর তুলনায় ইংরেজ বাহিনীর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক কম ছিল এবং সেই কারণে উক্ত হতাহতের সংখ্যা ইংরেজদের পক্ষে 'মারাত্মক আঘাত' রূপে দেখা দিল। তখন ক্লাইভ শত্রুর গোলাবর্ষণ থেকে নিস্তার লাভের জন্য তাঁর সৈন্যদের আম্রকুঞ্জে আশ্রয় নেয়ার নির্দেশ দিলেন। ঠিক এ ধরনের প্রতিরোধ ক্লাইভ আশা করেন নি। এ দেশীয় ষড়যন্ত্রকারীদের এক প্রতিনিধি নাকি ক্লাইভকে আশ্বাস দিয়েছিল, নবাবের সব সৈন্য ও সেনাপতি নবাবের প্রতি একান্তভাবেই বিরূপ এবং কেউই নবাবের হয়ে যুদ্ধ করবে না। ক্লাইভ যুদ্ধক্ষেত্রে সেই প্রতিনিধিকে নাকি বলেছিলেন, "এখন দেখছি ঠিক তার উল্টোটাই ঘটছে।"[১৩২] জন উড নামে পলাশীতে যুদ্ধ করেছে এমন এক ইংরেজ সৈন্য লিখেছে : "সারা সকাল ধরে ইংরেজদের অবস্থা খুবই নাজুক ছিল" এবং "রাত্রে কিছু করা ছাড়া অন্য কিছু তারা ভাবতেই পারছিল না।"[১৩৩]

চার ঘণ্টা যুদ্ধ চলার পরও জয়-পরাজয়ের কোন নিষ্পত্তি হয় নি ঠিকই, কিন্তু ইংরেজদের অবস্থা মোটেই উৎসাহব্যঞ্জক ছিল না। অন্যদিকে সিরাজউদ্দৌলার প্রতি মোটেই সুপ্রসন্ন ছিলেন না এমন একজন ফরাসী সমসাময়িক ঐতিহাসিকও বলছেন, "জয় ও বরমাল্য নবাবের হাতে প্রায় এসে যাচ্ছিল"। নবাবের সৈন্যবাহিনীর দুই-তৃতীয়াংশ মীর জাফর, ইয়ার লতিফ এবং রায় দুর্লভের অধীনে দর্শকের মতো নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে যুদ্ধ দেখলেও মীরমদন ও মোহনলাল ধীরে অথচ সদর্পে আম্রকুঞ্জের দিকে এগোচ্ছিলেন।[১৩৪] সময় তখন বিকেল প্রায় তিনটা। আর তখনই ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটলো। নবাবের 'শক্তির প্রধান উৎস', ডান হাত বলতে যা বোঝায়, সেই মীরমদন অকস্মাৎ শত্রুপক্ষের গোলার আঘাতে গুরুতরভাবে আহত হলেন। নবাবের তাঁবুতে আনার পরই তাঁর মৃত্যু হলো। এ ঘটনায় পলাশী যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেল। স্ক্র্যাফটন পলাশীর যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন এবং লিখেছেন : "আমাদের সাফল্যের একটি বড় কারণ হচ্ছে,ভাগ্যক্রমে মীরমদন নিহত

১৩২. *Sier*, Vol. II, 231, Mark Bence Jones, *Clive of India*, 140, Michael Edwards, *The Battle of Plassey*, 144

১৩৩. Holden Furber & Kristof Glamann, "Plassey A New Account from the Danish Archives", *Journal of Asian Studies*, Vol XIX, No 2, February 1960, 178.

১৩৪. Ghulam Husain Salim *Riaz-us-Salatin*, 375; *Sier*, Vol II, 231

হলেন।"[১৩৫] দিশেহারা হয়ে সিরাজউদ্দৌলা মীর জাফরকে ডেকে পাঠালেন এবং নিজের মাথার মুকুট মীর জাফরের সামনে রেখে তাঁর 'জীবন ও সম্মান' রক্ষা করার আকুতি জানালেন। মীর জাফর নবাবকে পরামর্শ দিলেন ঐদিনের মতো যুদ্ধ স্থগিত রাখতে. আশ্বাস দিলেন, পরের দিন মীর জাফর নিজে যুদ্ধ শুরু করবেন। এই খবরটি সঙ্গে সঙ্গে তিনি ক্লাইভকে পাচার করে দেন। উদ্ভ্রান্ত নবাব রায়দুর্লভকে ডেকে পাঠালেন, রায়দুর্লভও একই পরামর্শ দিলেন। দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে এবং এই জটিল পরিস্থিতি আপাতত সামলানোর উদ্দেশ্যে সিরাজউদ্দৌলা মোহনলাল, খাজা আবদুল হাদি, মীর মুহম্মদ কাজিম, রাজা মানিকচাঁদ প্রমুখ সেনাপতিকে পশ্চাদপসরণ করে তাঁবুতে ফিরে আসতে আদেশ দিলেন। মীরমদনের মৃত্যুর পর মোহনলাল নবাবের সৈন্যদের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন এবং নবাবের সৈন্যদের ফিরে আসতে বাধা দিলেন। সেনাপতিরা কিন্তু নবাবের আদেশ প্রথমে অগ্রাহ্য করেন এই কারণে যে, ঐ সময় নিজেদের জায়গা ছেড়ে তাঁবুর দিকে ফিরতে গেলেই শত্রুপক্ষ ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং তখন পরিস্থিতি কিছুতেই সামলানো যাবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নবাবের বারংবার অনুনয়ে তাঁরা নবাবের আদেশ মেনে নিলেন। তাঁরা তাঁবুর দিকে ফেরা মাত্রই ইংরেজরা প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করলো. নবাবের সৈন্যবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। বিকেল ৫ টার মধ্যে পলাশীর যুদ্ধ শেষ। সিরাজের পর[illegible] পরে মৃত্যুর ফলে বাংলায় ইংরেজ রাজ্য প্রতিষ্ঠাব শক্ত ভিত্তি স্থাপিত হলো।

১৩৫. Luke Scrafton *Reflections on Government* 100

# ৪

## ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠা : ১৭৫৭-১৭৯৩

সিরাজুল ইসলাম*

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মুগল সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চল সুবা বাংলায় বৃটিশ আধিপত্য বিস্তারের প্রক্রিয়া শুরু হয় সতেরো শতকের শেষ দশকে। ধাপে ধাপে প্রসারিত হয় ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আধিপত্য। ১৬৯৮ সালে কলকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর নামক তিনটি মৌজার উপর কোম্পানির জমিদারি স্বত্ব লাভ ছিল এই আধিপত্যের প্রথম দৃশ্যমান ধাপ। এরপর পর্যায়ক্রমে প্রতিটি পদক্ষেপ কোম্পানিকে এ দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে ক্রমশ সক্রিয় ও শক্তিশালী করে তোলে। যেমন, ১৬৯৮ সালে কলকাতায় দুর্গ স্থাপন, পরবর্তীকালে কলকাতার পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের উপর কোম্পানির বেনামী জমিদারি স্বত্ব প্রসার, আঠারো শতকের প্রথম থেকে এ দেশে বিপুল হারে কোম্পানির ব্যবসা বৃদ্ধি, ১৭১৭ সালে সম্রাট ফররুখশিয়রের কাছ থেকে মহা সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত ফরমান লাভ, ক্রমশ কোম্পানির ব্যবসায়ে দেশীয় পুঁজির অংশগ্রহণ, ব্যাপক হারে কোম্পানি-কর্মচারীদের অবৈধভাবে দেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে অংশগ্রহণ, ব্যবসায়িক স্বার্থে ইউরোপীয় বণিকদের সঙ্গে দেশী গোমস্তাদের আঁতাত এবং পরিশেষে নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে উৎখাত করার জন্য কোম্পানি ও দেশী বানিয়া-মুৎসুদ্দিদের মধ্যে গোপন ষড়যন্ত্র। ১৬৯৮-১৭৫৬ সময়কালে কোম্পানির উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে অধিকতর বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা আদায় করা এবং বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের নিরাপত্তা বিধান করা।

কিন্তু সরাসরি রাজ্য স্থাপন করার নীতি গ্রহণ করা হয় পলাশী যুদ্ধের পর এবং সে নীতিও একদিনে গৃহীত হয় নি। বস্তুত এ দেশে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়

* অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

এবং ধাপে ধাপে। ১৬৯৮-১৭৫৬ সময়কাল ছিল যথার্থ অর্থে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মানসিক প্রস্তুতিকাল। পলাশী যুদ্ধের পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ কোম্পানিকে উদ্বুদ্ধ করে প্রকৃত রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্য, কিন্তু তখনো সে রাজনৈতিক অভিলাষ সীমাবদ্ধ ছিল এ দেশে বাণিজ্যরত কোম্পানির কর্মচারীদের মধ্যে। ব্যক্তিগত বাণিজ্যিক স্বার্থে কর্মচারীরা কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলীর (Court of Directors) নির্দেশ উপেক্ষা করে রাজ্য স্থাপনের পথে এগিয়ে যায়। সমকালীন যোগাযোগব্যবস্থার কারণে কোম্পানির কর্মচারীরা স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ পায় এবং পরিস্থিতির চাপে পরিশেষে পরিচালকমণ্ডলী ঐসব সিদ্ধান্ত অনুমোদন করতে বাধ্য হয়। মনে রাখা উচিত যে, শান্তিপূর্ণ বাণিজ্যের মাধ্যমে মুনাফা অর্জনই ছিল পরিচালকমণ্ডলীর লক্ষ্য। কিন্তু এ দেশে কর্মরত কোম্পানির কর্মচারীদের লক্ষ্য ছিল নিজেদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যের প্রসার ঘটানো। মুগল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কোম্পানির দ্বন্দ্বের মূল কারণ দস্তকের অপব্যবহার, অর্থাৎ সরকার যেসব বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা কোম্পানিকে প্রদান করেছিল, কোম্পানির কর্মচারীরা তাদের ব্যক্তিগত ব্যবসাক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য বলে দাবি করলো। কিন্তু সরকার তা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানানোর কারণেই কর্মচারীরা রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে ব্যবসা প্রসারের প্রয়াস পায়। ১৭৫৬ সালের ষড়যন্ত্র, পলাশীর যুদ্ধ, চব্বিশ পরগনার জমিদারি লাভ (১৭৫৭), বর্ধমান, চট্টগ্রাম ও মেদিনীপুর জেলার স্বত্ব লাভ (১৭৬০), মীর কাশিমের সঙ্গে যুদ্ধ (১৭৬৪) এবং ১৭৬৫ সালে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দীউয়ানি লাভ সংক্রান্ত সব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল পরিচালকমণ্ডলীর অগোচরে। পরিচালকমণ্ডলীর সম্মতিক্রমে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়া শুরু হয় ১৭৬৭ সাল থেকে, যখন রবার্ট ক্লাইভকে দ্বিতীয়বার প্রেরণ করা হয় কলকাতা ফোর্ট উইলিয়মের গভর্নররূপে এবং এই প্রক্রিয়া পূর্ণতা লাভ করে ১৭৯৩ সালে, যখন নবাবি ক্ষমতা ও নবাবি শাসনব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করে শ্বেতাঙ্গ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার এই ক্রমবিকাশ পর্যালোচনা বর্তমান অধ্যায়ের উদ্দেশ্য।

## মীর জাফর ও ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, ১৭৫৭-৬০

পলাশী বিপর্যয়ের ফলে দেশে মুগল সার্বভৌমত্বের অবসান হয়েছে বা এমনকি কোনক্রমে তা ক্ষুণ্ন হয়েছে এমন কোন আশঙ্কা সমকালীন রাজনৈতিক মহলে জাগে নি। এদের দৃষ্টিতে পলাশী ঘটনা ছিল একটি আকস্মিক ক্ষমতাবদল মাত্র, যেমনভাবে ক্ষমতা পরিবর্তিত হয়েছিল নবাব মুর্শিদকুলী খান (১৭২৭) এবং নবাব শুজাউদ্দিন খানের মৃত্যুর (১৭৩৯) পর। এমনকি ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিও ভাবে নি যে পলাশী যুদ্ধ জয়ের ফলে মুগল সার্বভৌমত্ব ব্যাহত হয়েছে। মনে রাখা উচিত যে, মুগল রাজনৈতিক কাঠামোতে বিদেশীদের উপস্থিতি অবিধেয় কিছু ছিল না। উল্লেখ্য যে, মুগল সেনাবাহিনীতে, বিশেষ করে গোলন্দাজ শাখায় ইংরেজ, ওলন্দাজ, পর্তুগীজ ও ফরাসীরা নিযুক্ত হয়েছে এক শতাব্দী আগে থেকেই। যেমন, মারাঠা হামলা থেকে সুবা বাংলাকে

রক্ষা করার জন্য আলিবর্দী খান ইউরোপীয়দের সামরিক সাহায্য কামনা করেছিলেন।[১] সেনাবাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেবার জন্য ১৭৪৪ সালে আলিবর্দী খান "ত্রিশ-চল্লিশ জন বৃটিশ সামরিক অফিসার নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেন"।[২] কলকাতা অভিযানে (১৭৪৪) এবং পলাশী যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলা অনেক ইউরোপীয় গোলন্দাজ যোদ্ধা ও প্রকৌশলী নিযুক্ত করেছিলেন।[৩]

মুগল রাজনৈতিক দর্শনে অগ্রাধিকার পেয়েছে সামরিক আভিজাত্য। আনুগত্য প্রদর্শন করলে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে যেকোন সমরনায়ক মুগল সামরিক অভিজাত শ্রেণীর সদস্যপদ লাভ করতে পারতেন। কিন্তু অন্য কোন পেশার লোক সহজে এ সুবিধা লাভ করতে পারতেন না। মুগল আভিজাত্যের দৃষ্টিতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীরা ছিল বণিক, অতএব নিম্নশ্রেণীর। মুগল সরকার কখনো এদের সমকক্ষ গণ্য করে নি। কারণ এদের মাপকাঠিতে বীর বড়, বণিক ছোট; বীরের সঙ্গে বণিককে সমপর্যায়ে দেখা যায় না। কিন্তু বৃটিশ রয়েল অফিসার হিসেবে কর্নেল ক্লাইভ ও এডমিরাল ওয়াটসন ছিলেন সামরিক নেতা। অতএব সমকক্ষ হিসেবে তাঁদেরকে মুগল আভিজাত্যের অন্তর্ভুক্ত করতে তাঁদের কোন বাধা ছিল না। হুগলী দখলকালে নবাব সিরাজউদ্দৌলা তাই ক্লাইভকে লিখেছিলেন, "আমি অবগত আছি যে আপনি একজন যোদ্ধা, সমরবীর; সুতরাং আপনার সঙ্গে সমপর্যায়ে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে আমার কোনই আপত্তি নেই"।[৪] নবাব মীর জাফরের সুপারিশে দিল্লীর বাদশাহ কর্নেল ক্লাইভ, কর্নেল কুট ও এডমিরাল ওয়াটসনকে সম্মানসূচক সামরিক উপাধিতে ভূষিত করেন। যেমন, ক্লাইভকে উপাধি দেয়া হয় সাবুদ জং (সমরে শক্ত), মুইনুদ্দৌলা (রাষ্ট্রের সেরা); ওয়াটসনকে দেয়া হয় দিলীর জং (সমরে সাহসী) এবং কুটকে দেয়া হয় সাইফ জং (যুদ্ধের তলোয়ার) উপাধি, ইত্যাদি। অধিকন্তু, বাদশাহ ক্লাইভকে ছয় হাজারী জাট ও পাঁচ হাজারী ঘোড়ার মনসবদার পদে অধিষ্ঠিত করেন। ক্লাইভের পর ফোর্ট উইলিয়মের সকল গভর্নর ও কর্মকর্তাকে বিভিন্ন মুগল উপাধিতে ভূষিত করা হয়।[৫] এসবের পেছনে তাত্ত্বিক যুক্তি এই যে, মুগল রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে বিদেশীদের অংশগ্রহণে কোন বাধা নেই যদি এরা অভিজাত হয়ে থাকে এবং মুগল সরকারের প্রতি অনুগত থাকে। আর উপাধি তো আনুগত্যেরই পুরস্কার।

১. *Bengal Public Consultations*, 29 July 1742, (India Office Records, London); A.M. Khan, *The Transition in Bengal, 1756-1775*, (Cambridge 1969), 2-3.

২. A.M. Khan, *Transition*, 3.

৩. S.C. Hill, *Bengal 1756-57*, (London 1905), Vol. 1, Appendix 66.

৪. Sirajuddaula to Clive, I February 1757, *Home Miscellaneous Series*, Vol. 193,23, Cited in A.M, Khan, *Transition*, 4.

৫. মুগল সরকার কর্তৃক বৃটিশ নাগরিকদেরকে প্রদত্ত খেতাবাদি সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, A. M. Khan, *Transition*, XII-III, 5-6. ১৭৬০ সালের পর থেকে সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের প্রচুর পরিমাণে এবং নির্বিচারে এসব খেতাব প্রদান করা হয়।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ওসব উপাধি প্রদান ছিল সুবা বাংলায় ইংরেজ আধিপত্য সসম্মানে মেনে নেবার ছল মাত্র। যদিও কোম্পানির বিঘোষিত লক্ষ্য ছিল একজন মিত্র নবাবের অধীনে ১৭১৭ সালের ফরমান মোতাবেক শান্তিপূর্ণ উপায়ে বাণিজ্য করা[৬], তথাপি পলাশী যুদ্ধের পর কোম্পানির কর্মচারীদের বৃহদংশ রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের জন্য তৎপর হয়ে উঠে এবং দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ শুরু করে। ১৭৫৭-১৭৬৫ সময়কালের ঘটনাপ্রবাহ এই হস্তক্ষেপের প্রত্যক্ষ ফল।

বাংলার ইতিহাসে ইতিপূর্বে অনেকেই কণ্টকাকীর্ণ সিংহাসনে আরোহণ করেছেন। এঁদের মধ্যে মীর জাফর আলী খান বোধ হয় অতুলনীয়। অদূরদর্শী মীর জাফর আলী নগরচুক্তি (১৭৫৬) করার সময় হয়তো ভেবেছিলেন যে, কোম্পানির সঙ্গে মৈত্রী স্থাপিত হলে বৈদেশিক বাণিজ্য বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের সম্পদ বৃদ্ধি পাবে এবং ইংরেজদের ক্ষতিপূরণ প্রদান করে তিনি স্বাধীন ও সমৃদ্ধিশালী নবাব হিসেবে প্রবল ক্ষমতার অধিকারী হবেন। কিন্তু তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল অবাস্তব। সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের পর তিনি নিজ বলে সগৌরবে সিংহাসনে বসতে পারেন নি। পলাশী যুদ্ধের এক সপ্তাহ পর ক্লাইভ তাঁকে গদিতে বসান (২৯ জুন ১৭৫৭)। সপ্তাহব্যাপী রাজনৈতিক শূন্যতায় রাষ্ট্রীয় কোষাগার ও অন্যান্য সম্পদের ব্যাপক লুটপাট হয়। প্রত্যক্ষদর্শী লুক স্ক্র্যাফটনের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, "নবাবের হারেমের মহিলারা বিপুল পরিমাণ সোনা, হীরা-মুক্তা ও নগদ অর্থ নিয়ে প্রাসাদ থেকে পালিয়ে নিরাপদ আশ্রয় নেয়; সিপাহিরা কোষাগার ভেঙ্গে যাকিছু পায় লুট করে নিয়ে যায়।"[৭] কোম্পানির সঙ্গে চুক্তির (১৫ জুলাই ১৭৫৭) শর্ত মোতাবেক সিরাজউদ্দৌলা কর্তৃক কলকাতা আক্রমণের কারণে ক্ষয়ক্ষতি বাবদ মীর জাফর আলী খান কোম্পানিকে ২২৭ লক্ষ সিক্কা টাকা পরিশোধ করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিলেন।[৮] এ

৬. পলাশী ষড়যন্ত্রে যোগ দেয়ার যাথার্থ্য বর্ণনা করতে গিয়ে সিলেক্ট কমিটি লিখে, "...এবং একটি বিপ্লব এতো স্বাভাবিকভাবে আশা করা যাচ্ছিল যে আমাদের সাহায্য ছাড়াই (সম্ভবত সাফল্যজনকভাবে) এই লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালানো হতো, কিন্তু সেক্ষেত্রে এর ফলাফল খুব সামান্যই আমরা ভোগ করতে পারতাম। অথচ এ উদ্দেশ্যে স্থাপিত মৈত্রীসংঘের প্রতি অনুকূল মনোভাব পোষণ ও আমাদের সর্বশক্তি দিয়ে একে সহায়তা প্রদান দ্বারা আমরা আমাদের নিজস্ব উদ্দেশ্য সাধন করতে পারবো, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সুযোগ-সুবিধার সদ্ব্যবহার করে আমাদের কর্মচারীদের লাভবান করতে পারবো, সাধারণ কল্যাণমূলক কাজ করতে পারবো, অধিকৃত হওয়ার দরুণ আমাদের কলোনিবাসীরা (কলকাতা) যে বিপুল ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে তা পূরণের দ্বারা তাদের সন্তোষ উৎপাদন করতে পারবো, দেশে স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করতে পারবো এবং এর মাধ্যমে আমাদের ব্যবসায়ে নজিরবিহীন বৃহত্তর সুবিধাজনক পরিস্থিতির দ্বার উন্মোচন করতে পারবো এবং সবশেষে ফরাসীদের আশা-ভরসা ধূলিসাৎ করে তাদেরকে এই অঞ্চল থেকে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করতে সক্ষম হবো।"
দেখুন, ফোর্ট উইলিয়মের সিলেক্ট কমিটি কর্তৃক সিক্রেট কমিটির কাছে লিখিত পত্র। লন্ডন, ১৪ জুলাই, ১৭৫৭. উদ্ধৃত, Ramsay Muir, *The Making of British India,1756-1858.* (Oxford 1916), Pakistan reprint, 49-50.

৭. Luke Scrafton, A *History of Bengal before and after Plassey (1739-1758),* (London 1763), Indian edition, Calcutta, 1975, 87-88.

৮. ঐ।

ছাড়াও কোম্পানির বিভিন্ন কর্মকর্তাকে আর্থিকভাবে পুরস্কৃত করার জন্য তিনি ছিলেন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কোম্পানি ও এর কর্মকাণ্ডের দায়-দেনা শোধ করতে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন ছিল এর ক্ষুদ্রাংশও মীর জাফর আলীর কোষাগারে ছিল না।

কঠিন আর্থিক সমস্যা ছাড়াও মীর জাফর আলী জটিল রাজনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হন। বিহারের নায়েব সুবা রামনারায়ণ রায় ছিলেন সিরাজউদ্দৌলার অনুগত। তিনি মীর জাফরের সিংহাসন লাভের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করেন। অনুরূপভাবে সিরাজের অনুগত জমিদারগণ, বিশেষকরে পূর্ণিয়া ও মেদিনীপুরের জমিদারবৃন্দ মীর জাফরকে নবাবরূপে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করেন। মীর জাফরের দীউয়ান (অর্থমন্ত্রী) এবং পলাশী চক্রান্তের অন্যতম নায়ক রায়দুর্লভ প্রায় প্রকাশ্যে তাঁর বিরোধিতা করে নবাববিরোধী চক্রের হাত শক্তিশালী করেন। ওদিকে বাংলা থেকে রাজকর না পেয়ে দিল্লীর বাদশাহ্ শাহ্ আলম মুর্শিদাবাদ আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে খবর পাওয়া যায়। বাদশাহ্কে সমর্থন দেন রামনারায়ণ রায়। অন্য দিকে নিয়মিত বেতন-ভাতাদি না পেয়ে সিপাহিরাও বিদ্রোহী হয়ে উঠে। সমসাময়িক ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন তাবাতাবাই মন্তব্য করেন যে, মীর জাফর বৈরী পরিস্থিতির এমন এক অসহায় শিকারে পরিণত হন যে, এর সুযোগ গ্রহণ করে সবাই যার যার হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার প্রচেষ্টায় সক্রিয় হয়ে উঠে।[৯]

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে গদি রক্ষার জন্য মীর জাফরের পক্ষে কোম্পানির দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় রইল না। এদিকে মিত্র হিসেবে তাঁকে গদিনশীন রাখা ছিল কোম্পানির স্বার্থ; তবে সম্পূর্ণ আপদমুক্ত হয়ে তিনি যেন শক্তিশালী শাসকে পরিণত না হন সেটাও ছিল কোম্পানির একটি রাজনৈতিক বিবেচনার বিষয়।[১০] অতএব, আমরা দেখতে পাই, রবার্ট ক্লাইভ একদিকে যেমন তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে বিদ্রোহীদের দমন করে মীর জাফরকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে সাহায্য করছেন, তেমনি অপরদিকে মীর উপর চাপ প্রয়োগ করছেন বিদ্রোহী নেতাদের ক্ষমতাচ্যুত না করার জন্য হস্তক্ষেপে তিনি রামনারায়ণ রায়, রায়দুর্লভ প্রমুখ শত্রুদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে বিরত থাকেন। তাঁরা নবাবের শত্রু বটে, কিন্তু কোম্পানির বন্ধু। দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কোম্পানির হস্তক্ষেপ তার সঙ্গে চুক্তির নগ্ন লঙ্ঘন। তবু মীর জাফর নিরুপায়। সুবার রাজনীতিতে নাক না গলানোর জন্য কোম্পানিকে তিনি বার বার অনুরোধ জানান, কিন্তু কোম্পানি এতে কর্ণপাত করে নি।

বৃটিশদের প্রতি নতজানু নীতি সত্ত্বেও অচিরেই নবাব মীর জাফর তাদের বিরাগভাজন হন। কোম্পানিকর্তৃপক্ষ আশা পোষণ করেছিল যে, মীর জাফর ক্ষতিপূরণ বাবদ যে অর্থ

৯. Ghulam Husain Khan Tabatabai, *Seir-ul-Mutakherin* by Haji Mustafa (first published 1789) Calcutta reprint 1902, Part II, 6.

১০. Luke Scrafton, *Observations on Vansittart's Narrative*, (London 1767), 2.

শোধ করবেন এবং অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য থেকে যে মুনাফা অর্জিত হবে তা দিয়ে বাংলায় কোম্পানির পুঁজি যোগানো ছাড়াও দাক্ষিণাত্যে ফরাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের খরচ যোগানো, বাংলায় শক্তিশালী সামরিক বাহিনী গঠন এবং দূরপ্রাচ্যে বাণিজ্যের পুঁজি বিনিয়োগ সবই সম্ভব হবে।[১১] ইংরেজদের সে প্রত্যাশা মীর জাফর পূরণ করতে পারেন নি। দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা, বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ, কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্য প্রভৃতি কারণে সরকারের রাজস্ব-আয় এমন হ্রাস পায় যে, মীর জাফরের পক্ষে ক্ষতিপূরণ দেয়া দূরে থাক, সেনাবাহিনীর বেতন-ভাতাদি দেয়াই অসম্ভব হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় কোম্পানির ফোর্ট উইলিয়ম কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নেয় যে, মীর জাফর যেহেতু ক্ষতিপূরণ দিতে অপারগ, সেহেতু কোম্পানি মনে করে, ক্ষতিপূরণ বাবদ সরকারের উচিত কোম্পানিকে কতিপয় জেলা স্থায়ীভাবে ছেড়ে দেয়া। গভর্নর ভান্সিটার্টের ভাষায় :

> বাংলার আয় থেকে ফোর্ট সেন্ট জর্জ অর্থাৎ মাদ্রাজের আর্থিক প্রয়োজন মেটানো দূরে থাক, অর্থের অভাবে খোদ বাংলায়ই আমাদের 'ইনভেস্টমেন্ট' প্রায় বন্ধ হবার উপক্রম। আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা এমনই নাজুক হয়ে পড়েছে যে, ফোর্ট উইলিয়মের অত্যাবশ্যক খরচ মেটানো এবং সৈন্যদের বেতন দেয়াই কঠিন হয়ে পড়েছে। এহেন অবস্থা রোধ করতে হলে অনতিবিলম্বে অধিক পরিমাণ এবং অধিকতর নিশ্চিত আয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এটা একমাত্র সম্ভব যদি নবাব স্থায়ীভাবে রাজ্যের কিছু অংশ কোম্পানিকে ছেড়ে দেন।[১২]

প্রাক-পলাশী যুগে যখন কোম্পানির কোন রাজনৈতিক প্রভাব ছিল না এবং যখন কোম্পানি বিভিন্ন বণিকগোষ্ঠীর সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসা করতো, তখন কোম্পানি বিপুল মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু পলাশীর পর সুযোগ-সুবিধা অকল্পনীয়ভাবে বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও কোম্পানি ক্রমাগত লোকসানের ফলে প্রায় দেউলিয়া হবার উপক্রম হয়। এর কারণ কোম্পানির কর্মকর্তাদের মধ্যে দুর্নীতি ও অব্যবসায়ী খাতে ব্যয় বৃদ্ধি। কোম্পানির স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে কর্মকর্তারা ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে মেতে উঠে এবং ঐ ব্যক্তিগত ব্যবসার নিরাপত্তার জন্য সেনাবাহিনীর মতো অব্যবসায়ী খাতে খরচ বাড়িয়ে চলে। স্বভাবতই কোর্ট অব ডিরেক্টর্স এদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ছিল সমালোচনামুখর। কিন্তু কলকাতা ফোর্ট উইলিয়ম কর্তৃপক্ষ এদের পক্ষে এমনভাবে জনমত সৃষ্টি করে যে, ডিরেক্টরদের পক্ষে তা নীরবে অনুমোদন করা ছাড়া আর কোন বিকল্প থাকে না। কোম্পানির অর্থনৈতিক মন্দা কাটানোর লক্ষ্যে স্থায়ীভাবে রাজ্যের কিছু ভূমি দখল করার পরিকল্পনা আসলে দুর্নীতিবাজ ও উচ্চাভিলাষী ফোর্ট উইলিয়ম কর্মকর্তাদের ধাপে ধাপে রাজ্য স্থাপনের বৃহত্তর পরিকল্পনারই অংশ। পূর্বে তারা কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলীকে বোঝাবার চেষ্টা করে যে, সিরাজউদ্দৌলার বদলে একজন মিত্র

১১. P.J. Marshall, *The New Cambridge History of India*, II· 2; *Bengal:The British Bridgehead*, (Cambridge 1987), 84-85.

১২. *Fort William—India House Correspondence*, Vol III, 1760-63. ed. R.R. Sethi, (Delhi 1968), 290

১৩. Henry Vansittart, *A Narrative of the Transactions in Bengal from 1760 to 1764*, (London 1766) Vol.1, 64-65.

নবাবকে ক্ষমতাসীন করতে পারলে বাংলায় কোম্পানি-বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি হবে। কিন্তু বাস্তবে তা হয় নি। এবার এরা পরিচালকমণ্ডলীর কাছে আশাবাদ ব্যক্ত করে যে, নবাবের রাজ্যের কিয়দংশ দখল করলে কোম্পানির আর কোন আর্থিক অসুবিধা থাকবে না।

ভূমি দখল নবাবের সঙ্গে কোম্পানির সকল চুক্তি এবং মিত্রতার পরিপন্থী। ভূমি দখলের মাধ্যমে ফোর্ট উইলিয়ম কর্তৃপক্ষ বণিকের অবস্থান থেকে রাজনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত হতে তৎপর হয়। কোম্পানির এহেন রাজনৈতিক অভিলাষ ছিল মুগল সার্বভৌমত্বের প্রতি একটি চ্যালেঞ্জ। মীর জাফর সে চ্যালেঞ্জের মোকাবেলার জন্য তাঁর সাধ্যমত প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন। তিনি সেনাবাহিনীকে আরো সুশৃঙ্খল ও শক্তিশালী করার সঙ্কল্প নেন এবং একই সময়ে ইংরেজদের আধিপত্যে ঈর্ষান্বিত ওলন্দাজ ও ফরাসীদের সঙ্গে গোপন যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেন।[১৩]

কিন্তু ফোর্ট উইলিয়ম কাউন্সিলের কাছে তাঁর অভিসন্ধি গোপন থাকে নি। মুর্শিদাবাদের ঐ ষড়যন্ত্রমূলক পরিবেশে কিছুই গোপন থাকার কথা নয়। কাউন্সিল মনে করে যে, ইংরেজদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে মীর জাফরকে অপসারণ করা একান্ত প্রয়োজন।[১৪] তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় যে, চুক্তি মোতাবেক ১৭৫৭ থেকে তিন বছরের মধ্যে কোম্পানির সকল দেনা শোধ করার শর্ত তিনি লঙ্ঘন করেছেন। গভর্নর ভান্সিটার্ট দাবি জানান যে, মীর জাফর যেহেতু কোম্পানিকে প্রদেয় দেনা শোধ করতে অপারগ, সেহেতু ২৪ পরগনা ছাড়া আরো তিনটি জেলা (বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম) দেনা পরিশোধ বাবদ কোম্পানিকে হস্তান্তর করা হোক। ভান্সিটার্ট হুমকি দেন যে, প্রস্তাবিত জেলাগুলি হস্তান্তর না করলে নবাবের প্রতি কোম্পানির সমর্থন প্রত্যাহার করা হবে।[১৫] নবাব মীর জাফর তিনটি জেলা হস্তান্তর করার প্রস্তাবকে তাঁর সঙ্গে সম্পাদিত কোম্পানির মৈত্রীচুক্তির নগ্ন লঙ্ঘন বলে ঘোষণা করেন। অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগের এক পর্যায়ে কোম্পানি মীর জাফরকে উৎখাত করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং মীর জাফরের জামাতা মীর কাশিমের সঙ্গে আঁতাত করে আরেকটি চুক্তি সম্পাদন করে (২৭ সেপ্টেম্বর ১৭৬০)। চুক্তি অনুসারে সিংহাসনের বদলে মীর কাশিম বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম এই তিনটি বিস্তীর্ণ জেলা কোম্পানিকে ছেড়ে দিতে রাজি হন। কোম্পানি তিনটি জেলার বিনিময়ে নবাবের কাছে সকল পাওনা পরিশোধিত হয়েছে বলে ঘোষণা করে।[১৬]

## নবাব মীর কাশিম (১৭৬০-১৭৬৩)

### *সার্বভৌমত্ব রক্ষার শেষ চেষ্টা*

২০ অক্টোবর ১৭৬০ মীর কাশিম নবাব বলে ঘোষিত হন। ইংরেজদের সাহায্যে মীর জাফর যেমন নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে উৎখাত করেন, তেমনি মীর কাশিমও ইংরেজদের

১৪. বিস্তারিত দ্র., Atul Chandra Roy, *The Career of Mir Jafar Khan 1757-1765*, (Calcutta 1953).

১৫. A. M. Khan, *Transition*, 32-33

১৬. সিরাজুল ইসলাম, *বাংলার ইতিহাস : ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামো*, (ঢাকা ১৯৮৪), অধ্যায়-২।

হাত ধরে নবাব হন। পার্থক্য এই যে, সিরাজউদ্দৌলা ষড়যন্ত্রকারীদের প্রতিরোধ করে পরাস্ত হন, আর মীর জাফর সিংহাসন ত্যাগ করেন কোন প্রতিরোধ ছাড়াই। ইংরেজদের বিরুদ্ধে সামরিক সংঘাতে অবতীর্ণ হওয়া নিষ্ফল প্রচেষ্টা হবে—এই বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে তিনি নীরবে গদি ছেড়ে দেন। ইংরেজদের সঙ্গে মীর কাশিমের আঁতাত অপ্রত্যাশিত কিছু নয়। ক্ষমতালাভের জন্য ষড়যন্ত্র ও ঝুঁকিপূর্ণ আঁতাত মুগল সামরিক আভিজাত্য ও ঐতিহ্যের একটি বৈশিষ্ট্য।[১৭] মীর কাশিমের উত্থান এই বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। তবে ঝুঁকির দিক থেকে পূর্বেকার সকল আঁতাতকে ছাড়িয়ে যায় কোম্পানির সঙ্গে মীর কাশিমের চুক্তি। এর ফলে তাঁর নিজের জীবনই শুধু বিনষ্ট হয় নি, এ দেশে মুগল রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াও ত্বরান্বিত হয়। তবে কেন তিনি এই পদক্ষেপ নিয়েছিলেন ? কোম্পানির শক্তি ও রাজনৈতিক প্রভাব ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও তিনি তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন কয়েকটি অবাস্তব ধারণার বশবর্তী হয়ে। যেমন, তিনি মনে করেন যে, কলকাতায় বৃটিশ বসতিকে কেন্দ্র করে হুগলী-ভাগীরথী অববাহিকায় কোম্পানি ১৬৯০ সাল থেকে বিগত পঞ্চাশ বছরে যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব বিস্তার করেছে তা এতই ব্যাপক ও সর্বগ্রাসী যে, এই প্রভাববলয়ের ভিতর কোন শাসকের পক্ষেই সার্বভৌমত্ব বজায় রাখা সম্ভব নয়। এই অবস্থায় তিনি মনে করেন যে, অন্তত কিছুকাল গঙ্গার নিম্নাঞ্চলে কোম্পানির তৎপরতা রাজনৈতিকভাবে স্বীকার করে নিয়ে গঙ্গার উজানে এদের প্রভাববিস্তার রোধ করে সেখানে নবাবের ক্ষমতা অক্ষুণ্ন রেখে পরে ধীরে ধীরে নিম্নাঞ্চলে কোম্পানিকে নবাবের কর্তৃত্বাধীনে আনার ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব।

মীর কাশিমের পরিকল্পনার মধ্যে ছিল মুর্শিদাবাদ থেকে সুদূর মুঙ্গেরে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে ইংরেজদের প্রভাববলয়কে অকার্যকর করে দেয়া, নতুন রাজধানীতে কোন ইংরেজ বা ইংরেজ প্রতিনিধিকে বসবাসের অনুমতি না দেয়া, ইংরেজদের সঙ্গে ভবিষ্যতে মোকাবেলার জন্য সরকারের অর্থনীতি শক্তিশালী করা এবং সেনাবাহিনীকে আধুনিক করা। তাঁর পরিকল্পনার মধ্যে আরো ছিল প্রশাসন থেকে সকল নবাববিরোধী ও বৃটিশপন্থী কর্মচারীদের বরখাস্ত করে একটি দক্ষ ও অনুগত আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। এক কথায়, কৌশলগতভাবে একটি সুবিধাজনক জায়গায় অবস্থান নিয়ে একটি পেশাদার সেনাবাহিনী ও দক্ষ আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে এবং রাষ্ট্রীয় কোষাগারকে সমৃদ্ধ করে অচিরেই ইংরেজদের কবল থেকে সুবা পুনরুদ্ধার—এই ছিল মীর কাশিমের স্বপ্ন।

মীর কাশিম তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রথমেই রাজধানী সরিয়ে নেন মুঙ্গেরে। মুঙ্গেরে গমনের জন্য তিনি নির্দেশ দেন শুধু সেসব আমলা, আমির ও অমাত্যদের, যাঁরা

১৭. মুর্শিদকুলী খানের মৃত্যুর (১৭২৭) পর থেকে প্রাসাদ-ষড়যন্ত্র নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়। তাঁর মনোনীত সরফরাজ খান উৎখাত হন শুজাউদ্দিন খান (১৭২৮-৩৯) কর্তৃক, শুজাউদ্দিনের মনোনীত সরফরাজ খান পুনরায় আলিবর্দী খান (১৭৪০-৫৬) কর্তৃক ক্ষমতাচ্যুত হন। আলিবর্দীর মনোনীত উত্তরাধিকারী সিরাজউদ্দৌলা মীর জাফর কর্তৃক সৃষ্ট সেই একই ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত হন। ১৭৬০ সালে এই মীর জাফরই আবার ক্ষমতাচ্যুত হন মীর কাশিমের দ্বারা।

ছিলেন তাঁর প্রতি অনুগত এবং ইংরেজদের অভিসন্ধি সম্পর্কে সচেতন। মুঙ্গেরে যেন কোন বৃটিশ বা বৃটিশ প্রতিনিধি অবস্থান না নিতে পারে সেজন্য তিনি কোম্পানির প্রতিনিধিকে (Resident) মুর্শিদাবাদে থাকতে নির্দেশ দেন। প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে তিনি দরবারের সকল অপ্রয়োজনীয় কর্মচারী ছাঁটাই করেন ও যেসব উচ্চ আমলা-মুৎসুদ্দির আনুগত্য সন্দেহাতীত নয় তাদের বরখাস্ত করেন। তিনি সরকারের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিপুল পরিমাণ ভুয়া লাখেরাজ জমি বাজেয়াপ্ত করেন এবং নতুন জরিপের মাধ্যমে বর্ধিত হারে জমিদারদের রাজস্ব দিতে বাধ্য করেন। নতুন অর্থনৈতিক সংস্কারের ফলে সরকারের আয় বৃদ্ধি পায়। ফলে নবাব মীর কাশিম সকল দেনা শোধ করতে এবং সেনাবাহিনীর সকল বকেয়া বেতন-ভাতাদি শোধ করতে সক্ষম হন। আর্থিক সচ্ছলতা লাভ করে তিনি একটি আধুনিক সেনাবাহিনী গড়ে তোলার জন্য অবৃটিশ ইউরোপীয় সেনাপ্রশিক্ষক নিয়োগ করেন।[১৮]

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সরকারের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল করা, আইনশৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা এবং আধুনিক সেনাবাহিনী গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় নবাব মীর কাশিমের অসাধারণ যোগ্যতা ও দেশাত্মবোধের পরিচয় মেলে। কিন্তু সাফল্যের জন্য যোগ্যতাই একমাত্র মাপকাঠি নয়। ইতিহাসের যেসব রাষ্ট্রনায়ক যোগ্যতা ও আকর্ষণীয় নেতৃত্বের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও প্রতিকূল পরিস্থিতির কাছে পরাভূত হয়েছেন, মীর কাশিম তাঁদের অন্যতম। প্রশাসনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে আমূল সংস্কার আনয়নের নীতি গ্রহণ করেন। মীর কাশিমের সংস্কারনীতির অন্যতম দিক ছিল কোম্পানির কর্মচারী ও তাদের দেশী গোমস্তাদের অবৈধ ব্যবসা বন্ধ করা। বাদশাহি ফরমান অনুযায়ী কোম্পানি-কর্মচারীদের নয়, শুধু কোম্পানিরই বিনা শুল্কে বাংলার রপ্তানিবাণিজ্যে যোগদানের অধিকার ছিল। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, পলাশী যুদ্ধের পর কোম্পানির কর্মচারীরাও বিনা শুল্কে বাণিজ্য শুরু করে। এমনকি কোম্পানির গোমস্তারাও অবাধে এই অবৈধ পন্থা অবলম্বন করে। এর ফলে দেশী ব্যবসায়ীরা এদের কাছে মার খায় এবং স্বাভাবিক কারণেই শুল্ক বাবদ সরকারের আয় প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে আসে। এদের অত্যাচার মীর জাফর নীরবে সহ্য করেন, কারণ তাঁর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সত্তা ছিল কোম্পানির কাছে দায়বদ্ধ। কিন্তু সে দায়বদ্ধতা থেকে মীর কাশিম ছিলেন সম্পূর্ণ মুক্ত এবং প্রশাসন ছিল তাঁর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে, যা মীর জাফরের ছিল না। অতএব কোম্পানির কর্মচারী এবং দেশী গোমস্তাদের বেআইনী ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করার জন্য তিনি দৃঢ় সঙ্কল্প ঘোষণা করেন। চুক্তি ও দেশের আইন মেনে ব্যবসা পরিচালনার জন্য মীর কাশিম কোম্পানিকে আহ্বান জানান এবং ঘোষণা করেন যে, তিনি নিজে কোম্পানির সঙ্গে সকল চুক্তি আক্ষরিকভাবে মেনে নিতে প্রস্তুত, তবে স্বাভাবিকভাবেই অনুরূপ নীতি তিনি কোম্পানির কাছেও প্রত্যাশা করেন।

১৮. Vansittart, *Narrative*, Vol. III, 381.

কিন্তু সমস্যার মূল কারণ ছিল কোম্পানি-কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসা। সুবার আইন অনুসারে অভ্যন্তরীণ ব্যবসায়ে লিপ্ত দেশী-বিদেশী সবাইকে নির্দিষ্ট হারে শুল্ক দিতে হতো। কিন্তু কোম্পানির কর্মচারীরা দাবি তোলে যে, কোম্পানির কর্মচারী হিসেবে তাদেরও বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার রয়েছে এবং সে অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করার অধিকার নবাবের নেই। এক কথায়, নবাব মীর কাশিম কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসার উপর আইনানুগ শুল্ক আরোপ করতে বদ্ধপরিকর। অপরদিকে, কর্মচারীরাও বিনা শুল্কে ব্যক্তিগত বাণিজ্য করার অধিকার আদায়ের দাবিতে অটল। এর অনিবার্য ফল কোম্পানি ও নবাবের মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং পরিশেষে যুদ্ধ। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রাথমিকভাবে এ দেশের রাজনীতিতে আধিপত্য বিস্তারের অভিলাষ কোম্পানির পরিচালকদের ছিল না। এই অভিলাষ একান্তই ব্যবসায়ে লিপ্ত কোম্পানি-কর্মচারীদের। বলাবাহুল্য, এরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। নবাবের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক রক্ষা করে আইনানুগভাবে বাণিজ্য করার পক্ষে যাঁরা মত পোষণ করেন, তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন অতি নগণ্য। গভর্নর ভান্সিটার্ট ছিলেন এঁদের মধ্যে একজন। তবে কাউন্সিলে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণই প্রতিনিধিত্ব করতেন কোম্পানি-কর্মচারীদের স্বার্থের। নবাবের সঙ্গে বিবাদের কারণ ব্যাখ্যায় তিনি মন্তব্য করেন :

> আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমরা যদি নবাবের (মীর কাশিম) অধিকারে হস্তক্ষেপ না করি এবং তাঁর সরকারকে নানাভাবে হয়রানি না করি, তাহলে তিনিও আমাদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করবেন না। --- এমন কোন দৃষ্টান্ত দেয়া যাবে না যে, নবাব আমাদের বৈধ ব্যবসায়ে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু আমাদের কর্মচারী ও গোমস্তারা আইন লঙ্ঘন করছেন। এদের অন্যায় ও অবৈধ ব্যবসা-বাণিজ্য এবং চুক্তিবহির্ভূত অযৌক্তিক দাবিদাওয়াই নবাবকে বিবাদে লিপ্ত হতে বাধ্য করেছে।[১৯]

কোম্পানির কর্মচারী ও গোমস্তাদের বেআইনী ব্যবসা ও সরকারকে তোয়াক্কা না করার প্রবণতার বিষয় উল্লেখ করে মীর কাশিম বারবার কোম্পানি-কর্তৃপক্ষকে এ ব্যাপারে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। কিন্তু এতে কোন ফলোদয় হয় নি। অবৈধ ব্যবসায়ে লিপ্ত কর্মচারীরা দলে ভারী। অতএব এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের কোন উপায় ফোর্ট উইলিয়ম কর্তৃপক্ষের ছিল না।[২০] ফলে নবাবের শুল্ক-আমলাদের সঙ্গে অবৈধ ব্যবসায়ীদের দ্বন্দ্ব প্রায়শই সশস্ত্র সংঘাতের রূপ নেয়। এদিকে শুল্ক প্রদান করে দেশী বণিকরা কোম্পানির বণিকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় কুলাতে না পেরে ব্যবসা থেকে বিদায় নিচ্ছে। দেশ ও সরকারের অর্থনীতির উপর এর মারাত্মক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে অবশেষে মীর কাশিম পরোয়ানা জারি করে সকলের জন্য শুল্কপ্রথা রহিত করেন।

১৯. Ramsay Muir, *British India*, 74-75, Document no, 22
২০. ঐ, 73.
২১. ঐ, 73.
২২. Letter of Major Carnact, 26 February 1773, cited in John Malcolm, *The Life of Lord Clive*, Vol II (London 1830), 282-83.

কিন্তু নবাবের এই পরোয়ানাকে ফোর্ট উইলিয়ম কাউন্সিলের জঙ্গি সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ কোম্পানির প্রতি চ্যালেঞ্জ হিসেবে গণ্য করে এবং এই পরোয়ানা প্রত্যাহার করে নেবার জন্য মীর কাশিমের উপর চাপ সৃষ্টি করে। এমনকি নবাবকে ঔদ্ধত্যপূর্ণ হুঁশিয়ারি দেয়া হয় যে, "তিনি দিল্লীর বাদশাহের অনুমতি ব্যতিরেকে এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না।"[২১] বিদেশীরা বিনা শুল্কে দেশে বাণিজ্য করবে আর একই বাণিজ্যে দেশী বণিকরা শুল্ক দিতে বাধ্য হবে, তাও আবার বিদেশীদের চাপের মুখে—এহেন পরিস্থিতি কোন সার্বভৌম শাসক মেনে নিতে পারেন না। তাই নবাবের অভ্যন্তরীণ নীতিতে হস্তক্ষেপ করলে এর প্রতিফল সম্পর্কে মীর কাশিম কোম্পানিকে হুঁশিয়ার করে দেন। রাজধানী মুঙ্গেরে স্থানান্তর, নতুন রাজধানীতে কোন ইংরেজ প্রতিনিধিকে বসবাস করতে না দেয়া, মুঙ্গের দুর্গে ইংরেজ পলাতকদের আশ্রয়দান, উন্নয়নমূলক সংস্কার নীতি, বৃটিশবিরোধী শক্তিসমূহের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ স্থাপন এবং শুল্ক বিলোপ করে প্রতিযোগিতায় দেশী বণিকদেরকে বৃটিশদের সমপর্যায়ে আনা প্রভৃতি পদক্ষেপকে কোম্পানি প্রত্যক্ষ বৃটিশবিরোধী কার্যকলাপ বলে গণ্য করে। কলকাতা কাউন্সিলে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, "মীর কাশিমকে আর অগ্রসর হতে দেয়া যায় না; তাঁর কার্যকলাপ ও স্বাধীনতা কোম্পানির জন্য বিপজ্জনক।"[২২]

১৭৬০ থেকে ১৭৬২ সাল পর্যন্ত ছোটখাটো অনেক দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের জের হিসেবে মীর কাশিম অবশেষে অতিষ্ঠ হয়ে কোম্পানির পাটনা কুঠি আক্রমণ করে তাঁর পরম শত্রু কুঠিয়াল এ্যালিসকে হত্যা করেন।[২৩] এই ঘটনা থেকেই শুরু হয় কোম্পানির সঙ্গে মীর কাশিমের যুদ্ধ (জুলাই ১৭৬৩)। নবাব মীর কাশিম হয়তো ভেবেছিলেন যে, তাঁর নবগঠিত ও অধিকতর সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনী নগণ্য সংখ্যক ইংরেজ বাহিনীকে সাফল্যজনকভাবে মোকাবেলা করতে পারবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, বিভিন্ন খণ্ডযুদ্ধে তাঁর বাহিনী পর্যুদস্ত হয়ে পালিয়ে যেতে শুরু করলো। মীর কাশিমও মুঙ্গের ছেড়ে আশ্রয় নেন অযোধ্যায়। ইংরেজদের কবল থেকে দেশকে উদ্ধার করে পূর্ণ মুগল সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দিল্লীর বাদশাহ, অযোধ্যার নবাব এবং মীর কাশিম যৌথভাবে এক অভিযান চালালেন বৃটিশদের বিরুদ্ধে। বক্সারের প্রান্তরে এ সম্মিলিত বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় কোম্পানির বাহিনীর কাছে (২৩ অক্টোবর ১৭৬৪)। এই যুদ্ধে প্রমাণিত হলো যে, সংখ্যায় অল্প হলেও শ্রেষ্ঠ রণকৌশল ও অধিকতর ক্ষমতাসম্পন্ন মারণাস্ত্রের অধিকারী ইংরেজকে সেকেলে সমরকায়দায় হারানো সম্ভব ছিল না।

## ইঙ্গ-মুগল যৌথশাসন, ১৭৬৫-১৭৭২

বক্সারের যুদ্ধে সম্মিলিত মুগল বাহিনী পরাজিত হলেও তা ইংরেজ মহলে দারুণ সংশয়ের সৃষ্টি করে। আগে এরা মুগল সার্বভৌমত্বের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের ভান করে

২৩. Malcolm, *Clive*, Vol.II, 340.

প্রাদেশিক সরকারের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হতে দ্বিধা করে নি, কিন্তু বক্সার যুদ্ধের পর এই ছলের আশ্রয় নেয়া আর তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এরপর কোম্পানি-কর্তৃপক্ষের কাছে বিকল্প ছিল দুটি : হয় বৃটিশ সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করা, নয় যুদ্ধাবস্থা ও নৈরাজ্য পরিহার করার জন্য মুগল সরকারকে মেনে নেয়া। কিন্তু পরিস্থিতি ছিল এমন যে, এই দুই বিকল্প পন্থার কোনটাই তারা পুরোপুরি গ্রহণ করতে ছিল অপারগ। সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা ছিল পরিচালকমণ্ডলীর বিঘোষিত নীতির পরিপন্থী। তা ছাড়া সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করলে অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী ইউরোপীয় বণিকশক্তি ও দেশী রাজন্যবর্গের সঙ্গে সামরিক সংঘাত ছিল অবশ্যম্ভাবী, যা বাণিজ্যিক দিক থেকে ছিল মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ। অনুরূপ মারাত্মক অবস্থা ছিল দেশকে সরকারহীনতায় ঠেলে দেয়া। সেক্ষেত্রে কোম্পানির বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড অবশ্যই ব্যাহত হতো।

এমতাবস্থায় ফোর্ট উইলিয়ম কর্তৃপক্ষ একটি মধ্যমপন্থা অবলম্বন করলো। সেটি হচ্ছে তাত্ত্বিকভাবে মুগল সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়ে সরকারের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগি করা। এরই আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা এলাহাবাদ দীউয়ানি চুক্তি (১২ আগস্ট ১৭৬৫)। এই চুক্তির নায়ক রবার্ট ক্লাইভ দিল্লীতে গমন করে প্রচুর নজরানা ও পেশকাশ দিয়ে এবং ভবিষ্যতে বিপুল রাজস্ব আয়ের লোভ দেখিয়ে বাদশাহ শাহ আলমের সঙ্গে এই চুক্তি সম্পাদন করেন। এই চুক্তি অনুসারে বাদশাহ্ ফরমান জারি করেন :

> পরম পরাক্রমশালী যোদ্ধা এবং সরকারের অনুগত ও বিশ্বস্ত রাজকর্মচারী হিসেবে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে আলতামগা বা চিরস্থায়ী দান হিসেবে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দীউয়ানি মঞ্জুর করা হলো। শর্ত এই যে, বাদশাহি রাজস্ব হিসেবে বাৎসরিক ২৬ লক্ষ টাকা পরিশোধে কোম্পানি জামিন থাকবে। সুবার রাজস্বতহবিল থেকে নবাবের নিজামত খরচ বাবদ যা প্রয়োজন তা নবাবকে প্রদান করে সংগৃহীত রাজস্বের বাদবাকি কোম্পানি এর সেনাবাহিনী রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ইচ্ছামাফিক ব্যয় করতে পারবে।[২৪]

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুগল সরকারের অধীনে দেশী-বিদেশী সবাই রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব লাভ করতে পারতো। শর্ত ছিল শুধু সামরিক আভিজাত্য ও আনুগত্য। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি "প্রবল পরাক্রমশালী যোদ্ধা ও সরকার-অনুগত", অতএব মুগল সরকারকাঠামোতে তাদেরকে মেনে নিতে কোন আইনগত বাধা নেই। কোম্পানি লাভ করলো বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দীউয়ানি শাসনের দায়িত্ব। মুগল শাসনতন্ত্র মতে দীউয়ান পদটি প্রশাসনিক, রাজনৈতিক নয়। অতএব, এলাহাবাদ চুক্তি অনুসারে কোম্পানি মুগল সরকারের অধীনে দীউয়ান মাত্র, কোন রাজনৈতিক শক্তি নয়। কিন্তু প্রকৃত অর্থে এ সবই ছিল ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্থপতি রবার্ট ক্লাইভের সুচতুর কূটকৌশল। আসলে দীউয়ানির মোড়কে তিনি সংগোপনে লুকিয়েছেন সুবা বাংলায় কোম্পানির রাজনৈতিক আধিপত্য।[২৫]

২৪. East India Company's Treaty with Mir Zafar, 10 July 1763, cited in W.K. Firminger, *Historical Introduction to the Bengal Portion of the "Fifth Report"*, (Calcutta 1917), 20.

২৫. Ramsay Muir, *British India*, 84-85.

এলাহাবাদ চুক্তির অংশরূপে মুর্শিদাবাদে নবাবের সঙ্গে আরেকটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। উল্লেখ্য যে, মীর কাশিম কোম্পানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে মীর জাফরকে পুনরায় মুর্শিদাবাদের মসনদে বসানো হয়। এলাহাবাদ চুক্তির অংশ হিসেবে মীর জাফরের সঙ্গে আরেকটি চুক্তি সম্পাদিত হয় (সেপ্টেম্বর ৩০ ১৭৬৫)। এই চুক্তি অনুসারে দীউয়ান হিসেবে কোম্পানি সুবা বাংলার রাজস্ব থেকে নবাবকে বার্ষিক ৫৩,৮৬,১৩১ সিক্কা টাকা প্রদান করবে।[২৬] সংক্ষেপে, কোম্পানি সুবা বাংলা থেকে যে রাজস্ব সংগ্রহ করবে সে রাজস্বের হিস্যা হিসেবে সম্রাট পাবেন বার্ষিক ২৬ লক্ষ সিক্কা টাকা, নবাব তাঁর নিজামত শাসন পরিচালনা বাবদ পাবেন ৫৩,৮৬,১৩১ সিক্কা টাকা আর বাদবাকি ভোগ করবে কোম্পানি।

এলাহাবাদ এবং মুর্শিদাবাদ চুক্তির শর্তগুলি আক্ষরিকভাবে দেখলে মনে হবে, সুবা বাংলার উপর দিল্লীর কর্তৃত্ব বোধহয় সুপ্রতিষ্ঠিত হলো। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, মুর্শিদকুলী খানকে দীউয়ান হিসেবে নিযুক্তির (১৭০৪) পর এবারই বাদশাহ দিল্লী দরবার থেকে সরাসরি দীউয়ান নিযুক্ত করতে সক্ষম হন। যদিও সুবাদার ও দীউয়ান সরাসরি নিযুক্ত হতেন কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক, কিন্তু মুর্শিদকুলী খানের পর বাদশাহ কখনো আর এই ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন নি। এক্ষণে তিনি 'অনুগত' কোম্পানিকে সুবা বাংলার দীউয়ান নিযুক্ত করতে সক্ষম হন। সুবাদার ও দীউয়ান সরাসরি নিযুক্ত করা এবং নিয়মিত প্রদেশ থেকে রাজস্ব লাভের ওয়াদা লাভ করার মাধ্যমে বাদশাহ মনে করলেন, সুবা বাংলার উপর দিল্লীর বাদশাহের পূর্বকর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলো আর তিনি কোম্পানিকে গণ্য করলেন তাঁর মনোনীত মুৎসুদ্দি বলে।[২৭] সমকালীন বিশ্বের বৃহত্তম নৌ-শক্তি বৃটেনের বৃহত্তম একচেটিয়া চার্টার্ প্রতিষ্ঠান ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। ভারত মহাসাগর অঞ্চলে তার ছিল অপ্রতিরোধ্য কর্তৃত্ব। সেই মহা একচেটিয়া বাণিজ্যিক কোম্পানিকে দিল্লীর বাদশাহ শাহ আলম প্রাদেশিক দীউয়ান নিযুক্ত করে একে 'অনুগত' বাদশাহী মুৎসুদ্দি গণ্য করলেন—এর মধ্যেই পরিচয় মেলে শাহ আলমের অদূরদর্শিতা, অবিমৃষ্যকারিতা ও ইংরেজের কার্যকলাপ ও ক্ষমতা সম্পর্কে তাঁর সীমাহীন অজ্ঞতার। বাস্তব সত্য এই যে, কোম্পানি দীউয়ানি চুক্তির মাধ্যমে সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার ঝুঁকি না নিয়ে কায়েম করলো নিরঙ্কুশ রাজনৈতিক আধিপত্য, যা বাস্তবে সার্বভৌমত্বের সামিল। কোম্পানি এখন দেশের শাসনকর্তা না হলেও দেশ শাসনের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার বটে। মুগলদের মতো ইংরেজরাও এখন শাসক শ্রেণীর অন্তর্গত। তবে সমভিত্তিতে মুগলদের সঙ্গে যৌথভাবে ক্ষমতা ভোগ করার নীতি কোম্পানি বেশিদিন অনুসরণ করে নি। ১৭৬৫ থেকে ১৭৭২ সাল পর্যন্তই ছিল এর সময়কাল। এ সময়ে নবাব ও ইংরেজ উভয়ের প্রতিনিধিরূপে দেশ শাসন করেন সৈয়দ মোহাম্মদ রেজা খান।

২৬. ঐ, 45

২৭. A M Khan *Transition*, 2-5

দীউয়ানি লাভ করলেও নানা কারণে ক্লাইভ সরাসরি দীউয়ানি অর্থাৎ রাজস্ব শাসন পরিচালনা করতে ছিলেন অনিচ্ছুক। প্রথমত দীউয়ানি লাভের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয়ভাবে কোম্পানির জন্য পুঁজি সংগ্রহ করা। এ দেশের রপ্তানিপণ্য ক্রয় করার জন্য কোম্পানিকে ইউরোপ থেকে রূপা আমদানি করতে হতো, কারণ বাংলাদেশ তখন আমদানির চেয়ে রপ্তানি করতো বেশি। এ দেশে ইউরোপীয় পণ্যের বাজার ছিল না বিধায় বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ইউরোপীয়রা রজত আমদানি করতো। কিন্তু বেনেবাদ (mercantilism) যুগে রজত রপ্তানি ছিল সম্পদ পাচারের সামিল। অতএব দেশ থেকে মূল্যবান ধাতব আমদানি না করে স্থানীয়ভাবে পুঁজি সংগ্রহ করা ছিল দীউয়ানি লাভের অন্যতম লক্ষ্য। দেশ শাসনের অভিলাষ ছিল এখানে নিতান্তই গৌণ। অতএব দীউয়ানি শাসন পরিচালনার পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করা হলো সৈয়দ মোহাম্মদ রেজা খানকে। তিনি নিযুক্ত হলেন নায়েব দীউয়ান। তাছাড়া তিনি নাবালক নবাব নাজমউদ্দৌলার অভিভাবকও নিযুক্ত হলেন। অর্থাৎ রেজা খান হলেন একাধারে নায়েব নাজিম ও নায়েব দীউয়ান। নবাবের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি নায়েব নাজিম বা নিজামত শাসনকর্তা, এবং কোম্পানির প্রতিনিধি হিসেবে তিনি দীউয়ানি শাসনকর্তা।

রেজা খানের প্রতি ছিল কোম্পানির অকুণ্ঠ সমর্থন। পূর্ণ মর্যাদায় রেজা খান যেন দীউয়ানি ও নিজামত শাসন পরিচালনা করতে পারেন সেজন্য ক্লাইভ বাদশাহের কাছ থেকে তাঁর জন্য একাধিক রাজকীয় উপাধি আদায় করেন, যেমন বাহাদুর (সাহসী), মুজাফফর জং (সমরবিজয়ী), মুঈন-উদ-দৌলা (রাজ্যের সেরা), মুবারিজ-উল-মুলক (রাজ্যের প্রথম), ইত্যাদি। ক্লাইভের সমর্থনে রেজা খান এমন দক্ষতা ও দাপটের সাথে দীউয়ানি শাসন পরিচালনা করেন যে, দেশবাসীর দৃষ্টিতে তিনিই ছিলেন প্রকৃত শাসক।

কোম্পানির মনোনীত এজেন্ট হওয়া সত্ত্বেও সৈয়দ মোহাম্মদ রেজা খান কখনো কোম্পানির অন্ধ তাবেদার হিসেবে কাজ করেন নি। রাষ্ট্রকাঠামোতে তাঁর অবস্থান ও অধিকার সম্পর্কে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ সজাগ। কোম্পানিকে তিনি দেখেছেন বাদশাহ কর্তৃক নিযুক্ত কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ দীউয়ান হিসেবে। নায়েব নাজিম হিসেবে তাঁর অধিকার তিনি সম্পূর্ণরূপে প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছেন। মুগল শাসনব্যবস্থায় নবাবের পরেই দীউয়ানের স্থান। অতএব, নায়েব নাজিম হিসেবে তিনি কোম্পানির চেয়ে উচ্চতর পদমর্যাদার অধিকারী; অপরদিকে নায়েব দীউয়ান হিসেবে তিনি কোম্পানিরও প্রতিনিধি। উভয় ভূমিকায় তিনি এমন সুনিপুণ ও সুদক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করেছেন যেন মুগল ব্যবস্থা সমুন্নত থাকে।

রাষ্ট্রচিন্তায় রেজা খান পলাশীপূর্ব যুগের মুগল শাসনব্যবস্থাকে আদর্শ সরকারব্যবস্থা বলে গণ্য করেন এবং সরকার পরিচালনায় যথাসম্ভব ঐ ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। রবার্ট ক্লাইভেরও কৌশল ছিল পূর্বব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি আবার সচল করা এবং মুনাফার সাথে ব্যবসা করা। সুতরাং মুগল শাসনব্যবস্থা

পলাশীপূর্ব যুগের দক্ষতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টায় রেজা খান ক্লাইভের অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করেন। রেজা খানের কাছে ক্লাইভের প্রত্যাশা ছিল শুধু এই যে, তিনি যেন কোম্পানির জন্য দীউয়ানিকে একটি লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত করেন। এই প্রত্যাশা পূরণে রেজা খানও ছিলেন আস্থাশীল, কারণ তিনি মনে করেন যে, দেশে আইন-শৃঙ্খলা ফিরে আসলে এবং আগের মতো দক্ষতার সাথে সরকার পরিচালনা করতে পারলে দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং এভাবে সম্পদের প্রবৃদ্ধি হলে বর্ধিত হারে রাজস্ব সংগ্রহ করাও সম্ভব হবে।[২৮]

ক্লাইভের সমর্থন ও সহযোগিতায় রেজা খান রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব ও ক্ষমতা লাভ করেন। একাধারে নায়েব নাজিম এবং নায়েব দীউয়ান হিসেবে তিনি একজন শক্তিধর শাসকে পরিণত হন। রাজ্যের সকল নিয়োগ, বদলি ও বরখাস্তের ক্ষমতা তিনি লাভ করেন। রাজস্ব বন্দোবস্ত ও সংগ্রহের ব্যাপারে রেজা খানের ক্ষমতা প্রাক-পলাশী যুগের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। তবে তাঁর ক্ষমতার উৎস হচ্ছে কোম্পানি। কোম্পানি তাঁর উপর দীউয়ানি শাসনের সকল দায়িত্ব অর্পণ করে মুর্শিদাবাদ দরবারে নামেমাত্র একজন প্রতিনিধি নিযুক্ত করে। কার্যত কোম্পানির প্রতিনিধি রেজা খান নিজেই। তেমনিভাবে তিনি নবাবেরও প্রতিনিধি। উভয় ভূমিকায় তিনি অসীম ক্ষমতার অধিকারী। তবে এই প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থা বেশিদিন টেকে নি।

রেজা খান প্রশাসনের প্রথম পুণ্যাহ[২৯] অনুষ্ঠিত হয় ১৭৬৬ সালের এপ্রিল মাসে। দীউয়ান হিসেবে ক্লাইভ নিজে দরবারে উপস্থিত থাকলেও পুণ্যাহ অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করেন নায়েব নাজিম রেজা খান। মুগল শাসনকাঠামোতে নাজিম ও দীউয়ানের পদমর্যাদা সমান হলেও নাজিমই সুবার প্রথম ব্যক্তি। এহেন এ্যাংলো-মুগল শাসনব্যবস্থায় রেজা খানের আধিপত্য অক্ষুণ্ন থাকে ১৭৬৭ সাল পর্যন্ত। ১৭৬৬ সালের ৮ মে নবাব নাজমউদ্দৌলার মৃত্যু হয়। নতুন নবাব সাইফউদ্দৌলাও ছিলেন অপ্রাপ্তবয়স্ক। নিজামত খরচ কম—এই যুক্তি দিয়ে তাঁর নিজামত ভাতা হ্রাস করা হয়। বাদশাহের অনুমতি ব্যতিরেকে দীউয়ান কর্তৃক নাজিমের ভাতা হ্রাস করা ছিল দীউয়ানি চুক্তির পরিপন্থী। ১৭৭০ সালে সাইফউদ্দৌলা মারা যান এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন অপ্রাপ্তবয়স্ক মুবারকউদ্দৌলা। তাঁর সময়েও আরেক দফা নিজামতভাতা হ্রাস করা হয়। দীউয়ানি চুক্তি মোতাবেক নিজামতভাতা বার্ষিক ২৬ লক্ষ থেকে মাত্র ১৬ লক্ষ টাকায় কমিয়ে আনা

২৮. ঐ, 106-07.

২৯. বাংলা ফসলি পঞ্জিকা অনুযায়ী পুণ্যাহ ছিল বাংলার নতুন বছরের খাজনা আদায় উৎসব । বাংলা সনের প্রথম মাস বৈশাখের প্রথম দিনে সারা বছরের জন্য নতুন খাজনা বন্দোবস্ত আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হতো এবং একই সময় দীউয়ান কর্তৃক বিগত বছরের খাজনার লক্ষ্যমাত্রা, খাজনা আদায় ও উদ্বৃত্ত সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হতো। সকল জমিদারি কাছারিতেই পহেলা বৈশাখ অনুরূপ উৎসব অনুষ্ঠিত হতো।

হয়।[৩০] ফলে নবাব সিপাহি ও প্রাসাদ-আমলা আনুপাতিক হারে ছাঁটাই করতে বাধ্য হন। অসন্তোষ নিবারণের জন্য ছাঁটাইকৃত সেনাদের অধিকাংশকেই কোম্পানির সেনাবাহিনীতে পুনর্নিয়োগ করা হয়।[৩১] নিয়মিত এবং অধিক বেতন লাভের আকর্ষণে নবাবি সেনারা নির্দ্বিধায় কোম্পানির বাহিনীতে যোগদান করে। ফলে অনেকটা অলক্ষ্যে ও অননুভবনীয়ভাবে নবাবি সেনাবাহিনী বৃটিশ সেনাবাহিনীতে রূপান্তরিত হয়। কোম্পানি কর্তৃক সিপাহি ব্যাটালিয়ন গঠনে কোন জাতিভেদ নীতি অনুসৃত হয়েছে বলে কোন অভিযোগ উঠে নি, কারণ মুগলদের মতো প্রাথমিকভাবে কোম্পানিরও নীতি ছিল সেনাবাহিনীতে সাম্প্রদায়িক ভারসাম্য রক্ষা করা। প্রতিটি নতুন ব্রিগেড গঠিত হয় যথাসম্ভব সমান সংখ্যক মুসলমান ও হিন্দু সিপাহি নিয়ে।[৩২]

ইঙ্গ-মুগল যৌথ শাসনব্যবস্থা ক্লাইভের সৃষ্টি। এটা ছিল কোন রাজনৈতিক ঝুঁকি না নিয়ে শান্তিপূর্ণ উপায়ে দেশের সম্পদ মুগল অভিজাত ও কোম্পানির মধ্যে ভাগবাটোয়ারা করে নেবার একটি চাতুর্যপূর্ণ ব্যবস্থা। দেশের সার্বভৌম কর্তা হিসেবে সুবাদারকে মেনে নেন ক্লাইভ।[৩৩] তাঁর সৃষ্ট ব্যবস্থায় কোম্পানি রাজস্বের মালিক এবং সে মালিকানা মুগল সার্বভৌমত্বের অন্তর্গত একটি স্থায়ী ব্যবস্থা।[৩৪] এই ব্যবস্থাধীনে রেজা খানের আধিপত্য ক্লাইভ তথা কোম্পানি কর্তৃক স্বীকৃত। ক্লাইভের সহযোগিতায় রেজা খান আপ্রাণ চেষ্টা করেন দেশের আইন-শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অর্থনৈতিক সচ্ছলতা ফিরিয়ে আনতে। স্বল্পকালের জন্য হলেও এই প্রচেষ্টায় রেজা খান কল্পনাতীত সাফল্য অর্জন করেন।

তবে আইন-শৃঙ্খলার উন্নতি ঘটিয়ে রাজস্ব-আয় বৃদ্ধি করে রেজা খান যে সাফল্য অর্জন করেন এর মূল কারণ ছিল তাঁর প্রতি ক্লাইভ ও তাঁর পরবর্তী গভর্নর হ্যারী ভেরেল্স্ট-এর সক্রিয় সহযোগিতা ও সমর্থন। ইঙ্গ-মুগল যৌথ ব্যবস্থায় রাজনৈতিক আধিপত্য থাকলেও ক্লাইভ ও ভেরেল্স্ট এমন নিখুঁতভাবে মুখোশ পরেছিলেন যে, এঁরা যে দেশের প্রকৃত রাজনৈতিক প্রভু তা কখনো কার্যত প্রকাশ পায় নি। স্থানীয় প্রশাসন সম্পূর্ণভাবে মুগল ব্যবস্থাধীনে রেখে এমন একটি ছদ্মাবরণ সৃষ্টি করা হয় যেন দেশ আসলে আগের নবাবি যুগের মতোই স্বাধীন। ঔপনিবেশিক আধিপত্যবাদের এই মুখোশ উন্মোচিত হতে থাকে ১৭৬৭ সালে ক্লাইভের প্রত্যাবর্তনের কিছুকাল পর থেকে।

কোম্পানির কর্মচারীদের অবৈধ ব্যবসাকে কেন্দ্র করে প্রথম রেজা খানের কর্তৃত্বে হস্তক্ষেপ শুরু হয়। মীর কাশিমের মতো রেজা খানও কোম্পানির কর্মচারী ও

৩০. আরো তথ্যের জন্য দেখুন, K.M. Mohsin, *A Bengal District in Transition Murshidabad* 1765-1793, (Dacca 1973), Chapter VI.

৩১. A. M. Khan, *Transition*, 122.

৩২. ঐ, 122-23.

৩৩. ঐ, 132-33.

৩৪. Clive's minute, 'Bengal Secret and Military Consultations', 16 January 1767, উদ্ধৃত, A. M. Khan, *Transition*, 137.

অবৈধ ব্যক্তিগত ব্যবসার ঘোর বিরোধী ছিলেন। এহেন ব্যবসার ক্ষতিকর ও নির্যাতনমূলক দিকসমূহ তিনি কলকাতা ফোর্ট উইলিয়ম সিলেক্ট কমিটির কাছে অভিযোগ আকারে তুলে ধরেন। এর সমাধান হিসেবে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থানরত সকল ইউরোপীয়কে প্রত্যাহার করার জন্য তিনি কমিটিকে উপদেশ দেন।[৩৫] তিনি আরো হুঁশিয়ারি দেন যে, উক্ত সমস্যা সমাধান করা না হলে অচিরেই বন্দোবস্ত মোতাবেক সরকারি রাজস্ব সংগ্রহ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হবে। কোম্পানির ক্রমাগত ব্যয়বৃদ্ধির মুখে রাজস্বঘাটতি হলে যে সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে তা অনুধাবন করে সিলেক্ট কমিটি মফস্বলে ইউরোপীয়দের ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে কতিপয় নিবর্তনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে।[৩৬]

নিজেদের স্বার্থে বিঘ্ন ঘটায় অবৈধ ব্যবসায়ে লিপ্ত ইউরোপীয়রা রেজা খানের বিরুদ্ধে কোম্পানিমহলে মিথ্যা প্রচারণা শুরু করে। এরা পাল্টা অভিযোগ তোলে যে, দেশের অর্থনৈতিক মন্দার জন্য দায়ী রেজা খান নিজে এবং তাঁর "অদক্ষ, দুর্নীতিপরায়ণ" আমলাবৃন্দ। খানবিরোধী মহল অচিরেই সিলেক্ট কমিটিকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়। ১৭৬৯ সালের ১৬ আগস্ট প্রতি জেলায় একজন ইউরোপীয় সুপারভাইজার নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[৩৭] জেলা সুপারভাইজারের দায়িত্ব রেজা খানের আমলাদের উপর খবরদারি করা, আঞ্চলিক তথ্য সংগ্রহ করা এবং অঞ্চলের অবস্থা সম্পর্কে সিলেক্ট কমিটিকে অবহিত করা। বৃটিশ আধিপত্যকে কলকাতা-মুর্শিদাবাদ থেকে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিস্তারের এটাই প্রথম পদক্ষেপ। গভর্নর হ্যারী ভেরেল্স্ট অবশ্য খানকে আশ্বাস দেন যে, সুপারভাইজার নিয়োগের উদ্দেশ্য তাঁর ক্ষমতা খর্ব করা নয়, স্থানীয় আমলাদের উপর সামান্য নজর রাখা।[৩৮] কিন্তু এই পদক্ষেপ যে দেশে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার একটি প্রাথমিক ব্যবস্থা এ ব্যাপারে রেজা খান ছিলেন নিশ্চিত। তাই তিনি বহুবার সিলেক্ট কমিটিকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, চুক্তি মোতাবেক কোম্পানি মুগল সরকার কর্তৃক নিযুক্ত দীউয়ান মাত্র এবং নবাবের আমলাতন্ত্রের উপর খবরদারি করা কোম্পানির এখতিয়ারবহির্ভূত। কিন্তু রেজা খান এবং গোটা মুগল প্রশাসন এখন এমন অবস্থায় নিপতিত যে, কোম্পানিকে আইনের দোহাই দেয়া ছাড়া সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে অন্য কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে সরকার সম্পূর্ণ অপারগ।

জেলা সুপারভাইজারগণ মূলত নিযুক্ত হয়েছিল রেজা খান প্রশাসনের ছিদ্রানুসন্ধানের জন্য এবং তাঁর প্রশাসনকে উৎখাত করার একটি যৌক্তিক অজুহাত বের করার জন্য। অতএব, প্রত্যাশিতভাবেই সুপারভাইজারেরা প্রশাসনের অদক্ষতা ও দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সিলেক্ট কমিটির কাছে প্রতিবেদন পাঠাতে থাকে। ওসব প্রতিবেদনে মত প্রকাশ করা হয় যে, নবাবের সাথে কোম্পানির ক্ষমতা ভাগাভাগির ফলে দেশে নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে;

৩৫. 'Bengal Secret Consultations', 19 February 1766, উদ্ধৃত, A. M Khan. *Transition*, 137.
৩৬. Reza Khan's memorandum, *Bengal Public Consultations*, 24 March 1769.
৩৭. *Bengal Secret Consultations*, 16 August 1769
৩৮. Harry Verelst to Reza Khan, 8 September 1769, *Calender of Persian Correspondence*, Vol No. 1580

প্রশাসন ভেঙে পড়েছে, জনজীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। এমনকি ১৭৬৯-৭০ সালের মহাদুর্ভিক্ষের জন্য রেজা খান প্রশাসনকে সরাসরি দায়ী করা হয়। প্রত্যুত্তরে রেজা খান অভিযোগ করেন যে, কোম্পানির কর্মচারীরা নিজেদের ব্যক্তিগত ব্যবসার প্রসারের জন্য কোম্পানির রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার করছে, তারা নিজেদেরকে আইনের ঊর্ধ্বে গণ্য করছে এবং মফস্বলে কায়েম করছে ত্রাসের রাজত্ব; তাদের অত্যাচার-নির্যাতনের ফলেই দেশের অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে এবং এরই ফলশ্রুতি ১৭৬৯-৭০-এর মহাদুর্ভিক্ষ। কিন্তু সিলেক্ট কমিটি তাঁকে অপসারণ করে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পরবর্তী পর্ব শুরু করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। দুর্ভিক্ষের জন্য রেজা খানকে দায়ী করে কমিটির তরফ থেকে কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলীর কাছে প্রতিবেদন পাঠানো হয় এবং ইঙ্গ-মুগল যৌথ শাসনের 'কুফল' সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়। পরিচালকমণ্ডলী যথাবিহিত নির্দেশ দেয় যৌথ ব্যবস্থা বিলুপ্ত করে দীউয়ানি শাসন সরাসরি পরিচালনা করতে। ১৭৭২ সালের ২৭ এপ্রিল রেজা খানকে বরখাস্ত করে 'দুর্নীতির' দায়ে বন্দি করা হয়। নায়েব দীউয়ানের পদ বিলুপ্ত করে দীউয়ানি দপ্তর কলকাতায় স্থানান্তর করা হয় এবং দীউয়ানি শাসন সরাসরি পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।[৩৯]

## সার্বভৌমত্ব বিতর্ক

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক সরাসরি দীউয়ানি শাসন গ্রহণ, মফস্বলে ইউরোপীয় কর্মকর্তা নিয়োগ, কলকাতায় খালসা বা রাজস্ব দপ্তর স্থানান্তর এবং কলকাতাকে কেন্দ্রবিন্দু করে নানা ধরনের প্রশাসনিক সংস্কার সাধন, প্রশাসনে নাজিমের ভূমিকা নামমাত্র করা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে প্রশ্ন উঠে দেশের সার্বভৌমত্বের অবস্থান সম্পর্কে। বাংলার সার্বভৌম কর্তা কে ? নবাব, না কোম্পানি ? এই প্রশ্ন মুগল শাসকশ্রেণীর মধ্যে জাগে নি। এই বিতর্ক উঠে কোম্পানি সরকারের ভিতর থেকেই। বিতর্কে যোগদান করেন ফোর্ট উইলিয়মের গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস, কাউন্সিল-সদস্যগণ এবং সুপ্রিমকোর্ট। চার সদস্যবিশিষ্ট কাউন্সিলের একজন সদস্য (রিচার্ড বারওয়েল) ছাড়া বাকি সকলে (জন ক্লেভারিং, জর্জ মনসন, ফিলিপ ফ্রান্সিস) অভিমত প্রকাশ করেন যে, অতীতের সকল চুক্তি মোতাবেক এবং দেশের আইন মোতাবেক মুর্শিদাবাদের নবাবই দেশের সার্বভৌম কর্তা এবং কলকাতার কাউন্সিল শুধু রাজস্ব সংগ্রহের অধিকর্তা। তাঁরা যুক্তি প্রদান করেন যে, নবাব অন্যান্য সার্বভৌম দেশের দূত গ্রহণ করেন এবং ঐ সব দেশে তাঁর নিজের দূত প্রেরণ করেন; নবাবের নামে দেশের মুদ্রা খচিত হয় ; ফৌজদারি বিচার নবাবের হাতে এবং মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকর করতে নবাবের অনুমোদন নিতে হয়; দেশে অবস্থানরত অন্যান্য সকল বিদেশী কোম্পানি ও নাগরিক নবাবকেই সার্বভৌম কর্তা বলে স্বীকার করে এবং কোম্পানিকে গণ্য করে মুগল সরকারের চুক্তিবদ্ধ মুৎসুদ্দি হিসেবে।[৪০] এসব যুক্তির

৩৯. Letter from the Court of Directors, 28 August 1771, Fort William India House Correspondence Vol. 6, 122-23

৪০. এই বিতর্কটি অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে আলোচিত হয়েছে ডব্লিউ. কে. ফার্মিঙ্গার রচিত *Historical Introduction* গ্রন্থের ১২-১৩ পৃষ্ঠায়।

প্রত্যুত্তরে হেস্টিংস বলেন যে, নবাবের সার্বভৌমত্বের অনুকূলে যুক্তিসমূহ তত্ত্বনির্ভর, বাস্তবভিত্তিক নয়। বাস্তব অবস্থা হচ্ছে—এই নবাবের নির্মাতা হলো কোম্পানি। শুধু নবাব নির্মাণেই নয়, নবাবের মন্ত্রী নিয়োগেও কোম্পানির ভূমিকা সর্বজনবিদিত। হেস্টিংস বলেন যে, ১৭৭২ সাল থেকে মুর্শিদাবাদের মসনদ এমনি একটি নামমাত্র প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে যে, দেশ শাসন সংক্রান্ত কোন সিদ্ধান্তই এখন নবাবের সঙ্গে পরামর্শ করে নেয়া হয় না। "এখন নবাব একজন শাসনক্ষমতাচ্যুত সাজসর্বস্ব শিখণ্ডী মাত্র।"[৪১] এর প্রমাণ মেলে হেস্টিংস-এর নিজের শাসন থেকেই। ১৭৭২-৭৩ সালে হেস্টিংস প্রশাসনের ইউরোপীয়করণ করে একটি ব্যাপক শাসনকাঠামো নির্মাণ করেন এবং এ ব্যাপারে তিনি কখনো নবাবের সম্মতি গ্রহণের প্রয়োজন বোধ করেন নি। বস্তুত নবাব নিজেও হেস্টিংস-এর কার্যকলাপের আইনগত বৈধতার প্রশ্ন তোলেন নি। নবাব বরঞ্চ নিজেকে কোম্পানির পেনশনগ্রহিতা হিসেবেই গণ্য করেছেন।

উল্লেখ্য যে, ১৭৭৩ সালের রেগুলেটিং এ্যাক্ট-এর অধীনে ভারতে কোম্পানির বিষয়াদি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একজন গভর্নর জেনারেল এবং তাঁকে সভাপতি করে চার সদস্যবিশিষ্ট একটি কাউন্সিল নিযুক্ত করা হয়। কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের উপর নির্ভরশীল করা হয়। ঘটনাক্রমে প্রথম কাউন্সিলের চার সদস্যের মধ্যে তিনজনই ছিলেন হেস্টিংস-এর বিরোধী। অতএব রাজনৈতিক আধিপত্যবাদ নীতিকে কাউন্সিলের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য মুগল সরকারের সঙ্গে চুক্তির বিরোধী আখ্যায়িত করে তা বর্জন করে আগের মতো যৌথ ব্যবস্থায় ফিরে যাবার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে হেস্টিংস-এর অভিমত কাউন্সিলে বাতিল হয়ে যায়। কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলী কাউন্সিলের সংখ্যাগরিষ্ঠের মত মেনে নেন এবং হেস্টিংস-এর প্রবর্তিত শাসনব্যবস্থা বিলুপ্ত করে ইঙ্গ-মুগল যৌথ ব্যবস্থা পুনঃস্থাপনের নির্দেশ দেন (৩ মার্চ ১৭৭৫)। একই সঙ্গে পরিচালকমণ্ডলী ফোর্ট উইলিয়ম কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন রেজা খানকে মুক্তি দিয়ে পুনর্বার তাঁকে নায়েব নাজিম এবং নায়েব দীউয়ান নিযুক্ত করার জন্য।[৪২] নতুন পরিকল্পনা মোতাবেক রেজা খানকে পুনর্বার নায়েব সুবা ও নায়েব দীউয়ান নিযুক্ত করা হয়। ফৌজদারি আদালত কলকাতা থেকে পুনরায় মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত করা হয়। আবার মুর্শিদাবাদকে সুবার রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়।

কিন্তু সৈয়দ মোহাম্মদ রেজা খান নায়েব সুবা ও নায়েব দীউয়ান পুনর্নিযুক্ত (১৭৭৫) হলেও তিনি আর আগের মতো স্বাধীনচেতা শাসকের পরিচয় দেন নি, মুগল সরকারের শাসনতান্ত্রিক অধিকার সংরক্ষণে আর তিনি সোচ্চার হন নি। তিনি নীরবে বাস্তবতাকে মেনে নিলেন। আইনগতভাবে না হলেও বাস্তবে যে ইংরেজরা দেশের সার্বভৌম কর্তায় পরিণত হয়েছে এ সত্য তিনি স্বীকার করে নিলেন। বিশেষ করে রাজস্ব শাসন ব্যাপারে যৌথ ক্ষমতা পুনঃপ্রবর্তনকে তিনি একটি সম্পূর্ণ অবাস্তব পদক্ষেপ বলে মনে করেন। ১৭৭৫-১৭৭৮ সময়কালে ফিলিপ ফ্রান্সিসের নেতৃত্বে হেস্টিংসবিরোধী দল

৪১. ঐ, 24.

৪২. A M Khan, *Transition*, 347.

সংখ্যাগরিষ্ঠতাবলে মুগল সার্বভৌমত্ব বজায় রাখার পক্ষে রায় দিলেও রেজা খান বৃটিশ রাজনৈতিক আধিপত্য মেনে নিলেন এবং ফৌজদারি ক্ষমতা ছাড়া দীউয়ানি ক্ষমতা তিনি প্রায়[৪৩] সম্পূর্ণ কোম্পানির ইচ্ছামাফিক প্রয়োগ করেন। ১৭৮০ সালে ফ্রান্সিসের দলের চূড়ান্ত পতন ঘটে এবং এর সঙ্গে বিলুপ্ত হয় সকল নবাবি ক্ষমতা। হেস্টিংস পূর্ণ দাপটে সকল দীউয়ানি ও নিজামত ক্ষমতা প্রয়োগ করতে থাকেন। একটি স্থায়ী সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক কাঠামো নির্মাণ করেন তিনি। হেস্টিংস-এর নির্মিত রাজনৈতিক অবকাঠামো বৃটিশ পার্লামেন্টের স্বীকৃতি লাভ করে পিটস্ ইন্ডিয়া এ্যাক্ট-এর (১৭৮৪) মাধ্যমে। এর চূড়ান্ত রূপ দেন লর্ড কর্নওয়ালিস (১৭৮৬-৯৩)। লর্ড কর্নওয়ালিসের ব্যবস্থায় (১৭৯৩) নবাবের ফৌজদারি ক্ষমতা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করে তাঁকে কোম্পানির পেনশনভোগীতে পরিণত করা হয়।

### প্রশাসন শ্বেতাঙ্গীকরণ

১৭৬৯ সাল পর্যন্ত কোম্পানি অংশগ্রহণ করে শুধু দীউয়ানি প্রশাসনে এবং তাও সীমাবদ্ধ ছিল কেবল মুর্শিদাবাদ দরবারে। কোম্পানির মাত্র একজন প্রতিনিধি (Resident) দরবারে যোগদান করতেন। আমরা দেখেছি যে, কোম্পানির পক্ষে নায়েব দীউয়ান রেজা খান পরিচালনা করেছেন সমগ্র দীউয়ানি প্রশাসন, প্রশাসনের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও দেশী। আগেই উল্লেখিত হয়েছে যে, প্রশাসনে প্রথম শ্বেতাঙ্গের অনুপ্রবেশ ঘটে ১৭৬৯ সালে, যখন প্রতি জেলায় একজন করে সুপারভাইজার নিয়োগ করা হয়। এদের প্রধান দায়িত্ব হয় নিজ নিজ অঞ্চল সম্পর্কে নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করা, যেমন, (১) পরগনার ইতিহাস-ঐতিহ্য, (২) কৃষি উৎপাদন, (৩) জমির খাজনা ও অন্যান্য আবওয়াব বা কর, (৪) ও বিভিন্ন শিল্পোৎপাদন। বোঝা কঠিন নয় যে, দেশের প্রশাসন পরিচালনায় প্রথমেই সরাসরি লিপ্ত না হয়ে কোম্পানির উদ্দেশ্য ছিল সর্বাগ্রে দেশের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা।

প্রশাসন শ্বেতাঙ্গীকরণ প্রক্রিয়ার পরবর্তী পদক্ষেপ গৃহীত হয় ১৭৭০ সালে। রাজস্ব বন্দোবস্ত ও রাজস্ব সংগ্রহ ব্যাপারে খোঁজ খবর নেয়ার ও পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে ঢাকা ও মুর্শিদাবাদে দুটি রাজস্ব পরিষদ (Revenue Council) স্থাপন করা হয়। এর ফলে রেজা খান ও অন্যান্য আঞ্চলিক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের উপর কোম্পানির খবরদারি বৃদ্ধি পায় বটে, তবে প্রশাসন দেশী কর্মকর্তাদের হাতেই সীমাবদ্ধ থাকে। প্রশাসন থেকে দেশী কর্মকর্তাদের উচ্ছেদ করে ইউরোপীয় কর্মকর্তা নিয়োগের আনুষ্ঠানিক পর্ব শুরু হয় ১৭৭১ সালের আগস্ট মাসে, যখন পরিচালকমণ্ডলী নির্দেশ দেন দীউয়ানি শাসন সরাসরি কোম্পানি কর্তৃক পরিচালনা করার জন্য।[৪৪] ১৭৭২-৭৩ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস রেজা খান সহ দেশী মুৎসুদ্দিদের বরখাস্ত করে প্রশাসনকে ইউরোপীয়করণের একটি প্রাতিষ্ঠানিক

---

৪৩. Philip Francis to Lord Clive, 21 May 1775, Francis MSS, (India Office Records), EURE, 13,241.
৪৪. J. H. Harington, *An Analysis of the Laws and Regulations enacted by the Governor General in Council at Fort William in Bengal*, Vol. 2, (London 1821), 13.

কাঠামো নির্মাণ করেন। তিনি প্রতি জেলায় একজন ইউরোপীয় কালেক্টর ও সংখ্যক শ্বেতাঙ্গ কর্মকর্তা নিযুক্ত করেন। সদরে খালসা দপ্তর বিলুপ্ত করার ফলে সকল দেশী মুৎসুদ্দি অবসরপ্রাপ্ত হন। খালসা দপ্তর (রাজস্ব বিভাগ) পরিচালনার জন্য নিযুক্ত হয় একটি সর্বশ্বেত বোর্ড অব রেভিনিউ। এই মহাশক্তিমান বোর্ডে দেশী উপাদান বলতে থাকে শুধু কতিপয় নিম্নবেতনভোগী মুনশী-মুহরার। তবে হেস্টিংস-এর পরিকল্পনায় জেলা পর্যায়ে দেশীদের যোগদানের সুযোগ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করা হয় নি। প্রতি জেলায় ইউরোপীয় কালেক্টরের পাশাপাশি একজন সমমর্যাদার দেশী দীউয়ানের পদ সৃষ্টি করা হয়। রাজস্ব বন্দোবস্ত ও রাজস্ব সংগ্রহে এদের একে অপরের প্রতিবিধায়ক ও পরিপূরক হিসেবে কাজ করা ছিল এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, হেস্টিংস-এর এই নীতি ১৭৭৫ সালে বাতিল হয়ে যায়। তবে প্রশাসনিকভাবে শুধু মফস্বল থেকে ইউরোপীয় প্রশাসক প্রত্যাহার করা হয়। কিন্তু কেন্দ্রে ইউরোপীয় নিয়ন্ত্রণ বলবৎ থাকে। ১৭৮০ সাল থেকে পুনরায় মফস্বলে ইউরোপীয় প্রশাসক নিয়োগ করা হয়। পর্যায়ক্রমে দায়িত্বপূর্ণ পদ শ্বেতাঙ্গদের কাছে হস্তান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন লর্ড কর্নওয়ালিস। মফস্বলে জেলা দীউয়ানদের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ নেই যে, এরা অদক্ষ এবং এদের তত্ত্বাবধানে রাজস্ব সংগ্রহ অনিয়মিত বা কম হচ্ছে। বরঞ্চ সরকার কর্তৃক প্রতি বছর রাজস্ব বৃদ্ধি সত্ত্বেও মফস্বল দীউয়ানগণ বর্ধিত রাজস্ব আদায় করতে প্রয়োজনে বলপ্রয়োগ করেছে এবং নিয়মিত রাজস্ব সংগ্রহ করে কর্তৃপক্ষের মন জয় করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। কিন্তু প্রশাসন থেকে সেসব অনুগত ও দক্ষ দেশী আমলাদের বহিষ্কার করা ছিল ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়ার একটি অংশ। কর্নওয়ালিসের নীতি ছিল এক দিকে রাজস্বসংগ্রহ নিশ্চিত করা, অন্যদিকে শ্বেতাঙ্গ শাসন সুদৃঢ় করা।[৪৫] এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ১৭৮৬ সালে কর্নওয়ালিস মফস্বলে সকল দেশী কর্মকর্তা বরখাস্ত করে ইউরোপীয় কর্মকর্তা নিযুক্ত করেন। ইউরোপীয় জেলা কালেক্টরকে দেয়া হয় সর্বময় ক্ষমতা। জেলা কালেক্টর হলেন একাধারে জেলার রাজস্ব, বিচার ও পুলিশ কর্তৃপক্ষ। একই হাতে শাসন, বিচার ও পুলিশী ক্ষমতা অর্পণ সমকালীন বৃটেনে ছিল অকল্পনীয়। কিন্তু এখানে তা সম্ভব করা হলো ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকে শক্ত ভিত্তিতে স্থাপন করার জন্য। এই রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য মানুষের অধিকার সংরক্ষণ নয়, এর লক্ষ্য স্বৈরতন্ত্রী ব্যবস্থার মাধ্যমে অল্পসংখ্যক শ্বেতাঙ্গ দিয়ে ঔপনিবেশিক শাসন সুদৃঢ় করা। যেমন কর্নওয়ালিস তাঁর আমলাবর্গকে উপদেশ দেন, "সকল প্রশাসনিক ব্যবস্থায় আমাদের থাকার মূল লক্ষ্য দুটি—একটি আমাদের রাজনৈতিক নিরাপত্তা, অপরটি এ দেশকে কোম্পানি ও বৃটিশ জাতির জন্য যতোটুকু সম্ভব সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে পরিণত করা।"[৪৬] রাজনৈতিক নিরাপত্তার একটি হাতিয়ার হিসেবে কর্নওয়ালিস প্রবর্তন করেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। এর রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল স্থানীয় পর্যায়ে একটি শক্তিশালী অনুগত অভিজাত শ্রেণী গড়ে তোলা। ১৮৫৭-এর সিপাহি বিদ্রোহে জমিদারদের রাজ-আনুগত্য কর্নওয়ালিসের নীতির

---

৪৫. বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন, P J Marshall, "Indian Officials under the East India Company" *Bengal Past and Present*, Vol L XXXIV, 1965.

৪৬. Lord Cornwallis's Minute, 11 February 1793, Second Report from the Select Committee, 1810, Appendix 9 (A), 107

দূরদর্শিতা প্রমাণ করলো। কর্নওয়ালিসী ব্যবস্থাধীনে একজন জেলা জজ সর্বসাকুল্যে মাসিক পাঁচ হাজার টাকা বেতন পান, আর জেলা কালেক্টর পান চার হাজার টাকা। দেশী মুনশি-মুহরারদের সর্বোচ্চ মাসিক বেতন দেয়া হয় মাত্র ১৫০ টাকা।[৪৭] সে সময় অর্থাৎ ১৭৯৩ সালে বৃটিশ মুদ্রা স্টার্লিং ও ভারতীয় মুদ্রা সিক্কা টাকার বিনিময়হার ছিল ১ঃ২। অর্থাৎ স্টার্লিং-এর হারে একজন বৃটিশ জেলা কালেক্টরের বেতন ছিল দুই হাজার পাউন্ড, যা ছিল খোদ বৃটেনের সর্বোচ্চ সচিবের বেতনের চেয়েও দ্বিগুণ।[৪৮] জেলা কালেক্টর এবং জজদের সবার বয়স ছিল বিশের কোঠায় এবং বৃটেনের মানে এদের শিক্ষা ছিল খুবই সীমিত। চাকুরির জ্যেষ্ঠতা বৃদ্ধির সাথে এদের বেতন ও সুযোগ বাড়তো আরো বহু গুণ। অর্থাৎ বাংলায় একজন বৃটিশ কর্মকর্তা কয়েক বছর চাকুরিরত থাকতে পারলে সে প্রভূত সম্পদের মালিক হতে পারতো। উল্লেখ্য, বৃটিশ কর্মকর্তাদের আয় শুধু বেতনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, বেতন ছাড়াও এদের আরো আয়ের উৎস ছিল, যেমন প্রাইভেট ব্যবসা, ঘুষ, নজরানা, পুরস্কার ইত্যাদি। বিপুল সম্পদের অধিকারী এসব আমলা ছিল সবার ঈর্ষার পাত্র। ব্যঙ্গ করে এদের বলা হতো 'নেবাব'।

আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যদিও পলাশী যুদ্ধের পরপরই রাজ্য স্থাপনে সক্ষম ছিল, তথাপি নানা বাস্তব বিবেচনা ও কূটকৌশলগত কারণে এরা নিজেদের নামে রাজ্য প্রতিষ্ঠায় বিরত থাকে। বরঞ্চ একই লক্ষ্যে এরা এগিয়ে চলে ধাপে ধাপে। সার্বভৌমত্ব রক্ষায় মীর জাফর ও মীর কাশিমের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে সামরিক দুর্বলতার জন্য। কোম্পানির সেনাবাহিনী সংখ্যায় অল্প হলেও এরা ছিল সুশৃঙ্খল পেশাদার বাহিনী এবং অধিক শক্তিশালী মারণাস্ত্রের অধিকারী। রণকৌশলেও ছিল এরা শ্রেষ্ঠ। ১৭৬৫-১৭৭২ সময়ের ইঙ্গ-মুগল যৌথশাসন ছিল একটি পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা, যার ব্যর্থতা ছিল অবশ্যম্ভাবী। হেস্টিংস-এর নীতি এই অবশ্যম্ভাবিতাকে ত্বরান্বিত করলো। হেস্টিংস বৃটিশ শাসনের ভিত্তিমূল স্থাপন করলেন এবং সে ভিত্তির উপরিকাঠামো নির্মাণ করলেন কর্নওয়ালিস। হেস্টিংস প্রতিষ্ঠা করলেন বৃটিশ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র আর সে রাষ্ট্র পরিচালনার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিলেন কর্নওয়ালিস।[৪৯]

৪৭. Statement of salaries of Chittagong Collectorate Officials for 1787-88, *Chittagong District Records*, Vol 436, (National Archives of Bangladesh, Dhaka) 15

৪৮. Governor General to Board of Revenue, 18 July 1787, Extract in *Chittagong District Records*, Vol 436, 18 (বাংলাদেশ জাতীয় আর্কাইভস, ঢাকা)। ১৭৯৩ সালে রাজস্ব আদায়েব উপর কমিশন প্রাপ্তির প্রথা বিলুপ্ত কবা হয় এবং এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত কালেক্টরদেব ক্ষতিপূরণ বাবদ তাদের মাসিক বেতন বাড়িয়ে দ্বিগুণ করা হয়।

৪৯. কর্নওয়ালিসী ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, Sirajul Islam, *Permanent Settlement in Bengal* (Dacca 1978), W K Firminger, Fifth Report, 1812, (Calcutta 1917), A Aspinal, *Cornwallis in Bengal* (Manchester 1931); J. H Harington, *An Analysis of the Laws and Regulations* (Calcutta 1821), Ranajit Guha, *A Rule of Property for Bengal*, (Paris 1961)



# অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে প্রতিরোধ আন্দোলন এবং বিদ্রোহ

সিরাজুল ইসলাম*

মধ্য অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৃটিশ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের পত্তন এবং মধ্য বিংশতিতম শতাব্দী পর্যন্ত এর স্থায়িত্ব বাংলায় সুদীর্ঘ বিদেশী শাসনের ইতিহাসে আরেকটি অধ্যায় যুক্ত করে, যা ছিল যথেষ্ট বৈচিত্র্যময়। এই পর্বে বাংলার জনগোষ্ঠীর কোন জাতীয় পরিচিতি ছিল না এবং আধুনিক জাতীয়তাবাদের অনুরূপ চেতনাও তাদের মধ্যে গড়ে উঠে নি। তারা তাদের সর্বোচ্চ শাসকের জাতিত্ব ও ধর্মের উপর অতি কম গুরুত্ব আরোপ করতো। তখন একজন বিজেতাকে শান্তিপূর্ণভাবে অথবা বিদ্রোহের মাধ্যমে হটিয়ে আরেক জন দেশের শাসনক্ষমতা দখল করতেন; কিন্তু ক্ষমতার এ পরিবর্তন নিম্নবর্তী জনগণের নিকট ছিল কেবল অবগতির বিষয়, যারা তাদের ঊর্ধ্বতন এলিট শাসক সম্পর্কে কদাচিৎ কোনো আগ্রহ বা উদ্বেগ প্রকাশ করতো। নিজেদের জীবন পরিচালনার জন্য তাদের ছিল তাদেরই গড়ে তোলা জীবনবিধান। এ জীবনবিধানের অন্তর্ভুক্ত ছিল তাদের নিজস্ব রীতিনীতি, প্রতিষ্ঠান, অভ্যাস, আচরণ, বিশ্বাস ও দর্শন, এবং যতোদিন তাদের সামাজিক জীবনের এই অপরিহার্য উপাদানগুলোকে অব্যাহতভাবে ক্রিয়াশীল রাখা হতো, ততোদিন তারা কোনো অসন্তোষ বা বিরাগ প্রকাশ না করে কর প্রদানে প্রস্তুত থাকতো। ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা থেকে তারা এ বিশ্বাস অর্জন করেছিল যে নতুন শাসক যিনিই হোন এবং তাঁর জাতিত্ব ও ধর্ম যাই হোক না কেন, তাদেরকে স্থানীয় জীবনবিধান অনুসরণ করে জীবন যাপন করতে দেয়া হবে। তারা ইতিপূর্বে যতটুকু অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে তার আলোকে বলা যায়, পূর্ববর্তী কোনো বিজেতা এযাবৎ তাদের নিজস্ব ধ্যানধারণা ও প্রতিষ্ঠানের পরিমণ্ডলে সরাসরি হস্তক্ষেপ করেন নি। সামাজিক জীবনবিধানে কোনো পরিবর্তন হয়ে থাকলে তা বস্তুত মননশীল কোনো সমাজসংস্কারক দ্বারা এবং স্বাভাবিক সমাজ পরিবর্তনের ধারায়

অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সাধিত হয়েছিল এবং কদাচিৎ কোনো শাসক রাজার আদেশের মাধ্যমে এ পরিবর্তন এসেছে। শাসকরা কর সংগ্রহ করেই তুষ্ট থাকতেন এবং তাদের অব্যাহত জীবনপদ্ধতি নিয়ে দেশ শাসন করতেন। তবুও জনসাধারণের প্রয়োজন একজন রাজাকে এবং তাঁকেই তারা কর দিত, কারণ তিনি ছিলেন তাদের জীবন ও সম্পত্তির রক্ষক।

কিন্তু বিজেতা ও বিজিতের মধ্যে একে অন্যের কাজে হস্তক্ষেপ না করার (laissez faire) সম্পর্কটি বৃটিশ শাসন প্রবর্তনের সময় ভেঙে পড়ে। পূর্বের শাসকগণ অভিজাতদের মাধ্যমে রাজ্য শাসন করতেন, যাদের উদ্দেশ্য ছিল রাজ্য থেকে মুনাফা সংগ্রহ নয়, বরং তাদের মর্যাদা ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বণিক সরকারের জন্য প্রাধান্য বিস্তারই চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল না। কোম্পানি এবং কোন না কোনভাবে বৃটিশ রাজও প্রধানত মুনাফা ও বাণিজ্যিক অগ্রগতির জন্য বেশি তৎপর ছিল এবং প্রাধান্য বিস্তারকে ঈপ্সিত মুনাফা অর্জনের উপায় হিসেবে নিশ্চিত করতে চেয়েছিল। তারা চেয়েছিল, বাংলা রাষ্ট্রকে অবশ্যই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে বিতরণের জন্য পর্যাপ্ত লভ্যাংশ যোগাতে হবে এবং রাজার (Crown) সন্তুষ্টির জন্য যথেষ্ট অধীনতামূলক কর দিতে হবে, এবং এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকে অবশ্যই মুনাফাভিত্তিক হতে হবে। বাংলার ইতিহাসে এই প্রথম বার রাষ্ট্র গঠনে ও রাষ্ট্রচিন্তায় মুনাফার লক্ষ্য সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পায়।

বণিক সরকার শুরু থেকেই রাষ্ট্রীয় বিষয়সমূহের পরিবর্তনে সচেষ্ট ছিল, কারণ প্রচুর অর্থ পুরনো শাসনব্যবস্থা থেকে উৎসারিত হওয়ার সম্ভাবনা কম ছিল, যা অর্থনীতিকেন্দ্রিক না হয়ে বরঞ্চ অভিজাততান্ত্রিক সম্মানের লক্ষ্যে পরিচালিত হতো। অতএব নতুন শাসকের চাহিদা পূরনের জন্য ঐতিহ্যবাহী রাষ্ট্রের চারিত্রিক পরিবর্তন জরুরি ছিল। এজন্য অবশ্যই প্রয়োজন ছিল প্রশাসন ও প্রশাসনিক কর্মীবৃন্দকে পুনর্বিন্যাস করা, প্রত্যন্ত অঞ্চলে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের অনুপ্রবেশ ঘটানো এবং রাজস্বের প্রধানতম উৎস ভূমিকে আরো অধিকভাবে উদ্বৃত্ত উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রধান প্রধান ক্ষেত্র, যেমন ভূমিব্যবস্থা, প্রশাসন, শিক্ষা, আইন ও বিচার, পরিবহন, এমনকি বিবাহ ও নৈতিকতার পর্যায়ে সংস্কারকাজ শুরু করা হয়। স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে এসকল সংস্কার প্রচলিত ব্যবস্থার স্বার্থকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করেছিল এবং বিভিন্ন স্বার্থের জন্ম দিয়েছিল, যা ক্ষতিগ্রস্ত গোষ্ঠীসমূহ নীরবে মেনে নেয় নি এবং প্রয়োজনবোধে এর বিরুদ্ধে সর্বব্যাপী প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

কোম্পানি শাসনের শুরু থেকেই নতুন শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও প্রতিরোধ লক্ষ্য করা যায় এবং বৃটিশ রাজের পতন পর্যন্ত ঐ প্রবণতা অব্যাহত থাকে। কিন্তু ঐ সমস্ত প্রতিরোধ আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীগণ এবং তাদের সংগঠনের ক্রিয়াপদ্ধতি এবং নেতৃত্ব কখনো একই স্বার্থে এবং একইভাবে পরিচালিত ও সংগঠিত হয় নি। প্রেক্ষাপট পরিবর্তন

এবং নতুন স্বার্থ ও শক্তির উত্থানের সাথে সাথে ঔপনিবেশিক শাসক প্রদত্ত চাপ সকল সময়েই এক শ্রেণী থেকে অন্য শ্রেণীর উপর গিয়ে পড়েছে এবং দৃশ্যপটে পরিবর্তন এনেছে। দাবি এবং অংশগ্রহণের প্রেক্ষিতে এর প্রতিক্রিয়া কখনো সমরূপ ছিলনা। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শ্রেণীর জনগোষ্ঠী বিভিন্ন অবস্থা ও অনুষঙ্গের শিকার হয়ে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়েছে। এদের প্রতিক্রিয়া ছিল কোন কোন সময় নিষ্ক্রিয় এবং প্রায়শই তীব্র। সার্বিক প্রেক্ষাপটে এসব প্রতিক্রিয়ার ইতিহাস রচনা করা এবং অর্থবহ সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য তাই ঘটনাবলীকে সুনিপুণভাবে সাজিয়ে যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন রয়েছে। এ লক্ষ্য অর্জনে কাহিনীকে (যা পক্ষান্তরে বহুমুখী ও জটিল) অবশ্যই ধারণাক্রম, বিন্যস্ত ধারণা ও ভূমিকার বিপরীতে বর্ণনা করতে হবে এবং সময় ও আদর্শের নিরিখে বিশ্লেষণ করতে হবে। এ তাত্ত্বিক কাঠামোর ভিত্তিতেই আমরা এবার অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিবাদ বা সম্মুখ প্রতিরোধের ঘটনাবলী সামগ্রিকভাবে পর্যালোচনা করবো।

## লুপ্ত সার্বভৌমত্ব পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা

ইতিহাসে একটা সাধারণ ব্যাপার এই যে পরাজিত শক্তির কিছু অংশ সর্বদাই থেকে যায় এবং তাদের সুবিধাজনক স্থান থেকে নতুন শাসকের বিরুদ্ধে নানা গোলযোগ সৃষ্টি করে। আমরা জানি যে বিজয়ী মুগলদের বাংলার উপর সার্বভৌমত্ব পুরোপুরি প্রতিষ্ঠা করতে এবং পূর্বতন পাঠানদের ও স্থানীয় শাসকদের বিতাড়িত করতে প্রায় এক শতাব্দী লেগেছিল। কিন্তু সামরিক ও রাজনৈতিকভাবে নিঃসন্দেহে অনেক বেশি দক্ষ হওয়ার কারণে উক্ত কার্য সম্পন্ন করতে বৃটিশদের অনেক কম সময় লেগেছিল। পলাশীর যুদ্ধ অবশ্যই বৃটিশদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কিন্তু তা একেবারে চূড়ান্ত যুদ্ধ ছিল না। মুগলদের অবশিষ্টাংশকে পরাভূত করতে এবং স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে তাদেরকে বশে আনতে বৃটিশদের অনেক দুঃসাহসী যুদ্ধ করতে হয়েছিল। সিরাজউদ্দৌলার সবচেয়ে অদম্য জেনারেল এবং পাটনার ডেপুটি গভর্নর রাজা রাম নারায়ণ রায় কখনো মীর জাফরকে নবাব হিসেবে স্বীকার করেন নি এবং তাঁকে পরাভূত করতে আসা কোম্পানির সৈন্যসহ নবাবের বাহিনীর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। কোম্পানির নিয়ন্ত্রণাধীন প্রথম জেলা চব্বিশ পরগনার জমিদারগণ বৃটিশদের সাথে সমঝোতায় যেতে অস্বীকার করেন, কারণ তাদের কাছ থেকে বৃটিশরা নতুন হারে যে রাজস্ব দাবি করেছিল তার পরিমাণ পূর্বতন হারের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। দু'জন নৃপতি জমিদার—বর্ধমান ও বিষ্ণুপুরের মহারাজা বৃটিশের দুষ্কর্মের সহযোগী নবাব মীর জাফরের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করেন। বৃটিশ সৈন্যদের সহায়তায় তাঁদেরকে বশে আনা হয়। বৃটিশের করায়ত্ত মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম জেলার জমিদারগণও বিদ্রোহীদের ন্যায় আচরণ করছিলেন এবং তাদের সদাচরণ নিশ্চিত করার জন্য সেখানে কোম্পানির সৈন্য মোতায়েন করা হয়। তাদের অভিযোগ ছিল

এই যে কোম্পানি সরকার তাদের ভূমির উপর অধিক কর নির্ধারণ করেছে এবং তাদের এস্টেট ইজারা দিয়ে প্রজাদের ওপর তাদের ঐতিহ্যিক নিয়ন্ত্রণ খর্ব করেছে।

অল্পকালের মধ্যেই কোম্পানি সম্পর্কে মীর জাফরের মোহমুক্তি ঘটে, কারণ কোম্পানির নিকট তাঁর দেনা শেষ হচ্ছিলনা যদিও তিনি প্রতি বছর কোম্পানিকে লক্ষ লক্ষ পাউন্ড স্টার্লিং পরিশোধ করে যাচ্ছিলেন। কোম্পানি তাঁকে শত্রুদের সাথে স্বাধীনভাবে আলোচনায় বসার অনুমতি দেয় নি। কোম্পানির চাপে নবাবের সৈন্যবাহিনী ভেঙে দেয়া হয় এবং এসব সৈন্যকে কোম্পানির সৈন্যবাহিনীতে নিয়োগ করা হয়। মীব জাফর বৃটিশবিরোধী আঁতাত গঠনের জন্য অন্যান্য ভারতীয় রাজা ও নৃপতিদের সাথে যোগাযোগ করেন। এক্ষেত্রে প্রধান মধ্যস্থতাকারী ছিলেন মহারাজা নন্দকুমার, যাঁকে পরবর্তীকালে ওয়ারেন হেস্টিংস বিচারের মাধ্যমে হত্যা করেন। কোম্পানির নিকট থেকে গৃহীত ঋণের অংশবিশেষ পরিশোধের ব্যবস্থা হিসেবে কোম্পানি কর্তৃক দাবিকৃত তিনটি বৃহৎ জেলা মীর জাফর কোম্পানির নিকট হস্তান্তর করতে অস্বীকার করেন। সেই অপরাধে তাঁর স্থলে তাঁর জামাতা মীর কাশিমকে সিংহাসনে বসানো হয়, যিনি বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম এ তিনটি বড় জেলা হস্তান্তরের বিনিময়ে সিংহাসন লাভ করেন। শীঘ্রই মীর কাশিম অনুধাবন করেন যে দেশ ইতিমধ্যেই কোম্পানির নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে। অতএব তিনি নিজেকে কোম্পানির নিয়ন্ত্রণমুক্ত করতে চাইলেন। একজন স্বাধীন শাসক হওয়ার উদ্দেশ্যে মীর কাশিম ধনীদের উপর কর ধার্য করে রাষ্ট্রের আর্থিক উন্নতি ঘটাতে চান এবং সিপাহিদেরকে অধিক বেতন ও প্রশিক্ষণ দিয়ে সামরিক বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করতে সচেষ্ট হন। শেষে তিনি রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে মুঙ্গেরে স্থানান্তরিত করেন, যা ষড়যন্ত্রকারী ও বৃটিশদের থেকে দূরে অবস্থিত ছিল। এভাবে শক্তিসঞ্চয় করে তিনি বৃটিশদের দেশ থেকে বহিষ্কারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ফ্রন্টে তাদের উপর আক্রমণ চালান। কিন্তু অধিকাংশ যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন। তিনি অযোধ্যার নবাবসহ পার্শ্ববর্তী রাজ্যসমূহ থেকে সামরিক সাহায্য লাভের চেষ্টাও করেন। ১৭৬৪ সালে বক্সারে এক ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়, কিন্তু যৌথ বাহিনী পরাজিত হয়। মীর কাশিম দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান এবং উত্তর ভারতের কোন এক জঙ্গলে প্রাণত্যাগ করেন।

**অরাজন্য (non-princely) রাজনৈতিক প্রতিরোধ**

বক্সারে মীর কাশিমের পরাজয়ে সামরিক উপায়ে মুগল সার্বভৌমত্ব পুনরুদ্ধারের জন্য নৃপত্য প্রতিরোধের অবসান ঘটে। তবে অন্যান্য অরাজন্য উপাদান, যারা রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে পূর্বতন শাসনের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল, তারা তখনও নতুন শাসকের বিরুদ্ধে সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ চালিয়ে যাচ্ছিল। নবাবি প্রতিরোধের ব্যর্থতার পর রাজনৈতিক এলিটের প্রতিরোধমুখী চেতনার উদাহরণ হিসেবে সিলেটের মির্জা আগা মোহাম্মদ রেজা বেগ এবং ঢাকার নবাব শামসুদ্দৌলার প্রতিরোধের কথা উল্লেখ করা যায়। সিলেটের মির্জা

আগা মোহাম্মদ রেজা বেগ একজন স্বনির্বাসিত মুগল ছিলেন, যিনি ১৭৯৯ সালে 'ফিরিঙ্গি হুকুমত' থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং সকলকে বৃটিশবিরোধী জেহাদে তাঁর সাথে যোগ দেয়ার আহ্বান জানান। তিনি সিলেটের অদূরে প্রাকৃতিকভাবে সংরক্ষিত কাছারে এক সৈন্যবাহিনী গঠন করেন। তিনি বড় বড় জমিদার ও অন্যান্য এলিটের নিকট পরওয়ানা পাঠান এবং তাদেরকে একসাথে ফিরিঙ্গি রাজের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান।[১] তাঁর বিচারের বিবরণীতে (final proceedings) দেখা যায়, ফতেহ মোহাম্মদ নামে এক ব্যক্তিকে দেশের প্রধান জমিদারদের সমর্থন লাভের উদ্দেশ্যে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য প্রধান দূত (emissary) নিয়োগ করা হয়। রেজা বেগ ক্ষমতায় গেলে তাদেরকে বৃটিশদের চাইতে অধিক সুযোগ-সুবিধা দানের অঙ্গীকার করা হয়। সিলেট জেলার বানিয়াচং-এর জমিদারকে বেগ লিখেছিলেন :

> সময় এসেছে আপনার ধর্ম ও বিশ্বাসের প্রকাশ ঘটাতে, কারণ ফিরিঙ্গিদের দিন এখন শেষ প্রান্তে এবং আল্লাহ ও রসুলের শাসন সমাগত। অতএব আপনি অবশ্যই নাস্তিক ফিরিঙ্গিদের হত্যা করবেন এবং আমি আপনাকে এ যাবৎ আপনার অধিগত ভূমির চেয়ে আরো অধিক পরিমাণ ভূমি দান করবো। যদি আপনি আমার হুকুম বাস্তবায়ন করতে চান,' তবে যেখানেই ফিরিঙ্গিদের পাবেন বন্দি ও হত্যা করবেন এবং সিলেটে আমাকে সহায়তার জন্য ৫০০ জন অস্ত্রধারী পাঠাবেন ...
>
> তারিখ : শুক্রবার, ৩০ শে আষাঢ়, ১২০৮ বাংলা[২]

একইভাবে সিলেটের তুরাফ পরগনার জমিদারকে বেগ লিখেছিলেন :

> আপনার জানা দরকার যে ফিরিঙ্গিদের শাসনকাল ৪০ বছর ছিল, কিন্তু সে সময় অতিক্রান্ত হয়েছে এবং আল্লাহর বান্দাদের বিজয়...সমাগত। আপনি যদি ভাগ্যের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন থাকেন...আমার প্রতি আসক্ত থাকেন, তবে ফিরিঙ্গিদের সাথে যুদ্ধ করুন এবং অবিশ্বাসীদের হত্যা করুন ও তাদেরকে নরকে নিক্ষেপ করুন...এবং যে পরিমাণ ভূমি আপনি হারাবেন আমি আপনাকে তা মঞ্জুর করব অথবা আপনি বেশি চাইলে আমি তা দেব...
>
> তারিখ ৩০ শে আষাঢ়, ১২০৮ বাংলা[৩]

বেগ যে জমিদারদের নিকট থেকে কিছু সমর্থন লাভ করেন তার প্রমাণ হলো, ফিরিঙ্গিদের বহিষ্কারের জন্য তাঁর আহ্বানের পর অল্প কিছুদিনের মধ্যে তিনি কামান ও অন্যান্য হালকা অস্ত্রসজ্জিত এক বাহিনী গড়ে তুলতে সক্ষম হন। ১৭৯৯ সালের ১৪ জুলাই রেজা বেগ পাঁচ হাজার অস্ত্রসজ্জিত সৈন্যসহ কোম্পানির ভূখণ্ডে প্রবেশ করেন এবং

১. Criminal and Judicial Proceedings, 23 April 1801, No. 24 (British Library, India Office Records, অন্য কোন অর্থে উল্লেখ করা না হলে 'ইন্ডিয়া অফিস রেকর্ডস্' বলতে সকল লেখ্যপ্রমাণ বোঝাবে। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় এই যে রেজা বেগের নিজের ভাষা ফার্সি হলেও সকলের বোঝার সুবিধার্থে তার 'পরওয়ানা' শব্দটি বাংলায় লেখা হলো।

২. মির্জা মোহাম্মদ রেজা বেগের বিচারের কার্যবিবরণী দ্র., Criminal and Judicial Proceedings, 23 April 1801 No. 2.

৩. ঐ।

কোম্পানিবাহিনীকে পরাস্ত করে বিন্দাসাইল সীমান্ত পরগনা দখল করে নেন। কিন্তু তা তিনি বেশিদিন অধিকারে রাখতে পারেন নি। তাঁর শক্তি ও ঐকান্তিকতা লক্ষ্য করে সরকার তাঁকে পরাভূত করতে নিয়মিত সামরিক বাহিনী প্রেরণ করে। কোম্পানির সৈন্যদল কর্তৃক সহজেই পরাজিত হয়ে বেগ গেরিলাযুদ্ধের কৌশল অবলম্বন করে নিজেকে পুনর্গঠিত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু ত্বরিৎ আক্রমণের (hit-and-run) পর দ্রুত নিক্রমণকালে তিনি আঘাতপ্রাপ্ত হন এবং তাঁর প্রধান সর্দার বা সেনাপতিসহ বন্দি হন। এ বন্দি যোদ্ধাকে বিচারের জন্য কলকাতায় প্রেরণ করা হয়। কলকাতা আদালতে (court of circuit) বিচারকালে রেজা বেগের বিপক্ষে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগ আনা হয় এবং তাঁকে ১৭৯৯-এর ৪ ধারা মতে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করা হয়।[৪] তাঁর সাথে বন্দি অন্যান্য সহযোগীদের বিচার হয় ঢাকায় এক পৃথক আদালতে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন বাহাদুর শাহ, খাকি শাহ, নাজির মুহাম্মদ এবং রহিম খান, যাদের সকলকে সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়।[৫]

আরো দুঃসাহসিক, সুশৃঙ্খল এবং ব্যাপকধর্মী ছিল নবাব শামসুদ্দৌলার প্রতিরোধপরিকল্পনা। তিনি ঢাকার নায়েব নাজিম নবাব নুসরাত জং-এর ভ্রাতা ছিলেন। তিনি অন্যান্য বেশির ভাগ বিদ্রোহীর মতো অশিক্ষিত ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন বিদ্বান, যাঁর ইংরেজি সহ অন্যান্য ভাষায় ব্যুৎপত্তি ছিল। তাঁর জ্ঞান সম্পর্কে উইলিয়াম হিকি বলেন, "ভারতে আমার দেখা দেশীয়দের মধ্যে তিনি ছিলেন সবচেয়ে গুণবান ব্যক্তি; প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাসের একজন অসাধারণ পণ্ডিত এবং ইংরেজি ভাষায় বিস্ময়কর দক্ষতার অধিকারী। যখন আমি তাঁকে প্রথম দেখি, তাঁকে আমার চল্লিশ বছর বয়স্ক মনে হয়েছিল। আমি বিশেষভাবে তাঁর সাবলীল ও সুরুচিপূর্ণ সম্বোধনে অভিভূত হই। তাঁর সাথে কয়েক দফা আলাপ-আলোচনার পর আমি তাঁর ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহী হই।"[৬] হিকির (Hickey) ন্যায় বিশপ হেবারও (Bishop Heber) শামসুদ্দৌলার জ্ঞান সম্পর্কে সন্তোষ প্রকাশ করেন, যাঁর সাথে তাঁর ১৮২২ সালে ঢাকায় সাক্ষাৎ হয়। সমকালীন ইউরোপীয় সাহিত্য এবং ইতিহাস সম্পর্কে শামসুদ্দৌলার জ্ঞান দেখে হেবার বিস্মিত হয়েছিলেন। বিশপ শেকসপীয়ারের সাহিত্যিক গুণের মূল্যায়নে তাঁর দক্ষতা দেখে বিশেষ মুগ্ধ হন। শামসুদ্দৌলা বিশপের সাথে অনর্গল ইংরেজিতে আলাপ করেন এবং কথা প্রসঙ্গে ইতিহাসের কয়েকটি ইংরেজি পুস্তকের উদ্ধৃতি দানকালে স্প্যানিশ যুদ্ধের ঘটনাবলী ও তাতে স্যার এডওয়ার্ড প্যাগেট-এর ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানের প্রকাশ ঘটে।"[৭]

৪. ঐ।

৫. ঐ, No. 26: রেজা বেগের বিদ্রোহ সম্পর্কে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, Sirajul Islam, "Muslim Armed Resistance to Early British Rule in Bengal", *Revolt Studies*, vol. 1, No. 1, June, 1985.

৬. Alfred Spencer (ed.), *Memoirs of William Hickey*, vol. v. (1790-1809), 5th edition (1950), 252.

৭. Reginald Heber, *Narrative of a Journey Through the Upper Provinces of India, 1824-1825* (London, 1873 edition), vol. 1, 94.

কিন্তু বিদ্যা বা মার্জিত আচরণ শামসুদ্দৌলাকে সম্মানের সাথে বাঁচার জন্য কোন সুবিধা দেয় নি। তিনি ছিলেন বেকার। যেহেতু তিনি স্থানীয় অধিবাসী (native) ছিলেন, তাই তাঁর জন্য সকল সুযোগ-সুবিধা বন্ধ করে দেয়া হয়। কর্নওয়ালিস বিধি (Cornwallis Code) মোতাবেক কোনো স্থানীয়কে রাষ্ট্রের দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করা যেতোনা। ঢাকায় কোনো কর্মসংস্থান করতে না পেরে হতাশ হয়ে শামসুদ্দৌলা মুর্শিদাবাদে তাঁর ভাগ্য পরীক্ষার জন্য যান, কিন্তু ঢাকার মতো সেখানেও তাঁর জীবন ছিল একঘেঁয়ে ও সম্মানহানিকর। বিদ্বান ব্যক্তি হিসেবে শামসুদ্দৌলা দেশে বৃটিশ শাসনের সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করেছিলেন। পরিস্থিতির কাছে আত্মসমর্পণ না করে তিনি সাধারণ বিপ্লবের মাধ্যমে বৃটিশদের দেশ থেকে বিতাড়িত করতে বদ্ধপরিকর হন। এ লক্ষ্যে তিনি বাংলা ও বিহারের সকল অসন্তুষ্ট গোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করতে গোপন আন্দোলন শুরু করেন।[৮] মুর্শিদাবাদ ও কলকাতায় তাঁর কর্মব্যস্ততা এবং আন্দোলন কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁকে সন্দেহভাজন ব্যক্তিতে পরিণত করে। ১৭৯৪ সালে তাঁকে মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করে ঢাকায় যেতে বলা হয় এবং তিনি ঢাকায় চলে যান। কিন্তু তাঁর আসল পরিকল্পনা তিনি কখনো পরিত্যাগ করেন নি। তিনি দেশের অভ্যন্তরে কোডলিপির (code correspondence) মাধ্যমে সকল অসন্তুষ্ট জনগোষ্ঠীর সাথে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেন। ভারতের অন্যান্য মুসলিম নৃপতির সমর্থন আদায়ের জন্য তাঁদের নিকট দূত প্রেরণ করা হয়। ১৭৯৮ সালের মধ্যে এক সাধারণ গণঅভ্যুত্থানের জন্য তাঁর প্রস্তুতি পূর্ণতার পর্যায়ে পৌঁছে যায়।

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তখন শামসুদ্দৌলা তাঁর ধারণাবহির্ভূত এক বহিঃস্থ ঘটনার শিকার হন। অযোধ্যার নির্বাসিত নবাব ওয়াজির আলী তখন বেনারসে বাস করছিলেন। ১৭৯৯ সালের ১৪ জানুয়ারি তিনি বৃটিশ রেসিডেন্ট চেরি ও তাঁর ইউরোপীয় গার্ডদের হত্যা করে বেনারস থেকে পালিয়ে যান। পালাবার পর তাঁর বাড়ি থেকে এক বান্ডিল কাগজপত্র পাওয়া যায়। ঐ বান্ডিলে ৬২টি চিঠি ছিল, যেগুলো শামসুদ্দৌলাসহ বাংলা ও বিহারের বিদ্রোহী নেতাদের লিখিত ছিল।[৯] তাঁর চিঠিগুলো পরীক্ষা করে জানা যায় যে সুবিধাজনক সময়ে জাতীয় বিদ্রোহ সংঘটিত করার পরিকল্পনা তাঁর ছিল। বেনারসে কি ঘটেছে তা তিনি জানতে পারার আগেই এক ঝটিকা বাহিনী (storm troop) ঢাকায় আসে এবং তাঁকে গ্রেফতার করে। নিরাপত্তার কারণে এবং রাজনৈতিক বিবেচনায় তাঁকে বিচারের জন্য ঢাকা থেকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়।

বিচারকালে ওয়াজিরকে লেখা তাঁর সকল চিঠি খোলা হয়। চিঠিতে প্রকাশ পায় যে নবাব শামসুদ্দৌলা আফগানিস্তানের জামান শাহ ও মাস্কাটের শেখের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন। দেশের অভ্যন্তরে সাধারণ বিদ্রোহ শুরু হওয়ার সময় বাইরে থেকে

৮. Bengal Secret and Separate Consultations, 1 April 1799, No. 30.

৯ ঐ, 18 February 1799, No. 3

কোম্পানির এলাকা আক্রমণের জন্য তিনি তাদের নিকট আবেদন জানান।[১০] তিনি হিন্দু ও মুসলিম ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোর সমর্থন আদায় করেন এবং তাদেরকে ঢাকার হেমায়েত শাহের নেতৃত্বে সংগঠিত করেন।[১১] মির্জা তাপিস নামে পারস্যের এক অভিযাত্রী কলকাতা, মুর্শিদাবাদ ও ঢাকার বৈরী ব্যবসায়ীদেরকে অনুপ্রাণিত করে যুদ্ধের জন্য অর্থ সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত ছিলেন।[১২] বিরভূমের রাজা, যিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের চাপে ক্ষতিগ্রস্ত হন, তিনি বাংলা এবং বিহারের অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্ত জমিদারদের সমর্থন আদায়ে নিয়োজিত থাকেন। শেখ আলী খান নামে একজনকে আফগানিস্তানের জামান শাহের নিকট পাঠানো হয় সম্ভাব্য স্বাধীনতাযুদ্ধের নীলনক্শা সম্পর্কে তাঁকে সংক্ষেপে বুঝিয়ে বলার জন্য। হাকিম খান, গর খান, দাউদ খান এবং মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী লালা ইন্দরমুন্ডের প্রতিনিধির (agency) মাধ্যমে অযোধ্যার সিংহাসনচ্যুত নবাব ওয়াজির আলী এবং মারাঠা প্রধান সিন্ধিয়ার সাথে দু'টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির সিদ্ধান্ত ছিল, বাংলা এবং বিহারে বিদ্রোহের সময় তারাও বিদ্রোহী তৎপরতা আরম্ভ করবেন এবং জামান শাহের আক্রমণরত বাহিনীকে সহায়তা দেবেন।[১৩] কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে বেনারসের ঘটনা এসব দুঃসাধ্য গোপনীয় প্রস্তুতিকে নস্যাৎ করে দেয়। বাংলায় বৃটিশ সরকারকে ধ্বংস করার চেষ্টা এবং অভ্যন্তরীণভাবে একতাবদ্ধ হওয়ার পরিকল্পনা নিয়ে বাংলা ও বিহারের জমিদারদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন এবং পত্রাদির মাধ্যমে রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক যোগাযোগের অভিযোগে শামসুদ্দৌলা এবং তাঁর সহযোগীদের বিচার হয়।[১৪]

শামসুদ্দৌলার পরিকল্পনা শুধুমাত্র অলস স্বাপ্নিকের অলীক কল্পনা ছিলনা। তাঁর পরিকল্পনা থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে বাংলার বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণ যেভাবে নীরবে এবং নতমস্তকে বৃটিশ শাসন মেনে নেবে বলে সাধারণভাবে ধারণা করা হয়েছিল সেভাবে বৃটিশ শাসনকে তারা মেনে নেয় নি। তখন পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল গণঅভ্যুত্থানের, কিন্তু অভাব ছিল নেতৃত্ব ও সংগঠনের, বিপ্লব সংঘটনের জন্য যা ছিল সবচেয়ে জরুরি। শামসুদ্দৌলা ব্যক্তিগত নেতৃত্ব এবং এক ধরনের অনিয়মিত সংগঠন নিয়ে সম্ভাবনাপূর্ণ ও সফল নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন। কিন্তু বেনারসের দুর্ঘটনা তাঁর স্বপ্ন নস্যাৎ করে দেয়। যদি তিনি চূড়ান্ত অভ্যুত্থান ঘটাতে সক্ষম হতেন, তবে তা কোম্পানি শাসনে কি ফল বয়ে আনতো তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। কিন্তু তাঁর গোপন তৎপরতা ইঙ্গিত দেয় যে বাংলা ও বিহারের জনগণের মানসিক অবস্থা ছিল বিপ্লবমুখী। শামসুদ্দৌলা এ সুযোগ গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন।

---

১০. ঐ, নং ৫২ : আরো দেখুন, 'Documents on Shamsuddoulah's Intrigues Against the English', *Bengal Past and Present*, vol., 53, Jan.-June 1937

১১. Bengal Criminal and Judicial Consultations, 23 April 1801, Nos , 16, 25.

১২. ঐ।

১৩. Bengal Secret and Separate Consultations, 1 April 1799, No, 3.

১৪. Bengal Criminal Judicial Consultations, 9 July 1801, No 2.

## জমিদার বিদ্রোহ

প্রাক-বৃটিশ সময়কালে পরগনার নিয়ন্ত্রণ তথা স্থানীয় নিয়ন্ত্রণ জমিদারদের হাতে ন্যস্ত ছিল, যারা মধ্যগ (middle man) হিসেবে সরকারের নিকট গ্রামীণ সমাজের প্রতিনিধিত্ব এবং গ্রামীণ সমাজের নিকট সরকারের প্রতিনিধিত্ব করতেন। জমিদার ছিলেন বংশগতভাবে রাষ্ট্রীয় পদাধিকারী কর্তাব্যক্তি, যার উপর বিভিন্ন সরকারি দায়িত্ব, যেমন প্রশাসন, পুলিশ, বিচার, যোগাযোগ ইত্যাদির দায়িত্ব অর্পিত ছিল। এমনকি তাঁর সামরিক দায়িত্বও ছিল। জরুরি অবস্থায় এবং যুদ্ধকালীন সময়ে তাঁকে সরকারকে সৈন্য, ঘোড়া এবং পশু সরবরাহ করতে হতো। সৈন্যবাহিনী চলাচলকালে সৈন্যদেরকে প্রয়োজনীয় স্থানীয় সরবরাহ সহ অন্যান্য সহায়ক যোগানও তাঁকে দিতে হতো।

মুগল সরকারের নিকট জমিদারি প্রতিষ্ঠানটি বিশেষ প্রয়োজনীয় ছিল। কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বণিক সরকারের স্বার্থের সঙ্গে এ প্রতিষ্ঠান সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। যেহেতু জমিদারি প্রতিষ্ঠান ঔপনিবেশিক মুনাফার অভিপ্রায়কে সমর্থন করতো না, তাই কোম্পানি সরকারের সচেতন নীতি ছিল এই প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্নভাবে দুর্বল করা এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে তাত্ত্বিকভাবে না হলেও কার্যত তা থেকে অব্যাহতি লাভ করা। এভাবে ১৭৫৭ সালে পলাশীর উপঢৌকন হিসেবে প্রাপ্ত ২৪-পরগনার বড় বড় জমিদারি এবং ১৭৬০ সালে অধিকৃত তিনটি জেলাভুক্ত জমিদারি বিলোপ করা হয়। দীউয়ানি গ্রহণের পর জমিদারগণ ক্রমবর্ধমান রাজস্বচাহিদার চাপের মধ্যে পড়েন। ১৭৭২ সালে তাদেরকে পেনশনভোগীতে পরিণত করা হয় এবং তাদের এস্টেট পাঁচ বছরের জন্য সর্বোচ্চ নিলাম ডাককারীর নিকট ইজারা দেয়া হয়। জমিদারগণ পরিস্থিতির কারণে দরিদ্র ও হতোদ্যম হয়ে পড়েন এবং তারা সমাজের স্বাভাবিক নেতৃত্বে আর বহাল থাকলেন না। গভর্নর জেনারেল ও কাউন্সিলের একজন সম্মানিত সদস্য ফিলিপ ফ্রান্সিস সত্যের খুব কাছাকাছি পৌঁছে যান যখন তিনি মন্তব্য করেন যে "বৃটিশ শাসনে জমিদারগণ ক্রমান্বয়ে আলস্য, নির্বুদ্ধিতা, চরম দারিদ্র্য ও অবমাননায় নিমজ্জিত হয়েছে।" তিনি আরো বলেন যে "সার্বিকভাবে ঋণগ্রস্ত হয়ে তাঁরা জনগণের কাছে সকল সম্মান ও গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেন।"[১৫] ১৭৭৭ থেকে ১৭৯০ সাল পর্যন্ত জমিদারদেরকে বাৎসরিক ভিত্তিতে তাদের দখল ফিরিয়ে দেয়া হয়, কিন্তু তাঁরা ক্রমবর্ধমান রাজস্ব দাবির শিকার হয়েছিলেন। এ সময়ে তাদেরকে রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানাদি থেকে বাদ দেয়া হয় এবং তারা শুধুমাত্র রাজস্ব সংগ্রহকারী এজেন্ট হিসেবে গণ্য হন। ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পন্ন করা হয় এবং সরকারের নিকট যথাসময়ে রাজস্ব প্রদানে ব্যর্থ হলে তাঁদের ভূ-সম্পত্তি নিলামে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

কাজেই এটা সম্ভব ছিলনা যে বাংলার এসব স্থানীয় ক্ষমতাবান ব্যক্তি, যাঁরা বংশপরম্পরায় ক্ষমতা, মর্যাদা ও সম্পদের অধিকারী ছিলেন, তাঁরা এ জাতীয় উদ্বেগজনক

১৫. Philip Francis to H. Strachey, 23 November 1775, quoted in Sirajul Islam, *Permanent Settlement in Bengal. A Study of its Operation 1790-1819* (Dhaka 1979), 8-9.

এবং অস্থিতিশীল পদক্ষেপ সময়মতো মেনে চলবেন। প্রকৃত পক্ষে অধিকাংশ ক্ষতিগ্রস্ত জমিদার সচরাচর ব্যক্তিগতভাবে এবং কখনো কখনো যৌথভাবে কোম্পানির পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। সিলেটের আগা মোহাম্মদ রেজা এবং ঢাকার নবাব শামসুদ্দৌলার প্রতিরোধের উদাহরণ ইঙ্গিত দেয় বৃটিশ শাসনের প্রথম পর্যায়ে জমিদারগণ সাধারণভাবে কতখানি অসন্তুষ্ট ছিলেন। এখানে আমরা যুক্তিসহ আরো কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরবো, যেখানে যুক্তি দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে ক্ষতিগ্রস্ত জমিদারগণ বাধ্য হয়েই বৃটিশ শাসন মেনে নেন এবং যখন নতুন সরকার কর্তৃক তাঁদের স্বার্থ ও প্রভাবের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করা হয়েছে তখনই তাঁরা বিদ্রোহ করেছেন।

বারুই (Barui) উপকূলীয় অঞ্চলের জমিদার বিদ্রোহের প্রকৃতি সম্পর্কে অনুসন্ধান করেছেন। উক্ত এলাকায় স্থানীয় জমিদারদের প্রধান স্বার্থ ছিল লবণ উৎপাদন। কোম্পানি সরকার রাজস্ব সংগ্রহ বৃদ্ধির জন্য লবণ উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ সরকারের একচেটিয়া অধিকারে নিয়ে আসে এবং ব্যক্তিগতভাবে লবণ উৎপাদনকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করে। সরকার স্বয়ং লবণ উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে এগিয়ে আসবে এটি ঐতিহ্যবাহী লবণ উৎপাদনকারীদের চিন্তাবহির্ভূত ছিল। তাদের স্মৃতিতে এবং লোকাচারে রাষ্ট্রের পক্ষে এ ধরনের পদক্ষেপের নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায় না। জমিদারগণ ঘৃণাভরে লবণবিধির (regulation) বিরোধিতা করেন এবং কোম্পানির লবণচাষীদেরকে খেলারী বা লবণক্ষেত থেকে হটিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেন। দীর্ঘ দ্বন্দ্বের পর অবশেষে সরকার উপকূলীয় লবণ উৎপাদনকারী জমিদারদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য তাঁদের সাথে মীমাংসায় আসতে বাধ্য হয়।[১৬]

গোড়ার দিকে প্রথম ও প্রধান প্রতিরোধ আসে বিরভূমের নৃপতিতুল্য জমিদার রাজা আসাদুজ্জামানের কাছ থেকে। নবাবের শাসনে রাজাকে পার্বত্য সীমান্ত রক্ষার কাজে ও রাজকীয় যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য সামরিক বাহিনী রাখার কর্তৃত্ব দেয়া হয়েছিল।[১৭] কোম্পানি মীর কাশিমকে রাজার সৈন্যবাহিনী বাতিল করার এবং তাঁর রাজস্ব বৃদ্ধি করার পরামর্শ দেয়। তবে মীর কাশিম তা করতে অস্বীকৃতি জানান। কোম্পানি নিজেই তখন

১৬. বারুই মন্তব্য করেন, "বাংলার উপকূল অঞ্চলের জমিদারগণ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির লবণ একচেটিয়াকরণের বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী, সংগঠিত ও প্রণালীবদ্ধ বিদ্রোহ গড়ে তোলেন। কোম্পানির এই একচেটিয়াকরণের ফলে জমিদারগণ মুগল আমল থেকে লবণের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ হারান এবং লবণ উৎপাদন ও ব্যবসা থেকে বাদ পড়েন। ফলে জমিদারদের লবণ উৎপাদন সৃষ্ট বহু যুগের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সুবিধা হুমকির সম্মুখীন হয়। জমিদারগণ ও তাঁদের স্থানীয় মিত্ররা প্রণালীবদ্ধভাবে উক্ত একচেটিয়াত্ব খর্ব করতে প্রয়াসী হয় এবং তাদের অর্থনৈতিক ক্ষতি বিভিন্নভাবে পুষিয়ে নিতে ব্রতী হয়। এভাবে এক পক্ষে কোম্পানি ও তার মিত্র এবং অপর পক্ষে জমিদারগণ ও তাদের মিত্রদের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়।" দেখুন, বলাই চন্দ্র বারুই, "Resistance of the Bengal-Zemindars to East India Company's Salt Monopoly (1765-1836)", *Calcutta Historical Journal*, vol 11, 1992, 136-37

১৭. Nandalal Chatterjee, *Mir Qasim: Nawab of Bengal, 1760-63* (Calcutta 1935), 53.

রাজনৈতিক কারণে সৈন্যবাহিনী বাতিলের দায়িত্ব গ্রহণ করে। ফোর্ট উইলিয়মের গভর্নর হেনরী ভ্যানসিটার্ট (Henry Vansittart) রাজাকে তাঁর সৈন্যবাহিনী ভেঙে দিতে বলেন, অন্যথায় কোম্পানির সামরিক আক্রমণের সম্মুখীন হওয়ার হুমকি দেন। আসাদুজ্জামান এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন এবং কোম্পানির প্রভুত্বকে প্রকাশ্যে অগ্রাহ্য করেন। ভ্যানসিটার্ট তাঁকে পরাভূত করতে কয়েকটি অভিযান প্রেরণ করেন এবং অবশেষে রাজা পরাজিত ও বন্দি হন। বিরভূমের রাজা কখনোই যথাযথভাবে বৃটিশ শাসন মেনে নেন নি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের চাপে তাঁর সমগ্র জমিদারি সাত বছরের মধ্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। রাজা আসাদুজ্জামানের পুত্র জামান খান কোম্পানি শাসনের বিরুদ্ধে এক কৃষক বিদ্রোহ পরিচালনা করেন এবং এ অপরাধে নিজস্ব প্রাসাদে তাঁকে অন্তরীণ করে রাখা হয়, যেখানে তিনি ১৮০২ সালে মৃত্যুবরণ করেন।[১৮]

পূর্ববাংলার ফৌজদার ও নূরুল্লাপুরের জমিদার মোহাম্মদ আলী ইংরেজদের নিকট আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করেন যখন তারা দাবি করে যে তাদের অধিকৃত চট্টগ্রাম জেলা পশ্চিমে মেঘনা নদীর পূর্বতীর পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে অধিকৃত চট্টগ্রাম জেলার বাইরে তারা নবাবের প্রজা এবং নবাবের এলাকায় তাদের প্রজা হিসেবেই আচরণ করতে হবে, অন্যথায় তাদেরকে ফৌজদারের বাহিনী কর্তৃক নিগৃহীত হতে হবে।[১৯] মোহাম্মদ আলী এবং কোম্পানির মধ্যে কয়েকটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। দীউয়ানি অধিকারের পর মোহাম্মদ আলীকে ফৌজদারের রাষ্ট্রীয় পদ থেকে বরখাস্ত করা হয়। নূরুল্লাপুর পরগনার জমিদার হিসেবে তাঁকে অতিরিক্ত রাজস্ব চাহিদার আওতাভুক্ত করা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে ধ্বংস করা। ১৭৬৯ সালে কোম্পানির এক ব্যক্তিগত ব্যবসায়ী যখন তাঁর জমিদারিস্থ বাজারের দ্রব্যাদি একচেটিয়া দখলভুক্ত করতে আসে, তখন তাকে তিনি হত্যা করেন। কোম্পানি চট্টগ্রাম থেকে সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে প্রচণ্ড যুদ্ধের পর তাঁকে গ্রেফতার করে এবং তাঁর নিজস্ব জমিদারি, সম্মান ও সুবিধা থেকে তাঁকে বঞ্চিত করে।[২০]

জমিদারদের প্রথম দিককার প্রতিরোধ আন্দোলনের মধ্যে সবচেয়ে ব্যাপক ও সংগঠিত ছিল সন্দ্বীপের ভূ-মালিকদের (land holder) অভ্যুত্থান। ১৭৬০ সালে কোম্পানির অধিকারে নিয়ে আসার সময় সন্দ্বীপ চট্টগ্রাম জেলার অংশ ছিল। ১৭৬০ সাল থেকে এই দ্বীপটি অনেকবার জরিপ (measure) করা হয় এবং প্রতিবার ভূমিরাজস্ব বৃদ্ধি করা হয়। জমিদার ও তালুকদারগণ এ ধরনের অভূতপূর্ব কঠোরতার বিরুদ্ধে আপত্তি তোলেন। ১৭৬৪ সালে আরেকটি জরিপের জন্য আমিনদের পুনরায় প্রেরণ করা হয়। হাতিয়া, বামনি এবং সন্দ্বীপ—এ তিনটি দ্বীপের উত্তেজিত জমিদার ও তালুকদারগণ সন্দ্বীপের

---

১৮. Proceedings of the Board of Revenue, 15 December 1801

১৯. *Bangladesh District Records*, Chittagong, vol. I . 1760-1787, (Dhaka 1981), 99.

২০. Sirajul Islam,"Muslim Armed Resistance", 12-13

জমিদার আবু তুরাবের নেতৃত্বে সংগঠিত হন এবং ঘন ঘন জরিপের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করতে এবং কোম্পানিকে খাজনা না দিতে তাঁদের সংকল্প ব্যক্ত করেন। উক্ত তিনটি দ্বীপে জরিপের সমস্যা সম্পর্কে আলোচনাকালে ঢাকা প্রাদেশিক কাউন্সিল উল্লেখ করে যে "এ তিন দ্বীপের সকল জমিদার ও তালুকদার সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, কাছারি থেকে রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুণ্ঠন করে, বহু সংখ্যক সরকারি কর্মচারীকে হত্যা করে এবং রাজস্ব প্রদান পুরোপুরি বন্ধ রাখে।" প্রাদেশিক কাউন্সিল আরো মন্তব্য করে যে "বিভিন্ন সময়ে সন্দ্বীপে দুটি অভিযান পরিচালিত হয়েছে, একটি মেজর গ্রান্টের তত্ত্বাবধানে এবং অন্যটি ক্যাপ্টেন নলিকিন্সের পরিচালনায়। এ দুটি অভিযানই তৎকালীন জমিদার আবু তুরাবের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয় এবং তিনি নিজ বাড়িতে প্রকাশ্যে নিহত হন।"[২১]

১৭৭২-১৭৭৭ সময়ের চাষব্যবস্থার অধীনে অনেক জমিদার নিলাম ডাকে সাড়া দিতে অস্বীকার করেন এবং নির্ধারিত শতকরা দশভাগ মালিকানা-ভাতার ব্যাপারে উষ্মা প্রকাশ করেন। এসব ক্ষুব্ধ জমিদার ও তালুকদার গণঅভ্যুত্থানে প্রেরণা দান সহ স্থানীয় সংকট সৃষ্টি করে উক্ত চাষব্যবস্থাকে অকার্যকর করার চেষ্টা করেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কুমিল্লা জেলার হোমনাবাদের জমিদার আলী গাজী এবং মোজাফফর গাজীর সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ফিরিঙ্গি সরকারকে রাজস্ব প্রদান বন্ধ করে দেন।[২২] কুমিল্লার রেসিডেন্ট আর. লিক (R. Leeke) তাঁর প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন যে চার বছর যাবৎ তাঁরা রাজস্ব প্রদান বন্ধ রাখেন এবং সরকারি কর সংগ্রহকারীদের কর সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এলাকায় প্রবেশ সফলতার সাথে রুখে দেন।[২৩]

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারদের জন্য ব্যাপক সুবিধা বয়ে আনে, কারণ ততদিনে জমির মূল্য কয়েক গুণ বৃদ্ধি পায়, কিন্তু তাঁদের কাছ থেকে সরকারের প্রাপ্য খাজনার পরিমাণ ১৭৯৩ সালের খাজনার সমানই থেকে যায়। কিন্তু উক্ত ব্যবস্থার প্রাথমিক বছরগুলোতে এটি জমিদারদের উপর কঠিন বোঝায় পরিণত হয়েছিল। তাঁরা কদাচিৎ সরকারি রাজস্ব পরিশোধ করতে পারতেন এবং ফলশ্রুতিতে তাঁদের জমিদারি হুমকির সম্মুখীন হয় এবং সূর্যাস্ত আইন নামে পরিচিত কঠোর রাজস্ববিক্রয় আইনের আওতাভুক্ত হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দশ বছরের মধ্যে বর্ধমানের রাজার জমিদারি ব্যতীত বাংলার বড় বড় সকল জমিদারি সূর্যাস্ত আইনের কার্যকারিতায় বিক্রয় হয় এবং হাজার হাজার জমিদারি এস্টেট নিলামে উঠে। হিসাব করা হয়েছে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের দশ বছরের মধ্যে সরকারি রাজস্বের মাপকাঠিতে বাংলার ভূ-সম্পত্তির অর্ধেকেরও বেশি রাজস্ববকেয়ার কারণে নিলামে বিক্রয় হয়ে যায়।[২৪] যেসমস্ত পরিবার

২১. *Proceedings of the Committee of Circuit of Dacca,* (printed), (3 Oct. -28 Nov. 1772), 115.

২২. Sirajul Islam, 'Muslim Resistance', 14-15.

২৩. ঐ।

২৪. চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রাক্কালে ভূমি হস্তান্তরের সংখ্যাগত বিশ্লেষণের জন্য দেখুন, Sirajul Islam, *The Permanent Settlement in Bengal: A Study of its Operation 1790-1819,* (Dhaka 1979), chapters iv-v

ভূমি হারায়, তারা বংশপরম্পরায় সমাজের গতানুগতিক নেতৃত্বে ছিল এবং এত অল্প সময়ের মধ্যে ভূস্বামী হিসেবে তাদের পতন নিঃসন্দেহে এক বিরাট বিপর্যয় ছিল, যার জন্য তারা শুধুমাত্র ফিরিঙ্গিদের দায়ী করতো। ব্যক্তিগতভাবে এবং যৌথভাবে তারা সরকারের কাছে তাদের দাবিদাওয়া পেশ করে এবং এমনকি তাদের অনেকেই মরিয়া হয়ে স্থানীয় প্রতিরোধ আন্দোলন সংগঠিত করে।[২৫]

অনেক পুরানো জমিদার যদিও আঞ্চলিকভাবে এবং অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বহীন হয়ে পড়েন, তথাপি তাঁরা তাঁদের লাখেরাজ বা খাজনা মওকুফ অধিকারের বদৌলতে কোনোভাবে তাঁদের সামাজিক সম্মান বজায় রাখতে পেরেছিলেন। অতীতে যথাযথ সরকারি অনুমোদন নিয়ে জমিদারগণ ধর্ম, সাহিত্য, বিনোদন ইত্যাদি বিষয়ে নিবেদিত ব্যক্তিদেরকে লাখেরাজ-স্বত্ব মঞ্জুর করতে পারতেন। একে মাদাদ-ই-মাআশ বা জীবিকানির্বাহমূলক ভূমি অনুদান বলা হতো। এসব অনুদানের মধ্যে ছিল ইমামদের জন্য আইমা (aima), সুফীদের জন্য পিরুত্তর (piruttar), ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের জন্য ব্রহ্মোত্তর (brahmuttar), প্রতীমাপূজার জন্য দেবোত্তর (debuttar), চারণ কবিদের জন্য ভাতুত্তর (bhatuttar) ইত্যাদি। এ ছাড়া বৃত্তি, মহাত্রাণ, মিল্লাকী, ওয়াকী ইত্যাদি অন্যান্য অনুদানও ছিল। এসব অনুদান সকল ধরনের শিক্ষক ও সাহিত্যিক ব্যক্তির ভরণপোষণের জন্য নির্ধারিত ছিল। তত্ত্বগতভাবে এসব তামাদিযোগ্য হলেও কার্যক্ষেত্রে এতে বংশগত দখলস্বত্ব ছিল। মুগল সরকারের উদার নীতির সুযোগ গ্রহণ করে অনেক জমিদার শুধু সত্যিকারের যোগ্য ব্যক্তিদেরই লাখেরাজ অনুদান মঞ্জুর করেন নি, তবে মানবিক কারণ দেখিয়ে বিপুল সরকারি রাজস্ব জব্দ করে মিথ্যা বা জ্বাল নামে নিজেদের জন্য তা বরাদ্দ করেছিলেন।[২৬] প্রধানত দু'টি সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে তাঁরা খালসা (khalsa) বা রাজস্বভূমি সরাতে চেয়েছিলেন। প্রথমটি অতিরিক্ত আয় এবং দ্বিতীয়টি নিরাপত্তা। কোনো কারণে কিছু সময়ের জন্য জমিদারি হাতছাড়া হয়ে গেলে লাখেরাজ অনুদান তাঁদের অধিকারে থেকে যেতো। তাঁদের দূরদৃষ্টি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরবর্তী সময়ে যথাযথ প্রমাণিত হয়, যখন অনেক পুরনো জমিদার পরিবার তাদের ভূমি হারান, কিন্তু তখনও লাখেরাজ ভূমি বেনামীতে রাখার কারণে পুরোপুরি ধ্বংসের হাত থেকে তাঁরা বেঁচে যান।

কোম্পানি সরকার সুবিদিত ছিল যে সরকারি রাজস্বের বেশির ভাগ অংশ মাদাদ-ই-মাআশ নামে ফন্দিবাজ জমিদাররা বাগিয়ে নিচ্ছিল। কিন্তু এ ব্যাপারে কোনো কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় নি, কারণ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র তখন পর্যন্ত শিথিলভাবে গঠিত হচ্ছিল এবং জমিদারদের মতো ক্ষমতাবান কায়েমী স্বার্থকে উচ্ছেদ করার অবস্থানে ছিলনা। তবে ১৮২০ ও '৩০-এর দশকে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র সুষ্ঠুভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এ ব্যাপারে কোনো উদ্বেগ ছিলনা। অধিকন্তু ভীষণ আর্থিক সংকটে নিপতিত সরকার রাজস্বের নতুন

২৫. ঐ, Chapters ii-iii.

২৬. Chittabrata Palit, *Tensions in Bengal Rural Society: Landlords, Planters and Colonial Rule 1830-1860* (Calcutta 1975), 29-30.

উৎস থেকে অধিক আয়ের পথ খুঁজতে থাকে। অকেজো লাখেরাজ ভূমিকে পুনরায় ভাড়ার আওতায় আনা সরকারের নিকট খুব আকর্ষণীয় এবং মজবুত মনে হয়েছিল। রাজস্ববোর্ডের প্রেসিডেন্ট জন শোর (John Shore) কর্তৃক তৈরি ১৭৮৯ সালের হিসাব মতে অকেজো লাখেরাজ-এর কারণে সরকার বাৎসরিক ৩৫ লক্ষ সিক্কা রূপী থেকে বঞ্চিত হয়েছে, যা সরকারের বাৎসরিক মোট রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ।[২৭] ভূমি অনিরীক্ষিত থাকায় রাজস্বক্ষতির পরিমাণও কম ছিলনা এবং সেসকল ভূমি মুক্ত করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় থেকে চাষাবাদের আওতায় আনা হয়। সরকার দাবি করে যে মুক্ত ভূমির মালিক রাষ্ট্র এবং সকল পুনঃদাবিকৃত ভূমির জন্য পৃথক বন্দোবস্ত অবশ্যই থাকতে হবে। জমিদারগণ পুনঃদাবিকৃত সকল ভূমি তাঁদের জমিদারি এস্টেটের অংশ হিসেবে দাবি করেন, যা নতুনভাবে করযোগ্য হবে না।

সরকার ১৮২০-এর দশক থেকে বাজেয়াপ্ত আইন (resumption proceedings) ব্যাপকভাবে প্রবর্তন করে এবং ১৮২৮ সাল থেকে আরো আক্রমণাত্মকভাবে তা প্রয়োগ করে। জমিদার ও তালুকদারদেরকে তাদের লাখেরাজ বা তাইদাদ (taidad) কাগজপত্র পরীক্ষণের উদ্দেশ্যে জমা দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। এ পদক্ষেপ জমিদারদের বেসামাল করে দিয়েছিল, কারণ তারা কদাচিৎ তাদের কাগজপত্র সঠিক ও আসল বলে প্রমাণ করতে সক্ষম হতেন, যেখানে সরকার নিজেই উক্ত কাগজপত্র সঠিক হিসেবে মেনে নিতে আগ্রহী ছিলনা। বাজেয়াপ্ত করার ব্যবস্থা এ সকল পুরনো পরিবারের জন্য হুমকি হিসেবে আসে, যারা সূর্যাস্ত আইনে ইতিমধ্যেই তাদের এস্টেট হারায় এবং লাখেরাজ ব্যবস্থায় তখন পর্যন্ত টিকে ছিল।

বাজেয়াপ্ত আইন নতুন করে জমিদারদের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ালে তারা তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। দু'টি ক্ষেত্রে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়। সরকারি কর্মকর্তারা অকুস্থলে জরিপের জন্য আসা মাত্র স্থানীয় প্রতিরোধ সংগঠিত করা হয়। আমিন ও রাজস্ব সংগ্রহকারী এজেন্টদের তাড়িয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে লাঠিয়ালবাহিনী ব্যবহার করা হয়। ফলশ্রুতিতে গ্রামাঞ্চলে পুলিশ ও জমিদারের লাঠিয়ালদের সংঘর্ষ স্বাভাবিক ঘটনা ছিল।[২৮] চট্টগ্রামে প্রথমবারের মতো ১৭৬০-এর দশকে জরিপের বিরুদ্ধে প্রতিবোধ গড়ে তোলা হয় এবং চট্টগ্রাম জমিদার বিদ্রোহের প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠে। ১৮৩৭ সালের জানুয়ারি মাসে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার জে. জে. হারভের নিকট পাঠানো পত্রে জেলা প্রশাসক জমিদারদের আনুগত্যহীনতা ও অসন্তুষ্টির উল্লেখ করেন, যারা তাদের এলাকায় সরকারি এজেন্সীর প্রবেশের বা সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার অনুমতি দিচ্ছিলেন না। পালিত (Palit) মন্তব্য করেন, "অবস্থার এমন অবনতি ঘটে যে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য অতিরিক্ত সামরিক বাহিনী তলবের প্রয়োজন হয়।"[২৯] ঢোল বাজিয়ে জনগণকে সতর্ক করা হয় যাতে তারা

২৭. *Fifth Report,* Appendix 1, John Shore's Minute, 18 June, 1789, 181

২৮. Chittabrata Palit, *Tensions in Bengal Rural Society,* 46.

২৯. ঐ।

জরিপকারীদের (measuring people) সাথে সহযোগিতা না করে এবং এলাকা থেকে তাদের বহিষ্কার করে। উভয় পক্ষে বহুজনের মৃত্যু হয়। কলকাতার এক পত্রিকা *ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়াতে* চট্টগ্রাম বিদ্রোহের ঘটনার বিবরণ নিম্নোক্তভাবে পরিবেশিত হয় :

> "বাজেয়াপ্ত আইন বাস্তবায়নে প্রথম রক্তপাত হয়েছে এবং আমরা আন্তরিকভাবে আশা করি যে এটাই শেষ ঘটনা।"[৩০] কিন্তু তা শেষ ছিল না, বরং ছিল প্রথম। সিলেট এবং ত্রিপুরাতে লাখেরাজদারগণ জমি জরিপ ও অনুদানের কাগজপত্র পরীক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রেরিত (১৮৪১) আমিন ও ডেপুটি কালেক্টরদের সাথে সহযোগিতা করতে অস্বীকার করেন। সশস্ত্র সিপাহিসহ জরিপকর্মকর্তাদের বিদ্রূপ, ইট-পাটকেল ইত্যাদির সম্মুখীন হতে হতো এবং প্রায়শ এগুলো সশস্ত্র সংঘর্ষের রূপ নিত, যাতে উভয় পক্ষের লোক প্রাণ হারাতো।[৩১] অন্যান্য জেলাতেও একই ধরনের ঘটনা ঘটে। প্রতিরোধ ফ্রন্টগুলো বিশেষভাবে শক্তিশালী ছিল সীমান্তজেলাসমূহে, যেমন চট্টগ্রাম, সিলেট, রংপুর, মেদিনীপুর ইত্যাদি স্থানে, যেখানে লাখেরাজ ব্যবস্থা পর্যাপ্তভাবে বিদ্যমান ছিল।[৩২]

বাজেয়াপ্তকরণবিরোধী আন্দোলনের (anti-resumption movement) একটি রাজনৈতিক দিক ছিল। মফস্বল এলাকায় ব্যক্তিগত প্রতিরোধ আন্দোলনগুলো ছিল বিশেষভাবে স্থানীয় ও নির্দেশনাবিহীন, অকারণ সন্ত্রাসমুখী এবং এর ফলে অভিযুক্তদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হতো। ক্ষতিগ্রস্ত ভূমিমালিকদের দাবিদাওয়া সাংগঠনিকভাবে পূরণের বিষয়টি ছিল সময়ের দাবি এবং এ প্রয়োজনেই ১৮৩৭ সালে কলকাতা জমিদারি সঙ্ঘ (Zamindari Association of Calcutta) প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি ছিল এ ধরনের প্রথম সঙ্ঘ, ১৮৩৮ সালে যার পরিবর্তিত নাম হয় ভূম্যধিকারী সমিতি (Landholder's Society)। এ সমিতি বাজেয়াপ্তকরণ ইস্যুকে মফস্বল এলাকায় সরকারি কর্মকর্তাদের কঠোরতার বিরুদ্ধে আন্দোলনে রূপান্তরিত করে এবং বাজেয়াপ্তকরণ নীতির বিরুদ্ধে স্থানীয় ও বিরুদ্ধবাদী এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান পত্রিকাতে প্রবন্ধ লিখে এবং পার্লামেন্টে আবেদন জানিয়ে জনমত গঠনের চেষ্টা করে। ১৮৩৯ সালে ২০,০০০ ক্ষতিগ্রস্তের স্বাক্ষরযুক্ত এক আবেদনপত্র বৃটিশ পার্লামেন্টে প্রেরণ করা হয়। আবেদনকারীগণ যুক্তি উপস্থাপন করে যে বাজেয়াপ্তকরণ কর্মপন্থা আইনসিদ্ধ নয় এবং গ্রামাঞ্চলগুলো অকেজো লাখেরাজ অনুদান উৎঘাটনের জন্য নিয়োজিত অল্পবয়স্ক ও অশিক্ষিত ডেপুটি কালেক্টরদের দ্বারা নিপীড়িত হচ্ছে। আরো অভিযোগ করা হয় যে ডেপুটি কালেক্টরগণ তাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের অপপ্রয়োগ করছিল এবং দেশের অসহায় গোষ্ঠীকে ঠকিয়ে যাচ্ছিল। স্থানীয় প্রতিরোধ ও সমিতির আবেদন কর্তৃপক্ষকে ১৮৪০-এর দশকে বাজেয়াপ্তকরণের সমগ্র প্রশ্নটি পুনর্বিবেচনা করতে উৎসাহিত করে।[৩৩]

৩০. *The Friend of India,* 12 January, 1837.

৩১. Report by Bidwell, special deputy collector for Tipperah and Sylhet, to the Chittagong Commissioner, 1 June 1841, Nos. 6 & 7, *Comilla District Records* (Bangladesh National Archives).

৩২. বহির্ভাগস্থ পরগনাসমূহে মাদাদ-ই-মাআশ সুবিধা বরাদ্দ মুগল সরকারের এক সাধারণ কর্মকাণ্ড ছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল অর্থ প্রাপ্তিকে উৎসাহিত করা এবং স্বল্প খরচে সীমান্ত রক্ষা করা।

৩৩. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, Palit, *Tensions,* 49-51.

## ধর্মীয় গোষ্ঠীর (order) প্রতিরোধ

প্রাক-বৃটিশ বাংলার রাষ্ট্রশাসনকার্যে ধর্ম এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে বৃটিশপূর্ব সব সরকার জনগণের সকল ধর্মকে সম্মান প্রদর্শন করে। তখন সরকার শুধুমাত্র বহু ধর্মের উপস্থিতিকেই সহ্য করে নি, উপরন্তু উদারতার সাথে রাষ্ট্রীয়ভাবে তাদের প্রতিষ্ঠানসমূহকে সহায়তা প্রদান করে। বিদেশী শাসকদের জন্য এটি ছিল ধর্মীয় গোষ্ঠীসমূহকে তুষ্ট রাখার রাজনৈতিক কৌশল। কিন্তু পশ্চিমা, খ্রিস্টান ও মুনাফাকেন্দ্রিক কোম্পানি সরকার স্থানীয় ধর্মকে সম্মান প্রদর্শনের কোনো প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে নি। এই সরকার স্থানীয় ধর্মকে শুধুই কুসংস্কার হিসেবে দেখতো এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিবর্গকে পৃষ্ঠপোষকতা দানের কোনো রকম বাধ্যবাধকতা তাদের নেই বলে ভাবতো। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে ফকির, সন্ন্যাসী এবং অন্যান্য ভিক্ষুদেরকে মুষ্টি (musthi) নামে গ্রামীণ গৃহস্থদের প্রদত্ত সাহায্য গ্রহণের অনুমতি দেয়া হতো না।[৩৪] ধর্ম ও শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে মাদাদ-ই-মাআশ অনুদান প্রদানের রীতি রহিত করে দেয়া হয়। একইভাবে ধর্মীয় স্থান (shrine), মন্দির ও মসজিদের জন্য রাষ্ট্রীয় অনুদানও বন্ধ করে দেয়া হয়। এমনকি ফকির ও সন্ন্যাসীগণকে সদলবলে ত্রিশূল, শিকল ইত্যাদি সহকারে গ্রামাঞ্চলে অবাধে ঘুরে বেড়ানোর অনুমতি দেয়া হতো না। ভ্রমণরত ভিক্ষুদেরকে প্রায়শই চুরি ও ছিনতাইয়ের দায়ে অভিযুক্ত করা হতো। এ পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মীয় গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠানসমূহ স্পষ্টত ক্ষুব্ধ হয় এবং নতুন সরকারের অনুসৃত নীতির কারণে সরকারের বিরুদ্ধে তাদের তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। তারা কোম্পানি সরকারকে তাদের বৈধ শাসক হিসেবে মানতে অস্বীকার করে এবং শুরু থেকেই প্রতিরোধ সংগঠিত করতে থাকে।

সর্বপ্রথম এবং সর্বাধিক সংগঠিত বিদ্রোহ গড়ে তুলেন ফকির মজনু শাহ। তিনি ফকিরদের মাদারীয়া অংশের বুরহানা সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। ফকিরদের সদর খানকাহ্ ছিল বিহারের কানপুর জেলার মাখনপুরে। উত্তর বঙ্গের জেলাগুলোতে ছিল মজনু শাহের নিজস্ব মুরীদদের এক বিশাল নেটওয়ার্ক। এঁরা দেশের সকল স্থানে ফিরিঙ্গিদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য মজনু শাহের নিকট থেকে নির্দেশ লাভ করতেন। যদিও ফকির প্রতিরোধ ১৭৬০ সালে শুরু হয়, তবে ১৭৭০-এর দশকের শুরুতে তা সাংগঠনিক দৃঢ়তা লাভ করে এবং ১৭৮০-এর দশকের শেষাবধি সক্রিয় থাকে। এই আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়ে যখন এর নেতা কোম্পানি বাহিনীর সাথে সংঘর্ষকালে সম্ভবত ১৭৮৭ সালে নিহত হন।

---

৩৪. রন্ধনকালে গৃহিনীরা রান্নার পাত্র থেকে ভিখারিদের জন্য একমুঠো চাল তুলে রাখতো। ঐ ভিক্ষার চাল সংগ্রহের জন্য ভিখারিরা প্রতিটি বাড়িতে বিভিন্ন সময় পর পর যেতো। গৃহিনীকুল ও কৃষকগণ জমির উর্বরতাবৃদ্ধি, রোগমুক্তি ও মৃত্যু পরিহারের সহায়ক মনে করে উক্ত মুষ্টির চালকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতো।

১৭৮৪ সালে ফকিরগণ মজনু শাহের ভ্রাতা মুসা শাহের নেতৃত্বে ময়মনসিংহ, জাফরশাহী ও শেরপুর পরগনা দখল করে নেন।[৩৫] তাদেরকে এই পরগনাগুলো থেকে বহিষ্কারের জন্য কালেক্টরগণ ঢাকা থেকে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। কিন্তু ফকিরগণ শীঘ্রই গেরিলা কৌশল অবলম্বন করে নিরাপদ স্থানে পশ্চাদপসরণ করেন এবং উক্ত পরগনা থেকে সৈন্যবাহিনী চলে যাওয়া মাত্র তারা ফিরে আসেন এবং তাদের বৈধ শাসক হিসেবে বৃটিশদের স্বীকার না করার জন্য জনগণকে প্ররোচিত করেন। ১৭৮৪ সালে মজনু শাহ স্বয়ং বাংলার প্রতিরোধ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। তাঁর সম্পর্কে কলকাতা সরকার ঢাকার চীফের নিকট লেখে, "আমরা গোয়েন্দা সূত্রে খবর পেয়েছি যে মজনু শাহ সৈন্যবাহিনীসহ সিলবারিস জেলায় প্রবেশ করেছে এবং আশা করছি যে আপনার জেলাকে তার ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য দেশে ছড়িয়ে থাকা সিপাহিদের একত্র করে এবং যুদ্ধের জন্য মোতায়েন করে আপনি যতদুর সম্ভব তাৎক্ষণিক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করবেন... ।"[৩৬] ফকিরদের উৎখাতের জন্য সৈন্যবাহিনী পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু তাদেরকে কদাচিৎ চিহ্নিত করা গেছে। স্থানীয় জনগণের সহায়তায় ফকিরগণ সর্বদাই সরকারি বাহিনীর সাথে সরাসরি সংঘর্ষ এড়িয়ে যেতে সক্ষম হন। ফকিরবাহিনীর হয়রানিকৌশল এমন গুরুতর পর্যায়ে পৌঁছায় যে কোম্পানির বাহিনী মোতায়েন থাকাকালে বাইরে থেকে গ্রামাঞ্চলকে কোম্পানি নিয়ন্ত্রিত মনে হতো, কিন্তু এ বাহিনী প্রত্যাহৃত হলে কার্যত তা ফকিরদের নিয়ন্ত্রণে চলে যেতো। এ অবস্থার সাথে কার্যকরীভাবে মোকাবেলা করার জন্য কলকাতা সরকার এর গুপ্ত গোয়েন্দা বিভাগকে আরো সক্রিয় করার এবং সরাসরি গভর্নর জেনারেলকে দাপ্তরিক কর্মকাণ্ড ও পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ঐ সিদ্ধান্তে উল্লেখ করা হয় :

> কাউন্সিলসহ গভর্নর জেনারেলের অভিমত এই যে মজনু শ [মজনু শাহ] এবং তার অনুগতদের আক্রমণ ও ক্ষতি থেকে দেশকে রক্ষার জন্য এ যাবৎ গৃহীত পদক্ষেপের চেয়ে আরো কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। অতএব তার এবং তার প্রধান সহযোগীদের সম্ভাব্য গ্রেফতার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে তাকে অনুসরণ, তার আস্তানা ও গতিবিধি চিহ্নিতকরণ এবং কিভাবে তিনি জীবন যাপন করেন তা জানার জন্য গুপ্তচর নিয়োগ করতে আপনাকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে ... এ বিষয়ে গভর্নর জেনারেল ও পরিষদের অবগতির জন্য আপনি শুধুমাত্র আমার সাথে যোগাযোগ করুন।[৩৭]

১৭৮৮ সালের শুরু থেকে ফকির বিদ্রোহ সম্পর্কিত যথেষ্ট তথ্য আমাদের কাছে নেই। ধারণা করা হয় যে মজনু শাহ ১৭৮৭ অথবা ১৭৮৮ সালের কোনো এক সময় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর বুরহানা ফকির প্রতিরোধ আন্দোলন ক্রমান্বয়ে স্তিমিত

৩৫. ফকির প্রতিরোধ আন্দোলনের উপর তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, Jamini Mohan Ghosh, *Sannyasi and Fakir Raiders in Bengal* (Calcutta 1930), Mymensingh Collector to Dacca Chief, 5 February 1784; এটি সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত *Bangladesh District Records : Dacca District* (1784-1787), vol,. 1 (Dhaka 1981)-এর অন্তর্ভুক্ত, 61.

৩৬. Government to Chief of Dhaka, October 18, 1784, ঐ, 100.

৩৭. Secretary of the Council to Mathew Day, Collector of Dhaka, 7 December 1787, ঐ, 423-24.

হয়ে আসে। শেষ প্রতিরোধটি ঘটে ১৭৯৯ সালে যখন শাহ্ বাহারপুর নামে এক ব্যক্তি বৃটিশদের থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং নিজেকে হিন্দুস্থানের 'রাজা' হিসেবে আখ্যায়িত করেন।[৩৮]

ফকিরদের স্বাধীনতা ঘোষণা ১৭৮০ এবং '৯০-এর দশকে সম্ভবত এক রীতি (fashion) হয়ে দাঁড়ায়। কুমিল্লা জেলার কালু ফকির, যাঁকে বিভিন্ন পরিচয়ে, যেমন হুল্লি ফকির, হাল্লা ফকির এবং আল্লাহ্ ফকির নামে ডাকা হতো, সেই ব্যক্তি কৃষক, জোতদার, তালুকদার ও জমিদারদেরকে তাঁর অধীনে সংগঠিত করেন এবং বৃটিশদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তিনি তাঁর অনুগত প্রজা হিসেবে থাকার বিনিময়ে কাছ থেকে খাজনা দাবি করেন।[৩৯] ১৭৯২ সালে বরিশালের বলাকী শাহ রায়তদের' স্বার্থ তুলে ধরেন এবং জীয়ন নামে এক পরামর্শদাতাকে 'সুলতান' হিসেবে নিয়োগ করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ঢাকা জেলা কালেক্টরের (বরিশাল তখন ঢাকা জেলার অংশ ছিল) প্রতিবেদন অনুযায়ী "বলাকী শাহ নামে এক ব্যক্তি এক সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলেন এবং কতিপয় পরগনায় জমিদারদের আটক করে...এবং রাজস্ব আদায় ক'রে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেন।"[৪০] এক সরকারি গোয়েন্দা প্রতিবেদন থেকে তাঁর বিদ্রোহের প্রকৃতি সম্পর্কে বর্ণনা পাওয়া যায়। এই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে ঐ ফকির তাঁর পক্ষে যুদ্ধ করার জন্য কয়েক হাজার সশস্ত্র লোক সংগ্রহ করেন এবং সালিমাবাদ, নাজিরপুর ও চন্দ্রদ্বীপ পরগনার সকল জমিদারকে বৃটিশদের পরিত্যাগ করতে এবং তাঁকে প্রধান বা চীফ হিসেবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য করেন। প্রতিবেদনে আরো উল্লেখ করা হয় যে "ঐ ফকির ঢোল বাজিয়ে ঘোষণা করেন যে ফিরিঙ্গিদের শাসন শেষ হয়েছে ও তারা পালিয়ে গেছে এবং যদি কেউ ভবিষ্যতে ফিরিঙ্গিদের খাজনা দেয়, তবে তাকে কঠোর শাস্তি প্রদান করা হবে।"[৪১] বলাকী শাহের নিয়ন্ত্রণাধীন সকল পরগনায় বৃটিশ শাসনের শুরুতে বৃদ্ধিকৃত সকল কর বিলুপ্ত করা হয়। রাজস্বের হার হ্রাস করে বলাকী শাহ ঘোষণা করেন যে প্রতি কানি (প্রায় এক একর) জমির জন্য দুই রূপী খাজনা নেয়া হবে; কেউ তার অধিক নিয়ে থাকলে ফেরত দিতে হবে, অন্যথায় তাকে জরিমানা করা হবে।"[৪২]

দুঃসাহসী বলাকী শাহকে দমন করার জন্য ইউরোপীয় কর্মকর্তাদের দ্বারা পরিচালিত এক শক্তিশালী সিপাহিবাহিনী প্রেরিত হয়। বলাকী শাহের মাটির দুর্গে (mud fort) আক্রমণ চালিয়ে তাঁকে বন্দি করা হয়। ঢাকার নিজামত আদালত তাঁকে বিদ্রোহ ও রক্তপাতের দায়ে অপরাধী সাব্যস্ত করে এবং সাত বছরের কারাদণ্ড প্রদান করে।[৪৩]

৩৮. Bengal Criminal and Judicial Consultations, 23 April 1801, No. 25.

৩৯. Collector of Tipperah to Chief of Dhaka, April 24, 1787 ; in Sirajul Islam (ed.), *Dacca*, 304-10

৪০. Bengal Revenue Consultations, 10 February 1792, No 6

৪১. ঐ।

৪২. ঐ।

৪৩. Bengal Revenue Consultations (Judicial), 10 May 1792.

আমরা বৃটিশ শাসন বিরোধী ধর্মীয় গোষ্ঠীর আরো অনেক প্রতিরোধের উদাহরণ দিতে পারি। এসব স্থানীয় প্রতিরোধ ইঙ্গিত দেয় যে জনগণ, বিশেষ করে ধর্মীয় গোষ্ঠীসমূহ, যারা সাধারণ রায়ত হিসেবে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, তারা নতুন সরকারকে সামগ্রিকভাবে মেনে নেয় নি। তাই রায়তদের সমর্থনে তারা তথাকথিত স্বাধীনতা ঘোষণা করে তাদের প্রতিবাদ ব্যক্ত করে। স্থানীয় পর্যায়ে তাদের স্বাধীনতা জনগণের সত্যিকার জাতীয়তাবাদী চেতনার ইঙ্গিত দেয় না, বরং ঔপনিবেশিক শাসনের ত্রুটিপূর্ণ প্রকৃতির ইঙ্গিত দেয়। নতুন ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের গঠনপ্রক্রিয়ায় শাসকের বিধি-বিধান তাঁর কর্মচারীগণ আসার পূর্বেই পল্লী অঞ্চলে পৌঁছে যেতো। প্রতিরোধকারী জনগণ নতুন শাসকদের সম্পর্কে শুনে থাকলেও তাদেরকে কদাচিৎ চোখে দেখেছিল। এজন্য সহজেই প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব হয়। এক কথায়, গ্রামাঞ্চলের মানুষ নতুন শাসকদের অধীনে সুখী ছিল না, তাই নতুন অত্যাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে যিনি এগিয়ে আসতেন তাঁকেই তারা সহযোগিতা প্রদান করতে প্রস্তুত থাকতো।

ধর্মীয় স্বতঃস্ফূর্ত ও বিচ্ছিন্ন স্থানীয় প্রতিরোধ আন্দোলন ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে শেষ হয়ে যায়, যখন ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগঠন পূর্ণতায় পৌঁছে এবং রাজনৈতিক ও প্রশাসনিকভাবে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অনুপ্রবেশ করে। সমাজের শিক্ষিত ও সচেতন শ্রেণী হিসেবে ধর্মীয় গোষ্ঠীসমূহ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকে বাস্তবতার নিরিখে ব্যাখ্যা করতে শুরু করে এবং নতুন শাসকগোষ্ঠীর সাথে সমঝোতায় আসে, যদিও ময়মনসিংহের শেরপুরের ন্যায় প্রত্যন্ত অঞ্চলে তখনো ঔপনিবেশিক কর্তৃত্বের অনুপ্রবেশ ঘটে নি, যেখানে পুরনো কায়দায় ধর্মীয় প্রতিরোধ লক্ষ্য করা গেছে। শেরপুর ও সুসাং পরগনায় টিপু শাহ ও তাঁর উপজাতীয় অনুসারীগণ নতুন শাসকের ভূমিনীতি মেনে নিতে অস্বীকার করে এবং প্রথমে ১৮২৪ ও পরে ১৮৩৩ সালে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। টিপু ও তাঁর অনেক অনুসারীকে বন্দি করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়।[৪৪] তিতুমীর, শরিয়তউল্লাহ ও দুদু মিয়ার সাথেও নতুন শাসক ও তার স্থানীয় প্রতিনিধি জমিদারদের সংঘর্ষ হয়। কিন্তু তাঁদের বিদ্রোহের এক নতুন মাত্রা ছিল। ঔপনিবেশিক শাসকের সাথে তাঁদের দ্বন্দ্ব ইসলামী সংস্কার আন্দোলনের কারণে ঘটে, প্রত্যক্ষভাবে স্বার্থের সংঘাতের কারণে নয়। এভাবে সংস্কারবাদী ও রক্ষণশীলদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। জমিদারগণ ও সরকার আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় হস্তক্ষেপ করে এবং ফলশ্রুতিতে কর্তৃপক্ষের সাথে সংঘর্ষ দেখা দেয়। তথাকথিত ওহাবী আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার সাথে সাথে ধর্মীয় গোষ্ঠী দ্বারা ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে পরিচালিত বিদ্রোহের পরিসমাপ্তি ঘটে।

৪৪. টিপুর বিদ্রোহের বিস্তারিত বিবরণ দ্র., Willem Van Schendel, "Pagalpanthi Rebellion of Mymensingh (Bangla)" ; এটি সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ও মুন্তাসির মামুন সম্পাদিত *বাংলাদেশে সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন* (ঢাকা, ১৯৮৬) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত, পৃষ্ঠা ৭৪।

## এথনিক প্রতিরোধ

সমাজের প্রভাবশালী সংখ্যাগরিষ্ঠের নিকট উপজাতি হিসেবে পরিচিত বাংলার এথনিক সংখ্যালঘু জনগণ প্রধানত পশ্চিম, উত্তর এবং দক্ষিণের সীমান্তে উপ-পার্বত্য (sub-montane) অঞ্চলে বাস করতো। সীমান্তের প্রান্তিক সমাজ হিসেবে এথনিক গোষ্ঠীগুলো বাঙালিদের থেকে অপেক্ষাকৃত বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করতো। এমনকি তারা নিজেরাই একে অপর থেকে বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করতো। প্রতিটি উপজাতির নিজস্ব এলাকা এবং জীবনপ্রণালী ছিল। স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্রে প্রতিটি উপজাতি স্ববিবর্তিত ব্যবস্থা অনুসারে জীবন যাপন করতো এবং তারা কদাচিৎ বহিঃস্থ প্রভাব ও হস্তক্ষেপের প্রভাবাধীন ছিল। প্রাক-বৃটিশ সকল শাসক এসব উপজাতির এলাকাকে মধ্যবর্তী অঞ্চল (buffer states) হিসেবে গণ্য করতো এবং কদাচিৎ তাদের এলাকায় হস্তক্ষেপ করতো। কিন্তু কোম্পানি সরকার এ সকল সীমান্ত-অঞ্চলকে রাজস্বের উৎস হিসেবে বিবেচনা করে। উপ-পার্বত্য এলাকাসমূহকে কোম্পানিরাষ্ট্রের আওতাধীনে আনা হয় এবং উপজাতির জনগণকে নগদ অর্থ বা দ্রব্যে রাজস্ব পরিশোধ করতে নির্দেশ দেয়া হয়। এ ধরনের বিনিময়ের মাধ্যম উপজাতিদের নিকট অজ্ঞাত বিষয় ছিল।

উপজাতীয় সমাজগুলোর নিকট রাষ্ট্রের আইনের বশ্যতা স্বীকার এক অজানা অভিজ্ঞতা ছিল এবং স্পষ্টত তারা এ জাতীয় বশ্যতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। আমরা জোর দিয়ে বলতে চাই যে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়া ও উপজাতির বিদ্রোহের মধ্যে একটা ধনাত্মক সম্পর্ক ছিল। এ বক্তব্যের সপক্ষে অনেক উদাহরণের মধ্যে মাত্র তিনটি প্রতিনিধিত্বশীল উপজাতিবিদ্রোহের কথা এখানে উল্লেখ করা হলো।

## খাসি বিদ্রোহ (The Khasis Resistance)

স্থানীয় জনগণকে, বিশেষকরে খাসি জনগোষ্ঠীকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে ১৭৭২ সালে রবার্ট লিন্ডসেকে সিলেটে রেসিডেন্ট (Resident) হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। তিনি এ অঞ্চল সম্পর্কে মানসিক জরিপ চালিয়ে পাহাড়ী সমাজে ব্যবসা ও বাণিজ্যের বিপুল সম্ভাবনা লক্ষ্য করেন। খাসি পাহাড়গুলোতে প্রচুর পরিমাণে জাহাজ নির্মাণসামগ্রী, কাঠ, লোহা, সিল্ক, মোটা বা অসূক্ষ্ম মসলিন, হাতির দাঁত, মধু, আঠা, কমলা, লেবু ইত্যাদি পাওয়া যেতো। কিন্তু খাসি জনগণের অর্থনীতি কোম্পানির সাথে ব্যবসা করার অনুকূল ছিলনা। অধিকন্তু লিন্ডসে মন্তব্য করেন, "গ্রামের প্রত্যেক চীফ (chief) নিজেকে রাজা হিসেবে আখ্যায়িত করেন এবং নিজস্ব এলাকায় তাঁর স্বাধীন সরকার রয়েছে।" গ্রামে চীফের স্বাধীন অস্তিত্ব সম্পর্কে লিন্ডসে আরো উল্লেখ করেন, "তারা নিজস্ব ধারণায় পুরোপুরি স্বাধীন। আমি রাজা ও প্রধান ব্যক্তিদের সাথে প্রায়শ পূর্বে যোগাযোগ করে সাক্ষাৎ করেছি, কিন্তু একেবারে সমভাবে তা সম্ভব হয় নি, কিছু ক্ষেত্রে তারা সাক্ষাৎ দানে অস্বীকার করে। তারা আমাকে কোনো উচ্চ পর্যায়ের মর্যাদা দেয় নি এবং নিজেদের

পরিণাম সম্পর্কে তারা ছিল নাছোড়বান্দা (tenacious)।"[৪৫] লিন্ডসের মতে, ব্যবসার উদ্দেশ্যে পাহাড়ী সমাজে অনুপ্রবেশ করা তাদের স্বাধীন মর্যাদা ক্ষুণ্ন না করে সম্ভব ছিলনা। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র খাসি জনগোষ্ঠীকে কোম্পানি সরকারের আওতাধীনে আনার জন্য সীমিত পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং তা পাহাড়ী জনগণের তাৎক্ষণিক প্রতিরোধের কারণ হয়।

খাসিরা পশ্চিমে পান্দুয়া থেকে পূর্বে লাউর পরগনা পর্যন্ত সমতলের জমিদারদের সাথে আঁতাত করে এবং কোম্পানির রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়াকে নাজেহাল করে।[৪৬] খাসি জনগোষ্ঠীর সংহতি বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে সরকার সফলতার সাথে চীফদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি করে এবং তাদের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্র তৈরি করে। ১৭৮৩ থেকে ১৭৯০ সাল পর্যন্ত খাসি জনগোষ্ঠীকে তাদের অধিকৃত সমতল ভূমি থেকে বের করে পাহাড়ের দিকে ঠেলে দেয়ার উদ্দেশ্যে অনেকগুলো সামরিক অভিযান পরিচালিত হয়। তাদের নিজস্ব ভূমি থেকে তাড়িয়ে পাহাড়ে উদ্বাস্তু করার পর আপোস-মীমাংসার দ্বার উন্মুক্ত করা হয় এবং বলা হয় যে "তারা শান্তিপূর্ণ আচরণ সাপেক্ষে কোম্পানির এলাকায় ব্যবসার উদ্দেশ্যে খোলাখুলি আদান-প্রদান করতে পারবে; তাদেরকে সশস্ত্রভাবে চলার অনুমতি প্রদান করা হবেনা; এবং যদি তারা কোম্পানির চৌহদ্দিতে শত্রুতাপূর্ণ আচরণ করে অথবা তাদের এলাকায় আক্রমণ চালায়, তবে ব্যক্তিগত শত্রু ও অনধিকারপ্রবেশকারী হিসেবে তাদের শাস্তি প্রদানের নির্দেশসহ তাদের অঞ্চলে তৎক্ষণাৎ সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করা যাবে।"[৪৭] খাসি প্রতিরোধ আন্দোলনের নায়ক ছিলেন গঙ্গা শাহ, যাঁকে বৃটিশ বাহিনী বন্দি করে। কোম্পানিকে অবজ্ঞা করার দায়ে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে তাঁকে মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করা হয়।

### চাকমা প্রতিরোধ

খাসি ভূমির ন্যায় পার্বত্য অঞ্চলেও ব্যবসা ও রাজস্ব বৃদ্ধির সম্ভাবনা কোম্পানি রাষ্ট্রকে চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করে এবং পার্বত্য জনগোষ্ঠী চাকমাদের অনুরূপ প্রতিরোধের সম্মুখীন করে। চাকমারা মুগলদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ছিল, কারণ মুগল শাসনে সূতার বিনিময়ে রাজস্ব প্রদান ব্যতিরেকে তাদের কাছ থেকে আর কোন কিছু দাবি না করে তাদেরকে পুরোপুরি স্বাধীনভাবে নিজস্ব জীবন যাপনের অনুমতি দেয়া হতো। ১৭৩৩ সালে চাকমা চীফ শেরমস্ত খান পার্বত্য এবং চাষাবাদযোগ্য চাকলা রাঙ্গুনিয়া অঞ্চলের জমিদারিসনদ লাভ করেন এবং জমিদার হিসেবে চাকমা চীফ সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে আসেন। ঔপনিবেশিক সরকার স্বায়ত্তশাসনের পুরনো নীতি বাতিল করে

৪৫. Lindsay's 'Report on Khasis', 14 December 1787. cited in Nisith Ranjan Ray (ed.), *Challenge : A Saga of India's Struggle for Freedom* (New Delhi 1984, 133.

৪৬. Collector of Sylhet, Willes, to Governor General Cornwallis, 18 November 1789, cited in ঐ, 135.

৪৭. খাসি জনগোষ্ঠী ও কোম্পানির দ্বন্দ্বের ব্যাপারে সিলেটের জেলা কালেক্টর এবং সপরিষদ গভর্নর জেনারেল ও রেভিনিউ বোর্ডের মধ্যে অনেক চিঠির আদানপ্রদান হয়। দেখুন, ঐ, 134 139, 12.

চাকমাদেরকে সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালায়। তাদেরকে নগদ রাজস্ব প্রদান করতে বলা হয়। রাঙ্গুনিয়া জমিদারিতে খাজনার হার বৃদ্ধি করা হয়। যখন চাকমা রাজা জুয়ান বক্স বর্ধিত খাজনা প্রদান করতে অস্বীকৃতি জানালেন, তখন রাঙ্গুনিয়া এস্টেটকে কলকাতার এক বানিয়ার নিকট ইজারা দেয়া হয়। রাজার খাজনামুক্ত ভূমিসমূহ পুনর্দখল (resumed) করা হয়। এসব পদক্ষেপ পাহাড়ী জনগোষ্ঠীকে এত বেশি ক্ষুব্ধ করে যে ১৭৭৬ সালে তারা বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং রাজার দীউয়ান রানু খানের নেতৃত্বে স্বাধীনতা ঘোষণা করে।[৪৮]

সাংগঠনিকভাবে রানু খান গেরিলাকৌশল অবলম্বন করেন। তাদের যুদ্ধকৌশল ছিল আঘাত করে সরে পড়া (hit-and-run)। রানু খান ছিলেন সামরিক সর্বাধিনায়ক। তাঁর অধীনে বেশ ক'জন সেনাপতি (commander) ছিলেন। আবার তাঁদের নিয়ন্ত্রণে ছিল পালোয়ান নামে সৈনিকরা, যাদের অধিকাংশ কুকী গোষ্ঠী থেকে সংগ্রহ করা হয়। দাপ্তরিক বিবরণী ইঙ্গিত দেয় যে জুয়ান বক্স এবং রানু সমগ্র পার্বত্য অঞ্চলকে বৃটিশ শাসনমুক্ত করেন এবং তদুপরি তাঁদের অধিকৃত এলাকা সমগ্র রাঙ্গুনিয়া ও সমতলসংলগ্ন অন্যান্য এলাকাতেও সম্প্রসারিত করেন। পূর্বতন জমিদারি রাঙ্গুনিয়া অঞ্চলের উপর তাদের আক্রমণের মূল চাপ কেন্দ্রীভূত ছিল। ১৭৭৭ থেকে ১৭৮১ সাল পর্যন্ত বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় কর্মকর্তাদের নেতৃত্বে তিনটি পূর্ণাঙ্গ সামরিক অভিযান প্রেরিত হয়, কিন্তু বিদ্রোহীদের পরাভূত করার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। প্রতিরোধী চাকমাদের বিরুদ্ধে ব্যর্থ অভিযানের বর্ণনা দিয়ে চট্টগ্রাম কর্তৃপক্ষ গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসকে লিখে :

> "... যেহেতু এই লোককে (রানু খান) সর্বদা মর্যাদাহীন এবং বিবেচনার অযোগ্য ব্যক্তি বলে গণ্য করা হয়েছে, আমি আশা করেছিলাম যে তাকে আটক করে অবিলম্বে তার অশুভ উদ্দেশ্য এবং কর্মকাণ্ডের সমাপ্তি ঘটাতে সক্ষম হবো, কিন্তু আমার কর্মসূচি ব্যর্থ প্রমাণিত হয়। লোকটি নিজস্ব বাসভূমি থেকে পালিয়ে যায় এবং তার বিরুদ্ধে প্রেরিত ৫০ জন সিপাহি প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়, তারা শত্রুকে অনুসরণ করে এবং দুই বা তিনটি পাহাড় ও গ্রাম দখল করে এবং জ্বালিয়ে দেয়, যেখানে তারা অগ্রবর্তী ছিল; এটি তাকে বশে আনতে পর্যাপ্ত ছিলনা; সে আরো অধিক সংখ্যক লোক জড়ো করে, তারা তেমন সশস্ত্র না থাকলেও অভিযানকালে কিছু সিপাহিকে হয়রানি করে। এ পরিপ্রেক্ষিতে সেনাপতি (Commanding Officer) ক্যাপ্টেন এলারকার গতকাল অতিরিক্ত বাহিনী প্রেরণ যথাযথ বিবেচনা করেন, যার ফলে নিয়োজিত সিপাহির সংখ্যা দাঁড়ায় সর্বমোট ১১৫ জন, যাদেরকে বাধাদান করে বিপুল সংখ্যক কুকী উপজাতির লোক। এদেরকে ডেকে এনেছে রুনু কন (Runoo Cawn)। এরা বাস করে পাহাড়ের অনেক অভ্যন্তরে। এরা অস্ত্র ব্যবহার করতে জানে না এবং এদের দেহ থাকে অনাবৃত।"[৪৯]

৪৮. চাকমা প্রতিরোধ আন্দোলন সম্পর্কে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, Sirajul Islam, "Tribal Resistance in Chittagong Hill Tracts (1776-87)"; Nishith Ranjan Ray et. al (ed.), *Challenge* 122-128.

৪৯. Chittagong Council to Warren Hastings, 25 September 1775, in Sirajul Islam (ed.), *Chittagong District Records*, vol. 1 (Dhaka 1978), 239.

সিলেটে যখন চাকমাদের প্রতিরোধ চলছিল, তখন এ প্রতিরোধ মোকাবেলার উদ্দেশ্যে প্রথমে সমতলের পরগনা থেকে পাহাড়ী জনগোষ্ঠীকে তাড়িয়ে এ এলাকাকে তাদের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করার এবং তারপর দীর্ঘস্থায়ী মীমাংসার জন্য আলাপ-আলোচনার পদক্ষেপ নেয়া হয়। কিন্তু যখন চাকমা নেতা কোম্পানির সাথে সমঝোতায় আসতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন, তখন আরো কঠোর ও অমানবিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সব ধরনের দ্রব্য, যেমন শুকনো মাছ, লবণ, মৃন্ময় দ্রব্য, লৌহ দ্রব্য, মুদি দ্রব্য, মশলা ইত্যাদির সরবরাহ বন্ধ করে দেয়া হয়, যেগুলোর উপর পাহাড়ী জনগণ পুরোপুরি নির্ভরশীল ছিল। এ অবরোধ খুব বেশি সফল হয় নি, কারণ বিদ্রোহী বাহিনী অন্যান্য স্থান থেকে বিকল্প সরবরাহের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়। আবার যখন সিলেটে বিদ্রোহ বিস্তারলাভ করে, তখন চট্টগ্রাম কর্তৃপক্ষ বিদ্রোহীদের নেতাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালায় এবং এদের এক জনের পক্ষ নিয়ে অন্য জনকে পরাভূত করতে সচেষ্ট হয়। গুপ্তচরের মাধ্যমে চাকমা চীফ জুয়ান বক্সের মনে এমন ধারণা সৃষ্টি করা হয় যে রানু খান ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠছে এবং শীঘ্রই তিনি রাজাকে বহিষ্কারের উচ্চ অভিলাষ নিয়ে আঘাত হানবেন। এ কৌশলে কাজ হয়। রানু খানের অগোচরে জুয়ান বক্স সরকারের সাথে গোপন আলোচনা শুরু করেন, যার ফলে গভর্নর জেনারেল জুয়ান বক্সকে কলকাতায় গিয়ে রাজনৈতিকভাবে বিরোধ মিটিয়ে ফেলার জন্য আমন্ত্রণ জানান।[৫০]

১৭৮৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জুয়ান বক্স কলকাতায় যান এবং সরকারের সাথে এক চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এতে বলা হয়, কোম্পানি সরকার তাঁকে বৈধ চীফ হিসেবে স্বীকৃতি দেবে এবং তিনি স্বাধীনভাবে তাঁর এলাকা শাসন করবেন। আরো ঐকমত্য হয় যে জুয়ান বক্স রাঙ্গুনিয়া পরগনায় তাঁর জমিদারিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবেন এবং অন্যান্য জমিদারের মতো কোম্পানি রাষ্ট্রের একজন জমিদার হিসেবে দেশের সাধারণ আইনের আওতাভুক্ত হবেন।[৫১] রানু খান, যিনি এ যাবৎ প্রতিরোধ আন্দোলনের চূড়ান্ত সামরিক নেতা ছিলেন কিন্তু রাজা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হন, তিনি নির্জন স্থানে গমন করেন এবং তাঁর সম্পর্কে আর কিছু শোনা যায় নি।

## সাঁওতাল প্রতিরোধ

ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়ায় উপজাতীয় জনগণের মধ্যে যারা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং বিদ্যমান সমস্যার প্রেক্ষাপটে সবচেয়ে সংগঠিত প্রতিরোধ গড়ে তোলে, তারা হচ্ছে সাঁওতাল জনগোষ্ঠী। ১৮৫৫ সালে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তারা প্রচণ্ড প্রতিরোধ সংগঠিত করে, যে শাসন তাদের সংস্কৃতি ও নিজস্ব জীবনপ্রণালীর প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। এ প্রতিরোধের বেশ কিছু কারণ নরহরি কবিরাজ যথার্থভাবে চিহ্নিত

৫০. Proceedings of the Committee of Revenue, 28 March 1785, *Chittagong District Records*, vol 509 (National Archives of Bangladesh)

৫১. Board of Revenue Proceedings, 29 March 1787.

করেছেন। কারণগুলো হলো—"মহাজনের নিপীড়ন, জমিদারের অত্যাচার, সরকারের বর্ধিত খাজনা আরোপ, ইউরোপীয় রেলওয়ের ঠিকাদার কর্তৃক বলপ্রয়োগে শ্রমিক খাটানো, মাঁঝি (manjhi) ও পরগনাইত (parganait)-এর অধিকার হ্রাসকরণ ইত্যাদি।"[৫২]

সাঁওতাল সমাজকাঠামোতে শাসক এলিটশ্রেণী ছিল মাঁঝি (manjhi) নামে বংশগত শ্রেণী, যার পরে ছিল পরগনাইত বা পরগনাপ্রধানগণ। তাদের আধিপত্য আধুনিক রেলব্যবস্থা, শ্রমব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ দ্বারা হুমকির সম্মুখীন হয়। উক্ত শাসক শ্রেণী অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্ত নিম্নবর্ণভুক্ত উপজাতিকে (ডোম, বাউরি, লোহার, গোয়াল ইত্যাদি) সাথে নিয়ে বৃটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং বিরভূম জেলা ও ভাগলপুর সংলগ্ন পরগনাগুলোর উপর দরিদ্র মানুষের শাসন (poor man's raj) প্রতিষ্ঠা করে।[৫৩] বিদ্রোহীরা বৃটিশদের শান্তি প্রস্তাব তখনই মেনে নেয়, যখন ঐতিহ্যবাহী স্বায়ত্তশাসনের মর্যাদা সহ তাদের সকল দাবি সরকার পূরণ করে।

## কৃষক প্রতিরোধ

মুগলদের ছিল একটি প্রধানত কৃষিভিত্তিক সাম্রাজ্য এবং তার অধীনে ছিল প্রধান উৎপাদকগোষ্ঠী হিসেবে রায়তগণ, যারা রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিশেষ মর্যাদা ভোগ করতো। যদিও জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত কৃষি-উদ্বৃত্তের প্রায় সবটুকুই করের আকারে আদায় করা হতো, তথাপি রায়তদেরকে নিপীড়ন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ভিক্ষ এবং অভাব-অনটন থেকে নিস্তার লাভের জন্য বিশেষ কিছু সুবিধা ভোগের অনুমতি দেয়া হয়। মুনাফাশিকারি ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র দুঃসময়ে খাজনা মওকুফ এবং টাকভী ঋণের মতো কোন সুবিধা প্রদান ছাড়াই সকল কৃষকের উদ্বৃত্ত আদায়ে বদ্ধপরিকর ছিল। সরকারের ভূমিনীতি প্রজাদেরকে সরকারি প্রতিনিধি তথা ভূস্বামীদের শোষণের শিকারে পরিণত করে। যে ঐতিহ্যবাহী গ্রামপঞ্চায়েত প্রথাগতভাবে গ্রামে আইন-শৃঙ্খলা তদারক করতো, তার জন্য সরকারি সহায়তা প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। বিচ্ছিন্ন (alienated) গ্রামসমাজ তখন অসহায়ভাবে রাষ্ট্র ও তার প্রতিনিধি, যেমন জমিদার, তালুকদার, ইজারাদার, বানিয়া, ব্যবসায়ী, একচেটিয়া কারবারি, আমলা প্রভৃতির শোষণের শিকার হয়। কৃষক সমাজ বিভিন্ন সময়ে এদের বিরুদ্ধে এবং এদের মাধ্যমে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

কৃষক বিদ্রোহকে এর অন্তর্নিহিত কারণগুলোর প্রকৃতি অনুসারে তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। কারণগুলো হচ্ছে : (১) কৃষকদের খাজনা ও অধিকার সংক্রান্ত নীতি বা

৫২. Narahari Kaviraj, "Peasant and Adhivasi Uprisings": Nishith Ranjan Ray et. al. (ed.), *Challenge*, 116.

৫৩. সাঁওতাল বিদ্রোহের উপর পূর্ণাঙ্গ আলোচনার জন্য সর্বোৎকৃষ্ট উৎস হচ্ছে নরহরি কবিরাজ রচিত গ্রন্থ, *The Santhal Rebellion, Problems of National Liberation*, Vol IV, No. 1

প্রথা লঙ্ঘন; (২) প্রচলিত খাজনার হার অগ্রাহ্য করে যুক্তিহীনভাবে খাজনার হার বৃদ্ধিকরণ; এবং (৩) কৃষিশ্রম শোষণ। উপরোক্ত তিন পর্যায়ের বিদ্রোহ থেকে আমরা উদাহরণ হিসেবে মাত্র একটি (typical) কৃষক বিদ্রোহের উল্লেখ করবো।

## রংপুর কৃষক বিদ্রোহ

১৭৭২-১৭৭৭ সালের পঞ্চবর্ষব্যাপী ভূমিরাজস্ব বন্দোবস্ত এবং সে সময় থেকে বাৎসরিক বন্দোবস্তের অধীনে ভূমি সর্বোচ্চ নিলামে ইজারা দেয়ার পদ্ধতি কৃষকদের স্বার্থে এক বিধ্বংসী আঘাত ছিল। প্রথাগতভাবে রায়তগণ পরগনা নিরিখ অনুসারে ভূমিকর প্রদান করতো এবং তা বংশগত জমিদারদের দ্বারা সংগ্রহ করা হতো, যাদের সরকারি অনুমোদন ব্যতিরেকে পরগনা নিরিখ পরিবর্তনের অধিকার ছিলনা। স্পষ্টত রাজস্ব প্রদানকারী কৃষকদের (revenue farmers) প্রধান লক্ষ্য ছিল মুনাফা অর্জন করা। চুক্তি অনুসারে সরকারি রাজস্ব সংগ্রহের জন্য ও নির্ধারিত রাজস্বের অতিরিক্ত মুনাফার জন্য এসব কৃষক বাধ্য হয়ে পরগনা নিরিখ অগ্রাহ্য করে, রাজস্বহার বৃদ্ধি করে এবং অবৈধভাবে আবওয়াব (abwab) বা কর সংগ্রহ করে। এতে অতিরিক্ত করভারে ভারাক্রান্ত রায়তেরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়। অনেক স্থানে তারা নিষ্ক্রিয় এবং কোন কোন সময় সক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং নির্ধারিত হারের অতিরিক্ত কর প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়।

## রংপুর বিদ্রোহ

যাহোক, ১৭৮৩ সালে রংপুরে রায়ত-অসন্তোষের সবচেয়ে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষকে কম্পিত করে তোলে। এটা ছিল কলকাতার এক রাজস্ব ইজারাদার দেবী সিংহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। দেবী সিংহ রাজস্বহার বৃদ্ধি করেন এবং পরিবর্তিত হারে প্রজাদের খাজনা দিতে বাধ্য করেন। অধিকন্তু, তিনি কৃষকদেরকে দেরিনউইলা (Derinwilla) নামে নতুন কর (abwab) দিতে নির্দেশ দেন। এ ব্যবস্থা বিলম্বে করপ্রদানকারীদের উপর আরোপ করা হয়। আরেকটি নতুন আবওয়াব, যা প্রজাদের দিতে হতো, তা হলো হুন্দিয়ান (Hundian) বা অর্থ বিনিময় ও প্রেরণ সংক্রান্ত কর। দেবী সিংহের গোমস্তারা নিজেদের ভোগের জন্য প্রজাদেরকে আবওয়াব পরিশোধে বাধ্য করে।

দেবী সিংহ ক্ষুদে স্থানীয় জমিদারদের কাছ থেকে রাজস্ব সংগ্রহকারী এক ইজারাদার ছিলেন। উক্ত ভূমালিকগণ দেবী সিংহ ও কোম্পানি বাহাদুরের বিরুদ্ধে নির্যাতিত প্রজাদের পক্ষে নেতৃত্ব দেন। সাধারণ প্রজাদেরকে বর্ধিত হারে রাজস্ব দিতে নিষেধ করা হয় এবং ফলে উৎসাহী প্রজারা দেবী সিংহকে কোন রাজস্ব প্রদান করে নি এবং সেই সাথে তাঁকে রংপুর ও দিনাজপুরে অবাঞ্ছিত (undesirable) ব্যক্তি ঘোষণা করে।[৫৪]

৫৪. রংপুর প্রজা বিদ্রোহের উপর বিস্তারিত দেখুন, Narahari Kaviraj, *A Peasant Uprising in Bengal, 1783* (New Delhi 1972).

১৭৮৩ সালের জানুয়ারি মাসে বামনডাঙ্গা ও তেপাহ পরগনায় বিদ্রোহ শুরু হয় এবং তা শীঘ্রই অন্যান্য পরগনায় ছড়িয়ে পড়ে। সব স্থানেই প্রজারা 'ইজারাদার দেবী সিংহের মুণ্ডু চাই' স্লোগান দেয়। এ যাবৎ দেবী সিংহের গোমস্তাদের দ্বারা আটককৃত সকল খেলাপী প্রজাকে মুক্ত করা হয় এবং এ প্রক্রিয়ায় ইজারাদারের অনেক প্রতিনিধি নিহত হয়। এ বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন প্রথমে ধীরাজনারায়ণ নামে এক ক্ষুদে ভূস্বামী এবং পরবর্তীতে নূরুল-আল-দীন, যিনি নিজেকে দেশের 'নবাব' হিসেবে আখ্যায়িত করেন। দয়াশীল নামে আরেকজন ক্ষুদে ভূস্বামী (petty landholder) তাঁর দীউয়ান বা ডেপুটি ছিলেন। তাঁরা দু'জনেই লেফটেন্যান্ট ম্যাকডোনাল্ডের নেতৃত্বে সরকারি বাহিনীর সাথে সামরিক সংঘর্ষে নিহত হন। সৈন্যরা অনেক গ্রাম ভস্মীভূত করে দেয়। আতঙ্কিত ও ভীত প্রজারা পরে আত্মসমর্পণ করে এবং সরকারি শর্তাবলী মেনে নেয়। শর্তের একটি বিষয় ছিল, সকল খাজনা বর্ধিতকরণ বাতিলযোগ্য হবে ও সংগৃহীত খাজনা ফেরত দেয়া হবে এবং আগামীতে কৃষকদের স্বার্থ বিবেচনা না করে খাজনার হার বৃদ্ধি করা হবে না। বিদ্রোহে সক্রিয়ভাবে জড়িত প্রজাদেরকে সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়।

### নীল বিক্ষোভ (Indigo Disturbances)

কোম্পানিশাসনে অনেক অর্থকরী ফসল প্রবর্তন করা হয়, যেগুলোর একটি হলো নীল—এক জাতীয় রঙীন গাছ। রাজস্ব পরিশোধের জন্য কৃষকদের নগদ অর্থের প্রয়োজন ছিল এবং নীল চাষ তাদেরকে এই নগদ অর্থ লাভের উত্তম সুযোগ এনে দেয়। এই শস্য প্রাচীনকাল থেকে ঘরোয়াভাবে (domistically) উৎপাদিত হতো। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ইউরোপীয়দের দ্বারা তা বাজারজাত করা হতো এবং ১৮২০-এর দশক থেকে ব্যাপক আকারে এর চাষ সম্প্রসারিত করা হয়। ১৮২৯ সাল নাগাদ যখন ইউরোপীয় আবাদকারীগণ (planters) প্রথম বারের মতো গ্রামাঞ্চলে জমিদারি ব্যবস্থার অধিকারী হয় এবং কর্তৃত্ব অর্জন করে, তখন নীলচাষীরা এ আবাদে খুশী হয়, কারণ নীল খামারে সহনীয় শ্রমের বিনিময়ে তারা নগদ অর্থ লাভ করে। কিন্তু এ সম্পর্কটি বেনটিঙ্ক-এর শাসনামলে পরিবর্তিত হয়। মজুরিশ্রমিক দ্বারা নীল উৎপাদনের কৌশল নীলের রায়তী আবাদ অধিকভাবে চালু করে। নীলকরগণ (Indigo planters) এস্টেটসমূহের মালিক ছিলেন এবং তারা প্রজাদেরকে ক্রমবর্ধমান হারে অসুবিধাজনক শর্তে নীল চাষে বাধ্য করতেন। যতদিন পর্যন্ত নীল যথেষ্ট মুনাফা অর্জনকারী খাত ছিল, নীলচাষীরাও উচ্চ মজুরিহারের ভাগ পেত। কিন্তু ১৮৪০ এবং '৫০-এর দশকে বিশ্বে নীলের বাজারে ভয়ানক মন্দা দেখা দেয় এবং ফলশ্রুতিতে নীলরায়তদের মুনাফাও কমে যায়। ১৮৫০-এর দশকের শেষ দিকে প্রজাদের জন্য নীলচাষ লোকসানের খাতে পরিণত হয়। হিসাব করা হয়েছিল যে এক বিঘায় নীল চাষ করতে প্রজারা ২ থেকে ৩ রূপী খরচ করতো এবং উৎপাদিত শস্যের জন্য নীলকরদের কাছ থেকে প্রায় সমান অথবা কম অর্থ লাভ করতো। প্রজারা ঐ শস্য উৎপাদনে আইনত বাধ্য ছিল, কারণ নীলকরদের কাছ থেকে তারা যে অগ্রিম নিত তা

কদাচিৎ তারা পরিশোধ করতে পারতো। হিসাববইতে তাদের বকেয়া পুঞ্জীভূত হতো। এ পরিপ্রেক্ষিতে শস্য উৎপাদনে অনাগ্রহী রায়তদেরকে আদালতে অভিযুক্ত করার হুমকি দেয়া হতো, যা ছিল সম্পূর্ণরূপে নীলকরদেরই প্রভাবাধীন। নীল ক্রমান্বয়ে দমন ও ভীতি প্রদর্শনের প্রতীকে পরিণত হয়। ১৮৫৯ সালে বাংলায় প্রায় ৫০০ নীলকর ১৪৩ টি নীলক্ষেতের মালিক ছিল এবং এগুলোর অধিকাংশই নদীয়া ও যশোর জেলায় অবস্থিত ছিল। এবং এ দুই জেলা থেকেই সবচেয়ে হিংস্র বিদ্রোহ শুরু হয়। এর নেতৃত্ব দেন প্রধানত জমিদার এবং মধ্যগ (intermediate) ভূমালিক ও ধনী কৃষকগণ, যারা ক্ষমতাকাঠামোতে নীলকরদের প্রতিপক্ষ ছিলেন।

মুর্শিদাবাদ জেলার আওরঙ্গাবাদ কুঠি থেকে প্রথম বিদ্রোহ শুরু হয় এবং শীঘ্রই তা সকল নীল জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। লেফটেন্যান্ট গভর্নরের জন্য প্রস্তুতকৃত এক বিশেষ প্রতিবেদনে বিদ্রোহের সাংগঠনিক কাঠামোর নিম্নোক্ত বিবরণ প্রকাশ করা হয়েছে :

> নীলচাষের বিরুদ্ধে নিয়মিত এক লীগ (league) প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই এতে শপথ গ্রহণ করে। ঢোল বাজিয়ে এক গ্রামের রায়তদেরকে অন্য গ্রামের রায়তদের সহায়তা দানের আহ্বান জানানো হয়। বলা হয় যে যদি তারা নীলকরদের ভৃত্য প্রভৃতির দ্বারা উৎপীড়িত হয় এবং তাদেরকে নীলচাষ করতে বাধ্য করা হয়, তবে তারা বিরোধিতা করবে; সংকেত প্রেরিত হয় ও চাঁদা তোলা হয়; ঢোলের আহ্বানে গ্রামবাসীরা বেরিয়ে আসে এবং সশস্ত্র অবস্থায় বড় দলভুক্ত হয়ে হুমকিগ্রস্ত স্থানের দিকে অগ্রসর হয়; প্রকৃত পক্ষে তারা নিজেদের পদ্ধতিতে সবকিছু করে, পুলিশরা ভীত হয় এবং রায়তদের দ্বারা পরাভূত হয়।[৫৫]

১৮৬৩ সালের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে নীল বিদ্রোহ প্রশমিত হয়। ঐ সময় অনেক নীলকর তাদের কর্মকাণ্ড বন্ধ করে দেয় এবং তাদের এস্টেট বিক্রি করে দেয়। কিন্তু বাংলায় নীল পুরোপুরি বিলুপ্ত হয় নি। অনেক নীলকর খাজনা হ্রাস করে এবং ভদ্র আচরণ করে প্রজাদের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা করে। কিন্তু নীলের বাজার দ্রুত হ্রাস পায়। বিশ্ববাজারে নীলের চাহিদার ব্যাপক পরিবর্তনের কারণে নীলকরগণ বাংলায় একের পর এক তাদের ব্যবসা গুটিয়ে নিতে থাকায় কৃষকগণ স্বস্তি বোধ করে।[৫৬]

## পাবনা কৃষক বিদ্রোহ

নীল বিদ্রোহের পর দুই দশক ধরে অব্যাহত শান্তি বিরাজ করে। কৃষক সমাজ তাদের নিজস্ব ক্ষুদ্র গণ্ডিতে সুখে বাস করছিল বলে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু ১৮৭০ এবং '৮০-এর দশকে প্রজাগণ পুনরায় প্রতিরোধমুখী হয়ে উঠে। ১৮৬০-এর দশকে কৃষিপণ্যের মূল্য বৃদ্ধি

---

৫৫. Judicial Proceedings, 432-435, June 1860 (B-Proceedings).

৫৬. নীল বিদ্রোহের উপর উত্তম উৎসগুলোর কয়েকটি : Blair B. King, *The Blue Mutiny*, (Philadelphia 1966); Chittabarata Palit, *Tensions in Bengal Rural Society* (Calcutta 1975); *Report of the Indigo Commission* (Calcutta 1860).

এবং ভূমির উপর বাড়তি জনসংখ্যার চাপের ফলে ভূমালিকরা (landowners) খাজনার হার বৃদ্ধিতে তৎপর হয়। কিন্তু রায়তগণ পরগনা নিরিখ অনুযায়ী খাজনা প্রদানে তাদের রীতিসিদ্ধ অধিকারের উপর জোর দেয়। ১৮৭০ থেকে দুই দশকের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে কৃষক বিদ্রোহ লক্ষ্য করা যায় সুন্দরবনের তুষখালিতে (১৮৭২-৭৫), নোয়াখালীর ছাগলনাইয়ায় (১৮৭৪), উপ-পার্বত্য ময়মনসিংহে (১৮৭৪-৮২), ঢাকার মুন্সিগঞ্জে (১৮৮০-৮১) এবং মেহেদীগঞ্জে (১৮৮০-৮১)।

সবচেয়ে প্রচণ্ড কিন্তু ব্যাপকভাবে অহিংস ও সুসংগঠিত ছিল ১৮৭৩ সালের পাবনা কৃষক বিদ্রোহ। পাবনার জমিদারগণ, যারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রাক্কালে নিলামক্রেতা হিসেবে ভূমি নিয়ন্ত্রণকারী ছিলেন, তারা প্রায় সকলেই ছিলেন অনাবাসিক (non-resident)। সময়ে সময়ে খাজনা বৃদ্ধি করা ছাড়াও ভূমালিকরা সকল ধরনের আবওয়াব (abwab) সংগ্রহ করতেন। যখন অহরহ খাজনা বৃদ্ধি ও অবৈধ আবওয়াব সংগ্রহ থেকে বিরত থাকার জন্য আবেদনে কাজ হলোনা, তখন ক্ষুব্ধ প্রজারা ১৮৭৩ সালে খোলাখুলিভাবে অমান্য আন্দোলন শুরু করে। অমান্য আন্দোলন ও বিক্ষোভ প্রথমে সিরাজগঞ্জে শুরু হয়। শীঘ্রই তা অন্যান্য পরগনা ও জেলায় ছড়িয়ে পড়ে।

রায়তরা নিজেদেরকে সুস্পষ্ট নেতৃত্বের অধীনে বিভিন্ন জোট ও লীগে সংগঠিত করে।[৫৭] আইনসম্মত যুদ্ধ করা ও সার্বক্ষণিক লাঠিয়াল বাহিনী পরিচালনার জন্য সংগঠকগণ সমগ্র কৃষক সম্প্রদায়ের নিকট থেকে চাঁদা সংগ্রহ করে। গ্রামে গ্রামে গিয়ে তারা নিজেদের দাবির ব্যাপারে জনগণকে অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা চালায়। এক গ্রামে সফল হলে তারা অন্য গ্রামের দিকে অগ্রসর হয়। এভাবে প্রচারণা ও উদ্বুদ্ধকরণের ফলে সমগ্র জেলা কৃষক লীগসমূহের সমর্থকে পরিণত হয়। প্রথম দিকে নেতৃত্ব প্রদান করেন দৌলতপুরের এক ক্ষুদে ভূস্বামী—ঈশ্বর চন্দ্র রায়। শীঘ্রই জগতুলার খুদি মোল্লা নামে এক মুসলমান জোতদার জোটগুলোর মধ্যে ব্যাপক প্রভাবশালী নেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি কৃষকদের মধ্যে 'প্রধানমন্ত্রী' হিসেবে পরিচিত হন। পরবর্তীতে আরেকজন কৃষকনেতা খ্যাতি লাভ করেন। তিনি হলেন ষোলঘরের চন্দ্রনাথ মজুমদার। এটি ছিল প্রকৃতপক্ষে অনাবাসিক জমিদারদের সাথে সাধারণ কৃষক সমর্থিত স্থানীয় ক্ষুদে ভূমালিকদের বৃহৎ প্রতিদ্বন্দ্বিতা। খাজনা প্রদান বন্ধ রাখা হয় যতক্ষণ না বৃহৎ অনাবাসিক জমিদারগণ কৃষকদের এ দাবি মেনে নেন যে ভূমির উপর তাদের অধিকার রয়েছে এবং বিনা কারণে ভূমালিকদের খাজনা বৃদ্ধির কোনো অধিকার নেই। এ ধারণা কৃষকদের মধ্যে সাধারণভাবে বিরাজ করছিল এবং এ ধারণা পোষণে তারা কোনো বিমূর্ত তত্ত্ব দ্বারা পরিচালিত হয় নি, বরং রীতিসিদ্ধ অধিকারের ব্যাপারে তাদের সচেতনতাই এর মূলে ক্রিয়াশীল ছিল। গ্রামাঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এবং ভূস্বামী ও কৃষকদের মধ্যকার

৫৭. কে. কে. সেনগুপ্ত তাঁর পুস্তক ও প্রবন্ধে কৃষকদের সাংগঠনিক কাঠামো অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। দেখুন, তাঁর রচিত গ্রন্থ *Pabna Disturbances and the Politics of Rent* 1873-1885 (New Delhi 1974); আরো দেখুন, "Agrarian League of Pabna", *Economic and Social History Review*, 7:2 (1970), 253-69.

সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য ১৮৮৫ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সংবিধানে ঈষৎ পরিবর্তন করে ১৮৮৫ সালে এক নতুন প্রজাস্বত্ব আইন প্রণীত হয়। এভাবে ১৮৮৫ সালের বাংলা প্রজাস্বত্ব আইন কেবল অনেকের কল্পিত কোনো উদারপন্থী তত্ত্ব নয়, বরং তার চেয়ে অধিক পরিমাণে কৃষক বিদ্রোহের ফলশ্রুতি ছিল।

## সমাপনী মন্তব্য

বৃটিশ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র গঠনে জনগণের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কিত আমাদের উপরোক্ত জরিপে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে পূর্বতন অন্যান্য শাসনের মতো বৃটিশ শাসনও প্রজাসাধারণের কাছ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন লাভ করে নি, বরং আমরা লক্ষ্য করি যে নতুন শাসককে জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে। তাদের প্রত্যাখ্যান নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয় প্রতিরোধের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। নতুন শাসকগোষ্ঠী ভিনদেশী ছিল বলেই জনগণ তাদের প্রত্যাখ্যান করে নি, তারা কখনো তাদের শাসকদের জাতি বা বংশ (race) নিয়ে উদ্বিগ্ন হয় নি, বরঞ্চ তাদের প্রতিবাদের কারণ ছিল এই যে নতুন শাসক এ দেশ শাসনকালে চিরাচরিত রীতিকে উপেক্ষা করে তাদের রীতিনীতি ও ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে নি। এ শাসক ক্ষমতা ভাগাভাগির প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা, ভূমি নিয়ন্ত্রণ, আইন ও বিচারকে নগ্নভাবে উপেক্ষা করেছে এবং তা সংশ্লিষ্ট সকল স্তর ও পরিস্থিতির জনগণকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে এবং জনগণের এ উদ্বেগ নিষ্ক্রিয় বিরোধিতা থেকে সশস্ত্র প্রতিরোধ পর্যন্ত বিভিন্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এ প্রতিক্রিয়া পূর্বতন শাসকগোষ্ঠী, নৃপাতি-জমিদার, সাধারণ ভূমালিক, ধর্মীয় গোষ্ঠী, উপজাতীয় জনগণ এবং সর্বোপরি কৃষক সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে সমভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

কিন্তু কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার এই যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সরকার ভান করে যে প্রজাসাধারণ তাদের শুভ (benign) শাসনে সুখে-শান্তিতে বসবাস করছে। জনগণের উদ্দেশ্যে প্রচারিত সরকারি প্রতিবেদনে সরকারের এ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। উপরে বর্ণিত প্রতিরোধ আন্দোলন এবং বিদ্রোহকে বৃটিশ জনমতের সম্মুখে সংগঠিত ডাকাত ও লুণ্ঠনকারীদের কর্মকাণ্ড হিসেবে উপস্থাপন করা হয় এবং বলা হয় যে তাদেরকে অবরোধ করে লুণ্ঠন থেকে বিরত রাখা হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে জেমস মিল (James Mill) সহ সমসাময়িক সকল বৃটিশ লেখক আশ্চর্যজনকভাবে স্থানীয় অস্থিরতা ও প্রতিরোধ আন্দোলন সম্পর্কে নিশ্চুপ ছিলেন এবং তাঁরা সকলেই পূর্বতন মুসলিম শাসনকে সর্বনাশা ও বৃটিশ শাসনকে কল্যাণকর হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

আমরা লক্ষ্য করেছি যে উল্লিখিত প্রতিরোধ আন্দোলন ও বিদ্রোহগুলো সকল সময়ে একই ধরনের গঠনপ্রকৃতি ও অংশগ্রহণকারী নিয়ে সংঘটিত হয় নি। ভারতে বৃটিশ শাসন শুরু হওয়ার পূর্ববর্তী ক্রান্তিকালে ক্ষমতাচ্যুত শাসকগোষ্ঠী দ্বারা বিদ্রোহ হয়েছে। বাংলাদেশেও কোম্পানি বাহাদুর স্থানীয় এলিটদের সাথে ক্ষমতা ভাগাভাগি করতে প্রস্তুত

ছিলনা। কাজেই নবাব থেকে শুরু করে নৃপতি-জমিদার পর্যন্ত হতাশাগ্রস্ত এলিট গোষ্ঠী তাদেরকে হটানোর বৃটিশ পদক্ষেপ প্রতিরোধের চেষ্টা করে। মীর কাশিম শৌর্যপূর্ণ প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। তিনি ছাড়া বাকি সকল এলিট সহজেই পরাভূত হন এবং তাঁদের সবাইকে অবসরভাতা দিয়ে অবসর গ্রহণে বাধ্য করা হয়। প্রধান জমিদারদের ভাগ্যেও তদ্রূপ ঘটে। তাঁরা নিজস্ব প্রশাসনিক ও সামরিক ক্ষমতা হারান, কিন্তু অধিক রাজস্ব প্রদান সাপেক্ষে কিছু সময়ের জন্য তাদের জমিদারি টিকিয়ে রাখেন।

১৭৬০-এর দশকের শেষে শাসক অভিজাত শ্রেণী ও নৃপতি-জমিদারদের প্রতিরোধের সমাপ্তি ঘটে। অতঃপর সাধারণ জমিদারদের প্রতিরোধ শুরু হয়। পঞ্চবার্ষিক (১৭৭২) ও দশবার্ষিক (১৭৯০) বন্দোবস্তের রাজস্ব সংক্রান্ত নীতির ফলে তাদের স্বার্থ ও মর্যাদা দারুণভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছিল। ১৭৭২ সালে দীউয়ানি ক্ষমতা রেজা খানের হাত থেকে নতুন শাসকের হাতে চলে যাওয়ার পর কৃষক সমাজ ও ধর্মীয় গোষ্ঠী নতুন শাসকের উৎপীড়ন (pinch) প্রত্যক্ষ করতে শুরু করে এবং উক্ত সময় থেকে কৃষক ও ধর্মীয় গোষ্ঠীর প্রতিরোধ আরম্ভ হয়। ঐ একই সময়কালে উপজাতীয় সম্প্রদায়গুলোকে নতুন শাসকের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে আনা হয় এবং এরই প্রতিক্রিয়ায় তারা প্রতিরোধ গড়ে তোলে। যদিও তাদেরকে স্বাধীনভাবে বসবাসের অনুমতি প্রদান করা হয়, তথাপি তাদের অনেক ঐতিহ্যগত অধিকার খর্ব করা হয়। সর্বশেষ প্রতিরোধ ঘটে বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এক শতাব্দী পর। ১৮৭০-এর দশকে কৃষক বিদ্রোহ সর্বত্র লক্ষ্য করা যায় এবং এই বিদ্রোহ ছিল পরগনা নিরিখ বাতিল করে প্রচলিত খাজনাহার বৃদ্ধির জমিদারি প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে। প্রজারা তখন নিজেদের অধিকার ও দাবি আদায়ের জন্য সংগঠিত হতে থাকে এবং তাদের বিপক্ষে সরকার জমিদারদের পক্ষ নিতে আর আগ্রহী ছিল না। এভাবে ভূস্বামী-কৃষক সম্পর্ক উন্নয়ন এবং পরোক্ষভাবে বৃটিশরাজ ও প্রজাদের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৮৮৫ সালের বিখ্যাত বাংলা প্রজাস্বত্ব আইন প্রণীত হয়।



# বঙ্গবিভাগ (১৯০৫) : হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক*

জন আর. ম্যাকলেন**

১৯০০ সালের পূর্বে বাংলায় প্রতিদ্বন্দ্বী সাম্প্রদায়িক মানসিকতা তুলনামূলকভাবে জনগোষ্ঠীর ক্ষুদ্র অংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সাম্প্রদায়িক মন্তব্য, সংঘর্ষ কিংবা হিংস্রতার স্বল্পতার বিচারেই এ কথা বলা যায়। এর এক বা দুই দশক আগে থেকেই পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ এবং মহারাষ্ট্রে ক্রমবর্ধমান সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার সুস্পষ্ট চিহ্ন লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এই অঞ্চলগুলিতে যদিও সাম্প্রদায়িকতার নেপথ্যে প্রশাসনিক নীতির প্রভাব ছিল, তা সত্ত্বেও সেখানে ব্যাপকভাবে এর জন্ম হয়েছিল ধর্মভিত্তিক সম্প্রদায়গুলির সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের ফলেই। ভাষার প্রশ্নে বিতর্ক, গোহত্যা, ধর্মীয়-সামাজিক উৎসব, পরামর্শসভা ও আইন পরিষদে প্রতিনিধিত্ব, শিক্ষা এবং সরকারি পদে নিয়োগের প্রশ্নে বাংলার তুলনায় অন্য প্রদেশগুলিতে সাম্প্রদায়িকতার মাত্রা ছিল বেশি।

আধুনিককালে সাম্প্রদায়িকতার দৃষ্টিকোণ থেকে বঙ্গভঙ্গের উপর প্রায়ই গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ গঠন, শুরু থেকেই তার বিচ্ছিন্নতার মতাদর্শ এবং ১৯০৭ সালে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা সবই ছিল বঙ্গভঙ্গের রাজনৈতিক স্রোতোধারার সৃষ্টি। আজ পিছনে তাকিয়ে বঙ্গভঙ্গকে আধুনিক সাম্প্রদায়িকতার ইতিহাসে একটি প্রধান বিভাজক হিসেবে চিহ্নিত করা যায় এবং এমন এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করা যায়, যা ১৯৪৭ সালের বাংলা তথা ভারতবিভাগ অপরিহার্য করে তুলেছিল।

* এই প্রবন্ধ ইতিপূর্বে আরো বৃহৎ আকারে Alexander Lipski সম্পাদিত *Bengal East and West* (East Lansing 1970) গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে।

** অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, নর্থ ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটি, ইলিনয়, যুক্তরাষ্ট্র।

বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে মুসলমানদের তাৎক্ষণিক স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য যে মুসলিম লীগের জন্ম হয়েছিল, চূড়ান্ত পর্যায়ে সেই লীগই মুসলমানদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মঞ্চে পরিণত হয়েছিল। অন্যদিকে ১৯০৭ সালে হিন্দুদের উপর মুসলমানদের আক্রমণের অব্যবহিত পরে কংগ্রেস তার কর্মসূচির সপক্ষে জনগণের সমর্থন লাভের প্রত্যাশায় অহিংস পন্থায় বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনায় বাধাদানের প্রচারণা শুরু করেছিল। পরবর্তী চার দশকের বিভিন্ন সময়েই কংগ্রেস এই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি করে। ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যে সীমানা চিহ্নিত করা হয়েছিল তা ছিল মোটামুটিভাবে ১৯০৫ সালের সীমানাবিভক্তিরেখা বরাবর। প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল একটি সাম্প্রদায়িক সীমানা।

'সাম্প্রদায়িকতা' শব্দটিকে এ অধ্যায়ে একটি জনগোষ্ঠীর নিজ স্বার্থকে তাদের ধর্মীয় দলগুলির স্বার্থের সাথে অভিন্ন বলে মনে করার প্রবণতা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এই প্রবণতায় একটি জনগোষ্ঠী অন্য ধর্মীয় গোষ্ঠীর সদস্যদের আচার-আচরণ ও মূল্যবোধকে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ও অস্বাভাবিক বলে মনে করে। এই প্রবণতায় ধর্ম রাজনৈতিক আনুগত্য নির্ধারণ করে এবং অতঃপর এই প্রবণতা বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের সদস্যদের মধ্যে আন্তঃদলীয় সংঘর্ষের সৃষ্টি করে।

বর্তমান প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য হচ্ছে, যে অনুক্রমিক ঘটনাবলী ১৯০৭ সালের হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সৃষ্টি করেছিল এবং মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যকে সংবিধিগত স্বীকৃতি প্রদানের দাবির জন্ম দিয়েছিল, সে ঘটনাবলীতে বৃটিশ ভূমিকা ছিল মুখ্য। মূল বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা এবং পরবর্তীকালে বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন মোকাবেলা—এই উভয় ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য। আধুনিক দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ে যখন সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়েছে, সরকার তখন জনগোষ্ঠীর অভ্যন্তরে সাম্প্রদায়িক অংশগুলির মধ্যে সৃষ্ট উত্তেজনা দূর করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। কিন্তু ১৯০৫-০৯ কালপর্বে বহু ক্ষেত্রেই সরকারি নীতির মূল সুর নিরপেক্ষ ছিল না। বরং সরকারি কর্মকর্তাগণ বঙ্গভঙ্গের ফলে সৃষ্ট সাম্প্রদায়িক আগুনকে আরো উস্কে দিয়েছিলেন। এমনকি এই যুক্তিও প্রদর্শন করা হয় যে, সরকারি নীতি সহিংসতার সূচনা করেছিল। আধুনিক দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসে এমন আরেকটি উদাহরণ খুঁজে পাওয়া কঠিন, যেখানে সরকারি নীতির মতো কেবল একটি উপাদানকে হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষের কারণ হিসেবে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায়।

বঙ্গভঙ্গের আগে বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের উপর সুস্পষ্ট তথ্যের অভাব রয়েছে। তার একটি কারণ হয়তো এই যে, এই সম্পর্ক সে সময় এত সংঘাতপূর্ণ ছিল না যে, হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরা অথবা প্রশাসকগণ তা বিশ্লেষণে যত্নবান হবেন।[১] তথ্য এবং মন্তব্যের এই অনুপস্থিতিই সেই সময়ের সাম্প্রদায়িক চিত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক। প্রায়ই ধারণা করা হয় যে, বাংলায় সাম্প্রদায়িকতা ছিল হিন্দু জমিদার এবং তাদের মুসলমান প্রজাদের মধ্যে ভূ-সংক্রান্ত উত্তেজনার ফসল। কিন্তু এই মতের সমর্থনে প্রত্যক্ষ

১. দেখুন, Rafiuddin Ahmed, *The Bengal Muslims, 1871-1906 A Quest for Identity* (Delhi, 1981). Sufia Ahmed, *Muslim Community in Bengal, 1884-1912* (Dhaka 1974)

প্রমাণ খুবই কম। বঙ্গভঙ্গের পর যে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল তার বিশ্লেষণ থেকেই এই ধারণা সম্বন্ধে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। এ কথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, ভূ-সম্পর্কের চেয়ে বঙ্গভঙ্গের দ্বারা উজ্জীবিত এলিট গোষ্ঠীগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতাই বরং নতুন সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভবের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে উদ্ভূত হয়েছিল। কিংবা অন্তত সময়ের ক্রমানুসারে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এলিট গোষ্ঠীর প্রতিযোগিতা বঙ্গভঙ্গ কালপর্বের ভূ-সংক্রান্ত উত্তেজনার পূর্বসূচনা হিসেবে কাজ করেছিল এবং পরোক্ষভাবে এই উত্তেজনা আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল।

বঙ্গভঙ্গপূর্ব মুসলমান সমাজ তেমন সংহত ছিল না। এ সমাজে যেমন বিচ্ছিন্নতা ছিল তেমনি ছিল শ্রেণীবৈষম্য। অবশ্য হিন্দু সমাজের সাথে এর সামাজিক সাদৃশ্য থাকলেও এই বৈষম্য বা বিচ্ছিন্নতা হিন্দু সমাজের মতো তত প্রকট ছিল না। জেলা গেজেটিয়ারের লেখকদের বর্ণনায় দেখা যায়, আশরাফ বা উচ্চবংশীয় মুসলমানগণ শারীরিক শ্রমকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতো এবং তারা স্থানীয় মুসলমানদের আজলাফ বা 'নিম্ন জীবনযাত্রার জনগোষ্ঠী' বলে মনে করতো।[২] ১৯০৫ সালের আগে বাংলার গ্রাম এবং মফস্বল শহরগুলিতে যে শিক্ষিত মুসলমান এলিট গোষ্ঠীগুলির বাস ছিল, তাদের সাথে মুসলমান কৃষক, শ্রমিক কিংবা অন্যান্য নিম্নবর্গভুক্ত লোকদের তুলনায় হিন্দু এলিটদেরই মিল ছিল অনেক বেশি। নীরদচন্দ্র চৌধুরী বঙ্গভঙ্গপূর্ব সময়ে ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ শহরে তাঁর ছেলেবেলার যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা সম্ভবত অন্যান্য শহরগুলির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ছিল। তাঁর বর্ণনা এবং সাধারণভাবে বঙ্গভঙ্গ কালপর্বের উল্লেখে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লক্ষণীয়ভাবে সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে। বঙ্গভঙ্গপূর্ব কিশোরগঞ্জের স্মৃতিচারণে তিনি বলেছেন, সে সময়ে—

> পূর্ব বাংলায় (সাম্প্রদায়িক) বিদ্বেষের স্থান ছিল না মুসলমানদের সংখ্যার কারণে। তদুপরি এরাও ছিল বাংলাভাষী। দুই সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন ছিল একই সূত্রে গ্রথিত। আমাদের গলিতে বেশ কয়েকজন মুসলমান উকিল ছিলেন। তাঁদের আমরা আমার পিতার অন্যান্য সহকর্মীদের মতোই শ্রদ্ধা করতাম। তাঁদের কিংবা তাঁদের ভাইয়ের ছেলেদের সাথে আমাদের বন্ধুত্ব ছিল প্রতিবেশী অন্য হিন্দু ছেলেদের মতোই। বিশেষকরে দু'জন ছেলে আখতার ও করিম আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। স্কুলে আমাদের সহপাঠীদের একটা বড় অংশ ছিল মুসলমান। পুরো স্কুলে মুসলমান ছাত্রসংখ্যা অন্তত হিন্দু ছাত্রসংখ্যার সমান ছিল। আমরা খুব স্বাভাবিকভাবেই তাদের সাথে কাজ করতাম, কথা বলতাম ও খেলতাম।[৩]

এই পরিস্থিতির কিছু বিশ্লেষণ প্রয়োজন। প্রথমত, চৌধুরী নিজেই উল্লেখ করেছেন, মুসলমানদের সাথে তাঁদের প্রাত্যহিক ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সত্ত্বেও হিন্দু ভদ্রলোকগণ সমসাময়িক ইসলামী সংস্কৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞ ও উদাসীন ছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান উচ্চবংশীয়দের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং আন্তরিক যোগাযোগের জন্য পরস্পরের প্রতি যে ঔৎসুক্য বা হৃদয়ানুভূতির প্রয়োজন ছিল তা কোন পক্ষের মধ্যে উপস্থিত ছিল না। দ্বিতীয়ত

২. Reuben Levy, *The Social Structure of Islam* (Cambridge 1957), 73

৩. Nirad C Chaudhuri, *Autobiography of an Unknown Indian* (London 1951), 238

ধরে নেয়া যায়, ব্যক্তিপর্যায়ে এমন অনেক হিন্দু ও মুসলমান ছিল, যাদের দীক্ষা বা অবস্থান ছিল চৌধুরীর তুলনায় অধিক ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক এবং যারা একে অপরকে যবন, ম্লেচ্ছ, গোহত্যাকারী, মাংসভুক, কাফের, মূর্তিউপাসক ইত্যাদি নামে অভিহিত করতো। এই সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিবর্গ সঙ্কটের সময় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক তিক্ত করার ক্ষেত্রে তাদের সংখ্যার চেয়েও বড় ভূমিকা পালনে সক্ষম ছিল। তৃতীয়ত, ভূমি, পেশা, বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা এবং গ্রামবাংলার সম্পদের প্রধান অংশের উপর হিন্দু এলিটদেরই আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। নীরদ চৌধুরী নিজে ছিলেন একজন সফল আইনজ্ঞের সন্তান এবং সেই স্বল্পসংখ্যক উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজের একজন সদস্য, যারা এই সুযোগ-সুবিধার অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করতো। স্বাভাবিকভাবেই হিন্দু আইনজ্ঞদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি পেশায় যোগদানের সামর্থ্য অর্জন করেছেন এমন মুসলমান আইনজ্ঞদের পক্ষে সাম্প্রদায়িক বিষয়গুলিকে অনেক বেশি সহজ এবং সহনীয় দৃষ্টিতে দেখা সম্ভব ছিল। যদি কিশোরগঞ্জ সে সময়ে পূর্ব বাংলার অন্যান্য শহরগুলির অনুরূপ হয়, সেক্ষেত্রে প্রাথমিক স্কুলে ছাত্রভর্তি হয়তো হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রায় সমান সমান ছিল। কিন্তু প্রাথমিক স্কুল পরবর্তী পর্যায়ে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা হ্রাস পেতো। কারণ পূর্ব বাংলায় তখন একজন সফল কলেজছাত্র অথবা একজন শিক্ষক, কেরানি, প্রশাসক, আইনজ্ঞ, ব্যবসায়ী কিংবা একজন খাজনা সংগ্রহকারীর পক্ষে মুসলমানের চেয়ে হিন্দু হওয়ার সম্ভাবনাই ছিল বেশি।

নীরদ চৌধুরী যখন বলেন যে, তাঁর নিজ শহরের মুসলমানদের প্রতি তিনি কোন বিদ্বেষ পোষণ করতেন না, তখন তাঁর বক্তব্যেই সে সময়ে মুসলমানদের প্রতি সাধারণ অপছন্দের দিকটি স্বীকৃতি পেয়ে যায়। তিনি বলেন, "আমরা মুসলমানদের প্রতি আগে থেকেই সাধারণভাবে বিদ্বেষ পোষণ করতাম আমাদের উপর তাদের এককালের আধিপত্যের কারণে।" তাঁর মতে, মুসলমান শাসনের বিরুদ্ধে যেসব হিন্দু বিদ্রোহ করেছিল, তাদের শৌর্য-বীর্য নিয়ে লেখা বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জী ও রমেশচন্দ্র দত্তের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি এবং পাশাপাশি রাজপুত, মহারাষ্ট্রীয় ও শিখ ইতিহাসের পর্যালোচনা এই বিদ্বেষকে আরো তীব্র করেছিল। "এমনকি আমরা যখন পড়তে পারতাম না, তখনই আমাদের বলা হতো যে, মুসলমানরা এক সময় আমাদের শাসন ও নির্যাতন করেছে: তারা এক হাতে কোরান ও অন্য হাতে তলোয়ার নিয়ে ভারতে তাদের ধর্ম প্রচার করেছে; মুসলমান শাসকগণ আমাদের মেয়েদের অপহরণ করেছে, মন্দির ধ্বংস করেছে, আমাদের পবিত্র স্থানগুলি কলুষিত করেছে।" কিন্তু এ সত্ত্বেও ১৯০৫ সালের আগে নীরদ চৌধুরী তাঁদের "ঐতিহাসিক চেতনায় বিদ্যমান এই কাল্পনিক লেবেল লাগানো"[৪] মুসলমানদের সাথে তাঁর নিজ এলাকার মুসলমানদের এক করে দেখেন নি। ১৯০৫ সালের পূর্বে তিনি এবং কিশোরগঞ্জের হিন্দু ভদ্রলোকগণ মুসলমান উচ্চবংশীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে সহমর্মিতার সাথেই বসবাস করেছেন।

৪. ঐ, 235, 239.

বঙ্গভঙ্গ হিন্দু এবং মুসলমান এলিট গোষ্ঠীগুলির পারস্পরিক সম্পর্কে দু'টি গুণগত পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল। শিক্ষিত মুসলমানরা এই বিভক্তিকে স্বাগত জানায়। কারণ এই পদক্ষেপ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের অনেক সুবিধার পথ সুগম করেছিল। অন্যদিকে শিক্ষিত হিন্দুদের অনেকে যথার্থই আশঙ্কা করেছিলেন যে, এ বিভক্তির কারণে তাঁদের সুযোগ-সুবিধার ক্রমসংকোচন ঘটবে। ফলে হিন্দু ও মুসলমান এলিট গোষ্ঠী বঙ্গভঙ্গের প্রশ্নে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। ইতিপূর্বে কোন বিষয়ে এমন মতবিরোধের পরিস্থিতির উদ্ভব হয় নি। এটি ইতিপূর্বের দুর্বল বা কোন কোন ক্ষেত্রে অনুপস্থিত সাম্প্রদায়িক চরিত্রকে আরো উস্কে দিয়েছিল। দ্বিতীয়ত বাঙালি হিন্দুদের গৃহীত নতুন ধারার উগ্র ও সহিংস রাজনীতি মুসলমানদের ভীত এবং উত্তেজিত করে তুলেছিল। তারা শঙ্কার সাথে লক্ষ্য করেছিল, হাজার হাজার 'স্বদেশী' ছাত্র সরকারের উপর অভূতপূর্ব চাপ প্রয়োগ করছে এবং বিদেশী পণ্যের বিক্রি ব্যাপকভাবে কমিয়ে দিতে সফল হচ্ছে। বঙ্গভঙ্গের সমর্থক মুসলমানরা বিরোধী অসংখ্য ছাত্রের সফল বিক্ষোভ-সহিংসতাকে প্রত্যক্ষ করেছিল, যা তাদের কাছে ছিল অপ্রত্যাশিত; কারণ উচ্চশ্রেণীতে মুসলমান ছাত্র ও শিক্ষকের সংখ্যা ছিল হিন্দুদের তুলনায় নিতান্তই কম। মুসলমান রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তখনও প্রশাসনিক পর্যায়েই আবদ্ধ ছিলেন। এই পর্যায় থেকে 'বিক্ষুব্ধ' রাজনীতির স্তরে নিজেদের উত্তরণের জন্য মানসিক দিক থেকে অথবা অন্য কোনভাবে তারা তখনও প্রস্তুত ছিলেন না। 'প্রশাসনিক' রাজনীতিকে ঐতিহ্যগতভাবেই সরকারি নীতি পরিবর্তনের উপায় হিসাবে ব্যবহার করা হয়। সেই ধারার রাজনীতিতে পুরাতন ঐতিহ্যগত এলিট গোষ্ঠীর সদস্যরা সরকারের প্রতি ব্যক্তিভিত্তিক, সতর্ক এবং সনির্বন্ধ আবেদন-নিবেদনের নীতি গ্রহণ করেছিলেন। যেহেতু প্রশাসনিক ব্যক্তিবর্গকে এলিট পরিবারগুলি থেকে নিয়োগ করা হয়েছিল, ফলে এলিটবহির্ভূত অন্যান্য সাধারণ জনগোষ্ঠীগুলি তাদের নিরাপত্তার প্রয়োজনে ও তাদের স্বার্থে তদবির করার জন্য এই এলিট পরিবারগুলির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। এভাবেই সরকারের সাথে যোগাযোগের একটি অগণভিত্তিক মাধ্যম দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অন্যদিকে 'বিক্ষুব্ধ' রাজনীতির ধারায় সর্বসাধারণের (এক্ষেত্রে ছাত্র) বিক্ষোভের মাধ্যমে সরকারের বিরোধিতা করা হয় এবং দাবির সপক্ষে জনসমর্থন প্রকাশের মাধ্যমে দাবি আদায়ের চেষ্টা করা হয়।[৫]

বঙ্গভঙ্গের আগের বছরগুলিতে বাঙালি মুসলমানরা আরো অধিক সংখ্যায় তাদের শিক্ষাগত, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পশ্চাৎপদতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছিল। এর ফলে তারা শিক্ষাকে প্রাধান্য দেওয়ার অনুকূলে আলীগড় স্কুলের নীতিকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল। একটি সম্প্রসারিত ও ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতামূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় একদিকে সম্পদ ও শিক্ষাই ভোটের অধিকার হিসেবে গণ্য হচ্ছিল, অন্যদিকে উচ্চ পর্যায়ের

৫. Lucien W. Pye in *Politics, Personality and Nation Building. Burma's Search for Identity* (New Haven 1962), 103

অনেক ক্ষেত্রে ইংরেজিই যোগাযোগের ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছিল। এই পরিস্থিতিতে বাঙালি মুসলমানদের নিজেদের পশ্চাৎপদতা সম্বন্ধে উত্তর প্রদেশের মুসলমানদের তুলনায় বেশি সচেতন হওয়া স্বাভাবিক ছিল।

বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে হিন্দুবিক্ষোভ শিক্ষিত বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে একটি নতুন উপলব্ধির জন্ম দিয়েছিল, যার ফলে তারা অবাঙালি মুসলমানদের সাথে তাদের সহযোগিতার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছিল। বিশেষত ১৯০৬ সালে মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতিশীল বাংলা ও আসামের লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার ব্যাম্পফিল্ড ফুলারের পদত্যাগ মুসলমানদের স্বীয় রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তার বিপদ সম্বন্ধে সচকিত করে তোলে। বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের সফলতা প্রতিটি প্রদেশের মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করে। উনিশ শতকের শেষ দশকগুলিতে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মতো বাংলার মুসলমানরাও তাদের স্বার্থ সংরক্ষণে স্যার সৈয়দ আহমদ খান ও আলীগড় আন্দোলনের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের উপর নির্ভরশীল ছিল। ১৯০৬ সালের আগে মুসলমানদের কোন সর্বভারতীয় রাজনৈতিক সংগঠন ছিল না, যার ফলে পরিস্থিতির চাপে মুসলমান নেতৃত্ব তাঁদের আবেদন হারিয়ে ফেলেছিলেন। সৈয়দ আহমদের যুক্তি ছিল, রাজনীতিতে প্রবেশ করা মুসলমানদের স্বার্থের পরিপন্থী হবে। তাঁর বক্তব্য একারণে গ্রহণযোগ্য ছিল যে, তখন সিপাহি বিদ্রোহ ও ওহাবী আন্দোলনের অভিজ্ঞতা বৃটিশদের মনে জাগ্রত ছিল এবং তারা মুসলমানদেরকেই ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রধান হুমকি বলে মনে করতো। দ্বিতীয়ত, তখন উত্তর-পশ্চিম প্রদেশসমূহ ও অযোধ্যার সহানুভূতিশীল সরকারে সৈয়দ আহমদ এবং আলীগড় নেতৃবৃন্দের সরাসরি প্রবেশাধিকার ছিল। যাই হোক, উনিশ শতকের শেষদিকের ঘটনাবলী মুসলমানদের স্যার সৈয়দ আহমদের রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তার নীতি পুনর্মূল্যায়নে বাধ্য করেছিল। ১৮৯৮ সালে স্যার সৈয়দের মৃত্যুর পর আলীগড় আন্দোলন বিভক্তির সম্মুখীন হয়। স্যার সৈয়দ আহমদের যখন মৃত্যু হয়, তখন উত্তর-পশ্চিম প্রদেশসমূহ এবং অযোধ্যার প্রশাসক ছিলেন স্যার এ্যান্টনী ম্যাক্‌ডনেল। ইতিমধ্যে সবার কাছে এটা পরিষ্কার হয়ে উঠে যে, ম্যাক্‌ডনেল পূর্ববর্তী লেফটেন্যান্ট গভর্নরদের মতো মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণ করবেন না। সরকারি পর্যায়ে মুসলমানদের বিশেষ অবস্থানের যে অবসান ঘটেছিল তার প্রথম প্রমাণ পাওয়া গেল ১৯০০ সালে। হিন্দুদের দাবি মেনে নিয়ে ম্যাক্‌ডনেল উর্দুর পাশাপাশি হিন্দিকে সরকারি ভাষার মর্যাদা প্রদান করেন। লখনৌর মুসলমানরা এর প্রতিক্রিয়ায় উর্দু সংরক্ষণ সংস্থা গড়ে তোলেন। আলীগড়ের মুসলমানরাও অনুরূপ একটি সংস্থার কথা বিবেচনা করছিলেন। কিন্তু তার আগেই ম্যাক্‌ডনেল আলীগড় কলেজ ট্রাস্টের একটি বিশেষ সভা আহ্বান করেন। অভিযোগ করা হয়েছিল যে, এই আন্দোলন অব্যাহত থাকলে কলেজে সরকারি সাহায্য বন্ধ করে দেওয়া হবে বলে ম্যাক্‌ডনেল উক্ত সভায় হুমকি প্রদান করেছিলেন।

সম্ভবত সরকারি চাপের মুখেই এ সময় কোন সর্বভারতীয় মুসলমান রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে উঠতে পারে নি। অবশ্য স্যার সৈয়দের নিয়ন্ত্রণ ও হস্তক্ষেপের অবসান এবং হিন্দু রাজনীতিবিদদের প্রতি প্রদত্ত বৃটিশ সরকারের ক্রমবর্ধমান সমর্থনের পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানদের একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা কেবল সময়ের ব্যাপার ছিল। আলীগড় কলেজ দলের পক্ষে ভারতীয় নীতি নির্ধারণ আর সম্ভব ছিল না এবং অন্যরা এমন নীতি অনুসরণ করবে বলে আশা করাও যুক্তিযুক্ত ছিল না। উপরন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশের লক্ষ্যে মুসলমানদের নতুন আকাঙ্ক্ষাকে স্বীকৃতি প্রদান এবং তাকে রূপদানের দাবিতে আলীগড়ের উপর চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। স্যার সৈয়দের মৃত্যুর পর ভারতীয় শিক্ষিত মুসলমানদের বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং আলীগড় নেতৃত্ব পুরোপুরি সমার্থক ছিল না। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ, ফুলারের পদত্যাগ এবং আইনপরিষদসমূহ আরো নির্বাচনমূলক করা হবে বলে প্রদত্ত ঘোষণা ছিল মুসলমানদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ, যার মোকাবেলার জন্য এদের একটি সংগঠন গড়ে তোলা প্রয়োজন ছিল।

বঙ্গভঙ্গ মুসলমানদের আন্দোলনের ফল ছিল না। এমনকি বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা পর্যায়েও মুসলমানরা তা দাবি করে নি এবং এ সম্পর্কে অনুকূল মনোভাব গ্রহণের পরেও তারা এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছিল অত্যন্ত ধীরে। সরকারই প্রথম মুসলমানদের বঙ্গভঙ্গনীতি সমর্থনের আহ্বান জানায়। সেই উদ্দেশ্যে একটি পশ্চাৎপদ সম্প্রদায় হিসেবে মুসলমানদের জন্য এই পদক্ষেপ কি কি সুবিধা বয়ে আনবে তা উল্লেখ করা হয়েছিল। ১৯০৪ সালের প্রথমদিকে লর্ড কার্জন এই লক্ষ্যে মুসলমানদের সমর্থন লাভের আশায় চট্টগ্রাম, ঢাকা ও ময়মনসিংহ সফর করে তাদের প্রতি বঙ্গভঙ্গ সমর্থনের জন্য সরাসরি আবেদন জানিয়েছিলেন। ঢাকায় তিনি যেসব মন্তব্য ও বক্তৃতা প্রদান করেন, তাতে তিনি মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক গৌরবে উদ্দীপ্ত হতে আহ্বান জানান। তখন শ্রোতাদের উদ্দেশে তিনি বলেছিলেন, ঢাকা এখন "তার পূর্বের ছায়া" মাত্র। তিনি বলেন যে, বঙ্গভঙ্গ হচ্ছে এমন একটি ব্যবস্থা, "যা এসব জেলার জনগণকে তাদের সংখ্যাধিক্য ও উচ্চতর সংস্কৃতির বদৌলতে বঙ্গভঙ্গের ফলে সৃষ্ট জেলাসমূহে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম করবে এবং পূর্ব বাংলায় মুসলমানদের মধ্যে এমন ঐক্য গড়ে তুলবে, যা তারা প্রাচীন মুসলমান ভাইসরয় ও রাজাদের আমলের পর আর কখনো অর্জন করতে পারে নি।"[৬] কার্জন এবং তাঁর পরিষদ কার্জনের এই বক্তৃতাসফরের নীতি নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁরা জানতেন যে, মুসলমানদের অনেকেই ঢাকাকে এমন একটি প্রদেশের রাজধানী হিসেবে হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করবে, যেখানে মুসলমানপ্রাধান্য পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হবে। মুসলমানদের অতীত গৌরব প্রতিষ্ঠার জন্য এই আবেদন জানানোর মাধ্যমে বৃটিশ সরকার হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে গোলযোগ সৃষ্টির কোন আশা পোষণ করেছিল কি-না তা কেবল অনুমানের ব্যাপার।

---

৬. *Speeches by Lord Curzon of Kedleston*, Vol. III (Calcutta 1906), Address at Dhaka, 18 February 1904, 302-03.

সুতরাং বঙ্গভঙ্গের পক্ষে মুসলমানদের সুস্পষ্ট এবং বোধগম্য সমর্থন লাভের জন্য সরকার উদগ্রীব ছিল। পূর্ব বাংলায় মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক সচেতনতা ইতিমধ্যে গড়ে উঠলেও সাংগঠনিকভাবে উনিশ শতকের শেষদিক পর্যন্ত এর বহিঃপ্রকাশ ছিল সামান্য। নিজেদের পশ্চাৎপদ এবং অবনত অবস্থা সম্বন্ধে সচেতনতা মুসলমানদের মধ্যে আক্ষেপ সৃষ্টি করেছিল এবং তারা সময়ে সময়ে এ ব্যাপারে সরকারের কাছে আবেদনও করেছিল। কিন্তু তারা কখনো সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ অথবা নিজেদের সম্প্রদায়কে সংগঠিত করতে সক্ষম হয় নি। রাজনৈতিক এবং পৌর কার্যক্রমেও পূর্ব বাংলার মুসলমানদের ভূমিকা ছিল নিতান্ত নগণ্য। এমনকি বঙ্গভঙ্গের পরেও *মুসলেম ক্রনিকল* এবং *মিহির ও সুধাকর* নামে যে দু'টি সংবাদপত্র সম্ভবত শিক্ষিত মুসলমানদের ব্যাপক শ্রদ্ধা অর্জনে সমর্থ হয়েছিল, সে দু'টি সংবাদপত্রই কলকাতা থেকে প্রকাশিত হতো, ঢাকা থেকে নয়। বাংলার প্রধান মুসলমান কলেজ 'কলিকাতা মাদ্রাসা' ছিল তুলনামূলকভাবে নিম্নমানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং এর পাঠ্যসূচি ছিল অনাধুনিক। এই প্রতিষ্ঠান থেকে পাশ করা খুব কম সংখ্যক স্নাতকই প্রশাসনিক ও পেশাদারি ক্ষেত্রসমূহে হিন্দু ভদ্রলোকদের সাথে প্রতিযোগিতায় সফলতা অর্জন করেছিল, কিংবা মুসলিম সংস্কার ও রাজনৈতিক আন্দোলনসমূহে নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষম হয়েছিল।

বাংলায় সরকারি কর্মচারী ও মুসলমান জনগণের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা এবং মুসলমানদের অনুভূতি প্রকাশের জন্য আলীগড় কলেজের মতো প্রতিষ্ঠান না থাকায় পূর্ব বাংলা ও আসামের নতুন প্রাদেশিক সরকার আস্থা স্থাপন করেছিল নবাব স্যার সলিমুল্লাহর উপর, যিনি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত উপাধি, সম্পদ এবং পারিবারিক মর্যাদার কারণে ইতিমধ্যে পূর্ব বাংলার মুসলমানদের আস্থা অর্জন করেছিলেন। তিনি ছিলেন মুগল সম্রাট মোহাম্মদ শাহের অধীন কাশ্মীরের গভর্নর খাজা আবদুল হাকিমের বংশধর। ১৭৩৯ সালে নাদির শাহের দিল্লী দখলের সময় খাজা হাকিম বাংলায় পালিয়ে এসেছিলেন। বাংলায় প্রাথমিক বছরগুলিতে নবাব সলিমুল্লাহর পূর্বপুরুষেরা চামড়া এবং স্বর্ণ ব্যবসায়ে নিয়োজিত ছিলেন। তবে ক্রমান্বয়ে তাঁরা ভূমিতে তাঁদের বিনিয়োগ স্থানান্তরিত করেন। পরে বৃটিশ সরকার তাঁদের নবাব উপাধি প্রদান করে।[৭]

নবাব সলিমুল্লাহ ১৯০১ সালে তাঁর পিতা নবাব আহসানউল্লাহর মৃত্যুর পর এস্টেটে গদিনসীন হন। যদিও স্যার হার্বার্ট রিজলে ১৯০৪ সালের ডিসেম্বরে নেতৃস্থানীয় মুসলমানদের কংগ্রেসে যোগদানে বাধা দেওয়ার ক্ষেত্রে সলিমুল্লাহর ভূমিকাকেই প্রধান বলে উল্লেখ করেছিলেন[৮], তবু রাজনৈতিক নেতৃত্ব দানের জন্য সলিমুল্লাহর ইচ্ছা বা মেধা কমই ছিল বলে মনে হয়। তাছাড়া যেটুকু রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা তিনি পোষণ করতে

৭. B.C. Allen, *Eastern Bengal District Gazetteers: Dacca* (Allahabad 1912), 181.

৮. Risley's Note, December 6, 1904, Government of Bengal Proceedings, February 1905, No. 155-67.

পারতেন, পরিবারপ্রধান হিসেবে তাঁর ব্যর্থতার কারণে তাও নস্যাৎ হয়ে গিয়েছিল। নবাব আহসানউল্লাহর মৃত্যুর পর তাঁর পারিবারিক সম্পত্তি তাঁর আট সন্তান এবং বিধবা স্ত্রীর মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। একজন ইংরেজ ম্যানেজার ১৯০৪ সাল পর্যন্ত পুরো পরিবারের পক্ষে এই জমিদারি পরিচালনা করেন। এরপর নবাব সলিমুল্লাহ্ নিজেই এস্টেট পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। কিন্তু পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণ ম্যানেজার হিসেবে তাঁর ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেন এবং এই পারিবারিক বিবাদ অচিরেই জটিল রূপ ধারণ করে। বাংলার সরকার তখন ঢাকায় নতুন প্রাদেশিক রাজধানী স্থাপনের পরিকল্পনা নিচ্ছিল। এই মাসগুলিতে সরকার নবাব পরিবারের ঐক্য রক্ষার জন্য হস্তক্ষেপ করে। জমিদারির অংশীদারগণ আরেক জন ইংরেজ ম্যানেজার নিয়োগে রাজি হন। ১৯০৫ সালের মে মাসে কর্নেল জে. হোডিং যখন জমিদারির দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখন এর তোষাখানা ছিল শূন্য এবং জমিদারির ঋণের বোঝা ছিল প্রায় ৩,০০,০০০ টাকা। ভূমিরাজস্ব এবং সেস্ হিসাব করে সরকার এই জমিদারির বাৎসরিক সম্পদ নির্ধারণ করে ১১,৫৯,৬৪১ টাকা। তবে নবাব সলিমুল্লাহর ব্যক্তিগত ঋণ ছিল জমিদারির ঋণের তুলনায় আরো অনেক বেশি। যদিও জমিদারিতে নবাব সলিমুল্লাহর অংশ ছিল মোট ষোল ভাগের তিন ভাগেরও কম, তাঁর বিপুল ঋণের পরিমাণ ছিল ১৬,২৫,০০০ টাকা।[৯] ১৯০৬ সালের নভেম্বর মাসে সরকারের কাছে প্রেরিত একটি রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় যে, নেতৃস্থানীয় হিন্দু রাজনীতিকগণ নবাবের ঋণদাতাদের উৎসাহিত করছিল "তাদের ঋণ ফেরত চেয়ে নবাবের উপর চাপ প্রয়োগ করার জন্য"।[১০] পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রাদেশিক সরকারের পক্ষে তাদের প্রধান সমর্থকের এই দেউলিয়া অবস্থা এবং তাঁর জমিদারি হারানোর সম্ভাবনা মেনে নেয়া কষ্টকর ছিল। সুতরাং সরকার সম্পূর্ণ অর্থ বার্ষিক শতকরা তিন এবং সাড়ে তিন টাকা হারে 'কোর্ট অব ওয়ার্ডস' (Court of Wards)-এর মাধ্যমে নবাবকে ঋণ হিসেবে প্রদানের ব্যবস্থা করে।[১১] লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার ল্যান্সলট্ হেয়ার মত প্রকাশ করেন যে, এই ঋণ প্রদানে সরকারের অস্বীকৃতির অর্থ হবে, তাঁর ভাষায়, "এই সরকারের মর্যাদার প্রতি এবং মুসলমানদের উপর আমার ব্যক্তিগত প্রভাবের প্রতি এক বিরাট আঘাত।"[১২]

আর্থিক দিক দিয়ে নবাবকে মহাজনদের কবল থেকে উদ্ধার, ১৯০৮ সালে নবাবকে 'নাইট' উপাধি প্রদান এবং ভাইসরয়ের আইনপরিষদে তাঁর অন্তর্ভুক্তি বঙ্গভঙ্গের পক্ষে মুসলমানদের সমর্থন লাভের জন্য বৃটিশ সরকারের এক গোপন প্রয়াস বলে গণ্য হয়।

৯. Col. J. Hodding, *Report on the Dacca Nawab's Family Estate*, (Dhaka 1909), 1-2

১০. "An Account of the Swadeshi Movement (1903-1907)", 66, Paper No 66, West Bengal State Committee for the Compilation of the History of the Freedom Movement in India

১১. Hodding, *Report*, 10 নবাবের কুমিল্লা সফর এবং সেখানে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হওয়ার অনতিকাল পূর্বে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ সংক্রান্ত সংবাদ বাংলা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

১২. M N. Das, *India Under Morley and Minto · Politics Behind Revolution, Repression and Reforms* (London 1964), 179.

সরকারের কিছু সমালোচকের কাছে নবাব সলিমুল্লাহকে সরকারের পুতুল বলে মনে হয়েছিল। মুসলমান নেতৃবৃন্দের একটি অংশ এবং নবাবের নিজ আত্মীয়দেরই কয়েক জন এই ধারণা সৃষ্টিতে সাহায্য করেছিলেন। তাঁরা বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে যোগদান করে নবাবের নেতৃত্বকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এমনকি নবাবের আত্মীয় খাজা মোহাম্মদ আরজু ঢাকায় বঙ্গভঙ্গের প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত বঙ্গভঙ্গবিরোধী এক সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন।[১৩] টাঙ্গাইলের করটিয়ার জমিদার আবদুল হালিম গজনভী ১৯০৫ সালে কলকাতায় ইংরেজি বই আমদানিকারক মুসলমান ব্যবসায়ীদেরকে বই বিক্রি করতে বারণ করেছিলেন।[১৪] তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল নবাব সলিমুল্লাহর ভাই নবাব আতিকুল্লাহর বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে যোগদান এবং ১৯০৬ সালের কলকাতা কংগ্রেসে বঙ্গভঙ্গ রদের প্রস্তাব উত্থাপন।[১৫] বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনে নবাব সলিমুল্লাহর আত্মীয়দের অংশগ্রহণ স্বাভাবিকভাবেই বঙ্গভঙ্গবিরোধী নেতৃবৃন্দকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাঁরা এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন। নবাবের আত্মীয়গণ এক্ষেত্রে স্পষ্টতই বঙ্গভঙ্গ নিয়ে বিতর্কের চেয়ে তাদের পারিবারিক বিবাদ দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয়েছিলেন।

এমন ধারণা করা সম্পূর্ণ ভুল হবে যে, নবাব সলিমুল্লাহর ব্যক্তিগত উৎসাহ এবং প্রভাবের ফলেই মুসলমানরা ব্যাপকভাবে বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করেছিল। এর প্রতি প্রকাশ্য মুসলিম সমর্থন যদিও গড়ে উঠেছিল ধীরে ধীরে, তা সত্ত্বেও ১৯০৭ সালের গোড়াতেই হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের বড় অংশের কাছে এটা সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, মুসলিম জনমতের গুরুত্বপূর্ণ অংশ বঙ্গভঙ্গ রদের বিপক্ষে। অবশ্য মুসলমানদের বঙ্গভঙ্গ সমর্থনের কারণ সহজেই অনুমান করা যায়। ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে, পূর্ব বাংলার মুসলমানরা শিক্ষা এবং সরকারি নিয়োগের ক্ষেত্রে হিন্দুদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অনেক পিছিয়ে ছিল। সমস্যাটি এত সর্বজনবিদিত যে এর বিস্তারিত বিবরণ সম্ভবত নিষ্প্রয়োজন। তবে কিছু উদাহরণ এই অসমতাকে তুলে ধরতে পারে এবং ব্যাখ্যা করতে পারে কেন মুসলমানরা মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এই নতুন প্রদেশকে এবং সেই সাথে সরকারি চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে মুসলমানদের সুযোগ দানের নীতিকে স্বাগত জানিয়েছিল। ১৯০১ সালে বাংলায় ইংরেজি ভাষাজ্ঞানসম্পন্ন মুসলমানের সংখ্যা ছিল প্রতি ১০,০০০ জনের মধ্যে মাত্র ২২ জন। সেই তুলনায় হিন্দুদের মধ্যে এই সংখ্যা ছিল ১১৪ জন।[১৬] সরকারি 'উচ্চপদের' মাত্র ৪১টি ছিল মুসলমানদের দখলে। অন্যদিকে জনসংখ্যার দিক থেকে হিন্দুরা মুসলমানদের অর্ধেকের কম হওয়া সত্ত্বেও তাদের দখলে ছিল প্রায় ১,২৩৫ টি পদ।[১৭] বঙ্গভঙ্গ কার্যকর

১৩. "An Account of the Swadeshi Movement (1903-1907)", 55

১৪. "He specially worked upon the English-made Boot importers in Chandni Chowk who are a large community of Eastern Bengal men of Mymensingh." *Report* by F.L. Halliday to Chief Secretary, Govt. of Bengal, 21 September, 1905, Government of Bengal Proceedings

১৫. Pakistan Historical Society, *A History of the Freedom Movement*, Vol. III, 1831-1905, Part 1 (Karachi 1961), 17

১৬. General Report of the Census of India, 1901, 175

১৭. ঐ, 217.

হওয়ার পর সরকার জানতে পারে যে, পূর্ব বাংলার বিভাগ, জেলা এবং মহকুমা দপ্তরগুলিতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের পদসমূহে মুসলমানদের নিয়োগের হার ছয় ভাগের এক ভাগেরও কম। সরকারি দপ্তরগুলিতে হিন্দুরা এক ধরনের বেতনহীন শিক্ষানবিশি পদ্ধতির মাধ্যমে সুবিধাজনক অবস্থান লাভ করেছিল।[১৮] পূর্ব বাংলার পুলিশ দপ্তরে মুসলমানদের অবস্থান ছিল আরো করুণ। পূর্ব বাংলায় পুলিশের 'ইস্টার্ন বেঙ্গল রেঞ্জ'-এ মুসলমান জনসংখ্যা ছিল মোট জনগোষ্ঠীর শতকরা ৫৯ ভাগ। অথচ ৫৪ টি পুলিশ ইন্সপেক্টর পদের মধ্যে মাত্র ৪টি পদে নিয়োজিত ছিলেন মুসলমান। ৪৮৪ টি সাব-ইন্সপেক্টর পদের মধ্যে মুসলমানদের দখলে ছিল মাত্র ৬০ টি। ৪৫০ জন হেড কনস্টেবলের মধ্যে ৪৫ জন এবং ৪,৫৯৪ জন কনস্টেবলের মধ্যে ১,০২৭ জন ছিলেন মুসলমান।[১৯] যে সমাজে মামলার বিচারে পারিবারিক, বর্ণীয় বা গোত্রীয় সম্পর্ক যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতো, সেখানে পুলিশ প্রশাসনে দুর্বল প্রতিনিধিত্বকারী সম্প্রদায় ন্যায়বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে অসুবিধাজনক অবস্থানে ছিল। সাধারণভাবে পুলিশ বিভাগকেই প্রশাসনের সবচেয়ে দুর্নীতিপরায়ণ বিভাগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল।

আইন ব্যবসায়েও হিন্দুদের আধিপত্যের বিস্তার ঘটেছিল একেবারে গ্রামের দালাল থেকে শুরু করে হাইকোর্টের ব্যারিস্টার পর্যন্ত। শিক্ষাক্ষেত্রে হিন্দু আধিপত্য বজায় ছিল গ্রামের স্কুলের শিক্ষক হতে সরকারি সচিবালয় পর্যন্ত। ভূমিব্যবস্থায় ও গ্রামের কাছারিতে, যেখানে হিন্দু গোমস্তারা মুসলমান প্রজাদের খাজনা সংগ্রহ করতো, সেখান থেকে শুরু করে জমিদারের রাজবাড়িতে অবস্থিত প্রধান কাছারি এবং জেলা ভূমিরেকর্ড দপ্তর পর্যন্ত ছিল হিন্দু আধিপত্য। অবশ্য এই বক্তব্যের অর্থ এই নয় যে, হিন্দুরা তাদের এই ব্যাপক ক্ষমতা মুসলমানদের বিরুদ্ধে অনিবার্যভাবে প্রয়োগ করতো কিংবা আইনগত বিরোধের সিদ্ধান্ত সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে গ্রহণ করা হতো। বিস্তারিত অনুসন্ধান বরং এই আশঙ্কাকে যথেষ্ট প্রশমিত করতে পারে। অবশ্য এ কথা বলা যেতে পারে যে, হিন্দু ভদ্রলোক ও মুসলমানদের মধ্যে বিবাদের ক্ষেত্রে তদন্তকারী কর্মকর্তা, কেরানি কিংবা বিচার ও অর্থনৈতিক লেনদেন সম্পর্কিত কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে একজন হিন্দু ভদ্রলোক অনেক বেশি সুবিধাজনক পারিবারিক বা গোত্রীয় সাহায্য লাভ করতেন। ১৯০৫ সালের পরে এটাই ছিলো মুসলমানদের (এবং বৃটিশদের) একটি সাধারণ অভিযোগ। কিন্তু পাশাপাশি এ কথাও জোর দিয়ে বলা প্রয়োজন যে, এই সাম্প্রদায়িক বিভেদ প্রধানত হিন্দু এলিট এবং মুসলমান ভদ্রলোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল; হিন্দু কৃষক শ্রেণীর সন্তানরা মুসলমান কৃষকদের সন্তানের তুলনায় দ্রুতহারে শিক্ষা কিংবা সরকারি চাকরিতে প্রবেশ করতো—এমন ধারণার সপক্ষে তেমন যুক্তি নেই। পাশাপাশি এমন বিশ্বাস করারও কারণ

১৮. P.C. Lyon, Chief Secretary, East Bengal and Assam to Commissioner of Divisions, 25 May, 1906, Appointment Department, *Judicial Proceedings* No.16, Vol. 7215.

১৯. Chief Secretary, East Bengal and Assam to Inspector-General of Police, 12 December 1905, October Confidential, *Judicial Proceedings*, No. 6, Vol 7218.

ছিল না যে, গড়পড়তা একজন হিন্দু ভদ্রলোক মুসলমান কৃষকদের চেয়ে নমশূদ্রদের সাথে নিজেকে অনেক বেশি একাত্ম বলে মনে করতেন। বাস্তবিকপক্ষে নমশূদ্র নেতৃবৃন্দও উচ্চবর্ণের হিন্দুদের অধীনতা এবং শিক্ষাগত বৈষম্যের বিরুদ্ধে তাঁদের পুঞ্জীভূত অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন।[২০] প্রকৃতপক্ষে বঙ্গভঙ্গের প্রভাবে যার বিকাশ ঘটেছিল, তা হচ্ছে প্রতিদ্বন্দ্বী হিন্দু এবং মুসলমান অভিজাতদের সাম্প্রদায়িক সচেতনতা।

বঙ্গভঙ্গের পরে সরকার শিক্ষা এবং চাকরির ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক বৈষম্য দূর করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। ফুলার পুলিশের চাকরিতে মুসলমানদের নিয়োগের ক্ষেত্রে "জোর এবং ক্রমাগত উদ্যোগ" গ্রহণের সুপারিশ করেছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য ছিল এই যে, প্রচলিত বৈষম্য "মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য অন্যায় ··· (কারণ) এই ব্যবস্থা অবশ্যই ··· রায়তদের বিরাট অংশকে" তাদের হিন্দু জমিদারদের হুমকির মুখে পুলিশী দায়িত্ব থেকে 'বঞ্চিত' করছিল।[২১] তাঁর এই বক্তব্যে ফুলার সম্ভবত তাঁর নিরপেক্ষ এবং আন্তরিক সদিচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু 'সুবিচার' সেই সময়ের একটি রাজনৈতিক অস্ত্র হতে পারে এবং সরকারের নিরবচ্ছিন্ন ও নিঃস্বার্থ লক্ষ্য হতে পারে। তবে বঙ্গভঙ্গের পরে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পুনর্নির্ধারণের ক্ষেত্রে সুবিচার ছিল মিশ্র উদ্দেশ্য এবং অপ্রত্যাশিত ফলাফল অর্জনের জন্য একটি দ্বিধারী তলোয়ার।

বাঙালি মুসলমানদের আরো অধিক হারে শিক্ষা এবং সরকারি চাকুরিতে নিয়োগের বিশেষ প্রচেষ্টা এর আগেও গ্রহণ করা হয়েছিল, কিন্তু এত দৃঢ়তার সাথে নয়। অন্যদিকে ১৯০৫ সালের পরে নতুন প্রদেশে মুসলমানদের প্রতি আরো সুদূরপ্রসারী এবং প্রকাশ্য সরকারি সমর্থন প্রদান হিন্দুদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করেছিল। হিন্দুদের আশঙ্কা ছিল, বঙ্গভঙ্গ প্রকৃতপক্ষে তাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত একটি সুদূরপ্রসারী চক্রান্তেরই অংশ। প্রকৃতপক্ষে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন অব্যাহত থাকার প্রেক্ষাপটে মুসলমানদের নিয়োগের সরকারি প্রচেষ্টা আরো জোরদার হচ্ছিল। ১৯০৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ফুলার নতুন প্রশাসনিক পদগুলির জন্য যোগ্য প্রার্থী খুঁজে বের করার জন্য স্থানীয় মুসলমান সংস্থাগুলিকে ব্যবহার করতে সরকারি কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এরা যথেষ্ট সংখ্যক মুসলমান প্রার্থী সংগ্রহে ব্যর্থ হলে তিনি মুসলমানদের জন্য একটি নির্দিষ্ট কোটা নির্ধারণের এবং এই কোটা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত শূন্য পদগুলি মুসলমানদের দ্বারা পূরণের জন্য সুপারিশ করেন। তবে তাঁর মতে, ন্যূনতম যোগ্যতাসম্পন্ন মুসলমান প্রার্থীর অভাবে এই কোটার সংখ্যা মোট পদের 'সর্বাধিক' তিন ভাগের এক ভাগের বেশি হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।[২২] কিন্তু হিন্দু সম্প্রদায়ের বক্তব্য ছিল, এই সুপারিশ কার্যকরী হলে তারা শত শত

---

২০. Rajat Kanta Ray, *Social Conflict and Political Unrest in Bengal, 1875-1927* (Delhi 1984), 78-81.

২১. ঐ।

২২. P.C Lyon, Chief Secretary, East Bengal and Assam to Divisional Commissioner, 25 May 1906, *Judicial Proceedings*, No.15, Vol. 7215.

আকাঙ্ক্ষিত চাকরি হারাবে এবং বেকারত্বের অভিশাপে ভুগবে। ফুলার জনসমক্ষে মুসলমান সম্প্রদায়কে তাঁর প্রথম এবং হিন্দু সম্প্রদায়কে তাঁর দ্বিতীয় রানী হিসেবে অভিহিত করে অনাবশ্যকভাবে হিন্দুদের উত্তেজিত করে তোলেন এবং মুসলমানদের প্রত্যাশা বাড়িয়ে দেন। তাঁর এই বক্তব্য সে সময়ে বিভিন্ন অর্থে প্রচারিত হয়েছিল। অবশ্য পরবর্তীকালে তিনি এর সাধারণ অর্থ ব্যাখ্যা করে বলেন, "আমি বলেছিলাম যে, আমি এমন একজন স্বামীর মতো যিনি দুটি স্ত্রী গ্রহণ করেন—একজন হিন্দু এবং অন্যজন মুসলমান। তারা দু'জনেই তরুণী এবং আকর্ষণীয়া। কিন্তু একজনের কর্কশ ব্যবহার তাঁকে অন্যজনের বাহুপার্শ্বে যেতে বাধ্য করেছিল।"[২৩] এভাবেই কৃষকের বোধগম্য ভাষায় সরকারি নীতি ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। বরিশালে ধর্মঘটী হিন্দু কেরানিদের স্থলে ৬৩ জন মুসলমান কেরানি নিয়োগ এবং বিক্ষুব্ধ এলাকায় শান্তি রক্ষার্থে ব্যবহৃত পুলিশবাহিনীর বেতন প্রদানের দায় থেকে মুসলমানদের অব্যাহতি প্রদান হিন্দুদের এ ধারণাকে আরো জোরদার করেছিল যে, নতুন প্রশাসন বঙ্গভঙ্গ সমর্থনের প্রতিদান হিসেবে মুসলমানদের পৃষ্ঠপোষকতা করছে এবং এর বিরোধিতা করার জন্য হিন্দুদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। বঙ্গভঙ্গের পরবর্তী মাসগুলিতে জনস্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়গুলিকে আরো অধিক পরিমাণে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার যে প্রবণতা বাঙালিদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল, তার একটি প্রধান কারণ ছিল সরকারের পক্ষপাতমূলক নিয়োগনীতি।

১৯০৬ সালের প্রথমদিকে মুসলমানদের মধ্যে যে নতুন আক্রমণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছিল, কোন কোন ক্ষেত্রে তা বঙ্গভঙ্গবিরোধীদের কার্যক্রমের প্রতিক্রিয়া হিসেবে গড়ে উঠেছিল। বঙ্গভঙ্গবিরোধীরা এমন একটি পদক্ষেপকে বাতিল করতে চেয়েছিল, যা শিক্ষিত মুসলমানরা প্রায় সকলেই সমর্থন করেছিল। মুসলমানরা যেখানে ছিল বৃটিশ নীতির সমর্থক, সেখানে বোধগম্য কারণেই তাদের উপর বৃটিশ পণ্য বর্জনের জন্য চাপ প্রয়োগ করা হলে তারা এতে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে শুরু করে। ১৯০৬ সালের প্রথমদিকে মধ্য এবং পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি জেলায়, বিশেষত ময়মনসিংহে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার বাষ্প ঘনীভূত হয়ে উঠে। ময়মনসিংহ জেলায় নিম্নবর্গের মুসলমানরা হিন্দু ভূস্বামীদের হেনস্থা করছে বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। তারা প্রথানুযায়ী প্রচলিত সেবা প্রদানে এবং হিন্দু ভূস্বামীদের জমি চাষ করতে অস্বীকার করছিল। হিন্দুদের এভাবে হেনস্থা এবং বর্জন করার প্রচেষ্টার জন্য বহিরাগত বিক্ষোভ সৃষ্টিকারী মৌলবি কিংবা মৌলবি নামধারী ব্যক্তিদের প্রচারণাকেই দায়ী করা হয়। ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত *চারুমিহির* পত্রিকা উল্লেখ করে, মৌলবিরা মুসলমান চাষীদেরকে হিন্দুদের বর্গা জমি চাষ করতে নিষেধ করছিল। উপরন্তু মৌলবিরা হিন্দু মহাজনদের তাদের ঋণের কাগজপত্র প্রদানের জন্যও ভীতি প্রদর্শন করছিল। মহাজনদের ভয় দেখানো হয়েছিল, অচিরেই বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটবে এবং ইতিমধ্যে ফুলার ও ঢাকার নবাবের মধ্যে একটি হিন্দুবিরোধী জোট গঠিত হয়েছে।[২৪] বেশ

২৩. Bampfylde Fuller, *Some Personal Experiences* (London 1930),140-41.
২৪. *Charu Mihir*, 22 May 1906, BNNR , No 22, para 2.

কিছু সংবাদপত্র মুসলমানদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য ফুলার এবং নবাবকেই দায়ী করেছিল।[২৫] একটি সংবাদপত্র মুসলমানদের নতুন 'বিদ্রোহী' মনোভাবের জন্য তাদের প্রতি সরকারের 'তাৎক্ষণিক পৃষ্ঠপোষকতাকে' দায়ী করে বলে যে, এই পৃষ্ঠপোষকতা ও উস্কানি মুসলমানদের মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটিয়েছে। এই সংবাদপত্র আরো জানায়, নিম্নবর্গের মুসলমানরা বিশ্বাস করেছিল যে, হিন্দুদেরকে পীড়নের মাধ্যমে তারা আরো সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা লাভে সক্ষম হবে।[২৬]

১৯০৬ সালের গ্রীষ্ম ও বসন্তে সহিংস এবং প্রায়সহিংস কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনার খবর প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে ছিল ময়মনসিংহে সংঘটিত একটি শ্লীলতাহানির ঘটনা এবং ঢাকা জেলার দু'টি বাজারে প্রায় একশো 'বদমাশ' মুসলমানের আক্রমণ। প্রথমোক্ত ঘটনাটিতে আক্রমণকারীরা তাদের 'অত্যাচারের' লক্ষ্য হিসেবে বারবনিতাদের বেছে নিয়েছিল।[২৭] আরো গুরুতর ঘটনা সংঘটিত হয় খুলনার 'মাগুরঘোনা' নামক স্থানে কোরবানি ঈদ উৎসবে। মুসলমানরা এখানে হিন্দুদের আপত্তি সত্ত্বেও গরু জবাই করে। এর প্রতিশোধ হিসেবে হিন্দুদের একটি দল মৌলবিদের একজনকে অপদস্থ করে এবং মুসলমানদের ভাষ্য অনুযায়ী তারা কোরানের উপর মূত্রত্যাগ করে। বাংলা সরকার এই ঘটনাকে 'অত্যন্ত অতিরঞ্জিত' বলে উল্লেখ করেছিল। তা সত্ত্বেও এই ঘটনা প্রকাশিত হওয়ার ফলে বরিশালে প্রায় চারশো মুসলমানের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে মুসলমানরা মাগুরঘোনার ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তিপ্রদানে সরকার ব্যর্থ হলে তারা নিজেরাই হিন্দুদের শাস্তিপ্রদান করবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তারা ইসলামের জন্য মৃত্যুবরণে প্রস্তুত বলে ঘোষণা করে। খোদ মাগুরঘোনায় দশ হাজার মুসলমানের একটি জমায়েত অনুষ্ঠিত হয়। অবশ্য বর্ধমানের কংগ্রেসনেতা আবুল কাসেম এক্ষেত্রে মুসলমানদের উত্তেজনা প্রশমিত করতে সমর্থ হন। তিনি অন্যান্য হিন্দু রাজনীতিবিদদের সঙ্গে এই সমস্যা নিষ্পত্তির জন্য খুলনায় এসেছিলেন।[২৮] *দৈনিক হিতবাদী* পত্রিকার সংবাদদাতার বিবরণ অনুযায়ী, আরেকটি গোহত্যা সংক্রান্ত ঘটনায় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের হস্তক্ষেপ ছাড়া বিনা সহিংসতায় নিষ্পত্তি ঘটে। ময়মনসিংহের নান্দাইল থানার সংগ্রামকালী গ্রামের এক বাবু কোরবানির ঈদে গরু জবাই করতে মুসলমানদের বাধা প্রদান করেন বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। স্থানীয় মুসলমানরা এ ব্যাপারে ঢাকার নবাবের কাছে আবেদন করলে নবাব ঢোলশোহরতের মাধ্যমে গরু জবাই করার আদেশ দেন। পরে প্রায় পাঁচ হাজার মুসলমান গরু জবাই করার উদ্দেশ্যে পূর্বোল্লেখিত বাবুর বাসার কাছে জমায়েত হয়। কিন্তু হঠাৎ একটি বিশাল আকারের সাপ গাছ থেকে ভূমিতে পতিত হলে জনতার

২৫. BNNR, Part II, No. 20, para 611-16.

২৬. *Charu Mihir,* 15 May 1906, BNNR, No. 21, para 37 and 38

২৭. ঐ, ১৭ জুলাই ১৯০৬, BNNR, No 30, para 4

২৮. R.W. Carlyle, Chief Secretary, Govt. of Bengal to Secretary, Govt of India, Home Department, 7 April 1906, Prog No. 179, IHP

মধ্যে প্রাণভয়ে ছুটাছুটি শুরু হয় এবং শেষ পর্যন্ত গরু জবাই কর্মসূচি বাতিল হয়ে যায়।[২৯] *সঞ্জীবনী* পত্রিকায় প্রকাশিত এক চিঠিতে নান্দাইল থানার আরেকটি গ্রাম গাঙ্গাইলে সংঘটিত আরেকটি ঘটনার উল্লেখ করা হয়। এখানে মৌলবি বা ছদ্ম-মৌলবিরা প্রচার করে, "হিন্দুদের অধীনে কোন সেবা গ্রহণ করা ইসলামের নীতিবিরুদ্ধ"। এর ফলে মুসলমানরা এখানে হিন্দুদের জন্য কাজ করতে অস্বীকার করলে কিছু হিন্দু একটি কোরান গ্রন্থকে অবমাননা করে। অন্যদিকে মন্দির হতে একটি শিবলিঙ্গ সরিয়ে এর পরিবর্তে সেখানে একটি গরুর মস্তক রেখে দেওয়া হয়।[৩০]

ঢাকার নবাব ১৯০৬ সালে ঢাকায় জন্মাষ্টমী মিছিলে মুসলমানদের অংশগ্রহণ করতে নিষেধ করেছিলেন। মুসলমান গাড়োয়ানরা এতে সাড়া দিয়ে 'চৌকি' হিসেবে ব্যবহার করার জন্য তাদের গাড়ি ধার দিতে অস্বীকার করে। ফলে এই মিছিল দেখার জন্য সমবেত 'দশ সহস্র' লোক হতাশ হয়ে ফিরে যায়। নবাব দাবি করেছিলেন, ফুলারের পদত্যাগের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার আশঙ্কায় তিনি এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। সম্ভবত তিনি নিম্নবর্গের মুসলমানদের উপর হিন্দুরা কি পরিমাণে নির্ভরশীল ছিল তা প্রদর্শন করতে চেয়েছিলেন।[৩১]

১৯০৬ সালের প্রথম আট মাসে সংঘটিত এসব ঘটনায় সহিংসতার মাত্রা ছিল অল্প। বস্তুত ১৯০৬ সালে যা সবচেয়ে অস্বাভাবিক ছিল তা হলো মুসলমানদের উত্তেজিত করে তুলতে মৌলবিদের ব্যাপক প্রচারণা, হিন্দুদের প্রতি প্রচলিত ও প্রথাগত সেবা প্রদানে মুসলমানদের একটি অংশের অস্বীকৃতি এবং ফুলারের প্রশাসন মুসলমানদের উত্তেজিত করেছে এবং তাদের পক্ষাবলম্বন করেছে—এমন বিশ্বাস। মুসলমানরা হিন্দুদের বর্জন করার যে হুমকি দিয়েছিল তা মানসিকভাবে হিন্দুদের মধ্যে গুরুতর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। একজন হিন্দু ভদ্রলোক যেমন ঐতিহ্যগতভাবে উঁচু মর্যাদার সম্মান লাভ করতেন, তেমনি পূর্ব বাংলায় মুসলমানদের কাছ থেকে খাজনা, ভাড়া অথবা পেশাগত পারিশ্রমিক আদায়েও সক্ষম ছিলেন এবং যথারীতি সেসব আদায় করতেন। কিন্তু মুসলমানদের বর্জনের সম্ভাবনা তাঁকে অকস্মাৎ এক প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলমান জনসমুদ্রে সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন এবং একঘরে হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনার সম্মুখীন করেছিল। সান্দিকোনা (সম্ভবত ময়মনসিংহ জেলায়) গ্রামের এক চিঠিতে মুসলমানদের দ্বারা কোন কার্যকর বর্জন কি ধরনের বাস্তব পরিণতির জন্ম দিতে পারে তার একটি চিত্র পাওয়া যায়। এই গ্রামের জনগণের মাত্র আট ভাগের এক ভাগ ছিল হিন্দু। মুসলমানরাই এখানে কৃষিকাজ করতো, কারণ পত্রলেখকের বক্তব্য অনুযায়ী, "নিজের হাতে চাষ করা কেবল উচ্চবর্ণের হিন্দুর কাছেই নয়, নিম্নবর্ণের হিন্দুর কাছেও সামাজিক রীতিবিরুদ্ধ ছিল।" ফলে স্থানীয় মুসলমানরা যখন হিন্দুদের বর্জন করছিল, তখন প্রচুর জমি অনাবাদি থেকে গেল। "কিছুসংখ্যক কায়স্থ প্রাথমিকভাবে

২৯. *Daily Hitavadi*, 25 March 1906, BNNR, No. 13, para 9.

৩০. *Sanjivani*, 15 March 1906, BNNR, No. 12, para 9.

৩১. *Amrita Bazar Patrika*, 18 August 1906, BNNR, Part II, No. 34, para 1215 and *Dacca Prakash*, 19 August 1906, BNNR, No. 13, para 60.

নিজের হাতে চাষের কাজ করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাদের ভবিষ্যৎ বৈবাহিক সম্ভাবনা বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কায় তারা পরবর্তীকালে কৃষিকাজ থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়েছিল।" পত্রলেখক আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন, নিজেরা জমি চাষ না করলে স্থানীয় হিন্দুদের সকলেই ধ্বংস হয়ে যাবে।[৩২]

তথ্য-প্রমাণ থেকে মনে হয় না যে, বাস্তবিকই অনেক হিন্দুকে বর্জন করা হয়েছিল। বরং হিন্দু ভদ্রলোকগণ স্থানীয়ভাবে তাদের মুসলমান প্রজা, কর্মচারী এবং তাদের উপর নির্ভরশীল অন্যান্য ব্যক্তিদের উপর তাদের অবশিষ্ট ক্ষমতা নিয়েও অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং পুলিশ ও সরকারি দপ্তরসমূহের সাথে নিজেদের যোগাযোগের কারণে ব্যাপক সুবিধা ভোগ করছিল। তা সত্ত্বেও বর্জন ছিল একটি বাস্তব সমস্যা। উপরন্তু ভদ্রলোকদের উপর বদমাশদের আক্রমণের সম্ভাবনাও ছিল। অল্প কয়েকটি গ্রামে যে দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছিল, তার বিবরণ হিন্দুদের মধ্যে ব্যাপক ভীতির সঞ্চার করেছিল। মৌলবিদের প্রচারণা কিংবা মুসলমানদের সীমিত বর্জন যে প্রত্যক্ষ ফল সৃষ্টি করতো, তার তুলনায় এই ভীতি তাদের মধ্যে অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব ফেলেছিল। পূর্ব বাংলায় ১৯০৬ সালে ক্রমবর্ধিত হারে আরো অধিক সংখ্যক পত্রে এবং বিবরণে এই আতঙ্ক প্রকাশ পায়।

প্রকৃতপক্ষে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় বসবাসকারী হিন্দুদের যে বক্তব্য প্রকাশিত হচ্ছিল, তার সুর কলকাতা এবং পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলাগুলির হিন্দুদের বক্তব্য থেকে একেবারেই আলাদা ছিল। ১৯০৫ সালে বৃটিশ শাসনের অবসানের সম্ভাবনা যাদের মধ্যে উচ্চাশার জন্ম দিয়েছিল, মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই তারা হতাশ এবং বিষণ্ন হয়ে পড়েছিল। *চারু মিহির* পত্রিকা ১৯০৬ সালের আগস্টে এক সম্পাদকীয়তে সাম্প্রদায়িক গোলযোগপূর্ণ এলাকার হিন্দু অধিবাসীদের কয়েক জনের আশঙ্কার কথা প্রকাশ করেছিল। পত্রিকার বক্তব্য ছিল, "ভারত হতে বৃটিশ শাসনের আদৌ অবসান হলেও মুসলমানরা হিন্দুদের সাথে একত্রিত হবে কিনা সন্দেহ। তারা সম্ভবত চেষ্টা করবে ভারতকে মুসলমান বিশ্ব জুড়ে বিস্তৃত একটি সাম্রাজ্যের অংশে পরিণত করতে অথবা সার্বভৌম মুসলমান শাসকদের সৈন্যের সাহায্যে ভারতে পুনরায় মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠা করতে।" লেখক নিজেও এ ব্যাপারে উদ্বিগ্ন ছিলেন, কারণ ভারতে মুসলমানদের সংখ্যা হিন্দুদের তুলনায় দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল, যার পরিণামে সংখ্যার দিক থেকে হিন্দুদের চেয়ে মুসলমানদের এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এই সম্পাদকীয় বক্তব্যের শেষকথা এই যে, যদিও হিন্দুরা "বৃটিশ শাসনের অধীনে প্রভূত বঞ্চনার শিকার" হয়েছে, তা সত্ত্বেও হিন্দুদের রক্ষা করার জন্য এই শাসনের প্রয়োজন রয়েছে।[৩৩] সুতরাং মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা এবং ১৯০৭ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ভারতে বৃটিশদের উপস্থিতি সম্পর্কে পরস্পরবিরোধী ধারণাকে সম্ভবত আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল।

৩২. *Charu Mihir*, 20 February 1906, BNNR, No. 9, para 53

৩৩, *Charu Mihir*, 14 August 1906, BNNR, No. 34, para 57

হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ক্রমাবনতির এই প্রেক্ষাপটে একদিকে ভারত সরকারের নীতিতে এবং আরেকদিকে বাঙালি মুসলমান নেতৃবৃন্দের সাথে অবাঙালি মুসলমানদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হচ্ছিল। পূর্ব বাংলার সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই উভয় ঘটনারই গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পড়েছিল। অন্যদিকে বৃটিশ সরকারের সাংবিধানিক সংস্কার সাধনের সিদ্ধান্ত এবং ফুলারের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার প্রচেষ্টা হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে একটি নতুন সন্ধিক্ষণ সৃষ্টি করেছিল। পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জে দু'টি স্কুলছাত্রকে কঠোর শাস্তি প্রদান করা হলে ভারত সরকার ফুলারকে এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে বলে। ফুলার এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯০৬ সালের ১৫ জুলাই পদত্যাগের প্রস্তাব দিলে মোর্লি ও মিন্টো উভয়েই এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানান।[৩৪] এছাড়াও অন্য একটি বিষয়ে তাঁরা উভয়েই একমত হন। সরকারবিরোধিতার আংশিক অবসান এবং নরমপন্থী জাতীয়তাবাদীদের শক্তিবৃদ্ধির লক্ষ্যে তাঁরা আইনপরিষদসমূহ সম্প্রসারিত করার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন। ২০ জুলাই 'হাউজ অব কমন্স'-এ মোর্লি ঘোষণা করেন যে, ভারত সরকার সাংবিধানিক সংস্কার সাধনের কথা বিবেচনা করছে। মোর্লির ঘোষণা জনগণের মধ্যে এই ধারণার উদ্রেক করেছিল যে, সম্ভবত আইনপরিষদসমূহের সম্প্রসারণ করা হবে। এর অর্থ হচ্ছে নির্বাচনী ব্যবস্থার সম্প্রসারণ। এই দাবিটিই কংগ্রেস দীর্ঘদিন ধরে করে আসছিল এবং তার বিরোধিতা করছিল আলীগড়পন্থী মুসলমানরা। প্রায় দুই সপ্তাহ পরে সরকার ফুলারের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করা হয়েছে বলে ঘোষণা করে। এই ঘোষণা আরো জোরালো ইঙ্গিত প্রদান করে যে, বৃটিশ সরকার কংগ্রেস দলের বিক্ষোভের কাছে নতিস্বীকার করেছে। কিন্তু বাংলা এবং ভারতের মুসলমান নেতারা এ ব্যাপারে মৃদু ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। কলকাতা থেকে প্রকাশিত *ছোলতান* মত প্রকাশ করে যে, ফুলারের "ক্ষেত্রে হিন্দু বিক্ষোভকারীরা যথেষ্ট শক্তিশালী বলে প্রমাণিত হয়েছে।" *ছোলতান*-এর আশঙ্কা ছিল, এর পর মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষিত হবে না এবং "সকল বিষয়ই প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে, যেখানে মুসলমানদের কোন সাফল্যের সম্ভাবনা থাকবে না।"[৩৫] কলকাতার *মিহির* ও *সুধাকর* পত্রিকা সরকারের বিরুদ্ধে অন্যায় তোষণের অভিযোগ তোলে এবং মুসলমানদের উন্নয়নের জন্য ফুলারের "অসংখ্য পদক্ষেপের" প্রশংসা করে। পূর্ব বাংলার বাইরেও অনেক স্থানে ফুলারের পদত্যাগ বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। গভর্নর জেনারেলের অফিসে শত শত নিন্দাসূচক টেলিগ্রাম আসে এবং ভারতের সব গুরুত্বপূর্ণ শহরেই জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।[৩৬]

ফুলারের পদত্যাগের তাৎপর্য বাংলার দুই বিশিষ্ট নেতা নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী ও ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহর কাছে বিশেষভাবে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী

৩৪, Syed Razi Wasti, *Lord Minto and the Indian Nationalist Movement, 1905-1910* (London 1964), 49 এ বইতে ওয়াস্তি যে পরিস্থিতির কারণে ফুলারকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল তার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন।

৩৫, *Soltan*, 10 August 1906, BNNR, No. 33, para 41.

৩৬, Wasti, *Lord Minto*, 60-61

এক পর্যায়ে মুহসিন-উল-মুল্‌ক-এর কাছে আক্ষেপ করেছিলেন যে, যদি বাংলার মুসলমানরা সরকারকে অনুসরণ না করে হিন্দুদের মতো বিক্ষোভ প্রদর্শন করতো, তাহলে তাদের এত দুর্দশা হতো না; "আমাদের এখন হিন্দুদের মতো একই পথে অগ্রসর হতে হবে।"[৩৭] নবাবের পত্রিকা *মিহির* ও *সুধাকর* মুসলমানদের উদ্দেশে লেখা এক সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করে যে, ন্যায়পরায়ণ ফুলারকে পদত্যাগ করতে হয়েছে বৃটিশ রাজের প্রতি আনুগত্যের জন্য। পত্রিকাটি আহ্বান জানায় যে, বখতিয়ার খিলজির নেতৃত্বে একদা যদি মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষিত হতে পারে, তাহলে ভারতের কোটি কোটি মুসলমান সঙ্ঘবদ্ধ হলে এখনো সে স্বার্থ সংরক্ষণ করা সম্ভব।[৩৮]

ফুলারের পদত্যাগ সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে এক নতুন রাজনৈতিক সচেতনতার জন্ম দিয়েছিল।[৩৯]

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলমান নেতৃবৃন্দ সঙ্ঘবদ্ধ হতে শুরু করেছিল এ উদ্দেশ্যে যে, যখন আইনপরিষদসমূহের সংস্কার সাধন করা হবে, তখন মুসলমানদের আশা-আকাঙ্ক্ষা সুবিবেচনা লাভ করবে। অবশ্য প্রাথমিক পর্যায়ে সরকারের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে পুরাতন আলীগড় মাধ্যমকেই ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। আলীগড় কলেজের সচিব মুহসিন-উল-মুল্‌ক কলেজ-অধ্যক্ষ ডব্লিউ. এ. জে. আর্চবোল্ড-এর মাধ্যমে লর্ড মিন্টোর কাছে আসন্ন সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনার জন্য একটি মুসলমান প্রতিনিধিদল গ্রহণের আবেদন জানান।[৪০] মিন্টো এক সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে তাঁর সম্মতি প্রদান করেন।[৪১] ১ অক্টোবর সিমলায় আগা খানের নেতৃত্বে ৩৫ জন মুসলমানের এক প্রতিনিধিদলকে তিনি সাক্ষাৎদান করেন। অবশ্য এই প্রতিনিধিদল প্রস্তুতিতে বাঙালি মুসলমানদের ভূমিকা ছিল সামান্য। নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী ছিলেন প্রতিনিধিদলে পূর্ব বাংলার একমাত্র সদস্য। উত্তর প্রদেশ থেকে ছিলেন ১১ জন, পাঞ্জাব থেকে ৮ জন এবং কলকাতা থেকে ৫ জন।[৪২] ভাইসরয়ের উদ্দেশ্যে পঠিত অভিভাষণ রচনা করেছিলেন মুহসিন-উল-মুল্‌ক ও সৈয়দ হুসেন বিলগ্রামী। বিলগ্রামী সুদীর্ঘকাল যাবৎ আলীগড়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, যদিও কর্মক্ষেত্রে তিনি ছিলেন হায়দ্রাবাদ সরকারের সাথে সংযুক্ত। অভিভাষণে যুক্তি প্রদর্শন করা হয়, মুসলমানদের স্বার্থ ভারতের অন্যান্য জাতিব স্বার্থ থেকে স্বতন্ত্র। অভিভাষণের এই যুক্তি এবং এক্ষেত্রে লর্ড মিন্টোর জবাব বৃটিশ-মুসলমান

৩৭, Syed Nawab Ali Chaudhury to Mohsin-ul-Mulk, August 1906; M.N. Das, *India*, *168*.

৩৮. *Mihir-O-Sudhakar*, 31 August 1906, BNNR, No. 36, para 49.

৩৯. উদাহরণ স্বরূপ, Syed Nawab Ali Chaudhury to Mohsin-ul-Mulk, August 1906; *Moslem Chronicle*, 15 September 1906, BNNR, Part II, No. 41, para 1502.

৪০. Text of letter, dated 4 August 1906, is quoted by Wasti, *Lord Minto*, 61-63

৪১. Das, *India*, 166.

৪২. List of signatories is Appendix II to Wasti, *Lord Minto*, 222-23.

অংশীদারিত্ব আসন্ন বছরগুলিতে কি কি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে তার ব্যাখ্যা প্রদানে সাহায্য করেছিল। মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি বিশেষ সহানুভূতির যথার্থতা প্রতিপাদনের জন্য সিমলা প্রতিনিধিদল যথাক্রমে সংখ্যা, রাজনৈতিক গুরুত্ব এবং ভারতীয় সমাজের বহুজাতিক চরিত্রের উপর ভিত্তি করে তিনটি যুক্তি প্রদর্শন করেছিল। প্রথমত প্রতিনিধিদলের যুক্তি ছিল, ১৯০১ সালের জনসংখ্যা জরিপ অনুযায়ী যেখানে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ থেকে এক-পঞ্চমাংশ, সেখানে জরিপে হিন্দু হিসেবে চিহ্নিত অনেকেই ছিল অহিন্দু। প্রকৃতপক্ষে মুসলমান সম্প্রদায় সংখ্যায় প্রচলিত হিসেবের চেয়ে অনেক বড়।[৪৩] দ্বিতীয়ত প্রতিনিধিদল দাবি করে যে, মুসলমান সম্প্রদায়কে সংখ্যাশক্তির গণ্ডি পেরিয়ে তাদের রাজনৈতিক গুরুত্বের ভিত্তিতে বিবেচনা করতে হবে। এক্ষেত্রে ভারতের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে মুসলমানদের গুরুত্ব উল্লেখ করা হয়েছিল সম্ভবত সরকারকে এ কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য যে, ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রতি তিনজন সদস্যের একজন ছিল মুসলমান। প্রতিনিধিদল এ কথাও উল্লেখ করেছিলেন যে, মুসলমানরা এক শতাব্দীর 'সামান্য কিছু' পূর্বেই ভারতের অধিকাংশ এলাকা শাসন করতো এবং পূর্বের সেই মর্যাদার স্মৃতি "স্বাভাবিকভাবেই তাদের মন থেকে মুছে যায় নি"। তৃতীয়ত প্রতিনিধিদলের যুক্তি ছিল, যেহেতু প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ ভারতে একেবারেই নতুন, সেহেতু এক্ষেত্রে প্রচুর সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত যাতে "আমাদের জাতীয় স্বার্থ একটি সহানুভূতিহীন সংখ্যাগরিষ্ঠের দয়ার উপর ছেড়ে দেওয়া না হয়।" তা ছাড়াও অভিভাষণে আরেকটি বাস্তব এবং তাৎক্ষণিক প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়। প্রতিনিধিদলের বক্তব্য ছিল, "বর্তমানে গঠিত নির্বাচকমণ্ডলীর মাধ্যমে কোন মুসলমান প্রার্থীর পক্ষে (নির্বাচিত হয়ে) ফিরে আসা প্রায় অসম্ভব, যদি না তিনি গুরুত্বপূর্ণ সব বিষয়গুলিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রতি সহানুভূতিশীল হন।" সুতরাং মুসলমানদের দ্বারাই মুসলমান প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়া উচিত, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সংখ্যাও যথেষ্ট হওয়া উচিত (অর্থাৎ জনসংখ্যাভিত্তিক হওয়া প্রয়োজন) যাতে তারা "কখনই অক্ষম সংখ্যালঘিষ্ঠে পরিণত না হয়।"[৪৪]

লর্ড মিন্টো তাঁর পূর্বে প্রস্তুতকৃত জবাবে প্রতিনিধিদলের প্রদর্শিত যুক্তিগুলির প্রতি সাধারণ সহানুভূতি এবং মতৈক্য প্রকাশ করেন। এর মাধ্যমে তিনি পৃথক নির্বাচনের পক্ষে তাঁর পরোক্ষ সমর্থন প্রদান করেন। অবশ্য এর অধিক কিছু প্রার্থনা করার সুযোগও প্রতিনিধিদলের ছিল না।

৪৩. বহু নিম্নবর্ণ ও বর্ণচ্যুতকে হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত হিসেবে না দেখানোর পক্ষে যেসব যুক্তি ছিল তা মুসলিম লীগ সভাপতি সৈয়দ আমির আলি ১৯০৯ সালের জানুয়ারি মাসে লর্ড মোর্লির কাছে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। U. N. Mukherji, *Hinduism and the Coming Census: Christianity and Hinduism* (Calcutta 1911), 2.

৪৪. C. H. Philips (ed.), *The Evolution of India and Pakistan, 1858 to 1947 : Select Document* (London 1962), 190-193.

সিমলায় অবস্থানকালে প্রতিনিধিদলের সদস্যগণ একটি সর্বভারতীয় মুসলমান রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। তবে এই ক্ষেত্রে সিমলা প্রতিনিধিদল গঠনের তুলনায় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠায় বাঙালিদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। বাস্তবিকপক্ষে ফুলারের পদত্যাগে বাঙালি মুসলমানদের প্রতিক্রিয়াই হয়তো আরো বেশি সতর্ক আলীগড় নেতৃবৃন্দকে একটি রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠায় সম্মতি প্রদানে বাধ্য করেছিল। ১৯০৬ সালের ১৮ আগস্ট আর্চবোল্ডের কাছে লেখা এক পত্রে মুহসিন-উল-মুল্ক বলেন, "আমি লক্ষ্য করেছি, মুসলমানদের অনুভূতির ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে এবং আমি হরহামেশাই এমন চিঠি পাচ্ছি যেগুলিতে জোরালো ভাষায় বলা হচ্ছে, হিন্দুরা তাদের বিক্ষোভের রাজনীতির কারণে সফলতা অর্জন করেছে এবং মুসলমানরা নিশ্চুপ থাকার দরুন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।" মুহসিন-উল-মুল্ক মনে করতেন, মুসলমানরা একটি রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করে লাভের চেয়ে সম্ভবত বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কিন্তু এই প্রশ্নে "কারো পক্ষেই তাদের নিবৃত্ত করা সম্ভব নয়। পূর্ব বাংলার মুসলমানরা একটি নিদারুণ আঘাত পেয়েছে।"[৪৫] আগা খান দাবি করেছিলেন যে, তিনিই পরবর্তীকালে সিমলা প্রতিনিধিদলের সদস্যদের একটি স্থায়ী কমিটি গঠনের আহ্বান জানিয়েছিলেন। অবশ্য সৈয়দ রাজী ওয়াস্তীর মতে ঢাকার নবাবই এক্ষেত্রে "প্রথম বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন" এবং "সর্বভারতীয় মুসলিম মৈত্রীসঙ্ঘ" গঠনের প্রস্তাবসম্বলিত একটি চিঠি মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করেছিলেন।[৪৬] ঢাকার নবাবেরই ১৯০৬ সালের ডিসেম্বরে ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য বাৎসরিক 'মুসলমান শিক্ষা সম্মেলন' আয়োজনের দায়িত্ব পালনের কথা ছিল। তিনি ইতিমধ্যে একটি নতুন আঞ্চলিক দল 'মোহামেডান প্রভিন্সিয়াল ইউনিয়ন'-এর পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। বাংলায় মুসলমান স্বার্থ সংরক্ষণে ১৯০৫ সালের জুলাই মাসে এই দল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।[৪৭]

১৯০৬ সালে ঢাকায় বাৎসরিক শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। একই সময়ে কলকাতায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বৈঠক চলছিল। ঢাকায় শিক্ষা সম্মেলনের পরে প্রতিনিধিদল সিমলা প্রতিনিধিদলের বেশ কিছু সদস্যসহ ২০ ডিসেম্বর একটি সংক্ষিপ্ত বৈঠকে মিলিত হন। এখানেই তারা "ভারতের মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার ও স্বার্থসমূহ সংরক্ষণ এবং উন্নয়নে" 'সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ' প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেন।[৪৮] কিন্তু ১৯০৬-০৭ সালের ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় নবপ্রতিষ্ঠিত লীগ তাৎক্ষণিকভাবে কোন সাড়া জাগাতে পারে নি। ১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা অনেকের কাছে যেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছিল, সেই তুলনায় লীগের প্রতিষ্ঠা খুব কমই সাড়া জাগিয়েছিল।

---

৪৫. Das, *India*, 167-68.

৪৬. Wasti, *Lord Minto*, 77.

৪৭. "An Account of the Swadeshi Movement (1903-1907)", 52.

৪৮. মুসলিম নেতৃবৃন্দের ঢাকা অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য দেখুন, Wasti, *Lord Minto*, 79.

প্রকৃতপক্ষে লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কংগ্রেস মুসলমান ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করছে বলে কংগ্রেসের দাবির সরাসরি বিরোধিতা করে। বাঙালি মুসলমানদের একটি অংশ লীগকে এর প্রতিদ্বন্দ্বী ভূমিকা পালনের জন্য স্বাগত জানিয়েছিল। বিশেষত রাজনীতিমনস্ক মুসলমানদের মধ্যে লীগের এই প্রতিরোধমূলক নীতির পক্ষে সমর্থন ছিল প্রবল। ১৯০৬ সালের কলকাতা কংগ্রেসে মোট ১,৬৬৩ জন প্রতিনিধি যোগদান করেছিলেন এবং তাদের মধ্যে বাংলা থেকে অংশগ্রহণকারী মুসলমানদের সংখ্যা ছিল মাত্র ২৪ জন। অথচ ইতিপূর্বে ১৯০১ ও ১৮৯৬ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত অপেক্ষাকৃত অনেক ছোট অধিবেশন দুটিতে যোগদানকারী বাঙালি মুসলমানদের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৫৪ এবং ৪২ জন।[৪৯]

১৯০৬ সালের শেষ মাসগুলিতে বাঙালি মুসলমানরা সক্রিয়ভাবে বঙ্গভঙ্গের পক্ষে সমর্থন সংগ্রহের অভিযান শুরু করে। এই অভিযানের সাথে তাদের আগেকার প্রচেষ্টার কোন তুলনা ছিল না। ১৯০৬ সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ দিবসে যে সভাগুলি অনুষ্ঠিত হয়, সেগুলির সাথে পূর্ববর্তী বছরের সভারও ব্যাপক পার্থক্য ছিল। কারণ এই বছরে বঙ্গভঙ্গের সমর্থনে মুসলমানদের বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সরকারি সূত্র অনুযায়ী বঙ্গভঙ্গের প্রতি সমর্থন প্রকাশের লক্ষ্যে কলকাতার সার্কাস স্কোয়ারে প্রায় ২০,০০০ মুসলমান সমবেত হয়েছিল।[৫০] হস্তান্তরিত জেলাসমূহে বঙ্গভঙ্গের পক্ষে অনুষ্ঠিত সভাগুলিতেও আগের তুলনায় আরো অধিক সংখ্যক লোকের সমাগম হয়েছিল বলে উল্লেখ করা হয়, যদিও প্রতিবাদ সভাগুলিতে উপস্থিতির পরিমাণ ছিল আরো বেশি।[৫১]

১৯০৬ সালের শরৎকালে বঙ্গভঙ্গের সমর্থক এবং বিরোধীদের মধ্যে উত্তেজনা ঘনীভূত হয়ে উঠে। যেসব স্থানে বিরোধীরা শক্তিশালী ছিল, সেখানেও মুসলমানরা বঙ্গভঙ্গের পক্ষে তাদের সমর্থন প্রদর্শনের জন্য প্রকাশ্যভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছিল। ঢাকায় মুসলমান শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার আগেই নবাব সৈয়দ আমির হোসেন খান এবং সিরাজুল ইসলাম কলকাতায় 'মোহামেডান ভিজিলেন্স এসোসিয়েশন' গঠন করেন। মুসলমানদের উপর স্বদেশী বিক্ষোভকারীদের অত্যাচারের সংবাদ সংগ্রহ করাই ছিল এর উদ্দেশ্য।[৫২] উভয় নেতাই পরে ডিসেম্বরে মুসলিম লীগের অস্থায়ী কমিটির অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। তবে 'লাল ইশতেহার' নামে প্রচারিত একটি উত্তেজক পুস্তিকা মুসলমানদের বিক্ষুব্ধ মনোভাব ব্যক্ত করে। ঢাকা সম্মেলনের সময়েই মুসলমানদের মধ্যে এই পুস্তিকা বিতরণ শুরু হয়েছিল।

---

৪৯. Wasti, *Lord Minto*, Appendix 1, 221

৫০. R. W. Carlyle, Chief Secretary, Govt. of Bengal, Pol Dept., to Govt. of India, Home Dept., 26 October 1906, Prog. No. 147, IHP., Pol.

৫১. P. C. Lyon, Chief Secretary, East Bengal and Assam to Govt. of India, Home Dept., 5 November 1906, December 1906, Prog. No. 148 IHP., Pol.

৫২. "An Account of the Swadeshi Movement (1903-1907)", 69.

এতে জঙ্গি ভাষায় মুসলমানদের শোষণের জন্য হিন্দুদের অভিযুক্ত করা হয় এবং সার্বিকভাবে হিন্দুদের বর্জন করার জন্য মুসলমানদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। এই ইশতেহারের সাম্প্রদায়িক চরিত্র নিম্নোদ্ধৃত অংশে স্পষ্ট হয়ে উঠে :

> হে মুসলমানরা, উঠ, জাগো ! তোমরা হিন্দুদের সাথে একই স্কুলে পড়ো না। হিন্দুর দোকান হতে কিছু ক্রয় করো না। হিন্দুদের দ্বারা তৈরি কোন পণ্য স্পর্শ করো না। কোন হিন্দুকে কোন কাজে নিয়োগ করো না। হিন্দুর অধীনে তোমরা কোন নিম্নপদ গ্রহণ করো না। তোমরা অজ্ঞ, কিন্তু যদি জ্ঞান অর্জন করো, তবে তোমরা অবিলম্বে সকল হিন্দুকে জাহান্নামে পাঠাতে পারবে। তোমরাই হলে এই প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী। কৃষকদের মধ্যেও তোমরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। কৃষিই হচ্ছে সম্পদের উৎস। একজন হিন্দুর নিজের কোন সম্পদ নেই এবং সে কেবল তোমাদের সম্পদ হরণ করেই নিজে সম্পদশালী হয়েছে। তোমরা যদি যথোপযুক্তভাবে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠ, তবে হিন্দুরা সকলেই অভুক্ত থাকবে এবং অচিরেই মুসলমান হয়ে যাবে।[৫৩]

মুসলিম নেতৃবৃন্দের কয়েক জন ঢাকা সম্মেলনে এবং ১৯০৭ সালের মার্চে বরিশালে অনুষ্ঠিত মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনে 'লাল ইশতেহার' পুস্তিকার প্রচার ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এদের মনোভঙ্গি উপেক্ষা করে কলকাতার *মিহির ও সুধাকর* পত্রিকার প্রকাশক এটি বিতরণ করেন।[৫৪] তারা এর একটি সংক্ষিপ্তসারও প্রকাশ করেন।[৫৫] এই পুস্তিকার প্রতি *মিহির ও সুধাকর* পত্রিকার সমর্থন নিঃসন্দেহে অন্য যাঁরা এর গুরুত্ব হ্রাস করার এবং এটিকে যুক্তিহীন মৌলবাদীদের কাজ বলে অগ্রাহ্য করার চেষ্টা করছিলেন, তাঁদের প্রচেষ্টাকে ম্লান করে দেয়। *মিহির ও সুধাকর* পত্রিকার মালিক ছিলেন পূর্ব বাংলার সুপরিচিত নেতা নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী। তিনি স্থানীয় ঢাকা মুসলিম এসোসিয়েশনের সুপারিশে সরকার কর্তৃক প্রাদেশিক আইন পরিষদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। যদিও একজন সরকারি কর্মকর্তা দাবি করেছিলেন যে, ময়মনসিংহে ১৯০৭ সালের ভয়ঙ্কর দাঙ্গার আগে এই পুস্তিকা বিতরণ করা হয় নি[৫৬], তথাপি এর বিষয়বস্তু ইতিমধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছিল। এই পুস্তিকার লেখক ইব্রাহিম খাঁ ছিলেন ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইলের অধিবাসী।

১৯০৭ সালের দাঙ্গার সূত্রপাত হয়েছিল রাজনৈতিক অঙ্গনে মুসলিম লীগের আগমনের ফলে, যেখানে কংগ্রেস এবং স্বদেশী আন্দোলন ইতিমধ্যে একচেটিয়া প্রভাব বিস্তার করেছিল। এক্ষেত্রে ত্রিপুরা জেলার কুমিল্লা শহর মুসলিম লীগ এবং বঙ্গভঙ্গবিরোধী

৫৩. This and other extracts are quoted in R. C. Majumdar, *History of the Freedom Movement in India*, Vol. II (Calcutta 1963), 118-19. ইংরেজি থেকে বাংলায় অনূদিত।

৫৪. ঐ, 119-20.

৫৫. *Mihir-O-Sudhakar*, 31 May 1907, BNNR, No. 23, Para 66

৫৬. R. Nathan, Officiating Commissioner, Dacca Division to Chief Secretary, East Bengal and Assam, July 1907, December 1907, Prog. No 57-63, IHP., Pub., Pol

বিক্ষোভকারীদের শক্তি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে পরিণত হয়। কুমিল্লায় মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ১০,৫০০ এবং হিন্দুর সংখ্যা ছিল ৮,৫০০ জন। হিন্দুদের অনেকেই ছিলেন ভদ্রলোক হিন্দু। স্থানীয় কংগ্রেসপন্থী সংগঠন 'ত্রিপুরা পিপলস এসোসিয়েশন' এবং তার পাঁচটি শাখা বঙ্গভঙ্গ বর্জন আন্দোলনে সক্রিয় ছিল। এছাড়াও এই সংগঠন গ্রামগুলিতে "জনগণকে পুলিশের নির্যাতন থেকে রক্ষা করার জন্য" বিভিন্ন প্রতিরক্ষা সমিতি গড়ে তুলেছিল। ১৯০৭ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি কুমিল্লায় কোন গুরুতর দুর্ঘটনা ছাড়াই 'ত্রিপুরা জেলা সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। 'ত্রিপুরা পিপলস এসোসিয়েশন' এবং বিপিন চন্দ্র পাল এই সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন। এর সংগঠকগণ কলকাতার ব্যারিস্টার আবদুর রসুলকে সম্মেলনে সভাপতিত্ব করার জন্য নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেন। নিঃসন্দেহে বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে মুসলমানদের সমর্থন প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল। স্থানীয় মুসলমানদের অনেকেই অবশ্য এই পদক্ষেপকে স্পষ্টত একটি অন্যায্য দাবি বলে গণ্য করেছিলেন। ১৯০৭ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথমদিকে একটি সরকারি বিবরণে উল্লেখ করা হয় যে, জেলার মুসলমানরা বঙ্গভঙ্গবিরোধীদের "অত্যাচারের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে তাদের অসন্তোষ প্রকাশ করছিল" এবং বিভিন্ন সভার আয়োজন করছিল।[৫৭]

১৯০৭ সালের মার্চ মাসে কুমিল্লায় প্রথম উল্লেখযোগ্য সহিংসতার ঘটনা ঘটে। বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন এবং জেলা সম্মেলন প্রতিরোধ করার জন্য বঙ্গভঙ্গের সমর্থক মুসলমানরা কুমিল্লায় সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের একটি শাখা প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেয়। ত্রিপুরা জেলা সম্মেলন সমাপ্তির দুই সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে নবাব সলিমুল্লাহ এবং নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী ঢাকা থেকে এই উদ্দেশ্যে কুমিল্লায় আগমন করেন। এই জেলায় নবাব সলিমুল্লাহর জমিদারি ছিল। প্রায় ছয় শত মুসলমানের[৫৮] একটি দল রেল স্টেশনে ঢাকার নবাবের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং মিছিল সহযোগে তাঁকে প্রধান বাজারে নিয়ে যায়। মিছিলে প্রায় ৩০ থেকে ৪০ জন স্বেচ্ছাসেবক ছিল। আচকান এবং পায়জামা পরিহিত এই স্বেচ্ছাসেবকরা 'মারহাবা' এবং 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি প্রদান করছিল। পথিমধ্যে হিন্দুদের একজন কর্মী নবাবকে লক্ষ্য করে একটি ঢিল নিক্ষেপ করে। আরেকজন কর্মী নবাবের অতিক্রমণের সময় তাঁকে একটি ঝাড়ু প্রদর্শন করে বলে অভিযোগ করা হয়। এর ফলে সামান্য বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। মিছিলের ক্ষুব্ধ সদস্যরা জোরপূর্বক যোগীরাম পাল নামক জনৈক ব্যক্তির কাপড়ের দোকানে প্রবেশ করে এবং দোকানের লোকজনদের ভীতি প্রদর্শন করে। সেই সন্ধ্যায় মুসলমানদের একটি দল ঢিল নিক্ষেপ ও অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে বাজারে ফিরে আসে। তারা আরো কিছু দোকান ভাঙচুর করে, লুটপাট করে এবং সেখানকার লোকদের মারধোর করে।

৫৭. "An Account of the Swadeshi Movement (1903-1907)", 64.

৫৮. *The Statesman*. 6 March 1907.

কুমিল্লার হিন্দুরা বাজারে মুসলমানদের আক্রমণে ভীত হয়ে পড়ে। এছাড়াও ক্ষতিগ্রস্ত অভিযোগকারীদের প্রতি কার্যকর কিংবা সহানুভূতিশীল সাড়া প্রদানে পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের ব্যর্থতাও তাদের শঙ্কিত করে তোলে। মার্চের ৫ ও ৬ তারিখে স্কুল ও কলেজের হিন্দু ছাত্রদের অধিকাংশ এবং উকিলবর্গ সম্ভাব্য আক্রমণ হতে তাদের পরিবারের নিরাপত্তা বিধানের উদ্দেশ্যে ক্লাশ ও আদালতে যোগদান থেকে বিরত থাকে। ৫ তারিখের প্রধান ঘটনা ছিল নবাবের ব্যক্তিগত সচিবকে এক দল হিন্দুর লাঠি দ্বারা প্রহার। তবে চূড়ান্ত এবং সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ঘটনা সংঘটিত হয় পরবর্তী সন্ধ্যায়। একদল মুসলমান মিছিল সহযোগে শহর প্রদক্ষিণ এবং 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি প্রদান করতে থাকে। এক পর্যায়ে লাঠি বহনকারী একদল হিন্দুর সাথে তাদের সংঘর্ষ বাঁধে। অতঃপর পুলিশ তাদের বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এর পর মিছিল পুনরায় আরম্ভ হয় এবং এই পর্যায়ে একজন মুসলমান রুটিবিক্রেতা গুলিবিদ্ধ হয় এবং তার মৃত্যু ঘটে। এই ব্যক্তি মিছিলে অংশগ্রহণ করেছিল অথবা দর্শক হিসেবে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল। এই ঘটনার জের হিসেবে কয়েকজন জঙ্গি হিন্দু কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাদের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ আনা হয়। এদের মধ্যে একজন পুলিশ সাবইন্সপেক্টরও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।[৫৯]

গুলিবর্ষণের ঘটনার পর হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ কুমিল্লায় অধিকতর গোলযোগ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে সরকারের সাথে সহযোগিতা শুরু করেন। অবশ্য রক্তক্ষয়ের দিক থেকে একটি গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনা ছাড়া কুমিল্লার গোলযোগ তেমন গুরুতর ছিল না। অন্যদিকে হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় জড়িত হিন্দু আসামীদের মুসলমানদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে শাস্তি প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু হাইকোর্ট অভিযুক্তদের আপীলের রায়ে এই শাস্তি মওকুফ করে দেয়। সম্ভবত গুলিবর্ষণের ঘটনা কোন পূর্বপরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড ছিল না।

কুমিল্লার গোলযোগ একটি ধারা অনুসরণ করেছিল, যার জের ধরে অন্যান্য স্থানেও এর পুনরাবৃত্তি ঘটে। এই দাঙ্গা দ্রুত নিম্নবর্গের লোকদের মধ্যে এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে, যেখানে বঙ্গভঙ্গ সমর্থন কিংবা তার বিরোধিতা কোন বিতর্কিত বিষয় ছিল না। মুসলমান সহিংসতা ছিল হিন্দু সহিংসতারই জবাব, কিন্তু এসব সহিংসতার বিরুদ্ধে স্থানীয় প্রশাসকদের ব্যবস্থা গ্রহণের গতিও ছিল মন্থর এবং এতে এমন ধারণার সৃষ্টি হয় যে প্রশাসন চায়, মুসলমানরা হিন্দু বিক্ষোভকারীদের উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করুক।[৬০] পূর্ব বাংলা সরকারও সহিংসতার ঘটনার একটি একপেশে বিবরণ প্রকাশ করে এবং তার

৫৯. *Report* of E. C. Ryland, Superintendent of Railway Police, 9 March 1907, Unnumbered, 15 May 1907, Prog. (with Nos. 159-71), IHP., Pub.

৬০. H. Luson's letter of 15 March 1907. ১৯০৭ সালের ১২ মার্চের স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় উদ্ধৃত ঘটনার ব্যাপারে ম্যাজিস্ট্রেটের সমালোচনা করা হয়।

বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের ধারণাকে আরো বাড়িয়ে দেয়। এই বিবরণে সরকার মুসলমানদের দায়িত্বকে লঘু করে অভিযোগের দায় বঙ্গভঙ্গবিরোধী বিক্ষোভকারীদের উপর চাপানোর চেষ্টা করে। সরকারি বিবরণ অনুযায়ী একমাত্র লুটতরাজের ঘটনা সংঘটিত হয় দু'জন বারবনিতার গৃহে, যদিও মুসলমানরা নবাবের আগমনের দিন সন্ধ্যায় বাজারের দোকানসমূহে লুটতরাজ করেছিল এবং পরে এজন্য তাদের আদালতে অভিযুক্তও করা হয়েছিল।[৬১]

ঢাকার নবাব হত্যাকাণ্ডে নিহত ব্যক্তির শেষকৃত্য পর্যন্ত কুমিল্লায় উপস্থিত ছিলেন। পরে একটি বিশেষ ট্রেনে সিপাহি প্রহরায় তিনি চাঁদপুরের উদ্দেশ্যে কুমিল্লা ত্যাগ করেন। *মিহির* ও *সুধাকর* পত্রিকা পরে একটি বিবরণ প্রকাশ করে সম্ভবত এই বিশেষ প্রহরার যৌক্তিকতা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে। পত্রিকা উল্লেখ করে, নবাবের কুমিল্লা আগমনের সময় কুমিল্লার নিকটবর্তী স্থানে কিছু হিন্দু তাঁর ট্রেন লাইনচ্যুত করার চেষ্টা করে। তা ছাড়াও নবাবের কুমিল্লা ত্যাগের পর কিছু হিন্দু তরুণ ঢাকার এক মন্দিরে কুমিল্লার গোলযোগে উত্তেজনা সৃষ্টির অভিযোগে নবাবকে হত্যার শপথ গ্রহণ করে বলেও উল্লেখ করা হয়।[৬২] এই শপথ পূর্ণ না হওয়ায় ঢাকায় নবাব নওয়াব আলী চৌধুরীর গৃহে পাথর নিক্ষেপ করা হয়।[৬৩] উপরন্তু স্থানীয় হিন্দুদের রক্ষা করার উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, এমনকি নোয়াখালী ও বরিশাল থেকে হিন্দু স্বেচ্ছাসেবকদের কুমিল্লায় আগমন ঘটে।[৬৪] বস্তুত এই সমস্ত ঘটনা আরো অধিক গোলযোগের সম্ভাবনার দিকেই ইঙ্গিত প্রদান করছিল।

১৯০৭ সালে কুমিল্লায় আর কোন দাঙ্গা সংঘটিত হয় নি। অবশ্য লীগ এবং 'স্বদেশী' দলগুলি ত্রিপুরা জেলায় তাদের সভা অনুষ্ঠান অব্যাহত রেখেছিল। মার্চ মাসের শেষদিকে ত্রিপুরার রাজার অধীন কিছু গ্রামে নতুন করে দাঙ্গার সূচনা হয়। কুমিল্লার সাতাশ মাইল উত্তরে এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় অবস্থিত 'মোগরা' নামে একটি বড় হাটের সন্নিকটবর্তী গ্রামগুলিতে এই দাঙ্গা সংঘটিত হয়। সরকারি মতে, এখানে স্কুলছাত্ররা মুসলমানদের উত্তেজিত করে তোলে। তারা মুসলমানদের বিলাতি পণ্য বিক্রয়ে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে।[৬৫] তবে মূল দাঙ্গায় মুসলমানরা ছিল আক্রমণকারী। নিকটবর্তী একটি নদীর বিলগুলি থেকে আগত 'বদমাশরাও' এদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অবশ্য মুসলমান দাঙ্গাকারীদের বিরুদ্ধে পুলিশ কুমিল্লার তুলনায় এখানে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণে সমর্থ হয়েছিল।[৬৬]

৬১. *The Statesman*, 12 March 1907.

৬২. "An Account of the Swadeshi Movement (1903-1907)", 71

৬৩. East (Dacca), 28 March 1907, EBANNR, No 1, para 11.

৬৪. Note by H Risley, 11 March 1907, May 1907. Prog. Nos. 159-71 IHP., Pub

৬৫. Extracts from ten judgements by the Session Judge and Magistrates of Tippera, Enclosure to H. Le Mesurier, Officiating Chief Secretary, East Bengal and Assam to Secretary, Govt of India, Home Dept., 29 June 1907, July 1907, Prog. No. 192, IHP., Pol.

৬৬. H. Luson's letter of 10 April 1907

কুমিল্লার দাঙ্গা ছাড়াও ১৯০৭ সালে আর যেসব দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছিল সেগুলির প্রতিটি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা সম্ভব নয়। তবে এপ্রিল মাসে ময়মনসিংহ জেলার জামালপুর মহকুমায় যেসব ব্যাপক অনুক্রমিক দাঙ্গার সূচনা হয়েছিল, সেগুলির জের হিসেবে অন্যান্য স্থানেও দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছিল। ময়মনসিংহের দাঙ্গাগুলি কেবল অধিকতর সহিংসই ছিল না, বরং এই দাঙ্গা দেখে বোঝা যায় কিভাবে স্থানীয় এবং বাইরের রাজনৈতিক প্রভাব, সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা, সামাজিক বিভক্তি এবং প্রশাসনিক ভূমিকা একত্রে ব্যাপকভাবে সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি করে। ময়মনসিংহে ১৯০৬ সালের প্রথমার্ধে হিন্দুদের পক্ষে কাজ না করার জন্য কিছু মুসলমানের সিদ্ধান্ত এবং হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ক্রমাবনতির বিষয় ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে জামালপুরে গোলযোগের সূত্রপাত হয় অনেক আগে, ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবরে (বঙ্গভঙ্গ দিবসে)। সেদিন জামালপুরের দোকানদারদেরকে দোকানমালিক গৌরীপুর, রামগোপালপুর এবং নাটোরের জমিদারের কাছারিতে ডেকে নেওয়া হয়। তাদের বৃটিশ পণ্য বিক্রি বন্ধ করতে অঙ্গীকারনামা স্বাক্ষর করতে বলা হয়। মুসলমান ব্যবসায়ীরা এই অঙ্গীকারনামা স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করে। সেজন্য তাদের বিভিন্ন পর্যায়ে বাধা প্রদান করা হয়। জামালপুরের একটি 'ঋণদপ্তর' শীর্ষস্থানীয় মুসলমান ব্যবসায়ীকে এলাকা ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করে। পরবর্তী দেড় বছরে এ ধরনের আরো অনেক ঘটনা ঘটে। স্বেচ্ছাসেবকরা একজন মুসলমান দোকানদারের বিলাতি লবণ নষ্ট করে দেয়। আরেকজন মুসলমান লিভারপুল থেকে প্রেরিত লবণবোঝাই দু'টি মাড়োয়ারি শকট বিক্ষোভকারীদের হাত থেকে উদ্ধার করলে স্থানীয় উকিলগণ তাকে বর্জন করে। একবার বিলাতি কাপড় পরিহিত স্কুলছাত্রদের হয়রানি করা হয় এবং বঙ্গভঙ্গ বর্জনকারীদের একটি দল তাদের কাপড় ছিঁড়ে ফেলে। এই ঘটনাগুলির ক্ষেত্রে অথবা জামালপুরে সংঘটিত একই ধরনের অন্যান্য ঘটনাগুলির ক্ষেত্রেও কোন মামলা দায়ের করা হয় নি স্থানীয় চাপের কারণে অথবা এই মামলাগুলি গ্রহণে তিন জন মুসলমান মোক্তারের অস্বীকৃতির কারণে। এদের মধ্যে একজন মোক্তার ছিলেন 'স্বদেশী' পন্থী এবং অন্য দু'জন তাদের হিন্দু সহকর্মীদের নাখোশ করতে রাজি ছিলেন না।[৬৭]

জামালপুর শহর ছিল ব্রহ্মপুত্র নদীর ধারে এবং রেলপথে ময়মনসিংহ থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ মাইল উত্তর-পশ্চিমে। শহরের জনসংখ্যার অনুপাত ও অবস্থান ছিল কুমিল্লা কিংবা পূর্ব বাংলার অন্যান্য শহরগুলির মতোই। মোট ১৮,০০০ অধিবাসীর মধ্যে তিন ভাগের দুই ভাগেরও কিছু বেশি ছিল মুসলমান। কিন্তু খুব কম সংখ্যক মুসলমানই সঙ্গতিসম্পন্ন ছিল। হিন্দুরা অবস্থান গ্রহণ করেছিল প্রধানত বাজারের ভিতরে অথবা সন্নিকটে। এখানে তারা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। অন্যান্য মহকুমা-সদরের মতো জামালপুরেও সর্বাপেক্ষা

৬৭. Note by L. O. Clarke, District Magistrate, Mymensingh, 17 June 1907. Enclosure No. 2 to R. Nathan, Officiating Commissioner, Dacca Division to Chief Secretary, East Bengal and Assam, July 1907, December 1907, Prog No 57-63, IHP, Pol

প্রভাবশালী হিন্দুদের মধ্যে স্থানীয় আদালতে কর্মরত বিশিষ্ট উকিলগণ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তবে অন্যান্য অধিকাংশ জেলার তুলনায় ময়মনসিংহে বৃহদায়তন জমিদারি ছিল বেশি। সুতরাং গৌরীপুর জমিদারির স্থানীয় পরিচালকগণ এবং নাটোর ও রামগোপালপুর জমিদারির স্থানীয় অংশের নায়েবগণও বৃহৎ হিন্দু ভদ্রলোক সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় সদস্য ছিলেন।[৬৮]

জামালপুর একটি বাৎসরিক মেলা এবং স্নান-উৎসবের কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিল। এখান থেকেই ১৯০৭ সালের দাঙ্গার সূচনা হয়েছিল। জামালপুরের দাঙ্গার কিছুদিন পূর্বে এই মর্মে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, মুসলমানরা স্থানীয় স্নান-উৎসব এবং মেলায় অংশগ্রহণকারী হিন্দুদের আক্রমণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। অন্যান্য জেলাগুলিতেও ইতিপূর্বে ছোটখাটো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূচনা হয়েছিল। 'স্বদেশী' স্বেচ্ছাসেবকদের বর্জন কার্যক্রমের প্রতি মুসলমানদের অসহিষ্ণুতা থেকেই এগুলির উৎপত্তি হয়েছিল। ফলে এ ক্ষেত্রে হলুদ পাগড়ি* এবং স্বদেশী ব্যাজ পরিহিত স্বেচ্ছাসেবকরা বর্জন আন্দোলনে সাহায্য এবং মেলার মহিলা স্নানার্থীদের রক্ষা করার দ্বিবিধ উদ্দেশ্য নিয়ে জামালপুরে আগমন করে।

জামালপুরে ২১ এপ্রিল সংঘটিত প্রথম দাঙ্গায় ছাত্র স্বেচ্ছাসেবকরাই ছিল প্রধান। এর আগের দিন স্থানীয় মুসলমান সমিতি "তীর্থযাত্রীদের রক্ষার অজুহাতে" স্বেচ্ছাসেবকদের আগমনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়।[৬৯] ২১ এপ্রিল সকালে জামালপুরে মুসলমান বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের আক্রমণের গুজবের প্রতিক্রিয়ায় কিছু হিন্দু মেলায় যোগ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পুলিশ অবশ্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তা প্রদান করা হবে বলে ঢোলশোহরত করে জনগণকে আশ্বস্ত করেছিল। কিন্তু তার পরে কি ঘটেছিল পরবর্তীকালে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেওয়ার ব্যাপারে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি হয়েছিল।

সরকারি বিবরণীতে উল্লেখ করা হয় যে, "জমিদারের কর্মচারী, উকিল, মোক্তার" এবং ১৫০ জন স্বেচ্ছাসেবকের একটি দল লাঠি হাতে একটি হাতি নিয়ে মেলায় আগমন করে। তারা 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি প্রদান করে, মুসলমান দোকানদারদের অপমান করে এবং খেলনা, মিষ্টি ও লবণ বিনষ্ট করে।[৭০] হিন্দুরা বলে যে, এই দলে মাত্র তিরিশ জন স্বেচ্ছাসেবক ছিল। তারা মুসলমানদের উত্তেজিত করার অভিযোগ অস্বীকার করে।[৭১] এই

* পুলিশ এবং মধ্যদেশীয় লাঠিয়াল কর্তৃক ব্যবহৃত পাগড়ি, শক্তির চিহ্ন হিসেবে ব্যবহৃত।

৬৮. Nathan's letter of July 1907

৬৯. ঐ।

৭০. "Note on the occurrences at Jamalpur on 21 & 22 April" by R. Nathan, 23 April 1907, July 1907, Prog No. 6-16. IHP., Pol.

৭১. *The Statesman*, 5 May 1907.

মিছিল তীর্থযাত্রীদের রক্ষার জন্য হিন্দুদের শক্তি প্রদর্শনের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়েছিল নাকি বর্জন সমর্থনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়েছিল তা কোন তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে বলা যায় না। যাই হোক, মুসলমানদের একটি দল মেলা থেকে এই মিছিলকে আক্রমণ করে। সারা শহরব্যাপী আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণের এক পর্যায়ে 'দুর্গাবাড়ি' (দুর্গামন্দির) নামক স্থানে তারা একটি মূর্তি ধ্বংস করে। মুসলমান জনতার নাগাল থেকে পালানোর সময় একজন হিন্দু চৌকিদার পানিতে ডুবে মারা যায় এবং অন্য ছয় জন আহত হয়। নিহত ও আহত হওয়ার এবং মন্দির অবমাননার ঘটনা সত্ত্বেও পরপর কয়েকদিন কোন মুসলমানকে গ্রেপ্তার করা হয় নি, বরং পুলিশ এগারো জন হিন্দুকে গ্রেপ্তার করে। এদের মধ্যে গৌরীপুর জমিদারির দুই জন তত্ত্বাবধায়ক এবং ছয় জন উকিল ও মোক্তারও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।[৭২] এবারও সরকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় মুসলমানদের সহিংসতাকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করে বলে হিন্দুরা মত প্রকাশ করে। 'সরকার বাহাদুর' মুসলমানদের পক্ষে বলে প্রচার করা হয়।[৭৩]

দুর্গাবাড়ি ঘটনার পর জামালপুরের হিন্দু এবং মুসলমান উভয়েই পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত সন্দিহান হয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে হিন্দুরা একটি স্থানীয় মসজিদ আক্রমণ করবে বলে মুসলমানদের মধ্যে গুজব ছড়িয়ে পড়ে। সামরিক পুলিশের আগমন এবং মন্দির অবমাননার জন্য অনেক বিলম্বে আট জন মুসলমান গ্রেপ্তার হওয়ায় হয়তো হিন্দুরা দমে গিয়েছিল। কিন্তু নতুন আরেকটি দাঙ্গার আশঙ্কা তখনো ছিল। ময়মনসিংহ থেকে স্বেচ্ছাসেবকরা তাদের হিন্দু ভাইদের সাহায্য করার উদ্দেশ্যে জামালপুর যাওয়ার চেষ্টা করছিল। ২৭ এপ্রিলের পরবর্তী দাঙ্গার দিনে উত্তেজিত হিন্দুরা তাদের গৃহে অবস্থান করলেও মুসলমানদের বিভিন্ন দলকে শহরে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়।[৭৪] এক পর্যায়ে মুসলমানদের কয়েক জন জামালপুরের একজন নেতৃস্থানীয় মুসলমানের বাড়ির সামনে পাঁচ জনের মতো সন্দেহজনক ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে। তারা মুসলমানের ছদ্মবেশে হিন্দু স্বেচ্ছাসেবক বলে প্রমাণিত হয়। তারা সাথে রিভলবার বহন করছিল। মুসলমানরা তাদের ধরার চেষ্টা করলে স্বেচ্ছাসেবকদের একজন গুলি করে এবং তা একজন মুসলমানের উরুতে বিদ্ধ হয়। তখন উত্তেজিত মুসলমানদের আক্রমণের ফলে স্বেচ্ছাসেবকরা 'দয়াময়ী' মন্দিরে আত্মগোপন করে। এই মন্দিরটি রামগোপালপুর জমিদারির কাছারি এলাকায় অবস্থিত ছিল। মুসলমানরা মন্দিরের চারদিক ঘেরাও করলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট মন্দিরের দরজা খোলার নির্দেশ প্রদান করলে মন্দিরের ভিতর থেকে চারটি গুলির আওয়াজ করা হয়।

৭২. ১১ জনের মধ্যে ৬ জনকে ২১ এপ্রিল গ্রেফতার করা হয়।

৭৩. *The Statesman*, 28 April 1907 Also, *Report* by R Garlick, Additional District Magistrate, Mymensingh, 1 May 1907, July 1907, Prog. No. 6-16, IHP., Pol.

৭৪. *The Statesman*, 5 May 1907.

পরদিন এই মন্দির এবং রামগোপালপুর, গৌরীপুর এবং নাটোরের জমিদারির কাছারিসমূহে পুলিশ অস্ত্রের সন্ধানে খানাতল্লাশ করে। হিন্দু অভিযোগকারীদের মতে, পুলিশ লাঠিধারী একদল মুসলমানকে সঙ্গে নিয়ে কাছারিগুলি তছনছ করে। প্রশাসন তাদের তেমন নিরাপত্তা প্রদান করবে না—এই ধারণার বশবর্তী হয়ে সেই দিনই হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি বিরাট অংশ জামালপুর থেকে পালিয়ে যায়। *স্টেটস্‌ম্যান* পত্রিকা সংবাদ প্রকাশ করে যে, প্রায় চারশত হিন্দু পরিবার মুসলমানদের সহিংসতা থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে ময়মনসিংহ শহরে চলে এসেছিল।[৭৫]

এই ঘটনার পর জামালপুর ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসে। জামালপুরের হিন্দু-মুসলমানদের পুনরায় একত্রিত করার প্রচেষ্টায় সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর কিছু ভূমিকা ছিল। সুরেন্দ্রনাথ ময়মনসিংহে যাওয়ার পথে জামালপুরে যাত্রাবিরতি করেন। স্টেশনে এক বিরাট জনতা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে। পরে ময়মনসিংহে তিনি একটি হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সম্মেলনে বক্তৃতা করেন। এই সম্মেলনে প্রায় ষাট জন মুসলমানও যোগদান করে, যারা হিন্দুদের সাথে পর্যায়ক্রমে 'বন্দে মাতরম্' এবং 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি প্রদান করে। কিন্তু ময়মনসিংহ ও জামালপুরের বাইরে ভদ্রলোক এবং পুলিশের তেমন প্রভাব ছিল না। ফলে দাঙ্গা দ্রুত প্রত্যন্ত হাট এবং গ্রামগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। এই এলাকাগুলিতে ১৯০৭ সালের মে মাসে মুসলমানরা ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। আইন-শৃঙ্খলা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে এই পর্যায়ে জামালপুর জেলায় চল্লিশটি 'গোলযোগ' সংঘটিত হয়েছিল। জেলার চব্বিশটি শহর এবং গ্রামে লুটতরাজ করা হয়েছিল।[৭৬] লুটতরাজের পাশাপাশি অগ্নিসংযোগ এবং ব্যাপক সম্পত্তি ধ্বংসের ঘটনাও সংঘটিত হয়। অন্যদিকে স্বীকৃত তথ্য অনুযায়ী হত্যা এবং ধর্ষণের সংখ্যা ছিল স্বল্প, আপাতদৃষ্টিতে এক ডজনেরও কম, যদিও স্পর্শকাতর সংবাদপত্রগুলির বিবরণ একটি ভিন্ন ধারণা দেবার চেষ্টা করে। লুটতরাজের ঘটনাগুলিতে বদমাশ শক্তি সক্রিয় ছিল। এদের মধ্যে "যমুনা নদী ও গারো পাহাড়ের মধ্যবর্তী অংশে অবস্থিত উত্তর-পশ্চিম থানাগুলির উগ্র ও মারমুখী মুসলমান জনগোষ্ঠীও অন্তর্ভুক্ত ছিল।"[৭৭] অবশ্য সংঘটিত লুটতরাজের ঘটনাগুলির কোন নির্দিষ্ট ধারা নির্ণয় করা কষ্টকর। গ্রামগুলি ছিল প্রত্যন্ত অঞ্চলে এবং সেসব গ্রাম থেকে প্রাপ্ত বিবরণও ছিল অপর্যাপ্ত ও অস্পষ্ট। তবে তিনটি গ্রাম বকশীগঞ্জ, দেওয়ানগঞ্জ এবং ফুলপুর ছিল আকারে বৃহৎ। এই তিনটি গ্রামের কোনটিতেই তেমন 'স্বদেশী' বিক্ষোভ দেখা যায় নি।

প্রত্যন্ত পল্লী অঞ্চলের এই দাঙ্গাগুলির ক্ষেত্রে সরকারি নীতি ছিল এগুলির সংবাদ আংশিকভাবে পরিবেশন করা বা একেবারে গোপন করা। তবে সরকারি কর্মকর্তারা সরকারের নিরপেক্ষতার সুনাম গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল বলে উপলব্ধি করেছিলেন।

---

৭৫. *The Statesman,* 3 May 1907

৭৬. Abstract of looting in the Mymensingh District, July 1907, Prog No. 6-16, IHP., Pol.

৭৭. "An Account of the Swadeshi Movement (1903-1907)", 81.

তা ছাড়াও দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। সে কারণে শত শত লোককে গ্রেফতার করা হয় এবং অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তি প্রদান করা হয়। এর পরে পূর্ব বাংলার মুসলমানরা তেমন উগ্রতা প্রদর্শন করে নি। পরবর্তী কয়েক বছরে যে সহিংসতা সংঘটিত হয়েছিল, তার অধিকাংশই ছিল সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রমের ফল।

আরো সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার তুলনায় ১৯০৭ সালের দাঙ্গা মৃদু ছিল বলে মনে হতে পারে। পূর্ব বাংলার তেরোটি জেলার মধ্যে বলা যায় কেবল ময়মনসিংহে দাঙ্গার ব্যাপক বিস্তার ঘটেছিল। কিন্তু ১৯০৭ সালের ঘটনাকে অবশ্যই তার পূর্ববর্তী সময়ের আলোকে বিচার করতে হবে। পূর্ববর্তী দশকগুলিতে বাংলায় গুরুতর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছিল বিরল। অধিকন্তু সাম্প্রতিককালে যেসব বিচ্ছিন্ন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছে, সেগুলি ১৯০৭ সালের মতো সমাজের সমগ্র অংশকে প্রভাবিত করে নি। ১৯০৭ সালে বাংলার সমাজে সাম্প্রদায়িক ধারায় বিভক্ত হয়ে যাওয়ার লক্ষণ দেখা গিয়েছিল। এই বিভক্তির একদিকে ছিল পশ্চিমা শিক্ষিত পেশাজীবী ও জমিদার শ্রেণী এবং অন্যদিকে ছিল ভূমিহীন মজুর ও বদমাশরা। দাঙ্গার ভৌগোলিক বিস্তার সীমিত হলেও ১৯০৭ সালের বসন্তে এই দাঙ্গা ছড়িয়ে যাওয়ার এবং নিয়ন্ত্রণের বাইরে গিয়ে উন্মত্ত রূপ ধারণের আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। ফরিদপুর, ঢাকা, পাবনা এবং রাজশাহী জেলায় চার মাসের মধ্যে বহু সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ঘটে। রাজশাহী জেলার দুটি হাটে মুসলমানদের লুটতরাজের পরে চারশ' জনকে এবং পাবনায় কিছু গোলযোগের পর একশো জনকে গ্রেফতার করা হয়। পাবনা জেলায় কতিপয় মুসলমান হিন্দুদের অধীনে কাজ না করার জন্য মুসলমানদের প্ররোচিত করার চেষ্টা করে এবং এ লক্ষ্যে তারা একটি প্রচার অভিযান পরিচালনা করে।[৭৮] পাবনায় একটি প্রচারপত্রও বিলি করা হয়েছিল বলে উল্লেখ করা হয়। এই প্রচারপত্রে বলা হয়, "হিন্দু শালাদের জানানো যাচ্ছে যে, সাত দিনের মধ্যে তাদের বাড়ি লুট করা হবে।" প্রচারপত্রে প্রশ্ন করা হয়, "কিভাবে এই শালারা সংখ্যায় এত কম হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানদের সাথে বিবাদের সাহস পায়, যাদের উপর এমনকি তাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় জিনিসের জন্যও তারা নির্ভর করে।" মুসলমানদের উদ্দেশ্যে এই প্রচারপত্রে বলা হয়, "হিন্দুদের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন কর, তাদের বাড়ি লুট কর, জোর করে তাদের বৌদের নিকা কর, তাদের মন্দির ভেঙ্গে দাও এবং তাদের মূর্তি ধ্বংস কর। .... তোমাদের বিরুদ্ধে সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে না।"[৭৯]

১৯০৭ সালে বাংলার গ্রামগুলিতে যে আবেগ বিদ্যমান ছিল তা পরিমাপ করার নির্ভরযোগ্য কোন উপায় নেই। তবে কলকাতা, ঢাকা এবং দাঙ্গার কবল থেকে মুক্ত অন্যান্য শহর থেকে প্রকাশিত হিন্দু এবং মুসলমানদের পত্রিকায় প্রকাশিত কিছু প্রবন্ধ,

৭৮. ঐ, 84-5.

৭৯. *Hindu Ranjika* (Rajshahi), 29 May 1907, EBANNR, Part II, No 5, para 532.

সম্পাদকীয় এবং চিঠির ভাষা ছিল সাম্প্রদায়িক বিকারগ্রস্ত। জনগণ ১৯০৭ সালের দাঙ্গার চেয়েও বিশাল আকারের রক্তক্ষয়ী হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার জন্য শারীরিক এবং মানসিকভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করছিল। অবশ্য সরকার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করার দায়িত্ব পালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। সরকারি বিবরণ অনুযায়ী কিছু মুসলমানের বিশ্বাস ছিল যে, প্রতিবেশী হিন্দুদের আক্রমণ করার জন্য তাদের অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে হিন্দুরা বিশ্বাস করেছিল যে, সরকার এবং মুসলমানদের যৌথ আক্রমণের বিরুদ্ধে তাদের একমাত্র নিরাপত্তা তাদের নিজেদের প্রতিরোধশক্তি প্রদর্শন। বলাবাহুল্য, একবার শক্তিপরীক্ষা হয়ে যাওয়ার পর এবং ১৯০৭ সালের দাঙ্গা শেষ হওয়ার পর বঙ্গভঙ্গপূর্ব অবস্থায় সম্পূর্ণরূপে ফিরে যাওয়া সম্ভব ছিল না। মন্দির ও মসজিদের অবমাননা, ধর্ষণ, হত্যাকাণ্ড, সরকারি পক্ষপাতিত্বের সত্য অথবা মিথ্যা কাহিনী জনগণের মনে প্রভাব বিস্তার করে।

*মিহির ও সুধাকর* পত্রিকা একটি ঘটনার উল্লেখ করেছিল। তা এই যে, যশোর ও 'নলডাঙ্গা'র জমিদার তাঁদের মুসলমান প্রজাদের একটি স্বদেশী সভায় যোগ দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। প্রজারা এই নির্দেশ পালনে অস্বীকার করলে জমিদারের আমলা প্রথমে তাদের খাজনা নিতে অস্বীকার করে এবং পরে দীউয়ানি আদালতে তাদের বিরুদ্ধে বাকি খাজনার জন্য মামলা দায়ের করে।[৮০] সিরাজগঞ্জে এক দল মুসলমান সরকারের কাছে ইংরেজি মাধ্যমে 'ইসলামী উচ্চ বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠার জন্য আবেদন করে। তাদের অভিযোগ ছিল, হিন্দু শিক্ষকরা মুসলমান ছাত্রদের বিক্ষোভে যোগদান করার জন্য চাপ প্রদান করছিল।[৮১] অন্যান্য এলাকাগুলিতে বিলাতি পণ্য বিক্রিরত মুসলমান দোকানদারদের হিন্দু মালিকদের বাজার থেকে জোরপূর্বক বের করে দেওয়া হয়।[৮২] হিন্দু মহাজনরা বঙ্গভঙ্গ সমর্থনকারী মুসলমানদের ঋণবন্ধকী তামাদি করতে শুরু করে। তারা মুসলমান পিয়নদের বরখাস্ত করে এবং যেসব প্রজার বকেয়া ছিল ও যারা হিন্দুদের বিরুদ্ধে অত্যাচারের অভিযোগ এনে মিথ্যা মামলা দায়ের করেছিল তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণ করে।[৮৩] সামগ্রিকভাবে পরস্পরের প্রতি বিচিত্র ধরনের কাল্পনিক কিংবা অস্পষ্টভাবে অনুভূত বিদ্বেষ ক্রমশ তীব্র হয়ে উঠে। কুমিল্লা ও জামালপুরে দাঙ্গার পর প্রশাসনের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ থাকার পক্ষে নতুন সরকারি নীতি অথবা ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গরদ কোনটাই বাংলার সামাজিক কাঠামোতে সৃষ্ট এই ফাটলের পূর্ণ সংস্কার করতে পারে নি।

৮০. *Mihir-O-Sudhakar*, 20 July 1906, BNNR, No. 30, para 10.

৮১. Abdul Gaffor (sic) and others, Sirajganj, to Director of Public Instruction, East Bengal and Assam, 20 January 1906, June 1906, Prog. No 177, IHP., Pub.

৮২. *Soltan*, 4 January 1907, BNNR, No. 2, para 2.

৮৩. দেখুন, ৪৪টি স্বদেশী মামলার রায়, Appendix A of September 1910 Prog. No. 43, IHP., Pol., Vol.1, 843.

আধুনিক বাংলার ইতিহাসে ১৯০৭ সালের দাঙ্গা একটি ভেদরেখার সৃষ্টি করেছিল। যদিও বঙ্গভঙ্গের আগে কোন ঘটনা দাঙ্গার উস্কানি দেয় নি, বঙ্গভঙ্গের পরে সৃষ্ট নতুন ঘটনাবলী এবং তৎকালীন পরিস্থিতি একত্রে মিলে এই দাঙ্গার সৃষ্টি করেছিল। এই দাঙ্গার কারণ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে জাতীয়তাবাদীরা একদিকে সরকারি নীতি এবং আরেকদিকে মোল্লাদের প্রচারণাকে দায়ী করেছিল। অন্যদিকে সরকারি কর্মকর্তারা চেয়েছিলেন একদিকে ভূমিব্যবস্থা এবং অন্যদিকে বঙ্গভঙ্গ বর্জনকারীদের উত্তেজনাকে দাঙ্গার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করতে। এই চারটি কারণের তুলনামূলক গুরুত্ব অনুধাবন করতে হলে অবশ্যই সংঘটিত দাঙ্গাগুলির ধরন এবং তাদের পার্থক্য বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। সীমিত উদাহরণ থেকে বলা যায় যে, এই সময় সাধারণভাবে দুই ধরনের দাঙ্গা সংঘটিত হয়—একটি প্রাথমিক পর্যায়ের এবং অন্যটি আনুষঙ্গিক পর্যায়ের। কুমিল্লা ও জামালপুরে সংঘটিত দাঙ্গাগুলি প্রাথমিক পর্যায়ভুক্ত, যেগুলি পরে পার্শ্ববর্তী গ্রাম ও হাটগুলিতে দ্বিতীয় পর্যায়ের দাঙ্গার সূচনা করেছিল। প্রকৃতপক্ষে কুমিল্লা ও জামালপুর শহরে সৃষ্ট দাঙ্গার প্রতিক্রিয়া হিসেবে পল্লী অঞ্চলের দাঙ্গার সূত্রপাত হয়েছিল। সুতরাং পল্লী অঞ্চলের দাঙ্গা কোন স্ব-প্ররোচিত ঘটনা ছিলনা, বরং ধারাবাহিকভাবে একই প্রতিক্রিয়া থেকে এগুলির উদ্ভব হয়েছিল। সেসব অঞ্চলেই দাঙ্গার সূত্রপাত হয়েছিল, যেসব অঞ্চলে জনসংখ্যার বৃহদংশ ছিল হিন্দু ভদ্রলোক এবং রাজনৈতিকভাবে সচেতন, যেখানে হিন্দুদের বর্জন এবং বঙ্গভঙ্গবিরোধী কার্যক্রম মুসলমান দোকানদারদের (জামালপুর) এবং অন্যান্য মধ্যবিত্ত মুসলমানদের (কুমিল্লা) অসন্তুষ্ট করে তুলেছিল। এই উভয় শহরে ইতিমধ্যে সৃষ্ট অসন্তোষ বহিরাগতদের আগমনের ফলে আরো তিক্ত হয়ে উঠেছিল। কুমিল্লায় এই বহিরাগতদের মধ্যে ছিল ফেব্রুয়ারিতে ত্রিপুরা জেলা সম্মেলনে আগত প্রতিনিধিবৃন্দ এবং মার্চের প্রথমদিকে ঢাকার নবাবের প্রেরিত দল। জামালপুরে তীর্থযাত্রী ও স্বেচ্ছাসেবকরা ছিল বহিরাগত। এই উভয় স্থানেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত দলগুলির মধ্যে প্রাথমিক সংঘর্ষের পরে মুসলমান 'উচ্ছৃঙ্খল জনতা' হিন্দু ভদ্রলোকদের আক্রমণ করেছিল। প্রতিটি স্থানে একজন হিন্দু পিস্তল দিয়ে একজন মুসলমানকে গুলি করে বলে বিশ্বাস করা হয়। প্রতিটি স্থানে হিন্দু অধিবাসীদের একটি বড় অংশ শহর ত্যাগ করে চলে যায় এবং উভয় স্থানেই স্থানীয় হিন্দুদের রক্ষার জন্য স্বেচ্ছাসেবকদের আগমন ঘটে।

দ্বিতীয় পর্যায়ের দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছিল প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে, যেখানে শহরের দাঙ্গার খবর ছড়িয়ে পড়েছিল। এক্ষেত্রে অধিকাংশ গ্রামগুলিতেই কোন ভদ্রলোকের বাস ছিল না এবং সেখানে কোন বর্জন আন্দোলনও সংগঠিত হয় নি। এই পর্যায়ের অধিকাংশ দাঙ্গায় 'বদমাশ' নামে চিহ্নিত ব্যক্তিরা জড়িত ছিল। কিন্তু 'বদমাশ' শব্দটি অস্পষ্ট এবং অনেক ক্ষেত্রেই এমন ব্যক্তিকেই বদমাশ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, যার দাঙ্গা সংঘটনকারী হিসেবে দুর্নাম রয়েছে—সে একজন সাধারণ কৃষক অথবা ডাকাত যাই হোক না কেন। ফলে দাঙ্গার বর্ণনা থেকে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে না একজন 'ভদ্র চাষী' কতবার বদমাশদের সাথে যোগ দিয়েছিল।

পল্লীর মুসলমানরা হিন্দুদের আক্রমণ করার জন্য বিভিন্নভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিল, যদিও কত গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিল তা বলা মুশকিল। মোল্লা ও মৌলবিরা মুসলমানদের উত্তেজিত করে বলে অনেক বিবরণে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু তদন্তের পর কম সংখ্যক মোল্লা ও মৌলবিকেই সনাক্ত করা যায়। দেখা যায় যে, যাদের চিহ্নিত করা হয়েছে তারা ছদ্মবেশী বহিরাগত বিক্ষোভকারী, যারা মুসলমানদের ধর্মীয় চেতনায় আঘাত করার চেষ্টা করেছে। নদীয়ার একজন মুসলমানকে রাজশাহীর মুসলমানদের উত্তেজিত করার জন্য গ্রেপ্তার করা হয়।[৮৪] ময়মনসিংহের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আর. গারলিক প্রথমে রিপোর্ট প্রদান করেন যে, তাঁর বিশ্বাস ফুলপুর দাঙ্গা ছিল "মুসলমান মৌলবাদীদের প্রচারণার ফল, যারা সকল হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করার জন্য মুসলমানদের উত্তেজিঁত করে তুলছিল।"[৮৫] কিন্তু পরে আরো পুলিশ রিপোর্ট পাওয়ার পর তিনি লিখেন যে, তাঁর মনে হয় কোন মৌলবি বাস্তবিকপক্ষে ফুলপুর থানায় প্রবেশ করে নি। তাঁর মতে, মুসলমান বিক্ষোভকারীরা আদৌ বহিরাগত ছিল না এবং তারা "ইতিমধ্যেই ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রেখেছিল" যাতে স্থানীয় মুসলমানরা হিন্দুদের লুটতরাজ করার জন্য বদমাশদের সাথে যোগ দেয়।[৮৬] ঢাকা বিভাগের বিভাগীয় প্রশাসক আর. নাথান সামগ্রিকভাবে জামালপুর জেলায় 'হিন্দুবিরোধী বিশৃঙ্খলার সূচনা' প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন যে, মৌলবিদের ভূমিকা সম্পর্কিত গুজবের 'কোন দৃঢ় ভিত্তি ছিল না। কিছু ব্যক্তি মৌলবি ও মোল্লার আবরণে হয়তো অপপ্রচার চালিয়েছিল। কিন্তু বদমাশদের লুটতরাজের তৃষ্ণা ছিল আরো মুখ্য কারণ।' তিনি অবশ্য তা সত্ত্বেও একজন মৌলবির নাম উল্লেখ করেন, যিনি দাঙ্গা শুরু হওয়ার অনতিপূর্বে বকশীগঞ্জের সন্নিকটে প্রচারণা চালিয়েছিলেন। এই ব্যক্তি হিন্দুদের মূর্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চাঁদা প্রদান না করার জন্য এবং তার পরিবর্তে সেই অর্থ নিজেদের সন্তানদের শিক্ষায় ব্যয় করার জন্য মুসলমানদের প্রতি আবেদন জানিয়েছিলেন।[৮৭] কাজেই সরকারি বিবরণসমূহ এবং সংবাদপত্রের অসংখ্য বর্ণনা বিবেচনায় এতে তেমন সন্দেহ নেই বলেই মনে হয় যে, মৌলবি ও ছদ্ম-মৌলবিরা হিন্দুদের আক্রমণ করার জন্য মুসলমানদের প্রতি ধর্মের দোহাই দিয়ে আবেদন জানিয়েছিল এবং মুসলমান দাঙ্গাকারীরা তাদের আবেদনে সাড়া দিয়েছিল।

সাধারণ সরকারি মত ছিল, মৌলবি ও ছদ্ম-মৌলবিরা সফল হয়েছিল আসলে হিন্দু জমিদার, আমলা এবং মহাজনদের বিরুদ্ধে চাষীদের অসন্তোষের কারণে, শক্তিশালী ধর্মীয় কিংবা রাজনৈতিক অনুভূতির তাগিদে নয়। অবশ্য প্রশাসনের প্রচেষ্টা ছিল এর বিরোধীদের

৮৪. "An Account of the Swadeshi Movement (1903-1907)", 85

৮৫. *Report* by R. Garlick, 18 May 1907

৮৬. *Note* by R. Garlick, 22 May 1907, ঐ।

৮৭. Nathan's letter of July 1907.

একটি দুর্বল নৈতিক অবস্থানে নিয়ে যাওয়া। উপরোক্ত ব্যাখ্যা তাদের সেই সাধারণ আকাঙ্ক্ষা পূরণে সাহায্য করেছিল। আর একেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার একটি যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা বলে মনে হতে পারে, তবে সুদীর্ঘকাল যাবৎ বিদ্যমান ভারতীয় চিরায়ত সমাজব্যবস্থা এবং পূর্ববর্তী কৃষক বিদ্রোহের স্বল্প অভিজ্ঞতা এই দাঙ্গার শ্রেণীবিশ্লেষণের জন্য ছিল অনুপযোগী। যদি দাঙ্গাকারীরা তাদের আক্রমণের লক্ষ্য নির্ধারণে কোন পার্থক্য বিচার করতো এবং কেবল সেসব হিন্দুদেরই বেছে নিত, যাদের সাথে তাদের অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিল, তবে ভূমিব্যবস্থার সৃষ্ট অসন্তোষের তত্ত্ব যুক্তিযুক্ত বলে মনে হতো। কিন্তু দুঃখের বিষয়, দাঙ্গাকারী এবং তাদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পরিচয় সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য ছিল বিচ্ছিন্ন বা অসম্পূর্ণ। বকশীগঞ্জে লুটতরাজকারীদের লক্ষ্য নির্বাচনে কিছু প্রভেদ ছিল। তারা প্রথমে হিন্দুদের মূর্তি ধ্বংস করে এই কারণে যে, মূর্তির জন্য মুসলমানরা তাদের হিন্দু ভূস্বামীদের 'ঈশ্বর বৃত্তি' নামে চাঁদা দিতে বাধ্য হতো। ঢাকার প্রশাসকের মতে, পরে তারা সবচেয়ে অত্যাচারী মহাজনদের আক্রমণ করে, লুটতরাজ করে এবং ঋণপত্রসমূহ ধ্বংস করে দেয়। এ প্রক্রিয়ায় মুসলমানরা মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীদের এবং সাধারণ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের স্পর্শ করে নি।[৮৮] বকশীগঞ্জ সম্পর্কে কমিশনারের এই বিশ্লেষণ অবশ্যই তদন্তকারী কর্মকর্তার ধারণার আলোকে বিচার করা প্রয়োজন। তদন্ত কর্মকর্তার বক্তব্য ছিল, মুসলমান জোতদাররা হয়তো যাদের সাথে বিবাদ ছিল তাদের, যেমন 'সাহা' প্রজাদের দোকানে লুটতরাজ করার জন্য বদমাশদের প্ররোচিত করেছিল।[৮৯] দেওয়ানগঞ্জের দাঙ্গাকারীদের সম্বন্ধে ঢাকার কমিশনারের বক্তব্য ছিল, তারাও বকশীগঞ্জের মুসলমানদের মতো একই ধারা অনুসরণ করেছিল। কিন্তু এই বিশ্লেষণে তিনি সম্ভবত এল. ও. ক্লার্ক ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে যে বিবরণ দেন তা উপেক্ষা করেছিলেন। ক্লার্ক-এর মতে, দাঙ্গাকারীরা "বাঙালি মুসলমান এবং মাড়োয়ারি নির্বিশেষে লুটতরাজ করেছিল।"[৯০] জামালপুর মহকুমার মেলামগঞ্জে উচ্ছৃঙ্খল জনতা প্রথমে 'কালীবাড়ি' ধ্বংস করে এবং পরে প্রতিটি বাড়িতে প্রবেশ করে ব্যক্তিগত "প্রতিমাগৃহগুলি ধ্বংস করে দেয়।"[৯১] ফুলপুরে হিন্দু ও মুসলমান চাষীরা বদমাশদের সাথে যোগ দিয়ে হাট ও বাড়িগুলিতে লুটতরাজ করে। ক্লার্ক ভেবেছিলেন যে, দাঙ্গাকারীরা সম্ভবত যেসব দোকানের কাছে তারা ঋণী ছিল সেসব দোকান আক্রমণ করেছিল, যদিও তিনি এ ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন না।[৯২] শেরপুরে স্থানীয় মুসলমানরা তাদের হিন্দু প্রতিবেশীদের বহিরাগত বদমাশদের আক্রমণ থেকে রক্ষা

৮৮. ঐ।

৮৯. L. O. Clarke, District Magistrate, Mymensingh to Commissioner, Dhaka Division, 5 May 1907, July Prog. No. 6-16, IHP., Pol

৯০. L. O. Clarke to Mr. Barniville, 7 May 1907, ঐ।

৯১. Nathan's letter of July 1907.

৯২. *Note* by L. O. Clarke, 18 May 1907, July 1907, Prog. No. 6-16, IHP., Pol

করার জন্য আশ্রয় দিয়েছিল।[৯৩] কুমিল্লার দাঙ্গাগুলি কৃষকদের অসন্তোষের সাথে সম্পর্কিত ছিল না। জামালপুরের দাঙ্গাগুলি ভূমিসংক্রান্ত ছিল কিনা সে বিষয়েও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নেই, যদিও জমিদারের কর্মচারী, মন্দির এবং কাছারিসমূহ আক্রান্ত হয়েছিল। সুতরাং উচ্ছৃঙ্খল জনতার আচরণের প্রমাণের ভিত্তিতে এই উপসংহার টানা সম্ভব নয় যে, ভূমিসংক্রান্ত অসন্তোষের ফলে দাঙ্গাগুলির সৃষ্টি হয়েছিল।

দাঙ্গাকারীদের একটি সাধারণ দাবি এই যে, তারা আইনসম্মত কর্তৃপক্ষের পক্ষে কাজ করেছিল। কখনো কখনো সরকার নিজেই হিন্দুদের উপর আক্রমণের জন্য মুসলমানদের আদেশ দিয়েছিল বলে উল্লেখ করা হয়।[৯৪] কখনো এই আদেশ ঢাকার নবাবের কাছ থেকে এসেছিল বলে উল্লেখ করা হয়।[৯৫] অন্যান্য ক্ষেত্রে সরকার ও নবাব উভয়েই মুসলমানদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন বলে প্রকাশিত হয়। যেমন বকশীগঞ্জে প্রাপ্ত একটি বিজ্ঞপ্তিতে লক্ষ্য করা যায় :

> **আল্লাহু আকবর।**
>
> মুসলমান ভাইদের এতদ্বারা বলা হচ্ছে যে, তারা সকলে জানে কি করে জামালপুরের মুসলমানরা আহূত হয়ে স্বদেশী আন্দোলনে নিযুক্ত হিন্দুদের দমন করেছে।
>
> হে মুসলমান ভাইয়েরা, তোমরা কি জান যে, সরকার এবং নবাব সলিমুল্লাহ সাহেব সম্পূর্ণভাবে আমাদের সমর্থক ? সুতরাং, আমরা আর কার পরোয়া করবো ? লাঠি ধর, হিন্দুদের বিতাড়িত কর, খামা হিন্দুদের মাথা ভেঙ্গে দাও এবং ধুলায় মিশিয়ে দাও। যে এই বিজ্ঞপ্তি ছিঁড়বে সে তার নিজ মাকে অপহরণ করেছে বলে সাব্যস্ত করা হবে।[৯৬]

এই বিশেষ বিজ্ঞপ্তিটি এবং এই ধরনের অন্যান্য বিজ্ঞপ্তি ও গুজবের জন্য কে দায়ী ছিল ? কেউ কি হিন্দুদের উপর মুসলমানদের আক্রমণ সংগঠন করেছিল ? অনেক হিন্দু সন্দেহ প্রকাশ করে, এ ব্যাপারে পূর্ব বাংলা এবং আসাম সরকারই দায়ী ছিল। এই সন্দেহকে আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিসঙ্গত মনে করার পক্ষে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার প্রচুর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এটা খুবই সম্ভব ছিল যে, ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তারা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে সহিংসতার পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। এ কথা অবিশ্বাস করারও কোন বিশেষ কারণ নেই যে, বৃটিশ কিংবা মুসলমান অধস্তন সরকারি কর্মচারিরা সহিংসতা সৃষ্টিতে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। দাঙ্গা সৃষ্টির প্ররোচনার জন্য ঢাকার নবাবদের মতো স্থানীয় নেতৃবৃন্দকেও দায়ী করা যায়। এই নেতৃবৃন্দ হয়তো অনুভব করেছিলেন যে, হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার ফলে স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি মুসলমানদের যেটুকু সমর্থন অবশিষ্ট রয়েছে তার অবসান

৯৩. Nathan to Chief Secretary, East Bengal and Assam, ঐ।

৯৪. দ্রষ্টব্য, L. O. Clarke's letter of 7 May 1907.

৯৫. কুমিল্লা, ফুলপুর এবং বকশীগঞ্জে প্রাপ্ত।

৯৬. July 1907, Prog. No. 6-16, 38, IHP., Pol.

ঘটবে। তা ছাড়াও মুসলমানরা বৃটিশ সরকারের প্রতি এবং বঙ্গভঙ্গের পক্ষে যে সুস্পষ্ট সমর্থন প্রদান করেছিল, তা হয়তো বৃটিশ সরকারকে মুসলমান সম্প্রদায়ের কাছে যথেষ্ট ঋণী করে তুলেছিল। ফলে মুসলমানদের স্বার্থের জন্য উৎকণ্ঠা প্রদর্শনে সরকার যেমন উদ্বুদ্ধ হয়েছিল, তেমনি এর ফলে বঙ্গভঙ্গ রদের সম্ভাবনাও হয়তো কমে এসেছিল। ব্যক্তিগতভাবে নবাব সলিমুল্লাহ সম্বন্ধে সরকারি কর্মকর্তাদের বিশ্বাস ছিল, নবাব মৌলবি কিংবা ছদ্ম-মৌলবিদের সংগঠিত করেন নি; এমনকি তিনি তাদের সমর্থনও করেন নি। নবাব কুমিল্লায় সরকারি নির্দেশ মেনে নিয়েছিলেন এবং দাঙ্গার বিস্তাররোধে সরকারকে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেছিলেন। নবাবের নিজ জমিদারিও দাঙ্গামুক্ত ছিল। কাজেই দাঙ্গা সৃষ্টিতে নবাব সরাসরি দায়ী ছিলেন না—সরকারের এই বিশ্বাস সম্ভবত সঠিক ছিল। প্রকৃতপক্ষে পূর্ব বাংলার মুসলমানদের বেসরকারি নেতার মর্যাদা লাভ করার পিছনে নবাব সলিমুল্লাহর নিতান্ত সাধারণ ব্যক্তিগত গুণাবলীর ভূমিকা ছিল কম।[৯৭] বরং এক্ষেত্রে তাঁর বংশানুক্রমিক খেতাব, তাঁর পুনরুত্থানের জন্য সরকারের প্রচেষ্টা এবং তাঁর উপর বঙ্গভঙ্গসৃষ্ট পরিস্থিতির প্রভাব অধিক ভূমিকা রেখেছিল। সরকার সহিংসতার পক্ষপাতী ছিল না এবং নবাবও সে বিষয়ে অবগত ছিলেন—এই ধারণার ভিত্তিতে এটা প্রায় অসম্ভব বলেই মনে হয় যে, নবাব উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে দাঙ্গার প্ররোচনা দিয়েছিলেন।

আরেকজন সম্ভাব্য ব্যক্তি ছিলেন নবাব সলিমুল্লাহর ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সহযোগী নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী। কলকাতা থেকে প্রকাশিত তাঁর *মিহির ও সুধাকর* পত্রিকার ভূমিকা বিচার করে তাঁকে একজন গোঁড়া সাম্প্রদায়িক নেতা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। তিনি হিন্দু এবং সরকার উভয়ের প্রতিই বিদ্বেষী মনোভাবাপন্ন ছিলেন এবং সহিংসতা সৃষ্টিতে মুসলমানদের উৎসাহ প্রদানেও অগ্রগণ্য ছিলেন। *মিহির ও সুধাকর* পত্রিকাই আপত্তিকর 'লাল ইশতেহার' প্রচারে সাহায্য করেছিল। লীগনেতৃবৃন্দের অনেকে এই পুস্তিকার প্রচার ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিলেন। ১৯০৭ সালে সরকার এই পত্রিকাকে তার হিন্দুবিদ্বেষী চরিত্রের জন্য সতর্ক করে দেয়। নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সে সময় সরকারের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন এবং পত্রিকার সম্পাদককে বরখাস্ত করেছিলেন।[৯৮] কিন্তু ১৯০৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে *মিহির ও সুধাকর* পত্রিকা একটি গান প্রকাশ করে, যার মাধ্যমে এই পত্রিকা যে তার সাম্প্রদায়িক চরিত্র বজায় রেখেছে পুনরায় সেই ধারণা বদ্ধমূল হলো। এই গানের লেখক সম্ভবত বঙ্গভঙ্গবিরোধীদের দ্বারা অনুপ্রাণিত সদ্যসমাপ্ত 'শিবাজী' উৎসবের বিরুদ্ধে এবং মুসলমান দাঙ্গাকারীদের ব্যাপক গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে তাঁর নিম্নরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন :

> দস্যুদের শিরোমণি শিবাজীর বংশধরেরা আমাদের গৌরব কেড়ে নিয়েছে। উচ্ছৃঙ্খল ও দুশ্চরিত্র মারাঠা সোনার দিল্লীর ধ্বংস সাধন করেছে। বর্তমানে আমরা যেকোন ক্ষেত্রে এবং সর্বত্র

৯৭. দ্রষ্টব্য, নবাবের সাথে *The Manchester Guardian* -এর সাংবাদিক Henry W. Nevison -এর সাক্ষাৎকারের বিবরণ, *The New Spirit in India* (London 1908), 189-205.

৯৮. শেখ আবদুর রহিম ছিলেন এর সম্পাদক।

> অপমানের সম্মুখীন। আমরা আমাদের স্বাধীনতা হারিয়েছি, আমাদের সম্পদ এবং আমাদের সম্মান হারিয়েছি। নিজেদের আর কি করে আমরা মুসলমান বলবো ? আমরা সিংহের ঘরে কেবলমাত্র শৃগাল হয়ে জন্মেছি। আমাদের থেকে ধর্মে পৃথক, পিশাচ হতে নিকৃষ্ট কাফের আমাদের সমস্ত সম্পদ লুট করেছে এবং আমাদেরকে ভিক্ষুকেরও অধমে পরিণত করেছে। আমরা বিশ্বাসঘাতক দস্যুর অত্যাচার এবং শঠতাপূর্ণ উপায় বিস্মৃত হয়েছি এবং কেবল অশ্রুবিসর্জন করছি। হিন্দুদের অত্যাচার সকল বাংলা জুড়ে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। আমরা জানি না ভবিষ্যতে আর কত নিষ্পেষণ আমাদের উপর নেমে আসবে । মুসলমানরা আবার জেগে উঠ এবং ভয়শূন্য হয়ে হিন্দু শোষককে তুচ্ছ করে জগতকে পুনরায় (পূর্বের মতো) প্রকম্পিত করো।[৯৯]

কাজেই মনে হয়, নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী হিন্দুদের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক আগ্রাসনকে সমর্থন করেছিলেন, যদিও নবাব এবং দাঙ্গাকারীদের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

সুতরাং কে জনগণের এই সহিংসতাকে পরিচালিত করেছিল বা আদৌ তেমন কেউ ছিল কিনা তা নিশ্চিতভাবে নির্ধারণ করা প্রায় অসম্ভব। জর্জ রুড ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ডের জনসমর্থিত গোলযোগগুলি সম্বন্ধে বলেছিলেন, "একেবারে উপরের সারির নেতৃবৃন্দের সাথে তাঁদের অনুসারীদের খুব কম ক্ষেত্রেই সরাসরি যোগাযোগ ছিল।" নেতৃবৃন্দ প্রায়শই 'জনতার বাইরে' ছিল। তাঁরা তাঁদের বাগাড়ম্বরপূর্ণ বক্তৃতার মাধ্যমে জনতাকে উত্তেজিত করে তুলেছিলেন এবং জনতাকে তাদের উদ্দেশ্য নির্ধারণে সচেতন করে তুলেছিলেন। কিন্তু নিশ্চিতভাবে তাঁরা জনতার প্রতিটি পদক্ষেপকে পরিচালিত করেন নি। রুড ১৭৮০ সালে লন্ডনে সংঘটিত 'নো পোপারি' (রোমান ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে সংঘটিত দাঙ্গা) দাঙ্গাসমূহের ক্ষেত্রে লর্ড জর্জ গর্ডন-এর 'দ্বিধাগ্রস্ত' কিংবা 'অনিচ্ছুক' নেতৃত্বের কথা উল্লেখ করেছিলেন। গর্ডনের বক্তব্য এবং তাঁর কার্যক্রম, বিশেষভাবে রোমান ক্যাথলিকদের উপর তাঁর তীব্র আক্রমণ নিঃসন্দেহে এই দাঙ্গায় ইন্ধন জুগিয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি পূর্ণ সততার সাথে দাবি করতে পারতেন যে, তাঁর বক্তব্য এবং কার্যক্রমের ফলে যেসব ঘটনার সৃষ্টি হয়েছিল, তা একেবারেই তাঁর অভিপ্রেত ছিল না।[১০০] এই ব্যাখ্যা নবাব সলিমুল্লাহ এবং নবাব নওয়াব আলী চৌধুরীর ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যেতে পারে। তাঁরা হয়তো হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের আক্রমণের পরিকল্পনা করেন নি, কিন্তু তাঁরা উভয়েই ছিলেন রুডের ভাষায় জনতার 'বীর', "যাঁদের নামে জনতা দাঙ্গা কিংবা বিদ্রোহ করে, যাঁদের ডাকে তারা সাড়া দেয় ... এবং যাঁদের বক্তৃতা, কর্মসূচি কিংবা ধ্যান-ধারণা জনতার কার্যক্রমে আদর্শগত পটভূমি সৃষ্টি করে অথবা এর সহযোগী হিসেবে ভূমিকা পালন করে।"[১০১]

৯৯. *Mihir-O-Sudhakar,* 21 February 1908, BNNR, No. 9, para 133. ইংরেজি থেকে অনূদিত।

১০০. George Rude, *The Crowd in History A Study of Popular Disturbances in France and England, 1730-1848,* (N. Y. 1964), 248-49.

১০১. ঐ, 247.

মুসলমানদের সহিংসতার জন্য কে দায়ী ছিল তা নির্ধারণের প্রশ্নে এমনকি জনগণকে ছাড়িয়ে খোদ সরকারকেও দায়ী করা যেতে পারে। এটা সম্পূর্ণ সম্ভব এবং এটি একটি বাস্তব ঘটনা বলেই মনে হয় যে, মুসলমানদের গোলযোগের প্রতি লর্ড মিন্টো প্রায়শই তাঁর যে গোপন সমর্থন প্রকাশ করেছিলেন তা মুসলমান নেতৃবৃন্দের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। অন্যদিকে মুসলমান নেতৃবৃন্দ মনে করেছিলেন, সরকার মুসলমানদের মাধ্যমে হিন্দু বিক্ষোভকারীদের প্রতিরোধে ইচ্ছুক। এই ধারণা মুসলমান 'বদমাশদের' কাছে হিন্দুদের লুটতরাজ করার আমন্ত্রণ হিসেবে গণ্য হয়েছিল। ১৯০৭ সালে হিন্দুদের আক্রমণ করার জন্য যেসব মৌলবি এবং অন্যান্য ব্যক্তি মুসলমানদের প্ররোচিত করেছিল, তারা দাবি করেছিল যে, তারা সরকার ও ঢাকার নবাবের হয়ে কাজ করেছিল। যদিও সরকার এবং নবাব উভয়েই সহিংসতা সমর্থন করেছিলেন কিনা সে বিষয়ে কোন জোরালো প্রমাণ নেই, তথাপি সরাসরি সরকারি নীতির প্রভাবেই যে প্রচুর সংখ্যক হিন্দু ও মুসলমান সহিংসতায় লিপ্ত হয়েছিল এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

এ কথা অবশ্যই জোর দিয়ে বলা যেতে পারে যে, বঙ্গভঙ্গের অন্যান্য অনেক উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বাংলায় হিন্দুদের সাথে মুসলমানদের যোগদানের মাধ্যমে একটি রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে উঠার ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদের বিকাশের যেকোন সম্ভাবনা বিনষ্ট করা। তবে 'ভাগ করো এবং শাসন করো' নীতিকে যতো উদ্দেশ্যপূর্ণ ও কুটিল বলে মনে হোক না কেন, বঙ্গভঙ্গের উদ্দেশ্য তেমন ছিল না। উপরন্তু সাধারণভাবে সাম্প্রদায়িকতাকে সমর্থন অথবা নিরুৎসাহিত করার জন্যও এই পদক্ষেপ গৃহীত হয় নি। বরং সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাই ছিল বৃটিশ সরকারের মুখ্য উদ্দেশ্য। বৃটিশ রাজের লক্ষ্য ছিল প্রভাবশালী ভারতীয়দের সমর্থন লাভ করা এবং তাদের বৈধ দাবিসমূহ পূরণ করা। বৈধতা অবশ্য একটি আপেক্ষিক ধারণা এবং ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের সাথে সাথে এই ধারণাও বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে। মুসলিম সম্প্রদায় যখন বৃটিশ সরকারের আস্থা লাভ থেকে বঞ্চিত ছিল এবং ভূমিভিত্তিক অভিজাত শ্রেণী যখন শহরের শিক্ষিত শ্রেণীর সঙ্গে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা পালন করছিল, সেই পর্যায়ে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় হিসেবে মুসলমানরা তাদের প্রতি বিশেষ বিবেচনার জন্য বিভিন্ন সময়ে যে অনুরোধ জানিয়েছিল, সরকার তার জবাবে মুসলমানদের আত্ম-উন্নয়নের উপদেশ প্রদান করেছিল। লর্ড কার্জন নিজেই এক সময় এ ধরনের জবাব প্রদান করেছিলেন। অবশ্য এই উপদেশের পরবর্তী পর্যায়ে সংখ্যালঘুদের অনুকূলে শিক্ষা এবং সরকারি চাকুরিসমূহের ক্ষেত্রে প্রায়শই নীরব সরকারি প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। তা সত্ত্বেও এর ফলে সাধারণভাবে একটি দৃঢ়সঙ্কল্পের অনুপস্থিতির লক্ষণই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। সম্পূর্ণরূপে হস্তক্ষেপ না করার সরকারি নীতি বাংলায় তখনই পরিত্যক্ত হয়েছিল, যখন কংগ্রেস মানসিকভাবে শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা অর্জনে সক্ষম হয় এবং যখন মুসলমানদের মধ্যে আরো অধিক মাত্রায় কংগ্রেসের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ার ভীতি দেখা দেয়। সুতরাং এই অর্থে বঙ্গভঙ্গ ছিল মুসলমান সম্প্রদায়কে কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ন করার

একটি প্রচেষ্টা। পাশাপাশি এর লক্ষ্য ছিল মুসলমানদের মধ্যে কংগ্রেস থেকে স্বতন্ত্র একটি সাম্প্রদায়িক স্বার্থ জাগিয়ে তোলা এবং কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একটি প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলমান শক্তি গড়ে তোলা। অন্য অর্থে সাম্প্রদায়িক বিভক্তি কেবল বঙ্গভঙ্গের ফলই ছিল না, এটি ছিল বঙ্গভঙ্গের একটি সচেতন উদ্দেশ্য। লর্ড কার্জনের সাথে বঙ্গভঙ্গের প্রধান দায়িত্ব পালন করেছিলেন যে স্যার হার্বার্ট রিজলে, তিনিও বঙ্গভঙ্গের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সুস্পষ্ট মত প্রকাশ করেছিলেন। বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা পর্যায়ে তিনি বলেছিলেন, "আমাদের একটি প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে বিভক্তি সৃষ্টি করা এবং এর মাধ্যমে আমাদের শাসনের বিরোধী শক্তিশালী দলকে দুর্বল করে তোলা।" বলাবাহুল্য, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, তিনি হিন্দু কংগ্রেসীগণ থেকে মুসলমানদের পৃথক করতে চেয়েছিলেন। রিজলে 'কংগ্রেসী কুচক্রীদের' কথা উল্লেখ করেছিলেন, তাঁর ভাষায়, "যাঁদের সার্বক্ষণিক প্রচেষ্টা হলো নেতৃস্থানীয় মুসলমানদের তাঁদের (কংগ্রেসীদের) প্রভাবে চলে আসার পরামর্শ প্রদান করা। প্রধানত ঢাকার নবাবের প্রভাবের কারণে তাঁরা এতদিন পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছিলেন। যদি ঢাকাকে নতুন প্রদেশের রাজধানী করা হয়, তবে বাংলার মুসলমানদের আকর্ষণ করার সম্ভাবনা আরো ক্ষীণ হয়ে উঠবে।"[১০২]

হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের পরিচালিত করার জন্য সরকার কেবল বাংলাকে বিভক্তই করে নি, উদ্দেশ্যমূলকভাবে মুসলমানদের রাজনৈতিক প্রতিপত্তির পুরাতন দিনগুলির কথা উল্লেখ করেছিল। পূর্ব বাংলা সফরের সময় "লর্ড কার্জন কি নীতি অনুসরণ করবেন" সে সম্বন্ধে ভাইসরয়ের পরিষদ আলোচনা করেন। কেবল এর পরেই লর্ড কার্জন "অতীতের মুসলিম সুবাদার এবং রাজাদের সময় থেকে" পূর্ব বাংলার মুসলমানদের মধ্যে যে একতার অভাব ছিল সে সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন। সরকারি কর্মকর্তাগণ মুসলমানদের সাথে তাঁদের ব্যক্তিগত আলোচনায় তাদের (মুসলমানদের) অতীত শাসনের উদাহরণের সদ্ব্যবহার করেছিলেন কিনা বলা যায় না, তবে ১৯০৭ সালের দাঙ্গার সময় সাধারণের মধ্যে এমন ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল। সরকারি বক্তব্য এবং নীতি এই ধারণা প্রচারে সাহায্য করেছিল। যেমন, লর্ড মিন্টো এবং তাঁর ব্যক্তিগত সচিব ডানলপ স্মিথ উভয়ে ভূতপূর্ব নবাবি শাসন সংক্রান্ত প্রশ্নটির রাজনৈতিক জটিলতা নিয়ে যথেষ্ট স্পর্শকাতর ছিলেন। ১৯০৭ সালে লর্ড ক্লাইভের উদ্দেশ্যে একটি স্মৃতিফলক প্রতিষ্ঠার সময় তাঁদের সাহায্য প্রার্থনা করা হলে ডানলপ স্মিথ তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেছিলেন যে, বর্তমান 'অশান্ত এবং গোলযোগপূর্ণ' পরিস্থিতিতে মুসলমানরা যেখানে ব্যাপকভাবে সরকারের প্রতি তাদের আনুগত্য প্রকাশ করেছে, সেখানে "বাংলায় মুসলমান সাম্রাজ্যের অবসান ঘটিয়েছিল যে ব্যক্তি তাঁর স্মৃতিরক্ষণ" হয়তো মুসলমান নেতৃবৃন্দকে অসন্তুষ্ট করে তুলবে।[১০৩] সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিবর্তে কেবলমাত্র মুসলমানদের আনুগত্য লাভের জন্য ডানলপ স্মিথের এই উদ্বেগ প্রকৃতপক্ষে সে সময়ে সরকারি নীতির বৈশিষ্ট্যেরই পরিচয় বহন করে।

১০২ . Risley's Note of 6 December 1904, February 1905, Prog No. 155-67, IHP., Pub.

১০৩. Martin Gilbert, *Servant of India*, (London 1966), 88.

বঙ্গভঙ্গের নেপথ্যে যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কাজ করেছিল তা বিশ্লেষণ পরবর্তীকালের বৃটিশ আচরণ ও নীতির ব্যাখ্যা প্রদানে সাহায্য করে। নিঃসন্দেহে বঙ্গভঙ্গের ফল ছিল সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বৃদ্ধি। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা সম্বন্ধে বৃটিশ সরকারের মন্তব্যসমূহের গভীর বিশ্লেষণে দেখা যায়, এই ঘটনা আকস্মিক কিংবা অনাকাঙ্ক্ষিত উপজাত কোনটিই ছিল না। বরং সরকারি নীতির একটি উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষের একটি পরিস্থিতি সৃষ্টি করা। পূর্ব বাংলা এবং আসাম নিয়ে নতুন প্রদেশ সৃষ্টির অর্থ ছিল মুসলমানদের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে একটি ভৌগোলিক অভিব্যক্তি প্রদান করা। অন্যদিকে পৃথক নির্বাচন রাজনীতিতে মুসলমানদের অংশগ্রহণকে একটি ধর্মীয় ভিত্তি প্রদান করেছিল। সুতরাং বৃটিশ সরকার মুসলমানদের একটি পৃথক ও সাম্প্রদায়িক নির্বাচকমণ্ডলী এবং একটি ভৌগোলিক স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে কংগ্রেসী আন্দোলনে তাদের ব্যাপক অংশগ্রহণের সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করতে চেয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে সরকারি কর্মকর্তারা এই সম্ভাবনা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। ১৯০৬ সালের অক্টোবর মাসে সিমলা প্রতিনিধিদলের সাথে লর্ড মিন্টোর সাক্ষাতের আগে স্যার থিওডোর মরিসন (১৯০৫ পর্যন্ত আলীগড় মোহামেডান কলেজের অধ্যক্ষ), স্যার ডেনজিল ইবেটসন (পাঞ্জাবের লেফটেন্যান্ট গভর্নর) এবং লর্ড ল্যামিংটন (বোম্বের গভর্নর)-এর মতো ওয়াকিবহাল ব্যক্তিবর্গ মুসলমানরা অবিলম্বে কংগ্রেসে যোগদান করতে পারে—এই সম্ভাবনা সম্বন্ধে লর্ড মিন্টোকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন।[১০৪] মিন্টোর ব্যক্তিগত সচিব ডানলপ স্মিথ মুসলিম সমর্থনের রাজনৈতিক মূল্য সম্পর্কে বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন। মুসলমানদের রাজনৈতিক অস্থিরতা সম্বন্ধে মুহসিন-উল-মুল্ক-এর সতর্কবাণী পাওয়ার পর এবং লর্ড মিন্টোর সাথে সিমলা প্রতিনিধিদলের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করার পর ডানলপ স্মিথ তাঁর রোজনামচায় লিখেছিলেন, "আমি যা চাচ্ছি তা হচ্ছে সমগ্র ভারত জুড়ে তরুণ মুসলমানদের বিভিন্ন ক্ষুদ্র দল গঠনের প্রচেষ্টা রোধ করা। একবার যদি তারা এই খেলা শুরু করে, তারা আমাদের বাস্তবিকই উদ্বিগ্ন করে তুলতে পারে।"[১০৫] কাজেই মুসলিম রাজনীতি এ সময় একটি সংযোগস্থলে এসে পৌঁছেছিল বলে মনে হয়, যখন একদিকে কিছু তরুণ মুসলমানের কংগ্রেসে যোগদান করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় এবং অন্যদিকে অন্যান্য মুসলিম নেতৃবৃন্দ কংগ্রেস ও আলীগড় নেতৃত্ব থেকে স্বতন্ত্র একটি বৃটিশবিরোধী ধারা অনুসরণের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন। সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে, কংগ্রেস যা দাবি করেছিল তা থেকে স্বতন্ত্র কাঠামোর একটি রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব মুসলমানদের প্রদান করা হবে বলে আশ্বাস দেওয়ার মাধ্যমে তাদের কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলাই ছিল বৃটিশ সরকারের স্বার্থ। পাশাপাশি তাদের উদ্দেশ্য ছিল বৃটিশপক্ষীয় আলীগড় নেতৃবৃন্দকে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা। কারণ এর ফলে তারা তাদের অভিভাবকত্বে অকংগ্রেসী মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে সমর্থ হবে। বৃটিশদের এই উদ্দেশ্যের সাথে তাদের আচরণ, ব্যক্তিগত পর্যায়ে ব্যক্ত মতামত এবং রাজনৈতিক সম্বন্ধে সরকারি কর্মকর্তাদের প্রাপ্ত তথ্যের

১০৪. Das, *India*, 149 (Morison), 167 (Ibbetson), and 233 (Minto).

১০৫. Dunlop Smith's Diary, 10 September 1906. Martin Gilbert, *Servant of India*, 56

সঙ্গতি ছিল বলে মনে হয়। যেমন, মিন্টো একাধিক বার ফুলারের পদত্যাগ এবং সেই সাথে বঙ্গভঙ্গ বর্জন আন্দোলনের বিরুদ্ধে মুসলমানদের বিক্ষোভকে একটি শুভ ঘটনা হিসেবে অভিহিত করেছিলেন।

লর্ড মিন্টো কুমিল্লার দাঙ্গার আগের মাসগুলিতে স্বয়ং বৃটিশ রাজা, মোর্লি, ভারত বিষয়ক সচিব ও সহকারী সচিব এবং পূর্ব বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নরের কাছে প্রেরিত বিভিন্ন পত্রে বারবার মুসলমানদের বিক্ষোভের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছিলেন।[১০৬] তিনি লিখেছিলেন, "ফুলারের অপসারণের বিরুদ্ধে মুসলমানদের বিক্ষোভ যতদিন "নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে না যাবে, ততদিন এটি, আমার বিশ্বাস, আমাদের জন্য যথেষ্ট কার্যকরী হবে।"[১০৭] এমনকি, যখন এই বিক্ষোভ সহিংসতায় রূপ নিয়েছিল, তখন অল্পসংখ্যক সরকারি কর্মকর্তাই এ ব্যাপারে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন বলে মনে হয়। মিন্টো বিশেষত প্রায় উল্লসিত হয়ে উঠেছিলেন যখন দাঙ্গা বন্ধের পক্ষে তাঁর কাছে সরকারি সহায়তার জন্য আবেদন জানানোর উদ্দেশ্যে গঠিত যৌথ হিন্দু-মুসলিম প্রতিনিধিদলে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী এবং অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ যোগদান করতে বাধ্য হয়েছিলেন।[১০৮] অবশ্য সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় সরকারের দৃঢ় হস্তক্ষেপ নিঃসন্দেহে এই দাঙ্গা বন্ধ হওয়ার একটি প্রধান কারণ ছিল। কিন্তু বাংলার রাজনীতিতে এই দাঙ্গা ইতিমধ্যেই তার প্রভাব রেখে গিয়েছিল। দাঙ্গার সময় বঙ্গভঙ্গ বর্জনকারীদের বাধা দেওয়া হয়েছিল। ফলে কুমিল্লার ঘটনার পূর্বে তারা যেরকম সক্রিয় ছিল, পরবর্তীকালে তেমন সক্রিয়ভাবে তারা আর কখনো কাজ করতে পারে নি। সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক তিক্ততর হয়ে উঠেছিল। বৃটিশ সরকারের সততা এবং নিরপেক্ষতার সুনাম ক্ষুণ্ন হয়েছিল বলে সরকারি কর্মকর্তারা যদিও দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন, তথাপি এটা বিশ্বাস করার কারণ আছে যে, সামগ্রিকভাবে তাঁদের অনেকেই সংঘটিত ঘটনা সম্বন্ধে আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। সম্ভবত অল্পসংখ্যক সরকারি কর্মকর্তাই রিজলের মতো একান্ত সততার সাথে স্বীকার করেছিলেন যে, বঙ্গভঙ্গের একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সাম্প্রদায়িক ও আঞ্চলিক বিভক্তি ও তার বিকাশের পৃষ্ঠপোষকতা করা। বঙ্গভঙ্গের পক্ষে রিজলে যেসব যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন, সেগুলোর একটি সম্বন্ধে অধিকাংশ সরকারি কর্মকর্তাই সম্ভবত সচেতন ছিলেন না। রিজলে বলেছিলেন, "বিভক্ত বাংলা কয়েকটি ভিন্ন ধারাকে টেনে আনবে। এটিই এই পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ সুফলগুলির একটি।"[১০৯] এটা বোধগম্য যে, এই উদ্দেশ্যকে ফলপ্রসূভাবে সংযত করা যেতো এবং তাকে মুছে ফেলার জন্য প্রশাসনিক দক্ষতা যুক্তিসিদ্ধভাবে প্রয়োগ করা যেতো। যদিও দেশী মানুষের কল্যাণের ব্যাপারে বৃটিশ রাজের বিঘোষিত নীতি ছিল স্বার্থহীন জনকল্যাণ, তথাপি বঙ্গবিভাগ অবশ্যই ইঙ্গিত দেয় যে, এই পদক্ষেপ মোটেই স্বার্থহীন ছিল না।

১০৬. Das, *India*, 42,45, 151-52, 177 and Philips (ed ), *Evolution of India and Pakistan*, 194
১০৭. Minto to Morley, 22 August 1906, quoted by Das, *India*, 42.
১০৮. Das, *India*, 155.
১০৯. H. H. Risley's *Note* of 7 February 1905, Prog. No. 155-67, IHP., Pub.

# ৭

## বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদ

পিটার হিজ*

বৃটিশ ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনের সাফল্যের পেছনে চারটা কারণ বিদ্যমান ছিল : (১) গণপ্রতিষ্ঠানসমূহের "ন্যায়সঙ্গত" চাপ, (২) অহিংস প্রতিরোধ অভিযান, (৩) সহিংস প্রতিরোধ এবং (৪) বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পালাবদল। স্বাধীনতা আন্দোলনের উপর লিখিত ইতিহাসগুলোর অধিকাংশ দ্বিতীয় ও প্রথম কারণের উপর জোর দিয়েছে, তৃতীয় কারণ সম্পর্কে অপর্যাপ্ত আলোচনা করেছে এবং চতুর্থ কারণকে প্রায় সর্বতোভাবে উপেক্ষা করেছে। সাধারণত ১৮৮৫ সালে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস গঠনের সময় থেকে এই আন্দোলনের সূচনা দেখানো হয়। পরবর্তী পঁয়ত্রিশ বছর ধরে কংগ্রেসের অধিবেশনগুলোতে গৃহীত প্রস্তাবাবলী এর লক্ষ্যপথ নির্ধারণ করেছে। ১৯২০ সালে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী অসহযোগ আন্দোলনের নেতারূপে আবির্ভূত হন। তাই ইতিহাস রচনা পর্যায়ে প্রাধান্য পেয়েছে তাঁর সত্যাগ্রহ অভিযান; এর আগের ও পরের সশস্ত্র বিপ্লবী অভিযানগুলো রয়ে গেছে আড়ালে। ১৯৩৯-এর পর বিশ্বব্যাপী ঘটনাবলীর চাপ এত সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে তাকে উপেক্ষা করা সম্ভব হয় নি। এই সময় থেকে শাসনতান্ত্রিক আলাপ-আলোচনা ও পাকিস্তান আন্দোলনের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হয়।

স্বাধীনতা আন্দোলনের বেশ কিছু ইতিবৃত্ত, বিশেষকরে ভারতে প্রকাশিত এ পর্যায়ের ইতিবৃত্ত বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জঙ্গি প্রতিরোধের বিবরণ দিয়েছে। এগুলোর কোন কোনটা আবার আঠারো ও উনিশ শতকের কৃষক অভ্যুত্থান বা ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের সঙ্গে বিশ শতকের সুসংগঠিত উপনিবেশবিরোধী সংগ্রামের অসমর্থিত যোগসূত্রও আবিষ্কার

প্রযত্নে : শ্রী অরবিন্দ আশ্রম আর্কাইভস এ্যান্ড রিসার্চ লাইব্রেরি, পন্ডিচেরি, ভারত।

করেছে। ১৯০৭ থেকে ১৯৩৪ পর্যন্ত সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের বিবরণ প্রধানত আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তির ভূমিকাকেই তুলে ধরে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত বিষয়টির প্রতি সাধারণ মনোভঙ্গি ছিল স্মৃতিচারণমূলক, যাকে স্মৃতিস্তম্ভ ও শহীদ মিনারেরই বাচনিক রূপ বলা যায়। বিচ্ছিন্নভাবে রাজনৈতিক গতিধারার প্রেক্ষিতে বিচার করলে বৃটিশবিরোধী সন্ত্রাসী তৎপরতাকে বীরোচিত কিন্তু নিষ্ফল কর্মকাণ্ড বলে মনে হয়, যা আতশবাজির প্রদর্শনীর মতো হঠাৎ জ্বলে উঠে নিভে গিয়েছিল।

বর্তমান নিবন্ধে বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদী সমিতিগুলোর উৎপত্তি, গঠনপ্রকৃতি ও কার্যাবলীর বিবরণ দিতে গিয়ে এদের বাইরের চেহারার একটু ভেতরে নজর দিতে চেষ্টা করেছি, যা সাধারণ পাঠকের প্রয়োজন পূরণে সহায়ক হবে। এ পর্যায়ে আমি সবচেয়ে বেশি মনোযোগ দিয়েছি এসব সমিতি গড়ে উঠার সময়কালের (১৯০২-১৯১০) প্রতি, এর সাথে পর্যালোচনাও করেছি মধ্য ১৯৩০-এর দশক ও তার পরবর্তী ঘটনাবলী। বৃটিশ ভারতে সন্ত্রাসবাদ প্রধানত বাংলার ঘটনা। সুতরাং অবিভক্ত বাংলার কর্মকাণ্ডের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে আমি দেশের অন্যান্য অঞ্চলে এ পর্যায়ের ঘটনাবলীর প্রতিও নজর দেবো।

## ১৯০০ সালের পূর্বে সহিংস প্রতিরোধ

এই গ্রন্থের অন্যান্য অংশে আঠারো এবং উনিশ শতকের কৃষক অভ্যুত্থান সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।[১] বৃটিশ শাসনামলের শতাধিক কৃষক বিদ্রোহের খতিয়ান ঐতিহাসিকদের কাছে আছে। এগুলোর মধ্যে অধিক পরিচিত হলো উত্তর বাংলার সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (আঠারো শতকের শেষ দিকে), বাকেরগঞ্জে বিদ্রোহ ও সিলেটে অভ্যুত্থান (দুটোই ১৭৯০-এর দশকে), শেরপুরে "পাগল বিদ্রোহ" (১৮২০ ও ১৮৩০-এর দশকে), নীল বিদ্রোহ (১৮৫৯-৬০ সালে) এবং সুসংগঠিত পাবনা বিদ্রোহ (১৮৭০-এর দশকে)। এগুলো কমবেশি সহিংস বিদ্রোহের রূপ নিয়েছিল। কিন্তু এগুলোর কোনোটাকেই বিদেশী শাসন থেকে মুক্তিলাভের জন্য রাজনৈতিকভাবে সচেতন প্রয়াস বলে গণ্য করা যায় না। প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিক্ষোভের কারণ ছিল স্থানীয়, সাধারণত খাজনা সংক্রান্ত। নীল বিদ্রোহ বিখ্যাত হয়েছে, কারণ কলকাতার বুদ্ধিজীবীদের মনকে তা নাড়া দিয়েছিল। কিন্তু এটা ছিল মূলত একটা শ্রমিক আন্দোলন, যা ক্ষেত্রবিশেষে সহিংস রূপ নিয়েছিল। কিন্তু এটাকে রাজনৈতিক বিদ্রোহ বলা যাবে না। সিলেট অভ্যুত্থানের নায়ক অবশ্য ঘোষণা করেছিলেন, তিনি বিদেশী শাসকদের বিতাড়িত করতে চান। কিন্তু খাজনা সংক্রান্ত বিষয়গুলি ছাড়া তাঁর আর যেসব উদ্দেশ্য ছিল সেগুলি সর্বতোভাবে ছিল ধর্মীয়। উনিশ শতকের ওহাবী ও ফরায়জী আন্দোলনের নেতারাও ছিলেন এ পর্যায়ভুক্ত।

---

১. দেখুন, এই খণ্ডের পঞ্চম অধ্যায়ে সিরাজুল ইসলামের প্রবন্ধ, "অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রতিরোধ আন্দোলন ও কৃষক বিদ্রোহ"।

১৮৫৭-৫৮-এর মহাবিদ্রোহের সময় বাংলা মোটামুটিভাবে শান্ত ছিল। অবশ্য সিরাজুল ইসলাম এই গ্রন্থের অন্যত্র বলেছেন, বিদ্রোহী সৈন্যদের প্রতি কিছুটা সহানুভূতি এখানে বিরাজ করছিল এবং চট্টগ্রাম, ঢাকা ও অন্যান্য স্থানে ছোটখাটো নিয়মভঙ্গ করার ঘটনা ঘটেছিল। উনিশ শতকের শেষদিকে বাংলা প্রেসিডেন্সির সর্বত্র বৃটিশ শাসন দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। শিক্ষিত বাঙালি 'বাবুরা' কেবল নিজ প্রদেশেই নয়, বৃটিশ ভারতের সর্বত্র প্রাপ্তিসাধ্য অধস্তন পদগুলোর বিরাট অংশ গ্রাস করে। এবং মেকলের ঘোষণা অনুসারে এই বাঙালি বাবুরা ছিলেন সবচেয়ে কম জঙ্গি এবং নির্বীর্য। তাদের নির্বীর্যতা রমণীসুলভ দুর্বলতার পর্যায়ে পড়ে। ভারতের সকল "জনগোষ্ঠীর" মধ্যে বাঙালিরা সবচেয়ে কম "লড়াকু গুণসম্পন্ন"।

বাঙালিদের এই নতুনত্বহীন বাঁধাধরা জীবন যাপনের আরেকটা দিক ছিল। একই বাঙালি বাবুদের সম্পর্কে বৃটিশ পর্যবেক্ষকরা অভিযোগ করেন যে তারা বক্তৃতা দিতে এবং দল গঠন করতে পারদর্শী। ১৮৭৬ সালে কলকাতায় ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয়। এর নেতা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ছাত্র ও মধ্যবিত্তের অনানুষ্ঠানিক (informal) নির্বাচকমণ্ডলীর মুখপাত্র হয়ে দাঁড়ান। এই এ্যাসোসিয়েশন ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কনফারেন্সের জন্ম দেয় (১৮৮৩, ১৮৮৫), যেটা পরে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের সাথে একীভূত হয়। দেশের রাজনৈতিক জীবন এভাবে ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করে।

এই সকল সমিতির সভায় যেসব ছাত্র যোগদান করে, তাদের একাংশ নিজেরা কতকগুলো তথাকথিত গোপন সংগঠন গঠন করে, যেগুলোর লক্ষ্য ছিল শারীরিক শক্তি অর্জন এবং "জাতীয়" অনুভূতির স্ফূরণ। বিপিনচন্দ্র পাল বলেছেন, এই সকল ক্লাব ১৮৭০-এর দশকে কলকাতায় পুরো ছাত্র সমাজের মধ্যে গড়ে উঠেছিল। উদাহরণ স্বরূপ প্রায়ই একটা সমিতির কথা বলা হয়, যেটার সদস্য ছিলেন তরুণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কিন্তু এই সমিতির রাজনীতি বা বিপ্লবের দিকে ঝোঁক ছিল না, এর ঝোঁক ছিল রোমাঞ্চকর কর্মকাণ্ডের দিকে। এ সমিতিগুলো পরবর্তীকালের বৈপ্লবিক সমিতিগুলোর উৎস ছিল না, যদিও কখনো কখনো এরকম দাবি করা হয়। আসলে এসব সমিতি তরুণদের শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি করতে আগ্রহী করে তোলে এবং তাদের মধ্যে জাতীয় প্রেরণা জাগিয়ে তোলে। প্রথমে বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জীর রচনাবলী এবং পরে স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতাবলী এ প্রেরণাকে আরো প্রবল করে তোলে। এভাবে বৃটিশের অনুগত বাঙালিরাই বৃটিশ আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে মৌখিক প্রতিরোধ সৃষ্টিতে অগ্রণী ভূমিকা নিল।

জঙ্গি প্রতিরোধে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল মহারাষ্ট্র। ১৮৭০-এর দশকে বাসুদেব বলবন্ত ফাদকে একটা দুর্বলভাবে সংগঠিত সশস্ত্র বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, যার লক্ষ্য ছিল দেশকে হিন্দুধর্মের শত্রুদের কবল থেকে মুক্ত করা। এই অত্যুৎসাহী বিদ্রোহীর দ্বীপান্তর হয়ে যাবার পঁচিশ বছর পর চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয় পুনার ফাদকে চিতপবন ব্রাহ্মণদের

মতো একটা ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন, যেটার প্রকৃতি ছিল বাংলার গোপন সমিতিগুলোর অনুরূপ। কিন্তু এখানে যে শারীরিক প্রশিক্ষণ দেয়া হতো এবং যে বৃটিশবিরোধী ভাবাবেগ সঞ্চার করা হতো, তাতে বিপ্লবের প্রেরণা তেমন ছিল না। ১৮৯৭ সালের মহামারীর সময় ভ্রাতৃদ্বয়ের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হলো যে নগরের প্লেগ কমিশনের চেয়ারম্যান ডাব্লু. সি. র‍্যান্ড তাঁর দৃঢ় অথচ অসংবেদনশীল নীতির কারণে "আমাদের ধর্মের শত্রুতে পরিণত হয়েছেন"। ১৮৯৭ সালের জুন মাসে তাঁরা র‍্যান্ডকে এবং সি. ই. আয়েরস্ট নামক আরেকজন ইংরেজকে গুলি করে হত্যা করেন। এই হত্যাকাণ্ডকে বলা যায় আধা-রাজনৈতিক, যেটার জন্য ভ্রাতৃদ্বয়কে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিল। কংগ্রেস নেতা বি. জি. তিলকের লেখনী তাঁদের অন্তত আংশিক উজ্জীবিত করেছিল। কিন্তু মুখ্যত তাঁরা তাড়িত হয়েছিলেন ব্যক্তিগত ক্ষোভ ও ধর্মীয় উন্মাদনা দ্বারা।

## বাংলায় "আধুনিক" বৈপ্লবিক আন্দোলনের সূচনা

পণ্ডিতগণ প্রতিষ্ঠিত কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে দুই ধরনের সহিংস বিরোধিতা নির্দেশ করেছেন: সনাতন ও "আধুনিক" বিরোধিতা।[২] প্রথমটি হচ্ছে 'প্রাক-রাজনৈতিক', যার উদ্ভব সুনির্দিষ্ট অভাব-অভিযোগের দরুন কৃষক সমাজের প্রতিক্রিয়া থেকে। দ্বিতীয়টির সূত্রপাত করে শহরাঞ্চলের উচ্চ শ্রেণী একটি সচেতন রাজনৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে। আঠারো ও উনিশ শতকের বাংলার কৃষক অভ্যুত্থান সনাতন হিংস্রতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। চাপেকারদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় রাজনৈতিক আত্মসচেতনতা, কিন্তু একে আচ্ছন্ন করেছে ধর্মীয় চেতনা এবং সক্রিয় করেছে ব্যক্তিগত ক্ষোভ। আধুনিক ধরনের সংগঠিত সহিংসতার প্রথম উদ্ভব ঘটেছিল বাংলাতেই, শতাব্দীর সূচনাপর্বে।

এই সময় কলকাতা ছিল বৃটিশ ভারতের রাজধানী এবং জাতীয় রাজনীতির সবচেয়ে সোচ্চার কেন্দ্র। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এই "রাজনীতি" সংগঠিত জনমতের অধিক কিছু ছিল না, কারণ এমন কোনো দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান তখন ছিল না, যার মাধ্যমে ভারতীয়রা ক্ষমতার অংশীদার হতে পারতো। তখন সংবাদপত্রে প্রকাশিত নিবন্ধ, কংগ্রেসের অধিবেশনের সিদ্ধান্ত ও আইনসভায় উত্থাপিত প্রস্তাবাবলী ছিল দেশের রাজনৈতিক জীবনের সীমানাফলক। এই সীমিত ভূখণ্ডের মধ্যেই সুরেন্দ্র নাথ ও মতিলাল ঘোষের মতো ব্যক্তিরা বাংলার শিক্ষিত সমাজের উপর নিজ ব্যক্তিত্বের ছাপ রাখতে পেরেছিলেন। অনুরূপভাবে বোম্বাইতে ফিরোজশাহ মেহতা তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। পুনাতে জনগণের অনুগত্য বিভক্ত হয়ে গেল; একদিকে ছিলেন সতর্ক জি. কে. গোয়েল, আরেক দিকে হঠকারী তিলক। আরো কয়েকটি শহরের কয়েকজন নেতার ভূমিকা বর্ণনা করলে বৈপ্লবিক আন্দোলনের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যাবে।

২. Richard C. Hula, "Political Violence and Terrorism in Bengal" in Michael Stohl, ed., *The Politics of Terrorism* (New York : Marcel Dekker, 1983), 419-45

ভারতীয় রাজনীতির সহজাত নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে প্রথম যাঁরা আওয়াজ তুলেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ। ১৮৯৩ সালে ইংল্যান্ড থেকে ফিরেই তিনি লিখলেন, কংগ্রেস এমনই সংগঠন, যা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করে না, একটিমাত্র সীমিত শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে ; তাই এটাকে সঙ্গতভাবে জাতীয় সংগঠন বলা যায় না।[৩] এই তরুণকে বলা হলো তার সমালোচনার সুর নরম করতে। এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। এক দশক তিনি রাজনীতিভিত্তিক সাংবাদিকতা থেকে দূরে থাকলেন। ক্রমে অরবিন্দের বিশ্বাস জন্মালো যে প্রকৃতপক্ষে ভারতের প্রয়োজন একটি জঙ্গি বৈপ্লবিক আন্দোলন, আমেরিকান, ফরাসি ও আইরিশ আন্দোলনের মতো যেগুলো সম্বন্ধে তিনি ইংল্যান্ডে অধ্যয়ন করেছেন। ১৯০২ সালের দিকে যখন তিনি পশ্চিম ভারতে অবস্থান করছিলেন, তখন সেখানে তিনি এই মতাবলম্বী কিছু ব্যক্তির সংস্পর্শে আসেন। সে সময় যতীন্দ্রনাথ ব্যানার্জী নামক এক বাঙালি তরুণকে বরোদার মহারাজার সেনাবাহিনীতে প্রশিক্ষণ লাভে তিনি সাহায্য করেন। ১৯০২ সালের দিকে ব্যানার্জী কলকাতায় গিয়ে তরুণদের শারীরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও বৈপ্লবিক প্রচারণায় আগ্রহী করে তোলার চেষ্টা করেন। এই শহরে কয়েকটা ক্লাব ও সমিতি তখনো সক্রিয় ছিল। এগুলোর মধ্যে যেটি সম্ভবত সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ছিল সেটি পরিচালনা করতেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্রী সরলা দেবী ঘোষাল। অনুশীলন সমিতি নামে আরেকটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সতীশচন্দ্র বসু ১৯০২ সালে। শীঘ্রই সতীশ প্রমথনাথ মিত্র নামে হাইকোর্টের একজন ব্যারিস্টারকে উদ্যোক্তারূপে পেলেন। অল্পদিনের মধ্যে তিনি নিজেই সমিতির সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। যতীন ব্যানার্জী সরলা দেবী ও পি. মিত্রের সংস্পর্শে এসেছিলেন। এঁরা সতীশের সাথে তাঁর যোগাযোগ ঘটিয়ে দেন। ১৯০২ সালের মার্চে যতীন ও সতীশের দল দু'টি নতুন নামে একীভূত হয়ে গেল। এর নতুন নামটি সতীশ আগেই চয়ন করে রেখেছিলেন।

স্থাপিত হবার পর কয়েক বছর পর্যন্ত অনুশীলন সমিতি বা কলকাতার অন্যান্য দল দেশে তেমন কোনো প্রভাব ফেলতে পারে নি। রাজধানী ও মফস্বল অঞ্চলে কতিপয় যুবককে সমিতির অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং তারা অক্ষতিকর ধরনের কর্মকাণ্ডেই জড়িত হতো। ১৯০৩ সালে অরবিন্দ তাঁর ভ্রাতা বারীনকে পাঠালেন যতীনকে সহায়তা দান করতে। শীঘ্রই এই দুই যুবকের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি হলো, বারীন গুজরাট ফিরে গেলেন। সেই সময় হয়তো আন্দোলনটার স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটতো যদি কিছু রাজনৈতিক ঘটনা সংঘটিত না হতো। ১৯০৫ সালে সরকার ঘোষণা করলো যে তা বঙ্গবঙ্গের বিতর্কিত কর্মসূচি বাস্তবায়নে এগিয়ে যাচ্ছে। জনগণের অভূতপূর্ব প্রতিরোধের মুখে স্বদেশী ও পণ্যবর্জন আন্দোলন জন্মলাভ করলো। প্রদেশের সর্বত্র বড় বড় প্রতিবাদসভা হতে লাগলো। পণ্যবর্জন কার্যকর করার জন্য স্বেচ্ছাসেবীদের দলে দলে সংগঠিত করা হলো। ফলে

৩. Sri Aurobindo, *Bande Mataram · Early Political Writings and Speeches -1* (Pondicherry : Sri Aurodindo Ashram, 1972), 16.

স্বল্পকালের জন্য তা বেশ জোরদার হলো। কিন্তু মুসলমানরা এ আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন রয়ে গেল। তারা এতে অংশগ্রহণের তাগিদ বোধ করেনি। হিন্দুদের মতো বঙ্গভঙ্গের নতুন বিধানের বিরোধিতা করার কোন কারণ মুসলমানদের ছিল না।

যে ক্ষোভ ও উত্তেজনা স্বদেশী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেল, সেটা আরো আমূল পরিবর্তনমুখী ক্রিয়াপদ্ধতিকে উৎসাহিত করলো। বিপিন চন্দ্র পাল ও ব্রহ্মাবান্ধব উপাধ্যায় দ্রুত বর্ধিষ্ণু গোষ্ঠীর মুখপাত্ররূপে অকস্মাৎ খ্যাতিমান হয়ে উঠেন। এই গোষ্ঠী মনে করতো, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ও তাঁর কংগ্রেসী মিত্ররা যতটা প্রয়োজন ততটা আক্রমণশীল নয়। ১৯০৫ সালের শেষদিকে তাঁরা নিজদেরকে একটা নতুন দলরূপে পরিচিত করতে লাগলেন। প্রতিদ্বন্দ্বীদের দ্বারা তাঁরা আখ্যায়িত হলেন চরমপন্থী বলে।

প্রথম থেকেই চরমপন্থী রাজনীতিবিদ ও বৈপ্লবিক সমিতিগুলোর মধ্যে একটা মিথোজীবী সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। তরুণরা নেতাদের কাছ থেকে বস্তুগত সহায়তা ও নৈতিক অনুমোদন পেয়ে আসছিলেন। বিনিময়ে তাঁরা নেতার শক্তির ভিত্তি ও দক্ষিণ হস্ত হিসেবে কাজ করতেন। নেতার মান-মর্যাদা ও বাগ্মিতা সমিতিগুলোকে অনেকখানি এগিয়ে নিল। ১৯০৫ সালের নভেম্বরে বিপিন চন্দ্র ও পি. মিত্র ঢাকা সফর করলেন এবং স্বেচ্ছাসেবীদের প্রতি আহ্বান জানালেন দেশমাতৃকার জন্যে তাদের সর্বস্ব উৎসর্গ করতে। যে আশি জন স্বেচ্ছাসেবী এগিয়ে এলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন উয়ারির বাসিন্দা পুলিন বিহারী দাস। অনুশীলন সমিতির যেটা ব্যস্ততম কর্মক্ষেত্ররূপে গড়ে উঠেছিল সেটারই প্রধান নিয়োগ করা হলো তাঁকে। তাঁর নেতৃত্বে এটা প্রদেশময় "দাবাগ্নির মতো" ছড়িয়ে পড়লো। এর পাঁচ শ'র অধিক শাখা খোলা হলো, যেগুলো পুলিনের সদর দপ্তরের সঙ্গে "ঘনিষ্ঠ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ সাংগঠনিক সূত্র" দ্বারা যুক্ত হলো। ঢাকা অনুশীলন "শীঘ্রই তার মূল সংগঠনকে ছাড়িয়ে গেল" এবং অনেক ক্ষুদ্র দলকে টেনে নিল, বিশেষকরে পূর্ব বাংলায়।[৪] প্রতিষ্ঠার দুই বছরের মধ্যেই এটা স্বদেশী আন্দোলনে যে আগ্রহ অর্জন করেছিল তা হারিয়ে ফেলল এবং বাংলার প্রধান দু'টি বিপ্লবী সংগঠনের একটিতে পরিণত হলো।

অপর দলটি কোন এককেন্দ্রিক দল ছিল না, বরং তাকে একটা শিথিল ধরনের জোট বলা যায়। আলোচ্য বছরগুলিতে এটা একটা বেনামী প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে উঠে। এর আদি পর্ব একটা সংবাদপত্রের আদি পর্বের সাথে যুক্ত এবং এর নামকরণও হয় সেই সংবাদপত্রের নামানুসারে—'যুগান্তর'। ১৯০৬ সালের শুরুতে অরবিন্দ ঘোষ বরোদায় তাঁর পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে কলকাতা চলে আসেন। তাঁর ভ্রাতা বারীনও একই সময়ে কলকাতা পৌঁছান। অরবিন্দের প্রথম কাজ হলো নতুন বেংগল ন্যাশনাল কলেজ প্রতিষ্ঠা

৪. *Memorandum on the History of terrorism in Bengal* (Calcutta : Bengal Government Press, 1933), 4; J. C. Nixon, *An Account of the Revolutionary Organizations in Bengal other than the Dacca Anushilan Samity* (Calcutta : Bengal Secretariat Press, 1917) [hereafter Nixon Report], 9; Charles Tegart, "Terrorism in India", Supplement to the Review of India, November 1932, 8.

করা। তাছাড়া তিনি বারীন ও অন্যান্যদের সাহায্য করলেন একটা খবরের কাগজ প্রকাশ করতে, যেটা খোলাখুলিভাবে একটা বৈপ্লবিক কর্মসূচি দেশের সামনে তুলে ধরবে। 'যুগান্তর'-এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হলো মার্চ মাসে। এ পত্রিকার পাঠকসংখ্যা প্রথমদিকে কম থাকলেও ক্রমশ দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং পত্রিকাটি জনগণের মধ্যে বিপুল সাড়া জাগিয়ে তোলে। এটি জনগণকে দেশ স্বাধীন করার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে আহ্বান জানায়। এ পর্যায়ে বাঙালি তরুণদের বিশেষভাবে উদ্দীপ্ত করে পত্রিকাটির এই আহ্বান : "ভারতকে মুক্ত করতে গিয়ে পাঁচ কোটি লোকের প্রাণবলিদান কি শান্তির ভয়ানক আশ্রয়ে এই নির্বীর্য মৃত্যুর চেয়ে শতগুণ শ্রেয় নয়...জীবনে যদি প্রকৃত মানুষ না হতে পার, মৃত্যুতে হও। তুমি কীভাবে জীবন ধারণ করবে সেটা বিদেশীরা এসে নির্ধারণ করে দিয়েছে, কিন্তু কীভাবে তুমি মরবে সেটা পুরোপুরি তোমার হাতে।"[৫]

একই সময়ে বারীনও চেষ্টা করছিলেন অনুশীলন সমিতির ভাঙা টুকরোগুলোকে নতুন করে জড়ো করতে। এক বা দু'ছর আগে যতীন্দ্র নাথ ব্যানার্জীর সাথে তাঁর বিরোধের কারণে সমিতি ভেঙে গিয়েছিল। স্বদেশী আন্দোলন জনগণের মধ্যে একটা জাগরণ সৃষ্টি করেছিল এবং যুগান্তরের বিপ্লবী বাণী সেটাকে উসকে দিয়েছিল। ফলে তরুণদের দলে টেনে এনে বৈপ্লবিক মন্ত্রে দীক্ষিত করা সহজ হলো। এভাবে এক ঝাঁক ছোট দল বৈপ্লবিক কর্মসূচি শুরু করে। পরে তারা সেই পত্রিকাটির নামে পরস্পর যুক্ত হয়ে যায়, যা ছিল তাদের প্রেরণার উৎস।

১৯০৬ সালের গ্রীষ্মকাল। পত্রিকা সম্পাদনায় কাজ করতে করতে বারীন তখন ক্লান্ত। সে সময়ে সমিতির কলকাতাভিত্তিক এক পৃষ্ঠপোষকের কাছ থেকে তিনি প্রস্তাব পেলেন একটা হত্যা প্রচষ্টায় অর্থ যোগানোর জন্য। এজন্য নির্বাচিত লক্ষ্যবস্তু বাম্পফিল্‌ড ফুলার, পূর্ববাংলা ও আসামের নবগঠিত প্রদেশের লেফটেন্যান্ট গভর্নর। ফুলার সাহেব বাংলার হিন্দুদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন, কারণ তিনি স্বদেশী আন্দোলন দমন করতে চেয়েছিলেন এবং মুসলমানদের প্রতি তাঁর ছিল স্বঘোষিত পক্ষপাত-নীতি। বারীন এবং মেদিনীপুর থেকে ভর্তি করা সদস্য হেমচন্দ্র দাস গৌহাটি থেকে বরিশাল ও সেখান থেকে রংপুর পর্যন্ত ফুলারের পিছু নিলেন। কিন্তু হত্যা-প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকেন। শেষোক্ত স্থানে বারীন প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের জন্য একটি ডাকাতির পরিকল্পনা করেন, কিন্তু এলাকায় পুলিশ এসেছে শুনে সেটা বর্জন করেন। এ দু'টি পরিকল্পিত তৎপরতাই ছিল বাংলায় সম্ভবত এই প্রথম।[৬] এ দুটোর সূত্র ধরে বিঘোষিত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই পরবর্তীকালে কয়েক ডজন হত্যাকাণ্ড এবং কয়েক শ' ডাকাতির পরিকল্পনা করা হয়, যেগুলোর অনেকগুলো সফল হয়। অতএব বলা চলে, এসব পরিকল্পনা বাংলায় সক্রিয় সন্ত্রাসী

---

৫. "যুগান্তর", ১৭ জুন,১৯০৬। বাংলা পাঠ, উমা মুখার্জী ও হরিদাস মুখার্জী, *ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে "যুগান্তর" পত্রিকার দান;* (কলিকাতা : ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিঃ, ১৯৯৬), ১৬০।

৬. বাংলাতে কথোপকথনের সময় সন্ত্রাসবাদীরা যেকোনো প্রচেষ্টাকে (ডাকাতি, হত্যা) *কাজ* বা *কর্ম* বলতেন, যখন ইংরেজিতে কথা বলতেন তখন বলতেন "এ্যাকশন"।

আন্দোলনের সূচনা করে। আনাড়িপনা ও ব্যর্থতার জন্য বারীন ঘোষ ও তাঁর সহযোগীরা বিশিষ্ট হয়ে থাকবেন।

১৯০৭ সালে বারীন ও হেমচন্দ্র ভিন্ন ভিন্ন পন্থায় অধিকতর পেশাদারি দক্ষতা অর্জনের চেষ্টা করলেন। হেমচন্দ্র প্যারিসে যান, সেখানে থাকাকালে নৈরাজ্যবাদীদের সংস্পর্শে আসেন এবং বৈপ্লবিক রাজনীতি ও বোমা তৈরিতে পাঠ নেন। এই নৈরাজ্যবাদীদের কেউ কেউ রুশ ছিলেন।[৭] বারীন কলকাতার উপকণ্ঠে মানিকতলায় তাঁর পরিবারের মালিকানাধীন একটা বাগানবাড়িকে বৈপ্লবিক স্কুল ও অস্ত্রাগারে রূপান্তরিত করেন। এখান থেকেই প্রথম তিনি গুরুত্বপূর্ণ বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতা শুরু করেন। যেমন ১৯০৭ সালের নভেম্বর ও ডিসেম্বরে বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নরকে বহনকারী রেলগাড়ি লাইনচ্যুত করার ব্যবস্থাগ্রহণ এবং ১৯০৮ সালের জানুয়ারি ও এপ্রিলে কলকাতার ম্যাজিস্ট্রেট ও পরবর্তীকালে মুজাফফরপুরের জজ ডগলাস কিংসফোর্ডকে হত্যার কাজ সম্পন্ন করা। মুজাফফরপুরের এই এ্যাকশন ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকি সম্পাদন করেছিলেন। বাংলার ইতিহাসে এটা সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ঘটনাগুলোর অন্যতম। বারীন কর্তৃক পরিকল্পিত অন্য সকল এ্যাকশনের মতো এটাও ব্যর্থ হয়। কিংসফোর্ডের স্থলে দু'জন নিরপরাধ ইংরেজ মহিলা নিহত হলেন। এই "চরম নিষ্ঠুরতা" সশস্ত্র বিপ্লবের কর্মসূচিকে অন্য সমিতিগুলো কর্তৃক ১৯০৭ সালের ডিসেম্বরে পরিচালিত দু'টি সফল অভিযানের চেয়েও প্রকটভাবে জনগণের সামনে নিয়ে এলো। এ দু'টি অভিযানের একটি হচ্ছে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের পরিচালনায় একটা দল কর্তৃক চিংগ্রিপতায় (২৪ পরগনা) ডাকাতি এবং অরেকটি হচ্ছে ঢাকা অনুশীলনের সদস্যগণ কর্তৃক ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বি. সি. এ্যালেনের উপর গুলি বর্ষণ। সেক্রেটারি অব স্টেট জন মরলি মন্তব্য করলেন যে এ্যালেনকে গুলি করার সংবাদ পেয়ে তিনি বিস্মিত হন নি। ভাইসরয় লর্ড মিন্টোকে তিনি লিখলেন, "দীর্ঘদিন ধরে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে সরকারের প্রতি ভারতবাসীর বৈরিতা ক্রমশ স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় বাড়তে থাকবে এবং হত্যাকাণ্ডের পর্যায়েও চলে যাবে।"[৮] এখন থেকে আধুনিক সশস্ত্র বিপ্লব বাংলার রাজনৈতিক দৃশ্যপটের অংশ হয়ে দাঁড়ালো।

### প্রভাব ও মতাদর্শ

মরলির মন্তব্য থেকে মনে হয়, তিনি বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবকে তীব্র রাজনৈতিক অসন্তোষের স্বাভাবিক পরিণতি বলে গণ্য করতেন। পক্ষান্তরে মিন্টো মনে করতেন, এটা নেহাত অনুকরণজনিত। মুজাফফরপুরের ঘটনার পর মরলিকে লেখা পত্রে তিনি বলেন যে

---

৭. এই সময় প্যারিসে নৈরাজ্যবাদ সম্বন্ধে এবং সেখানে হেমচন্দ্রের কার্যাবলী সম্বন্ধে বিশদ জানতে হলে দেখুন, P. Heehs, "Foreign Influences on Bengali Revolutionary Terrorism 1902-1908", *Modern Asian Studies* 28 (1994) : 533-56.

৮. Morley to Minto, 26 December 1907. *Minto Papers* (National Library of Scotland).

চক্রান্তকারীদের লক্ষ্য হচ্ছে ভারতে এযাবৎ অজ্ঞাত হত্যাকাণ্ড সংঘটনের পন্থার বিস্তৃতি ঘটানো, যেটা পাশ্চাত্য থেকে আমদানি করা হয়েছে এবং অনুকরণপ্রিয় বাঙালি ছেলেমানুষের মতো বির্বিচারে গ্রহণ করেছে।[৯] ভাবটা এই যে বাঙালি সশস্ত্র বিপ্লবীদের কোনো প্রকৃত মতাদর্শ নেই। কংগ্রেসের সদস্যরা যেমন সংসদসদস্য হিসেবে খেলছে, তেমনি সশস্ত্র বিপ্লবীরা নৈরাজ্যবাদী হিসেবে খেলায় মেতেছে।

বাংলার সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদে যে বিদেশী প্রভাব ছিল তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, অরবিন্দ আয়ারল্যান্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকার বৈপ্লবিক আন্দোলনগুলো গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। প্রথমদিকের "গুপ্ত সমিতিগুলোর" সদস্যরা মাতসিনির (Mazzini) কাছ থেকে কিছুটা প্রেরণা লাভ করেছিলেন এবং কিছু বইপত্রও অধ্যয়ন করেছিলেন, যেমন টমাস ফ্রস্টের *Secret Societies of the European Revolution*। দু'জন অভারতীয়ও কলকাতার সেই মহলকে প্রভাবিত করেছিলেন, যা থেকে ১৯০২ সালের দিকে বৈপ্লবিক সমিতিগুলোর উদ্ভব হয়। সমিতিভিত্তিক আন্দোলনের যখন সূচনালগ্ন, ঠিক সেই সময় জাপানী সমালোচক কাকুজো ওকাকুরা প্রমথনাথ মিত্র ও আরো কয়েকজনকে বৈপ্লবিক আদর্শ ও সর্ব এশীয় ধ্যান-ধারণায় উজ্জীবিত করেন। এ পর্যায়ে আইরিশ মহিলা মার্গারেট নোবল-এর নাম উল্লেখ করা যায়, যিনি স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণের পর থেকে 'সিসটার নিবেদিতা' নামে পরিচিতি লাভ করেন। অরবিন্দ ঘোষ, সতীশ বসু এবং 'যুগান্তরের সহ-সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ কয়েকজন তরুণের সাথে নিবেদিতার যোগাযোগ ছিল। পিটার ক্রপটকিন, যিনি সন্ত্রাসবাদী ছিলেন না এবং বৈপ্লবিক মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন, তাঁর সাথেও নিবেদিতা পত্রযোগাযোগ রেখেছিলেন। নিবেদিতার নিজেরও কিছু বিপ্লবাত্মক ধ্যান-ধারণা ছিল বলে জানা যায়। উক্ত তরুণদের তিনি কিছু বাছাই করা বই পড়তে দিয়েছিলেন, যেগুলোর মধ্যে বিপ্লবের ইতিহাস সংক্রান্ত বইও ছিল এবং মাতৃভূমির প্রতি তাদের যে কর্তব্য আছে সেটা নিবেদিতা তাদের মনে করিয়ে দিতেন। মোটামুটিভাবে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায়, "বৈপ্লবিক দল" সন্ত্রাসবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ার পূর্বে তিনি এই সংগঠনের নেত্রী ছিলেন। এ ধরনের কিছু অস্পষ্ট প্রভাব ছাড়াও ১৯০৭ সালে প্যারিসে হেমচন্দ্র দাসের সাথে ইউরোপীয় বিপ্লবীদের যে যোগাযোগ ঘটেছিল এটা নিশ্চিত। হেমচন্দ্র তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন যে যেসব বিপ্লবী ধারার রাজনীতির সংস্পর্শে তিনি এসেছেন সেগুলি সম্বন্ধে তিনি অজ্ঞ ও অনাগ্রহী ছিলেন। তাঁর প্রধান আগ্রহের বিষয় ছিল বিস্ফোরণ সংক্রান্ত রসায়ন। এই বিদ্যা তিনি ভালভাবেই রপ্ত করেছিলেন এবং যখন ভারতে ফিরে আসেন তখন সঙ্গে নিয়ে আসেন বিস্ফোরণের উপর হাল আমলের তথ্য সম্বলিত একটা হাতবই।

এই প্রযুক্তিগত ঋণকেই বলা চলে বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবের উপর সবচেয়ে বড় বিদেশী প্রভাব। বৃটিশ আমলারা ভারতীয় আন্দোলনকে অনুকরণশীল বলে অভিহিত করেছিলেন,

৯. Minto to Morley, 6 May 1908, *Morley Papers* (British Library, Oriental and India Office Collection).

কারণ তাঁরা বিশ্বাস করতেন না যে ভারতীয়দের রাজনৈতিক অভাব-অভিযোগগুলো ন্যায়সঙ্গত। মিন্টো ১৯০৮ সালে লিখলেন : "স্বদেশে জনগণ মারাত্মক ভুল করবে যদি তারা মনে করে যে মুজাফফরপুরে যে সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটেছে তা অত্যাচারীর কবল থেকে মুক্তিলাভের জন্য সংগ্রামরত জনগণের তৎপরতার বহিঃপ্রকাশ।"[১০] এটা অবশ্যই মিন্টোর একটা বিরাট ভুল ছিল। বিপ্লবের যাঁরা হোতা ছিলেন, যেমন বিপিন চন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ, তাঁদের মতাদর্শ যদিও অংশত ইউরোপীয় ইতিহাস পাঠের ফলে জন্ম নিয়েছে, মূলত এটা ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্বের বিরুদ্ধে স্বাভাবিক ও দেশজ প্রতিক্রিয়া। তাঁদের মতাদর্শের তিনটা প্রধান লক্ষ্য ছিল : রাজনৈতিক স্বাধীনতা বা স্বরাজ, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, যা স্বদেশী পণ্যবর্জন আন্দোলনেরও লক্ষ্য ছিল এবং জাতীয় শিক্ষার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক মুক্তি অর্জন।

সশস্ত্র বিপ্লবীদের কাছে কেবল প্রথম লক্ষ্যটার সরাসরি আবেদন ছিল। অনুশীলন সমিতির এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় : কোনো জননন্দিত এবং বাহ্যিক স্বদেশী আন্দোলনের সাথে এই সমিতির কোনো প্রকাশ্য সম্পর্ক নেই, যেমন বিলাতি দ্রব্য, বস্ত্র, লবণ, চিনি ইত্যাদি বর্জন। এসব বিষয়ে কোনো বিবাদ বা বিরোধ অথবা মামলায় জড়িয়ে পড়া সমিতির নীতিবিরুদ্ধ।[১১] তেমনি বারীন ঘোষের দলও স্বদেশী পণ্যবর্জন আন্দোলনকে "বানিয়া রাজনীতি" বলে চিহ্নিত করলো। একটিমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ালো রাজনৈতিক স্বাধীনতা। এটা অর্জনের একমাত্র উপায় শক্তিপ্রয়োগ।

শক্তিপ্রয়োগের প্রশ্নে চরমপন্থী রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। বিপিন চন্দ্র পাল এর বিপক্ষে ছিলেন, অরবিন্দ ছিলেন পক্ষে। এটাই ছিল 'বন্দে মাতরমে'র সম্পাদকীয় পর্ষদ থেকে পালকে বহিষ্কার করার অন্যতম কারণ। যদিও অরবিন্দের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধতত্ত্ব (১৯০৭) স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রথম এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ দিকনির্দেশক ছিল, তিনি তাঁর এ অভিমত গোপন রাখেন নি যে একটি জাতি সশস্ত্র তৎপরতার মাধ্যমেই স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে।[১২] কিন্তু যতীন ব্যানার্জী ও বারীন ঘোষকে যখন তিনি সমিতি সংগঠন করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তখন তাঁর চিন্তায় ছিল দুই বা তিন দশককাল ধরে গড়ে তোলা বড় মাপের জঙ্গি অভ্যুত্থানের কথা। অধৈর্য এবং অর্থ প্রদানকারীদের চাপ বারীন ও অন্যান্যদের সশস্ত্র আন্দোলনের দিকে ঠেলে দেয়। যদিও অরবিন্দ বাস্তবিক অর্থে হত্যা ও ডাকাতি সমর্থন করতেন না, তথাপি তাঁর ভ্রাতার তৎপরতা সম্বন্ধে তিনি অবহিত ছিলেন এবং অন্তত এতে মৌন সম্মতি দিয়েছিলেন।[১৩] অহিংসা বনাম হিংস্রতার প্রশ্নটি বাংলায় স্বাধীনতা আন্দোলনের সকল পর্বেই একটা জাগ্রত প্রশ্ন থেকে গিয়েছিল।

১০. Minto to Morley, 27 May 1908. Morley Papers.

১১. Cited in P.K. Ghosh, "Ideology of a Revolutionary Secret Society : Anushilan Samity, 1902-1918". India Past and Present 1 (1984) : 94.

১২. Sri Aurobindo, *On Himself* (Pondicherry: Sri Aurobindo Ashram, 1972), 41.

১৩. এ-সম্পর্কে আলোচনা ও সূত্রের জন্য দেখুন, P. Heehs, "Aurobindo Ghose and Revolutionary Terrorism", *South Asia*, 15 (1992), 47-67.

বিপ্লবীদের মতাদর্শে ধর্মের স্থান নির্ণয় একটা সমস্যা ছিল। অরবিন্দ, বিপিন চন্দ্র, ব্রহ্মাবান্ধব উপাধ্যায় এবং অন্যান্য তথাকথিত "হিন্দু"[১৪] প্রচারক তাঁদের লেখায় প্রায়ই ধর্মীয় চিত্রকল্প ব্যবহার করতেন এবং কখনোবা তাদের আন্দোলনকে "ধর্ম" হিসেবে চিহ্নিত করতেন। ফলে সমকালীন বৃটিশ পর্যবেক্ষকরা এবং পরবর্তীকালের ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের ইতিহাসবিদরা ধর্মের সাথে রাজনীতিকে গুলিয়ে ফেলার দায়ে, এমনকি সাম্প্রদায়িকতার দায়ে তাঁদের আভিযুক্ত করেছেন। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিভেদ বঙ্গভঙ্গবিরোধী বিক্ষোভে রাজনৈতিক রূপ নেয়।[১৫] স্বদেশী স্বেচ্ছাসেবকরা ও মুসলিম রাজনৈতিক কর্মীরা পরস্পরবিরোধী অবস্থান নেয় এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস জন্ম নেয়। সাংবাদিক ও প্রচারপুস্তক রচয়িতারা আক্রমণাত্মক বাকযুদ্ধে লিপ্ত হয়। কুমিল্লা, ময়মনসিংহ ও অন্যান্য স্থানে গুরুতর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়। আত্মরক্ষার ডাক প্রতিশোধের হুংকারে পরিণত হয়।

এই অবনতিশীল পরিস্থিতির মধ্যে অরবিন্দ ও বিপিন চন্দ্র "দেশপ্রেমের ধর্ম" প্রচার করেন। কোনো কোনো সময় জনপ্রিয় ধর্মের ভাষা ব্যবহার করে তাঁরা আন্দোলনকে মেরুকরণের দিকে নিয়ে যেতে সাহায্য করলেন।[১৬] কিন্তু অরবিন্দ ও বিপিন চন্দ্র উভয়েই হিন্দুদের মতো মুসলমানদেরও গড়ে উঠতে থাকা ভারতীয় জাতির অংশ বলে গণ্য করতেন। উভয়েই জাতীয় আন্দোলনে আরো বেশি অংশগ্রহণের জন্য মুসলমানদের আহ্বান জানান এবং দুই সম্প্রদায়ের মাঝে ব্যবধান সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষ্য করে ক্ষুব্ধ হন। অবশ্য উভয়েই মনে করেন, ১৯১০ সালে মরলি-মিন্টো সংস্কার দ্বারা প্রবর্তিত লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে মুসলমানদের পৃথক প্রতিনিধিত্বের বিধান ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের সর্বনাশ ডেকে আনবে। হলোও তাই।

বাংলায় বিপ্লবের প্রধান নায়কদের মতাদর্শে সাম্প্রদায়িক চিন্তা-ভাবনা কোনো স্থান পায়নি। তবে নিম্ন পর্যায়ে অবশ্যই সাম্প্রদায়িকতার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। সমিতির কিছু

১৪. এই বাক্যে উল্লেখিত তিন ব্যক্তির মধ্যে কেহই ঐতিহ্যগতভাবে হিন্দু ছিলেন না, যদিও এঁদের সকলেরই ধর্মীয় পরিচয় হিন্দু বা ব্রাহ্মণ।

১৫. বিশদ জানার জন্য দেখুন, এই খণ্ডের ষষ্ঠ অধ্যায়ে জন আর ম্যাকলেনের প্রবন্ধ, "বঙ্গবিভাগ (১৯০৫) : হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক"।

১৬. এই সম্ভাবনাটা আমি মেনে নিলাম যদিও সমসাময়িক এমন কোনো দলিলপত্র মনে করতে পারছি না, যার দ্বারা পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকদের এই অভিযোগ প্রমাণিত হয় যে জঙ্গিদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ উক্তি মুসলিমদের বিরূপ করে তুলেছে। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যকার সম্পর্ক যখন তিক্ত হয়ে উঠল, তখন দুই পক্ষেরই বক্তব্য হয়ে গেল আরো উস্কানিমূলক। তথাকথিত *Red Pamphlet* ছিল হিন্দুবিরোধী ও স্বদেশীবিরোধী। 'যুগান্তর'-এর মতো পত্রিকা হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের বাঁধাধরা বুলি বাদ দিয়ে চড়া সুর ধরলো। কিন্তু যতটা জানি, সরাসরি কোনো প্রকার উস্কানি দেয়নি। বলাই বাহুল্য, সংরক্ষিত নথিপত্রে তখনকার অংশগ্রহণকারীদের মনোভাবের সঠিক পরিচয় নাও থাকতে পারে। তাছাড়া, দেশমাতৃকাকে একটা হিন্দু দেবী কল্পনা করে তাকে রক্ষা করার ডাক যদি মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন নাও করে থাকে, অনুপ্রাণিত করে নি নিশ্চয়ই। আলোচনা ও উৎসের জন্য দেখুন, P. Heehs, *The Bomb in Bengal* (Delhi : Oxford University Press, 1993), 105-7.

সংখ্যক সদস্য বঙ্গভঙ্গের সমর্থক মুসলমানদের তাঁদের শত্রু বলে গণ্য করতে লাগলেন। সমিতির সদস্য এবং মুসলিম রাজনৈতিক কর্মীরা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় অংশ নেয়। খুব কম সংখ্যক মুসলমানই বৈপ্লবিক দলের সদস্য হয়েছিল। ঢাকা অনুশীলনের সদস্য হওয়ার পথ তাদের জন্য রুদ্ধ ছিল, যদিও নীতিগতভাবে সমিতির সদস্যদের উপর নিষেধাজ্ঞা ছিল "একটা জাতি হিসেবে মুসলমানদের প্রতি কোনো বিরূপ মনোভাব প্রকাশ বা অন্যায় আচরণ না করার জন্য"।[১৭] দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈরিতা নিঃসন্দেহে আন্দোলনকে দুর্বল করে দেয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, এ বৈরিতার কারণে পূর্ব বাংলার সমিতিগুলো মুসলমান কৃষকদের সমর্থন পেল না। এতে সরকারেরই লাভ হলো। কিন্তু বৃটিশরা কোন কোন ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক বিভেদ বাড়িয়ে দিলেও তারা যে এ বিভেদ সৃষ্টি করেনি এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

## সশস্ত্র বিপ্লবী সমিতিগুলোর গঠনকাঠামো

দু'টি বিপ্লবী সংগঠন অনুশীলন ও যুগান্তরের গঠনকাঠামো ছিল ভিন্ন। যুগান্তর ছিল বিভিন্ন নেতার পরিচালিত কয়েকটি দলের সমন্বয়ে গঠিত একটা শিথিল জোট, যারা মাঝে মাঝে একযোগে কাজ করতেন। অনুশীলন ছিল কেন্দ্রীয়ভাবে গঠিত, এর পদসোপান (hierarchy) ছিল উল্লম্ব ধরনের এবং এতে ছিল কঠোর শৃঙ্খলা। দুটো প্রতিষ্ঠানই ছিল কাঠামোগত দিক দিয়ে সম্ভবত সর্বোত্তম ধরনের, যার সাথে যেকোন নির্দিষ্ট সমিতির কাঠামোর কমবেশি মিল রয়েছে।

বারীন ঘোষ কর্তৃক ১৯০৭ সালে মানিকতলায় প্রতিষ্ঠিত গুপ্ত সমিতিকে যুগান্তর ধাঁচের সংগঠনের আদি রূপ বলা যায়।[১৮] তাত্ত্বিকভাবে দেখলে এটার একটা জটিল পদসোপান (hierarchy) ছিল, যেটা ফ্রস্টের *Secret Society*-এর মতো গ্রন্থে বর্ণিত রুশ ধাঁচের। প্রকৃত সাংগঠনিক দলিলে দেখা যায় দু'জন সক্রিয় নেতা বারীন ও উপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর মধ্যে এবং সকল পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের মধ্যে মৌলিক বিভেদ। অরবিন্দ সহ উচ্চ পর্যায়ের নেতাদের কেবল সক্রিয় নেতাদের পরিচিত বলে ধরে নেয়া হয়। প্রত্যেক সদস্যের জন্য তিনটা কার্যবৃত্ত নির্ধারিত ছিল : (১) অর্থ সংগ্রহ, (২) সশস্ত্র বিপ্লবের বাস্তব কার্যক্রম এবং (৩) প্রচারণা। বাস্তব ক্ষেত্রে মৌলিক বিভেদ ছিল "সামরিক" কাজ (দ্বিতীয় কার্যবৃত্ত সম্পর্কিত) এবং "অসামরিক" কাজের মধ্যে।

মানিকতলা ও অন্যান্য দলের সদস্যরা প্রায়ই দাবি করতেন যে ভারতব্যাপী গুপ্ত সমিতিগুলোর বিরাট জালের সাথে তারা যুক্ত। প্রকৃতপক্ষে প্রদেশগুলোর মধ্যে যোগাযোগ

১৭. "Rules of Membership of the Anushilan Samiti'. circa 1913, and a Circular of the Anushilan Samiti, circa 1907, cited in P.K. Ghosh, "Ideology of a Revolutionary Secret Society", 95.

১৮. পরবর্তী বিবরণের ভিত্তি, P. Heehs, " The Maniktala Secret Society: An Early Bengali Terrorist Group, *Indian Economic and Social History Review* 29 (1992), 349-70.

মাত্র কয়েকজন ব্যক্তির মধ্যে সীমিত ছিল, যাঁদের অনেক বন্ধুবান্ধব ছিল পশ্চিম ভারতে। বাংলার অভ্যন্তরে মানিকতলা সমিতির সাথে অন্যান্য দলের যোগাযোগ ছিল, যেমন অনুশীলন এবং আত্মোন্নতি সমিতি। কিন্তু এ সম্পর্ক যতটা ছিল সহযোগিতামূলক, তার চেয়ে বেশি ছিল প্রতিযোগিতামূলক। মানিকতলা সমিতির প্রাথমিক সদস্যরা কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলে যুগান্তর নেটওয়ার্ক তার স্থান দখল করে এবং এই নেটওয়ার্কের বিভিন্ন উপদল ও গোষ্ঠীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়ে যায়।

লিওনার্ড গর্ডনের মতে[১৯], ১৯১০ থেকে ১৯১৫ সালের মধ্যে যুগান্তর নেটওয়ার্কের প্রতিটি উপদল ছিল স্বতন্ত্র ইউনিট এবং একজন নেতা ও তাঁর অনুসারীদের নিয়ে এ ইউনিট গঠিত হতো। এ নেতা দাদা নামে পরিচিত ছিলেন। এ নাম থেকেই স্পষ্ট যে দাদা ছিলেন বিপ্লবী পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য। তিনি ছিলেন একজন গুরু, যিনি শিষ্যদের শেখাতেন বিভিন্ন দক্ষতা ও কৌশল আর পাঠ দিতেন বৈপ্লবিক আদর্শে। গর্ডন মনে করেন, গ্রামবাংলায় যে সামাজিক কাঠামো আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল তা থেকেই দাদা-ব্যবস্থার উদ্ভব। তিনি মনে করেন, তাদের কর্মকাণ্ডের আওতায় রাজনৈতিক হত্যা ও ডাকাতি বাংলার গ্রামাঞ্চলে জমিদার-প্ররোচিত সহিংসতা থেকে উদ্ভূত হতে পারে। লোক সংগ্রহ, অর্থ ও সম্পদ অর্জন প্রভৃতি কাজে দাদারা যেমন পরস্পর সহযোগিতা করতেন, তেমনি প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করতেন।

অনুশীলন সমিতি সম্বন্ধে একটু বিশদ বর্ণনা দেয়া সম্ভব, কারণ ঢাকায় এর কেন্দ্রীয় সংগঠনের বিধিমালা লিপিবদ্ধ হয়েছিল এবং সরকারি প্রতিবেদনে এর পূর্ণ বিবরণ বা সারাংশ প্রকাশিত হয়েছিল।[২০] কিন্তু মনে হয়, এর কোন নিয়মসিদ্ধ গঠনপ্রক্রিয়া সকল শাখার উপর চাপিয়ে দেয়া কার্যত অসম্ভব ছিল। একটা হিসাব অনুসারে এক পর্যায়ে ঢাকা অনুশীলন সমিতির ৫০০ শাখায় ২০,০০০ সদস্য ছিল। অধিকাংশ শাখা বাংলার পূর্বাঞ্চলীয় জেলাগুলোতে স্থাপিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলাসমূহ, বিহার ও যুক্তপ্রদেশেও শাখা খোলা হয়। ফেরারিদের জন্য আসামে গোপন আশ্রয়কেন্দ্রও খোলা হয়েছিল আর ত্রিপুরায় ছিল দুটো খামার।

সম্ভবত পুলিন বিহারী দাসের লেখা একটা অভ্যন্তরীণ বিজ্ঞপ্তিতে (আনু. ১৯০৮) বলা হয় যে এখনকার মতো সুব্যবস্থা করার জন্য সমগ্র বাংলাকে বিভাগ ও উপবিভাগে ভাগ করা এবং কয়েকটি ছোট ছোট সমিতির সমন্বয়ে কেন্দ্রীয় সমিতি গঠন করা বিশেষ জরুরি হয়ে পড়েছে। প্রধানত বৃটিশ প্রশাসনিক বিভাগ অনুসরণে বিন্যাসটা করা হয়েছিল সমিতির

১৯. Leonard A. Gordon. "Portrait of a Bengal Revolutionary". *Journal of Asian Studies* 27 (1968), 197-216.

২০. নিম্নের তথ্যাদির জন্য দ্রষ্টব্য, P. K. Ghosh, "Organizational Structure of a Revolutioanary Secret Society: Anushilan Samiti, 1901-1918", Bengal Past and Present 97 (1978): 139-48. ঘোষ পুলিশের জব্দকৃত সমিতির কাগজপত্র, সরকারি রিপোর্টসমূহ এবং সদস্যদের স্মৃতিকথাসমূহ কাজে লাগিয়েছেন।

সমগ্র কাজ অনুপুঙ্খভাবে ও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পাদনের জন্য সঠিক ব্যক্তিকে সঠিক স্থানে নিয়োগের প্রয়োজনে।[২১] পাঁচ বা দশ সদস্যের কয়েকটা দল একেকজন দলপতির নেতৃত্বে একেকজন অধ্যক্ষ ও অন্যান্য কর্মকর্তা দ্বারা পরিচালিত স্থানীয় সমিতিগুলোর সাথে জোটবদ্ধ হতো। এগুলো ঢাকার কেন্দ্রীয় সংগঠন দ্বারা নিযুক্ত এবং এর নিকট দায়ী জেলা কর্মকর্তার নিকট প্রতিবেদন উপস্থাপন করতো। কেন্দ্রীয় সংগঠনের অধিনায়ক ছিলেন পুলীন দাস এবং তিনি কারারুদ্ধ হলে যাঁরা তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন তাঁরা চারটি কার্যভিত্তিক দলে বিভক্ত ছিল। এ কার্যগুলো হলো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড, সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড, অস্ত্র সংরক্ষণ ও অভ্যন্তরীণ বিভাগের কর্মকাণ্ড। বার্তা আদান-প্রদান করা হতো বিশেষ বাহক মারফত এবং এ বার্তা লিখিত হতো গুপ্ত সংকেতলিপিতে। এই কর্মপ্রক্রিয়া এবং অন্য কার্যাবলীর বিবরণ পাওয়া যায় সাহিত্যিক উৎসে এবং তা অংশত তরুণদের রোমান্টিক নাটকে অভিনয়ের চাহিদা পূরণ করতো।

## সশস্ত্র বিপ্লবী সমিতিগুলোর বিন্যাস

আলোচ্য সময়ে এবং পরেও বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লবী সমিতিগুলো প্রায় পুরোপুরি গঠিত হয়েছিল শহরাঞ্চলের অভিজাত হিন্দু তরুণদের দ্বারা। প্রথম দিকে এতে কোনো সক্রিয় মহিলা সদস্য ছিলেন না, বরং এতে মহিলাদের প্রবেশাধিকার বিশেষভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল এবং কতকগুলো সমিতি সদস্যদের নির্দেশ দিয়েছিল নারীসঙ্গ ত্যাগ করতে। ১৯২৪ সালের পর কয়েকটা দল মহিলাদের প্রবেশাধিকার দেয় এবং কয়েকটা মহিলা দলও গঠিত হয়। হাতে-গোনা কয়েকজন মহিলা গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে অংশ নেন, যাঁদের মধ্যে ছিলেন প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ও বীণা দাস। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে সশস্ত্র বিপ্লবকে কেবল পুরুষদের কাজ বলেই মনে করা হতো।

সমিতিতে হিন্দুদের প্রাধান্যের কারণ সম্পর্কে ইতিমধ্যে আমার বক্তব্য রেখেছি। কিন্তু এই প্রাধান্য চূড়ান্ত ছিল না। জাতীয়তাবাদী মৌলবি লিয়াকত হোসেনের প্রতি সমিতিগুলো অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিল (গোঁড়া মুসলমানরা অবশ্য তাঁকে দলত্যাগী মনে করতেন)। ভবিষ্যতের কংগ্রেস নেতা আবুল কালাম আজাদ "দু'টি বা তিনটি উপলক্ষে" অরবিন্দ ঘোষের সাথে মিলিত হয়েছিলেন এবং বৈপ্লবিক রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং দলগুলোর একটাতে যোগদান করেছিলেন।[২২] তা হলেও সাধারণ নিয়মের খুব বেশি ব্যতিক্রম সম্ভবত হয়নি। "হিন্দু" সশস্ত্র বিপ্লবীদের এক বড় অংশ ধার্মিক ছিলেন না, বিশেষকরে ১৯২০-এর পরে যখন অনেক বাঙালি তরুণ হিন্দু ধর্মচিন্তা বাদ দিয়ে মার্ক্সবাদী বিশ্বচিন্তার অনুসারী হন।

২১. উদ্ধৃত, S. A. T. Rowlatt and others, *Report of the Committee Appointed to Investigate Revolutionary Conspiracies in India* (London. 1918) [অতঃপর Rowlatt Report], ch. 5, para 88.

২২. Maulana Abul Kalam Azad, *India Wins Freedom* (Delhi: Orient Longman. 1984). 4.

সশস্ত্র বিপ্লবী দলগুলোর অধিকাংশ সদস্য এসেছিলেন বাঙালি 'ভদ্রলোক' শ্রেণী থেকে। তাঁদের বৃহদংশ ছিলেন ব্রাহ্মণ, বৈদ্য বা কায়স্থ বর্ণের। আলিপুর বোমা মামলায় (১৯০৯) যে ৩৬ জন সম্বন্ধে রায় দেয়া হয়েছিল তাঁদের মধ্যে দু'জন ছাড়া সবাই ছিলেন উক্ত তিন বর্ণভুক্ত। বাংলায় ১৯০৭ থেকে ১৯১৭ সালের মধ্যে বৈপ্লবিক অপরাধের জন্য দণ্ডপ্রাপ্ত অথবা অপরাধ সংঘটনের সময় নিহত ১৮৬ জনের মধ্যে শতকরা ৮৯ জন ছিলেন ব্রাহ্মণ, বৈদ্য বা কায়স্থ এবং শতকরা ৯ জন ছিলেন নিম্নবর্ণের। তিরিশের দশক জুড়ে একই ধারা অব্যাহত ছিল।[২৩] সর্বত্রই শহরাঞ্চলীয় বিপ্লবী দলগুলোতে উচ্চ শ্রেণীর প্রাধান্য দেখা যায়।[২৪] বাঙালি বিপ্লবী দলগুলোতে 'ভদ্রলোক' শ্রেণীর প্রাধান্যের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা প্রদানের চেষ্টা করা হয়েছে। বৃটিশরা এ আন্দোলনকে চিহ্নিত করলো 'ভদ্রলোক' শ্রেণীর একটা চক্রান্ত হিসেবে। তারা মনে করেছে, এই শ্রেণীর কর্মসংস্থানের সুযোগ কমে যাওয়াই এর কারণ। আধুনিক কালের কোন কোন ইতিহাসবিদ দেখাতে চেয়েছেন, আন্দোলনটা অংশত ছিল 'ভদ্রলোক' শ্রেণীর সেরাংশের (Elite) আপামর জনগণের উপর প্রাধান্য বজায় রাখার চেষ্টা। কিন্তু বোঝা যায় না শিক্ষা এবং চাকরির জগৎ থেকে বেরিয়ে গিয়ে কারাগার এবং মৃত্যুর মখোমুখি হয়ে 'ভদ্রলোক' শ্রেণীর ব্যক্তিরা তাঁদের কোন উদ্দেশ্যটা সাধন করলেন। এই ধারণা আর নির্বিচারে গ্রহণ করা যায় না যে "শ্রেণী" বলে অভিহিত একটা নির্বস্তুক সত্তার বস্তুগত স্বার্থ থাকতে পারে।

উপরে তৃতীয় পর্বে উদ্ধৃত অংশে দেখানো হয়েছে, অরবিন্দ ১৮৯৩ সালেই আন্দোলনে জনগণকে সম্পৃক্ত করার প্রয়োজন উপলব্ধি করেছিলেন। চরমপন্থীরা আন্দোলনে অংশগ্রহণের ভিত্তি সম্প্রসারিত করেছিলেন ঠিক, কিন্তু অভিজাতের প্রতি পক্ষপাত বদলাননি। অনুশীলন ও অন্যান্য সশস্ত্র বিপ্লবী দল চেষ্টা করেছিল নিম্নবর্ণের হিন্দুদের দলভুক্ত করতে। খুব একটা সাফল্য তারা লাভ করেনি।[২৫] তাদের প্রতি কৃষকদের সমর্থন যেমন ছিল না, তেমনি মুসলমানদেরও সমর্থন ছিল না, যার ফলে আন্দোলনটা দুর্বল হয়ে পড়ে।

সকল যুগের, সকল দেশের বিপ্লবীদের মতো বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবী দলগুলোর অধিকাংশ সদস্য ছিল বয়সে তরুণ, অনেকে নেহাত ছেলেমানুষ। আলিপুর মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত ৩৬ জনের গড় বয়স ছিল ২২। এই বয়সের নমুনাকে দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় : এক শ্রেণীতে ছিলেন ৬ জন নেতা, যাঁদের গড় বয়স ৩২ এবং অন্য শ্রেণীতে ছিলেন ৩০ জন সর্বস্তরের সদস্য, যাঁদের বয়সের গড় ২০। সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের প্রধান শক্তি ছিল তরুণরা। আলিপুর অথবা হ্যারিসন রোড মামলায় (১৯০৭-৮) যে ২১ জন আসামি

২৩. P. Heehs, *Bomb in Bengal*, 269.

২৪. Walter Laqueur, *The Age of Terrorism* (Boston: Little, Brown, 1987), 82-3.

২৫. *Terrorism in Bengal*, vol. 2 (Calcutta: Government of West Bengal, 1995), 741.

দণ্ডিত হয়েছিল এবং রাওলাট রিপোর্টে ১৯০৭-১৭ সালের যে ১৮৬ জন "বিপ্লবী অপরাধীর" তালিকা দেয়া হয়েছিল, সারণি-১-এ ৮টা স্তম্ভে বিভক্ত করে তাদের বয়স দেখানো হলো :

**সারণি ১ : বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবীদের বয়স, ১৯০৭-৮ এবং ১৯০৭-১৭**

| | ১০-১৫ | ১৬-২০ | ২১-২৫ | ২৬-৩০ | ৩১-৩৫ | ৩৬-৪৫ | ৪৫+ | নথিভুক্ত নয় |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| আলিপুর নমুনা | ০ | ৯ | ৭ | ৪ | ০ | ১ | ০ | - |
| রাওলাট নমুনা | ২ | ৪৮ | ৭৬ | ২৯ | ১০ | ৯ | ১ | ১১ |

সূত্র : আলিপুর নমুনা : Government of Bengal pol. conf. file no. 24 of 1910. রাওলাট নমুনা : Rowlatt report , Annexure (2). । উভয় নমুনাতেই দণ্ড প্রদানের বা মৃত্যুর সময়ের বয়স ধরা হয়েছে, গ্রেপ্তারের সময়ের বয়স নয়। পিটার হিজের *Bomb in Bengal,* 270 থেকে গৃহীত।

### সশস্ত্র বিপ্লবী সমিতিগুলোর কার্যক্রম

সশস্ত্র বিপ্লবী সমিতিগুলোর কার্যক্রমকে দু'টি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায় : (১) প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম এবং (২) প্রকৃত সশস্ত্র তৎপরতা। প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল দলভুক্তকরণ, প্রচারণা, প্রশিক্ষণ, বাইরের ছদ্ম কার্যক্রম, অস্ত্র সংগ্রহ এবং অর্থ সংগ্রহ। সম্ভাব্য সদস্যদের অধিকাংশকে স্কুল বা কলেজ থেকে দলভুক্ত করা হতো। দলভুক্তির ব্যাপারে বিভিন্ন দলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। দাদারাও সুযোগ পেলেই "ছেলে ধরার" কাজে লেগে যেতেন। মানিকতলা দলে যারা যোগ দিয়েছিল তাদের অনেকে ছিল ছাত্র। 'যুগান্তর' পড়ে তারা যুগান্তর অফিসে চলে আসতো। স্বদেশী যুগের বাঙালিদের উপর এই পত্রিকার প্রভাব ছিল প্রবল। 'যুগান্তর'-এর অনেকগুলো নিবন্ধের একটা সংকলন বেরিয়েছিল 'মুক্তি কোন পথে ?' শিরোনামে। এটা হুহু করে বিক্রি হতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত পুলিশ এটা বাজেয়াপ্ত করলো। এই দলের আরেকটি দুঃসাহসিক প্রকাশনা ছিল 'বর্তমান রণনীতি'। এটা ছিল প্রধান দলের *Modern Weapons and Modern War* -এর ভাবানুবাদ। এর শেষ অধ্যায়ে বাঙালি লেখক প্রশ্ন তুলে ধরেছেন, "কীভাবে একটা দুর্বল নিরস্ত্র জাতি একটা অস্ত্রসজ্জিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করতে পারে ?" লেখকই এ প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বলেন যে জনগণ যদি প্রাণের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জন করতে কৃতসংকল্প হয়, তা হলে কোন কিছুই অসম্ভব নয়। যখন অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে, তখন দেশীয় সৈন্যরা দলত্যাগ করবে, পাহাড়ী উপজাতীয়রা জেগে উঠবে এবং তরুণরা নিজের মতো করে যুদ্ধে নামবে। এ সবের মিলিত ক্রিয়ায় এবং বিদেশী চাপের

মুখে শত্রু দুর্বল হয়ে পড়বে।[২৬] এ ধরনের প্রচারণার প্রভাবে মানিকতলা দল তাদের সময় ও সম্পদের বৃহদংশ ব্যয় করতে লাগলো প্রকাশনায় ও এসব প্রকাশনা বিলির কাজে। মনে হয়, ঢাকার অনুশীলন তার প্রচারণা ও দীক্ষিতকরণ কার্যের জন্য কলকাতার বইপত্রের উপর নির্ভর করতো।

এই দুই সংগঠনের সদস্য হতে গিয়ে দীক্ষা ও গোপনীতা সম্পর্কে বিস্তৃত শপথ নিতে হতো। এটা ছিল ধর্মীয় আচারের মতো। নব্য সদস্যের প্রধান কাজ ছিল শরীরচর্চা—ব্যায়াম, লাঠিখেলা, সাইকেল চালানো, ইত্যাদি। এইসকল কার্য সমিতিকে বাহ্য রূপ দিয়েছিল এবং প্রয়োজনীয় দক্ষতা শিক্ষা দিয়েছিল। অনুশীলনের দলগুলো নৌকা চালনার বিভিন্ন কৌশল শিক্ষা দিত। এটা কাজে লাগতো যখন ছেলেরা নদীতীরের জেলাগুলিতে ডাকাতি করতে যেতো। ধর্মীয় ও বিপ্লবী বইপত্র পাঠেও শিক্ষানবিশরা অনেক সময় ব্যয় করতো। মানিকতলা সমিতি তার বাগানবাড়ির সদর দপ্তরে একটা পূর্ণাঙ্গ স্কুল খুললো। এর পাঠ্যসূচি ছিল অদ্ভুত ধরনের। পনেরো বছর বয়স্ক কৃষ্ণজীবন সান্যালের জবানিতে,"বাগানে উপেন বাবু আমাদের উপনিষদ ও রাজনীতিতে পাঠ দিতেন আর বারীন্দ্র বাবু পড়াতেন গীতা ও রুশ-জাপান যুদ্ধের ইতিহাস এবং উল্লাস বাবু দুই দিন বিস্ফোরক সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়েছিলেন।"[২৭]

নীতিগতভাবে নব্য দলভুক্তদের সংগঠনের "সামরিক দিকে" জড়িত করা হতো না যতদিন না তারা নিজেদের খাঁটি বিপ্লবীরূপে প্রমাণ করতো। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দীর্ঘদিন সামরিক তৎপরতা তাদের অজানা থাকতো না। বারীন এবং মানিকতলার অন্যান্য নেতা নিরাপত্তার ব্যাপারে শিথিলতা দেখিয়েছিলেন এবং পুলিশের চররা সহজেই সংগঠনের ভেতরে অনুপ্রবেশ করতে পেরেছিল। সুশৃঙ্খল অনুশীলন সমিতির নিরাপত্তাব্যবস্থা ছিল মজবুত এবং নিরাপত্তাজনিত ঝুঁকি এড়াবার জন্য তাদের বাছাইয়ের প্রক্রিয়া তারা কঠোর করেছিল। অভ্যন্তরীণ দলিলপত্রের বরাত দিয়ে পি. কে. ঘোষ বলেছেন যে অনুশীলনের সদস্যদের "নিষ্কলুষ নৈতিক চরিত্রের" অধিকারী হতে হতো। এ কথার বিপক্ষে বৃটিশ সূত্রের রিপোর্টও খতিয়ে দেখতে হয়। এতে বলা হয় যে অনুশীলনের কিছু বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য ছোটদের সমকামিতার দিকে টেনে আনতেন।[২৮] যুগান্তরের নেতারা নৈতিক চরিত্রের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। এসব নেতার মধ্যে মুখার্জী সব ধরনের ক্ষুদ্রতা, উচ্চাভিলাষ ও ভয় থেকে মুক্ত থেকে সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন।

---

২৬. James Ker, *Political Trouble in India 1907-1917* [(Calcutta, 1917), reprint Calcutta, 1973], 50.

২৭. Court testimony cited in Government of India, Home (Political) Department, series A. May 1908, 112-50, 39.

২৮. P. K. Ghosh, "Organizational Structure", 141, Armstrong Report (1917)) reprinted in *Terrorism in Bengal*, vol. 2, 393-5.

শিক্ষা ছাড়াও সমিতিগুলোর আরেকটি বাহ্যত প্রতীয়মান প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল সমাজসেবা। অশ্বিনীকুমার দত্তের দল "গরিবদের ছোট ভাই" গ্রামাঞ্চলে সেবার জন্য বিখ্যাত হয়ে উঠে। এসব উপদলের সশস্ত্র বিপ্লবের সাথে কোনো সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু তারা সংগঠন ও কাজের একটা আদর্শ খাড়া করেছিল যেটাকে সশস্ত্র বিপ্লবীরা কাজে লাগিয়েছে। মূল অনুশীলন সমিতির বিঘোষিত লক্ষ্য ছিল সমাজসেবা, এবং তাদের এই লক্ষ্য পুরোপুরি মিথ্যাও ছিল না। সমিতির সদস্যরা অকৃপণভাবে সমাজসেবা করেছেন, যেমন দামোদরের প্লাবনের সময় এবং রাজনৈতিক সমাবেশ ও মেলার মতো গণঅনুষ্ঠান পরিচালনায় তারা সহায়তা করেছেন। তরুণ বাঙালিরা সুষ্ঠুভাবে তাদের কাজ সম্পাদন করছে দেখে বৃটিশ পর্যবেক্ষকরা অবাক হয়েছেন, কিন্তু এটাও তাঁরা লক্ষ্য করেছেন যে স্বেচ্ছাসেবকরা যে উর্দি ও ব্যাজ পরতো এবং যে লাঠি বহন করতো, সেগুলো তাদের কাজকর্মে সৈনিকসুলভ ভাব ফুটিয়ে তুলতো। সময় এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে এ ধরনের কার্যক্রম সশস্ত্র বিপ্লব-কর্মকাণ্ডের একটা ছদ্মরূপ ও প্রশিক্ষণবিশেষ হয়ে দাঁড়ালো।

১৮৭৮ সালের অস্ত্র আইনে অধিকাংশ নেটিভের জন্য বন্দুক, তলোয়ার বা অন্য কোনো অস্ত্র রাখা বেআইনী ঘোষিত হলো। এই বেআইনী অস্ত্র সশস্ত্র বিপ্লবীদের দীক্ষা গ্রহণ অনুষ্ঠানে এবং সশস্ত্র অভিযানে অপরিহার্য হয়ে উঠলো। আগ্নেয়াস্ত্র দু'ভাবে অর্জিত হতো : বৈধ প্রক্রিয়ার অপব্যবহার এবং চুরি। ফরাসিদের নিয়ন্ত্রণাধীন চন্দননগরে অস্ত্র আইন প্রযোজ্য হতো না। এটাই সমগ্র ভারতে না হলেও বাংলায় বন্দুক ও পিস্তল আমদানির প্রধান কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ালো। কিছু ব্যক্তিকে অস্ত্র আইনের কড়াকড়ি থেকে মুক্ত রাখা হয়েছিল, যেমন জমিদার, রাজপরিবারের সদস্য এবং অসামরিক সরকারি কর্মকর্তা। এদের নিজস্ব ব্যবহারের অস্ত্রও ছিল। আন্দোলনের ইতিহাসে সবচেয়ে বিখ্যাত অস্ত্র দখলের ঘটনা হচ্ছে ১৯১৪ সালে কলকাতার একটা আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান থেকে ৫০টা মৌসের অটোমেটিক পিস্তল এবং ৪৬,০০০ গোলাবারুদ চুরি। এটা প্রায় এক ডজন দলকে বেশ কিছুকাল পর্যন্ত সর্বাধুনিক অস্ত্র সরবরাহ সম্ভব করে।

মানিকতলা সমিতি ভারতে প্রথম সশস্ত্র বিপ্লবের কাজে বোমা ব্যবহার প্রবর্তন করে। প্রথমে উল্লাসকর দত্তের মতো স্বশিক্ষিত রসায়নবিদরা পরীক্ষাকার্য চালান। এর পরে হেমচন্দ্র দাস ও অন্যরা আরো উন্নত ও পেশাগত মানসম্পন্ন বিস্ফোরক তৈরি করলেন। ইউরোপ থেকে হেমচন্দ্র বিস্ফোরক তৈরি সংক্রান্ত যেসব বইপত্র এনেছিলেন, সেগুলো ব্যাপকভাবে বিলিবণ্টন করা হয়। এক পর্যায়ে অনেকগুলো জেলা স্কুলের ছাত্রদের কাছে বেনামীতে এসব বইয়ের কপি পাঠানো হয়। ১৯০৮ সালে বিস্ফোরক আইন পাশ হলেও সশস্ত্র বিপ্লবীরা রসায়নের পর্যাপ্ত জ্ঞান লাভ করে উন্নত মানের বোমা তৈরি থেকে নিবৃত্ত হন নি।

জার্মান নৈরাজ্যবাদী জোহান মোস্ট-এর কথায়, "অস্ত্রের চাবিকাঠি লুকিয়ে ছিল অর্থবলের মধ্যে, যা ছিল ডিনামাইটের চেয়ে বেশি শক্তিশালী।[২৯] আগ্নেয়াস্ত্র ও রাসায়নিক

২৯. উদ্ধৃত, Laqueur, *Age of Terrorism*, 57-8.

মালমশলা খরিদ করতে, প্রচারপত্র ছাপাতে ও বিলি করতে অর্থের প্রয়োজন ছিল। কয়েক ডজন কিশোরকে একটা বাড়িতে রেখে খাওয়ানোর খরচ আরো বেশি হতে পারতো। ১৯০৮ সালের একটা দলিল প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের তিনটা উপায়ের উল্লেখ করেছে। এগুলো হচ্ছে—(১) লাভজনক ব্যবসা, (২) ধনীদের কাছ থেকে চাঁদা, (৩) "সশস্ত্র বিভাগের সহায়তায় ধনীদের উপর করারোপ" অর্থাৎ সশস্ত্র ডাকাতি।[৩০] তৃতীয় পন্থাটাই ছিল সবচেয়ে জনপ্রিয়। বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লবী অভিযানের অধিকাংশ ছিল ডাকাতি, অবশ্যই যার লক্ষ্য ছিল ধনী ভারতীয়রা। বলাবাহুল্য, আক্রান্ত ধনীরা বিপ্লবী ডাকাতদের ডাকাত ছাড়া আর কিছু মনে করতেন না এবং "করের" কথা শুনে কিংবা বিশেষ একটি পত্রের মতো কাগজপত্র দেখে বিভ্রান্ত হতেন না। পত্রটা পাওয়া গিয়েছিল কলকাতায় একটা ডাকাতির পর। এতে লেখা হয়েছিল : "আমাদের কলকাতা অর্থ বিভাগের ছয়জন অবৈতনিক কর্মকর্তা আমাদের মহৎ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য আপনার কাছ থেকে টাকা ৯,৮৯১-১-৫ ঋণ নিয়েছেন এবং উপরোক্ত দপ্তরে আপনার হিসাবে জমা দিয়েছেন। যিনি এ ঘটনার শিকার তিনি নিঃসন্দেহে সুদ সহ অর্থ পরিশোধের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন, যা ছিল তাকে প্রদত্ত সেই হুমকির চেয়ে কম গুরুতর, যাতে বলা হয়েছিল যে যদি তিনি পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করেন, তা হলে অর্থবিভাগ "আপনার পরিবারের কাউকে আপনাদের অঢেল সম্পত্তি ভোগ করতে দেবে না"।[৩১]

সরকার দাবি করে যে আন্দোলনটা শুরু হওয়ায় তা জন্ম দিয়েছে "একটা ভদ্রলোক নামধারী ইতর অপরাধী শ্রেণী এবং একটা অরাজক পরিস্থিতি, যেখানে বৈপ্লবিক ধ্যান-ধারণা বিদ্যমান থাকলেও এর একটা বড় উপাদান ছিল সাধারণ অপরাধ"। বারীন ঘোষ ও হেমচন্দ্র দাসের বিবৃতিতেও এর কিছুটা সমর্থন মেলে। এই সূত্রে লিওনার্ড গর্ডন মন্তব্য করেন যে ১৯১০ সালের পরে বাঙালি বিপ্লবীরা যেসব সহিংস ঘটনা ঘটিয়েছে "প্রায়শ সেগুলো ভারতের স্বাধীনতার লক্ষ্যের সাথে কেবল অস্পষ্টভাবে সম্পর্কিত থাকতো।[৩২]

হত্যাপ্রচেষ্টার অবশ্য রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল। লক্ষণীয় যে বাঙালি সশস্ত্র বিপ্লবীরা পরিকল্পনা মতো বৃটিশ কর্মকর্তাদের হত্যা করতে খুব কমই সফল হয়েছিলেন, যদিও যেসব বাঙালি শত্রুদের সহযোগী বলে চিহ্নিত হয়েছিল অথবা সমিতির প্রতি কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয়েছিল, তাদের হত্যা করতে তারা কমই বিফল হয়েছিল। বাঙালি সংবাদপত্র উভয় ধরনের হত্যার নিন্দা করতো, কিন্তু ক্ষুদিরাম বসু, কানাইলাল দত্ত প্রমুখের জন্য জনগণের গভীর সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছিল। এতে প্রমাণিত হয় যে তারা সব ক্ষেত্রেই ইংরেজ বা স্পষ্ট দৃশ্যমান বিশ্বাসঘাতককে হত্যার নিন্দা করে নি।

---

৩০. "General Principles of Secret Society", Oriental and India Office Library MSS Eur D 709. "Nangla Dacoity Case Exhibits", Ex 3g, 2.

৩১. *Rowlatt Report*, para 77.

৩২. Nixon Report, 7 ; হেমচন্দ্র কানুনগো (হেমচন্দ্র দাস), *বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা* (কলকাতা : কমলা বুক ডিপো, ১৯২৮), ১৬৪; Barindra Kumar Ghose, *Wounded Humanity* (Calcutta : Privately published, n. d ), 50; Gordon, "Portait", 205.

সাধারণভাবে বলতে গেলে, বিশেষভাবে যে সময়কাল আমরা পর্যালোচনা করছি সেই সময়কালে সশস্ত্র বিপ্লবীরা বড় রকমের সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি। সারণি-২-এ বাংলায় প্রথম গুপ্ত সমিতির প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে তার অধিকাংশ নেতার কারাবরণ পর্যন্ত সময়ে পরিচালিত অভিযানগুলির ফলাফল দেখানো হলো :

**সারণি ২ : মানিকতলা গুপ্ত সমিতির পরিচালিত অভিযান**

| সাল | মাস | স্থান | লক্ষ্যবস্তু | প্রকৃতি | ফল |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৯০৬ | ? | পূর্ববাংলা | ফুলার | হত্যা | অকার্যকর |
| ১৯০৬ | আগস্ট | রংপুর | এক বিধবা | ডাকাতি | অকার্যকর |
| ১৯০৬ | আগস্ট | বাঁকুরা | এক মোহন্ত | ডাকাতি | অকার্যকর |
| ১৯০৭ | অক্টোবর | দার্জিলিং | ফ্রেজার | হত্যা | অকার্যকর |
| ১৯০৭ | নভেম্বর | মানকুণ্ডু | ফ্রেজার | ট্রেন লাইনচ্যুত করা | ব্যর্থ |
| ১৯০৭ | নভেম্বর | মানকুণ্ডু | ফ্রেজার | ট্রেন লাইনচ্যুত করা | অকার্যকর |
| ১৯০৭ | ডিসেম্বর | নারায়ণগঞ্জ | ফ্রেজার | ট্রেন লাইনচ্যুত করা | ব্যর্থ |
| ১৯০৮ | জানুয়ারি | কলকাতা | কিংসফোর্ড | হত্যা | ব্যর্থ |
| ১৯০৮ | এপ্রিল | চন্দননগর | টারডিভেল | হত্যা | ব্যর্থ |
| ১৯০৮ | এপ্রিল | মুজাফফরপুর | কিংসফোর্ড | হত্যা | ভুল ব্যক্তি নিহত |

সূত্র : Government of Bengal pol. conf. file 266 of 1908; B. K. Bose, ed. The Alipore Bomb Trial (Calcutta : Butterworth, 1922), 16, Nixon Report, Table A; Government of India, Home (Political) Department, series A, September 1910, 33-40: 18-21, 42; GOI HPD series D. August 1911, 9 : 13, Reproduced from P. Heehs, *Bomb in Bengal,* 252

পরবর্তী বছরগুলোতে অভিযানের পৌনঃপুনিকতা ও সাফল্যের হার দুটিই বৃদ্ধি পেল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ১৯১৫ সালে ৪৯টা "বৈপ্লবিক নৃশংসতার" প্রয়াস চালানো হয়েছিল। এগুলোর মধ্যে ৩৯টা ডাকাতি আর ১০টা হত্যা। চব্বিশটা ডাকাতি সফল হয়েছিল (এই অর্থে যে ডাকাতরা কিছু লুণ্ঠিত সম্পদ নিয়ে পালাতে পেরেছিল)। হত্যাপ্রচেষ্টার সবগুলোর লক্ষ্যবস্তু ছিল বাঙালিরা (সরকারি চাকুরে, পুলিশ, ইত্যাদি) এবং দুটো ব্যতীত সবগুলো সফল হয়েছিল।[৩৩]

৩৩. Table in J. C. Nixon, *Notes on Outrages Compiled in 1917,* vol, 6 reproduced in *Terrorism in Bengal,* vol, 6 (Calcutta : Government of Bengal, 1995), 341-6.

## ১৯১০ সালের পর বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

সমিতিগুলোর উন্মেষপর্বে (১৯০২-১০) তাদের কার্যক্রম ও গঠনপ্রকৃতির দিকে আমি বেশি মনোযোগ দিয়েছি, কারণ এই সময়ের দলিলপত্রের সাথে আমি বেশি পরিচিত, যেটা আমাকে এগুলো একটু গভীরভাবে বিচার করতে সাহায্য করেছে। পরবর্তীকালের ঘটনাবলী কিছুটা সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করবো এবং এগুলোর গঠনপ্রকৃতি বিশ্লেষণে যাব না। এ কথা অবশ্য বলা যায় যে সমিতিগুলোর উন্মেষকালের যে মৌলিক রূপরেখা প্রদান করা হয়েছে, তা বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনের চার দশকব্যাপী সশস্ত্র বিপ্লবের যুগে টিকেছিল।

সশস্ত্র বিপ্লবী কার্যক্রমের প্রথম তাৎক্ষণিক ফলস্বরূপ সরকারি দমননীতির একটা পর্ব চললো। এই পর্বে সমিতিগুলো বেআইনী ঘোষিত হলো এবং অনেক বিপ্লবীকে কারারুদ্ধ বা দীপান্তরিত করা হলো। যাঁরা অব্যাহতি পেলেন তাঁরাও কিছুদিন গুটিসুটি মেরে থাকলেন। এই বছরগুলোতে যুগান্তর সংগঠনটি একটা আকার নিতে শুরু করলো। তখন পর্যন্ত বেআইনী অনুশীলন সমিতি নতুন দল হিসেবে শক্তি অর্জনের চেষ্টা করছিল। বৃটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ রদ করেও সহিংস বিপ্লবকে বিফল করে দেয়ার লক্ষ্য অর্জন করতে পারলো না। ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ ১৯১২ সালের ডিসেম্বরে যখন নতুন রাজধানী দিল্লীতে মহাসমারোহে প্রবেশ করেন, সেই সময়ে বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবীরা সুপরিকল্পিত বোমা হামলায় তাঁকে হত্যার প্রচেষ্টায় অল্পের জন্য সফল হতে পারেন নি।

ইউরোপে যখন যুদ্ধ বেধে গেল, বিপ্লবী দলগুলো চেষ্টা করলো সুযোগটা কাজে লাগাতে। তখন যদিও ক্ষুদ্রাকারে সশস্ত্র বিপ্লবের কার্যক্রম চলছিল, অধিকতর উচ্চাভিলাষী নেতারা একটা ব্যাপক অভ্যুত্থান ঘটাতে চাইলেন, যেটা এক দশক পূর্বে অরবিন্দ কল্পনা করেছিলেন। রাসবিহারী বসু (যিনি ভাইসরয়কে হত্যার প্রধান পরিকল্পনাকারী ছিলেন) মহারাষ্ট্রের বিষ্ণু গণেশ পিংলে এবং কয়েকজন জঙ্গি শিখ সহযোগে ১৯১৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে কয়েক স্থানে একসাথে সেনাবিদ্রোহ সংঘটনের পরিকল্পনা করেন। তাঁদের দুর্ভাগ্য, পরিকল্পনাটা ফাঁস হয়ে যায় এবং তখন মাত্র একটি বিদ্রোহ হয়েছিল যেটা শীঘ্রই দমন করা হয়। বিপ্লবীদের অন্যান্য দল জার্মান পররাষ্ট্র দপ্তরের সাথে যোগাযোগ করে অর্থ ও অস্ত্রসাহায্য চায়। তারা অর্থ সংগ্রহ করতে পেরেছিল, কিন্তু চোরাপথে দেশে অস্ত্র আনার উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টাটি বিফল হয়ে যায়। নিউ ইয়র্কে একজন জার্মান এজেন্ট দ্বারা ক্রয় করা জাহাজভর্তি অস্ত্রশস্ত্র ভারতের পথে প্রেরণ করার পূর্বেই যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আটক করা হয়। যুগান্তর নেতা যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী এই মাল খালাসের জন্য উড়িষ্যায় অপেক্ষা করছিলেন, কিন্তু তিনি বৃটিশদের ফাঁদে পড়লেন এবং যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণ করলেন ১৯১৫ সালের সেপ্টেম্বরে।

যুদ্ধকালীন সশস্ত্র ও জঙ্গি তৎপরতা চলতে থাকার কারণে ভারতে প্রতিরক্ষা আইন পাশ হয়। এই আইনে "বৈপ্লবিক অপরাধ" দমন করবার জন্য সরকারকে বিশেষ ক্ষমতা দেয়া হয়। যুদ্ধের পর এসব ক্ষমতা রাওলাট আইনের বলে প্রলম্বিত করা হয়, যে কারণে এম. কে. গান্ধী অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা করেন।

অহিংস অসহযোগ নীতি যখন গণপর্যায়ে পরীক্ষিত হচ্ছিল, তখন দেশের অপর প্রধান নেতা ঢাকার সি. আর. দাসের অনুরোধে যুগান্তর সশস্ত্র কার্যক্রম বন্ধ রাখতে রাজি হলো। অনুশীলন এতে সম্মতি দেয়নি, কিন্তু তা ১৯২০ থেকে ১৯২২ সালের মধ্যে বড় আকারের কোনো সশস্ত্র অভিযান পরিচালনা করে নি।[৩৪] ১৯২২ সালে অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত হয়। এরপর যুগান্তর আবার সক্রিয় হয়ে উঠে। চট্টগ্রাম ও ঢাকায় এর সহযোগী উপদল গঠিত হয়। চট্টগ্রামের উপদলটি ১৯২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের চট্টগ্রাম অফিসে এক দুঃসাহসিক ডাকাতি সংঘটিত করেছিল। এই উপদলের নেতা সূর্য সেন এবং আরো দু'জন গ্রেপ্তার হয়েছিলেন, কিন্তু মুক্তি পেয়ে যান। পরের মাসে গোপীমোহন সাহা গ্রেপ্তার হন। তিনি একজন ইউরোপীয়কে ভুলক্রমে কলকাতা পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট মনে করে হত্যা করেন। বাঙালি সংবাদপত্র গোপীমোহনের বীরত্বের ভূয়সী প্রশংসা করে। বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেসও তাঁকে শহীদ ঘোষণা করে, যেটা গান্ধীকে ক্ষুব্ধ করেছিল। এই সময় যুগান্তর কলকাতা কর্পোরেশনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ছিল। তখন কর্পোরেশনের নেতৃত্বে ছিলেন সি. আর. দাস ও সুভাষ চন্দ্র বসু। দৃশ্যত সুভাষ বসু "সক্রিয় বিপ্লবীদের সাথে সদ্ব্যবহার করতেন এবং তাদের পরিকল্পনা সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা রাখতেন"। এই সময় থেকে বাংলার স্থানীয় সরকারের ক্ষমতার ভারসাম্যে তখনকার সশস্ত্র বিপ্লবী ও প্রাক্তন সশস্ত্র বিপ্লবীরা একটা প্রভাবশালী পক্ষ হয়ে দাঁড়ায়।[৩৫]

বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লবীদের কার্যক্রম ও প্রভাবের কারণে ১৯২৪ সালে বাংলা ফৌজদারি আইন সংশোধন অধ্যাদেশ পাশ হয়। পরের বছর এটা আইনের রূপ লাভ করে। এই আইনে পুলিশকে অসাধারণ ক্ষমতা দেয়া হয় এবং ১৯২৪ থেকে ১৯২৭ সালের মধ্যে প্রায় দুইশ সন্দেহভাজন লোককে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়, যাঁদের অন্যতম ছিলেন সুভাষ বসু। এর পর বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লবী কার্যক্রমে ভাটা পড়লো, কিন্তু অনুশীলনের সাথে যুক্ত

৩৪. দেখুন, *Terrorism in Bengal*, vol. 6, 645-8. যে কয়টা ঘটনা ঘটেছিল সেগুলোকে সেই ধরনের মামলা হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছিল যেগুলোতে "বিপ্লববাদীরা সম্পৃক্ত ছিলেন, কিন্তু উদ্দেশ্য সম্ভবত ছিল ব্যক্তিগত লাভ।

৩৫. David M. Laushey, *Bengal Terrorism and the Marxist Left* (Calcutta : Firma K. L. Mukhopadhyay, 1975), 21-27; quotation on Bose : Leonard Gordon, *Brothers Against the Raj* (New Delhi : Viking, 1990), 115.

একটা উপদল যুক্তপ্রদেশে কিছুটা প্রাধান্য বিস্তার করলো। ১৯২৩ সালে শচিন্দ্রনাথ সান্যাল এবং যোগেশ চন্দ্র চ্যাটার্জী হিন্দুস্থান রিপাবলিকান এ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেন। শীঘ্রই কলকাতা থেকে লাহোর পর্যন্ত এর শাখা স্থাপিত হয়। উত্তর প্রদেশে পরপর কয়েকটা সফল ডাকাতির পর কাকোরিতে একটা দুঃসাহসিক ট্রেন ডাকাতি সংঘটিত হয়। এর ফলে দুটি বিচার অনুষ্ঠিত হয় যা সংগঠনকে পঙ্গু করে দেয়। হিন্দুস্থান রিপাবলিকান এ্যাসোসিয়েশন উত্তর ভারতের রাজনীতিতে বিপ্লবী ভাবধারা সঞ্চারিত করেছিল। কয়েক বছর পর হিন্দুস্থান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান এ্যাসোসিয়েশন নামে এর পুনর্জন্ম হয়।[৩৬]

১৯২৭ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বৃটেনের কাছ থেকে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি তোলে। অরবিন্দ, তিলক ও অন্যান্য চরমপন্থী রাজনীতিক কুড়ি বছর আগে যে লক্ষ্য স্থির করেছিলেন সেটা এখন স্বীকৃতি পেল। এর আংশিক কারণ ছিল জঙ্গি দলগুলোর চাপ। বাংলা তখন কিছুটা শান্ত ছিল। তাই সরকার ১৯২৫ সালের আইনের অধীনে আটককৃত অধিকাংশ বন্দিকে ছেড়ে দিল। এই সময় যুগান্তর ও অনুশীলনের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার একটা উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল যেটা সফল হয় নি। তখন তরুণ উগ্রপন্থীদের অনেকে নতুন পথ বেছে নিলেন। তরুণ ও প্রবীণ অনেকেই কংগ্রেসের কার্যক্রমে অংশ নিলেন, যেমন ১৯২৮ সালের সাইমনবিরোধী বিক্ষোভ। কংগ্রেসনেতা লালা লজপত রায় আহত হলেন যখন পুলিশ অক্টোবরে লাহোরে একটা বিক্ষোভ মিছিল ভেঙে দেয়। এই আঘাতেই তিনি মারা যান। ভগত সিং ও হিন্দুস্থান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান এ্যাসোসিয়েশনের অন্যান্য নেতা ডিসেম্বরে এই মৃত্যুর প্রতিশোধ নিলেন। ভগত সিং বিধান সভায় বোমা নিক্ষেপ করেন। তিনি এবং হিন্দুস্থান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকানের অন্যান্য সদস্য গ্রেপ্তার হন এবং এঁদের তিনজন কারাগারে অনশন করে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেন। বাঙালি বোমা প্রস্তুতকারক যতীন্দ্রনাথ দাস আমৃত্যু অনশন করেন। ১৯২৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর কলকাতা কর্পোরেশন একটা শোকপ্রস্তাব পাশ করে। ভগত সিংহের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হবার পর ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসও শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করে।

ত্রিশের দশকের শুরুতে জাতীয় আন্দোলন যখন তীব্রতর হয়, তখন কয়েকজন প্রাক্তন সশস্ত্র বিপ্লবী কংগ্রেসের প্রভাবশালী নেতা হয়ে উঠেন, যেমন যুগান্তর নেতা সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ। তখন অনেক বাঙালি কংগ্রেসী সশস্ত্র বিপ্লবী সংগঠনগুলোর সাথে যোগাযোগ রেখেছেন। ১৯৩০ সালের জানুয়ারি মাসে কংগ্রেস প্রথম বারের মতো "স্বাধীনতা দিবস" উদ্‌যাপন করে। পরবর্তী মাসগুলোতে স্বাধীনতাকে বাস্তব রূপ দেবার জন্য কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। মার্চ মাসে গান্ধী আইন অমান্য আন্দোলনের সূচনা করেন এবং তাঁর 'সল্ট মার্চ' পরিচালনা করেন। এপ্রিলে সূর্য সেন ও তাঁর সহযোগীরা চট্টগ্রাম অস্ত্রাগারে আক্রমণ চালান।

৩৬. Leushey, *Bengal Terrorism*, 24, 27-37.

যে চার বছর সময় আইন অমান্য আন্দোলন চলেছিল, সে সময়টা ছিল বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবের সবচেয়ে ঘটনাবহুল সময়কাল। কেবল ১৯৩০ সালেই এগার জন বৃটিশ কর্মকর্তাকে হত্যা করা হয়, বিশেষকরে ডিসেম্বরের রাইটার্স বিল্ডিং আক্রমণে। এই দশকের প্রথমার্ধে মেদিনীপুরে একের পর এক ক্ষমতাসীন তিনজন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে হত্যা করা হয় এবং আরো কয়েক ডজন সফল অভিযান পরিচালনা করা হয়। কিন্তু এটা ছিল নিভে যাবার আগে আগুনের হঠাৎ দফ করে জ্বলে উঠা। বলা যায়, ১৯৩৪ সালে বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লবের অবসান ঘটে।[৩৭]

বিশ ও ত্রিশের দশকে বহু বাঙালি সশস্ত্র বিপ্লবী কমিউনিস্ট ও অন্যান্য বামপন্থী দলে যোগদান করেন। এম. এন. রায় নামে সমধিক পরিচিত প্রাক্তন যুগান্তর নেতা নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল-এর একজন প্রভাবশালী সদস্য হয়ে যান এবং ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করেন। যুগান্তর, অনুশীলন ও অন্যান্য দলের বহু নেতাকে কমিউনিস্ট পার্টি বরণ করে নেয়, বিশেষকরে ১৯৩০-এর দশকের ব্যাপক ধরপাকড়ের সময়। এই দশকের শেষ দিকে সবগুলো বামপন্থী দল প্রদেশের তরুণদের দলভুক্ত করার জন্য প্রতিযোগিতা করেছিল। এই সময় দলের অধিকাংশ সদস্য নিছক ত্রাস সৃষ্টির বিরোধী ছিল, তাঁদের লক্ষ্য ছিল বৃহত্তর ভিত্তিতে শ্রেণীসংগ্রাম।

অনেক সশস্ত্র বিপ্লবী, যাঁরা বামপন্থী দলগুলোতে যোগ দেন নি, তাঁরা কংগ্রেসের সদস্য হলেন। ১৯৩৮ সালে যুগান্তরকে যখন আনুষ্ঠানিকভাবে বিলুপ্ত করা হয়, তখন অনেক প্রাক্তন সদস্য সুরেন্দ্র মোহন ঘোষের অধীনে একযোগে কাজ করতে থাকেন। সুরেন্দ্র মোহন পন্ডিচেরিতে অরবিন্দ ঘোষ ও কংগ্রেসী রাজনীতিকদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করতেন। কংগ্রেসে যে বামপন্থীদের শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেল ১৯৩৮ সালে প্রেসিডেন্ট পদে সুভাষ বসুর নির্বাচনে ও ১৯৩৯ সালে তাঁর পুনর্নির্বাচনে। দ্বিতীয় বারের নির্বাচনে তিনি গান্ধীর প্রার্থীকে পরাজিত করেন এবং এজন্য কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করে। এপ্রিলে তিনি ফরোয়ার্ড ব্লক প্রতিষ্ঠা করেন। উদ্দেশ্য, গান্ধীর পক্ষকে পরাজিত করার জন্য একটা সুসংহত ও সুশৃঙ্খল বাম পক্ষ গড়ে তোলা। সুভাষকে গৃহবন্দি করে রাখা হয়। কিন্তু তিনি পালিয়ে ইউরোপ চলে যান, মুসোলিনি ও হিটলারের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং পরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির সামরিক অভিযান ব্যর্থ হয়, কিন্তু এই ক্রান্তিকালে দিল্লীতে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির অফিসারদের বিচার অনুষ্ঠিত হওয়ার ফলে সমগ্র দেশ প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। পরে এসব অফিসারকে বেকসুর খালাস দিয়ে আদালত কার্যত স্বীকার করে নেয় যে, অস্থায়ী সরকারের অধীন একটা

৩৭. Laushey, *Bengal Terrorism*, 58-86, 121.

সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনীর বিদ্রোহ দেশদ্রোহিতা নয়। কয়েক মাস পর বোম্বাইতে নৌ-সেনাদের বিদ্রোহের পর বৃটিশ সরকার নিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করে যে সশস্ত্র বাহিনীর বিশ্বস্ততার উপর আর নির্ভর করা যাবে না। পরের দিনই সরকার ক্যাবিনেট মিশন প্রেরণ করার কথা ঘোষণা করে।

স্বাধীনতা আন্দোলন যতদিন চলেছিল, ততদিন সহিংসতার ঘটনা অব্যাহত থাকায় সরকার বৈধ আন্দোলনের নেতাদের সাথে আলাপ-আলোচনাকে গুরুত্ব দিতে বাধ্য হয়। গান্ধী এ ব্যাপারে সব সময় সচেতন ছিলেন। অহিংসার এই দূত ১৯৩১ সালের গোলটেবিল বৈঠকে ঘোষণা করলেন, তিনি "সশস্ত্র বিপ্লবীদের পক্ষে কোনো ওকালতি" করতে যাচ্ছেন না, কিন্তু এটুকু যোগ করতে ছাড়েন নি যে, সরকার যদি তাঁর সাথে কাজ করতে অসম্মত হয়, তাহলে তাকে সন্ত্রাসবাদীদের মোকাবেলা করতে হবে। "সন্ত্রাসকে বিদায় দেবার একমাত্র পথ হচ্ছে কংগ্রেসের সাথে কাজ করা।"[৩৮] মহাত্মাকে পছন্দ না করলেও সরকার তাঁর পরামর্শমতো ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তখন সাম্রাজ্যবাদী বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছিল, যেখান থেকে বেরিয়ে আসার একটা উত্তম পথই তিনি দেখিয়েছিলেন, যা অবলম্বন করা হলে প্রচণ্ড বিপ্লবী শক্তিগুলোর সাথে প্রলম্বিত যুদ্ধ পরিহার করা সম্ভব হতো।

## উপসংহার

স্বাধীনতা আন্দোলনের উপর পরোক্ষ চাপ সৃষ্টি হচ্ছে এ আন্দোলনের সাফল্যের পেছনে বিপ্লবীদের মৌলিক অবদান। তাঁরা দেখিয়ে গেছেন, স্বাধীনতার জন্য প্রাণ বিসর্জন দেয়া যেতে পারে। ক্ষুদিরাম বসু, সূর্য সেন ও যতীন্দ্রনাথ দাসের আত্মোৎসর্গ ১৯০৮ থেকে ১৯৩৮ সালের মধ্যবর্তী কালের প্রজন্মের মানসলোকে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। তা সত্ত্বেও সন্ত্রাসবাদীরা যে কার্য সম্পাদন করেছেন তাকে স্বতন্ত্রভাবে বিচার করলে সফল বলা কঠিন। ডাকাতির মাধ্যমে পর্যাপ্ত অর্থ পাওয়া যায় নি। যেসব বৃটিশ বিপ্লবীদের আক্রমণের লক্ষ্য ছিল, তাদের অধিকাংশ বুলেট ও বোমার আক্রমণ এড়াতে পেরেছিল। বাঙালি সশস্ত্র বিপ্লবীরা অন্য বাঙালিকে হত্যা করতে বেশি সফল হয়েছিলেন, কিন্তু এসব হত্যাকাণ্ড ও অন্যান্য অভিযানের অধিকাংশের সাথে জাতীয় আন্দোলনের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল ক্ষীণ। অপরাধী পক্ষ যখন প্রবল হয়ে উঠলো, তখন অধিক সংখ্যক দল অকারণে সহিংসতা ঘটাতে লাগলো। যেসব অভিযান যুক্তিসঙ্গত বলে প্রতীয়মান হয়েছিল, যেমন শাসকশক্তির সহযোগী বা গুপ্তচরদের হত্যা, সেসব অভিযান কখনো কখনো অপ্রয়োজনীয় নৃশংসতার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। অনুশীলন সমিতি আক্রান্তদের শিরচ্ছেদ করতো বা তাদের শরীর ক্ষতবিক্ষত করতো। এই আন্দোলনের সংকীর্ণ ভিত্তি তার কার্যকারিতাকে করেছিল

৩৮. M. K. Gandhi, "Speech at the Plenary Session of the Round Table Conference", 1 December 1931, Collected Works of Mahatma Gandhi, 48: 358, 365.

সীমাবদ্ধ এবং বাংলায় সামাজিক বিভাজনকে তা আরো তিক্ত করে থাকতে পারে। খুব কম সংখ্যক মুসলমান বা নিম্নবর্ণের লোক এ সমিতির সদস্য হয়েছে। এমনকি সমিতিগুলোর প্রতি তাদের পরোক্ষ সমর্থনও ছিল খুবই কম। এটা এবং সমিতির অভ্যন্তরীণ দলাদলি সরকারকে সাহায্য করেছিল এর শাসনের প্রতি সশস্ত্র বিপ্লবের সত্যিকারের হুমকি হয়ে দাঁড়ানো অসম্ভব করে তুলতে।

ভারতে দীর্ঘকালের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সুদূরপ্রসারী প্রভাবে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলায় সহিংস বিরোধিতা সামাজিক-রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের অংশ হয়ে দাঁড়ায়। ভারতের কমিউনিস্ট অভ্যুত্থানের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা যে পশ্চিম বাংলার নক্সালবাড়িতে ঘটলো এটা কোনো কাকতালীয় ব্যাপার নয়। চল্লিশের দশকের শেষদিক থেকে সত্তরের দশক পর্যন্ত এই অঙ্গরাজ্যের বাম দলগুলো প্রাক্তন সশস্ত্র বিপ্লবীদের দ্বারা স্ফীত হয়ে অনেক সহিংস ধর্মঘট ও বিক্ষোভের আয়োজন করেছে। ১৯৭৭ সালে বাম দলগুলোর উত্থান সম্পর্কে (তার পরে পরিস্থিতি পাল্টে গিয়েছিল) পাশ্চাত্যের একজন সমাজবিজ্ঞানী লিখেছেন, "এতে সন্দেহ নেই যে পশ্চিম বাংলায় প্রায় সকল রাজনৈতিক দল সহিংসতাকে গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক কৌশল মনে করে।[৩৯] এমনকি যে সহিংস প্রতিরোধ বাংলাদেশ সৃষ্টি করতে সাহায্য করলো, সেটাও বলা যায় অংশত ১৯৪৭পূর্ব যুক্ত বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন থেকে উদ্ভূত।

৩৯. Hula, "Political Violence", 440.

৮

# রাজনীতির সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি : ১৯০৬-১৯৪৭

জে. এইচ. ব্রুমফিল্ড*

এই গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের উপর বঙ্গভঙ্গের (১৯০৫) প্রভাব আলোচনা থেকে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারি যে, বঙ্গবিভাগ বাংলার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্তন সাধন করেছে। বাংলার রাজনীতি এখন আর উনিশ শতকের রাজনীতির ধারায় প্রবাহিত নয়। বঙ্গভঙ্গ-উদ্ভূত রাজনৈতিক ইস্যুগুলি মুসলমানদের মধ্যে এক নতুন চেতনার সৃষ্টি করে। এই চেতনায় মুসলমান নেতৃত্ব গোটা রাজনৈতিক সম্পর্ককে নতুনভাবে মূল্যায়ন করে। এই মূল্যায়নে মুসলমানদের প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বী ও বিরোধী শক্তি হচ্ছে হিন্দু ভদ্রলোক শ্রেণী, বৃটিশ রাজ নয়। বৃটিশ কর্তৃক বাংলা বিজয়ের পর থেকে অবনত মুসলমান অভিজাত শ্রেণী ইংরেজদেরকে তাদের শত্রু হিসেবে গণ্য করেছে এবং ফিরিঙ্গি শাসনের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার নীতি অনুসরণ করেছে প্রায় এক শত বছরব্যাপী। কিন্তু বিশ শতকের গোড়া থেকে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মুসলমান নেতৃত্ব বৃটিশ রাজের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করে। পরিবর্তিত রাজনৈতিক সম্পর্কের মধ্যে মুসলমানদের প্রতিদ্বন্দ্বী এখন হিন্দু ভদ্রলোক, বৃটিশ রাজ নয়। ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্র থেকে মুসলমান নেতৃত্ব এই মন্ত্র লাভ করে যে, এদের সকল দুর্দশা ও পশ্চাৎপদতার জন্য দায়ী হিন্দু আধিপত্যবাদ, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ নয়। বাঙালি জাতি বিভক্ত হয়ে গেল 'ওরা' এবং 'আমরা'য়। 'ওরা-আমরা' রাজনীতির ফসল ১৯৪৭ সালের বাংলাবিভক্তি।

১৯৪৭ সালে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বাংলাবিভাগ এবং ১৯৭১ সালে একটি স্বাধীন জাতিরাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় অনেকের কাছেই আকস্মিক ও চমকপ্রদ মনে হতে পারে। এর জন্য দায়ী বিশ শতকের বঙ্গীয় রাজনীতির উপর বিশ্লেষণমূলক অপ্রতুল

* অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাষ্ট্র।

গবেষণা। মুসলিম রাজনীতি তো বটেই, বঙ্গভিত্তিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উপরও গবেষণা হয়েছে খুবই কম। বিগত দুই দশকে অবশ্য বেশ কয়েকটি মূল্যবান গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সুফিয়া আহমেদের *Community in Bengal* (১৯২৪), শিলা সেনের *Muslim Politics in Bengal, 1937-1947*, বজলুর রহমান খানের *Politics in Bengal, 1927-1936* (১৯৮৭), হারুন-অর-রশিদের *Foreshadowing of Bangladesh* (১৯৮৭) এবং রফিউদ্দিন আহমেদের *Bengal Muslims, 1871-1906* (১৯৮৮)।

বঙ্গীয় রাজনীতির উপর গবেষণায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বোধহয় এর সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি। এখানে এ বিষয়টিকে কেন্দ্র করে কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে।[১] যেমন অবিভক্ত বাংলায় কি কি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ছিল ? সময়ের ব্যবধানে এই প্রতিষ্ঠানসমূহের নীতি ও কার্যকলাপে কি কি পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় এবং এসব পরিবর্তনের সামাজিক ও রাজনৈতিক ভিত্তি কি ?

প্রতিষ্ঠানগত বিশ্লেষণের একটি বিরাট সুবিধা হলো, এ ধরনের বিশ্লেষণে আমরা রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ব্যাপ্তি এবং নেতৃত্বের প্রকৃতি সম্পর্কেও ন্যায়সঙ্গতভাবে কিছু বলার সুযোগ পাই। আত্মজীবনীমূলক সংকলনগুলি এবং এ সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের সদস্যপদ ও নির্বাহী কমিটির তালিকা সম্পর্কিত ব্যাখ্যা অবশ্যই রাজনীতিবিদদের জানার জন্য সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উপাদান। এগুলির সব ক'টির উপরই ঐতিহাসিকগণ বিশেষভাবে নির্ভর করেছেন। অনুরূপভাবে প্রতিষ্ঠানসমূহের ঘোষিত উদ্দেশ্য এবং তাদের বাস্তব অবদান সম্পর্কিত পরীক্ষা হচ্ছে রাজনৈতিক বক্তব্য সম্পর্কে সবচেয়ে সুফলদায়ক তদন্ত।

**কালানুক্রম**

এই আলোচনার জন্য একটি কালানুক্রমিক কাঠামো তৈরি এবং বিগত অর্ধশতাব্দীর বৃহৎ রাজনৈতিক আন্দোলনগুলি সম্পর্কে চিন্তার উদ্রেক করার জন্য আমি প্রথমে কালানুক্রমিকভাবে বাংলার রাজনীতিকে পাঁচটি পর্বে ভাগ করবো। আমি মনে করি, এ অঞ্চলের ইতিহাসে ১৯৪৭ ও ১৯৭১ সালকে মাইলফলক হিসেবে বিবেচনা করার জন্য একটি সাধারণ মতৈক্য পাওয়া যাবে। অধিকাংশ ঐতিহাসিক এই পর্যায়ে ১৯০৫ সালকেও যোগ করতে চাইবেন। কিন্তু এই অনুচ্ছেদের শিরোনামের দিক থেকে আমি এ তারিখটি বাদ দিয়ে ১৯০৬ সালকেই গ্রহণ করেছি। ১৯০৩ সালে বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব ঘোষণার পরপরই এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। কিন্তু এই আন্দোলন উনিশ শতকের শেষদিককার কংগ্রেসী আন্দোলনের মতো এক ধরনের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের ভূমিকা পালন করে। ১৯০৬ সালেই দেখা যায় সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম—কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবী ব্রিগেড পরিচালনা, অর্থনৈতিক বর্জন, স্বাদেশিকতার জঙ্গি প্রচারাভিযান এবং সন্ত্রাসবাদী

১. এই নিবন্ধটি Rachel Van M. Baumer সম্পাদিত এবং ১৯৭৫ সালে হাওয়াই থেকে প্রথম প্রকাশিত *Aspects of Bengal History and Society* গ্রন্থ থেকে ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে পুনর্লিখিত হয়েছে।

সমিতি কর্তৃক প্রথম প্রকাশ্য বিক্ষোভ। এই বছরেই প্রচণ্ড সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয় এবং ঢাকায় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। এগুলিই হলো বিশ শতকের প্রারম্ভে বাংলার রাজনীতির বৈশিষ্ট্য।

আমি সাধারণভাবে গৃহীত একটি মাইলফলক অর্থাৎ ১৯১২ সালের প্রাদেশিক পুনরেকত্রীকরণকে পুনরায় পাশ কাটিয়ে (অবশ্য কম নিশ্চয়তার সাথে) ১৯১৮ সালকে পরবর্তী পর্বের প্রারম্ভ হিসেবে নির্বাচন করেছি। মধ্যপন্থীরা ১৯১৮ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ হারায় এবং উদীয়মান রাজনীতিবিদ চিত্তরঞ্জন দাসকে সামনে রেখে নতুন নেতৃত্ব কংগ্রেসকে জনগণের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার প্রয়াস চালায়। এই প্রয়াসের মধ্যে ছিল জেলা শহর পর্যন্ত দলীয় সদস্য সংগ্রহ ও সংগঠনের প্রসার এবং এর মধ্যেই ছিল কংগ্রেসী দল ও রাজনীতির একটি ব্যাপক পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা। পুনর্বার নবোদ্যমে গড়ে উঠে এই দলটি এমনকি সন্ত্রাসবাদীদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ফলে বিপ্লবাত্মক সহিংস কর্মকাণ্ড কিছুকাল শান্ত থাকে। মুসলমান রাজনীতিবিদরাও ১৯১৮ সালে ব্যাপক রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সমস্যায় পড়ে। এই সময়ে নানা কারণে কলকাতায় তাদের ধর্মীয় সহকর্মীদের হতাশার কারণে শুরু হয় মারাত্মক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। এই রকম বিস্ফোরণে নতুন সাম্প্রদায়িক সংগঠনসমূহ, বিশেষকরে খেলাফত কমিটিগুলির প্রতিষ্ঠা ত্বরান্বিত হয় এবং শিল্পশ্রমিকদের মাঝে উক্ত সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির সাংগঠনিক তৎপরতার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে।

আট বছর পরে কলকাতায় এর চেয়েও মারাত্মক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয় এবং এই দাঙ্গায় বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের আরেকটি মোড় সূচিত হয়। ১৯২৫ সালে চিত্তরঞ্জন দাসের অকাল মৃত্যুর পর কংগ্রেস ভিন্ন ভিন্ন নীতি গ্রহণ করে এবং যে হিন্দু-মুসলমান সমঝোতা তিনি কঠিন শ্রম ও দূরদর্শিতা প্রয়োগ করে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা তাঁর উত্তরসূরিরা অগ্রাহ্য করে। সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে যুক্ত হয় সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ। এ থেকে জন্ম নেয় মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদ। সকল নির্বাচনমূলক প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ লাভ করার প্রয়াসে সাম্প্রদায়িক প্রার্থীদের পিছনে মুসলিম ভোটারদের সংগঠিত করার জন্য সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ১৯৩০-এর দশক পর্যন্ত এই প্রয়াস টিকিয়ে রাখা হয় এবং তা বেশ সাফল্য অর্জন করে।

১৯৩৭ সালে কৃষক প্রজা পার্টির নেতা এ. কে. ফজলুল হক বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হওয়ার পর শুরু হয় পরবর্তী পর্ব। ১৯৩৫ সালে আরো ৪০ লক্ষ কৃষককে ভোটার তালিকাভুক্ত করা হয় এবং বিভিন্ন মতবাদী অনেক রাজনীতিবিদ প্রজাবর্গের পক্ষে কথা বলার দাবি নিয়ে সোচ্চার হন। এঁদের মধ্যে ছিলেন সাম্প্রতিককালে বৃটিশ কারাগার থেকে ক্রমান্বয়ে মুক্তিপ্রাপ্ত মার্কসীয় মতাবলম্বী ব্যক্তিবর্গ। হকের প্রধানমন্ত্রিত্ব ছয় বছরকাল টিকে থাকে এবং তাঁর পর্যায়ক্রমিক মন্ত্রিত্বকালে কয়েকটি গ্রামীণ অর্থনীতি ও সমাজসংস্কার আইন প্রণীত হয়।

১৯৪৩ সালে ফজলুল হকের পতন ঘটে। এ প্রসঙ্গে এম. এ. জিন্নাহ দাবি করেন যে, তাঁর পরাজয় ছিল মুসলিম লীগের আদর্শের জয় এবং এই প্রতিষ্ঠান ছিল তখন পাকিস্তান অর্জনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত চূড়ান্ত পর্বে লীগ বাংলায় ক্ষমতাসীন থাকে। পাকিস্তানের মধ্যে এই প্রদেশটির পূর্ণ কিংবা আংশিক অন্তর্ভুক্তির সম্ভাব্যতা ছিল এই সময়ের একটি প্রধান রাজনৈতিক বিষয়।

### উনিশ শতকের ঐতিহ্য

উপরোক্ত পাঁচটি পর্বের প্রতিটির জন্য আমাদেরকে রাজনীতির প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো পরীক্ষা করে দেখতে হবে। এটা করতে গিয়ে আমাদের উচিত 'রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান' শব্দটির সম্ভাব্য সুস্পষ্ট গঠন উপস্থাপন করা। যেসব প্রতিষ্ঠান নামেমাত্র অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রকৃতির, সেগুলিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় এবং আমরা যদি সেগুলিকে হিসেবের মধ্যে না আনি, তবে আমরা আমাদের রাজনৈতিক প্রক্রিয়া সম্পর্কিত জ্ঞানকে সীমাবদ্ধ রাখবো। অতএব, এখানে আমি এক প্রান্তে সরকারি প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানগুলি এবং অপরপ্রান্তে পরিবারের রাজনৈতিক ভূমিকাকে আলোচনার মধ্যে রাখছি না। প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান ও পরিবারের মধ্যে যেসব প্রতিষ্ঠান রয়েছে, সেগুলির প্রায় সব ক'টিকেই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বলে অভিহিত করা যেতে পারে।

বিশ শতকের প্রারম্ভে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী প্রশাসকদের বিরক্তি সত্ত্বেও ইতিমধ্যে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যাপক বিস্তার লাভ করে। প্রশাসকরা এ রকম অবস্থাকে প্রদেশের জন্য অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতি বলে মনে করে। প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি বৃটিশদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় স্থাপিত হয়, কিন্তু এগুলি ক্রমশ বাঙালিদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। এই শতাব্দীর প্রায় চল্লিশ বছরের পুরনো বঙ্গীয় আইনসভাকে কঠোর বৃটিশ নিয়ন্ত্রণাধীন একটি ক্ষুদ্র উপদেশক সভা হিসেবে অস্তিত্ব বজায় রাখতে দেখা যায়। কিন্তু কলকাতা পৌর কর্পোরেশন এবং অন্যান্য পৌরসভা ও স্থানীয় বোর্ডগুলির ক্ষেত্রে বৃটিশের পক্ষ থেকে এই নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারটি ততোটা জোরালো ছিল না। এই সকল স্থানীয় সংস্থায় নির্বাচিত হওয়া বা নিযুক্তি লাভ ছিল এক চরম মর্যাদার ব্যাপার এবং তৎকালীন বাংলার রাজনীতিতে সবচেয়ে সক্রিয় দু'টি পেশাগত শ্রেণী এই মর্যাদা লাভের জন্য ছিল অত্যন্ত সক্রিয়। এরা হচ্ছে ভূস্বামী ও আইনজীবী শ্রেণী। এই কারণে অধিকাংশ জেলা শহরগুলিতে ভূস্বামী ও আইনজীবী সমিতির অস্তিত্ব এবং রাজধানীতে এদের সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড লক্ষ্য করা যায়। মাসে মাসে হলেও এই ভূস্বামী ও আইনজীবীদের কাজের সমন্বয় সাধন করতো কলকাতা থেকে জমিদারদের ক্ষেত্রে অভিজাত ও প্রভাবশালী বৃটিশ ভারতীয় সমিতি এবং আইনজীবীদের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বার লাইব্রেরি ক্লাব।

কলকাতায় ব্যাঙ্কমালিক ও ব্যবসায়ী এবং চা-বাগান (প্লানটেশন), কয়লাখনি ও কলকারখানার মালিকদের স্বার্থরক্ষার জন্য ছিল বণিক সমিতি। এই বণিক সমিতি-সমূহ সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে, পৃথক পৃথক বৃটিশ, মাড়োয়ারি, মুসলমান ও বাঙালি হিন্দু

সংগঠনগুলির সহযোগিতায় গঠিত হয়। মফস্বল এলাকায় প্রায় সব বিখ্যাত ব্যাঙ্কমালিক ও ব্যবসায়ীর (মাড়োয়ারি, মুসলমান ও বাঙালি হিন্দু) জমি ছিল। সুতরাং আমরা ভূস্বামী সমিতিগুলিকে স্থানীয়ভাবে তাদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করতে দেখতে পাই।

আইনজীবী ও জমিদারগণ জেলা ও অন্যান্য সমিতিগুলির নিয়ন্ত্রণে ছিলেন এবং এখানে কলেজের অধ্যাপক, স্কুলশিক্ষক, সাংবাদিক ও সরকারি কর্মকর্তাদেরকেও দেখা যেতো। এগুলির মধ্যে কিছু কিছু সংগঠন জেলাসদর শহরে সক্রিয় ছিল, কিন্তু অধিকাংশ সংগঠনের কেন্দ্র ছিল কলকাতায়। সেখানে বিশিষ্ট পেশাজীবী ও ব্যবসায়ীরা তাঁদের জীবনের উন্নতি বিধান করার জন্য যেতেন এবং সেখানে তাঁদের নিজ জেলার স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সবচেয়ে বেশি সচেষ্ট থাকতেন।

আমরা উনিশ শতকের প্রারম্ভে কংগ্রেস নামক সংগঠনের অস্তিত্ব দেখতে পাই না। প্রতিষ্ঠালাভের পর দীর্ঘকাল কংগ্রেস ছিল একটি নামসর্বস্ব সংগঠন। সমিতিগুলির অনেক সদস্যই নিজেদেরকে কংগ্রেসী বলে পরিচয় দিত; ভারতীয় সমিতির অধিকাংশ সদস্যই এই পরিচয় দিত। কিন্তু কংগ্রেসের সকল কাজকর্ম সীমাবদ্ধ থাকে ভারতীয় সমিতির নির্বাহী সভা ও নিয়ন্ত্রণকারী জেলার জেলা সভার যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত বার্ষিক জাতীয় সম্মেলন ও প্রাদেশিক সম্মেলনের মধ্যেই। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অস্তিত্ব কাগজে-কলমে থাকলেও বস্তুত তা ছিল ভারতীয় সমিতির একটি উপ-কমিটিবিশেষ।

আধুনিক ভারতের ইতিহাস সংক্রান্ত লেখায় অন্যতম প্রধান প্রচলিত বিকৃতি হলো রাজনীতির সঙ্গে জাতীয়তাবাদের সমীকরণ এবং যে বিষয়টি নিয়ে পুনরাবৃত্তি করার কারণ রয়েছে তা হলো এই যে, বিশ শতকের প্রথমদিকে বহু রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের অস্তিত্ব ছিল এবং তাতে জাতীয়তাবাদ ছিল অপ্রাসঙ্গিক ও কেবল প্রান্তিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই ধরনের রাজনীতির একটি স্পষ্ট ক্ষেত্র ছিল বাংলার শিক্ষা-রাজনীতি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট থেকে শুরু করে মহকুমা শহরের স্কুল শিক্ষাবোর্ড পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে অতি বিশিষ্ট স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ স্বেচ্ছাশিক্ষা প্রশাসনে নিয়োজিত ছিলেন। এঁরা স্থানীয়ভাবে ছিলেন অতিশয় প্রভাবশালী এবং শিক্ষা-রাজনীতি ছিল এঁদের কর্মকাণ্ডের একটি বড় ক্ষেত্র।

শিক্ষা-রাজনীতি ক্ষেত্রে মুসলমানরাও ছিল খুব সক্রিয়। তাদের মাদ্রাসা ও মক্তব বিষয়ক কাজকর্ম ছাড়াও ১৯০০ সালের দিকে তারা শিক্ষাক্ষেত্রে পশ্চাৎপদতার কারণে নিজ সম্প্রদায়ের জন্য প্রতিকারমূলক সহায়তায় প্রভাব খাটাতে প্রাদেশিক ও জাতীয় পর্যায়ে সভাসমিতি (কেন্দ্রীয় জাতীয় মোহামেডান এসোসিয়েশন সবচেয়ে প্রসিদ্ধ) গঠনপূর্বক সাধারণ শিক্ষা-রাজনীতিতে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করছিল। হিন্দু পরিচালিত জেলা ও গণসমিতিসমূহের অনুরূপ সংস্থা জেলা ইসলামিয়া আঞ্জুমানগুলি শিক্ষা-রাজনীতিকে অগ্রাধিকার প্রদান করে।

এ বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্য আমাদেরকে কলেজ ছাত্রসমিতিগুলির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। এই সমিতিগুলি নিজেরাই ছিল প্রাণবন্ত রাজনৈতিক বিতর্কের মঞ্চ এবং জাতীয়তাবাদী কর্মী তৈরির কেন্দ্র। রাজনীতির সাথে সরাসরি কম জড়িত কিন্তু শিক্ষিতদের মিলিত হবার এবং আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল অনেক শহরে বিদ্যমান ব্যক্তিগত লাইব্রেরি, পাঠাগার এবং সাহিত্য পরিষদ, সারস্বত সভা ও সংস্কৃতি সভার মতো সাংস্কৃতিক সমিতিগুলি। এইসব প্রতিষ্ঠানের বাংলা শিরোনাম দেখে বোঝা যায় যে, এগুলি ছিল নির্দিষ্ট লোকালয়ের হিন্দু সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট হিন্দু সমিতি। উল্লেখ্য যে, বাঙালি মুসলমানের সাংস্কৃতিক জীবন ছিল একেবারে নিষ্প্রভ, কারণ কলকাতার বাইরে তাদের ছিল এ রকম কেবল গুটি কয়েক সমিতি এবং সেগুলির অধিকাংশের পৃষ্ঠপোষকতা করতো উর্দুভাষী মুসলমান সম্প্রদায়, বাংলাভাষী মুসলমান সম্প্রদায় নয়।

এমতাবস্থায় এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করা প্রয়োজন যে, সমভাবে সমগ্র প্রদেশব্যাপী এই প্রাতিষ্ঠানিক উন্নতি সাধিত হয় নি। অবশ্য কলকাতা ছিল ব্যতিক্রম। কিন্তু দেশের অন্যান্য জেলাগুলির মধ্যেও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাত্রায় ছিল লক্ষণীয় পারস্পরিক পার্থক্য। উদাহরণস্বরূপ, মেদিনীপুর ও হুগলীতে নিকটবর্তী বাঁকুড়া, বর্ধমান ও বীরভূমের চাইতে বেশি রাজনৈতিক-প্রাতিষ্ঠানিক কর্মতৎপরতা দেখা যায়। ঢাকা ও চট্টগ্রামের মধ্যবর্তী জেলাগুলির চেয়ে ঐ জেলাদ্বয়ে ছিল অনেক বেশি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। এই বৈষম্যময় অবস্থার কারণ আমরা অনুমান করতে পারি। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপারটি এই যে, বাংলার রাজনৈতিক প্রক্রিয়া এবং বিবিধ মৌলিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অনেক সীমিত।

**প্রথম পর্ব, ১৯০৬-১৯১৮**

লর্ড কার্জনের বঙ্গবিভাগ বাংলার রাজনীতিতে অসাধারণ গতি সঞ্চার করে এবং হঠাৎ সংবাদপত্রের প্রচারসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াই এর প্রমাণ। উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে কলকাতা ঠিকই প্রাণবন্ত সাংবাদিকতার জন্য বিখ্যাত ছিল, তবে আমাদের এই সাংবাদিকতার আয়তন কিংবা এর প্রভাব সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। কেবল ১৯০৬ সাল থেকেই সংবাদপত্র পাঠের মাত্রা যথেষ্ট প্রসার লাভ করে এবং সংবাদপত্র ও সাময়িকীর অফিসগুলি উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। আর এসব পত্র-পত্রিকায় নিয়োজিত হয় বিপুল সংখ্যক পেশাগত সাংবাদিক। স্বল্পকালস্থায়ী পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশের রাজধানী ঢাকা তখন দৈনিক পত্রিকা চালিয়ে নেবার সামর্থ্য অর্জন করে এবং অন্যান্য মফস্বল শহর অবিরাম সাপ্তাহিক সাময়িকী প্রকাশ করতে থাকে। এই সকল সাময়িকী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী প্রেসের আনুষঙ্গিক পত্র-পত্রিকা এবং এদের প্রকাশকরা যখন তাদের প্রধানত সরকারি বিজ্ঞাপনের অবশ্যম্ভাবী ক্ষতিপূরণের জন্য স্থানীয় কংগ্রেসীদের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য পেতো, তখনই শখ করে জাতীয়তাবাদী

রাজনীতির চর্চা করতো। এটি ছিল অন্যতম উপায়, যার মাধ্যমে বৃটিশরা হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণ করতো। মুসলমান রাজনৈতিক অবস্থানের পক্ষ সমর্থনের জন্য অনুরূপ কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ছিল না।

১৯০৬ সালে এবং তার পরবর্তী বছরগুলিতে বাংলায় রাজনীতির প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নে বৃটিশদের উদ্বিগ্ন হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল। 'গরিবন্ডির লাল কোর্তাদের' দ্বারা উৎসাহিত হয়ে জঙ্গি যুব কংগ্রেসীরা যেসব দোকান আমদানিকৃত কাপড় বিক্রি করতো সেসব দোকান বর্জনে অগ্রণী ভূমিকা নিত। এই শতাব্দীর প্রথম থেকে পরীক্ষামূলক স্বেচ্ছাসাহায্য সমিতিসমূহের দ্বারা উৎপাদিত দেশীয় পণ্য এরা ফেরি করে বিক্রি করতো এবং এ উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছাব্রিগেড সংগঠিত করে। এই আর্থিক স্বনির্ভরতার আদর্শকে জাতীয় শিক্ষার আদর্শরূপে গড়ে তোলা হয়। আর্থিক স্বনির্ভরতার আদর্শের মধ্যে বৃটিশ নিয়ন্ত্রিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার আওতা থেকে মুক্ত রেখে জাতীয় স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ প্রদান করা হয়। নতুন প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষাক্রম প্রযুক্তি ও শরীরচর্চা শিক্ষার উপর জোর দিয়ে হিন্দুস্থানের গৌরবময় সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। এই সময়ে খেলাধুলার ক্লাব ও ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে শরীরচর্চা শিক্ষা এবং সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাপূর্ণ সংগ্রামের প্রস্তুতির মধ্যকার কর্মকাণ্ড কোন গোপন ব্যাপার ছিল না।

এই পর্যায়ে অধিকতর গোপনীয়তা বজায় রেখে চলছিল বিপ্লবী সমিতিগুলি। এই সমিতি প্রতিশোধপরায়ণ মা কালীর প্রতি শ্রদ্ধা হিসেবে রাজনৈতিক আত্মবিসর্জনের উত্তেজক মতবাদ প্রচার করে কলেজ ছাত্রদের সমিতির সদস্য হতে উদ্বুদ্ধ করে। বিপ্লবী সমিতির ব্যাপক ব্রতীকরণ,আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এর সদস্যদেরকে আনুগত্য, গোপনীয়তা ও চিরকৌমার্য গ্রহণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করা হতো এবং অতি বিশ্বস্তদের ক্ষেত্রে বৃটিশ কর্মকর্তাদের উপর আক্রমণ পরিচালনার প্রস্তুতির জন্য বোমা ও রিভলবার নিয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতো। কলকাতা এবং হুগলী নদী বরাবর উত্তর দিকের শহর এলাকা, ঢাকা ও বরিশাল ছিল এই সমিতির প্রাথমিক কেন্দ্র। কিন্তু বৃটিশরা তাদের সাম্রাজ্যের প্রতিরক্ষা কমিটির শক্তিবৃদ্ধি করায় এবং স্বেচ্ছাচারী গ্রেফতার ও নির্বাসনের মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদীদের প্রত্যাঘাত করায় সন্ত্রাসকারীরা আত্মগোপন করে এবং তাদের গোপন আস্তানা থেকে দেশে বিপ্লবী সহিংসতার আদর্শ প্রচার করতে থাকে। এই বিপ্লবী সহিংসতাই বাংলার রাজনৈতিক ঐতিহ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠে।

কম দৃশ্যমান অথচ সক্রিয় ছিল যাত্রা (লোকনাটক) ও লোকসঙ্গীত দলগুলি। এই দলগুলি শহরের কেন্দ্র থেকে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে ধর্মীয় ঐতিহ্য ও বাণী প্রচার করতো। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দিজেন্দ্রলাল রায়, অতুল প্রসাদ সেন ও মুকুন্দ দাসের মতো সবচেয়ে জনপ্রিয় ও শক্তিমান পুরুষেরা এইসব দলের অভিনেতাদেরকে গান ও নাটক লিখে সরবরাহ করতেন।

এ সময় কলকাতা থেকে মফস্বল এলাকায় নতুন নতুন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ছড়িয়ে পড়তেও দেখা যায়। উনিশ শতকের অধিকাংশ সময় রাজধানীতে এবং একটি বা দুটি বৃহৎ শহরে ব্রাহ্ম সমাজের মতো সংস্কারবাদী দল ও তাদের সনাতন বিরোধী প্রতিপক্ষের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও বিবাদ ঘটতে দেখা যায়। কিন্তু গ্রামবাংলায় ধর্মীয় সংগঠন তাদের ঐতিহ্যগত পারিবারিক বা বংশীয় রূপ বজায় রাখে। বিবেকানন্দের রামকৃষ্ণ মিশনের মঠ, আশ্রম, বিদ্যালয়, ছাত্রাবাস, লাইব্রেরি ও চিকিৎসালয় দ্রুত সারা বাংলায় ও বাংলার বাইরে ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায় এবং এই মিশন রাজনীতির নয়া আদর্শ সরবরাহ করে এবং এই প্রসঙ্গে রাজনীতির নতুন পরিসর সৃষ্টি হয়।

যে সমাজসেবার আদর্শ মিশনকে কাজের উৎসাহ যোগাতো, তা একদল ক্ষুদ্র সমিতির কাজে উৎসাহ যোগায় এবং এই ক্ষুদ্র সমিতির অধিকাংশই ছিল ধর্মনিরপেক্ষ। যে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে রয়েছে বাংলার নিদারুণ সম্পর্ক সেই প্রাকৃতিক দুর্যোগ তথা দুর্ভিক্ষ, বন্যা, ঝড় ও মহামারির পুনঃসংঘটনশীল ধ্বংসযজ্ঞের সময় এই সকল সংগঠন তহবিল গঠন করতো, ত্রাণ সরবরাহের যোগান দিত এবং দুর্যোগ-উপদ্রুত মানুষের প্রয়োজন মেটাবার ব্যবস্থা নিত। জরুরি ত্রাণকাজ পরিচালনাকালে কঠোর পরিশ্রম ও কার্যকর সংগঠনের মাধ্যমে রাজনৈতিক সুনাম অর্জন করা হতো।

জাতীয়তাবাদী রাজনীতির এই উদ্যম ও প্রয়াস বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে একটি প্রতিকূল ক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং এই প্রতিকূল ক্রিয়াটি পরবর্তী দশকে যে পর্যায়ক্রমিক সঙ্কটে মুসলমানরা বিজড়িত থাকে সেই পর্যায়ক্রমিক সঙ্কটের মাঝে বজায় থাকতে দেখা যায়। ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকা সম্মেলনের পর নিখিল ভারত ও বাংলা প্রেসিডেন্সি মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা ছিল একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, এটিই ছিল মুসলমানদের একমাত্র রাজনৈতিক সংগঠন।

## দ্বিতীয় পর্ব, ১৯১৮-১৯২৬

১৯১৭ ও ১৯১৮ সালের শীতকালে *ভারতীয় সমিতির* নিয়ন্ত্রণ থেকে বাংলা প্রাদেশিক কংগ্রেসকে উদ্ধার করে এর উপর নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে চিত্তরঞ্জন দাস ও তাঁর সহচর চরমপন্থীরা কলকাতায় নিখিল বঙ্গ রাজনৈতিক সম্মেলন আহ্বান করেন। ঐ সম্মেলনে তাঁরা একশ'র বেশি গ্রামীণ প্রতিনিধি আনতে সক্ষম হন। প্রতিনিধিদের সমর্থন লাভ করে চরমপন্থীরা বাংলা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির ক্ষমতা দখল করেন এবং জেলা সমিতিগুলিকে প্রত্যক্ষ প্রতিনিধিত্ব দেবার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে কমিটি পুনর্গঠিত করা হয়।

এটি ছিল বাংলায় কংগ্রেস কমিটির অবকাঠামো তৈরির প্রথম সঙ্ঘবদ্ধ প্রয়াস এবং ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে কংগ্রেসের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডকে উচ্চমাত্রা লাভ করতে দেখা যায়। সেই সময়ের মধ্যে বাংলা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির

অফিস কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেখান থেকে চিত্তরঞ্জন দাসের সার্বক্ষণিক কর্মীবাহিনী কলকাতার চারটি এলাকার কাজ পরিচালনা করতো। রাজধানী শহর কলকাতাকে চারটি এলাকায় ভাগ করা হয় এবং প্রতিটি জেলায় সক্রিয় কংগ্রেস কমিটিসমূহের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা হয়। কংগ্রেস সংবাদ সার্ভিসকে পার্টির প্রচারণার কাজে নিয়োগ করা হয় এবং আগের চেয়ে আরো নিয়মানুগ গতিতে অসংখ্য কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক সমগ্র প্রদেশব্যাপী স্বরাজ তহবিল শক্তিশালী করার কাজে ব্যাপৃত হয়ে পড়ে।

রাজনৈতিক বিক্ষোভে বহুসংখ্যক মহিলাকে আত্মপ্রকাশ করতে দেখা যায় এবং নতুন মহিলা সমিতি শহরগুলিতে শিক্ষা ও সমাজকল্যাণ কাজে অংশগ্রহণ করতে শুরু করে। যেসব জাতীয় স্কুল ও কলেজ বঙ্গবিভাগ আন্দোলনের বছরগুলিতে বন্ধ হয়ে যায়, সেগুলিকে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জনে উৎসাহ দেয়ার জন্য পুনরুজ্জীবিত করা হয় এবং কোন কোন স্থানে কংগ্রেস সালিশী বোর্ডগুলিকে আদালত থেকে প্রত্যাহারকৃত মামলার ব্যাপারে মধ্যস্থতা করার দায়িত্ব দেয়া হয়। যদিও সমান্তরাল এই প্রয়াস অল্প কয়েক মাসের বেশি টিকিয়ে রাখা যায় নি, তথাপি এই প্রয়াসে এমন একটি সংগ্রামী প্রক্রিয়ার জন্ম হয়, যা স্বাধীনতা পর্যন্ত বা স্বাধীনতার পরেও প্রতিটি আইন অমান্য আন্দোলনে বারবার সাফল্যের সাথে ব্যবহার করা হয়। শহরগুলির বাইরেও কংগ্রেসের প্রভাব বিস্তারের জন্য গান্ধীবাদীরা গ্রামীণ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে। এই আশ্রমগুলিতে ব্যক্তিগত পরিশ্রম ও দায়িত্বের ভিত্তিতে ধৈর্যের সাথে গ্রাম পুনর্গঠন ও কুটিরশিল্পের বিভিন্ন দিকে শিক্ষাপ্রদান করা হতো। এসব কাজে মুসলমান ও হিন্দুরা জড়িত ছিল, অর্থাৎ ১৯১৮ সাল থেকে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত এই সময়কালটি বাংলায় ভারতীয় জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে মুসলমানদের উচ্চমাত্রায় অংশগ্রহণের পরিচয় বহন করছিল।

অধিকন্তু, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরপরই এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ মুসলমানরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে খেলাফত রক্ষার জন্য আন্দোলন শুরু করে। দেশের প্রতি শহরে স্থাপন করা হয় খেলাফত কমিটি। খেলাফত কমিটিগুলির কেন্দ্রীয় প্রধান দফতর ছিল কলকাতায় এবং প্রতিটি জেলা শহরে এদের শাখা বিস্তারলাভ করে। এই কমিটিগুলি কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের সাথে সমান্তরালভাবে গড়ে উঠে। খেলাফতীগণ জেলা ইসলামিয়া আঞ্জুমানগুলির নিয়ন্ত্রণ গ্রহণেও তৎপরতা দেখায় এবং বহু মোল্লার সমর্থন পেয়ে তারা তাদের স্বধর্মাবলম্বীদের মধ্যে একটি নির্ভরযোগ্য যোগাযোগকাঠামো গড়ে তোলে।

খেলাফতীরাই ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনে কংগ্রেস কর্তৃক তাৎক্ষণিকভাবে অনুসৃত প্রয়াসের অনুরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। যুদ্ধের ঠিক পরবর্তী বছরগুলিতে পরিবহনশ্রমিক, খনিশ্রমিক, কারখানাশ্রমিক এবং চা-বাগানের কুলিদের মধ্যেকার বিক্ষোভ অনেক বেপরোয়া ধর্মঘটের জন্ম দেয়, কিন্তু ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনটি ছিল দুর্বল এবং সংগঠনটির

যেকোন ধর্মঘট করার মতো মজবুত তহবিলের অভাব ছিল। ফলে ধর্মঘটে জড়িত শ্রমিকগণ দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাংলায় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে একটি জোরালো শক্তিতে রূপান্তরিত করার জন্য সংগঠনটির আরো বিশ বছর সময় লাগে।

এইসব প্রয়াস সুস্পষ্টরূপে আন্দোলনকে অধিকতর গণমুখী করার উদ্দেশ্যে সংগ্রহকাজে পরিচালিত হয়। নগরবাসী নিম্নমধ্যবিত্ত এবং ধনী কৃষিজীবীদের মধ্য থেকে ১৯২১ সালে প্রায় দশ লক্ষ নতুন লোকের ভোটাধিকার লাভে উৎসাহিত হয়ে আরো নতুন সংগঠন অন্যান্য পেশাদারি কর্মপ্রয়াসে তৎপর হয়। শিক্ষক, মোক্তার, অঘোষিত সরকারি কর্মকর্তা ও জোতদারদের নিয়ে সমিতি গঠনে প্রখ্যাত এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী রাজনীতিবিদদের ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়। নির্বাচনের ঝুঁকি গ্রহণ করা তখন যথোপযুক্ত হয়ে উঠে। কতিপয় সরকারি বিভাগের উপর প্রাদেশিক বিধান পরিষদকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়, সরকার কর্তৃক মনোনীতদের কাছ থেকে নির্বাচিত সদস্যদের হাতে মধ্য দশকে কলকাতা পৌর কর্পোরেশনের ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয় এবং সম্প্রসারণপদ্ধতির আওতাভুক্ত স্থানীয় বোর্ডগুলি জেলা ও বিভাগীয় কর্মকর্তাদের কাছ থেকে দায়িত্ব বুঝে নেয়। ১৯২১ সালে অসহযোগীরা তাদের সাফল্যের শিখরে আরোহণ করেও বিরুদ্ধবাদীদের কাছে এসব প্রতিষ্ঠান ছেড়ে দেয়ার মধ্যে যে ঝুঁকির সম্ভাবনা ছিল সে সম্পর্কে বেশ সতর্ক ছিল এবং ১৯১৫ ও ১৯২৫ সালের মধ্যকার বছরগুলিতে তারা যে অন্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের ব্যাপারে সক্রিয় ছিল তা অবশ্যই লক্ষ্য করতে হবে। সেটি হলো ধর্ম ও বর্ণভিত্তিক সমিতিসমূহের প্রতিষ্ঠা। বাংলার কোন কোন বর্ণগত সভার অভ্যুদয় অনেক আগেই ঘটেছিল, কিন্তু এই সময় মধ্য ও নিম্নবর্ণের বহু সংগঠনের উৎপত্তি পরিলক্ষিত হয়। এই নতুন সমিতিগুলি পুরনো ও চিরাচরিত বর্ণগত পঞ্চায়েতের সাথে তুলনীয় নয়। জেলা শহর কিংবা কলকাতায় অবস্থানরত গুটিকয়েক শিক্ষিত ও পেশাজীবীদের দ্বারা গঠিত হয়েছে এইসব নতুন সমিতি। মুদ্রিত পরিপত্রের মাধ্যমে এবং যেসব জেলা শহরে অধিকাংশ বর্ণহিন্দু সদস্যরা আরাম-আয়েশে থাকতেন, সেসব জেলা শহরে আহুত সভায় তাঁরা প্রস্তাবিত সমিতির উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতেন।

অনুরূপভাবে, এইসব উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি ছিল যে উচ্চ মর্যাদার বিষয়টির সাথে বর্ণভেদ 'সন্দেহাতীতভাবে' জড়িত সেই উচ্চ মর্যাদার (ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা নিরেট শূদ্র যেটিই হোক না কেন) উপযোগী করে বর্ণগত আচার-অনুষ্ঠানের উন্নতি বিধান নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা। যে বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় তা হলো সঠিক বর্ণগত মর্যাদা এবং এই বর্ণগত মর্যাদার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যেকোন বর্ণগত নামকে দশ বছর অন্তর আদমশুমারিতে অন্তর্ভুক্ত করা। কোন কোন ক্ষেত্রে বর্ণগত উপদল বিলোপের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে বিশেষকরে যেখানে লক্ষণীয়ভাবে পেশাগত পার্থক্য বিরাজ করে, সেখানে পরিপূর্ণ প্রয়াসকে সমর্থন করা হয়েছে। যদি বর্ণসমূহের

লোকেরা তাদের যেসব সাথী নির্বাচনে প্রার্থী হয় তাদেরকে দৃঢ় সমর্থন জ্ঞাপন করে থাকে, তাহলে স্থানীয় বোর্ড এবং আইন পরিষদের উপর অর্পিত নতুন ক্ষমতার দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণসমূহের প্রতি প্রদেয় সুযোগ-সুবিধার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে। এই সংস্কারগুলি কার্যকর করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষাবিস্তারের প্রচার অভিযানের প্রতি সমর্থন প্রদানের ক্ষেত্রে সমিতির চাঁদার যোগান দিতে এবং অভাবগ্রস্ত লোকদেরকে সাহায্য প্রদানে সমিতিকে সক্ষম করে গড়ে তুলতে বর্ণসমূহকে উৎসাহিত করা হয়। এসব আবেদনে যখন অনুকূল সাড়া পাওয়া যায়, তখন স্বভাবতই সমিতিগুলি বর্ণসংক্রান্ত সাময়িকী প্রকাশ করতে শুরু করে, যদিও মাত্র কয়েকটি সাময়িকী অধিক সময় টিকে থাকে।

## তৃতীয় পর্ব, ১৯২৬-১৯৩৭

কোন কোন হিন্দু বর্ণ সমিতির প্রকাশিত সাহিত্যে উচ্চবর্ণের লোকদের বিশেষ সুবিধা ও ক্ষমতার বিষয়ে সমালোচনা ছিল একটি বৈশিষ্ট্য। এতে ১৯২৩ সালে বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভা গঠনের পথ সুগম হয়। এই হিন্দু মহাসভা গঠনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিল ব্রাহ্মণগণ এবং তাদের ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অনৈক্য প্রতিরোধ করা। ১৯২৬ সাল থেকে বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভাকে বহু বাধার সম্মুখীন হতে হয়।

কংগ্রেস কর্তৃক চিত্তরঞ্জন দাসের হিন্দু-মুসলিম চুক্তি বাতিলকরণ ও এর পরবর্তী সময়ে ১৯২৬ সালের মধ্যভাগে অভূতপূর্ব সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে অনেক বাঙালি মুসলমান সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, যেসব মুসলমান নেতা হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের সাথে সব ধরনের মৈত্রীর অবসানে মদদ যোগাচ্ছেন তাদেরকে অনুসরণ করাই যুক্তিযুক্ত হবে। প্রাদেশিক সরকারের অনুমোদনক্রমে এবং কোন কোন জেলায় বৃটিশ কর্মকর্তাদের সহায়তায় অধিকতর দক্ষ নির্বাচনী ব্যবস্থাপনার নিশ্চয়তা বিধানের উদ্দেশ্যে স্থানীয় মুসলিম সমিতিগুলির একটি সাফল্যজনক একত্রীকরণ ঘটে। ১৯২৬ সালের ডিসেম্বরের নির্বাচনে বঙ্গীয় আইন পরিষদে বহু স্বতন্ত্র প্রার্থীর বিজয়লাভের ফলে এই সাফল্যজনক একত্রীকরণ সংঘটিত হয়। এই একত্রীকরণের ফলে পরবর্তী বছরে স্থানীয় বোর্ডগুলির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে তাতে ব্যাপকহারে মুসলিম প্রার্থীর বিজয় সূচিত হয়। ১৯৩০ সালে প্রথমদিকে মুসলমানরা আরো বেশি আসন দখল করে এবং হিন্দু নিয়ন্ত্রিত কলেজ ও স্কুলবোর্ডগুলিতে তাদের প্রবেশলাভ করতে দেখা যায়। গ্রামীণ এলাকায় ভূম্যধিকারী উচ্চশ্রেণীর স্বার্থের বিরুদ্ধে মুসলমান ও নিম্নবর্ণের হিন্দু কৃষকগোষ্ঠীর মধ্যে সহযোগিতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যে কৃষক সমিতিগুলি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে তাদের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে দেশের কৃষকগোষ্ঠীকে সংগঠিত করার জন্য সক্রিয় ছিল, সেই কৃষক সমিতিগুলি বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার কারণে বাংলার অর্থনীতিতে ধ্বস নামার সুযোগে ব্যাপকহারে কৃষকদের সমর্থন অর্জনে সমর্থ হয়। এ. কে. ফজলুল হক কর্তৃক ১৯৩৫ সালের কৃষক প্রজা পার্টি গঠনের ফলে আইন পরিষদে এই সমিতিগুলির নেতৃত্বদানের ও এদের মুখপাত্র হিসেবে কাজ

করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। সাইমন কমিশন নিয়োগে যে শাসনতান্ত্রিক বিতর্ক শুরু হয়, সেই শাসনতান্ত্রিক বিতর্ক চলাকালে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের বিরুদ্ধে একটি উপদলে নিম্নবর্ণসভাকে একত্রিত করার জন্য একই সময়ে অন্ত্যজ শ্রেণীর (তফসিলী সম্প্রদায়, পরবর্তী সময়ে তারা এই নামে অভিহিত হয়) সমিতিসমূহ গঠন করা হয়। রাজনীতির এই উদ্দেশ্য অনুসরণ করে বাংলার একটি বৃহৎ কিন্তু সাধারণভাবে অবহেলিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং উপজাতীয়গণও গ্রামীণ পরিষদের মধ্যে আন্ত-উপজাতিক সংযোগ নির্মাণ করার প্রয়াস চালাচ্ছিল। এ ব্যাপারে তারা কেবল সীমিত সাফল্য অর্জন করে, তবে সাঁওতালরা সম্ভবত এ বিষয়ে ছিল সবচেয়ে বেশি উদ্যোগী।

বাংলায় নানা চরমপন্থী সংগঠনের বিভিন্ন ধরনের সক্রিয় কর্মকাণ্ডের ভিতব দিয়ে চলছিল এই দুর্যোগময় বছরগুলি। সমসাময়িক ইউরোপের ফ্যাসিবাদী ও কমিউনিস্ট পার্টিগুলি এ সময়ে কিছু কিছু বাঙালি যুব আন্দোলনকারীদের কাছে আদর্শ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। স্বদেশে প্রতিষ্ঠিত সন্ত্রাসবাদী সমিতিগুলি বাংলার গ্রাম ও শহরের ব্যাপক এলাকায় জালের মতো তাদের শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে এবং তাদের জবরদস্তিমূলক কৌশলসমূহ এখন তাদের মুসলমান ও হিন্দু রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও বৃটিশের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হতে থাকে। ১৯৩০-১৯৩৪ সালের মধ্যকার আইন অমান্য আন্দোলন চলাকালে সন্ত্রাসবাদীরা বৃটিশ পুলিশ ও সেনাবাহিনীকে গেরিলা যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত করে রাখার জন্য যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করে। মেদিনীপুর জেলায় তারা উপর্যুপরি কয়েকজন বৃটিশ কর্মকর্তাকে হত্যা করায় সাময়িকভাবে সেখানে বৃটিশ নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে পড়ে এবং কিছুকালের জন্য কংগ্রেস একটি সমান্তরাল সরকার পরিচালনা করতে সক্ষম হয়। গোহত্যা এবং মসজিদের সামনে বাদ্য বাজানোর ব্যাপারে পরস্পরকে বাধাদান করতে গিয়ে সংশ্লিষ্ট সমিতিগুলি পারস্পরিকভাবে তাদের সাম্প্রদায়িক প্রতিপক্ষের অন্যায়-অপরাধের প্রমাণ উপস্থাপনে ব্যস্ত থাকে। এই বেদনাদায়ক পরিস্থিতি আরো মারাত্মক করে তোলার জন্য কলকাতার গুণ্ডাদল ছিল এবং এই গুণ্ডাদলকে আন্তঃদলীয় বিবাদে ভাড়াটে সাহায্যকারীরূপে উভয় ধর্মের উগ্রপন্থী রাজনীতিবিদরা ব্যবহার করেন।

এই সময়ে হাজার হাজার বাঙালি জাতীয়তাবাদের আরেক ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক অভিজ্ঞতা অর্জন করে। সেটি হলো বৃটিশ কারাগার বা নিরোধ ক্যাম্পে অবরুদ্ধ জীবন যাপনকারীদের প্রতিষ্ঠান। এইগুলিকে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বর্ণনায় কোনরূপ কৌতুকপ্রবণতা ছিল না। তবুও বলতে হয়, বিভিন্ন বয়স, অভিজ্ঞতা, আদর্শগত বিশ্বাস এবং মূল অঞ্চলের বহু বন্দিকে একত্রে দলবদ্ধ করে বৃটিশ জাতি অনিচ্ছাকৃতভাবে এমন একটি পরিবেশের সৃষ্টি করে যাতে রাজনৈতিক দল, রাজনৈতিক মঞ্চ, দলীয় কর্মসূচি ও রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র সৃষ্টির পথ সুগম হয়। জাতীয়তাবাদীরা কারাগার থেকে স্নাতক ডিগ্রি গ্রহণ ছাড়াও প্রচুর বাস্তব জ্ঞান নিয়ে এইসব রাজনৈতিক 'কলেজ' থেকে বের হয়ে আসে।

**শেষ পর্ব, ১৯৩৭-১৯৪৭**

১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত দশকটি বাংলার জন্য এত উত্তেজনাময় ও বেদনাদায়ক ছিল যে, যদিও ক্রুটিহীনভাবে এর সমগ্র প্রাতিষ্ঠানিক ইতিহাস বর্ণনা করা সম্ভব নয় বলে মনে হয়, তথাপি এ পর্যায়ের যে মূল্যায়ন আমরা পাই, তা একেবারে অপ্রাসঙ্গিক বা ভ্রমাত্মক নয়। এই সময় কতিপয় নতুন অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। যে সমবায় আন্দোলন এই শতাব্দীর প্রথম থেকেই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে অগ্রসর হচ্ছিল, সেই আন্দোলনে ১৯৩০-এর শেষের দশকে কৃষক সমিতির উৎসাহ সৃষ্টি এবং পল্লীঋণ হ্রাসকরণ এবং কৃষিঋণের নতুন উৎস সৃষ্টির নির্বাচনী ম্যান্ডেট সম্বলিত একটি প্রাদেশিক সরকারের প্রতিশ্রুতি নতুন শক্তি সঞ্চার করে। এটিই ছিল প্রথম নির্বাচিত সরকার, যা ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অধীনে ক্ষমতা গ্রহণ করে এবং প্রদেশসমূহে প্রতিনিধিত্বশীল সরকার গঠন করে। এই প্রশাসনের পক্ষে আইন পরিষদীয় সমর্থন জুগিয়ে আসছিল কৃষক প্রজা পার্টি ও তফসিলী সম্প্রদায়ের দলগুলি। এই তফসিলী সম্প্রদায়ের দলগুলি পরবর্তী সময়ে বাঙালি রাজনীতির নতুন গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

মৌলিক আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আইন পরিষদ মার্কসবাদী গোষ্ঠীর সমর্থন বর্জন করে এবং এতে বৃটিশ কারাগারগুলির মধ্যে বিশেষ অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়। যুব সন্ত্রাসবাদীদের অনেকেই তাদের অন্তরীণাবস্থায় সাম্যবাদী ভাবধারা গ্রহণ করে এবং ১৯৩০-এর দশকের শেষদিকে তাদের মুক্তি প্রদান করা হলে রাজনৈতিক জটিলতার মাত্রা আরো বেড়ে যায়। উপদলীয় কোন্দলের জন্য সব সময়ই বাংলার মুসলিম রাজনীতির দুর্নাম ছিল। চিত্তরঞ্জন দাসের মৃত্যুর পর প্রাদেশিক কংগ্রেস তাঁর আরব্ধ কাজ চালিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯৩৯ সালে গান্ধীর নির্দেশে প্রভাবশালী বসু গ্রুপ বহিষ্কৃত হওয়ায় এবং অতঃপর এদের দ্বারা ফরওয়ার্ড ব্লক প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বাংলায় সমন্বিত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সকল সুযোগ নষ্ট হয়ে যায়। রাজনৈতিক অবকাঠামো তথা পৌরসভা, ছাত্রসংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন, জেলা কংগ্রেস কমিটি ও কৃষক সমিতিগুলির মাধ্যমে প্রতিদ্বন্দ্বী দলসমূহ ক্ষমতালাভের সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। অবাঙালিদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নতুন প্রতিনিধিত্বমূলক সমিতিসমূহ কলকাতায় দাবিদাওয়ার শোরগোল আরো বাড়িয়ে দেয় এবং সমগ্র ভারতব্যাপী আঞ্চলিক ভাবধারাকে তীব্রতর করে।

শেষ পর্যায়ে, স্বাধীনতার ঠিক পূর্বেকার বছরগুলিতে আমরা কতিপয় অতি লক্ষণীয় ভিন্নধর্মী কর্মকাণ্ড দেখতে পাই। এর একটি হলো, এ সময়ে প্রতিবেশী পূজা কমিটিগুলি বড় বড় হিন্দু উৎসব তথা দুর্গা ও সরস্বতী পূজাকে পারিবারিক অনুষ্ঠানের গণ্ডি থেকে সমবেতভাবে সাম্প্রদায়িক গণ্ডিতে ব্যাপকভাবে স্থানান্তরণের কাজে লিপ্ত থাকে। নিজস্ব তহবিল গঠনের বেশ কয়েক বছরের মধ্যে তাদের লোকালয় সম্পর্কিত ব্যাপক জ্ঞানলাভ এবং পার্শ্ববর্তী আয়োজনকারীদের সাথে উদ্ভূত প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিপ্রেক্ষিতে এইসব পূজা

কমিটি আনুষ্ঠানিক রাজনৈতিক দলগুলির প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক অঙ্গ-সংগঠনের রূপ লাভ করে। ইত্যবসরে মার্কসবাদীদের অনেকেই বর্তমানের যে ঐক্যবিনাশকারী অবস্থা বৃটিশদের এখান থেকে চলে যাওয়ার সাথে সাথে অপসৃত হবে বলে ধারণা করেছিল, সেই ঐক্যবিনাশকারী অবস্থা থেকে যেসব সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যেতে পারে সেসব লক্ষ্য করে বাংলার প্রোলেতারীয় শ্রেণী তথা শিল্প ও বাগান শ্রমিক, ভূমিহীন, উপজাতি এবং বাংলার কৃষককুলের মধ্যে সমাজবিপ্লবের প্ররোচনা সৃষ্টিতে কাজে লেগে গেল। কোন কোন স্থানে জমির খাজনা ও কর প্রতিরোধের সপক্ষে আন্দোলনে সমর্থন দিতে তারা প্রথম বঙ্গবিভাগকালের পূর্বের লোকসঙ্গীত ও যাত্রানুষ্ঠান আয়োজনের কৌশল অবলম্বন করে।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সুভাষচন্দ্র বসুর আত্মগোপন এবং ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনী গঠনের জন্য অক্ষশক্তির সাথে মৈত্রী গঠনের ফলে বাংলায় কল্পিত স্বতঃস্ফূর্ত সহিংসতায় ভাটা পড়ে। বৃহৎ ধর্ম দু'টির সাম্প্রদায়িক চরমপন্থীদের দ্বারা গঠিত সতর্ক প্রহরীদলভুক্ত স্থানিক বাহিনী ছিল কম কল্পনাবিলাসী ও তাৎক্ষণিকভাবে বেশ সহিংস। এইসব বেসরকারি বাহিনী ১৯৪০-এর দশকের প্রথমদিকে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয় এবং অবশেষে ১৯৪৬ সালের খণ্ডযুদ্ধে এই অবস্থার অবসান ঘটে। এতে যে রক্তপাত ঘটে তাতে বাংলাবিভক্তি নিশ্চিত হয়ে যায়।

## রাজনীতির সামাজিক ভিত্তি

বিশ শতকের বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক ইতিহাস সম্পর্কিত আমাদের জ্ঞান যদি পরিপূর্ণ না হয়ে থাকে, তবে রাজনীতির সামাজিক ভিত্তি সম্পর্কেও আমরা সম্ভবত সীমিত জ্ঞানের পর্যায়েই রয়েছি। রাজনৈতিক নেতৃত্ব কিংবা এর সমর্থকদের পরিবর্তনশীল অঞ্চল, মর্যাদা, শ্রেণী এবং পর্যায়ভিত্তিক গঠন ও বিকাশের ইতিহাস উদ্ধার করার জন্য কেবল প্রয়োজনীয় গবেষণা শুরু করা ছাড়া এর চেয়ে বেশি কিছু আমরা অর্জন করতে পারি নি।

এখানে যে প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের কাঠামো তুলে ধরা হয়েছে তাতে উক্ত পরিবর্তনগুলি সম্পর্কে জানার সূত্র পাওয়া যায়, তবে এই পরিবর্তনগুলির পরিমাণ এদের জানার সূত্রের চাইতে বেশি নয়। অধিকন্তু এদের সম্পর্কে বেশি কিছু জানা বা পাঠ করার ব্যাপারে আমাদের অবশ্যই সতর্ক থাকা উচিত। এই শতাব্দীর প্রথমদিকে ভূম্যধিকারী সমিতিগুলির প্রাধান্য সৃষ্টি এবং ১৯২০-এর দশকের মধ্যবর্তী সময়কাল হতে গুরুত্বের দিক দিয়ে এগুলোর দ্রুত অবনতিতে আমরা সঠিকভাবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি যে, পুরনো জমিদারশ্রেণী ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। যাই হোক, আমরা ভুল করবো যদি এই উদাহরণ থেকে এমনটি নিশ্চিত করে মেনে নিই যে, সকল প্রাতিষ্ঠানিক অবনতিতে নতুন সামাজিক স্তরের দিকে ক্ষমতার একটি পরিবর্তন অবশ্যই ঘটে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯১৮ সালের পর ভারতীয় সমিতির কোন গুরুত্ব ছিল না, কিন্তু গুরুত্বের দিক দিয়ে এই

সমিতিকে অতিক্রমকারী বাংলা কংগ্রেসের নেতৃত্ব আসে অনুরূপ ভদ্রলোক পদমর্যাদাসম্পন্ন দল থেকে এবং এই দল উনিশ শতকের শেষদিক থেকে বাংলার জাতীয়তাবাদী রাজনীতির উপর প্রাধান্য বিস্তার করে চলে।

অন্যত্র আমি যে অর্থে 'ভদ্রলোক' শব্দটি ব্যাখ্যা করেছি তা এই যে এরা সামাজিকভাবে সুবিধাভোগী ও বিবেকবুদ্ধির বিচারে উৎকৃষ্ট একটি শ্রেণী। এই শ্রেণী আর্থিক দিক থেকে ভূমিরাজস্ব ও পেশামূলক এবং কেরানি ধরনের চাকুরির উপর নির্ভরশীল থাকে, উচ্চবর্ণীয় মর্যাদাসম্বলিত প্রতিষেধ ও শিক্ষাগত প্রাধান্যের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে তাদের দূরত্ব বজায় রাখে। এরা নিজেদের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস নিয়ে গর্ববোধ করে এবং একটি বেশ জটিল প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মাধ্যমে নিজেদের সাম্প্রদায়িক সংহতি রক্ষা করে, যে কাঠামোর মাধ্যমে তারা প্রমাণ করেছে যে তারা সামাজিক ক্ষমতা এবং রাজনৈতিক সুবিধাবলী পরিবর্তন ও বৃদ্ধির জন্য লক্ষণীয়ভাবে প্রস্তুত।[২]

এই মন্তব্য করার পক্ষে যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, এই ভদ্রলোক শ্রেণীটি এমনকি স্বাধীনতার পরে পশ্চিম বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদী ও নকশালপন্থীদের মতো মৌলবাদী দলগুলির নেতৃত্ব প্রদানপূর্বক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানাদি নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি নিয়ন্ত্রণ করার দৃশ্যটি সম্ভবত অলীক হতে পারে, তবে এই ভদ্রলোক শ্রেণীটি গত অর্ধ শতাব্দী যাবৎ ক্ষমতার সামাজিক ভিত্তির সূক্ষ্ম পরিবর্তনকে প্রকাশ না করে বরং গোপন করে আসছে।

উদাহরণস্বরূপ, প্রথম বঙ্গবিভাগকালীন বিক্ষোভের সময় এবং ১৯২০-এর দশকে যখন কংগ্রেস নেতাদের অভ্যন্তরীণ কলহ ও আদর্শগত অবনতির ফলে যুব বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা সমাজবাদী দল গঠনের পথ রচিত হয়, তখন সাময়িকভাবে যে পুরুষানুক্রমিক বিবাদ বাঙালি জাতীয়তাবাদী রাজনীতিকে বিশৃঙ্খলার মধ্যে ঠেলে দেয় সেই পুরুষানুক্রমিক বিবাদের প্রতিফলের পরিমাণ নির্ণয় করার বাস্তবিকপক্ষে আর কোন সার্থকতা থাকে না। অনুরূপভাবে ভদ্রলোক সমাজের মধ্যে শ্রেণীগত উত্তেজনার বিষয়টি আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয় এবং এই শ্রেণীগত উত্তেজনাটি কোন কোন কঠিন পরিস্থিতিতে, যেমন ১৯২০ সালের আইন অমান্য বিতর্ককালীন সময়ে যখন রাজনৈতিক কৌশলের মাধ্যমে ব্যাপক পরিবর্তনের জন্য সরকারকে বাধ্য করার প্রয়াস নেয়া হয় তখন দেখতে পাওয়া যায়।

এই প্রাতিষ্ঠানিক বিশ্লেষণে ১৯১৮ সাল থেকে জেলা শহরগুলিতে জাতীয়তাবাদী সংগঠন পুনর্গঠন করার বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে এবং ১৯২০-এর দশকে মুসলিম

২. Elite Conflict in a Plural Society: Twentieth-Century Bengal, (Berkeley 1968), 12-13

সংগঠনের মধ্যেও অনুরূপ সমান্তরাল পুনর্গঠনের ভাব পরিলক্ষিত হয়। এতে যে ফল পাওয়া যায় তা হলো বাংলার গ্রামীণ এলাকায় নতুন ধনসম্পদের বৃদ্ধি। ধনসম্পদের এই নতুন বৃদ্ধির বিষয় ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমাদের অবশ্যই বাংলার যে ভূ-সংস্থান সব সময় যাতায়াতব্যবস্থাকে সমস্যাসঙ্কুল করে রেখেছে, সেই ভূ-সংস্থানকে এবং যে পরিবর্তনশীল নদীপ্রবাহ, বিশ্বাসঘাতী আবহাওয়া এবং মারাত্মক আঞ্চলিক রোগসমূহ একত্রে জনসংখ্যার ঘনত্ব এবং কৃষি-উৎপাদনের অবিরল হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটায়, তাকে বিবেচনায় আনতে হবে। এই হ্রাস-বৃদ্ধির অর্থ এই যে, বাংলা এবং এর পশ্চাৎভূমির যে এলাকাগুলি (অর্থাৎ সুন্দরবন, ব্রহ্মপুত্র নদীর চর, টেরাই এবং ছোট নাগপুর প্রান্তের শালবন) বর্তমান শতাব্দীর প্রথমদিকেও অব্যবহৃত ছিল এবং অর্থনৈতিক উদ্যোগ, যেমন পরিবহন, কৃষি ও স্বাস্থ্য প্রযুক্তির জন্য উপযোগী ছিল, সেই এলাকাগুলির উন্নতি বিধান করার জন্য প্রয়াস নেয়া হয়। এইসব নতুন ভূমি উদ্ধার করার ফলে কে উপকৃত হয়েছে সেসম্পর্কে এবং পূর্ব বাংলার পাট-ব্যবসা, উত্তর বাংলার চা-শিল্প এবং পশ্চিম বাংলার খনি থেকে কৃষিজমির জন্য পুনঃনিয়োজিত মূলধনের সঠিক পরিমাণ সম্পর্কে এখনো কোন গবেষণা হয় নি। যাই হোক, এ সময় জেলা শহরগুলিতে বসবাসকারী এবং শক্তিশালী পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে চতুর্দিকস্থ গ্রামাঞ্চলের কোন কোন এলাকা নিয়ন্ত্রণকারী জালের মতো বিস্তৃত এক শ্রেণীর ভূঁইফোড় লোকের অভ্যুদয় আমরা প্রত্যক্ষ করি।

এই শ্রেণীটিই জেলা ও স্থানীয় বোর্ডগুলির নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের এবং প্রাদেশিক আইন পরিষদ ও ভোটাধিকার সম্প্রসারণের সুযোগ গ্রহণের সবচেয়ে অনুকূল স্থানে অবস্থান করে এবং এই শ্রেণীটিই অতি দ্রুত বর্ণগত সমিতিগুলির সাংগঠনিক সমর্থন অর্জন করে এবং ইসলামিয়া আঞ্জুমানগুলিকে সুসংহত করে। এরাই ছিল জোতদার সমিতিগুলির সক্রিয় শক্তি এবং এদের বিনিয়োজিত অর্থে অন্যান্য অর্থনৈতিক উদ্যোগের মধ্যে জেলা সমবায় ব্যাংক পরিচালনার উদ্যোগও টিকে থাকে।

লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, বাংলায় এককালে শহরের বাইরে এবং বড় জমিদারদের রাজবাড়ি ছাড়িয়ে দূরে যেসব লোকের আনাগোনা ছিল, তারা হলো বাংলার অবিচ্ছিন্ন বিপুল কৃষক জনগোষ্ঠী। সাধারণ গরিব গ্রামীণ জনগণের মধ্যে অবশ্য বেশ কিছু সংখ্যক 'মোটা বিড়াল'-এর অস্তিত্ব দেখা যেতো। সবচেয়ে স্বল্প ছিল সেই ভূমিহীন উদ্বাস্তু উপজাতি এবং অন্যান্য ভূমিহীন শ্রমিকশ্রেণী, স্বাধীনতার আগে যাদের কোন প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিনিধিত্ব ছিল না। ১৯৪০-এর দশকে যখন মার্কসবাদীরা তেভাগা ও অনুরূপ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ভোগদখলবর্জিত রায়ত এবং ফসলের নগণ্য অংশীদারদের নেতৃত্ব দেয়, তখন পর্যন্ত তাদের নিষ্ক্রিয়ভাবে অপেক্ষা করতে হয়। ভোগদখলদার রায়তরাই ছিল কৃষক সমিতিগুলির প্রধান উদ্যোক্তা এবং কতিপয় মধ্যস্বত্বাধিকারী (জোতদার, তালুকদার ও পত্তনিদার) সহ তারাই ছিল কৃষি সমবায়ের প্রধান অবলম্বন। এইভাবে গ্রামীণ দরিদ্রদের প্রতিষ্ঠানসমূহ বলতে প্রথম দৃষ্টিতেই যা মনে হয়, যদি তা গভীরভাবে পরীক্ষা করা হয়,

তবে প্রমাণিত হবে যে, মধ্যপন্থী ধনীরাই আসলে শক্তির নতুন উৎস হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

ইউরোপীয় অভিজ্ঞতা থেকে আমরা ধারণা করতে পারি যে, বাংলার শিল্পপ্রোলেতারীয়দের রাজনৈতিক অভিযান গত তিন দশকে গ্রামীণ ভূমিহীন শ্রমিকদের রাজনৈতিক অভিযানের আগেই সংঘটিত হয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঠিক পরবর্তী বছরগুলি ছিল সম্ভাবনাময়। যুদ্ধপরবর্তী দাবিদাওয়া কৃত্রিমভাবে হলেও বাংলায় শিল্প ও খনি উন্নয়নের প্রয়াসকে উৎসাহিত করে। কিন্তু ১৯২০ সালের প্রথমদিকে ছিল ব্যবসার মারাত্মক পতনাবস্থা। এ অবস্থাকে আরো শোচনীয় করে তোলে ব্যাপক ইনফ্লুয়েঞ্জা-মহামারিসহ ১৯১৮ ও ১৯১৯ সালের পর্যায়ক্রমিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এতে খাদ্যসামগ্রী ও সূতাজাত দ্রব্যাদির তীব্র মূল্যবৃদ্ধি ঘটে। এই মূল্যস্ফীতির সঙ্গে বেতন বা মজুরি বৃদ্ধি পায় নি এবং শিল্পশ্রমিকদের কাজের অবস্থা এবং চাকুরির শর্ত ছিল খুবই শোচনীয়।

আমরা দেখেছি যে, খেলাফতী ও কংগ্রেসীরা এই পরিস্থিতিতে আন্দোলনকে পুনরায় জোরদার করার একটি সুবর্ণ সুযোগ লাভ করে এবং এই পর্যায়ে তাদের প্রাথমিক সাফল্য অসহযোগ আন্দোলনকে আরো শক্তিশালী করে তোলে। যাই হোক, পরবর্তী সময়ে রাজনীতিবিদরা আরো সঙ্কটময় অবস্থার সম্মুখীন হয়। এই রাজনীতিবিদরা ছিল বাঙালি এবং অধিকাংশ শিল্পশ্রমিক ছিল বিহার ও যুক্ত প্রদেশের। বাঙালি নেতৃত্বকে মেনে নিতে এসব শ্রমিকের বরাবর অনিচ্ছা এবং যে এলাকায় কাজ করে তারা জীবননির্বাহ করে সেই এলাকা নিয়ে আত্মপরিচয় দিতে এদের অস্বীকৃতি বিংশ শতাব্দীর পূর্ব ও পশ্চিম বাংলায় মারাত্মক অস্থিরতার উৎপত্তি ঘটায়। বিহারীদের দ্বারা পরিচালিত সাময়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা আমাদের যে কথাটি স্মরণ করিয়ে দিত তা হলো, এখানে সব রাজনীতিই প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে নি।*

এই লেখার বৃহদংশ নেয়া হয়েছে Rachel Van M. Baumer কর্তৃক সম্পাদিত *Aspects of Bangladeshi History and Society* (1975) গ্রন্থে প্রকাশিত লেখকের 'Social and Institutional Bases of Politics in Bengal' শীর্ষক রচনা থেকে। অনুমতি প্রদানের জন্য লেখক উক্ত গ্রন্থের প্রকাশকের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছেন।



# বঙ্গীয় মন্ত্রিসভা ১৯৩৭-১৯৪৭

হারুন-অর-রশিদ*

১৮৬১ সাল থেকে ধাপে ধাপে বঙ্গীয় আইনসভা গড়ে উঠলেও ১৯১৯ সালের দ্বৈতশাসনের (dyarchy) পূর্ব পর্যন্ত আইনপ্রণয়ন ও শাসনকাজ পরিচালনা সম্পূর্ণ বৃটিশ শাসকদের হাতেই ন্যস্ত ছিল। দ্বৈতশাসনের আওতায় কোন কোন ক্ষেত্রে ভারতীয়দের আইনপ্রণয়নক্ষমতা প্রদান এবং কতিপয় বিষয়ের (transferred subjects) দায়িত্ব স্থানীয় মন্ত্রীদের উপর অর্পণ করা হলেও তার পরিসর ছিল খুবই সীমিত। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অধীনে ভোটাধিকার ও আইনসভার সদস্যসংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি[১] এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করা হলে এদেশীয়দের কাছে প্রাদেশিক পর্যায়ে সরকার গঠনের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়।

দীর্ঘকাল পর ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যে বাংলার রাজনীতিতে মুসলমান সম্প্রদায়ের উত্থান ঘটে, রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণকর্তৃত্ব হিন্দু সম্প্রদায়ের হাত থেকে তাদের হাতে চলে যায় এবং বাংলায় পাকিস্তান আন্দোলন ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে, যার পরিণামে ১৯৪৭ সালে দেশ বিভক্ত হয়। আলোচ্য সময়কালে বাংলায় চারটি মন্ত্রিসভা ক্ষমতাসীন হয় : ফজলুল হকের প্রথম মন্ত্রিসভা (১৯৩৭-১৯৪১), ফজলুল হকের দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা (১৯৪১-১৯৪৩), নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভা (১৯৪৩-১৯৪৫) ও সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভা (১৯৪৬-১৯৪৭)। এই প্রবন্ধে ভিন্ন ভিন্নভাবে এসব মন্ত্রিসভার গঠন ও কার্যাবলী এবং

---

* অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. ১৯১৯ সালে যেখানে শতকরা মাত্র ৩ ভাগ লোক ভোটার ছিল, ১৯৩৫ সালে তা শতকরা ১৪ ভাগে উন্নীত হয়। আইনসভার সদস্যসংখ্যাও ১৩৯ জন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২৫০ জনে দাঁড়ায়।

এবং বঙ্গীয় রাজনীতিতে, বিশেষকরে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের উপর এর প্রভাব-প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

## ফজলুল হকের প্রথম মন্ত্রিসভা (১৯৩৭-১৯৪১)

১৯৩২ সালের 'সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ' (Communal Award) অনুযায়ী বিভিন্ন সম্প্রদায় ও স্বার্থ-গ্রুপের মধ্যে বণ্টনকৃত বঙ্গীয় আইনসভার আসনে 'পৃথক নির্বাচন' পদ্ধতিতে (separate electorate) অনুষ্ঠিত ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে কোন একক রাজনৈতিক দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে সক্ষম না হওয়ায় একটি কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন প্রায় অনিবার্য হয়ে পড়ে। ২৫০ আসনবিশিষ্ট বঙ্গীয় আইনসভায় এককভাবে মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য সর্বাধিক আসন (১২১টি) সংরক্ষিত থাকায় এ সরকারের নেতৃত্ব যে তাদের হাতে আসবে তাও সুনিশ্চিত ছিল। এদিকে মুসলিম আসনে ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন কৃষক প্রজা পার্টি, জিন্নাহর মুসলিম লীগ এবং স্বতন্ত্র সদস্যরা প্রায় কাছাকাছি সংখ্যক আসন লাভ করলেও[২] পটুয়াখালী নির্বাচনী এলাকা থেকে (অপর একটি আসন বাদে) সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ফজলুল হক মুসলিম লীগ নেতা ও ঢাকা নবাব পরিবারের অন্যতম সদস্য খাজা নাজিমুদ্দিনকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে নির্বাচিত হলে ফজলুল হকের ব্যক্তিগত গ্রহণযোগ্যতা ও প্রজা আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধি ইত্যাদি বিবেচনায় এটাও মোটামুটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ফজলুল হককেই সরকার গঠনে আমন্ত্রণ জানানো হবে।

বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থে বঙ্গীয় আইনসভায় মুসলমান সদস্যরা যেন ঐক্যবদ্ধ থাকে, সেজন্য মুসলমান জনমতের প্রচণ্ড চাপ থাকা সত্ত্বেও ফজলুল হক প্রথমে কংগ্রেসের সঙ্গে মন্ত্রিসভা গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃত্বের অদূরদর্শিতা ও সিদ্ধান্তহীনতার কারণে তা সফল হতে পারে নি।[৩] ফজলুল হকের এ উদ্যোগে শঙ্কিত মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ কালবিলম্ব না করে তাঁর নেতৃত্বাধীনে একটি মন্ত্রিসভা গঠনে তাঁদের সম্মতি ও সক্রিয় সহযোগিতা দানের কথা ব্যক্ত করলে ফজলুল হক ও তাঁর দল এ প্রস্তাব গ্রহণ করেন। নিঃসন্দেহে এটি জিন্নাহর একটি কৌশলগত চাল ছিল, যা বাংলার রাজনীতিতে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে।

---

২. কৃষক প্রজা পার্টি ৩৬, মুসলিম লীগ ৩৯, স্বতন্ত্র ৪৩।

৩. ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে কংগ্রেসের প্রত্যাশা পূরণ না হলে কংগ্রেস নির্বাচনের পর প্রথমে দায়িত্ব গ্রহণে অনিচ্ছুক হয়। যাহোক, ১৯৩৭ সালের জুলাই মাসে তারা প্রথমত যেসব প্রদেশে পার্টির নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে সেসব প্রদেশে, অতঃপর যেখানে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে সেখানে সরকার গঠনের এবং সর্বশেষে, যেখানেই সরকার গঠনের কোন সুযোগ আছে সেখানে তার সদ্ব্যবহার করার অনুকূল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। Humayun Kabir, *Muslim Politics 1906-1947 and Other Essays*, (Calcutta 1969), 26.কংগ্রেসের সঙ্গে ফজলুল হকের মন্ত্রিসভা গঠনের উদ্যোগ সংক্রান্ত ব্যাপারে দেখুন, Formation of New Government Under Fazlul Huq (1941-43), Part 1, L/P & J/8/651, 166-167, in India Office Library and Records (hereafter IOR), আবুল মনসুর আহমদ, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, (ঢাকা ১৯৭৫), ১৩৬-১৪১।

'প্রজা-লীগ' ঐকমত্য সত্ত্বেও মন্ত্রিসভা গঠনের বিষয়টি সহজ কাজ ছিল না। আইনসভার নির্বাচনের পরপর কতিপয় প্রভাবশালী ব্যক্তি (যাঁদের অধিকাংশই জমিদার শ্রেণীভুক্ত) আঞ্চলিকতা বা অন্য সঙ্কীর্ণ স্বার্থের কথা তুলে নিজেদের পক্ষে অন্যান্য সদস্যের সমর্থন লাভের চেষ্টা করতে থাকেন। মন্ত্রিসভায় আসন লাভ করা ছিল এঁদের মূল লক্ষ্য। এক্ষেত্রে মাসুদ আলী খান পন্নী[৪] (টাঙ্গাইল), নবাব কে. জি. এম. ফারুকী[৫] (কুমিল্লা) এবং নবাব মোশাররফ হোসেন[৬] (জলপাইগুড়ি) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ তিন জনের মধ্যে নবাব মোশাররফ হোসেন আরো এক ধাপ এগিয়ে 'প্রশাসনে উত্তর বাংলার ন্যায্য অধিকার' সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ২৫ জন সদস্য সমন্বয়ে 'এ্যাসেমব্লি নর্থ বেঙ্গল গ্রুপ' গঠন করে প্রচণ্ড চাপ প্রয়োগ করতে থাকেন।[৭] একটি আধা-সামন্তবাদী সমাজে অনুন্নত দলীয় ব্যবস্থার কারণে এ ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব কোন অস্বাভাবিক ঘটনা নয়।

যাহোক, প্রায় তিন সপ্তাহ সময় নিয়ে ফজলুল হকের পক্ষে ১১ সদস্যবিশিষ্ট একটি মন্ত্রিসভা গঠন করা সম্ভব হয়। মন্ত্রিসভার সদস্যগণ হলেন ফজলুল হক (মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়), স্যার খাজা নাজিমুদ্দিন (স্বরাষ্ট্র), নবাব খাজা হাবিবুল্লাহ (কৃষি ও শিল্প), হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী (বাণিজ্য ও শ্রম), সৈয়দ নওশের আলী (জনস্বাস্থ্য ও স্থানীয় সরকার), নবাব মোশাররফ হোসেন (বিচার ও আইন), নলিনী রঞ্জন সরকার (অর্থ), স্যার বি. পি. সিংহ রায় (রাজস্ব), প্রসন্নদেব রাইকত (শুল্ক ও বন), মুকুন্দ বিহারী মল্লিক (সমবায়, ঋণ ও পল্লীদারিদ্র্য) এবং মহারাজা শ্রীশ চন্দ্র নন্দী (যোগাযোগ ও পূর্ত)।

১১ সদস্যবিশিষ্ট এ মন্ত্রিসভায় ৬ জন ছিলেন মুসলমান এবং ৫ জন ছিলেন হিন্দু (৩ জন বর্ণহিন্দু ও ২ জন তফসিলী হিন্দু)। কংগ্রেস মন্ত্রিসভায় যোগদান না করায় হিন্দু সদস্যদের অন্তর্ভুক্তি হিন্দু সম্প্রদায়, বিশেষকরে ব্যাপক হিন্দু মধ্যবিত্তের জন্য প্রতিনিধিত্বশীল ছিল না। অন্যদিকে ১১ জন সদস্যের মধ্যে ৬ জন জমিদার[৮], ১ জন

৪. করটিয়ার প্রখ্যাত জমিদার, যিনি ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে একজন স্বতন্ত্র সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। নির্বাচনের পর তিনি ময়মনসিংহ জেলার সদস্যদের নিয়ে একটি গ্রুপ গঠনের চেষ্টা করেন। Star of India, 2 March 1937, 5.

৫. নবাব ফারুকী (১৮৯১-১৯৭১) কুমিল্লার একজন প্রভাবশালী জমিদার, যিনি ১৯২১ সাল থেকে বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য এবং ১৯২৯-১৯৩৬ সময়ে মন্ত্রী ছিলেন। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে একজন স্বতন্ত্র সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট মুসলিম দল' নামে তিনি আইনসভার মধ্যে একটি ভিন্ন গ্রুপ গঠনের উদ্যোগ নেন। *আজাদ*, ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৭, ৭।

৬. নবাব মোশাররফ হোসেন (১৮৭১-১৯৬৬) জলপাইগুড়ি জেলার একজন জমিদার ও চা- বাগানের মালিক ছিলেন। ১৯২৩ সাল থেকে তিনি বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য এবং ১৯২৭ সালে স্বল্প সময়ের জন্য শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন।

৭. *Star of India*, 27 February 1937, 9; *The Amrita Bazar Patrika*, 27 February 1937, 5

৮. নবাব খাজা হাবিবুল্লাহ, খাজা নাজিমুদ্দিন, নবাব মোশাররফ হোসেন, স্যার বি. পি. সিংহ রায়, শ্রীশ চন্দ্র নন্দী ও প্রসন্ন দেব রাইকত।

পুঁজিপতি[৯] এবং ৪ জন আইনজীবী-রাজনীতিবিদ ছিলেন।[১০] নির্বাচনী এলাকা বিচারে ৩ জন বিশেষ নির্বাচনী এলাকার প্রতিনিধি ছিলেন, যাঁদের মধ্যে ২ জন জমিদার এ্যাসোসিয়েশন[১১] এবং ১ জন চেম্বার অব কমার্সের[১২] প্রতিনিধিত্ব করেন এবং বাকি ৮ জনের মধ্যে ৪ জন শহর এলাকা থেকে নির্বাচিত ছিলেন।

ফজলুল হক তাঁর রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ মুসলিম লীগের সঙ্গে শুধু কোয়ালিশন মন্ত্রিসভাই গঠন করেন নি, বরং যাঁর বিরুদ্ধে কিছুদিন আগে তিনি ও তাঁর দল তীব্র নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন, তাঁর সাথে 'প্রজা-লীগ কোয়ালিশনের' একটি যুক্ত সংসদীয় কর্মসূচিও প্রণয়ন করেন, যাতে তাঁর দলের নির্বাচনী মেনিফেস্টো থেকে কতিপয় ক্ষেত্রে ছাড় দেয়া হয়।[১৩] 'বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ' কৃষক প্রজা পার্টির প্রধান নির্বাচনী ওয়াদা হওয়া সত্ত্বেও তাঁর মন্ত্রিসভায় জমিদারসদস্যরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করেন। এজন্য অনেক রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মনে করেন যে, আত্মসংরক্ষণের তাগিদ এবং গদির আকর্ষণ বিচিত্র ধরনের বিপরীতধর্মী চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়েছে, যা ফজলুল হককে সাধারণ মানুষের জন্য 'ডাল-ভাতের' নিশ্চয়তা বিধানের নির্বাচনী ইস্যু শিকায় তুলে রাখতে প্ররোচিত করে।[১৪] তৎকালীন পরিস্থিতির বাস্তবতায় এ ধরনের মন্তব্য হকের প্রতি খানিকটা অবিচার করার শামিল। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, আসলে কংগ্রেসের সিদ্ধান্তহীনতা ও অদূরদর্শিতা তাঁকে তাঁর এক সময়কার ঘোরতর রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের শিবিরে ঠেলে দেয়। নিঃসন্দেহে মন্ত্রিসভায় পল্লী অঞ্চলের জনগণের, বিশেষকরে কৃষক প্রজার প্রতিনিধিত্ব ছিল খুবই অপ্রতুল। তৎকালীন অবস্থায় মুসলিম লীগ ও অকংগ্রেসী হিন্দু সদস্যদের নিয়ে গঠিত কোয়ালিশনে প্রভাবপ্রতিপত্তিশালী জমিদার-সদস্যদের অন্তর্ভুক্তি স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। এই অবস্থায় যদি কোন মন্ত্রিসভাই গঠন করতে হতো, তাহলে ফজলুল হকের পক্ষে ঠিক এমন একটি মন্ত্রিসভা গঠনই সম্ভব ছিল।[১৫] কথা উঠতে পারে, তিনি আদৌ এ ধরনের মন্ত্রিসভা গঠনে সম্মত না হলেও পারতেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর ক্ষমতার প্রতি আকর্ষণ লক্ষণীয়। বিরোধী অবস্থানে থেকে

---

৯. নলিনীরঞ্জন সরকার।

১০. ফজলুল হক, সোহরাওয়ার্দী, সৈয়দ নওশের আলী ও মুকুন্দবিহারী মল্লিক।

১১. স্যার বি. পি. সিংহ রায় ও শ্রীশ চন্দ্র নন্দী যথাক্রমে বর্ধমান ও প্রেসিডেন্সি বিভাগের জমিদারদের প্রতিনিধিত্ব করেন।

১২. তিনি হলেন নলিনীরঞ্জন সরকার, যিনি বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্সের প্রতিনিধি ছিলেন।

১৩. Harun-or-Rashid, *The Foreshadowing of Bangladesh : Bengal Muslim League and Muslim Politics, 1936-1947*, (Dhaka 1987), 90.

১৪. Z.H. Zaidi (ed.), *Jinnah-Ispahani Correspondence*, 1936 1948, (Karachi 1976), 26

১৫. Partha Chatterjee "Bengal Politics and the Muslim Masses, 1920-1947", *The Journal of Commonwealth and Comparative Politics*, XX.1, (1982), 37.

আদর্শচর্চার লোক তিনি ছিলেন না। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ক্ষমতালাভ এবং ক্ষমতায় আরোহণ করে নিজস্ব কর্মসূচি বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণের অনুকূলে। একে কেউ বলবেন 'সুবিধাবাদ', কেউ বলবেন 'বাস্তববাদিতা'। তবে, অবশ্যই মনে রাখা প্রয়োজন যে, ফজলুল হক বিপ্লবী ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন সংস্কারবাদী নেতা মাত্র।

মন্ত্রিসভা গঠন নিয়ে ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টিতে প্রথমে অসন্তোষ এবং কিছুদিন পর প্রকাশ্য বিভক্তি দেখা দেয়। মন্ত্রিসভায় মুসলিম লীগ যেখানে ৩টি আসন লাভ করে (সোহরাওয়ার্দী এবং ঢাকার নবাব পরিবারের খাজা হাবিবুল্লাহ ও স্যার খাজা নাজিমুদ্দিন), সেখানে কৃষক প্রজা পার্টি থেকে মাত্র ২ জন সদস্য (ফজলুল হক ও নওশের আলী) অন্তর্ভুক্ত হন। মন্ত্রিসভা গঠনের পূর্বক্ষণে চূড়ান্ত তালিকা থেকে ফজলুল হক তাঁর পার্টির সেক্রেটারি শামসুদ্দিন আহমদকে বাদ দিয়ে তদস্থলে নবাব মোশাররফ হোসেনকে অন্তর্ভুক্ত করে শপথ নিলে পার্টির অপেক্ষাকৃত তরুণ, সংগ্রামী অংশ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। যদিও গভর্নর এবং বঙ্গীয় আইনসভার ২৫ সদস্যবিশিষ্ট 'ইউরোপীয় গ্রুপের' আপত্তির কারণেই শামসুদ্দিনের নাম তালিকা থেকে বাদ দেয়া হয়[১৬], তথাপি পার্টির তরুণ অংশ হকের সদিচ্ছা সম্পর্কে নিঃসংশয় ছিল না। তাদের ধারণা ছিল ভিন্ন রকম। তারা মনে করতো, জমিদারি স্বার্থের কাছে ফজলুল হক নতি স্বীকার করেছেন।[১৭] শামসুদ্দিনের নেতৃত্বাধীনে কৃষক প্রজা পার্টির এক অংশ মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধাচরণ করে কংগ্রেসের সহযোগীর ভূমিকা নেয় এবং প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়ে হকের সমালোচনা করে। ফজলুল হক এর ফলে ১৯৩৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর পার্টির এ্যাসেমব্লি শাখার ১৭ জন 'অননুগত সদস্যের' বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে এঁদের বহিষ্কার করেন।[১৮] এরপর উভয় পক্ষের মধ্যে বহিষ্কার-পাল্টা বহিষ্কার সংঘটিত হয়, যা কৃষক প্রজা পার্টির এ্যাসেমব্লি শাখা ও মূল সংগঠন দুটোকেই আনুষ্ঠানিকভাবে দ্বিধাবিভক্ত করে।

এ কথা মনে করা ঠিক নয় যে, শুধু মন্ত্রিত্বের প্রশ্নে কৃষক প্রজা পার্টি বিভক্ত হয়। উভয় অংশের মধ্যে মৌলিক নীতিগত পার্থক্যও ছিল। শামসুদ্দিনের নেতৃত্বাধীন অংশ যেখানে পার্টির মূল আদর্শ ও কর্মসূচি ঊর্ধ্বে তুলে ধরার পক্ষপাতী, সেখানে ফজলুল হকের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল নমনীয় ও আপোসমুখী। যাহোক, কংগ্রেসের কঠোর বিরোধিতা এবং নিজ দলের বিভক্তি হকের জন্য এক বিপর্যয়কর অবস্থা সৃষ্টি করলে এ অবস্থা কাটিয়ে উঠার লক্ষ্যে ১৯৩৭ সালের ১৫ অক্টোবর তিনি সরাসরি মুসলিম লীগে যোগদান করেন।

১৬. Anderson to Linlithgow, 7 April 1937, *Bengal Governors Reports to Viceroy*, R/3/2/2, 3 in IOR

১৭. আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, ১৪২-১৪৭; Humayun Kabir, "Among The Bengal Peasants", *The Hindustan Times* (Magazine Section), 20 May 1945, 4.

১৮. *Star of India*, 1 September 1937, 1,8.

'বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ' এবং সাধারণ মানুষের জন্য 'ডাল-ভাতের' প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এলেও ফজলুল হকের পক্ষে এর কোনটিই বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় নি। প্রথমটির ব্যাপারে ১৯৩৮ সালে একটি কমিশন গঠিত হয় মাত্র, যা 'ফ্লাউড কমিশন'[১৯] নামে পরিচিত। আসলে ফজলুল হককে বহু সীমাবদ্ধতার মধ্যে কাজ করতে হয়েছিল। তথাপি, কৃষক ও বাঙালি শিক্ষিত মুসলমানদের স্বার্থে হক মন্ত্রিসভা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ ক্ষেত্রে যেসব পদক্ষেপ গৃহীত হয় সেগুলির মধ্যে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব (সংশোধন) আইন (১৯৩৮), কৃষিখাতক আইন (১৯৩৮), মহাজনী আইন (১৯৪০) এবং বঙ্গীয় চাকুরি নিয়োগ বিধি বা সম্প্রদায়ভিত্তিক বণ্টন বিধি (১৯৩৯) অন্যতম।[২০] প্রজাস্বত্ব আইন পাশ করে জমিদারদের দেয় জমি হস্তান্তর সংক্রান্ত ফি, জমিদারদের জমিক্রয়ের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার (pre-emption), সার্টিফিকেটপ্রথার মাধ্যমে খাজনা আদায় এবং চাষীদের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের অবৈধ আদায় বা 'আবওয়াব' প্রভৃতি বাতিল করা হয়। কুড়ি বছর সময় অতিক্রান্ত হওয়ার আগে মাত্র চার বছরের খাজনা পরিশোধ করে চাষীরা সিকস্তি জমি পুনরুদ্ধারের সুযোগ লাভ করে। বকেয়া খাজনার উপর ধার্যকৃত সুদের হার ১২.৫% থেকে কমিয়ে ৬.২৫% স্থির করা হয়: এই আইনে জমিদারদের দ্বারা বিভিন্ন ধরনের ও পর্যায়ের স্বত্বাধিকারীদের উপর খাজনাবৃদ্ধি দশ বছরের জন্য স্থগিত রাখা হয়। কৃষিখাতক আইনের আওতায় সমগ্র প্রদেশে বহুসংখ্যক 'ঋণসালিশী বোর্ড' গঠন করা হয়। বঙ্গীয় মহাজনী আইন পাশ করে সরকার সকল মহাজনের জন্য ট্রেড লাইসেন্স থাকা আবশ্যকীয় করে। এ ছাড়া, সুদের হারও স্থির করে দেয়া হয়। সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এসব আইন কৃষকদের এক বৃহৎ অংশকে "ভয়াবহ ঋণের বোঝা এবং মধ্যস্বত্বভোগী জমিদার ও মহাজনদের বিভিন্ন প্রকার অবৈধ আদায়" থেকে রেহাই দেয়।[২১] দীর্ঘকাল যাবৎ বাংলার সরকারি চাকুরি ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের একচেটিয়া দখলে। হক মন্ত্রিসভা কর্তৃক চাকুরিতে নিয়োগদানের ক্ষেত্রে প্রণীত সম্প্রদায়ভিত্তিক বণ্টনবিধির অধীনে ৫০% পদ মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা হয় এবং এ নিয়োগনীতির যথার্থ প্রয়োগ তদারকির জন্য একজন বিশেষ কর্মকর্তা নিযুক্ত করা হয়। অধিকন্তু, মুসলমানদের প্রতি মন্ত্রিসভার সাধারণ পক্ষপাতিত্ব তো ছিলই।

মন্ত্রিসভার যাকিছু সাফল্য বা কৃতিত্ব ছিল, তা সংগঠনগতভাবে মুসলিম লীগ পুরোপুরি নিজ স্বার্থে ব্যবহার করে। অন্য সবকিছু বাদ দিলেও একজন মুসলমানের (ফজলুল হক) নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠন ছিল সর্বক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ বঙ্গীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য এক

১৯. এই কমিশন জমিদারদের ক্ষতিপূরণদানসহ জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের সুপারিশ করলেও দেশবিভাগের পূর্বে কোন মন্ত্রিসভার পক্ষেই তা কার্যকরী করা সম্ভব হয় নি। একমাত্র ১৯৫০ সালে 'পূর্ব বাংলা প্রজাস্বত্ব অধিগ্রহণ আইন' পাশ করে সেটি কার্যকরী করা হয়।

২০. Shila Sen, *Muslim Politics In Bengal, 1937-1947*, (New Delhi 1976), 101-115; Muhammad Abdur Rahim, *The Muslim Society and Politics in Bengal*, 1757-1947, (Dhaka 1978), 253-257

২১. Shila Sen, *Muslim Politics*,103

বিরাট রাজনৈতিক সাফল্য। হক মন্ত্রিসভার প্রতি নিজ সম্প্রদায়ের বিপুল সমর্থনের পেছনে এই অনুভূতিও ক্রিয়াশীল ছিল। মন্ত্রিসভার সমর্থনে মুসলিম লীগ সুদৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করে। অন্যদিকে, দ্বিধাবিভক্ত কৃষক প্রজা পার্টিতে শামসুদ্দিনের নেতৃত্বাধীন বিদ্রোহী অংশ কংগ্রেসের সাথে হাত মিলিয়ে মন্ত্রিসভার পতন ঘটানোর চেষ্টা করলে মুসলমানদের মধ্যে এদের বিরুদ্ধে এক তীব্র সাধারণ বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়, যা কৃষক প্রজা পার্টির এই অংশের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে খুবই প্রতিকূল ছিল। ফজলুল হক স্বয়ং তাঁর এক সময়কার রাজনৈতিক সহকারীদের তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন। পার্টিতে শামসুদ্দিনের নেতৃত্বাধীন অংশকে তিনি 'কৃষক প্রজা পার্টির মুখোশে কংগ্রেস সমিতি' নামে আখ্যায়িত করে ঘোষণা দেন যে, এর সাথে তাঁর 'আসল' কৃষক প্রজা পার্টির কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না।[২২] স্মরণ করা যেতে পারে যে, ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের সময় হক ও তাঁর দলের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলিম লীগারদের তরফ থেকে একই ধরনের অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছিল।

নির্বাচনের পর মুসলিম লীগের সাথে কোয়ালিশন গঠন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে লীগে যোগদান করার পর ফজলুল হক এই মর্মে একটি তত্ত্ব দেয়ার চেষ্টা করেন যে, বাঙালি মুসলমানদের নিজেদের স্বার্থেই মুসলিম লীগকে সমর্থন করতে হবে, কৃষক প্রজা পার্টিকেও সমর্থন করতে হবে। উল্লেখ্য, তিনি একই সাথে কৃষক প্রজা পার্টির নিজ অংশ এবং বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এ ধরনের রাজনৈতিক দ্বৈতবাদ বিশেষকরে একটি আধুনিক ও গণভিত্তিক রাজনৈতিক দল গঠনের পক্ষে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। হক নিজেও পরে স্বীকার করেন যে, এর ফলে তাঁর দলের সমর্থকদের মধ্যে প্রচুর বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়।[২৩] উপরন্তু ক্ষমতাসীন থেকেও তিনি নিজ সংগঠনকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর কোন প্রয়াসই গ্রহণ করেন নি। সাংগঠনিক প্রতিভার অধিকারী সোহরাওয়ার্দী মুসলিম লীগের বিস্তৃতির স্বার্থে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সামগ্রিক পরিস্থিতির সর্বোচ্চ সুযোগ গ্রহণ করেন। ফলে মফস্বল শহর ও গ্রামাঞ্চলের হক সমর্থক কৃষ প্রজা পার্টির নেতা-কর্মীরা ক্রমান্বয়ে লীগে যোগদান করতে থাকে। শামসুদ্দিন ও আবদুল্লাহেল বাকীর নেতৃত্বাধীন কৃষক প্রজা পার্টির অপর অংশ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে টিকে থাকার চেষ্টা করলেও কার্যত কংগ্রেসঘেঁষা একটি গ্রুপ হিসেবে আইনসভায় এর কর্মকাণ্ড সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

আইনসভার ভিতরে ও বাইরে কংগ্রেস ও তার সহযোগীদের তীব্র বিরোধিতার মোকাবেলা করতে গিয়ে[২৪] ফজলুল হক মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক অবস্থান অবলম্বন

২২. বঙ্গীয় সংসদে ফজলুল হকের বক্তৃতা, *Star of India*, 21 February 1939, 5

২৩. বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্মেলনে ফজলুল হকের উদ্বোধনী ভাষণ, ঐ, ১০ এপ্রিল ১৯৩৯, ৭।

২৪. উদাহরণস্বরূপ, ১৯৩৮ সালে হক মন্ত্রিসভার প্রত্যেক সদস্যের বিরুদ্ধে একটি করে মোট দশটি অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়েছিল এবং একে কেন্দ্র করে সারা প্রদেশে মুসলমানদের মধ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

করেন। ১৯৩৭-১৯৪০ সময়কালে তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ সফর করেন এবং লীগের জনসভা-কনফারেন্সে জোরালো বক্তব্য রাখেন। তিনি কংগ্রেসশাসিত ৭টি হিন্দুপ্রধান প্রদেশে মুসলমানদের উপর কথিত দুঃশাসনের বিরুদ্ধে বাংলায় তাঁর সরকার কর্তৃক 'প্রতিশোধ' গ্রহণের হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন। নিজ নামে 'Muslim Sufferings Under Congress Rule' শীর্ষক পুস্তিকা প্রকাশ ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তিনি ভারতীয় মুসলমানদের মনোবল জাগিয়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। আসলে কংগ্রেস ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে সাফল্য লাভ করায় ও ১১টি প্রদেশের মধ্যে ৭টিতে এককভাবে সরকার গঠন করায় মুসলমানদের মধ্যে হিন্দু আধিপত্যের ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। অন্যদিকে মুসলিম লীগ বাংলায় ফজলুল হকের সঙ্গে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন ব্যতীত ভারতের অন্য কোথাও সরকার গঠন করতে সমর্থ হয় নি। এ অবস্থায় ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে অধিকতর সংহতি গড়ে উঠে এবং মুসলিম লীগের গুরুত্ব ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। ১৯৪০ সালে 'লাহোর প্রস্তাব' (যা 'পাকিস্তান প্রস্তাব' নামেও অভিহিত) গৃহীত হলে মুসলিম লীগ একটি ইতিবাচক রাজনৈতিক কর্মসূচি লাভ করে। পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবিকে কেন্দ্র করে মুসলিম লীগের দ্রুত শক্তিবৃদ্ধি ঘটে এবং এর অগ্রগতি হয়ে উঠে অপ্রতিরোধ্য।

এমনি অবস্থায় জিন্নাহর হাত ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী হতে থাকলে তিনি বিভিন্ন প্রাদেশিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা শুরু করেন এবং এ নিয়ে শীঘ্রই ফজলুল হকের সাথে তাঁর মতবিরোধ দেখা দেয় এবং পরবর্তীকালে দু'জনের মধ্যে রাজনৈতিক বিচ্ছেদ ঘটে।

মুসলিম লীগ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে ফজলুল হকের কখনো সুসম্পর্ক ছিল না। সচরাচর নেতৃত্বের প্রশ্নে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হলেও এক্ষেত্রে অবস্থা ছিল ভিন্নতর। ফজলুল হক সর্বভারতীয় পর্যায়ে নেতা হতে চান নি বা তিনি এমন কোন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন না। তাঁর রাজনীতি মুখ্যত ছিল বাংলাকে কেন্দ্র করে। দীর্ঘ অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে তাঁর মধ্যে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল যে, ভারতের মুসলিম রাজনীতিতে বাঙালি মুসলমানরা একটি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে আসলেও লীগের অবাঙালি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে তাদের স্বার্থ ও ন্যায্য দাবিদাওয়া কখনো সুবিবেচনা লাভ করে নি। অবাঙালি নেতৃবৃন্দের সাথে তাঁর সম্পর্কের স্থায়িত্বের ব্যাপারে তিনি সবসময় সন্দিহান ছিলেন। ১৯৩৭ সালে নির্বাচনের পরবর্তীকালে তাঁর নেতৃত্বে একটি কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সহযোগিতা প্রদান ও জিন্নাহর সম্মতি এবং কিছুদিন পরে হকের লীগে যোগদান উভয়ই ছিল পারস্পরিক সুবিধা লাভের একটি আঁতাত। বাংলায় মুসলিম লীগের বিস্তৃতি এবং সর্বভারতীয় পর্যায়ে এর মর্যাদা ও ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠায় জিন্নাহর জন্য যেমন ফজলুল হকের সহযোগিতা প্রয়োজন ছিল, তেমনি কংগ্রেসের বিরোধিতা মোকাবেলা করে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য হকেরও প্রয়োজন ছিল জিন্নাহ ও মুসলিম লীগের সক্রিয় সমর্থন-সহযোগিতার। তাই বলে লীগে যোগদানের পর হক তাঁর কৃষক প্রজা পার্টিকে বিলুপ্ত

করেন নি, বরং নামসর্বস্ব হলেও এর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব তিনি টিকিয়ে রেখেছিলেন। সর্বভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সরকারের উপর জিন্নাহর দলীয় নিয়ন্ত্রণ আরোপের প্রচেষ্টা ফজলুল হকের কাছে আদৌ গ্রহণযোগ্য ছিল না, বরং একে তিনি তাঁদের 'অভ্যন্তরীণ' ব্যাপারে হস্তক্ষেপ বলে মনে করতেন।

১৯৩৯ সালের ৩ সেপ্টেম্বর বৃটেন জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে যুদ্ধের জন্য বেসামরিক সাহায্য-সহযোগিতা আদায় ও রাজনৈতিক সমর্থন লাভ সরকারের জন্য প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। জিন্নাহ ও মুসলিম সংখ্যালঘিষ্ঠ প্রদেশে মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতারা ভারতীয় মুসলমানদের পক্ষে লীগের কতিপয় দাবির প্রতি বৃটিশ সরকারের সুবিবেচনা সাপেক্ষে সরকারি যুদ্ধপ্রচেষ্টায় সমর্থন ও সহযোগিতা দানের পক্ষপাতী ছিলেন। অন্যদিকে, মুসলিম সংখ্যাগুরু প্রদেশ থেকে ফজলুল হক ও পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী সেকান্দার হায়াত খান ছিলেন শর্তহীন সমর্থন দানের পক্ষে। তাঁরা মনে করতেন, নিঃশর্তভাবে যুদ্ধে সহযোগিতা দান অধিক পরিমাণে মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণ করতে পারে। ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর মাসে হক বঙ্গীয় আইনসভায় এই মর্মে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করতে চাইলে তা আবদুর রহমান সিদ্দিকী ও হাসান ইস্পাহানীর নেতৃত্বে লীগ সংসদীয় দলের একটি অংশের ঘোর বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। 'লীগ হাইকমান্ডের যেকোন সিদ্ধান্ত তিনি মেনে চলবেন' ফজলুল হক কর্তৃক এমন ঘোষণা দেয়ার পর প্রস্তাবটি আইনসভায় পাশ করিয়ে নেয়া সম্ভব হয়। যাহোক, ১৯৪০ সালের জুন মাসে জিন্নাহ মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির মাধ্যমে সরকারি যুদ্ধপ্রচেষ্টায় লীগসদস্যদের কোন রকম সহযোগিতা দানের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন, যা বিশেষকরে বাঙালি মুসলমানদের স্বার্থবিরোধী বলে ফজলুল হকের দৃঢ় ধারণা ছিল।[২৫] তিনি মনে করতেন, জিন্নাহ কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা আরোপের ফলেই 'সিভিল গার্ডস' সহ যুদ্ধকালীন অন্যান্য সংস্থার চাকুরি হিন্দু সম্প্রদায়ের একচেটিয়া অধিকারভুক্ত হয়ে যায়। এমনকি জিন্নাহর অনুগত নাজিমুদ্দিনও এই বিধিনিষেধ আরোপ করাটা যথার্থ হয়েছে বলে মনে করতে পারেন নি। ফজলুল হক এ নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে চলতে থাকেন। কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত কিছু করে ফেলারও তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু তাঁর মন্ত্রিসভার মুসলমান সদস্যগণ এর বিরোধী ছিলেন। বিশেষকরে নাজিমুদ্দিন ও সোহরাওয়ার্দীর দলীয় শৃঙ্খলা রক্ষার প্রবণতা তাঁকে খুবই ক্ষুব্ধ করে।

১৯৪১ সালের আদমশুমারি চলাকালে বাংলার হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে এক ধরনের অঘোষিত প্রতিযোগিতা দেখা দেয়। দুটো সম্প্রদায়ের মধ্যে উত্তেজনা এমন চরমে পৌঁছে যে, খুলনা ও ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়। হিন্দু মহাসভা ও বর্ণহিন্দুরা

২৫. Raghib Ahsan to Jinnah, 14 July 1940, *Quaid-i-Azam Papers*, F 204, 81-82, in National Archives of Pakistan, (hereafter NAP), Islamabad

নিজ সম্প্রদায়ের সপক্ষে প্রকৃত হারের চেয়ে বর্ধিত হারে জনসংখ্যা দেখানোর জন্য নানা ধরনের কৌশল অবলম্বন করছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করে এর বিরুদ্ধে সর্বভারতীয় পর্যায়ে সোচ্চার হওয়ার জন্য জিন্নাহকে অনুরোধ করেও ফজলুল হক তাঁর কাছ থেকে আশানুরূপ কোন সাড়া পান নি। পক্ষান্তরে, খুলনা ও ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং সারা প্রদেশব্যাপী সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সত্ত্বেও জিন্নাহ একই সময়ে কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগের কর্মসূচি অনুযায়ী 'পাকিস্তান দিবস' উদযাপনের নির্দেশ দেন।[২৬] উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি হিসেবে ফজলুল হক বাংলায় 'পাকিস্তান দিবস' উদযাপন স্থগিত রাখার জন্য ইতিপূর্বে লীগ কমিটির বিভিন্ন শাখার প্রতি নির্দেশ প্রেরণ করেছিলেন। এ সিদ্ধান্তের প্রতি প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সেক্রেটারি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীরও সম্মতি ছিল।

প্রদেশের উপর কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগের অধিকতর নিয়ন্ত্রণ এবং বাংলার ব্যাপারে স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণে লীগ হাইকমান্ডের হস্তক্ষেপজনিত অবস্থা থেকে মুক্ত হওয়ার লক্ষ্যে ফজলুল হক কিছুদিন আগে থেকেই হিন্দু সম্প্রদায়ের সাথে একটি সমঝোতায় পৌঁছার কথা ভাবছিলেন। সেই লক্ষ্যে তিনি ১৯৪০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতায় হিন্দু ও মুসলমান নেতৃবৃন্দের একটি সম্মেলন আহ্বান করেন। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে কংগ্রেস ও অন্যান্য দলকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি কোয়ালিশন সরকার গঠনে জিন্নাহর সম্মতি পাওয়া যেতে পারে বলে মনে করে তিনি এরকম একটি সরকার গঠনের প্রস্তাব করেন, কিন্তু এতে জিন্নাহর সম্মতি পাওয়া যায় নি।[২৭]

ডিফেন্স কাউন্সিল ঘটনাকে কেন্দ্র করে হক-জিন্নাহ সম্পর্ক তিক্ততর হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ১৯৪১ সালের ২১ জুলাই ভাইসরয় 'ন্যাশনাল ডিফেন্স কাউন্সিল' (জাতীয় প্রতিরক্ষা কাউন্সিল) নামে একটি উচ্চ পর্যায়ের পরিষদ গঠনের ঘোষণা দেন। এর উদ্দেশ্য ছিল সরকারি যুদ্ধপ্রচেষ্টার সাথে জনসাধারণকে সংশ্লিষ্ট করা এবং তাদের সমর্থন আদায় করা। এতে জিন্নাহর পূর্বানুমতি ছাড়াই অন্যান্যের মধ্যে মুসলিম লীগ দলীয় তিন প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী সেকান্দার হায়াত খান (পাঞ্জাব), ফজলুল হক (বাংলা) ও সাদুল্লাহ (আসাম)-এর নাম অন্তর্ভুক্ত হলে জিন্নাহ তাঁদেরকে কালবিলম্ব না করে এই কাউন্সিল থেকে পদত্যাগ করার নির্দেশ দেন। অন্যথায় শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে তাঁদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক পদক্ষেপ গ্রহণের কথাও তিনি উল্লেখ করেন। যদিও সেকান্দার হায়াত খান ও সাদুল্লাহ জিন্নাহর নির্দেশ অনুযায়ী পদত্যাগ করেন, কিন্তু ফজলুল হক তাঁর অবস্থানে অটল

---

২৬. Jinnah to Raghib Ahsan, 23 March 1941, *Quaid-i-Azam Papers*, F 204, 129, *আজাদ*, ২৫ মার্চ ১৯৪১, ৫।

২৭. Herbert to Linlithgow, 23 November 1940, *Governor's Fortnightly Reports* (hereafter GFR), L/P & J/5/147.

থাকার জন্য প্রথমে নিজ মন্ত্রিসভার সহকর্মী, ভাইসরয় ও গভর্নরের সহযোগিতা-সমর্থন লাভের জন্য সচেষ্ট হন।[২৮] কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে তিনিও পদত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। একই সাথে তিনি কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি ও কাউন্সিল থেকেও পদত্যাগের কথা ঘোষণা করেন। ৮ সেপ্টেম্বর লীগ সেক্রেটারি লিয়াকত আলী খানকে লেখা এক পত্রে ফজলুল হক লীগ সভাপতি জিন্নাহ কর্তৃক ক্ষমতার যথেচ্ছ ব্যবহার এবং মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশের নেতৃবৃন্দ কর্তৃক বাংলা ও পাঞ্জাবের মতো মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহের প্রকৃত অবস্থা ও স্বার্থকে উপেক্ষার বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। জিন্নাহকে একজন 'রাজনৈতিক একনায়ক' হিসেবে আখ্যায়িত করে তিনি বলেন, "আমাদের প্রদেশের বাইরের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাছে বাংলা খুব একটা গুরুত্ব পায় না, অথচ ভারতের সমগ্র মুসলমান জনগোষ্ঠীর এক-তৃতীয়াংশ হচ্ছি আমরা...।"[২৯] বাংলার অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে লীগ হাইকমান্ডের অতিমাত্রায় হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে তিনি ঘোষণা করেন, "আমি বাংলার ৩৩ মিলিয়ন মুসলমানের উপর বাইরের কোন কর্তৃত্ব কিছুতেই প্রতিষ্ঠিত হতে দেব না।"[৩০]

হকের পত্র কলকাতায় মুসলমানদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। শুধু কলকাতার অবাঙালি মুসলমানরাই নয়, বাঙালি মুসলমানদের মধ্যেও প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে সমগ্র নগরীতে হকবিরোধী প্রচণ্ড বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হতে থাকে। সোহরাওয়ার্দীর উদ্যোগেই বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটি জিন্নাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা এবং হকের প্রতি কার্যত অনাস্থা জ্ঞাপন করে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। অন্যদিকে সোহরাওয়ার্দীর ভূমিকা তাঁর বিরুদ্ধে হক সমর্থকদের বঙ্গীয় আইনসভায় একাধারে ৬টি অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপনে প্ররোচিত করে। জিন্নাহর জন্য এ ছিল এক বিশেষ মুহূর্ত, কেননা এ পর্যায়ে বাংলার দুইজন অত্যন্ত প্রভাবশালী নেতা হক ও সোহরাওয়ার্দী প্রকাশ্যে পরস্পরবিরোধী দ্বন্দ্বে লিপ্ত হন এবং দেশবিভাগের আগে তাঁরা আর ঐক্যবদ্ধ হতে পারেন নি।

এদিকে ফজলুল হক জিন্নাহর বিরুদ্ধে লড়াই অব্যাহত রাখতে দৃঢ়সঙ্কল্প ছিলেন। কিন্তু এ ব্যাপারে তিনি নেতৃস্থানীয় কারো সমর্থন-সহযোগিতা লাভে ব্যর্থ হন। সেকান্দার হায়াত খান শুরুতেই মাঠ থেকে সরে দাঁড়ান। ভাইসরয় এবং বাংলার গভর্নর দু'জনেই জিন্নাহর দৌরাত্ম্য খর্ব হোক এটা চেয়েছেন, তবে মুসলিম লীগের কোন রকম বিভক্তি তাঁদের কাম্য

২৮. Herbert to Linlithgow, 8 September 1941, GFR, L/P&J/5/148; Linlithgow to Herbert, 13 October 1941, *Formation of New Government Under Fazlul Huq, 1941-43*, L/P & J/8/651, Pt. 2, 314-15.

২৯. Fazlul Huq to Liaquat Ali Khan, 8 September 1941 সম্পূর্ণ পত্রটি দ্রষ্টব্য, Zaidi (ed), *Jinnah-Ispahani Correspondence*, Appendix 11, 641-51.

৩০. ঐ।

ছিল না। তাই ফজলুল হককে উৎসাহ দানে তাঁরা বিরত থাকেন পাছে তিনি লীগকে ভেঙে বঙ্গীয় কংগ্রেসের সবচেয়ে অবাঞ্ছিত অংশ বসু-গ্রুপকে সরকারে নিয়ে আসেন।[৩১] অধিকন্তু, সরকারি ইন্ধনে লীগের বিভক্তি ঘটলে তা চূড়ান্ত বিশ্লেষণে জিন্নাহর হাতকেই শক্তিশালী করতে পারে এ আশঙ্কাও ছিল। ঐ সময় বঙ্গীয় মন্ত্রিসভার বিভক্তি ঘটলে বৃটিশদের অনুগত স্যার খাজা নাজিমুদ্দিনের পক্ষে এমনকি ইউরোপীয় গ্রুপের সমর্থন নিয়েও সরকার গঠনের সম্ভাবনা সম্পর্কে গভর্নর স্যার জন হার্বার্ট খুবই সন্দিহান ছিলেন। অতএব, তিনি একজন মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তাঁর আপোসফর্মুলা অনুযায়ী[৩২] বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটি এক বৈঠকে ফজলুল হকের উপর আস্থা ব্যক্ত করে এক প্রস্তাব গ্রহণ করে। অন্যদিকে ফজলুল হক লিয়াকত আলী খানকে লেখা আরেক পত্রে এই মর্মে মত ব্যক্ত করেন যে, তাঁর আগের চিঠির বক্তব্য দিয়ে তিনি কাউকে কটাক্ষ বা আহত করতে চান নি।[৩৩]

বস্তুত উভয় পক্ষের আনুষ্ঠানিক বিভক্তি অনিবার্য হয়ে পড়ে। গভর্নর হার্বার্টের আপোসফর্মুলায় তাঁদের সম্মতিজ্ঞাপন ছিল কৌশলগত চাল মাত্র। ফজলুল হক ইতিমধ্যে একটি বিকল্প কোয়ালিশন সরকার গঠনের লক্ষ্যে বঙ্গীয় আইনসভার বিভিন্ন গ্রুপের সাথে গোপন আলাপ-আলোচনায় অবতীর্ণ হন। ১ ডিসেম্বর ১৯৪১ হক মন্ত্রিসভার মুসলিম লীগ দলীয় সদস্যগণ 'তাঁকে নিজ অবস্থান সুদৃঢ়করণে আর কোন সুযোগ না দেয়ার' জন্য একযোগে পদত্যাগ করেন। তাছাড়া এরপর 'তাঁদেরকেই সরকার গঠনে আমন্ত্রণ জানানো হবে' এমন ধারণাও তাঁরা লাভ করেছিলেন।[৩৪] দুদিন পর ফজলুল হক বিভিন্ন গ্রুপ, যেমন—ফরওয়ার্ড ব্লক, কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা, ইন্ডিপেন্ডেন্ট, তফসিলী হিন্দু, কৃষক প্রজা পার্টি (শামসুদ্দিন) ও নিজ অনুসারীদের সমন্বয়ে গঠিত 'প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টি'র নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।[৩৫] এরপর জিন্নাহ 'মারাত্মক অসদাচরণ ও প্রতারণার' দায়ে মুসলিম লীগের প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে ফজলুল হককে বহিষ্কার করেন।

৩১. Herbert to Linlithgow,8 October 1940, *GFR*, L/P&J/5/ 147, Herbert to Linlithgow, 13 July 1940, *ibid*; Herbert to Linlithgow,10 July 1940, ঐ, Linlithgow to Herbert 12 October 1941, *Formation of New Government*

৩২. বিস্তারিত দ্র., Herbert to Linlithgow of 21 October 1941, *GFR*, L/P&J/5 148

৩৩. সম্পূর্ণ পত্র দ্র., Government of India, File 17/4/ 41, Poll (1). *Indian Annual Register 1941*, 11, 220

৩৪. Khwaja Nazimuddin to Jinnah, 14 December 1941, *Quaid-i-Azam Papers*, F. 392, 76-78.

৩৫. ১৯৪১ সালের ২৮ নভেম্বর জে. সি. গুপ্তের কলকাতাস্থ বাসভবনে বিভিন্ন গ্রুপের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত বৈঠকে এই পার্টি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ফজলুল হক এর নেতা এবং শরৎচন্দ্র বসু এর উপনেতা নির্বাচিত হন। আবুল মনসুর আহমদ, *রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, ২২৫; Herbert to Linlithgow, 5 December 1941, *GFR*, L/P&J/ 5/148.

**ফজলুল হকের দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা (১৯৪১-১৯৪৩)**

ফজলুল হকের দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা দুই পর্যায়ে গঠিত হয়—প্রথম পর্যায়ে তা আংশিকভাবে গঠিত হয় ১১ ডিসেম্বর, দ্বিতীয় পর্যায়ে আংশিকভাবে গঠিত হয় ১৮ ডিসেম্বর। ১ ডিসেম্বর ফজলুল হকের প্রথম মন্ত্রিসভার পতন ঘটলেও খাজা নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বাধীনে একটি মন্ত্রিসভা গঠনের সম্ভাব্যতা যাচাই এবং নব ঘোষিত প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টির ডেপুটি লিডার ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শরৎচন্দ্র বসুর গ্রেফতার এই দুই কারণে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন বিলম্বিত হয়।[৩৬] বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস ফজলুল হকের মন্ত্রিসভার প্রতি নিরপেক্ষ থাকে, কিন্তু নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বাধীনে কোন মন্ত্রিসভা গঠিত হলে এর সর্বাত্মক বিরোধিতার নীতি গ্রহণ করে। অন্যদিকে মুসলিম লীগ সংসদীয় দলের নেতৃত্বের প্রশ্নে কোন্দলের ফলে ঢাকার নবাব খাজা হাবিবুল্লাহ তাঁর অনুগামী ৮ জন আইনসভা-সদস্য সহ হকের দলে যোগ দেন। এর পর নাজিমুদ্দিনের জন্য আর কোন সম্ভাবনাই অবশিষ্ট থাকলো না। এমতাবস্থায় গভর্নর হার্বার্ট মুসলিম লীগ সহ সকল রাজনৈতিক দল নিয়ে একটি যুদ্ধকালীন 'কোয়ালিশন সরকার' গঠনের প্রয়াস পান, কিন্তু জিন্নাহর অসম্মতির কারণে[৩৭] তাঁকে তা পরিত্যাগ করতে হয়। ফজলুল হকের প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সুস্পষ্ট সমর্থন থাকায় যদিও শেষ পর্যন্ত তাঁকে সরকার গঠনের আমন্ত্রণ জানানো হয়, তবু মন্ত্রিসভার শপথগ্রহণের দিনই ভারত প্রতিরক্ষা আইনে শরৎ বসুকে গ্রেফতার করা হয়। শুরুতেই এ ছিল হকের জন্য একটি প্রচণ্ড ধাক্কা। উল্লেখ্য যে, নতুন মন্ত্রিসভায় শরৎ বসুর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব লাভের কথা ছিল।

হকের নতুন মন্ত্রিসভা পাঁচমিশালী দল নিয়ে গঠিত হয়। অবশ্য বঙ্গীয় কংগ্রেস এতে যোগদান করা থেকে বিরত থাকে। ফজলুল হক ছাড়া মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্য হলেন নবাব খাজা হাবিবুল্লাহ (মুসলিম লীগ পক্ষ ত্যাগকারী), খান বাহাদুর আবদুল করিম (স্বতন্ত্র), খান বাহাদুর হাশেম আলী খান (হকের কৃষক প্রজা পার্টি), শামসুদ্দিন আহমদ (কৃষক প্রজা পার্টির এক অংশের নেতা), শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী (হিন্দু মহাসভা), সন্তোষকুমার বসু (ফরওয়ার্ড ব্লক, কংগ্রেস), প্রমথনাথ ব্যানার্জী (ফরওয়ার্ড ব্লক, কংগ্রেস) এবং উপেন্দ্রনাথ বর্মণ (তফসিলী হিন্দু)। মন্ত্রিসভার এ গঠন দেখে গভর্নর জেনারেল লিনলিথগোর মন্তব্য ছিল : "এটি খুবই লক্ষণীয় বিষয় হবে যদি এ মন্ত্রিসভা নয় বা বারো মাস একত্রে থাকতে পারে।"[৩৮]

৩৬. Herbert to Linlithgow,20 December 1941, *GFR*, L/P&J/5/148; Governor of Bengal to Viceroy, *Telegram*, 9 December 1941, in Formation of New Government, 298.

৩৭. Governor of Bengal to Viceroy, *Telegram*, 9 December 1941, ঐ।

৩৮. Linlithgow to Amery, 22 December 1941, *Formation of New Government*, 280.

এ ধরনের একটি মন্ত্রিসভা গঠনের মাধ্যমে ফজ্‌লুল হক বঙ্গীয় রাজনীতিতে এক নতুন ধারার সূচনা করেছিলেন, আর তা হচ্ছে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করে বিদ্যমান রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান। স্পষ্টত এর দ্বারা তিনি উভয় সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে তাঁর এতদিনকার অবস্থান থেকে সরে আসেন। নিঃসন্দেহে এ উদ্যোগ ছিল অতি বিলম্বিত। ইতিমধ্যে 'কায়েদে আজম'-এর উত্থান ঘটেছে; নিখিল ভারত মুসলিম লীগ নিজ অবস্থান সুদৃঢ় করেছে; 'পাকিস্তান পরিকল্পনা' মুসলিম লীগের মূল আদর্শে পরিণত হয়েছে; বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করেছে; হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের গুরুতর অবনতি ঘটেছে; মুসলমান জনসাধারণের মনে সর্বভারতীয় মুসলমান সংহতির ধারণা ভিত্তিমূল লাভ করেছে এবং বাংলার মুসলমান মধ্যবিত্ত পূর্ববর্তী মন্ত্রিসভার বিভিন্ন কার্যকলাপ দ্বারা উপকৃত হয়ে মুসলিম লীগের সাথে নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নকে সম্পর্কিত করে ফেলেছে।

লীগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ফজলুল হককে তাঁর ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তার উপর নির্ভর করতে হয়। এ সময়ে তাঁর কৃষক প্রজা পার্টি কার্যত অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে। শামসুদ্দিন আহমদের নেতৃত্বাধীন অপর অংশের অবস্থাও দাঁড়ায় প্রায় অনুরূপ। আইনসভার বাইরে নবগঠিত প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টিরও ছিল না কোন অস্তিত্ব এবং এর মূল উদ্দেশ্য ছিল সরকারভুক্ত বিভিন্ন গ্রুপকে একত্র রাখা।

মন্ত্রিসভায় অখণ্ড হিন্দুস্থানে বিশ্বাসী হিন্দু মৌলবাদী সংগঠন নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার কার্যকরী সভাপতি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর অন্তর্ভুক্তি ছিল ফজলুল হকের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত ১৯৩২ সালের 'সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ' (যার দ্বারা মুসলমান সম্প্রদায় আইনসভায় পূর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক আসন লাভ করে)-এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ছিলেন একজন অগ্রসৈনিক। হকের প্রথম মন্ত্রিসভার আমলে চাকুরিক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য কোটা নির্ধারণ, কলকাতা পৌর কর্পোরেশন (সংশোধন) বিল[৩৯] ও মাধ্যমিক শিক্ষা বিল[৪০] -এর চরম বিরোধিতা এবং ১৯৩৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য থাকাকালীন সময়ে তাঁর ভূমিকা মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিকে আহত করে। মুসলমান সম্প্রদায়ের কাছে তিনি একজন কট্টর সাম্প্রদায়িকতাবাদী হিসেবে চিহ্নিত হন। এমনকি, মাত্র কয়েক মাস আগে স্বয়ং

৩৯. এই বিলের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে কর্পোরেশনের অফিসারদের নিয়োগদান। বিলটি ১৯৩৯ সালের জুলাই মাসে বঙ্গীয় আইনসভায় পাশ হয়।

৪০. এই বিলের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কবল থেকে সমগ্র বাংলার মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণভার মুক্ত করে একটি মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের উপর তা ন্যস্ত করা এবং প্রস্তাবিত বোর্ডে মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব থাকার আইনগত বিধান করা। বর্ণহিন্দুদের বিরোধিতার কারণে বিলটি আইনে পরিণত হতে পারে নি।

ফজলুল হক তাঁর সমালোচনায় মুখর ছিলেন। অতএব, মন্ত্রিসভায় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর অন্তর্ভুক্তি হকের বিরুদ্ধে মুসলমানদের ক্ষেপিয়ে তুলতে মুসলিম লীগ নেতাদের চমৎকার সুযোগ প্রদান করে।

বাংলার মতো একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে পাঁচ বছরকাল ক্ষমতা ভোগ করার পর গদিচ্যুত হওয়াটা মুসলিম লীগের জন্য খুবই উৎকণ্ঠার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। আইনসভার ৪০ জনের মতো সদস্য খাজা নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বাধীনে লীগের প্রতি অনুগত থাকে। যেহেতু ফজলুল হক আইনসভার অভ্যন্তরে অধিকাংশের সমর্থন লাভে সক্ষম হন, সেহেতু লীগ নেতৃবৃন্দের সামনে একটি বিকল্প পথই খোলা ছিল আর তা হচ্ছে নিজ সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে হাজির হওয়া।

তাঁরা ভাল করেই জানতেন যে, ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তনের ক্ষেত্রে হকই হচ্ছেন মূল বাধা। তাই তাঁদের রণনীতি ছিল হককে নিজ সম্প্রদায় থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা। যেহেতু তাঁর রাজনৈতিকভাবে টিকে থাকার মূল অবলম্বন ছিল ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা, বিশেষভাবে পূর্ব বাংলার পল্লী অঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে জনপ্রিয়তা, সেহেতু লীগ নেতৃবৃন্দ তাঁর সমর্থনের সেই ঘাঁটিতেই আঘাত হানার সিদ্ধান্ত নেয়।

সোহরাওয়ার্দী, নাজিমুদ্দিন ও তমিজুদ্দিন খানের নেতৃত্বে মুসলিম লীগের একটি শক্তিশালী টিম সমগ্র প্রদেশব্যাপী গণসংযোগে বের হয় এবং নতুন হক মন্ত্রিসভা ক্ষমতাসীন হওয়ার ৭ মাসের মধ্যে ৫০০ থেকে ৮০০ জনসভায় তাঁরা বক্তব্য রাখেন। এসব জনসভায় ফজলুল হক এবং তাঁর সহযোগীদের মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। বলা হয় যে, "এসব মুসলমান কুইসলিং মুসলিম বাংলাকে মহাসভার হাতে তুলে দিয়েছে, যেভাবে মীর জাফর বাংলাকে ক্লাইভের হাতে তুলে দিয়েছিল।"[৪১] ফজলুল হককে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে বলা হয় যে, তিনি বাঙালি-অবাঙালি প্রশ্ন তুলে ভারতীয় মুসলমানদের সংহতি বিনষ্ট করেছেন। যদিও ফজলুল হকের নতুন মন্ত্রিসভায় হিন্দু মহাসভা থেকে একমাত্র শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন, তথাপি মুসলিম লীগ মহল কর্তৃক একে 'শ্যামা-হক মন্ত্রিসভা' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়, যার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল মুসলমান সম্প্রদায়ের কাছে ফজলুল হককে হেয় প্রতিপন্ন করা। মন্ত্রিসভার তীব্র সমালোচনা করে মুসলিম লীগের মুখপত্র *স্টার অব ইন্ডিয়া* এক সম্পাদকীয়তে লিখে :

> বাংলায় মহাসভা শাসনের কুফল ফলা শুরু হয়েছে। মুসলমানদের নিজেদের হাতে এর প্রতিকার নিহিত। সর্বত্র তাদের অবশ্যই মুসলিম লীগের পতাকাতলে সংঘবদ্ধ হতে হবে এবং বর্তমান মন্ত্রিসভার পতন ঘটিয়ে নিজ সম্প্রদায়ের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ না নেয়া পর্যন্ত ক্ষান্ত হওয়া যাবে না বলে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হবে।[৪২]

৪১. Raghib Ahsan to Jinnah, 27 March 1942, *Quaid-i-Azam Papers*, F. 204, 203-4

৪২. *Star of India*, 26 January 1942, 2.

এভাবে মুসলিম লীগ সমর্থক *দৈনিক আজাদ, স্টার অব ইন্ডিয়া, দি মর্নিং নিউজ* ইত্যাদি পত্রিকা হকবিরোধী প্রচারণায় অবতীর্ণ হয়। এর সাথে যুক্ত হয় সোহরাওয়ার্দী কর্তৃক উদ্দীপ্ত বাংলার মুসলমান ছাত্র ও তরুণ সম্প্রদায়। হকের বিরোধিতায় জিন্নাহও তাঁর সমস্ত প্রভাব-প্রতিপত্তি নিয়ে এসে দাঁড়ান। ১৯৪২ সালে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্মেলনে সভাপতিত্ব করা উপলক্ষে পূর্ব বাংলার সিরাজগঞ্জ শহরে তাঁর আগমন কার্যত হকবিরোধী আন্দোলনকে আরো চাঙ্গা করে তোলে। সর্বভারতীয় মুসলমানদের পক্ষ থেকে সংগ্রামের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে তিনি বলেন :

> বাঙালি মুসলমানদের উচিত লীগের নীতি ও কর্মসূচি অন্ধভাবে অনুসরণ করা···ভারতের অন্য সব এলাকার মুসলমানদের থেকে বাঙালি মুসলমানরা নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন রাখতে পারে না এবং লাহোর প্রস্তাবে যে পাকিস্তানের কথা বলা হয়েছে তা প্রতিষ্ঠিত হলে তা দ্বারা বাংলা ও পাঞ্জাবই অধিকতর লাভবান হবে।[৪৩]

সোহরাওয়ার্দীর অত্যন্ত দক্ষ সাংগঠনিক নেতৃত্বাধীনে বঙ্গীয় মুসলিম লীগ তার কর্মতৎপরতা বহুমাত্রায় বৃদ্ধি করে। লীগের সদস্য সংগ্রহের জন্য এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবের বহুল প্রচারের জন্য বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন মফস্বল শহরে লীগ, পাকিস্তান ও ছাত্রদের নামে বহুসংখ্যক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। গণসংযোগের অংশ হিসেবে প্রথমবারের মতো প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সভা বিভিন্ন জেলা সদরে অনুষ্ঠিত হতে থাকে।

মুসলিম লীগের প্রচার-প্রচারণায় শঙ্কিত হয়ে ফজলুল হকও তাঁর কতিপয় সহকর্মীকে সঙ্গে নিয়ে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন এলাকা সফরে বের হন এবং তাঁর নতুন রাজনৈতিক অবস্থানের প্রতি জনসমর্থন লাভের নিষ্ফল প্রয়াস পান। মুসলমান ছাত্র ও তরুণ সম্প্রদায়, যাদেরকে তিনি এতদিন সযত্নে প্রতিপালন করেছেন, তারা তাঁর বিরুদ্ধে কালো পতাকা প্রদর্শন করে এবং 'গাদ্দার মুর্দাবাদ' (বিশ্বাসঘাতক নিপাত যাক) ধ্বনি তোলে। ফজলুল হক যে অতি দ্রুত জনসমর্থন হারাচ্ছিলেন তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার চার মাসের মধ্যে অর্থাৎ ১৯৪২ সালের এপ্রিল মাসে নাটোরে অনুষ্ঠিত প্রথম উপনির্বাচনের ফলাফলে। এ নির্বাচনে মুসলিম লীগের বিজয়ী প্রার্থীর ১০৮৪৩ ভোটের বিপরীতে তাঁর মনোনীত প্রার্থী মাত্র ৮৪০ ভোট পেয়ে শোচনীয় পরাজয় বরণ করেন এবং তাঁর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়।

এ সত্ত্বেও ফজলুল হক তাঁর নতুন উদ্যোগ নিয়ে এগুতে থাকেন। ১৯৪২ সালের জুন মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হিন্দু-মুসলমান ঐক্য সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেন, "বাংলার হিন্দু ও মুসলমানদের অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে যে, তাদের একত্রে বসবাস

---

৪৩. ঐ, 13 February 1942, 8.

করতে হবে, ডুবতে হবে, সাঁতরাতে হবে এবং প্রয়োজনে মাতৃভূমির মঙ্গলে একই সঙ্গে জীবনদান করতে হবে।"[৪৪] পাটনা (বিহার) থেকে প্রকাশিত ইংরেজি দৈনিক *দি সার্চলাইট* এই মর্মে সংবাদ পরিবেশন করে যে, বাংলাকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক 'বঙ্গস্থান আন্দোলন' শুরু করার কথা গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করছেন।[৪৫] রিপোর্টে এও উল্লেখ করা হয় যে, বাংলার হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে এ পরিকল্পনা সর্বাত্মকভাবে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে প্রস্তাবিত 'বঙ্গস্থান রাষ্ট্রে' পূর্ব ও পশ্চিম বাংলা—এ দুটো স্বায়ত্তশাসিত ইউনিটের বিধান থাকবে, যার প্রথমটিতে মুসলমান এবং দ্বিতীয়টিতে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে।

যাহোক, ফজলুল হকের আশু কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় তাঁর প্রতি মুসলমানদের জনসমর্থন পুনরুদ্ধার। এ লক্ষ্যে তিনি 'প্রগতিশীল মুসলিম লীগ' নামে লীগের একটি বিকল্প সংগঠন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন, যার মূল আদর্শ হবে 'সর্বক্ষেত্রে ইসলাম, তবে একই সঙ্গে অন্যান্য সম্প্রদায়ের ন্যায্য অধিকার সংরক্ষণ'।[৪৬] ১৯৪২ সালের ২১ জুন তিনি বাংলার বিভিন্ন প্রভাবশালী ব্যক্তির কাছে পত্র লিখে জিন্নাহর নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগের সঙ্গে তাঁর বিরোধের কারণ তুলে ধরে প্রস্তাবিত প্রগতিশীল মুসলিম লীগ গঠনে তাঁকে সহযোগিতা দানের অনুরোধ জানান। চিঠিতে তিনি বলেন, "রাজনৈতিকভাবে আমাকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য জিন্নাহর সমর্থকরা বাংলায় মুসলিম লীগকে সংগঠিত করতে খুবই তৎপর। আমি মনে করি, যে মুসলিম লীগ সংগঠনে আমি নেই সে ধরনের কোন সংগঠন দ্বারা বাঙালি মুসলমানদের আদৌ কোন স্বার্থ সংরক্ষিত হতে পারে না।"[৪৭] এ ছিল তাঁর অরণ্যে রোদন মাত্র। বাঙালি মুসলমানরা ইতিমধ্যে লীগের সর্বভারতীয় মুসলমান সংহতির আদর্শে দীক্ষিত হয়। সুতরাং প্রস্তাবিত প্রগতিশীল মুসলিম লীগ গঠনের ব্যাপারে হক আর অগ্রসর হন নি। এটি একটি 'কাগুজে পরিকল্পনা'ই থেকে যায়। মুসলিম লীগের বিরোধিতা করে আর একটি মুসলিম লীগ গঠনের না ছিল অনুকূল পরিস্থিতি, না ছিলেন তিনি একজন দক্ষ সংগঠক।

বস্তুত ফজলুল হক একটি অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থায় পতিত হন। যদিও তাঁর মন্ত্রিসভার ঘোষিত লক্ষ্য ছিল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা, তবু এটি তাঁর সহকর্মীদের অনেকের, বিশেষকরে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর হৃদয়গত উপলব্ধির ব্যাপার ছিল না। মুখার্জী অধিকতর উৎসাহী ছিলেন 'হিন্দু আধিপত্য প্রতিষ্ঠায়'।[৪৮] পাকিস্তান সম্বন্ধে মুসলিম লীগের প্রচার-

৪৪. Shyamoli Ghosh, "Fazlul Huq and Muslim Politics in Pre Partition Bengal," *International Studies*, July-December, 13 : 3(1974), 457.

৪৫. Quoted in *Star of India* ,11 June 1942. *Jinnah- Ispahani Correspondence*, 1.

৪৬. Zaidi (ed.), Appendix V111: *Fazlul Huq's Move*, 668.

৪৭. ঐ, 670.

৪৮. Herbert to Linlithgow, 21 April 1942, *GFR*, L/P & J/5/149.

প্রচারণা ও ক্রীপস্ পরিকল্পনায় (১৯৪২) পাকিস্তানের প্রচ্ছন্ন স্বীকৃতির বিরুদ্ধে ১০ মে হিন্দু মহাসভা সভা-সমাবেশের মাধ্যমে 'পাকিস্তানবিরোধী দিবস' পালন করে। নিঃসন্দেহে এ ঘটনা 'মুসলমানদের দারুণভাবে আহত করে এবং লীগ মহল কর্তৃক এর দায়-দায়িত্ব ফজলুল হকের উপর বর্তানো হয়'।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে বিমান হামলা থেকে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য বেসামরিক লোকজনদের নিয়ে একটি বিশেষ বাহিনী গঠন করা হয়, যা সংক্ষেপে এ. আর. পি. নামে অভিহিত ছিল। ফজলুল হকের প্রথম মন্ত্রিসভার সময় প্রণীত চাকুরিতে নিয়োগে 'সাম্প্রদায়িক বণ্টনবিধি'র আওতায় মুসলমানদের জন্য শতকরা ৫০ ভাগ পদ নির্দিষ্ট করা হলেও নতুন মন্ত্রিসভার আমলে শতকরা ৫ ভাগ মুসলমানও এ. আর. পির নিয়োগ লাভ করে নি।[৪৯] চাকুরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে মুসলমানদের এই দুরবস্থা হকবিরোধী প্রচারণায় মুসলিম লীগের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি ছিল।

বাঙালি মুসলমানদের স্বার্থের ব্যাপারে ফজলুল হক সর্বদা সচেতন ছিলেন। তাঁর হিন্দু সহকর্মীদের মনমানসিকতায় তিনি ক্ষুব্ধ হন। মফস্বল এলাকা সফরে এসে তাঁর বুঝতে অসুবিধা হয় নি যে, নতুন উদ্যোগের প্রতি স্বধর্মাবলম্বীদের প্রতিক্রিয়া খুবই বিরূপ। তিনি এক পর্যায়ে জিন্নাহর সঙ্গে বিরোধ মিটিয়ে ফেলতে আগ্রহী হন। কিন্তু যত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেই নিপতিত হোন না কেন, তিনি কিছুতেই বাংলার উপর সকল কর্তৃত্ব জিন্নাহর হাতে ছেড়ে দিয়ে 'আত্মসমর্পণ' করার পক্ষপাতী ছিলেন না।[৫০]

হকবিরোধী আন্দোলনে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ বাংলার গভর্নর জন হার্বার্ট এবং মুখ্য সচিব থেকে মহকুমা অফিসার পর্যন্ত সর্বস্তরের আমলাদের আনুকূল্য লাভ করেন।[৫১] সচিবালয় থেকে ছাড় দেয়ার সাথে সাথেই সরকারি গোপন সার্কুলার ও নির্দেশাবলী সোহরাওয়ার্দীর হাতে পৌঁছে যেতো।[৫২] ফজলুল হকের পুনঃ পুনঃ অনুরোধ সত্ত্বেও হার্বার্ট মন্ত্রিসভার সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি ও পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি নিয়োগদান থেকে বিরত থাকেন। অন্যদিকে, মুসলিম লীগের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করে একটি 'জাতীয় সরকার' গঠনের জন্য তাঁর উপর চাপ প্রয়োগ করা হয়। ১১টি দপ্তর থাকা সত্ত্বেও মাত্র ৮ জন (পরবর্তীকালে ৭ জন) মন্ত্রী ও ১ জন পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি নিয়ে হককে কাজ চালিয়ে যেতে হয়। এক পর্যায়ে তিনি হার্বার্টের বিরুদ্ধে মুসলিম লীগের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শনের অভিযোগ তোলেন, যা ভিত্তিহীন ছিল না। ভাইসরয় লিনলিথগোকে লেখা এক পত্রে তিনি

৪৯ Fazlul Huq to Herbert, 2 August 1942, *Formation of New Government*, Part 1, 15-21; *Star of India*, 23 July 1942, 5.

৫০. Fazlul Huq to Jinnah, 5 February 1943, in *Star of India*, 17 February 1943, 1,2, Huq's reply to Jinnah, ঐ, 18 February 1943, 3.

৫১. বিস্তারিত দ্র., Shila Sen, *Muslim Politics*, 151-65.

৫২. Kamruddin Ahmad, *A Social History of Bengal*, (Dacca 1970), 58

বলেন, "... আমার গভর্নর এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন যা আমাকে পদে পদে বাধাগ্রস্ত করছে এবং আমার পক্ষে বিধিসম্মতভাবে শাসনকাজ পরিচালনা অসম্ভব করে তুলেছে।"[৫৩] এমনকি লিনলিথগোর মনেও এ স্থির বিশ্বাস জন্মে যে, দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে হার্বার্ট খানিকটা মাত্রা অতিক্রম করেছেন এবং ফজলুল হকের প্রতি যথেষ্ট পরিমাণে ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করেন নি, যদিও ফজলুল হক যেভাবে দায়িত্ব পালন করছিলেন তা লিনলিথগোর কাছেও সন্তোষজনক ছিল না।[৫৪]

স্পষ্টত হার্বার্ট ও মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হকের মধ্যে মতবিরোধ প্রকট হয়ে উঠে। বঙ্গীয় আইনসভার অভ্যন্তরে ইউরোপীয় গ্রুপ সরকারকে সমর্থনের চিরাচরিত নীতি পরিহার করে ফজলুল হকের মন্ত্রিসভার পতন ঘটাতে মুসলিম লীগের সাথে হাত মিলায়। অবশেষে ১৯৪৩ সালের ২৮ মার্চ হার্বার্ট ফজলুল হককে পদত্যাগে বাধ্য করেন, যা ছিল তাঁকে বরখাস্ত করার শামিল।[৫৫] ঘটনাপ্রবাহের যেকোন পর্যবেক্ষকের কাছে গভর্নরের এ পদক্ষেপ আকস্মিক মনে হবে না। কেননা, হকের এ মন্ত্রিসভার শুরু থেকেই তিনি প্রায়শ ৯৩ ধারা আরোপ বা এক ধরনের 'শো-ডাউন' কিংবা বরখাস্তের কথা বলে আসছিলেন। গভর্নর জেনারেলের কাছে হকের বিরুদ্ধে তাঁর গৃহীত পদক্ষেপের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হার্বার্ট উল্লেখ করেন যে, সে সময়ে হক মন্ত্রিসভা বিপর্যয়ের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়।

এ কথা ঠিক যে, ফজলুল হক ক্রমবর্ধমান মাত্রায় নিজ সম্প্রদায় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিলেন। তাঁর মন্ত্রিসভার আমলে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনে মুসলিম লীগের প্রার্থীদের কাছে সরকারমনোনীত প্রার্থীরা শোচনীয় পরাজয় বরণ করে ও জামানত হারায়। আইনসভার ভিতরে সরকারি দল প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টির সদস্যরা পক্ষ পরিবর্তন করে লীগে যোগদান শুরু করে। অবশেষে ফজলুল হককে অসাংবিধানিকভাবে ক্ষমতা থেকে সরানো হয়, কেননা তখন পর্যন্ত তাঁর প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন বহাল ছিল।

বাংলাকে ঘিরে ফজলুল হকের যে রাজনৈতিক স্বপ্ন ছিল তাঁর ক্ষমতাচ্যুতির ফলে সে স্বপ্নের মৃত্যু ঘটে বলে তিনি মনে করেন। আসলে বহু আগেই কৃষক প্রজা পার্টির

৫৩. Fazlul Huq to Linlithgow, Note (n.d.), October 1942

৫৪. Linlithgow to Amery, 10 October 1942, *Formation of New Government*, Part 2, 219, Viceroy to Secretary of State for India, *Telegram*, 8 October 1942, ঐ, 243.

৫৫. *Star of India*, 29 March 1943, 1; A K Fazlul Huq, *Bengal To-day*, (Calcutta 1944); Fazlul Huq to Secretary of State for India, *Telegram*, 10 April 1943, *Formation of New Government*, Part 1, 153-55 Linlithgow wrote to Herbert. ".. I would not like you to think that I am at all happy at the way that this matter has been handled . I am gravely disturbed, even now, at the possibility that we may have trouble in the House of Commons over his resignation... the situation stands. .as follows: that Huq was confronted by you with a draft of a letter or resignation, not, it is true, on Government House paper, but nonetheless a draft of a letter of resignation ... "Linlithgow to Herbert, 2 April 1943, ঐ, 135-36. Herbert replied: "... what I write now is by way of explanation ...If Huq managed to scrape through the session he would never have resigned · I must admit that I urged him pretty firmly (to resign) though "compulsion" is a quite unfair description... " Herbert to Linlithgow, 7 April 1943, *GFR*, L/P & J/ 5/150

দ্বিধাবিভক্তি ও আনুষ্ঠানিকভাবে ফজলুল হকের মুসলিম লীগে যোগদান করার সময় থেকে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের মৃত্যুঘণ্টা বেজে উঠে। যে সময় লীগের অগ্রযাত্রা হয়ে উঠে অপ্রতিরোধ্য, সে সময়ে এ দলে টিকে থাকতে না পারায় এই পরিণতি ঘটাই স্বাভাবিক। অস্বীকার করা যাবে না যে, ১৯৩৭-১৯৪৩ কালপর্বে তাঁকে বহু প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে। একজন বড় মাপের নেতার বহু গুণই তাঁর মধ্যে ছিল। কিন্তু তাঁর বড় দুর্বলতা এই যে, তিনি একজন দক্ষ সংগঠক ছিলেন না। তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক ভ্রান্তি হলো, কৃষক প্রজা পার্টিকে একটি শক্তিশালী সংগঠন হিসেবে গড়ে না তুলে তিনি নিজের ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তার উপর সম্পূর্ণরূপে ভরসা করেছেন এবং কলকাতায় বসে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দলকে সঙ্গে নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন ও ক্ষমতায় টিকে থাকার প্রয়াসে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেছেন।

ফজলুল হকের দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা মাত্র ৪৭৪ দিন ক্ষমতায় থাকে. এ সময়ে প্রতিটি মুহূর্ত তাঁকে কাটাতে হয়েছে মুসলিম লীগের প্রবল বিরোধিতার মুখে। ফলে, তাঁর মন্ত্রিসভা উল্লেখযোগ্য কোন অবদান রাখতে সক্ষম হয় নি। অন্যদিকে মুসলিম লীগ পুরোদমে সক্রিয় হয়ে দলের সুদৃঢ় ভিত্তি গড়ে তোলে।

## নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভা (১৯৪৩-১৯৪৫)

ফজলুল হকের পদত্যাগের সময় গভর্নর কর্তৃক একটি সর্বদলীয় মন্ত্রিসভা গঠনের ধারণা দেয়া হলেও কিছুদিনের মধ্যে মুসলিম লীগ সংসদীয় দলের নেতা স্যার খাজা নাজিমুদ্দিনকে মন্ত্রিসভা গঠনের আহ্বান জানানো হয় এবং ২৪ এপ্রিল তিনি ১৩ সদস্যবিশিষ্ট একটি মন্ত্রিসভা গঠন করেন। এর সদস্যরা হলেন খাজা নাজিমুদ্দিন (মুখ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র ও দেশরক্ষা মন্ত্রণালয়), হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী (বেসামরিক সরবরাহ), তমিজুদ্দিন খান (শিক্ষা), খান বাহাদুর সৈয়দ মোয়াজ্জেমুদ্দিন হোসেন (কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন), নবাব মোশাররফ হোসেন (বিচার ও ব্যবস্থাপনা), খাজা শাহাবুদ্দিন (বাণিজ্য, শ্রম ও শিল্প), খান বাহাদুর জালালউদ্দিন আহম্মদ (জনস্বাস্থ্য ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন), তুলসীচরণ গোস্বামী (অর্থ), বরদা প্রসন্ন পাইন (পূর্ত ও যানবাহন), তারকনাথ মুখার্জী (রাজস্ব ও রিলিফ), প্রেমহরি বর্মা (বন ও আবগারি), পুলিনবিহারী মল্লিক (প্রচার) ও যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল (সমবায়,ঋণ ও পল্লীদারিদ্র্য)।

মন্ত্রিসভায় ৬ জন হিন্দু সদস্য (৩ জন বর্ণহিন্দু ও ৩ জন তফসিলী হিন্দু) অন্তর্ভুক্ত হন সত্যি, কিন্তু এর দ্বারা হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব ঘটে নি। কেননা, হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বকারী বঙ্গীয় কংগ্রেসের কোন অংশই মন্ত্রিসভায় যোগদান করে নি। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ফজলুল হকের ক্ষমতাচ্যুতির প্রাক্কালে মুসলমান সদস্যগণ পক্ষত্যাগ করে বিরোধী শিবিরে যোগ দিতে থাকে। হক মন্ত্রিসভার পতন ও নাজিমুদ্দিনকে

সরকার গঠনের আমন্ত্রণ জানানোর সাথে সাথে এরা অধিক সংখ্যায় লীগে যোগদান করে। ফলে মুসলিম লীগ সংসদীয় দলের সদস্যসংখ্যা রাতারাতি ৪০ থেকে ৭৯ জনে উন্নীত হয়। নাজিমুদ্দিনের পেছনে ছিল ইউরোপীয় গ্রুপের পূর্ণ সমর্থন। এ ছাড়া তিনি তফসিলী হিন্দুদের একটি অংশ, এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ও অন্য আরো কিছু সদস্যের সমর্থন লাভে সক্ষম হন, গভর্নর হার্বার্টের সমর্থন-সহযোগিতা তো ছিলই। ফজলুল হককে যেখানে মাত্র ৮ জন (পরবর্তীকালে ৭ জন) মন্ত্রী এবং ১ জন পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি নিয়ে কাজ চালিয়ে যেতে হয়, সেখানে নাজিমুদ্দিনকে শুরুতেই ১৩ সদস্যবিশিষ্ট একটি মন্ত্রিসভা গঠন এবং ১৭ জন পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি নিয়োগ করতে অনুমতি দেয়া হয়।

মন্ত্রিসভা গঠনের পর থেকে নাজিমুদ্দিন ও সোহরাওয়ার্দীর মধ্যে পার্লামেন্টারি নেতৃত্ব নিয়ে আঘোষিত দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের একক সংগঠক এবং হকবিরোধী আন্দোলনের মূল নায়ক হওয়া সত্ত্বেও সোহরাওয়ার্দী স্থান লাভ করেন নাজিমুদ্দিনের দু'জন ডেপুটির মধ্যে একজন হিসেবে।[৫৬] সুযোগ থাকা সত্ত্বেও জিন্নাহ তাঁকে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা থেকে বিরত থাকেন। ১৯৪৩ সালে লীগ হাইকমান্ড এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করে যে, মন্ত্রী বা পার্লামেন্টারি সেক্রেটারিদের কেউ একই সাথে লীগের সাংগঠনিক কোন পদে আসীন থাকতে পারবেন না। এই সিদ্ধান্ত সোহরাওয়ার্দীকে খুবই বেকায়দায় ফেলে, কেননা তিনি মন্ত্রিত্বের পাশাপাশি বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সেক্রেটারি পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন। এ কথা হয়তো বলা যেতে পারে যে, লীগের সাংগঠনিক তৎপরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দলীয় ও পার্লামেন্টারি নেতৃত্বের পৃথকীকরণের জন্য এ নীতি গৃহীত হয়। কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে এটা মনে হওয়াও অস্বাভাবিক নয় যে, উল্লিখিত সিদ্ধান্তের মূল উদ্দেশ্য ছিল সোহরাওয়ার্দীর ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি হ্রাস করা।

সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রীপদে বহাল থাকার সিদ্ধান্ত নিলেও দলের সেক্রেটারির মতো গুরুত্বপূর্ণ পদটি যাতে হাতছাড়া হয়ে না যায় সে ব্যাপারে সচেতন ছিলেন। লীগের পার্লামেন্টারি নেতৃত্ব ছিল খাজাদের করায়ত্ত। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে এককভাবে ঢাকা নবাব পরিবারের ১০ জন সদস্য[৫৭] বঙ্গীয় আইনসভায় নির্বাচিত হন। খাজা নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভায় তাঁরই সহোদর খাজা শাহাবুদ্দিনকে অন্তর্ভুক্ত করেন। শুধু পার্লামেন্টারি নেতৃত্ব কেন, সংগঠনের উপরও তাঁদের প্রভাব ছিল লক্ষণীয়। তাঁদেরই সমর্থক ও তৎকালীন একমাত্র বাংলা দৈনিক *আজাদ*-এর মালিক মওলানা আকরম খাঁ ছিলেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি। ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে কলকাতায় বসবাসরত ও জিন্নাহর একান্ত

৫৬. অন্যজন ছিলেন খান বাহাদুর সৈয়দ মোয়াজ্জেমুদ্দিন হোসেন।

৫৭. এঁরা হচ্ছেন : নবাব খাজা হাবিবুল্লাহ, নবাবজাদা খাজা নসরুল্লাহ, খাজা নাজিমুদ্দিন, খাজা শাহাবুদ্দিন, ফরহাত শাহাবুদ্দিন (শাহাবুদ্দিনের স্ত্রী), খাজা নূরউদ্দিন, সৈয়দ আবদুল হাফিজ, সৈয়দ আবদুস সেলিম, সৈয়দ আবদুস শহীদ ও খাজা ইসমাইল।

বিশ্বস্ত অবাঙালি ইস্পাহানী পরিবারের হাতে ন্যস্ত ছিল লীগের আর্থিক নিয়ন্ত্রণভার। বাংলার অন্যতম বৃহৎ জমিদারির মালিক হওয়ার সুবাদে সমগ্র প্রদেশ জুড়ে ছড়িয়ে ছিল তাঁদের সমর্থক প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ। সবকিছুর উর্ধ্বে তাঁদের প্রতি ছিল লীগ হাইকমান্ডের অকুণ্ঠ সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা। তাই সোহরাওয়ার্দীর জন্য একমাত্র পথ খোলা ছিল সংগঠনের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। তিনি তাঁর স্থলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সেক্রেটারি পদে তাঁর দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় আবুল হাশিম (১৯০৫-১৯৭৪) যাতে নির্বাচিত হন তা নিশ্চিত করেন।

বর্ধমানের (পশ্চিম বাংলা) খ্যাতিমান কংগ্রেসী মুসলিম নেতা আবুল কাসেমের পুত্র আবুল হাশিম যেমন ছিলেন সুবক্তা তেমনি ছিলেন একজন দক্ষ সংগঠক। রাজনৈতিক বিশ্বাসে তিনি ছিলেন প্রগতিশীল ও প্রচণ্ড সাম্রাজ্যবাদবিরোধী। সোহরাওয়ার্দীর পূর্ণ সমর্থন নিয়ে তিনি শুরুতেই বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগকে একটি ব্যাপক গণভিত্তিসম্পন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে আত্মনিয়োগ করেন। লীগের সকল জেলা ও মহকুমা শাখার জন্য পার্টি-অফিসের ব্যবস্থা করতে তিনি নির্দেশ প্রদান করেন। লীগ তহবিলকে শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নিয়ে আসা হয়। প্রত্যেক শাখাকে নিয়মিত নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে বলা হয়। পূর্ব বাংলায় লীগকে শক্তিশালী সংগঠন হিসেবে গড়ে তুলতে ১৯৪৪ সালে ঢাকায় একটি স্থায়ী পার্টি-অফিস স্থাপন করা হয়। কমিউনিস্ট পার্টির মডেলে দলের জন্য বেশ কিছু সার্বক্ষণিক কর্মী নিয়োগ করা হয়। তাঁরই সুপারিশক্রমে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের কাউন্সিল সংগঠনের অভ্যন্তরে গণতন্ত্রায়নের লক্ষ্যে কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে, যা খাজাদের স্বার্থের প্রতিকূলে যায়। এসবের মধ্যে রয়েছে (ক) লোকসংখ্যা নির্বিশেষে প্রত্যেক জেলার জন্য লীগ কাউন্সিলে ২৩ জন সদস্যের কোটা নির্ধারণ এবং (খ) ওয়ার্কিং কমিটিতে সভাপতি কর্তৃক মনোনীত সদস্যের সংখ্যা ১০ জন থেকে কমিয়ে ৪ জন করা।

আবুল হাশিম কর্তৃক সূচিত লীগের গণতন্ত্রায়ন প্রক্রিয়া এবং এর গণভিত্তি সম্প্রসারণের জন্য গৃহীত পদক্ষেপসমূহ খাজানেতৃত্বকে শঙ্কিত করে তোলে। যে ঢাকা জেলা মুসলিম লীগ ছিল আহসান মঞ্জিলের নবাব পরিবারের করায়ত্ত, ১৯৪৪ সালে তার নিয়ন্ত্রণ অন্যদের হাতে চলে যায়। আবুল হাশিম লীগ পার্লামেন্টারি গ্রুপের উপর দলের প্রভুত্ব ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হলে তাঁর সঙ্গে খাজা-গ্রুপের স্পষ্ট বিরোধ দেখা দেয়। পার্লামেন্টারি নেতৃত্ব দলকে উপেক্ষা করে সমগ্র প্রদেশ জুড়ে তাঁদের অনুগত রাজনৈতিক দোসরদের মাধ্যমে একটি সমান্তরাল ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখছে বলে হাশিম অভিযোগ তোলেন। আইনসভার অভ্যন্তরে দলত্যাগী সদস্যদের বিরুদ্ধে সামাজিক বয়কটসহ শাস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য জেলা ও স্থানীয় পর্যায়ে সাংগঠনিক উদ্যোগ নেয়া হলে পার্লামেন্টারি নেতৃত্বের পক্ষ থেকে বাধা আসে। তাঁরা গদি টিকিয়ে রাখার স্বার্থে দলত্যাগী

সদস্যদের নানা সুযোগ-সুবিধার বিনিময়ে পুনরায় দলে ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হন বলে তিনি উল্লেখ করেন।[৫৮] হাশিম আরো অভিযোগ করেন যে, প্রাথমিক সদস্য সংগ্রহের জন্য রশিদবই ছাপাতে বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভার কাছ থেকে এক রিম কাগজ পর্যন্ত বরাদ্দ পাওয়া যায় নি।

সোহরাওয়ার্দী-হাশিম গ্রুপের তৎপরতা মোকাবেলায় এক সময় খাজা-গ্রুপ কর্তৃক পূর্ব বাংলা-পশ্চিম বাংলা ইস্যু তোলা হয় এবং হাশিমের কর্মী-সংগঠকদের 'কমিউনিস্ট' বলে আখ্যায়িত করে তাদের বিরুদ্ধে নানা প্রচারণা চালানো হয়।[৫৯] উল্লেখ্য, সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম উভয়েরই জন্মস্থান হলো পশ্চিম বাংলা। অন্যদিকে নাজিমুদ্দিন ও খাজা-গ্রুপের অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন পূর্ব বাংলার বাসিন্দা। অন্য একটি বাস্তব ব্যাপার ছিল এই যে, বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সেক্রেটারি আবুল হাশিমের প্রগতিশীল নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা তরুণ সম্প্রদায়কে বিপুলভাবে আকৃষ্ট করেছিল। এদের মধ্যে কেউ কেউ কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিল।[৬০] তবে অধিকাংশেরই এ ধরনের কোন সংশ্রব ছিল না। আসলে, সোহরাওয়ার্দী-হাশিম এবং খাজা-গ্রুপের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব তা একই গোষ্ঠীর মধ্যে নিছক ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ছিল না, এ ছিল উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও সামন্ত শাসক শ্রেণীর মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, অন্য কথায় জনসাধারণ ও প্রাসাদের দ্বন্দ্ব।

নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভাকে সবচেয়ে বড় যে সমস্যার মোকাবেলা করতে হয় তা হচ্ছে বাংলার দুর্ভিক্ষ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে এক পর্যায়ে জাপানীরা বার্মা দখল করে চট্টগ্রামের উপকূলে এসে হাজির হলে বাংলার পতন অত্যাসন্ন বলে মনে করা হয়। শত্রুপক্ষকে সর্বাত্মক অসুবিধার মধ্যে ফেলার বৃটিশ নীতি অনুযায়ী উপকূলীয় অঞ্চল থেকে খাদ্য মজুত অন্যত্র সরিয়ে নেয়া হয়; নৌ-যোগাযোগব্যবস্থা সম্পূর্ণ অচল করে দেয়ার লক্ষ্যে সুপরিকল্পিতভাবে দেশীয় নৌকা ধ্বংস করা হয় এবং বহু স্টীমার ও রেলগাড়ি বাংলার বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। এর ফলে খাদ্যসামগ্রীর চলাচল মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়। উপরন্তু যুদ্ধজনিত পরিস্থিতিতে দেখা দেয় মুদ্রাস্ফীতি, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি এবং অসাধু ব্যবসায়ীদের মজুতদারি। ১৯৪৩ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের মূলে ছিল এসব কারণ। এ দুর্ভিক্ষের সময় বেসামরিক সরবরাহ মন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর তত্ত্বাবধানে কলকাতা শহরে লঙ্গরখানা খুলে এবং রেশনিং ব্যবস্থা চালু করে দুর্ভিক্ষ মোকাবেলার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এই পদক্ষেপ কলকাতা শহরে বহু জীবনকে নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা করলেও সারা বাংলায় ৩৫ থেকে ৩৮ লক্ষ লোক মৃত্যুবরণ করে।

৫৮. *Review of Muslim League Organisation in Bengal*, submitted by the Secretary (Abul Hashim) of the Bengal Provincial Muslim League to the Secretary of the All-India Muslim League (Strictly Confidential), 30 July 1944, *Shamsul Hasan Collection: Bengal*, Vol. 1, File 23(micro-film) in NAP.

৫৯. Shahid Ahmed to Liaquat Ali Khan, 17 May 1945, File *BPML*, Vol. 42, in Archives of Freedom Movement, Karachi

৬০. যেমন, মোহাম্মদ তোয়াহা (নোয়াখালী), সরদার ফজলুল করিম (বরিশাল), শামসুদ্দিন (ঢাকা), আবদুল হক (যশোর)।

দুর্ভিক্ষ মোকাবেলা করা ভিন্ন নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভা তার দু'বছরের শাসনামলে উল্লেখযোগ্য তেমন কোন কাজ সম্পাদন করতে সক্ষম হয় নি। মাধ্যমিক শিক্ষাকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করার লক্ষ্যে একটি শিক্ষাবোর্ড গঠনের প্রস্তাবসহ যে 'মাধ্যমিক শিক্ষা বিল' ফজলুল হকের প্রথম মন্ত্রিসভার সময় উত্থাপন করা হয়েছিল, তা আবার নতুন করে উত্থাপন করা হয়। কিন্তু আগের মতো হিন্দু সদস্যদের বিরোধিতার কারণে সেটি পাশ করা সম্ভব হয় নি।

নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে নানা অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল। নাজিমুদ্দিন তাঁর সহোদর খাজা শাহাবুদ্দিনকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করায় মুসলিম লীগের অভ্যন্তরেই ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।[৬১] মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে একটি বড় অভিযোগ ছিল দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির। ব্যক্তিগতভাবে খাজা নাজিমুদ্দিন দুর্নীতিমুক্ত হলেও মন্ত্রিসভার অনেকের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ উঠে। এও বলা হয় যে, ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে বাংলায় যখন অগণিত লোক মৃত্যুবরণ করছিল, তখন মন্ত্রীরা তাঁদের আত্মীয়-স্বজন ও সমর্থকদের মধ্যে সুযোগ-সুবিধা বিতরণ করছিলেন। তাঁদেরই যোগসাজশে অনেকে প্রচুর অবৈধ টাকার মালিক হয়। একই সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয় খাজা শাহাবুদ্দিনের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান শালিমার এন্ড কোং। ইস্পাহানী কোম্পানি লাভ করে খাদ্য সংগ্রহের সোল এজেন্সি। এমনকি, মন্ত্রীদের স্ত্রীরা পর্যন্ত রাতারাতি সরকারি ঠিকাদার বনে যান।[৬২] এসব কারণে নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভা এর নৈতিক ভিত্তি হারিয়ে ফেলে। অন্যদিকে, এই মন্ত্রিসভার আমলে সাধারণভাবে মুসলমানদের প্রতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে আনুকূল্য ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান ছাড়াও বাংলায় পাকিস্তান আন্দোলনের ব্যাপক বিস্তৃতি হিন্দু সদস্যদের আরো বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। মন্ত্রিসভার প্রতি হিন্দু সদস্যদের যে সমর্থন ছিল তাও প্রত্যাহৃত হতে থাকে। এমনি এক অবস্থায় ১৯৪৫ সালের ২৮ মার্চ বাজেটবরাদ্দের উপর এক ভোটাভুটিতে ২০ জন সরকারসমর্থক সদস্য বিরোধী শিবিরে যোগ দিলে ১০৬-৯৭ ভোটে মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। অবশ্য বিরোধীরা দলত্যাগীদের উৎকোচ দিয়ে বিরোধী দলভুক্ত করেছে বলে নাজিমুদ্দিনের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়।[৬৩]

## সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভা (১৯৪৬-১৯৪৭)

নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভার পতনের পর এক বছরের মধ্যে অর্থাৎ ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে বাংলাসহ ভারতের সকল প্রাদেশিক পরিষদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বৃটিশ শাসনাধীনে এটি ছিল সর্বশেষ সাধারণ নির্বাচন। উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এ নির্বাচন ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। নির্বাচনে ২৫০ সদস্যবিশিষ্ট বঙ্গীয় আইনসভায় প্রাদেশিক

৬১. Raghib Ahsan to Jinnah, 11 July 1944, *Quaid-i-Azam Papers*, F.1103 (micro-film), 344-47 in NAP.

৬২. Shahid Ahmed to Liaquat Ali Khan, 17 May 1945; *Confidential Report* (hereafter *CR*), lst half, April 1945, *GFR*, L/P & J/ 5/152.

৬৩. *Casey's Personal Diary*, Photo Eur. 48/3, 33-38 in *IOR*. *Star of India*, 29 March 1945, 2; also *CR* ,2nd half, March 1945, *GFR*, L/P&J/ 5/152, 182-83

মুসলিম লীগ ১২১টি মুসলিম আসনের মধ্যে ১১৪টি আসন লাভ করে এবং একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আবির্ভূত হয়। এ সাফল্যের মূল নায়ক ছিলেন সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম। নির্বাচনের পরপরই সোহরাওয়ার্দী সর্বসম্মতিক্রমে লীগ পার্লামেন্টারি দলের নেতা নির্বাচিত হন। ইতিপূর্বে দলের প্রার্থী মনোনয়ন সংস্থা লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ডের নির্বাচনে নাজিমুদ্দিন সোহরাওয়ার্দীর কাছে হেরে গিয়ে পরিষদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়ালে সোহরাওয়ার্দীর পার্লামেন্টারি নেতৃত্বলাভ নিশ্চিত হয়ে যায়।[৬৪] ২ এপ্রিল বাংলার নতুন গভর্নর স্যার ফ্রেডারিক বারোজ সোহরাওয়ার্দীকে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আমন্ত্রণ জানান।

নির্বাচনের সামগ্রিক ফলাফলের প্রেক্ষিতে সোহরাওয়ার্দীর পক্ষে এককভাবে মন্ত্রিসভা গঠন কোন সমস্যা ছিল না। তা সত্ত্বেও তিনি প্রথমে কংগ্রেসের সঙ্গে একটি কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনের উদ্যোগ নেন। সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম এ ব্যাপারে সচেতন ছিলেন যে, সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভাবশালী অবস্থানে থাকা সত্ত্বেও বাংলার হিন্দু সম্প্রদায় ১৯৩৭ সাল থেকে প্রদেশের শাসনকাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারছে না। ফজলুল হকের দ্বিতীয় মন্ত্রিসভার সময় সে সুযোগ তারা পেয়েছিল বটে, কিন্তু এ মন্ত্রিসভা ১৬ মাসের বেশি স্থায়ী হয় নি এবং এ কারণে বাংলার বর্ণহিন্দুদের মধ্যে অসন্তোষ বিরাজ করছিল। এ অবস্থা এক সময় বাংলার সংহতির পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে ভেবে[৬৫] তাঁরা একটি কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন যাতে করে বাংলার হিন্দু ও মুসলমানরা নিজেদের সামগ্রিক কল্যাণে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার সুযোগ লাভ করতে পারে।[৬৬] লীগের মধ্যে খাজা-গ্রুপ এ উদ্যোগ সমর্থন করে নি।[৬৭]

কোয়ালিশনের বিষয়টি নিয়ে বঙ্গীয় কংগ্রেসের পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা কিরণশঙ্কর রায়ের সাথে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা ছাড়াও সোহরাওয়ার্দী দিল্লীতে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস উভয় দলের হাইকমান্ডের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁদের সম্মতিলাভের চেষ্টা করেন। কিন্তু বাংলার দুর্ভাগ্য, সোহরাওয়ার্দীর এ উদ্যোগ সফল হতে পারে নি। মন্ত্রিসভায় উভয় দলের আসনসংখ্যা নির্ধারণ, কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় বণ্টন ইত্যাদি প্রশ্নে আলোচনা ভেঙে যায় বলে প্রতীয়মান হলেও[৬৮] এর মূলে ছিল কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অনমনীয় মনোভাব।[৬৯] এঁদের কেউ চান নি সর্বভারতীয় পর্যায়ে একটি রাজনৈতিক সমাধানের পূর্বে

৬৪. বিস্তারিত দ্র., Harun-or-Rashid, *Foreshadowing of Bangladesh*, 194-207.

৬৫. Abul Hashim, *In Retrospection*, (Dhaka 1974), 108

৬৬. Suhrawardy to Kiran Shankar Roy, 11 April 1946, *Star of India*, 23 April 1946, 3.

৬৭. Sir F. Burrows to Lord Wavell, 25 April 1946, *GFR*, L/P & J/5/153, 162-64; আরো দ্রষ্টব্য, *মিল্লাত*, ২৩ এপ্রিল ১৯৬৪, ৩।

৬৮. Burrows to Lord Wavell, 25 April 1946; also Kiran Shankar Roy's statement in *Star of India*, 22 April 1946, 3-4

৬৯. Governor of Bengal to Viceroy, *Inward Telegram*, 13 April 1946; *Franchise: Elections In Bengal 1946* (main file), L/P&J/8/475 in *IOR*; Suhrawardy's statement in *Star of India*, 23 April 1946, 4.

প্রাদেশিক ক্ষেত্রে বাংলার উভয় সম্প্রদায় কোন ধরনের রাজনৈতিক সমঝোতায় উপনীত হোক।

অবশেষে ১৯৪৬ সালের ২৪ এপ্রিল সোহরাওয়ার্দী ৭ জন মুসলিম লীগ দলীয় সদস্য এবং ১ জন তফসিলী হিন্দু সদস্য নিয়ে মোট ৮ সদস্যের একটি মন্ত্রিসভা গঠন করেন। এ মন্ত্রিসভার সদস্যগণ হলেন সোহরাওয়ার্দী (মুখ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়), আহমদ হোসাইন (কৃষি), খান বাহাদুর আবদুল গোফরান (বেসামরিক সরবরাহ), খান বাহাদুর মোহাম্মদ আলী (অর্থ, জনস্বাস্থ্য ও স্থানীয় সরকার), খান বাহাদুর মোয়াজ্জেমুদ্দিন হোসাইন (শিক্ষা ও রাজস্ব), খান বাহাদুর এ. এফ. এম. আবদুর রহমান (সমবায় ও সেচ), শামসুদ্দিন আহমদ (বাণিজ্য, শ্রম ও শিল্প) এবং যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল (বিচার, পূর্ত ও গৃহনির্মাণ)।

সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভায় চার জন প্রাক্তন মন্ত্রী এবং চার জন খান বাহাদুর খেতাবধারী অন্তর্ভুক্ত হলেও মূলত এই মন্ত্রিসভা মধ্যবিত্ত স্বার্থেরই প্রতিনিধিত্ব করে। অবশ্যই মনে রাখা প্রয়োজন যে, ১৯৩৭ সালের পর প্রথমবারের মতো বাংলায় এই একটি মন্ত্রিসভা গঠিত হয়, যাতে ঢাকার নবাব পরিবারের কেউ অন্তর্ভুক্ত হন নি। এমনকি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নাজিমুদ্দিনের সমর্থকদের কেউই এ মন্ত্রিসভায় স্থান পান নি। মন্ত্রিসভার সবাই ছিলেন সোহরাওয়ার্দীর অনুসারী। এখানেই শেষ নয়, কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র পদে নির্বাচনে মুসলিম লীগের কর্পোরেশন শাখা জিন্নাহর একান্ত বিশ্বস্ত ও অন্ধ অনুসারী হাসান ইস্পাহানীকে মনোনয়ন দান করলে নির্বাচনের মাত্র কয়েক দিন আগে সোহরাওয়ার্দীর হস্তক্ষেপে এই মনোনয়ন পরিবর্তন করে সেখানে তাঁরই সমর্থক মোহাম্মদ ওসমানকে মনোনয়ন দেয়া হয় এবং তিনি নির্বাচিত হন।

খাজাসমর্থকদের মালিকানাধীন তিনটি প্রভাবশালী দৈনিক *আজাদ*, *স্টার অব ইন্ডিয়া* এবং *দি মর্নিং নিউজ* শুরু থেকেই মন্ত্রিসভার প্রতি শীতল দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে এবং কখনো কখনো প্রকাশ্যে বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকে। মন্ত্রিসভার সমর্থনে জনমত গঠনে একমাত্র আবুল হাশিমের সাপ্তাহিক *মিল্লাত* কিছুতেই প্রয়োজনোপযোগী ছিল না। মন্ত্রিসভা গঠনকালে সোহরাওয়ার্দী এই প্রত্যাশায় কিছু আসন খালি রেখে দেন যে, কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নে একটি সমঝোতায় পৌঁছানো সম্ভব হলেও হতে পারে। কিন্তু এ রকম কোন সম্ভাবনাই দেখা যায় নি। অতএব তিনি খাজা-গ্রুপের প্রতি নমনীয় হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অন্যদিকে নাজিমুদ্দিন যখন দেখলেন যে, কিছুতেই জিন্নাহ সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে নির্দেশ প্রদান করছেন না, তখন তিনি সোহরাওয়ার্দীর সাথে তাঁর সমর্থকদের ব্যবধান আর যেন বেড়ে না যায় সে ব্যাপারে প্রভাব খাটাতে থাকেন। ফলে ১৯৪৬ সালের নভেম্বর মাসে সোহরাওয়ার্দী তাঁর মন্ত্রিসভা সম্প্রসারিত করলে এতে অন্যান্যের মধ্যে খাজা-গ্রুপের প্রভাবশালী সদস্য ও প্রাক্তন চীফ হুইপ ফজলুর রহমান অন্তর্ভুক্ত হন। এছাড়া খাজা গ্রুপের অপর এক সদস্য নূরুল আমিনকে স্পীকার নির্বাচিত

করা হয়। ১৩ জন পার্লামেন্টারি সেক্রেটারির মধ্যে অন্তত ৫ জনকে এই গ্রুপ থেকে নেয়া হয়।

সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভা এর ১৫ মাসের শাসনামলে উল্লেখযোগ্য কোন আইনগত বিধান রচনা করতে পারে নি। ভাগচাষী যেন তার ফসলের অর্ধেকের স্থলে দুই-তৃতীয়াংশ লাভ করে এবং জমিতে তার দখলস্বত্ব যেন প্রতিষ্ঠা পায় সে দাবিতে এই সময় বাংলার বিস্তৃত অঞ্চলে শক্তিশালী কৃষক আন্দোলন চলছিল, যা 'তেভাগা আন্দোলন' নামে সুপরিচিত। এ পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রিসভা কর্তৃক বঙ্গীয় আইনসভায় 'বেঙ্গল বর্গাদার (প্রভিশনাল) কন্ট্রোল বিল' নামে একটি বিল উত্থাপন করা হলে লীগের জোতদার সদস্যদের বিরোধিতার কারণে এ বিষয়ে আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় নি।[৭০] বাংলার কৃষক-অসন্তোষের মূলে ছিল জমিদারি প্রথা। ফজলুল হকের প্রথম মন্ত্রিসভার আমলে গঠিত ফ্লাউড কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত করার বিষয়টি ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে আইনসভায় তোলা হলেও বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে তা আইনে পরিণত হতে পারে নি।

আসলে সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভার কার্যকাল ছিল বাংলা ও ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে খুবই ঘটনাবহুল। ভারত থেকে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান, দেশবিভাগ ও পাকিস্তান সৃষ্টিকে কেন্দ্র করে এই অধ্যায়ের রাজনীতি আবর্তিত হয়। বাংলায় ভয়াবহ 'কলকাতা দাঙ্গা' (আগস্ট ১৯৪৬), 'স্বাধীন অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ' এবং 'বঙ্গবিভাগ' হচ্ছে এই সময়কালের প্রধান ঘটনা।

কলকাতায় হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঙালির জীবনে একটি কালো অধ্যায় । সরকারি রেকর্ড অনুযায়ী এ দাঙ্গায় ৪ হাজার লোক নিহত এবং ১০ হাজার লোক আহত হয়[৭১], যদিও বেসরকারি হিসাব মতে এ সংখ্যা বহুগুণ বেশি। সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভা এ দাঙ্গারোধে ব্যর্থ হয় এবং বিশেষকরে হিন্দুদের মধ্যে অনেকে 'স্বয়ং সোহরাওয়ার্দীর' ভূমিকাকে এজন্য দায়ী করে থাকেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবিতে মুসলিম লীগ কর্তৃক ১৬ আগস্ট সারা ভারতে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' পালনকে কেন্দ্র করে এই দাঙ্গা সংঘটিত হয়। ঐ দিন সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভা কর্তৃক বাংলায় সরকারি ছুটি ঘোষণা এবং দাঙ্গা চলাকালে পুলিশ কন্ট্রোলরুমে সোহরাওয়ার্দীর সার্বক্ষণিক উপস্থিতি তাঁর ভূমিকা সম্বন্ধে প্রশ্নের উদ্রেক করে। তিনি পরবর্তীকালে আত্মপক্ষ সমর্থনে বক্তব্য তুলে ধরেন। যাই হোক, ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত না হওয়ায়[৭২] সোহরাওয়ার্দীর সত্যিকার

৭০. Burrows to Mountbatten, 11 April 1947, *GFR*, L/P&J/5/154, 55-57.

৭১. *Secret Report*, 2nd half, August 1946, *GFR*, L/P&J/5/153, 90-91.

৭২. ভারতের চীফ জাস্টিস স্যার প্যাট্রিক স্পীনস্‌কে চেয়ারম্যান করে যদিও একটি তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়েছিল, কিন্তু ভারতবিভক্তি অত্যাসন্ন হয়ে পড়ায় অতঃপর তা বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়।

ভূমিকা হয়তো কোনদিন জানতে পারা যাবে না। তবে এ কথা অস্বীকার করা যাবে না যে, বৃটিশ কেবিনেট মিশন কূটনীতিই এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য প্রধানত দায়ী।[৭৩]

দেশবিভাগের প্রাক্কালে সোহরাওয়ার্দী কর্তৃক শরৎচন্দ্র বসু ও কিরণশঙ্কর রায়কে সঙ্গে নিয়ে 'স্বাধীন অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ * রাজনৈতিকভাবে তাঁর জন্য খুবই ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। এই উদ্যোগ জিন্নাহর দ্বিজাতিতত্ত্বের পরিপন্থী ছিল এবং এর প্রতি বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের খাজা-গ্রুপের কোন সমর্থন ছিল না। তাঁরা ছিলেন জিন্নাহর 'এক পাকিস্তানের' সমর্থক। সোহরাওয়ার্দীর এ উদ্যোগ ব্যর্থ হলে বাংলার বিভক্তি অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ১৯৪৭ সালের ২০ জুন দেশবিভাগ পরিকল্পনার নীতিমালা অনুযায়ী বাংলার হিন্দুপ্রধান এলাকার (পশ্চিম বাংলা) সদস্যগণ পৃথকভাবে মিলিত হয়ে ৫৮-২১ ভোটে প্রদেশবিভাগের পক্ষে রায় দেন, যা ছিল আনুষ্ঠানিকতা মাত্র।

এরপর পাকিস্তানভুক্ত পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক নেতৃত্ব যে খাজাদের হাতে চলে যাবে সেটাই সহজে অনুমেয় ছিল। আনুষ্ঠানিকভাবে বৃটিশদের ক্ষমতা হস্তান্তরের আগেই লীগ হাইকমান্ড পূর্ব বাংলার আইনসভার জন্য পার্লামেন্টারি নেতা নির্বাচন করতে দলীয় সদস্যদের নির্দেশ দেয়। ৫ আগস্ট অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনে খাজা নাজিমুদ্দিন ৭৫-৩৯ ভোটে সোহরাওয়ার্দীকে হারিয়ে তাঁর পরিবর্তে সংসদীয় নেতা নির্বাচিত হন।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, ১৯৩৭-১৯৪৭ কালপর্বে বাংলায় যে চারটি মন্ত্রিসভা ক্ষমতাসীন ছিল সেগুলোর মধ্যে একমাত্র ফজলুল হকের প্রথম মন্ত্রিসভা কতিপয় বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আইন রচনা করতে সক্ষম হয়। অন্যান্য মন্ত্রিসভা একদিকে যেমন স্বল্প সময়ের জন্য ক্ষমতাসীন থাকে, অন্যদিকে তেমনি ক্ষমতায় টিকে থাকতে এবং উদ্ভূত রাজনৈতিক পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে তাদের প্রায় পুরো সময়ই ব্যয় করতে হয়। বাংলার এই পর্বের রাজনীতির প্রধান দিক হচ্ছে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে সৃষ্ট এক ধরনের বিচ্ছিন্নতাবোধ। বাংলায় হিন্দুদের দীর্ঘ সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং রাজনীতিক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও ১৯৩৭ সাল থেকে কার্যত সরকারের বাইরে থাকায় তাদের মধ্যে এই বিচ্ছিন্নতাবোধ সৃষ্টি হয়। বঙ্গীয় মন্ত্রিসভা প্রতিনিধিত্বের প্রেক্ষিতে মুসলিম মন্ত্রিসভার রূপ লাভ করে। বঙ্গীয় রাজনীতিতে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য প্রধান অবলম্বন ছিল তাদের জনসংখ্যা। বাংলার তৎকালীন আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে সর্বক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ মুসলমানদের কল্যাণে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলেই হিন্দুদের কায়েমী স্বার্থ ক্ষুণ্ন হতো। মূলত মন্ত্রিসভাগুলোর সাম্প্রদায়িক চরিত্র, দুই সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক স্বার্থের দ্বন্দ্ব—এ সবকিছু ছাড়িয়ে অসাম্প্রদায়িক ধারায়

৭৩. বিস্তারিত দ্র., Harun-or-Rashid, *Foreshadowing of Bangladesh*, 255-261

* এ সম্বন্ধে লেখকের অপর প্রবন্ধ 'অখণ্ড স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র গঠনের উদ্যোগ'-এ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

সর্বভারতীয় পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় নি, যদিও শেষ মুহূর্তে উভয় সম্প্রদায়ভুক্ত নেতৃত্বের একটি অংশ যৌথভাবে স্বাধীন অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

ফজলুল হক ও সোহরাওয়ার্দী ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনের যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন, তা সফল হলে হয়তো এর একটি ইতিবাচক প্রভাব বাংলার রাজনীতির উপর পড়তো। আসলে ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টি বাংলার জন্য একটি বিকল্প ধারার সম্ভাবনা নিয়ে হাজির হয়েছিল। তা ছিল আর্থ-সামাজিক কর্মসূচিভিত্তিক অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির ধারা। তবে বাঙালি জনগণের সামনে কোন রাষ্ট্রিক ধারণা তুলে ধরতে না পারাটা ছিল এর সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতা। 'বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ' কৃষক প্রজা পার্টির প্রধান রাজনৈতিক কর্মসূচি হলেও ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর ফজলুল হকের পক্ষে ফ্লাউড কমিশন গঠন ব্যতীত এ লক্ষ্যে আর কিছু করা সম্ভব হয় নি। যেহেতু প্রজা-লীগ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার আমলে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, সেহেতু মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দও এর অংশীদার ছিলেন। লীগের সঙ্গে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হবার পর ফজলুল হক বিরোধীদের মোকাবেলা করতে গিয়ে লীগের সাম্প্রদায়িক অবস্থান অনুসরণ করেন। ফলে দুই সম্প্রদায়ের সাধারণ স্বার্থকে সামনে রেখে তাঁর কৃষক প্রজা পার্টির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার আর কোন যৌক্তিকতাই থাকলো না। মুসলিম লীগের রাষ্ট্রিক ধারণা 'পাকিস্তান' অবশেষে সবকিছু অতিক্রম করে গেল।

# ১০

## বঙ্গীয় আইনসভা ও শাসনতান্ত্রিক বিকাশ

সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম*

একটি শাসনতন্ত্রের অধীনে প্রতিনিধিত্বমূলক আইনসভার মাধ্যমে সরকার পরিচালনার ব্যবস্থা বৃটিশ শাসনের একটি অন্যতম ইতিবাচক অবদান। প্রাক-বৃটিশ যুগের সরকার পরিচালিত হতো নবাবের ইচ্ছামাফিক। তবে নবাবের ইচ্ছা স্বেচ্ছাচারিতায় পরিণত হওয়ার অবকাশ ছিল কম, কেননা নবাবের ইচ্ছা হুকুমত অতিক্রম করতে পারতো না। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিধি-নিষেধ এবং সামাজিক প্রথা-প্রতিষ্ঠান নিয়ে গঠিত ছিল হুকুমত, যাকে আমরা সনাতন শাসনতন্ত্র বলে অভিহিত করতে পারি। এই হুকুমত-শাসনতন্ত্রের ভিত্তি যেহেতু ছিল কুরআন-সুন্নাহ, ক্বিয়াস এবং ধর্মশাস্ত্র, সেহেতু এর বিধান ভঙ্গ করা শাসকশ্রেণীর পক্ষে ছিল প্রায় অসম্ভব। এজন্য উপর মহলে সরকার স্বৈরতন্ত্রী থাকা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের অধিকারের রক্ষাকবচ ছিল এই হুকুমত। এই হুকুমত-শাসনতন্ত্রের স্থলে বৃটিশ ব্যবস্থা কায়েম করতে সময় লেগেছিল এক শতকেরও বেশি। এই পরিবর্তনের জন্য নির্মাণ করা হয় প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক ও মানবিক অবকাঠামো—যেমন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, পাশ্চাত্য বিচারব্যবস্থা, পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের লক্ষ্যে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, সভা-সমিতি গঠন ইত্যাদি।

১৭৭২ সালে রেগুলেটিং এ্যাক্ট-এর আওতাধীনে প্রবর্তিত চার সদস্যবিশিষ্ট 'গভর্নর জেনারেল এ্যান্ড কাউন্সিল'কে ধরা যেতে পারে পরবর্তীকালের আইনসভার প্রাথমিক রূপ। আলোচনা এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের ভিত্তিতে কাউন্সিল পাশ করতো রেগুলেশন।[১]

---

* সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. ১৮৩৩ সালে বৃটিশ সার্বভৌমত্ব ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত কোম্পানি সরকারের আইনকে 'রেগুলেশন' বলা হতো।

কাউন্সিলে গভর্নর জেনারেলের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে ১৭৮৪ সালের পীটস ইন্ডিয়া এ্যাক্ট অনুসারে এর নামকরণ করা হয় 'গভর্নর জেনারেল-ইন-কাউন্সিল'। আইন সংক্রান্ত বিষয়ে সাহায্য করার জন্য ১৮৩৩ সালে কাউন্সিলে একজন অতিরিক্ত আইন-সদস্য নিয়োগের বিধান করা হয়।

পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার এবং পাশ্চাত্য ধাঁচে সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠার ফলে ১৮৫০ সাল নাগাদ একটি অধিকারসচেতন তবে বৃটিশ-অনুগত শ্রেণী সৃষ্টি হয়েছিল। ১৮৫১ সালের অক্টোবর মাসে কলকাতায় রাজা রাধাকান্ত দেব ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে গঠিত হয় 'বৃটিশ-ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন'। এই সংগঠনটিই সর্বপ্রথম দেশ শাসনে দেশবাসীর অংশীদারিত্ব দাবি করে। ১৮৫৩ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চার্টার নবায়নের প্রাক্কালে এই সমিতি ৪,৯০০ জনের স্বাক্ষর সম্বলিত একটি দাবিনামা বৃটিশ পার্লামেন্টের বিবেচনার জন্য প্রেরণ করে। ঐ দাবিনামার মধ্যে অন্যতম ছিল বাংলায় একটি প্রতিনিধিত্বমূলক আইনসভা স্থাপন।[২] কিন্তু এই দাবির বিপক্ষে কোম্পানি মহল এমন তদবির চালায় যে পার্লামেন্ট মনে করে, প্রতিনিধিত্বমূলক আইনসভা স্থাপনের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হতে আরো অনেক পথ অতিক্রম করতে হবে।[৩]

১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ উক্ত আইনসভা স্থাপনের প্রক্রিয়া যথেষ্ট ত্বরান্বিত করে। বৃটিশ সরকার অত্যন্ত সন্তোষের সাথে লক্ষ্য করে যে, বাংলায় বিদ্রোহ হয়েছে নামেমাত্র এবং এই বিদ্রোহের বিরুদ্ধে বাংলার জমিদার, শিক্ষিত সমাজ এবং পত্র-পত্রিকাগুলি ছিল সোচ্চার। এর ফলে বাঙালিদের প্রতি বৃটিশ সরকারের আস্থা সৃষ্টি হয় এবং বৃটিশ সরকারের প্রতি এদের সমর্থন যেন অব্যাহত থাকে সেজন্য প্রতিনিধিত্বমূলক আইনসভা প্রতিষ্ঠার জন্য সক্রিয় চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়। পার্লামেন্টেও এর পক্ষে জনমত সৃষ্টি হতে থাকে। পার্লামেন্টের জনৈক সদস্যের ভাষায়, "বাংলার শিক্ষিত সমাজ সিপাহি বিদ্রোহের সময় সরকারকে বিদ্রোহ দমনে যে মূল্যবান সমর্থন দিয়েছে সেটা বিবেচনা করে স্থানীয় পরিষদে তাঁদের প্রতিনিধিত্ব থাকা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি।"[৪] ১৮৬১ সালের মার্চ মাসে ১৪৩৩ জন ভদ্রলোকের স্বাক্ষরযুক্ত একটি স্মারকলিপি পার্লামেন্টে উপস্থাপিত হয়। স্মারকলিপির শিরোনাম ছিল 'Petition from inhabitants and Tax Payers of Calcutta and Bengal Proper'।[৫] এরই জের হিসেবে সেক্রেটারি অব স্টেট ভারত সরকারকে নির্দেশ দেন বাংলায় প্রতিনিধিত্বমূলক আইনসভা স্থাপনের জন্য।[৬] এর ফলে ১৮৬১ সালের ১ আগস্ট ভারতীয় কাউন্সিল আইন ঘোষিত হয়।

২. Biman Bihari Majumdar, *Indian Political Associations and Reforms of Legislature,* (Calcutta 1965), 40; P. N. Sinha Roy, (ed.), *Chronicle of the British Indian Association,* (Calcutta 1965), 9-19.

৩. William Taylor, *Indian Reform-Suggestion For the Consideration of the British Parliament,* (London 1871), 5.

৪. Hansard, *Parliamentary Debates*, Vol. 161, Col. 474.

৫. ঐ, Vol. 162, Col. 1157.

৬. *Parliamentary Papers*, Vol. 43 (1861), No. 307.

## বঙ্গীয় আইনসভার বিকাশ

১৮৬১ সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইনে বঙ্গীয় আইনসভা প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করা হলেও ঐ আইনসভাকে খুব সীমিত আকারে ক্ষমতা প্রদান করা হয়। তাছাড়া ঐ সংস্কার আইনে কোন নির্বাচিত প্রতিনিধি বা যথেষ্ট সংখ্যক বাঙালি সদস্য অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা করা হয় নি। প্রকৃত ক্ষমতা গভর্নর জেনারেলের হাতেই থেকে যায়। তাই ঐ সংস্কার আইন ঘোষণার দুই সপ্তাহ পরেই স্যার চার্লস উড লিখেন, "কলকাতার ইংরেজরা যাদেরকে ঘৃণা করে তাদের প্রতিনিধিত্ব তারা করতে পারে বলে আমার মনে হয় না"।[৭] বলা বাহুল্য, অত্যন্ত করুণ অবস্থায় যাত্রা শুরু করলেও ধীরে ধীরে বঙ্গীয় আইনসভা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। এই প্রবন্ধে, আলোচনার সুবিধার্থে, বঙ্গীয় আইনসভার বিকাশকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে—প্রাথমিক পর্যায়, মধ্যবর্তী পর্যায় ও চূড়ান্ত পর্যায়।

### *প্রাথমিক পর্যায় (১৮৬২-১৯১১)*

১৮৬২ সালের ১ ফেব্রুয়ারি, শনিবার বঙ্গীয় আইনসভার উদ্বোধনী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আইনসভায় লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার জন পিটার গ্রান্ট পদাধিকারবলে সভাপতি এবং বারো জন মনোনীত সদস্য ছিলেন। বারো জন সদস্যের মধ্যে চারজন সরকারি ও চারজন বেসরকারি বিদেশী এবং চারজন বাঙালি ছিলেন। বাঙালিরা হলেন মৌলবি আবদুল লতিফ, রাজা রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র রাজা রামপ্রসাদ রায়, বর্ধমানের জমিদার রাজা প্রতাপচন্দ্র এবং দ্বারকানাথ ঠাকুরের চাচাতো ভাই প্রসন্ন কুমার ঠাকুর। রাজ-অনুগত ব্যক্তি হিসেবে বাঙালি সদস্যবৃন্দ সরকারের ধামাধরার ভূমিকা পালন করেন এবং আইন প্রণয়নে এঁরা সবসময়ই সরকারকে সমর্থন জানান।[৮] ১৮৬২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ১৮৫৯ সালের আইনের দশম ধারার সংশোধনী প্রস্তাব বিল আকারে পেশ করা হয়। ঐ বিলের শিরোনাম ছিল "Fines on Villages for Outrages and Trespasses Committed"। মৌলবি আবদুল লতিফ ছাড়া সকলেই ঐ বিলে সম্মতি দেন। মৌলবি লতিফ তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেন :

> এভাবে সকলকে জরিমানা করার অর্থই হলো, পুলিশ অলস এবং অদক্ষ। এটা জমিদারদের দুর্নীতি করার সুযোগ দেয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। উক্ত বিলে ম্যাজিস্ট্রেটকে চরম ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। কোন জমিদার যদি তার অনুরক্ত তিন-চারজন লোককে দিয়ে ঘোষণা করায় যে কোন বিশেষ গ্রামের বাসিন্দারা জমিদারের ফসল নষ্ট করেছে এবং কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ ছাড়াই ম্যাজিস্ট্রেট যদি সন্তুষ্ট হন, তবে তিনি সেই গ্রামে ১ লক্ষ টাকা জরিমানাও করতে পারেন। ঐ গ্রামের বাসিন্দারা কখনো সেই পরিমাণ টাকা দিতে পারবে না। ম্যাজিস্ট্রেট তখন ইচ্ছা করলে উক্ত গ্রাম সেই জমিদারের কাছে বিক্রি করে দিতে পারেন। এর প্রকৃত অর্থ এই দাঁড়ায় যে, সকল গ্রাম শেষ পর্যন্ত জমিদারদের কবলে চলে যাবে।[৯]

৭. India Office Library, *Wood Papers*, Vol 8, 220-24.
৮. *Proceedings of Bengal Legislative Council*, Vol.I, (29 March 1862), 33, 101-102.
৯. ঐ, ৯৮-৯৯।

কিন্তু গণবিরোধী এই সংশোধনীতে অন্য কেউ এমন বক্তব্য রাখে নি। এটাই স্বাভাবিক। সংশোধনীটি আনা হয় জমিদারদের স্বার্থে। আইনসভায় লতিফ ছাড়া বাকি তিনজনই ছিলেন জমিদার।

বঙ্গীয় আইনসভায় সাধারণ মানুষের স্বার্থের পরিপন্থী বিল পাশ হওয়ার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ বাংলায় বেশ কিছু সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং বিভিন্ন স্বদেশী পত্র-পত্রিকার প্রকাশনা শুরু হয়। উনিশ শতকের ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে রাজনারায়ণ বসুর নেতৃত্বে 'স্বদেশীদের সভা' নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়, যার অন্যতম সদস্য নবগোপাল মিত্র '*জাতীয় পত্রিকা*' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন। ১৮৬৮ সালে যশোর থেকে শিশির কুমার ঘোষ '*অমৃতবাজার পত্রিকা*' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করেন। ঐ একই সময় পাবনাতে 'কর বিদ্রোহ' সংঘটিত হয়। এর তীব্রতা লক্ষ্য করে পাবনার ম্যাজিস্ট্রেট রাজশাহীর কমিশনারকে লিখেন যে, "পাবনা ও বগুড়ার বিভিন্ন গ্রামে বিভিন্ন লিফলেট ছাড়া হয়েছে, যেগুলোতে ভারতে বৃটিশ শাসন অবসানের আহ্বান জানানো হয়েছে।"[১০] শেষ পর্যন্ত ঐ সকল আন্দোলন দমনের লক্ষ্যে বৃটিশ সরকার ১৮৭৬ সালে Dramatic Performances Act এবং ১৮৭৮ সালে Vernacular Press Act ঘোষণা করে সকল প্রকার সরকারবিরোধী বক্তব্য, আন্দোলন ও প্রকাশনা নিষিদ্ধ করে। ঐ দুটি আইনের বিরুদ্ধে সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বাংলায়, যথা ঢাকা, বরিশাল, বগুড়া, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে প্রতিবাদের ধ্বনি উঠে। ১৮৭৮ সালের ১৭ এপ্রিল কলকাতায় এক প্রতিবাদসভা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে বঙ্গীয় আইনসভার কোন সদস্য ঐসব আন্দোলনের প্রতি কোনরকম সমর্থন জানান নি।[১১] ১৮৭০ থেকে ১৮৮০ সালের মধ্যে বঙ্গীয় আইনসভায় বেশ কয়েকজন খ্যাতনামা সদস্য ছিলেন, যেমন সৈয়দ আমির আলি, কৃষ্ণদাস পাল, রামশঙ্কর সেন, ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র, পিয়ারী মোহন মুখার্জী এবং রাজা যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর। ঐ সকল সদস্যের মধ্যে কোন প্রতিবাদী কণ্ঠ শোনা যায় নি। কারণ, প্রথমত, তাঁরা সকলেই ছিলেন সরকারের পছন্দসই মনোনীত সদস্য; দ্বিতীয়ত, তাঁরা সকলেই ছিলেন কলকাতার বাসিন্দা এবং বিত্তশালী; তৃতীয়ত, তাঁরা বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পেয়েছিলেন এবং আরো সুযোগ-সুবিধার আকাঙ্ক্ষী ছিলেন। অপরপক্ষে যাঁরা আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন মফস্বলের বাসিন্দা। দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীব বাড়ি ছিল পূর্ববঙ্গের এক গ্রামে। কৃষ্ণকুমার মিত্র এবং আনন্দ মোহন বসু উভয়ের বাড়ি ছিল ময়মনসিংহে। আইনসভার সদস্যবৃন্দ বৃটিশ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করায় মফস্বলের নতুন নেতৃবৃন্দ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর নেতৃত্বে 'বৃটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন' থেকে বেরিয়ে এসে 'ইন্ডিয়ান

১০. "Circulation of Seditious Papers in Bogra", *Judicial Proceedings*, No. 47 (June 1864).

১১. *সোমপ্রকাশ*, ১২ কার্তিক, ১২৬৯ (অক্টোবর ১৮৬২); প্রদত্ত ভট্টাচার্য, "বিদ্যাসাগর, বাংলার কৃষক এবং মার্কসবাদ", *পরিচয়* (কলকাতা), পূজা সংখ্যা, ১৯৭২, ২৯৯; Monju Chatterjee, "Pabna Peasant Uprising 1873", *Indian Left Review*, (New Delhi), 11· 3 (1973).

এসোসিয়েশন' গঠন করেন।[১২] এই সংগঠন বেশ কয়েকটি জনসভার আয়োজন করে। ১৮৮৩ সালে আনন্দ মোহন বসুর সভাপতিত্বে এই সংস্থার প্রথম অধিবেশন কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। বাংলার বাইরে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও, যেমন বোম্বে ও মাদ্রাজে, এ সময় সরকারবিরোধী বিভিন্ন আন্দোলন দানা বেঁধে উঠে। ফলে বাঙালি জাতীয়তাবাদীরা দেশের অন্যান্য স্থানের জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ১৮৮৫ সালে 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস' প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রথম অধিবেশনেই প্রস্তাব গ্রহণ করে, "কংগ্রেস মনে করে যে, এমন ধরনের সংস্কার হওয়া উচিত যাতে স্থানীয় আইনসভায় বেশ কিছু সংখ্যক ভারতীয় নির্বাচিত সদস্য থাকতে পারে।"[১৩] সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী কলকাতায় তাঁর এক ভাষণে ভবিষ্যৎ বঙ্গীয় আইনসভার একটি খসড়াও প্রণয়ন করেন এবং বলেন যে, উক্ত আইনসভায় নির্দিষ্ট কিছু সংখ্যক সদস্য বিশ্ববিদ্যালয়, মিউনিসিপ্যালিটি, জেলাবোর্ড ও চেম্বার অব কমার্স কর্তৃক নির্বাচিত হবেন। সরকার এ দাবি উপেক্ষা করতে পারে নি। ভারতের ভাইসরয় স্বরাষ্ট্র সচিব এ্যান্টনি ম্যাকডনেলকে বাংলার সম্ভাব্য আইনসভার একটি রূপরেখা প্রণয়নের নির্দেশ দেন। অবশেষে ঐ রূপরেখার ভিত্তিতেই পাশ হয় ১৮৯২ সালের সংস্কার আইন।

১৮৯২ সালের সংস্কার আইনে বঙ্গীয় আইনসভায় তেরো জন সদস্যের পরিবর্তে একুশ জন সদস্য রাখার বিধান করা হয়। এর মধ্যে দশ জন মনোনীত সদস্য। যে সকল সংস্থা মনোনয়ন দানের অধিকার পেলো, তারা হলো কলকাতা কর্পোরেশন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, মিউনিসিপ্যালিটিসমূহ, জেলাবোর্ডসমূহ এবং বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স। মিউনিসিপ্যালিটিসমূহের মধ্যে যেসব মিউনিসিপ্যালিটির আয় ছিল পাঁচ থেকে দশ হাজার টাকার মধ্যে, তাদের ভোটে এক জন এবং যেসব মিউনিসিপ্যালিটির আয় এক লক্ষ টাকার উপরে ছিল, তাদের ভোটে পাঁচ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়। সকল জেলাবোর্ড সমান ভোটে একজন সদস্য সুপারিশ করতে পারতো। অন্যান্য তিনটি সংস্থার প্রত্যেকে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে নির্বাচিত একজন করে সদস্য সুপারিশ করতে পারতো। ১৮৯৩ সালে নবগঠিত বঙ্গীয় আইনসভার সদস্যদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মৌলবি সিরাজুল ইসলাম, মৌলবি আবদুল জাব্বার, ডব্লিউ. সি. ব্যানার্জী, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, লাল মোহন ঘোষ, আনন্দ মোহন বসু, ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, গণেশচন্দ্র এবং নাটোরের জগদীন্দ্রনাথ রায়। ১৮৯৩ থেকে ১৮৯৯ সাল পর্যন্ত বঙ্গীয় আইনসভার সদস্যবৃন্দ বিভিন্ন নীতির প্রশ্নে সমালোচনামুখর ছিলেন না। তবে কোন বৃটিশ ম্যাজিস্ট্রেট বা সৈনিক কোন বাঙালির প্রতি দুর্ব্যবহার করলে অনেকেই বঙ্গীয় আইনসভায় এ ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।[১৪] সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ও আনন্দ মোহন বসু এ ব্যাপারে খুব সোচ্চার

১২. S. N. Banerjee, *A Nation in the Making*, (Calcutta 1925), 85-86
১৩. Anil Seal, *The Emergence of Indian Nationalism*, (Cambridge 1968), 174.
১৪. বর্ধমানের ম্যাজিস্ট্রেট ১৮৯৬ সালে মেমারীতে ভ্রমণে যান, যাওয়ার সময় পথে একটি গরুর গাড়ি সামনে পড়ে। ফলে তাঁকে রাস্তায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। তিনি সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থেকে নেমে ছড়ি দিয়ে ঐ গাড়োয়ানকে বেত্রাঘাত করে রক্তপাত ঘটান। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী বঙ্গীয় আইনসভায় ঐ ঘটনা তুলে ধরেন এবং গভর্নরকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করেন।

ছিলেন। তাই যদিও বঙ্গীয় আইনসভায় তখনো বৃটিশ সরকারের নীতিসমূহের সমালোচনা করা শুরু হয় নি, তথাপি আমলাদের কার্যকলাপের সমালোচনা বৃটিশ সরকারের উপর কিছুটা প্রভাব বিস্তার করে।

১৮৯২ সালের আইনে বঙ্গীয় আইনসভার সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও ঐ আইনে জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের কোন বিধান করা হয় নি। তাই ভারতীয় কংগ্রেস ঐ সংস্থাকে নির্বাচিত সংস্থায় পরিণত করার জন্য আন্দোলন শুরু করে। ১৮৯৫ সালে পুনা কংগ্রেস অধিবেশনে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী এ তথ্যের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, যুক্তরাজ্যের ৪ কোটি অধিবাসীর জন্য পার্লামেন্টে ৬৭০ জন সদস্য রয়েছে আর বাংলায় সাত কোটি লোকের জন্য রয়েছে দশ জন সদস্য।[১৫] তিনি দাবি করেন যে, অর্থসংক্রান্ত বিলের সমালোচনা করার উপর যে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে তা তুলে নিতে হবে। এর কিছুদিন পর ১৮৯৯ সালে কংগ্রেস সভাপতি রমেশচন্দ্র দত্ত লখনৌ অধিবেশনে দাবি জানান যে, বঙ্গীয় আইনসভায় প্রত্যেক জেলা থেকে একজন নির্বাচিত প্রতিনিধি থাকতে হবে। বাংলার মতো ভারতের অন্যান্য স্থানের নেতৃবৃন্দও প্রত্যেক রাজ্যে প্রতিনিধিত্বশীল আইনসভার দাবি উত্থাপন করেন। মহারাষ্ট্রে দাবি উত্থাপন করেন বাল গঙ্গাধর তিলক আর পাঞ্জাবে লালা রাজপত রায়। ১৯০৪ সালে কংগ্রেসের বোম্বে অধিবেশনে পুনরায় প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইনসভাকে বর্ধিত করার দাবি জানানো হয়। এছাড়া, ১৯০৩ থেকে ১৯০৫ সালের মধ্যে বৃটিশ অফিসার ও ব্যবসায়ীদের অত্যাচারের বিবরণ তুলে ধরার জন্য বাংলায় প্রায় দুই হাজার জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।[১৬] ঠিক ঐ সময়ে কয়েকটি রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটে। প্রথমত, বৃটিশ সরকার শাসনতান্ত্রিক সুবিধার কথা উল্লেখ করে ১৯০৫ সালে বাংলাকে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলায় বিভক্ত করেন। বাংলার হিন্দুদের মধ্যে এটা মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। দ্বিতীয়ত, যুক্তরাজ্যে লিবারেল দল ক্ষমতায় আসে এবং জন মোর্লি ভারতের নতুন সেক্রেটারি অব স্টেট নিযুক্ত হন। তৃতীয়ত, ১৯০৬ সালে ঢাকার নবাবের নেতৃত্বে একটি নতুন দল সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের জন্ম হয়। পরিশেষে, বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন চলাকালীন সময়ে বাংলার মুসলিম নেতা সৈয়দ আমির আলি লর্ড মোর্লির কাছে ভারতের মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনের দাবি জানান। লর্ড মোর্লি অবশ্য ইতিমধ্যেই ভারতে এক নতুন সংস্কার আইন ঘোষণা করতে মনস্থির করেছিলেন। তিনি বঙ্গীয় সরকারকে এ ব্যাপারে একটি সুপারিশমালা পেশ করার নির্দেশ দেন। লর্ড মিন্টোর সুপারিশমালায় বঙ্গীয় আইনসভার কাঠামোতে মোট সাঁইত্রিশ জন সদস্য রাখার সুপারিশ করা হয়। তাঁদের মধ্যে বাইশ জন মনোনীত এবং চৌদ্দ জন নির্বাচিত সদস্য হবেন বলে উল্লেখ করা হয় (সারণি ১)।

কিন্তু এই সুপারিশমালায় মুসলমানদের জন্য কোন পৃথক সদস্যসংখ্যার কথা উল্লেখ করা হয় নি। ফলে এই সুপারিশমালা সরকারের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় নি। ১৯০৮ সালের অক্টোবর মাসে ভারতীয় বৃটিশ সরকার বঙ্গীয় আইনসভাকে নিম্নরূপে গঠনের সুপারিশ করে (সারণি ২) :

১৫. A. C. Banerjee, *Indian Constitutional Document*, Vol. 1, (Calcutta 1945).

১৬. ঐ।

## সারণি ১ : ১৯০৮ সালে লর্ড মিন্টো কর্তৃক সুপারিশকৃত বঙ্গীয় আইনসভার কাঠামো

| মনোনীত সদস্য | নির্বাচিত সদস্য | সর্বমোট সদস্য |
|---|---|---|
| ২২ জন<br>১৮ জন সরকারি অফিসার<br>৩ জন স্বার্থগোষ্ঠী ও তফসিলী প্রতিনিধি | ১৪ জন<br>১ জন কলকাতা কর্পোরেশন<br>৭ জন মিউনিসিপ্যালিটি ও জেলাবোর্ডসমূহ<br>২ জন ভূস্বামীশ্রেণী<br>১ জন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়<br>১ জন চেম্বার অব কমার্স<br>১ জন কলকাতা ব্যবসায়ী সমিতি<br>১ জন ভারতীয় ব্যবসায়ী সমিতি | ৩৭ জন<br>৩৬ জন মনোনীত ও নির্বাচিত সদস্য+ লেফটেন্যান্ট গভর্নর |

উৎস : Government of India, *Papers Relating to The Constitutional Reform in India,* Vol, II, (1908), 557.

## সারণি ২ : ১৯০৮ সালে ভারতীয় বৃটিশ সরকার কর্তৃক সুপারিশকৃত বঙ্গীয় আইনসভার কাঠামো

| মনোনীত সদস্য | নির্বাচিত সদস্য | সর্বমোট সদস্য |
|---|---|---|
| ২৬ জন<br>২৩ জন সরকারি অফিসার<br>৩ জন বিশেষ স্বার্থগোষ্ঠী ও তফসিলী প্রতিনিধি | ১৯ জন<br>১ জন কলকাতা কর্পোরেশন<br>৪ জন মিউনিসিপ্যালিটিসমূহ<br>৪ জন জেলাবোর্ডসমূহ<br>৪ জন ভূস্বামীশ্রেণী<br>১ জন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়<br>১ জন চেম্বার অব কমার্স<br>১ জন কলকাতা ব্যবসায়ী সমিতি<br>১ জন ভারতীয় ব্যবসায়ী সমিতি<br>২ জন মুসলিম সদস্য | ৪৬ জন<br>৪৬ জন মনোনীত ও নির্বাচিত+লেফটেন্যান্ট গভর্নর |

উৎস : সারণি ১-এর উৎস দ্র.।

উপরোক্ত সুপারিশমালার পরিপ্রেক্ষিতে লর্ড মোর্লি ১৯০৮ সালের ডিসেম্বর মাসে বৃটিশ পার্লামেন্টে ভারতের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভার একটি রূপরেখা পেশ করেন। এই রূপরেখায় আইনসভার সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি, নির্বাচনের ব্যবস্থা এবং অর্থসংক্রান্ত বিলের উপর নিষেধাজ্ঞা রহিত করার সুপারিশ করা হয়। সকল প্রস্তাব বিবেচনা করে ১৯০৯ সালের ২৫ মে বৃটিশ পার্লামেন্টে একটি সংস্কার আইন পাশ হয়।[১৭] এই সংস্কার আইনের বিধান অনুযায়ী ভারতীয় বৃটিশ সরকার ১৯০৯ সালের ১৫ ডিসেম্বর বঙ্গীয় আইনসভার নতুন কাঠামো ঘোষণা করে। উক্ত কাঠামোতে ১৭ জন সরকারি অফিসার ও ৩১ জন বেসরকারি সদস্যের বিধান করা হয়। বলাবাহুল্য, যদিও সুপারিশকৃত বঙ্গীয় আইনসভায় বেসরকারি সদস্য সংখ্যাগরিষ্ঠ করা হয়, তথাপি কংগ্রেসের মধ্যে যাঁরা চরমপন্থী ছিলেন তাঁরা নতুন সংস্কার আইনকে প্রত্যাখ্যান করেন, কারণ এ আইনে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের কোন বিধান করা হয় নি।[১৮] অন্যদিকে, মধ্যপন্থীরা যতোক্ষণ পর্যন্ত বঙ্গভঙ্গ রহিত করা না হয় ততোক্ষণ পর্যন্ত আইনসভায় অংশগ্রহণে অসম্মতি জানান। এমন অবস্থায় ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রহিত করা হয় এবং বাংলার দায়িত্ব গভর্নরের পরিষদকে দেয়া হয়। বিহার ও উড়িষ্যাকে পৃথক প্রদেশ ঘোষণা করা হয় এবং ঐ দুটি রাজ্যে পৃথক আইনসভা গঠনের ব্যবস্থা করা হয়। ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করা হয়।[১৯]

*মধ্যবর্তী পর্যায় (১৯১২-১৯৩৪)*

১৯১৩ সালের ১৮ জানুয়ারি নবগঠিত বঙ্গীয় আইনসভার উদ্বোধনী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। গভর্নর কারমাইকেল তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, "আইনসভার সদস্য হিসেবে জনগণের মঙ্গল সাধন করবো—এটাই হবে আমাদের সকলের লক্ষ্য।"[২০] কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে বঙ্গীয় আইনসভার উদ্বোধনের এক বছরের মধ্যেই বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ শুরু হয়। বৃটিশ সরকার সেই যুদ্ধে লিপ্ত হয়। অনেক চরমপন্থী ধারণা করেছিল যে, এই সময়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের পতন ঘটতে পারে। বৃটিশ সরকার সত্যিকারভাবেই ঐ সময়ে বেকায়দায় ছিল। ফলে সব ধরনের বিরোধী আন্দোলন দমন করার জন্য সরকার ভারতীয় প্রতিরক্ষা আইনে হাজার হাজার তরুণ বিপ্লবীকে আটক করে। ঐ সময় মধ্যপন্থীরাও এক সঙ্কটে পতিত হয়। কারণ একদিকে তারা বৃটিশ সরকারকে সহযোগিতা প্রদান করছিল, অন্যদিকে বঙ্গীয় আইনসভায় সকল রাজবন্দির মুক্তির দাবি জানাচ্ছিল। চরমপন্থীদের সমর্থক চট্টগ্রাম বিভাগের অখিলচন্দ্র দত্ত বঙ্গীয় আইনসভায় সরকারের সমালোচনা করে

১৭. ঐ, ২য় খণ্ড,২৪৫-২৪৬।
১৮. ঐ।
১৯. C.H. Philips (ed.), *The Evolution of India and Pakistan . Selected Documents*, (London 1965), 169
২০. *Proceedings of the Bengal Legislative Council*, January 18, 1913, 3.

বলেন, "আমরা এখানে সকল নির্যাতনকে সমর্থন দেবার জন্যই বসি।"[২১] কিন্তু কর্তৃপক্ষ এসবে কর্ণপাত করে নি এবং সমস্যা সমাধানের চেষ্টাও করে নি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে রাজনৈতিক সঙ্কট নিরসনকল্পে ভারতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ ১৯১৬ সালে লখনৌতে একটি যৌথ সম্মেলনে মিলিত হয় এবং একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। ঐ চুক্তিতে দাবি করা হয়, প্রত্যেক প্রাদেশিক আইনসভায় চার-পঞ্চমাংশ নির্বাচিত এবং এক-পঞ্চমাংশ মনোনীত সদস্য থাকতে হবে; বড় প্রদেশগুলোর আইনসভায় কমপক্ষে একশো পঁচিশটি আসন এবং অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র প্রদেশের আইনসভায় পঞ্চাশ থেকে পঁচাত্তরটি আসন থাকবে; আইনসভার সদস্যবৃন্দ জনগণের সাধারণ ভোটে নির্বাচিত হবেন এবং সংখ্যালঘিষ্ঠদের জন্য পৃথকভাবে নির্ধারিত সংখ্যক আসন থাকবে; বাংলার আইনসভায় শতকরা ৪০টি মুসলিম আসন সংরক্ষিত থাকবে; ঐ আইনসভার অর্থসংক্রান্ত বিষয়সহ সকল বিষয়ে পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকতে হবে। এভাবে একদিকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের আন্দোলন, অন্যদিকে বিশ্বযুদ্ধের চাপ ঔপনিবেশিক সরকারকে বিব্রত করে তুললো। এমতাবস্থায় ১৯১৭ সালের ৩০ জুলাই ভারতের সেক্রেটারি অব স্টেট বৃটিশ মন্ত্রিসভার নিকট এক তারবার্তায় ভারতের জন্য কোন নতুন পদক্ষেপ গ্রহণের আবেদন জানান। ভারতের ভাইসরয় চেমসফোর্ড এবং সেক্রেটারি অব স্টেট মন্টেগুর যৌথ প্রচেষ্টায় ১৯১৭ সালের ২০ আগস্ট একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। ঐ রিপোর্ট অনুযায়ী পার্লামেন্টে একটি সংস্কার আইন পাশ হয় এবং ১৯১৯ সালের ২৩ ডিসেম্বর মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার প্রস্তাব রাজার অনুমতি পায় এবং তা আইনে পরিণত হয়।

১৯১৯ সালের আইনে ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে দ্বৈতশাসনব্যবস্থা (Dyarchy) চালু করা হয় এবং ঐ ব্যবস্থা অনুযায়ী প্রাদেশিক বিষয়গুলোকে 'রক্ষিত' ও 'হস্তান্তরিত'—এ দু'ভাগে ভাগ করা হয়। রক্ষিত বিষয়গুলোর দায়িত্ব ঐ সকল মন্ত্রীকে দেয়া হয়, যাঁরা প্রাদেশিক গভর্নরের কাছে দায়ী থাকবেন। আর হস্তান্তরিত বিষয়গুলো, যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার, ঐ সকল মন্ত্রীর হাতে দেয়া হয়, যাঁরা আইনসভার কাছে দায়ী থাকবেন। বঙ্গীয় আইনসভায় জনগণের সাধারণ ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধির সংখ্যা ১১৪ জন করা হয়। আইনসভার ক্ষমতাও বর্ধিত করা হয়, তবে কর নির্ধারণ ও সরকারি ঋণ প্রভৃতি বিষয়ে গভর্নরের পূর্বসম্মতি প্রয়োজন হবে বলে উল্লেখ করা হয়। প্রাদেশিক গভর্নরকে যেকোন বিলে ভেটো প্রদানের ক্ষমতা প্রদান করা হয়। তাই উক্ত আইনে সর্বতোভাবে দায়িত্বশীল ও প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের বিধান করা হয় নি। বিভিন্ন দাবিদাওয়া পূরণ হওয়া সত্ত্বেও ১৯১৯ সালের আইন বাস্তবায়ন করা কঠিন হলো, কারণ ঐ সময় মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে সারা ভারতে অসহযোগ আন্দোলন ও মুসলিম লীগের নেতৃত্বে খেলাফত আন্দোলন শুরু হয়।[২২] ১৯২০ সালে নির্বাচন ঠিকই অনুষ্ঠিত হয়, তবে তাতে প্রায় শতকরা ৮০ জন ভোটার ভোটদানে বিরত থাকে।[২৩] নির্বাচনের পর বাংলার তদানীন্তন

২১. ঐ, মার্চ ২৪, ১৯১৭।

২২. Philips, *Evolution of India and Pakistan*

২৩. ঐ।

গভর্নর রোনাল্ডসে তাঁর নির্বাহী পরিষদের ৪ জন সদস্য এবং রক্ষিত বিষয়ের জন্য ৩ জন মন্ত্রী নিয়োগ করেন। হস্তান্তরিত বিষয়ের মধ্যে রাজনৈতিক (পুলিশ) বিষয় ও অর্থমন্ত্রণালয় দেয়া হয় যথাক্রমে হুইলার এবং কেরিকে, ভূমি মন্ত্রণালয় দেয়া হয় বি. সি. মাহতাবকে, বিচার মন্ত্রণালয় দেয়া হয় স্যার আবদুর রহিমকে, স্থানীয় শাসন ও জনস্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় দেয়া হয় সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীকে, শিক্ষামন্ত্রণালয় দেয়া হয় প্রভাষচন্দ্র মিত্রকে এবং কৃষি মন্ত্রণালয় দেয়া হয় সৈয়দ নবাব আলি চৌধুরীকে।[২৪]

বঙ্গীয় আইনসভার অধিবেশন শুরু হলে অন্যতম সদস্য কিশোরী মোহন মজুমদার নির্বাহী পরিষদের সদস্যসংখ্যা ৪ জন থেকে কমিয়ে ২ জন করার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এ. কে. ফজলুল হক ঐ প্রস্তাব সমর্থন করেন। ইউরোপীয় এবং ভারতীয় মন্ত্রীরা ঐ প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেও প্রস্তাবটির পক্ষে ৭৪ ভোট পড়ে। কয়েক দিন পর ১৯২১ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি আইনসভায় একটি প্রস্তাব উত্থাপিত হয় যে, "আগামী বছর থেকে দার্জিলিংয়ে সরকার স্থানান্তরের বাৎসরিক যে প্রক্রিয়া চলে তা বন্ধ করতে হবে।"[২৫] এ প্রস্তাবটির পক্ষেও তেপান্নটি ভোট পড়ে। এ ধরনের ছোটখাটো প্রস্তাব ছাড়াও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বঙ্গীয় আইনসভায় প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। ১৯২১ সালের মে মাসে আসামের চা-বাগানের বেশ কয়েক জন শ্রমিক পলায়ন করে এবং কুমিল্লার চাঁদপুরে গিয়ে আশ্রয় নেয়। কিন্তু চা-বাগানের মালিকবৃন্দ চাঁদপুরে সেসব শ্রমিকের উপর নির্যাতন চালায়। চট্টগ্রাম বার সমিতির নেতা জে. এন. সেনগুপ্ত এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন। বঙ্গীয় আইনসভায়ও এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করা হলে স্যার হেনরি হুইলার বিষয়টি ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করেন।[২৬] কিন্তু কেবল চাঁদপুর নয়, ১৯২২ সালে পুলিশ ও জেলা কর্তৃপক্ষ ফরিদপুরের জেলে রাজবন্দিদের উপর অত্যাচার চালালে এ. কে. ফজলুল হক বঙ্গীয় আইনসভায় তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন।[২৭] চিত্তরঞ্জন দাসের পুত্র চিররঞ্জন দাসের সঙ্গে জেলে অন্তরীণ সময়ে যে দুর্ব্যবহার করা হয়, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী তার সমালোচনা করেন। কিন্তু বৃটিশ সরকার এসব সমালোচনায় কর্ণপাত না করে বাংলার অন্যান্য স্থানে অত্যাচারের স্টিম রোলার চালায়। পুলিশ রংপুরের নীলফামারীতে অসহযোগ আন্দোলন সমর্থনকারী বহু স্বেচ্ছাসেবীকে নির্যাতন করে। বঙ্গীয় আইনসভায় ঐসব ঘটনার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। এমনকি হুইলার নিজে আইনসভায় স্বীকার করেন যে, "সরকারকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হচ্ছে, কারণ রংপুর, রাজশাহী, নোয়াখালী, ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ, মেদিনীপুর, বাকেরগঞ্জ, বীরভূম ও চট্টগ্রামের জনগণ চৌকিদারি কর দিচ্ছে না।"[২৮] ঠিক ঐ সময়ে ১৯২১ সালের ১৭ নভেম্বর ওয়েল্সের রাজকুমার বোম্বেতে অবতরণ করেন এবং সেদিন সমগ্র কলকাতায় হরতাল পালিত হয়। ফলে সরকার ১৯ নভেম্বর

২৪. *Proceedings of the Bengal Legislative Council,* Vol. 1 (1921), 1-2.
২৫. ঐ, ফেব্রুয়ারি ৮ (১৯২১), ১০৫।
২৬. ঐ, জুলাই ৮ (১৯২১), ১৬৫।
২৭. ঐ, জানুয়ারি ১৯ (১৯২২)।
২৮. ঐ, ফেব্রুয়ারি ২০ (১৯২২)।

সকল জনসভা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু তাতে আন্দোলন স্তব্ধ করা সম্ভব হয় নি। ১৯২২ সালে কংগ্রেসের গয়া সম্মেলনে চিত্তরঞ্জন দাস এই মর্মে প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে, কংগ্রেস বঙ্গীয় আইনসভার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে, তবে সকল দাবিদাওয়া পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আইনসভাকে অচল করে রাখা হবে।[২৯] মতিলাল নেহেরু ঐ প্রস্তাব সমর্থন করলেও অনেকেই ঐ প্রস্তাবে সাড়া দিলেন না। প্রস্তাবটির পক্ষে জোর সমর্থন না পাওয়ায় চিত্তরঞ্জন দাস দলত্যাগের ঘোষণা দিলেন এবং 'স্বরাজ পার্টি' গঠনের হুমকি দিলেন। কেন্দ্রীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে তাঁর প্রস্তাবের পক্ষে সমর্থন পাওয়া না গেলেও বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন পেলেন। চিত্তরঞ্জন দাস অনেক মুসলমান নেতাকেও প্রভাবিত করলেন এবং আইনসভায় মুসলমানদের জন্য পৃথক সংখ্যক আসনের প্রতিশ্রুতি দিলেন। এরই ফলে ১৯২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে 'বেঙ্গল প্যাক্ট' (Bengal Pact) স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিতে বলা হয় যে, যেখানে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে শতকরা ৬০টি হিন্দু আসন এবং ৪০টি মুসলিম আসন থাকবে; আর যেখানে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে শতকরা ৬০টি মুসলিম আসন ও ৪০টি হিন্দু আসন থাকবে। এমনকি ১৯২৪ সালের জুন মাসে সিরাজগঞ্জে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্মেলনে বেঙ্গল প্যাক্ট দলের অধিকাংশ সদস্যের সমর্থন পায়।[৩০] ১৯২৩ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে স্বরাজ পার্টি নির্বাচনী ঘোষণাপত্রে সকল রাজবন্দির মুক্তির প্রতিশ্রুতি দেয়। ফলে ১৯২৩ সালের নির্বাচনে স্বরাজ পার্টি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে (সারণি ৩)।

**সারণি ৩ : ১৯২৩ সালের নির্বাচনের ফলাফল**

| দলের নাম | নির্বাচিত প্রার্থীর সংখ্যা |
|---|---|
| স্বরাজ পার্টি | ৪২ |
| কংগ্রেস | ২৯ |
| স্বতন্ত্র | ২৫ |
| ইউরোপীয় | ১৮ |
| মোট | ১১৪ |

উৎস : *The Statesman*, (Calcutta), December 1, 1923.

১৯২৪ সালের ২৪ জানুয়ারি বঙ্গীয় আইনসভার প্রথম অধিবেশনেই সকল রাজবন্দির মুক্তির প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। সোহরাওয়ার্দী ও শরৎ বসু (সুভাষ বসুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) ঐ প্রস্তাব সমর্থন করেন। স্বরাজ পার্টির সকল সদস্য এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীগণ ঐ প্রস্তাব সমর্থন

২৯ C R.Das, "Statement on Civil Disobedience Enquiry Committee", *Indian Annual Register*, Vol I (1923).

৩০. আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, (ঢাকা ১৯৭০), ৫৫।

করেন। বঙ্গীয় আইনসভায় স্বরাজ পার্টি এর দ্বিতীয় পদক্ষেপ হিসেবে গভর্নর কর্তৃক তাঁর পরিষদে তিন জন ভারতীয় মন্ত্রী নিয়োগের ব্যাপারে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে। লর্ড লিটন ইতিমধ্যেই এ. কে. ফজলুল হক, এ. কে. গজনবী ও সুরেন্দ্রনাথ মল্লিককে নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ১৯২৪ সালের মার্চ মাসে মন্ত্রীদের বেতন, শিক্ষা-ইন্সপেক্টর ও মেডিকেল বিভাগ সংক্রান্ত সরকারি বিলের বিরুদ্ধে স্বরাজ পার্টির সদস্যবৃন্দ ভোটদান করেন।[৩১] লর্ড লিটন ক্ষুব্ধ হয়ে শিক্ষা বিভাগ ও মেডিক্যাল বিভাগ বন্ধের হুমকি দেন। কিন্তু স্বরাজ নেতা ইতিমধ্যে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। নতুন মিউনিসিপ্যাল আইনের অধীনে কলকাতা কর্পোরেশনের প্রথম নির্বাচনে তিনি মেয়র এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হন। ১৯২৪ সালের ২৬ আগস্ট সরকার মন্ত্রীদের বেতন সংক্রান্ত বিলটি আবার আইনসভায় পেশ করে। বিলটি ৬৮-৬৬ ভোটে নাকচ হয়ে যায়। ফলে লর্ড ক্ষুব্ধ হয়ে বঙ্গীয় আইনসভার অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবি ঘোষণা করেন।[৩২]

১৯২৫ সালের জানুয়ারি মাসে আবার বঙ্গীয় আইনসভার অধিবেশন বসে। গভর্নর Bengal Ordinance-এ সংশোধন এনে Criminal Law Amendment Bill পাশ করার উদ্যোগ নিলে বঙ্গীয় আইনসভায় চিত্তরঞ্জন দাস ঐ বিলের ঘোর বিরোধী মতামত ব্যক্ত করেন। ফজলুল হকও এই বিলের বিপক্ষে মতামত প্রদান করেন। দুদিন পর ভোটাভুটি হলে বিলের বিপক্ষে ৬৯টি ভোট এবং পক্ষে ৬৩টি ভোট পড়ে।[৩৩] লর্ড লিটন অসন্তুষ্ট হয়ে আবার আইনসভার অধিবেশন মুলতবি ঘোষণা করেন। ঐ বছরই ১৬ জুন চিত্তরঞ্জন দাস দার্জিলিং-এ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। ১৯২৫ সালে বাংলার বিভিন্ন স্থানে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের দাবিতে কৃষক আন্দোলন চলছিল। চিত্তরঞ্জন দাসের মৃত্যুর পর সরকার বঙ্গীয় আইনসভায় কৃষক আন্দোলনের দাবির সমর্থনে একটি Tenancy Amendment Bill-এর প্রস্তাব উত্থাপন করে। কিন্তু জমিদার সদস্যবৃন্দ এবং এমনকি স্বরাজ পার্টির অনেকে ঐ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। ফলে অল্পকাল পরেই ১৯২৬ সালে যখন পুনরায় বঙ্গীয় আইনসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তখন স্বরাজ পার্টি পরাজিত হয়। গভর্নর আবদুল করিম গজনবী ও ব্যোমকেশ চক্রবর্তীকে নিয়ে মন্ত্রিপরিষদ গঠন করেন। ঐ মন্ত্রিপরিষদ 'গাজা-চক্র' মন্ত্রিপরিষদ নামে পরিচিত ছিল।[৩৪] কৃষকদের দাবি পূরণ না হওয়ায় তখনো তাদের আন্দোলন চলছিল। ১৯২৭ সালে বরিশালের ফুলকাঠিতে কৃষকদের একটি মিছিলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মি. ব্ল্যান্ডির আদেশে পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। ফলে সকলেই গাজা-চক্র মন্ত্রিপরিষদের পদত্যাগ দাবি করে। ঐ বছর ২৫ আগস্ট ডঃ বি. সি. রায় ঐ মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনেন। ঐ অনাস্থা প্রস্তাব গজনবীর বিরুদ্ধে

৩১. *Proceedings of the Bengal Legislative Council,* August 26, (1924).

৩২. ঐ।

৩৩. ঐ, জানুয়ারি ২৫ (১৯২৫)।

৩৪. আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর,* ৫৬।

৬৬-৬২ ভোটে এবং চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে ৬৮-৫৭ ভোটে পাশ হয়। এরপর অধিবেশন মুলতবি ঘোষণা করা হয়।[৩৫] ২৬ আগস্ট গজনবী ও চক্রবর্তী পদত্যাগপত্র দাখিল করেন। কয়েক দিনের মধ্যে গভর্নর মোশারফ হোসেন ও পি. সি. মিত্রকে নিয়ে মন্ত্রিপরিষদ গঠন করেন। কিন্তু ঐ মন্ত্রিপরিষদ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নি।

ভারতের সাংবিধানিক সমস্যা নিরসনকল্পে ১৯২৭ সালে বৃটিশ সরকার জন সাইমনের নেতৃত্বে ভারতে একটি কমিশন প্রেরণ করে। কিন্তু স্বরাজ পার্টির সমর্থকগণ ঐ কমিশনকে প্রত্যাখ্যান করেন এবং সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করেন। বৃটিশ সরকার বঙ্গীয় আইনসভায় স্বরাজ পার্টিভুক্ত সকল বিরোধী সদস্যকে প্রভাবিত করে এবং সাইমন কমিশনের সঙ্গে সহযোগিতার প্রস্তাব পাশ করিয়ে নেয়। স্বরাজ পার্টি নেতা ডঃ বি. সি. রায় এমন প্রচেষ্টার তীব্র সমালোচনা করেন। ১৯২৮ সালের ৩১ জুলাই সাইমন কমিশনকে লক্ষ্য করে বঙ্গীয় আইনসভায় স্যার আবদুর রহিম সাত দফা সম্বলিত একটি প্রস্তাব রাখেন। এগুলো হলো— (১) বৃটিশ কমনওয়েলথের অধীনে ভারতকে স্বায়ত্তশাসিত ডোমিনিয়ন মর্যাদা দিতে হবে; (২) স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ নিয়ে ভারতে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠন করতে হবে; (৩) দ্বৈতশাসনব্যবস্থার অবসান করে পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার চালু করতে হবে; (৪) সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকার দিতে হবে; (৫) আইনসভায় যথেষ্ট সংখ্যক নির্বাচিত প্রতিনিধি থাকতে হবে; (৬) সরকারি অফিসে নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতার যথাযথ মর্যাদা দিতে হবে; এবং (৭) অতি শীঘ্র সকল দাবি পূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।[৩৬] আবদুর রহিমের প্রস্তাবকে যশোরের কৃষকনেতা নওশের আলী এবং কুমিল্লার কৃষকনেতা আসিমুদ্দিন আহম্মেদ স্বাগত জানান। ঐ প্রস্তাব বঙ্গীয় আইনসভায় সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হয়।

১৯২৮ সালের ৭ আগস্ট বঙ্গীয় আইনসভায় ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী পি. সি. মিত্র জমিদারদেরকে আরো ক্ষমতা দিয়ে Bengal Tenancy (Amendment) Bill উত্থাপন করেন। অধিকাংশ জমিদার সদস্যের ঐ বিলে সমর্থন থাকলেও অনেকেই, যেমন ফজলুল হক, নওশের আলী, আসিমুদ্দিন আহম্মেদ, আশরাফ আলী খান চৌধুরী এবং শামসুর রহমান ঐ বিলের তীব্র সমালোচনা করেন। আইনসভার অন্যতম সদস্য যোগেশচন্দ্র চক্রবর্তী ঐ বিলের একটি সংশোধনী এনে 'প্রকৃত মালিকের' সংজ্ঞা দেন।[৩৭] মুক্তাগাছার জমিদার মহারাজা শশীকান্ত আচার্য ঐ সংশোধনী প্রস্তাবের সমালোচনা করেন। বিলটি শেষ পর্যন্ত ৭৩-৪৬ ভোটে পাশ হয়। একই দিনে আজিজুল হক সংশোধনী প্রস্তাব আনেন যে, সকল

৩৫. *Proceedings of the Bengal Legislative Council*, August 25, (1927), 261, *Indian Quarterly Register* Vol. II (July-December 1972), 380.

৩৬. *Proceedings of the Bengal Legislative Council*, July 31 (1928), 45.

৩৭. ঐ, আগস্ট ১৩ (১৯২৮), ১২১।

বর্গাদারকে আইনগত অধিকার দিতে হবে।[৩৮] ১৪ আগস্ট কংগ্রেসসদস্য অমরেন্দ্রনাথ ঐ বিলের ৫ নং ধারায় 'চাকর এবং শ্রমিক'-এর মধ্যে 'বর্গাদার' এবং 'ভাগীদার' সংযুক্ত করার সংশোধনী প্রস্তাব আনেন, কিন্তু প্রস্তাবটি নাকচ হয়ে যায়। ঐ বছরই সেপ্টেম্বর মাসে আসিমুদ্দিন আহম্মেদ 'সালামি' প্রথার বিরুদ্ধে প্রস্তাব আনেন যে, কোন সালামি গ্রহণ করা চলবে না। কিন্তু মাত্র ২২ জন ঐ প্রস্তাব সমর্থন করেন। পঁচাত্তর জন ঐ প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেন।[৩৯] এসব ঘটনার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ কংগ্রেসের কয়েকজন মুসলিম সদস্য, যেমন মওলানা আকরম খাঁ, সৈয়দ নওশের আলী, এ. কে. ফজলুল হক, তমিজুদ্দিন খান, শামসুদ্দিন আহমেদ এবং আরো অনেকে কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসেন।[৪০]

বঙ্গীয় আইনসভার অবস্থা যখন এমন চরম সঙ্কটাপন্ন, তখন সমগ্র ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতিও উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল। ঠিক ঐ সময়ে অর্থাৎ ১৯৩০ সালে মহাত্মা গান্ধী সমগ্র ভারতে 'আইন অমান্য আন্দোলন'-এর ডাক দেন। ঐ আন্দোলনে সাড়া দিয়ে হাজার হাজার বাঙালিকে কারাবরণ করতে হয়। এদিকে ১৯৩০ সালের জুন মাসে সাইমন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। কিন্তু সমগ্র ভারতবাসী ঐ রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করে। ঐ বছরের আগস্ট মাসে বঙ্গীয় আইনসভায় সাইমন কমিশনের রিপোর্ট আলোচিত হয় এবং জে. এন. সেনগুপ্ত, আবদুস সামাদ, এস. এন. বসু প্রমুখ ঐ রিপোর্টের তীব্র সমালোচনা করেন। ঐসব সমালোচনার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে সরকার বঙ্গীয় আইনসভায় Bengal Criminal Law Amendment Bill পাশ করাতে উদ্যোগী হয়। ফলে সমগ্র বাংলায় বিরূপ প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। ১৯৩১ সালের ২৬ জানুয়ারি স্বাধীনতা দিবস পালিত হয় এবং জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয়।[৪১] অবস্থা চরমে পৌঁছলে ভারতের ভাইসরয় লর্ড আরউইন মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে বসে একটি সমঝোতায় উপনীত হন (গান্ধী-আরউইন চুক্তি)। গান্ধী আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করার প্রতিশ্রুতি দিলেন আর আরউইন প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, সকল রাজবন্দিকে মুক্তি দেয়া হবে।[৪২] ১৯৩৩-৩৪ সালে প্রায় দশ হাজার বাঙালিকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং অনেককে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে নির্বাসন দেয়া হয়। ১৯৩৪ সালের এপ্রিল মাসে মহাত্মা গান্ধী আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত ঘোষণা করেন। ইতিমধ্যে বৃটিশ সরকার ভারতে অধিকতর দায়িত্বশীল স্বায়ত্তশাসিত সরকার প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে একটি নতুন সংস্কার আইন ঘোষণার পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

৩৮. ঐ, আগস্ট ১৪ (১৯২৮), ১৬৩।

৩৯. ঐ, সেপ্টেম্বর ৪ (১৯২৮), ৯২৭।

৪০. আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, ৬১।

৪১. Gautam Chattopadhyay, *Bengal Electoral Politics and Freedom Struggle*, (New Delhi : Indian Council of Historical Research, 1984), 123.

৪২. B. P. Sitaramayya, *History of the Indian National Congress*, (New Delhi 1969), 436.

*চূড়ান্ত পর্যায় (১৯৩৫-৪৭)*

১৯৩৫ সালে এক নতুন ভারতীয় আইন ঘোষণা করা হয়। ঐ আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল—(১) ভারত একটি যুক্তরাষ্ট্র হবে এবং (২) প্রদেশগুলোর প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন থাকবে। ঐ আইনে আরো বলা হয় যে, ১৯৩৭ সালের ১ এপ্রিল থেকে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন কার্যকরী হবে। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে এ. কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে একটি নতুন দল 'কৃষক প্রজা পার্টি' গঠিত হয়। নির্বাচনী প্রচারণায় কৃষক প্রজা পার্টি ১৪ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে। ঐ সকল কর্মসূচির মধ্যে অন্যতম ছিল জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ, বিনা বেতনে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, বাংলায় পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা এবং সকল রাজবন্দির মুক্তি।[৪৩] ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে প্রধানত ৩টি দল—কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও কৃষক প্রজা পার্টি অংশগ্রহণ করে। উক্ত নির্বাচনে কংগ্রেস একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে ব্যর্থ হয় (সারণি ৪)।

**সারণি ৪ ঃ ১৯৩৭ সালে বঙ্গীয় আইনসভার নির্বাচনের ফলাফল**

| দল | নির্বাচিত প্রার্থীর সংখ্যা |
|---|---|
| কংগ্রেস | ৬০ |
| মুসলিম লীগ | ৪০ |
| কৃষক প্রজা পার্টি | ৩৫ |
| স্বতন্ত্র মুসলমান | ৪১ |
| স্বতন্ত্র হিন্দু | ১৪ |
| স্বতন্ত্র তফসিলী সম্প্রদায় | ২৩ |
| ইউরোপীয় | ২৫ |
| এ্যাংলো ইন্ডিয়ান | ৪ |
| মোট | ২৪২ |

উৎস : *Indian Annual Register*, Vol 1, 1937, 59-60.

নির্বাচনের পর স্বতন্ত্র মুসলমান সদস্যদের মধ্যে কয়েকজন মুসলিম লীগে ও কয়েকজন কৃষক প্রজা পার্টিতে যোগ দেন। ফলে মুসলিম লীগের আসনসংখ্যা দাঁড়ায়

৪৩. আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর* , ১১১।

৬০টি এবং কৃষক প্রজা পার্টির আসনসংখ্যা দাঁড়ায় ৫৮টি। নির্বাচনের পর মুসলিম লীগ ও কৃষক প্রজা পার্টি যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠন করে। লীগের পক্ষ থেকে মন্ত্রিত্ব পেলেন খাজা নাজিমুদ্দিন, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, নবাব খাজা হাবিবুল্লাহ এবং নবাব মোশারফ হোসেন। কৃষক প্রজা পার্টির পক্ষ থেকে মন্ত্রিত্ব পেলেন এ. কে. ফজলুল হক এবং সৈয়দ নওশের আলী। স্বতন্ত্র হিন্দুদের মধ্য থেকে নলিনীরঞ্জন সরকার, শিরিশচন্দ্র চক্রবর্তী, বি. পি. সিংহ রায় এবং তফসিলীদের মধ্য থেকে প্রসন্ন দেব রাইকাত ও মুকুন্দবিহারী মল্লিক মন্ত্রিত্ব পেলেন। এ. কে. ফজলুল হক হলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে ১৯৩৭ সালের ৯ আগস্ট যুক্তফ্রন্ট সরকার বঙ্গীয় আইনসভায় সকল রাজবন্দির মুক্তির প্রস্তাব উত্থাপন করে। ১৯৩৭ সালের শেষ নাগাদ অধিকাংশ রাজবন্দি মুক্তি পায়। দ্বিতীয় পদক্ষেপ হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক জমিদারি প্রথার উচ্ছেদকল্পে ১৯৩৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে Bengal Tenancy (Amendment) Act Bill উত্থাপন করেন। বিলটি বিপুল ভোটে পাশ হয়। কিন্তু গভর্নর জমিদারদের মানসিকতা লক্ষ্য করে বিলটি স্বাক্ষর করতে কিছুটা সময় নেন। ফলে ১৯৩৮ সালের আগস্ট মাসে মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়, কিন্তু ১৩০-১১১ ভোটে অনাস্থা প্রস্তাব বাতিল হয়।[৪৪] ১৯৩৮ সালেই গভর্নর উক্ত বিলে স্বাক্ষর প্রদান করেন। হক মন্ত্রিসভা কয়েকটি কৃতিত্ব অর্জন করে। প্রথমত, ভূমিরাজস্ব কমিশন গঠন করে সারা বাংলায় জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ করা হয়। দ্বিতীয়ত, Money Lenders Act বলবৎ করে অর্থঋণ প্রদানকারীদের ক্ষমতা খর্ব করা হয়।

উপরোক্ত কৃতিত্ব সত্ত্বেও হক মন্ত্রিসভা শান্তিপূর্ণভাবে শাসন পরিচালনা করতে পারে নি। ১৯৩৯ সালে বিশ্বব্যাপী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঘনঘটা দেখা দেয়। যুদ্ধ শুরু হলে বৃটিশ সরকার সকল প্রদেশের মন্ত্রিসভা ও আইনসভার সদস্যদের সমর্থন লাভের চেষ্টা করে। ফজলুল হক ব্যক্তিগতভাবে এ ব্যাপারে খুব উৎসাহী না হলেও ১৯৩৯ সালে War Resolution প্রস্তাব বঙ্গীয় আইনসভায় ১৪২-৮২ ভোটে পাশ হয়ে যায়। ঐ প্রস্তাবে বলা হয় যে, বঙ্গীয় সরকার ভারতীয় সরকারকে যুদ্ধকালীন সময়ে পূর্ণ সহযোগিতা দেবে।[৪৫] যুদ্ধের অবস্থা মারাত্মক আকার ধারণ করলে বৃটিশ সরকার শঙ্কিত হয়, কারণ ভারতে তখন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। এমন অবস্থায় ১৯৪২ সালে বৃটিশ সরকার স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্‌কে ভারতে পাঠায়।

ক্রিপস্ ভারতীয়দের কাছে একটি যুদ্ধোত্তর প্রস্তাব রাখেন। ঐ প্রস্তাবে বলা হয় যে, যুদ্ধ চলাকালীন প্রতিরক্ষা নিয়ন্ত্রণ ছাড়া সরকারি সকল বিষয়ে ভারতীয়দের যতদূর সম্ভব অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হবে আর যুদ্ধের পর ভারতকে ডোমিনিয়নের মর্যাদা দেয়া হবে।

---

৪৪. ঐ, ১৭২।

৪৫. *Proceedings of the Bengal Legislative Council*, December 18 (1939).

কিন্তু কংগ্রেস কর্তৃক ক্রিপস্ প্রস্তাব সর্বতোভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়। ১৯৪২ সালের এপ্রিলে যুদ্ধ ভারতের দ্বারপ্রান্তে এসে উপস্থিত হয়। চট্টগ্রামে বেশ কয়েকটি যুদ্ধবোমা বিস্ফোরিত হয়। ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে বঙ্গীয় আইনসভায় সকল রাজবন্দির অবিলম্বে মুক্তি দাবি করে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। কিন্তু বৃটিশ সরকার এতে কর্ণপাত করলো না। এদিকে ১৯৪৩ সালে সারা বাংলায় ঘূর্ণিঝড়ের কারণে চরম দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। কিন্তু বৃটিশ সরকার এই দুর্ভিক্ষে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করলো। কোনরকম সাহায্যসামগ্রী পাঠানো হলো না।[৪৬] মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক বঙ্গীয় আইনসভায় বৃটিশ সরকারের কার্যকলাপের সমালোচনা করেন এবং উল্লেখ করেন যে, যেসব স্থানে পুলিশ অত্যাচার চালিয়েছে সেসব স্থানে তদন্ত হওয়া উচিত। গভর্নর স্যার জন হার্বার্ট ফজলুল হকের বক্তৃতায় খুব ক্ষুব্ধ হলেন এবং তাঁকে গভর্নর হাউজে ডেকে পাঠালেন। প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী গভর্নর ফজলুল হককে পদত্যাগপত্রে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেন।[৪৭] ফলে স্পীকার সৈয়দ নওশের আলী আইনসভার সভা স্থগিত ঘোষণা করেন। ১৯৪৩ সালের ২৪ এপ্রিল গভর্নর খাজা নাজিমুদ্দিনকে প্রভাবিত করে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। কিন্তু এতে সঙ্কট নিরসন করা সম্ভব হলো না। খাদ্যসঙ্কট চরম আকার ধারণ করলো। নবনিযুক্ত ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল নিজে ২০, ডিসেম্বর ঢাকায় আসেন এবং স্বচক্ষে বাংলার দুর্ভিক্ষ দেখেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ইংল্যান্ডে তারবার্তা পাঠালেন। এর এক মাস আগেই তিনি ভারতের সেক্রেটারি অব স্টেট এমেরীর কাছে এক তারবার্তায় বাংলায় গভর্নরের শাসন জারির সুপারিশ করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, "বাংলার রাজনীতি খুব তিক্ত মনে হচ্ছে। সম্ভবত ক্যাসিকে ৯৩ ধারা জারি করতে হবে।"[৪৮] সত্যি সত্যিই বাংলার গভর্নর ক্যাসি ১৯৪৫ সালের ৩১ মার্চ ৯৩ ধারা অনুযায়ী বঙ্গীয় আইনসভা বাতিল ঘোষণা করেন এবং সারা বাংলায় গভর্নরের শাসন জারি করেন।

১৯৪৫ সালেই একদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি, অন্যদিকে ইংল্যান্ডে ক্ষমতাসীন কনজার্ভেটিভ দলের পতন ঘটে। ইংল্যান্ডে প্রধানমন্ত্রী এটলীর নেতৃত্বে লেবার দল ক্ষমতায় আসে। নতুন সরকার ভারতের সঙ্কট নিরসনে একটি মন্ত্রিমিশন পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯৪৬ সালে পুনরায় বঙ্গীয় আইনসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে মুসলিম লীগ, কৃষক প্রজা পার্টি, কংগ্রেস ও সি. পি. আই. (ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি) অংশগ্রহণ করে। নির্বাচনে মুসলিম লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করে, কংগ্রেস ৮৬ টি আসন লাভ করে (সারণি ৫)।

৪৬. জি. গোস্বামী, *বাঙ্গালীর হাদীঘাট তমলুক*, (মেদিনীপুর ১৯৭৩)।

৪৭. *Proceedings of the Bengal Legislative Council*, March 27 (1943).

৪৮. Casey, *Personal Experience, 1939-46*, (London 1962), 216-17.

**সারণি ৫ : ১৯৪৬ সালে বঙ্গীয় আইনসভার নির্বাচনের ফলাফল**

| দল | নির্বাচিত প্রার্থীর সংখ্যা |
|---|---|
| মুসলিম লীগ | ১১৪ |
| কংগ্রেস | ৮৬ |
| কৃষক প্রজা পার্টি | ৩ |
| স্বতন্ত্র তফসিলী | ২ |
| স্বতন্ত্র মুসলিম | ৩ |
| স্বতন্ত্র হিন্দু | ৪ |
| ভারতীয় খৃস্টান | ২ |
| ইউরোপীয় | ২৩ |
| সি. পি. আই. | ৩ |
| মোট | ২৪০ |

উৎস : *The Statesman* (Calcutta), April 2, 1946.

১৯৪৬ সালের ২৩ এপ্রিল হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে বাংলায় মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। ইতিমধ্যেই মন্ত্রিমিশন ভারতে উপস্থিত হয়েছিল। ঐ বছর ১৬ মে মন্ত্রিমিশন ভারতকে তিনটি গ্রুপে বিভক্ত করে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা ঘোষণা করে। কিন্তু ঐ পরিকল্পনাও সকল ভারতীয়ের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় নি।[৪৯] কংগ্রেস তখন পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত ছিল। মুসলিম লীগ ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করছিল। ঐ সময় বৃটিশ সরকার লর্ড ওয়াভেলের স্থলে লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে ভারতের ভাইসরয় নিয়োগ করে। ১৯৪৭ সালের ৩ জুন নবনিযুক্ত ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন শীঘ্রই ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। ১৯৪৭ সালের ১০ জুন বঙ্গীয় আইনসভা শেষবারের জন্য অধিবেশনে বসে এবং ১২৬-৯০ ভোটে মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনাকে সমর্থন জানায়। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গীয় আইনসভারও যবনিকাপাত ঘটে।

## বঙ্গীয় আইনসভার কার্যপ্রণালী

বিশ্বের অন্য যেকোন আইনসভার মতো বঙ্গীয় আইনসভার প্রধান কাজ ছিল আইন প্রণয়ন করা। প্রথম থেকেই এ লক্ষ্যে বিধিমালা অনুসরণ করা হয়। অবশ্য বিভিন্ন সময়ে

৪৯. Stanley Wolpert, *A New History of India*, (New York 1982).

প্রাথমিক বিধিমালায় সংশোধন আনা হয়। ১৮৮৯ সালে বিধিমালায় সংশোধনী আনার লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়। ১৮৯০ সালের ১৮ জানুয়ারি এ কমিটি রিপোর্ট দাখিল করে। সর্বসম্মতি না থাকলেও ঐ রিপোর্ট বঙ্গীয় আইনসভায় অনুমোদিত হয়। ঐ বিধিমালা সংসদীয় গণতন্ত্রের বিধি অনুযায়ী নির্দেশিত হয়েছিল।

বঙ্গীয় আইনসভার বিধি অনুযায়ী ১৯২০ সাল পর্যন্ত লেফটেন্যান্ট গভর্নর (পরে গভর্নর) বঙ্গীয় আইনসভার অধিবেশন আহ্বান ও অধিবেশনে সভাপতিত্ব করতেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে এ্যাডভোকেট জেনারেল বা নির্বাহী পরিষদের একজন উচ্চপদস্থ সদস্য সভাপতিত্ব করতেন। ১৯২০ সালে মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কারের পর ঐ নীতিমালাতে কিছু পরিবর্তন সাধন করা হয়। এর পর থেকে বঙ্গীয় আইনসভায় সভাপতিত্ব করার জন্য একজন পৃথক সভাপতি বা স্পীকারের বিধান করা হয়। অবশ্য বিধি অনুযায়ী গভর্নর যখনই প্রয়োজন মনে করতেন তখনই অধিবেশন আহ্বান করতে পারতেন। তবে বছরে অন্তত একটি অধিবেশন অবশ্যই বসতে হতো। প্রথমদিকে সাধারণত শনিবার ১১টায় অধিবেশন বসতো; তবে ১৯১২ সালে বিধান করা হয় যে, এক দিনের জন্য হলে বুধবার, দুই দিনের জন্য হলে মঙ্গলবার এবং দীর্ঘদিনের জন্য হলে সোমবার বঙ্গীয় আইনসভার অধিবেশন বসবে।[৫০] বঙ্গীয় আইনসভার অধিবেশন প্রথমদিকে খুব ঘন ঘন বসতো, তবে ক্রমান্বয়ে তা কমে আসে। যেমন, প্রথম বছর বঙ্গীয় আইনসভার ১৯টি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়, অথচ ১৯৪৭ সালে বসে একটি বা দুটি অধিবেশন ।

আইনসভার অনুমতিক্রমে বিল উত্থাপন করা হতো। যে সদস্য বিল উত্থাপন করতেন তাঁকে প্রথমে বিলের উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করতে হতো। কোন সদস্য একটি বিলে একবারই বক্তব্য পেশ করতে পারতেন। কেবল কোন সদস্য সংশোধনী প্রস্তাব আনলে বিতর্কের সময় জবাব দেবার সুযোগ পেতেন। প্রথমদিকে আইনসভায় নিজ মতামত প্রকাশ করতে সদস্যের জন্য কোন সময়সীমা নির্দিষ্ট করা ছিল না। পরে প্রত্যেক সদস্যের জন্য সময়সীমা পনেরো মিনিট ধার্য কবা হয়। সময়সীমা অতিক্রান্ত হলেই ঘণ্টা বেজে উঠতো। অবশ্য সরকারি অফিসারের ক্ষেত্রে সময়সীমা নির্ধারিত ছিল না। বিলের উত্থাপক সদস্যকে আধঘণ্টা সময় দেয়া হতো। প্রথমে বেসরকারি সদস্য বক্তব্য পেশ করতেন, পরে সরকারি সদস্য বক্তব্য রাখতেন। সাধারণত ইংরেজিতে বক্তব্য পেশ করতে হতো।[৫১]

৫০. ঐ সকল বিধিমালা ১৮৬২ সালের ২৫ জানুয়ারি গভর্নর জেনারেল অব ইন্ডিয়া-ইন- কাউন্সিলের অনুমোদন পায়। Notification No. 1932, dated 25-12-1912 (Published in the *Calcutta Gazette*, December 25,1912, part-V), 145.

৫১. S. N Banerjee, *A Nation in the Making*, (Calcutta 1925), 130.

প্রত্যেকটি বিল বিস্তারিতভাবে আলোচিত হতো। আইনে পরিণত হওয়ার জন্য প্রত্যেকটি বিলকে কয়েকটি স্তর অতিক্রম করতে হতো। যেকোন বিল উত্থাপনের পর বিলের দায়িত্বে নিয়োজিত সদস্য নীচের যেকোন একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রস্তাব পেশ করতেন—(১) বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো উচিত, (২) পরবর্তী কোনদিন বিলটি আলোচিত হওয়া উচিত, (৩) সকল সদস্যের মতামত যাচাইয়ের জন্য বিলটি সবার মধ্যে বিতরণ করা উচিত। সাধারণত সকল বিলই সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো হতো। সিলেক্ট কমিটি প্রধানত সমান সংখ্যক সরকারি ও বেসরকারি সদস্য নিয়ে গঠিত হতো। বিল উত্থাপক সিলেক্ট কমিটির সদস্যদের নাম প্রস্তাব করতে পারতেন। সাধারণত এ্যাডভোকেট জেনারেল সব কমিটিতেই থাকতেন। বিলের দায়িত্বে নিয়োজিত সদস্য সিলেক্ট কমিটিতে সভাপতিত্ব করতেন।

বঙ্গীয় আইনসভায় আরও কয়েকটি কমিটি ছিল, যেগুলো বিশেষ বিষয় সংক্রান্ত বিলের দায়িত্ব পালন করতো। যেমন, রাজস্ব কমিটি। প্রতি বছর ৫ জানুয়ারি রাজস্ব কমিটি গঠন করা হতো। ঐ কমিটি বারো জন সদস্য নিয়ে গঠিত হতো। তাঁদের মধ্যে ছয় জনকে গভর্নর মনোনীত করতেন এবং অবশিষ্ট ছয় জন সদস্য বঙ্গীয় আইনসভার বেসরকারি সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হতেন। প্রত্যেক সদস্যের ছয়টি ভোট ছিল। প্রত্যেক সদস্য পৃথক পৃথক ব্যক্তিকে বা যেকোন এক জনকে ছয়টি ভোট দিতে পারতেন। রাজস্ব কমিটির প্রধান কাজ ছিল প্রদেশের আয়-ব্যয়ের বাৎসরিক হিসাব তৈরি করা। কমিটিকে ২৮ জানুয়ারির মধ্যে রিপোর্ট পেশ করতে হতো, কিন্তু খসড়া রিপোর্ট ১৮ জানুয়ারির মধ্যে জমা দিতে হতো। ফলে মাত্র দশ দিন পর্যবেক্ষণ করার সময় পাওয়া যেতো। রাজস্ব বিল উত্থাপক সদস্য পদাধিকারবলে রাজস্ব কমিটির সভাপতি থাকতেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে রাজস্ব বিলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হতো। কিন্তু সমান সমান ভোট প্রদত্ত হলে সভাপতি নিষ্পত্তি ভোট দিতে পারতেন। রাজস্ব কমিটি ছিল একটি ক্ষণস্থায়ী কমিটি।

বৃটিশ পার্লামেন্টের মডেল অনুসরণ করে বঙ্গীয় আইনসভায় আরেকটি কমিটি 'Committee of the Whole House'-এর বিধান করা হয়। আইনসভার সকল সদস্যই এই কমিটির সদস্য ছিলেন। আইনসভার বিধিমালার মতো নয়, বরং অনানুষ্ঠানিকভাবে সকল সদস্য বসে আইনগত ব্যাপারে আলোচনা করতেন। কলকাতা মিউনিসিপ্যাল বিল পাশের ক্ষেত্রে ঐ কমিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। 'স্ট্যান্ডিং কমিটি' নামেও বঙ্গীয় আইনসভার একটি কমিটি ছিল। যদি আইনসভা সংক্রান্ত কোন বিধি-নিষেধ পরিবর্তনের প্রস্তাব থাকতো, তবে তা ঐ কমিটির কাছে পাঠিয়ে দেয়া হতো। ঐ কমিটির প্রধান লক্ষ্য ছিল আইনসভায় উন্নতমানের বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন করা।

সকল কমিটি পর্যায়, বিশেষত সিলেক্ট কমিটি অতিক্রম করার পর আইনসভায় কমিটির রিপোর্ট বিস্তারিতভাবে আলোচিত হতো। যেকোন বিল সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে পাশ হতো। প্রয়োজন হলে ভোট গ্রহণ করা হতো। বিল আইনসভায় পাশ হলে গভর্নরের কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হতো। গভর্নর বিলে ইচ্ছানুযায়ী সম্মতি বা অসম্মতি জ্ঞাপন করতে পারতেন। গভর্নরের সম্মতি পেলে বিলটি আইনে পরিণত হতো।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উনিশ শতকের ষাটের দশকে শাসক ও শাসিত উভয়ের প্রয়োজনেই বঙ্গীয় আইনসভার যাত্রা শুরু। প্রথম পঞ্চাশ-ষাট বছর প্রতিষ্ঠানটি মূলত উচ্চশ্রেণী ও বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থই পূরণ করেছিল। বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীর মূল লক্ষ্য ছিল ঔপনিবেশিক শাসনের ভিত্তি সুদৃঢ় করা আর জমিদারদের লক্ষ্য ছিল সমাজে তাদের কর্তৃত্ব আরো সুদৃঢ় করা। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ইংরেজি শিক্ষায় নব্যশিক্ষিত ব্যক্তিরাও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা লাভ করেছিল। আইনসভার লক্ষ্য সাধারণ জনগণ ছিল না। সাধারণ জনগণও এর অস্তিত্ব সম্পর্কে সঠিকভাবে অবহিত ছিল না। এমনকি, সদস্যদের স্বার্থের পরিপন্থী কোন বিল উত্থাপিত হলে জোর বাধা সৃষ্টি করা হতো। তাই একবার স্যার জর্জ ক্যাম্পবেল বঙ্গীয় আইনসভায় বলেন, "এই আইনসভায় এমন কোন ভদ্রলোক নেই যাকে সত্যিকার অর্থে জনপ্রতিনিধি বলে বিবেচনা করা যায়।" কিন্তু কালক্রমে সাধারণ নির্বাচন চালু হওয়ার পর বঙ্গীয় আইনসভার সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং এসকল সদস্য আংশিকভাবে হলেও জনপ্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেছিলেন। আইনসভাকে পূর্ণ জনপ্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকার করে না নিলেও এই প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। এই প্রতিষ্ঠানের যাঁরা সদস্য ছিলেন তাঁরা গুণ ও মর্যাদার দিক থেকে অনেক উন্নতমানের ছিলেন। অনেক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় আইনসভার চেয়েও বঙ্গীয় আইনসভা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। বঙ্গীয় আইনসভা প্রতিষ্ঠার পরেই ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে আইনসভা প্রবর্তিত হয়। বঙ্গীয় আইনসভাই ভারতে সংসদীয় গণতন্ত্রের সূচনা করে। আইনসভায় তর্ক-বিতর্ক, প্রশ্নোত্তর এবং অন্যান্য সংসদীয় ব্যবস্থার প্রথাসমূহ ভারতের সাংবিধানিক ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় সংযোজন করেছিল। বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসক শুরুতেই সম্ভবত বঙ্গীয় আইনসভার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে নি। এই শাসকগোষ্ঠী প্রাকৃতিক বিবর্তনকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে নি। বঙ্গীয় আইনসভায় অনুসৃত বিধিব্যবস্থাগুলো এখনো অনুসরণ করা হয়। ভারতীয় শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে বঙ্গীয় আইনসভার অবদান অনস্বীকার্য, কারণ এই প্রতিষ্ঠান কেবল ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছিল তাই নয়, বরং বর্তমানে ভারতীয় উপমহাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের যেসমস্ত বিধিমালা অনুসরণ করা হয় সেগুলোরও অগ্রদূত ছিল বঙ্গীয় আইনসভা।

## পরিশিষ্ট

### বঙ্গীয় আইনসভার শেষ নির্বাচনে (১৯৪৬) নির্বাচিত সদস্যদের তালিকা

ডঃ আবদুল আহাদ (সাতক্ষীরা)
মওলানা মোঃ আবদুল আজিজ (পূর্ব নারায়ণগঞ্জ)
আবদুল আজিজ মুন্সী (পূর্ব মাদারীপুর)
মির্জা আবদুল হাফিজ (পশ্চিম টাঙ্গাইল)
মওলানা আবদুল হাই (দক্ষিণ নোয়াখালী)
আবদুল হাকিম মিঞা (পশ্চিম নোয়াখালী)
মোঃ আবদুল হাকিম বিক্রমপুরী (মুন্সীগঞ্জ)
মোঃ আবদুল হাকিম মোল্লা (পশ্চিম নদীয়া)
আবদুল হামিদ (দক্ষিণ রাজশাহী)
এ.এম. আবদুল হামিদ (পশ্চিম পাবনা)
আবদুল হান্নান (মেহেরপুর)
আবদুল করিম (উত্তর জামালপুর)
মৌলবি আবদুল খালেক (দক্ষিণ ঢাকা)
ফকির আবদুল মান্নান (উত্তর ঢাকা)
আবদুল মোমিন (ত্রিপুরা কেন্দ্র)
মওলানা আবদুল্লাহিল বাকী (পূর্ব দিনাজপুর)
এ. এফ. এম. আবদুর রহমান (উত্তর-পূর্ব ২৪ পরগনা)
আবদুর রহমান খান (নুরু মিয়া) (উত্তর পটুয়াখালী)
আবদুর রশিদ মাহমুদ (দক্ষিণ সিরাজগঞ্জ)
মওলানা আবদুর রশিদ খন্দকার (সিরাজগঞ্জ)
সৈয়দ আবদুর রউফ (পূর্ব যশোর)
আবদুস সবুর খান (খুলনা)
মোঃ আবদুস সালাম (মতলববাজার)
মৌলবি আবিদুর রেজা চৌধুরী (পশ্চিম চাঁদপুর)
আবুল হাশিম (বর্ধমান)
আবুল কালাম শামসুদ্দিন (পশ্চিম ময়মনসিংহ)
কাজী আবুল মাসুদ (নাটোর)
আবুল কাশেম (হুগলী)

সিতাংশু কান্ত আচার্য (ঢাকা, জমিদার)
অমূল্যচন্দ্র অধিকারী (পূর্ব ময়মনসিংহ)
মীর আলী আহম্মদ (জামালপুর-মুক্তাগাছা)
আহম্মেদ আলী মৃধা (গোয়ালন্দ)
আহম্মেদ হাশেম (গাইবান্ধা দক্ষিণ)
আহম্মেদ কবির চৌধুরী (চট্টগ্রাম দক্ষিণ)
মৌলবি আকবর আলী (নেত্রকোণা উত্তর)
আলী আহম্মেদ চৌধুরী (চট্টগ্রাম দক্ষিণ)
আলী আহম্মেদ খান (ব্রাহ্মণবাড়িয়া দক্ষিণ)
বেগম আনোয়ারা খাতুন (ঢাকা, মুসলিম)
আরিফ চৌধুরী (ধনুমিয়া) (বাকেরগঞ্জ উত্তর)
আসান আলী মোক্তার (নেত্রকোণা দক্ষিণ)
আওলাদ হোসেন খান (মানিকগঞ্জ পূর্ব)
সৈয়দ আজিজুর রহমান (ভোলা দক্ষিণ)
মোঃ বদিউজ্জামান (বগুড়া পূর্ব)
বাফাতুদ্দিন তালুকদার (জামালপুর পশ্চিম)
প্রমথনাথ ব্যানার্জী (মেদিনীপুর দক্ষিণ-পশ্চিম)
গোবিন্দলাল ব্যানার্জী (খুলনা)
শিবনাথ ব্যানার্জী (হাওড়া, কারখানা প্রতিনিধি)
সুশীলকুমার ব্যানার্জী (হাওড়া)
ডঃ সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জী (কলকাতা, কারখানা প্রতিনিধি)
হরেণ চন্দ্র বর্মণ (বগুড়া—পাবনা)
মোহিনী মোহন বর্মণ (জলপাইগুড়ি—শিলিগুড়ি)
দ্বারকানাথ বারুরী (ফরিদপুর)
হেমন্ত কুমার বসু (কলকাতা উত্তর)
জ্যোতি বসু (রেলওয়ে শ্রমিকসঙ্ঘ প্রতিনিধি)
চারুচন্দ্র ভান্ডারী (২৪ পরগনা উত্তর-পশ্চিম)
গণেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য (ঢাকা পূর্ব)
সুনেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (ঢাকা পশ্চিম)
শ্যামাপদ ভট্টাচার্য (মুর্শিদাবাদ)
বীর বীর্য (মালদহ)

ডাঃ ভোলানাথ বিশ্বাস (যশোর)
গয়ানাথ বিশ্বাস (ময়মনসিংহ পশ্চিম)
সতীশচন্দ্র বসু (কলকাতা দক্ষিণ)
রতন লাল ব্রাহ্মণ (দার্জিলিং সদর)
বিনোদচন্দ্র চক্রবর্তী (ময়মনসিংহ পশ্চিম)
সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী (প্রেসিডেন্সি বিভাগ)
হরিপদ চ্যাটার্জী (নদীয়া)
মিহির লাল চট্টোপাধ্যায় (বীরভূম)
আনন্দ প্রসাদ চৌধুরী (ঝড়গ্রাম, ঘাটাল)
ই. ই. করস্টোর ফাইন (ভারতীয় চা-সমিতি)
বীণা দাস (কলকাতা, কেন্দ্রীয়)
ব্রজমাধব দাস (রংপুর)
যোগেন্দ্রচন্দ্র দাস (ত্রিপুরা)
রাধানাথ দাস (হুগলী উত্তর-পূর্ব)
যুগেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত (জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি)
সুরেন্দ্র দাসগুপ্ত (বগুড়া—পাবনা)
কানাইলাল দেব (বর্ধমান— কেন্দ্রীয়)
ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ( ত্রিপুরা)
কানাইলাল দে (বাঁকুড়া—পশ্চিম)
মনোরঞ্জন ধর (উত্তর বাংলা মিউনিসিপ্যাল)
হরেন্দ্রনাথ দলুই (ঝাড়গ্রাম-ঘাটাল)
ডি. আই. ডাফ (ভারতীয় পাটকল সমিতি)
সুকুমার দত্ত (হুগলী দক্ষিণ-পশ্চিম)
নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার (ব্যারাকপুর, কারখানা প্রতিনিধি)
মৌলবি ইব্রাহিম খাঁ (টাঙ্গাইল উত্তর)
ইমাদুদ্দিন আহম্মদ (রংপুর দক্ষিণ)
ইস্কান্দার আলী খান (মাদারীপুর পশ্চিম)
এ. জে. এমেরী (প্রেসিডেন্সি বিভাগ, ইউরোপীয়)
ফরিদ আহম্মদ চৌধুরী (চট্টগ্রাম উত্তর-পূর্ব)
এ. কে. ফজলুল হক (বাকেরগঞ্জ দক্ষিণ)
ফজলুল করিম (রামগঞ্জ, রায়পুর)

ফজলুল কাদির (চট্টগ্রাম উত্তর)
ফজলুর রহমান (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)
ফজলুর রহমান (জামালপুর পূর্ব)
ফজলুর রহমান (নোয়াখালী উত্তর)
এফ. ডব্লিউ. ফিক্স (কলকাতা ব্যবসায়ী সমিতি)
বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী (২৪ পরগনা, মিউনিসিপ্যাল)
অরবিন্দ গায়েন (হাওড়া)
এ. কে. ঘোষ (বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স)
বিমল কুমার ঘোষ (বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স)
শূন্য (কলকাতা পূর্ব)
হরেণচন্দ্র ঘোষ চৌধুরী (নোয়াখালী)
ডি. গোমেজ (কলকাতা-প্রেসিডেন্সি বিভাগ)
আর. এ. গোমেজ (ঢাকা বিভাগ)
প্রতাপচন্দ্র রায় (ফরিদপুর)
জে. সি. গুপ্ত (কলকাতা দক্ষিণ)
মনোরঞ্জন গুপ্ত (বাকেরগঞ্জ উত্তর-পূর্ব)
ডেম্বার সিং গুরুং (দার্জিলিং)
সৈয়দ হাবিবুল হক (কিশোরগঞ্জ উত্তর)
হাফিজুদ্দিন চৌধুরী (ঠাকুরগাঁও)
কুবেরচন্দ্র হালদার (মুর্শিদাবাদ)
হামিদুদ্দিন আহম্মেদ (কিশোরগঞ্জ পূর্ব)
হাসান আলি (দিনাজপুর, পশ্চিম)
হাতেম আলী খান সাহেব (পিরোজপুর দক্ষিণ)
আর. হেউড (বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স)
হুসনে আরা বেগম (কলকাতা, মুসলিম)
ই. এ. হাচিসন (কলকাতা উপশহর)
ইলিয়াস আলী মোল্লা (২৪ পরগনা কেন্দ্র)
এম. এ. এইচ. ইস্পাহানী (মুসলিম চেম্বার অব কমার্স)
ঈশ্বর দাস জালাল (কলকাতা পশ্চিম)
জসিমুদ্দিন আহম্মেদ (২৪ পরগনা দক্ষিণ)
জনাব আলি মিঞা (চাঁদপুর পূর্ব)

কবির আহম্মেদ চৌধুরী (কক্সবাজার)
সাহেবজাদা সৈয়দ কাজেম আলী মির্জা (মুর্শিদাবাদ)
খয়রাত হোসেন (নীলফামারী)
দেবীপ্রসাদ খয়তান (ভারতীয় চেম্বার অব কমার্স)
মোঃ খোদাবক্স (বহরমপুর)
খুররম খান পন্নী (টাঙ্গাইল দক্ষিণ)
নিশীথ নাথ কুণ্ডু (দিনাজপুর)
প্রভাষচন্দ্র লাহিড়ী (রাজশাহী)
এইচ. এ. লুক (বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স)
লুৎফর রহমান (যশোর সদর)
লুৎফর রহমান দেওয়ান (পাবনা পূর্ব)
জি. এম. ম্যাকিনলে (ভারতীয় পাটকল সমিতি)
মাদার বক্স (রাজশাহী কেন্দ্র)
মফিজুদ্দিন আহম্মেদ (ত্রিপুরা দক্ষিণ)
সৈয়দ মোহাম্মদ আফজাল (পিরোজপুর উত্তর)
মোহাম্মদ ওয়াইস (রংপুর উত্তর)
মোহাম্মদ সাইদ মিঞা (মালদহ উত্তর)
চারুচন্দ্র মাহান্তী (মেদিনীপুর কেন্দ্র)
স্যার উদয় চাঁদ মাহাতাব (বর্ধমান, জমিদার প্রতিনিধি)
নিকুঞ্জবিহারী মাইতি (বর্ধমান বিভাগ, উত্তর)
নিশাপতি মাঝি (বীরভূম)
মুজিবর রহমান (নোয়াখালী কেন্দ্র)
ভূপতি মজুমদার (হুগলী-হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি)
ঈশ্বরচন্দ্র মাল (মেদিনীপুর দক্ষিণ-পূর্ব)
ডাঃ এ. এম. মালিক (পানি সরবরাহ শ্রমিক সমিতি)
আশুতোষ মল্লিক (বাঁকুড়া পশ্চিম)
আনন্দ প্রসাদ মণ্ডল (বর্ধমান উত্তর-পশ্চিম)
বাঁকুবিহারী মণ্ডল (বর্ধমান উত্তর-পশ্চিম)
শূন্য (বাকেরগঞ্জ দক্ষিণ-পশ্চিম)
কৃষ্ণপ্রসাদ মণ্ডল (মেদিনীপুর কেন্দ্র)
মনিরুদ্দিন আকন্দ (রাজশাহী উত্তর)

মর্তুজা রেজা চৌধুরী (জঙ্গিপুর)
মসিউদ্দিন আহম্মেদ (রাজামিয়া) (মানিকগঞ্জ)
আবু তৈয়ব মাজহারুল হক (ঢাকা কেন্দ্র)
জে. এইচ. মেথহোল্ড (বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স)
মোবারক আলী আহম্মদ (বগুড়া উত্তর)
মোহাম্মদ শরীফ খান (হুগলী-হাওড়া)
মোহাম্মদ আলী (বগুড়া পশ্চিম)
শ্যামা প্রসাদ মুখার্জী (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)
জে. ই. মরিস (রাজশাহী বিভাগ)
ডাঃ মোঃ মোজাম্মেল হোসেন (বাগেরহাট)
মুদাসসির হোসেন (বীরভূম)
মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ চৌধুরী (ফেনী)
মোহাম্মদ  ইদ্রিস (হাওড়া)
মোহাম্মদ ইসহাক (বগুড়া দক্ষিণ)
মোহাম্মদ ইসরাইল (কিশোরগঞ্জ দক্ষিণ)
মওলানা হাজি মোহাম্মদ কাসেম (বাকেরগঞ্জ পশ্চিম)
মোহাম্মদ কামরুদ্দিন (ব্যারাকপুর)
মোহাম্মদ রফিক (কলকাতা উত্তর)
মোহাম্মদ রুকুনদ্দিন (ব্রাহ্মণবাড়িয়া)
সৈয়দ মোহাম্মদ সিদ্দিক (বাঁকুড়া)
ধীরেন্দ্র নারায়ণ মুখার্জী  (হুগলী উত্তর-পূর্ব)
মুকুন্দবিহারী মল্লিক (খুলনা)
বসন্তলাল মুরাকা (কলকাতা কেন্দ্র)
নবাব খানবাহাদুর মোশারফ হোসেন  (জলপাইগুড়ি-দার্জিলিং)
মোজাফফর রহমান চৌধুরী (বালুর ঘাট)
মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী (প্রেসিডেন্সি, জমিদার প্রতিনিধি)
মোহাম্মদ নাজমুল হক (মালদহ দক্ষিণ)
কে. নসরুল্লাহ (ঢাকা মিউনিসিপ্যাল)
অর্ধেন্দুশেখর নস্কর (২৪ পরগনা উত্তর-পশ্চিম)
হেমচন্দ্র নস্কর ( ২৪ পরগনা দক্ষিণ-পূর্ব)
নবাব আলী (ত্রিপুরা পশ্চিম)

নওয়াজেস আহম্মেদ (নদীয়া পূর্ব)
নাজির হোসেন খন্দকার (কুড়িগ্রাম দক্ষিণ)
কে. নুরুদ্দিন (কলকাতা দক্ষিণ)
নুরুজ্জামান (ভোলা উত্তর)
নুরুল আমিন (ময়মনসিংহ পূর্ব)
ওসমান আলি (নারায়ণগঞ্জ দক্ষিণ)
মোহাম্মদ ওসমান গনি (সিরাজগঞ্জ উত্তর)
পনিরুদ্দিন আহম্মেদ (কুড়িগ্রাম উত্তর)
যাদবেন্দ্র পাঞ্জা (বর্ধমান কেন্দ্র)
পি. আই. জি. ডব্লিউ. প্যারিস (কলকাতা ও উপশহর-ইউরোপীয়)
এল. আর. পেস্টনী (এ্যাংলো ইন্ডিয়ান )
আর.আই. প্ল্যাটেল (এ্যাংলো ইন্ডিয়ান)
আনন্দীলাল পোদ্দার (মাড়োয়ারী সমিতি)
শূন্য (বর্ধমান বিভাগ, ইউরোপীয়)
পূর্ণচন্দ্র প্রামাণিক (নদীয়া)
রজনীকান্ত প্রামাণিক (মেদিনীপুর পূর্ব)
শূন্য (জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি)
কমল কৃষ্ণ রায় (বাঁকুড়া পূর্ব)
নগেন্দ্র নারায়ণ রায় (রংপুর)
রজনীকান্ত রায় বর্মণ (রংপুর)
ই. এম. রিকেটস (এ্যাংলো ইন্ডিয়ান)
ধনঞ্জন রায় (ঢাকা পূর্ব)
হরেন্দ্রনাথ রায় (দিনাজপুর)
কিরণ শঙ্কর রায় (পূর্ব বাংলা —মিউনিসিপ্যাল)
রামহরি রায় (দিনাজপুর)
এস. এ. সালাম (নারায়ণগঞ্জ উত্তর)
বিজয়কৃষ্ণ সরকার (খুলনা)
প্রফুল্লরঞ্জন সরকার (ময়মনসিংহ পূর্ব)
আশালতা সেন (ঢাকা, সাধারণ)
দেবেন্দ্রনাথ সেন (কলিয়ারী কয়লা খনি)
যতীন্দ্রনাথ সেন (বাকেরগঞ্জ দক্ষিণ-পূর্ব)

নেলি সেনগুপ্তা (চট্টগ্রাম)
সৈয়দ সিরাজুল হক (ত্রিপুরা দক্ষিণ)
সিরাজুদ্দিন আহম্মদ (মেদিনীপুর)
সিরাজুদ্দিন আহম্মেদ (গাইবান্ধা উত্তর)
সিরাজুল ইসলাম (বনগাঁ)
শামসুদ্দিন আহম্মেদ (কুষ্টিয়া)
শামসুদ্দিন আহম্মেদ চৌধুরী (বাদশা মিঞা) (ফরিদপুর পূর্ব)
শামসুদ্দিন আহম্মেদ খন্দকার (গোপালগঞ্জ)
মোহাম্মদ শামসুদ্দিন সিকদার (পটুয়াখালী দক্ষিণ)
মওলানা শামসুল হুদা (ময়মনসিংহ দক্ষিণ)
শরফুদ্দিন আহম্মদ (ময়মনসিংহ উত্তর)
নরেন্দ্র সিং সিনহা (রাজশাহী, জমিদার প্রতিনিধি)
অরুণচন্দ্র সিনহা (চট্টগ্রাম, জমিদার প্রতিনিধি)
বিমলচন্দ্র সিনহা (২৪ পরগনা দক্ষিণ-পূর্ব)
ডি.জি. স্মিথবার্ণ (দার্জিলিং)
এ. এফ. স্টার্ক (কলকাতা এবং উপশহর)
এন. স্টোকম (কলকাতা ব্যবসায়ী সমিতি)
হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী (২৪ পরগনা—মিউনিসিপ্যাল)
তোফাজ্জল আলি (ত্রিপুরা উত্তর-পূর্ব)
এ. ডব্লিউ. ও. বি. ই. টেলর (বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স)
প্রমথরঞ্জন ঠাকুর (ফরিদপুর)
এন. কে. টড (ঢাকা বিভাগ, ইউরোপীয়)
তোফাজ্জল হোসেন (ঝিনাইদহ)
সি. পি. জি. ওয়েড় (চট্টগ্রাম বিভাগ, ইউরোপীয়)
জে. আর. ওয়াকার (বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স)
আর. বি. হোয়াইটহেড (ভারতীয় খনি সমিতি)
এইচ. এফ. হুইটহোম (বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স)
জি. উইলকিনসন (হুগলী-হাওড়া)
জি. সি. ডি. উইল্কস (এ্যাংলো ইন্ডিয়ান)
ডব্লিউ. সি. সি. আই. ই. ওয়ার্ডসওয়ার্থ (কলকাতা এবং উপশহর, ইউরোপীয়)
ইউসুফ হোসেন চৌধুরী (ফরিদপুর পশ্চিম)
এ. এম. এ. জামান (হুগলী-শ্রীরামপুর, রেজিস্টার্ড কারখানা প্রতিনিধি)

# ১১

## আমলাতন্ত্র ও লোক প্রশাসন ১৭৬৫-১৯৪৭

সিরাজুল ইসলাম*

বাংলায় (পরবর্তীকালে সমগ্র ভারতে) বৃটিশ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে একটা আপাতবিরোধী সত্য এই যে কখনো সচেতনভাবে এ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করে একই সঙ্গে সামগ্রিকভাবে তা কার্যকর করা হয়নি, বৃটিশদের দেশীয় কর্তৃপক্ষও (কোর্ট অব ডিরেক্টর্স ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির স্বত্বাধিকারীগণ) অত্যন্ত উৎসাহী হয়ে একে সমর্থন করেনি। অন্যান্য রাজ্য যেভাবে কোনো চূড়ান্ত যুদ্ধ বা চুক্তির পরিণতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেভাবে বাংলায় কোম্পানির রাজ্যও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাংলায় কোম্পানির বাণিজ্য শুরু এবং বাণিজ্যকুঠি স্থাপনের পর এক শতাব্দীর অধিক কাল যাবৎ মুগল সরকার থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রাপ্ত ফরমান, পরোয়ানা ও সনদ এবং এ সরকারের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি এবং মাঝে মাঝে সংঘটিত যুদ্ধের মাধ্যমে।

এ পর্যায়ে প্রথম দিকে বিজিত অঞ্চলগুলির, যেমন হস্তান্তরিত (ceded) এলাকা ও দীউয়ানি এলাকাগুলির শাসনকার্য পরিচালনায় সাম্রাজ্য স্থাপনের ব্যাপারে সিদ্ধান্তহীনতা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। এ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা রবার্ট ক্লাইভ একটা শাসনপদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন, যেটাকে প্রায়ই দ্বৈত শাসন বলে অভিহিত করা হয়। এই ব্যবস্থার অধীনে কোম্পানি দেশে পূর্ব থেকে বিদ্যমান শাসক শ্রেণীর সঙ্গে বরং অধস্তন অংশীদার (দীউয়ান) হিসেবে ক্ষমতার অংশীদার হয়।[১] ওয়ারেন হেস্টিংস (১৭৭০-১৭৮৫) কোম্পানিকে প্রথমে সমান অংশীদার এবং পরে অত্যন্ত প্রভাবশালী অংশীদারে পরিণত করে কোম্পানির অবস্থানকে উন্নীত করেন। লর্ড কর্নওয়ালিস (১৭৮৬-৯৩) আরো এক ধাপ এগিয়ে যান।

* অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. এই ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশদ জানার জন্য দেখুন, Abdul Majed Khan, *The Transition in Bengal, 1756-1775: A Study of Saiyid Muhammad Reza Khan* (Cambridge 1969), Chapters 6-8.

তিনি সাবেক সরকারগুলোর ইঙ্গ-বাংলা অংশীদারিত্বের জগাখিচুরি ধারণা সম্পূর্ণ বাতিল করলেন, রাষ্ট্র পরিচালনা থেকে দেশীয়দের (natives) পুরোপুরি বাদ দিলেন, প্রশাসনকে করলেন সম্পূর্ণরূপে শ্বেতাঙ্গদের কর্তৃত্বাধীন বিষয়, যদিও স্পষ্টত সমকালীন রাজনীতিতে প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগুলোর মনোলোকে মুগল সাম্রাজ্যের সর্বময়তার ভাবমূর্তি তখনো অটুট ছিল। দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রেও প্রথমদিকে দেশীয় আইন, আচার ও প্রথা প্রশাসন ও বিচারকার্যের দিকনির্দেশিকা হিসেবে অনুসৃত হতো। কিন্তু কর্নওয়ালিসের পদ্ধতিতে তৎকালীন আইন ও আইনী প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুসৃত নীতি ও কার্যাবলীর মধ্যে বিপুল পরিবর্তন আনা হয় এবং এগুলোকে আকস্মিকভাবে বৃটিশ বিধি-বিধানের সাথে মিশিয়ে ফেলা হয়। ফলে একটা যৌগিক ব্যবস্থা গড়ে উঠলো, যাকে আমরা ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা বলি। কর্নওয়ালিসের গৃহীত ব্যবস্থাবলী কার্যকর করার পরে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম চার দশকে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের সম্প্রসারণ এবং এর ভিত্তি সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে আরো সংস্কার সাধন করা হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এই সংস্কারের গতিতে হঠাৎ ছেদ পড়ে।[২] কারণ হচ্ছে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ। বৃটিশরা এই অভ্যুত্থান থেকে এই শিক্ষা লাভ করলো যে ভবিষ্যতে এই ধরনের বা এর চেয়েও মারাত্মক পরিণতি এড়াতে হলে যতো অসম্পূর্ণভাবেই হোক, রাষ্ট্রক্ষমতা দেশীয়দের সাথে ভাগাভাগি করতে হবে। এই পরিস্থিতিতে প্রাথমিক পর্যায়ে অত্যন্ত সীমিত পরিসরে ১৮৬০-এর দশক থেকে ভারতীয়দের ক্ষমতার অংশীদার করার ব্যাপারে বিপরীতমুখী সংস্কার শুরু হয়। সংস্কারের জন্য জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯২০-এর দশকে এবং ঔপনিবেশিক শাসনের শেষ দশকের মধ্যে আমলাতন্ত্রে আধিপত্য এবং শাসনক্ষমতা সুস্পষ্টভাবে বৃটিশদের হাত থেকে ভারতীয়দের হাতে চলে যায়। সংক্ষেপে বলতে গেলে, একটি আদর্শ ব্যবস্থা হিসেবে ঔপনিবেশিক সরকারের আমলাতন্ত্র ও প্রশাসনযন্ত্র কদাচিৎ সমপরিমাণে দেশীয় ও বৃটিশদের দ্বারা গঠিত হয়েছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটি ছিল উভয়েরই সংমিশ্রণ এবং উভয়ের অংশীদারিত্বের পরিমাণ ছিল বিভিন্ন রকম। উদাহরণত, প্রথমদিকে দেশীয়দের অংশীদারিত্ব ছিল সর্বাধিক এবং ঔপনিবেশিক শাসনের শেষের দশকগুলিতেও দেশীয়দের এ প্রাধান্য বিদ্যমান ছিল। মধ্যবর্তী সময়কালে অর্থাৎ কর্নওয়ালিস যুগ থেকে কার্জন যুগ পর্যন্ত আমলাতন্ত্রে শ্বেতাঙ্গদের পূর্ণ আধিপত্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় এই যে সংখ্যাগত দিক থেকে যদিও আমলাতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ ইউরোপীয়দের হাত থেকে ভারতীয়দের হাতে চলে এল, এর রূপ ও প্রকৃতি সগৌরবে অপরিবর্তিত থেকে গেল। অংশীদারিত্বের প্রথম পর্যায়ে স্থানীয় আইন ও প্রতিষ্ঠানগুলোর ভিত্তিতে গড়ে উঠা প্রশাসনব্যবস্থা বহাল রাখা হয়েছিল, কিন্তু অংশীদারিত্বের দ্বিতীয় পর্যায়ে ঐকমত্য ছিল ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্র ও প্রশাসনের সপক্ষে। এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই যে সব সময়েই জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সঙ্গতিপূর্ণভাবে পরিচালিত হয়েছিল বৃটিশের বিরুদ্ধে, বৃটিশের আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কখনো নয়। এ কারণে ১৯৪৭ সালে

২. কোম্পানির সংস্কারের রাজনীতি সম্বন্ধে জানতে হলে দ্রষ্টব্য, Siraj ul Islam, "Britons in India: How Heavy was the 'White Man's Burden'?" , *Bangladesh Historical Studies*. 1996.

বৃটিশরা বিদায় নিলেও ঔপনিবেশিক শাসনোত্তর রাষ্ট্র শাসনের জন্য বৃটিশ আমলাতন্ত্র ও প্রশাসনব্যবস্থা অপরিহার্যভাবে টিকিয়ে রাখা হয়েছিল। আমাদের এই পর্যবেক্ষণের উপর এখন আমরা আরো বিশদ আলোচনা করতে পারি।

## আদি প্রশাসনিক ও আমলাতান্ত্রিক কাঠামো

*দীউয়ানিপূর্ব প্রকরণ*

এ কথা সত্য যে পলাশীর অব্যবহিত পরেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রাজনৈতিক ক্ষমতা হাতে নেয়নি। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দীউয়ানি লাভের (১৭৬৫) আগে পর্যন্ত কোম্পানি দেশের ক্ষমতাকাঠামোতে নিজেকে সুস্পষ্টভাবে জাহির করেনি। তবে মুগল সাম্রাজ্যের কাঠামোর ভিতরে একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র শাসন করে কোম্পানি মূল্যবান প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছিল। পলাশী ষড়যন্ত্রের (৩ জুন ১৭৫৭) পুরস্কারস্বরূপ মীর জাফর নবাবের পদে অধিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানি পুরস্কার হিসেবে ২৪-পরগনার দখল পেল। নবাব মীর কাশিমের সঙ্গে একটা নতুন চুক্তির অংশ হিসেবে তিনটা সুবিস্তীর্ণ চাকলা বা প্রদেশ (বর্ধমান, মেদিনীপুর এবং চট্টগ্রাম) ১৭৬০ সালে কোম্পানির নিকট হস্তান্তর করা হয়।

কোম্পানির এই নবলব্ধ এলাকাগুলো কিভাবে শাসিত হচ্ছিল? কোম্পানি ইচ্ছা করলে কলকাতায় প্রবর্তিত তাদের শাসনব্যবস্থা এসব এলাকায় সম্প্রসারিত করতে পারতো। কলকাতার সার্বভৌম মালিক হিসেবে কলকাতাকে তারা প্রধানত বৃটিশ আইন মোতাবেক শাসন করতো।[৩] কিন্তু এসব এলাকায় তারা বৃটিশ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন থেকে বিরত থাকলো, কারণ প্রাচ্যের একটা সমাজকে খাঁটি বৃটিশ আইন ও প্রাতিষ্ঠানিক ঐতিহ্য অনুসরণ করে শাসন করতে যাওয়া রাজনৈতিক দিক থেকে বিজ্ঞতার পরিচায়ক হবে না বলে তারা মনে করতো। নবলব্ধ জেলাগুলো শাসনের জন্য বৃটিশ অফিসারদের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দিয়ে সেখানে পাঠানো হয়েছিল। রাজস্ব নিষ্পত্তি ও আদায়ের বিদ্যমান ব্যবস্থা এবং এমনকি বিদ্যমান আমলা[৪] বা পরগনা পর্যায়ে প্রশাসনিক কর্মচারীবৃন্দ পুরোপুরি বহাল ছিল। অবশ্য জমিদারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে নির্মমভাবে খর্ব করা হয়েছিল।[৫] সর্বতোভাবে শ্বেতাঙ্গদের দ্বারা গঠিত তিন সদস্যের একটি প্রাদেশিক পরিষদ প্রত্যেক হস্তান্তরিত জেলায় গঠন করা হয়েছিল।[৬] এই পরিষদগুলোকে দায়ী করা হলো এক উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে,

৩. কোম্পানির বৃটিশ ও অন্যান্য ইউরোপীয় প্রজারা মেয়রের আদালতের এখতিয়ারাধীন ছিল এবং এই আদালত খাঁটি বৃটিশ আইন মোতাবেক বিচারকার্য সম্পাদন করতো। দেশীয় প্রজারা ছিল জমিদারি কাছারির এখতিয়ারাধীন। এই কাছারির নিয়মকানুন ছিল দেশীয় ও ইউরোপীয় আইনব্যবস্থার জগাখিচুরিবিশেষ।

৪. 'আমলা' আরবি 'আমিল'-এর বহুবচন, অর্থ প্রশাসক।

৫. বিশদ জানার জন্য দ্রষ্টব্য, W. K. Firminger, *Historical Introduction to the Bengal portion of the Fifth Report*, (Calcutta reprint 1962), chapter on 'The Ceded Lands'.

৬. 'জেলা' ছিল 'প্রেসিডেন্সি'র মতো একটা ব্যবসায়িক শব্দ। দেশের অভ্যন্তরে ব্যবসারত ইউরোপীয় ব্যবসায়ীরা এই শব্দ ব্যবহার করতো। বিশেষ অঞ্চলের জন্য একটি বিশেষ কুঠি বা ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হতো এবং এ অঞ্চলের নাম দেয়া হয় জেলা। তারা মুগলদের ব্যবহৃত শব্দ 'চাকলা'র অর্থ করেছিল একাধারে প্রদেশ এবং জেলা। হেস্টিংসের শাসনামলে অনেকগুলো পরগনা মিলিয়ে গঠিত হয় জেলা, এই অর্থে জেলা শব্দটা সরকারি পর্যায়ে ব্যবহৃত হতো।

যার নামকরণ করা হয় কমিটি অব নিউ ল্যান্ডস। এই কমিটি গঠিত হয় কলকাতার ফোর্ট উইলিয়মের গভর্নর এবং পরিষদের ছয় সদস্যের সমন্বয়ে। বস্তুত গভর্নর ও তাঁর পরিষদকে কমিটি অব নিউ ল্যান্ডস নামে অভিহিত করা হলো যখন তাঁরা এই জেলাগুলোর কার্য সম্পাদন করছিল। কমিটির সভাপতি ছিলেন গভর্নর।[৭] এই ক্ষুদ্র রাষ্ট্রব্যবস্থার কেন্দ্র থেকেই ঔপনিবেশিক প্রতিষ্ঠান আমলাতন্ত্র ও প্রশাসনের প্রথম সূত্রপাত হয়।

## ইঙ্গ-মুগল অংশীদারিত্ব ১৭৬৫-১৭৯৩

রবার্ট ক্লাইভ ১৭৬৫ সালে দিল্লীর সম্রাটের নিকট থেকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দীউয়ানি লাভ করেন। এযাবৎ মুগল প্রাদেশিক সরকার দুই ধরনের আমলাতন্ত্র দ্বারা শাসিত হতো। একটা ছিল নিজামত বা সামরিক আমলাতন্ত্র, যেটা নির্বাহী ও বিচার বিভাগীয় দিকগুলি পরিচালনা করতো; অপরটা ছিল দীউয়ানি বা বেসামরিক আমলাতন্ত্র, যেটা রাষ্ট্রের রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়গুলো পরিচালনা করতো। নিজামতের প্রধান ছিলেন সুবাদার, দীউয়ানির প্রধান ছিলেন দীউয়ান। এই দুই ধরনের আমলাতন্ত্র আওরঙ্গজেবের মৃত্যুকাল পর্যন্ত পরস্পর স্বাধীন ছিল। মুগল সাম্রাজ্যের ব্যবস্থাধীনে নাজিম ও দীউয়ান সমান পদমর্যাদার অধিকারী ছিলেন এবং তাঁরা সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত হতেন, সম্রাটের কাছেই দায়ী থাকতেন। নবাবি আমলে যখন সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব ধীরে ধীরে হ্রাস পেল, তখন দুটি পদে অধিষ্ঠিত হলেন একই ব্যক্তি অর্থাৎ নবাব, যিনি কেন্দ্রের অধীনতা থেকে কার্যত মুক্ত হয়ে গেলেন। রবার্ট ক্লাইভ সম্রাটের সাথে দেখা করে তাঁকে উৎসাহিত করলেন সম্রাটরূপে তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে এবং কোম্পানিকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় তাঁর দীউয়ান নিযুক্ত করতে, যার বিনিময়ে কোম্পানি সম্রাট ও নবাবকে ধার্যকৃত বার্ষিক কর প্রদান করবে। সম্রাট ক্লাইভের প্রস্তাবে সম্মত হলেন এবং এ পরিপ্রেক্ষিতে ১৭৬৫ সালের ১২ আগস্ট সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী কোম্পানিকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দীউয়ান নিযুক্ত করা হয়।

এরপর রবার্ট ক্লাইভ এবং ফোর্ট উইলিয়মে কর্মরত তাঁর পরিষদের সামনে প্রশ্ন দাঁড়ায়, কিভাবে তাঁরা দীউয়ানি পরিচালনা করবেন? তাঁরা কি বিদ্যমান ব্যবস্থা ও আমলাতন্ত্র অপরিবর্তিত রাখবেন, নাকি এগুলোর স্থলে তাঁদের পছন্দমতো নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তন করবেন? এ সম্পর্কে ক্লাইভের সুস্পষ্ট অভিমত ছিল বিদ্যমান ব্যবস্থা অটুট রাখার পক্ষে। তিনি যুক্তি দেখান যে হস্তান্তরিত এলাকাগুলোতে এযাবৎ প্রচলিত প্রত্যক্ষ প্রশাসন অত্যন্ত অদক্ষ এবং হয়রানিমূলক। প্রত্যেকটা হস্তান্তরিত এলাকায় অবাধ্যতা ও বিদ্রোহ লেগেই থাকতো। সরেজমিনে কোম্পানির প্রশাসকরা দেখেছিলেন যে বঞ্চিত, হতাশাগ্রস্ত ও অসন্তুষ্ট শাসক শ্রেণী উপর্যুপরি ঘটমান প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমের পেছনে সক্রিয়

৭. Governor Henry Vansittart to Harry Verelst, Chief of the Council at Chittagong, 21 January 1761, Sirajul Islam (ed.), *Bangladesh District Records : Chittagong*, vol. 1 (1760-1787), (Dhaka 1978) doc, no. 2.1. 118.

রয়েছে এবং এতে তাদের প্রজাকুল ও দোসরদের সমর্থনের অভাব নেই।[৮] কাজেই দীউয়ানি প্রশাসন প্রত্যক্ষভাবে পরিচালনার চেষ্টা পরিহার করে বিপদ ডেকে না আনা দূরদর্শিতার পরিচায়ক হবে বলে ধারণা করা হয়। তাই ক্লাইভ মনে করলেন, বিজিত জনগণকে শান্ত রাখার সবচেয়ে নিরাপদ উপায় হলো প্রথাগত আমলাতন্ত্র ও ভূস্বামী এলিট শ্রেণীকে না ঘাঁটিয়ে কোম্পানির কর্মকাণ্ড দরবার পর্যায়ে দেশীয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে 'জমা' বা রাজস্ব আদায়ের মধ্যে সীমিত রাখা উচিত। ক্লাইভের মতে, দেশ থেকে সংগৃহীত রাজস্ব দ্বারা বাংলায় কোম্পানির বিনিয়োগের জন্য অর্থ সংগ্রহ করাও একটি সবচেয়ে নিরাপদ পন্থা।[৯] স্বদেশে কর্তৃপক্ষ ক্লাইভের অভিমত গ্রহণ করলেন। ফলে ক্লাইভ একটা রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুললেন, যা দেশীয় ব্যক্তিবর্গকে সকল তদারকি ও প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রদান করে।

ক্লাইভের ব্যবস্থাধীনে নিজামত বা সামরিক বাহিনী ও পুলিশের উপর নিয়ন্ত্রণ নবাবের হাতে ন্যস্ত হলো। রাজস্ব ও আনুষঙ্গিক বেসামরিক প্রশাসন, যেটা সম্রাটের দীউয়ান হিসেবে কোম্পানির দায়িত্বের আওতাভুক্ত, সেটাও কোম্পানি কিছুটা পরোক্ষভাবে পরিচালনা করতে লাগলো মুৎসুদ্দি বা স্থানীয় নায়েব-নাজিমদেরকে স্বাধীনভাবে দীউয়ানি প্রশাসন চালিয়ে যেতে দেয়ার মাধ্যমে। বাংলায় দীউয়ানি প্রশাসন পরিচালনার জন্য ডেপুটি দীউয়ান নিযুক্ত করা হলো সৈয়দ মোহাম্মদ রেজা খানকে। তিনি ছিলেন পারস্য থেকে আগত এক ভাগ্যান্বেষী, যিনি পলাশী-উত্তর যুগে রাজস্ব প্রশাসনের কাজে প্রভূত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। তাঁকে কলকাতার পরিবর্তে মুর্শিদাবাদ থেকে দীউয়ানি কার্য পরিচালনা করতে বলা হলো। এর উদ্দেশ্য ছিল মুগল অভিজাতবর্গকে এই ধারণা দেয়া যে কোম্পানি তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, বরং কনিষ্ঠ অংশীদার মাত্র।

ক্লাইভের পদ্ধতি এই অর্থে অত্যন্ত সফল ছিল যে দেশীয় রাজনৈতিক অভিজাত শ্রেণী বা মুৎসুদ্দিদের কেউই এই পদ্ধতি সম্পর্কে অসন্তোষ প্রকাশ করে নি। কিন্তু এই পদ্ধতি সফল হলেও কোম্পানির কর্মচারীদের রাজনৈতিক অভিলাষের প্রেক্ষিতে এ পদ্ধতি যে দীর্ঘদিন টিকবে না তা নিশ্চিতভাবে বলা যেত। ১৭৬৯ সালে ক্লাইভের ব্যবস্থা ধসে পড়লো যখন জেলা পর্যায়ে ইউরোপীয় তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করা হলো। সরাসরি দেশ

৮. দ্রষ্টব্য, Firminger, *Historical Introduction;* A. M. Serajuddin, *The Revenue Administration of the East India Company in Chittagong 1761-1785* (Chittagong 1971), প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম : 'Direct Administration'.

৯. ক্লাইভ সচেতন ছিলেন যে বৃটিশ রাজ ইতিপূর্বে তাঁর দেশজয়ের পরিকল্পনা নাকচ করে দিয়েছে এবং ১৪ জানুয়ারি ১৭৫৮-এর সরকারি সনদপত্রবলে পার্লামেন্টের পূর্বানুমতি না নিয়ে বিদেশী শক্তির কাছ থেকে জমি ক্রয় করার অধিকার থেকেও কোম্পানিকে বঞ্চিত করেছে। তাছাড়া, বাংলার মতো একটি প্রাচীন রাষ্ট্রকে শাসন করার জন্য পর্যাপ্ত জনশক্তি ও প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা কোনোটাই কোম্পানির ছিল না। তদুপরি, কোম্পানির কর্মচারীরা ইতিমধ্যেই অর্থলোভীর মতো আচরণ করছিল; তাদের হাতে প্রত্যক্ষ ক্ষমতা থাকলে তারা আরো বেপরোয়া লুণ্ঠন শুরু করতো। বাংলার প্রশাসন সম্পর্কে ক্লাইভের রাজনৈতিক ধারণার উপর একটা অত্যন্ত সারগর্ভ আলোচনা দেখুন, Abdul Majed Khan, *The Transition in Bengal 1756-1775: A Study of Saiyid Muhammad Reza Khan* (Cambridge 1969), chapter 6.

শাসন না করে জেলা তত্ত্বাবধায়কদের নির্দেশ দেয়া হলো স্থানীয় আচার-প্রথা, অর্থনৈতিক সম্পদ, স্থানীয় সরকারব্যবস্থা, দেশীয় নিয়ন্ত্রণপ্রণালী ইত্যাদি সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য সংগ্রহ করতে।[১০] কার্যত এটাই ছিল উত্থানশীল ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে প্রথম পদক্ষেপ।

১৭৭০ সালের মধ্যে বাংলায় কোম্পানির কর্মচারীরা অনুভব করলো যে তারা এখন সরাসরি রাজ্য শাসনের জন্য নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করতে অধিকতর পরিমাণে সক্ষম। কলকাতা ফোর্ট উইলিয়মের গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস (১৭৭২-৭৪) দীউয়ানি শাসনভার নিজের হাতে তুলে নিলেন এবং ইউরোপীয় কর্মচারীদের অভ্যন্তরে পাঠালেন রাজস্ব প্রশাসনে মুৎসুদ্দিদের সাথে ক্ষমতা ভাগাভাগি করবার জন্য। ওয়ারেন হেস্টিংস গভর্নর জেনারেলরূপে (১৭৭৪-৮৫) আমলাতন্ত্রকে আরো জোরদার করলেন। তিনিই দেশীয় মুৎসুদ্দিদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব জোরালোভাবে খর্ব করে তাদের স্থলে জেলা কালেক্টরদের নিয়োগের মাধ্যমে এই আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৭৮৬ সালে কর্নওয়ালিস গভর্নর জেনারেল হয়ে এলেন ১৭৮৪ সালের আইনানুসারে। তাঁর উপর সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকে দৃঢ় ভিত্তিতে দাঁড় করাতে হবে এবং মুৎসুদ্দিদের সাথে ক্ষমতা ভাগাভাগির সকল ভনিতা ঝেড়ে ফেলতে হবে। পার্লামেন্ট আনুষ্ঠানিকভাবে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিল, ১৭৯৩ সালে কোম্পানির সনদপত্র নবায়ন করলো। একই বছর সপরিষদ গভর্নর জেনারেল চার্লস কর্নওয়ালিস এই নতুন রাষ্ট্রের আমলাতান্ত্রিক খুঁটিনাটিকে আনুষ্ঠানিক রূপ দিলেন।

### আধুনিক আমলাতন্ত্রের পত্তন, ১৭৯৩

নতুন রাষ্ট্র শাসন করার জন্য কোম্পানির তিন ধরনের বেসামরিক কর্মকর্তা ছিল— চুক্তিবদ্ধ (covenanted), অচুক্তিবদ্ধ (uncovenanted) এবং দেশীয় আমলা। যেসকল কর্মকর্তাকে কোর্ট অব ডিরেক্টর্স সরাসরি নিয়োগ করতো তাদের বলা হতো চুক্তিবদ্ধ (covenanted) কর্মকর্তা, কারণ প্রাচ্যে কোম্পানির বিষয়াবলী সংক্রান্ত কার্য পরিচালনার সূত্রে তাদের সুযোগ-সুবিধা ও দায়দায়িত্ব উল্লেখ করে তারা কোম্পানির সঙ্গে একটা চুক্তি স্বাক্ষর করতো। তারা কোর্ট অব ডিরেক্টর্স কর্তৃক নিযুক্ত হতো এবং কোর্ট অব ডিরেক্টর্সের নিকট দায়ী থাকতো। চুক্তিবদ্ধ সিভিল সার্ভেন্টদের সংক্ষেপে সিভিলিয়ান বলা হতো। যেসকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য কলকাতা সরকার নিয়োগ দিত, তাদের বলা হতো অচুক্তিবদ্ধ (uncovenanted) সিভিল সার্ভেন্ট। চুক্তিবদ্ধ শ্রেণীর কর্মকর্তাদের মতো তারা স্বদেশের সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হতো না এবং তাদের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধার নিশ্চিয়তা বিধান করে কোনো চুক্তিও সম্পাদিত হতো না। আরেক শ্রেণীর কর্মকর্তা ছিল মুৎসুদ্দি বা দেশী আমলা। বস্তুত তারা মুগল আমলাতন্ত্রেরই ছিটেফোঁটা অংশ। ১৭৮৬ সালে উচ্চ বেতনভুক দেশী আমলাদের বাদ

১০. Abdul Majed Khan, *Transition*, 200-1.

দেয়া হয়।[১১] তখন পর্যন্ত চুক্তিবদ্ধ আমলারা তুলনামূলকভাবে স্বল্প বেতন পেত। এর পেছনে যুক্তি ছিল এই যে তাদের ব্যক্তিগত ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়ে যাবার সুবিধা দেয়া হয়েছিল, এবং তাদের দাপ্তরিক মর্যাদা অক্ষুণ্ন রেখে কোম্পানির জাহাজে পণ্য পরিবহনের জন্য বিনা মূল্যে তাদের জন্য স্থান বরাদ্দ করা হতো।

### কোম্পানির শাসনামলে আমলাতন্ত্র

কর্নওয়ালিসের প্রশাসন আঞ্চলিক প্রশাসনকে ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে পৃথক করে দেয় এবং প্রশাসনিক চাকুরিকে পুরোপুরি একটা পেশায় পরিণত করে, যার সাথে ব্যবসার কোন সম্পর্ক থাকলো না। সিভিলিয়ানদের প্রকাশ্যে বা বেনামীতে ব্যবসা-বাণিজ্যে জড়িত হওয়া বেআইনী ঘোষণা করা হয় এবং বিধি লঙ্ঘন করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হয়। ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ দান করা অনুমোদিত ছিল, ক্ষতিপূরণ বাবদ সিভিলিয়ানরা মোটা অঙ্কের অর্থ পেতেন।[১২] এই নিয়মও প্রবর্তিত হয় যে রাষ্ট্রের সকল দায়িত্বপূর্ণ পদ চুক্তিবদ্ধ সিভিল সার্ভেন্টরা পূরণ করবেন অথবা সকল সিভিলিয়ান এসব পদে নিয়োজিত হবেন, যাঁরা কোর্ট অব ডিরেক্টর্স এবং সপরিষদ গভর্নর জেনারেলের সামনে এই মর্মে শপথ নেবেন যে তাঁরা সর্বদাই নির্ধারিত নীতিমালা দ্বারা পরিচালিত হবেন, বিশ্বস্ততার সাথে দায়িত্ব পালন করবেন এবং সিভিলিয়ানরূপে কর্তব্য পালনের সময় কখনোই কোনো আর্থিক বা অন্য কোনো প্রলোভনের বশবর্তী হবেন না।[১৩]

একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তাকে চুক্তিবদ্ধ সিভিল সার্ভেন্ট হতে হলে তার ক্ষেত্রে এই চূড়ান্ত নিয়ম প্রযোজ্য হবে যে দেশীয় কোনো নাগরিক রাষ্ট্রের অন্য কোনো দায়িত্বপূর্ণ পদে বহাল থাকতে পারবেন না, কারণ কারো পক্ষে লন্ডনে গিয়ে প্রথমে কোর্ট অব ডিরেক্টর্সের একজন সদস্যের কাছ থেকে মনোনয়ন লাভ করা এবং তার পরে ভারতে কোম্পানির সিভিল সার্ভিসে রাইটারের পদের জন্য অন্যদের সাথে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়া

১১. Extract from the Proceedings of the Hon'ble Governnor General and Council, 7 April 1786, in Sirajul Islam (ed.), *Bangladesh District Records: Dacca District*, vol. 1 (1784-1787), (Dacca University 1981), 190-91.

১২. জেলা কালেক্টর ও জজের বেতন ছিল ২৫০০ সিক্কা টাকা থেকে ৩০০ সিক্কা টাকা। স্টার্লিং-এর মূল্যমান অনুসারে এই অঙ্ক সেই সময় বৃটেনে অধিকতর শিক্ষিত যোগ্যতাসম্পন্ন সমপর্যায়ের অফিসারদের যে বেতন দেয়া হতো, তার চেয়ে বহুগুণ বেশি। কিন্তু দেশী আমলাদের বেতনক্রম হ্রাস করা হলো। কিছু আমলাকে, যেমন মুনসেফদের নামমাত্র বেতন দেয়া হতো সংশ্লিষ্ট পক্ষ থেকে ফি আদায়ের মাধ্যমে। এর সপক্ষে কর্নওয়ালিসের যুক্তি এই যে বেশি বেতন দেশীয় আমলাদের নৈতিক উন্নতি সাধনে উৎসাহী করবে না, যাদের নৈতিকতা প্রাচ্যের ঐতিহ্য ও সামাজিক ধারা অনুসারে কমবেশি স্থির হয়ে আছে। স্থানীয়দের প্রশাসন থেকে দূরে রাখার জন্য তাঁর যুক্তিও ছিল এটাই।

১৩. সিভিল সার্ভিসের নিয়ম ও বিধিমালা ১৭৯৩ সালের চার্টার এ্যাক্ট-এর ৫৬, ৫৭, ৬০ ধারায় বিধৃত হয়েছে।

কার্যত অসম্ভব।[১৪] কোম্পানির চুক্তিবদ্ধ সিভিল সার্ভিসের জন্য শিক্ষানবিশ মনোনয়ন কোর্ট অব ডিরেক্টর্সের একক অধিকার ছিল এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবেচনায় এটা প্রত্যাশিত ছিল না যে কোনো ডিরেক্টর একজন ভারতীয়কে লন্ডনে শিক্ষানবিশির জন্য মনোনয়ন দেবেন। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের নবগঠিত আমলাতন্ত্র থেকে দেশীয়দের সর্বাংশে বাদ দেয়া রাজনৈতিক দিক থেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল। আমরা শীঘ্রই দেখতে পাবো যে এটা পরবর্তী যুগে শাসক ও শাসিতের সম্পর্কের ধারা নির্ধারণ করে দিয়েছিল। সুতরাং ১৭৯৩ সালে বিন্যস্ত আমলাতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হলো প্রশাসন থেকে বাণিজ্যের পৃথকীকরণ, এবং এজন্য কোর্ট অব ডিরেক্টর্স কর্তৃক নিযুক্ত একটা স্থায়ী শিক্ষানবিশবাহিনী গঠন, সিভিলিয়ানদের জন্য অত্যন্ত আকর্ষণীয় বেতন নির্ধারণ এবং প্রশাসন থেকে দেশীয়দের অব্যাহতি দান। এটা অবশ্যই ছিল একটা চরম ব্যবস্থা এবং পরবর্তীকালে দ্রুত রাজনৈতিক ও অন্যান্য পরিবর্তনের কারণে কর্নওয়ালিসের আমলাতন্ত্র সংশোধন ও পুনর্গঠন করতে হয়।

প্রশাসনের সাথে জড়িত অধিকাংশ আমলা অচুক্তিবদ্ধ সিভিল সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁদের নিয়োগ প্রদান করতো কলকাতা সরকার। কোনো কোভেন্যান্ট বা চুক্তির আওতায় তাদের চাকুরির নিশ্চয়তা ছিল না এবং যেকোন সময় যেকোন কারণে তাদের বরখাস্ত করা যেতো। তাদের বেতন অবশ্যই স্বল্প ছিল, কিন্তু বেতন যতই কম হোক, সকল নিয়োগ ও বেতনের ব্যাপারে কোর্ট অব ডিরেক্টর্সের অনুমোদন নিতে হতো। উদাহরণত, যদি একজন শুল্ক কালেক্টরের গুদামের জন্য প্রহরীর প্রয়োজন হতো, এজন্য তাঁকে সম্ভাব্য ব্যয় ও লাভের পূর্ণ বিবরণসহ যুক্তি প্রদর্শন করে প্রস্তাব পেশ করতে হতো, যা জেলা কালেক্টর, রাজস্ব বোর্ড এবং সপরিষদ গভর্নর জেনারেলের মাধ্যমে কোর্ট অব ডিরেক্টর্সের বিবেচনার জন্য পাঠানো হতো এবং এ-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত একই পথ ধরে উপর থেকে নীচে প্রস্তাব উত্থাপনকারী কর্মকর্তার নিকট ফিরে আসতো। এতে বোঝা যায় যে আর্থিক বিষয়সমূহ নিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়া এতই কেন্দ্রীভূত ছিল যে কেবল কোর্ট অব ডিরেক্টর্সের যথাযথ মঞ্জুরি নিয়েই বড় বা ছোট যেকোন ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব হতো। তৎকালে যেহেতু যোগাযোগ সময়সাপেক্ষ ছিল, যেকোনো ব্যয়সাপেক্ষ কাজ সম্পাদন করতে দীর্ঘ সময় লাগতো এবং জনগণের যেকোনো কাজের সাথে খরচ জড়িত ছিল। তাই এ ধরনের আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা অকুস্থলে জনগণের উদ্যম এবং উন্নয়নপ্রয়াসকে রুদ্ধ করে দিয়েছিল। এভাবে দাপ্তরিক কর্মকাণ্ডে স্থবিরতা ও অচলাবস্থা ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়লো।

১৪. কোর্ট অব ডিরেক্টর্স কর্তৃক চূড়ান্তভাবে মনোনীত হবার পর একজন প্রার্থী কোম্পানির চুক্তিবদ্ধ সিভিল সার্ভিসে যোগদান করতো একজন রাইটার হিসেবে। ভারতে চুক্তিবদ্ধ কোনো পদে নিয়োগদানের পূর্বে প্রার্থীকে রাইটার হিসেবে বহাল করা হতো। একজন পরিচালকের সুপারিশে প্রার্থী নির্বাচন করা হতো। কোর্ট অব ডিরেক্টর্সের প্রত্যেক সদস্য নির্দিষ্ট সংখ্যক রাইটারের মনোনয়ন দিতে পারতেন।

নতুন পদ সৃষ্টির পথে শত বাধা সত্ত্বেও এবং কর্নওয়ালিস কর্তৃক ভারতীয়দের প্রশাসনিক দায়িত্ব থেকে দূরে রাখবার নীতি অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও ওয়েলেসলি প্রশাসন দেশীয়দের জন্য অচুক্তিবদ্ধ সিভিল সার্ভিসে কতকগুলো পদ সৃষ্টির ব্যবস্থা করেছিল। এর তাৎক্ষণিক কারণ হলো ভারতে বৃটিশ রাজ্যের ব্যাপক বিস্তার এবং তার ফলে শ্বেতাঙ্গ জনশক্তির স্বল্পতা, এবং গ্রামাঞ্চলে আইন-শৃঙ্খলার ক্রমাবনতি। জেলা জজকে সহায়তা করতে দেশীয়দের জন্য সদর আমিন নামে একটা বিচার বিভাগীয় পদ সৃষ্টি করা হয়। অর্থনীতি ও জনশক্তি সংক্রান্ত সমস্যা বিবেচনায় বেনটিঙ্ক প্রশাসন অচুক্তিবদ্ধ সিভিল সার্ভিসে দেশীয়দের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নেয়। বেনটিঙ্ক প্রিন্সিপ্যাল সদর আমিন নামে আরেকটি বিচার বিভাগীয় পদ সৃষ্টি করেন। প্রিন্সিপ্যাল সদর আমিনের দাপ্তরিক মর্যাদা ছিল অতিরিক্ত জেলা জজের পরেই। জেলা কালেক্টরকে সহায়তা করার জন্য তিনি দেশীয়দের জন্য ডিপুটি কালেক্টর নামে একটা পদ সৃষ্টি করলেন। দেশীয়দের জন্য সৃষ্ট প্রিন্সিপ্যাল সদর আমিন ও ডেপুটি কালেক্টরের পদ কর্নওয়ালিসের সিভিল সার্ভিসে মৌলিক পরিবর্তন সাধন করলো। ১৮৩৩ সালের চার্টার এ্যাক্ট বলবৎ হওয়ায় কর্নওয়ালিসের সৃষ্ট জাতিভিত্তিক বাধা অপসারিত হলো এবং অচুক্তিবদ্ধ সিভিল সার্ভিস দেশীয়দের মধ্যে কিছুটা মর্যাদা লাভ করলো। ১৮৪০ সালের দিকে অচুক্তিবদ্ধ সিভিল সার্ভিসে, বিশেষভাবে বিচারবিভাগের চাকুরিতে দেশীয়দের সংখ্যা তেমন কম ছিল না, কিন্তু তখনো তারা উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন দায়িত্বশীল পদ এবং উচ্চ বেতনের পদে নিয়োগ লাভ করতো না, যেগুলো শ্বেতাঙ্গদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। এসব পদ লাভ করতে অভিলাষী ভারতীয়দের পরবর্তী সুযোগ গ্রহণ করতে হতো এবং তা হচ্ছে যোগ্যতার ভিত্তিতে চুক্তিবদ্ধ সিভিল সার্ভিসে অন্তর্ভুক্তি।[১৫]

## চুক্তিবদ্ধ সিভিল সার্ভিস : পৃষ্ঠপোষকতা থেকে প্রতিযোগিতা

আধুনিক আমলাতন্ত্রের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সকল স্তরে প্রতিযোগিতা। এই পদ্ধতি কোম্পানির সিভিল সার্ভিসের নিয়োগপ্রক্রিয়ায় বলতে গেলে অনুপস্থিত ছিল। রাইটারদের বাছাই করা হতো কোর্ট অব ডিরেক্টর্স এবং নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের সদস্যদের ব্যক্তিগত মনোনয়নের মাধ্যমে। প্রতি বছর কোর্টের চেয়ারম্যান দু'জন প্রার্থীকে মনোনয়ন দিতে পারতেন এবং নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের চেয়ারম্যান দু'জন এবং পরিচালক বোর্ডের প্রত্যেক পরিচালক একজন করে মনোনয়ন দিতে পারতেন। রাইটার কাজের বিনিময়ে নগদ উপহার প্রদান করতেন, এটাই রেওয়াজ হয়ে দাঁড়ায়। ফলে যোগ্যতার বদলে অর্থই হয়ে গেল মনোনয়নের মাপকাঠি। কর্নওয়ালিস এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করতে পার্লামেন্টকে প্রণোদিত করতে সফল হয়েছিলেন। মুক্ত বাণিজ্যের সপক্ষে আন্দোলনকারীরা এ আইন প্রণয়নের জন্য চাপ প্রয়োগ করেছিলেন। ১৭৯৩ সালের চার্টার এ্যাক্ট-এর বিধান

১৫. ১৮৫৩ সালে বৃটিশ পার্লামেন্টে সাত হাজার ভারতীয়ের স্বাক্ষরিত একটা আরজি পেশ করা হয়েছিল, যেটাতে প্রশাসনে ভারতীয়দের জন্য ন্যায্য অংশ দাবি করা হয়েছিল। দ্রষ্টব্য, *Parliamentary Papers*, House of Commons, vol. 27 (1852-53).

মোতাবেক কোর্ট অব ডিরেক্টর্সের সদস্যদের এই মর্মে শপথ নিতে হতো যে রাইটারশিপের জন্য মনোনীতদের কাছ থেকে তাঁরা কোনো নগদ অর্থ বা উপহার নেবেন না। শিক্ষানবিশদের কাছ থেকে উপহার নেবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে ডিরেক্টরগণ তাঁদের পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধুবান্ধবের স্বার্থ হাসিলের জন্য পৃষ্ঠপোষকতা করতে লাগলেন।

ভারতে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র গঠনের সঙ্গে সঙ্গে সমান তালে এগিয়েছে পেশাভিত্তিক সিভিল সার্ভিস গঠনের প্রক্রিয়া। ভূখণ্ডের দিক দিয়ে এবং বস্তুগতভাবে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়া ১৮৫৮ সালে কোম্পানিশাসনের অবসান পর্যন্ত অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে এগিয়েছে। রাষ্ট্রগঠনপ্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্র গঠনপ্রক্রিয়াও অব্যাহত ছিল। যখন ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের ব্যাপ্তি ছিল কেবল বৃহত্তর বাংলার মধ্যে সীমিত, তখন কর্নওয়ালিস যে ধরনের আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা ১৮২০-এর দশকে যখন এ আমলাতন্ত্র সর্বভারতীয় আকার নিল এবং আরো পরিমার্জিত হয়ে উঠল তখন সঙ্গতিহীন হয়ে পড়লো। তা ছাড়া ১৮১৩ সালে কোম্পানি তার একচেটিয়া ব্যবসা হারালো এবং বৃটিশ ভারতকে মুক্ত বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত করা হলো। ১৮২০-এর দশক থেকে প্রত্যক্ষ উপনিবেশ স্থাপনের পালা শুরু হলো। তাই নতুন সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য কর্নওয়ালিসসৃষ্ট আমলাতন্ত্র সংশোধন ও সময়োপযোগী করার প্রয়োজন দেখা দিল। ১৮৩৩ সালে সেই সুযোগ এল যখন কোম্পানির সনদপত্র নবায়নের জন্য পার্লামেন্টে পেশ করা হলো।

সনদপত্র কোম্পানিকে পৃষ্ঠপোষকতার অধিকার প্রদান করেছিল। কিন্তু পার্লামেন্টের ভেতরে ও বাইরে এই বিশেষ সুবিধাটির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এর মোকাবিলা করার জন্য কোম্পানিও পার্লামেন্টে তার সমর্থকগোষ্ঠী তৈরি করছিল। এভাবে পার্লামেন্টেও কোম্পানির একটা সমর্থক গোষ্ঠীর সৃষ্টি হলো, যেটা কোম্পানির পৃষ্ঠপোষকতার অধিকারের পক্ষে লড়তো। যাহোক, যারা কোম্পানির অধিকার, এমনকি তার অস্তিত্বও বিলোপ করতে চেয়েছিল, তারা ১৮৩৩ সালে নবায়িত চার্টার এ্যাক্টে এই মর্মে একটি বিধি সন্নিবেশিত করতে সক্ষম হলো যে এখন থেকে প্রত্যেক ডিরেক্টর চারজন করে প্রার্থীকে মনোনয়ন দেবেন, যাঁদের মধ্যে একজনকে যোগ্যতার ভিত্তিতে বাছাই করা হবে। বাছাই করবে হেইলবারী কলেজের একটা বাছাই বোর্ড। অধিকার বিলোপের সমর্থকবৃন্দ চুক্তিবদ্ধ সিভিল সার্ভিসকে প্রতিযোগিতামূলক করার পথে আরো একধাপ এগিয়ে গেল ১৮৩৮ সালে আর একটি বিধি প্রবর্তনের মাধ্যমে, যা বোর্ড অব কন্ট্রোলকে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সক্ষম করলো যে হেইলবারি কলেজের বাছাই বোর্ড যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রার্থীদের প্যানেল পুনর্মূল্যায়ন করতে পারে এবং কোন পৃষ্ঠপোষকের প্যানেল সন্তোষজনক বিবেচিত না হলে পুরোপুরি বা আংশিকভাবে বাতিল করে ফেরত দিয়ে নতুন মনোনয়ন চাইতে পারবে। এ ধরনের বিধি পৃষ্ঠপোষকের উপর

চাপ প্রয়োগ করলো পৃষ্ঠপোষকতার অধিকার প্রয়োগের সময় একটু সতর্ক হতে। একই বিধির আওতায় রাইটারদের বয়স-সীমা ষোল থেকে একুশের মধ্যে নির্দিষ্ট করে দেয়া হলো।

১৮৩৩ সালের চার্টার এ্যাক্ট কর্নওয়ালিসসৃষ্ট ব্যবস্থায় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার সাধন করে। এর একটা ধারায় উল্লেখ করা হয় যে এখন থেকে জাতি, ধর্ম ও বর্ণের কারণে কেউ ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত হবে না।[১৬] এটা বাস্তবিকই ছিল একটা সাধু সিদ্ধান্ত, যার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল কেবল সকল জাতির লোক নিয়োগ করা নয়, পার্লামেন্টে হট্টগোলকারী লিবারেলদের শান্ত রাখা। কোর্ট অব ডিরেক্টর্স তাদের পৃষ্ঠপোষকতার অধিকার সংরক্ষণের প্রশ্নে অনড় থাকলো এবং কলকাতা সরকারকে পরামর্শ দিল বিশ্বস্ততার সাথে উক্ত দফাকে অগ্রাহ্য করে পৃষ্ঠপোষণের নিয়মকে সমর্থন দিতে।[১৭] উৎকোচ দিয়ে এবং সুবিধা দিয়ে কোম্পানি লিবারেল শক্তিগুলোর সাথে একটা বোঝাপড়ার সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল। এ বোঝাপড়ার ধরনটা ছিল এই যে পার্লামেন্টের ভেতরে লিবারেলরা যা খুশি বলবে এবং কার্যক্ষেত্রে কোম্পানি যা খুশি করবে। ১৮৫৮ সালে কোম্পানির শাসনের অবসানের বেশ কিছুদিন পর পর্যন্ত সিভিল সার্ভিসে কোনো ভারতীয়কে মনোনয়ন দেয়া হয়নি।

কিন্তু পৃষ্ঠপোষকতার দিন শেষ হয়ে আসছিল। বৃটিশ ভারত তখন এমন একটি বিশাল ও সম্পদশালী দেশ ছিল যে অন্য স্বার্থগোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে শুধু একটা ব্যবসায়ী কোম্পানির পৃষ্ঠপোষণব্যবস্থার মাধ্যমে এ দেশ শাসন করা সম্ভব ছিল না। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরোধী স্বার্থগোষ্ঠীগুলো কোম্পানির কার্যাবলীর উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছিল এবং এদের সংখ্যা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল, যার ফলে উৎকোচ আর পৃষ্ঠপোষকতার সুবিধা বণ্টন করে তাদের আর হাত করা যাচ্ছিল না।[১৮] ১৮৫০-এর দশকের মধ্যে বিরোধী শক্তিগুলো এতই সোচ্চার ও দুর্দমনীয় হয়ে উঠলো যে পৃষ্ঠপোষণ ব্যবস্থার সংস্কার অপরিহার্য হয়ে পড়লো। ১৮৫৩ সালে নবায়নকৃত চার্টার এ্যাক্টের অধীনে পার্লামেন্ট কর্তৃক পৃষ্ঠপোষণ ব্যবস্থা বিলোপ করা হলো এবং চুক্তিবদ্ধ সিভিল সার্ভিসের ক্ষেত্রে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার নিয়ম প্রবর্তিত হলো। পার্লামেন্টের এই প্রস্তাব বাস্তাবায়নের পথ ও পন্থা নির্দেশ করবার জন্য টি বি মেকলের নেতৃত্বে একটা পাঁচ সদস্যের সংস্কার কমিটি গঠিত হয়।[১৯] মেকলে কমিটির প্রতিবেদন অনুসারে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলো অনুষ্ঠানের জন্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের অধীনে সিভিল সার্ভিস কমিশনার্স নামে

১৬. Article 87, Charter Act of 1833, দেখুন, A., C. Banerjee (ed.), *Indian Constitutional Documents* (Calcutta 1977-78), vol. 1, 259.

১৭. Anuradha Chanda, *Public Administration and Public Opinion in Bengal*, 1854-1885 (Calcutta 1986), 30.

১৮. Ralph Braibanti (ed.), *Asian Bureaucratic Systems Emergent from the British Imperial Tradition* (Duke University 1966), 104-7.

১৯. দেখুন, Macaulay Report on Civil Service and discussions on it, *Parliamentary Papers* (HC), No. 34 of 1855.

একটা স্থায়ী বাছাই কমিটি গঠিত হয়। আঠারো থেকে তেইশ বছর বয়স-সীমার মধ্যে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সকল নাগরিক প্রতি বছর অনুষ্ঠেয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশ নেবার যোগ্য বিবেচিত হয়। মেকলে কমিটি চেয়েছিল, ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে যাঁরা যোগ দেবেন, তাঁরা বাণিজ্যে উদ্যোগী ব্যক্তি না হয়ে বরং কৃতবিদ্য ব্যক্তি হবেন। কাজেই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার পাঠ্যসূচিতেও ইতিহাস ও সাহিত্যকে অধিক গুরুত্ব দেয়া হয় এবং এই পাঠ্যসূচি প্রণীত হয় অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচির ভিত্তিতে।[২০] বিশ্ববিদ্যালয়ে লব্ধ জ্ঞানের উপর জোর দেয়া হয়েছিল এই চিন্তা থেকে যে কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত কৃতবিদ্য প্রশাসকরাই সাম্রাজ্যকে স্বচ্ছ চিন্তাশক্তি ও সহমর্মিতা দ্বারা পরিচালনা করতে পারবেন। এই প্রতিযোগিতাভিত্তিক প্রবেশনের (recruitment) আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল প্রদেশওয়ারি নিযুক্তি। রাজনৈতিক ও অন্যান্য গুরুত্বের কারণে প্রার্থীরা বাংলাকে বেশি পছন্দ করতো, নববিজিত সীমান্তপ্রদেশগুলো ছিল তাদের পছন্দের তালিকায় সর্বনিম্নে। তাই প্রভাবশালী মহল থেকে কর্তৃপক্ষের উপর চাপ আসতো প্রার্থীদের পছন্দের জেলাগুলোতে নিযুক্তি দেবার জন্য। এই পরিস্থিতি এড়াবার জন্য এবং সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশে সবচেয়ে মেধাসম্পন্নদের নিযুক্তি নিশ্চিত করতে এই বিধান রাখা হয় যে প্রার্থীদের নিযুক্তি প্রদান করা হবে সম্পূর্ণরূপে মেধার ভিত্তিতে এবং যখন মেধার ভিত্তিতে কোন প্রার্থীকে বিশেষ একটি প্রদেশে নিযুক্তি প্রদান করা হবে, তাকে চাকুরিজীবনের শেষ পর্যন্ত সেখানেই চাকুরি করতে হবে। যেসকল প্রার্থী পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর পেত, তাদের নিযুক্তি দেয়া হতো বাংলা প্রেসিডেন্সিতে। সর্বোচ্চ মেধাসম্পন্নদের নিযুক্তি দেয়া হতো এই বিবেচনায় যে তাদের কেবল সবচেয়ে জনসংখ্যাপীড়িত ও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ কেবল শাসনই করতে হবে না, শেষ পর্যন্ত মেধার ভিত্তিতে কলকাতায় বৃটিশ ভারতের সর্বোচ্চ সরকারও পরিচালনা করতে হবে।

২০. বিষয় ও বরাদ্দ নম্বর ছিল নিম্নরূপ :

| | |
|---|---|
| ইংরেজি রচনা | ৫০০ |
| ইংরেজি সাহিত্য ও ইতিহাস | ১০০০ |
| গ্রীক ভাষা, সাহিত্য ও ইতিহাস | ৭৫০ |
| রোমান ভাষা, সাহিত্য ও ইতিহাস | ৭৫০ |
| ফরাসি ভাষা, সাহিত্য ও ইতিহাস | ৩৭৫ |
| জার্মান ভাষা, সাহিত্য ও ইতিহাস | ৩৭৫ |
| ইতালীয় ভাষা, সাহিত্য ও ইতিহাস | ৩৭৫ |
| গণিত | ১২৫০ |
| প্রাকৃতিক বিজ্ঞান | ৫০০ |
| নৈতিক ও রাজনৈতিক দর্শন | ৫০০ |
| সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য | ৫০০ |
| আরবি ভাষা ও সাহিত্য | ৫০০ |
| সর্বমোট | ৭৩৭৫ |

## বৃটিশ শাসনামলে সিভিল সার্ভিস (১৮৫৮-১৯৪৭)

কর্নওয়ালিস যদিও তাঁর 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'কে একটা অপরিবর্তনীয় আইনে পরিণত করেছিলেন, তথাপি ১৭৯০-৯৩ সালে তাঁর গড়ে তোলা সিভিল সার্ভিস ও লোক প্রশাসনের নীতি ও গঠনপ্রক্রিয়ায় কালক্রমে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকে সম্প্রসাারিত ও সুসংহত এবং পুরোপুরি মেট্রোপলিটান ব্যবস্থার অঙ্গীভূত করার সাথে সাথে এর আমলাতন্ত্রের ধরনেও প্রয়োজনমতো পরিবর্তন সাধন করা হয়। এর পর দেশের জনগোষ্ঠীকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত রাখা রাজনৈতিকভাবে সম্ভব ছিল না, যারা বৃটিশ শাসনকে মেনে নিয়েছিল এবং নতুন সরকারের সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেবার জন্য ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করেছিল এবং একটা যুগোপযোগী সামাজিক রূপান্তর ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল। বৃটেনে রাজনৈতিক আবহাওয়া এবং ভারতে সামাজিক বিবর্তন এ ধরনের প্রভূত্ব কায়েম করার পথে অন্তরায় ছিল। অপর দিকে ঔপনিবেশিক প্রভুরা, যারা নিজেদের বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিধর জাতি এবং সভ্যতার ধারক ও বাহক মনে করতো, তাদের কাছে এটাও রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে গ্রহণযোগ্য ছিল না যে তাদেরকে দেশের জনগণের সাথে সম অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে এ দেশ শাসন করতে হবে, যদিও তাদের নিজেদের বিচারে তাদের অনেকেই মেধাগত দক্ষতা এবং নৈতিক চরিত্রের মাপকাঠিতে সমপর্যায়ের ইউরোপীয়দের থেকে কোনো অংশে কম ছিলেন না।

### সিভিল সার্ভিসের ভারতীয়করণ

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সারা ভারতব্যাপী ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের প্রসারণ ঘটে আর তার ফলে আমলাতন্ত্রের আকার বৃদ্ধি পায় এবং রাজনৈতিকভাবে সচেতন মধ্যবিত্তের উদ্ভব হয়। এই পরিস্থিতি ভারতীয়দের ক্রমবর্ধমান মাত্রায় আমলাতন্ত্র ও প্রশাসনের আওতাভুক্ত করে। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ ভারতীয় রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় ভারতীয়করণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্য ঔপনিবেশিক শাসকদের প্রেরণা ও সাহস যোগায়।

এটা সত্য যে সিভিল সার্ভিসের নিয়োগনীতিতে মেকলে কমিটি পৃষ্ঠপোষণের স্থলে প্রতিযোগিতা প্রবর্তন করেছিল। কিন্তু পরীক্ষার পাঠ্যসূচি থেকে এটাই স্পষ্ট হয়ে উঠলো যে অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদের সম্পৃক্ত করাই এর লক্ষ্য। ভারতীয় প্রার্থীর তো প্রশ্নই উঠে না, ঐ দুই সেরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগত না হলে বৃটিশ স্নাতকদের পক্ষেও প্রতিযোগিতা করা দুঃসাধ্য ছিল। ১৮৫৫ সাল থেকে প্রতিযোগিতাভিত্তিক নিয়োগনীতি অনুসৃত হচ্ছিল। ১৯১৪ সাল পর্যন্ত মাত্র ৮৪ জন ভারতীয় ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের জন্য নির্বাচিত হয়েছিল; পক্ষান্তরে এই সময়কালে কৃতকার্য বৃটিশ প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ২৬৪৪, যাদের অধিকাংশ অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেছিল। আইলিংটন (Islington) কমিশন যথার্থই মন্তব্য

করেছিল যে বৃটিশ ও ভারতীয় প্রার্থীদের সংখ্যায় এই বিরাট ফারাকের কারণ এটা নয় যে ভারতীয়রা মেধায় খাটো ছিল; এর কারণ এই যে এই ব্যবস্থায় ভারতীয়দের লন্ডনে এসে প্রতিযোগিতা করতে হতো এবং পরীক্ষা দিতে হতো এমন একটা পাঠ্যসূচির ভিত্তিতে, যেটা অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজের ছাত্রদের অনুকূলে প্রণয়ন করা হতো।[২১]

ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা বৃটিশ লিবারেলদের সঙ্গে একযোগে দাবি জানিয়ে আসছিল যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলো একই সময়ে লন্ডনে ও ভারতে অনুষ্ঠিত করা হোক যাতে ভারতীয় প্রার্থীরা সমতার ভিত্তিতে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে পারে। কিন্তু ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে অন্তর্ভুক্তি প্রকৃত অর্থে প্রতিযোগিতামূলক হোক এমন কোনো অভিপ্রায় বৃটিশ কায়েমী স্বার্থের ছিল না ; তাই একযোগে বৃটেন ও ভারতে পরীক্ষা অনুষ্ঠানে তারা সায় দিতে পারেনি। এই পর্যায়ে ভারতীয়দের চাপ এবং বৃটিশ কায়েমী স্বার্থের চাপের মুখে ১৮৮৬ সালে পাঞ্জাবের গভর্নর চার্লস এচিসনের (Aitchison) নেতৃত্বে একটি ১৫ সদস্যের সংস্কার কমিশন গঠিত হয়। এচিসন কমিশন একটা সমাধান পেশ করলো, যেটা ইঙ্গ-ভারতীয় এবং ভারতীয় উভয় ধরনের স্বার্থের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে বলে মনে করা হলো। সকল শ্রেণীর ভারতীয়দের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে সাবোর্ডিনেট এক্সিকিউটিভ সার্ভিস ও সদ্যপ্রতিষ্ঠিত স্ট্যাটিউটরি সিভিল সার্ভিস বিলোপ করে অধিক বেতনসম্পন্ন নতুন দুটি ক্যাডার গঠন করা হয়।[২২] উভয় ক্যাডারই ছিল প্রাদেশিক পর্যায়ে। একটা প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিস, অপরটা সাবোর্ডিনেট সিভিল সার্ভিস। এ দু'টি চাকুরিতে নিয়োগের পদ্ধতি প্রতিযোগিতামূলক ছিল না; তা ছিল সরাসরি মনোনয়ন, বিভাগীয় পরীক্ষা এবং কর্মচারীদের সম্পর্কে গোপন মূল্যায়ন। প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসের নামকরণ হয় একেকটি প্রদেশের নামানুসারে, যেমন বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস, মাদ্রাজ সিভিল সার্ভিস, ইত্যাদি।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী চিন্তাবিদগণ প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিস নামে ভারতীয়দের জন্য আরেকটি প্রতিযোগিতামূলক বিকল্প আমলাতন্ত্র গঠন করে আইসিএস-এর সমান্তরাল একটা স্তর সৃষ্টির ঘোর বিরোধী ছিল। নতুন ব্যবস্থায় চাকুরিপ্রার্থীকে প্রথমে সাবোর্ডিনেট

---

২১. বৃটিশ ও ভারতীয় প্রার্থীদের তুলনামূলক বিচারের জন্য দ্রষ্টব্য, Report of the Royal (Islington) Commission on *Public Services in India*, 1913-16, Appendix Vol,. IX; B. B. Misra, *The Bureaucracy in India, An Historical Analysis of Development upto 1947* (New Delhi 1977), 101-102.

২২. ১৮৬১ সালের সিভিল সার্ভিস আইনের অধীন সাবেক অচুক্তিবদ্ধ সিভিল সার্ভিসের সংস্কার করে এর নতুন নাম দেয়া হয় সাবোর্ডিনেট এক্সিকিউটিভ সার্ভিস। সর্বনিম্নে সার্ভেয়ার থেকে সর্বোচ্চ ডেপুটি কালেক্টর পর্যন্ত এই সার্ভিসের আওতাভুক্ত ছিল। ১৮৭৯ সালে ভারতীয়দের একটা উচ্চতর সিভিল সার্ভিস গঠিত হয় যার নাম স্ট্যাচুটরি সিভিল সার্ভিস। এই সার্ভিসের লক্ষ্য ছিল কিছুসংখ্যক শিক্ষিত খ্যাতিমান ভারতীয়কে মনোনয়নের মাধ্যমে আইসিএস-দের জন্য সংরক্ষিত পদগুলোতে নিয়োগ করা। এই চাকুরি জনসাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্য হলো না, কারণ ইতিপূর্বে যারা অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও অনুগত এবং সমাজে উচ্চস্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন কেবল তাঁরাই এ পদের জন্য বিবেচিত হতেন।

সিভিল সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত হতে হতো স্বাভাবিক বিভাগীয় নিয়োগপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে, তারপর চাকুরিজীবীরা মনোনয়নের মাধ্যমে উচ্চতর প্রাদেশিক সার্ভিসে পদোন্নতি লাভ করতে পারতো। মনোনয়ন পেতে হলে প্রার্থীকে অবশ্যই বিশ্বস্ত ও অনুগত এবং শাসকদের সন্তুষ্টিবিধানে সক্ষম হতে হতো। সার্ভিসের লোকদের এ ধরনের মানসপ্রবণতা নিশ্চিতভাবেই রাজনৈতিক বিক্ষোভ ও সহিংসতা প্রশমনের জন্য সহায়ক ছিল। অতএব প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিস ছিল ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের মোটামুটি একচেটিয়া আধিপত্য অক্ষুণ্ন রাখার একটা কৌশল। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের একজন অত্যুৎসাহী প্রবক্তা ভাইসরয় লর্ড কার্জন মনে করতেন, আইসিএস পরীক্ষা একযোগে লন্ডন ও ভারতে অনুষ্ঠিত হলে ভারতীয়রা সিভিল সার্ভিসে বিপুল সংখ্যায় ঠাঁই করে নেবে। তাঁর যুক্তি ছিল এই যে ভারতীয় প্রার্থীরা মেধার দিক থেকে যোগ্য হতে পারে, কিন্তু নৈতিক দিক থেকে তারা অধঃপতিত ও কাপুরুষ। অতএব বিপুল সংখ্যায় সিভিল সার্ভিসে তারা প্রবেশ করলে বৃটিশ সাম্রাজ্যের নৈতিক মানের অবনতি ঘটবে।[২৩] তাই পরিকল্পিতভাবেই দুই স্তরবিশিষ্ট প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিস গঠন করা হয়েছে যাতে একদিকে বিক্ষোভরত মধ্যবিত্তকে শান্ত রাখা যায়, আরেকদিকে ভারতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা অনুষ্ঠান বর্জন করে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের একচেটিয়া প্রাধান্য বজায় রাখা যায়।

কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে চরম পন্থা অবলম্বন এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এতই বদলে দিল যে নতুন পরিস্থিতিতে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের পুরনো কাঠামো আর বজায় রাখা সম্ভব ছিল না। তাই অন্তত বাইরে ঔপনিবেশিক শাসন অক্ষুণ্ন রাখার জন্য সিভিল সার্ভিস ও প্রশাসন সহ রাষ্ট্র পরিচালনার সর্বস্তরে দেশের জনগণের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগি করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। মন্টেগু-চেম্‌সফোর্ড সংস্কার নামে পরিচিত ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন এই অবস্থার মোকাবিলার উপায়স্বরূপ ছিল। এই আইনের কাঠামোর মধ্যে সিভিল সার্ভিস ও প্রশাসনের নতুন সৌধ নির্মিত হয়। সিভিল সার্ভিসে নিয়োগ ও পদোন্নতির জন্য পুনর্গঠিত ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো বিভিন্ন জাতিগত সম্প্রদায়, অনগ্রসর সম্প্রদায়, বর্ণ, এমনকি অনগ্রসর অঞ্চলগুলোর জন্য পদ সংরক্ষণ এবং যোগ্যতা নির্ধারণের ব্যবস্থা। প্রতিযোগিতার মাধ্যমে মেধা নির্ধারণের চেয়ে ন্যায়বিচার ও রাজনীতি অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় হলো। চাকুরির ভারতীয়করণের নয়া নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পার্লামেন্ট কর্তৃক ১৯২৪ সালে গঠিত লী কমিশনের সুপারিশ অনুসারে কেন্দ্রীয় চাকুরিগুলো তদারক করার জন্য ১৯২৬ সালে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস কমিশন গঠিত হয়।[২৪] তখন থেকে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের জন্য প্রতি বছর

২৩. Lord Corzon to Lord Hamilton, 23 April 1900, in C. H. Philips (ed.), *The Evolution of India and Pakistan 1858 to 1947*: Selected Documents (Oxford 1962), 564.

২৪. পাঁচ সদস্যের সমন্বয়ে কমিশন গঠিত হয়। সদস্যরা সরাসরি সপরিষদ সেক্রেটারি অব স্টেট কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং তাঁদের কাছেই সদস্যরা দায়ী থাকেন।

ভারতে দুই-পঞ্চমাংশ, লন্ডনে দুই-পঞ্চমাংশ এবং প্রাদেশিক সার্ভিসগুলো থেকে এক-পঞ্চমাংশ পদোন্নতির মাধ্যমে বাছাই করার বিধান করা হয়। সার্ভিসগুলোর ভারতীয়করণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্য উচ্চতর সার্ভিসগুলোকে তিনটা শ্রেণীতে ভাগ করা হয়, যেমন সর্বভারতীয়, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক। সর্বভারতীয় সার্ভিসের সদস্যদের ভারতের যেকোন স্থানে নিযুক্ত বা বদলি করা যেতো এবং তাদের নিযুক্তি ও বদলি সপরিষদ সেক্রেটারি অব স্টেটের নিয়ন্ত্রণে ছিল। চাকুরির শ্রেণীগুলো হলো ভারতীয় সিভিল সার্ভিস, ভারতীয় পুলিশ সার্ভিস, ইন্ডিয়ান সার্ভিস অব ইঞ্জিনিয়ার্স এবং ফরেস্ট ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস। কেন্দ্রীয় সার্ভিসের আওতাভুক্ত ছিল দেশীয় রাজ্য, পররাষ্ট্র বিষয়, যোগাযোগ, শুল্ক, হিসাব নিরীক্ষণ ও হিসাব রক্ষণ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ। বাকি সব দপ্তর প্রাদেশিক সার্ভিসের আওতায় ন্যস্ত হয়। এটাই ছিল মূলত ১৯১৯ সালের দ্বৈত শাসনভিত্তিক সংবিধানের আমলাতান্ত্রিক ও প্রশাসনিক রূপায়ণ। ঔপনিবেশিক রাজনীতির অনুশাসন অনুসারে ১৯২০-এর দশক থেকে প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসগুলোকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হতো। এ পর্যন্ত ভারতে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক উভয় পর্যায়ের পাবলিক সার্ভিস ভারতীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের আওতাধীন ছিল, যা ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত স্বাধীনভাবে সার্ভিসগুলো নিয়ন্ত্রণ করতো। ১৯৩৫ সাল থেকে ১৯৩৫-এর সংবিধান কার্যকর হয় এবং ১৯৩৫ সাল থেকেই ভারতীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশন ফেডারেল পাবলিক সার্ভিস কমিশনরূপে পুনর্গঠিত হয়, যাকে এখন থেকে কেবল কেন্দ্রীয় সার্ভিসগুলোর তদারকি করতে হতো। প্রদেশে পৃথক পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠিত হলো প্রাদেশিক সার্ভিসগুলোর তদারকির জন্য।

## পাবলিক সার্ভিসের ভারতীয়করণ

স্বদেশী আন্দোলনকারীরা সিভিল সার্ভিসের ভারতীয়করণ দাবি করলেও বৃটিশ সরকার বিষয়টার প্রতি তেমন মনোযোগ দেয়নি। ১৯১৯ সালে ইন্ডিয়া এ্যাক্ট পাশ হলে প্রথমবারের মতো পাবলিক সার্ভিসগুলোর ভারতীয়করণের জন্য কিছু সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেয়া হয়। এর আগে বৃটিশ ভারতের কোনো প্রদেশেই সিভিল সাভিসে ভারতীয়দের প্রতিনিধিত্ব ১৬%-এর অধিক ছিল না, আর কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিসে এই হার ছিল শূন্যের কাছাকাছি। ১৯২২ সাল থেকে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত হতো এবং লী কমিশন রিপোর্ট বাস্তবায়ন করাতে ভারতীয়করণের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়।

১৯২২ সালের লী কমিশন রিপোর্ট এবং এর তাৎক্ষণিক বাস্তবায়নকে সিভিল সার্ভিসে ভারতীয়দের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অভিযাত্রার প্রকৃত সূচনা বলা যেতে পারে। এই রিপোর্ট যে পরিবর্তনের সূচনা করেছিল তা ১৯২৫ সাল থেকে এমন গতি লাভ করলো যে ১৯৩৫ সালের মধ্যে উচ্চতর সার্ভিসগুলোতে ভারতীয়দের প্রতিনিধিত্ব শতকরা পঞ্চাশে

গিয়ে পৌঁছালো, এবং অচিরেই ভারতীয় সদস্যদের সংখ্যা বৃটিশদের ছাড়িয়ে গেল।[২৫] ভারত যেদিন বিভক্ত হলো সেদিন পর্যন্ত ভারতীয় সিভিল সার্ভিস ও সকল প্রশাসনিক ক্যাডারে ভারতীয়দের একচ্ছত্র প্রাধান্য ছিল।

## ক্রিয়াশীল আমলাতন্ত্র : জেলা প্রশাসন

প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে ও কার্যক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্র মহানগরীর কেন্দ্র থেকে দূর দূরান্তে অবস্থানকারী জনগণকে দক্ষভাবে এবং লাভজনকভাবে শাসন করার লক্ষ্য অর্জনে কিভাবে ক্রিয়াশীল ছিল তা দেখার জন্য আমরা যথাযথভাবে জেলা প্রশাসনের রীতিপদ্ধতির দিকে চোখ ফেরাতে পারি। এ জেলা ছিল সেই ইউনিট, যাকে আমরা সত্যিকার অর্থে ক্ষুদ্রাকার ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র বলে অভিহিত করতে পারি। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগঠনপ্রক্রিয়ায় জেলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। প্রকৃতপক্ষে ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি জেলা থেকেই রাষ্ট্রগঠনপ্রক্রিয়া শুরু করেছিল। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের প্রাণকেন্দ্র কলকাতা ছিল একটি স্বশাসিত উপনিবেশ এবং এটি ছিল তিনটি মৌজা নিয়ে গঠিত একটি জেলা। মৌজাগুলো হচ্ছে কলকাতা, সুটানুটি ও গোবিন্দপুর। কোম্পানি ১৬৯৮ সালে প্রাপ্ত সনদবলে এ তিনটি মৌজা লাভ করে। ১৭৫৭ সালে একটি নতুন জেলা ২৪ পরগনাকে এই ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের সাথে যুক্ত করা হয়। এ জেলাটি ছিল পলাশীর ঘটনা সংঘটনের জন্য নতুন নবাবের উপহার। এ ছাড়া ১৭৬০ সালে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের সাথে আরো তিনটি বিস্তৃত জেলা যুক্ত করা হয়। জেলাগুলো হচ্ছে চট্টগ্রাম, বর্ধমান ও মেদিনীপুর। কোম্পানি এই সংযুক্ত জেলাগুলোর প্রশাসন থেকেই জেলা প্রশাসনের কলাকৌশল সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করেছিল। ক্লাইভ-১৭৬৫ সালে দীউয়ানি চুক্তির পর যে শাসনপদ্ধতি গড়ে তুলেছিলেন, সেটা মূলত ছিল জেলার সঙ্গে সম্পৃক্ত, কারণ এখানে আমরা স্পষ্ট কোনো কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচয় পাই না।[২৬] তা ছাড়া ১৭৭২ থেকে

২৫. ১৯৪২ সালে আইসিএস সহ উচ্চতর সার্ভিসগুলোকে ভারতীয় ও ইউরোপীয়দের প্রদেশওয়ারি অনুপাত :

| প্রদেশ | ভারত | ইউরোপ | মোট |
|---|---|---|---|
| মাদ্রাজ | ১০৬ | ৮১ | ১৮৭ |
| বোম্বাই | ৮৪ | ৬৬ | ১৫০ |
| বাংলা | ১১১ | ৯৬ | ২০৭ |
| উত্তর প্রদেশ | ১০৯ | ১০৫ | ২১৪ |
| পাঞ্জাব | ৭৮ | ১০৩ | ১৮১ |
| বিহার-উড়িষ্যা | ৬৭ | ৬৩ | ১৩০ |
| মধ্য প্রদেশ | ৪৬ | ৪৬ | ৯২ |
| আসাম | ১৬ | ২৫ | ৪১ |
| মোট | ৬১৭ | ৫৮৫ | ১২০২ |

২৬. সৈয়দ মোহাম্মদ রেজা খানের উপর নায়েব দীউয়ানরূপে কোম্পানির পক্ষ থেকে রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়ের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল। কিন্তু রেজা খান নাবালক নবাবের প্রতিভূ হিসেবে দেশের অধিকর্তাও ছিলেন। বাস্তব অবস্থা এই যে তিনি গ্রামাঞ্চল থেকে রাজস্ব আদায় করে তার দীউয়ানি অংশ কোম্পানিকে প্রদান করতেন। ক্লাইভের ব্যবস্থা প্রথমে এভাবেই চলেছিল।

১৭৯৩ সাল পর্যন্ত রাজস্ব প্রশাসনের সকল পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রকৃতপক্ষে জেলা প্রশাসনকে নিখুঁত করার লক্ষ্যেই পরিচালিত হয়েছিল।

অতএব এটা অস্বাভাবিক কিছু ছিল না যে কর্নওয়ালিসের বিধান (১৭৯৩) জেলাগুলোকে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের কেন্দ্রবিন্দু করে সেগুলোর উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিল। জেলা প্রশাসনের এই দিকনির্দেশক ভূমিকা ১৯৪৭ সালে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান পর্যন্ত অটুট ছিল। ই. এন. বেকার (Baker) নামে একজন সিভিলিয়ান, যিনি অর্থসচিব ও প্রদেশের লেফটেন্যান্ট গভর্নরের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁর ভাষায় "এটি সরকারের চোখ ও কানের মতো" সঙ্গতিপূর্ণভাবে কাজ করেছে।[২৭] কিন্তু মাঝে মাঝে জেলা প্রশাসনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। প্রতিবারই পরিবর্তন এসেছে জেলা আমলাতন্ত্রের নির্বাহী ও বিচার বিভাগীয় কার্যক্রমের ক্ষেত্রে। ঔপনিবেশিক আমলের সমস্তটা জুড়ে জেলা পর্যায়ে নির্বাহী বিভাগ ও বিচাব বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক অস্থিতিশীল ছিল। সব সময়েই অস্থিতিশীলতার সৃষ্টি হয়েছিল ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণব্যবস্থায় উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে। যেমন ধরা যাক ১৭৬৫ থেকে ১৭৭২ সালের সময়কার অবস্থার কথা। নবগঠিত রাষ্ট্র তখনো পরিপূর্ণ রূপ পায়নি এবং স্থানীয় অভিজাতদের সাথে ক্ষমতা ভাগাভাগি করাই সেই সময়কার মুখ্য নীতি ছিল। জেলা কালেক্টরের (তখন সুপারভাইজার বলা হতো) কর্মকাণ্ডকে প্রকৃত দেশপরিচালনার আওতাভুক্ত করা হয়। প্রকৃত ক্ষমতা তখন ছিল দেশীয় দীউয়ান ও মুৎসুদ্দিদের হাতে। কিন্তু ১৭৮০'র দশকে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ততোদিনে বাইরের বা ভেতরের যেকোন হুমকি মোকাবেলা করার জন্য যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস ও শক্তি অর্জন করেছে। জেলা কালেক্টরকে পরিপূর্ণ প্রশাসনিক ও বিচারক্ষমতা দেয়া হলো এবং বলা হলো তাঁর জেলাকে তিনি যেন তেমন স্বৈরাচারী পন্থায় শাসন করেন, যেমনভাবে শাসন করতেন তাঁর সমকক্ষ মুগল ফৌজদার, অন্য একটি সরকারের প্রধান। কিন্তু এ দুই শাসকের মধ্যে বড় একটা পার্থক্য ছিল। ফৌজদারের ছিল নিজের মানবতাবোধ ও বিবেক অনুযায়ী ক্ষমতা প্রয়োগের পর্যাপ্ত স্বাধীনতা। কিন্তু তাঁর উত্তরসূরি জেলা কালেক্টরের সেই স্বাধীনতা ছিল না। সুনির্দিষ্ট আইনের অধীনে কাজ করাই কালেক্টরের দায়িত্ব ছিল। কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন না নিয়ে সুনির্দিষ্ট আইনের ব্যত্যয় ঘটাবার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। এভাবে মনস্বী ব্যক্তিদের স্বৈরাচারের স্থান নিল জড়বোধসঞ্জাত নীতি ও বিধিমালার স্বৈরাচার। কিন্তু তথাকথিত নীতিমালার শাসন আইনের সার্বভৌমত্বকে সমুন্নত রেখেছে বলে কোনক্রমেই মনে করা যায় না। কারণ দৃশ্যত এ নীতিমালা প্রণীত ও কার্যকর করা

২৭. *Judicial Proceedings of the Government of Bengal*, July 1901, No. 21, (National Archives of Bangladesh). নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণের যৌক্তিকতার উপর বিতর্ক কার্যবিবরণীর মধ্যে বিধৃত। সংখ্যাগুরুর অভিমত ছিল জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সর্বোচ্চ দায়িত্ব অব্যাহত রাখার পক্ষে।

হয়েছিল ঔপনিবেশিক সমাজের উদ্বৃত্ত নিংড়ে নেবার জন্য, সমভিত্তিতে এর অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার জন্য নয়।

কেবল কোম্পানির থলি ভরবার জন্য স্থানীয় প্রশাসনের এরূপ কঠোর ও নির্মম পদ্ধতি অবলম্বন বৃটিশ পার্লামেন্টে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল বলে মনে হয়। এ কারণে পার্লামেন্ট ভারতে কোম্পানির ক্রিয়াকলাপে হস্তক্ষেপ করে এবং লর্ড চার্লস কর্নওয়ালিসকে গভর্নর জেনারেলরূপে (১৭৮৬-১৭৯৩) প্রেরণ করে। তাঁর উপর অর্পিত হয় বৃটিশ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের আদর্শ অনুসারে নতুন রাষ্ট্রের প্রশাসনকে ঢেলে সাজাবার দায়িত্ব। কর্নওয়ালিস পূর্ব ভারতে বৃটিশের অধিকৃত অঞ্চলগুলো শাসনের জন্য একটা বিধিমালা প্রবর্তন করেন। 'কর্নওয়ালিস বিধিমালা' নামে পরিচিত তাঁর বিধিমালা এক ধরনের আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল, যাতে শাসক ও শাসিত একই আইন ও আদালতের আওতাভুক্ত হয়। এই ব্যবস্থা প্রাচ্যের সমাজে এযাবৎকাল অজানা ছিল। তা ছাড়া বিচার বিভাগের কার্যাবলীকে নির্বাহী বিভাগ থেকে বহুলাংশে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন করা হয়। আইনের শ্রেষ্ঠত্বকে অতিরিক্ত গুরুত্ব প্রদানের জন্য সামাজিক মর্যাদাক্রমে বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষকে নির্বাহী বিভাগের উপরে স্থান দেয়া হয়। জজকে বেতন ও মর্যাদা উভয় দিক থেকেই জেলা প্রশাসনে প্রথম স্থান দেয়া হয় এবং কালেক্টরকে দ্বিতীয় স্থান দেয়া হয়। জজের উপর বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতার পাশাপাশি পুলিশের ক্ষমতাও অর্পণ করা হয় এবং তাঁকে জেলার ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্বও প্রদান করা হয়।[২৮] কর্নওয়ালিস গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন যে যদি রাষ্ট্র জনগণের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান করতে পারে, তাহলে দেশের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি আপনাআপনিই অর্জিত হবে। এ কারণেই নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক করা হয়।

যদিও মনে করা হয়েছিল যে কর্নওয়ালিসের জেলা প্রশাসন পরিকল্পনা চিরস্থায়ী না হলেও দীর্ঘস্থায়ী হবে, কিন্তু অচিরেই এর মধ্যে কিছু পরিবর্তন এসে গেল এবং এর প্রবক্তার উচ্চ কণ্ঠের নীতিবাক্য ভেস্তে গেল। অল্পদিনের মধ্যেই পরিষ্কার হয়ে গেল যে জেলার মধ্যে জজকে সর্বোচ্চ আসন প্রদান মহানগরীয় সমাজের স্বার্থ পরিপূরণের জন্য প্রতিষ্ঠিত ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের লক্ষ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কালে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র গ্রাম পর্যায়ে বিস্তৃত হলো, এর ভৌগোলিক সম্প্রসারণ ঘটলো সারা ভারত জুড়ে। ফলে নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি এমন বদলে গেল যে বিচার বিভাগের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে কর্নওয়ালিসের

২৮. ১৭৭২ থেকে ১৭৯৩ সালের মধ্যে কর্নওয়ালিস বিধির অধীনে জেলা কর্মকর্তাদের ক্ষমতা ও একতিয়ারে যে পরিবর্তন ঘটে তার বিবরণ দেখুন, J. H. Herringbone (compiler), *An Elementary Analysis of the Laws and Regulations enacted by the Governor-General in Council at Fort William in Bengal for the Civil Government of the British Territories under that Presidency*, 3 Vols., (Calcutta 1805-1817); J. E. Colebrooke (compiler), Supplement to the Digest of the Regulations and Laws enacted by the Governor General in Council for the Civil Government of the Territories under the Presidency of Bengal, (Calcutta 1807).

ধারণা রাজনৈতিকভাবে উদ্দেশ্য সাধনের অনুপযোগী এবং অর্থনৈতিকভাবে ব্যয়বহুল প্রমাণিত হলো। এতএব জেলা প্রশাসন ব্যবস্থায় সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দিল। ১৮২০-এর দশকে সরকার কর্তৃক লাখেরাজ জমির উপর কর পুনরারোপিত হওয়ায় অসন্তোষ ব্যাপকভাবে বিস্তারলাভ করলে এবং এমনকি গ্রামাঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের সহিংসতার ঘটনা ঘটলে সরকার জজের ম্যাজিস্ট্রেটক্ষমতা প্রত্যাহারপূর্বক একে জেলার নির্বাহী কর্মকর্তা কালেক্টরের ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীতা অনুভব করলো। এভাবে ১৮৩১ সালে কালেক্টরের পদের সাথে ম্যাজিস্ট্রেটের পদ যুক্ত করা হলো। এই নতুন ব্যবস্থায় ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর পুলিশের ক্ষমতা প্রয়োগ করে কোন সন্দেহভাজন অপরাধীকে গ্রেপ্তার করার এবং তাঁর বিচারক্ষমতা প্রয়োগ করে নিজ আদালতে গ্রেফতারকৃত পুরুষ বা মহিলার বিচার করার ক্ষমতা লাভ করলেন।[২৯] এভাবে সন্দেহকারী নিজেই হয়ে যান বিচারক এবং নথিপত্রে প্রমাণ পাওয়া যায় যে এর ফলে সাধারণত সন্দেহভাজন ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হয়ে যায়। অধীন জনগোষ্ঠীর উপর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ কায়েম রাখতে হলে এমন সংক্ষিপ্ত বিচারের তীব্র প্রয়োজন ছিল।

ক্রমবর্ধমান জাতীয়তাবদী বিক্ষোভ এবং রাজনৈতিক অপরাধ রুখতে হলে ম্যাজিস্ট্রেটের নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা আরো জোরদার করা প্রয়োজন বলে অনুভূত হয়। সে কারণে মহাবিদ্রোহের পর জেলার বিষয়গুলোতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর সর্বময় ক্ষমতা লাভ করলেন। জজের আগের ভাবমূর্তি বিদ্যমান থাকলো না। ১৮৬১ সাল থেকে জেলার নির্বাহী ব্যবস্থা আরো শক্তিশালী করার জন্য জেলা পুলিশ সুপারিন্টেনডেন্ট নামে একটা নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের সদস্য জেলা পুলিশ সুপারিন্টেনডেন্ট হলেন আরেক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশের অধীন। ম্যাজিস্ট্রেটকে সহায়তা করতেন কয়েকজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। মোট কথা, মহাবিদ্রোহের পর জেলা নির্বাহীর পদটিকে ততোটাই স্বৈরাচারী করা হলো যতোটা তা ছিল কর্নওয়ালিসের বিধিমালা কার্যকর করার পূর্বে। বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের শেষ অবধি আইনের শাসনের নামে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরের কঠোর নিয়ন্ত্রণ শিথিল করার কথা ভাবা হয়নি।[৩০]

২৯. ইংল্যান্ডে লিবারেলদের চাপের মুখে ১৮৩৭ সালে ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরের পদ দুটি পৃথক করা হয়। কিন্তু মহাবিদ্রোহ ঔপনিবেশিক সরকারকে বাধ্য করলো ন্যায়বিচারের তোয়াক্কা না করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির লক্ষ্যে জেলাপ্রশাসকের ক্ষমতা প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি করতে। ১৮৫৯ সালে তাই দুটো পদ আবার যুক্ত হয়ে গেল এবং ১৯৪৭ সালে বৃটিশ শাসনের অবসান পর্যন্ত এই ব্যবস্থা বলবৎ ছিল। কিন্তু পদটির নামকরণ করা হলো জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর।

৩০. ১৮৮০ সালে বিচার বিভাগের মানোন্নয়নের জন্য সরকার পৃথক বিচার বিভাগীয় সার্ভিস গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। সিভিলিয়ানরা জেলা পর্যায়ে নয় বছর চাকুরি করার পর প্রশাসনের নির্বাহী ও বিচারবিভাগ যে-কোনো একটিকে বেছে নিতে পারতো। দেখুন, *Judicial Proceedings,* July 1881, (Bangladesh National Archives); Sarmila Benerjee, ***Studies in Administrative History of Bengal*** (1880-1898), New Delhi 1978), 106-107.

১৭৯৩ সালে জেলার আমলাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ছিল অতিশয় ক্ষুদ্র এবং জটিলতামুক্ত। মাত্র একজন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও একজন জেলা জজ গুটিকয়েক অধস্তন কর্মচারীর সাহায্যে সমগ্র জেলা প্রশাসন পরিচালনা করতেন। তখন জেলাগুলোও ছিল আয়তনে বিশাল, সমগ্র বাংলায় জেলার সংখ্যা ছিল মাত্র ১৭টি।[৩১] জেলাগুলোর বিশালত্ব থেকেই বোঝা যায় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দশকগুলোতে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ও তার শাসিত জনগণের মধ্যে সম্পর্কের ব্যবধান কত বেশি ছিল। গ্রামাঞ্চল তখন জমিদারদের জিম্মায় ছেড়ে দেয়া হয়েছিল। রাষ্ট্র তখন রাজস্ব আদায় করেই তুষ্ট থাকতো। লাভ ও লভ্যাংশনির্ভর একটা ব্যবসায়ী কোম্পানির জন্য এটা অস্বাভাবিক বা বিচিত্র কিছু নয়।

কেবল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী কিছুটা রাজনৈতিক মর্যাদা অর্জন করলো এবং একটা পূর্ণাঙ্গ আধুনিক রাষ্ট্ররূপে পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করলো। সুবিস্তীর্ণ জেলাগুলোকে খণ্ডবিখণ্ড করে ছোট ছোট জেলা সৃষ্টি করা হলো সুশাসনের স্বার্থে এবং সেগুলোর প্রত্যেকটিকে ভেঙে ভেঙে কতকগুলো মহাকুমা গঠন করা হলো। মহকুমার শাসনভার ছিল একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের উপর ন্যস্ত, যিনি একাধারে ম্যাজিস্ট্রেট ও নির্বাহী প্রধান। ১৯১৩ সালে বাংলায় জেলার সংখ্যা দাঁড়ায় ২৮টি। বাংলা জেলা প্রশাসন কমিটি (১৯১৩-১৪) আরো বিভাজনের প্রস্তাব দিয়েছিল। কারণ সেসময় স্বদেশী আন্দোলন ও সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রম চলছিল। প্রতিটি জেলায় বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা, ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটা বিশদ প্রতিষ্ঠান ছিল। কী আশ্চর্য পরিবর্তন ! বাংলায় একটা সুবিশাল জেলা শাসন করবার জন্য ১৭৯৩ সালে ছিলেন কেবল দু'জন সিভিলিয়ান—একজন কালেক্টর এবং একজন জজ, যাঁদের শাসনকার্যের জন্য পর্যাপ্ত মনে করা হয়েছিল। অথচ বিংশ শতাব্দীর শুরুতে যখন সাম্রাজ্যবাদের সূর্য মধ্য গগনে, তখন গড়পড়তা পূর্ববর্তী জেলার চেয়ে আয়তনে অর্ধেক একটি জেলার শাসনকার্য পরিচালিত হচ্ছিল অর্ধ ডজনেরও কম সিভিলিয়ান দ্বারা। নির্বাহী শাখায় আমরা দেখতে পাই একজন ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর, একজন অতিরিক্ত ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর, একজন পুলিশ সুপারিন্টেনডেন্ট, একজন অতিরিক্ত পুলিশ সুপারিন্টেনডেন্ট, দু'জন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর (প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতাসম্পন্ন) এবং একজন সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর। বিচার বিভাগে যেসকল পদ ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের জন্য সংরক্ষিত ছিল, সেগুলো ছিল সিভিল ও সেশন জজ, অতিরিক্ত জজ, সহকারী জজ, যুগ্ম ম্যাজিস্ট্রেট (বিচার বিভাগীয়) এবং সহকারী ম্যাজিস্টেট ও কালেক্টর (নির্বাহী) পদ এবং সহকারী ম্যাজিস্ট্রেটগণ (বিচার বিভাগীয়) ছিলেন শিক্ষানবিশ, যাঁরা অন্যান্য সিভিলিয়ান থেকে প্রশিক্ষণ নিত।

৩১. জেলাগুলো হচ্ছে বর্ধমান, বীরভূম, মেদিনীপুর, ২৪ পরগনা, কলকাতা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, যশোর, ঢাকা, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট। শেষোক্ত জেলাটি ১৮৭৪ সালে অনিয়ন্ত্রিত আসাম প্রদেশের নিকট হস্তান্তরিত হয়।

জেলা পর্যায়ে আমলাতন্ত্রের এমন শাখা বিস্তারের কারণ পার্কিনসনের সূত্র নয়, যে সূত্র অনুসারে আমলাতন্ত্রের প্রসার ঘটে। প্রকৃতপক্ষে এই প্রসারণ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ প্রসারণের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল, যা ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বময় বিস্তারের প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় ছিল। ভারতকে মনে করা হতো বৃটিশ রাজের মুকুটের উজ্জ্বলতম মণি। বাস্তাবিকই জেলা ও তার অন্তর্গত মহকুমাগুলোতে সিভিলিয়ানরা ছিল ঐ মণির 'ইস্পাত কাঠামো'। জেলা ও এর অন্তর্ভুক্ত মহকুমাগুলোকে ক্ষুদ্রাকার সাম্রাজ্য বলে গণ্য করা হতো। এইরূপ দুষ্টিভঙ্গি ১৯৩০ সালেও হ্রাস পায়নি যখন এলিটবাদী আমলাতন্ত্র বৃটিশদের হাত থেকে ভারতীয় শরিকদের হাতে চলে যাচ্ছিল। যদিও কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের অনেক ঊর্ধ্বতন পদ প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসের সদস্যদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়, তথাপি সাবডিভিশনাল অফিসার, জেলা জজ এবং ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরের পদে কখনোই প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসের সদস্যদের নিয়োগ করা হয়নি। সাম্রাজ্যবাদী নিয়ন্ত্রণের স্বার্থে আমলাতান্ত্রিক সিঁড়ির এই বুনিয়াদি ধাপগুলোতে আইসিএস-এর সদস্যদের নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত ছিল।[৩২]

### একটি মূল্যায়ন

ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন বাস্তব ক্ষেত্রে কোনো মতেই মুগল সাম্রাজ্যবাদী শাসনের চেয়ে কম স্বৈরাচারী ছিল না। কিন্তু একটা তফাত ছিল : মুগল স্বৈরাচার ছিল ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং অভিজাততান্ত্রিক, কিন্তু বৃটিশ স্বৈরাচার ছিল প্রাতিষ্ঠানিক এবং নির্দেশিতভাবে প্রতিযোগিতামূলক। বৃটিশ স্বৈরাচারী শাসন পরিচালনা করতো একদল পেশাদার আমলা, যারা নিয়ন্ত্রিত হতো আইন ও উচ্চতর আমলাদের দ্বারা এবং কোন ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছা অনুযায়ী তারা কাজ করতো না, যেমনটি আমরা দেখেছি মুগল স্বৈরতন্ত্রের আমলে। যদিও মুগলরা নৃতাত্ত্বিক বিবেচনায় বহিরাগত ছিল, ভারতে তারা নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছিল এবং স্থানীয় প্রথাগত ঐতিহ্য এবং ইসলামের বিধান অনুযায়ী ভারতীয় এলিটদের সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সাম্রাজ্য শাসন করতো। অন্য দিকে বৃটিশরা সাগরের পরপার থেকে তাদের নিয়োজিত কনসাল ও সিভিল সার্ভেন্টদের মাধ্যমে একটি কলোনী হিসেবে তাদের দখলকৃত রাজ্য শাসন করতো। তৎকালীন পরিবহনব্যবস্থার নানা প্রতিকূলতার মধ্যে সরাসরি সাম্রাজ্য নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান করা তখন

৩২. ভারতে রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে সৃষ্ট নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে ভারত থেকে বৃটিশ শাসন প্রত্যাহার ছিল কেবল সময়ের ব্যাপার। তবুও স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স মনে করতেন যে বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে লন্ডনে সিভিল সার্ভিসে নিয়োগ বন্ধ রাখার কারণে ভারতে বৃটিশ শক্তির ভিত এতই দুর্বল হয়ে পড়ে যে এর ফলে ভারত থেকে বৃটিশ শাসন প্রত্যাহার ত্বরান্বিত হয়েছে, Cripps's speech in the House of Commons, 5 March 1947, *Indian Constitutional Documents*, vol. iv, 278-80, edited by A. C. Banerjee.

সম্ভব ছিল না। আমরা খোশখেয়ালের বশে তাকে ঔপনিবেশিক মডেল বলে অভিহিত করতে পারি, কিন্তু এর সাথে এ কথাও উল্লেখ করতে হবে যে অন্যান্য সমসাময়িক শক্তি নিজ নিজ অধিকৃত অঞ্চল শাসনের জন্য যে আমলাতন্ত্র গড়ে তুলেছিল, তার সাথে বৃটিশদের গড়ে তোলা আমলাতন্ত্রের কোন সামঞ্জস্য ছিল না। এটি নিজেই ছিল একটি বিশেষ ধরনের আমলাতন্ত্র।

তাত্ত্বিকভাবে, ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের আমলাতন্ত্র পরিজ্ঞাত বিধি ও প্রবিধানমালা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। সিভিলিয়ানদের আইনের শ্রেষ্ঠত্বকে মেনে নিতে হতো, এবং তাদেরকে কোম্পানির (এবং পরে বৃটিশ রাজ্যের) কর্মচারি হিসেবে বিশ্বস্ততার সাথে তাদের দায়িত্ব পালন করতে হতো এবং সর্বাবস্থায় যেকোন প্রলোভন ও দুর্নীতি থেকে মুক্ত থাকতে হতো। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে সিভিলিয়ানরা বোধগম্যভাবে নিজেদেরকে জনগণের প্রভুতে পরিণত করেছিল এবং তাদের মধ্যে মাত্র কয়েক জন বিলাসিতা ও স্বজাতিপ্রীতির মোহে আচ্ছন্ন থাকতো না। লোভ তাদেরকে বিপুল পরিমাণে দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল, এবং আইন তাদেরকে অবৈধ কার্যকলাপ থেকে বিরত রাখার জন্য সহায়ক ছিল না।

ম্যাক্স ওয়েবার ও অন্যদের দ্বারা নির্ধারিত আধুনিক আমলাতন্ত্রের উপাদান কর্নওয়ালিসের ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় পরিমাণে বিদ্যমান ছিল না, যা দ্বারা ১৮৫৪ সাল পর্যন্ত ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র শাসিত হয়েছে। আমলাতন্ত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে প্রতিযোগিতা, যা কর্নওয়ালিসের ব্যবস্থায় বিদ্যমান ছিল না। এক্ষেত্রে সিভিলিয়ানদের প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বাছাই না করে পৃষ্ঠপোষণের মাধ্যমে বাছাই করা হতো। পৃষ্ঠপোষণ ব্যতীত কেউ বৃটিশ ভারতের আমলাতন্ত্রে প্রবেশ করতে পারতো না। সিভিলিয়ানরা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করতো। এর ফলে সিভিলিয়ানদের পক্ষে নিরপেক্ষতা বজায় রাখা কার্যত অসম্ভব হতো এবং একে খুব বেশি মূল্যও তখন দেয়া হতো না। অথচ এ নিরপেক্ষতা ছিল আমলাতন্ত্রের আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। যদিও ১৮৫৫ সালে নিয়োগপ্রক্রিয়ায় প্রতিযোগিতার মতো একটি উপাদান যুক্ত করা হয়েছিল, বাস্তব ক্ষেত্রে তা হয়ে দাঁড়িয়েছিল কেবল কেমব্রিজ ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্তদের মধ্যে প্রতিযোগিতা। কারণ ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার পাঠ্যসূচি এমনভাবে তৈরি হয়েছিল যেন তা উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্তদের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী হয়, এবং প্রাপ্ত পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে ১৯১০ সাল পর্যন্ত ভারতীয় সিভিল সার্ভিস ছিল প্রায় একচেটিয়াভাবে উক্ত দুটি প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ের করায়ত্ত। যদিও পূর্বে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস একচেটিয়াভাবে কোম্পানির পৃষ্ঠপোষণক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিবর্গের করায়ত্ত ছিল, এখন তা দু'টি প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদের একচেটিয়া অধিকারে চলে গেল। অন্য যে কারণে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে গেছে, তা হচ্ছে কেবল লন্ডনে পরীক্ষা অনুষ্ঠান। লন্ডন থেকে সুদূর ভারতে বিদ্যমান সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতা ভারতীয় প্রার্থীদের

জন্য ভারত থেকে লন্ডনের পথ পাড়ি দিয়ে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়া কার্যত অসম্ভব করে তুলেছিল।

ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের আধুনিক আমলাতন্ত্র হিসেবে অর্থাৎ প্রতিযোগিতা, পেশাগত প্রশিক্ষণ ও অঙ্গীকার, সংগঠন, সংহতি, নিরপেক্ষতা এবং এর সদস্যদের মর্যাদার ধারক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিকাশলাভের পথে কিছু অন্তরায়ও বিদ্যমান ছিল। চুক্তিবদ্ধ ও চুক্তিবহির্ভূত সিভিল সার্ভিসে ছিল দুটি স্বতন্ত্র শ্রেণী। এদের একটি ছিল সুবিধাভোগী, অন্যটি সুবিধাভোগী নয়; একটি ইউরোপীয়, অন্যটি প্রধানত ভারতীয়। চুক্তিবদ্ধ সিভিল সার্ভেন্টদের কোন প্রশিক্ষণ দেয়া হতো না এবং তারা ছিল অসন্তুষ্ট গোষ্ঠী, কারণ রাষ্ট্রের প্রতি তাদের সেবা আদৌ অসম না হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে অন্যদের সমান মর্যাদা ও বেতন প্রদান করা হতো না। এ্যাচিশন কমিশন তাদের চাকুরির মর্যাদাকে উচ্চস্তরে উন্নীত করেছিল, কিন্তু তাদের চাকুরিগত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য কিছুই করা হয়নি। শিক্ষানবিশি ছাড়া তাদের প্রশিক্ষণ দানের জরুরি ব্যবস্থা তখনও গড়ে তোলা হয়নি। স্ট্যাটিউট্রি সিভিল সার্ভিস (১৮৭৯) লাভের ভিত্তি প্রতিযোগিতা ছিল না, এমনকি শিক্ষাগত যোগ্যতাও ছিল না। এক্ষেত্রে উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণই ছিল নিয়োগ লাভের জন্য প্রধান বিবেচ্য বিষয়। 'তালিকাভুক্ত' পদগুলোতে যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিরা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নয়, বিভাগীয় সুপারিশের মাধ্যমে এসেছিল, এবং কেবল তারাই সুপারিশ লাভ করেছিল, যারা নিজেদের বৃটিশ রাজের জন্য হিতকর বলে প্রমাণ করতে পেরেছিল। ১৯১৯ সালের পরে বহু আইসিএস সদস্যকে প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসে নিয়োগ দান করা হয়। বেতন ও সুবিধার দিক দিয়ে উভয় সার্ভিসের মধ্যে পার্থক্য ছিল, যদিও তারা একই স্থানে একই অফিসে কর্মরত ছিল এবং একই ধরনের কার্য সম্পাদন করছিল। ১৯২২ সাল থেকে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষা ভারতে অনুষ্ঠিত হওয়া শুরু হয়। কিন্তু এ পরীক্ষা পরিচালনা করতো একটি স্বাধীন কর্তৃপক্ষ (ভারতীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশন)। লন্ডন কেন্দ্রে এ পরীক্ষা পূর্বের মতো পরিচালনা করতো বৃটিশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনার্স। ১৯২৫ সাল থেকে প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসের জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে শুরু হয়। ১৯৩৫ সালের এ্যাক্টের অধীনে প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিস কমিশন গঠিত হয়।

এভাবে ১৯৪০ সালের মধ্যে আমরা বেশ কিছু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োজিত আমলাতন্ত্র পেয়েছি। এসব কর্তৃপক্ষ হচ্ছে পাবলিক সার্ভিস কমিশনার্স, ইন্ডিয়ান পাবলিক সার্ভিস কমিশন এবং প্রাদেশিক পাবলিক সার্ভিস কমিশন। বিভিন্ন বিবেচনার ভিত্তিতে বিভাগীয় সুপারিশের মাধ্যমে নিয়োজিত একটি আমলাতন্ত্রও আমরা পেয়েছি। এসব বিবেচনার মধ্যে রয়েছে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব, বর্ণভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব, আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্ব ইত্যাদি। বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিভিন্ন মান ও বিবেচনার ভিত্তিতে নিয়োজিত এবং একই

ধারায় বিভিন্নভাবে প্রশিক্ষিত সিভিল সার্ভেন্টগণ একই স্থানে, একই অফিসে এবং প্রায়শ একই বেতন-স্কেলে চাকুরি করেছে। কখনো এটা কল্পনা করা কঠিন ছিল না যে বিভিন্ন স্বার্থ, বেতন-স্কেল ও মর্যাদার সমন্বয়ের মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত এসব চাকুরিজীবীর মধ্যে ত্যাগের মনোভাব, সাংগঠনিক সংহতি এবং পেশাগত অঙ্গীকার ও নিরপেক্ষতা বিদ্যমান থাকতে পারে না। এমনকি বৃটেনের সিভিল সার্ভিস কমিশনার্স কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত সিভিলিয়নরাও নিজেদের কোনো ত্যাগের মনোভাবের অধিকারী বলে দাবি করতে পারতো না; কেননা ভারতে কর্মরত থাকাকালে তারা আচার-আচরণে স্কটিশ স্বার্থ বা আইরিশ স্বার্থ বা ওয়েলসের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করেছে, যেমন ভারতীয় সিভিলিয়ানরা নিজেদের বর্ণ, সম্প্রদায় ও এলাকার প্রতিনিধিত্ব করেছে। জাতিসত্তা, জাতিত্ব, ধর্ম, শিক্ষা, আঞ্চলিকতা, বিভিন্ন নিযুক্তি ও প্রশিক্ষণ, বিভিন্ন বেতন ও পদমর্যাদা ইত্যাদি সব কিছু মিলে বৃটিশ ভারতের আমলাতন্ত্রকে প্রভূত পরিমাণে একটা পাঁচমিশালী সংগঠনে পরিণত করেছে। এ ধরনের একটা সংগঠন কোন ঔপনিবেশিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে পারে, কিন্তু কখনো তা শৃঙ্খলা, অখণ্ডতা, দক্ষতা এবং সর্বোপরি একটা আধুনিক রাষ্ট্রের যৌক্তিক আমলাতন্ত্রের নিরপেক্ষতা অর্জন করতে পারে না। বৃটিশ ভারতেব আমলাতন্ত্রকে যথার্থই সর্বাংশে একটা বিশেষ ধরনের শাসকগোষ্ঠী বলা যায়, যেটা বিশেষভাবে উদ্ভাবিত হয়েছিল সুদূর ভারতের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ রাখার উদ্দেশ্যে এবং বহুদুরে অবস্থিত মহানগরীর প্রভুদের সেবা করার জন্য।

কিন্তু এ কথা অবশ্যই মানতে হবে যে বৃটিশ আমলাতন্ত্র অন্তত একটা ক্ষেত্রে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিল। তা হচ্ছে প্রশাসনিক সিঁড়ির সকল ধাপে সব ধরনের লেনদেনের অনুপুঙ্খ ও পরিপূর্ণ দলিল সংরক্ষণ। সকল সিভিলিয়ান ও তাদের অধস্তনদের সূচিত ও গৃহীত সকল কার্যব্যবস্থার কার্যবিবরণী সংরক্ষণ করতে হতো এবং এগুলোর অনুলিপি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করতে হতো। এক বিভাগ থেকে আরেক বিভাগে নথিপত্রের অগ্রগমন লন্ডনস্থ ইন্ডিয়া অফিসে গিয়ে শেষ হতো। সেখানে নথিপত্রগুলো শ্রেণীবিভাগ করা হতো, ক্রমবিন্যাস করা হতো এবং এগুলো বিষয় ও বিভাগ অনুসারে ভবিষ্যৎ তথ্যসূত্রের প্রয়োজনে সংরক্ষিত হতো।[৩৩] ইন্ডিয়া অফিস ভারত সরকারের কার্যবিবরণী পাঠ করতো এবং সেখানেই এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হতো এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তা ভারতে পাঠানো হতো। ক্রমে নথিপত্রের স্তূপ জমে যেতো। এভাবে ইন্ডিয়া অফিসে যেসব নথিপত্র জমা হতো, সেগুলো কলকাতা সরকারের নিকট প্রেরিত হতো এবং সেগুলোর অনুলিপি প্রশাসনের সর্বনিম্ন ধাপ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট স্থানে প্রেরিত হতো। আবার এসব নথিপত্রের শ্রেণীবিভাগ ও ক্রমবিন্যাস করে এগুলো নতুন কর্মকর্তার দিকনির্দেশনার জন্য সংরক্ষণ করা হতো।

৩৩. বিশদ জানার জন্য দ্রষ্টব্য, M. Moir A *General Guide to the India Office Records.* (The British Library 1988).

আধুনিক আমলাতন্ত্রের একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে স্বচ্ছতা ও অনমনীয়তা এবং এজন্য বৃটিশ ভারতীয় আমলাতন্ত্র অবিসংবাদিতভাবে শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করতে পারে। কিন্তু এর জন্য মূল্য দিতে হয়েছে। স্থানীয় অফিস থেকে লন্ডন ইন্ডিয়া অফিসে নথিপত্রের এই অবিরাম পথপরিক্রমায় উদ্যম ও নতুন প্রবর্তনা নিঃশেষ হয়ে যেতো। এ পর্যায়ে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে মাসের পর মাস, এমনকি বছরের পর বছর লেগে যেতো এবং অনুমোদন যখন পাওয়া যেতো তখন সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিত এতোটা বদলে যেতো যে সিদ্ধান্তটাই অপ্রয়োজনীয় বা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়তো। কিন্তু গৃহীত ব্যবস্থা সংক্রান্ত দলিলপত্র আমলাতন্ত্রের রীতিবদ্ধতার নিদর্শন হিসেবে থেকে যেতো। আমলাতন্ত্রে সব সময়েই বাহ্যিক নিয়মরীতির জয় হয়েছে এবং এর অন্তর্নিহিত মর্মবাণী হয়েছে উপেক্ষিত। এই প্রক্রিয়ায় প্রচলিত ব্যবস্থার অধীনে কর্মরত সিভিলিয়ান ও অফিসারগণ দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে এমন কেরানিমনোবৃত্তিসম্পন্ন ও যান্ত্রিক হয়ে পড়লো যে তারা কাজের চেয়ে কাগজকেই বেশি গুরুত্ব দিতে লাগলো। লর্ড কার্জন ছিলেন ভারতের অত্যন্ত গতিশীল ঔপনিবেশিক শাসক। তিনি একদিন আমাদের কাছে আমলাতন্ত্রের নিষ্প্রাণ আনুষ্ঠানিকতা সম্পর্কে এক গল্প বলেছিলেন। একদিন তিনি তাঁর সচিবকে ডেকে একটা উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা শুরু করার ব্যাপারে তাঁর নিকট মন্তব্য পেশ করতে বললেন। সচিব তাঁর মন্তব্যের খসড়া লিখে মন্তব্যটা তাঁর অধস্তনের নিকট পাঠালেন এবং সেই অধস্তন অফিসের পদসোপানে তাঁর পরবর্তী অধস্তন কর্মকর্তার নিকট তা পাঠালেন এবং এভাবে নথিটা ধাপে ধাপে নিচে নামতে লাগলো। অতঃপর সবগুলি মন্তব্য আর মার্জিননোট সম্বলিত নথিটা সর্বনিম্ন ধাপ থেকে আবার সব ডেস্ক হয়ে উপরে উঠতে লাগলো। কার্জন লিখলেন—

> "...প্রথম কেরানি নথির মন্তব্যের ভাষা পরিবর্তন করে তার উপর নিজের ভাষায় মন্তব্য লিখলেন ৪১ পৃষ্ঠার অধিক মুদ্রিত পৃষ্ঠা জুড়ে। ...এর পর দ্বিতীয় কেরানির পালা। তিনি প্রথম কেরানির মন্তব্যের উপর যোগ করলেন আরো ২১ পৃষ্ঠা। এর পর আমরা এলাম সহকারী সচিব, ডেপুটি সচিব এবং সচিবদের মহলে। এই ভদ্রমহোদয়গণ সবাই একই রকম দীর্ঘ অর্থহীন বক্তব্য রাখলেন সংশ্লিষ্ট নথিতে। অবশেষে আমরা এলাম পদসোপানের শেষ ধাপে এবং দেখলাম, ভাইসরয় ও সামরিক সদস্য নিজ নিজ পদমর্যাদাকে গুরুত্ব দিয়ে সমপরিমাণ দীর্ঘ বক্তব্য দিয়ে নিজেদের অতিরিক্ত জ্ঞান জাহির করেছেন। এর পর নথিটি ঘুরে এল এক বিভাগ থেকে অন্য বিভাগে এবং কাউন্সিলের এক সদস্যের হাত থেকে অন্য সদস্যের হাতে। এঁদের প্রত্যেকের নিজস্ব বক্তব্য ছিল নথিতে এবং এর ফল দাঁড়ালো এক ধরনের সাহিত্যিক পাগলামি বা পণ্ডশ্রম।"

এটা হচ্ছে বিগত দেড় শতাব্দী যাবৎ বেড়ে উঠা আমলাতান্ত্রিক মনমেজাজের একটা যথাযথ বিবরণ। আনুষ্ঠানিকতা সব সময়েই মর্মবাণী বা মূল আদর্শকে আড়াল করে মুখ্য হয়েছে, দ্বিধা-সংকোচ উদ্যোগ গ্রহণে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, জড়তা স্থবির করে দিয়েছে গতিশীলতাকে। সিদ্ধান্তগ্রহণ বিলম্বিত করা বা স্থগিত রাখা যেকোনো সংগঠিত আমলাতন্ত্রের মজ্জাগত বৈশিষ্ট্য। কিন্তু বৃটিশ ভারতীয় আমলাতন্ত্রের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য

অধিকতর পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। এর কারণ খুঁজতে বেশি দূর যেতে হবে না। বৃটিশ ভারতীয় আমলাতন্ত্র প্রত্যেক উদ্যোগ ও কার্যক্রম গ্রহণের জন্য ইন্ডিয়া অফিসের আমলাতন্ত্রের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য ছিল, সেই উদ্যোগ বা কার্যক্রম যতই গুরুত্বপূর্ণ বা গুরুত্বহীন হোক। ছোট বা বড় প্রত্যেকটা পদক্ষেপের উপর ইন্ডিয়া অফিস সিদ্ধান্ত দেবে, সেজন্য ক্ষমতার দুই প্রান্তের মাঝখানে বিদ্যমান সাগর ও মহাসাগরকে কোনো প্রতিবন্ধক মনে করা হতো না। নিম্ন পর্যায়ে জেলা পর্যন্ত এই প্রবণতা বিদ্যমান ছিল। কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং ব্যবস্থা গ্রহণের আগে সবাই এ সম্পর্কে সবকিছু জানতে চাইত। প্রত্যেককে মন্তব্য প্রদান করে ঊর্ধ্বতনের দিকে নথি পাঠাতে হতো। এটি হয়ে দাঁড়ায় এক অন্তহীন প্রক্রিয়া, যার শেষ কোথায় জানা নেই। কোন প্রস্তাব সংক্রান্ত নথি সংশ্লিষ্ট সকলের মন্তব্য সম্বলিত হয়ে এ প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন সকল সঞ্চিত কাগজপত্রসহ যখন পর্যন্ত ইন্ডিয়া অফিসে না পৌছাতো, তখন পর্যন্ত তার যাত্রার সমাপ্তি হতো না; এবং এই প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে ব্যবস্থাগ্রহণ সেদিন পর্যন্ত শুরু হতো না, যেদিন প্রয়োজনীয় অনুমোদন লাভ করে নথি গভর্নর জেনারেলের পরিষদ, সংশ্লিষ্ট সকল সেক্রেটারি ও বিভাগ এবং অন্যান্য কর্তাদের মাধ্যমে মূল অফিসে অর্থাৎ প্রস্তাব উত্থাপনকারী অফিসে ফিরে না আসতো। ফলে ধীকল্প (ideas) ও উদ্যোগ গ্রহণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব ও দীর্ঘসূত্রিতা নিয়মিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

বেন্টিং থেকে কার্জন পর্যন্ত কোনো উদ্যমী ও শক্তিমান ঔপনিবেশিক শাসক ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের কাজে সন্তুষ্ট ছিলেন না। ভারতীয় আমলাতন্ত্রের কাজের ধারা সম্বন্ধে চরম হতাশা ব্যক্ত করে লর্ড কার্জন সেক্রেটারি অব স্টেট-লর্ড হ্যামিল্টনকে ব্যক্তিগতভাবে লিখেছিলেন :

> ভারতীয় শাসন সম্পর্কে সাড়ে চার বছরের অভিজ্ঞতা লাভের পর আমি স্বেচ্ছায় এ কথা বলছি যে আমাদের প্রশাসনের উন্নয়নের জন্য যদি স্থানীয় সরকারগুলোর উদ্যোগ ও কার্যক্রমের উপর নির্ভর করতে হয়, তা হলে এর অগ্রগতি কখনো হবে না। আমি আমার কার্যকালের এমন একটি প্রস্তাবের কথাও স্মরণ করতে পারিনা, যা প্রশাসনের কোন শাখার উন্নয়নের জন্য কোন স্থানীয় সরকার কর্তৃক উত্থাপিত হয়েছিল, ... এবং সেক্ষেত্রে আমি গুটি কতক প্রশাসনিক উন্নয়নের প্রস্তাবের কথা স্মরণ করতে পারি, যাতে তাদের নিজেদের কর্মকর্তাদের বেতনবৃদ্ধির অনুরোধ ছাড়া অন্য কোন কিছু অন্তর্ভুক্ত ছিল না। আমি ভারতে আসার পর ব্যাপক প্রশাসনিক সংস্কারের কাজ হাতে নেয়া হয়, আমি বলতে পারি যে এদের একটিও কোন স্থানীয় সরকারের উদ্যোগে শুরু হয় নি এবং বলতে পারি যে যদি আপনি তাদের কাছ থেকে কোন উদ্যোগ বা কার্যক্রমের জন্য অপেক্ষা করেন তা হলে অগ্রগতির চাকা থেমে যাবে এবং এক শতাব্দীর মধ্যে শাসনযন্ত্রের কোন সংস্কার বা পরিবর্তন সাধিত হবে না। আমি বহুবার আপনার নিকট উল্লেখ করেছি যে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে না আছে সৃজনশীলতা, না আছে ধ্যান-ধারণা বা কল্পনাশক্তি, তারা বর্তমানকেই সর্বোত্তম মনে করে এবং কোন পরিবর্তন বা উন্নয়ন বা সংস্কারের কথা শুনলে তাদের পিলে চমকে উঠে।[৩৪]

৩৪ Lord Curzon to Lord Hamilton, 4 June 1903 in C. H. Philips, *The Evolution of India and Pakista 1858-1947* (London 1962), 73

গভর্নর জেনারেল এবং ভাইসরয়রূপে ভারতে আসার পূর্বে ভারত সম্পর্কে কার্জনের কোন অভিজ্ঞতা ছিল না এবং তিনি আদৌ জানতেন না যে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস এমন একটি সুসংগঠিত শক্তি, যাকে সব সময়েই গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য করতে হবে। তিনি বহুলাংশে এই শক্তিকে ডিঙিয়ে যেতে পেরেছিলেন, কারণ তাঁর সময়ে সাম্রাজ্যবাদ ছিল তুঙ্গে, যখন ইন্ডিয়া অফিস গভর্নর জেনারেলকে পরাক্রান্ত মুগল হিসেবে মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু উন্নয়নকামী আরেকজন শাসক লর্ড রিপনকে আমলাতন্ত্র সহজেই নতজানু করে ছেড়েছিল। রিপনের সময়টা সংস্কারের অনুকূল ছিল না। তবু তিনি এজন্য চেষ্টা করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হন। ভারতীয় আমলাতন্ত্রের কার্যকলাপের একজন সমকালীন পর্যবেক্ষক ডাব্লু ব্লান্ট (W. Blunt) রিপনের জন্য দুঃখ বোধ করেছেন, যিনি আমলাতন্ত্রের অসহযোগিতার কারণে তাঁর সংস্কারপ্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁর রোজনামচায় তিনি লিখেছেন, "তাঁর প্রস্তাবিত প্রত্যেকটা ব্যবস্থা সর্বাংশে ব্যর্থ হয়েছে এবং সিভিল সার্ভিস এতই ক্ষমতাবান যে তারা স্বদেশের সরকারকে ভারতীয় সমুদয় নীতি একের পর এক বিসর্জন দিতে বাধ্য করেছে।[৩৫]

উপসংহারে এ কথা বলা যায় যে যদিও ভারতীয় সিভিল সার্ভিসকে মূলত দেশ পরিচালনার জন্য একটা দক্ষ ও প্রয়োজনীয় যন্ত্ররূপে গড়ে তোলা হয়েছিল, ক্রমে তা একটা বিচ্ছিন্ন অভিজাত শ্রেণীতে পরিণত হলো, যাকে সকল বৃটিশ ও ভারতীয় ঈর্ষার চোখে দেখতো, যাদের বিবেচনায় আই সি এস-এর সদস্যগণ ছিল "স্বর্গে জন্ম নেয়া সন্তান", যারা সর্বদাই প্রশ্রয় পেয়ে এসেছে আর পেয়েছে অবারিত সুযোগ-সুবিধা। যদি বৃটিশ শাসনের অধীনে ভারত অপরিবর্তিত থেকে থাকে, তা সম্ভব হয়েছে প্রধানত আমলাতন্ত্রের বদৌলতে। শুরু থেকেই বৃটিশ ভারতকে একটা আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করা হয়েছে। আমলাতন্ত্রের স্বার্থ নিহিত ছিল স্থিতিশীলতায়, পরিবর্তনে নয়। সিভিলিয়ানদের কাছে পরিবর্তনের অন্তর্নিহিত অর্থ হলো রাষ্ট্রক্ষমতা পর্যায়ক্রমে আমলাতন্ত্রের কাছ থেকে প্রতিনিধিত্বশীল সংস্থার নিকট হস্তান্তরিত হওয়া, যা তারা কিছুতে মেনে নিতে পারেনি। ১৯২০ সাল থেকে প্রতিনিধিত্বশীল সরকার গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং তখন থেকেই ভারতীয় সিভিল সার্ভিস দুর্বল হতে থাকে। তখন থেকে বৃটিশ প্রতিযোগীদের কাছে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের আকর্ষণ হ্রাস পেতে থাকে। স্পষ্টতই এই ফাঁক পূরণ করতে লাগলো ভারতীয়রা। ১৯৪০-এর মধ্যে সিভিল সার্ভিসের ভারতীয় সদস্যরা, যারা ১৯২০ সালের পূর্বে কেবল একটি ক্ষুদ্র অংশ ছিল, তারা বাংলায় এবং অন্য সকল প্রদেশে প্রভাবশালী হয়ে উঠে। ১৯৪০ -এর দশকে আইসিএস-এ ইউরোপীয়দের নিযুক্তি কার্যত থেমে গেল। এরূপ পরিস্থিতিতে অনেক প্রবীণ ইউরোপীয় সদস্য চাকরির মেয়াদ শেষ হবার আগেই অবসর নেবার পথ বেছে নিলেন। ১৯৪৭ সালের মধ্যে ভারতীয়

৩৫. W S Blunt, *India Under Ripon, A Private Diary*, (London 1909), Vol II, 158, Sarmila Banerjee, *Studies in Administrative History of Bengal 1880-1898* (New Delhi 1978), 178

সিভিল সার্ভিসে ভারতীয়দের সংখ্যাই অধিক হয়ে গেল। এ ক্ষেত্রে পরিবর্তন এত দ্রুত ঘটছিল যে অনেকে অভিযোগ করেন যে সিভিল সার্ভিসের মান অধিক পরিমাণে নেমে গেছে। বাস্তব ক্ষেত্রে এই অভিযোগ ব্যক্তিগত ধারণাপ্রসূত ও মনস্তাত্ত্বিক। পূর্বেকার আইসিএসবর্গ ছিলেন ফর্ম পূরণ, দীর্ঘসূত্রিতা এবং বর্ণবাদী ঔদ্ধত্যের জন্য সুপরিচিত, উদ্ভাবনী ধ্যান-ধারণা ও উদ্যোগের জন্য নয়। জনগণকে তুষ্ট করার জন্য তাদের দক্ষতার কথা ফলাও করে প্রচার করা হতো, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা লক্ষ্য করা যায় নি। ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্র গড়ে তোলা হয়েছিল একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এবং জাতীয়তাবাদী জাগরণের মুখে যখন সিভিলিয়ানরা এই উদ্দেশ্য সাধন করতে সমর্থ হলো না, তখন তারা কমবেশি একই ঔপনিবেশিক মডেল অনুসরণ করে বিদ্যমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে তোলা নতুন শাসকগোষ্ঠী এবং নতুন আমলাতন্ত্রের কাছে নতি স্বীকার করে সসম্মানে সরে দাঁড়ালো। যদিও গোড়ার দিকে তারা কতিপয় জাতীয়তাবাদী উদ্দেশ্য সাধন করেছিল, পরবর্তীকালে তারাও একটা স্বতন্ত্র শ্রেণী হিসেবে গড়ে উঠেছিল। বিভাগোত্তর ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে তারা জনপ্রতিনিধিত্বমূলক বা সামরিক সরকারের বাহ্য রূপের আড়াল থেকে শাসন করে চললো।

# ১২

## লোক প্রশাসন ১৯৪৭-৭১

সৈয়দ গিয়াসউদ্দিন আহমেদ*

### উত্তরাধিকার

আসলে আলোচ্য কালপর্বে বাংলাদেশ অঞ্চলের লোক প্রশাসন ব্যবস্থা অখণ্ড পাকিস্তান রাষ্ট্রের সার্বিক শাসন কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গড়ে উঠেছিল। তবে এর সূচনা ও বিকাশ হয়েছিল ভারতে বৃটিশ শাসনামলে এবং তৎপূর্ববর্তী বেশ কয়েক শতাব্দী আগে থেকেই। এই অধ্যায়ে আমরা পাকিস্তান আমলের জাতীয় ও প্রাদেশিক এবং তদন্তর্ভূত আঞ্চলিক পর্যায়ে আমলাতান্ত্রিক কাঠামো, এর রাজনৈতিক ভিত্তি এবং শুরু থেকে শেষ অবধি এর বিকাশের ধারা বিশ্লেষণ সহকারে তৎকালীন লোক প্রশাসনের সার্বিক সাংগঠনিক কাঠামো এবং কার্যক্রম আলোচনা করবো। পাকিস্তান আমলের লোক প্রশাসন সম্পর্কিত যে বর্ণনা এই অধ্যায়ে দেয়া হয়েছে, তা সুনির্দিষ্টভাবে ঐ সময়ে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলীর নিরিখেই দেয়া হয়েছে। এ কথা ঠিক যে, বর্তমান পাকিস্তান এবং বাংলাদেশে পূর্বেকার সেই প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং কার্যসম্পাদনের ধরন অব্যাহত রাখার প্রচেষ্টা এখনো চলছে।[১] যা হোক, প্রারম্ভিক এই পরিচ্ছেদের বাকী অংশটুকুতে পাকিস্তান আমলের লোক প্রশাসন ভারতবর্ষে বৃটিশদের সৃষ্ট শাসন ব্যবস্থার উত্তরাধিকারের দ্বারা কি পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছিল তা তলিয়ে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে।

* অধ্যাপক, লোক প্রশাসন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. বর্তমান পাকিস্তান ও বাংলাদেশের লোক প্রশাসন ব্যবস্থার বিস্তারিত বর্ণনা দেখুন, Nasir Islam, "Colonial Legacy, Administrative Reforms and Politics Pakistan 1947-1987", *Public Administration and Development*, vol. 9, 1989, 271-285; Syed Giasuddin Ahmed and Mohammad Mohabbat Khan, "Bangladesh", in V. Subramaniam (ed ), *Public Administration in the Third World*, (New York 1990), 17-41, Garth N Jones and Shafik Hashmi, "Pakistan Personnel Administration in an Obsolescing Imperial Tradition", *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh*, vol. 41, no 1, June 1996, 85-132.

অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিই পাকিস্তানকে (১৯৪৭-৭১) এমন একটি প্রশাসনিক রাষ্ট্র হিসেবে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছেন, যার রাষ্ট্রপরিচালনার নীতিনির্ধারণ-প্রক্রিয়াটিতে বরাবরই সিভিল-মিলিটারি এলিটদের প্রাধান্য বজায় ছিল। এইসব এলিটই একদিকে যেমন নীতি বাস্তবায়ন সম্পর্কিত প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে জড়িত থেকেছে, অন্যদিকে তেমনি তাদেরকে রাষ্ট্রীয় নীতিপ্রণয়ন সম্পর্কিত রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন করতেও দেখা গেছে। এমনকি তারা তাদের স্ব-আরোপিত এই রাজনৈতিক ভূমিকাকে বৈধতা দেয়ার একটি কৌশল হিসেবে দেশটির রাজনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অবদান রাখতেও প্রয়াসী হয়েছিল। ফেডারেল পদ্ধতির রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অধীনে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক পর্যায়ের প্রশাসনিক সদর দপ্তরগুলোকে ঘিরে গড়ে তোলা হয়েছিল অতিমাত্রায় কেন্দ্রনিয়ন্ত্রিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা, যেখানে এলিট শ্রেণীর আমলারাই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালনে সচেষ্ট ছিল। তিন তিনটি পৃথক সাংবিধানিক আইনের (১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন, ১৯৫৬ সালের সংবিধান এবং ১৯৬২ সালের সংবিধান) আওতায় পাকিস্তানের জন্যে ফেডারেল পদ্ধতির একটি সরকারব্যবস্থা গৃহীত হয়ে থাকলেও বাস্তবে দেশটি একটি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার অধীনেই পরিচালিত হয়ে এসেছে। এই অবস্থাটির জন্যে ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকারকে ধরে রাখার মন-মানসিকতার পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ের প্রথাগত শ্রেণীকাঠামো এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থাও আংশিকভাবে দায়ী।[২]

পাকিস্তানের প্রশাসনিক পরিমণ্ডল দেশটির মুসলিম ঐতিহ্যের কারণে সমৃদ্ধ ছিল। ৭১২ খ্রিস্টাব্দে আরবদের সিন্ধুবিজয়ের মধ্য দিয়ে এই উপমহাদেশে মুসলিম প্রভাবের যাত্রা শুরু হয় এবং দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত ধীরে ধীরে এর বিস্তার ঘটতে থাকে। তবে, পরবর্তীকালে বিশেষকরে ষোড়শ শতকের শেষ এবং সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকে মুগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই এই প্রভাব আরো দ্রুত এবং গভীরতর হতে শুরু করে।[৩] বিশেষভাবে উল্লেখ্য, সম্রাট আকবরসহ সেই সময়কার আরো কয়েকজন শাসকের সফল রাষ্ট্রপরিচালনার ফলশ্রুতিতে এমন কিছু প্রশাসনিক পদ্ধতির উদ্ভাবন ঘটেছিল, যা পরবর্তী সময়ে দীর্ঘকাল ধরে অনুসৃত হতে থাকে। পাকিস্তানসহ উপমহাদেশের অন্যান্য দেশসমূহে যুগ যুগ ধরে প্রচলিত ভূমিস্বত্ব আইন, রাজস্ব আদায় ও স্থানীয় সরকারপদ্ধতিগুলোর দিকে তাকালেই মুগলদের সেই উদ্ভাবনী দক্ষতার বেশ কিছু চিহ্ন চোখে পড়বে। পাকিস্তানীরা তাদের এই মুসলিম ঐতিহ্যের জন্যে গর্বিতই ছিল।[৪]

২. Nasir Islam, "Pakistan", in V. Subramaniam (ed.), *Public Administration in the Third World* (New York 1990),68.

৩. Alan Glendhill, *Pakistan: The Development of its Laws and Constitution* (Connecticut 1980), 3-11

৪. দেখুন, Syed Giasuddin Ahmed, " A Typological Study of the State Functionaries under the Mughals", *Asian Profile*, vol. 20, no 4, August 1982, 327-346

অষ্টাদশ শতকে উপমহাদেশের অধিকাংশ অঞ্চলই মুগলদের হাত থেকে বৃটিশ শাসনাধীনে চলে আসে। অধিকাংশ ঐতিহাসিক বলতে চেয়েছেন যে, বৃটিশরা ভারতে কাঠামো এবং উপাদানের দিক থেকে এমন একটি লোক প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল, যা বিশাল একটি ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য শাসনের পক্ষে ছিল খুবই উপযোগী। বৃটিশ আমলারা আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং যথাযথভাবে রাজস্ব আদায় করতে পারলেই নিজেদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালিত হয়েছে বলে মনে করতো। ১৯৪৭ সালে বৃটিশরা ভারত ছেড়ে যাওয়ার সময় পর্যন্ত সাম্রাজ্য রক্ষার স্বার্থে প্রণীত এই প্রশাসন পদ্ধতি পুরাপুরিই অক্ষুণ্ন ছিল। পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মপরবর্তী চব্বিশ বছর সময়ে দেশটির এলিট শাসকরা বৃটিশদের রেখে যাওয়া ব্যবস্থায় খুব সামান্যই পরিবর্তন ঘটিয়েছিল।[৫]

স্বাধীন পাকিস্তানে কি কেন্দ্রে কি প্রদেশে প্রশাসনিক কাঠামোর মৌলিক ধরনটি প্রাক-ভারত বিভাজন সময়কার মতোই ছিল। 'সেক্রেটারিয়েট' এবং 'এটাচ্‌ড্' বা 'অপারেটিং' ডিপার্টমেন্টগুলোর মধ্যেকার পূর্বেকার বিভাজন ব্যবস্থাও বজায় ছিল। নীতিনির্ধারণী কার্যাবলীর উপর একচ্ছত্র আধিপত্য আগের মতোই সেক্রেটারিয়েটের হাতে থেকে গেল তাত্ত্বিক কারণে। অন্যদিকে অপারেটিং ডিপার্টমেন্টের হাতে ন্যস্ত রইল নীতিসমূহ বাস্তবায়নের ভার। ঔপনিবেশিক শাসনামলের প্রশাসন কাঠামোতে এ ধরনের সুস্পষ্ট বিভাজন ব্যবস্থা চালু রাখার তাৎপর্যপূর্ণ উদ্দেশ্যটি ছিল কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক উভয় সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস বা আইসিএস অফিসারদের জন্যে সংরক্ষিত রাখার পক্ষে একটি যুক্তি দাঁড় করানো। ঠিক একই যুক্তির দোহাই দিয়ে পাকিস্তানের সার্বিক প্রশাসনিক কাঠামোর সর্বস্তরের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো এলিট সিভিল সার্ভিস অব পাকিস্তান বা সিএসপি অফিসারদের যতজনই পাওয়া গেছে যতটা সম্ভব ততজন দিয়েই পূরণ করা হয়েছিল।[৬]

মাঠ পর্যায়ে আইন কার্যকরীকরণ ও রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত প্রশাসনিক কার্যক্রমের ধরন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই আগের মতোই থেকে গেল। মাঠভিত্তিক প্রশাসনের সবচেয়ে ছোট এলাকাটি ছিল পূর্ব পাকিস্তানে 'থানা' এবং পশ্চিম পাকিস্তানে 'তহসিল'। এগুলো আবার ছিল কয়েকটি মহকুমার অন্তর্গত এবং এই মহকুমাগুলো দায়বদ্ধ ছিল জেলার কাছে। এই জেলাই ছিল মাঠ পর্যায়ে প্রশাসনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইউনিট। আর জেলার কালেক্টর, ডেপুটি কমিশনার অথবা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, যে নামেই ডাকা হোক (পরবর্তীতে আমরা এই তিনটি পদের জন্যে একটি উপাধি অর্থাৎ "জেলা অফিসার" ব্যবহার করবো), তিনিই

৫. Guthrie S. Birkhead, "Introduction", in Guthrie S. Birkhead (ed.), *Administrative Reforms in Pakistan*, (New York 1966), 9.

৬. ঐ, 11.

ছিলেন পুরো বৃটিশ আমলাতন্ত্রের সবচেয়ে ক্ষমতাবান ও গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদনকারী কর্মকর্তা। স্বাধীনতা পরবর্তী ২৪ বছর সময়ে তার কর্মপরিধির মধ্যে সাধারণ প্রশাসন পরিচালনা ছাড়াও উন্নয়ন সম্পর্কিত বেশ কিছু নতুন দায়-দায়িত্ব অন্তর্ভুক্ত হয়।[৭]

কয়েকটি জেলা নিয়ে আবার একটি বিভাগ তৈরি হয়েছিল এবং বিভাগের প্রধান হতেন একজন কমিশনার, যিনি সাধারণত একজন অভিজ্ঞ সিএসপি কর্মকর্তা। ভারতে বৃটিশ শাসনব্যবস্থা চালু হওয়ার বেশ কয়েক দশক পরেই কমিশনারের পদ এবং তার দপ্তরটি সৃষ্টি করা হয়েছিল। কিন্তু এই কর্মকর্তা জেলা অফিসারের মতো মাঠ পর্যায়ে সাধারণ মানুষদের দৃষ্টি খুব একটা আকর্ষণ করতে পারেন নি, যদিও আমলাতান্ত্রিক পদক্রমে জেলা অফিসারের পদটি বেশ নীচের দিকেই ছিল। কার্যত কমিশনারের এই পদটি ছিল মাঠ পর্যায়ে প্রশাসনের সর্বোচ্চ পদ এবং এই পদটি সাধারণত কার্যক্ষেত্রে জেলা অফিসার অথবা সেক্রেটারিয়েটের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা হিসেবে সাফল্যের সাথে দায়িত্ব পালনকারী অফিসারদেরকেই দেওয়া হতো। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এরা সিএসপি অফিসার ছিলেন। কমিশনার এবং জেলা অফিসার এই দু'টি পদের বৈশিষ্ট্যাবলীতে মুগল আমলে বা তারও পূর্বে মাঠ পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত শাসনব্যবস্থার আদল লক্ষ্য করা যায়। তবুও, প্রায় দুই শত বছরব্যাপী বৃটিশ শাসনামলেই এই পদ দু'টির আসল চরিত্র নির্ণীত হয়েছিল।[৮]

ঔপনিবেশিক আমলে মূলত এই জেলা অফিসারই ছিলেন মাঠ পর্যায়ে জনগণের নিকটতম সরকারি কর্মকর্তা। ভারতবিভাগের পরেও তিনি তার আগেকার অর্থাৎ বৃটিশ আমলের ক্ষমতার প্রায় সবটাই ধরে রেখেছিলেন, যদিও তাঁর বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা কোন কোন ক্ষেত্রে কিছুটা হ্রাস পেয়েছিল। তবে বিশ শতকের শুরুর দিকে যখন জনস্বাস্থ্য, কৃষি ইত্যাদি নতুন নতুন ক্ষেত্রে সরকারি কার্যক্রম চালু হয়, তখন থেকেই এই সকল কর্মকাণ্ডের তদারকির ভারও তাঁর উপর ন্যস্ত হয়। এগুলো ছাড়াও "জাতিগঠনমূলক" আরো কিছু কার্যবিভাগ মাঠ পর্যায়ে জেলাকে কেন্দ্র করেই তাদের কর্মকাণ্ড চালাতে শুরু করে। জেলা পর্যায়ে ঐ সব অপারেটিং ডিপার্টমেন্টের আলাদাভাবে নিজস্ব কার্যক্রম চালু ছিল। তথাপি কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা সবাই আনুষ্ঠানিকভাবে জেলা অফিসারের নিকটই দায়বদ্ধ থাকতেন। জেলা অফিসার এই সব বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন করতেন। জেলা বা শীর্ষ নির্বাহী কর্মকর্তাভেদে এই সম্পর্ক বা দায়-দায়িত্বের তারতম্য ঘটলেও জেলা অফিসার সব সময়েই মাঠ পর্যায় এবং প্রাদেশিক সদর দপ্তরের মধ্যেকার সেতুবন্ধন হিসেবেই কাজ

৭. Najmul Abedin, *Local Government and Politics in Modern Societes: Bangladesh and Pakistan* (Dhaka 1973), 114-130.

৮. Birkhead, "Introduction", 12; S. G. Ahmed, (1982), 335-340.

করতেন। আর তিনি যদি একজন সিএসপি অফিসার হতেন, সেক্ষেত্রে তার মর্যাদাটি হতো আরো উপরে।[৯]

বৃটিশদের রেখে যাওয়া সম্ভবত সবচেয়ে দুরপনেয় যে চিহ্নটি পাকিস্তানী প্রশাসকদের মধ্যে কার্যকরভাবে উপস্থিত ছিল, তা হচ্ছে বিশেষ করে প্রশাসনের একেবারে উচ্চ পর্যায়ে কর্মরত সিএসপি অফিসারদের ক্ষেত্রে তাদের মন-মানসিকতা। স্বভাবের দিক থেকে এরা হয়ে উঠেছিল অহঙ্কারী, জটিল মনোভাবাপন্ন এবং উন্নাসিক। একজন বিশিষ্ট পর্যবেক্ষক এই সিএসপিদেরই পূর্বসূরি আইসিএস অফিসারদেরকে প্লেটোর "আদর্শ রাষ্ট্রের" গার্জিয়ান ক্লাস-এর সাথে তুলনা করেছেন।[১০] বৃটিশ রাজশক্তির প্রতিনিধি হিসেবে এই আইসিএস অফিসাররা পুরো উপমহাদেশকে যেভাবে কব্জা করে রেখেছিলেন, তাতে তাদেরকে কখনো কখনো বিশাল সেই বৃটিশ সাম্রাজ্যের "স্টিল ফ্রেম" হিসেবেও অভিহিত করা হতো। সিএসপিদের ক্ষেত্রেও এই অভিধাটি মাঝেমধ্যে ব্যবহার করা হতো যেহেতু পাকিস্তান রাষ্ট্রের সার্বিক প্রশাসনিক কাঠামো পাকিস্তানের এই ক্যাডারভুক্ত অফিসারদের প্রশাসনিক ক্ষমতাবলয়ের আওতাধীন ছিল। এই "গার্জিয়ানশীপ"-এর সমপর্যায়েই ছিল এলিট সিএসপি, পুলিশ সার্ভিস অব পাকিস্তান (পিএসপি) এবং অনেকাংশে অন্যান্য সুপিরিয়র সার্ভিসভুক্ত কর্মকর্তাদের পদমর্যাদা। সাধারণ মানুষদের থেকে একটা দূরত্ব বজায় রাখতেন তারা। তবে এ কথা বলা মোটেই ঠিক হবে না যে, এইসব এলিট প্রশাসকের সকলের মধ্যেই জনস্বার্থে কাজ করার ব্যাপারে যথেষ্ট পরিমাণে দায়িত্বশীলতার অভাব ছিল। বিভাগপূর্ব কালের মতোই পাকিস্তান আমলেও প্রতিশ্রুতিশীল তরুণেরা সিএসপি বা অন্যান্য এলিট সার্ভিসে যোগ দেয়ার ব্যাপারে উৎসাহী ছিল।[১১]

### প্রারম্ভিক পর্যায় ও বিকাশপর্ব

ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা ও পরবর্তীকালের মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা অনুযায়ী বৃটিশরা ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত গণপরিষদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করে। এই গণপরিষদের প্রথম সভাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৪৭ সালের ১০ আগস্ট ফেডারেল পাকিস্তানের নবগঠিত রাজধানী করাচিতে।[১২] পরের দিনই অর্থাৎ ১১ আগস্ট গণপরিষদ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে এর সভাপতি নির্বাচিত করে। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট জিন্নাহ বৃটিশ ভারতের সর্বশেষ গভর্নর জেনারেল মাউন্টব্যাটেনকে সঙ্গে নিয়ে পরিষদসভায় উপস্থিত হন এবং এ সময়েই আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পন্ন হয়। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট লাহোর

৯. Birkhead, "Introduction", 12-13.

১০. দেখুন, Philip Woodruff, *The Men Who Ruled India: The Guardians*, vol. 2 (London 1963), 12.

১১. Birkhead, "Introduction", 12

১২. Keith Callard, *Pakistan: A Political Study* (London 1957), 77-85

হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি আবদুর রশিদের নিকট জিন্নাহ পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন এবং একই দিনে জিন্নাহ নিজে স্বাধীন পাকিস্তানের প্রথম মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে সাতজন মন্ত্রীকে (লিয়াকত আলী খান প্রধানমন্ত্রী) শপথবাক্য পাঠ করান।[১৩] ১৯৪৭ সালের ১৬ আগস্ট সরকারি ঘোষণার মাধ্যমে সাতজন ক্যাবিনেটমন্ত্রীর মধ্যে আটটি মন্ত্রণালয় পর্যায়ের দপ্তর বণ্টন করা হয়। নতুন রাষ্ট্রের সরকারি কর্মকাণ্ডের দ্রুত প্রসারমানতার প্রেক্ষিতে পরবর্তী মাসগুলোতে মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়তে থাকে। এভাবেই ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জিন্নাহর মৃত্যুর সময়ে আটজন ক্যাবিনেট মন্ত্রীর অধীনে পূর্ণ মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় মোট বারোতে।[১৪] (সারণি ১ দ্রষ্টব্য)।

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট করাচিতে কেন্দ্রীয় সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের দিনেই যুগপৎভাবে পাকিস্তানের চারটি প্রদেশের (পূর্ব বাংলা, পাঞ্জাব, সিন্ধু এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ বা সীমান্ত প্রদেশ) নবনিযুক্ত গভর্নরগণ আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁদের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং একইসাথে তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভার অন্যান্য মন্ত্রীকেও শপথ গ্রহণ করান। লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, চারটি প্রদেশের মধ্যে তিনটিরই গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন তিনজন প্রবীণ বৃটিশ আইসিএস অফিসার। এঁরা হলেন স্যার ফ্রেড্রিক বার্নি (পূর্ব বাংলা), স্যার ফ্রান্সিস মুডী (পাঞ্জাব) এবং স্যার জর্জ কানিংহাম (সীমান্ত প্রদেশ)। এই ক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রমী ব্যক্তিটি ছিলেন সিন্ধুর গভর্নর গোলাম হুসেইন হিদায়েতুল্লাহ। গভর্নর হিসেবে নিযুক্তির আগে তিনি একই প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।[১৫]

রিপোর্টারদের ভাষ্যে জানা যায় যে, বস্তুত ১৯৪৭ সালের ১৯ আগস্ট থেকেই করাচিতে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের অধিকাংশ অফিস তাদের দাপ্তরিক কার্যক্রম শুরু করে। তবে পাকিস্তানকে তার চলার পথের একেবারে প্রারম্ভিক রেখা থেকেই যাত্রা শুরু করতে হয়েছিল। অবিভক্ত বৃটিশ ভারতের প্রশাসনের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া খণ্ডিতাংশগুলো একত্রিত করে কাজ চালানোর মতো একটি রাষ্ট্রযন্ত্র দাঁড় করাতে হয়েছিল। রেলওয়ে, ডাক ও টেলিফোন এবং টাঁকশালসহ বিভাগপূর্ব সরকারের বিভিন্ন প্রকার স্থায়ী সম্পদের যথাযথ হিস্যা রাষ্ট্রীয় সীমানা অনুযায়ী পাকিস্তান পেয়েছিল। কিন্তু প্রশাসন চালানোর মতো দক্ষ কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং বিশেষজ্ঞ দেশটির ভাগে পড়েছিল খুবই কম। কারণ বৃটিশ ভারতের প্রশাসনিক সার্ভিসসমূহে যোগদানের ক্ষেত্রে হিন্দুদের চাইতে মুসলমানরা বরাবরই পিছিয়ে ছিল। ভারতে সিভিল সার্ভিসসমূহের চাকরিতে আগে থেকেই বৃটিশ এবং হিন্দু প্রাধান্য বজায় ছিল। ১৯৪৭ সালে ১০০০ আইসিএস এবং

১৩. দেখুন, *The Indian and Pakistan Year Book 1948* (Bombay 1948), 163.
১৪. দেখুন, Khalid Bin Sayeed, " The Central Government of Pakistan 1947-51", (unpublished Ph D thesis, Department of Economics and Political Science, McGill University, 1956), 53-54.
১৫. দেখুন, Callard, 344-345.

ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল সার্ভিসের (আইপিএস) কর্মকর্তাদের মধ্যে ১০০ জনেরও কম ছিলেন মুসলমান। এঁদের অনেকেই আবার চাকরির ক্ষেত্রে ছিলেন নিম্নপদস্থ ও অনভিজ্ঞ। ১৯৪৭ সালের গোড়ার দিকে পাঞ্জাবে প্রায় ১০০ জন বৃটিশ আইসিএস অফিসার কর্মরত ছিলেন। কিন্তু দেশবিভাগের পরে তিন সপ্তাহের মধ্যেই দেখা গেল, এঁদের মাত্র ছয়জন সেখানে কর্মরত রয়েছেন। ফলে প্রারম্ভিক পর্বে দেখা গেল যে, পাকিস্তানের উচ্চ পর্যায়ের পদগুলি হয় শূন্য থেকেছে নয়তো অনভিজ্ঞদের দ্বারা পূরণ করা হয়েছে।[১৬]

১৯৪৭ সালের পূর্বে করাচি ছিল পাঁচ লাখেরও কম লোকসংখ্যার মোটামুটিভাবে শান্ত ও পরিচ্ছন্ন একটি বাণিজ্যকেন্দ্র। কিন্তু বিভাগোত্তর এক থেকে দুই বছরের মধ্যেই এর জনসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণে গিয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে শহরটির চতুর্দিকে একরকম শ্বাসরুদ্ধকর বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখা দিল। পয়ঃব্যবস্থাদি ভেঙে পড়লো এবং গজিয়ে উঠতে লাগলো অসংখ্য অস্থায়ী শরণার্থীপল্লী। এরকম একটি বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যেই সরকার পরিচালনার যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করতে হয়েছিল এবং জরুরি ভিত্তিতে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও শরণার্থী সমস্যা মোকাবিলা করে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে স্বাভাবিক খাতে প্রবাহিত করার লক্ষ্যে সার্বিক প্রশাসনিক কাঠামোকে যথাযথভাবে বিন্যস্ত করতে হয়েছিল।[১৭]

পাকিস্তানের জন্যে আবশ্যিক একটি লোক প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার দায়িত্ব পড়লো প্রধানত ঊর্ধ্বতন কয়েকজন মুসলিম সিভিল সার্ভিস কর্মকর্তার উপর, বিশেষ করে চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর উপর, যিনি ইন্ডিয়ান অডিট এন্ড একাউন্টস্ সার্ভিসের একজন সদস্য ছিলেন এবং পরে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীও হয়েছিলেন। দেশবিভাগের পরে কয়েক মাস তিনি পাকিস্তান সরকারের সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কেন্দ্রীয় সরকারের সচিবালয়ের গঠনপ্রক্রিয়া তাঁর হাতেই সম্পন্ন হয় এবং এর সার্বিক পরিচালনার দায়িত্ব তাঁকেই দেওয়া হয়। তিনি ক্যাবিনেট সচিব, সংস্থাপন সচিব এবং প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। স্বাধীনতা লাভের কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই এমন একটি কার্যকর প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারাটা সত্যিই ছিল একটি প্রশংসনীয় কাজ। কারণ ঐ সময়ে প্রয়োজনীয় অনেক রেকর্ডপত্রও পাওয়া যাচ্ছিল না। পাওয়া গিয়েছিল কেবল যৎসামান্য ভৌত পরিসম্পদ এবং ভারত থেকে বদলি হয়ে আসা স্বল্প সংখ্যক অভিজ্ঞ নির্বাহী কর্মকর্তা।[১৮]

১৬. Henry Frank Goodnow, *The Civil Service of Pakistan* (London 1964), 28-30.

১৭. ঐ, 28.

১৮. Mumtaz Ahmad, *Bureaucracy and Political Development in Pakistan* (Karachi 1974), 2.

## সারণি ১
## পাকিস্তানের প্রথম মন্ত্রিসভা
## (আগস্ট ১৯৪৭—সেপ্টেম্বর ১৯৪৮)

| মন্ত্রী ও তাঁদের দপ্তর | সংক্ষিপ্ত কর্মজীবন |
|---|---|
| ১. লিয়াকত আলী খান : প্রধানমন্ত্রী এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী; ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট তারিখে দায়িত্বগ্রহণ করেন। | বিভাগপূর্ব সময়েই দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন; অন্তর্বর্তীকালীন (১৯৪৬-৪৭) সরকারের অর্থ বিষয়ক সদস্য। |
| ২. স্যার মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান : পররাষ্ট্র এবং কমনওয়েলথ সম্পর্ক; দায়িত্বগ্রহণ করেন ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৪৭। | ভাইসরয়ের কাউন্সিলের সাবেক সদস্য; ফেডারেল আদালতের (১৯৪১-৪৭) সাবেক বিচারক। |
| ৩. গোলাম মোহাম্মদ : অর্থ; অর্থনৈতিক বিষয়; দায়িত্বগ্রহণ করেন ১৫ আগস্ট, ১৯৪৮। | ইন্ডিয়ান অডিট এন্ড একাউন্টস্ সার্ভিসের সাবেক সদস্য; হায়দরাবাদ রাজ্যের সাবেক অর্থমন্ত্রী; টাটার (ইন্ডিয়া) সাবেক পরিচালক। |
| ৪. সরদার আবদুর রব নিশ্‌তার : যোগাযোগ; দায়িত্বগ্রহণ করেন ১৫ আগস্ট, ১৯৪৭। | বিভাগপূর্ব কালের দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন; অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের যোগাযোগ বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্য। |
| ৫. যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল: আইন ও শ্রম; দায়িত্বগ্রহণ করেন ১৫ আগস্ট, ১৯৪৭। | বিভাগপূর্ব বাংলার মন্ত্রিসভার সাবেক সমবায় মন্ত্রী; অন্তর্বর্তী সরকারের আইন বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্য। |
| ৬. ফজলুর রহমান: শিক্ষা ও শিল্প; বাণিজ্য ও পূর্ত; দায়িত্বগ্রহণ করেন ১৫ আগস্ট, ১৯৪৭ | বিভাগপূর্ব বাংলার সাবেক মন্ত্রী (১৯৪৬)। |
| ৭. পীরজাদা আবদুস সাত্তার: খাদ্য, কৃষি ও স্বাস্থ্য; দায়িত্বগ্রহণ করেন ৩০ ডিসেম্বর, ১৯৪৭। | সিন্ধু প্রদেশের মন্ত্রিসভার সাবেক মন্ত্রী (১৯৪১-১৯৪২, ১৯৪৬-১৯৪৭)। |
| ৮. খাজা সাহাবুদ্দিন: স্বরাষ্ট্র; তথ্য ও প্রচার; শরণার্থী পুনর্বাসন; দায়িত্বগ্রহণ করেন ৮ মে, ১৯৪৮। | বিভাগপূর্ব বাংলার গভর্নরের নির্বাহী পরিষদের সাবেক সদস্য (১৯৩৬); বাংলার মন্ত্রিসভার সাবেক মন্ত্রী (১৯৪৩-৪৫)। |

সূত্র: Khalid Bin Sayeed, "*The Central Government of Pakistan 1947-1951*" (unpublished Ph.D Thesis, Department of Economics & Political Science, McGill University, 1956), 56-57.

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে অভিযোজিত ধারাসমূহের আওতায় স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময় গঠিত পাকিস্তানের সরকারপদ্ধতি ছিল সংসদীয় (এর নেতৃত্বে ছিলেন

প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান)।[১৯] কিন্তু গভর্নর জেনারেল জিন্নাহ তাঁর বৃটিশ পূর্বসূরিদের মতোই অধিকাংশ সরকারি ক্ষমতা নিজের সিদ্ধান্তেই প্রয়োগ করতে প্রয়াসী হন। তিনি নিজেই মন্ত্রিসভার সদস্য, প্রাদেশিক গভর্নর এবং মুখ্যমন্ত্রীদের মনোনীত করেন। মন্ত্রিসভার বৈঠকেও তিনি সভাপতিত্ব করতেন। গভর্নর জেনারেলের সচিবালয় (ব্যক্তিগত) ছাড়াও নবগঠিত একটি মন্ত্রণালয় (স্বরাষ্ট্র ও সীমান্ত অঞ্চল সম্পর্কিত) তিনি সরাসরি নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখেন। এমন উদাহরণও আছে যে, জিন্নাহ গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদগুলিতে বৃটিশ আইসিএসসহ অন্যান্যদের নিয়োগের ক্ষেত্রে নিজেই সিদ্ধান্ত নিতেন এবং বিশেষত প্রাদেশিক বৃটিশ গভর্নরদের কাছ থেকে সরাসরি পরামর্শ গ্রহণ করতেন। এভাবে তিনি নিজেই পাকিস্তান লোক প্রশাসন ব্যবস্থার প্রারম্ভিক পর্যায়েই এর ধরন ও গড়ন নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন, যার প্রভাব পরবর্তী চব্বিশ বছর পর্যন্ত অক্ষুণ্ন ছিল। বিশেষ করে মন্ত্রীবর্গসহ নির্বাচিত সকল জনপ্রতিনিধিদের অবজ্ঞা করার প্রবণতা লক্ষণীয় ছিল তাঁর প্রশাসনে।[২০]

যাই হোক, প্রারম্ভেই ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর মৃত্যু এবং ১৯৫১ সালে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের হত্যাকাণ্ড নব প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাজনৈতিক নেতৃত্বের জন্যে চরম বিপর্যয় ডেকে নিয়ে আসে। এর ফলে পাকিস্তান আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী মুসলিম লীগে ভাঙ্গন দেখা দেয় এবং উপদলীয় কোন্দল মাথাচাড়া দিতে শুরু করে। আর তখন সংবিধান প্রণয়নের বিষয়টি হয়ে দাঁড়ায় সুদূরপরাহত। কারণ, খোদ সংবিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত গণপরিষদে শুরু হয়ে যাওয়া বিরোধ আর বিভাজনের কোন্দলে পরিষদ সাত বছরেরও অধিক সময় ধরে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন জাতীয় ইস্যুতে ঐকমত্যে পৌছার চেষ্টা করেও সফলকাম হতে পারে নি। অবশেষে ১৯৫৪ সালে গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ দেশের প্রথম সংবিধান প্রণয়নের জন্য গঠিত পরিষদটি বাতিল করে দেন। এবং এভাবেই দেশ একটি মারাত্মক আইনগত সঙ্কটে পড়ে, যা থেকে পরবর্তীকালে সুপ্রিম কোর্ট তাকে উদ্ধার করে।[২১] এরপর ইস্কান্দার মির্জা গোলাম মোহাম্মদের স্থলাভিষিক্ত হন। শেষ পর্যন্ত গভর্নর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জার আমলেই ১৯৫৬ সালে দেশের জন্য একটি সংবিধান গৃহীত হয়। এই সংবিধান কেন্দ্র ও প্রদেশের সম্পর্কের ভিত্তিতে একটি ফেডারেল পদ্ধতির কাঠামো স্থির করে। এই কাঠামোর আওতায় কেন্দ্র এবং প্রদেশ উভয় স্থানেই সংসদীয় পদ্ধতির সরকারের ব্যবস্থা রাখা হয়।[২২]

১৯. দেখুন, G. W. Chowdhury, *Constitutional Development in Pakistan*, (London 1969), 6-34.

২০. Nasir Islam, "Colonial Legacy" , 273.

২১. Goodnow, 30.

২২. দেখুন, G. W. Chowdhury, *The Constitutional Development*, , 102-132.

সংবিধান গৃহীত হওয়ার বিষয়টিও কিন্তু দেশের রাজনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে খুব একটা সাহায্য করতে পারলো না। পূর্বের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সংঘাত লেগেই থাকলো, এমনকি তা আরো ব্যাপক হয়ে উঠলো। এইসব ঘটনাপ্রবাহ এবং আরো কিছু বিষয় প্রেসিডেন্ট মির্জাকে ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খানকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ করে দেশে একটি সামরিক শাসন জারির সুযোগ করে দিল। সামরিক সরকার সামরিক আইনের আওতায় নির্দেশ জারি করে মন্ত্রিসভা ও নির্বাচিত পরিষদসমূহ বাতিল ঘোষণা এবং রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মকাণ্ডের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলো। দুই সপ্তাহ পরেই জেনারেল আইয়ুব নিজেকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা দিলেন।[২৩]

১৯৬২ সালে দ্বিতীয় সংবিধান প্রণয়নের ঘোষণা প্রদানের মাধ্যমেই কেবল দেশের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর আরোপিত প্রায় চুয়াল্লিশ মাস ধরে চলতে থাকা নিষেধাজ্ঞাটির অবসান ঘটলো। নতুন সংবিধানের আওতায় পাকিস্তানে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হলো। এই পদ্ধতিতে প্রেসিডেন্টকে অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে দেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দেয়া হয়। প্রাদেশিক গভর্নর ও তাঁর মন্ত্রিসভা নিয়োগের ভার ন্যস্ত হয় কেন্দ্রের হাতে। মৌলিক গণতন্ত্রের আওতায় নির্বাচিত আশি হাজার সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত একটি নির্বাচকমণ্ডলীর পরোক্ষ ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ও আইনসভা গঠনের বিধান রাখা হয়। তবে বৃটিশ পদ্ধতির সংসদীয় রাজনীতি চর্চার উপযোগী একটি পরিমণ্ডলে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির শাসনপ্রণালী কায়েমের ধারণাটি ছিল অস্পষ্ট। যাই হোক, জাতীয় উন্নয়নের ধারাকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সরকারের দক্ষতা বৃদ্ধির অনুকূল একটি আমলানির্ভর প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলার ব্যবস্থা এই নতুন সংবিধানটিতে সন্নিবেশিত ছিল। এরই মাধ্যমে, প্রধানত ব্যাপক সরকারি বিনিয়োগ এবং সামাজিক খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বেশ কিছু কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছিল।[২৪] পল্লী অঞ্চলের প্রভাবশালী গোষ্ঠীগুলোকে "সমর্থন দানের রাজনীতির" প্রতি আকৃষ্ট করার জন্যে নতুন শাসকেরা ১৯৫৯ সালে মৌলিক গণতন্ত্রের মোড়কে নতুন এক ধরনের অংশীদারিত্বের রাজনৈতিক ব্যবস্থা চালু করলো।[২৫]

তবে, নতুন এসব প্রতিষ্ঠান এবং উন্নয়নের এই ধারা বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণী ও অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে ক্রমাগত উচ্চারিত হতে থাকা দাবিগুলোকে শেষ পর্যন্ত আর সামাল দিতে পারলো না। এটা সত্যি যে, আইয়ুব খানের শাসনামলে (১৯৫৮-৬৯)

২৩. Mumtaz, 3-4.

২৪. ঐ, 4.

২৫. দেখুন, Rahman Soban, *Basic Democracies Works Programme and Rural Development in East Pakistan*, (Dacca 1968), 240-261.

ব্যাপক শিল্পায়ন, দ্রুত নগরায়ণ এবং শিক্ষার প্রসার জনগণের রাজনৈতিক চেতনার মান উন্নত করেছিল। তথাপি ক্ষমতাসীন এই নতুন রাজনৈতিক শক্তির সাথে সাধারণ মানুষের সম্পর্কের বিষয়টি অস্পষ্ট এবং অনির্ধারিত ও অনির্ণীতই থেকে গেল। কারণ, আমলাতান্ত্রিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াটি শাসকদের জন্যে একটি গণভিত্তি নির্মাণের সেতুবন্ধ হিসেবে প্রয়োজনীয় কোন মেলবন্ধন সাধারণ মানুষের সাথে গড়ে তুলতে পারেনি। এর ফলে নতুন শহুরে এলিটদের মধ্যে ক্রমাগত বাড়তে থাকা বিচ্ছিন্নতাবোধ ১৯৬৯ সালে আইয়ুব খানের পতনের ক্ষেত্রে সম্ভবত তৎপর্যপূর্ণ একটি ভূমিকা পালন করেছিল।[২৬]

সংক্ষেপে ঘটনা হলো, টানা পাঁচ মাস ধরে পাকিস্তানের উভয় অংশে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ এবং এক অনিশ্চিত অবস্থা বিরাজ করতে থাকে। বিশেষকরে দেশের পূর্ব-অংশের গ্রামগুলোতে চলতে থাকা বিক্ষোভ ক্রমেই একটি সর্বাত্মক বিদ্রোহের আকার ধারণ করছিল। এ পরিস্থিতিতে অবস্থা বেগতিক দেখে এবং যে-কোন সময় পুরো প্রশাসনব্যবস্থাই ভেঙ্গে পড়তে পারে এই আশংকায় জেনারেল আইয়ুব খান ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে প্রেসিডেন্টের পদ থেকে সরে দাঁড়ান। কালবিলম্ব না করে জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১৯৬২ সালের সংবিধান বাতিল করেন এবং নিজেকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ঘোষণা করে সারা দেশে সামরিক আইন জারি করেন। ৩১ মার্চ তারিখে যথারীতি তিনি দেশের প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত হন।[২৭] প্রথম দিকে প্রধানত বেসামরিক ব্যক্তিদের নিয়ে লোকদেখানো একটি মন্ত্রিসভা গঠন করা হলেও ইয়াহিয়ার সামরিক শাসন (১৯৬৯-৭১) কিন্তু প্রকৃত অর্থেই এর কৌলীন্য বজায় রেখেছিল। একান্তভাবে সামরিক-বেসামরিক প্রশাসনের সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল প্রাদেশিক গভর্নরের পদগুলোসহ দায়িত্ব ও ক্ষমতার বিচারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনেকগুলো পদেই ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তাদের বসিয়ে দেয়া হয়। তবে, ইয়াহিয়ার তিন বছরের মতো স্থায়ী এই প্রশাসনকে প্রধানত জাতীয় এবং রাজনৈতিক প্রশ্নে জন্ম নেয়া দাবিগুলো সামাল দিতেই বেশির ভাগ সময় ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। ইয়াহিয়া খান ভয়-ভীতি প্রদর্শন এবং দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত সরকারি কর্মকর্তাদের শাস্তি প্রদানের নির্দেশ দেন এবং একইসাথে বেআইনীভাবে যারা বিদেশের ব্যাংকে বিপুল পরিমাণ অর্থ গচ্ছিত রেখেছিল তাদের বিরুদ্ধেও তদন্ত পরিচালনা এবং শাস্তি বিধানের হুকুম জারি করেন। আপাতদৃষ্টিতে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের খুশী করার জন্যে কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় পূর্ব পাকিস্তানীদের প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর নির্দেশ দেন এবং সেনাবাহিনীতে লোক নিয়োগের ক্ষেত্রেও পূর্ব পাকিস্তানের কোটা দ্বিগুণ করার প্রস্তাব করেন। ১৯৭০ সালের মার্চ মাসে জেনারেল ইয়াহিয়া খান

২৬. Mumtaz, 5.

২৭. দেখুন, Talukder Moniruzzaman, "Crises in Political Development and the Collapse of the Ayub Regime in Pakistan", *The Journal of Developing Areas*, vol. 5, no 2, January 1971, 221-238

আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের "এক ইউনিট" ব্যবস্থা বাতিল করে পশ্চিম পাকিস্তানকে বালুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব এবং সিন্ধু—পূর্বেকার এই চারটি প্রদেশে বিভক্ত করেন। এটি কেবলমাত্র পাঞ্জাব ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানের অন্য সকল অঞ্চলের রাজনৈতিক নেতাদেরই দাবি ছিল।[২৮]

১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের অধীনে দেশব্যাপী যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল দু'টি সুনির্দিষ্ট কারণে তা ঐতিহাসিক তাৎপর্য বহন করে। প্রথমত, পাকিস্তানের জন্মের পর এই প্রথম পাকিস্তানীরা দেশের জন্য একটি নতুন সংবিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে একটি জাতীয় পরিষদ গঠনের জন্যে ভোট দেয়। দ্বিতীয়ত, খুবই পরিচ্ছন্ন এবং অবাধ পরিবেশে অনুষ্ঠিত এই নির্বাচন বাংলাদেশের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর দল আওয়ামী লীগকে জাতীয় পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা (৩১৩ আসনের মধ্যে ১৬৭ আসন) প্রদান করলেও নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার অব্যবহিত পরের রক্তক্ষয়ী সংঘাত, গণহত্যা এবং উত্তাল ঘটনাপ্রবাহ পাকিস্তানকে বিভক্ত করে ফেলে এবং পূর্ব পাকিস্তান ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নামে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে জন্মলাভ করে।[২৯]

## কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক কাঠামো

পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় সরকারের (১৯৪৭-৭১) প্রশাসনিক কাঠামোর বাহ্যিক রূপটি ছিল প্রধানত বিভাগপূর্ব বৃটিশ সাংগঠনিক কাঠামোরই মতো। এটি ছিল দুই স্তরবিশিষ্ট-নীতি প্রণয়নের জন্যে একটি সচিবালয় এবং প্রণীত নীতিসমূহ বাস্তবায়নের জন্যে সচিবালয়ের সাথে সংযুক্ত বিভাগসমূহ অথবা অধীনস্থ অফিসসমূহ। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং ডিভিশন বা বিভাগগুলোকে নিয়ে গড়ে উঠেছিল সচিবালয়। বিভাগই ছিল সচিবালয়ের মূল ইউনিট। এক একটি বিভাগ গঠিত হয়েছিল কেন্দ্রীয় পর্যায়ে একক একটি রাষ্ট্রীয় কার্য সম্পাদন সম্পর্কিত নীতি-প্রণয়ন ব্যবস্থাপনাকে সংগঠিত করার জন্য। আবার কিছু কিছু মন্ত্রণালয়ের অধীনে ছিল একাধিক বিভাগ।[৩০] প্রতিটি বিভাগ বা বিভাগসমষ্টির নেতৃত্ব থাকতেন একজন মন্ত্রী। তাত্ত্বিক দিক দিয়ে অন্তত এ কথা বলা যায় যে, প্রধানত রাজনৈতিক ও নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়গুলো তিনিই দেখতেন। আর সুনির্দিষ্ট কর্মসূচিসমূহ প্রণয়ন এবং সেগুলোর সমন্বয় সাধন, নিয়ন্ত্রণ এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তাঁকে সহযোগিতা প্রদানের জন্যে নিয়োজিত থাকতেন "সরকারেব সচিব" পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা।

২৮. দেখুন, Damodar P Singhal, *Pakistan,* (London 1972), 186-201.

২৯. দেখুন, A. M. A. Muhith, *Bangladesh: Emergence of a Nation,* (Dhaka 1978)

৩০. দেখুন, Government of Pakistan (Cabinet Division), *Rules of Business 1962* (corrected up to January 1965), (Karachi 1965), 1

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি হতেন "উর্ধ্বতন" একজন পেশাদার আমলা বা সিভিল সার্ভেন্ট। তাঁকে সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্যে পদসোপানভিত্তিক অধঃক্রম অনুসারে নিয়োজিত থাকতেন যথাক্রমে অতিরিক্ত সচিব (বড় মন্ত্রণালয়সমূহে), যুগ্মসচিব, উপসচিব এবং সেক্শন অফিসারের মতো কর্মকর্তাগণ। এই কর্মকর্তাগণই আবার তাদের অফিসের সুপারিনটেনডেন্ট, সহকারী এবং উচ্চমান ও নিম্নমান করণিকের মতো কর্মচারীদের কাজকর্ম তদারক করতেন। এইসব কর্মচারী অধিকাংশ সময়েই অফিসের নথিপত্র নিয়ে ব্যস্ত থাকতো। তারা নোটসহ ফাইল ছাড়তো, নোটের খসড়া তৈরি করতো এবং পূর্বেকার রেকর্ড ও উদাহরণসমূহ খুঁজে বের করে তা রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করে সারসংক্ষেপ তৈরি করতো। তারা সংশ্লিষ্ট বিষয় এবং এর সাথে সম্পর্কিত ধারাগুলো চিহ্নিত করে নিজেদের মন্তব্য প্রদান করতো, যেগুলো তাদের তত্ত্বাবধানকারী কর্মকর্তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কাজে লাগতো।[৩১] এটা বোঝাই যাচ্ছিল যে, উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ সরকারি কাজকর্মের ব্যাপারে তাঁদের অধঃস্তন কর্মচারিদের সাহায্য-সহযোগিতার উপর বেশ খানিকটাই নির্ভরশীল থাকতেন। তবে দ্বিধাদ্বন্দ্বগ্রস্ত কোন কোন কর্মকর্তার ক্ষেত্রে এ জাতীয় সহযোগিতা অনেক সময়ই বিলম্বিত হতো। পুরো সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় এই অবস্থাটিকেই লাল ফিতার দৌরাত্ম্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

দেশে প্রতি মুহূর্তে জন্ম নেয়া সমস্যাসমূহ সমাধানের ব্যাপারে সরকারের আন্তরিকতা ও সামর্থ্য এবং কোন্ ধরনের রাজনৈতিক ব্যক্তিদের নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত তার উপর নির্ভর করেই মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সংখ্যা নির্ধারিত হতো। পাকিস্তানে প্রথম মন্ত্রিসভা ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট শপথ গ্রহণ করে। এই মন্ত্রিসভার সদস্যসংখ্যা ছিল মাত্র সাত এবং এদের অধীনে ছিল পনেরোটি বিভাগ সম্বলিত আটটি মন্ত্রণালয়। এ ছাড়াও ছিল আলাদা দু'টি সচিবালয়—একটি গভর্নর জেনারেলের (ব্যক্তিগত) এবং অন্যটি মন্ত্রিপরিষদ সম্পর্কিত। প্রথমটি গঠিত হয়েছিল বিভাগপূর্ব কালের তিনটি পৃথক গভর্নর জেনারেল সচিবালয়কে একীভূত করে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয়টি গঠন করা হয়েছিল স্বল্পায়ু মধ্যবর্তী সরকারের (১৯৪৬-৪৭) আমলে গভর্নর জেনারেলের নির্বাহী পরিষদের কার্যবিবরণী ও অন্যান্য বিভাগের অভিন্ন কাগজপত্র ও তথ্যাদি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে গঠিত অফিসটির আদল ও পদবি অনুসরণ করে।[৩২]

১৯৫৮ সালের অক্টোবরে সামরিক আইন জারি হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে সবচেয়ে প্রভাবশালী অংশটি ছিল মন্ত্রিপরিষদ সম্পর্কিত সচিবালয়। এর কাজ ছিল মন্ত্রিসভার কার্যবিবরণী ও রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ, মন্ত্রণালয়গুলোতে জনশক্তি সরবরাহ

৩১. Goodnow, 130.

৩২. দেখুন, Choudhuri Muhammad Ali, *The Emergence of Pakistan* (New York 1967), 83-103, Syed Giasuddin Ahmed, *Public Personnel Administration in Bangladesh* (Dhaka 1968), 64-65.

এবং সচিবালয় ও মন্ত্রণালয়-বিভাগসমূহের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা ও সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন। এ ছাড়া প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরও এই সচিবালয়ের অধীনেই ছিল।[৩৩] স্বাধীনতার পরপরই মন্ত্রিপরিষদ সচিবালয়টি দু'টি প্রধান শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়। এর একটি মন্ত্রিপরিষদ শাখা (পরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ) এবং অন্যটি সংস্থাপন শাখা (পরে সংস্থাপন বিভাগ)। এই দু'টি শাখাই মন্ত্রিপরিষদ সচিব ও পাকিস্তান সরকারের সেক্রেটারি জেনারেল পদবির সর্বোচ্চ কর্মকর্তার একক প্রশাসনিক কর্তৃত্বের অধীনে ন্যস্ত ছিল এবং পুরো সবিচালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী। পরবর্তীতে সংস্থাপন শাখাটি একজন পূর্ণ সচিবের অধীনে সংস্থাপন বিভাগে উন্নীত হয়। এটিই ফেডারেল কর্মী ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করে। সংস্থাপন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত সংগঠন ও পদ্ধতি নামক ইউনিটটিই সরকারের গঠনকাঠামো ও কার্যপ্রণালীর বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণা এবং এগুলোকে আরো উন্নত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল।[৩৪]

১৯৬২ সালের সংবিধানের আওতায় প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকারব্যবস্থা চালু হওয়ার পর মন্ত্রিপরিষদ সচিবালয়টি সরাসরি প্রেসিডেন্টের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সচিবালয়কেও দু'টি শাখায় বিভক্ত করা হয়। এর একটিতে থাকে কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রণালয়সমূহ এবং অন্যটিতে থাকে প্রেসিডেন্টের সচিবালয়। ১৯৬৫ সালের আগস্ট মাসে প্রেসিডেন্ট সচিবালয়ের অধীনে মোট সাতটি বিভাগ ছিল। যথা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, মুখ্যসচিবের বিভাগ, অর্থনীতিসংক্রান্ত বিভাগ, সংস্থাপন বিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত গবেষণা বিভাগ এবং স্বরাষ্ট্র ও সীমান্ত বিভাগ। এছাড়া মন্ত্রণালয়গুলোর অধীনে ছিল অতিরিক্ত আরো বাইশটি বিভাগ। এগুলো ছাড়াও প্রেসিডেন্ট ও মন্ত্রণালয়সমূহের অধীনস্থ বিভাগগুলোর সাথে সংযুক্ত অসংখ্য ডিপার্টমেন্ট এবং অফিসও ছিল।[৩৫]

আকার, গুরুত্ব ও ক্ষমতার বিচারে সংযুক্ত ডিপার্টমেন্টগুলোর মধ্যে পার্থক্যও ছিল অনেক। যেমন, এমন কয়েকটি ডিপার্টমেন্ট ছিল যেগুলোর প্রধান হতেন পূর্ণ সচিব মর্যাদার কর্মকর্তাগণ। বাদবাকী ডিপার্টমেন্টগুলোর দায়িত্বে উপসচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তারাই থাকতেন। পদমর্যাদার ক্ষেত্রে তারতম্য থাকলেও সংযুক্ত ডিপার্টমেন্টগুলোর প্রধানদের পদবি হতো সাধারণত মহাপরিচালক বা প্রধান প্রশাসক। কাজ করার ক্ষেত্রে তাঁদের স্বাধীনতা ছিল প্রচুর এবং আর্থিক ক্ষমতাও ছিল যথেষ্ট পরিমাণে। আর অধীনস্থ

৩৩. Goodnow, 131.

৩৪. পাকিস্তানের সংস্থাপন বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো এবং এর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্যে দেখুন, S. G. Ahmed, *Public Personnel Administration*, 63-95.

৩৫. Ralph Braibanti, "The Higher Bureaucracy of Pakistan" in Ralph Braibanti *(ed.), Asian Bureaucratic Systems Emergent from the British Imperial Tradition* (Durham 1966), 338-339.

অফিসসমূহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা সংযুক্ত ডিপার্টমেন্টের নিয়ন্ত্রণে থেকে ঐসব মন্ত্রণালয় বা ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক গৃহীত নীতিসমূহ বাস্তবায়নের কাজেই মূলত নিয়োজিত থাকতো। অধীনস্থ অফিসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা নির্ধারণ, বেতন বৃদ্ধি, বদলি, পদোন্নতি এবং আর্থিক বরাদ্দ প্রদান জাতীয় কর্মী ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়াদি মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হতো। অধীনস্থ অফিসসমূহের প্রধান হিসেবে সাধারণত সরকারের সচিবের চেয়ে কম পদমর্যাদার কর্মকর্তাদেরই নিয়োগ দেয়া হতো।[৩৬] বলা যায়, অনেকটা ঔপনিবেশিক নীতির ধারাবাহিকতা হিসেবেই কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক উভয় সরকারে পাকিস্তানের প্রশাসনের অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো সাধারণজ্ঞ সিভিল সার্ভিস ক্যাডার অর্থাৎ সিএসপি অফিসারদের জন্যে সংরক্ষিত রাখা হয়েছিল। এই সিএসপিরা পূর্বেকার আইসিএসদেরই ধারাবাহিক উত্তরসূরি। সিএসপি সার্ভিসের গঠনরীতি এবং ১৯৫৪ (১৯৬৬ সালে সংশোধিত) সালের ক্যাডার রুল অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের সচিব, অতিরিক্ত সচিব, যুগ্মসচিব এবং উপসচিবদের দুই-তৃতীয়াংশ পদ সিএসপি অফিসারদের দ্বারা পূরণ করার কথা।[৩৭] নির্ধারিত এই কোটার সুবাদে সিএসপি অফিসাররা খুব সহজেই কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের অধিকাংশ কর্মকর্তার পদ দখল করে নিলেন। একটি সূত্র থেকে ১৯৬৫ সালে এই পদ বণ্টনের আরো কিছু চমকপ্রদ তথ্য পাওয়া গেছে। এতে দেখা যায়, ঐ সময়ে কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের ঊনত্রিশটি (মন্ত্রণালয়ভুক্ত ২২টি বিভাগ এবং প্রেসিডেন্ট সচিবালয়ের আওতাধীন ৭টি বিভাগ) ইউনিটের মধ্যে বাইশটিরই (৭৬%) প্রধান ছিলেন সিএসপি কর্মকর্তাগণ।[৩৮] আর নিয়োগদানের ক্ষেত্রে এভাবেই সিএসপি ক্যাডার রুল (১৯৫৪) দ্বারা নির্ধারিত দুই-তৃতীয়াংশের কোটাটিও অতিক্রম করে যাওয়া হয়। পূর্ববর্তী বছরগুলোর চিত্রও কমবেশী এরকমই ছিল।

কর্মবাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান (line organization) হিসেবে বিবেচিত সংযুক্ত ডিপার্টমেন্ট এবং অধীনস্থ অফিসসমূহের পদগুলো সাধারণত বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারদর্শী বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পূরণ করা হতো। এইসব সংযুক্ত ডিপার্টমেন্টের কারিগরী বিশেষজ্ঞরা সচিবালয়ের নীতি প্রণয়নকারীদেরকে বিভিন্ন পরামর্শ এবং তথ্য প্রদান করে সহযোগিতা করতেন। তবে প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদেরকে নীতিপ্রণয়ন প্রক্রিয়া থেকে দূরে রাখা হতো এবং কেবলমাত্র গৃহীত নীতিসমূহ বাস্তবায়নেই তাদের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ ছিল। সচিবালয় এবং সংযুক্ত ডিপার্টমেন্ট ও অফিসসমূহের মধ্যেকার এই পার্থক্যটি ঔপনিবেশিক আমল থেকে সংগৃহীত একটি যুগ-অনুপযোগী রীতি ছিল বলেই ধরে নেয়া হয়। পাকিস্তানের প্রশাসনিক পদ্ধতি সম্পর্কিত অনেক লোক প্রশাসন বিশেষজ্ঞ বা পরামর্শকই

৩৬. দেখুন, Government of Pakistan (Ministry of Information and Broadcasting), *Twenty Years of Pakistan 1947-1967* (Karachi 1967), 97-98

৩৭. দেখুন, Government of Pakistan (Establishment Division), *Establishment Manual*, vol., 1 (Karachi 1968), 193-196.

৩৮. Braibanti, "The Higher Bureaucracy of Pakistan", 301.

এই পার্থক্যের রীতিটিকে অচল বলে মত দিয়েছিলেন। আমেরিকান পরামর্শক বার্নার্ড গ্লডিয়েক্স (১৯৫৫) শীর্ষস্থানীয় প্রশাসনিক পদগুলো সকল প্রতিযোগীর জন্যে উন্মুক্ত রাখার কথা বলেছিলেন। তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন, সরকারের একজন সচিবকে সাধারণ এবং পেশাগত উভয়বিদ দক্ষতারই অধিকারী হতে হবে। বিচারপতি কর্নেলিয়াসের নেতৃত্বে গঠিত বেতন ও কর্ম কমিশন (১৯৫৯-৬২) এই মর্মে অভিমত দিয়েছিল যে, নীতি প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়ন এ দু'টি কাজকে আলাদা করে রাখা ঠিক হবে না। বস্তুত কর্নেলিয়াস কমিশন মাঠ পর্যায়ের ডিপার্টমেন্টগুলোর সাথে সচিবালয়ের একটা সমন্বয় সাধনেরই পরামর্শ দিয়েছিল। কমিশন সুনির্দিষ্টভাবে বলেছিল, সচিবের পদটি হবে মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ন্যস্ত বিষয়াবলীর প্রধানের। একজন নীতিবিশেষজ্ঞ হিসেবে মন্ত্রীকে তিনি পরামর্শ দেবেন। অন্যদিকে নীতি বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত ডিপার্টমেন্টগুলোকে অবশ্যই নীতি প্রণয়নের কাজেও সম্পৃক্ত করতে হবে এবং তারা সরাসরি মন্ত্রীর সাথে সম্পর্কযুক্ত হবে।[৩৯]

## পাবলিক কর্পোরেশন

পাকিস্তানে সাধারণভাবে পাবলিক কর্পোরেশন বা এন্টারপ্রাইজ নামে পরিচিত বেশ কিছু সরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল এগুলোর মাধ্যমে পুঁজিনির্ভর এবং শ্রমঘন কিছু বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা। এছাড়া, যেখানে বেসরকারি বিনিয়োগ দ্বিধাগ্রস্ত, যেমন গৃহনির্মাণ, সেখানে বিনিয়োগ করা, অথবা সরকারের যেসব ক্ষেত্রে (যেমন, পানি ও বিদ্যুৎ) আশানুরূপ সাফল্যের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না সেসব ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে উন্নতি বিধান করার মতো কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এ ছাড়াও আরো কিছু সরকারি প্রতিষ্ঠান ছিল, যেগুলোর কোন কোনটি পুরোপুরি আবার কোন কোনটি আংশিকভাবে সরকারি অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। একটি পরিচালনা পরিষদের মাধ্যমে এসব প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হতো এবং তাতে সরকারি প্রতিনিধিত্ব থাকতো। এগুলো লোকবল ব্যবস্থাপনা এবং আর্থিক নিয়ন্ত্রণসহ প্রায় সব ক্ষেত্রে মোটামুটিভাবে সরকারি নিয়ন্ত্রণমুক্ত ছিল। তবে নীতি সংক্রান্ত বিষয়ে এসব প্রতিষ্ঠান সরকারি পরামর্শ মেনে চলতো।

যাই হোক, ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের সময় পাকিস্তান খুব সামান্য কয়েকটি সরকারি প্রতিষ্ঠানই উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিল। এর মধ্যে অবশ্যই ছিল করাচি এবং লাহোরে নগর উন্নয়ন কর্পোরেশন। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান রেলওয়ের কর্মকাণ্ড প্রথম কয়েক বছর অনেকটা কর্পোরেশনের মতোই ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে প্রাদেশিক সরকারগুলোর ক্রমাগত নিয়ন্ত্রণ এদের স্বায়ত্তশাসনকে খুবই সীমিত করে ফেলে। একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং কর্পোরেশন হিসেবে ১৯৪৮ সালে 'দি স্টেট

৩৯. Nasir Islam, "Pakistan', 76-77.

ব্যাংক অব পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠিত হয়। একই বছরে প্রতিষ্ঠিত হয় শরণার্থী পুনর্বাসন ফাইনান্স কর্পোরেশন। আর ১৯৪৯ সালে বিনিয়োজিত পুঁজির এক-চতুর্থাংশ সরকারি মালিকানায় সরকারি উদ্যোগেই প্রতিষ্ঠালাভ করে 'ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান' নামের একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক। এর পর নতুন নতুন শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৫০ সালে 'পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন' (পিআইডিসি) গড়ে তোলার পরই এ ক্ষেত্রে বড় ধরনের একটি গতিসঞ্চার ঘটে। এবং ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারি হওয়ার আগ পর্যন্ত প্রায় তেরোটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৮ এবং ১৯৫৯ সালে পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিম উভয় অংশে প্রতিষ্ঠিত হয় পানি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ। শুধুমাত্র পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৫৮ সালে একটি অভ্যন্তরীণ জলপরিবহন কর্তৃপক্ষ স্থাপিত হয়েছিল। ১৯৬২ সালে দুই প্রাদেশিক অঞ্চলেই প্রতিষ্ঠিত হয় কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এবং 'পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন' বা পিআইডিসি উভয় অঞ্চলে বিভক্ত হয়ে'পূর্ব পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন' বা 'ইপিআইডিসি' এবং 'পশ্চিম পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন' বা 'ডব্লিউপিআইডিসি'তে পরিণত হয়। এভাবেই ১৯৬৯ সালে আইয়ুব শাসনের শেষ দিকে এসে প্রায় চার ডজন বা তারও বেশি সরকারি কর্পোরেশন জন্মলাভ করেছিল। এদের প্রায় সবগুলোই উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিল। এগুলোর মধ্যে বারোটি কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে থেকে সারা পাকিস্তান ভিত্তিতে তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতো। অন্য বারোটি ছিল কেবল পূর্ব পাকিস্তানে এবং ছয়টি ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। এ ছাড়াও ছিল আরো বারোটি প্রতিষ্ঠান, যারা স্থানীয় ভিত্তিতে তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতো।[৪০]

স্বাধীনতার পর থেকেই পাকিস্তান "সহযোগিতাভিত্তিক" একটি শিল্প উন্নয়ন নীতি অনুসরণ করে এসেছে। ১৯৫০ সালে 'পিআইডিসি' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মূলত বেসরকারি উদ্যোক্তাদেরকে প্রধানত ভারী প্রকৌশল, রসায়ন, সার এবং পূর্ব পাকিস্তানের পাটখাতে সরকারের সাথে যৌথ বিনিয়োগে উৎসাহী করে তোলার জন্যে। সহযোগিতাভিত্তিক এই সরকারি নীতিটির পেছনের উদ্দেশ্যটি বাস্তব এবং সঠিক ছিল বলেই মনে হয়। বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তাগণ সরকারের এই জড়িত হওয়ার উদ্যোগটিকে একচেটিয়া প্রভাব বিস্তারের মনোভাব হিসেবে বিবেচনা করে নি। উপরন্তু সরকারের সহযোগিতাভিত্তিক এই শিল্পনীতির কারণেই সরকারি-বেসরকারি যৌথ মালিকানায় বেশ কিছু সফল শিল্পোদ্যোগ পরিচালনা সম্ভব হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই 'পিআইডিসি'র প্রতিষ্ঠা শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে বড় ধরনের একটি গতিসঞ্চার করেছিল। ১৯৫৯ সাল নাগাদ 'পিআইডিসি'র সম্পদের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল দেশের গোটা শিল্পসম্পদের ১৬ শতাংশ। আর এতে কর্মরত জনশক্তির পরিমাণ ছিল সারা দেশের শিল্পখাতে নিয়োজিত মোট জনবলের ২০ শতাংশ।

৪০. Guthrie S. Birkhead, "Government by Corporations", in Birkhead (ed.), *Administrative Problems in Pakistan,* 119-120. পাকিস্তানে কর্পোরেশনসমূহের ঐতিহাসিক বিকাশ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার জন্যে দেখুন, Reza H. Syed (ed.) *Role and Performance of Public Enterprises in the Economic Growth of Pakistan,* (Karachi 1977), 23-35.

১৯৫০-এর দশকের শেষ নাগাদ 'পিআইডিসি' দেশের বহুসংখ্যক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে গঠিত বৃহৎ একটি কর্পোরেশন হিসেবে আবির্ভূত হয়। ১৯৫০-এর দশকের শেষে এবং ১৯৬০-এর দশকে 'পিআইডিসি' বেশ কয়েকটি সরকারি শিল্পপ্রতিষ্ঠান (public enterprises) স্থাপন করতে পেরেছিল এবং পরবর্তীতে সেগুলো ধাপে ধাপে বেসরকারি খাতে ছেড়ে দিয়েছিল।[৪১]

যাই হোক, বাজারসূচকের আলোকে বিচার করলে দুই অঞ্চলে বিভক্ত 'পিআইডিসি' এবং অন্যান্য সরকারি কর্পোরেশনের সাফল্য কিন্তু খুব একটা উল্লেখযোগ্য নয়। তাদের উৎপাদন ও লাভের মাত্রা বেসরকারি খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোর তুলনায় অনেক নিচের দিকেই ছিল। এই অবস্থার জন্যে সমালোচকরা পাকিস্তান আমলে প্রথাগতভাবে সরকারি কর্পোরেশনগুলিতে আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা চাপিয়ে দেয়াকেই দায়ী করে থাকেন। নিজেদের যুক্তির পক্ষে উদাহরণ হিসেবে তাঁরা দেখিয়ে থাকেন যে, 'ইপিআইডিসি' এবং 'ডব্লিউপিআইডিসি' উভয়টি প্রায় বরাবরই সাধারণজ্ঞ (generalist) সিভিল সার্ভেন্ট এবং অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মকর্তাদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। আইয়ুব আমলে (১৯৫৮-৬৯) প্রথম সারির মোট ৮৫ জন সিভিল সার্ভেন্ট সরকারি কর্পোরেশনগুলির শীর্ষপদসমূহ দখল করেছিলেন। ১৯৫০ এবং ১৯৬০-এর দশকে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পরিচালককেই নিয়োগ করা হয়েছিল পাকিস্তানের উচ্চবিত্ত শিল্প পরিবারগুলো থেকে। প্রধান নির্বাহী এবং অর্থপরিচালক পদে নিয়োগ পেতেন অবশ্যই শীর্ষস্থানীয় সিভিল সার্ভেন্টগণ।[৪২] ফল দাঁড়ায় এই যে, কর্পোরেশনের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করাব জন্যে সংশ্লিষ্ট আইনবলে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা যে কর্তৃত্বটুকু পেতেন তা বরং তারা কর্পোরেশনগুলোর দৈনন্দিন প্রশাসনিক ও নিজস্ব এখতিয়ারভুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণমূলক কাজগুলোতে হস্তক্ষেপ করার জন্যে ব্যবহার করতেন। সাধারণ আমলাতান্ত্রিক একটি ডিপার্টমেন্ট চালানোর জন্যে প্রণীত কার্যপ্রণালী এবং কাঠামো, যা একটি শিল্প বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের জন্যে কোন অবস্থাতেই উপযোগী নয়, হরহামেশাই তা চাপিয়ে দেয়া হতো সরকারি কর্পোরেশনগুলির উপর। পাকিস্তানের অধিকাংশ সরকারি কর্পোরেশনগুলোতে এসব প্রথাবন্দি কর্মকাণ্ডের ফল দাঁড়িয়েছিল 'লাল ফিতার' দৌরাত্ম্যের প্রসার এবং লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অনেক নিম্নহারের উৎপাদন।[৪৩]

## সিভিল সার্ভিস

পাকিস্তানে 'সিএসপিই' একমাত্র সিভিল সার্ভিস ছিল না বা এমনও নয় যে, গুরুত্বপূর্ণ সবগুলো প্রশাসনিক পদে এই সার্ভিসেরই একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল। সবগুলো সুপিরিয়র সার্ভিসকে নিয়ে একত্রে যে "কেন্দ্রীয় সুপিরিয়র সার্ভিসেস" গঠিত হয়েছিল এটি ছিল

৪১. Nasir Islam, "Pakistan", in V. Subramaniam (ed.), *Public Administration in the Third World*, 79.

৪২. দেখুন, S.J. Burki, "Twenty Years of the Civil Service of Pakistan: A Reevaluation", *Asian Survey*, vol,. 9, April 1969, 254; A.K.M. Ahsan, "Top Level Management and Personnel Problems of Public Enterprises', in M. A. K. Beg and others (eds.), *Problems of Public Enterprises* (Lahore 1967), 150-169.

৪৩. Nasir Islam, "Pakistan", 79

তারই অন্যতম। মর্যাদার বিচারে শীর্ষে অবস্থিত সিএসপি এবং সর্বনিম্নে অবস্থানকারী কেন্দ্রীয় সচিবালয় সার্ভিস বা সিএসএস—এ জাতীয় সর্বমোট সতেরোটি সার্ভিস ছিল[৪৪] (সারণি ২ দ্রষ্টব্য)। এই সার্ভিসগুলোকে কেন 'সুপিরিয়র' সার্ভিস হিসেবে গণ্য করা হতো একটি সরকারি পুস্তিকায় তা নিম্নলিখিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে :

> "সার্ভিসগুলোকে সুপিরিয়র হিসেবে গণ্য করা হয় এই কারণে যে, মর্যাদার দিক থেকে এগুলোর চেয়ে নিম্নতর আরো অনেক সার্ভিস রয়েছে। সুপিরিয়র সার্ভিসে অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক সিভিল সার্ভেন্টের অধীনে আরো শতশত লোক কর্মরত রয়েছে, যাদের কেউই সুপিরিয়র সার্ভিসের সদস্য নয়। এই বিপুল সংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারীর নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার দায়িত্ব সরাসরি সুপিরিয়র সার্ভিসের কর্মকর্তাদের উপর ন্যস্ত"।[৪৫]

তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সুপিরিয়র সার্ভিসগুলোর মধ্যে সিএসপিই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। একই পুস্তিকায় এই সার্ভিস সম্পর্কে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলা হয়েছে, "পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস পাকিস্তানে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসেরই উত্তরসূরি। এটি ছিল পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ সিভিল সার্ভিস।"[৪৬]

পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের সাংগঠনিক কাঠামোটি ছিল অনমনীয় এবং জটিল। বিশেষকরে উপরের দিকের আমলাতান্ত্রিক কাঠামোটি কাজের ধরন বা ক্যাডারের ভিত্তিতে বিভক্ত ছিল। এখানে আন্তঃক্যাডার মেধা প্রবাহিত হওয়ার সুযোগ ছিল খুবই কম। আসলে এটি ছিল ভারতে বৃটিশ শাসন পরিচালনার লক্ষ্যে রাজনৈতিক প্রয়োজনে একটি প্রশাসনব্যবস্থা গড়ে তোলার লাগাতার কৌশলেরই ফসল।[৪৭] উপরের স্তরের আমলাতন্ত্রে কাজের ধরনের ভিত্তিতে বিন্যস্ত ক্যাডার ব্যবস্থা ছাড়াও পদের শ্রেণীগত (১ম শ্রেণী, ২য় শ্রেণী, ৩য় শ্রেণী এবং ৪র্থ শ্রেণী) এবং স্থানগত (নিখিল পাকিস্তান, কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক) বিভাজন রীতিও চালু ছিল। এই ব্যবস্থাকে অনেকেই একদিকে প্রশাসনের মধ্যে একটি সার্ভিসকৌলীন্য ও আন্ত-সার্ভিস বিরোধের জন্মদান এবং অন্যদিকে প্রশাসনকে কেন্দ্রীভূত করে তোলার জন্যে দায়ী করে থাকেন।[৪৮] পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান তিন ধরনের ১ম শ্রেণীর চাকরির মধ্যে সর্বপ্রথমেই ছিল সেইসব পদ, যেগুলো আইনের ভিত্তিতে গঠিত একটি সার্ভিস বা ক্যাডারের অন্তর্ভুক্ত থাকতো। দ্বিতীয়ত, এমন কিছু চাকরি ছিল, যেগুলো নিয়মিত কোন সার্ভিস বা ক্যাডারের অন্তর্গত নয়। এগুলো ছিল

---

৪৪. পাকিস্তানে সার্ভিসের সংখ্যা বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তিত হয়েছে। পাকিস্তান সরকারের ছাব্বিশটি কেন্দ্রীয় সুপিরিয়র সার্ভিসের নামও তালিকাভুক্ত পাওয়া গেছে—দেখুন, *Report of the Administrative Reorganization Committee - 1961* (Karachi 1961) (reprinted in public edition by Efficiency O & M Wing, Establishment Division, President's Secretariat, 1963), 348. আরো বিস্তারিত জানার জন্যে দেখুন, Braibanti, "The Higher Bureaucracy of Pakistan", 258-59.

৪৫. The Government of Pakistan (Establishment Division), *Careers in the Pakistan Central Superior Services* (Karachi 1954), 2.

৪৬. ঐ, 3.

৪৭. Ralph Braibanti, *Research on the Bureaucracy of Pakistan*, (Durham 1966), 101-112

৪৮. দেখুন, S.G. Ahmed, *Public Personnel Administration*, 48-49.

বিশেষ কিছু পেশাদার গোষ্ঠী, যেমন—অর্থনীতিবিদ, বিজ্ঞানী, উপ/সহকারী শিক্ষা উপদেষ্টা, পরিকল্পনা কমিশনের উপ/সহকারী উপদেষ্টার পদ। তৃতীয়ত, আর্থিক ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত মন্ত্রণালয়সমূহ, যথা— অর্থ, শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের জন্যে ১৩০টি পদের একটি ইকনোমিক পুল ব্যবস্থাও চালু ছিল।[৪৯]

## সারণি ২

## সতেরোটি কেন্দ্রীয় সুপিরিয়র সার্ভিসের তালিকা

১. সিভিল সার্ভিস অব পাকিস্তান
২. পাকিস্তান ফরেন সার্ভিস
৩. পুলিশ সার্ভিস অব পাকিস্তান
৪. পাকিস্তান অডিট এন্ড একাউন্টস সার্ভিস
৫. পাকিস্তান মিলিটারি একাউন্টস সার্ভিস
৬. পাকিস্তান টেক্সেসন সার্ভিস
৭. পাকিস্তান রেলওয়ে একাউন্টস্ সার্ভিস
৮. পাকিস্তান কাস্টম্স এন্ড এক্সাইজ সার্ভিস
৯. সেন্ট্রাল ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস
১০. টেলিগ্রাফ ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস
১১. পোস্ট এন্ড টেলিগ্রাফ ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস
১২. পাকিস্তান পোস্টাল সার্ভিস
১৩. পাকিস্তান মিলিটারি ল্যান্ডস এন্ড ক্যান্টনমেন্টস্ সার্ভিস
১৪. সেন্ট্রাল ইনফরমেশন সার্ভিস
১৫. ট্রেড সার্ভিস অব পাকিস্তান
১৬. জিওলজিক্যাল সার্ভে অব পাকিস্তান
১৭. সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েট সার্ভিস

সূত্র : Government of Pakistan, *Report of the Working Group on the Reorganization of the Public Service Structure in Pakistan* (Chairman, D.K. Power), (Karachi 1969), 138.

৪৯. Cf. *Memorandum Submitted to the Services Reorganization Committee* (1969) by the CSP Association (reprinted in *Administrative Science Review*, NIPA, Dacca, vol. 4, no. 1, March 1970, 169-243), 208-211.

প্রথম ধরনের পদগুলোর জন্যে নিয়মিত ভিত্তিতে সতেরোটি সার্ভিস বা ক্যাডার ব্যবস্থা চালু ছিল, যা ২নং সারণিতে দেখানো হয়েছে। এই সতেরোটির মধ্যেকার বিভাজন তুলনামূলকভাবে স্পষ্ট। কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক আয়োজিত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা এবং সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে এই সতেরোটি ক্যাডারে লোক নিয়োগ করা হতো। প্রতিটি ক্যাডারব্যবস্থাই ছিল আলাদা।[৫০] এগুলোর সাথেই যুক্ত করা হয়েছিল ছোট আকারের আরো একটি ক্যাডার। জেনারেল এডমিনিস্ট্রেটিভ রিজার্ভ বা General Administrative Reserve (জিএআর) নামের এই ক্যাডারটিতে বিভাগ পরবর্তীকালে পাকিস্তানে আইসিএস অফিসারদের স্বল্পতাজনিত সমস্যা মোকাবিলা করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সার্ভিস বা ডিপার্টমেন্ট থেকে সংগৃহীত কিছু সংখ্যক কর্মকর্তাকে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল।[৫১] এই সবের বাইরে উল্লেখ করার মতো খুব সামান্য কিছু ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তার পদ ছিল, যারা পাকিস্তান সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত ছিল। এদের মধ্যে ছিল বিনিয়োগ উন্নয়ন ও সরবরাহ ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তা; কৃষি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও পেশাদার কর্মকর্তা; পরিকল্পনা কমিশন, কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান অফিস এবং অন্যত্র নিয়োজিত অর্থনীতিবিদ ও পরিসংখ্যানবিদ; পাকিস্তান বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ এবং পাকিস্তান পরমাণু শক্তি কমিশনের বিজ্ঞানী এবং বেসামরিক বিমান চলাচল ও আবহাওয়া ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তারা।[৫২]

১৯৫০ সালে 'ফাইন্যান্স এন্ড কমার্স পুল' নামে একটি পৃথক সার্ভিস গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৫৯ সালে 'ইকনোমিক পুল' নামে এটিকে পুনর্গঠিত করে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীন বেশ কিছু পদ সৃষ্টি না করা পর্যন্ত এর কার্যক্রম স্থগিতই ছিল।[৫৩] ইকনোমিক পুল তৈরি করার এই ধারণাটি এসেছিল বিভাগপূর্ব বৃটিশ ভারতের কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মকর্তা নিয়োগের প্রচলিত একটি নীতিকে অনুসরণ করে। এই নীতিটি ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন ক্যাডারের অনমনীয় স্ব স্ব স্বাতন্ত্র্যবোধকে কিছুটা সংযত করার উদ্দেশ্যে সরকারের বিভিন্ন সার্ভিসে কর্মরত মেধাবী অর্থনীতিবিদদেরকে অভিন্ন একটি ক্যাডারে নিয়ে আসা। অর্থনৈতিক বিষয়াদিতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও দক্ষতাসহ মাঝারি পর্যায়ের সীমিত সংখ্যক কিছু কর্মকর্তাকেই ইকনোমিক পুলের জন্যে নির্বাচন করা হতো। এই পুলে যথাক্রমে ৬০ শতাংশ পদে

৫০. পাকিস্তান পাবলিক সার্ভিস কমিশনের গঠন এবং এর কর্মকাণ্ডের উপর বিস্তারিত প্রতিবেদন পাওয়া যাবে, Syed Giasuddin Ahmed, *Bangladesh Public Service Commission*, (Dhaka 1990), 48-86; S. G. Ahmed, 'Public Service Commission in Pakistan", *Pakistan Administration*, vol. 31, no. 2, 1985, 87-98.

৫১. Cf. *The CSP Association Memorandum of 1969*, 208-211.

৫২. Government of Pakistan, *Report of the Working Group on the Reorganization of the Public Service Structure in Pakistan*, (Karachi 1969), 138.

৫৩. Cf. M.A. Rahman, ed., *Administrative Reforms in Pakistan* (Lahore 1969), 10-11.

সিএসপি এবং ৪০ শতাংশ পদে একাউন্টস ও টেক্সেশন ক্যাডারের কর্মকর্তারা নিয়োগ পেতে পারতো।[৫৪]

সতেরোটি ক্যাডার, ক্যাডারবহির্ভূত ১ম শ্রেণীর পেশাদারদের পদ এবং ইকনোমিক পুল ছাড়া পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের বাদবাকী সার্ভিসগুলোর গঠন জটিলই ছিল। ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের শ্রেণীকরণ রীতিপদ্ধতিটি বিভাগপূর্ব অবস্থার প্রায় অনুরূপই থেকে গিয়েছিল। পরিবর্তনের মধ্যে ছিল কেবল বিভিন্ন কয়েকটি ক্যাডারের নামের একটু হেরফের এবং সময়ের চাহিদা অনুযায়ী নতুন কয়েকটি সার্ভিস বা ক্যাডারের সংযোজন। সার্ভিসগুলোকে সর্বপ্রথম বিস্তৃতভাবে শ্রেণীকরণ করা হয় স্থানভিত্তিক বিভাজনের মাধ্যমে। যেমন, নিখিল পাকিস্তান সার্ভিস, কেন্দ্রীয় সার্ভিস এবং প্রাদেশিক সার্ভিস। সিএসপি এবং পুলিশ সার্ভিস অব পাকিস্তান (পিএসপি) ছিল বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে নিখিল পাকিস্তান সার্ভিস, যেহেতু এই সার্ভিস দু'টির কর্মকর্তারা কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক উভয় সরকারেই চাকরি করতো। আর এটা হয়েছিল এই কারণে যে, এই দু'টি সার্ভিসের মাঠ পর্যায়ের পদগুলো প্রধানত প্রাদেশিক অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। নিখিল পাকিস্তান সার্ভিসকাঠামোর আওতায়ই পিএসপি দু'টি প্রাদেশিক ক্যাডারে (পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান) বিভক্ত ছিল। অন্যদিকে সিএসপি ছিল পুরোপুরি কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত একটি ক্যাডার। অডিট এন্ড একাউন্টস সার্ভিস, মিলিটারি একাউন্টস সার্ভিস, টেক্সেশন সার্ভিস, রেলওয়ে একাউন্টস সার্ভিস, কাস্টমস এন্ড এক্সাইজ সার্ভিস এবং সেন্ট্রাল ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসের মতো কেন্দ্রীয় সার্ভিসগুলো নিখিল পাকিস্তান সার্ভিস (সিএসপি এবং পিএসপি) দু'টি থেকে আলাদা ছিল। কারণ, প্রথম ধরনের সার্ভিসগুলোর সদস্যরা একান্তভাবেই কেন্দ্রীয় সরকারের জন্যে কাজ করতো। নিয়োগ পাওয়ার পরপরই কেন্দ্রীয় সার্ভিসের সদস্যরা সংশ্লিষ্ট কোন সংযুক্ত ডিপার্টমেন্ট বা অধীনস্থ অফিসে কাজ করতে শুরু করতো। এই ডিপার্টমেন্ট বা অফিসগুলো সুনির্দিষ্ট অঞ্চলে সরকারি কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতো।[৫৫]

নিখিল পাকিস্তান এবং কেন্দ্রীয় সার্ভিসগুলো ছাড়াও প্রতিটি প্রাদেশিক সরকারেরই নিজস্ব কিছু সার্ভিস ছিল। প্রত্যেক প্রাদেশিক সরকার যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নিজেই এসব সার্ভিসের জনবল সংগ্রহ, এদের ব্যবস্থাপনা এবং নিয়ন্ত্রণ করে থাকতো। তবে চাকরির বিভিন্ন শর্তাদি বা সুযোগ-সুবিধার বিচারে প্রাদেশিক এই সার্ভিসগুলো নিখিল পাকিস্তান এবং কেন্দ্রীয় উভয় প্রকারের সার্ভিস থেকে কম মর্যাদাসম্পন্ন ছিল। সিএসপি সার্ভিসেরই একটু ছোট আকারের অনুকৃতি প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসের (অর্থাৎ ইস্ট পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস বা ইপিসিএস) সদস্যরা ব্যতীত অন্য অধিকাংশ প্রাদেশিক সার্ভিসের সদস্যরাই তাদের চাকরিজীবনের পুরোটা সময় প্রদেশের সংশ্লিষ্ট সার্ভিসেই কর্মরত থাকতো।[৫৬]

৫৪. বৃটিশ ভারতে অর্থনৈতিক পুলের উৎপত্তি সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্যে দেখুন, S.G. Ahmed, *Public Personnel Administration in Bangladesh*, 51 (fn. 19)

৫৫. S. G. Ahmed, *Public Personnel Administration*, 52-54.

৫৬. Cf. *The CSP Association Memorandum of 1969*, 208-209.

দায়িত্বের ধরন ও প্রকৃতি বিচারে পাকিস্তানে সার্ভিস ও ক্যাডারের ক্ষেত্রে বড় দাগের আরেকটি শ্রেণীবিভাজন করা হয়েছিল। যেমন, (১) সাধারণজ্ঞ প্রশাসনিক সার্ভিস (সিএসপি); (২) পেশাদারী সার্ভিস (অর্থাৎ অডিট এন্ড একাউন্টস, ইনকাম ট্যাক্স, কাস্টমস এন্ড এক্সাইজ); এবং (৩) বিশেষজ্ঞ সার্ভিস (অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস, টেলিগ্রাফ এবং জিওলজিক্যাল সার্ভে)। সিএসপি অফিসারদেরকে সাধারণজ্ঞ প্রশাসক হিসেবে বিবেচনা করা হতো এই কারণে যে, তারা এক ধরনের কাজ থেকে অন্য ধরনের কাজে, এক ডিপার্টমেন্ট থেকে অন্য ডিপার্টমেন্টে এবং কেন্দ্র থেকে প্রদেশ বা প্রদেশ থেকে কেন্দ্রে বদলি হতে পারতো। তারা কেবল ভূমিরাজস্ব বা আইন-শৃঙ্খলা সম্পর্কিত প্রশাসনই নয়, রাষ্ট্রের শিল্প, অর্থনীতি এবং বাণিজ্য বিষয়ক প্রশাসনেরও দায়িত্ব পালন করতো। তাছাড়া রাষ্ট্রের অন্যবিধ গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাজের সাথেও জড়িত ছিল তারা। কেউ কেউ আবার বিচার বিভাগেও কাজ করতো। সুতরাং সিএসপি ছিল পাকিস্তানে প্রকৃত অর্থেই সাধারণজ্ঞ সর্বক্ষেত্রে ধন্বন্তরি একটি সার্ভিস।[৫৭]

পেশাদারি সার্ভিসের সদস্যরা নিজ নিজ সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত পেশাগত দায়িত্ব পালন করতো এবং চাকরিজীবনের সবটা সময় সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্টেই কাটিয়ে দিত। তবে বিশেষজ্ঞ সার্ভিসটি সাধারণজ্ঞ এবং পেশাদারি এই উভয় সার্ভিস থেকেই আলাদা ছিল। কারণ বিশেষজ্ঞ সার্ভিসের সদস্যদেরকে নিয়োগ করা হতো তাদের বিশেষ পেশাগত ডিগ্রী এবং প্রশিক্ষণের ভিত্তিতে। অন্যদিকে সাধারণজ্ঞ এবং পেশাদারি সার্ভিসের সদস্যদেরকে নিয়োগ করা হতো প্রায় প্রতি বছর কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক আয়োজিত প্রতিযোগিতামূলক অভিন্ন একটি কেন্দ্রীয় সুপিরিয়র সার্ভিস পরীক্ষার মাধ্যমে।[৫৮] সাধারণজ্ঞ, পেশাদাবি এবং বিশেষজ্ঞ জাতীয় বিভাজনটিকে সার্ভিসের উল্লম্ব শ্রেণীকরণের বৈশিষ্ট্যযুক্ত বিভাজন হিসেবে বর্ণনা করা হয়। কারণ সার্ভিসগুলো তাদের কাজের ধরন অনুযায়ী উল্লম্ব রেখা দ্বারা একে অপর থেকে বিভক্ত।[৫৯]

এ ছাড়াও পাকিস্তানে সার্ভিসগুলো আবার অনুভূমিকভাবে চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। যথা—১ম, ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ শ্রেণী। প্রতিটি শ্রেণীর পদের গুরুত্ব, বেতনস্কেল এবং দায়িত্বের তারতম্যের উপর ভিত্তি করেই এই বিভাজনটিকে অনুভূমিক শ্রেণীবিভাজন বলে অভিহিত করা হয়েছিল। ১ম শ্রেণী এবং ২য় শ্রেণীর অধিকাংশ কর্মকর্তাই ছিল গেজেটেড অফিসার (কারণ তাদের নিয়োগ, দায়িত্ব গ্রহণ এবং চাকরিজীবনের অন্যান্য তথ্যাদি সরকারি গেজেটবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশিত হতো) এবং সার্ভিস ব্যবস্থাপনা ও সরকারি

৫৭. M. A. Chaudhuri, *The Civil Service of Pakistan.* (Dacca 1969), 60.

৫৮. *The CSP Association Memorandum of 1969,* 208-209; M.A. Chaudhuri, *The Civil Service of Pakistan.* 59-64.

৫৯. M. A. Chaudhuri, ঐ, 60.

কর্মকাণ্ড সম্পাদনের ক্ষেত্রে তারা উচ্চতর ক্ষমতা এবং দায়িত্ব লাভ করতো। ৩য় শ্রেণীর সিভিল সার্ভেন্টরা ১ম ও ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানে থেকে দৈনন্দিন কাজকর্ম সম্পাদন করতো। আর ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা নিয়োজিত থাকতো শারীরিক বা অন্যান্য ছোটখাট কাজকর্মে।[৬০]

পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের শ্রেণীকরণপদ্ধতির বিরুদ্ধে অধিকাংশ সময়েই যে অভিযোগটি আনা হয় তা হলো, এই শ্রেণীকরণ পদ্ধতিটি সিএসপিদেরকে আলাদা একটি কৌলীন্যের মর্যাদা প্রদান করেছিল। তিনটি ব্যবস্থার মাধ্যমে এই কৌলীন্যের বিষয়টি কার্যকর করা হতে। প্রথমত, এই সার্ভিসে নিয়োগদানের ক্ষেত্রে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা পদ্ধতির এমন একটি কঠিন নীতি বরাবরই চালু রাখা হয়েছিল, যা কেবল সমাজের বিশেষ ভাগ্যবান একটি অংশের প্রতিযোগীদেরকেই এই মর্যাদাপূর্ণ ক্যাডারটিতে প্রবেশের সুযোগ করে দিত। দ্বিতীয়ত, চাকরিতে পদোন্নতি এবং পোস্টিং-এর ক্ষেত্রে যাতে করে অতিরিক্ত সুবিধা পাওয়া যায় সেজন্যে বিপুল সংখ্যক অনুমোদিত পদের বিপরীতে সব সময়েই তুলনামূলকভাবে কম সংখ্যক সিএসপি অফিসার নিয়োগ করা হতো। এবং তৃতীয়ত, সচিবালয়ের অধিকাংশ নীতিনির্ধারণী গুরুত্বপূর্ণ পদ এবং একই সাথে নীতি বাস্তবায়নকারী ডিপার্টমেন্টগুলোর প্রশাসনিক পদসমূহ সিএসপিদের জন্যে সংরক্ষিত থাকতো।[৬১] আরো সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে বলা যায়, সিএসপি ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাদের প্রকৃত সংখ্যার চাইতে তাদের জন্যে সংরক্ষিত পদের সংখ্যা সব সময়ই বেশি ছিল। এর ফলে অতি সহজেই সিএসপি কর্মকর্তারা মাঠ ও সদর অফিস, প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকার এবং পাবলিক কর্পোরেশন ও বিচার বিভাগের মধ্যে অহরহ স্থানান্তর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কর্মরত থাকার সুযোগ পেত। এ জাতীয় স্থানান্তরের মানেই ছিল দ্রুত পদোন্নতি। শীর্ষপদগুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য উচ্চতর বেতনস্কেলের বিধানটিও কিন্তু সিএসপিদের জন্যে বিশেষ একটি মর্যাদা হিসেবে কাজ করতো। পেশাদারি এবং বিশেষজ্ঞ ক্যাডারের সদস্যদের ক্ষেত্রে সচলতা এবং পরিক্রমণের এ জাতীয় সুযোগ খুবই কম ছিল বলে প্রায়ই তারা পদোন্নতিতে সিএসপিদের চাইতে অনেক পিছিয়ে থাকতো। এই অবস্থাটি পেশাদারি ও বিশেষজ্ঞ সিভিল সার্ভেন্টদের মধ্যে একটি ভয়ানক মানসিক যন্ত্রণার জন্ম দিত।[৬২]

পুরো পাকিস্তান সময়ে (১৯৪৭-৭১) সর্বমোট কতজন লোক সরকারি চাকরিতে নিয়োজিত ছিল তার কোন সঠিক হিসাব অথবা জনশক্তি সংক্রান্ত বিস্তারিত কোন জরিপের সন্ধান পাওয়া যায় নি। এমনকি কোনোক্রমে সংগৃহীত সূত্রাদি থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহও খুব বেশি নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয় নি। এক্ষেত্রে জ্ঞাত তথ্যাদি ও অনুমিত

৬০. ঐ, 61; *The CSP Association Memorandum of 1969,* 210.

৬১. Cf. The Civil Service of Pakistan (Compostion & Cadre) Rules, 1954, in Government of Pakistan (Establishment Division), *Establishment Manual,* vol. 1 (Karachi 1968), 185-196.

৬২. দেখুন, Nasir Islam, "Pakistan", 82.

হিসাবের সাথে প্রাপ্ত পরিসংখ্যানগত উপাত্তসমূহ মিলিয়ে নিয়েই মোটামুটিভাবে গ্রহণযোগ্য একটি সংখ্যা নির্ণয় করতে হবে। ১৯৬২ সালে পশ্চিম পাকিস্তান সরকার কর্তৃক পরিচালিত এক সরকারি গণনায় দেখা গেছে যে, ১৯৬০-এর দশকের প্রথম দিকে সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী মিলিয়ে সারা পশ্চিম পাকিস্তানে মোট ৩৭৬,৫২১ জন লোক সরকারি চাকরিতে নিয়োজিত ছিল।[৬৩] শিক্ষকবৃন্দ এবং রেলওয়েতে কর্মরত জনবলও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। তবে, ডাক ও তারের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরিজীবী বিধায় তাদেরকে এই হিসাবের বাইরে রাখা হয়েছে। ১৯৬৩ সালে পূর্ব পাকিস্তানে সরকারি চাকরিজীবীদের উপর পরিচালিত এক সরকারি গণনায় দেখা যায় যে, ঐ সময়ে সর্বমোট ১৮৫,৭৯৪ জন লোক পূর্ব পাকিস্তান সরকারের চাকরিতে নিযুক্ত ছিল। এদের মধ্যে ৫,৭৩৬ জন গেজেটেড অফিসার, ১০০,২৩৩ জন ৩য় শ্রেণীর কর্মচারী এবং ৭৯,৮২৫ জন ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী।[৬৪] ১৯৬৬ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের এক কর্মচারী গণনায় দেখা যায়, ১৯৬৬ সালের ১লা জুলাই তারিখে প্রায় ১৩২,৯৯০ জন লোক পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরিতে নিয়োজিত ছিল।[৬৫] বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত নিয়ে রাল্‌ফ ব্রাইবান্টি দেখিয়েছিলেন, ১৯৬৩ সাল বা এর কাছাকাছি সময়ে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরিতে প্রায় দশ লক্ষ (৯৯৫,৩২৩) লোক নিযুক্ত ছিল।[৬৬] আরেকটি সূত্রের হিসাব মতে, ১৯৭০ সালে সারা পাকিস্তানে সরকারি চাকরিতে কর্মরত লোকের সংখ্যা ছিল বারো লক্ষ। এদের মধ্যে ৫৫৫ জন ছিলেন সিএসপি কর্মকর্তা।[৬৭]

## প্রাদেশিক প্রশাসন

১৯৫৫ সালের অক্টোবরে পশ্চিম পাকিস্তানকে একক একটি প্রাদেশিক প্রশাসনের আওতায় আনার আগ পর্যন্ত পাকিস্তানের রাষ্ট্রকাঠামোটি বিক্ষিপ্ত কয়েকটি প্রশাসনিক ইউনিটে জটিলভাবে বিন্যস্ত ছিল। পূর্ব অংশে পূর্ববঙ্গকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল গভর্নরশাসিত একক একটি প্রদেশ। আর পশ্চিম অংশে ছিল তিনজন গর্ভনরশাসিত তিনটি প্রদেশ, যথা (পশ্চিম) পাঞ্জাব, সিন্ধু এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ (এন.ডব্লিউ.এফ.পি)। সেই সাথে ছিল (বৃটিশ) বালুচিস্তান, দি বালুচিস্তান স্টেটস (খালাত, লাসবেলা, মাকরান এবং খারানকে নিয়ে একত্রে গঠিত হয়েছিল বালুচিস্তান স্টেট্‌স ইউনিয়ন), দি এন.ডব্লিউ.এফ.পি. স্টেটস্ (দার, আম্ব, সোয়াত এবং চিত্রল), সীমান্ত উপজাতীয় অঞ্চল,

৬৩. Ralph Braibanti,, *Research on the Bureaucracy of Pakistan,* (Durham 1966), 131-132.
৬৪. দেখুন, Government of East Pakistan (Services & General Administration Department), *Census of Civil Employees 1965,* Vo. 1, (Dacca 1966), 1-9.
৬৫. Cf. *CSP Association Memorandum of 1969,* 210.
৬৬. বিস্তারিত জানার জন্যে দেখুন, R. Braibanti, "Concluding Observations", in R. Braibanti and others (eds.), *Asian Bureaucratic Systems Emergent from the British Imperial Tradition,* (Durham 1966), 648-649.
৬৭. Mumtaz Ahmad, *Bureaucracy and Political Development in Pakistan,* (Karachi 1974), 63.

করাচির ফেডারেল রাজধানী এলাকা এবং খায়েরপুর ও বহওয়ালপুরের প্রিন্সলি স্টেটস্। ১৯৫৬ সালের আগ পর্যন্ত গভর্নর শাসিত প্রদেশগুলি ১৯৩৫ সালের অভিযোজিত ভারত আইনের সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহের আওতায় পরিচালিত হতো। এবং এসব প্রদেশের শাসনপদ্ধতি মোটামুটিভাবে একটি গণতান্ত্রিক সরকারের মতোই ছিল। প্রিন্সলি স্টেটগুলির অবস্থা ছিল একেবারে প্রায় একনায়কতান্ত্রিক শাসন থেকে গভর্নরের শাসনপদ্ধতির কাছাকাছি পর্যায়ের। অন্যদিকে বালুচিস্তান, করাচি এবং উপজাতীয় অঞ্চলসমূহ শাসিত হতো কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত এজেন্টদের মাধ্যমে। গভর্নর শাসিত তিনটি প্রদেশ, প্রিন্সলি স্টেটগুলো এবং উপজাতীয় অঞ্চলসমূহ একক একটি প্রদেশের আওতায় এসে পশ্চিম পাকিস্তান (লাহোরে এর নতুন রাজধানী স্থাপিত হল) নাম ধারণ করলো। তখন থেকে পূর্ববঙ্গও হলো পূর্ব পাকিস্তান (আগের মতোই এর রাজধানী থেকে গেল ঢাকা)।[৬৮] ১৯৫৬ সালের সংবিধান প্রাদেশিক আইন পরিষদগুলোকে সরকারি নির্দেশ জারি, বিচার প্রশাসন (সুপ্রিম কোর্ট ব্যতীত), ভূমি, কৃষি, স্থানীয় সরকার, শিক্ষা, পানি, স্বাস্থ্য, সড়ক ও রেলপথ, বিদ্যুৎ উৎপাদন, শিল্প এবং জনসেবা সংক্রান্ত আইন পাশের ক্ষমতা দিয়েছিল। গঠনকাঠামোর দিক থেকে অনেকটা ফেডারেল সরকারের মতোই প্রতিটি প্রাদেশিক সরকারেরও ছিল একজন গভর্নর, মুখ্যমন্ত্রী, মন্ত্রীপরিষদ, এক কক্ষবিশিষ্ট একটি আইন পরিষদ, হাইকোর্ট, সচিবালয়, সরকারি কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট এবং পাবলিক কর্পোরেশন, সিভিল সার্ভিস এবং একটি পাবলিক সার্ভিস কমিশন। তবে প্রাদেশিক সরকারগুলির প্রশাসনকাঠামোর পার্থক্য নির্ণয়সূচক সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল এর মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন প্রশাসনিক ইউনিট। ভৌগোলিক আয়তনের ভিত্তিতে এদের উচ্চ বা নিম্ন ক্রমটি নির্ধারিত ছিল। যেমন—বিভাগ, জেলা, মহকুমা এবং থানা/তহসিল।[৬৯]

প্রাদেশিক গভর্নর ছিলেন প্রদেশের নামমাত্র প্রধান। তিনি সাংবিধানিকভাবে প্রেসিডেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত বা বরখাস্ত হতেন। প্রাদেশিক পরিষদের যে সদস্য পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থা অর্জন করতে পারবেন বলে মনে হতো তাঁকেই প্রদেশ সরকারের প্রধান নির্বাহী হিসেবে নিযুক্ত করার জন্যে ১৯৫৬ সালের সংবিধান গভর্নরকে নির্দেশ দিয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে গভর্নর একটি মন্ত্রীপরিষদও নিয়োগ করতেন (তিনি যেকোন মন্ত্রীকে আবার অপসারণও করতে পারতেন)।[৭০]

পাকিস্তানের ১৯৬২ সালের সংবিধানটি নতুন অনেক কিছুই ধারণ করেছিল, আবার পুরনোও ছিল অনেক কিছু। সরকারের প্রশাসনিক এবং বিচার বিভাগীয় কার্যক্রম আগের

৬৮. দেখুন, Callard, *Pakistan,* 155-156.

৬৯. দেখুন, Goodnow, 45-46.

৭০. ঐ, 48.

মতোই চলছিল। সামরিক ও বেসামরিক চাকরিগুলোকে সাংবিধানিকভাবে অনেক বেশি সুরক্ষিত করা হলো। তবে সরকারের কাঠামোটিকে ফেডারেল হিসেবে ঘোষণা দেয়া হলেও ১৯৬২ সালের সংবিধানে বর্ণিত প্রাদেশিক সরকারগুলো অনেক বেশি দুর্বল হয়ে পড়লো। প্রত্যেক প্রদেশেরই একটি করে এক কক্ষবিশিষ্ট আইন পরিষদ থাকলেও প্রাদেশিক গভর্নর একান্তভাবেই প্রেসিডেন্ট কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত এবং অপসারিত হতেন। তা ছাড়া গভর্নরকে তাঁর মন্ত্রিসভার প্রতিটি সদস্য নিয়োগের আগে প্রেসিডেন্টের অনুমোদন নিতে হতো এবং এই মন্ত্রিসভায় মুখ্যমন্ত্রীর কোন পদ ছিল না, যা ১৯৫৬ সালের সংবিধানে ছিল। এমন কি মন্ত্রিসভার সদস্যদের আইনপরিষদের সদস্যও হতে হতো না এবং আইনপরিষদের নিকট তাঁরা দায়বদ্ধও থাকতেন না। প্রাদেশিক বিভিন্ন দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের একমাত্র কাজ ছিল গভর্নরকে তাঁর শাসন পরিচালনায় সহযোগিতা করা।[৭১]

১৯৬২ সালের সংবিধান কেন্দ্রীয় সরকারকে মোট ঊনপঞ্চাশটি বিষয়ে ক্ষমতা প্রদান করেছিল। এসকল বিষয়ের তালিকায় ছিল প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র বিষয়, আন্তঃপ্রদেশ এবং আন্তর্জাতিক ব্যবসা ও বাণিজ্য, বীমা, ডাক, টেলিযোগাযোগ এবং পর্যটন। বাদবাকি ক্ষমতাগুলো অনেকটা প্রদেশের জন্যেই সংরক্ষিত ছিল এবং এগুলো প্রাদেশিক আইনপ্রণেতাদের দ্বারা প্রণীত আইনের নিকট দায়বদ্ধ থাকতো।[৭২] এক্ষেত্রে অবশ্য সংবিধানের ১৩১ অনুচ্ছেদের ২ ধারার মাধ্যমে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যতিক্রমের বিধান রাখা হয়েছিল। এই বিধান জাতীয় স্বার্থে প্রয়োজনীয় মনে হলে নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, পরিকল্পনা ও সহযোগিতা অথবা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সমতা আনয়নের প্রশ্নে কেন্দ্রীয় সরকারকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করেছে। ১৩১ (২) অনুচ্ছেদের মাধ্যমে প্রদত্ত কর্তৃত্বের মধ্যে প্রদেশগুলোতে 'স্বায়ত্তশাসন' চর্চার বিরুদ্ধে সম্ভাব্য ব্যবস্থা গ্রহণের একটি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রয়েছে। এই কর্তৃত্ব কেন্দ্রীয় আইনসভাকে দেওয়া হয়েছিল প্রয়োজন সাপেক্ষে আইন বা বিধানাবলী প্রণয়নের জন্যে। এ কর্তৃত্ব প্রেসিডেন্টকেও দেয়া হয়েছিল পরোক্ষভাবে। কেননা প্রেসিডেন্ট ১৩১ (২) অনুচ্ছেদে উল্লেখিত আইনগত কোন পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষ্যে জরুরি ভিত্তিতে নির্বাহী অধ্যাদেশের মাধ্যমে আইনসভার মতই প্রয়োজনীয় বিধানাবলী জারি করতে পারতেন।[৭৩]

আমরা এবার প্রাদেশিক প্রশাসনের বিষয়ে আরো একটু বিস্তারিত আলোচনা করবো। আলোচনায় প্রধানত সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের বাস্তবতার আলোকে লোক প্রশাসন বিষয়ের

৭১. Cf. articles 80-84 in *The Constitution of the Islamic Republic of Pakistan* (as modified up to 10 April 1968).

৭২. ঐ, Cf. articles 131.

৭৩. দেখুন, Braibanti, "Higher Bureaucracy of Pakistan", 217-218.

উপরই গুরুত্ব আরোপ করা হবে। তবে আন্তঃপ্রাদেশিক পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্যগুলোর কথাও যথাস্থানে উল্লেখ করা হবে।

**প্রাদেশিক সচিবালয় :** পূর্ব পাকিস্তান সরকারের ১৯৬২ সালের রুলস অব বিজনেস অনুযায়ী প্রাদেশিক সচিবালয়ের অন্তর্ভুক্ত কোনো একটি ডিপার্টমেন্ট ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি প্রশাসনিক ইউনিট। এটির দায়িত্ব ছিল একটি স্বতন্ত্র ও সুনির্দিষ্ট পরিমণ্ডলে যাবতীয় সরকারি কর্মকাণ্ড নির্বাহ করা। অন্যদিকে ডাইরেকটোরেট/অধীনস্থ অফিসসমূহ 'অপারেটিং এজেন্সি' হিসেবে প্রাদেশিক সচিবালয়ের কোন না কোন ডিপার্টমেন্টের সাথে যুক্ত থাকতো। জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত সরকারের আমলে সচিবালয়ের প্রতিটি ডিপার্টমেন্টই এক একজন মন্ত্রীর অধীনে ন্যস্ত থাকতো। তাঁকে সহযোগিতা করার জন্যে থাকতো একদল স্থায়ী সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী; যথা— সচিব, অতিরিক্ত সচিব (কেবলমাত্র বড় ডিপার্টমেন্টগুলির ক্ষেত্রে), যুগ্ম সচিব, উপ সচিব, সেকশন অফিসার এবং করণিক পর্যায়ের বেশ কিছু কর্মচারী। একটি সচিবালয় ডিপার্টমেন্টের প্রধান হতেন একজন সচিব। অন্তত তাত্ত্বিকভাবে হলেও এই সচিব সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্টের জন্যে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি প্রণয়ন, এগুলোর সমন্বয় সাধন ও নিয়ন্ত্রণ এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নিজ পদাধিকারবলে মন্ত্রীকে সহযোগিতা প্রদান করতেন। সচিব তাঁর নিজ ডিপার্টমেন্টসহ সংযুক্ত অপারেটিং এজেন্সিগুলির মুখ্য হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার দায়িত্বও পালন করতেন। উদ্দেশ্য, তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন আর্থিক বরাদ্দসমূহ প্রচলিত আর্থিক নিয়মনীতি অনুযায়ী ব্যয় হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করা।[৭৪]

প্রাদেশিক সচিবালয় ও প্রাদেশিক ডাইরেকটোরেট বা "অপারেটিং" এজেন্সিগুলির মধ্যেকার সম্পর্ক অনেকটা কেন্দ্রীয় সচিবালয় ও কেন্দ্রীয় অপারেটিং ডিপার্টমেন্টের মধ্যেকার সম্পর্কের অনুরূপই ছিল। প্রাদেশিক পর্যায়ের 'অপারেটিং' বা 'সংযুক্ত' বা 'ফাংশনাল' এজেন্সিগুলি (এগুলিকে এসব বিশেষ নামেই অভিহিত করা হতো) সচিবালয়ে অবস্থিত এদের নিয়ন্ত্রণকারী সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্টগুলির সাধারণ তত্ত্বাবধানেই পরিচালিত হতো। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় শিক্ষা, কৃষি এবং পুলিশ ডাইরেকটোরেটসমূহ সাধারণত সচিবালয়ে অবস্থিত তাদের নিয়ন্ত্রণকারী সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্টসমূহ, যথা—শিক্ষা, কৃষি ও স্বরাষ্ট্র বিষয়ক ডিপার্টমেন্টের ঘনিষ্ঠ তত্ত্বাবধানেই নিজেদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতো। বিভিন্ন ডাইরেকটোরেট বা অধীনস্থ অফিসসমূহের প্রধানদের পদবি কিন্তু এক রকম ছিল না। শিক্ষা ডাইরেকটোরেটের প্রধানকে বলা হতো ডাইরেকটর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন বা ডিপিআই, সড়ক পরিবহন ডাইরেকটোরেটের প্রধান ছিলেন 'চীফ ইঞ্জিনিয়ার' এবং প্রাদেশিক পুলিশের প্রধানের পদবি ছিল ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ বা আইজিপি।[৭৫]

৭৪. দেখুন, Government of East Pakistan (Services & General Administration Department), *The East Pakistan Government Rules of Business*, 1962 (revised up to June 1971), 3-4.

৭৫. Najmul Abedin, *Local Administration and Politics in Modernising Societies: Bangladesh and Pakistan* (Dhaka 1973), 102-103.

বাহ্যত প্রাদেশিক সচিবালয় কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের ছোট একটি অনুকৃতি হলেও উভয় সচিবালয়ের মধ্যে বড় ধরনের কিছু পার্থক্যও ছিল। প্রাদেশিক সচিবালয়ে 'চীফ সেক্রেটারি' হিসেবে পরিচিত একজন 'চীফ' অফিসার ছিলেন। একজন সিনিয়র সিএসপি অফিসার এই পদে নিয়োগ পেতেন। সরাসরি কোন মন্ত্রীর নিকট তিনি দায়বদ্ধ থাকতেন না, দায়বদ্ধ থাকতেন কেবল মুখ্যমন্ত্রী/গভর্নর এবং পুরো মন্ত্রীপরিষদের নিকট।[৭৬] আরো সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায়, তিনি ছিলেন আসলে প্রাদেশিক প্রশাসনের অরাজনৈতিক প্রধান। সাধারণ প্রশাসন এবং সচিবালয়ের পুরো কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনার দায়িত্ব তাঁর উপরই ন্যস্ত ছিল। তিনি মন্ত্রীপরিষদের বৈঠকের আয়োজন করতেন এবং মন্ত্রীপরিষদের পক্ষ থেকে নির্দেশসমূহ জারি করতেন। সিভিল সার্ভিসের ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের নিয়ন্ত্রণও তিনি নিজের হাতেই রাখতেন। তাঁর কর্তৃত্বের প্রধান একটি দিক ছিল প্রদেশের সকল বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা কর্মকর্তার উপর প্রশাসনিক তত্ত্বাবধান পরিচালনার ক্ষমতা। গুরুত্বপূর্ণ স্বরাষ্ট্র ডিপার্টমেন্টের কর্মকাণ্ডও তাঁরই সঠিক তত্ত্বধানে পরিচালিত হতো। এই ডিপার্টমেন্টটির দায়িত্ব ছিল প্রদেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা।[৭৭]

কিন্তু কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে চীফ সেক্রেটারির কোন পদ ছিল না। অবশ্য বিভাগোত্তরকালে (১৯৪৭-৫১) এবং সামরিক শাসন জারির অব্যবহিত পরে (১৯৫৮) কিছু কালের জন্যে সেক্রেটারি জেনারেল নামে সিনিয়র একজন কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি ছিলেন কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের প্রধান এবং মন্ত্রীপরিষদের সচিব। বাদবাকি অন্য সব সময়েই মন্ত্রীপরিষদ সচিব কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে কর্মরত সকল সচিবের চীফ-অব-স্টাফের দায়িত্ব পালন করতেন।[৭৮]

১৯৬৪ সালের ১লা জানুয়ারিতে নেয়া হিসাব মতে পূর্ব পাকিস্তানে বারোটি সচিবালয় ডিপার্টমেন্ট ছিল। একই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানে এই সংখ্যা ছিল ষোলো। তবে প্রতিটি প্রদেশে মোট যে পাঁচটি করে স্বতন্ত্র অফিসের সমন্বয়ে গভর্নরের সচিবালয়টি গড়ে উঠেছিল সেগুলোকে এই হিসাবের বাইরে রাখা হয়েছে। এগুলো ছিল মুখ্য সচিবের অফিস, গভর্নরের সচিবের অফিস, পরিকল্পনা সচিবের অফিস এবং চাকরি সংক্রান্ত ও সাধারণ প্রশাসন সংক্রান্ত ডিপার্টমেন্ট। এই অফিসগুলোর প্রতিটির প্রধান ছিলেন সচিব পর্যায়ের সিনিয়র সিএসপি অফিসার। পূর্ব পাকিস্তানে বারোটি সচিবালয় ডিপার্টমেন্টের মধ্যে পাঁচটিরই প্রধান ছিলেন সিএসপি অফিসারগণ। তাঁরা প্রাদেশিক মুখ্য সচিব এবং অতিরিক্ত মুখ্য সচিবের সাধারণ তত্ত্বাবধানে থেকে নিজেদের কার্যনির্বাহ করতেন। তবে প্রাদেশিক

৭৬. ১৯৫৮ সালের পূর্ববর্তীকালে ' নর (১৯৪৭-৭১) প্রদেশসমূহে মুখ্যমন্ত্রীই ছিলেন প্রধান নির্বাহী শাসক, কিন্তু ১৯৫৮ সালের ' । প্রকৃতপক্ষে গভর্নরই ছিলেন প্রধান নির্বাহী শাসক।

৭৭. Goodnow, 123.

৭৮. Braidanti, "The Higher Bureaucracy of Pakistan", 301.

সচিবালয় ডিপার্টমেন্টসমূহের দায়িত্ব পাওয়ার ক্ষেত্রে সিএসপি অফিসারদের প্রাধান্য পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানেই বেশি পরিলক্ষিত হতো। ১৯৬৪ সালের ১লা জানুয়ারির হিসাব মতে, পশ্চিম পাকিস্তানে ষোলোটি সচিবালয় ডিপার্টমেন্টের মধ্যে বারোটির প্রধান ছিলেন সিএসপি অফিসার।[৭৯] যাই হোক, ১৯৭০ সালের শেষ দিকে এসে পূর্ব পাকিস্তানে সচিবালয় ডিপার্টমেন্টের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় সতেরোতে। এগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ চৌদ্দটি ডিপার্টমেন্টের প্রধান ছিলেন সিএসপি কর্মকর্তাগণ। অবশ্য গভর্নরের সচিবের অফিস এবং মুখ্য সচিবের অফিসকে এই হিসাবের বাইরে রাখা হয়েছে। এই অফিস দুটোর প্রধানও ছিলেন দু'জন সিএসপি অফিসার। এছাড়াও সচিবালয়ে অতিরিক্ত সচিব, যুগ্মসচিব এবং উপসচিব পদে সিএসপি ক্যাডারের বহু অফিসার কর্মরত ছিলেন। গুরুত্বপূর্ণ রাজস্ব বোর্ডের (প্রাদেশিক পর্যায়ে কর সংক্রান্ত অভিযোগ দায়েরের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ) পাঁচজন সদস্যের মধ্যে মাত্র একজন ছাড়া বাদ বাকি সবাই এবং বোর্ডের চেয়ারম্যানও ছিলেন সিএসপি অফিসার। প্রদেশের চারটি বিভাগের মধ্যে তিনটিরই কমিশনার এবং উনিশটি জেলার মধ্যে বারোটির জেলা অফিসার (ডেপুটি কমিশনার) পদে সিএসপি ক্যাডারের অফিসারগণই কর্মরত ছিলেন। এমনকি পূর্ব পাকিস্তান হাই কোর্টের রেজিস্ট্রারের পদটিতে নিয়োজিত ছিলেন একজন সিএসপি অফিসার।[৮০]

প্রাদেশিক সরকারেও সিএসপি অফিসারের এ জাতীয় প্রাধান্য বজায় থাকার মূলে ছিল ১৯৫৪ সাল থেকে চাকরিতে সিএসপিদের জন্য কোটাপদ্ধতি এবং ক্যাডার-নীতির প্রচলন। এই নীতি অনুযায়ী প্রাদেশিক সচিবালয়ের সচিব, অতিরিক্ত সচিব, যুগ্মসচিব ও উপসচিব এবং মাঠ পর্যায়ের বিভাগীয় কমিশনার, জেলা অফিসার ও রাজস্ববোর্ডের সদস্যের মতো পদগুলির মোট দুই-তৃতীয়াংশই ষিএসপি অফিসারদের দ্বারা পূরণ করতে হবে। একই নীতির অন্য একটি ধারাবলে সিএসপি ক্যাডারের ৩০ শতাংশ পদ আবার প্রাদেশিক সাধারণজ্ঞ সিভিল সার্ভেন্টদের (অর্থাৎ ইপিসিএস অফিসার) মধ্য থেকে পূরণ করার কথা ছিল। তবে এই পদ্ধতিতে পূরণকৃত সিএসপি ক্যাডারের পদগুলো ছিল একেবারেই অস্থায়ী ও স্বল্পমেয়াদী এবং এগুলো 'তালিকাভুক্ত পদ' হিসেবে চিহ্নিত থাকতো।[৮১]

**বিভাগ** : প্রশাসনিক প্রয়োজনে প্রতিটি প্রদেশই কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত থাকতো এবং প্রতিটি বিভাগ আবার গঠিত হতো কয়েকটি জেলার সমন্বয়ে। পূর্ব পাকিস্তানে ছিল

৭৯. Braibanti, পূর্বোক্ত, 225

৮০. Cf. Government of East Pakistan (Services & General Administration Department), *The East Pakistan Civil List 1967-68*, Part 1 No. II, (Dacca 1971), 1-31.

৮১. "তালিকাভুক্ত" হিসেবে চিহ্নিত কিছু পদের বিধান চালু হয়েছিল ভারত বিভাগের আগে থেকেই। সেই বিধান অনুযায়ী সাধারণভাবে আইসিএস অফিসারদের জন্যে নির্ধারিত জেলাপ্রধান বা জেলা ও সেসন জজ-এর মত পদগুলির কোন কোনটিতে প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিস থেকে বাছাই করা দু'একজন কর্মকর্তাকেও নিয়োগ দেয়া হতো। Cf. *Report of the Indian Statutory Commission, Cmp. 3568, 1930*, vol. 1, 265

চারটি বিভাগ এবং পশ্চিম পাকিস্তানে তেরোটি।[৮২] প্রতিটি বিভাগের প্রধান ছিলেন 'বিভাগীয় কমিশনার' পদবিধারী একজন উচ্চপদস্থ বেসামরিক কর্মকর্তা। তাঁর সরকারি দায়দায়িত্ব অনেকটা প্রায় বৃটিশ ভারতীয় সময়ের দায়দায়িত্বের মতোই ছিল। অর্থাৎ তাঁর বিভাগের আওতাধীন জেলাসমূহের দৈনন্দিন প্রশাসনিক কাজের ব্যাপারে তাঁর নিজের কোন দায়-দায়িত্বই ছিল না। তিনি কেবল তাঁর বিভাগীয় জেলা অফিসারদের কাজের মধ্যে সমন্বয়সাধন ও তাদের কাজকর্মের সাধারণ তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করতেন। এ ছাড়া বিভাগীয় সদর দফতরে অবস্থিত বিভিন্ন ডাইরেকটোরেটের অফিসসমূহে কর্মরত অফিসারদের কর্মকাণ্ডের সাধারণ তদারকির কাজও তিনি করতেন।[৮৩] তবে জেলা অফিসারদের তদারকি করার মতো অতি সাধারণ একটি দায়িত্বই কেবল বিভাগীয় কমিশনারদের উপর কেন যে অর্পিত হয়েছিল তার যুক্তিসঙ্গত কারণটি ছিল সম্ভবত এই যে, বিভাগের আয়তন বড় ছিল বিধায় কার্যকর একটি একক প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে বিভাগকে গণ্য করার বিষয়টি যৌক্তিক বিবেচিত হয় নি।[৮৪]

এটিও ঠিক যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে বিভাগীয় কমিশনাররা যে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করতেন তা সর্বত্র সমান মাত্রার ছিল না। পশ্চিম পাকিস্তানে বিভাগীয় কমিশনাররা যে তদারকির দায়িত্ব পালন করতেন তার ক্ষেত্র ছিল অনেক বেশি বিস্তৃত এবং দায়িত্বপূর্ণ। পশ্চিম পাকিস্তানে বিভাগীয় কমিশনারদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে এই ভিন্ন মাত্রাটি সংযুক্ত হবার আংশিক কারণ নিহিত রয়েছে একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের মধ্যে। তা হলো, বৃটিশ ভারতে বেশ কিছু ননরেগুলেটেড এরিয়া বা অনিয়ন্ত্রিত অঞ্চল বা প্রদেশ ছিল। এগুলোকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্যে ঐসব অঞ্চলে আলাদা একটি বিশেষ ধরনের প্রশাসনব্যবস্থা গড়ে তুলতে হয়েছিল। পরবর্তীকালের তিনটি নিয়ন্ত্রিত প্রদেশ (পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বালুচিস্তান) পশ্চিম পাকিস্তানের ঐসব অনিয়ন্ত্রিত অঞ্চল বা প্রদেশেরই উত্তরসূরি।

আরো স্পষ্টভাবে বলা যায়, অনিয়ন্ত্রিত প্রদেশসমূহের বিভাগীয় কমিশনারদেরকে তাঁদের অধীনস্থ জেলা অফিসারদের বিভিন্ন প্রশাসনিক কাজকর্মের উপর খুবই তীক্ষ্ণ নজর ও নিয়ন্ত্রণ রাখতে হতো। কারণ এসব অফিসার ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে এমনিতেই প্রচুর স্বাধীনতা ভোগ করতেন। প্রতিটি জেলা অফিসার তাঁর নিজস্ব সীমায় সব ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারতেন। বিচার বিভাগীয় কাজ সহ আরো বহু ধরনের দায়িত্ব তিনি একাই পালন করতেন। দেখা গেছে, নিয়ন্ত্রিত প্রদেশের কোন জেলার ন্যায় অন্তত জেলা

৮২. বিভিন্ন সময়ে সৃষ্ট বিভাগ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্যে দেখুন, Najmul Abedin, *Local Administration and Politics in Modernising Societies,* 122-126 (fn. 4).

৮৩. দেখুন, Abedin, ঐ।

৮৪. দেখুন, *Report of the Bengal Administration Enquiry Committee, 1944-45* (Chairman, Sir A. Rowlands), (Alipore 19450, para 114 (1).

জজের মতো ন্যূনতম একজন প্রতিদ্বন্দ্বীও তাঁর ছিল না। এই পরিপ্রেক্ষিতেই চিন্তা করা হয়েছিল যে, অনিয়ন্ত্রিত প্রদেশের বিভাগীয় কমিশনারদের নজরদারিটি যদি কর্তৃত্বপূর্ণ হয় তবে তা অবাধ স্বাধীনতা ভোগকারী জেলা অফিসারদের রাশ টেনে ধরার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নিয়ামক হিসেবে কাজ করবে। এর ঠিক বিপরীত চিত্রটিই পাওয়া যায় নিয়ন্ত্রিত প্রদেশ বৃটিশ বাংলায়। এখানকার জেলা অফিসারদের স্বাধীনভাবে ক্ষমতা প্রয়োগের তেমন কোন সুযোগই ছিল না। তাদেরকে বেঁধে দেয়া সাধারণত অপরিবর্তনশীল কিছু নিয়ম-কানুনের মধ্যে কাজ করতে হতো। আর সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনারগণ জেলাসমূহের বিভিন্ন প্রশাসনিক কাজের উপর নজরদারিমূলক একটি নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখলেও তা ছিল নামমাত্র। রাজস্ব সংক্রান্ত বিরোধ বা অভিযোগসমূহ খতিয়ে দেখাই ছিল তাঁর প্রধান কাজ। এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, পশ্চিম পাকিস্তানে বিভাগীয় কমিশনারগণ পূর্ব পাকিস্তানের বিভাগীয় কমিশনারদের চাইতে অনেক বেশি ক্ষমতা ভোগ করতেন। কারণ পশ্চিম পাকিস্তানে বিভাগীয় কমিশনারগণ উত্তরাধিকারসূত্রেই অনিয়ন্ত্রিত প্রদেশসমূহের প্রশাসনব্যবস্থাটি পেয়েছিলেন। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তান পেয়েছিল নিয়ন্ত্রিত বৃটিশ বাংলা প্রদেশের প্রশাসনব্যবস্থাটি।[৮৫]

কর্মী ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়গুলো, যেমন বিভাগীয় কমিশনারদের পোস্টিং, পদোন্নতি, বদলি বা ছুটির বিষয়, সাধারণত প্রদেশের মুখ্য সচিবের সার্বিক প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রনের অধীনে চাকরি এবং সাধারণ প্রশাসন ডিপার্টমেন্ট (প্রাদেশিক কেন্দ্রীয় কর্মী ব্যবস্থাপনা এজেন্সি) নিয়ন্ত্রণ করতো। তবে যেসব বিভাগীয় কমিশনার সিএসপি ক্যাডারের কর্মকর্তা ছিলেন তাদের বিষয়গুলোর চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থাপন বিভাগের হাতেই থাকতো। বিধি অনুযায়ী বিভাগীয় কমিশনারের পদমর্যাদা হচ্ছে প্রাদেশিক সরকারের একজন সচিব অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের একজন যুগ্মসচিবের সমান। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান মিলিয়ে যে মোট ষোলোটি বিভাগীয় কমিশনারের পদ ছিল তাদের সবগুলোই সংরক্ষিত ছিল সিএসপি অফিসারদের জন্যে।[৮৬] যাই হোক, ১৯৬৪ সালের ১লা জানুয়ারির এক হিসাবমতে সে সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের চারটির মধ্যে দু'টি এবং পশ্চিম পাকিস্তানের বারোটির মধ্যে দশটি বিভাগীয় কমিশনারের পদে সিএসপি অফিসাররা কর্মরত ছিলেন।[৮৭] বিভাগীয় কমিশনারের বাদবাকি পদগুলোতে কর্মরত ছিলেন প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসের 'তালিকাভুক্ত পদ'-এর কর্মকর্তারা।

**জেলা :** প্রশাসনিক প্রয়োজনে পূর্ব পাকিস্তানকে মোট ১৯টি এবং পশ্চিম পাকিস্তানকে মোট ৫৫টি (এর মধ্যে উপজাতীয় অঞ্চলের ৬টি রাজনৈতিক এজেন্সিও অন্তর্ভুক্ত ছিল)

৮৫. Cf. Najmul Abedin, 31, 125.

৮৬. Cf. The Civil Service of Pakistan (Composition & Cadre) Rules, 1954.

৮৭. দেখুন, Braibanti, " The Higher Bureaucracy of Pakistan", 302.

জেলায় ভাগ করা হয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানের আয়তন ছিল ৫৫,১২৬ বর্গমাইল এবং পশ্চিম পাকিস্তানের আয়তন ছিল ৩১০,৪০৩ বর্গমাইল। ১৯৬১ সালে পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৫ কোটি ১০ লক্ষ এবং বসতির হার ছিল প্রতি বর্গমাইলে ৯২২ জন। অন্যদিকে একই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানের জনসংখ্যা ছিল ৪ কোটি ৩০ লক্ষের মতো এবং বসতির হার ছিল প্রতি বর্গমাইলে মাত্র ১৮৩ জন।[৮৮] সাধারণভাবে একটি জেলার আয়তন ছিল ৪০০০ বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা ছিল দশ থেকে বিশ লক্ষের মধ্যে।

জেলা অফিসার ছাড়াও প্রাদেশিক সরকারের বিভিন্ন 'কর্ম বাস্তবায়ন' (functional) ডিপার্টমেন্টের মাঠ পর্যায়ের প্রতিনিধিরা একটি জেলাসদরে অবস্থান করতেন। এদের মধ্যে সাধারণত ছিলেন একজন সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ, একজন জেলা শিক্ষা অফিসার, একজন জেলা স্কুল পরিদর্শক, একজন জেলা স্বাস্থ্য অফিসার, একজন সিভিল সার্জন এবং একজন নির্বাহী প্রকৌশলী (সড়ক) সহ আরো অনেকে। এইসব কর্মকর্তা তাদের সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক নিয়োজিত হতেন এবং নিয়োগদাতা ডিপার্টমেন্টের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে থাকতেন। তবে সাধারণত তারা দ্বৈত তদারকির নিয়ন্ত্রণে কাজ করতেন। বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের কর্মসূচিসমূহের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় সাধনের প্রয়োজনে আলাদা আলাদা ডিপার্টমেন্টের প্রতিনিধিদেরকে জেলা অফিসারের সাধারণ তত্ত্বাবধানে তাদের নিজ নিজ কাজকর্ম পরিচালনা করতে হতো। বস্তুত জেলা অফিসার ছিলেন ছোটখাট একজন গভর্নর এবং তিনিই জেলা পর্যায়ে প্রাদেশিক সরকারের মুখ্য প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতেন। তাকে ঘিরেই জেলার পুরো প্রশাসন আবর্তিত হতো। তাকে সময় সময় জেলা প্রশাসনের 'পিভট', 'কিংপিন', 'কীস্টোন', 'আর্কস্টোন', 'মেরুদণ্ড' এবং 'স্নায়ুকেন্দ্র' বলে অভিহিত করা হতো। বস্তুত একটি জেলায় প্রাদেশিক সরকারের সমস্ত কর্মকাণ্ডের জন্যে তিনিই ছিলেন দায়িত্বপ্রাপ্ত মূল ব্যক্তি।[৮৯]

একজন জেলা অফিসারের প্রাথমিক কাজ ছিল ভূমিরাজস্ব আদায় এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি রক্ষা করা। তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতাবলে ফৌজদারি মামলায় সর্বাধিক দুই বছর পর্যন্ত সাজা প্রদান করতে পারতেন। তাকে পর্যায়ক্রমেই জেলার দূরবর্তী অঞ্চলসমূহ পরিদর্শন করতে হতো এবং তিনিই ছিলেন সরকারের উচ্চ পর্যায় ও জেলার মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী প্রধান মাধ্যম। পাঁচশালা পরিকল্পনাসমূহের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প এবং ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন-উত্তর মৌলিক গণতন্ত্রের কর্মসূচিগুলোর বাস্তবায়নে তাঁর সক্রিয় সহযোগিতার বিষয়টি ছিল বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।[৯০]

৮৮. Abedin, 107-112 (fn. 1).

৮৯. দেখুন, A. M. A. Muhith, *The Deputy Commissioner in East Pakistan*, (Dacca 1968), 11-34.

৯০. Goodnow, 124-127.

জেলা অফিসারের কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানের জন্যে প্রাদেশিক সদর দফতরে স্বতন্ত্র বা আলাদা ধরনের কোন অফিস ছিল না। কার্যত তিনিই ছিলেন জেলা পর্যায়ে সবগুলো সচিবালয় ডিপার্টমেন্টের সরাসরি প্রতিনিধি। প্রাদেশিক সরকারের সকল সচিবই নিজ নিজ ডিপার্টমেন্টের কর্মকাণ্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও নির্দেশনা পাঠানোর জন্যে তাঁর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন। তাঁরা তার কাছ থেকে বিভিন্ন কাজের অগ্রগতি সম্পর্কিত প্রতিবেদনও মাঝে মাঝে চেয়ে পাঠাতেন। এমনিতে সবগুলো সচিবালয় ডিপার্টমেন্টের সাথে সরাসরি যোগাযোগ থাকলেও প্রধানত চাকরি ও সাধারণ প্রশাসন, স্বরাষ্ট্র, স্থানীয় সরকার, অর্থ ও পরিকল্পনা ডিপার্টমেন্টের সাথেই জেলা অফিসারের কাজের সম্পর্ক ছিল বেশি। তার চাকরির কর্মীব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়াদির অধিকাংশই নিয়ন্ত্রিত হতো মুখ্য সচিবের সার্বিক নিয়ন্ত্রণাধীন চাকরি ও সাধারণ প্রশাসন ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক।[৯১] এক হিসাব মতে, ১৯৬৪ সালের ১লা জানুয়ারি পূর্ব পাকিস্তানের উনিশটি জেলার মধ্যে এগারোটি এবং পশ্চিম পাকিস্তানের পঞ্চান্নটি জেলার মধ্যে সাতাশটির জেলা অফিসারই ছিলেন সিএসপি ক্যাডারের অফিসার।[৯২]

একটি কথা মনে রাখা দরকার যে, পূর্ব পাকিস্তানের পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাটি (উনিশটি জেলার অন্যতম) প্রদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় পার্বত্য এলাকাসমূহের সমন্বয়ে ১৮৬০ সালেই স্বতন্ত্র একটি সত্তা নিয়ে জন্মলাভ করেছিল। অঞ্চলটিতে প্রধানত বিভিন্ন উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর মানুষেরা বসবাস করতো। ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন এবং এর পরবর্তী সংশোধনী ও বর্ধিত ধারাগুলো অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামকে উপজাতীয় তিনটি 'সার্কেলে' বিভক্ত একটি 'বহির্ভূত' অঞ্চল হিসেবে গণ্য করা হয়েছিল। অতঃপর প্রতিটি সার্কেলকে আবার একজন আঞ্চলিক উপজাতীয় 'চিফ' (স্থানীয়ভাবে এঁরা রাজা হিসেবে পরিচিত ছিলেন)-এর অধীনে ন্যস্ত করা হয়। সার্কেল-'চিফ' এবং তাঁর অধীনস্থ হেডম্যানরাই সার্কেলের পুরো প্রশাসনের দায়িত্বে ছিল। তাদের প্রাথমিক কাজ ছিল রাজস্ব আদায় এবং স্থানীয় পর্যায়ে ছোটখাট বিবাদ-বিসংবাদ মীমাংসা করা। তবে এসব 'চিফ'/হেডম্যানের মূল এবং একক নিয়ন্ত্রক ছিলেন ডেপুটি কমিশনার (ডিসি)। তিনি প্রাদেশিক গভর্নরের হয়ে এই অঞ্চলের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করতেন। যেমন, তিনি ছিলেন একাধারে জেলা মেজিস্ট্রেট, জেলা জজ, জেলা রেজিস্ট্রার ইত্যাদি। যাই হোক, ১৯৬৪ সালের ১০ জানুয়ারি থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম আর 'বহির্ভূত অঞ্চল' হিসেবে থাকলো না। ফলে এর প্রশাসনিক ধরনটিও অন্য সব সাধারণ জেলার মতোই হয়ে গেল। তথাপি প্রতিষ্ঠিত রীতি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার ডিসির পদটি কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণই রয়ে গেল; আগের মতোই তিনি জেলার 'কিংপিন' হিসেবেই বিবেচিত হতে

৯১. Najmul Abedin, 121.

৯২. দেখুন, Braibanti, "*The Higher Bureaucracy of Pakistan*", 302.

থাকলেন। তবে প্রশাসন চালানোর ক্ষেত্রে তাকে এবার আগের চেয়ে অনেক বেশি সচেতন হতে বলা হলো; তাকে উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর কল্যাণে প্রয়োজনীয় মানবিক কর্মসূচি গ্রহণ এবং একই সাথে উপজাতীয় সংস্কৃতি, মূল্যবোধ এবং জীবনযাত্রার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনেরও নির্দেশ দেয়া হলো।[৯৩]

**মহকুমা** : পূর্ব পাকিস্তানের উনিশটি জেলার প্রতিটি (কেবল টাঙ্গাইল ও পটুয়াখালী জেলা বাদে) জেলাকে 'মহকুমা' নামে দুই বা ততোধিক প্রশাসনিক ইউনিটে ভাগ করা হয়েছিল। ১৯৭১ সালে এই প্রদেশে সর্বমোট ৫৫টি মহকুমা ছিল। প্রতিটি মহকুমারই জনসংখ্যা ছিল প্রায় আড়াই লাখের মতো এবং আয়তন ছিল ৫০০ থেকে ১০০০ বর্গমাইলের মধ্যে। একজন তরুণ সিএসপি অফিসার অথবা তুলনামূলকভাবে অভিজ্ঞ একজন ইপিসিএস অফিসার এই প্রশাসনিক ইউনিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত হতেন। তাকে বলা হতো মহকুমা অফিসার। প্রতিটি জেলায় একটি করে মহকুমাকে আবার সদর মহকুমা বলা হতো। জেলার সদর দফতর এই মহকুমাতেই অবস্থিত থাকতো।[৯৪]

বস্তুত আলাদাভাবে একটি প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে মহকুমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বৃটিশ বাংলায় উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। এটি প্রতিষ্ঠার পেছনে মূল লক্ষ্য ছিল জেলা প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে প্রশাসনকে জনগণের খুব কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া, যাতে করে প্রধানত তাদের অভাব-অভিযোগ ও সমস্যাসমূহ সহজে উপলব্ধি এবং সমাধান করা যায়। বলা যায়, মহকুমা প্রশাসনটি ছিল আসলে জেলা প্রশাসনেরই বর্ধিত অংশ। দেখা যেতো, যেকোন জেলারই জেলা অফিসারের অফিস এবং ঐ জেলার অন্তর্গত সদর মহকুমা অফিসারের অফিস একই শহরে অবস্থিত ছিল। ফলে সংশ্লিষ্ট জেলা অফিসারের উপস্থিতির কারণে ঐ শহরেই কর্মরত সদর মহকুমা অফিসারের অস্তিত্ব বা প্রভাব-প্রতিপত্তি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খুব একটা টের পাওয়া যেতো না।[৯৫]

সে যাই হোক, সদর এলাকার বাইরের অন্যান্য মহকুমার মহকুমা অফিসার কিন্তু যেকোন বিবেচনায়ই নিজ মহকুমায় কার্যত জেলা অফিসারের মতোই ছিলেন। সেখানে তিনি একজন জেলা অফিসারের মতোই মর্যাদা আর শ্রদ্ধা পেতেন। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং রাজস্ব আদায় থেকে শুরু করে সামাজিক উন্নয়ন এবং জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা পর্যন্ত তার কার্যপরিধি বিস্তৃত ছিল। প্রাদেশিক সরকারের অধিকাংশ 'অপারেটিং' ডিপার্টমেন্টেরই মহকুমা সদরে নিজ নিজ প্রতিনিধি ছিল। তাদেরকে এক প্রকার দ্বৈত তদারকির অধীনেই কাজ করতে হতো। প্রথমত, জেলা পর্যায়ে তাদের নিজস্ব

৯৩. আরো বিস্তারিত জানার জন্যে দেখুন, Muhammad Ishaq (ed.) *Bangladesh District Gazetteers: Chittagong Hill Tracts*, (Dacca 1971), 251-281

৯৪. Najmul Abedin, 127.

৯৫. দেখুন, A. M. A. Muhith, 16-17.

অপারেটিং ডিপার্টমেন্টের উর্ধতন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা ছিলেন, যারা নিয়মমাফিক তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতেন। অন্যদিকে আবার মহকুমা সদরে অবস্থানরত মহকুমা অফিসারও তার বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের উপর একটি সাধারণ নজরদারি চালাতেন। উদ্দেশ্য ছিল, বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের কর্মকাণ্ডের মধ্যে সামগ্রিক একটি সমন্বয় সাধন নিশ্চিত করা।[৯৬]

তরুণ সিএসপি অফিসারদের মধ্য থেকে একজন সহকারী কমিশনার অথবা পূর্ব পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের কোন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটকেই মহকুমা অফিসার হিসেবে নিয়োগ করা হতো। তাকে সহযোগিতা করার জন্য থাকতেন আরো কয়েকজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। চাকরিতে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে তাদেরকে 'দ্বিতীয়' অথবা 'তৃতীয়' শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে গণ্য করা হতো। আর মহকুমা অফিসারকে সাধারণত প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের মর্যাদা প্রদান করা হতো।[৯৭] সিএসপি ক্যাডারের সদস্যদের ক্ষেত্রে সহকারী কমিশনারের পদটিই ছিল সর্বনিম্নের। এবং চাকরিতে যোগদানের পর প্রথম দু'তিন বছর একজন সিএসপি অফিসার সাধারণত জেলা অফিসারের সহকারী হিসেবে কর্মরত থাকতেন। এই সময় তিনি তুলনামূলকভাবে সহজ মামলাগুলোতে ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ করতেন এবং সেই সাথে রাজস্ব সংক্রান্ত কম জটিল বিষয়গুলোরও দেখাশুনা করতেন। এভাবে এক সময় যখন দেখা যেতো যে তিনি প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনে সক্ষম হয়েছেন, তখনই তাকে জেলা অফিসারের তত্ত্বাবধান থেকে সরিয়ে নিয়ে একটি মহকুমার দায়িত্বে বসিয়ে দেয়া হতো।[৯৮] সিএসপি ক্যাডার রুল অনুযায়ী পূর্ব পাকিস্তানে সহকারী কমিশনারের ৩২টি পদ তরুণ সিএসপি অফিসারদের জন্যে নির্ধারিত করে রাখা হয়েছিল।

১৯৪৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানে জেলার নিম্নতর ধাপে আলাদা একটি প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে মহকুমা প্রতিষ্ঠার বিষয়টি খুব একটা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয় নি। তবে এর গুরুত্ব দেশবিভাগের পর থেকেই ক্রমান্বয়ে ঐ অংশে অনুভূত হতে থাকে। ১৯৬০ সালে যখন প্রাদেশিক প্রশাসন কমিশন (পিএসি) স্থাপন করা হয় তখন সারা পশ্চিম পাকিস্তানে মহকুমার সংখ্যা ছিল মাত্র ৪৪টি। আর ১৯৬৩ সালের শেষ নাগাদ এই সংখ্যা বেড়ে গিয়ে ৮৬তে দাঁড়ায় এবং পরবর্তী সময়ে ধাপে ধাপে অনেক তহসিল (পশ্চিম পাকিস্তানে প্রশাসনের সর্বনিম্ন ধাপ) মহকুমায় রূপান্তরিত হয়। এই রূপান্তর প্রক্রিয়াটি এতটা দৃঢ় গতিতে সম্পন্ন হয়েছিল সম্ভবত পিএসির কিছু সুপারিশের কারণে। পিএসি তার সুপারিশে বলেছিল যে, 'জেলা পর্যায়ে একটি দক্ষ প্রশাসন গড়ে তুলতে হলে নীচের দিকের প্রশাসন ব্যবস্থাকেও অনেক বেশি মজবুত করতে হবে এবং

৯৬. Najmul Abedin, 119-120.

৯৭. Najmul Abedin, 126-129.

৯৮. Goodnow, 175.

এই লক্ষ্য অর্জন করার জন্যে বর্তমানে যেসব এলাকায় মহকুমা ব্যবস্থা চালু নেই সেসব এলাকায় তা স্থাপন ও শক্তিশালী করাই হবে সঠিক ও উপযুক্ত পদক্ষেপ'।[৯৯] পিএসি সুনির্দিষ্টভাবে প্রস্তাব করে যে, বড় বড় তহসিলগুলোকে শীঘ্রই মহকুমায় রূপান্তরিত করতে হবে। আর ছোট আকারের তহসিলগুলোকে পরবর্তী দশ বছর মেয়াদের মধ্যে পর্যায়ক্রমে মহকুমা হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।[১০০]

তবে, যে বিষয়টি পশ্চিম পাকিস্তানে মহকুমা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পক্ষে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল তা হচ্ছে ১৯৫৯ সাল থেকে চালু হওয়া মৌলিক গণতন্ত্র কার্যক্রম। এই কার্যক্রমের আওতায় পল্লী অঞ্চলে ব্যাপক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড হাতে নেয়া হয়। আর প্রাথমিকভাবে এসব কর্মকাণ্ডের সরাসরি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার প্রয়োজন থেকেই বড় বড় জেলাগুলোকে একাধিক মহকুমায় ভাগ করে ফেলা হয়। তবে জেলাসদরের আওতায় অতিরিক্ত হিসেবে প্রতি জেলায় একটি করে সদর মহকুমা স্থাপনের ধারণাটি পশ্চিম পাকিস্তানে কখনো বাস্তবায়িত হয় নি।[১০১]

পশ্চিম পাকিস্তানে (সিন্ধু ব্যতীত) মহকুমা প্রধানকে বলা হতো মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট। কিন্তু সিন্ধুতে তার পদবি ছিল মহকুমা অফিসার। সহকারী কমিশনার হিসেবে কর্মরত তরুণ সিএসপি অফিসার অথবা প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসের কর্মকর্তারাই যথারীতি মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট বা মহকুমা অফিসার হিসেবে নিয়োগ লাভ করতেন। সিএসপি ক্যাডার রুল অনুযায়ী সহকারী কমিশনার/মহকুমা অফিসারের সর্বোচ্চ ৬৭টি পদ তরুণ সিএসপি অফিসারদের জন্যে সংরক্ষিত থাকতো।[১০২]

**থানা/তহসিল** : পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিটি মহকুমা কয়েকটি থানায় বিভক্ত ছিল। 'থানার' আক্ষরিক অর্থ হলো 'পুলিশ স্টেশন'। তবে প্রশাসনিক কাঠামো হিসেবে সারা প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সর্বমোট ৪১১টি থানা অবস্থিত ছিল। মূলত পল্লী এলাকায় একটি পুলিশ প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যেই এই থানাগুলো স্থাপন করা হয়েছিল। প্রতিটি থানাসদরেই পুলিশের একজন সাব-ইন্সপেক্টরের অধীনে কয়েকজন জুনিয়র অফিসার সহ মোটামুটি আকারের একটি পুলিশ বাহিনী নিয়োজিত থাকতো। কর্মরত এই পুলিশ বাহিনীর সদস্যসংখ্যা কত হবে তা নির্ভর করতো সংশ্লিষ্ট থানার আয়তন এবং এর সামাজিক ও ভৌগোলিক অবস্থানের উপর।[১০৩]

---

৯৯. দেখুন, *Report of the Provincial Administration Commission*, (Lahore 1960), p 189

১০০. ঐ

১০১. পশ্চিম পাকিস্তানের মহকুমা ব্যবস্থার কাঠামোর কার্যাবলী সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্যে দেখুন, Ahmad Maqsood Hameedee, "Sub-divisional Administration in West Pakistan", in Inayatullah (ed ), *District Administration in West Pakistan* (Peshawar 1964), 101-107

১০২. Cf. The Civil Service of Pakistan (Composition & Cadre) Rules, 1954.

১০৩. Najmul Abedin, *Local Administration and Politics in Modernising Societies*, 129.

১৯১৩ সালে 'সার্কেল' নামে বৃটিশ বাংলায় নতুন আকারের একটি প্রশাসন-কাঠামোর প্রবর্তন ঘটে। বস্তুত স্বতন্ত্রভাবে গড়ে উঠা এই সার্কেল থেকেই মহকুমার নিম্নতর সাধারণ প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে থানার উদ্ভব হয়। আরো স্পষ্টভাবে বলা যায়, একটি সার্কেলের অধীনে একই মহকুমার দুই বা ততোধিক থানা অবস্থিত থাকতো এবং এই থানাগুলোর সীমার মধ্যে ছিল আবার কমবেশি পঁচিশটি করে ইউনিয়ন। প্রতিটি ইউনিয়নের আয়তন ছিল দশ থেকে পনেরো বর্গমাইল বা প্রায় দশটি গ্রামের সমান। লোকসংখ্যা দশ হাজারের মতো।[১০৪] দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত বেঙ্গল জুনিয়র সিভিল সার্ভিসের জুনিয়র কোন অফিসারকে সার্কেলের প্রধান হিসেবে নিয়োগ করা হতো। তার পদবি ছিল 'সার্কেল অফিসার'। তার প্রাথমিক দায়িত্ব ছিল সার্কেলের অধীনস্থ ইউনিয়ন বোর্ডসমূহের (গ্রামভিত্তিক সর্বনিম্ন পর্যায়ের স্থানীয় শাসনব্যবস্থা) কর্মকাণ্ড তদারক করা। তিনি স্থানীয় পর্যায়ে গৃহীত বিভিন্ন প্রকার উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং এগুলো সংগঠিত ও বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে ইউনিয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং মেম্বারদেরকে প্রয়োজনীয় সব ধরনের বুদ্ধি-পরামর্শ ও সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করতেন। একজন সার্কেল অফিসার তার সার্কেলের সীমার মধ্যে বলা যায় সব ধরনের দায়িত্বই পালন করতেন যাতে করে মনে হতো, তিনি ঐ সার্কেলে তার উপরস্থ মহকুমা অফিসারের একেবারে প্রত্যক্ষ একজন প্রতিনিধি। এছাড়াও পরিস্থিতির চাহিদা এবং উপরস্থ মহকুমা অফিসার, জেলা অফিসার এবং বিভাগীয় কমিশনারের নির্দেশমতো তাকে আরো অনেক কাজ (প্রধানত বিভিন্ন জিজ্ঞাসার উত্তর প্রদান এবং তথ্যাদি সরবরাহ) করতে হতো।[১০৫]

১৯৫০-এর দশকের শেষ দিকে পূর্ব পাকিস্তান সরকার উপলব্ধি করলো যে, ১৯৫৯ সালের মৌলিক গণতন্ত্র কার্যক্রমের আওতায় পল্লী অঞ্চলের জন্যে নেয়া ব্যাপক উন্নয়নমূলক কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নের জন্যে প্রচলিত 'সার্কেল' প্রশাসনটিকে আরো জোরদার করা দরকার। তদনুযায়ী সরকার ১৯৬১ সালে সার্কেলের আয়তন কমিয়ে এনে একটি থানার সীমায় একে পুনর্বিন্যস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রায় একই সময়ে প্রধানত বিভিন্ন সহযোগী সার্ভিসের মধ্যম সারির কর্মকর্তাদের নিয়ে নতুন এক ব্যাচ অফিসার তৈরি করা হয়। তাদের এক এক জনকে পুনর্গঠিত প্রতিটি থানার উন্নয়নের দায়িত্ব দিয়ে সার্কেল অফিসার হিসেবে নিয়োগ করা হয় এবং তাদেরকে দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত পূর্ব পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস (নির্বাহী)[১০৬] নামে নবগঠিত একটি সার্ভিসের সদস্যপদ

১০৪. দেখুন, S D Khan, *Note on Reorganization of Local Bodies in the Province*, (Dacca 1959), 13, Hugh Tinker, *Foundations of Local Self-Government in India, Pakistan and Burma* (London 1954), 118

১০৫. Md Anisuzzaman, *The Circle Officer: A Study of His Role*, (Dacca 1963), 3-4.

১০৬. Cf. Government of East Pakistan (Services & General Administration Department), *The East Pakistan Establishment Manual*, (Dacca 1968), 39-42.

প্রদান করা হয়। সরকার অপারেটিং ডিপার্টমেন্টগুলির প্রশাসনিক স্তর থানা পর্যন্ত বিস্তৃত করারও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যাতে থানা পর্যায়ে কর্মরত ঐ সকল ডিপার্টমেন্টের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা স্থানীয় প্রয়োজনের নিরিখে উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার সুযোগ পায়। থানা পর্যায়ে অবস্থিত বিভিন্ন অপারেটিং ডিপার্টমেন্টের প্রতিটি অফিসের কর্মকাণ্ডের পরিধি সংশ্লিষ্ট থানার আয়তনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এভাবেই দেখা গেল যে, নতুন করে পুনর্গঠিত থানাগুলোর সবই ১৯৬১ সালের পর থেকে ক্রমান্বয়ে থানা পর্যায়ে অবস্থিত বিভিন্ন অপারেটিং ডিপার্টমেন্টের অফিসসমূহের সমন্বয়ে বৃহদাকার একটি প্রশাসনিক কমপ্লেক্সে পরিণত হয়ে গেছে। এসব ফাংশনাল অফিস ও তাদের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপর উন্নয়নের দায়িত্বে নিয়োজিত সার্কেল অফিসারের আইনগত কোন নিয়ন্ত্রণ না থাকলেও তাকে তাদের সকল কর্মকাণ্ডের বিষয়েই ওয়াকেবহাল থাকতে বলা হয়েছিল। তিনি এই অফিসের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজকর্মগুলোর মধ্যে প্রধানত উৎসাহ বা তাগাদা প্রদান করতেন, বৈঠকে বসে আলোচনার মাধ্যমে সমন্বয় সাধন করতেন। তাকে কার্যত মহকুমা অফিসের আনুষ্ঠানিক প্রতিনিধি হিসেবেই বিবেচনা করা হতো। ফলে দেখা যেত যে, নিজস্ব পরিসরে তিনি প্রায়শঃই যথেষ্ট পরিমাণ প্রভাব বিস্তার এবং সমীহ আদায় করতেন।[১০৭] তবে সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) সব সময়েই যে কেবল উন্নয়ন-কর্মকাণ্ড নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন তা নয়, জেলা অফিসার এবং মহকুমা অফিসারের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে নির্দেশনা ও পরামর্শ অনুসারেও তাকে আরো অনেক কাজ সম্পাদন করতে হতো। সুতরাং এটি খুবই স্বাভাবিক ছিল যে, তার সময় শ্রমের অধিকাংশটাই ব্যয় হয়ে যেত জেলা ও মহকুমা অফিসারদের কাছ থেকে যে-কোন সময় তলব করা বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান এবং তথ্য সরবরাহের কাজে। এছাড়া তাকে তার নিজের উপর ন্যস্ত আনুষ্ঠানিক দায়-দায়িত্বাদি সম্পর্কিত এবং সার্কেল অফিসার হিসেবে পুরো থানা সংক্রান্ত অভিজ্ঞতার একটি প্রতিবেদন প্রতি মাসেই মহকুমা অফিসারের নিকট প্রেরণ করতে হতো। এমনকি জেলা এবং মহকুমা অফিসারদের মতো আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং রাজস্ব আদায়ের কোনো রকম দায়-দায়িত্ব সার্কেল অফিসারের (উন্নয়ন) উপর ন্যস্ত না থাকা সত্ত্বেও তাকে থানার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং রাজস্ব সংগ্রহের অবস্থা সম্পর্কে নিয়মিতভাবে জেলা ও মহকুমা অফিসারদেরকে অবহিত করতে হতো।[১০৮]

পশ্চিম পাকিস্তানের কোন কোন অঞ্চলে (সিন্ধু ছাড়া) তহসিলই ছিল জেলার অধীনস্থ মহকুমা স্বরূপ। আবার কোথাও কোথাও এই তহসিল ছিল মহকুমারই একটি অঙ্গবিশেষ। যেমন সিন্ধুতে প্রতিটি জেলাই কয়েকটি করে মহকুমায় বিভক্ত ছিল। সেখানে তালুকগুলি (তহসিলেরই পরিপূরক রূপ) ছিল আবার মহকুমারই অংশ স্বরূপ। প্রথমত, রাজস্ব প্রশাসনের ইউনিট হিসেবেই তহসিল ও তালুকগুলোর সৃষ্টি হয়েছিল। এবং এই স্তরের

১০৭. Najmul Abedin, *Local Administration and Politics in Modernising Societies*, 129-131.

১০৮. ঐ।

প্রশাসনব্যবস্থাটি পুরোপুরিই তখন মাঠ পর্যায়ের রাজস্ব কর্মীদের দ্বারা পরিচালিত হতো। কিন্তু ১৯৫০-এর দশকের শেষ দিক থেকে যখন অধিকাংশ অপারেটিং ডিপার্টমেন্টই তাদের মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলো একেবারে তৃণমূলে নিয়ে যেতে শুরু করলো, তখন থেকেই ক্রমান্বয়ে তহসিল এবং তালুকগুলো আন্তঃডিপার্টমেন্ট সম্পর্কিত কর্মকাণ্ড পরিচালনার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হতে থাকে। এসব কেন্দ্রে কর্মরত সকল অফিসারের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন প্রধান রাজস্ব অফিসার। তহসিলের ক্ষেত্রে তার পদবি ছিল তহসিলদার এবং তালুক হলে বলা হতো মুখতিয়ারকার। পূর্ব পাকিস্তানের সার্কেল অফিসারদের মতোই এসব তহসিলদার বা মুখতিয়ারকারেরও তাদের নিজ নিজ তহসিল বা তালুকে অবস্থানরত অন্যান্য ডিপার্টমেন্টের অফিসারদের উপর আনুষ্ঠানিকভাবে নিয়ন্ত্রণমূলক কোন নজরদারির ক্ষমতা ছিল না। তথাপি জেলা অফিসারের (অথবা ক্ষেত্রবিশেষে যেখানে মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট/অফিসার ছিল তাদের) প্রতিনিধি এবং সেই অঞ্চলে প্রচলিত প্রাচীনতম সরকারি পদের কর্মকর্তা হিসেবে একজন তহসিলদার বা মুখতিয়ারকার তার অন্যান্য সহকর্মী এবং স্থানীয় জনগণের মধ্যে অনেক বেশি প্রভাব বিস্তারকারী এবং সমীহ আদায়কারী কর্মকর্তা ছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানের সার্কেল অফিসারের মতো তাকেও জেলা অফিসারের (অথবা মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট/অফিসারের) নিকট পল্লী অঞ্চলের জীবনযাত্রা ও প্রশাসনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ করতে হতো। তবে নির্দিষ্ট কয়েকটি কাজের ক্ষেত্রে সার্কেল অফিসারের ভূমিকা থেকে তহসিলদারের (মুখতিয়ারকারের) ভূমিকা আলাদা ছিল। যেমন তহসিলদার দ্বিতীয় শ্রেণীর একজন ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবেও কাজ করতেন। অথচ সার্কেল অফিসারের বিচারকার্য সংক্রান্ত কোন ভূমিকাই ছিল না। এ ছাড়া তহসিলদার বা মুখতিয়ারকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সরাসরি কোন ভূমিকাই ছিল না। কারণ এসব কর্মকাণ্ড তদারক করার জন্যে উন্নয়ন অফিসার নামে আলাদাভাবে নিযুক্ত একজন কর্মকর্তা ছিলেন।

এতদ্‌সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামাঞ্চলের উন্নয়নের দায়িত্বে নিয়োজিত সার্কেল অফিসারই ছিলেন ঐ স্তরের মুখ্য সরকারি কর্মকর্তা। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে নিম্নতম ঐ একই স্তরে নিযুক্ত রাজস্ব অফিসার অর্থাৎ তহসিলদার বা মুখতিয়ারকার ছিলেন সরকারের সর্ববিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন কর্মকর্তা।[১০৯]

**পশ্চিম পাকিস্তানের বিশেষ অঞ্চলসমূহ :** আগের পরিচ্ছেদগুলিতে যে পদ্ধতির প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা হয়েছে সেগুলো পশ্চিম পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চলীয় কিছু দুর্গম পাহাড়ি এবং বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অঞ্চলের জন্যে প্রযোজ্য ছিল না। অঞ্চলগুলো ছিল আম্ব, চিত্রল, দার এবং সোয়াত রাজ্য; খাইবার, কুররাম, মালাকান্দ, মোহমান্দ এবং উত্তর ও দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের রাজনৈতিক এজেন্সি এবং বানু, দেরা

১০৯. আরো বিস্তারিত জানার জন্যে দেখুন, Najmul Abedin, 133-134; Inayatullah, *Basic Democracies, District Administration and Development* (Peshawar 1964), 205-222.

ইসমাইল খান, হাজারা, কোহাট, মার্দান ও পেশোয়ার জেলা সংলগ্ন উপজাতীয় অঞ্চলসমূহ। এসব অঞ্চলের আলাদা ধরনের ভূ-প্রাকৃতিক ও সামাজিক অবস্থা প্রচলিত মানের একটি প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালু করার অনুকূল ছিল না বলেই মনে করা হয়েছিল। এগুলোর কোন কোনটি স্থানীয় গোষ্ঠীপতিদের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে ছিল। কোন কোনটি আবার শাসিত হতো বিভিন্ন ধরনের উপাধিধারী একনায়কদের দ্বারা। তবে এদের সবাই কমবেশি পাকিস্তান সরকারের প্রতি অনুগত ছিল।

এসব অঞ্চলের সুনির্দিষ্টভাবে বিভক্ত এক একটি এলাকার দায়িত্বে নিযুক্ত থাকতেন একজন সিএসপি অফিসার অথবা প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসের (পিসিএস) কোন কর্মকর্তা। তবে অঞ্চলভেদে তাদের মর্যাদা এবং কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে বেশ তারতম্যও থাকতো। এসব এলাকায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ সাধারণত প্রাদেশিক গভর্নরের একজন প্রতিনিধি হিসেবেই নিয়োজিত থাকতেন এবং প্রাদেশিক সরকার ও ঐ বিশেষ এলাকার মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করাই ছিল তার প্রাথমিক দায়িত্ব। ১৯৫৬ এবং ১৯৬২ সালের সংবিধান দু'টির উভয়টিতেই এই মর্মে একটি বিধান চালু ছিল যে, প্রাদেশিক গভর্নর কর্তৃক জারিকৃত অথবা প্রাদেশিক কিংবা জাতীয় আইন পরিষদ কর্তৃক প্রণীত কোন আইনই ঐসব বিশেষ অঞ্চলের ক্ষেত্রে কার্যকর হবে না যদি না পূর্বাহ্নে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট কর্তৃক তা অনুমোদিত হয়ে থাকে।[১১০] ১৯০১ সালের সীমান্ত অপরাধ নিয়ন্ত্রণ আইন নামে বিশেষ কিছু আইন পার্বত্য অঞ্চলগুলোর ক্ষেত্রে চালু ছিল। এসব আইনের মধ্যেই পার্বত্য অঞ্চলগুলোর প্রশাসন ব্যবস্থাটি কেমন ধরনের হবে তার একটি বিস্তারিত রূপরেখা দেয়া ছিল। ঐসব বিশেষ অঞ্চলে বসবাসকারী বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষদের আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্যের কথা বিবেচনায় রেখেই অঞ্চলগুলোকে প্রধানত প্রশাসনিক প্রয়োজনে 'রাজনৈতিক এজেন্সি' নামে আলাদা কতকগুলো ইউনিটে চিহ্নিত করা হয়েছিল। প্রতিটি রাজনৈতিক এজেন্সির দায়িত্বে থাকতেন জেলা অফিসারের সমমর্যাদার একজন কর্মকর্তা। তার পদবি ছিল রাজনৈতিক এজেন্ট। তাকে সহযোগিতা করার জন্যে ছিলেন একজন সহকারী রাজনৈতিক এজেন্ট, একজন সহকারী রাজনৈতিক অফিসার এবং অধস্তন কিছু কর্মচারী। প্রতিটি এজেন্সিতেই প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় উভয় সরকারেরই কিছু কিছু ডিপার্টমেন্টের প্রতিনিধি ছিল। আর এদের কাজকর্মের সমন্বয় সাধন এবং তদারকির দায়িত্ব পালন করতেন স্বয়ং রাজনৈতিক এজেন্ট। রাজনৈতিক এজেন্সি এবং অন্যান্য সাধারণ এলাকায় কর্মরত সকল স্তরের কর্মকর্তাদের মধ্যেই আন্তঃবদলির বিধান চালু ছিল।[১১১]

তবে আম্ব, দার, সোয়াত এবং চিত্রলের প্রিন্সলি স্টেটসমূহে প্রচলিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা অন্যান্য উপজাতীয় অঞ্চলের ব্যবস্থার চাইতে বেশ আলাদা ধরনের ছিল। এসব স্টেটের

---

১১০ . Goodnow, 126-127

১১১. Abedin, 141.

অভ্যন্তরীণ প্রশাসন কার্যত প্রচলিত জেলা প্রশাসন ব্যবস্থার আওতার বাইরেই ছিল। এবং এসব প্রশাসনের পুরোটাই ছিল ক্ষমতাসীন সামন্ত প্রধানদের হাতে। সামন্ত শাসকরাই (এদের পদবি ছিল ওয়ালি, নওয়াব, মিম, খান এবং নিজাম) ছিল সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের অধিকারী। তথাপি রাজনৈতিক এজেন্টদের মাধ্যমে এসব সামন্ত শাসক এবং পাকিস্তানের আমলাতন্ত্রের মধ্যে একটি সংযোগ রক্ষিত ছিল। এসব সংযোগ রক্ষার কাজে সংশ্লিষ্ট স্টেটের পার্শ্ববর্তী এলাকার কোন আবাসিক বাড়ি বেছে নেয়া হতো। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, চিত্রল, সোয়াত এবং দার স্টেটের সামন্ত শাসকদের সাথে মালাকান্দ এজেন্সির রাজনৈতিক এজেন্টের মাধ্যমে সংযোগ রক্ষা করা হতো।[১১২]

যাই হোক, ১৯৭০ সাল কিংবা তারই কাছাকাছি সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রিন্সলি স্টেটগুলোকে জেলায় রূপান্তরিত করা হয় এবং এদের সামন্ত শাসকদের ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়া হয়। এই সময়েই মালাকান্দ এজেন্সিকে রূপান্তরিত করা হয় একটি বিভাগে এবং চিত্রল, সোয়াত ও দারকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ ছাড়া পূর্বে যেসব এলাকা এই এজেন্সির আওতায় ছিল সেগুলোকেও নতুন এই বিভাগের অধীনস্থ করা হয়। অন্যদিকে আম্ব স্টেটটিকে করা হয় পেশোয়ার বিভাগের অন্তর্ভুক্ত।[১১৩]

**প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিস** : ফেডারেল পাকিস্তানের প্রতিটি প্রদেশেরই নিজস্ব কিছু সিভিল সার্ভিস ছিল। প্রাদেশিক পর্যায়েই প্রতিষ্ঠিত একটি পাবলিক সার্ভিস কমিশন এবং অন্যান্য কিছু কর্মীব্যবস্থাপনা এজেন্সির মাধ্যমে লোক নিয়োগ করে প্রাদেশিক সরকারগুলো নিজেরাই পুরোপুরিভাবে এসব সার্ভিস নিয়ন্ত্রণ করতো। প্রাদেশিক সার্ভিসগুলোর অধিকাংশই ১৯৪৭ সালের আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল। বৃটিশ শাসনের প্রথম দিকে উচ্চতর দায়িত্বের জন্যে চুক্তিভিত্তিক চাকরির কিছু পদ তৈরি করা হয়। এসব পদে লোক বাছাই এবং নিয়োগ দেয়া হতো সরাসরি ইংল্যান্ড থেকে। পাশাপাশি এসব উচ্চতর পদের নীচেও আবার আরেকটি ধাপ তৈরি করা হয়। তবে এই ধাপের সকল চাকরির বিভিন্ন পদে বিনা চুক্তিতে নিয়োগের জন্যে ভারতেই লোক বাছাইয়ের ব্যবস্থা করা হতো। চুক্তিহীন এসব চাকরি ছিল অস্থায়ী এবং স্বল্পমেয়াদী। পরবর্তীকালে চেয়ারম্যান হিসেবে চার্লস ইউ এচিসন-এর নেতৃত্বাধীন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (১৮৮৬-৮৭) সুপারিশ অনুযায়ী চুক্তিবদ্ধ এবং চুক্তিহীন এসব সার্ভিসকে তিনটি সুনির্দিষ্ট স্তরে যথাযথভাবে পুনর্বিন্যাস করা হয়। এগুলো ছিল (১) দি ইম্পেরিয়াল সার্ভিস যা পূর্বেকার চুক্তিবদ্ধ সার্ভিসগুলোর স্থলাভিষিক্ত হয়, (২) চুক্তিহীন সার্ভিসের উপরের স্তরের চাকরিগুলোকে নিয়ে গঠিত প্রাদেশিক সার্ভিসসমূহ এবং (৩) চুক্তিহীন সার্ভিসের নিচের স্তরের চাকরিগুলোর স্থলে প্রবর্তিত অধস্তন সার্ভিসসমূহ। তিন স্তরবিশিষ্ট নতুন এই

১১২. ঐ।

১১৩. ঐ, 139-141.

সার্ভিসকাঠামোটি আবার দি রয়াল কমিশন অব পাবলিক সার্ভিস (১৯১২-১৫) কর্তৃক পুনঃঅনুমোদিত হয়, যার চেয়ারম্যান ছিলেন লর্ড ইস্‌লিংটন। যাই হোক, ইস্‌লিংটন কমিশন এই সার্ভিসকাঠামোর পুনর্বিন্যাসগত কিছু সংযোজনীরও প্রস্তাব দেয়। কমিশন মনে করে যে, কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক পরিসরে কার্যকর সার্ভিসগুলো নামকরণের দিক থেকে বাস্তবসম্মত রীতিতে আলাদা হওয়া উচিত। এরই ফলশ্রুতিতে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক উভয় পরিসরে বিদ্যমান উচ্চতর স্তরের সার্ভিসগুলো রাজকীয় বা নিখিল ভারত সার্ভিস হিসেবে গণ্য ছিল। একই স্তরের যে সার্ভিসগুলো কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় পরিসরে প্রযোজ্য ছিল সেগুলোর নাম দেয়া হলো কেন্দ্রীয় সার্ভিস ১ম শ্রেণী, আর মধ্যম বা প্রাদেশিক পর্যায়ের দায়িত্বের যে সার্ভিসগুলো কেন্দ্রীয় পরিসরে কার্যকর ছিল সেগুলোকে অভিহিত করা হল কেন্দ্রীয় সার্ভিস ২য় শ্রেণী হিসেবে। অন্যদিকে প্রাদেশিক সার্ভিসের যে সার্ভিসগুলোর কর্মকাণ্ড কেবলমাত্র প্রাদেশিক পরিসরেই সীমাবদ্ধ ছিল, সেগুলোকে আলাদা করা হয় সংশ্লিষ্ট প্রদেশের নাম আলাদা আলাদাভাবে সেগুলোর সাথে জুড়ে দেয়ার মাধ্যমে। উপরন্তু প্রতিটি সার্ভিসের নামের সাথে তাদের কাজের ধরনও লিপিবদ্ধ থাকতো। ক্রমবিকাশের ধারায় এভাবে জন্ম নিয়েছিল বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস, বোম্বে পুলিশ সার্ভিস, মাদ্রাজ কৃষি সার্ভিস ও বেঙ্গল এডুকেশন সার্ভিস সহ এ ধরনের আরো বহু সার্ভিস। কার্যত এগুলো ছিল বিভিন্ন প্রদেশে বিদ্যমান মধ্যম অথবা প্রাদেশিক সার্ভিসসমূহেরই প্রতিরূপ। অধস্তন সার্ভিসগুলো অবশ্য পূর্বের মতোই বহাল ছিল।[১১৪] বস্তুত উল্লিখিত গুরুত্বপূর্ণ দু'টি কমিশন এবং লর্ড লীকে চেয়ারম্যান করে গঠিত দি রয়াল কমিশন অন দি সুপিরিয়র সার্ভিসেস ইন ইন্ডিয়া (১৯২৪) কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশসমূহই পরবর্তীকালে ভারতীয় উপমহাদেশে জন্ম নেয়া বিভিন্ন দেশের অধিকাংশ সার্ভিসকাঠামোর উন্নয়নে ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায় যে, এচিসন কমিশন যে প্রাদেশিক সার্ভিসের সুপারিশ করেছিল তা থেকেই পরবর্তীকালে প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিস তথা ইপিসিএস অথবা পিসিএস ও অন্যান্য বিশেষায়িত প্রাদেশিক সার্ভিসসমূহ পাকিস্তান সহ অন্যত্রও আবির্ভূত হয়। স্বাধীনতার সময় পাকিস্তান যে প্রাদেশিক সার্ভিসকাঠামোটি উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিল পরবর্তী চব্বিশ বছরে তা প্রায় অক্ষুণ্নই থেকে গিয়েছে। পরিবর্তন বলতে সামান্য যেটুকু হয়েছিল তা ছিল কেবল বিভিন্ন সার্ভিসের নামকরণের ক্ষেত্রে এবং পর্যায়ক্রমে নতুন কিছু সার্ভিস বা ক্যাডারও এর সাথে যুক্ত হয়েছিল।[১১৫]

১৯৫৫ সালে একক একটি পশ্চিম পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগ পর্যন্ত পাকিস্তান ছিল আলাদা চারটি প্রদেশের সমন্বয়ে গঠিত একটি রাষ্ট্র। এই কারণে সেই সময়কার প্রাদেশিক সার্ভিসগুলোও চারটি প্রাদেশিক ইউনিটের (পূর্ব বাংলা, পাঞ্জাব, সিন্ধু এবং

১১৪. বৃটিশ ভারতে প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসের ক্রমোন্নয়নের বিস্তারিত বর্ণনা দেখুন, B. B Misra, *The Bureaucracy in India*, (Delhi 1977), 91-299, Charles H. Kennedy, *Bureaucracy in Pakistan* (Karachi 1987), 17-53; Pakistan, *Report of the Pay and Services Commission 1959-1962* (Chairman, A.R. Cornelius) (Karachi 1969), 44-45.

১১৫. Cf. Charles H. Kennedy, 21-22.

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ) অন্তর্গত করেই আলাদা আলাদাভাবে গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৫৫ সাল থেকে শুরু করে ১৯৭০ সালের জুন মাসে একক পশ্চিম পাকিস্তান ইউনিটটি ভেঙ্গে দেয়ার আগ পর্যন্ত প্রাদেশিক সার্ভিসগুলো পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান—এই দু'টি সুনির্দিষ্ট প্রাদেশিক ইউনিটেই বিন্যস্ত ছিল। সার্ভিসগুলোর সাথে প্রদেশের নাম জুড়ে দিয়ে এক প্রদেশের সার্ভিস থেকে আরেক প্রদেশের সার্ভিসকে আলাদা করা হয়। অবশ্য এর সাথে প্রতিটি সার্ভিসের কাজের ধরনও উল্লেখ করা থাকতো। যেমন, পূর্ব পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস, পশ্চিম পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস, পূর্ব পাকিস্তান পুলিশ সার্ভিস, পশ্চিম পাকিস্তান পুলিশ সার্ভিস, পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা সার্ভিস, পশ্চিম পাকিস্তান শিক্ষা সার্ভিস ইত্যাদি। যাই হোক, পশ্চিম পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের ক্ষেত্রে 'পশ্চিম পাকিস্তান' কথাটি সাধারণত ব্যবহার করা হতো না। এটিকে অভিহিত করা হয় কেবল প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিস বা পিসিএস নামে।[১১৬]

পূর্ব পাকিস্তানে নিয়মিত ভিত্তিতেই মোট চব্বিশটি সার্ভিস (সারণি ৩ দ্রষ্টব্য) প্রচলিত ছিল। অন্যদিকে এরূপ সার্ভিসের সংখ্যা পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল চৌদ্দটি।[১১৭] প্রাদেশিক সার্ভিসসমূহের কাঠামো প্রায় কেন্দ্রীয় সার্ভিসসমূহের কাঠামোর মতোই ছিল। কিন্তু চাকরির শর্তাবলীর দিক থেকে প্রাদেশিক সার্ভিসগুলো ছিল কেন্দ্রীয় সার্ভিসের তুলনায় নিম্ন মর্যাদার।

যাই হোক, বিশেষভাবে পূর্ব পাকিস্তানের সার্ভিসগুলো বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে সুস্পষ্টভাবেই ভিন্ন ভিন্ন ছিল। প্রথমত প্রাদেশিক এই সার্ভিসগুলো অনেকটা কেন্দ্রীয় সার্ভিসের মতোই প্রধান তিনটি ধারায় বিভক্ত ছিল। যেমন, সাধারণজ্ঞ প্রশাসনিক সার্ভিস (অর্থাৎ ইপিসিএস এবং পূর্ব পাকিস্তান সচিবালয় সার্ভিস), বিশেষজ্ঞ সার্ভিস (অর্থাৎ স্বাস্থ্য, কৃষি, প্রকৌশল সার্ভিস) এবং নির্দিষ্ট বৃত্তিনির্ভর সার্ভিস, অর্থাৎ যেগুলোর জন্যে চাকরিতে পূর্ববর্তী কারিগরি যোগ্যতার প্রয়োজন হতো না (অর্থাৎ পুলিশ ও এক্সাইজ সার্ভিস)। দ্বিতীয়ত, এই সার্ভিসগুলোর শ্রেণীকরণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অনুসৃত সেই চারটি শ্রেণীর ধরনই বজায় রাখা হয়েছিল। যথা, ১ম শ্রেণী, ২য় শ্রেণী, ৩য় শ্রেণী এবং ৪র্থ শ্রেণী। কোন কোন সার্ভিসে ৩য় শ্রেণী থেকে ২য় শ্রেণী এবং ২য় শ্রেণী থেকে ১ম শ্রেণীতে উত্তরণের সীমিত কিছু সুযোগ ছিল। তবে ৪র্থ শ্রেণী থেকে ৩য় শ্রেণীতে এমনকি সংশ্লিষ্ট কর্মচারীটির প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও পদোন্নতি দানের বাস্তব কোন সুযোগই ছিল না। তৃতীয়ত, প্রাদেশিক সার্ভিসের অনেকগুলোই আবার ১ম শ্রেণী এবং ২য় শ্রেণী বা উর্ধ্বতন বা নিম্নতন অথবা উচ্চতর ও নিম্নতর—এভাবে বিভক্ত ছিল। চতুর্থত, প্রাদেশিক সার্ভিসসমূহের বেতনস্কেল কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ একই রকম সার্ভিসের বেতনস্কেলের

১১৬. Cf Muneer Ahmad, *The Civil Servant in Pakistan* (Karachi 1964), 204.
১১৭. দেখুন, Braibanti, "The Higher Bureaucracy of Pakistan", 244.

তুলনায় কম হতো। এ ছাড়াও প্রাদেশিক সরকারের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্যে অনেকগুলো বেতনস্কেল বহাল থাকার কারণে এ ক্ষেত্রে যৌক্তিক একটি বেতনকাঠামো দাঁড় করানোর সমস্যাও ছিল। পঞ্চমত প্রাদেশিক পুলিশ সার্ভিসের কোন কর্মকর্তা পাকিস্তান পুলিশ সার্ভিসে, যা ছিল একটি নিখিল পাকিস্তান সার্ভিস, উচ্চতর কোন পদে পদোন্নতি পেলে স্বাভাবিব নিয়মেই তিনি পিএসপির সদস্য হয়ে যেতেন। কিন্তু যেসব ইপিসিএস অফিসার তালিকাভুক্ত পদের জন্য নির্বাচিত হয়ে সিএসপি ক্যাডারভুক্ত পদে নিযুক্তি পেতেন, তাদেরকে কখনোই পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের আনুষ্ঠানিক সদস্যপদ দেয়া হতো না।[১১৮]

## সারণি ৩

## পূর্ব পাকিস্তানে প্রাদেশিক সার্ভিসসমূহ

১. পূর্ব পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস, ১ম শ্রেণী
২. পূর্ব পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস, ২য় শ্রেণী
৩. পূর্ব পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস (বিচার)
৪. পূর্ব পাকিস্তান পুলিশ সার্ভিস
৫. পূর্ব পাকিস্তান জুনিয়র পুলিশ সার্ভিস
৬. পূর্ব পাকিস্তান সিনিয়র এডুকেশন সার্ভিস
৭. পূর্ব পাকিস্তান জুনিয়র এডুকেশন সার্ভিস
৮. রেলওয়ে সার্ভিস অব ইঞ্জিনিয়ার্স
৯. রেলওয়ে কমার্শিয়াল, ট্রান্সপোর্টেশন এন্ড ট্রাফিক সার্ভিস
১০. পূর্ব পাকিস্তান এক্সাইজ সার্ভিস
১১. পূর্ব পাকিস্তান হেলথ সার্ভিস (আপার)
১২. পূর্ব পাকিস্তান হেলথ সার্ভিস (লোয়ার)
১৩. পূর্ব পাকিস্তান সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস
১৪. পূর্ব পাকিস্তান ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস
১৫. পূর্ব পাকিস্তান এগ্রিকালচার সার্ভিস
১৬. পূর্ব পাকিস্তান হায়ার লাইভস্টক সার্ভিস

১১৮. পূর্ব পাকিস্তানে প্রাদেশিক সার্ভিস সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্যে দেখুন, S G. Ahmed, *Public Personnel Administration*, 159-164, Government of Bangladesh (Cabinet Division), *Report of the Pay and Services Commission*, Part 1 - *The Services*, vol. 1 (Dhaka 1977), 169-173; Civil Service Association (ex-CSPs), *Future Services Structure of Bangladesh* (Dhaka 1972.)

১৭. পূর্ব পাকিস্তান লাইভস্টক সার্ভিস
১৮. পূর্ব পাকিস্তান হায়ার ফিশারিজ সার্ভিস
১৯. পূর্ব পাকিস্তান ফিশারিজ সার্ভিস
২০. পূর্ব পাকিস্তান সিনিয়র ফরেস্ট সার্ভিস
২১. পূর্ব পাকিস্তান জুনিয়র ফরেস্ট সার্ভিস
২২. পূর্ব পাকিস্তান ফুড এডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস
২৩. পূর্ব পাকিস্তান সেক্রেটারিয়েট সার্ভিস
২৪. পূর্ব পাকিস্তান ট্যাক্সেশন সার্ভিস

সূত্র : Government of Bangladesh, Cabinet Division, *Report of the Pay and Services Commission,* Part 1- *The Services*, vol. 1, (Dhaka 1977), p.37.

প্রতিটি প্রদেশেই মোটামুটি সিএসপি সার্ভিসের মতোই প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিস ক্যাডারকে সাধারণত সিভিল সার্ভিস (ক্যাডার) হিসেবে মনে করা হতো। সংক্ষেপে এর নাম ছিল পিসিএস। পূর্ব পাকিস্তানে এই পিসিএসকে সুনির্দিষ্টভাবে আলাদা করে চিনতে পারার জন্য বলা হতো পূর্ব পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস বা ইপিসিএস। সিএসপির মতো এটিও ছিল একটি সর্বক্ষেত্রে ধন্বন্তরি সার্ভিস যদিও সারা পাকিস্তান জুড়ে এর ব্যাপ্তি ছিল না। তবে, কখনো কখনো অল্প সংখ্যক বাছাই করা ইপিসিএস অফিসার কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ পেতেন। ইপিসিএস অফিসারদেরকে নিয়োগ করাই হতো মূলত প্রাদেশিক প্রশাসনের জন্যে। তরুণ ইপিসিএস অফিসারদের দিয়ে প্রধানত মাঠ প্রশাসনের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটদের পদগুলো পূরণ করা হতো। সিএসপিদের মতোই তারাও মাঠ পর্যায়ের পদ থেকে সচিবালয়ের পদে অথবা সচিবালয় থেকে মাঠ পর্যায়ের পদে বদলি হতো। এই বদলি প্রদেশের ফাংশনাল এবং স্বায়ত্তশাসিত উভয় ধরনের প্রতিষ্ঠানের পদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল। তবে তাদের বদলি সিএসপি অফিসারদের মতো এত ঘন ঘন হতো না। সাধারণ প্রশাসনের তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ নির্দিষ্ট সংখ্যক উচ্চ পদেই কেবল ইপিসিএস অফিসারদের নিয়োগ দেয়া হতো। সিএসপিদের মতো এত দ্রুত তারা উচ্চতর পদসমূহে পদোন্নতি পেতেন না।[১১৯]

১৯৬৬ সালে যেসব ইপিসিএস অফিসার মহকুমা ও জেলা অফিসার হিসেবে কর্মরত ছিলেন তাদের বয়স ছিল যথাক্রমে ৩৫ থেকে ৫০ এবং ৪৫ থেকে ৫৫ বছরের মধ্যে। অন্যদিকে ১৯৬৬ সালেই যেসব সিএসপি অফিসার পূর্ব পাকিস্তানে উল্লেখিত দু'টি পদে চাকরিরত ছিলেন, তাদের অধিকাংশের বয়সই ছিল যথাক্রমে ২৫ থেকে ২৮ এবং ৩২ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। ইপিসিএসদের মধ্য থেকে মেধা ও দক্ষতা প্রদর্শনকারী সীমিত

১১৯. দেখুন, Najmul Abedin, *Local Administration and Politics in Modernising Societies*, 187-188.

সংখ্যক কিছু অফিসারই কেবল মহকুমা ও জেলা অফিসার হিসেবে নিয়োগ পেতেন। তাদের থেকে বাছাই করা খুব অল্প সংখ্যক অফিসারই কেবল প্রাদেশিক সচিবালয়ের যুগ্মসচিব, অতিরিক্ত সচিব এবং সচিব পদে পদোন্নতি পেতেন।[১২০]

ইপিসিএস অফিসারদের মধ্যে বরাবরই এই অসন্তোষ বিদ্যমান ছিল যে, ধারাবাহিকভাবে ঔপনিবেশিক নীতি অনুসরণ করে প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহ সিএসপি অফিসারদের জন্যে সংরক্ষিত রেখে দিয়ে তাদেরকে তাদের চাকরিজীবনের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। তাদের বক্তব্য ছিল, তারা যে ক্যাডারের অন্তর্ভুক্ত সেই ক্যাডার কোন অবস্থায়ই সিএসপিদের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হওয়া উচিত নয়। কারণ যে পদ্ধতিতে তাদের বাছাই করা হতো সেই পদ্ধতিটি কোন অংশেই সিএসপিদের বাছাইপদ্ধতির চেয়ে কম প্রতিযোগিতামূলক ছিল না এবং কর্মক্ষেত্রেও তাদেরকে সিএসপিদের অনুরূপ দায়িত্বই পালন করতে হতো। বাস্তব অবস্থাটি ছিল এই যে, মাঠ পর্যায় এবং সচিবালয় উভয় ক্ষেত্রেই ইপিসিএস অফিসারদের কাজের অভিজ্ঞতা ছিল দীর্ঘ এবং কাজের পরিধি ছিল বিস্তৃততর। কারণ তাদের ক্ষেত্রে এক পদ থেকে আরেক পদে বদলি বা পদোন্নতির ঘটনা খুব ধীরে এবং কমই ঘটতো। উপরন্তু ইপিসিএস অফিসারদের সংখ্যা প্রতি বছরই বেড়ে চলছিল। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ১৯৫০ সালে যখন ইপিসিএস অফিসারদের জন্যে 'তালিকাভুক্ত' পদের সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়, তখন ইপিসিএস ক্যাডারে অফিসারের সংখ্যা ছিল ২৮০ জন। কিন্তু ১৯৬৪ সালে এই ইপিসিএস অফিসারের সংখ্যা বেড়ে যখন ৭৪০-এ দাঁড়িয়েছিল, তখনো তাদের জন্যে নির্ধারিত 'তালিকাভুক্ত' পদের সংখ্যা অপরিবর্তিতই থেকে গেছে। এর অবধারিত ফল দাঁড়ালো এই যে, বহু যোগ্য ও দক্ষ ইপিসিএস অফিসারেরই পদোন্নতি পাওয়ার সুযোগ ক্রমান্বয়ে সংকুচিত হয়ে আসতে লাগলো। বিশেষত প্রাদেশিক সচিবালয়ে সিএসপি মুখ্য সচিবের সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণাধীন চাকরি ও সাধারণ প্রশাসন ডিপার্টমেন্টে ইপিসিএস অফিসারদের চাকরি যেভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে তা তাদের মনে বড় ধরনের একটি ক্ষতই তৈরি করেছিল।[১২১]

সিএসপি ও ইপিসিএসদের মধ্যেকার বিরোধ ছিল প্রাদেশিক আমলাতন্ত্রে আন্তঃক্যাডার সম্পর্কের মাত্র একটি রূপ। বিরোধের আরেকটি দিক ছিল একদিকে সিএসপি ও ইপিসিএস (পশ্চিম পাকিস্তানে পিসিএস) অফিসার এবং অন্যদিকে নির্দিষ্ট বৃত্তিনির্ভর ও বিশেষজ্ঞ সার্ভিসের কর্মকর্তাদের মধ্যেকার ঈর্ষা এবং বৈরিতার সম্পর্ক। এমনিতে সিএসপি এবং ইপিসিএসরা নিজেদের মধ্যে বিরোধে লিপ্ত থাকলেও যখনই বৃত্তিভুক্ত ও বিশেষজ্ঞরা সচিবালয়ের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোর দিকে হাত বাড়াতো, তখনই

১২০. ঐ., 144.

১২১. Cf. Ali Ahmed, *Role of Higher Civil Servants in Pakistan*, (Dacca 1968), 346-357

তারা বিরোধ বাদ দিয়ে নিজেদের মধ্যে এক ঐক্য গড়ে তুলতো। সাধারণজ্ঞ ক্যাডারের কর্মকর্তাদের অধীনস্থ পদগুলোতে চাকরি করার ব্যাপারে এবং বৃটিশদের রেখে যাওয়া পুরো প্রশাসন ব্যবস্থাটি, যা চৌকস কর্মকর্তাদের শীর্ষ পদগুলোতে বসার ব্যবস্থা করে দিয়ে গিয়েছিল, তার ব্যাপারেই নির্দিষ্ট বৃত্তিনির্ভর ও বিশেষজ্ঞদের বরাবরই অসন্তোষ ছিল।[১২২]

### উপসংহার

বস্তুত লোক প্রশাসন ব্যবস্থাটি ছিল দেশী-বিদেশী ও স্থানীয় উচ্চবর্গের শাসক শ্রেণীর বিভিন্ন মূল্যবোধসঞ্জাত মানব তৈরির কৃত্রিম একটি সাংস্কৃতিক আবহ। পাকিস্তানের অভিজাত শাসকগোষ্ঠী এসব মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটানোর লক্ষ্যে কার্যকর কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল বলে মনে হয় না। পাকিস্তান লোক প্রশাসনের গতিপ্রকৃতির প্রধান কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের দিকে তাকালেই এই বক্তব্যের সত্যতা স্পষ্টতর হবে।

প্রথমত, পাকিস্তান রাষ্ট্রের সরকার কাঠামোটি বরাবরই এমন একটি প্রশাসনিক ব্যবস্থার মধ্যে আটকে ছিল যার প্রধান বৈশিষ্ট্যই ছিল সামরিক-বেসামরিক আমলাতান্ত্রিক একনায়কসুলভ প্রাধান্য।[১২৩] কেউ হয়তো যুক্তি দেখাবেন যে, পাকিস্তান নামের দেশটি এরূপ একটি প্রশাসনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার তুঙ্গে পৌঁছেছিল আইয়ুব খানের আমলে (১৯৫৮-১৯৬৯)।[১২৪] তথাপি সত্যের খাতিরেই বলতে হয়, এর সবটা দায়দায়িত্ব এককভাবে কেবল আইয়ুব খানের উপর চাপানো ঠিক হবে না। বরং আমলাতান্ত্রিক প্রাধান্যের বীজ রোপিত হয়েছিল পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এবং প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের আমলেই। এঁরা দুজনেই অতি মাত্রায় আমলানির্ভর ছিলেন। এর কারণ ছিল সম্ভবত এই যে, জিন্নাহ এবং লিয়াকত আলী দু'জনেরই প্রশাসনিক কাজের বাস্তব কোন অভিজ্ঞতা না থাকার ফলে উভয়কেই আমলাদের উপর খুব বেশি নির্ভরশীল থাকতে হয়েছিল। এই আমলাদের কয়েক জন ছিলেন আবার পাকিস্তানে প্রবাসী বৃটিশ আইসিএস অফিসার। অবশ্য এমনও শোনা গেছে যে, জিন্নাহর নিজস্ব ধ্যান-ধারণার মধ্যেও কিছুটা আমলাতান্ত্রিক মনোভাব কাজ করতো। যেমন ১৯৩৫ সালে অভিযোজিত ভারত শাসন আইন অনুযায়ী পাকিস্তানের প্রথম সরকার-প্রধান হিসেবে তিনি প্রধানমন্ত্রী না হয়ে গভর্নর জেনারেলের পদটি বেছে নিয়েছিলেন। অথচ উল্লিখিত আইনটিতে স্বাধীন পাকিস্তানের জন্যে একটি সংসদীয় সরকার-পদ্ধতির বিধানই

১২২. দেখুন, Talukder Maniruzzaman, "Administrative Reforms and Politics within the Bureauecracy in Bangladesh", *Journal of Commonwealth and Comparative Politics*, vol. xvii, no. 1, 1979, 49. Similar inter-cadre conflicts in West Pakistan are reported in Muneer Ahmed, *The Civil Servant in Pakistan*, 183-255; C.J. Hayes, *Report on the Public Service Commissions of British Commonwealth Countries* (London 1955), 168-169.

১২৩. Nasir Islam, "Pakistan", in Subramaniam (ed.), *Public Administration in the Third World* (New York), 96.

১২৪. Nasir Islam, "Colonial Legacy, Administrative Reform and Politics: Pakistan 1947-1987", 275.

সংযোজিত ছিল। জিন্নাহর অধীনে চারটি প্রদেশের মধ্যে তিনটির গভর্নরই ছিলেন আইসিএস অফিসার। তিনি সচিব পর্যায়ে তাঁর নিজস্ব পছন্দের কিছু কর্মকর্তাসহ এসব গভর্নরের কাছ থেকে সরাসরি পরামর্শ গ্রহণ করতেন। এবং এভাবেই নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের অবস্থান তাঁর সময় থেকেই গুরুত্ব হারাতে শুরু করেছিল।[১২৫]

ব্যাপারটি কখনো এমন ছিল না যে, ফেডারেল পাকিস্তান সরকারের প্রথম মন্ত্রিসভার সকল মন্ত্রীরই একই রকম প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা ছিল অথবা তাদের উত্তরসূরি মন্ত্রী এবং আইন প্রণেতারা পরবর্তী বছরগুলিতে (১৯৪৭-১৯৫৮) নিজ নিজ কাজের ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে ভাল কিছু প্রদর্শন করতে পেরেছিলেন। বরং জিন্নাহর মৃত্যু এবং লিয়াকত আলীর হত্যাকাণ্ডের পর পাকিস্তান আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী দল মুসলিম লীগে ভাঙ্গন দেখা দিতে শুরু করলো এবং দলটিতে গোষ্ঠীরাজনীতি মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। সেই সাথে যখন তখন প্রদেশগুলোতে গভর্নরের এবং কেন্দ্রে গভর্নর জেনারেল কিংবা প্রেসিডেন্টের শাসন জারির ঘটনায় এই অবস্থাটি আরো সঙ্গীন আকার ধারণ করেছিল। এই ধরনের শাসনকালীন সময়গুলোতে সাধারণ প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ বাতিল থাকতো এবং দেশ কার্যত শাসিত হতো আমলাদের দ্বারা। ১৯৫৮ সাল থেকে শুরু হওয়া আইয়ুব খানের সামরিক শাসন এই অবস্থাটিকে কেবল একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছিল এবং সরকারি কর্মকাণ্ড পরিচালনায় আমলাদের দিয়েছিল বাড়তি কিছু স্বাধীনতা।[১২৬]

পর পর পাঁচশালা পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং গভর্নর জেনারেল জিন্নাহ ও প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের একক নিয়ন্ত্রিত প্রশাসনের অধীনে গড়ে উঠা প্রধান দু'টি নিখিল পাকিস্তান সার্ভিস (সিএসপি ও পিএসপি) পাকিস্তানের লোক প্রশাসনটিকে অতিমাত্রায় একটি এক-কেন্দ্রিক চরিত্র প্রদান করেছিল, যা অন্য কোন ফেডারেল পদ্ধতির সরকারে দেখা যায় না। সম্ভবত অস্বাভাবিক কিছু বৈচিত্র্যের এমন একটি দেশে বিভিন্ন শক্তির কেন্দ্রবিমুখ প্রবণতাকে মোকাবিলা করার সামর্থ্য এবং দ্রুততার সাথে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্যে চেইন অব কমান্ড প্রক্রিয়াটির গুরুত্ব অক্ষুণ্ন রাখতে এই পদ্ধতিটির প্রাসঙ্গিকতা তখন ছিল। একই কারণে মনে হয়েছে, পাকিস্তানের সংবিধান একটি জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার লক্ষ্যে আর্থিক ও প্রশাসনিকভাবে প্রদেশগুলোকে কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল করে রাখতে চেয়েছিল এবং তা করতে যেয়েই নিখিল পাকিস্তান এবং কেন্দ্রীয় সার্ভিসসমূহ ও আনুষঙ্গিক কিছু বিধি-বিধান চালু করেছিল। বিশেষত আইয়ুব আমলে ঘোষিত ১৯৬২ সালের সংবিধান পাকিস্তানকে একটি প্রেসিডেন্ট-পদ্ধতির শাসন-ব্যবস্থায় নিয়ে যায়, যেখানে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডসমূহ প্রেসিডেন্ট কর্তৃক জারিকৃত অধ্যাদেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত

১২৫. ঐ, 273.

১২৬. M. Anisuzzaman, "Bureaucratic Reforms in Pakistan" (unpublished Ph D Thesis, Syracuse University, 1975), 91-92.

হতো। এছাড়া প্রাদেশিক গভর্নর এবং প্রদেশ-মন্ত্রিসভার সদস্যরাও নিয়োজিত হতেন কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা এবং আশি হাজার মৌলিক গণতন্ত্রীর সমন্বয়ে গঠিত একটি নির্বাচকমণ্ডলীর পরোক্ষ ভোটে দেশের প্রেসিডেন্ট ও জাতীয় সংসদ নির্বাচিত হতো।[১২৭]

এভাবেই পাকিস্তানের প্রশাসন ব্যবস্থাটি অতিমাত্রায় কেন্দ্রীভূত চরিত্র অর্জন করলো। কিন্তু ক্ষমতা প্রায় সবটাই ফেডারেল সরকারের কুক্ষিগত হয়ে পড়ায় প্রাদেশিক পর্যায়ে অবস্থিত বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের কর্মকাণ্ডে উদ্যোগ ও উৎসাহের অভাব দেখা দিল। বস্তুত এই অবস্থাটি বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানে ক্রমান্বয়েই খুব বেশি বিরূপ সমালোচনার মুখোমুখি হতে লাগলো এবং এ থেকেই ১৯৭১ সালে দেশটি বিখণ্ডিত হয়ে পড়ার গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলো জন্ম নিয়েছিল।

তৃতীয়ত, পাকিস্তান লোক প্রশাসনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল এই ব্যবস্থাটির মধ্যে বৃটিশ ঔপনিবেশিক আমলের প্রতিষ্ঠানগুলিকেই বিভিন্নভাবে ধরে রাখার প্রবণতা। সচিবালয় ব্যবস্থা, মন্ত্রণালয় এবং সংযুক্ত ডিপার্টমেন্টসমূহের সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিরাজমান নীতি-প্রশাসনের দ্বি-বিভাজন বৃটিশ আইসিএস অফিসারদের উত্তরসূরি সাধারণজ্ঞ ক্যাডারের সিএসপি অফিসারদের আধিপত্য, জেলা প্রশাসন যেখানে একজন কালেক্টর, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা ডেপুটি কমিশনার কার্যত ছোটখাট একজন গভর্নরের মতোই প্রশাসন পরিচালনা করতেন এবং ভূমি রাজস্ব প্রশাসন এসবই ছিল ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকারের এক একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ।[১২৮]

বিশেষভাবে সিএসপি পদের জন্যে যে বেতন-ভাতা এবং আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা ধার্য করা হয়েছিল তা ছিল যথেষ্ট আকর্ষণীয় এবং এগুলো বৃটিশ আমলকে অনুসরণ করেই করা হয়েছিল। উপরন্তু বৃটিশ আমলের তুলনায় আরো বেশি সামাজিক মর্যাদাও এরা ভোগ করতেন। একজন পাকিস্তানী সমালোচক বলেছেন, বৃটিশ আমলের মতো শাসক সম্প্রদায়ের একটি সুবিধাভোগী জনবিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী হওয়া ছাড়াও ধনিকশ্রেণীভুক্ত হওয়া এবং ঐশ্বর্যময় ও বিলাসবহুল জীবন যাপন করার প্রতিই পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসটির আগ্রহ ছিল অনেক বেশি। বলা বাহুল্য, দেশের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানের সাথে তাদের এই ধরনের জীবনযাপন ছিল একেবারেই সঙ্গতিহীন।[১২৯]

স্বাধীনতার পরে অবশ্য প্রশাসনিক সংস্কারের বিষয়ে পরামর্শ দেয়ার জন্যে বেশ কিছু কমিশন ও কমিটি গঠন করা হয়েছিল। এসব কমিশন ও কমিটির সুপারিশের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন সময়ে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু কিছু সংস্কার এবং পরিবর্তন সাধন করা হয়েছিল।

১২৭. দেখুন, Mumtaz Ahmad, *Bureaucracy and Political Development in Pakistan*, 4.

১২৮. দেখুন, Nasir Islam, "Pakistan', 97.

১২৯. Mustaq Ahmad, *Government and Politics in Pakistan* (Karachi 1970), 84.

কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে, এসব সংস্কার বা পরিবর্তন হয় অসম্পূর্ণ না হয় অসময়োপযোগী ছিল। বিশেষত পাবলিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংখ্যাধিক্য এবং এগুলোকে স্বায়ত্তশাসিত করার লক্ষ্যে এগুলোর পৃথকীকরণ পদ্ধতি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এই ধরনের পরিবর্তন আনার সময় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোতে সম্পদসমূহের সুষ্ঠু ব্যবহার এবং এগুলোর কর্মতৎপরতা পর্যবেক্ষণের অনুকূল একটি কার্যোপযোগী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নির্মাণের বিষয়টিকে গুরুত্বই দেয়া হয় নি। উপরন্তু নব প্রতিষ্ঠিত এসব পাবলিক প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশেই শীর্ষস্থানীয় পদসমূহে অভিজাত আমলাদেরই নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। এদের মধ্যে বেশির ভাগই ছিলেন আবার সিএসপি অফিসার। তা ছাড়া সচিবালয়গুলোতে অবস্থিত নিয়ন্ত্রক মন্ত্রণালয়সমূহ অধীনস্থ এসব সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন প্রশাসনিক কাজ এবং অভ্যন্তরীণ সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায়ও অন্যান্য সরকারি ডিপার্টমেন্টের মতোই হস্তক্ষেপ করা অব্যাহত রেখেছিল।[১৩০]

পাকিস্তান প্রশাসনের চতুর্থ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যটি ছিল, এক কথায় বলতে গেলে, মুগল ধাঁচের কিছু কিছু প্রশাসনিক ব্যবস্থার পুনরুত্থান। আর এটি ঘটার কারণ সম্ভবত ছিল এই যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক ভিত্তিটিই ছিল ইসলামী আদর্শের স্পৃহা এবং উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের ভাবাবেগের প্রভাবের প্রতিফলন। বক্তব্যটি স্পষ্টতর করার জন্যে এ ক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার। পাকিস্তান লোক প্রশাসনের কোন কোন সমালোচক পাকিস্তানে বেশ কিছু অনড় অবস্থান গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠার কারণ অনুসন্ধান করতে যেয়ে মুগলদের সৃষ্ট প্রশাসনিক ব্যবস্থাটির দিকেই নজর দিতে চেয়েছেন বেশি। এর বোধগম্য কারণটি ছিল এই যে, মুগল ধাঁচে রাষ্ট্র পরিচালনার সাদৃশ্যসূচক বেশ কিছু রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের ঘটনা সে সময়ে পাকিস্তানে দেখা গিয়েছিল। আরো সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায়, পাকিস্তানের অতিমাত্রায় কেন্দ্রাভিমুখ রাষ্ট্রীয় নীতি এবং এর সামরিক-বেসামরিক আমলাপ্রধান শাসনের দীর্ঘ ইতিহাসটি মুগল রাষ্ট্রীয় এবং মনসবদারির অনেক বৈশিষ্ট্যকেই আত্মস্থ করেছিল।[১৩১]

বাস্তবিকপক্ষেই, অতি মাত্রায় কেন্দ্রীকরণের মুগল প্রবণতা এবং মুগল মনসবদারি যা বেসামরিকের তুলনায় অনেক বেশি সামরিক ছিল। বৃটিশ শাসনামলে এসে তা বেশ

১৩০. Nasir Islam, "Pakistan" 79.

১৩১. ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত চব্বিশ বছর সময়ে অবিভক্ত পাকিস্তানে দুই দফা সরাসরি সামরিক হস্তক্ষেপের ঘটনা থেকেই এ জাতীয় একটি চরিত্র নির্ধারণ করা হয়েছে। ১৯৫৮ সালে একবার এবং ১৯৬৯ সালে আরেকবার বেসামরিক প্রশাসনকে বাতিল করা হয়েছিল। এমনকি যে স্বল্প সময়গুলোতে বেসামরিক শাসন বহাল ছিল তখনও পর্যন্ত বেসামরিক আমলাতন্ত্রের সাথে সামরিক বাহিনী বেশ তাৎপর্যপূর্ণভাবেই ক্ষমতা ভাগাভাগি করেছে; Cf. Aron S Klieman, "Confined to Barracks: Emergencies and the Military in Developing Societies" in *Comparative Politics*, Vol. 12. No. 2, January 1980, 154-158; Ferrel Heady, *Public Administration: A Comparative Perspectives*, (New York 1979), 314-320; Robert La Port, Jr., *Power and Privilege: Influence and Decision-Making in Pakistan* (Berkeley 1975).

কিছুটা শিথিল হয়ে পড়ে। আর এটি সম্ভব হয়েছিল এই সময়ে রাষ্ট্রীয় শাসনকর্তৃত্বটি একটি ব্যক্তিনিরপেক্ষ রূপ ধারণ করেছিল বলে। বিশেষত ভারতে বৃটিশ শাসন ক্রমাগতভাবেই একটি বেসামরিক রাষ্ট্রীয় রূপ লাভ করতে থাকে, যেখানে সামরিক এবং বেসামরিক কর্মতৎপরতার পার্থক্য সুস্পষ্টভাবেই দৃশ্যমান ছিল। পাশাপাশি বেসামরিক ব্যবস্থাটিও আবার ধীরে ধীরে আইন প্রণয়ন এবং বিচার বিভাগীয় পর্যায়ে দু'টি স্পষ্ট সীমারেখায় বিভক্ত হয়ে যায়। অন্য কথায়, ভারতে বৃটিশ শাসন প্রবর্তন এখানে ধীরগতিতে এবং ধারাবাহিকভাবে আইনের শাসন এবং একটি বেসামরিক প্রশাসনব্যবস্থার জন্ম দেয়, যা মোটামুটিভাবে একটি যৌক্তিক ও বৈধ ভিত্তির উপর নির্ভর করেই গড়ে উঠেছিল।[১৩২]

সবশেষে বলা যায়, ১৯৪৭ সালে বৃটিশরা ভারত ছেড়ে চলে যাওয়ার শত শত বছর আগে থেকেই যে প্রশাসনিক ব্যবস্থাটি এখানে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল তার ধরনটি বেশ উল্লেখযোগ্যভাবেই পাকিস্তান ও বাংলাদেশের প্রশাসন ব্যবস্থায়ও বহাল থেকেছে। ব্যবস্থাটির কেন্দ্রীয়করণ প্রবণতা, সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্রের প্রাধান্য, পদমর্যাদার প্রতি আকর্ষণ, কর্মকর্তাদের মধ্যে উঁচু-নিচু প্রভেদ এবং সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহেও স্বায়ত্তশাসনের অভাবের মতো বৈশিষ্ট্যগুলো এখনো টিকে আছে।

১৩২. দেখুন, B.B. Misra, *The Bureaucracy in India*, (Delhi 1977), 387-8

# ১৩

## অখণ্ড স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ

হারুন-অর-রশিদ*

ভারতবর্ষ কখনো একজাতিক রাষ্ট্র ছিল না। পৃথিবীর মানচিত্রে বহুজাতি অধ্যুষিত ভারত একটি উপমহাদেশ। যদি স্বাধীনভাবে বিকশিত হওয়ার সুযোগ পেতো, তাহলে এসব জাতির পক্ষে এখানে একাধিক জাতি-রাষ্ট্র গঠনের যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। ভাষা, রক্ত-সম্বন্ধ, ইতিহাস-ঐতিহ্য, ভৌগোলিক অবস্থান, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য[১] বিবেচনায় ভারতের অন্য এলাকার চেয়ে বাংলায় জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের সম্ভাবনা ছিল সবচেয়ে উজ্জ্বল। কিন্তু ইউরোপ স্বাধীনভাবে জাতি গঠনের যে সুযোগ পায়, ভারত তা পায় নি। তুর্কী, আফগান, মুগল, বৃটিশ প্রভৃতি বহিরাগত বিজাতীয় শক্তির দীর্ঘ (৭১২ খৃ. থেকে) শাসন, বিশেষকরে দুশ' বছরের বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন এখানে এক অস্বাভাবিক পরিবেশ-পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটায়, যা জাতি-প্রশ্নটির স্বাভাবিক সমাধানের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে একে ভিন্নপথে পরিচালিত করে। বৃটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে জাতি-প্রশ্নটি উঠে আসার সুযোগ সৃষ্টি হলেও বস্তুত একই অবস্থার কারণে তা অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বনাম ধর্মভিত্তিক দ্বিজাতিতত্ত্বের বিকৃত রূপ পরিগ্রহ করে। ফলে জাতি-সমস্যার স্বাভাবিক সমাধানের প্রশ্নটি ঐতিহাসিক বিভ্রান্তির শিকার হয় এবং অমীমাংসিত থেকে যায়।

* অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১ এ সম্পর্কে দেখুন, আবুল কাসেম ফজলুল হক, 'বাঙালি জাতি'; মনসুর মুসা (সম্পাদিত), *বাঙলাদেশ* (ঢাকা ১৯৭৪), ৫৯-১০৭; Kamruddin Ahmad, *A Social History of Bengal*, (Dhaka 1970), I-XXIX; Denis Wright, *Bangladesh : Origins and Indian Ocean Relations, 1971-1975* (Dhaka 1988) 12-16; ইবনে আজাদ, "বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভবিষ্যৎ"; আসহাবুর রহমান (সম্পাদিত), *বাঙলাদেশের ভবিষ্যৎ ও অন্যান্য প্রবন্ধ* (ঢাকা ১৯৮৭), ৫০-৫২; আবদুল হক, *নিঃসঙ্গ চেতনা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ* (ঢাকা ১৯৮৪), ১৩৬-১৩৭।

এমনি এক ঐতিহাসিক ধারায় দেশবিভাগের প্রাক্কালে অবিভক্ত বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ২৭ এপ্রিল (১৯৪৭) দিল্লীতে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে "স্বাধীন, সার্বভৌম, অখণ্ড বাংলা " প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণের কথা ঘোষণা করেন।[২] এই উদ্যোগের সঙ্গে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সেক্রেটারি আবুল হাশিম, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শরৎচন্দ্র বসু এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সংসদীয় নেতা কিরণ শংকর রায় প্রমুখ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন এবং এক্ষেত্রে তাঁরা সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। এ প্রচেষ্টা সফল হলে ১৯৪৭ সালেই ভারত ও পাকিস্তানের পাশাপাশি অখণ্ড বাংলা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হতো। স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার এ প্রয়াস শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলেও একে কেন্দ্র করে নানা প্রশ্ন উত্থিত হওয়ার অবকাশ রয়েছে। যেমন, এ ধারণার উৎপত্তি হলো কিভাবে ? এটা কি বাংলাকে বিভক্ত করার যে আন্দোলন গড়ে উঠে তা ঠেকানোর উদ্দেশ্যে একটি নিছক কৌশলগত চাল ছিল, নাকি এর একটি সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক আদর্শগত লক্ষ্য ছিল ? এই উদ্যোগের পেছনে কি জিন্নাহর সম্মতি ছিল ? এই সময়ে কংগ্রেস হাইকমান্ডের অবস্থান কি ছিল ? কলকাতা, দিল্লী ও লন্ডনস্থ বৃটিশ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গি কি ছিল ? কেন এ উদ্যোগ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় ? এসব ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্নের নিরিখেই বর্তমান প্রবন্ধটি রচিত।

## দুই

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে উপনিবেশসমূহে স্বাধীনতালাভের আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়ে উঠলে ভারতে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান প্রায় অবধারিত হয়ে পড়ে। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এটলীর বিখ্যাত ফেব্রুয়ারি ঘোষণার (১৯৪৭) পর এটি এক রকম নিশ্চিত হয়ে যায়। এটলী তাঁর ঘোষণায় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে, বৃটেন ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ভারত থেকে হাত গুটাতে চায় এবং এর মধ্যে বৃহৎ দুটো দল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ কেন্দ্রীয় পর্যায়ে সমঝোতায় উপনীত হতে ব্যর্থ হলে প্রয়োজনে প্রাদেশিক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয় বিবেচিত হবে। এ ঘোষণায় ভারতবিভক্তি ও এক ধরনের পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ফুটে উঠে। এমতাবস্থায় কালবিলম্ব না করে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর নেতৃত্বে কট্টর হিন্দু সাম্প্রদায়িক সংগঠন 'হিন্দু মহাসভা' বাংলাকে বিভক্ত করে কলকাতাসহ হিন্দুপ্রধান অংশ নিয়ে পশ্চিম বাংলা প্রদেশ গঠন এবং এই নতুন প্রদেশকে ভারত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্তকরণের আন্দোলন শুরু করে। এটলীর ফেব্রুয়ারি ঘোষণার তিন সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে অখণ্ড ভারত ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের এতদিনকার প্রবক্তা কংগ্রেস পার্টির ওয়ার্কিং কমিটি সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে পাঞ্জাব ও বাংলাকে বিভক্ত করার সুপারিশ করে প্রস্তাব গ্রহণ করে।[৩] বাংলাবিভক্তি

২. *The Statesman*, 28 April 1947, 1

৩. Enclosure to 511, Nicholas Mansergh and Penderal Moon (eds.), *The Transfer of Power,* Volume X ( London 1981), 897-901, 308-309; *Secret Report* (অতঃপর *SR*) *on the Political Situation of Bengal* (Home Dept.)', 1st half, March 1947; *Governor's Fortnightly Report* (অতঃপর *GFR*), L/P & J/5/154, 64, India Office Library, London; আরো দেখুন, *Star of India*, 11 March 1947, 2 (editorial).

আন্দোলনের সমর্থনে কলকাতাস্থ বাঙালি-অবাঙালি শিল্প ও বণিক সমিতিসমূহ সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসে।[৪] এ ছাড়া প্রভাবশালী হিন্দু দৈনিক পত্রিকাসমূহ যেমন—*অমৃতবাজার পত্রিকা, আনন্দবাজার পত্রিকা* ও *হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড* বাংলাবিভক্তির সমর্থনে হিন্দু জনমত গঠনে ব্যাপক প্রচারাভিযানে অবতীর্ণ হয়।

এমনি এক রাজনৈতিক পটভূমিতে সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম 'স্বাধীন অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে আসেন। বাংলাবিভক্তির দাবির পশ্চাতে সক্রিয় হিন্দু মনমানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি। এ দাবির অযৌক্তিকতা, 'বাংলাবিভক্তির পরিণতি', বাংলার ঐক্যবদ্ধ থাকার অপরিহার্যতা, স্বাধীন অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্রে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক এবং এ রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ ইত্যাদি বিষয়ের উপর আলোকপাত করে সোহরাওয়ার্দী এক দীর্ঘ বক্তব্য পেশ করেন। হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেসের বাংলাবিভক্তির দাবিকে অদূরদর্শী এবং 'পরাজিতের মানসিকতা' বলে আখ্যায়িত করে তিনি বলেন যে, ১৯৩৭ সাল থেকে বাংলার হিন্দুরা তাদের সংখ্যা, সম্পদ, শিক্ষা ও প্রভাব-প্রতিপত্তির তুলনায় বঙ্গীয় মন্ত্রিসভায় আসন লাভ করতে না পারায় তা থেকে সৃষ্ট হতাশাই উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য দায়ী। বাংলার হিন্দুদের ঐ অবস্থার মূল কারণ হিসেবে প্রধানত সর্বভারতভিত্তিক হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্বের কথা তিনি উল্লেখ করেন, যেখানে সব ধরনের সমস্যা সর্বভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচিত হয়ে থাকে। 'প্রত্যেকটি প্রদেশ নিজ ব্যাপারে সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করলে পুরোপুরি ভিন্ন এক অবস্থার উদ্ভব হবে' এ আশাবাদ ব্যক্ত করে সোহরাওয়ার্দী বলেন, 'স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্রে আমরা সবাই এক সঙ্গে বসে এমন একটি সরকারব্যবস্থা প্রণয়ন করতে সক্ষম হবো, যা সকলের সন্তুষ্টি বিধান করতে পারে।' ১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসে 'ভয়াবহ কলকাতা দাঙ্গার' অব্যবহিত পরে পূর্ব বাংলার নোয়াখালী জেলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়, যাতে হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্তরাই অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। 'নোয়াখালী দাঙ্গা'কে অখণ্ড স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্রে হিন্দুদের সম্ভাব্য অবস্থার একটি নজির হিসেবে কোন কোন মহল তুলে ধরার চেষ্টা করলে সোহরাওয়ার্দী তা খণ্ডন করে হিন্দু সম্প্রদায়কে স্মরণ করিয়ে দেন যে, নোয়াখালী ছাড়া বাংলায় আরো বহু জেলা রয়েছে, যেখানে মুসলমানরা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও উভয় সম্প্রদায় বহুকাল ধরে শান্তি ও পারস্পরিক সৌহার্দ্যের মধ্যে বসবাস করে আসছে। 'বাংলাবিভক্তি হিন্দুদের জন্যও আত্মহত্যার শামিল হবে'—এ অভিমত ব্যক্ত করে তিনি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেন যে, 'অর্থনৈতিক ঐক্য, পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এবং একটি কার্যকর শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠনের আবশ্যকতা' বিবেচনায় বাংলা সর্বদাই অবিভাজ্য। তিনি বাঙালি-অবাঙালি প্রশ্ন তুলে কিভাবে এক শ্রেণীর অবাঙালি কর্তৃক বাংলা শোষিত হচ্ছে সে কথা উল্লেখ করে বলেন, 'বাংলাকে সমৃদ্ধিশালী হতে হলে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে ... বাংলাকে অবশ্যই তার ধন-সম্পদ এবং নিজ ভাগ্যের নিয়ন্ত্রক হতে হবে।' বাংলা

৪. *The Statesman*, 1 May 1947, 5; আরো দেখুন, অমলেন্দু দে, *স্বাধীন বঙ্গভূমি গঠনের পরিকল্পনা : প্রয়াস ও পরিণতি*, (কলিকাতা ১৯৭৫), ১৩২-১৩৫।

ঐক্যবদ্ধ ও স্বাধীন হলে এর ভবিষ্যৎ চিত্র কেমন হতে পারে তার ইঙ্গিত দিতে গিয়ে সোহরাওয়ার্দী বলেন :

> এটা বস্তুত একটি মহান দেশে পরিণত হবে, ভারত উপমহাদেশে যা হবে সবচেয়ে সমৃদ্ধ। এখানে জনগণ উন্নত জীবন ধারণের সুবিধা নিয়ে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছাতে সক্ষম হবে। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে সমৃদ্ধি অর্জন করে কালক্রমে এ দেশ বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী ও উন্নত রাষ্ট্রের মর্যাদা অর্জন করতে সমর্থ হবে।

সোহরাওয়ার্দী এই মর্মে আরো অভিমত ব্যক্ত করেন যে, হিন্দু ও মুসলমানরা সম্মিলিতভাবে বাংলাকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে সক্ষম হলে এক সময়ে বাংলার সঙ্গে তৎসংলগ্ন ও বিহার প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত মানভূম, সিংভূম ও পূর্ণিয়া জেলা এবং আসাম প্রদেশের সুরমা এলাকার সংযুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দেশবিভাগকে কেন্দ্র করে দু'সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্যমান দ্বন্দ্ব-সংঘাতের অবসান হলে আসামের বাকি অংশ বাংলার সঙ্গে একীভূত হয়ে একক রাষ্ট্র গঠনে এগিয়ে আসবে বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।[৫] এটাই ছিল সোহরাওয়ার্দীর 'বৃহত্তর বাংলা' রাষ্ট্রের ধারণা।

স্বাধীন অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র গঠন সম্পর্কে সোহরাওয়ার্দীর দিল্লী ঘোষণার দু'দিনের মধ্যে ২৯ এপ্রিল আবুল হাশিম এক বিবৃতিতে এ পরিকল্পনার সপক্ষে জোরালো বক্তব্য তুলে ধরে বাংলাবিভক্তির আন্দোলনে মদদ দানের জন্য বিদেশী পুঁজি এবং ভারতীয় দোসরদের দায়ী করেন। তিনি হিন্দুদের স্মরণ করিয়ে দেন যে, তারা (হিন্দুরা) বাংলার জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক এবং হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোন এক-সম্প্রদায়ের পক্ষে অপরকে পদানত করে রাখা সম্ভব নয়। অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্রে নির্বাচকমণ্ডলীর প্রকৃতি কেমন হবে সে সম্পর্কে সোহরাওয়ার্দী সুস্পষ্ট মতামত দানে বিরত থাকলেও হাশিম হিন্দুদের উদ্দেশ্যে যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং প্রশাসনে তাদেরকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের 'বেঙ্গল প্যাক্ট' (১৯২৩) অনুযায়ী ৫০ : ৫০ আসন প্রদানের কথা ঘোষণা করেন। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে বাংলার যুব সম্প্রদায়ের প্রতি এক আবেগপূর্ণ আবেদনে তিনি মন্তব্য করেন যে, 'উদ্ভূত সঙ্কট নিরসনের পন্থা হচ্ছে গভীর দেশপ্রেমের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলাকে ঐক্যবদ্ধ ও স্বাধীন করা, একে বিভক্ত করা নয়।'[৬]

৫. ১৯৪৭ সালের ২৭ এপ্রিল দিল্লীতে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদত্ত সোহরাওয়ার্দীর বিস্তারিত বক্তব্য দেখুন। এ বক্তব্যের বিভিন্ন উৎস রয়েছে। সোহরাওয়ার্দী কর্তৃক জিন্নাহর কাছে পেশকৃত এবং ন্যাশনাল আর্কাইভস অব পাকিস্তান (ইসলামাবাদ)-এর *Quaid-i-Azam Papers*, F.458, 64-73 -এ সংরক্ষিত বক্তব্যের একটি কপি থেকে এর সার-সংক্ষেপ আলোচ্য প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে।

৬. আবুল হাশিমের ২৯ এপ্রিল (১৯৪৭) প্রদত্ত বিবৃতিতে বিস্তারিত দেখুন। এর অন্যান্য উৎস হচ্ছে, *Star of India*, 30 April 1947, 2,5; *মিল্লাত* ( সাপ্তাহিক), ২ মে ১৯৪৭, ১-২; Abul Hashim, *In Retrospection* ( Dhaka 1974), 139-143.

## তিন

স্বাধীন অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্রের ধারণা গড়ে উঠার পশ্চাতে কি উদ্দেশ্য, আদর্শ ও বিবেচনা কাজ করেছিল সে সম্পর্কে পণ্ডিত ও পর্যবেক্ষকদের বিভিন্ন মতামত রয়েছে।[৭] তাঁদের অধিকাংশ মনে করেন যে, এটা ছিল বাংলাবিভক্তিকে ঠেকানোর উদ্দেশ্যে সোহরাওয়ার্দীর একটি বিকল্প প্রস্তাব।[৮] নিঃসন্দেহে, সোহরাওয়ার্দী ও হাশিমের এটি আশু লক্ষ্য ছিল, কিন্তু তাঁদের এই উদ্যোগ শুধুমাত্র বাংলাবিভক্তি রোধকল্পে একটি নিছক বিকল্প প্রস্তাব ছিল না। এর মূলে রয়েছে এক সযত্নলালিত ইতিবাচক আদর্শ ও দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য, যা অতীত ঘটনার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে বেড়ে উঠেছে এবং এই পর্যায়ে এর মূর্ত প্রকাশ ঘটেছে।

ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশ থেকে বাংলার একটা স্বতন্ত্র সত্তা সুদীর্ঘকাল থেকেই লক্ষণীয়। অষ্টম শতাব্দীতে পাল বংশের প্রতিষ্ঠা থেকে প্রায় পাঁচশ' বছর ধরে বাংলা ছিল সর্বভারতীয় নিয়ন্ত্রণমুক্ত এক স্বাধীন ভূখণ্ড। বাস্তবিকই অভ্যন্তরীণভাবে এই ভূখণ্ডটি বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন বা প্রায়-স্বাধীন অঞ্চলে বিভক্ত ছিল।[৯] ১২০৪ সালে বখতিয়ার খিলজীর নেতৃত্বে তুর্কীরা বাংলা (লক্ষণাবতী) জয় করে নেয় এবং এভাবে বাংলায় তুর্কী মুসলমানদের আগমন ঘটে। তবে পরবর্তীকালে বাংলার সুলতানি আমলের শাসকরা দিল্লীর তুর্কী সুলতানদের প্রতিনিধি হিসেবে শাসনের পরিবর্তে স্বাধীনভাবে বাংলা শাসন করেন। এসব শাসক একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করেন আর তা হচ্ছে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলকে মোটামুটি একই শাসনাধীনে নিয়ে আসা, যা একটি স্বাধীন রাজনৈতিক সত্তা হিসেবে প্রায় দুশ' বছর (১৩৪২-১৫৩৮) টিকে থাকে। এ সময় বাংলার হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, শিল্প ও বাণিজ্য, প্রশাসন, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠে, যা পরবর্তীকালে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বুনিয়াদ রচনা করে।[১০] কালক্রমে তা বাংলায় একটি অখণ্ড জাতি-রাষ্ট্র গঠনের পথ সুগম করতে পারতো। কিন্তু মুগল (১৫৭৬) এবং বৃটিশদের (১৭৫৭) 'সমরশক্তির কাছে পরাজিত হয়ে বাঙালির জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের সে সম্ভাবনা তিরোহিত হয়ে যায়।'[১১] এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, তুর্কী, মুগল, বৃটিশ প্রভৃতি বৈদেশিক জাতির শাসনাধীনে এলেও দিল্লীভিত্তিক কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে বাংলার

৭. দেখুন, Harun-or-Rashid, *The Foreshadowing of Bangladesh*, (Dhaka 1987), 280 n.

৮. দেখুন, V.P. Menon, *The Transfer of Power in India*, (New Delhi 1979), 355, Muhammad Abdur Rahim, *The Muslim Society and Politics in Bengal, 1757-1947* (Dhaka 1978), 331-332.

৯. যেমন, সমতট-হরিকেল বা পূর্ববঙ্গ, গৌড় বা উত্তরবঙ্গ, এবং রাঢ় বা পশ্চিমবঙ্গ।

১০. আবুল মনসুর আহমদ, *বাংলাদেশের কালচার,* (ঢাকা ১৯৭৪), ২৬৭-২৬৯; M.R.Tarafdar, *Husain Shahi Bengal: A Socio-Political Study* ( Dhaka 1965), *Passim.*

১১. আসহাবুর রহমান, '*দক্ষিণ এশিয়ায় জাতিপ্রশ্ন* : বাংলাদেশ', মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (সম্পাদিত), *সুন্দরম্*, বসন্ত সংখ্যা, ১৩৯৪, ৬।

শাসক-নৃপতিদের বিভিন্ন সময় স্বাধীনতা ঘোষণা করতে দেখা যায় এবং এসব বৈদেশিক শক্তির মধ্যে একমাত্র বৃটিশরাই বাংলাকে দিল্লীভিত্তিক সর্বভারতীয় কেন্দ্রীয় ব্যবস্থার সুদৃঢ় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিল। অবশ্য এ ক্ষেত্রেও, ভারতে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের প্রাক্কালে বাংলাকে বাইরের নিয়ন্ত্রণমুক্ত স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ গৃহীত হয়েছিল। যদিও বৃটিশ শাসনের শেষদিকে জিন্নাহর নেতৃত্বে পাকিস্তান আন্দোলনের দ্রুত বিস্তৃতি দেশবিভাগকে অনিবার্য করে তোলে, তবু বাঙালি মুসলমান নেতৃত্বের একাংশের কাছে পাকিস্তান পরিকল্পনার ভিন্ন অর্থ ছিল এবং তা এই যে, পাকিস্তান পরিকল্পনার আওতায় বাংলা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হবে।

ভারতের স্বাধীনতা ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বেশ কয়েকদিন ধরে জিন্নাহ ও গান্ধীর মধ্যে যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে পাকিস্তান পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক ছিল আলোচনার কেন্দ্রীয় বিষয়। সে সময়ে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটি ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের রূপ কি হবে তা নির্ধারণ করার উদ্দেশ্যে একাধিক পরিকল্পনা বিচার-বিবেচনার পর 'স্বাধীন ইস্টার্ন পাকিস্তান' রাষ্ট্রের এক বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা জিন্নাহর কাছে পাঠায়।[১২] পাকিস্তান পরিকল্পনার রাষ্ট্রীয় রূপ সুনির্দিষ্টকরণের লক্ষ্যে এটাই ছিল সর্বপ্রথম উদ্যোগ। 'স্বাধীন ইস্টার্ন পাকিস্তান' রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমানা নিয়ে বঙ্গীয় লীগ নেতৃবৃন্দ দুটি ভিন্নমত পোষণ করেন। 'খাজা-গ্রুপ' নামে পরিচিত ঢাকার নবাব পরিবারের নেতৃত্বাধীন ও ভূমিভিত্তিক অভিজাত শ্রেণীটি পুরো আসাম, হিন্দুপ্রধান বর্ধমান বিভাগ (বর্তমান পশ্চিম বাংলা) বাদে বাংলার বাকি অংশ এবং বিহারের পূর্ণিয়া জেলার কিয়দংশ নিয়ে এ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে ছিল। অন্যদিকে 'সোহরাওয়ার্দী-হাশিম গ্রুপ' নামে পরিচিত ক্রমবিকাশমান বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী অংশ চেয়েছিল পুরো আসাম, অবিভক্ত বাংলা এবং বাংলার সংলগ্ন বিহারের কতিপয় জেলা এর অন্তর্ভুক্ত করতে।

বস্তুত এ সময় থেকে সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম এক ধরনের 'বৃহত্তর বাংলা রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার ধারণা পোষণ করতে থাকেন। প্রস্তাবিত রাষ্ট্রের সীমানা নির্ধারণে দু'গ্রুপের মতপার্থক্যের মূলে যে বিবেচনা ক্রিয়াশীল ছিল তা হচ্ছে, প্রথম পক্ষ চেয়েছিল মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য সুনিশ্চিত করতে; অন্যদিকে, অপর পক্ষ চেয়েছিল পাকিস্তান পরিকল্পনার প্রতি বাংলার হিন্দুদের বিরোধিতা অতিক্রম করা ছাড়াও এর মাধ্যমে স্বাধীন

১২. Raghib Ahsan, *Hussain Shaheed Suhrawardy and the Inner History of the United Bengal Scheme*, (Karachi 1951), 4-7; Casey to Lord Wavell, 30 October 1944, *GFR*, L/P & J/5/151, 64; *Casey's Personal Diary*, Photo Eur. 48/1, 339-40, India Office Library, London. আরো দ্রষ্টব্য, Raghib Ahsan's *Confederacy of East Pakistan and Adibasistan*, enclosed in Raghib Ahsan to Jinnah, 14 August 1944, *Quaid-i-Azam Papers*, F. 204, 324-29; Raghib Ahsan to Jinnah, 2 September 1944, *Quaid-i-Azam Papers*, F. 5, 1-55; Maulana Akram Khan's *The Construction of the State of Eastern Pakistan*, enclosed in Akram Khan to Jinnah, 24 August 1944, *Quaid-i Azam Papers*, F.337, 4-22.

পূর্ব পাকিস্তানকে আর্থিক ও সামরিক উভয় দিক দিয়ে একটি কার্যকর শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করতে।[১৩] উল্লিখিত জিন্নাহ-গান্ধী বৈঠকের সময় 'পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি' (যা ১৯৪২ সালে এক শ্রেণীর মুসলিম সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়, যাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সঙ্গে সরাসরি জড়িত ছিলেন) কেবল প্রস্তাবিত 'ইস্টার্ন পাকিস্তান' রাষ্ট্রের বিভিন্ন দিক, যেমন এর সীমানা, সরকারের ধরন, অর্থনৈতিক সম্পদ, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সংখ্যানুপাত, প্রতিরক্ষা ইত্যাদির উপর আলোকপাত করে 'ইস্টার্ন পাকিস্তান : এর জনসংখ্যা, সীমানা ও অর্থনীতি' শিরোনামে একটি পুস্তিকা বের করে।[১৪] ১৯৪৫ সালের প্রথমদিকে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সেক্রেটারি আবুল হাশিম 'স্বাধীন ইস্টার্ন পাকিস্তান রাষ্ট্রের' মৌলিক নীতিসমূহ চিহ্নিত করে লীগের একটি খসড়া মেনিফেস্টো প্রণয়ন করেন, যাতে সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে একটি সাংবিধানিক পরিষদ (Constituent Assembly) গঠনের কথা বলা হয়।[১৫] মুসলিম লীগ কর্তৃক ১৯৪৬ সালের জুন মাসে বৃটিশ কেবিনেট মিশন পরিকল্পনা গ্রহণ করার অল্প কিছুদিন পরে *এসোসিয়েটেড প্রেসের* সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী বলেন যে, পরবর্তী বিশ বছরের মধ্যে বঙ্গাসাম (অর্থাৎ বাংলা ও আসাম, প্রস্তাবিত রাষ্ট্রের এটি একটি নাম) একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হবে। কলকাতার দাঙ্গায় (১৯৪৬) মুসলমানদের সপক্ষে হিন্দুদের বিরুদ্ধে আনীত উস্কানিমূলক ভূমিকা পালনের অভিযোগ খণ্ডন করতে গিয়ে বঙ্গীয় আইনসভায় সোহরাওয়ার্দী পুনরুক্তি করেন যে, 'বাংলা একদিন স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশ করবে।'[১৬] ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে *হিন্দু* নামে একটি পত্রিকার সঙ্গে বিস্তারিত সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন :

> লোকজন আমাকে বাংলার সমস্যা ভারতের অন্য সব এলাকা থেকে ভিন্ন করে দেখার কথা বলে ... এর মাধ্যমে আসলে তারা এক অর্থে পাকিস্তান আদর্শকে মেনে নিচ্ছে, কেননা স্বীকার করা হচ্ছে যে অঞ্চলসমূহের নিজস্ব পৃথক সমস্যাবলী রয়েছে, যা তাদেরই সমাধান করতে হবে। আমিও বিশ্বাস করি, ভবিষ্যতে যে স্বাধীন বৃহত্তর বাংলা কায়েম হবে, সেখানে বাংলার জনগণ নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধান করবে... ।[১৭]

এ বিষয়টি লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, এটলীর ফেব্রুয়ারি ঘোষণা এবং তৎপরবর্তী হিন্দু মহাসভার বাংলাবিভক্তির আন্দোলনেরও আগে ১৯৪৭ সালের জানুয়ারি মাসে আবুল

১৩. Casey to Lord Wavell, 30 October 1944; *Casey's Personal* Diary, Photo Eur 48/1, Raghib Ahsan, *Hussain Shaheed Suhrawardy*, 6-7 ; Casey to Lord Wavell, 11 September 1944, *GFR*, L/P & J/5/151, 117-120; আরো দেখুন, *Casey's Personal Diary*, Photo Eur 48/2, 58.

১৪. দেখুন, *GFR*, L/P & J/5/151, 72-86.

১৫. খসড়া মেনিফেস্টোটি দেখুন, *Star of India*, 23 March 1945, 3

১৬. *The Amrita Bazar Patrika*, 21 September 1946 (cutting), *GFR*,/L/P & J/5/153, 82

১৭. Quoted in *Star of India*, 17 September 1946, 3; আরো দ্রষ্টব্য, *মিল্লাত*, ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৪৬, ৭।

হাশিম বাংলাকে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত করার উদ্দেশ্যে শরৎ বসু ও আজাদ হিন্দ ফৌজ-এর কতিপয় কর্তাব্যক্তির সঙ্গে একাধিক বৈঠকে মিলিত হন।[১৮] এভাবে স্পষ্টত লক্ষ্য করা যায় যে, ব্যর্থ কেবিনেট মিশন পরিকল্পনা, 'ভয়াবহ কলকাতা দাঙ্গা' (আগস্ট ১৯৪৬) ও এটলীর ভারত সম্পর্কিত ঐতিহাসিক নীতি নির্ধারণী ঘোষণাকে কেন্দ্র করে প্রদেশসমূহের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের সম্ভাবনা দেখা দেয় এবং পৃথক পশ্চিম বাংলা প্রদেশ গঠনের জন্য হিন্দুদের দাবির বহু আগেই সোহরাওয়ার্দী ও হাশিম ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন, যা কখনো 'ইস্টার্ন পাকিস্তান', কখনো 'বঙ্গাসাম', কখনো 'বৃহত্তর বাংলা' অথবা 'স্বাধীন অখণ্ড বাংলা' নামে আখ্যায়িত হয়েছিল।

এ কথা সকলেই অবগত যে, ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগ কর্তৃক লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর 'পাকিস্তান' লীগের মূলমন্ত্র ও একমাত্র কর্মসূচিতে পরিণত হয়। ১৯৪৬ সালের আগে মুসলিম লীগ হাইকমান্ড কর্তৃক পাকিস্তান পরিকল্পনার সুনির্দিষ্ট রূপরেখা (তাঁদের ভাষায়, পাকিস্তান হবে ভারতের দু'টি মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে গঠিত একটি স্বাধীন রাষ্ট্র) প্রণীত না হওয়ার কারণে ১৯৪০ সাল থেকেই বাংলার নেতৃস্থানীয় মুসলিম লীগ নেতারা পাকিস্তান পরিকল্পনাকে ভারতের দু'টি মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে দু'টি স্বতন্ত্র, স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষিতে দেখে আসছিলেন।[১৯]

স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার তত্ত্বটির পশ্চাতে প্রধানত তিন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি বিদ্যমান ছিল। প্রথমত, আবুল হাশিমের মতো কেউ কেউ এবং পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটির প্রবক্তারা বিশ্বাস করতেন, বাঙালি মুসলমানরা শুধু হিন্দুদের থেকে ভিন্ন নয়, বরং অন্যান্য প্রদেশের মুসলমানদের থেকেও ভিন্ন, অতএব তারা একটি স্বতন্ত্র জাতিসত্তার অধিকারী। দ্বিতীয়ত কারো কারো (যেমন খাজা-গ্রুপ) মনে কেন্দ্রীয় শাসনের প্রতি ভীতি[২০] বা অন্ধ আনুগত্য প্রবল ছিল। তৃতীয়ত লাহোর প্রস্তাবের 'স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ' কথাটি সোহরাওয়ার্দীর মতো অনেকের মনে বাংলায় পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেতনা জাগ্রত করেছিল।

বস্তুত লীগ ও পাকিস্তান আন্দোলনের গোটা সময়ব্যাপী বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে ভিন্ন জাতিসত্তার দৃষ্টিভঙ্গি বিদ্যমান ছিল। বিশিষ্ট বাঙালি নেতা ও লাহোর প্রস্তাবের প্রস্তাবক ফজলুল হকের সঙ্গে কেন্দ্রীয় লীগ নেতৃত্বের দ্বন্দ্বের মূলে ছিল পারস্পরিক স্বার্থ ও

১৮. *Star of India*, 29 January 1947, ৩; *মিল্লাত*; ২৮ জানুয়ারি ১৯৪৭, ২; *মিল্লাত*, ৩১ জানুয়ারি ১৯৪৭, ১২; Abul Hashim, *In Retrospection*, 134-135.

১৯. দেখুন, *আজাদ*, ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৪০, ৪, সম্পাদকীয়: "পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ"; ঐ, ২৪মে ১৯৪০, সম্পাদকীয়।

২০. *Casey's Personal Diary*, Photo Eur. 48/3, 252; Casey to Lord Wavell, 11 September 1944, *GFR*, L/P & J/5/151, 117-120.

আনুগত্যের সংঘাত, যেহেতু তিনি দৃঢ়ভাবে অনুভব করতেন যে, অবাঙালি মুসলমান নেতারা বাংলার মুসলমানদের বিশেষ সমস্যার প্রতি কখনো প্রয়োজনীয় গুরুত্ব আরোপ করতেন না। বহু বিষয় ও ঘটনা হক, হাশিম ও সোহরাওয়ার্দীর মতো নেতাদের মনে এ ধারণারই সৃষ্টি করে যে, জিন্নাহর 'প্রস্তাবিত' পাকিস্তান বাংলার জনগণের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে না, অর্থাৎ তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন, একটি মাত্র পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানে বাঙালি মুসলমানদের উপর চলবে পশ্চিম পাকিস্তানীদের আধিপত্য। এসব বাঙালি নেতৃত্বের কাছে জিন্নাহর দ্বিজাতিতত্ত্বের অর্থ ছিল ভিন্নতর। তাঁদের বিবেচনায় এটা অখণ্ড পাকিস্তানের আদর্শিক ভিত্তি পর্যায়ের কোন বিশ্বাসবোধ ছিল না, বরং এটা ছিল ভারতের মুসলমানদের সাধারণ প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী অর্থাৎ হিন্দু বা 'সংক্ষেপে' কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তাদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের একটি কৌশলগত দিক। পাকিস্তান সম্পর্কে জিন্নাহর ধারণা থেকে তাঁদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভিন্নতর ছিল। যাহোক, ফজলুল হকের বিপরীতে হাশিম ও সোহরাওয়ার্দী উপযুক্ত সময় ও সুযোগ সৃষ্টি হওয়ার আগে এ সম্পর্কিত তাঁদের স্বতন্ত্র চিন্তা-ভাবনা নিয়ে অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে ঐ সময় পর্যন্ত লীগের আন্দোলনের মূলধারার সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ত রাখাকেই শ্রেয় মনে করেন। কেননা এর বিপরীত পন্থা অবলম্বন করলে এ পর্যায়ে ভারতের মুসলমানদের মধ্যে যে অনৈক্যের সৃষ্টি হবে তা খোদ পাকিস্তান পরিকল্পনার মূলে কুঠারাঘাত হানতে পারে বলে তাঁরা একে আত্মঘাতী বিবেচনা করতেন।

অতএব, স্বাধীন 'ইস্টার্ন পাকিস্তান' বা এক ধরনের 'বৃহত্তর বাংলা' রাষ্ট্র গঠনের ধারণা সম্বন্ধে ঘনিষ্ঠভাবে ওয়াকিবহাল যেকোন ব্যক্তির কাছে ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে সোহরাওয়ার্দী কর্তৃক গৃহীত অখণ্ড স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের পেছনে তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্য কি ছিল তা 'অস্পষ্ট' থাকার কথা নয়।[২১] তা ছিল সোহরাওয়ার্দী-হাশিম গ্রুপের ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে ভারতের পূর্বাঞ্চলের স্বাধীনতার লক্ষ্য সামনে রেখে দাবিকৃত পাকিস্তান ধারণার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। কার্যত দিল্লী থেকে অখণ্ড স্বাধীন বাংলার জন্য আন্দোলন শুরু করার ঘোষণা দানকালে সোহরাওয়ার্দী সুস্পষ্ট ভাষায় বলেন : "আমি বাংলাকে বরাবর একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ভেবে আসছি, ভারতের কোন ইউনিয়নের অংশ হিসেবে নয়।"[২২]

## চার

অখণ্ড স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবের প্রতি বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসকবর্গের দৃষ্টিভঙ্গি কি ছিল তা ঐ সময়কার *Transfer of Power Papers* এবং *Mountbatten Papers*

---

২১. বঙ্গীয় রাজনীতি ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উপর অন্যতম উৎসাহী লেখক-গবেষক Leonard A. Gordon-এর কাছে সোহরাওয়ার্দীর মনোভাব 'অস্পষ্ট' রয়ে যায়। দেখুন, Gordon, "Divided Bengal : Problems of Nationalism and Identity in the 1947 Partition", *The Journal of Commonwealth and Comparative Politics*, 2 : XVI (1978), 155.

২২. সোহরাওয়ার্দীর ২৭ এপ্রিল দিল্লীর সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তব্য, দ্রষ্টব্য।

হাতে না পৌঁছানো পর্যন্ত সঠিকভাবে জানা সম্ভব হয় নি। সাধারণ ধারণা হচ্ছে, বৃটিশরা এর বিরোধী ছিল এবং তাদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে বাংলা ও পাঞ্জাব বিভক্ত হয়। কিন্তু বাস্তব অবস্থা ছিল ভিন্নতর। অধিকন্তু, এখন জানা যায় যে, বাংলার গভর্নর, সর্বভারতীয় পর্যায়ে গভর্নর জেনারেল এবং লন্ডনস্থ বৃটিশ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গি এক ও অভিন্ন ছিল না।

বাংলার গভর্নর স্যার এফ. বারোজ তাঁর মুখ্যমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর অখণ্ড স্বাধীন বাংলা দাবির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করলেও ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন এ ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করেন, যেহেতু তাঁকে বিষয়টি 'সর্বভারতীয় দৃষ্টিকোণ' থেকে বিচার করতে হয় এবং তাই প্রথমদিকে এটি তাঁর কাছে বাঞ্ছনীয় মনে হয় নি। বারোজ মনে করতেন, 'বাংলাকে বিভক্ত না করে স্বাধীনতা প্রদানই হচ্ছে বাংলার অত্যন্ত জটিল সমস্যাবলী যুক্তিসঙ্গতভাবে সমাধানের উপায়। এসব সমস্যার অন্যতম হচ্ছে বাংলার উভয় অংশের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা, যার উপর কলকাতা মহানগরীর ভবিষ্যৎ শ্রীবৃদ্ধি নির্ভরশীল। বাংলাকে বিভক্ত করা হলে খাদ্যঘাটতিপূর্ণ এবং বৃহৎ শিল্প-কারখানাহীন পূর্ব বাংলার পক্ষে বিভাগের পর টিকে থাকা সম্ভব নয়'[২৩], এবং যেহেতু উভয় সম্প্রদায়ের দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে কলকাতা মহানগরীর উপর, তাই কলকাতাকে কেন্দ্র করে চূড়ান্ত সংঘর্ষ সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মাউন্টব্যাটেনের অভিমত এই যে, সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে যদি ভারতকে বিভক্ত করতে হয়, তাহলে একই যুক্তি বাংলা ও পাঞ্জাবসহ অন্য প্রদেশসমূহের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। তিনি আরো মনে করেন, বাংলাকে যদি স্বাধীনতা লাভের সুযোগ দেয়া হয়, তবে তা হবে ভারতকে 'খণ্ডবিখণ্ডকরণে' সাহায্য করার শামিল এবং কংগ্রেসের মৌলিক নীতি-আদর্শের বিরুদ্ধে যাওয়া। এমন অবস্থায়, কংগ্রেস পাকিস্তানকে মেনে নিতে সম্মত হওয়ার মাধ্যমে তার অখণ্ড ভারত আদর্শ থেকে সরে এসে যে ত্যাগ স্বীকার করলো এর মূল্য থাকলো কোথায়। এছাড়া, মাউন্টব্যাটেনের ধারণা ছিল, জিন্নাহ বাংলার স্বাধীনতার প্রস্তাবের বিরোধিতা করবেন।[২৪] যাহোক, বারোজের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে মাউন্টব্যাটেন বাংলাকে অবিভক্ত রেখে স্বাধীনতা প্রদানে সম্মত হন বটে, তবে তা কোন অবস্থাতেই তাঁর সর্বভারতীয় অবস্থানকে ক্ষুণ্ণ করে নয়। অন্যদিকে, ভারতসচিব লিস্টওয়েলও (Listowel) বাংলাকে অবিভক্ত অবস্থায় স্বাধীনতালাভের সুযোগ দানের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর যুক্তি হলো, (ক) আসামের সিলেট অঞ্চলসহ বা এটা বাদ দিয়ে হলেও বাংলা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের জন্য যথেষ্ট বৃহৎ; (খ) অবিভক্ত বা বিভক্ত যাই থাকুক না কেন, রাজনৈতিকভাবে (পশ্চিম) পাকিস্তানের সঙ্গে সংযুক্ত থাকলেও কার্যত

২৩. Minutes of Viceroy's 9th Miscellaneous Meeting, 1 May 1947, *The Transfer of Power*, X, 389-390; Burrows', *Partition of Bengal Scheme and Explanatory Note*, 390-394.

২৪. Minutes of Governor's Conference (Second Day), 16 April 1947, *The Transfer of Power*, X, 269-279; আরো দেখুন, *Viceroy's Personal Report*, No.2, 9 April 1947, File L/P & J/10/79, 508-510; *Viceroy's Personal Report*, N0.3, 17 April 1947. *The Transfer of Power*, X, 296-303.

বাংলার অবস্থা হবে একটি পৃথক রাষ্ট্রের মতো এবং (গ) বাংলা বিভক্ত হলে বিশেষকরে পূর্ব বাংলায় সৃষ্টি হবে বিরূপ অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া।[২৫] সুতরাং এ কথা অনস্বীকার্য যে, বৃটিশ সরকারের অনুসৃত 'অফিসিয়াল' নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ডমিনিয়ন মর্যাদায় অবিভক্ত বাংলাকে স্বাধীনতা প্রদানে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সম্মত থাকা; তবে শর্ত হচ্ছে, অবশ্যই এ ব্যাপারে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ হাইকমান্ডের অনুমোদন থাকতে হবে।[২৬]

সোহরাওয়ার্দী কর্তৃক উত্থাপিত অখণ্ড স্বাধীন বাংলা প্রস্তাবের প্রতি জিন্নাহর দৃষ্টিভঙ্গি কি ছিল এ সম্বন্ধে দেশের বিদ্বজ্জন, রাজনৈতিক ভাষ্যকার এবং নেতৃবর্গের মধ্যে ভিন্নমত থাকলেও সম্প্রতি এ প্রস্তাব সম্পর্কে জিন্নাহর প্রকৃত অবস্থানটি জানা সম্ভব হয়েছে। বিষয়টি প্রকাশ পায় এভাবে : ১৯৪৭ সালের ২৬ এপ্রিল এক সাক্ষাৎকারে সোহরাওয়ার্দী ভাইসরয়কে জানান যে, 'পর্যাপ্ত সময় পেলে তিনি বাংলার অখণ্ডতা বজায় রাখতে সক্ষম হবেন এবং এ ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত।... তিনি এ মর্মে জিন্নাহর সম্মতি আদায় করতে সক্ষম হবেন যে, যদি বাংলাকে ঐক্যবদ্ধ রাখা হয় তাহলে এর পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আবশ্যকতা নেই।' তিনি আরো বলেন, 'বাংলার কমনওয়েলথের সদস্য হিসেবে থাকার সর্বপ্রকার ইচ্ছা রয়েছে।'[২৭] একই দিন জিন্নাহ ভাইসরয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসলে ভাইসরয় তাঁকে সোহরাওয়ার্দীর প্রস্তাব সম্বন্ধে অবহিত করেন এবং বাংলাকে পাকিস্তানের বাইরে রেখে এর অখণ্ডতা বজায় রাখা সম্পর্কে তাঁর মতামত সরাসরি জানতে চান। 'কোনরকম দ্বিধা ছাড়াই' জিন্নাহ জবাব দেন :

> আমার আনন্দিত হওয়ার কথা। কলকাতা ছাড়া বাংলার মূল্য কোথায় ? তারা বরং অবিভক্ত ও স্বাধীন থাক, আমি নিশ্চিত যে তারা আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে চলবে।[২৮]

কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত থাকা সম্পর্কে সোহরাওয়ার্দী যে ইচ্ছা প্রকাশ করেন তার প্রতি জিন্নাহর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, "অবশ্যই, যেমনি আমিও আপনাকে ইঙ্গিত দিয়েছি যে পাকিস্তান কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত থাকতে চাইবে।"[২৯] জিন্নাহ এবং লিয়াকত

২৫. Memorandum by Secretary of state on Draft Statement of Policy, 17 May, *The Transfer of Power*, X, 876-880.

২৬. Mountbatten to Burrows, 23 May 1947, *The Transfer of Power*, X, 971; Minutes of India Committee Meeting, 28 May 1947, *The Transfer of Power*, 1013-1023; আরো দেখুন, *Addendum* received on 2 June to Viceroy 's *Telegram* No. 1223-5, 31 May, L/P & J/10/79.

২৭. *The Transfer of Power*, X, 448-49.

২৮. Record of Interview between Mountbatten and Jinnah, 26 April 1947, *The Transfer of Power*, X, 451-454; আরো দেখুন, Mountbatten to Burrows, 28 April 1947, *The Transfer of Power*, 471-472; Minutes of Viceroy's 9th Miscellaneous Meeting.

২৯. Record of Interview between Mountbatten and Jinnah, 29 April 1947.

আলী খান পরে বিভিন্ন সময়ে বাংলার অখণ্ডতা ও স্বাধীনতার প্রশ্নে একই অভিমত ভাইসরয় এবং তাঁর স্টাফদের কাছে ব্যক্ত করেন।[৩০]

আসলে জিন্নাহর লক্ষ্য ছিল একটি মাত্র পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা এবং এটা ১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত দিল্লী মুসলিম লেজিসলেটরস কনভেনশনে পরিষ্কার হয়ে যায়, যেখানে লাহোর প্রস্তাবের বহুবচনসূচক 'স্টেটস' কথাটিকে 'মুদ্রণ বিভ্রাট' হিসেবে বর্ণনা করে তিনি তাঁর নিজস্ব রাষ্ট্রীয় ভাবনা-চিন্তার সপক্ষে একটি প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিয়েছিলেন। তাহলে কি কারণে জিন্নাহ্ সোহরাওয়ার্দীর পরিকল্পনার প্রতি অনুমোদন দান করেছিলেন? অবশ্যই সোহরাওয়ার্দীর পক্ষ থেকে তাঁর উপর প্রচণ্ড চাপ ছিল। কেননা, বাইরের হস্তক্ষেপমুক্ত একটি পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন ছাড়াও সোহরাওয়ার্দীর উদ্যোগের সঙ্গে জড়িত ছিল মহানগরী কলকাতার ভাগ্য, যে কলকাতা হচ্ছে তাঁর রাজনীতির কেন্দ্রস্থল এবং যেখানে তিনি কাটিয়েছেন জীবনের শ্রেষ্ঠতম সময়। অধিকন্তু ভাইসরয় জিন্নাহর সম্মুখে যে খণ্ডিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের চিত্র তুলে ধরেছিলেন তার জেতব্য অবস্থানের (vulnerability) কথা চিন্তা করে জিন্নাহ্ অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন বলে মনে হয়। এই পাকিস্তানে পশ্চিমে সিন্ধু ও পশ্চিম পাঞ্জাবের যোগদানের সম্ভাবনা ছিল নিশ্চিত, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের যোগদান তখনো অনিশ্চিত এবং পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হতে যাচ্ছিল কলকাতা বাদে বাংলার সবচেয়ে পশ্চাৎপদ অংশ। আর জিন্নাহ্ যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে আসামের সিলেট অঞ্চলও পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হতে পারতো।[৩১] নিঃসন্দেহে, এক্ষেত্রে জিন্নাহর ইচ্ছা ছিল সমগ্র বাংলাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা এবং ভারতীয় ইউনিয়নের বাইরে বাংলার অখণ্ড সত্তা বজায় রাখাকে তিনি তাঁর প্রাথমিক কর্তব্য বলে বিবেচনা করে থাকতে পারেন। যদি বাংলায় খাজা নাজিমুদ্দিন, মওলানা আকরম খাঁ ও নূরুল আমিনদের মতো খাঁটি পাকিস্তানপন্থীরা বাংলাকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করতে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থও হন, তাতেও কোন ক্ষতি নেই, যতোদিন সমগ্র বাংলা হিন্দুস্থানের বাইরে থাকছে। জিন্নাহর ধারণা হলো, 'পাকিস্তানের একটি শক্তিশালী মিত্র'[৩২] হিসেবে বাংলা অবস্থান করবে। ইন্ডিয়া কমিটির কাছে পেশকৃত মাউন্টব্যাটেনের রিপোর্টেও এ মতের সমর্থন মেলে। এতে বলা হয়: "মিঃ জিন্নাহ মনে করেন যে, মুসলমানপ্রধান স্বাধীন বাংলা এক ধরনের আনুষঙ্গিক পাকিস্তানে পরিণত হবে।"[৩৩]

৩০. দেখুন, Mieville to Mountbatten, 29 April 1947, *The Transfer of Power*, X, 479: Mountbatten to Burrows, 2 May 1947, *The Transfer of Power*, 554-555; আরো দেখুন, *Viceroy's Personal Report*, No. 5, 1 May 1947, *The Transfer of Power*, 533-547, Record of Interview between Mountbatten and Chundrigar, 2 May 1947, *The Transfer of Power*, 561-562, Minutes of India Committee Meeting, 5 May, *The Transfer of Power*, 625-628.

৩১. *Viceroy's Personal Report*, No.3; আরো দেখুন, *Viceroy's Personal Report*, No. 2.

৩২. R. J. Moore, *Escape From Empire*, Oxford University Press (London 1983), 340.

৩৩. Minutes of India Committee Meeting, 19 May 1947, *The Transfer of Power*, X, 896-901

জিন্নাহ এবং বৃটিশ কর্তৃপক্ষের অনুকূল মনোভাব সত্ত্বেও সময়ের সীমাবদ্ধতা নিয়ে সোহরাওয়ার্দী অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিলেন, যেহেতু ভাইসরয় তাঁকে জানান যে, বাংলাকে অবিভক্ত ও স্বাধীন রাখার সপক্ষে জনমত গড়ে তুলতে তিনি 'বড়জোড়' দু'মাস সময় পেতে পারেন।[৩৪] আসলে, বাংলার স্বাধীন মর্যাদা সম্বন্ধে উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের মধ্যে ঐকমত্য ছিল না এবং এঁদের মধ্যে সমর্থক ও বিরোধী উভয়ই ছিল। এ বিষয়কে কেন্দ্র করে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের মধ্যে দুটি ভিন্ন মত সৃষ্টি হয়। সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ কংগ্রেসের এক অংশ যখন এ প্রস্তাবকে 'প্রাদেশিকতা'[৩৫] হিসেবে দেখার পক্ষপাতী, তখন অপর অংশ, যারা বাংলার যেকোন বিষয়ের প্রতি অগ্রাধিকার দেয়ার ক্ষেত্রে সদা সচেতন, তারা মনে করেছিল বাংলার স্বাধীনতা অর্জনই এর অখণ্ডতা বজায় রাখার একমাত্র উপায় হতে পারে। অন্যদিকে, বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের 'সোহরাওয়ার্দী-হাশিম গ্রুপে'র কাছে অখণ্ড স্বাধীন বাংলা পরিকল্পনার মধ্যে সে অর্থে নতুন কিছু ছিল না, যেহেতু এটা ছিল ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করে প্রণীত 'পাকিস্তান ধারণার' সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। কিন্তু 'খাজা-গ্রুপ' দৃঢ়ভাবে চেয়েছিল, বাংলা অবিভক্ত বা বিভক্ত যাই হোক, অখণ্ড পাকিস্তানের একটি অংশে পরিণত হোক। যদিও 'খাজা-গ্রুপ'কে কিছুকাল পর্যন্ত স্বাধীন 'ইস্টার্ন পাকিস্তান' ধারণাটি লালন করতে দেখা যায়, তথাপি এদের কাছে এটা কোন গভীর বিশ্বাসের ব্যাপার ছিল না। জিন্নাহর পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্টভাবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় রূপরেখা তুলে না ধরা পর্যন্ত এরা এ ধারণাটি পোষণ করতে থাকে এবং ১৯৪৬ সালে দিল্লী মুসলিম লেজিসলেটরস কনভেনশনে জিন্নাহ 'এক পাকিস্তান তত্ত্ব' নিয়ে আবির্ভূত হলে 'খাজা-গ্রুপ' তাঁর অনুগত অনুসারী দলভুক্ত হয়।[৩৬] অখণ্ড বাংলার আন্দোলন চলাকালে যদিও জিন্নাহ উল্লিখিত কারণে বাংলাকে স্বাধীন মর্যাদা দানে সম্মত ছিলেন, তথাপি এ মনোভঙ্গি ব্যক্ত করে তিনি প্রকাশ্য কোন উক্তি করেন নি। বরং সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম যে সময় বাংলার অন্য সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ঐকমত্যে পৌঁছার শর্ত নিয়ে আলাপ-আলোচনায় নিয়োজিত ছিলেন, সে সময় জিন্নাহর কাছ থেকে তাঁর অনুগত 'খাজা-গ্রুপ' এমন ধারণা লাভ করেছিল যে, 'হিন্দু নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্য লীগ হাইকমান্ড থেকে কাউকে ক্ষমতা দেয়া হয় নি।'[৩৭] এভাবে ভারতীয় মুসলমানদের রাজনীতির ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে জিন্নাহ বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের উভয় গ্রুপকে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত

৩৪. Record of interview between Mountbatten and Suhrawardy, 26 April 1947, *The Transfer of Power*, X, 448-449; আরো দ্রষ্টব্য, Lord Ismay to Mountbatten, 26 April 1947, *The Transfer of Power* X, 450.

৩৫. বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি সুরেন্দ্রমোহন ঘোষের ২ মে'র (১৯৪৭) বিবৃতি দ্রষ্টব্য, অমলেন্দু দে, পূর্বোক্ত, ১০৪-১০৫, ১৩২-১৩৫।

৩৬. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, Harun-or-Rashid, *The Foreshadowing of Bangladesh;* আরো দ্রষ্টব্য, মওলানা আকরম খানের ৪ মে'র বিবৃতি, *Star of India*, 5 May 1947, 2.

৩৭. Serajuddin Hussain, *Look into the Mirror* (Dhaka 1974), 35.

সতর্কতা অবলম্বন করেন। যাহোক, এ পর্যায়ে 'খাজা-গ্রুপ' বা অখণ্ড পাকিস্তানপন্থীরা এ ধারণা পোষণ করতে থাকে যে, (পশ্চিম) পাকিস্তানের সঙ্গে বন্ধনহীন অবস্থায় বাংলার মুসলমানরা 'ঐক্যবদ্ধ হিন্দুস্থানের শক্তি মোকাবেলা করতে'[৩৮] সমর্থ হবে না এবং কালক্রমে বাংলা 'ভারতের একটি অংশে'[৩৯] পরিণত হবে বলে তারা আশঙ্কা করে। এ ছাড়া পাকিস্তানের অভ্যুদয় যখন অবশ্যম্ভাবী বলে মনে হচ্ছিল, তখন থেকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কলকাতা বনাম ঢাকা প্রতিদ্বন্দ্বিতার এক নতুন উপসর্গ দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পড়ে।[৪০] অভিযোগ করা হয় যে, 'খাজা-গ্রুপে'র দৃঢ়চেতা অংশ, যাঁরা পূর্ব বাংলা থেকে আগত এবং যাঁরা বেশ কিছুদিন ধরে সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভা পুনর্বিন্যাসের পক্ষে একটানা প্রচার চালিয়ে আসছিলেন, তাঁরা তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপকে দমন করার লক্ষ্যে ব্যক্তিপর্যায়ে বাংলাবিভক্তির সপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। এঁদের কেউ কেউ ভেবেছিলেন, বঙ্গীয় আইনসভার স্পীকার নূরুল আমিনের (পূর্ব বাংলা) নেতৃত্বে পূর্ব বাংলায় নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হবে এবং সে মন্ত্রিসভায় এঁরা নিশ্চিত আসন লাভে সক্ষম হবেন।[৪১]

## পাঁচ

সে যাহোক, বহু আলাপ-আলোচনার পর ১৯৪৭ সালের ২০ মে শরৎ বসুর কলকাতাস্থ বাড়িতে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে অবিভক্ত ও স্বাধীন বাংলার সমর্থক উভয় সম্প্রদায়ের বাঙালি নেতৃবৃন্দ ঐকমত্যে পৌঁছে একটি চুক্তি প্রণয়ন করতে সক্ষম হন,[৪২] যা ছিল নিম্নরূপ :

এক. বাংলা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হবে। ভারতের বাকি অংশের সঙ্গে এ রাষ্ট্রের সম্পর্ক কি হবে তা সে নিজে নির্ধারণ করবে।

দুই. এ স্বাধীন বাংলার শাসনতন্ত্রে হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা অনুপাতে আসন সংরক্ষণসহ যুক্ত নির্বাচন ও প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে আইনসভা নির্বাচনের ব্যবস্থা থাকবে। হিন্দু ও তফসিলী হিন্দুদের মধ্যে জনসংখ্যা অনুপাতে অথবা উভয়ের সম্মতিক্রমে নির্ধারিত পদ্ধতিতে আসন বণ্টন করা হবে। নির্বাচন হবে একটি এলাকা থেকে একাধিক প্রার্থী নির্বাচনমূলক (multiple) এবং ভোট হবে বণ্টনধর্মী (distributive), সর্বোচ্চ

৩৮. আকরম খানের৪ মে'র বিবৃতি, পূর্বোক্ত।

৩৯. শাহ আজিজুর রহমানের সঙ্গে প্রবন্ধকারের ১৯৮২ সালের ১০ নভেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত সাক্ষাৎকার। আজিজুর রহমান ১৯৪৫-৪৭ সময়কালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ছাত্র সংগঠন নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের সম্পাদক ছিলেন।

৪০. দেখুন, Raghib Ahsan, *Hussain Shaheed Suhrawardy*,17.

৪১. Memorandum of the Calcutta District Muslim League and others to Jinnah, 31 May 1947, *Quaid-i-Azam Papers*, F. 10, 24-33 .

৪২. Abul Hashim, *In Retrospection,* 153-54; Sarat Chandra Bose, *I Warned My Countrymen,* (Calcutta 1968); 186-87; অমলেন্দু দে, পূর্বোক্ত, ৩৮-৪১; আরো দ্রষ্টব্য, Text of Suhrawardy's Memorandum to Kiran Shankar Roy in Burrows to Listowell and Mountbatten, 19 May 1947, *The Transfer of Power,* X, 905-906, Burrows to Listowell and Mountbatten, 21 May, 926-927.

আসনসংখ্যাভিত্তিক (cumulative) নয়। কোন প্রার্থী যদি নির্বাচনে তাঁর নিজ সম্প্রদায়ের প্রদত্ত ভোটের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট লাভ করেন এবং অন্য সম্প্রদায়ের প্রদত্ত ভোটের ২৫% পান, তাহলে তিনি নির্বাচিত বলে গণ্য হবেন। যদি কোন প্রার্থী এ শর্ত পূরণে ব্যর্থ হন, তাহলে যিনি নিজ সম্প্রদায়ের বেশিরভাগ ভোট লাভ করবেন তাঁকে নির্বাচিত ঘোষণা করা হবে।

তিন. বৃটিশ সরকার এ মর্মে ঘোষণা প্রদান করবে যে, স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে এবং বাংলা বিভক্ত হবে না; বাংলার বর্তমান মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেয়া হবে এবং মুখ্যমন্ত্রীর পদ বাদে সমসংখ্যক মুসলমান ও হিন্দু (তফসিলী হিন্দুসহ) সদস্য নিয়ে একটি নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হবে। এ মন্ত্রিসভায় মুখ্যমন্ত্রী হবেন একজন মুসলমান এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হবেন একজন হিন্দু।

চার. নতুন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী আইনসভা ও মন্ত্রিসভা গঠিত না হওয়া পর্যন্ত হিন্দু (তফসিলী সম্প্রদায়সহ) এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সামরিক বাহিনী ও পুলিশসহ সকল চাকুরিতে সমান অংশ থাকবে। এসব চাকুরিতে কেবল বাঙালিদেরই নিয়োগ করা হবে।

পাঁচ. ইউরোপীয় সম্প্রদায়ভুক্ত সদস্যগণ বাদে বঙ্গীয় আইনসভায় মুসলমান ও অমুসলমান সদস্যগণ মিলে ১৬ জন মুসলমান এবং ১৪ জন হিন্দু সদস্য অর্থাৎ মোট ৩০ সদস্যবিশিষ্ট একটি সংবিধান পরিষদ নির্বাচিত করবে।

যদিও বাংলার উভয় সম্প্রদায়ের কতিপয় নেতার স্বাক্ষরিত চুক্তির উল্লিখিত শর্তাবলী বাংলার রাজনৈতিক সঙ্কট নিরসনে একটি যুক্তিসম্মত ক্ষেত্র সৃষ্টি করেছিল, তথাপি এর প্রতি কংগ্রেস হাইকমান্ডের, বিশেষকরে নেহেরু ও সরদার প্যাটেলের প্রতিক্রিয়া আদৌ সহায়ক ছিল না। অখণ্ড স্বাধীন বাংলার পরিকল্পনাকে 'একটি ফাঁদ' হিসেবে আখ্যায়িত করে প্যাটেল বাংলার কতিপয় প্রখ্যাত হিন্দু ও কংগ্রেস নেতাকে এ ফাঁদে পা না দেয়ার জন্য সতর্ক করে দেন। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে এ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, 'বাংলার অমুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে হলে বাংলাকে অবশ্যই বিভক্ত করতে হবে।'[৪৩] নেহেরু আরো সুনির্দিষ্টভাবে ঘোষণা করেন :

> বিরাজমান অবস্থায় বাংলার স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ যা দাঁড়াবে তা হচ্ছে এখানে মুসলিম লীগের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা। এর অর্থ হবে কার্যত সমগ্র বাংলা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়া, যদিও এর প্রবক্তারা তা বলছে না।[৪৪]

লীগ বা অনুরূপ কোন দলের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার আশঙ্কায় বাংলার স্বাধীনতার বিরোধিতা করাটা ন্যায়সঙ্গত ছিল না। সংখ্যার দিক দিয়ে বাংলার হিন্দু ও মুসলমানরা

৪৩. Sardar Patel to Binoy Kumar Roy, 23 May 1947, Durga Das (ed.), *Sardar Patel's Correspondence 1945-50*, Vol. IV, (Ahmedabad 1972), 43; আরো দেখুন, Patel to K C. Neogy MLA, 13 May, ঐ, 39-40, Patel to Surendranath Sen, 1 June, ঐ, 52; Patel to Shyama Prasad Mookherjee, 17 May, ঐ, 41.

৪৪. *News Chronicle*-এর প্রতিনিধি Norman Clift-এর সঙ্গে নেহেরুর ২৭ মে'র (১৯৪৭) সাক্ষাৎকার দ্রষ্টব্য, *The Transfer of Power*, X, 1039-1041.

—৫০

প্রায় সমান। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারসহ যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা, যা বাস্তবায়িত হবে বলে বাঙালি নেতৃবৃন্দের স্বাক্ষরিত চুক্তিতে (যা সোহরাওয়ার্দী-বসু রায় ফর্মূলা নামেও পরিচিত) অঙ্গীকার করা হয়েছে, তাতে কোন একটি সম্প্রদায়ের কোন দলের শাসন প্রতিষ্ঠা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার ছিল। অধিকন্তু একবার স্বাধীন হলে বাংলার পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা যে মোটেও ছিল না একথা প্রায় নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

বস্তুত কংগ্রেস হাইকমান্ড বাংলার বিভক্তির প্রশ্নে অটল ছিলেন এবং তাঁরা ভারতের পূর্বাঞ্চলে একটি পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হোক তা চায় নি। অখণ্ড স্বাধীন বাংলা পরিকল্পনার প্রতি তাঁদের সর্বাত্মক বিরোধিতার এটাই আসল কারণ। এটা সত্য যে, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের একটি অংশ অখণ্ড স্বাধীন বাংলা পরিকল্পনার বিরোধিতা করে। তবে এটাও ভুলে গেলে চলবে না যে, বাংলাবিভক্তির উদ্যোগ সর্বপ্রথম এঁদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব থেকেই আসে।

স্পষ্টত কংগ্রেস হাইকমান্ডের কাছে আশু বিবেচ্য বিষয় ছিল সম্পদসমৃদ্ধ পশ্চিম বাংলা, বিশেষকরে কলকাতা শহর। আসামের গুরুত্ব সম্পর্কেও তাঁরা একইভাবে সচেতন ছিলেন বলে মনে করার কারণ রয়েছে। আসামে ছিল পেট্রোল ও অন্যান্য প্রচুর খনিজ সম্পদ। কৌশলগত দিক দিয়েও আসাম ছিল গুরুত্বপূর্ণ। অখণ্ড স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠিত হলে তা আসামকে ভারতীয় ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন করতো; এর সঙ্গে রেলপথে ভারতের মূল ভূখণ্ডে যোগাযোগের কোন ব্যবস্থা থাকতো না; বাংলার মধ্য দিয়ে যাতায়াতের জন্য আসামের পক্ষে, মাউন্টব্যাটেনের পরামর্শ[৪৫] অনুযায়ী, 'ট্র্যানজিট অধিকার' লাভের জন্য বাংলার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে হতো। তবে এ ব্যাপারে কোন নিশ্চয়তা ছিল না যে, প্রস্তাবিত স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতীয় ইউনিয়নের সর্বদা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় থাকবে। সাধারণত সীমান্তবর্তী দেশের মধ্যে বৈরী সম্পর্ক দেখা দেয়। তাই বৈরী ভাবাপন্ন বাংলা দ্বারা আসাম ঘিরে থাকার সম্ভাবনাও ছিল।[৪৬]

আসলে কংগ্রেস হাইকমান্ডের বিশ্বাস ছিল, বাংলার বিভক্তি 'দীর্ঘস্থায়ী' হবে না[৪৭], কেননা কি অর্থনৈতিক কি ভূরাজনৈতিক কোন দিক বিবেচনায় এককভাবে পূর্ব বাংলার পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব ছিল না। মাউন্টব্যাটেন এক রিপোর্টে উল্লেখ করেন : "নেহেরু ... মনে করেন যে বর্তমানে ভাগ করা হলেও কয়েক বছরের মধ্যে পূর্ব বাংলা হিন্দুস্থানের মধ্যে চলে আসবে।"[৪৮]

৪৫. Minutes of Governor's Conference (Second Day).
৪৬. আসামের গভর্নর স্যার এন্ড্রু ক্লোও এ মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন। দ্রষ্টব্য, ঐ।
৪৭. Norman Cliff-এর সঙ্গে নেহেরুর ২৭ মে'র সাক্ষাৎকার, পূর্বোক্ত; আরো দেখুন, শ্যামা প্রসাদ মুখার্জীর বক্তৃতা, *Star of India*, 24 May 1947, 1
৪৮. *Viceroy's Personal Report*, No. 7, File L/P & J/10/79, 222-226; আরো দেখুন, *SR*. Ist half, June 1947, *GFR*, L/P & J/5/154, 20-21.

যাহোক, ১৯৪৭ সালের ২৭ মে এক সংবাদ প্রতিনিধির কাছে ব্যক্ত নেহেরুর মন্তব্যকে কেন্দ্র করে অখণ্ড স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার এ নাটক দ্রুত যবনিকাপাতের দিকে এগিয়ে যায়। তাঁর মন্তব্য ছিল : 'ইউনিয়নের (অর্থাৎ হিন্দুস্থানের) অভ্যন্তরে বাংলা অবস্থিত থাকবে একমাত্র এ শর্তে আমরা বাংলাকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে সম্মত রয়েছি।'[৪৯] যদিও ২ জুন অনুষ্ঠিত শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের এক বৈঠকে উভয় হাইকমান্ড কর্তৃক বৃটিশদের দেশবিভাগ পরিকল্পনা কার্যত গৃহীত হয়, তথাপি বঙ্গীয় আইনসভার সদস্যরা বাংলার দু'অংশে হিন্দু ও মুসলমান এ দু'সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে বিভক্ত হয়ে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ পশ্চিম অংশের সদস্যরা ২০ জুন এক পৃথক বৈঠকে মিলিত হন এবং ৩৭ ভোটের ব্যবধানে বাংলাকে ভাগ করার সপক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।[৫০] যেহেতু দেশবিভাগ পরিকল্পনা অনুযায়ী যেকোন একটি অংশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য দ্বারা দেশবিভাগের সপক্ষে রায়দান এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য যথেষ্ট ছিল, অতএব এ ভোটাভুটির মাধ্যমে বাংলাবিভক্তি নিশ্চিত হয়ে যায়।

## ছয়

অবিভক্ত স্বাধীন বাংলার উদ্যোগ ব্যর্থ হওয়ার কারণ নিম্নোক্তভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। বাংলার শাসনকাজে ১৯৩৭-১৯৪৭ এই এক দশক যাবৎ কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা পালনের সুযোগ না পেয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যে এক ধরনের সম্পৃক্তিহীনতা জন্ম নেয়। একই সময়ের মধ্যে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক ও সোহরাওয়ার্দী উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নিয়ে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনের উদ্দেশ্যে বহুবার প্রয়াস চালান, কিন্তু কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ হাইকমান্ডের বিরোধিতার কারণে সে উদ্যোগ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

বাংলার জনসংখ্যার বিস্তৃতি এমনি ছিল যে, সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে বাংলাকে বিভক্ত করা এতে অতি সহজ হয়ে উঠে। কলকাতাসহ প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ বাংলার অর্ধাংশ পেলে বাংলাবিভক্তিতে পশ্চিম বাংলার হিন্দুদের ক্ষতি ছিল না। তারা বুঝেছিল যে, এর ফলে মুসলমানদের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগি না করে তারা নিজেরা একক শাসনক্ষমতা লাভ করবে। এটা তাদেরকে বাংলাবিভক্তির আন্দোলন জোরদার করতে আরো উৎসাহিত করে থাকতে পারে। অধিকন্তু, ১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসে সংঘটিত 'ভয়াবহ কলকাতা দাঙ্গা'র পর থেকে বিরাজমান সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ স্বার্থান্বেষী হিন্দু মালিকানাধীন

৪৯. Norman Cliff-এর সঙ্গে নেহেরুর ২৭শে মে'র সাক্ষাৎকার, পূর্বোক্ত; আরো দেখুন, *অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অব ইন্ডিয়ার* সঙ্গে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট কৃপালনীর সাক্ষাৎকার, Minutes of India Committee Meeting, 28 May, *The Transfer of Power*, X, 1038-1039.

৫০. প্রস্তাবের পক্ষে ৫৮ ভোট ও বিপক্ষে ২১ ভোট পড়ে। যাঁরা বিপক্ষে ভোট দেন তাঁরা বাংলার ঐ অংশ থেকে আগত মুসলিম লীগ দলভুক্ত ছিলেন।

পত্রিকাগুলোর জন্য সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প ছড়াতে একটি 'অপূর্ব সুযোগ' এনে দেয়, যা দুটো সম্প্রদায়ের মধ্যে এক 'ভয়ানক সন্দেহের প্রাচীর'[৫১] গড়ে তুলতে বড় ধরনের ভূমিকা পালন করে।

সময়ের সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে বাংলার গভর্নর বারোজসহ অখণ্ড স্বাধীন বাংলা উদ্যোগের প্রবক্তারা বহুবার তাঁদের উদ্বেগ প্রকাশ করেন। এটা আর একটি অন্তরায়। অখণ্ড স্বাধীন বাংলা প্রশ্নে বাঙালি নেতৃবৃন্দের মধ্যে ইতিপূর্বে উল্লেখিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর 'হিন্দুদের মধ্যে তাদের পূর্বেকার দৃষ্টিভঙ্গির দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে এবং বাংলাবিভক্তির বিরুদ্ধে জনমত গড়ে উঠতে' দেখা যায়।[৫২] তবে সাধারণ অভিমত হচ্ছে : '... প্রস্তাবটি খুবই বিলম্বে এসেছে...কমপক্ষে এক বছর পূর্বে এটা উত্থাপন করা উচিত ছিল।'[৫৩] প্রচণ্ড সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার মধ্যে এবং ঘোষিত সময়সীমার পূর্বে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হলে ভারতীয় ইউনিয়নের ডমিনিয়ন মর্যাদায় কমনওয়েলথের অভ্যন্তরে থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা, যাকে মাউন্টব্যাটেন 'আমাদের (বৃটিশদের) দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য অর্জনে একটি সুবর্ণ সুযোগ' হিসেবে আখ্যায়িত করেন, তা বৃটিশ সরকারকে 'সম্ভাব্য সবচেয়ে দ্রুত গতিতে ... একটি ঘোষণাদানের দিকে' অগ্রসর হতে তাগিদ দেয়।[৫৪] এভাবে পূর্বঘোষিত ১৯৪৮ সালের জুন মাসের পরিবর্তে ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে বৃটিশরা ক্ষমতা হস্তান্তর করে ভারত পরিত্যাগ করে। এটা ছিল অখণ্ড স্বাধীন বাংলা উদ্যোগের জন্য বিপর্যয়কর, কেননা এতে সফলকাম হতে হলে প্রয়োজন ছিল পর্যাপ্ত সময়ের। এ থেকে এটি প্রতীয়মান হয় যে, ডমিনিয়ন মর্যাদায় বাংলার তৃতীয় স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠালাভ সম্পর্কে বৃটিশ সরকারের সম্মতি থাকা সত্ত্বেও তারা অখণ্ড বাংলার বেদিমূলে তাদের সর্বভারতীয় স্বার্থ জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত ছিল না।

যদিও সোহরাওয়ার্দীর উদ্যোগের বিরুদ্ধে বাংলার হিন্দুদের একটি বড় অংশকে সংগঠিত করা হয়েছিল, তবুও এর ব্যর্থতার জন্য এটাই মুখ্য কারণ ছিল না। অখণ্ড স্বাধীন বাংলার ভাগ্য কেন্দ্রীয় পর্যায়ে নির্ধারিত হয় এবং এ প্রয়াস ব্যর্থ হওয়ার জন্য কংগ্রেস হাইকমান্ডের ভেটো বড় কারণ। নিঃসন্দেহে, সোহরাওয়ার্দী জিন্নাহর বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিতেন[৫৫] যদি এমনটি হতো যে, জিন্নাহর অনমনীয় মনোভাবের কারণে বাংলার

৫১. *Star of India*, 12 May 1947, 2.

৫২. *SR*, 1st half, May, 1947, *GFR*, L/P & J/5/154, 27-28

৫৩. Burrows to Mountbatten, 28 May, *The Transfer of Power*, X, 1025-1027

৫৪. Mountbatten to Lord Ismay, 11 May 1947, *The Transfer of Power*, X, 774.

৫৫. দ্রষ্টব্য, Burrows to Mountbatten, 28 May, আরো দেখুন, Minutes of Viceroy's 9th Miscellaneous Meeting; Record of Interview between Mountbatten and Tyson, 15 April 1947, *The Transfer of Power*, X, 263-264; Suhrawardy to Liaquat Ali Khan, 21 May 1947, *Quaid-i-Azam Papers*, F, 458, 75-79

ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত সমঝোতাটি অকার্যকর হয়ে পড়ছে। যাহোক, যেখানে পরিকল্পনাটির প্রতি একটি বিশেষ সময় পর্যন্ত জিন্নাহর সম্মতি ছিল, সেখানে কংগ্রেস হাইকমান্ড, বিশেষকরে নেহেরু ও প্যাটেল আগাগোড়া এর ঘোর বিরোধিতা করতে থাকেন; সোহরাওয়ার্দী যথার্থই বুঝতে পেরেছিলেন যে, নেহেরু ও প্যাটেল যদি অনড় থাকেন, তাহলে কিরণ শংকর রায়ের পক্ষে তাঁদের মত পরিবর্তন করানো কিংবা নিজস্ব স্বাধীন অবস্থান গ্রহণ কোনটাই সম্ভব ছিল না। এমনকি মহাত্মা গান্ধীকেও কংগ্রেস হাইকমান্ডের এ দু'নেতাকে বুঝিয়ে নরম করানোর মতো আর তেমন ক্ষমতাবান মনে হয় নি এবং অখণ্ড স্বাধীন বাংলার প্রয়াসে শরৎ বসু ও অন্যদের সমর্থন দানের জন্য তাঁকে এক ধরনের 'ভর্ৎসনাও' করা হয়।[৫৬]

## সাত

আলোচনা থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, কেবল বাংলাবিভক্তি ঠেকানোর উদ্দেশ্যে স্বাধীন অবিভক্ত বাংলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় নি, এটা ছিল বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের অভ্যন্তরে 'সোহরাওয়ার্দী-হাশিম গ্রুপের' দীর্ঘমেয়াদী রাষ্ট্রভাবনার ফল এবং সেকারণে তা তাঁদের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে ভারতের পূর্বাঞ্চলে একটি পৃথক রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ধারণার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এটাও অসত্য যে, বৃটিশরা এ উদ্যোগের বিরোধী কিংবা এর প্রতি নিরুৎসাহী ছিল। হিন্দুস্থান ও (পশ্চিম) পাকিস্তানের পাশাপাশি অবিভক্ত বাংলাকে ডমিনিয়ন মর্যাদায় একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতিদানে তারা একেবারে অনিচ্ছুক ছিল না। এ কথাও বলা যাবে না যে, জিন্নাহর অনুমোদনের অভাবে সোহরাওয়ার্দীর প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছিল, কেননা একটা পর্যায় পর্যন্ত এর প্রতি তাঁর সম্মতি ছিল। এ প্রয়াস ব্যর্থ হওয়ার মূলে ছিল কংগ্রেস কর্তৃক 'ভেটো' প্রয়োগ।

স্বাধীন 'ইস্টার্ন পাকিস্তান' বা এক ধরনের 'বৃহত্তর বাংলার' ধারণা লালন করে 'সোহরাওয়ার্দী-হাশিম গ্রুপ' একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে হাত দিয়েছিল, কেননা এর সঙ্গে বাংলা অবিভক্ত থাকা না থাকার মতো দীর্ঘমেয়াদী প্রশ্ন এবং বাংলার মুসলমানদের সঙ্গে বাঙালি হিন্দু ও বাংলার বাইরের মুসলমানদের সম্বন্ধ কেমন হবে তা জড়িত ছিল। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, ১৯৪৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত এঁরা রাষ্ট্রগঠন সংক্রান্ত তাঁদের এই স্বতন্ত্র ধারণা জনসম্মুখে তুলে না ধরে একে শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের মাঝে সীমাবদ্ধ রাখেন। ভারতীয় মুসলমানদের ঐক্য ও সংহতি, যা পাকিস্তান আন্দোলনের বিজয়ের জন্য অপরিহার্য

৫৬. ১৯৪৭ সালের ৮ জুন দিল্লীতে গান্ধীর প্রার্থনাশেষে প্রদত্ত বক্তব্য দ্রষ্টব্য, অমলেন্দু দে, পূর্বোক্ত, ৯০-৯১; আরো দেখুন, Gandhi to Sarat Bose, 8 June 1947, in Abul Hashim's *In Retrospection*, 1581 স্মর্তব্য। গান্ধীজী প্রদেশসমূহের বিভক্তির বিরোধী ছিলেন এবং অখণ্ড স্বাধীন বাংলা পরিকল্পনার প্রতি তাঁর এক ধরনের আশীর্বাদ ছিল। দ্রষ্টব্য, *Viceroy's Personal Report*, No 7, *SR*, 2nd half, March 1947, *GFR*, L/P & J/5/154, 58-60; Burrows to Lord Wavell, 19 March 1947, *GFR*, পূর্বোক্ত, 62-63; Burrows to Mountbatten, 28 May 1947, *The Transfer of Power*, X, 1025-1027

শর্ত ছিল, সেটি বিঘ্নিত হতে পারে এই আশঙ্কাতেই তাঁরা এমন পন্থা অবলম্বন করেন—তাঁদের ধারণাটি গুপ্ত রাখার এটি কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা হতে পারে না। তখনকার ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে ফজলুল হক, সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম ছিলেন জনপ্রিয় ও শীর্ষস্থানীয় বাঙালি নেতা। বাঙালির জাতি-রাষ্ট্র গঠনের প্রশ্নে তাঁদের আগ্রহ ছিল, সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁরা তাঁদের চিন্তাকে যৌক্তিক পরিণতিতে নিয়ে যাওয়ার জন্য দূরদর্শিতা ও দৃঢ় মনোবলের পরিচয় দিতে ব্যর্থ হন। এই ব্যর্থতার নানা কারণ থাকতে পারে, তবে তাঁদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের সংঘাত ও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব প্রবল থাকায় তাঁরা এই পর্যায়ে বাঙালির জাতি-রাষ্ট্র গঠনে প্রয়োজনীয় নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হন নি। নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এই বাঙালি নেতাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় সম্পর্ককে তাঁদের পরিকল্পিত 'একীভূত পাকিস্তান রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠায় কাজে লাগিয়েছে।

বাঙালি হিন্দু ও মুসলমান যদি ঐক্যবদ্ধভাবে অবিভক্ত স্বাধীন বাংলা প্রস্তাবের সমর্থনে সর্বভারতীয় পর্যায়ে তাদের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে সুদৃঢ় ভূমিকা রাখতে পারতো, তাহলে এ উদ্যোগ সফল হওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা ছিল। এজন্য প্রয়োজন ছিল ধর্ম নির্বিশেষে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে একই বাঙালি জাতীয়তাবাদের একটি স্বচ্ছ ও শক্তিশালী ধারণা বর্তমান থাকা। কিন্তু তা অনুপস্থিত ছিল। বাংলার তৎকালীন আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে দু'সম্প্রদায়ের পরস্পরবিরোধী স্বার্থ বিবেচনায় একই বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধারণা গড়ে উঠা খুবই দুরূহ ব্যাপার ছিল।

যাহোক, ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বাঙালির স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনপ্রচেষ্টার এক সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। আধুনিককালে ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের পথ ধরে উদ্ভাসিত স্বাধীন 'ইস্টার্ন পাকিস্তান' এবং 'বৃহত্তর বাংলা' পরিকল্পনা (১৯৪৪) ও অবিভক্ত স্বাধীন বাংলা উদ্যোগের (১৯৪৭) সঙ্গে ১৯৭১-এর স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের একটি অবিচ্ছিন্ন যোগসূত্র রয়েছে, আর তা হচ্ছে, এতদঞ্চলে একটি পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। বিভিন্ন পর্যায়ে এর আদর্শিক ভিত্তি (যেমন ১৯৪০-এর দ্বিজাতিতত্ত্ব, ১৯৪৭-এর বিমূর্ত বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও ১৯৭১-এর অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী আদর্শ) এবং ভৌগোলিক সীমারেখা (যেমন লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী সাম্প্রদায়িক সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে ভৌগোলিক সীমারেখা পুনর্নির্ধারণ, ১৯৪৭-এর অবিভক্ত বাংলা বা বৃহত্তর বাংলা এবং ১৯৭১-এর খণ্ডিত বাংলা) ইত্যাদি বিষয়ে ভিন্নতা বা কখনো কখনো বৈপরীত্য লক্ষ্য করা গেলেও উল্লিখিত যোগসূত্রের কোন ব্যত্যয় ঘটে নি, যে কারণে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে রচিত পাকিস্তান আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেও সোহরাওয়ার্দী ও অন্যদের পক্ষে ১৯৪৭ সালে বাঙালি জাতীয়তাবাদের নামে অবিভক্ত স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ সম্ভব হয়েছিল। লক্ষণীয় যে, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক বাস্তবতায় পরিকল্পিত রাষ্ট্রের আদর্শিক ভিত্তির সময়োপযোগী ও যথাযথ পরিবর্তন ঘটে থাকে এবং এক অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট অবস্থা থেকে ক্রমশ তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে।

# ১৪

# স্বাধীনতার সময়ে পূর্ব বাংলা

আহমেদ কামাল*

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট মধ্যরাতে পকিস্তানের জন্ম হয় এবং ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত বাংলা প্রদেশকে দ্বিধাবিভক্ত করা হয়। এই দ্বিখণ্ডিত প্রদেশটির পূর্বাংশ 'পূর্ব পাকিস্তান' নামে পরিচিত হয়। বলা হয়ে থাকে, পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র মুসলমানেরা আজানের ধ্বনি দিয়ে এই নতুন জাতি ও রাষ্ট্রের জন্মকে স্বাগত জানিয়েছিল।[১] চল্লিশের দশকের একজন তরুণ মুসলিম জাতীয়তাবাদী রাজনীতিবিদ তাঁর দিনলিপিতে উল্লেখ করেছেন যে, ঢাকা শহরের সকল মুসলমান অধ্যুষিত এলাকার অধিবাসীরা সারা দিনরাত স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের জন্য তোরণ নির্মাণ এবং সাজসজ্জা প্রভৃতির প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিল।[২] সরকারি ও বেসরকারি ভবনসমূহ আলোকসজ্জিত করা হয়েছিল এবং জ্বালানো হয়েছিল আতশবাজি।[৩] জনগণের আনন্দোল্লাসে মুখরিত ছিল পথঘাট এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ ট্রাকে, কেউ বা হাতিতে চড়ে আনন্দমিছিলে যোগ । *স্টেটস্‌ম্যান* পত্রিকার ভাষ্য অনুযায়ী, এ দিনের উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে ছিল হিন্দু-মুসলমানদের একটি সম্মিলিত মিছিল, যা ভিক্টোরিয়া পার্কে এসে জমায়েত হয়েছিল এবং সেখানে প্রধান প্রধান দলের নেতৃবৃন্দ ভাষণ দিয়েছিলেন।[৪]

* অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. আসহাব উদ্দীন আহমদ, *আসহাব উদ্দীন রচনা সংগ্রহ*, ৩য় খণ্ড (চট্টগ্রাম ১৯৮২), ৫৫।

২. তাজউদ্দীন আহমদের ডায়েরী, সংকলিত, বদরুদ্দীন উমর, *ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গে কতিপয় দলিল*, (ঢাকা ১৯৮৪)।

৩. ঐ।

৪. *The Statesman*, 15 August 1947, Calcutta

যদিও পাকিস্তান রাষ্ট্র সম্পর্কে, বিশেষকরে এর পটভূমি ও অর্জন সম্পর্কে বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে, তথাপি কোনো গ্রন্থে জন্মলগ্নে এবং জন্মের অব্যবহিত পরে এই রাষ্ট্রের যে স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে তার প্রতি পর্যাপ্ত মনোযোগ প্রদান করা হয় নি। বর্তমান গ্রন্থের এই অধ্যায়ে এমন কিছু বিষয় উত্থাপন করা হবে, যেগুলোতে জন্মলাভের পরে এই রাষ্ট্রের যে স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছিল তা তুলে ধরা হয়েছে এবং এ নতুন রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ে পূর্ব বাংলার জনগণ যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিল প্রধানত তার মধ্যেই আলোচনা কেন্দ্রীভূত থাকবে।

স্বাধীনতা দিবস উদযাপন কেবলমাত্র ঢাকাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বরিশাল শহরে বিজয় তোরণ নির্মাণের সাথে সাথে সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।[৫] সিলেটে দিবসটি উদযাপিত হয় জনসমাবেশের মধ্যদিয়ে। ১৪ আগস্ট মধ্যরাতে সাইরেন বেজে উঠার সাথে সাথে এই জেলাটি আর ভারতের আসাম প্রদেশের অংশ রইল না। মুসলমানরা দলে দলে বেরিয়ে এসে মিছিল সহকারে রাজপথ প্রদক্ষিণ করে।[৬] একজন প্রখ্যাত জেলা পর্যায়ের কংগ্রেস নেতা প্রভাষ চন্দ্র লাহিড়ী তাঁর স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেন, উত্তর বাংলার শহর রাজশাহীতে সমবেত বিরাট জনতার প্রত্যেকের মুখমণ্ডল স্বাধীনতা অর্জনের দীর্ঘ লালিত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হওয়ার আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল।"[৭] এমনকি পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী জেলাসমূহের উপজাতীয় জনগোষ্ঠীও বৃটিশ রাজের অধীনতা থেকে রাজনৈতিক মুক্তি লাভের দরুন নবপ্রেরণা ও আনন্দে মেতে উঠেছিল। একজন সক্রিয় কমিউনিষ্ট কর্মী এবং লেখকের মতে, অন্যদের মতো কমিউনিস্টরাও স্বাধীনতা লাভের আনন্দে অভিভূত হয়েছিল।[৮] ১৫ আগস্ট ময়মনসিংহ জেলার দুর্গাপুর, হালুয়াঘাট, নালিতাবাড়ী এবং ভাটপুর অঞ্চলে উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ সভা, সমাবেশ ও মিছিলের আয়োজন করেন এবং এসবের মধ্যদিয়ে তারা নতুন রাষ্ট্রের সাথে তাদের সংহতি প্রকাশ করেন।[৯]

স্বাধীনতা দিবসে সৌহার্দ্য ও মিলনের এক অভূতপূর্ব দৃশ্য প্রত্যক্ষ করা যায় ঢাকা এবং দেশের অন্যান্য স্থানে।[১০] তাজউদ্দীনের দিনলিপির আকর্ষণীয় বর্ণনায় উঠে এসেছে স্বাধীনতা ও মুক্তির সীমাহীন আনন্দ ও উদ্দীপনায় মুখরিত সেদিনকার উৎসবমুখর প্রাদেশিক শহর-গ্রামের ছবি।[১১] স্পষ্টতই বিজয়োৎসবের দর্শকদের কাছে এই

৫. হেদায়েত হোসাইন মোরশেদ, *আলতাফ মাহমুদ* (ঢাকা ১৯৮২), ৭।
৬. *The Statesman*, 15 August 1947. Calcutta.
৭. Provash Chandra Lahiry, *India Partitioned and Minorities in Pakistan* (Calcutta 1964). 1.
৮. সত্যেন সেন, *বাংলাদেশের কৃষকের সংগ্রাম*, (ঢাকা ১৯৬৮), ৫৭।
৯. প্রমথ গুপ্ত, *মুক্তিযুদ্ধে আদিবাসী*, কলকাতা ১৯৮২, ৮৮।
১০. *ডায়েরী*, ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ সম্পর্কে মন্তব্য, *দলিল*।
১১. L F Rushbrook Williams, *The State of Pakistan* (London 1962), 35; Adrienne Cooper, *Sharecropping and Sharecroppers' Struggle in Bengal 1930-50*, Ph.D Thesis, London University, 1984.

'আনন্দোন্মাদনা' ছিল একমাত্রিক ও শর্তহীন। অবশ্য এই আনন্দোৎসবের হিড়িক দেখে ভাববার কোন কারণ নেই যে, স্বাধীনতা অর্জনের আনন্দোন্মাদনায় সকল মানুষ এক অভিন্ন অনুভূতির অংশীদার ছিল। 'আনন্দোন্মাদনা' শব্দটি পাকিস্তানের ধারণাকে ঘিরে বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী প্রত্যাশাকে প্রকাশ করে এবং আড়ালও করে।

পাকিস্তানের জন্মের দিনটি পর্যন্ত পাকিস্তান রাষ্ট্রের একটি সঠিক সংজ্ঞা দেয়া সম্ভব হয় নি। পূর্ব বাংলার মুসলমানদের জন্য পাকিস্তানের একটি রূপরেখা নির্ধারণে নিযুক্ত মুসলিম লীগের সক্রিয় কর্মীরা যখন এই সদ্যোজাত রাষ্ট্রের সংবিধানের নতুন নীতিমালা প্রণয়নে নিয়োজিত ছিলেন, তখনও তারা এই রাষ্ট্রের একটি সুস্পষ্ট সংজ্ঞা দিতে ব্যর্থ হন, যদিও জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে একটি উদার দৃষ্টিভঙ্গি তাদের ছিল।[১২] স্বাধীনতার লগ্নে জিন্নাহ জাতির উদ্দেশ্যে বলেন :

> আমরা এই মৌলিক নীতি থেকে শুরু করছি যে আমরা সকলেই একই রাষ্ট্রের নাগরিক এবং সমান নাগরিক... একে আমাদের সামনে আমাদের আদর্শ হিসেবে রাখা প্রয়োজন এবং আপনারা দেখবেন যে হিন্দুরা আর হিন্দু থাকবে না এবং মুসলিমরা আর মুসলিম থাকবে না, তবে ধর্মীয় অর্থে নয়, কারণ ধর্ম হলো প্রতিটি মানুষের নিজস্ব বিশ্বাস, তবে রাজনৈতিক অর্থে সকলেই রাষ্ট্রের নাগরিক।

সেই একই ভাষণে জিন্নাহ পাকিস্তানের আইন প্রণয়নকারী গণপরিষদের পূর্ণ স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের নিশ্চয়তা প্রদান করেন।[১৩] ঢাকায় প্রখ্যাত মুসলিম জাতীয়তাবাদী নেতা মওলানা ভাসানীও বিধান সভার অধিবেশনে একই ধরনের আশাবাদ ব্যক্ত করেন :

> আজ দেশ একটি মুক্ত স্বাধীন দেশ এবং তা জনগণের মতামতের ভিত্তিতেই পরিচালিত হওয়া উচিত।[১৪]

এ ধরনের স্থানীয় নেতাদের জন্য 'পাকিস্তান'-এর প্রকৃত অর্থ ছিল ঔপনিবেশিক আমলের অভিজ্ঞতালব্ধ অংশীদারিত্ববর্জিত, অগণতান্ত্রিক, অপ্রতিনিধিত্বমূলক রাজনীতির অবসান ঘটিয়ে বিপরীত রাজনীতির অবতারণা।[১৫]

"আজকের রাত বারোটা হলো বৃটিশ শাসনের অবসানমুহূর্ত এবং ভারতের নিজস্ব স্বাধীন সরকারের সূচনালগ্ন"—১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট তাজউদ্দীন তাঁর দিনলিপিতে রাজনৈতিক মুক্তি অর্জনের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া এভাবেই ব্যক্ত করেছেন। তিনি তাঁর ডায়েরীর পাতার শীর্ষে বড় অক্ষরে 'স্বাধীনতা' শব্দটি লিখেছেন, যা তাঁর অনুভূতিরই

---

১২. Mustaq Ahmed, *Politics without Social Change* (Karachi 1971), 3.

১৩. M A Jinnah, "Presidential Address to Constituent Assembly of Pakistan" on 11, August, 1947. দেখুন, Jamiluddin Ahmed (ed.), *Speeches and Writings of Mr. M A Jinnah*, Vol 2 (Lahore 1964), 402.

১৪. *East Bengal Legislative Assembly Proceedings*, Vol 1, No 3, 7, from now on EBLA, *Progs*

১৫. Clive Y Thomas, *The Rise of the Authoritarian State in Peripheral Societies*, (New York, London 1984), 97.

ঘনীভূত অভিব্যক্তির সূচক।[১৬] রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনকে উদযাপন করতে গিয়ে এক কবি পাকিস্তানকে 'এক অনন্ত ঈদের দেশ' হিসেবে কল্পনা করেছেন।[১৭] বহু জাতীয়তাবাদীর কাছে স্বাধীনতা ছিল "ভারতীয় মুসলমানদের জন্য শ্রেষ্ঠতম সময়"।[১৮] একজন জাতীয়তাবাদী নেতা একে 'পাকিস্তান বিপ্লব' বলে অভিহিত করেছেন।[১৯] তাদের বহুজনের কাছেই এটা ছিল নিদেনপক্ষে 'বর্বর শাসনের অবসান', যে শাসন সব ধরনের মানবিক সম্পর্কের অবনতি ঘটিয়েছিল এবং উদ্যমী মানুষের সৃষ্টিশীলতাকে বিপর্যস্ত করেছিল।

প্রকৃতপক্ষে জাতীয়তাবাদী রচনা এবং বক্তৃতাসমূহ স্বাধীনতার দিনটিকে ১৭৫৭ সালের পলাশীর প্রান্তরে বাংলার নবাবের পরাজয়ের পর থেকে সংঘটিত সব আন্দোলনের চূড়ান্ত পরিণতি বলে গণ্য করেছে। আবার অন্য কেউ কেউ একে ১৮৫৭-এর ব্যর্থ অভ্যুত্থান থেকে সূচিত কালক্রমে স্থাপন করেন। 'পাকিস্তান—প্রতিশ্রুতির দেশ, আশার দেশ, সহস্র মানুষের জীবনের বিনিময়ে অর্জিত দেশ' এমনিতরো অভিব্যক্তি প্রচুর পরিমাণে প্রকাশিত হতো জাতীয়তাবাদী সাহিত্যের পাতায়।[২০]

আর এসব আশার কথা মুসলিম লীগের চারপাশে সমবেত হাজার হাজার মানুষকে শ্রেণী ও নৃতাত্ত্বিক বৈষম্যবর্জিত একটি মুসলিম 'জাতি' রূপে প্রতীয়মান করেছিল। দরিদ্র মুসলমানদের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রায়শ ছিল অভিজাত মুসলমানদের চেয়ে ভিন্ন। এ ছাড়াও জিন্নাহ এবং মুসলিম লীগ কখনো পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ চরিত্র সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করেন নি বলে একটা ভাবাদর্শগত শূন্যতা রয়েই গেল, অথচ মুসলিম লীগ সম্পর্কে নানাবিধ পরস্পরবিরোধী মূল্যায়ন বিদ্যমান ছিল।[২১]

'ইতিহাসের এক নতুন যুগ' এবং প্রভাতের উপমা প্রায়শ ব্যবহৃত হতো একটি নবসূচনার ধারণাকে প্রকাশ করার জন্য।[২২] অ্যান্ডারসন সঠিকভাবেই প্রভাত, আলো ও

---

১৬. *ডায়েরী, দলিল।*

১৭. তালিম হোসেন, "পাক ওয়াতন", উদ্ধৃত, সাঈদ-উর-রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা* (ঢাকা ১৯৮৩), ১৭২।

১৮. Kalim Siddique, *Conflict, Crisis and War in Pakistan* (London 1972), 54.

১৯. Abul Mansur Ahmad, *End of a Betrayal and Restoration of Lahore Resolution* (Dacca 1975), 165-8

২০. Begum Saistha Ikramullah, *From Purdah to Parliament* (London 1963), 158; A B M Habibullah, "Plassey to Pakistan", *Statesman*, Independence Day Supplement, 15 August 1947, Calcutta; আরও দেখুন, সাঈদ-উর-রহমান, পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা, মাসিক মোহাম্মদী নং ৭, ৯, ১০, ১১, ২০ বর্ষ, ৫৭৭, ৭৯৬, ৮৮১, ৫৮৯, ৯১৯ কলিকাতা, ভাদ্র, ১৩৫৪।

২১. বিস্তারিত দ্র. Shila Sen, *Muslim Politics in Bengal* (New Delhi 1976); Sirajuddin Hussain, *Look into the Mirror* (Dacca 1974); Kamruddin Ahmad, *Social History*; আবুল মনসুর আহমদ , আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, ঢাকা।

২২. দক্ষিণ এশিয়া সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ এফ. ই. জুখভ পাকিস্তান কনসেপ্টের অনেক রকম অর্থ লক্ষ্য করেছেন; দেখুন, D Overstreet and Windmiller, *Communism in India*, (Barkeley 1959), 254.

সূর্যকে পুনরুজ্জীবন ও পুনর্জন্মের প্রতীক হিসেবে কল্পনা করেছেন, যা সেই মুহূর্তে যথার্থ ব্যঞ্জনা লাভ করে যখন জাতীয়তাবাদীদের জীবন "পৃথিবীর অগ্রযাত্রার সাথে যুক্ত হয়।"[২৩] সেটি এমন এক সময়, যখন গণমানুষের আশার বহুমুখী বিস্তার ঘটে। জাতীয়তাবাদীরা এই জটিল প্রপঞ্চের প্রায়শ সরলীকরণ করেছেন।

## দুই

পাকিস্তানের অভিনবত্ব ছিল এর এলাকাগত অবস্থান, যা এযাবৎকালের জানা সব রাষ্ট্রের সংজ্ঞা সম্পর্কে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছিল। পাকিস্তান "'জাতিত্বের প্রায় সকল মানদণ্ডকেই অস্বীকার করেছিল"।[২৪] এই নতুন রাষ্ট্রের দুই অংশ হাজার মাইলের ভারত দ্বারা বিচ্ছিন্ন ছিল এবং ক্ষুদ্রতম পূর্বাঞ্চল (মাত্র ৫৪,০৯১ বর্গমাইল এলাকাসম্পন্ন) ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের চাইতে অধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত, যেখানে পশ্চিম পাকিস্তানের আয়তন ছিল পূর্ব পাকিস্তানের ছয় গুণেরও বেশি।

যদিও এটা ছিল একটা 'দ্রুত উদ্ভাবিত' সর্বভারতীয় সমাধান[২৫], কতিপয় জাতীয়তাবাদীর দৃষ্টিতে এটা ছিল রাষ্ট্র নির্মাণের নব্য পরীক্ষানিরীক্ষা।[২৬] অন্য বহু জনের কাছেই এটা ছিল একটা অন্যায্য বিভাজন[২৭], ক্ষেত্রবিশেষে 'অস্বাভাবিক' বিভাজন। হয়তো অনেকেই এটাকে একটা উদ্ভট রাষ্ট্র ভেবেছিলেন।[২৮] এ ধরনের চিন্তাধারার পেছনে অসংখ্য কারণ ছিল। যেভাবে বৃটিশ ভারত এবং বিশেষত বঙ্গ প্রদেশ বিভক্ত হয়েছিল, তা ছিল অনেকের কাছেই অগ্রহণযোগ্য। কতিপয় হিন্দু ও মুসলমান নেতা চেষ্টা করেছিলেন আর একটি তৃতীয় রাষ্ট্রের পরিকল্পনা উদ্ভাবন করতে। এই পরিকল্পনাই পরে প্রস্তাবিত হয়েছিল বৃহৎ বঙ্গ নামে।[২৯] কিন্তু এই প্রচেষ্টাও ব্যাহত হয়েছিল দলীয় বিরোধিতা দ্বারা এবং প্রতিযোগী ভারতীয় ও পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদীদের অনীহার কারণে।[৩০] বাংলাকে বিভক্ত করা হলো এবং কলকাতা ছাড়া পূর্ববঙ্গকে মনে হয়েছিল এক বিশাল জনসংখ্যা অধ্যুষিত এক বৃহৎ দরিদ্র বস্তি।[৩১] এই বিভাজন সংঘটিত হলো বিশৃঙ্খলা ও রক্তপাতের মধ্য

---

২৩. সাঈদ-উর-রহমান, *রাজনীতি ও কবিতা*।

২৪. Benedict O'Gorman Anderson, "A Time of Darkness and a Time of Light, Transposition in Early Indonesian Nationalist Thought" in Anthony Reid and David Marr (eds ) *Perceptions of the Past in South-Asia* (Singapore 1979), 247.

২৫. Barbara Metcalf, "The Case of Pakistan," in Peter Herkel and Ninian Smart (eds.) *Religion and Nationalism in the Modern World* (New York,1983), 107

২৬. Ayesha Jalal, *The Sole Spokesman* (Cambridge 1985), 293.

২৭. Kamruddin Ahmad, *The Social History of East Pakistan* (Dacca n.d.) , 89

২৮. Chaudhry Mohammad Ali, *The Emergence of Pakistan* (New York and London 1967), 203-221, Abul Mansur Ahmad, *Amar Dekha*, 257

২৯. Kamruddin Ahmad, *Social History*, 96.

৩০. Paul R. Greenough made this observation in his *Prosperity and Misery in Modem Bengal . The Famine of 1943-1944* (New York 1982), 8.

৩১. *Eastern Pakistan through Six Months of Independence*, East Bengal Government Press, from now on GOEB, 1948, 5, 29.

দিয়ে।[৩২] বিভাজন নাটকের একজন মূল নায়ক এ বিভাজনকে বর্ণনা করেছিলেন "ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রশাসনিক অপারেশন" হিসেবে।[৩৩] পাকিস্তানের জন্মলগ্ন অব্দি তার ভাবমূর্তি ছিল অস্বচ্ছ এবং অনিশ্চিত, সেই সাথে বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্রের অভিমুখী।[৩৪]

ধর্মীয়, জাতিগত, ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক বিবেচনা এই নতুন রাষ্ট্রের নিয়ামক ছিল না, যার বিশেষ রাজনৈতিক ভূসংস্থান নির্ধারিত হয়েছিল বিদায়ী ঔপনিবেশিক শক্তি এবং প্রতিযোগী জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলির স্বেচ্ছাচারী কার্যাবলী দ্বারা। জাইরিং যথার্থই মন্তব্য করেন যে, "জনগণের মধ্যকার ঐতিহ্যগত গতিশীলতাকে মন্থর ও সীমাবদ্ধ করে আন্তর্জাতিক সীমানাসমূহ টানা হয়েছে ।"[৩৫] কিছু মুসলিম লীগ নেতা অভিযোগ করেন যে, র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ প্রদেশকে অত্যন্ত মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। নদীপথসমূহকে কৃত্রিমভাবে বিভক্ত করা হয়েছে এবং একমাত্র কর্ণফুলী ছাড়া সকল বাঁধের এলাকাই পশ্চিম বাংলায় পড়েছে।[৩৬] বাউন্ডারি কমিশনের রোয়েদাদ সম্পর্কে বহু মুসলিম লীগ সদস্যের অভিমত এই যে, তা শিল্পায়নের বিকাশকে অনিশ্চিত করেছে।[৩৭] এ ছাড়া প্রদেশের এ ধরনের বিভাজন আসামের পার্বত্য ত্রিপুরা স্টেট এবং কাছাড় থেকে সিলেটের বহু থানায় চিরাচরিত নিয়মে চাল ও ধান সরবরাহ কঠিন করে তোলে।[৩৮] সিলেট জেলার উত্তরাঞ্চলের কানাইঘাট, জয়ন্তিয়াপুর ও গোয়াইনঘাট থানাসহ জয়ন্তিয়া পরগনার জনগণ সবচেয়ে বেশি অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়। আসামের সাথে তাদের স্বাভাবিক বাণিজ্যপথগুলি চিরকালের জন্য রুদ্ধ হয়ে যাবার ফলে তাদের জীবনে দুঃখকষ্ট ও অভাব নেমে আসে।[৩৯]

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট কলমের এক আঁচড়ের মাধ্যমে সৃষ্ট দেশটির অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে যখন নানা সমস্যা "বিস্ময়কর গতিতে ভিড় করতে থাকে" এই ভূখণ্ডে, যেখানকার জনসংখ্যা ৪ কোটি ২০ লক্ষ, যাদের মধ্যে ২৯,৪৮১,০০৯ জন মুসলমান, ১১,৭৩৬,০২৯ জন হিন্দু, ৫৬,৮৮২ জন খৃস্টান এবং ১,১৭৯ জন শিখ। ঐ সময়ে মাইলপ্রতি জনসংখ্যার ঘনত্ব ছিল ৭৭৫ জন, যা ছিল বিশ্বে সর্বোচ্চ ঘনবসতি। কেবলমাত্র ৫০০ মাইল পাকা রাস্তা এবং অসংখ্য আঁকাবাঁকা নদ-নদী ও খাল এই ভূখণ্ডের ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ তৈরি করেছিল।[৪০]

৩২. দ্রষ্টব্য, Metcalf, "Pakistan", 170.
৩৩. Mount Batten's Address to the Indian Constituent Assembly at New Delhi, 15 August 1947, taken from Ayesha Jalal, *Spokesman*, 293.
৩৪. Khalid B. Sayeed, *Pakistan : The Formative Phase* (Karachi 1960), 102.
৩৫. Lawrence Ziring, "The Failure of Democracy in Pakistan : East Pakistan and the Central Government 1947-1958", unpublished Ph.D. thesis, Columbia University, 1962, 10.
৩৬. EBLA, progs, Vol. 1, No. 3, 39.
৩৭. ঐ, Vol. 3, 143.
৩৮. Fishery Bundle, B-progs, Sept. 1953, Nos. 461-472.
৩৯. *The Dacca Gazzette*, 22 Nov., 1951, Parti, Dacca, 1225.
৪০. *East Pakistan Forges Ahead, Homes Political Bundle.*

পূর্ব বাংলা উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছিল ভারতের ৪০০ সুতাকলের মধ্যে মাত্র ১০টি, ১০৬টি পাটকলের একটিও না, লোহা ও ইস্পাত কারখানা, কাগজ কল, রাসায়নিক শিল্প, কয়লা খনি কিংবা পানি বিদ্যুৎ প্রকল্প একটিও না। কেবল ছিল ৪৯টি অস্থায়ী (ঋতুভিত্তিক) পাটের গাঁইট বাঁধার কারখানা (সমগ্র দেশের এতদসংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের ২০ শতাংশ মাত্র), ৫৮টি ক্ষুদ্র চাউলকল, ৩টি চিনির কল ও ১টি সিমেন্ট ফ্যাক্টরী।[৪১]

এতদ্‌সত্ত্বেও সমসাময়িক সরকারি বিবরণীতে পাকিস্তানের স্থায়িত্ব সম্পর্কে একটি আশাবাদী চিত্র তুলে ধরা হয়। স্বাধীনতার পরপরই প্রকাশিত একটি সরকারি দলিলে উল্লেখ করা হয় যে "এসব উপেক্ষিত অঞ্চলের প্রচুর উন্নতির সম্ভাবনা সংক্রান্ত আশা, যা নিয়ে নতুন রাষ্ট্র তার যাত্রা শুরু করে, তা কোন মূল্যহীন বিশ্বাস নয়" এবং ঐ দলিলে চা, তামাক, চামড়া, কাগজ ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যের উৎপাদন এবং রপ্তানির সম্ভাবনা এমনভাবে বিশ্লেষণ করা হয়, এতে জনগণের আস্থা ও মনোবল অনেক বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বাস্তব অবস্থা ছিল এই যে, দশকের পর দশক ধরে পাট উৎপাদনকারী এই প্রদেশটির অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল "কলকাতার সমৃদ্ধির পশ্চাদ্‌ভূমি হিসাবে"।[৪২]

পূর্ব বাংলায় কিছু নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যেরও ঘাটতি ছিল, যেমন ভোজ্যতেল, চিনি এবং বস্ত্র। এখানকার ৪টি চিনির কলে বার্ষিক উৎপাদন ছিল ২৫,০০০ টন, যা প্রয়োজনের অর্ধেক।[৪৩] পূর্ব বাংলার ভাগে পড়ে অবিভক্ত বাংলার মোট শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মাত্র ১২ শতাংশ। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট শিল্পশ্রমিকের সংখ্যা ছিল মাত্র ৭০০০।[৪৪]

স্বাধীনতার সময়কালকে সরকারি প্রতিবেদনসমূহে সাধারণত "সমস্যা জর্জরিত" অভিধায় অভিহিত করা হয়েছে। নতুন সরকার ক্ষমতা গ্রহণের ১৫ দিনের মধ্যেই বড় ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় যখন চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী অঞ্চলের প্রায় ৫০০ বর্গমাইল এলাকা ও পাঁচ লক্ষের অধিক জনগোষ্ঠী প্রবল বন্যায় আক্রান্ত হয়।[৪৫] শত শত ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়, অসংখ্য গবাদি পশু ভেসে যায় বন্যার পানিতে, মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় শস্যসম্পদ।ফলে নতুন দেশে সৃষ্টি হয় খাদ্য সংকটের সমস্যা। বন্যার পানি নেমে না যেতেই 'নজিরবিহীন এক ঘূর্ণিঝড়' পূর্ববঙ্গের সর্বদক্ষিণের অঞ্চল কক্সবাজারের উপর দিয়ে বয়ে যায়, যাতে প্রায় এক লক্ষ মানুষ বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের মত প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং বার্ষিক পলিজ বৃদ্ধি ছাড়াও নদীসমূহে অব্যাহত ক্ষয়প্রক্রিয়ার কারণে পূর্ব বাংলার বিপুল সংখ্যক মানুষের জীবন ক্রমাগত ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে।[৪৬]

৪১. Nafis Ahmad, *An Economic Geography of East Pakistan* (London 1958).
৪২. *Eastern Pakistan*, 30-32.
৪৩. East Bengal Province, Home Police, B-progs, June, 1951, No. 102.
৪৪. ঐ, ৬।
৪৫. দ্রষ্টব্য, *Eastern Pakistan*, East Pakistan Forges Ahead, GOEB.
৪৬. Abdur Razzaq, *Bangladesh : State of the Nation* (Dhaka 1981), 7.

তবে দেশের সবচেয়ে গুরুতর সমস্যা হয়ে উঠে খাদ্যসংকট। ৭.৮ মিলিয়ন টন ধান উৎপাদনকারী এবং ৮ মিলিয়ন টন ধানের চাহিদাসম্পন্ন এই অঞ্চল দুর্ভিক্ষের হুমকির সম্মুখীন হলো, অথচ তখনো জনগণের স্মৃতি থেকে ১৯৪৩-এর ভয়াল দুর্ভিক্ষের ছবি মুছে যায়নি। বিভাজনের পর পূর্ববঙ্গ বরাদ্দ হিসেবে পায় মাত্র ১৮,০০০ টন ধান। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট কোন মজুদ ময়দার অস্তিত্বই ছিল না এই প্রদেশে। এমনকি এই তারিখের চার মাস আগে থেকেই ঢাকায় কোন রুটির সংস্থান করা সম্ভব ছিলনা।[৪৭] তদানীন্তন ধানের মজুদ আর মাত্র দুই সপ্তাহ শহরের চাহিদা পূরনে সক্ষম ছিল, এবং তাও শহরের রেশনিং সিস্টেমের অধীন ছিল। প্রদেশের মোট ৩৯,০০০ টন খাদ্যের চাহিদায় ঘাটতি ছিল ৯,০০০ টন। যেহেতু সম্পূর্ণ পরিবহনব্যবস্থাই হিন্দু কর্মীরা দেশান্তরী হওয়ার ফলে অচল হয়ে পড়েছিল, তাই ঘাটতি এলাকাগুলি খাদ্য বিতরণকারী সংস্থার আয়ত্তের বাইরেই চলে যায়। অথচ একটি বাস্তব সত্য এই যে, সেই সময় খাদ্যদ্রব্যের বিক্রয়ই প্রাদেশিক সরকারকে দেউলিয়া হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে সচল রেখেছিল।[৪৮]

অবশ্য স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছিল যে, একটি দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে। পাকিস্তান সরকার ও পশ্চিম বাংলার প্রতি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষকসভার খোলা চিঠিতে তা এভাবেই বিবৃত হয়েছে :

> 'খাদ্যের মূল্য মণপ্রতি ৩০ টাকা বেড়ে গেছে। রেশনিং চাল রয়েছে কেবলমাত্র ৬ লাখ লোকের জন্য। এর ফলে হিন্দু-মুসলমানরা পাইকারি হারে অভুক্ত রয়েছে। অনাহারে মৃত্যুর সংখ্যা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে। গ্রাম থেকে শহরে আসা মানুষের সংখ্যা ব্যাপক হারে বাড়ছে। পূর্ববঙ্গের বিশাল অঞ্চল সত্যিকার অর্থেই ভয়াল দুর্ভিক্ষের কবলে।[৪৯]

## তিন

Greenough সমগ্র স্বাধীনতাপূর্ব সময়কে 'অনিয়ম' ও 'দুর্দশার কাল' বলে অভিহিত করেছেন।[৫০] প্রকৃত প্রস্তাবে খাদ্যঘাটতি, বন্যা এবং সরকার পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত লক্ষাধিক মানুষের কাছে স্বাধীনতা নতুন সূচনা না হয়ে নতুন সংকট হয়ে দাঁড়ালো।

যখন ঔপনিবেশিক শক্তি দেশ ছেড়ে চলে যায়, তখন জনগণের পরিবর্তে অনেকাংশে নবজাত রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রের বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত কর্মকর্তাগণই সরকারের শাসনভার গ্রহণ করে। পূর্ব পাকিস্তানে রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়া ভারাক্রান্ত ও দুর্বহ হয়ে উঠেছিল অসংখ্য প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক সমস্যার দ্বারা। এক সরকারি প্রতিবেদনের ভাষ্য

৪৭. *Estern Pakistan*, 3.

৪৮. Abdus Salam, "My Faith as an Editor". *Pakistan Day Supplement, Pakistan Observer*, 15 August 1966, as quoted in D N Banerjee, *East Pakistan, A Case Study in Muslim Politics* (Delhi, 1969), 46.

৪৯. বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাংলা ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, ২য় খণ্ড, ঢাকা, ১৯৭৫, ৯।

৫০. Greenough, *Prosperity*, 254.

অনুযায়ী, বিভাগীয় জটিলতা ও অস্পষ্টতার কারণে '১৫ আগস্ট' প্রাদেশিক রাজস্ব দপ্তরের তহবিল একদম শূন্য হয়ে পড়ায় একজন বিশেষ গুপ্তচরকে করাচীতে পাঠানো হয়েছিল ত্রাণসাহায্য চাওয়ার জন্য।'[৫১] কর্মকর্তার অভাব নিয়েও সমস্যা ছিল। কর্মকর্তাদের ভাষ্য অনুযায়ী নতুন রাষ্ট্রের সূচনা ছিল এই রকম :

> 'আগস্ট ১৪, ১৯৪৭। কলকাতার কাছাকাছি দমদম এয়ারপোর্ট থেকে একটি ডাকোটা বিমান অনিচ্ছুকভাবে রওয়ানা দিল ঢাকার উদ্দেশে... বিমানটি ভূমি স্পর্শ করার পর দুই ডজন কর্মকর্তা তা থেকে নেমে এলেন। এঁরা ছিলেন পাকিস্তানে চলে আসতে ইচ্ছুক কিছু সিনিয়র কর্মকর্তা, যাঁরা পূর্ব বাংলার কিছু অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদ পূরণ ও কার্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতার অধিকারী ছিলেন।...এ রকম একটি ঢাকাগামী ডাকোটা ফ্লাইটই যথেষ্ট ছিল ঐ পর্যায়ের যোগ্যতার অধিকারী কর্মকর্তাদের অভাব পূরণের জন্য।'[৫২]

এমনকি কিছুদিন পর পূর্ববঙ্গে সরকারি প্রশাসন প্রায় অস্তিত্বহীন এবং ভয়ানকভাবে অদক্ষ হয়ে পড়লো।[৫৩] ৯ মার্চ, ১৯৪৮-এর "Statesman" পত্রিকা এক সমালোচনায় লিখেছিল, "খুব স্বল্পসংখ্যক রাষ্ট্রই শূন্য তহবিল নিয়ে কাজ শুরু করে, যেমন পূর্ববঙ্গ কাজ শুরু করেছে, এর সাথে যোগ হয়েছে একটি ভেঙ্গে পড়া প্রশাসনযন্ত্র।"[৫৪] প্রাথমিক পর্যায়ে কর্মকর্তাদের প্রতিক্রিয়ায় অসহায়ত্ব প্রতিভাত হয়েছে, কেননা তাদেরকে হঠাৎ নিজেদের রক্ষার দায়িত্ব নিজেদেরই গ্রহণ করতে হয়েছিল।

প্রাদেশিক সরকারের পদের ক্ষেত্রেও পরিস্থিতি এর চেয়ে খুব বেশি ভিন্ন ছিল না :

> 'ঢাকা একটি ছোট্ট বিভাগীয় শহর...হঠাৎ করেই সেখানে কেবল প্রাদেশিক সরকার নয়, এর বিশাল কর্মচারীবাহিনী, আনুষঙ্গিক সাজসরঞ্জাম এবং এমনকি কতিপয় কেন্দ্রীয় সরকারি বিভাগের জন্য স্থান সংকুলানের প্রয়োজন হলো ... নতুন সরকার নিজের দেশেই ছিল পলায়নপর... সরকারি নির্দেশ কখনো ছেঁড়া কাগজের টুকরোয় লিখিত হতো, তথ্যবিনিময় হতো ছেঁড়া সিগারেটের প্যাকেটে, টাইপরাইটার মাঝে মাঝে মিলতো, টেলিফোন ছিল এক দুর্লভ সামগ্রী...প্রশাসনের সুবিধাদায়ক যন্ত্র না হয়ে তা পরিণত হয়েছিল বিলাসসামগ্রীতে ...কর্মকর্তারা নিজেরাই প্রায়শ নিজেদের বার্তাবাহকের ভূমিকা পালন করতেন। আসবাবপত্র বলতে বস্তুত কিছুই ছিল না।[৫৫]

তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জেনারেল অফিসার কমান্ডিং (জি ও সি) স্মরণ করেন, "স্বাধীনতার অল্পকাল পরেই সেখানে কেবল দুই ব্যাটালিয়ন পদাতিক বাহিনী ছিল। এদের একটিতে ছিল তিনটি কোম্পানি, যাদের সৈনিক হওয়ার মত যোগ্যতার যথেষ্ট অভাব ছিল। সদর দপ্তরে কোন টেবিল, চেয়ার, সাজসরঞ্জামাদি, এমনকি পূর্ব পাকিস্তানের মানচিত্র কোন কিছুই ছিল না। কর্মকর্তারা চালাঘরে বাস করতো, মুষলধারে

---

৫১. *Eastern Pakistan*, 1.

৫২. *East Pakistan Forges Ahead*, Home Political Bundle, 1.

৫৩. Taya Zinkin, *Reporting India* (London, 1962), 40.

৫৪. *The Statesmen*, 9 March 1948, Calcutta.

৫৫. *East Pakistan Forges Ahead*, 3-4, Emphasis mine.

বৃষ্টি হলে তাতে ক্রমাগত পানি পড়তো, কখনো ত্রিপলঢাকা ছাদ উড়ে যেত।[৫৬] ১৯৪৭-এর আগস্টে ঢাকায় চাকুরিরত একজন সামরিক কর্মকর্তার ভাষ্য অনুযায়ী : "১৯৪৭ সালের আগস্টে মনে হচ্ছিল, প্রদেশটি অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলার কবলে পড়েছে।" তিনি আরো মন্তব্য করেন : "সেই অবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ সাফল্যের জন্য যা পাওয়া গিয়েছিল, তাও ছিল তুলনামূলকভাবে অপ্রতুল, এক কথায় একেবারেই অপর্যাপ্ত"[৫৭]

পুলিশবাহিনী তাদের নিজেদের মূল্যায়নে অত্যন্ত হীন অবস্থায় ছিল। আইনের প্রয়োগ এবং শৃঙ্খলা রক্ষা উভয় দায়িত্বই বৃটিশ আমলের মত তখনো পুলিশ বাহিনী পালন করতো। ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত পূর্ব পাকিস্তানের পুলিশ প্রশাসনের প্রতিবেদনে পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল স্বাধীনতার প্রথম বছর সম্পর্কে বলেন, "এটি নজিরবিহীন প্রবল চাপ ও সংকটের বছর।" মজার ব্যাপার এই যে প্রারম্ভিক অনিশ্চয়তার এই সময়ে সরকারি প্রতিবেদনসমূহ সদয়ভাবে নতুন দেশকে অভিহিত করেছে 'শিশুরাষ্ট্র' বলে।

রাজনৈতিক স্বাধীনতা রাষ্ট্রযন্ত্রের জন্য অবধারিতভাবে এক অনিশ্চয়তার জন্ম দিল, এবং এই পরিস্থিতিতে কখনো কখনো জনগণের উদ্যম ছিল অত্যন্ত প্রবল। কর্মকর্তাদের বিবেচনায় রাষ্ট্র ছিল সরকারি কার্যাবলীর সমষ্টিমাত্র। পক্ষান্তরে সরকার সম্পর্কে জনগণের ধ্যানধারণা ও প্রত্যাশা প্রায়শ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে ধাঁধায় ফেলে দিত। একদিকে রাষ্ট্রের প্রয়োজন এবং কাম্য ছিল জনগণের আনুগত্য, নতুন রাষ্ট্রের কাছে যাদের প্রত্যাশা মাঝে মাঝে ছিল একেবারে অবাস্তব। অন্যদিকে রাষ্ট্রের প্রশাসনযন্ত্রকে সুসংগঠিত করার প্রয়োজন ছিল; কেননা রাষ্ট্রে ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত সংগঠন ছিল অগণতান্ত্রিক, দমনপন্থী ও ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রেরই অবদান।

## চার

স্বাধীনতাপূর্ব দিনগুলিতে মুসলিম লীগ তার সমস্ত কর্মকাণ্ড ও ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করেছিল এই উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক জাতীয় পরিচয় নির্মাণের উদ্দেশ্যে। ১৯৪০-এর ২৩ মার্চের লাহোর প্রস্তাব মোতাবেক মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখতো মুসলিগ লীগ। কিন্তু তারা ঔপনিবেশিক শাসনের কঠোর সমালোচনা যেমন করেনি, তেমনি সম্ভাব্য রাষ্ট্রের চারিত্র্য সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট বক্তব্যও রাখে নি। মূলত এ রাষ্ট্রের জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠেছিল নেতিবাচকভাবে।[৫৮] পাকিস্তানবাদ হয়ে দাঁড়ায় উপনিবেশবাদবিরোধিতা এবং ব্রাহ্মণ্যবাদবিরোধিতার নামান্তর।[৫৯] যে ইতিবাচক বক্তব্য লীগের ছিল তাকে বৃহৎ পরিসরে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। কখনো উপমহাদেশের

৫৬. Muhammad Ayub Khan, *Friends not Masters : A Political Autobiography* (London, 1967), 22-23.

৫৭. Colonel Mohammad Ahmad, *My Chief* (Lahore 1960), 6-7.

৫৮. Humayun Kabir, *Muslim Politics, 1906-47 and Other Essays* (Calcutta 1969), 94

৫৯. দ্রষ্টব্য, Habibullah Bahar's speech in EBLA, progs, Vol. 1, No. 4, 26.

মুসলিম সম্প্রদায়ের ঐক্য এবং সময় ও বৌদ্ধিক সম্পদের অভাবের দোহাই দিয়ে একে যুক্তিগ্রাহ্য করা হয়েছে।[৬০] তার ফলে মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ পরিকল্পনা ও নীতি প্রণয়ন সংক্রান্ত সব ধরনের আলোচনাকে এড়িয়ে গেছেন।

লীগের কিছু সদস্যের একমাত্র ভয় ছিল এই যে স্বাধীন অখণ্ড ভারতে হিন্দুরা প্রাধান্য বিস্তার করবে। অন্যরা আশা করেছিল যে অতীত ঐতিহ্যবাহী মুসলিম শক্তির গৌরবের পুনর্জন্ম হবে। কিন্তু কোন পক্ষেরই পরিষ্কার ধারণা ছিল না কিভাবে রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানকে সংগঠিত করতে হবে।[৬১] আসলে তাদের চিন্তাভাবনা ছিল মূলত এলিটবাদী। তাদের মূল লক্ষ্য ছিল কিছু নির্দিষ্ট সামাজিক শ্রেণীর লোকের স্বার্থকে সম্পূর্ণ জনগোষ্ঠীর স্বার্থ হিসেবে দেখানো। এ ছিল তাদের আভিজাত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি। এভাবে তারা ইসলামী ঐক্যের ধারণাটিকে ইসলামী সাম্রাজ্যের গৌরবময় অতীতের কল্পলোকে স্থাপন করলেন।[৬২] বহু মুসলিম লীগ কর্মীর বক্তৃতা ও লেখায় এই উদ্দেশ্য সচেতনভাবে ক্রমাগত প্রকাশিত ও প্রতিফলিত হয়েছে। স্বাধীনতার ঠিক ঊষালগ্নে পূর্ব পাকিস্তানের এক জেলায় জনৈক মুসলিম লীগ কর্মীর উচ্ছ্বাস ছিল, "মুসলিম ভারত তার হারানো সাম্রাজ্য ফিরে পেতে যাচ্ছে।"[৬৩] অতীত কালের ঐতিহ্যের দোহাই দিয়ে লীগ চেষ্টা করতে লাগলো মুসলমানদের বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক প্রবণতাকে একটি জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংগঠিত করতে।

একটি পৃথক রাষ্ট্র যখন প্রকৃত অর্থেই জন্ম নিল, তখন তা অনেকটা বৃটিশপ্রদত্ত উপহার হয়ে দাঁড়ালো। স্বাধীনতা দিবসে প্রকাশিত স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় একে ঔপনিবেশিক শাসকদের বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ সংগ্রামের মাধ্যমে জাতির অর্জনের পরিবর্তে বৃটিশের অমূল্য উপহার হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার এই সম্মতিভিত্তিক পরিবর্তন পাকিস্তানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পরিণাম বয়ে নিয়ে এলো। বৃটিশ ভারতে যে পদ্ধতিতে গভর্নর জেনারেল নিয়োগ করা হতো সেই পদ্ধতি অবলম্বন করে ১৫ আগস্টে জিন্নাহ পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল উপাধি ধারণ করলেন। তিনি গণপরিষদের সভাপতির পদ গ্রহণ করলেন এবং একই সাথে মুসলিম লীগের সভাপতির পদেও বহাল থাকলেন। যুক্তপ্রদেশ মুসলিম লীগের একজন নেতা লিয়াকত আলী খান প্রধানমন্ত্রীর পদ অলঙ্কৃত করলেন।

বাংলার বেশ কিছু স্বনামধন্য মুসলিম লীগ নেতা দেশবিভাগ এবং স্বাধীনতার পূর্ববর্তী ঘটনাপ্রবাহের পরিণামে রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে উৎখাত হয়ে যান। অবিভক্ত বাংলার

---

৬০. Talukder Maniruzzaman, "National Integration and Political Development in Pakistan", *Asian Survey*, December 1967, Vol. 7, No. 12.

৬১. Keith Callard, "The Political Stability of Pakistan", *Pacific Affairs*, Vol. xxix, No. 1, 1956, 8

৬২. Rafiuddin Ahmed, *Bengal Muslim, 1871-1906* (Delhi 1981), xxii

৬৩. Speech by Manjurul Huq, Chairman, Reception Committee of Sub-divisional Muslim League Conference held on 4 May 1947, Umar (ed.), Delhi, 19

প্রধানমন্ত্রী এইচ. এস. সোহরাওয়ার্দী মুসলিম লীগের সংসদীয় দল থেকে নেতৃত্বচ্যুত হয়ে তাঁর সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করলেন ইতিমধ্যে অবনতিশীল বাঙালি হিন্দু ও মুসলমানের সম্পর্ককে উন্নত করার জন্য। যখন দাঙ্গাবিধ্বস্ত কলকাতা শহরকে স্বাধীনতাপরবর্তী বিজয়োৎসবের আনন্দ আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল, তখন তিনি এক দরিদ্র মুসলমানের জীর্ণগৃহে অনশনরত গান্ধীজীর অনশন ভাঙানোর চেষ্টা করছিলেন। ফজলুল হক, যিনি যুগ যুগ ধরে বাঙালি মুসলমানদের নেতৃত্ব দিয়ে আসছিলেন, তিনি জিন্নাহর কূটকৌশলের দরুন বাংলার মুসলিম লীগের রাজনীতিতে প্রভাব-প্রতিপত্তি হারিয়ে কলকাতায় নিজের বাসভবনে পরাজয়ের মর্মবেদনা নিয়ে কালাতিপাত করছিলেন। মুসলিম লীগের সেক্রেটারি আবুল হাশিম, যিনি মৃতপ্রায় এই সংগঠনটিকে একটি কর্মপরিকল্পনা ও প্রাদেশিক কর্মসূচির ঘোষণাপত্র দিয়ে এর উদ্যমী তরুণ ছাত্র-সদস্যদের উজ্জীবিত করেছিলেন, তিনিও দেশবিভাগের সময়কার গোলযোগ ও বিভ্রান্তির শিকার হন। তিনি তখন সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে একটি সার্বভৌম বাংলাদেশ গড়ার জন্য তাঁর সমস্ত কর্মোদ্যোগ নিয়োগ করেন। অবশ্য এই লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়ে তিনি অবশেষে বর্ধমানে তাঁর গ্রামের বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করেন। আসামের মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট মওলানা ভাসানী, যিনি পূর্ববঙ্গ থেকে আসামে এসে বসবাসকারী মুসলমান কৃষকদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, পূর্ব পাকিস্তানের অংশ হিসেবে আসামের জেলা সিলেটকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন, তিনিও দেখতে পেলেন, স্বাধীনতা-উত্তরকালে নতুন মুসলিম লীগের দলীয় বিন্যাসে তাঁর কোন স্থান নেই এবং অল্প দিনের মধ্যেই তিনি আসাম সরকারের কারাগারে বন্দি হলেন। শেখ মুজিবুর রহমান ও আবুল মনসুর আহমদ বঙ্গদেশ বিভক্ত হওয়ার পর কলকাতায় থেকে যান। আতাউর রহমান খান, কামরুদ্দীন আহমেদ, শামসুল হক প্রমুখ ঢাকাভিত্তিক বিশিষ্ট মুসলিম লীগ নেতা তখন স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লীগের নতুন কেন্দ্র ঢাকার নবাববাড়ী 'আহসান মঞ্জিল' থেকে তাঁদের দূরত্ব পরিমাপ করে চলেছেন।[৬৪] তাঁদের প্রত্যেকেই স্বাধীনতা-উত্তরকালে বিরোধী দলীয় রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

খাজা নাজিমুদ্দিন এবং মওলানা আকরাম খাঁ যথাক্রমে প্রাদেশিক সরকার ও মুসলিম লীগের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রাক্তন ঔপনিবেশিক গভর্নর স্যার ফ্রেডারিক বোর্ন স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর নিযুক্ত হন। মূলত মুসলিম লীগ তিনটি কেন্দ্রের কাছে বাঁধা পড়ে। এগুলো হচ্ছে নেতৃত্বের জন্য আহসান মঞ্জিল, প্রচারের জন্য দৈনিক আজাদ, অর্থের জন্য ইস্পাহানির বাণিজ্যিক সংস্থা।[৬৫] সংক্ষেপে এই ছিল তদানীন্তন মুসলিম লীগের

৬৪. কামরুদ্দীন আহমদ, *বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ*, ২য় খণ্ড, ১৯৭৫, ৯০। ব্যানার্জী বঙ্গবিভাগের দরুণ বাঙালি মুসলিম অভিজাত সম্প্রদায়ের হতভম্ব দশার বিবরণ দিয়েছেন অতিরঞ্জিতভাবে। সম্ভবত তাদের কিছু অংশের বেলায় একথা আংশিকভাবে সত্য ছিল। দেখুন, D N Banerjee, *East Pakistan* (Delhi 1969), 45.

৬৫. ঐ, 21.

স্বরূপ। ভারতের মুসলমানদের একমাত্র মুখপাত্র হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে বৃটিশ রাজ এই সংগঠনের কাছেই তার রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তর করে।

## পাঁচ

মার্ক্সীয় ধারার লেখাও পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতে এক অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়ে যায়। ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবিকে সমর্থন করতো এবং মুসলিম লীগের স্বজাতির প্রতিনিধিত্ব করার দাবিকেও স্বীকার করতো।[৬৬] কিন্তু পাকিস্তানের অভ্যুদয়ের সাথে সাথেই কমিউনিস্টদের মোহমুক্তি ঘটে। জাতীয়তাবাদীদের সাথে তাদের সম্পর্ক ক্রমেই উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠে এবং পরিণামে তাদের যাত্রাপথ ভিন্ন হয়ে যায়। তারা কেবল পৃথক পথ বেছে নিয়েই ক্ষান্ত হয় নি, সশস্ত্র সংঘর্ষের মাধ্যমে পরস্পরকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়। এ পর্যায়ে কমিউনিস্টদের উচ্চকিত শ্লোগানে বলা হয়, 'এ স্বাধীনতা মিথ্যা'। পরবর্তীকালে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক স্বাধীনতার মার্ক্সীয় ব্যাখ্যায় প্রাথমিক মুহূর্তগুলির তিক্ততার ছাপ লক্ষ্য করা যায়।

এমনকি বেশ কয় বছর পর কেউ কেউ স্বাধীনতার বাস্তবতাকে অস্বীকার করে একে তুলনা করেছে "সাদা হাতীর কালো মাহুত" অথবা "নতুন বোতলে পুরনো মদ"-এর সঙ্গে।[৬৭] স্বাধীনতার মোহভঙ্গ আমূল সংস্কারকামীদের কাছে এত গভীরপ্রসারী হয়েছিল যে, তারা একে অন্ধ যুগের আবির্ভাবের সাথে তুলনা করেছেন।[৬৮] প্রায় দুই যুগ পরে ১৯৭১ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির খুলনা শাখার প্রাক্তন সদস্য ধনঞ্জয় দাস ১৯৪৭ সালের আগস্টে স্বাধীনতা দিবস উদযাপনে অংশ নিয়েছিলেন বলে খেদ প্রকাশ করেছেন।[৬৯] সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত বরিশালের এক মুসলমান কমিউনিস্টের আত্মজীবনীতে বৃটিশ শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভে তার অনুভূতির কথা কিছুই লেখা হয় নি।[৭০] বহু সংস্কারবাদীর কাছেই রাজনৈতিক স্বাধীনতার অর্থ আর কিছুই নয়, শাসনকাঠামোর বাহ্যিক রূপের পরিবর্তন এবং বৃটিশ, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সমন্বিত যোগসাজশের ফলশ্রুতি মাত্র। যেমন একজন সক্রিয় কমিউনিস্ট বিদ্রূপের সাথে লিখেছেন : "কিছু পরিবর্তন হয়েছে বটে, বৃটিশ পুলিশের স্থলে ক্যাম্প স্থাপন করেছে পাকিস্তানী পুলিশ।"[৭১]

৬৬. P C Joshi, "They Must Meet Again". Bombay, Sept. 1944, 7, as cited by Shri Prakash in "CPI and the Pakistan Movement", in Bipin Chandra (ed.) *The Indian Left* (Delhi 1983)

৬৭. আবদুস শহীদ, *আত্মকথা,* ১ম খণ্ড (ঢাকা ১৯৮৪), ১৪৬। আরও দেখুন, আবদুল মতিন, *মওলানা হামিদ খান ভাসানী প্রসঙ্গে* সংকলিত শাহরিয়ার কবির (সম্পাদিত), *মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক জীবন ও সংগ্রাম* (ঢাকা ১৯৭৮), ১৪৭।

৬৮. সরদার ফজলুল করিম, *নানা কথার পরের কথা,* ঢাকা, ৫।

৬৯. ধনঞ্জয় দাস, আমার জন্মভূমি স্মৃতিময় বাংলাদেশ, (কলকাতা ১৯৭১), ১৩।

৭০. আবদুস শহীদ, *আত্মকথা,* ১ম খণ্ড (ঢাকা ১৯৮৪), ১৪৮।

৭১. নুকুল মল্লিক, *আমার জীবন ও ডুমুরিয়ার কৃষক আন্দোলন* (ঢাকা ১৯৮০), ৩৪।

কমিউনিস্ট আন্দোলনের অপর এক সক্রিয় কর্মী পাকিস্তানের প্রতি বাঙালি মুসলমানের সমর্থনকে সনাক্ত করেছেন এইভাবে : "পাকিস্তান দাবির প্রতি পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের জোরালো ও সক্রিয় সমর্থন রয়েছে।" সেই সাথে তিনি যুক্ত করেছেন : "যদিও এ দাবি ভুল ছিল কিংবা এতে সচেতনতার অভাব ছিল, তথাপি পূর্ব বাংলার খেটে খাওয়া মুসলমান জনগোষ্ঠী পাকিস্তানকে তাদের নিজস্ব ভূমি হিসেবেই গ্রহণ করেছে।"[৭২] পাকিস্তান সম্পর্কে কমিউনিস্ট সাহিত্যের প্রবণতা হচ্ছে অনিচ্ছাসত্ত্বেও গণসচেতনতাকে 'ভ্রান্ত হলেও সত্য' বলে মেনে নেয়া।

পূর্ব বাংলার সমাজের অপর গুরুত্বপূর্ণ অংশ বর্ণ হিন্দু সম্প্রদায়ের অধিকাংশই জাতীয় কংগ্রেসের ছত্রছায়ায় সংগঠিত ছিল। তাদের প্রতিক্রিয়া এবং প্রত্যাশাও পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক জটিলতায় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিল। প্রথমেই ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট অর্জিত রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রতি লাহিড়ীর প্রতিক্রিয়া দিয়ে শুরু করা যাক :

> বলা যায়, ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট জেলা কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্ট অনেকটা ফাঁদে পড়েই মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্টের সাথে সম্মিলিতভাবে (পাকিস্তানী) পতাকা উত্তোলনে বাধ্য হলেন। মনে হয়, এই সংস্থাকে কেবল অপমানিত করার উদ্দেশ্যে এটা করা হয়েছিল, যে সংস্থার অবিচল দাবি ছিল অখণ্ড ভারতবর্ষের স্বাধীনতা... এতে বাঙালি বিপ্লবীদের পক্ষে আনন্দিত হওয়া ছিল কঠিন ব্যাপার।[৭৩]

পাকিস্তানের সৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথে এক আকস্মিক পরাজয়, হতাশা ও বিশ্বাসভঙ্গের অনুভূতি পূর্ববঙ্গের উচ্চ সম্প্রদায়ের হিন্দু গোষ্ঠীর মনকে ভারাক্রান্ত করলো। একজন হিন্দু নেতা তাঁর মোহভঙ্গের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে : হিন্দুরা কখনো পাকিস্তান চায়নি। পাকিস্তানকে তাদের উপর জোরপূর্বক চাপিয়ে দেয়া হয়েছে।[৭৪] ঢাকার একজন প্রবীণ কমিউনিস্ট কর্মী জ্ঞান চক্রবর্তী উল্লেখ করেন যে, হিন্দুদের কাছে গোড়া থেকেই পাকিস্তান অগ্রহণযোগ্য ছিল এবং স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরপরই বিপুল সংখ্যক হিন্দু দেশত্যাগ করে। তাঁর বক্তব্য অনুসারে, এই সম্প্রদায়ের প্রায় সকল সরকারি কর্মচারীই সেই সময় পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করে।[৭৫] কিছু স্থানে হিন্দু পেশাজীবীদের প্রতিক্রিয়া এত বেশি তিক্ত ছিল যে, দেশত্যাগের পূর্বে তাঁরা সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর পর্যন্ত করেছিল। অজয় ভট্টাচার্যের ভাষ্য অনুযায়ী, সিলেট হাসপাতালের হিন্দু কর্মচারীরা হাসপাতালের সম্পদ ভাঙচুরের পর সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে চলে যায়।[৭৬] খবর পাওয়া যায় যে মুন্সিগঞ্জ সাব-জেলের

---

৭২. অমল সেন, *নড়াইলের তেভাগা সংগ্রামের সমীক্ষা* (ঢাকা ১৯৮০), ৩৪।

৭৩. Lahiry, *India Partitioned*, 2-3.

৭৪. Letter from S. Bhattacharya, President Hindu Sevak Sangha, Sylhet, on 7 October, 1947, Home Political Bundle, Dhaka.

৭৫. জ্ঞান চক্রবর্তী, *ঢাকা জিলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত যুগ* (ঢাকা ১৯৭২), ১৩১, আরও দেখুন, সত্যেন সেন, *মনোরমা মাসামা* (ঢাকা ১৯৭০), ১২৭।

৭৬. অজয় ভট্টাচার্য, *নানকার বিদ্রোহ*, ২য় খণ্ড (ঢাকা) ১৪৭।

হিন্দু কেরানী ও বন্দিরা স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে বরাদ্দ 'বাড়তি রেশন'-এর কোটা বর্জন করে।[৭৭] সমাজের 'নেতৃস্থানীয় শ্রেণী'[৭৮] উচ্চতর বর্ণের হিন্দুরা রাতারাতি তাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা হারালো এবং বঙ্গবিভাগ তথা ১৯৪৭ সালের ভয়ানক দিনগুলোর মর্মান্তিক অনুভূতিসঞ্জাত হতাশা, তিক্ততা ও মোহভঙ্গ এক লক্ষণীয় ইতিহাস সৃষ্টি করলো, সে ইতিহাস যদিও এই নিবন্ধের আওতার বাইরে।[৭৯]

লাহিড়ীর অভিমানসূচক অভিব্যক্তিতে প্রতিফলিত হয়েছে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উচ্চবর্ণের হিন্দুর ব্যর্থতাবোধ, যা পূর্ব বাংলায় সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে প্রভাবশালী হওয়া সত্ত্বেও অধিক সংখ্যক হিন্দুর মনে জাগ্রত হয়েছিল। এমনকি হিন্দু সমাজের নিম্নবর্ণের নির্যাতিত শ্রেণী সাংবিধানিক রাজনীতির পরিমণ্ডলে তাদের ভাগ্যকে বাংলার মুসলমানদের হাতে ছেড়ে দিয়েছিল।[৮০]

তবু পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন ধারার সাম্যবাদী রাজনীতিতে যুক্ত বহু হিন্দু এখানেই থেকে যাওয়ার এবং পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক জীবনে অবদান রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। এঁদের অন্যতম ত্রৈলোক্য নাথ চক্রবর্তী লিখেছেন :

> আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে, আমি দেশত্যাগ করবো না, আমি পাকিস্তানেই থেকে যাব। পাকিস্তানের জনগণের সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়ে এখানেই আমি থেকে যাব। এই দেশ পূর্ব বাংলা আমার দেশ ... কেন আমি এই দেশ ত্যাগ করবো ?[৮১]

তাঁর মতো মনোভাবসম্পন্ন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কমিউনিস্টও এদেশে থেকে যান পরবর্তীতে পূর্ব পাকিস্তানের কারাগারসমূহে দীর্ঘ বছরগুলোর দুর্ভোগপূর্ণ বন্দিত্ব বরণ করে নেয়ার জন্য।

উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহেও অস্থিরতা লক্ষ্য করা যায়, যেখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, বিশেষত গারোরা মনে করে যে নতুন রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের ব্যাপারে কোন নির্দিষ্ট নীতিমালা নেই। অতএব, একমাস শেষ না হতেই ময়মনসিংহের পার্শ্ববর্তী এলাকার উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর একটি স্মারকলিপি পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর

৭৭. Jail Bundle, B-progs, February, 1956, Nos 1-18.

৭৮. ঢাকায় হিন্দুরা ছিল মোট জনসংখ্যার ৫৯% এবং স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে ঢাকার ধন-সম্পদের ৮৫%-এর মালিক। দেখুন, Jayanta Kumar Ray, *Democracy and Nationalism on Trial*, 35; EBLA progs, vol. 1, no. 4, 15; Sugata Bose, *Agrarian Bengal, Economy, Social Structure and Politics 1920-47* (London, 1986) 230.

৭৯. হিন্দু রাজনীতির এই দিক সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন, Muhammad Golam Kabir, *Minority Politics in Bangladesh* (Delhi 1980).

৮০. ঐ, Jogen Mondol's letter of Resignation, Appendix v.

৮১. শ্রী ত্রৈলোক্য নাথ চক্রবর্তী (মহারাজ), *জেলে ত্রিশ বছর ও পাক-ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম* (ময়মনসিংহ ১৯৬৮), ৩৬১।

কাছে পেশ করা হয়।[৮২] এই স্মারকলিপি উত্থাপিত হয় ১৯৪৭ সালের ২৪ আগস্ট উত্তর ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটের রাংরাপাড়ায় আয়োজিত উপজাতীয়দের সমাবেশে। সেখানে উপস্থিত প্রায় ৪০০০ লোক তাদের বসতি অঞ্চলের একত্রীকরণ দাবি করে। এর মধ্যে ছিল ময়মনসিংহের অধীন ৫টি থানা এবং ঐ এলাকা সন্নিহিত ভারতের আসাম প্রদেশ।[৮৩] বৃটিশ রাজ কর্তৃক গৃহীত জাতিভিত্তিক নতুন রাষ্ট গঠনের সিদ্ধান্ত সংখ্যালঘু জাতিসমূহকে তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণ ও স্বাধীনতার দাবি জানানোর সুযোগ করে দিল। বৃটিশরাজের এই দেশবিভক্তি গারো সম্প্রদায়ের উপজাতীয় নেতা ও জনগণকে অনুপ্রাণিত করলো উপজাতি সম্প্রদায়গুলিকে সংগঠিত করে এই দাবি জানাতে। সমতলের গারোরা যে কারণে অস্থিরতার শিকার হয় তা এই যে স্বেচ্ছাচারী রেডক্লিফ রোয়েদাদ মোতাবেক জোরপূর্বক দেশবিভাগের মাধ্যমে একটি ধর্মীয় রাষ্ট্র সৃষ্টির ফলে পাহাড়ী গারোরা ভারতীয় ভূখণ্ডের আওতাভুক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে।

র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদের মাধ্যমে দেশবিভাগের দ্বারা গারোদের দু'টি অংশের ঐতিহাসিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়, অথচ এ ব্যাপারে তাদের সাথে কোন আলোচনাই করা হয়নি। স্বাধীনতার সময়ে উপজাতীয়দের আশা ও ভীতি যে বিতর্কিত বিষয়গুলির জন্ম দিয়েছিল, তা আজও বাংলাদেশের রাজনীতিতে গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়।

## ছয়

স্বাধীনতার বড় বড় বুলির প্রকৃত অর্থ ভিন্নতর হয়ে যায় যখন আমরা স্বাধীনতাদিবসে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতিক্রিয়া বিবেচনা করি। তাজউদ্দীন আহমদ মন্তব্য করেন : "যখন রাত নেমে এলো এবং আনন্দোৎসব শেষ হলো, তখনো ঢাকার রাজপথে বহুলোক রয়ে গেল, যাদের অধিকাংশই বিজয়োৎসবে অংশ নেয়ার জন্য পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহের গ্রামগুলি থেকে ঢাকায় এসেছিল।"[৮৪] রাজশাহী থেকে লাহিড়ী লিখেছেন : "দিনের আলো বাড়ার সাথে সাথে শত শত, হাজার হাজার দরিদ্র মানুষ শহরে প্রবেশ করতে লাগলো।"[৮৫] সমান সংখ্যক হিন্দু-মুসলমান মিলে প্রায় ১ লক্ষ লোক ঢাকায় স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের জন্য উপস্থিত হয়। তাজউদ্দীন ১৫ আগস্ট লক্ষ্য করেন, অধিকাংশ লোকই জেলার বাইরের গ্রামবাসী। তারা এসেছিল সুদূর কুমিল্লা ও ময়মনসিংহ থেকে 'পাকিস্তান'-এর বাস্তব

৮২. Home Political Bundle, B-progs, October, 1950, No. 516.

৮৩. গারো সম্প্রদায় সম্পর্কে আরো জানার জন্য দেখুন, Pierre Bassaignet, "Tribes of the Northern Border of East Pakistan" in Bassaignet (ed.) *Social Research in East Pakistan* (Dacca 1960), 150-52; আরো দেখুন, গৌতম ভদ্র, *'পাগলাই ধূম': ময়মনসিংহের কৃষক বিদ্রোহ, শারদীয় অনুষ্টুপ* (কলিকাতা ১৯৮৬)।

৮৪. *ডায়েরী, দলিল*।

৮৫. Lahiry, *India Partitioned*, 1.

রূপায়ণ দেখার জন্য। তাদের অবস্থান গ্রামে, যেখানে ভৌগোলিক গতিশীলতা স্বাভাবিকভাবেই ছিল যথেষ্ট সীমাবদ্ধ।[৮৬] শুধুমাত্র মুক্তির অনুভূতিই তাদের টেনে এনেছিল ঢাকায়, নতুন ক্ষমতার কেন্দ্রস্থলে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমরা সেই রাতে ঢাকার পথে 'আগত জনগণ' সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানি না। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই দিবসের অনুষ্ঠানসমূহে অংশ নিয়েছে কোন অনভিপ্রেত ঘটনা ছাড়াই। সারাদেশেই তাদের সৌভ্রাতৃত্বপূর্ণ মৈত্রী ছিল অন্তত বাহ্যিকভাবে সুস্পষ্ট।

ঢাকায় তাজউদ্দীন ও লাহিড়ী উভয়েই বিচলিত হয়েছিলেন জনগণের অত্যধিক উচ্ছ্বাসের প্রকৃতি লক্ষ্য করে। তাজউদ্দীন নেতাদের বক্তৃতা শুনার জন্য আগত জনগণের মধ্যে নিয়ম-শৃঙ্খলার অভাব দেখে অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন। "তারা এসেছিল নেতৃবৃন্দের বক্তব্য শুনতে এবং কোথাও আসন গ্রহণ না করে তারা ভিড় করছিল।"[৮৭] লাহিড়ী জানান যে এদের কেউ ট্রেনে টিকিট করার প্রয়োজন বোধ করেনি।[৮৮] তাজউদ্দীন আরো লক্ষ্য করেন যে যারা ঢাকায় এসেছিল 'তাদেরকে ট্রেনের ভাড়া দিতে হয়নি।' এসব উচ্ছৃঙ্খল আচরণ মধ্যবিত্ত জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের কাছে ছিল অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক।

এছাড়া আরো বহু বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। একটি সরকারি রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় যে, ১৯৪৭-এর ১১ সেপ্টেম্বর মুন্সিগঞ্জ সাব-জেল থেকে ৮৩ জন বন্দি পালিয়ে যায়। এরা সকলেই স্বাধীনতা দিবসে মুক্তিলাভ করবে বলে আশা করেছিল।[৮৯] স্বাধীনতা অর্জনকে আরো কতিপয় বন্দি মুক্তিলাভের এবং পরবর্তীতে আত্মউন্নয়নের সুযোগ বলে মনে করেছিল। ১৯৪৭-এর ১৪ সেপ্টেম্বর আজাদ পত্রিকার রিপোর্টে বলা হয় :

> ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের প্রায় সব বন্দিই এই মুহূর্তে অনশন ধর্মঘট পালন করছে। এই বন্দিরা স্বাধীনতা উপলক্ষে মুক্তি প্রার্থনা করেছিল। তারা কায়েদ-ই-আজম এবং খাজা নাজিমুদ্দিনের কাছে মুক্তির জন্য আবেদন জানায় যাতে তাদের নিজেদের চরিত্র সংশোধনের সুযোগ তারা পায়।[৯০]

স্বাধীনতাকে ব্যাপকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল বৃটিশ শাসন সংশ্লিষ্ট পুলিশ ও রাষ্ট্রীয় সকল প্রতিষ্ঠানের অবলুপ্তির উপলক্ষ হিসাবে। জেলা পর্যায়ের একজন মুসলিম লীগ কর্মী আতাউর রহমান খানকে একজন প্রবীণ গ্রামবাসী জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "এখন যখন পাকিস্তান অর্জিত হয়েছে, এরপরও কি দেশে পুলিশ, কোর্ট-কাছারি, সৈন্য-সেন্ট্রি, জেল এবং লকআপের অস্তিত্ব থাকবে ?" খান উত্তর দিয়েছিলেন, "কেন নয় ? এসব প্রতিষ্ঠান ছাড়া রাষ্ট্রকে রক্ষা করবেন কিভাবে ?" হতভম্ব সেই বৃদ্ধ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেছিলেন, "তাহলে কোন ধরনের পাকিস্তান আমরা পেলাম ? দয়া করে এর নামটি পাল্টে ফেলুন। আপনারা এর নাম দেবেন পাকিস্তান অথচ অনাচার আর দুর্নীতিকেও প্রশ্রয় দেবেন!"[৯১]

৮৬. ১৯৪১ সালের আদমশুমারি অনুসারে প্রতি ১০০০ জনের মধ্যে কেবল ৯৯ জন শহরের বাসিন্দা ছিল। দেখুন, Nafis Ahmad, *Statesman*, 15 August 1947, Supplement, Calcutta.
৮৭. *ডায়েরী, দলিল*।
৮৮. Lahiry, *India Partitioned,* 1.
৮৯. Jail Bundle, B-progs, February 1956, Nos. 1-18.
৯০. *আজাদ*, ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭, কলকাতা।
৯১. আতাউর রহমান খান, *স্বৈরাচারের দশ বছর* (ঢাকা ১৯৪৭), ৪৫।

উক্ত বৃদ্ধ রাষ্ট্রীয় ঔপনিবেশিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে, বিশেষকরে পুলিশ এবং আদালতকে স্বাধীনতার মূল্যবোধের অন্তরায় বলে মনে করেছিলেন। অবশ্য এ ধরনের প্রতিক্রিয়ার পেছনে বহু যৌক্তিক কারণও ছিল। পালিত লিখেছেন, "নালিশ, সওয়াল-জবাব ও সাক্ষ্য প্রদানের সম্পূর্ণ পদ্ধতিটিই বস্তুত" ছিল গরিবের জন্য বর্জনীয়, এর কারণ খরচ, বিলম্ব, হয়রানি ও লিখিত দরখাস্ত পেশ করার আনুষ্ঠানিকতা।[৯২] ময়মনসিংহের উপজাতীয় কৃষক বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে ভট্টাচার্য লক্ষ্য করেন যে কৃষকরা প্রায়শ আদালতের মামলার মাধ্যমে তাদের জমি হারাতো।[৯৩] কিন্তু সমস্যা শুধু উপজাতীয় কৃষকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, মুসলমান কৃষকরাও জমি সংক্রান্ত মামলায় প্রচুর অর্থ খোয়ায়।[৯৪] এই শতকের প্রথম দশকে বঙ্গীয় ব-দ্বীপের কৃষকদের অবস্থা সম্পর্কে লিখতে গিয়ে পানান্দীকর লক্ষ্য করেন যে, কৃষিকাজে লাভের একটি বড় অংশ "মামলা-মোকদ্দমায় নষ্ট হয়।"[৯৫] স্বাধীনতার পরপরই শেখ মুজিবুর রহমান এবং নাঈমুদ্দিন আহমেদ ব্যথিত চিত্তে লক্ষ্য করেন যে, ঔপনিবেশিক আদালতের যাঁতাকলে পিষ্ট কৃষকরা রাস্তার ভিক্ষুকে পরিণত হয়েছে।[৯৬] এমনকি ১৯৪০ সালে ফ্লাউড কমিশন এই মর্মে মন্তব্য করে যে, আদালতে মামলা-মোকদ্দমার কারণে অনেক ভাগচাষী তাদের জমি হারিয়েছে।[৯৭] আইন-আদালতের উপর অনগ্রসর শ্রেণীর জনগণের খুব কমই আস্থা ছিল। ৩০-এর দশকের প্রথম দিকের মালদহের উপজাতি বিদ্রোহের নেতা জিতু সাঁওতাল মন্তব্য করেছিলেন, "ইংরেজ রাজ" ছিল "নিপীড়নকারী", কারণ "সরকারি আদালতে বিচার পাওয়া যায় না।"[৯৮]

বিচার বিভাগের অন্যতম সহযোগী প্রতিষ্ঠান পুলিশ বিভাগ ছিল সমভাবে ভীতিপ্রদ। ইসলাম লিখেছেন, "জনগণ (ঢাকা জেলার বদরপুরের) ছিল পুলিশের ভয়ে ভয়ংকরভাবে ভীত।" স্বাধীনতার আগে লাল পাগড়ী দেখে (ইংরেজ আমলে পুলিশ লাল পাগড়ী পরতো) জনগণ নিকটবর্তী ধানক্ষেত কিংবা ঝোপের আড়ালে পালাতো।[৯৯] পূর্ববঙ্গ পুলিশ কমিটির রিপোর্টে বলা হয়, "স্বাধীনতার পূর্ববর্তী প্রায় অর্ধশতকে কখনোই পুলিশ জনগণের আস্থা অর্জন করতে পারে নি।[১০০] পুলিশ হচ্ছে ন্যূনতম বেতনভোগী চরম

৯২. Chittabrata Palit, *Tensions in Bengal Rural Society* (Calcutta 1975), 81.

৯৩. Jnanbrata Bhattacharyya, "An Examination of Leadership Entry in Bengal Peasant Revolts, 1937-1947", *Journal of Asian Studies*, August, 1978, Vol xxxvii, No. 4, 626.

৯৪. উমর, *দলিল*, ৭৭।

৯৫. S G Panandikar, *The Wealth and Welfare of the Bengal Delta* (Calcutta 1926), 150.

৯৬. শেখ মুজিবুর রহমান এবং নাইমুদ্দিন আহমেদ, *পূর্ব পাকিস্তানের দুর্ভাগা জনসাধারণ* (ঢাকা ১৯৪৮),২।

৯৭. R K Mukherjee, *Dynamics of a Rural Society* (Berlin 1957), 30.

৯৮. Tanika Sarkar, "Jitu Santal's Movement in Malda, 1924-1932: A Study in Tribal Protest' in Ranajit Guha (ed.) *Subaltarn Studies*, Vol. iv (Delhi 1985), 159.

৯৯. A K M Aminul Islam, *Bangladesh Village Conflict and Cohesion* (Cambridge, Massachusetts 1974), 104.

১০০. Report of the East Bengal Police Committee, 1953, East Bengal Government Press, Dhaka, 1954, 5.

দুর্নীতিগ্রস্ত ও নিষ্ঠুর, সকলের অপ্রিয় হিসেবে পরিচিত এবং ইংরেজ আমলের দমন-পীড়নের মূর্তিমান প্রতীক হিসাবে স্মরিত।[১০১] পূর্বোল্লেখিত কৃষকের রাজনৈতিক প্রত্যাশা ছিল এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের অবলুপ্তি।

সাধারণ মুসলমান কৃষকের আদর্শিক ভাবনায় পাকিস্তান স্থান পেয়েছে একটি নতুন নৈতিক মূল্যবোধের ভিত্তিভূমি হিসেবে, যেখানে পারস্পরিক অধিকারের এবং বিচারের নৈতিকতা সামাজিক জীবনের উপর কর্তৃত্ব করবে। সামাজিক উচ্চ শ্রেণী এবং ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের সদস্যদের দ্বারা যুগ যুগ ধরে অবদমিত হওয়ার ফলে তারা 'পাকিস্তান' নামটিকে একটি পবিত্র অনুভূতির মধ্যে স্থাপন করেছিল। একজন জনপ্রিয় কবি তাঁর কবিতায় পাকিস্তানের মাটিতে মিথ্যাচার ও অনাচার পরিত্যাগ করার জন্য জনগণকে আহ্বান জানান।"[১০২]

ঐতিহ্যগতভাবে মুসলমান কৃষকগণ যে সুপরিচিত দমন-পীড়নের শিকার হতো, তা ছিল শ্রেণীগত এবং জাতিগত বা ধর্মীয় উভয়ই। মহাজন এবং জমিদারদের অধিকাংশই ছিল হিন্দু। ১৯৪৭ সালে বাংলায় ২২৩৭টি বড় জমিদারির মধ্যে ৩৫৮টি ছিল মুসলমান জমিদারি।[১০৩] মহাজনদের অধিকাংশই জাতিতে ছিলেন বণিক ও তেলি, যারা খাতক মুসলমান জনগোষ্ঠীর নিপীড়নকারী বলে গণ্য হতেন। এরা ছিলেন ঋণ গ্রহণকারী মোট কৃষকগোষ্ঠীর ৯০ শতাংশ।[১০৪] সুদের হার ছিল কম-বেশি ১২ থেকে ২৮০ শতাংশ, কখনো কখনো তারও বেশি।[১০৫] এই শতকের প্রথম দিকে কৃষকগোষ্ঠীর ঋণ গ্রহণের পরিমাণ ছিল নিম্নে পানান্দীকর প্রদত্ত পরিমাণের চেয়ে অনেক বেশি। তিনি হিসাব করেছেন যে, ৩৯১৮৯৪ পরিবারের মধ্যে ১৮৫,৮৬৯টি পরিবার ঋণী ছিল এবং মোট ঋণের পরিমাণ ৪$\frac{১}{৩}$ লক্ষ টাকা। অনুমান করা হয়, ফরিদপুর জেলায় মোট ঋণ ছিল ২৩০ লক্ষ টাকা, যা মাথাপিছু ১১ টাকা কিংবা মোটামুটিভাবে সমগ্র পরিবারের বার্ষিক আয়ের এক-পঞ্চমাংশ।[১০৬] ১৯৩৭ সালে ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৯ কোটি টাকা; সালিশী বোর্ডের নিকট মামলা দায়ের করা হয় ৪ লক্ষ।[১০৭] এর বাইরে ছিল জমিদার ও তার লোকদের 'আবওয়াবের' মাধ্যমে জোরপূর্বক অর্থসম্পদ আহরণ। প্রদত্ত খাজনার বাইরে

১০১. Tanika Sarkar, "National Movement and Popular Protest in Bengal, 1928-1934", Unpublished Ph.D. Thesis, Delhi University, 1980, 8.
১০২. কাজী আবুল হোসেন, *জিন্নাহনামা* (ঢাকা ১৯৬১) (পরিবর্ধিত সংস্করণ), ৯০।
১০৩. D N Wilber, Pakistan : Its People, Its Society, Its Culture (New Haven 1964), 219.
১০৪. কে. এম শমসের আলী, *প্রশাসনিক সংস্কারে সরকারী কর্মচারির ভূমিকা;* নিলুফার বেগম সম্পাদিত, *স্মৃতিচারণ প্রবীণ প্রশাসকের অভিজ্ঞতা,* (ঢাকা ১৯৮৪), ৭৯।
১০৫. দেখুন, Hashmi, Thesis, 40.
১০৬. দেখুন, Panandikar, *The Wealth and Welfare,* 181
১০৭. EBLA, progs. Vol. 1, No. 3, 34.

কৃষকের কাছ থেকে খাজনা আদায় খরচ এবং জমিদারের নিযুক্ত প্রতিনিধিদের খরচ উঠাতে যে অর্থ আদায় করা হতো সেটাই আবওয়াব। তা ছাড়াও বিশেষ আবওয়াব, যেমন খালবান্দি (বাঁধ খরচ), দাখিলা খরচ (খাজনা আদায় খরচ), পোল খরচ (সেতু তৈরি), ডাক খরচ, ভান্ডারী খরচ (হাট-বাজারের রক্ষণাবেক্ষণ), শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, চিকিৎসালয় ও মন্দির রক্ষণাবেক্ষণ খরচ, সাদিয়ানা (জমিদারবাড়ির বিবাহ খরচ) এবং সর্বশেষ বেগার খরচ (মজুরিবিহীন শ্রম) আদায় করা হতো। ব্যক্তিগতভাবে পালকি ব্যবহারের অনুমতিলাভের জন্য ১০ থেকে ২৫ টাকা এবং ছাতা ব্যবহার, হাতিতে চড়া কিংবা পুকুর খনন করতে ২০ থেকে ৪০ টাকা খাজনা প্রদান করতে হতো।[১০৮] কোন কোন জেলায়, যেমন বরিশালে, আবওয়াব ছিল মূল খাজনার এক-চতুর্থাংশ কিংবা তারো বেশি।[১০৯]

মুসলমান কৃষকদের সর্বপ্রকার সামন্তবাদী বৈষম্যমূলক নিপীড়ন সহ্য করতে হতো। অবৈধভাবে উচ্ছেদ, আকস্মিক অগ্নিকাণ্ড এবং জমিদারের লোকজন কর্তৃক ঘরবাড়ি ভেঙে ফেলা এসবেরই শিকার হতো তারা, যখন তারা খাজনা দিতে দেরি করতো অথবা জমিদারের আদেশ-নির্দেশ পালনে অস্বীকার করতো কিংবা বিদ্রোহ করতো। ইসলাম উল্লেখ করেছেন যে, বদরপুরে আইন অমান্যের জন্য সাধারণ কৃষককে বেত কিংবা জুতো দিয়ে পিটানো হতো, পক্ষান্তরে অপেক্ষাকৃত ভালো অবস্থাসম্পন্ন কৃষককে কেবল জরিমানা করা হতো।[১১০] নড়াইল মহকুমার জগপুর গ্রামের মুসলমান কৃষকগণ হিন্দু জমিদার দ্বারা কী ধরনের বৈষম্যমূলক কঠোর সামাজিক নির্যাতনের শিকার হতো সে বিষয়ে সিদ্দিকী বর্ণনা করেছেন :

> "সমগ্র গ্রামের জমির মালিক সাতজন জ্বাতিদারের (জোতদার) মধ্যে একজন মাত্র ছিলেন মুসলমান (এবং সেও একজন ক্ষুদ্র জ্বাতিদার)... অধিকাংশ মুসলমান ছিল হিন্দু মালিকদের জমির ভাগচাষী এবং দিনমজুর। এর সাথে হিন্দুত্বের প্রচলিত ব্যাখ্যা (মুসলমানরা নীচ শ্রেণীর হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত) মুসলমান এবং দিনমজুর এই উভয় শ্রেণীকে আরও হীন করেছিল এবং গাঁয়ের মুসলমান প্রজাদের বিভিন্ন সামাজিক বৈষম্যমূলক নিপীড়নের শিকারে পরিণত করেছিল; তাদের 'ছোটলোক' (নীচ শ্রেণীর মানুষ) বলে প্রকাশ্যে সম্বোধন করা হতো; ... যদি কোন মুসলমান কোন ব্রাহ্মণের বাড়ি অতিক্রম করতো, তাহলে ঐ অপবিত্র স্থানটি পানি ও গোবর ছিটিয়ে শুদ্ধ করা হতো।

সিদ্দিকী আরো উল্লেখ করেছেন যে, একজন বৃদ্ধ গ্রামবাসী ১৯৪০ সালের একটি ঘটনা এখনো মনে রেখেছেন, যে ঘটনায় একজন মুসলমান বালক হিন্দু জ্বাতিদারের আম বাগানে প্রবেশ করার কারণে জ্বাতিদার কর্তৃক প্রহৃত হয়।[১১১] বস্তুত সব শ্রেণীর কৃষকরাই মাটিতে মাদুর অথবা বেঞ্চের উপর বসতো, এমনকি অনেক জমিদার তার কাছারির

১০৮. Panandikar, *The Wealth and Welfare*, 102.

১০৯. Hashmi, Thesis, 31.

১১০. Aminul Islam, *Bangladesh Village*, 99.

১১১. Kamal Siddiqui, *The Political Economy of Rural Poverty in Bangladesh* (Dhaka 1983), 257

(জমিদারি অফিস) পাশ দিয়ে জুতো পরে যাতায়াত করতে কিংবা জমিদারির মধ্যে ঘোড়া বা হাতিতে চড়তে অনুমতি দিতেন না। কোন কোন জমিদার আবার জমিদারির প্রজাদের কুয়া, পুকুর কিংবা পাকা বাড়ি তৈরির অনুমতি দিতেন না। হিন্দু জমিদার প্রায়শ মুসলমান প্রজাকে গরু জবাই করতে দিতেন না।[১১২] প্রখ্যাত জাতীয়তাবাদী নেতা আবুল মনসুর আহমদ এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ, যাঁরা সচ্ছল অর্থনৈতিক শ্রেণীভুক্ত ছিলেন, তাঁরাও ছোটবেলায় হিন্দু জমিদার ও বর্ণ হিন্দুদের নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। এমন কিছু তিক্ত সামাজিক বৈষম্যের কথা তাঁরা তুলে ধরেছেন, যার মাধ্যমে মুসলমান প্রজাদের উপর সামাজিক নিপীড়নের মাত্রাটি কেবল অনুভব করা যায়।[১১৩] ইসলাম এবং সিদ্দিকী উভয়েই উপসংহার টেনেছেন এই বলে যে, এইসব ঘটনাই গ্রামীণ পূর্ববঙ্গে বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনীতির পথ সুগম করেছিল।

অতীতের স্বর্ণযুগ ফিরে আসবে বলে বিশ্বাসে উদ্দীপ্ত হয়ে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে 'পাকিস্তান'-এর ধারণার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হতো। এই বিশ্বাসের প্রবক্তারা বেশ্যালয়, মদ ও জুয়ার অবলুপ্তি সাধনের আহ্বান জানাতেন এবং এজন্য ইসলামী বিধান কার্যকর করতে চাইতেন।[১১৪] মুসলিম লীগের সভা ও মিছিলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠে "কৃষককে ভূমিদান" এবং "ঋণের অবসান" প্রভৃতির প্রতিশ্রুতিভিত্তিক স্লোগান।[১১৫] যখন কলকাতার এক শ্রমিক জিন্নাহকে বলেন, "তাঁরা (হিন্দু নেতারা) বলে যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবে ধনীদের জন্য, দরিদ্রদের জন্য নয়", তখন জিন্নাহ বলেন, "যদি বৃটিশরা চলে যায় এবং ঐ এলাকা (বাংলা) পাকিস্তানে পরিণত না হয়, তাহলে হিন্দুরা কোন দিনই জমিদারের জোয়াল থেকে মুসলমানদের মুক্তির জন্য কোন আইন সৃষ্টি করতে দেবে না।"[১১৬]

চট্টগ্রামের এক জনসমাবেশে নাজিমুদ্দিন শপথ করে বলেন, "যদি পাকিস্তান অর্জিত হয়, তখন আপনার সন্তান মুন্সেফ হবে, ম্যাজিস্ট্রেট, ডেপুটি ও দারোগা হবে।"[১১৭] আইয়ুব খান, যিনি স্বাধীনতার পরপরই ঢাকায় কর্মরত ছিলেন, স্মৃতিচারণ করেন, "তারা (জনগণ) ভেবেছিল [স্বাধীনতা পেলে] তাদের জীবনে আর কোন সমস্যা থাকবে না।"[১১৮] তাই এটি মোটেই আশ্চর্যজনক নয় যে, পূর্ব পাকিস্তানের জন্মের পরপরই তাঁতী সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ সরকারের কাছে তাদের নতুন সামাজিক স্বীকৃতি ও সামাজিক অবস্থানের উত্তরণ দাবি

১১২. Hashmi, Thesis, 53.

১১৩. আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা,* ১৪; চৌধুরী কুদরাত-ই-গণি, *উন্নয়ন ও আমলাতান্ত্রিক রাজনীতি*; সংকলিত, নিলুফার বেগম (সম্পা.) *স্মৃতিচারণ* (ঢাকা ১৯৮৪); কামরুদ্দীন আহমদ, *আত্মবিকাশ,* ১ম খণ্ড, ৭০।

১১৪. EBLA, progs. Vol. 1. No. 3, 155. আরো দেখুন, উমর, *দলিল,* ৩৫।

১১৫. আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা,* ২৮৪।

১১৬. Sirajuddin Hossain, *Mirror,* 1.

১১৭. সাঈদ-উর-রহমান *রাজনীতি ও কবিতা,* ১০।

১১৮. Ayub Khan, *Friends,* 79.

করে। রাজনৈতিক স্বাধীনতার আলোকে তারা এই দাবিকে যুক্তিযুক্ত ও বৈধ মনে করেছে।[১১৯]

গুরুত্বপূর্ণ কৃষক আন্দোলন চলাকালে পাকিস্তান অর্জিত হয়। এ আন্দোলন হচ্ছে ঐতিহাসিক তেভাগা আন্দোলন বা বর্গাচাষীদের সংগ্রাম এবং খাজনা প্রদানের জন্য টংক ও নানকার প্রথার বিলোপ আন্দোলন। রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পূর্বের দশকে পূর্ব বাংলার প্রায় সমগ্র পূর্বাঞ্চল এবং আসামের অংশবিশেষ, প্রধানত সিলেট জেলা বিভিন্ন প্রকৃতি ও মাত্রার কৃষক আন্দোলনের আওতায় ছিল। স্বাধীনতার পূর্ববর্তী পূর্ব পাকিস্তানের সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণেই এসব আন্দোলনের উদ্ভব ঘটে। এসব আন্দোলনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ভাগচাষীদের আন্দোলন, যা তেভাগার লড়াই নামে বহুল পরিচিত। উৎপাদিত ফসলের উপর জমির মালিকের অংশ অর্ধেকের বদলে এক-তৃতীয়াংশে নামিয়ে আনার দাবিকে কেন্দ্র করে এই আন্দোলন। বস্তুত সুনির্দিষ্টভাবে আন্দোলনকারী কৃষকদের এই দাবির কারণে আন্দোলনের নামও হয়েছে তেভাগার লড়াই। বামপন্থী ঐতিহাসিকদের মতে, বিভাগপূর্ব বাংলার উনিশটি জেলায় ছড়িয়ে পড়া এই আন্দোলনে ষাট লক্ষ কৃষক অংশ গ্রহণ করে।[১২০] কোন কোন ঐতিহাসিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণকারী কৃষকদের উপরোক্ত সংখ্যার সঠিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন।[১২১] আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী কৃষকদের সংখ্যা সংক্রান্ত এই বিতর্ক কোনভাবেই বর্গাচাষীদের দ্বারা পরিচালিত আন্দোলনের গুরুত্বকে খাটো করে না, যে আন্দোলন পরবর্তীতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বাংলা প্রদেশের কৃষক ফ্রন্ট প্রাদেশিক কৃষকসভা কর্তৃক সমর্থিত হয় এবং এর সাহায্য লাভ করে। একজন খ্যাতনামা কৃষকসভাকর্মী এই আন্দোলনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এই আন্দোলনকে "এমন একটি বিরাট ঘটনা" বলে অভিহিত করেছেন, যা গ্রামবাংলাকে আন্দোলিত করেছিল।[১২২]

এই আন্দোলন জমিদারি উচ্ছেদ কিংবা ব্যাপক প্রচলিত বর্গাচাষ প্রথা ধ্বংস করার লক্ষ্য স্থির করেনি, যা ১৯৩০-এর দশকের শেষের দিকে সমগ্র বাংলার কৃষিজমির এক-পঞ্চমাংশ এবং কৃষিভিত্তিক পরিবারের ৩৫ শতাংশের জন্য বর্গাচাষকে একটি প্রজাস্বত্ব ব্যবস্থায় পরিণত করে। বর্গা নামে সমধিক খ্যাত বর্গাচাষ এবং উৎপাদনের অন্যান্য পদ্ধতির চাষ হয়েছিল, বিনয় চৌধুরীর বর্ণনানুসারে, "অকৃষিকরণ প্রক্রিয়ায়" মাধ্যমে। এর ফলে রায়তী জমি কমে যাচ্ছিল এবং অকৃষক শ্রেণী এইসব রায়তদের হস্তচ্যুত জমি হস্তগত করছিল। এভাবে রায়ত কমছিল, বর্গাদার বাড়ছিল। কৃষকদের ঋণগ্রহণ এবং তার

১১৯. Home Pol. Bundle Memo No. 60; এটা পার্থ চ্যাটার্জীর উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর প্রদানে সহায়তা করবে। প্রশ্নটি ছিল, জমিদারি আধিপত্য থেকে নিজেদের মুক্ত করার আকাঙ্ক্ষার চেয়ে তাদের পাকিস্তান দাবি কি আরো সুনির্দিষ্ট ছিল না? দেখুন, Partha Chatterjee, *Bengal, 1920-1947*, vol. 1, *The Land Question* (Calcutta 1984), 171.

১২০. আবদুল্লাহ রসুল, *কৃষকসভার ইতিহাস*(কলিকাতা ১৯৬৯) ১৫৪।

১২১. Hashmi, Thesis, 308; Also Jnanbrata Bhattacharyya, "Leadership Entry".

১২২. ভবানী সেন, *বাঙ্গালী তেভাগা আন্দোলন, তেভাগা স্মারক* (কলিকাতা ১৯৭৩), ৫।

ফলে মহাজন কর্তৃক জমি জবরদখল অকৃষিকরণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ।[১২৩] বর্গাচাষ বিষয়ে কোন রকম স্বার্থ না থাকা সত্ত্বেও অকৃষিকরণের এই পদ্ধতিগুলি বিপুল সংখ্যক ভূমিহীন ও প্রায় ভূমিহীন কৃষিমজুরকে এই আন্দোলনে টেনে আনে।

হাশমীর মতে, জোতদার ও মহাজনসহ ক্ষুদ্র ভূস্বামীদের মোকাবিলায় পরিচালিত এই আন্দোলন শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্র ও প্রকৃত কৃষকের মধ্যকার সকল মধ্যস্বত্বভোগী বিলোপ করার লক্ষ্য নির্ধারণ করে।[১২৪] এই আন্দোলনের প্রভাব গ্রামীণ জীবনে গণতন্ত্র চর্চার যে সুযোগ সৃষ্টি করেছিল তাও কতিপয় বামপন্থী নেতার দৃষ্টি এড়ায় নি, যদিও ঐতিহাসিকগণ কেবলমাত্র এই আন্দোলনের অর্থনৈতিক লক্ষ্যের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন।[১২৫] ভবানী সেনের মূল্যায়নে তেভাগা আন্দোলন সফল হয়েছিল; কারণ ৪০ শতাংশ ভাগচাষী ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ ভাগ লাভে এবং বাকি ৬০ শতাংশ কৃষকের আবওয়াব বা ঋণের সুদ মওকুফ করাতে সমর্থ হয়। যারা তেভাগা লাভে সমর্থ হয় নি, তারাও সরকারের উপর অধিকতর চাপ প্রয়োগে ভূমিকা পালন করে, যার ফলে সরকার ন্যূনতম বর্গাচাষীদের দাবিদাওয়া অন্তর্ভুক্ত করে একটি সংসদীয় বিলের সুচনার কথা ঘোষণা করে।[১২৬] এটুকু অর্জন করতে প্রকৃতপক্ষে অনেক মূল্য দিতে হয়। প্রায় ৫০০০ কৃষক বন্দি এবং ৫০ জন কৃষক শহীদ হয়।[১২৭] পক্ষান্তরে একজন ভূস্বামীরও মৃত্যুদণ্ড হয়নি কিংবা কৃষক কর্তৃক তাদের ঘরবাড়ি ভস্মীভূত হয়নি। কৃষকদের দ্বারা এই ধরনের দমন-পীড়ন কৃষক বিদ্রোহের সময় প্রায়শ পরিলক্ষিত হয়।[১২৮]

তেভাগা আন্দোলনের চেয়ে প্রকৃতিগতভাবে ভিন্ন টংক আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল মূলত উপজাতীয় কৃষকদের মধ্যে, প্রধানত ময়মনসিংহ জেলার উত্তরাঞ্চলের হাজংদের মধ্যে। হাজার হাজার হাজং উপজাতীয় কৃষকের সমর্থিত এই আন্দোলন ৫০ মাইল দীর্ঘ এবং ১০ মাইল বিস্তৃত একটি বিশাল এলাকাব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। আন্দোলনকারী কৃষকদের অধিকাংশ হাজং হলেও তাদের সাথে কোচ, হাদি, ডালু এবং বনাই উপজাতীয় কৃষকরাও জড়িয়ে পড়ে।[১২৯] ভট্টাচার্য এই আন্দোলন সম্পর্কে লিখতে গিয়ে আন্দোলনে বিপুল সংখ্যক মুসলমান টংকদারের জড়িত থাকার কথা অগ্রাহ্য করেছেন। তবে এই আন্দোলনের অন্যতম সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ নেতা মনিসিংহ তাঁর আত্মজীবনীতে ১৯৩৭ সালে এই আন্দোলনের শুরুতে মুসলমান কৃষকদের অংশগ্রহণের কথা স্মরণ করেছেন।

১২৩. Jnanbrata Bhattacharyya, "Leadership Entry", 625.
১২৪. Hashmi, Thesis, 316.
১২৫. অমল সেন, *নড়াইল তেভাগা*, ১০৯; রানী দাসগুপ্ত, *তেভাগার লড়াইয়ে কৃষক মেয়েদের ভূমিকা, তেভাগা স্মারক*।
১২৬. ভবানী সেন, *স্মারক*, ১৫।
১২৭. ঐ,১৪-৫।
১২৮. দেখুন, Ranajit Guha, *Elementary Aspect of Peasant Insurgency in Colonial India* (Delhi,1983), Chapter on *Negation.*
১২৯. Janabrata Bhattacharyya, "Leadership Entry", 612.

টংক পদ্ধতি এক ধরনের বর্গাচাষ প্রথা, যা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল, যেমন ধানকরারি, ফুরর কিংবা চুক্তিবর্গা,[১৩০] যেখানে উৎপাদনের একটি নির্দিষ্ট অংশ খাজনা হিসেবে প্রদান করতে হতো। বলা হয়, এই প্রথার উৎস বর্গা প্রথার চেয়ে অধিকতর আধুনিক এবং একজন ঐতিহাসিক এই প্রথার সূচনাকাল শতাব্দীর শুরুতে নির্ধারণ করেছেন।[১৩১] উৎপত্তিগতভাবেই এই আন্দোলন ছিল উত্তরপূর্ব ময়মনসিংহ অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

যে লক্ষ্য নিয়ে টংক আন্দোলন পরিচালিত হয় তা হচ্ছে খাজনা প্রদানের মাধ্যম টংক-এর পরিবর্তে নগদ টাকায় রূপান্তর, যার পরিমাণ ছিল অনেক কম; এতে বর্গাচাষীদের উৎপাদিত শস্যের এক-তৃতীয়াংশ দেয়া হলেও তা ছিল নগদ টাকায় খাজনা প্রদানকারী সাধারণ কৃষকদের দেয় অংশের চেয়েও ৫০০ ভাগ বেশি।[১৩২] ১৯৪৭ সালে প্রতি একর টংক জমির খাজনা ছিল ৪০-৭০ টাকা; পক্ষান্তরে ঐ একই পরিমাণ জমির সাধারণ খাজনা ছিল মাত্র ৬ টাকা। প্রতি একরে টংক খাজনা ছিল ৩ মণ ৩৩ সের ধান, যা অ-টংক জমির খাজনার চেয়ে ৮ গুণ বেশি।[১৩৩] স্বাধীনতাপূর্ব ভারতের বিধানসভার একজন বামপন্থী সদস্য সোমনাথ লাহিড়ী এই আন্দোলনকে "গরিব কৃষকদের উন্নতির জন্য বৈধ" বলে বর্ণনা করেছেন। টংক প্রথা বাতিলের সংগ্রামে ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৪৭ সালের জানুয়ারি মাসের মধ্যে ২ জন মুসলমান কৃষকসহ অসংখ্য হাজং এবং ডালু উপজাতীয় কৃষক তাদের জীবন উৎসর্গ করেছেন।[১৩৪]

অন্যদিকে নানকার বিদ্রোহের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল বর্গাচাষীর কায়িক শ্রম প্রদান প্রথার বিলোপ সাধন। এই প্রথায় এক একর জমির একজন বর্গাচাষীকে জমির মালিকের বাড়িতে মাসে পাঁচ থেকে সাত দিন বেগার খাটতে হতো; জমির মালিক ডাকা মাত্রই কৃষক তার স্বীয় প্রয়োজন-অপ্রয়োজন নির্বিশেষে কাজ করতে বাধ্য হতো। নানকার জমির উপর বর্গাচাষীর কোন অধিকার ছিল না।[১৩৫] নানকার কৃষকের প্রাত্যহিক নির্দেশিত কাজ এত বেশি ছিল যে সেই কাজ করতে তার পুরো পরিবারকে শ্রম দিতে হতো, অন্যদিকে তার নিজস্ব যে ছোট্ট এক টুকরো জমি থাকতো, যা দিয়ে তার পুরো পরিবারের বাৎসরিক ভরণপোষণ চলতো, তার খুব কমই পরিচর্যা সে করতে পারতো, ফলে তার উৎপাদন কমতো।

১৩০. মনি সিং, *জীবন সংগ্রাম*, ৪৬।

১৩১. Binay Bhushan Choudhury, "The Process of Depeasantisantion in Bengal and Bihar, 1885-1947," *India Historical Review*, ii,i, 1975, 105-165, 146-52.

১৩২. Sunil Sen, *Agrarian Struggle in Bengal*, 1946-47 (New Delhi 1972), 78.

১৩৩. উমর, *ভাষা আন্দোলন*, ২য় খণ্ড, ৬০-১।

১৩৪. উমর, ভাষা আন্দোলন, ২য় খণ্ড, ৬০-১।

১৩৫. *Cross Roads*, 1 Sept. 1950, As cited in Yu V Gankovosky and L R Gordon, Polonsky, *A History of Pakistan* (Lahore, n.d.), 141.

জমিদারের কাজ না করলে শারীরিক নির্যাতন ছিল প্রাত্যহিক বিষয় এবং সময় নষ্ট করা হলে নষ্ট সময় পুষিয়ে নিতে আরো অনেক বেশি কাজ দেওয়া হতো। জমিদার কিংবা জমিদারবাড়ির পুরুষ সদস্যদের দ্বারা প্রায়শ নানকারদের স্ত্রী এবং যুবতী মেয়েরা যৌন নির্যাতনের শিকার হতো এবং এই অবস্থা নিরসনে ব্যক্তিগত কিংবা দলগতভাবে প্রতিরোধ ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। এই ধরনের প্রতিরোধের জন্য চরম মূল্য দিতে হতো— বাস্তুচ্যুত হওয়া থেকে জমিদারের 'গুণ্ডারাহিনী' কর্তৃক হত্যা পর্যন্ত। ১৯৪৬ সাল ও ১৯৪৭ সালের প্রথমার্ধের মধ্যে এই বর্বর প্রথা সিলেট জেলার অধিকাংশ গ্রাস করে। ত্রিশ লক্ষ জনসংখ্যা অধ্যুষিত এই জেলার জনসাধারণের ১০ শতাংশ এই আন্দোলনে সক্রিয় সমর্থন প্রদান করে।[১৩৬]

রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের সঙ্গে কৃষক বিপ্লবের 'ভূমি ও খাজনা' প্রশ্নটি পর্যায়ক্রমে প্রশমিত করে পরে একেবারেই খারিজ করে দেওয়া হয়। স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি এবং বঙ্গবিভাজন কমিউনিস্ট কর্মীদের মতানুসারে কৃষকদের জমিদার ও রাষ্ট্রের কর্মচারীদের সঙ্গে বিরোধিতা থেকে সরে আসার মূল কারণ ছিল। সক্রিয় কৃষক কর্মীরা এবং কৃষকসভার সদস্যগণ বিশ্বাস করতো, পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া অপ্রয়োজনীয়। তাদের প্রত্যাশা ছিল যে, জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরের পর তাদের দাবি মেনে নেবে। এমনকি ভাগচাষীদের আন্দোলনের উপর সাম্প্রতিক লেখালেখিতেও তার সাক্ষ্য মেলে। কুপার বিশ্বাস করেন, এ ধরনের প্রত্যাশা তেভাগা আন্দোলনকে দুর্বল করেছিল।[১৩৭]

মুসলিম লীগের নেতৃত্ব খোলাখুলিভাবে জনসমক্ষে কথা দিয়েছিল যে, তারা জমিদারি প্রথার বিলুপ্তি ঘটাবে এবং অন্যান্য কৃষি বিষয়ক সংস্কার সাধন করবে। কতিপয় প্রধান আঞ্চলিক নেতা কৃষকদের প্রত্যাশার পরিমাণকে আরো বাড়িয়ে তুলেছিলেন। গিয়াসুদ্দিন পাঠান ছিলেন ময়মনসিংহের একজন অন্যতম লীগ নেতা। শোনা যায়, মুসলমান ভাগচাষীরা, যারা কৃষকসভার সাংগঠনিক নেতৃত্বে আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিল, তাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছিলেন, তেভাগার পিছনে তাদের সময় ও শ্রম অপচয় করা উচিত নয়; যেহেতু পাকিস্তানের অভ্যুদয় আর বেশি দূরে নয়, তারা তাদের উৎপাদিত পণ্যের পুরোটাই অর্থাৎ চৌভাগই পাবে। মনি সিহের ভাষ্য অনুযায়ী, এ কথায় যাদুমন্ত্রের মতো কাজ হয়। কৃষকরা জমিদারদের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত শস্য ফিরিয়ে দিল।[১৩৮] বস্তুত মুসলিম লীগ ভাগচাষীদের দাবিদাওয়া মেটানোর জন্য কিছু পদক্ষেপ নিয়েছিল, যা গ্রামীণ জীবনে প্রগতিশীল পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

১৩৬. অজয় ভট্টাচার্য, *নানকার বিদ্রোহ,* ২য় খণ্ড, (ঢাকা), ২৩৪।

১৩৭. Adrienne Cooper, Thesis, 375.

১৩৮. মনি সিং, *সংগ্রাম,* ৯৭।

১৯৪৭-এর ২২ জানুয়ারি "দি বেঙ্গল বর্গাদার বিল", যা অল্পদিনের মধ্যেই সমগ্র প্রদেশে তেভাগা পদ্ধতি উপস্থাপন করতো, কলকাতা গেজেটে প্রকাশিত হয়। এই বিল খুব ফলপ্রসুভাবে বিক্ষোভ প্রশমিত করে। যদিও প্রতিক্রিয়ার তারতম্য ঘটে, মোদ্দা কথা এই যে, আইন প্রণয়নের প্রতিশ্রুতি আন্দোলনের প্রচণ্ডতাকে থিতিয়ে দেয়।[১৩৯] ভাগচাষীদের বিল কৃষি ব্যবস্থায় এক ধরনের প্রভাবক হিসাবে কাজ করেছে এবং একই সাথে আসন্ন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সম্পর্কে আশা ও ভীতির জন্ম দিয়েছে। এই বিলটি মুসলমান কৃষকদের নিকট মুসলিম লীগের ভাবমূর্তিকে অনেক উঁচু করে তোলে, যদিও বিলটি পাশ করানোর জন্য কার্যকর কিছুই করা হয়নি। এমন কথাও বলা হয়ে থাকে যে, খাজা নাজিমুদ্দিনের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রাদেশিক পর্যায়ের মুসলিম লীগ নেতা ব্যক্তিগত পর্যায়ে জমিদারদের সাথে যোগাযোগ করে তাদের স্বার্থ পুরোপুরি সংরক্ষণের আশ্বাস দিয়েছিলেন।[১৪০] একটি জাতীয় সরকারের সম্ভাবনা সিলেট জেলায় নানকারদের চলমান সক্রিয় আন্দোলনে ছেদ ঘটায়। অজয় ভট্টাচার্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ কর্মীরাও স্বীকার করেন যে, সিলেটের সাধারণ জনগণের প্রত্যাশা এবং ধারণা ছিল, নানকার সংকট আপোসের মাধ্যমেই সমাধান করা হবে যদি জনগণ পাকিস্তানের প্রতি তাদের সমর্থন অটুট রাখে।[১৪১]

এই একই সম্ভাবনা হিন্দু নানকারদের মধ্যেও হতাশার সৃষ্টি করে। পরিস্থিতি আরো বেশি জটিল হয়ে উঠে যখন উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা পাকিস্তানের জন্মের পরই তড়িঘড়ি করে দেশত্যাগ করে ভারতে চলে যায়। এদের কাছ থেকে অল্প হলেও যে সমর্থন পাওয়া গিয়েছিল, তা তখন আর থাকলো না।[১৪২] একজন কৃষকসভাকর্মী হাজী মোহাম্মদ দানেশ বলেন যে, হিন্দুরা ভেবেছিল, মুসলমানদের দেশ পাকিস্তানে তারা অসহায় হয়ে পড়বে।[১৪৩] হিন্দু ও মুসলমান নানকারদের মধ্যে একটি পার্থক্য পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠে পাকিস্তান অথবা ভারতের অংশ হওয়ার প্রশ্নে সিলেটে গণভোট অনুষ্ঠিত হওয়ার সময়, যা সহজে পরিণত হতে পারতো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়। এরই সাথে যুক্ত হলো করিমগঞ্জ থানার বিভাজন, যা ছিল আন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্রস্থল এবং এর ফলে আন্দোলনের ভবিষ্যৎ নিয়ে সৃষ্টি হলো অনিশ্চয়তা।[১৪৪]

## আট

যখন পাকিস্তানের জন্ম হয়, পূর্ব বাংলা তখন দুর্ভিক্ষের কবলে। তারপরও একটা লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, মুসলমান কৃষকরা তাদের হিন্দু ভাইদের মতো সেই সময়ে

১৩৯. Cooper, Thesis, 376.

১৪০. কামরুদ্দীন আহমদ, *আত্মবিকাশ* ১ম খণ্ড, (ঢাকা ১৯৭৫), ১১৬-৭।

১৪১. অজয় ভট্টাচার্য, *নানকার,* ২য় খণ্ড, ১৬৭।

১৪২. ঐ, ২৫১।

১৪৩. Cooper, Thesis, 380.

১৪৪. অজয় ভট্টাচার্য, *নানকার,* ২য় খণ্ড, ২৪৩।

দেশত্যাগ করেনি। *স্বাধীনতা* পত্রিকার একটি রিপোর্টে বলা হয় : "পাকিস্তান অর্জিত হযেছে। মুসলমানরা প্রত্যাশা করে, দ্রব্যমূল্য নেমে আসবে। তারা দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ নিয়ে ততোটা চিন্তিত নয়। তারা দেশত্যাগ করেও চলে যাবে না।[১৪৫] একজন সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী আবদুস শহীদ স্মরণ করেন কিভাবে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও জাতীয় নেতৃত্বের প্রতি আস্থাশীল হয়ে বহু লোক আসন্ন দুর্ভিক্ষের মোকাবেলা করেছে।[১৪৬] রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রাপ্তির আনন্দে চট্টগ্রামের পল্লীগায়ক রমেশ শীল গেয়েছেন :

> ১৯৪৩ সালে সাম্রাজ্যবাদের পীড়নে,
> অনাহারে লক্ষ লক্ষ লোক দিয়েছে জীবন।
> এইবার মোদের স্বাধীন রাষ্ট্র, দুর্ভিক্ষের অন্নকষ্ট
> ঘুচাইয়ে শান্তিরাজ্য কর ভাই স্থাপন।[১৪৭]

১৯৩৭-এর নির্বাচনের পর থেকেই মুসলমান নেতৃবৃন্দ মুসলমানদের ভবিষ্যৎ বাসভূমির ছবি এঁকেছেন। তাঁরা আশা করেন, এমন হবে সে দেশ যেখানে দরিদ্র কৃষকের দুবেলা দুমুঠো খাদ্য পাবার স্বপ্ন সত্যি হবে।[১৪৮] মহা দুর্ভিক্ষের পর 'বিপর্যয়পরবর্তী কল্পরাজ্যের' প্রেক্ষিতে জনগণের কাছে দুমুঠো 'ভাত' পাওয়াই হয়ে দাঁড়ায় পরিপূর্ণতার প্রতীক। Greenough-এর মন্তব্য অনুসারে, বহু কৃষকের জন্য অন্নের সংস্থানই হচ্ছে তাদের স্বাধীনতা।[১৪৯] লীগ কর্মীরা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর এইসব বাস্তব দুর্দশাকেই তাদের রাজনৈতিক প্রচারণার বিষয় করে তুলেন। সাধারণ মুসলমান কৃষকদের আশাবাদ এবং পাকিস্তানকেন্দ্রিক প্রত্যাশা নিঃসন্দেহে পূর্ব বাংলার সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে জাতীয়তাবাদী অনুভূতির প্রতিফলন। তৎকালীন সমাজ ও রাজনীতির চরিত্র বিশ্লেষণ করলে সবদিক দিয়ে প্রকৃত প্রস্তাবে জাতীয়তাবাদ হতে পারতো নিতান্তই একটি উচ্চবর্গীয় চিন্তাভাবনা। কেননা মৃত্যু ও দুর্ভিক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে জাতীয়তাবাদ ছিল বহু বিপরীত পরিস্থিতির একটি, যা দরিদ্রকে আন্দোলনে নামতে বাধ্য করেছিল।[১৫০]

ইসলাম ধর্ম স্বয়ং এবং ইসলামের অন্তর্নিহিত সাম্যবাদী জাতীয়তাবাদ[১৫১] একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শক্তিতে রূপান্তরিত হলো, বিশেষত যখন নিপীড়ক শক্তিকে উচ্চবর্ণ হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসেবে দেখানো হয়েছিল। ইসলাম দৈনন্দিন রাজনীতিতে সেই সময় এতই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, এমনকি ধর্মনিরপেক্ষ দাবিসমূহও ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ দ্বারা ঈষৎ রঞ্জিত হতো। '৫০-এর দশকের সদ্য গঠিত বাংলা ভাষাকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদ ইসলামের

১৪৫. উদ্ধৃত, উমর, *ভাষা আন্দোলন*, ২য় খণ্ড, ৫।
১৪৬. আবদুস শহিদ, *আত্মকথা*, ১৩৭।
১৪৭. পূর্ণেন্দু দস্তিদার, *কবিয়াল রমেশ শীল*, (ঢাকা ১৯৬৩), ৪৯।
১৪৮. Humaira Momen, *Muslim Politics*, 57; Shila Sen, *Muslim Politics*, 80-83, উমর, *দলিল*, ৭৭-৭৯।
১৪৯. Greenough, *Prosperity*, 228.
১৫০. ঐ, Chapter 4.
১৫১. গেলনার ইসলামকে প্রচ্ছন্ন সাম্যবাদ বলে চিহ্নিত করেছেন। দেখুন, Ernst Gellner, *Nations and Nationalism* (England 1993), 17.

সংগঠন ও বাণী থেকে এর বহু ধারণা ও উদাহরণ গ্রহণ করেছিল। এই জাতীয়তাবাদের প্রথম দিককার লেখায় নতুন রাষ্ট্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ওমরের প্রসঙ্গ ও উদাহরণ টেনে আনা হয় এবং তাঁর মতোই একটি আদর্শ সমাজ অর্জন ও প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে কেউ কেউ লিখেছেন "কখন আমরা হযরত ওমরের মতো একজন আদর্শ শাসক পাবো ? কখন আবার সেই চার খলিফার যুগের পুনরাবির্ভাব ঘটবে ?"[১৫২]

মুসলিম লীগের এই প্রচারণা ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করেছিল, কারণ তা মুসলমান কৃষকদের ঐতিহ্যগত ধর্মীয় আনুগত্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল।[১৫৩] লীগ তার প্রচার কার্যক্রম চালাতো সামাজিক আনুষ্ঠানিক সমাবেশগুলির মধ্যে, যেমন জুম্মার নামাজ, মিলাদ মাহফিল, ওয়াজ ও ঈদের জামাত প্রভৃতিতে। এভাবেই সামাজিক জীবনকে রাজনীতির সাথে যুক্ত করে মুসলিম লীগ ঐতিহ্যগত ধর্মীয় আনুগত্যকে একটি রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপান্তরিত করলো, যা কখনো সাম্প্রদায়িক আন্দোলন এবং কখনো বিচ্ছিন্নতাবাদের দ্যোতক প্রতীকের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছে।[১৫৪]

সংক্ষেপে এই হলো বাংলার মুসলমান জনগণের নিজেদের পৃথক বাসভূমি অর্জনের লক্ষ্যে সংগ্রামের পথে তাদের বিশ্বাস, আকাঙ্ক্ষা ও শ্রমলব্ধ অবদানের ইতিহাসের প্রেক্ষাপট। স্বাধীনতা-উত্তরকালে মুসলিম লীগ সম্পর্কে মোহমুক্তি সম্পর্কে ধারণালাভের জন্য মনে রাখা প্রয়োজন জনগণের সে সময়কার নানামুখী আশা ও প্রত্যাশার কথা, যা প্রাথমিক পর্যায়ে লীগকে ক্ষমতাসীন করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকর শক্তি হিসেবে কাজ করেছিল।

১৫২. শেখ মুজিবুর রহমান এবং নাইমুদ্দিন আহমেদ, *দুর্ভাগা জনসাধারণ*, ৭।

১৫৩. দেখুন, Rafiuddin Ahmed, *Bengal Muslims,* কামরুদ্দীন আহমদ, *আত্মবিকাশ* ২য় খণ্ড, ৪৯।

১৫৪. দেখুন, Partha Chatterjee, "Agrarian Relations and Communalism in Bengal, 1926-35"; Ranajit Guha (ed.) *Subaltern Studies;* Vol. 1, Delhi, 1982; আরো দেখুন, যুক্তপ্রদেশের রাজনীতিতে এই প্রবণতার বহিঃপ্রকাশ সম্পর্কে চমৎকার বিবরণ, Gyan Pandey, "Rallying Round the Cow", ঐ, Vol. 2, Delhi, 1983, also Hashmi, Thesis, 44.



# ভাষা আন্দোলন

বদরুদ্দীন উমর*

বৃটিশ ভারত বিভক্ত হয়ে ভারতীয় উপমহাদেশে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ যেসব রাজনৈতিক আন্দোলন করেছিল, সেসবের মধ্যে ভাষা আন্দোলনই ছিল সবচেয়ে ব্যাপক, তীব্র ও গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে এই আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার জনগণের পৃথক অস্তিত্বের চেতনা তথা বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রকাশ ঘটে। ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেই বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি উত্থিত হতে দেখা যায়। ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ একটি প্রবন্ধে বলেন, "যদি বিদেশী ভাষা বলিয়া ইংরেজি ভাষা পরিত্যক্ত হয়, তবে বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণ না করার পক্ষে কোন যুক্তি নাই। যদি বাংলা ভাষার অতিরিক্ত কোন রাষ্ট্রভাষা গ্রহণ করিতে হয়, তবে উর্দু ভাষার দাবি বিবেচনা করা কর্তব্য।"[১]

শুধু সাংস্কৃতিক মহলই নয়, রাজনৈতিক মহলেও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগে ভাষা বিষয়ক কিছু উল্লেখযোগ্য চিন্তাভাবনা ছিল। ১৯৪৪ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের তদানীন্তন সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশিম প্রাদেশিক কাউন্সিলের সামনে পেশ করার জন্য যে খসড়া ম্যানিফেস্টো প্রণয়ন করেছিলেন, তাতে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের বিষয়টি

* প্রাক্তন সহযোগী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১. ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, 'আমাদের ভাষা সমস্যা', *দৈনিক আজাদ*, ১২ শ্রাবণ ১৩৫৪

গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করা হয়েছিল।[২] ১৯৪৭ সালের ৩ জুন বৃটিশ ভারতের সর্বশেষ গভর্নর জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটেন কর্তৃক ভারতবিভাগ সম্পর্কিত রোয়েদাদ ঘোষণার পর মুসলিম লীগের অল্পসংখ্যক বামপন্থী কর্মীর উদ্যোগে জুলাই মাসে ঢাকায় 'গণআজাদী লীগ' নামে একটি রাজনৈতিক গ্রুপ গঠিত হয়।[৩] কামরুদ্দীন আহমদ, মোহাম্মদ তোয়াহা, তাজউদ্দীন আহমদ, অলি আহাদ প্রভৃতি নেতৃস্থানীয় কর্মীর দ্বারা এটি গঠিত হয়। এই গ্রুপ 'আশু দাবি কর্মসূচি আদর্শ' নামে যে ম্যানিফেস্টো প্রকাশ করে তাতে বলা হয় : "মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষাদান করিতে হইবে।[৪] বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। এই ভাষাকে দেশে যথোপযোগী করিবার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বাংলা হইবে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।"[৫] বাংলা পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে এ কথার একটা সম্ভাব্য ব্যাখ্যা এই হতে পারে যে, তখন পর্যন্ত মুসলিম লীগ বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে নি। কাজেই গণআজাদী লীগের সদস্যদের হয়তো ধারণা ছিল যে, পাকিস্তানের দুই অংশে পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন কায়েম হবে এবং তার ফলে পূর্ব পাকিস্তানকে একটি রাষ্ট্রীয় একক হিসেবে গণ্য করা যাবে।

১৯৪৭ সালের ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান যুব কর্মী সম্মেলন নামে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই সম্মেলনে বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করা সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত না হলেও এ বিষয়ে একটি প্রস্তাবে বলা হয় :

> পূর্ব-পাকিস্তান কর্মী সম্মেলন প্রস্তাব করিতেছে যে, বাংলা ভাষাকে পূর্ব-পাকিস্তানের শিক্ষার বাহন ও আইন-আদালতের ভাষা করা হউক। সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হইবে তৎসম্পর্কে আলাপ-আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার জনসাধারণের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হউক এবং জনগণের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হউক।[৬]

১৯৪৭ সালের ২ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় ছাত্র এবং অধ্যাপকের উদ্যোগে তমদ্দুন মজলিস নামে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে এই প্রতিষ্ঠানটি বাংলা ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম ও আইন-আদালতের ভাষা করার পক্ষে প্রচার-প্রচারণা চালায়। ঐ বছরই ১৫ সেপ্টেম্বর 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা-

২. Abul Hashim, *Draft Manifesto of the Bengal Provincial Muslim League*, (প্রকাশক, শামসুদ্দিন আহমেদ, ১৫০, মোগলটুলি-ঢাকা), ৬।

৩. *আশুদাবি কর্মসূচি আদর্শ*, প্রকাশক, কামরুদ্দীন আহমদ, কনভেনার, গণআজাদী লীগ, পূর্ব পাকিস্তান পাবলিশিং হাউস, জুমরাইল লেন, ঢাকা, জুলাই ১৯৪৭।

৪. ঐ, ২২।

৫. ঐ, ২৩।

৬. শামসুল হক, ভূমিকা : 'আমরা গড়িব স্বাধীন সুখী গণতান্ত্রিক পাকিস্তান', পূর্ব পাকিস্তান কর্মী সম্মেলনের পক্ষে শামসুল হক কর্তৃক, ১৫০ মোগলটুলি, ঢাকা হতে প্রকাশিত এবং বলিয়াদি প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ঢাকা হতে এ. এইচ. সৈয়দ দ্বারা মুদ্রিত।

না উর্দু ?' নামে তাঁরা একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। সেই পুস্তিকায় তাঁরা বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার বাহন, আদালতের ভাষা, অফিসের ভাষা ও পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের ভাষা করার কথা বলেন। পুস্তিকাটিতে রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে বলা হয়, "লাহোর প্রস্তাবেও পাকিস্তানের প্রত্যেক ইউনিটকে সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতার অধিকার দেওয়া হয়েছে। কাজেই প্রত্যেক ইউনিটকে তাদের স্ব-স্ব প্রাদেশিক রাষ্ট্রভাষা কি হবে তা নির্ধারণ করবার স্বাধীনতা দিতে হবে।"[৭] উল্লিখিত প্রস্তাবটি তমদ্দুন মজলিসের প্রধান কর্মকর্তা অধ্যাপক আবুল কাসেম কর্তৃক লিখিত হয়েছিল। এছাড়া পুস্তিকাটিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন এবং তৎকালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত *দৈনিক ইত্তেহাদ*-এর সম্পাদক আবুল মনসুর আহমদের ভাষা সম্পর্কিত প্রবন্ধও ছাপা হয়।

১৯৪৭ সালের ৫ ডিসেম্বর ঢাকাতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির অর্থাৎ বিভাগপূর্ব আমলের অখণ্ড বাংলার প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সর্বশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেই বৈঠকে ওয়ার্কিং কমিটি এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, উর্দুকে পূর্ব বাংলার সরকারি ভাষা করা হবে না। এ বিষয়ে কমিটির সভাপতি মওলানা আকরাম খাঁকে সংবাদপত্রে একটি ঘোষণা প্রকাশ করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়।[৮] মুসলিম লীগের এই বৈঠক প্রধানমন্ত্রী* খাজা নাজিমুদ্দিনের সরকারি বাসভবন 'বর্ধমান হাউসে'** অনুষ্ঠিত হওয়ার সময় বহু সংখ্যক ছাত্র ও কয়েকজন শিক্ষক সেখানে উপস্থিত হয়ে বাংলাকে অবিলম্বে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। মওলানা আকরাম খাঁ তাঁদেরকে আশ্বাস দেন যে, তাঁদের দাবি সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করা হবে।[৯]

ইতিপূর্বে করাচীতে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে একটি শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং তাতে অংশগ্রহণের পর পূর্ব পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রী হবিবুল্লাহ বাহার এবং আবদুল হামিদ ঢাকায় প্রত্যাবর্তনের পর ৫ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় বিমানবন্দরে সাংবাদিকদেরকে বলেন যে, উপরোক্ত শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। এই বিবৃতি ৬ ডিসেম্বরের *মর্নিং নিউজে* প্রকাশিত হওয়ার আগের

* তখন প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার প্রধানকেও প্রধানমন্ত্রী বলা হতো।

** বর্তমান বাংলা একাডেমী ভবন।

৭. *পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা- না উর্দু ?* প্রকাশক, অধ্যাপক এম. এ. কাসেম, তমদ্দুন মজলিস, রমনা, ঢাকা। প্রিন্টার এ. এইচ. সৈয়দ, বলিয়াদি প্রিন্টিং ওয়াকর্স, ১৩৭ নং বংশাল রোড, ঢাকা, সেপ্টেম্বর ১৯৪৭।

৮. *Morning News*, December 7, 1947; *দৈনিক আজাদ*, ৭ ডিসেম্বর, ১৯৪৭।

৯. *Morning News* , December 7,1947.

দিন অর্থাৎ ৫ ডিসেম্বর এ. পি. আই. পরিবেশিত ও *মর্নিং নিউজে* প্রকাশিত অপর একটি খবরে বলা হয় যে, শিক্ষা সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে উর্দুকে পাকিস্তানের 'লিংগুয়া ফ্রাঙ্কা' করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, কিন্তু রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নি। সেই সিদ্ধান্তের ভার পাকিস্তান গণপরিষদের উপর অর্পিত হয়েছে।

শিক্ষা সম্মেলনের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ৬ ডিসেম্বর দুপুর ২টার সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে যে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়, সেটি ছিল রাষ্ট্রভাষার দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সর্বপ্রথম সাধারণ ছাত্রসমাবেশ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ, জগন্নাথ ইন্টারমিডিয়েট কলেজ এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা এই বিরাট সমাবেশে যোগদান করে। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ও তমদ্দুন মজলিসের সম্পাদক আবুল কাসেম। এই সমাবেশে যাঁরা বক্তৃতা করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন মুনীর চৌধুরী, আবদুর রহমান, কল্যাণ দাশগুপ্ত, এ. কে. এম. আহসান ও এস. আহমদ। সমাবেশটিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়নের ভাইস প্রেসিডেন্ট ফরিদ আহমদ নিম্নোক্ত প্রস্তাবসমূহ পেশ করেন এবং সেগুলি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় :

১. বাংলাকে পাকিস্তান ডোমিনিয়নের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা এবং পূর্ব-পাকিস্তানের সরকারি ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম করা হোক।

২. রাষ্ট্রভাষা এবং লিংগুয়া ফ্রাঙ্কা নিয়ে যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হচ্ছে তার মূল উদ্দেশ্য আসল সমস্যাকে ধামাচাপা দেওয়া এবং বাংলাভাষা ও পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা।

৩. পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রী ফজলুর রহমান এবং প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রী হবিবুল্লাহ বাহার উর্দু ভাষার দাবিকে সমর্থন করার জন্য সভা তাঁদের আচরণের তীব্র নিন্দা করছে।

৪. সভা 'মর্নিং নিউজ'-এর বাঙালিবিরোধী প্রচার-প্রচারণার প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করছে এবং জনসাধারণের ইচ্ছার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের জন্য পত্রিকাটিকে সাবধান করে দিচ্ছে।"[১০]

এই ছাত্রসভাটি শেষ হওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে ছাত্ররা মিছিল সহকারে বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করে সেক্রেটারিয়েট ভবনে উপস্থিত হয়। সেক্রেটারিয়েট থেকে তারা মন্ত্রী নূরুল আমিন এবং হামিদুল হক চৌধুরীর বাসায় উপস্থিত হয়ে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানায়। এরপর মিছিলটি প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দিনের বাসভবনে উপস্থিত হয়। ইতিপূর্বে প্রাদেশিক মন্ত্রী মোহাম্মদ আফজাল এবং নূরুল আমিন বাংলা ভাষার দাবি সমর্থন

---

১০. ঐ।

করার প্রতিশ্রুতি দিলেও[১১] নাজিমুদ্দিন সে ধরনের কোন প্রতিশ্রুতি দিতে অসম্মত হন। সে সময় তিনি অসুস্থ থাকার অজুহাতে ছাত্রদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অক্ষমতা জানান এবং সেই সঙ্গে তাঁদের কাছে পাঠানো একটি লিখিত নোটে বলেন যে, মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি ও পার্লামেন্টারি পার্টির মতামত না জানা পর্যন্ত তিনি ভাষার প্রশ্নে কোন সুনির্দিষ্ট মত প্রকাশ করতে পারবেন না।[১২] শিক্ষা সম্মেলন সম্পর্কে ঢাকা বিমান বন্দরে হবিবুল্লাহ বাহারের সাক্ষাৎকার সম্পর্কিত যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল তার প্রতিবাদ করে ১১ ডিসেম্বর তিনি সংবাদপত্রে এক বিবৃতিতে বলেন যে, তাঁর বক্তব্য বিকৃত করা হয়েছে এবং তিনি সে সময় বলেছিলেন যে, রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত সম্মেলনে নেওয়া হয় নি।[১৩]

শিক্ষা সম্মেলনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে অন্যান্য স্থানে যে সময় বিক্ষোভ ও প্রতিবাদসভা অনুষ্ঠিত হতে থাকে, সে সময় সিলেটের কিছু সংখ্যক নাগরিক উর্দুর সমর্থনে খাজা নাজিমুদ্দিনের কাছে একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন। স্মারকলিপিটিতে বলা হয় :

> একদল লোক নিজেদেরকে বিরাট সাহিত্যিক, শিল্পী ও পণ্ডিত বলে জাহির করে উর্দুর বিরুদ্ধে দারুণ প্রচারণা শুরু করেছে। পূর্ব বাংলার লোকেরা একটি জাতি, এই উদ্ভট ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা উর্দুকে জাতীয়তাবিরোধী ও বিদেশী ভাষা হিসেবে বর্জন করতে বদ্ধপরিকর হয়েছে। সীমিত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেশপ্রেমের মুখোশ পরে তারা বাংলাকে পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার জন্যে চারিদিকে তোলপাড় আরম্ভ করেছে। জনমতের প্রতিনিধিত্ব করার ভাব দেখিয়ে তারা নিজেরাই বাংলার মতো এমন এক ভাষার দাবি তুলেছে যে ভাষার একটি মুসলিম রাষ্ট্রের জাতীয় ভাষার মর্যাদা লাভের মতো যোগ্যতা একেবারেই নেই। মুসলিম সংস্কৃতির গৌরবময় ঐতিহ্যবাহী উর্দু ভাষাকে বর্জন করার এই নির্লজ্জ প্রচেষ্টা যে শুধু ধ্বংসাত্মক তাই নয়, তা পশ্চাদমুখী, নিন্দনীয় এবং সর্বোপরি সর্বজনীন ইসলামী ভ্রাতৃত্বের প্রতি চ্যালেঞ্জ স্বরূপ।[১৪]

স্মারকলিপিতে তাঁরা আরও বলেন :

> পবিত্র কোরআন এবং অন্যান্য ইসলামী সাহিত্য থেকে প্রেরণাপ্রাপ্ত উর্দু ভাষাকে অবহেলা করে আমরা যদি প্রধানত রামায়ণ, মহাভারত, উপনিষদ, বেদ এবং অন্যান্য সংস্কৃত সাহিত্য থেকে প্রেরণাপ্রাপ্ত বাংলা ভাষার দিকে যাই, তাহলে আমরা আমাদের জাতীয় সত্তাকেই অস্বীকার করবো। পৃথক সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং দৃষ্টিভঙ্গী গঠিত ভারতের মুসলমানদের পৃথক জাতিত্বের উপর ভিত্তি করেই পাকিস্তান ধারণার জন্ম। ভারতীয় মুসলমানদের জাতীয় ভাষা এবং ইসলাম ও আধুনিক বিজ্ঞান বিষয়ক সাহিত্যে সমৃদ্ধ উর্দুই পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়ার জন্য সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ভাষা।[১৫]

১১. ঐ।
১২. ঐ, December 10, 1947
১৩. ঐ, December 13, 1947.
১৪. ঐ, December 19, 1947.
১৫. ঐ।

এই স্মারকলিপিতে দাবি করা হয় যে, যাঁরা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার সপক্ষে ওকালতি করছেন তাঁদের মতের সঙ্গে জনসাধারণের মতের কোন মিল নেই। আসলে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার কথা যারা বলছেন তাঁরাই জনমতের প্রতিনিধি। এ প্রসঙ্গে তাঁরা সিলেট জেলা মুসলিম ছাত্র ফেডারেশন, শর্ষিনায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের কনফারেন্স, সিলেটের সাপ্তাহিক পত্রিকা *যুগভেরী*, আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন উপাচার্য ডক্টর জিয়াউদ্দিন, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ফজলুর রহমান প্রমুখের উর্দু সমর্থনের কথা বলেন। তাঁদের মতে, উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা না করে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করলে পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে কোন ঐক্যসূত্র থাকবে না এবং তার ফলে পাকিস্তানী জাতীয়তা ধ্বংস হয়ে যাবে।[১৬]

বাংলা ভাষাবিরোধীদের এই স্মারকলিপিতে সিলেটের জনগণের মতামতের প্রতিনিধিত্বকারী কোন প্রতিষ্ঠান, পত্রিকা অথবা ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। কিন্তু তাঁরা যে বক্তব্য প্রদান করেছিলেন সে বক্তব্য ছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন মহলের একটি প্রতিনিধিত্বশীল বক্তব্য।

১৯৪৭ সালেই রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নকে কেন্দ্র করে পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যশ্রেণীর মধ্যে সরকারবিরোধী মনোভাব গড়ে উঠতে থাকে এবং বিভিন্ন ধরনের প্রতিরোধ আন্দোলনের মধ্যে তার প্রতিফলন ঘটে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মানি অর্ডার ফর্ম, ডাকটিকিট এবং মুদ্রায় শুধুমাত্র ইংরেজি ও উর্দুর ব্যবহার এবং এগুলিতে বাংলা ভাষাকে উপেক্ষা করার ফলে পূর্ব বাংলার জনসাধারণ ও শিক্ষিত মহলে যথেষ্ট উদ্বেগ ও বিরুদ্ধ মনোভাবের সৃষ্টি হয়।

এই বিরুদ্ধ মনোভাবকে সাংগঠনিক রূপ দেওয়ার প্রয়োজনেই ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে সর্বপ্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। তমদ্দুন মজলিস এবং মুসলিম ছাত্রলীগের অল্প কয়েকজন কর্মীর উপস্থিতিতে এই সংগ্রাম পরিষদটি গঠিত হয় এবং তমদ্দুন মজলিসের সদস্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নূরুল হক এর আহ্বায়ক নির্বাচিত হন।[১৭] এই সংগ্রাম পরিষদ প্রথমদিকে পত্র-পত্রিকায় বিবৃতি প্রদান, লেখালেখি, আলোচনাসভা অনুষ্ঠান, সরকারি ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার এবং কিছু কিছু সভা-সমিতির মাধ্যমে আন্দোলন অব্যাহত রাখে। পরবর্তী পর্যায়ে ভাষা আন্দোলন সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হলেও প্রাথমিক পর্যায়ে তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে গঠিত এই প্রথম সংগ্রাম পরিষদটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয় ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি। এই অধিবেশনে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধি ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উর্দু এবং ইংরেজির সঙ্গে বাংলাকেও

১৬. ঐ।
১৭. আবুল কাসেম, *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস,* ঢাকা ১৯৬৭, ১৬।

গণপরিষদের অন্যতম ভাষা হিসেবে ব্যবহার করার দাবি উত্থাপন করেন।[১৮] ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রস্তাবটির উপর গণপরিষদে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়। প্রস্তাবটির বিরোধিতা করতে গিয়ে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান বলেন :

> এখানে এ প্রশ্নটি তোলাই ভুল হয়েছে। এটি আমাদের জন্য এক জীবনমরণ সমস্যা। আমি অত্যন্ত তীব্রভাবে এই সংশোধনী প্রস্তাবের বিরোধিতা করি এবং আশা করি যে এ ধরনের একটি সংশোধনী প্রস্তাবকে পরিষদ অগ্রাহ্য করবেন।[১৯]

প্রস্তাবটিকে অসৎ উদ্দেশ্যপূর্ণ বলে অভিহিত করে তিনি আরো বলেন :

> প্রথমে এই প্রস্তাবটির উদ্দেশ্য নির্দোষ বলে আমি ভেবেছিলাম। কিন্তু বর্তমানে মনে হয়, পাকিস্তানের অধিবাসীদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করা এবং একটি সাধারণ ভাষার দ্বারা ঐক্যসূত্র স্থাপনের প্রচেষ্টা থেকে মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন করাই এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।[২০]

পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রস্তাবটির বিরোধিতা করতে গিয়ে বলেন, "পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ অধিবাসীরই এই মনোভাব যে, একমাত্র উর্দুকে রাষ্টভাষারূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।"[২১] এছাড়া গণপরিষদের সহ-সভাপতি পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধি তমিজুদ্দিন খানও প্রস্তাবটির বিরোধিতা করে বক্তৃতা দেন।[২২]

গণপরিষদে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের বাংলা ভাষা বিষয়ক প্রস্তাবটির বিরোধিতা করে লিয়াকত আলী খান, নাজিমুদ্দিন, তমিজুদ্দিন খান প্রভৃতি মুসলিম লীগ নেতা যেসব বক্তব্য প্রদান করেন তার বিরুদ্ধে পত্র-পত্রিকায় অনেক বিবৃতি ও সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হয়। কিন্তু শুধু পত্র-পত্রিকার বিরোধিতাই নয়, ছাত্রধর্মঘট, মিটিং-মিছিল ইত্যাদির মাধ্যমেও এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাস বর্জনের পর মিছিল করে বাংলা ভাষার সমর্থনে নানা শ্লোগান দিতে দিতে রমনা এলাকা প্রদক্ষিণ করে। এরপর মিছিলটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এসে শেষ হলে সেখানে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় আবুল কাসেম সভাপতিত্ব করেন এবং বক্তৃতা করেন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের আহ্বায়ক নঈমুদ্দিন আহমদ ও ফজলুল হক হল ইউনিয়নের সহ-সভাপতি মোহাম্মদ তোয়াহা।[২৩]

১৮. আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৬.২.১৯৪৮; *Amrita Bazar Patrika*, 27.2.1948

১৯. *Amrita Bazar Patrika* (Town edition), 27 2 1948

২০. *নওবেলাল*, ৪.৩. ১৯৪৮।

২১. ঐ।

২২. ঐ, সম্পাদকীয়।

২৩. *নওবেলাল* , ৪.৩.১৯৪৮ এবং *আনন্দবাজার পত্রিকা* (শেষ শহর সংস্করণ), ২৭.২.১৯৪৮।

গণপরিষদের সিদ্ধান্ত এবং পাকিস্তান মুসলিম লীগের বাংলা ভাষাবিরোধী নীতি ও কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ সালের ২ মার্চ পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্রাবাস ও তমদ্দুন মজলিসের যৌথ উদ্যোগে ফজলুল হক হলে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মীদের একটি সভা আহ্বান করা হয়।[২৪] এই সভায় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন এবং আলোচনায় অংশ নেন তাঁদের মধ্যে কামরুদ্দীন আহমদ, রনেশ দাশগুপ্ত, আজিজ আহমদ, অজিত গুহ, আবুল কাসেম, সরদার ফজলুল করিম, শামসুদ্দিন আহমদ, শামসুল হক, মোহাম্মদ তোয়াহা, নঈমুদ্দিন আহমদ, তোফাজ্জল আলী, আলী আহমেদ, মহিউদ্দিন, আনোয়ারা খাতুন, শামসুল আলম, শহীদুল্লাহ্ কায়সার, তাজউদ্দীন আহমদ, লিলি খান, শওকত আলী, আবদুল আউয়াল, ওয়াহেদ চৌধুরী, নূরুল আলম, কাজী গোলাম মাহবুব প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।[২৫] এই সভায় সভাপতিত্ব করেন কামরুদ্দীন আহমদ।[২৬]

ভাষা আন্দোলনকে প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক রূপ দেওয়া এবং সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে একটি ব্যাপকভিত্তিক সংগ্রাম পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত এই সভায় গৃহীত হয়। 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' নামে এই সর্বদলীয় পরিষদে গণআজাদী লীগ, গণতান্ত্রিক যুবলীগ, তমদ্দুন মজলিস ও পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ থেকে দু'জন করে প্রতিনিধি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, ফজলুল হক মুসলিম হল ইত্যাদি ছাত্রাবাস থেকে দু'জন করে প্রতিনিধি সদস্য মনোনীত হন এবং এর আহ্বায়ক মনোনীত হন শামসুল আলম।[২৭]

রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ এভাবে গঠিত হওয়ার পর এই সভা বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং সেই সঙ্গে পাকিস্তান গণপরিষদে সরকারি ভাষার তালিকা থেকে বাংলা ভাষাকে বাদ দেওয়ার প্রতিবাদে ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ সমগ্র পূর্ব বাংলায় সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান জানিয়ে অপর একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে।[২৮]

১১ মার্চ সাধারণ ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর সেই ধর্মঘট সফল করার জন্য কর্মীরা বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করে। অন্যদিকে সেই ধর্মঘট বানচাল করার উদ্দেশ্যে মুসলিম লীগ ও সরকার পক্ষ থেকে নানা ধরনের তৎপরতা শুরু করা হয়। ১১ মার্চের

২৪. বদরুদ্দীন উমর, *ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ: কতিপয় দলিল*, (প্রথম খণ্ড), *তাজউদ্দীন আহমদের ডায়েরী*, ২.৩.১৯৪৮, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪।

২৫. ঐ।

২৬. ঐ।

২৭. বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, প্রথম খণ্ড (৩য় সংস্করণ), ৬৮।

২৮. *সাপ্তাহিক নওবেলাল* (সিলেট থেকে প্রকাশিত ), ৪.৩.১৯৪৮।

ধর্মঘট সম্পর্কে বিস্তারিত কর্মসূচি নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ১০ মার্চ রাত্রে ফজলুল হক হলে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের একটি সভা বসে। ১১ মার্চ পর্যন্ত ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করা না হলেও প্রতিকূল পরিস্থিতির উদ্ভব হলে কি কর্মপন্থা অবলম্বন করা দরকার সে বিষয়ে এই সভায় আলোচনা হয়। এছাড়া পরদিন ধর্মঘটের সময় বিভিন্ন এলাকায় পিকেটিং সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।[২৯]

১১ মার্চ সকাল থেকে ইডেন বিল্ডিং-এর প্রথম ও দ্বিতীয় গেট, রমনা পোস্ট অফিস, পলাশী ও নীলক্ষেত ব্যারাক, জেলা আদালত, হাইকোর্ট, রেলওয়ে ওয়ার্কশপ ইত্যাদি স্থানে বিশেষ পিকেটিং-এর ব্যবস্থা করা হয়। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী ১১ মার্চ খুব ভোর থেকেই ছাত্ররা পিকেটিং-এর জন্য পূর্বনির্ধারিত স্থানে উপস্থিত হয়। রেলওয়ে ওয়ার্কশপে কাজ শুরু হতো ভোর পাঁচটা থেকে। সেজন্য ছাত্ররা সেখানে ভোর পাঁচটার আগেই উপস্থিত হয়। অফিসের লোকজন যেসব এলাকায় তখন বসবাস করতো সেসব এলাকায়, যেমন নীলক্ষেত ও পলাশী ব্যারাকে ছাত্ররা অফিস শুরু হওয়ার বেশ আগেই উপস্থিত হয়।[৩০] রমনা ডাকঘরের সামনে ছাত্ররা পিকেটিং করার সময় তাদের কয়েকজনকে পুলিশ গ্রেফতার করে।[৩১] হাইকোর্টের গেটের সামনে ছাত্ররা পিকেটিং শুরু করে উকিলদেরকে সেদিনের জন্য আদালত বর্জনের অনুরোধ ও চাপ প্রয়োগ করতে থাকলে উকিলদের মধ্যে কারো কারো সঙ্গে ছাত্রদের বাদানুবাদ শুরু হয়। এ প্রসঙ্গে ফজলুল হক *অমৃতবাজার পত্রিকার* এক প্রতিনিধিকে বলেন :

> বেলা ১০-৩০ মিনিটের সময় আমি হাইকোর্টের সামনে উপস্থিত হই, কিন্তু ছাত্ররা সেখানে পিকেটিং করতে থাকার ফলে ভিতরে ঢুকতে অসমর্থ হই। ছাত্রদেরকে আমি বলি যে আমার প্রায় আটটি কেস কোর্টে আছে এবং আমার অনুপস্থিতিতে আমার মক্কেলরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কিন্তু তাদেরকে এ ব্যাপারে কিছুতেই রাজি করাতে সক্ষম না হয়ে অবশেষে আমি বাড়ির দিকে রওয়ানা হই।[৩২]

ফজলুল হকের সঙ্গে ছাত্রদের এই কথাবার্তা চলাকালে পূর্ব বাংলার তৎকালীন জেনারেল অফিসার কমান্ডিং আইয়ুব খান হাইকোর্ট প্রাঙ্গণে সদ্য স্থাপিত বিভাগীয় সামরিক হেড কোয়ার্টারে যাওয়ার সময় ফজলুল হক ও ছাত্রদের বাদানুবাদ লক্ষ্য করেন এবং পরবর্তীকালে তাঁর *প্রভু নয় বন্ধু* নামক পুস্তকে এই ঘটনার নিম্নলিখিত বর্ণনা দেন :

> আমার মনে আছে, একদিন একটি পরিদর্শনের কাজ শেষ করে আমি হাইকোর্টে ফেরত যাচ্ছিলাম। আমি দেখলাম, ফজলুল হক আদালতের কাজে বাধা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ছাত্রদেরকে

---

২৯. উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, প্রথম খণ্ড, ৭২-৭৩।

৩০. ঐ, ৭২।

৩১. ঐ, ৭৪।

৩২. *Amrita Bazar Patrika*, 12.3.1948.

মাটির উপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়তে বলছিলেন। আমি গাড়ির ভেতর থেকে জিজ্ঞেস করেছিলাম কিজন্য ঐ সব করা হচ্ছিল। ফজলুল হক আমাকে দেখেছিলেন এবং দেখার পর আমাকে তাঁর রীতিমতো ভীতিপ্রদ মনে হওয়ায় তিনি শান্তভাবে ছাত্রদেরকে সে এলাকা ছেড়ে চলে যেতে পরামর্শ দিয়েছিলেন।[৩৩]

আইয়ুব খানের এই বর্ণনার সঙ্গে এ বিষয়ে প্রাপ্ত অন্য কোন তথ্যেরই কোন সঙ্গতি নেই এবং এটি পরবর্তীকালে প্রদত্ত একটি মিথ্যা ও বাহাদুরিপূর্ণ বক্তব্য ব্যতীত অন্য কিছু নয়।

হাইকোর্টের সামনে পিকেটিংরত ছাত্রদের উপর পুলিশ এক পর্যায়ে লাঠিচার্জ করলে উকিলরা তার প্রতিবাদে আদালত বর্জন করার সিদ্ধান্ত নেন।[৩৪] ছাত্ররা শুধু হাইকোর্টের সামনেই নয়, হাইকোর্টের কাছাকাছি অবস্থিত সেক্রেটারিয়েটের সামনেও পিকেটিং করতে থাকে। পিকেটিং চলাকালে সেখানেও ছাত্রদের উপর লাঠিচার্জ করা হয়। এ সম্পর্কে *অমৃতবাজার পত্রিকার* প্রতিনিধির সাথে পূর্বোল্লেখিত সাক্ষাৎকারের সময় ফজলুল হক বলেন :

হাইকোর্ট থেকে বাড়ি ফেরার পথে সেক্রেটারিয়েটের কাছে আমি একদল ছাত্রকে দেখি। আমি তাদেরকে নানাভাবে বোঝাবার চেষ্টা করি এবং তাদেরকে বাড়ি ফেরত যেতে অনুরোধ করি। এই সময় হঠাৎ একদল পুলিশ ধাওয়া করায় তারা দৌড়ে এসে আমি যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম সেখানে হাজির হয়। আমি দেখলাম, একদল পুলিশ আমার চতুর্দিকে যে ছাত্ররা জড়ো হয়েছিল তাদেরকে মারপিট করতে শুরু করলো। লাঠির একটি বাড়ি আমারও হাঁটুর উপর পড়ায় আমি খুব যন্ত্রণা অনুভব করি। এরপর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে গিয়ে আমি ক্ষতস্থান ব্যান্ডেজ করিয়ে নিই। তবে আমার আঘাত তেমন গুরুতর ছিলো না।[৩৫]

১১ মার্চ সকালে সেক্রেটারিয়েটে পিকেটিং-এর জন্য ছাত্ররা তোপখানা এবং আবদুল গনি রোডস্থ উভয় গেটের সামনেই উপস্থিত হয়েছিল। আবদুল গনি রোডে উপস্থিত ছিলেন শামসুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান, অলি আহাদ প্রমুখ। তোপখানা রোডে উপস্থিত ছিলেন কাজী গোলাম মাহবুব, শওকত আলী, বরকত প্রমুখ। পিকেটিং চলাকালে পুলিশের সঙ্গে শামসুল হক, শওকত আলী, কাজী গোলাম মাহবুব, বরকত প্রমুখের অনেক তর্কবিতর্ক হয়। পুলিশকে নানাভাবে বাধা দেওয়ার জন্য সেক্রেটারিয়েটের উভয় গেট থেকে শামসুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান, অলি আহাদ, শওকত আলী, কাজী গোলাম মাহবুব প্রমুখকে গ্রেফতার করে ওয়াইজঘাটের কোতোয়ালীতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কিছু জিজ্ঞাসাবাদের পর বিকেলের দিকে তাঁদের সকলকেই ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে স্থানান্তরিত করা হয়।[৩৬]

৩৩. Mohammad Ayub Khan, *Friends Not Masters*, 30.

৩৪. *Amrita Bazar Patrika,* 12.3.1948.

৩৫. ঐ।

৩৬. উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি,* প্রথম খণ্ড, ৭৭

১১ মার্চের ধর্মঘটের সময় ছাত্রদের উপর পুলিশের লাঠিচার্জ এবং অন্যান্য নির্যাতনের প্রতিবাদে বেলা আড়াইটার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একটি বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের আহ্বায়ক নঈমুদ্দিন আহমদ। এই সভায় বক্তারা সরকারের বিরুদ্ধে উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা দেন এবং একটি প্রস্তাবে ছাত্রদের উপর সেদিনকার পুলিশী নির্যাতনের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা ও প্রতিবাদ করেন। এছাড়া তাঁরা অন্য একটি প্রস্তাবে পাকিস্তান গণপরিষদের যেসকল পূর্ব বঙ্গীয় সদস্য বাঙালিদের স্বার্থ রক্ষা করতে অক্ষম হন তাঁদের পদত্যাগও দাবি করেন।[৩৭]

সেদিনের ধর্মঘটে ছাত্রদের সাথে সেক্রেটারিয়েট ও রেলের কিছু সংখ্যক কর্মচারীও যোগদান করেন এবং এর ফলে ঢাকাতে কিছু সময়ের জন্য হলেও আংশিক রেল ধর্মঘট হয়। রেলওয়ে ওয়ার্কশপে ধর্মঘটের জন্য পিকেটিং করার সময় পুলিশের সাথে ছাত্রদের এক সংঘর্ষ ঘটে এবং কয়েকজন ছাত্র সেখান থেকে গ্রেফতার হয়।[৩৮]

১১ মার্চ শুধু ঢাকাতেই নয়, ঢাকার বাইরেও অনেক জায়গায় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে পূর্ণ ধর্মঘট পালিত হয়। পূর্ব বাংলার প্রায় সর্বত্র ঐদিন ছাত্র-ছাত্রীরা পূর্ণ ধর্মঘট পালন করে। প্রায় সকল স্থানেই মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবে ধর্মঘট পালিত হলেও যশোরে ধর্মঘটী ছাত্র-ছাত্রীদের উপর জেলাকর্তৃপক্ষ পুলিশের মাধ্যমে হামলা চালায়। এই হামলার প্রতিবাদে সেদিন যশোরে দারুণ সরকারবিরোধী উত্তেজনা বিরাজ করতে থাকে এবং বিকেলের দিকেও এই ঘটনার প্রতিবাদে সমস্ত দোকানপাট বন্ধ রাখা হয়।[৩৯]

১২ মার্চ তারিখে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের আহ্বায়ক নঈমুদ্দিন আহমদ সংবাদপত্রে একটি বিবৃতির মাধ্যমে পূর্বদিনের ধর্মঘটের সময় ছাত্রদের উপর সরকারি নির্যাতনের প্রতিবাদ করেন। এই বিবৃতিতে তিনি ১১ মার্চের বিভিন্ন ঘটনাবলীতে নিহত, আহত ও পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতারকৃত ছাত্রদের যে হিসাব দেন, সে হিসাব মতে আহত ২০০, গুরুতরভাবে আহত ১৮, গ্রেফতার ৯০০ (এদের মধ্যে অনেককে পরে ছেড়ে দেওয়া হয়) এবং জেলে বন্দী ৬৯।[৪০]

*এসোসিয়েটেড প্রেস অব পাকিস্তান* পরিবেশিত একটি সংবাদে বলা হয় যে, ১২ মার্চ সকালের দিকে জগন্নাথ কলেজে একটি ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয় এবং সে সভা চলাকালে বেলা সাড়ে বারোটার দিকে প্রায় একশ' লোক বাইরে থেকে এসে সভার লোকজনের উপর ইট-পাটকেল ছুড়তে শুরু করে। এই হামলার ফলে কেউ কেউ আহত হন।[৪১]

৩৭. *Amrita Bazar Patrika*, 12.3.1948
৩৮. উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, প্রথম খণ্ড, ৭৯।
৩৯. ঐ, ৭৯-৮০।
৪০. *Amrita Bazar Patrika*, 13.3.1948.
৪১. ঐ।

জগন্নাথ কলেজের এই ঘটনা ছাড়াও ঢাকাতে বিক্ষিপ্তভাবে ঐদিন আরো কয়েকটি ঘটনা ঘটে। দুই ব্যক্তিকে কমিউনিস্ট সন্দেহে লোহার রড দ্বারা আঘাত করা হয়। সেদিন সেক্রেটারিয়েটের সামনের সমস্ত এলাকায় সশস্ত্র পুলিশ পাহারা দেয় এবং সেক্রেটারিয়েটের সামনে দিয়ে জনসাধারণের যাতায়াত বন্ধ থাকে।[৪২] এসব সত্ত্বেও ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় মিছিল বের করে পুলিশী জুলুম ও বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।[৪৩]

১৩ মার্চ সরকার কলকাতা থেকে প্রকাশিত *অমৃতবাজার পত্রিকা, আনন্দবাজার পত্রিকা* এবং কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র *দৈনিক স্বাধীনতা* পূর্ব বাংলায় নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। সেই আদেশ অনুযায়ী ঐদিন তেজগাঁও বিমান বন্দরে এই পত্রিকাগুলি এসে পৌঁছলে সেগুলি পুলিশ হস্তগত করে বাজেয়াপ্ত করে।[৪৪]

১১ মার্চে পুলিশী জুলুমের প্রতিবাদে ও বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ১৩ মার্চ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ঢাকার বাইরে চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, যশোর, খুলনা, বরিশাল, ফরিদপুর ইত্যাদি শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীরা ব্যাপকভাবে ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করে এবং সংগ্রাম পরিষদ ঐ ধর্মঘট ১৫ মার্চ পর্যন্ত অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, কারণ ঐ দিনটি ছিল পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক সভার প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখ।[৪৫]

পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার আগের দিন বিকেলে মুসলিম লীগ সংসদীয় দলের একটি সভা প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দিনের বাসভবনে শুরু হয়। এই সভা চলাকালে বেশ কিছু সংখ্যক ছাত্র সেখানে উপস্থিত হয় এবং রাত্রি নয়টা পর্যন্ত সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং গ্রেফতারকৃত ছাত্রদের মুক্তিদান ও বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানায়।[৪৬] মুসলিম লীগ সংসদীয় দলের ঐ সভায় ১১ মার্চের ঘটনাবলীর বিস্তৃত পর্যালোচনা করা হয়।[৪৭]

পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক সভার সদস্য বগুড়ার মোহাম্মদ আলী এবং নাজিমুদ্দিনের প্রাইভেট সেক্রেটারি খাজা নসরুল্লাহ ১৫ মার্চ তারিখ সকালের দিকে সংগ্রাম পরিষদের অন্যতম নেতা কামরুদ্দীন আহমদের বাসায় উপস্থিত হয়ে তাঁকে জানান যে, নাজিমুদ্দিন

৪২. ঐ।
৪৩. উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, প্রথম খণ্ড, ৮১।
৪৪. *Amrita Bazar Patrika*, 14.3.1948.
৪৫. ঐ, 14.3.1948 ; *নওবেলাল*, ১৯.৩.১৯৪৮।
৪৬. *তাজউদ্দীন আহমদের ডায়েরী*, ১৪.৩.১৯৪৮; উমর, *ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ : কতিপয় দলিল*, (প্রথম খণ্ড); *Amrita Bazar Patrika*, 16.3.1948.
৪৭. উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, প্রথম খণ্ড, ৮২।

ঐদিন বেলা সাড়ে এগারোটার সময় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সাথে ভাষার প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করতে চান। এরপর সকাল সাড়ে দশটার সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে সংগ্রাম পরিষদের এক জরুরি বৈঠক বসে। এই বৈঠকে নাজিমুদ্দিনের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যাপারে তাঁরা একমত হন এবং সেই সাক্ষাতের সময় আলোচনার ধারা সম্পর্কেও নিজেদের মধ্যে মতবিনিময় করেন। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের সময় যে চুক্তির ভিত্তিতে আলোচনা হওয়ার কথা, তার একটি প্রাথমিক খসড়া প্রস্তুত করেছিলেন কামরুদ্দীন আহমদ। ফজলুল হক হলের এই বৈঠকে সেই খসড়াটিও আলোচিত এবং অনুমোদিত হয়।[৪৮]

নির্ধারিত সময়ে নাজিমুদ্দিনের সঙ্গে আলোচনার জন্য সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে কামরুদ্দীন আহমদ, মোহাম্মদ তোয়াহা, আবুল কাসেম, নঈমুদ্দিন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, আজিজ আহমদ, আবদুর রহমান চৌধুরী প্রমুখ বর্ধমান হাউসে উপস্থিত হন। বৈঠকের আগে নাজিমুদ্দিন প্রস্তাব করেন যে, প্রাদেশিক সরকারের চীফ সেক্রেটারি আজিজ আহমদ সে আলোচনাকালে উপস্থিত থাকবেন। কিন্তু সংগ্রাম পরিষদের সদস্যরা তাতে কিছুতেই সম্মত না হওয়ায় আজিজ আহমদকে বাদ দিয়েই আলোচনা শুরু হয়।[৪৯]

নাজিমুদ্দিনের সঙ্গে সংগ্রাম পরিষদের এই আলোচনাবৈঠকে তুমুল বিতর্ক এবং উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। সংগ্রাম পরিষদ যে চুক্তিটি অনুমোদনের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে পেশ করে, তার কয়েকটি ধারা মেনে নিতে সম্মত হলেও অন্যগুলি সম্পর্কে নাজিমুদ্দিন তাঁর দৃঢ় অসম্মতি জানান। তিনি সংগ্রাম পরিষদকে বলেন যে, বাংলাকে পূর্ব বাংলার সরকারি ভাষা, আদালতের ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ঘোষণা করতে তাঁর কোন আপত্তি নেই, কিন্তু বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য সুপারিশ করে পূর্ব বাংলার ব্যবস্থাপক সভায় কোন প্রস্তাব উত্থাপন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়; কারণ রাষ্ট্রভাষা কি হবে সে বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারই নির্ধারণ করতে পারে, প্রাদেশিক সরকারের এ ব্যাপারে কোন কিছু করার আইনগত এখতিয়ার নেই। *ইত্তেহাদ, আনন্দবাজার পত্রিকা, অমৃতবাজার পত্রিকা, যুগান্তর, স্বাধীনতা* ইত্যাদি দৈনিক পত্রিকার উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার প্রসঙ্গে নাজিমুদ্দিন বলেন যে, পত্রিকাগুলি বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য সুপারিশ করার কারণে সেগুলির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় নি, নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে পত্রিকাগুলির পাকিস্তানবিরোধী প্রচারণার জন্য।[৫০]

৪৮. ঐ, ৮৩-৮৪।
৪৯. ঐ, ৮৪।
৫০. ঐ।

সংগ্রাম পরিষদের দ্বারা পেশকৃত চুক্তিটির মধ্যে একটি দাবি ছিল, ভাষা আন্দোলনে জড়িত থাকার জন্য কোন সরকারি কর্মচারীকে শাস্তি প্রদান করা চলবে না। এ সম্পর্কে নাজিমুদ্দিন বলেন যে, সরকারি কর্মচারী সক্রিয়ভাবে সরকারবিরোধী বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করলে যদি তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হয়, তাহলে রাষ্ট্রের কাজকর্ম শৃংখলার সাথে পরিচালনা করা সম্ভব নয়। আন্দোলন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সরকারিভাবে ভাষা আন্দোলনকে রাষ্ট্রের শত্রুদের দ্বারা পরিচালিত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছিল এবং নাজিমুদ্দিন ১৪ মার্চ রাতে এক বেতারভাষণে নিজেও এ বক্তব্য প্রদান করেছিলেন। সংগ্রাম পরিষদ এ ব্যাপারে দাবি জানায় যে, ভাষা আন্দোলনের বিরুদ্ধে এই সরকারি প্রচার সম্পর্কে সরকারি প্রেসনোট জারি করে ভুল স্বীকার করতে হবে এবং আন্দোলন যে রাষ্ট্রশত্রুদের দ্বারা পরিচালিত হয় নি সেকথাও একই সঙ্গে ঘোষণা করতে হবে। এর জবাবে নাজিমুদ্দিন বলেন যে, তিনি এ ব্যাপারে সংগ্রাম পরিষদের সদস্যদের কাছে ভুল স্বীকার এবং দুঃখ প্রকাশ করতে পারেন, কিন্তু প্রকাশ্যভাবে কিছু করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। দীর্ঘ সময় স্থায়ী এই বৈঠকে উভয় পক্ষের মধ্যে অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়, কিন্তু সংগ্রাম পরিষদের সদস্যরা তাঁদের দাবিতে অনমনীয় থাকায় নাজিমুদ্দিন শেষ পর্যন্ত তাঁদের সবকটি দাবিই মেনে নিতে বাধ্য হন। তবে ৮ দফা চুক্তিটির শেষ দফাটি কিছু রদবদল করে নাজিমুদ্দিন স্বহস্তে সেটি নতুনভাবে লিখে দেন।[৫১]

সংগ্রাম পরিষদের সাথে প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দিনের ৮ দফা চুক্তির বিবরণ নিম্নরূপ :

১. ২৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮ হইতে বাংলা ভাষার প্রশ্নে যাঁহাদিগকে গ্রেফতার করা হইয়াছে তাঁহাদিগকে অবিলম্বে মুক্তি দান করা হইবে।

২. পুলিশ কর্তৃক অত্যাচারের অভিযোগ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং তদন্ত করিয়া এক মাসের মধ্যে এ বিষয়ে একটি বিবৃতি প্রদান করিবেন।

৩. ১৯৪৮-এর এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে পূর্ব বাঙলা সরকারের ব্যবস্থাপক সভায় বেসরকারি আলোচনার জন্যে যে দিন নির্ধারিত হইয়াছে সেই দিন বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করিবার এবং তাহাকে পাকিস্তান গণপরিষদে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পরীক্ষাদিতে উর্দুর সমমর্যাদা দানের জন্যে একটি বিশেষ প্রস্তাব উত্থাপন করা হইবে।

৪. এপ্রিল মাসে ব্যবস্থাপক সভায় এই মর্মে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হইবে যে প্রদেশের সরকারি ভাষা হিসেবে ইংরেজি উঠিয়া যাওয়ার পরই বাংলা তাহার স্থলে সরকারি ভাষারূপে স্বীকৃত হইবে। ইহা ছাড়া শিক্ষার মাধ্যমও হইবে বাংলা। তবে সাধারণভাবে স্কুলকলেজগুলিতে অধিকাংশ ছাত্রের মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষাদান করা হইবে।

---

৫১. ঐ, ৮৫।

৫. আন্দোলনে যাঁহারা অংশগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের কাহারো বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে না।

৬. সংবাদপত্রের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হইবে।

৭. ২৯ ফেব্রুয়ারি হইতে পূর্ব বাংলার যেসকল স্থানে ভাষা আন্দোলনের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করা হইয়াছে সেখান হইতে তাহা প্রত্যাহার করা হইবে।

৮. সংগ্রাম পরিষদের সাথে আলোচনার পর আমি এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হইয়াছি যে এই আন্দোলন রাষ্ট্রের দুশমনদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় নাই।[৫২]

চুক্তিপত্রটি স্বাক্ষরিত হওয়ার আগে কামরুদ্দীন আহমদ, আবুল কাসেম প্রমুখ জেলখানায় উপস্থিত হয়ে ভাষা আন্দোলনে আটক বন্দীদেরকে চুক্তিপত্রটি দেখান। শামসুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান, অলি আহাদ, কাজী গোলাম মাহবুব, শওকত আলী প্রমুখ চুক্তির শর্তাবলী দেখার পর সেটি অনুমোদন করেন। এরপর সংগ্রাম পরিষদের সদস্যগণ বর্ধমান হাউসে ফিরে আসেন। সরকারের পক্ষে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন এবং সংগ্রাম পরিষদের পক্ষে কামরুদ্দীন আহমদ চুক্তিপত্রটিতে স্বাক্ষর প্রদান করেন।[৫৩]

১৫ মার্চ দুপুর ১টায় একটি সাধারণ ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হওয়ার পর ছাত্ররা মিছিল সহকারে পরিষদভবনের সামনে উপস্থিত হয় এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে। তখনও পর্যন্ত চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হওয়ার খবর সাধারণভাবে প্রচার করা হয় নি। কাজেই ছাত্র-জনতার ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা লক্ষ্য করে আবুল কাসেম তাদেরকে শান্ত করার চেষ্টায় চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার কথা উল্লেখ করেন। কিন্তু চুক্তির কথা শোনামাত্র ছাত্ররা আরো উত্তেজিত হয়ে গালাগালি বর্ষণ করতে থাকে। চুক্তিপত্রটি তাদের পড়ে শোনানো হলেও তাতে কর্ণপাত না করে তারা স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দিনের কাছ থেকে চুক্তি সম্পর্কে সরাসরি শোনার জন্য দাবি জানাতে থাকে এবং বিক্ষোভ অব্যাহত রাখে।[৫৪]

তখন ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন চলছিল এবং বাইরে ছাত্র-জনতার সমাবেশ ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময় পরিষদের অভ্যন্তরেও দারুণ গণ্ডগোল এবং উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। ব্যবস্থাপক সভার বিরোধী দলীয় সদস্যগণও চুক্তি ও পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীকে চাপ দিতে থাকেন। এসবের ফলে নাজিমুদ্দিন সংগ্রাম কমিটির সঙ্গে আলোচনা সম্পর্কে পরিষদের সামনে তাঁর রিপোর্ট পেশ করেন। কিন্তু রিপোর্ট পেশ করার পর পরিষদে আবার হট্টগোল শুরু হলে তিনি ৮ দফা চুক্তিটি সম্পূর্ণ পাঠ করে তাদেরকে শোনান।[৫৫]

৫২. *East Bengal Assembly Proceedings*, Vol. 1, *The Amrita Bazar Patrika*, 16 3.1948

৫৩. উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, প্রথম খণ্ড, ৮৬।

৫৪. ঐ।

৫৫. ঐ, ৮৬-৮৭।

রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে তাড়াহুড়ো করে প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দিনের চুক্তি সম্পাদন এবং শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম পরিষদের সবগুলি দাবি মেনে নেওয়ার আসল কারণ ছিল পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর আসন্ন ঢাকা সফর। এই সফরের সময় জনগণ কর্তৃক, বিশেষত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীগণ কর্তৃক সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের মতো কোন পরিস্থিতির যাতে উদ্ভব না ঘটে সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্যই নাজিমুদ্দিন ও তাঁর সরকার যথেষ্ট নমনীয় অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। তাছাড়া তাঁরা আশা করেছিলেন যে, জিন্নাহ উর্দুর সপক্ষে প্রকাশ্যে মতামত প্রদান করলে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়বে এবং পরিস্থিতি তাঁদের নিয়ন্ত্রণাধীন হবে।

১৯ মার্চ বিকেলে গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ তেজগাঁ বিমানবন্দরে পৌঁছলে হাজার হাজার লোক তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য বিমানবন্দরে উপস্থিত হয় এবং অসংখ্য লোক বিমানবন্দর থেকে রেসকোর্স ময়দান পর্যন্ত পথের দুই পাশে তাঁর দর্শনলাভের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে।[৫৬]

২১ মার্চ ঢাকার নাগরিকদের পক্ষ থেকে রেসকোর্স ময়দানে জিন্নাহকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের ব্যবস্থা করা হয়। ঐ দিন বিকেলে রেসকোর্স ময়দানে এক বিশাল জনসভায় প্রায় এক ঘন্টাকাল বক্তৃতার মধ্যে ভাষার প্রশ্ন এবং ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে তিনি বলেন :

> একথা আমি পূর্বেই বলেছি যে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই ভাষার প্রশ্ন তোলা হয়েছে। আপনাদের প্রধানমন্ত্রীও একটি সদ্য প্রকাশিত বিবৃতিতে যথার্থভাবেই একথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর সরকার এদেশের শান্তি বিঘ্নিত করার জন্য রাজনৈতিক অন্তর্ঘাতক অথবা তাদের এজেন্টদের যেকোন চেষ্টাকে কঠিনভাবে দমন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় আমি খুশি হয়েছি। বাংলা এই প্রদেশের সরকারি ভাষা হবে কিনা সেটা এই প্রদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই স্থির করবেন। আমার কোন সন্দেহ নেই যে যথাসময়ে এই প্রদেশের অধিবাসীদের ইচ্ছানুসারেই এই প্রশ্নের মীমাংসা হবে।[৫৭]

উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার বিষয়ে যুক্তি দিতে গিয়ে তিনি বলেন :

> আমি সুস্পষ্ট ভাষায় আপনাদেরকে জানাতে চাই যে আপনাদের দৈনন্দিন জীবনের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিয়ে কোন রকম প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হবে একথার মধ্যে কোন সত্যতা নেই। কিন্তু আপনারা, এই প্রদেশের অধিবাসীরাই চূড়ান্তভাবে স্থির করবেন আপনাদের প্রদেশের রাষ্ট্রভাষা কি হবে। কিন্তু একথা আপনাদেরকে পরিষ্কারভাবে বলে দেওয়া দরকার যে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু, অন্য কোন ভাষা নয়। এ ব্যাপারে যদি কেউ আপনাদেরকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে, তাহলে বুঝতে হবে সে হচ্ছে রাষ্ট্রের শত্রু। একটি মাত্র রাষ্ট্রভাষা ছাড়া কোন জাতিই একসূত্রে গ্রথিত হয়ে কার্যনির্বাহ করতে পারে না। অন্যদেশের ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে দেখুন। অতএব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। কিন্তু আমি পূর্বেই বলেছি, এ প্রসঙ্গ পরে আসবে।[৫৮]

৫৬. ঐ, ১০৫।
৫৭. *Quaid-i-Azam Mohammad Ali Jinnah's Speeches as Governor General*, Pakistan Publication, Karachi, 89
৫৮. ঐ।

২৪ মার্চ সকালের দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জিন্নাহর সম্মানে একটি বিশেষ সমাবর্তন সভার আয়োজন করে। এই সমাবর্তন সভাতেও জিন্নাহ রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে তাঁর রেসকোর্স ময়দানে প্রদত্ত বক্তৃতারই পুনরাবৃত্তি করেন। এ সময় উপস্থিত ছাত্রদের মধ্যে কিছু সংখ্যক 'না, না' বলে চীৎকার করে জিন্নাহর বক্তৃতায় বাধার সৃষ্টি করেন। কিন্তু এরপরও জিন্নাহ রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে নিজের বক্তব্য প্রদানে বিরত না হয়ে আবার সেই একই বক্তব্য প্রদান করেন।[৫৯]

রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের একটি প্রতিনিধিদলকে জিন্নাহ ২৪ মার্চ সন্ধ্যায় সাক্ষাৎদান করেন। এই সাক্ষাতের সময় সংগ্রাম পরিষদের সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শামসুল হক, কামরুদ্দীন আহমদ, আবুল কাসেম, তাজউদ্দীন আহমদ, লিলি খান, মোহাম্মদ তোয়াহা, আজিজ আহমদ, নঈমুদ্দিন আহমদ, শামসুল আলম, অলি আহাদ এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম। আলোচনার প্রথমেই জিন্নাহ তাঁদেরকে বলেন যে, নাজিমুদ্দিনের সঙ্গে তাঁদের যে চুক্তি হয়েছে সেটাকে তিনি স্বীকার করেন না, কারণ নাজিমুদ্দিনের কাছ থেকে জোরপূর্বক সেই চুক্তিতে সই আদায় করা হয়েছে। তিনি এ সময় দৃঢ়ভাবে সংগ্রাম পরিষদের সদস্যদেরকে জানান যে, একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। এই সাক্ষাৎকারের সময় উভয় পক্ষে অল্পক্ষণের মধ্যেই তুমুল বাকবিতণ্ডা শুরু হলে জিন্নাহ আর আলোচনা করতে অসম্মত হওয়ায় সাক্ষাৎকারটি নির্ধারিত সময়ের আগেই আকস্মিকভাবে সমাপ্ত হয়।[৬০] সাক্ষাৎকারের সময় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে জিন্নাহর কাছে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার ব্যাপারে একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।[৬১]

জিন্নাহর পূর্ব বাংলা সফরের পর ১৯৪৮ সালের ৬ এপ্রিল পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক সভার যে অধিবেশন বসে তাতে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে তাঁর চুক্তি লঙ্ঘন করে নিম্নলিখিত ভাষা বিষয়ক প্রস্তাব পেশ করেন :

(ক) পূর্ব বাংলা প্রদেশে ইংরেজির স্থলে বাংলাকে সরকারি ভাষা হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে ; এবং

(খ) পূর্ব বাংলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষার মাধ্যম হইবে যথাসম্ভব বাংলা অথবা প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকাংশ স্কলারদের মাতৃভাষা।[৬২]

৫৯. উমর *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, ১০৯-১১১।

৬০. ঐ, ১১১-১১৩।

৬১. *দৈনিক যুগান্তর*, ২.৪.১৯৪৮।

৬২. *East Bengal Legislative Assembly Proceedings*, Vol. 1, No. 4, Thursday the 6th April 1948, 57

নাজিমুদ্দিন এই প্রস্তাব পেশ করার পর পরিষদে তুমুল বিরোধিতা ও হট্টগোল শুরু হলে জিন্নাহর মতামতের কথা উল্লেখ করে নাজিমুদ্দিন তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাহার করতে অস্বীকার করেন।[৬৩]

আন্দোলনের মুখে চুক্তি সম্পাদন এবং আন্দোলনের পর পরিস্থিতি পরিবর্তনের সুযোগ নিয়ে সেই চুক্তিভঙ্গের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন বিশ্বাসঘাতকতার যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন তা পূর্ব বাংলার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসে একটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় বিষয়।

১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনের পর ছাত্র আন্দোলন কিছুদিন স্তিমিত থাকলেও পূর্ব বাংলার অর্থনীতি, রাজনীতি ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের আন্দোলন সংগঠিত হতে থাকে। মুসলিম লীগ সরকার কোন সমস্যারই সমাধানের চেষ্টা না করে খাদ্য, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিস্থিতি সঙ্কটজনক করে তোলে এবং স্বাধীনতা লাভের এক বছরের মধ্যেই সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ চারদিকে ব্যাপকভাবে দেখা দেয়। এই বিক্ষোভের মুখে রাজনৈতিক কর্মীদের গ্রেফতার, বহিষ্কারাদেশ, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ, জনগণের উপর নতুন নতুন কর নির্ধারণ ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন মুসলিম লীগ সরকারের সাধারণ নিয়মে পরিণত হয়। এই সময় মুসলিম লীগের মধ্যেও দেখা দেয় অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং ভাঙনের নানা লক্ষণ। এই ভাঙনের পরিণতিতে কোন বিরোধী দল যাতে গঠিত হতে না পারে সেজন্য মুসলিম লীগ সংগঠন ও সরকারি মহলে মুসলিম লীগের বামপন্থী গ্রুপ নামে পরিচিত পূর্ববর্তী সোহরাওয়ার্দী-আবুল হাশিম গ্রুপের কর্মীদের বিরুদ্ধে এমন সব পদক্ষেপ নেওয়া হতে থাকে যাতে তাঁরা মুসলিম লীগের মধ্যে কোনক্রমেই আর অবস্থান করতে না পারেন এবং কোন পাল্টা রাজনৈতিক দলও যাতে গঠন করতে সক্ষম না হন।

১৯৪৮ সালে ঢাকায় কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীরা নিজেদের আর্থিক ও অন্যান্য দাবিদাওয়ার ভিত্তিতে ৮ এপ্রিল থেকে ১৮ দিন স্থায়ী এক ধর্মঘট করে। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্ররা নিজেদের দাবিদাওয়া সম্বলিত একটি স্মারকলিপি কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করার পর কর্তৃপক্ষ সেগুলি বিবেচনা করতে অসম্মত হওয়ায় ৩৬ জন মেডিক্যাল ছাত্র ১৮ এপ্রিল থেকে অনশন ধর্মঘট শুরু করে।[৬৪] অনশনকারী ছাত্ররা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী হবিবুল্লাহ বাহারের বাসভবনের সামনে এবং সার্জেন জেনারেল ও মিটফোর্ড হাসপাতালের সামনে কয়েক দিন ধরে বিক্ষোভ করার পর ২৭ এপ্রিল কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের দাবি স্বীকার করে নিলে ঐ দিনই মেডিক্যাল ছাত্ররা ধর্মঘট প্রত্যাহার করে।[৬৫] নতুন

৬৩. উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি,* ১৫৩-১৫৮।

৬৪. ঐ, ১৬১।

৬৫. *নওবেলাল,* ২২.৪.১৯৪৮; *তাজউদ্দীন আহমদের ডায়েরী,* ২৭.৪.১৯৪৮, উমর, *ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ: কতিপয় দলিল,* প্রথম খণ্ড।

বিক্রয়কর ধার্যের ফলে ঢাকা ও পূর্ব বাংলার অনেক জায়গায় জনসাধারণ ও দোকানদারদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং এই কর ধার্যের বিরুদ্ধে ২৬ এপ্রিল ঢাকাতে পূর্ণ সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়। বিকেলের দিকে আরমানিটোলা ময়দানে কর প্রত্যাহারের দাবিতে এক বিরাট জনসভাও অনুষ্ঠিত হয়।[৬৬]

ফেব্রুয়ারি মাসে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার পর শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা এবং পূর্ব বাংলা থেকে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ৩ জুন ঢাকা উপস্থিত হলে তাঁকে জননিরাপত্তা আইনের দশ ধারাবলে অন্তরীণ করা হয় এবং জানানো হয় যে, তিনি তাঁর সফরসূচি বাতিল করে পূর্ব বাংলা ত্যাগ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেই তাঁকে মুক্তি দেওয়া হবে। প্রাদেশিক সরকারের কাছে সোহরাওয়ার্দী সেই মর্মে ইচ্ছা প্রকাশ করলে তাঁকে মুক্তি প্রদান করা হয় এবং তিনি কলকাতার উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন।[৬৭] এভাবে সোহরাওয়ার্দীকে যখন পূর্ব বাংলা থেকে বহিষ্কার করা হয়,তখন তিনি পাকিস্তান গণপরিষদের একজন সদস্য ছিলেন।

১৯৪৮ সালের ৩০ জুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা অব্যবস্থা এবং শিক্ষকসমস্যা আলোচনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একটি সভা করে।[৬৮] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৪৭ সালে হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত শিক্ষকগণই ছিলেন বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং প্রধান শিক্ষকদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন ঐ একই সম্প্রদায়ভুক্ত। এর ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সে সময় তীব্র শিক্ষকসঙ্কট দেখা দেয়। এই সময়ে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের তরফ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষের নিকট যে স্মারকলিপি প্রদান করা হয় তা থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকসমস্যার পরিচয় পাওয়া যায়। স্মারকলিপিটির দাবিসমূহ ছিল এই রকম :

১. বেতনের হার বৃদ্ধি করিতে হইবে, প্রারম্ভিক বেতন বর্তমানের ১৫০ টাকা হইতে বৃদ্ধি করিয়া ২৫০ টাকা করিতে হইবে।
২. অধ্যাপকগণের প্রচলিত বাধ্যতামূলক অবসরলাভের বয়স বৃদ্ধি করিয়া অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় ইহা ষাট বৎসর করিতে হইবে।
৩. নিয়োগ ও পদোন্নতির সময় পক্ষপাতিত্ব, স্বজনপ্রীতি বা সাম্প্রদায়িকতা চলিবে না।
৪. অবিলম্বে শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ অধ্যাপক নিয়োগ করিয়া বর্তমানের শূন্যপদ পূরণ করিতে হইবে।
৫. অধ্যাপকবৃন্দের অভাব-অভিযোগ অবিলম্বে পূরণ করিতে হইবে।
৬. যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাঁহাদিগকে রাখিবার জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।[৬৯]

৬৬. *নওবেলাল*, ২৬.৪.১৯৪৮।
৬৭. *দৈনিক আজাদ* , ১০.৬.১৯৪৮।
৬৮. ঐ, ১.৭.১৯৪৮।
৬৯. ঐ।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু ছাত্র এবং শিক্ষকদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়েই যে আন্দোলন চলছিল তাই নয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নতম বেতনের কর্মচারীরা, যাঁরা চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী বলে পরিচিত ছিলেন, তাঁরাও এক মাসের নোটিশে ১৯৪৯ সালের ৩ মার্চ থেকে ধর্মঘট শুরু করে। এই ধর্মঘটে ছাত্র ও কর্মচারীদের মধ্যে আন্দোলনের ক্ষেত্রে এমন একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠে, যা ইতিপূর্বে অথবা পরে কোন সময়ই আর দেখা যায় নি। এই আন্দোলনের সময় কিছু সংখ্যক ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হয় এবং কিছু ছাত্রকে জরিমানা ও গ্রেফতার করা হয়। এসবের ফলে এই কর্মচারী ধর্মঘট, ছাত্র ধর্মঘট ও ছাত্র আন্দোলনের ক্ষেত্রেও এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়।[৭০]

১৯৪৮ সালের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো পুলিশ ধর্মঘট। দেড় মাস বেতন না পাওয়ার ফলে বিরাট সংখ্যক পুলিশ কনস্টেবল ১৪ জুলাই ধর্মঘট করে এবং ঢাকা শহরের পথে পথে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। অবস্থা আয়ত্তে আনার জন্য সরকার সামরিক বাহিনী তলব করে এবং তারা লালবাগস্থ পুলিশ লাইনে পুলিশদেরকে ঘেরাও করে।[৭১] এসময়ে সেনাবাহিনী ও সশস্ত্র পুলিশদের মধ্যে সংঘর্ষ ও গুলিবিনিময় হয় এবং তার ফলে ২ জন পুলিশ নিহত ও ১ জন আহত হয়।[৭২]

বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের একটি রূপ ছিল বাংলা ভাষায় আরবি হরফ প্রবর্তনের চেষ্টা। এ চেষ্টা ১৯৪৭ সাল থেকেই শুরু হয়েছিল এবং এর প্রধান প্রবক্তা ছিলেন পূর্ব বাংলার প্রতিনিধি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ফজলুর রহমান। নানা বক্তৃতা, বিবৃতি, সভা-সমিতির মাধ্যমে তিনি বাংলা ভাষায় আরবি হরফ প্রবর্তনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে ক্রমাগত একথা প্রচার করতে থাকেন যে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় সংহতি এবং দুই অংশের জনগণের মধ্যে অর্থপূর্ণ ঐক্য গড়ে তোলা ও সুদৃঢ় করার জন্য পাকিস্তানের সকল ভাষার অক্ষর এক রকম হওয়া উচিত। হরফ পরিবর্তনের এই চক্রান্ত ভালভাবে দানা বাঁধে ১৯৪৯ সালে। এরপর ১৯৫০ সালের ১৮ এপ্রিল থেকে কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জেলায় ২০টি কেন্দ্রে আরবি হরফে বাংলা ভাষার মাধ্যমে প্রাপ্তবয়স্কদেরকে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়ার কাজ শুরু হয়। একটি সরকারি সূত্র থেকে বলা হয় যে, প্রত্যেক শিক্ষাকেন্দ্রে ২৫ থেকে ৩৫ জন ছাত্র ঐভাবে শিক্ষাগ্রহণ করতে আরম্ভ করেছে এবং ছয় মাসকাল তারা ঐ কেন্দ্রগুলিতে শিক্ষালাভে নিযুক্ত থাকবে।[৭৩]

১৯৪৯ সালে প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষাদান পরিকল্পনা খাতে কেন্দ্রীয় সরকার মোট ৩৫ হাজার টাকা মঞ্জুর করেন। কিন্তু ১৯৫০ সালে সেই টাকার অঙ্ক বাড়িয়ে এই খাতে ব্যয়

৭০. উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, ১৯৩-৯৪।

৭১. *তাজউদ্দীন আহমদের ডায়েরী*, ১৪.৭.১৯৪৮; উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ ঃ কতিপয় দলিল*, প্রথম খণ্ড।

৭২. *দৈনিক আজাদ* , ১৫.৭.১৯৪৮।

৭৩. ঐ, ২৪.৫.১৯৫০।

বরাদ্দ করা হয় ৬৭ হাজার ৭৬৪ টাকা[৭৪], যা পূর্ব বাংলার ক্ষেত্রে খরচ হয় আরবি হরফে বাংলা প্রচলনের কর্মসূচিতে। প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার্থীদের জন্য অস্থায়ীভাবে গৃহীত পাঠ্যতালিকা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় খরচে আরবি হরফে বাংলা বই ছাপানো হয় এবং সেই সমস্ত বই বিনামূল্যে ছাত্রদের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়।[৭৫] এছাড়া আরবি হরফে বাংলা পাঠ্যপুস্তক রচনাকারীদেরকে পুরস্কার প্রদান করা হবে এই মর্মে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে একটি বিজ্ঞপ্তিও প্রচার করা হয়।[৭৬]

আরবি হরফে বাংলা ভাষা শিক্ষাদানের এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলা ভাষাসংস্কার কমিটির সদস্য ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ১৯৫০ সালের ৪ অক্টোবর একটি বিবৃতি প্রদান করেন।[৭৭] এর আগেই সেপ্টেম্বর মাসে মওলানা আকরম খাঁর সভাপতিত্বে গঠিত পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটি তার এক রিপোর্টে বাংলা ভাষায় আরবি হরফ প্রচলন অন্তত কুড়ি বছর স্থগিত রাখার জন্য সুস্পষ্টভাবে সুপারিশ করেন। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর বিবৃতিতে এই সুপারিশের প্রতিও সরকার ও জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিন্তু এসব সত্ত্বেও বাংলা হরফ পরিবর্তন সম্পর্কিত পাকিস্তান সরকারের চক্রান্ত আরো কিছুদিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। শুধু বাংলা ভাষায় আরবি হরফ প্রবর্তনের মধ্যেই এই ধরনের চক্রান্ত সীমাবদ্ধ থাকে নি, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা আরবি করার জন্য কোন কোন মহল থেকে প্রস্তাব করা হয়।[৭৮] কিন্তু তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানেও এই প্রস্তাবের পক্ষে বিশেষ কোন সাড়া না পাওয়ায় তা বেশিদূর অগ্রসর হতে পারে নি। কিন্তু এই দাবি ইসলামী সংস্কৃতি বিকাশের প্রশ্নের সাথে জড়িত থাকায় তা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রভাষা উর্দু এবং বাংলা ভাষায় আরবি হরফ প্রবর্তনের দাবিকে কতগুলি মহলে জোরদার করে।

বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে চক্রান্তের অপর একটি রূপ ছিল বাংলা ভাষা সংস্কারের নামে অনেক ধরনের অবাস্তব পরিবর্তনের প্রচেষ্টা। এই উদ্দেশ্যে 'পূর্ব বাংলায় প্রচলিত বাংলা ভাষা প্রমিতকরণ, সহজীকরণ ও সংস্কারের প্রশ্ন পরীক্ষার' জন্য ৯ মার্চ ১৯৪৯ তারিখে পূর্ব বাংলা সরকার 'পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটি' নামে একটি কমিটি গঠন করে।[৭৯] মওলানা আকরাম খাঁ এই কমিটির সভাপতি নিযুক্ত হন এবং সদস্যদের মধ্যে ছিলেন ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, হবিবুল্লাহ বাহার, ডক্টর মোয়াজ্জেম হোসেন, মওলানা আবদুল্লাহেল বাকী, সৈয়দ আবুল হাসনাত মুহম্মদ ইসমাইল, আবুল কালাম শামসুদ্দিন, শইখ শরফউদ্দিন, গোলাম

৭৪. ঐ।
৭৫. ঐ।
৭৬. ঐ।
৭৭. ঐ, ৪.১০.১৯৫০।
৭৮. ঐ, ২৩.১.১৯৫০; ২৯.৪.১৯৫০; ১০.২.১৯৫১।
৭৯. *Report of the East Bengal Language Committee,* 1946, Officer on Special Duty (Home Der East Pakistan Govt. Press, Dacca, 2.

মুস্তফা প্রমুখ।[৮০] ৬ ডিসেম্বর, ১৯৫০ তারিখে এই কমিটি এর মূল রিপোর্টটিকে চূড়ান্ত আকার দেন এবং কমিটির সভাপতি মওলানা আকরাম খাঁ পূর্ব বাংলা সরকারের শিক্ষা দপ্তরের সেক্রেটারির কাছে সেটি পাঠিয়ে দেন।[৮১]

ভাষা কমিটি স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আরবি হরফ প্রচলনের পক্ষে একটা সুপারিশ আদায় করা। কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এ কারণেই সরকার উক্ত রিপোর্টটি জনসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকেন। পাকিস্তানে সামরিক শাসন কায়েম হওয়ার পর ভাষা কমিটির এই রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৯৫৮ সালে। আইয়ুবের সময় বাংলা ভাষায় আরবি হরফ প্রচলনের প্রশ্ন ছিল একেবারেই অসম্ভব। কাজেই রিপোর্টটি ধামাচাপা দিয়ে রাখার কারণ তখন আর ছিলনা। কিন্তু সেই রিপোর্টটির মধ্যে অনেক প্রতিক্রিয়াশীল সুপারিশ থাকায় সেগুলি কার্যকর করার প্রতি আইয়ুব খানের সামরিক সরকার ছিল অধিকতর আগ্রহী। এই আগ্রহের কারণেই তৎকালীন সরকার রিপোর্টটি তাড়াতাড়ি প্রকাশ করে।

১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনের পর থেকে পূর্ব বাংলার জনগণের অর্থনৈতিক জীবনে, বিশেষকরে কৃষক-শ্রমিক ও নিম্নমধ্যবিত্ত জনগণের জীবনে যে দুঃখ-দুর্দশা নেমে আসে এবং জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর সামগ্রিকভাবে নানা ধরনের যে নির্যাতন চালানো হয়, সেসবের পুঞ্জীভূত প্রক্রিয়া জনগণের রাজনৈতিক জীবনে গভীর ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। এজন্য ১৯৪৭-৪৮ সাল থেকে শুরু করে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পূর্ব পর্যন্ত পূর্ব বাংলার সামগ্রিক পরিস্থিতির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

১৯৪৭ সালের আগস্ট মাস থেকেই পূর্ব বাংলায় বিপুল খাদ্যাভাব লক্ষ্য করা যায়। এজন্য আগস্ট মাসেই পূর্ব বাংলায় সরকারি পর্যায়ে অভ্যন্তরীণ সংগ্রহের জন্য কর্ডন প্রথা চালু করা হয়। পূর্ব বাংলা সরকার আশা করেছিল যে, ১৭টি জেলার মধ্যে ৮টি উদ্বৃত্ত জেলার ধান-চাল সংগ্রহ করে তারা ঘাটতি এলাকাগুলোতে নিয়ে যাবে; এর ফলে ঘাটতি এলাকার ঘাটতি যেমন পূরণ হবে তেমনি সাধারণভাবে চালের মূল্য হ্রাস পাবে। কিন্তু কর্ডন প্রথা চালু করা সত্ত্বেও বস্তুতপক্ষে দেখা গেল যে, ধান-চাল উদ্বৃত্ত এলাকায় সংগ্রহ করে ঘাটতি এলাকায় তাড়াতাড়ি চালান দেবার মতো কোন ব্যবস্থা সরকারের নেই। এর জন্য প্রশাসনিক অব্যবস্থা এবং যানবাহন ও পথঘাটের দুরবস্থাই মূলত দায়ী। এছাড়া সরকারি আমলাদের দুর্নীতি এবং চোরাকারবারি ব্যবসায়ীদের তৎপরতার দরুন চোরাচালান, বেআইনীভাবে ধান-চাল গুদামজাত করে রাখা এবং ব্যাপক চোরাকারবারের

৮০. ঐ, 2-3.
৮১. ঐ, 115.

ফলে খাদ্যসঙ্কট দূর না হয়ে শেষ পর্যন্ত ১৯৪৮-৪৯ সালে এবং পরে ১৯৫১ সালে তা দুর্ভিক্ষের আকার ধারণ করে। খুলনা, ফরিদপুর, সিলেট এবং উত্তর বাংলার জেলাগুলিতে গ্রামাঞ্চলের জনগণ ব্যাপকভাবে দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে। অন্য জেলাগুলিতেও পরিস্থিতির যথেষ্ট অবনতি ঘটে। শহরের গরিবদের অবস্থাও নিদারুণ সঙ্কটজনক হয়ে পড়ে। কোন কোন এলাকায় কৃষকরা এই পরিস্থিতিতে সংঘবদ্ধভাবে সরকারি খাদ্য সংগ্রহ ব্যবস্থা প্রতিরোধ করতে এগিয়ে আসে। কিন্তু দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ আন্দোলনে জনগণকে ব্যাপকভাবে ও দেশব্যাপী সংগঠিত করা কারো পক্ষেই সম্ভব হয় নি। কমিউনিস্ট পার্টি এ সময় সশস্ত্র আন্দোলনে নামার ফলে তার এবং তার সঙ্গে সম্পর্কিত কৃষক সমিতির উপর সরকারি নির্যাতন ও নানা প্রকার নিষেধাজ্ঞার জন্য ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের সময়ের মতো তারা প্রকাশ্যে রিলিফের কাজে এগিয়ে আসতে পারে নি। তৎকালীন পরিস্থিতিতে গোপনীয়তা অবলম্বন করে অন্য কোনভাবেও রিলিফের কাজ করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। যে দু'একটি নতুন বিরোধী সংগঠন সদ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেগুলির পক্ষেও এ ব্যাপারে বেশি কিছু করা সম্ভব হয় নি, যদিও কিছু রিলিফকাজ তারা বিক্ষিপ্তভাবে করেছিল এবং কোন কোন এলাকায় দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে খণ্ড খণ্ড বিক্ষোভও সংগঠিত হয়েছিল।[৮২]

১৯৪৭ থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত প্রায় একটানা তীব্র খাদ্যাভাব ও দুর্ভিক্ষাবস্থা জনগণের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল, সেটা ভাষা আন্দোলনের সময় সুদূর গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত সরকারবিরোধী বিক্ষোভ বিস্তৃত হওয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল।

১৯৪৮ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত পূর্ব বাংলায় ময়মনসিংহ, সিলেট ও রাজশাহী জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সরকারের বিরুদ্ধে কৃষকসংগ্রাম সংগঠিত হয়। যশোর-খুলনার কোন কোন এলাকাতে তুলনামূলকভাবে ছোট আকারে হলেও কৃষক আন্দোলন ঘটতে দেখা যায়। ময়মনসিংহ, সিলেট ও রাজশাহী জেলায় কৃষক আন্দোলন সশস্ত্র আকারও ধারণ করে। ময়মনসিংহে হাজং সম্প্রদায় টংক প্রথা উচ্ছেদের জন্য সংগ্রাম করে। সিলেটে নানকাররা নানকার প্রথা উচ্ছেদের জন্য সংগ্রাম করে। রাজশাহীর নাচোল অঞ্চলে সাঁওতাল কৃষকরা স্থানীয় ভূমিমালিকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এসব সংগ্রামের ফলে পূর্ব বাংলার সরকার ১৯৫০ সালে টংক ও নানকার প্রথা উচ্ছেদ করতে বাধ্য হয়।[৮৩]

কিন্তু শুধু কৃষকরাই নয়, শ্রমিকরাও ১৯৪৭ সাল থেকে পূর্ব বাংলাব্যাপী দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, খাদ্যাভাব, স্বল্প মজুরি ইত্যাদির বিরুদ্ধে একটানা আন্দোলন করে। চা-বাগানশ্রমিক, রেলশ্রমিক ও কর্মচারী, সুতাকল, সিমেন্ট, পোর্ট ও ডকশ্রমিকরা মাঝে মাঝে ধর্মঘট করে এবং খণ্ড খণ্ড আন্দোলন গড়ে তোলে। সে সময়ে শিল্পের তেমন কোন বিকাশ না ঘটায়

৮২. উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ, ১-১২৬।
৮৩. ঐ, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, ১৮৪-৩১৪।

শ্রমিকদের সংখ্যা বৃটিশ আমলের তুলনায় বেশি ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও শ্রমিক-অসন্তোষ ও শ্রমিক-ধর্মঘট সরকারের বিরুদ্ধে জনমত গঠনে কিছুটা সহায়তা করে।[৮৪]

১৯৫০ সালে পূর্ব বাংলার প্রাথমিক শিক্ষকগণ বিভিন্ন দাবির ভিত্তিতে ৪ থেকে ৬ মার্চ প্রতীক ধর্মঘট করেন। কিন্তু সরকার তাঁদের দাবিদাওয়া অগ্রাহ্য করায় শিক্ষকগণ ঐ বছরই ১ এপ্রিল থেকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য ধর্মঘট শুরু করেন। এই ধর্মঘটের সমর্থনে শুধু শিক্ষকগণই নয়, জনসাধারণও স্থানে স্থানে সভা ও সমাবেশ করে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও সরকার শিক্ষকদের দাবিদাওয়া মেনে নিতে অস্বীকার করায় দুই মাসকাল স্থায়ী হওয়ার পর ২ জুন ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হয়। শিক্ষকদের এই ধর্মঘট দাবিদাওয়া আদায়ে ব্যর্থ হলেও সরকারের অনমনীয় মনোভাবের জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে সরকারের বিরুদ্ধে জনগণ যথেষ্ট বিক্ষুব্ধ হয়।[৮৫]

১৯৪৮ সাল থেকেই সরকার সংবাদপত্রের উপর হামলা শুরু করে। এই হামলার কবলে প্রধানত সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলি পড়লেও বিরোধী মতাবলম্বী দৈনিক পত্রিকাগুলিও তা থেকে রেহাই পায় নি। পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ, জরিমানা, তলব, সম্পাদক ও সাংবাদিক গ্রেফতার ইত্যাদি দমনমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে পূর্ব বাংলায় সে সময় সংবাদপত্রের উপর হামলা একটি নিয়মিত ব্যাপারে পরিণত হয়। এই হামলার বিরুদ্ধে সাংবাদিক ও সংবাদপত্রের মালিকগণ প্রতিরোধ গড়ে তোলেন এবং জনসাধারণও তাঁদেরকে অনেক সাহায্য করে।[৮৬]

ময়মনসিংহ, সিলেট, রাজশাহী ইত্যাদি জেলায় কৃষক আন্দোলন প্রধানত কমিউনিস্টদের নেতৃত্বেই পরিচালিত হয় এবং সেখানে তাদের উপর সরকার সব ধরনের নির্যাতন চালায়, কৃষকদের গুলি করে হত্যা পর্যন্ত করে।[৮৭] ১৯৫০ সালের ২৪ এপ্রিল রাজশাহী জেলের অভ্যন্তরে কমিউনিস্ট রাজবন্দীদের উপর গুলি চালিয়ে সরকার সাত জনকে হত্যা করে। অনেকেই আহত হন। এছাড়া ১৯৪৯ সালে ঢাকা, রাজশাহী ইত্যাদি জেলার কেন্দ্রীয় কারাগারসহ অন্যান্য জেলে কমিউনিস্ট রাজবন্দীদের উপর সরকারি নির্যাতনের বিরুদ্ধে শতশত রাজবন্দী কয়েকবার অনশন ধর্মঘট করেন। অনশন ধর্মঘটের সময়েও তাঁদের উপর নির্যাতন চালানো হয়।[৮৮]

ছাত্রদের উপরেও সরকারি নির্যাতন ১৯৪৭ থেকে নিয়মিত হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৪৮ সালের মধ্যেই ঢাকা এবং পূর্ব বাংলার অন্যান্য এলাকায় শতশত ছাত্রকে গ্রেফতার করা

৮৪. ঐ, তৃতীয় খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ, বইঘর, চট্টগ্রাম, ১-৬৬।
৮৫. ঐ, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, ১০৫-১২৮।
৮৬. ঐ, দ্বিতীয় খণ্ড, ৩৫৪-৩৬৫।
৮৭. ঐ, ১৯২-৩১৪।
৮৮. ঐ, প্রথম খণ্ড, তৃতীয় সংস্করণ, ৩১৪-৩২৮, ৩৩২-৩৩৭।

হয় এবং তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও নিজ নিজ এলাকা থেকে বহিষ্কার করা হয়। এসবের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ' ১৯৪৯ সালের ৮ জানুয়ারি পূর্ব বাংলাব্যাপী 'জুলুম প্রতিরোধ দিবস' পালনের জন্য ছাত্রদের প্রতি আহ্বান জানায়। এই আহ্বানে ছাত্র ফেডারেশনও সমর্থন প্রদান করে। ৮ জানুয়ারি ঢাকা এবং পূর্ব বাংলার অন্যান্য শহর ও বিভিন্ন অঞ্চলে 'জুলুম প্রতিরোধ দিবস' পালিত হয়।[৮৯]

১৯৫১ সালের নভেম্বর মাসে পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদে 'জননিরাপত্তা আইন'-এর মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য একটি অধ্যাদেশ পেশ করা হয়। এই অধ্যাদেশের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিবাদ সংগঠিত হলেও ৫ নভেম্বর সেটি গৃহীত হয় এবং এর মেয়াদ ১৯৫৩ সালের ১ অক্টোবর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।[৯০]

এই সময় সরকারের নির্যাতন যে কেবল কমিউনিস্ট ও ছাত্রদের উপরই জারি ছিল তাই নয়, প্রগতিশীল জনগণের সমগ্র অংশ, এমনকি মুসলিম লীগের অভ্যন্তরে সরকারবিরোধী অংশও এই নির্যাতনের কবল থেকে রেহাই পায় নি। প্রথম থেকেই পূর্ব বাংলা সরকারের বিভিন্ন নীতি নির্ধারণ ও কার্যাবলীর ক্ষেত্রে মুসলিম লীগ নেতৃত্ব থেকে আমলাতন্ত্রের প্রভাব তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি ছিল। শুধু তাই নয়, আমলাতন্ত্রের এই প্রভাব সমগ্র প্রশাসন ও সরকারি নীতির ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর বেড়েই চলছিল। এজন্য মুসলিম লীগের অন্তর্ভুক্ত হাজার হাজার রাজনৈতিক কর্মী এবং জেলা, মহকুমা অথবা তারও নিম্নপর্যায়ের নেতাদের কোন সমালোচনাই তৎকালীন পূর্ব বাংলার সরকারের নীতি অথবা কার্যাবলীর মধ্যে কোন পরিবর্তন সাধন করতে সক্ষম হচ্ছিল না। এর ফলে মুসলিম লীগের মধ্যেই সরকারবিরোধিতা ক্রমশ ব্যাপক আকার পরিগ্রহ করছিল এবং তার পরিণতিতে এই ধরনের বিরোধী মতাবলম্বীরা মুসলিম লীগ থেকে সাংগঠনিক দিক দিয়ে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিল।[৯১]

মুসলিম লীগ কর্মীদের ক্ষেত্রে যা ঘটছিল, সাধারণভাবে মুসলিম লীগ সমর্থক পত্র-পত্রিকাগুলির ক্ষেত্রেও ঘটছিল ঠিক তাই। সামান্য বিরোধিতা কোন জায়গায় দেখা দিলেই তাকে কমিউনিস্ট তৎপরতা বলে গণ্য করে সেই বিরোধিতাকে নির্যাতনেব মাধ্যমে স্তব্ধ ও বিলুপ্ত করতে সরকারের কোন ক্লান্তি ছিল না। এই নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ খুব ব্যাপক আকারে না হলেও বিভিন্ন আন্দোলনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে দানা বাঁধছিল। অসংগঠিত বিক্ষোভ ও প্রতিরোধ ধীরে ধীরে সংগঠিত ও দৃঢ় প্রতিরোধের রূপ পরিগ্রহ করছিল।

৮৯. ঐ, দ্বিতীয় খণ্ড, ৩৬৬-৩৭৯।

৯০. ঐ, ৩৭৪-৩৭৭।

৯১. ঐ, ৩৭৮-৩৭৯।

১৯৪৯ সালের ১২ মার্চ পাকিস্তান গণপরিষদের একটি প্রস্তাব অনুযায়ী শাসনতান্ত্রিক মূলনীতি নির্ধারক কমিটি গঠিত হয়েছিল। এই কমিটি ১৯৫০ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর গণপরিষদে অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্ট পেশ করে। এই রিপোর্টে কমিটি যেসব সুপারিশ করে তাতে সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে পুরোপুরিভাবে কেন্দ্রীভূত করার এবং পূর্ব বাংলা সরকারের হাতে যেটুকু ক্ষমতা তখনও ছিল সেটুকু কেড়ে নেয়ার চেষ্টা ছিল। সুপারিশগুলি প্রকাশিত হওয়ার পরই পূর্ব বাংলায় তুমুল বিক্ষোভ শুরু হয়। এই বিক্ষোভে শুধু বিরোধী দলীয় ব্যক্তি ও পত্র-পত্রিকাই অংশগ্রহণ করে নি, মুসলিম লীগ সমর্থক ব্যক্তি ও পত্রিকাগুলিও কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশ করে। মূলনীতি কমিটির সুপারিশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা ও ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে 'গণতান্ত্রিক ফেডারেশন' নামে একটি সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়। এই সংগ্রাম কমিটির আহ্বানে ১৯৫০ সালের ৪ ও ৫ নভেম্বর ঢাকায় একটি জাতীয় মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে কতকগুলি পাল্টা শাসনতান্ত্রিক সুপারিশও পেশ করা হয়। এর পর গণতান্ত্রিক ফেডারেশন-এর পক্ষ থেকে ১২ নভেম্বর মূলনীতি কমিটির সুপারিশের বিরুদ্ধে সভা-সমাবেশ ও মিছিলের মাধ্যমে পূর্ব বাংলাব্যাপী বিক্ষোভের জন্য জনসাধারণ ও ছাত্রদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম কমিটিও ঐ একই দিনে ছাত্র-ধর্মঘটের আহ্বান জানায়। এর ফলে ঢাকা ও পূর্ব বাংলার বিভিন্ন স্থানে ছাত্র ও জনসাধারণ ব্যাপকভাবে মিটিং-মিছিলের মাধ্যমে সুপারিশগুলির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এভাবে পূর্ব বাংলার সর্বত্র কমিটির সুপারিশের বিরুদ্ধে জনগণ সংগঠিত হতে শুরু করায় পাকিস্তান সরকার ভীত হয়ে পড়ে এবং ১৯৫০ সালের ২১ নভেম্বর রিপোর্টটি সম্পর্কে পরিষদীয় আলোচনা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[৯২]

১৯৫০ সালের এই শাসনতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে জনগণের, বিশেষত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চেতনায় একটি তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। এদিক দিয়ে এ আন্দোলন পূর্ব বাংলার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করে।

১৯৪৭ সালের আগস্ট মাস থেকেই পূর্ব বাংলার জনগণের উপর মুসলিম লীগ শাসনের শোষণ-নির্যাতন শুরু হয় এবং ক্রমশ তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু ১৯৫০ সালের এই আন্দোলনের পূর্বে সেই শোষণ ও নির্যাতনকে মূলত কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত হিসেবে না দেখার ফলে জনগণের বিক্ষোভ তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি প্রাদেশিক সরকার ও প্রাদেশিক মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে প্রকাশ পায়। আমলাদের বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই যথেষ্ট বিক্ষোভ থাকা সত্ত্বেও তাদের মূলত কেন্দ্রীয় সরকারের এজেন্ট হিসেবে না দেখে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অবাঙালি হিসেবে চিহ্নিত করেই জনগণ ক্ষান্ত থাকতো। শুধু তাই নয়, সেসময়ে প্রাদেশিক সরকার, প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ও প্রাদেশিক আমলাতন্ত্রের

৯২. ঐ, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, ৩৮০-৪১৬।

বিরুদ্ধে নির্যাতন, দুর্নীতি ইত্যাদির প্রতিকারকল্পে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন জানানো হতো। কারণ তখন জনগণ সাধারণভাবে মনে করতো যে, প্রাদেশিক সরকারই মুসলিম লীগ ও আমলাতন্ত্রের সাহায্যে জনগণের উপর নির্যাতন চালাচ্ছে, কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে বুঝি এর বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই।[৯৩]

১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গণপরিষদের মূলনীতি কমিটির সুপারিশ প্রকাশিত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে। কারণ এই সুপারিশগুলি যে পূর্ব বাংলার উপর শোষণ-নির্যাতন কায়েম করার উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়েছে তা জনগণ অচিরেই জানতে পারে। মূলনীতি কমিটি যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ নির্দেশ ও তদারকিতেই এই সমস্ত সুপারিশ প্রদান করেছিল, সেজন্য এর সমস্ত দায়িত্ব যে কেন্দ্রীয় সরকারের সে বিষয়ে জনগণের মনে কোন সন্দেহ রইলো না।[৯৪]

এই চেতনার ফলেই প্রাদেশিক সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকারের এজেন্ট হিসেবে বিবেচনা করে জনগণ তাদের শাসনতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে মূলত কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধেই পরিচালনা করে। কিন্তু এর পর থেকে শুধু শাসনতান্ত্রিক অধিকারের সংগ্রামই নয়, সর্বপ্রকার গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারকে জনগণ মূল শত্রু হিসেবে বিবেচনা করে পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানী শাসন, শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে ক্রমাগত নিজেদের গণতান্ত্রিক সংগ্রাম সংগঠিত করতে থাকে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন ছিল এই গণতান্ত্রিক সংগ্রামেরই একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত।

১৯৪৮ সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সময় যে সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়েছিল তার কোন কার্যকারিতা পরবর্তী কয়েক বছর আর থাকে নি। প্রতি বছরের মতো ১৯৫১ সালেও ১১ মার্চ রাষ্ট্রভাষা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একটি ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। খালেক নেওয়াজ খানের সভাপতিত্বে এই সভায় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির নিষ্ক্রিয়তা সম্পর্কে বক্তাদের আলোচনার পর তা পুনর্গঠিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং ঐ সভাতেই আবদুল মতিনকে আহ্বায়ক করে 'বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' নামে একটি কমিটি গঠিত হয়। এভাবে কমিটি গঠিত হওয়ার কয়েক দিন পর তহবিল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে 'পতাকা দিবস' উদযাপন করা হয় এবং গণপরিষদের সদস্যদের কাছে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি সম্বলিত একটি স্মারকলিপি প্রদানের উদ্দেশ্যে এ সংক্রান্ত একটি খসড়া কমিটিও গঠন করা হয়। এই কমিটি যে খসড়া তৈরি করে, সেটি ২৫ মার্চ তারিখে হাবিবুর রহমান শেলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের এক বৈঠকে বিবেচিত ও গৃহীত হয়। এই বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্মারকলিপিটি মুদ্রণের পর

৯৩. ঐ।
৯৪. ঐ।

তার কপি পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্যদের কাছে এবং পাকিস্তানের সব পত্রিকাতে পাঠানো হয়।[৯৫]

১৯৫১ সালের ১৬ অক্টোবর লিয়াকত আলী খান রাওয়ালপিন্ডিতে আততায়ীর গুলিতে নিহত হন। তারপর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন খাজা নাজিমুদ্দিন। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে খাজা নাজিমুদ্দিন ১৯৫২ সালের জানুয়ারি মাসের শেষদিকে ঢাকায় আসেন এবং ২৭ জানুয়ারি পল্টন ময়দানে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা দেন। সেই বক্তৃতায় প্রাদেশিকতা সম্পর্কে কিছু বক্তব্য প্রদানের পর তিনি বলেন যে, পূর্ব বাংলার ভাষা কি হবে সেটা পূর্ব বাংলার জনগণই নির্ধারণ করবে। কিন্তু পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু, অন্য কোন ভাষা নয়।[৯৬]

খাজা নাজিমুদ্দিনের এই বক্তৃতার পরই 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার দেওয়ালে পোস্টার লাগায় এবং ৩০ জানুয়ারি প্রতীক ধর্মঘট ও সভা আহ্বান করে। সে অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় ৩০ জানুয়ারি যে ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয় সেখানে তাঁরা ১৯৪৮ সালে সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে খাজা নাজিমুদ্দিনের স্বাক্ষরিত চুক্তি রক্ষার দাবি জানায়। সভায় বক্তারা রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে নতুনভাবে সংগঠিত করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সঙ্কল্প ঘোষণা করেন। সভায় ৪ ফেব্রুয়ারি ভাষার দাবিতে ঢাকার সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভাশেষে ছাত্ররা মিছিল করে ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণ করে।[৯৭]

বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় এই সভা অনুষ্ঠানের পরদিনই পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে কাজী গোলাম মাহবুব ৩১ জানুয়ারি ঢাকার বার লাইব্রেরি হলে একটি সর্বদলীয় সভা আহ্বান করেন। আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে ৩১ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত এই সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদসহ অপরাপর রাজনৈতিক এবং ছাত্র সংগঠনও যোগদান করে। এ সভায় একটি প্রস্তাবে পল্টন ময়দানের বক্তৃতায় খাজা নাজিমুদ্দিনের রাষ্ট্রভাষা বিষয়ক বক্তব্যের বিরুদ্ধে নিন্দা ও প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয় এবং অবিলম্বে তাঁর সেই বক্তব্য প্রত্যাহার করার দাবি জানানো হয়। অপর একটি প্রস্তাবে বাংলা ভাষায় আরবি হরফ প্রচলনের সরকারি চক্রান্তের বিরোধিতা করে সে চক্রান্ত বন্ধ করার দাবি জানানো হয়। ৪ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ যে ধর্মঘট আহ্বান করে তার প্রতি সমর্থন জানিয়েও একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। বার লাইব্রেরির এই সভায় কাজী গোলাম মাহবুবকে আহ্বায়ক করে চল্লিশ সদস্যবিশিষ্ট একটি সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয় এবং এই কমিটির সদস্যদের মধ্যে থাকেন মওলানা ভাসানী, আবুল হাশিম, আতাউর

৯৫. ঐ, তৃতীয় খণ্ড, ১২৯-১৩৯।
৯৬. *The Morning News*, 28.1.1952; *নওবেলাল*, ৩১.১.১৯৫২।
৯৭. *The Pakistan Observer*, 30.1.1952; *The Morning News*, 31.1.1952.

রহমান খান, কামরুদ্দীন আহমদ, শামসুল হক, মোহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, আবদুল মতিন ও খালেক নেওয়াজ খান।[৯৮]

৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ ঢাকা শহরের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয় এবং ধর্মঘটের পর ছাত্ররা মিছিল সহকারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সমবেত হয়। এরপর গাজীউল হকের সভাপতিত্বে সেখানে একটি ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আবদুল মতিন, কাজী গোলাম মাহবুব এবং অন্য কয়েকজন ছাত্রনেতা বক্তৃতা করেন। এসব বক্তৃতায় নাজিমুদ্দিনের পল্টন বক্তৃতার তীব্র বিরোধিতা করে ১৯৪৮ সালে স্বাক্ষরিত চুক্তি বাস্তবায়নের দাবি জানানো হয়। সভার একটি প্রস্তাবে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'কে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের একটি অঙ্গ হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ২০ ফেব্রুয়ারি পূর্ব বাংলা পরিষদের পরবর্তী অধিবেশন শুরু হবার কথা ইতিপূর্বে সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়েছিল। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই বিশ্বদ্যিালয়ের এই সভায় ২১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে সারা পূর্ব বাংলায় এক সাধারণ ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভা সমাপ্ত হওয়ার পর হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে বের হয়ে শ্লোগান দিতে দিতে প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমিনের বাসভবন হয়ে, হাইকোর্টের সামনে দিয়ে নবাবপুর, পাটুয়াটুলী, আর্মানিটোলা, নাজিমুদ্দিন রোড অতিক্রম করে পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ফিরে আসে।[৯৯] ৪ ফেব্রুয়ারি বিকেলেই সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের একটি সভায় একুশে ফেব্রুয়ারি প্রদেশব্যাপী এক সাধারণ ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সভায় মওলানা ভাসানী, আবুল হাশিমসহ সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের অনেক সদস্য উপস্থিত থাকেন এবং ভাষার দাবি সুপ্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার সঙ্কল্প ঘোষণা করেন।[১০০] ৪ ফেব্রুয়ারি শুধু ঢাকাতেই নয়, পূর্ব বাংলার প্রায় সর্বত্র ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়।[১০১]

২০ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৫টার দিকে আওয়ামী মুসলিম লীগের অফিস ৯৪, নবাবপুর রোডে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের একটি বৈঠক বসে। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন আবুল হাশিম। বৈঠক চলতে থাকার সময়েই মাইকযোগে সরকারি ঘোষণা প্রচার করা হতে থাকে যে, ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ২০ ফেব্রুয়ারি থেকেই ৩০ দিনের জন্য শহরে ১৪৪ ধারা জারি করেছেন। রেডিওর মাধ্যমেও ঐ একই ঘোষণা প্রচার করা হয়। এভাবে ১৪৪ ধারা জারির ফলে সমস্ত পরিস্থিতির মধ্যে আমূল পরিবর্তন দেখা দেয়। সংগ্রাম কমিটির ঐদিনের বৈঠকে ১৪৪ ধারার প্রশ্নটিই বড় হয়ে দেখা দেয় এবং ১৪৪ ধারা ভঙ্গ

৯৮. *The Morning News* ,1.2.1952; *দৈনিক আজাদ,* ১.২.১৯৫২।

৯৯. *নওবেলাল*, ১৪.২.১৯৫২; গাজীউল হক, *একুশের সংকলন* ১৯৮০, বাংলা একাডেমী, ২৩৫; *The Morning News*, 5.2.1952.

১০০. *একুশের ইতিহাস,* হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২২৩।

১০১. *সাপ্তাহিক ইত্তেফাক*, ১০.২.১৯৫২।

করা হবে কি হবে না এই নিয়ে কমিটির সদস্যদের মধ্যে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়। অধিকাংশ সদস্যই ১৪৪ ধারা ভঙ্গের বিরোধিতা করেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন আবুল হাশিম, কামরুদ্দীন আহমদ, খয়রাত হোসেন, শামসুল হক, মোহাম্মদ তোয়াহা, কাজী গোলাম মাহবুব, আবদুস সামাদ প্রমুখ। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার পক্ষে এঁদের মূল যুক্তি ছিল এই যে, ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করলে দেশে বিশৃঙ্খলা ও সঙ্কটজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে, ফলে সাধারণ নির্বাচন বাতিল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেবে। সরকার ১৯৪৭ সালের পর থেকে সাধারণ নির্বাচন দেয় নি। এই পরিস্থিতিতে নির্বাচন যদি আরো পিছিয়ে যায় বা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত থাকে, তা হলে তা গণতন্ত্রের পক্ষে খুব বিপজ্জনক হবে। এছাড়া সারা দেশে কোন সুসংগঠিত রাজনৈতিক দল না থাকায় এবং রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের কোন সাংগঠনিক কাঠামো প্রদেশব্যাপী গড়ে না উঠায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গজনিত পরিস্থিতি মোকাবেলা করার অসম্ভাব্যতার দিকটিও তাঁরা যুক্তি হিসেবে তুলে ধরেন। অন্যদিকে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে যুক্তি প্রদান করতে গিয়ে অলি আহাদ ও আবদুল মতিন বলেন যে, ১৪৪ ধারা জারি করে সরকার যে পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে তাতে সরকারি নিষেধাজ্ঞার কাছে নতি স্বীকার করলে ভাষা আন্দোলনের কোন অগ্রগতি তো হবেই না, উপরন্তু তা ধ্বংস হবে।[১০২]

সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের বৈঠকে এই বিতর্ক চলাকালে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'-এরও একটি বৈঠক বসে। সেই বৈঠকে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের সভা চলাকালে তাঁদেরকে বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া হয় এবং সেই সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করে অলি আহাদ ও আবদুল মতিন বলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদের গুরুত্বই আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে বেশি; কাজেই তাঁরা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন সর্বদলীয় পরিষদকেও সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।[১০৩] অধিক রাত্রি পর্যন্ত এই বিতর্ক চলার পর অবশেষে তা ভোটে দেওয়া হয়। অলি আহাদ ও আবদুল মতিনসহ মাত্র চারজন ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে ভোট দেন। কাজেই অধিকাংশ ভোটে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা হবে কি হবে না সেটা পরদিন ২১ ফেব্রুয়ারি সকালের দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাতেই চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হবে। এই কথার পর সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদে এই মর্মে মত প্রকাশ করা হয় যে, পরদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সভায় বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যদি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা হয়, তা হলে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত বলে ধরে নেওয়া হবে। ২০ ফেব্রুয়ারি তারিখের এই বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, ২১

১০২. উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, তৃতীয় খণ্ড, ২৫৪-২৬১

১০৩. ঐ।

ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসভায় সর্বদলীয় পরিষদের পক্ষ থেকে শামসুল হক ও কাজী গোলাম মাহবুব ছাত্রদেরকে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের সিদ্ধান্তের বিষয় অবহিত করবেন এবং সেই সাথে সিদ্ধান্তটি ব্যাখ্যা করবেন।[১০৪] পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির পূর্ববঙ্গ সাংগঠনিক কমিটি ২০ ফেব্রুয়ারি তারিখে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের আহ্বানে সাড়া দিন, সকল ভাষার সমমর্যাদা ও বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ২১ ফেব্রুয়ারি প্রদেশব্যাপী ধর্মঘট, হরতাল, সভা ও শোভাযাত্রা করুন' শীর্ষক একটি সাইক্লোস্টাইল করা ইশতেহার প্রচার করে।[১০৫]

২১ ফেব্রুয়ারি বেশ সকাল থেকেই ছাত্ররা ঢাকা শহরে বিভিন্ন এলাকায় পিকেটিং-এর উদ্দেশ্যে উপস্থিত হয়। নবাবপুর এলাকায় পিকেটিং শুরু করার পর আওয়ামী মুসলিম লীগ, মুসলিম ছাত্রলীগ ইত্যাদি যারা ধর্মঘটের বিরুদ্ধে ছিল এবং এই পিকেটিং-এরও পক্ষে ছিল না, তাদের সঙ্গে এজন্য পিকেটিংরত ছাত্রদের নবাবপুরে একটা সংঘর্ষকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। কিন্তু তা বিস্তারলাভ করার আগেই ছাত্রসহ সকলে পিকেটিং বন্ধ রেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে ফিরে যায়। সকাল ৯টা থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সারা শহর থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা এসে সমবেত হতে থাকে এবং তাদের সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে। এসময় অসংখ্য পুলিশকে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়, বিশেষকরে তৎকালীন কলাভবনের সামনে মোতায়েন করা হয়। পুলিশের এ সমাবেশ দেখে ছাত্রদের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে থাকে।[১০৬]

সকাল ১০টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ ছাত্র-ছাত্রী দ্বারা প্রায় ভর্তি হয়ে যায় এবং তারপর গাজীউল হকের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় ছাত্রদের সভা শুরু হয়। পূর্বসিদ্ধান্ত অনুযায়ী শামসুল হক ও কাজী গোলাম মাহবুব সমবেত ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের সিদ্ধান্তের যথার্থতা বোঝাতে চেষ্টা করলে ছাত্রদের মধ্যে যথেষ্ট উত্তেজনা দেখা দেয়। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীরা সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করতে বদ্ধপরিকর।[১০৭]

সভা শুরু হবার পর শামসুল হক ও কাজী গোলাম মাহবুব ছাড়াও মোহাম্মদ তোয়াহা ও খালেক নেওয়াজ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার সপক্ষে বক্তব্য রাখেন। অন্যদিকে আবদুল

১০৪. ঐ।

১০৫. উমর, *ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ ঃ কতিপয় দলিল*, প্রথম খণ্ড, ৩১৩।

১০৬. উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, তৃতীয় খণ্ড, নবম পরিচ্ছেদ, ২৬৫।

১০৭. অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ১৯৭৫*, ১৫২-১৫৩; গাজীউল হক, *একুশের সংকলন*, বাংলা একাডেমী, ১৪৬।

মতিন ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে মত প্রকাশ করে বলেন যে, আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে গেলে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করতেই হবে। অলি আহাদ ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে থাকলেও তিনি সভায় এ বিষয়ে কোন বক্তব্য রাখেন নি। এ সম্পর্কে তিনি বলেন যে, তিনি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করতে চান, কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও চান যাতে এমন বাক-বিতণ্ডা শুরু না হয় যাতে করে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের এবং আন্দোলনের ঐক্য বিনষ্ট হয়।[১০৮]

সভা ঘণ্টাখানেক চলার পর অবশেষে গাজীউল হক সভাপতি হিসেবে বক্তব্য রাখেন এবং ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে সভার পক্ষ থেকে ঘোষণা প্রদান করেন। ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত এভাবে ঘোষিত হওয়ার পর ছাত্র-ছাত্রীরা উত্তেজিত হয়ে '১৪৪ ধারা ভাঙতে হবে', 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' ইত্যাদি শ্লোগান দিতে থাকে। এই সময় ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার পদ্ধতি নির্ধারণ করে স্থির হয় যে, দশ জন করে এক এক ব্যাচে ছাত্র-ছাত্রীরা বের হয়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করতে হবে, অন্যথায় সকলে একসঙ্গে বের হতে চাইলে চারদিকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হাবিবুর রহমান শেলীর নেতৃত্বে ১৪৪ ধারা ভঙ্গকারী প্রথম দলটি গেট থেকে রাস্তায় বের হয়।[১০৯]

ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গের প্রস্তুতি নেওয়ার সময় এবং ১৪৪ ধারা ভঙ্গকালেও ছাত্র ও পুলিশের মধ্যে কিছু ইটপাটকেল ছোড়াছুড়ি হতে থাকে। কিছুক্ষণ এভাবে চলার পর পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার মধ্যে সমবেত ছাত্রদের দিকে কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করে। ছাত্র-ছাত্রীরা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে গেটের বাইরে গেলে পুলিশ অনেককেই গ্রেফতার করে গাড়িতে করে ঢাকার বাইরে কিছুদূরে নিয়ে ছেড়ে দেয়। একটি খুব মোটা রশি দিয়ে পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের গেট বন্ধ রাখার চেষ্টা করে, কিন্তু বেলা ১২টা থেকে ছাত্ররা সেই রশির বাধা পার হয়ে দলে দলে মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলের দিকে যেতে থাকে। মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলটি তখন ছিল তৎকালীন ব্যবস্থাপকসভা ভবনের (বর্তমান জগন্নাথ হলের) একেবারে কাছাকাছি। মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলে ছাত্রদের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে চারদিকে মোতায়েন করা পুলিশের সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হচ্ছিল এবং উভয় দিকে উত্তেজনাও বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এই পরিস্থিতিতে মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল এলাকাতেও ছাত্র ও পুলিশের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে ইটপাটকেল ছোড়াছুড়ি চলছিল। এক পর্যায়ে পুলিশ মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে সমবেত ছাত্রদের উপর কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করতে থাকে এবং লাঠিচার্জ করার উদ্দেশ্যে হোস্টেলের ভিতরে প্রবেশ করে। ছাত্ররাও তখন পুলিশের দিকে বেশি করে ইটপাটকেল ছুড়তে থাকে।[১১০]

---

১০৮. অলি আহাদ, ঐ, ১৫৪; গাজীউল হক, ঐ, ১৪৭।

১০৯. গাজীউল হক, ঐ, ১৪৭; মুহম্মদ সুলতান, *একুশের সংকলন ১৯৮০,* বাংলা একাডেমী, ৮২; হাবিবুর রহমান, *একুশের সংকলন ১৯৮০,* ৫৯।

১১০. উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি,* তৃতীয় খণ্ড, নবম পরিচ্ছেদ, ২৭৮-২৮৩।

এভাবে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ চলাকালে বেলা প্রায় ৩ টার দিকে পরিস্থিতির বেশ অবনতি ঘটে। এই সময় পুলিশের ডি. আই. জি., জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টসহ অনেক উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মকর্তা ও সরকারি আমলা ঘটনাস্থলে ছিলেন। পুলিশের সঙ্গে সঙ্গে এই ঊর্ধ্বতন কর্মচারীরাও যথেষ্ট উত্তেজিত হয়ে উঠেন এবং ছাত্ররা পিছু হটতে অস্বীকার করে ব্যবস্থাপক পরিষদ ভবনের দিকে যাওয়ার পথে পুলিশের দিকে এগিয়ে আসার চেষ্টা করতে থাকলে তাঁদের উত্তেজনাও বৃদ্ধি পায়। এ সময় পুলিশ পক্ষ থেকে ছাত্রদেরকে দু'একবার সতর্ক করে দেওয়া হয়। কিন্তু তাতে পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন না হওয়ায় পুলিশ কয়েক রাউন্ড ফাঁকা আওয়াজ করে। এই আওয়াজ শোনার পর ছাত্ররা পিছু হটে মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলের শেডগুলির (এই শেডগুলির মেঝে এবং দুই ফুট পর্যন্ত দেওয়াল পাকা, দেওয়ালের বাকি অংশ বেড়া এবং ছাদ টিনের ছিল) মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। শেডের দেওয়াল বেড়ার তৈরি হওয়ায় অধিকাংশ ছাত্রই মেঝের উপর শুয়ে পড়ে। এই সময় চীৎকার করে কেউ কেউ বলে যে, পুলিশ ফাঁকা আওয়াজ করছে। ছাত্ররা এই কথা শোনার পর দলে দলে শেডগুলি থেকে বের হয়ে হোস্টেল প্রাঙ্গণে ছড়িয়ে পড়ে এবং তাদের একটা অংশ গেটের দিকে এগিয়ে যায়। এই সময়েই পুলিশ আরেক দফা গুলিবর্ষণ করে। এবার তারা ছাত্রদের দিকে লক্ষ্য করেই অনেক রাউন্ড গুলি ছোড়ে এবং সেই গুলিতেই বেশ কিছু সংখ্যক ছাত্র হতাহত হয়।[১১১]

গেটের সামনেই একজন ছাত্র মাথায় গুলিবিদ্ধ হন। তাঁর মাথার খুলি উড়ে গিয়ে ছিটকে মগজ বেরিয়ে যায় ও পাশে খড়কুটোর উপর পড়ে। পরে খড়কুটোসহ মগজ আবার খুলির মধ্যে ঢুকিয়ে তাঁকে পার্শ্ববর্তী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। আবুল বরকত নামে আরেকজন ছাত্র ১২ নং শেড থেকে বের হয়ে ফাঁকা জায়গায় দাঁড়ানো অবস্থায় উরুতে গুলিবিদ্ধ হন। তিনি তৎক্ষণাৎ পড়ে যান এবং তাঁর ক্ষতস্থান থেকে ভয়ানক রক্তক্ষরণ হতে থাকে। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে সন্ধ্যার দিকে হাসপাতালে আবুল বরকতের মৃত্যু ঘটে। কম-বেশি আহত হন প্রায় ষাট জন ছাত্র। এদের অধিকাংশকেই প্রাথমিক চিকিৎসার পর হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হলেও একজন সেদিনই সন্ধ্যা-রাত্রিতে মারা যান। এই নিয়ে ২১ ফেব্রুয়ারিতে নিহতের সংখ্যা দাঁড়ায় তিন।[১১২]

২১ ফেব্রুয়ারি মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলের কাছাকাছি ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে যোগদানের জন্য সভার সদস্যরা পরিষদভবনে যখন উপস্থিত ছিলেন সেই সময়েই ছাত্রদের উপর গুলিবর্ষণ করা হয়। গুলির আওয়াজ সেখান থেকেও শোনা যায়। গুলির কিছুক্ষণ পর ছাত্ররা মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণের যেদিকে পরিষদভবন অবস্থিত ছিল সেদিকে

১১১. ঐ, ২৮৪-২৯২
১১২. ঐ, ২৮৫-২৯৫

সমবেত হয়ে পরিষদসদস্যদেরকে বাইরে বের হয়ে আসার জন্য চীৎকার করে আহ্বান জানাতে থাকে। এ সময় পরিষদের অভ্যন্তরেও দারুণ হট্টগোল শুরু হয়। মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ স্পীকারকে বলেন পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখতে যাতে করে তাঁরা সকলে বাইরে যেতে পারেন। ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও মনোরঞ্জন ধর নূরুল আমিনকে বলেন যে, তাঁর উচিত তৎক্ষণাৎ মেডিক্যাল হাসপাতাল পরিদর্শন করা এবং তারপর পরিস্থিতি সম্পর্কে পরিষদে বিবৃতি দেওয়া। নূরুল আমিন এই প্রস্তাবে সম্মত না হওয়ায় বিরোধী পক্ষীয় সদস্যগণ সেদিনের মতো অধিবেশন স্থগিত রাখার দাবি করেন। কিন্তু নূরুল আমিন বিরোধী পক্ষের দাবি অগ্রাহ্য করে নিজের বিবৃতি দিতে শুরু করলে পুলিশের গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে পরিষদের অধিবেশন বর্জন করে মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, আবুল কালাম শামসুদ্দিন, আনোয়ারা খাতুন এবং আলী আহমদ খান পরিষদভবন পরিত্যাগ করে বাইরে ছাত্রদের সামনে উপস্থিত হন।[১১৩]

মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলের একটি কামরায় মাইক বসিয়ে ছাত্ররা আগে থেকেই বক্তৃতা করছিল এবং গুলিবর্ষণের পর তাদের সেই বক্তৃতায় স্বাভাবিকভাবেই সরকারি নির্যাতনের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় ক্ষোভ প্রকাশ করা হচ্ছিল। আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ পরিষদভবন থেকে প্রথম বের হয়ে আসার পর তাঁকে হোস্টেলের ভিতরে মাইকের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখান থেকে তিনি মাইকে ছাত্রদের উদ্দেশে বক্তৃতা করেন।[১১৪]

ঐ দিন সন্ধ্যার দিকেই মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলের মাইক থেকে ঘোষণা দেওয়া হয় যে, পরদিন ২২ ফেব্রুয়ারি সকাল সাতটায় মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে শহীদ ছাত্রদের জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। রাতে মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলের একটি কামরায় তোয়াহা, অলি আহাদ, এমাদুল্লাহ, আবদুল মতিন, গোলাম মাওলা প্রমুখ বৈঠকে মিলিত হন। এই বৈঠকে তাঁরা সিদ্ধান্ত নেন যে, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ এবং বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ সেমুহূর্তে অকার্যকর হয়ে যাওয়ার কারণে সংগ্রাম পরিষদকে নতুনভাবে সংগঠিত করা দরকার। এ কারণে সেই বৈঠকেই মেডিক্যাল কলেজ ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি এবং সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সদস্য গোলাম মাওলাকে অস্থায়ী সম্পাদক করে একটি নতুন সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। পরদিনের গায়েবি জানাজা ইত্যাদি সম্পর্কেও তাঁরা আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।[১১৫]

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি ধর্মঘটের যে আহ্বান জানানো হয় তার সমর্থনে ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় বহু দোকানপাট বন্ধ থাকে এবং যানবাহন চলাচলও হয় কম। কিন্তু ছাত্রদের উপর গুলিবর্ষণের খবর ছড়িয়ে পড়ার পর ঢাকার সমস্ত দোকানপাট ও যানবাহন চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়।

১১৩. ঐ, ৩০০-৩০৬।
১১৪. ঐ, ৩০৭।
১১৫. ঐ, ৩০৭-৩০৮।

২১ ফেব্রুয়ারি যে তিন জন ছাত্র নিহত হয়েছিলেন তাঁদের লাশ আত্মীয়-স্বজনের কাছে ফেরত না দিয়ে ঐ রাতেই পুলিশের তত্ত্বাবধানে আজিমপুর গোরস্থানে দাফন করা হয়েছিল। এজন্য ২২ তারিখ সকালে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে একুশের শহীদদের গায়েবি জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। সেই জানাজায় ছাত্ররা উপস্থিত থাকলেও সারা শহর থেকে হাজার হাজার লোক তাতে অংশগ্রহণ করেছিল।[১১৬]

গায়েবি জানাজা এবং সংক্ষিপ্ত জনসভার পর উপস্থিত ছাত্রসহ হাজার হাজার লোক মিছিল করে শহরের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। মিছিলটি শান্তিপূর্ণ থাকলেও হাইকোর্টের গেটের সামনের পথ অতিক্রম করার সময় মিছিলটির মাঝামাঝি জায়গায় পুলিশ লাঠিচার্জ করার ফলে প্রথমে সকলে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে, কিন্তু পরে মিছিলটি দুই ভাগ হয়ে এক ভাগ নাজিমুদ্দিন রোড ধরে চকবাজার, ইসলামপুর, পাটুয়াটুলী অতিক্রম করে পগোজ স্কুলের সামনে পৌঁছলে সেখানে পুলিশ আবার মিছিলটির উপর লাঠিচার্জ করে এবং একে পুরোপুরি ছত্রভঙ্গ করে দেয়। হাইকোর্টের সামনের দিকে মিছিলের যে অংশ ছিল সেটি তৎকালীন রমনা রেস্ট হাউসের সামনে দিয়ে নবাবপুর রোড ধরে অগ্রসর হয়। এ সময় রাস্তায় পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর গাড়ি ব্যতীত অন্য কোন যানবাহন সকাল দশটার পর আর দেখা যায় নি।[১১৭]

রথখোলার মোড়ে সরকারসমর্থক পত্রিকা *দৈনিক সংবাদ* অফিস পাহারা দেওয়ার জন্য এক ট্রাক সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন করা হয়। মিছিলটি যখন বংশাল রোডের মোড়ে সংবাদ অফিসের কাছাকাছি পৌঁছায়, তখন সশস্ত্র বাহিনীর লোকেরা তাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। এর ফলে দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং বাধা সত্ত্বেও মিছিলটি এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে ট্রাকের উপর থেকেই পুলিশ মিছিলের উপর গুলিবর্ষণ করে। এই গুলিবর্ষণের ফলে ঘটনাস্থলে অনেকে হতাহত হয়। বংশালের মোড় ছাড়াও নবাবপুর রোডের আরও কয়েকটি স্থানে পুলিশ মিছিলের উপর বিক্ষিপ্তভাবে গুলিবর্ষণ করে। ২২ ফেব্রুয়ারি বিভিন্ন স্থানে এভাবে গুলিবর্ষণের ফলে আট বছর বয়স্ক একটি বালকসহ পাঁচজন নিহত হয় এবং আহতদের সংখ্যা দাঁড়ায় পঞ্চাশেরও অধিক।[১১৮]

ঢাকা থেকে প্রকাশিত ইংরেজি দৈনিক *মর্নিং নিউজ* প্রথম থেকেই রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের বিরুদ্ধে নানা ধরনের মিথ্যা এবং উগ্র প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছিল। তার উপর একুশে ফেব্রুয়ারির গুলিবর্ষণের ঘটনার অনেক বিকৃত বিবরণ ও আন্দোলনের বিরুদ্ধে মন্তব্য ২২ তারিখে প্রকাশ করায় জনসাধারণ পত্রিকাটির বিরুদ্ধে ভয়ানক বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। সে সময় *মর্নিং নিউজ-এর* প্রেস এবং অফিস ছিল ভিক্টোরিয়া পার্কের (বর্তমান বাহাদুর শাহ পার্কের) নিকটবর্তী একটি গলিতে। সেই গলির দুই দিক থেকে বহু লোক

১১৬. ঐ, ৩২৩-৩২৪।

১১৭. *দৈনিক আজাদ*, ২৩.২.১৯৫২; অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি*, ১৬২-১৬৪; *একুশে ফেব্রুয়ারি* (হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত), ২২৮; মুহম্মদ সুলতান, *একুশের সংকলন* ১৯৮০, ৮৭।

১১৮. উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, তৃতীয় খণ্ড, ৩০০-৩৩২; *দৈনিক আজাদ*, ২৩.২.১৯৫২।

উক্ত প্রেস ও অফিসে আক্রমণ করে। তারা পত্রিকাটির অফিস তছনছ করে এবং প্রেস ও আসবাবপত্রে পেট্রোল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয়। এর ফলে *মর্নিং নিউজ*-এর প্রেস ও অফিস সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়। এই ঘটনাটি ঘটে নাজিমুদ্দিন রোড বরাবর মিছিলটি সদরঘাট এলাকায় পৌঁছানোর পূর্বে।[১১৯]

২১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পরিস্থিতি বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের কিছুটা নিয়ন্ত্রণে ছিল এবং সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ২১ ফেব্রুয়ারি সকাল থেকেই অকার্যকর হয়ে গিয়েছিল। ২২ ফেব্রুয়ারি গায়েবি জানাজার পর থেকে ঢাকা শহরের পরিস্থিতির উপর অবশ্য কারও কোন সাংগঠনিক নিয়ন্ত্রণ থাকে নি। শহরের বিভিন্ন এলাকায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে নানা ঘটনা ঘটে যাচ্ছিল। ১৪৪ ধারা বলবৎ থাকা সত্ত্বেও জনতা দলবদ্ধভাবে রাস্তায় ঘোরাফেরা করছিল এবং পুলিশের সাথে তাদের বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ হচ্ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়ও সেদিন এই ধরনের একটি সংঘর্ষ ঘটে এবং জনতার উপর পুলিশ লাঠিচার্জ করে। ২২ ফেব্রুয়ারি এসব সংঘর্ষের ফলে ঢাকায় ঠিক কত জন হতাহত হয়েছিল তার কোন সঠিক হিসাব দেওয়া কারও পক্ষেই সম্ভব ছিল না।[১২০]

২২ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় রেলওয়ে ওয়ার্কশপের শ্রমিক ও রেলকর্মচারীরা পূর্ণ ধর্মঘট পালন করে। এর ফলে রেলের চাকা সেদিন বন্ধ থাকে। নারায়ণগঞ্জেও রেলশ্রমিক ও কর্মচারীরা পূর্ণ ধর্মঘট পালন করে। ২১ তারিখের গুলি ও ছাত্রহত্যার খবর ঢাকার পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ার পর গ্রাম থেকে কৃষকরা দলে দলে ঢাকা শহরে এসে সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।[১২১]

২২ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক সভার একটি অধিবেশন বসে। তাতে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য পাকিস্তান সংবিধান সভার কাছে সুপারিশ করে একটি প্রস্তাব সরকারিভাবে পেশ করা হয়। প্রস্তাবটি পেশ করেন প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমিন।[১২২]

২২ ফেব্রুয়ারির মতো ২৩ ফেব্রুয়ারি তারিখেও ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। দোকানপাট, অফিস ও যানবাহন চলাচল একেবারে বন্ধ থাকে। নারায়ণগঞ্জে একটি জনসভাও অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব বাংলার সর্বত্র ছাত্র, শ্রমিক, কর্মচারীসহ জনগণের ব্যাপক অংশ ধর্মঘটে যোগদান করে।[১২৩] গ্রামাঞ্চলেও ঢাকার গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভমিছিল ও সভা অনুষ্ঠিত হয়। খুলনা জেলার মোরেলগঞ্জের কাছে

১১৯. ঐ, ৩২৮-৩৩০; *দৈনিক আজাদ*, ২৩.২.১৯৫২।

১২০. ঐ, ৩৩২-৩৩৩; *দৈনিক আজাদ*, ২৩.২.১৯৫২।

১২১. ঐ, ৩৩৪-৩৩৭।

১২২. ঐ, ৩৪১-৩৫৫; *East Pakistan Legislative Assembly Proceedings*, 22.2.1952.

১২৩. উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, তৃতীয় খণ্ড, ৩৬৩-৩৬৪, ৩৮২-২৮৩।

একটি গ্রামে দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকেরা টেস্ট রিলিফের কাজ বর্জন করে ঐ সময় ছাত্রহত্যার বিরুদ্ধে ধর্মঘট পালন করে।[১২৪]

২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারি আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল ছিল মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল। কিন্তু ২২ তারিখ থেকে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলেও আরেকটি কেন্দ্র স্থাপিত হয়। সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ইউনিয়নের কর্মকর্তারা প্রায় সকলেই ছিলেন ইসলামপন্থী। কিন্তু মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল কেন্দ্রে যুবলীগের কর্মী ও কমিউনিস্টদেরই প্রাধান্য ছিল। এ কারণে মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল ও সলিমুল্লাহ হলে অবস্থিত দুই কেন্দ্রের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব ছিল। ২১ ফেব্রুয়ারির পর আন্দোলনের ক্ষেত্রে যেটুকু সংগঠিত তৎপরতা ছিল সেটা এই দুই কেন্দ্র থেকেই নিয়ন্ত্রিত হতো। এ ব্যাপারে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হোস্টেলের ছাত্ররা সাধারণভাবে মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল কেন্দ্রের সঙ্গেই যুক্ত ছিল। সংগ্রামের ক্ষেত্রে কোন সক্রিয় ভূমিকা পালনে সমর্থ হওয়ার জন্য আওয়ামী মুসলিম লীগ ও পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের কোন কার্যকারিতা এ পর্যায়ে আর ছিল না।[১২৫]

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির একটি বৈঠক ২৩ ফেব্রুয়ারি রাতে আবুল হাশিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি ও ভবিষ্যৎ কর্মসূচি নিয়ে সেখানে আলোচনা হলেও এসব আলোচনা থেকে বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, ঐ কমিটির কোন বিশেষ কার্যকারিতাও সে পর্যায়ে আর ছিল না।[১২৬]

২৩ তারিখ রাতে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে রাতারাতি একটি শহীদ স্মৃতিসৌধ বা শহীদ মিনার নির্মাণ।[১২৭] এই শহীদ মিনারটি ঠিক সেই স্থানটিতেই নির্মিত হয়েছিল, যেখানে মাথায় গুলি লেগে ছাত্রকর্মী সালাহউদ্দিন প্রথম শহীদ হন। ২৬ মার্চ পুলিশ মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলে অভিযান চালিয়ে শহীদ মিনারটিকে ধ্বংস করে।[১২৮]

প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমিন আন্দোলনের সময় তাঁর প্রথম রেডিও বক্তৃতা প্রদান করেন ২৪ ফেব্রুয়ারি। এই বক্তৃতায় নূরুল আমিন রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে বিদেশী এজেন্টদের দ্বারা অনুপ্রাণিত বলে আখ্যায়িত করেন।[১২৯] নূরুল আমিন তাঁর পরবর্তী রেডিও বক্তৃতা প্রদান করেন ৩ মার্চ। ঐ বক্তৃতাটির খসড়া হোম ডিপার্টমেন্ট থেকে তাঁর কাছে পাঠানো হয়েছিল। আজফার তখন ছিলেন হোম ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারি।[১৩০] এই বক্তৃতাতে

১২৪. ঐ. ৩৫৬, ৩৮২-৩৮৩।

১২৫. ঐ, ৩৭০।

১২৬. ঐ, ৩৬৯।

১২৭. ঐ, ৩৭১।

১২৮. ঐ, ৪০৭।

১২৯. *দৈনিক আজাদ* , ২৪.২.১৯৫২।

১৩০. উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, তৃতীয় খণ্ড, ৪৩৪-৪৩৫

নূরুল আমিন বিদেশী এজেন্টদের সঙ্গে কমিউনিস্টদেরও যুক্ত করে তাঁদেরকে ভাষা আন্দোলনের প্রেরণাদানকারী ও ষড়যন্ত্রমূলক সংগঠক বলে বর্ণনা করেন।[১৩১]

২৩ ফেব্রুয়ারি রাতে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে পূর্ব বাংলা মুসলিম লীগ সংসদীয় দলের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ঐ বৈঠকে সংসদীয় দলের সদস্যগণ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন এবং সেই মর্মে একটি প্রস্তাবও তাঁদের দ্বারা গৃহীত হয়। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমিনের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করেও অপর একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এই বৈঠক পর পর তিন দিন অর্থাৎ ২৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছিল।[১৩২]

২০ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমিন পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক সভায় প্রাদেশিক বাজেট পেশ করেছিলেন। সেই বাজেট অধিবেশন কয়েক দিন চলার কথা ছিল, কিন্তু ২৪ তারিখেই প্রাদেশিক গভর্নর একটি বিশেষ ঘোষণার মাধ্যমে বাজেট অধিবেশন স্থগিত করেন।[১৩৩]

২৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির একটি প্রতিবাদ ও শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়।[১৩৪] সেই শোকসভায় তাঁরা গুলিবর্ষণের বিরুদ্ধে নিন্দা জ্ঞাপন করেন এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করা, গুলিবর্ষণের জন্য দায়ী অফিসারদের শাস্তিবিধান করা ইত্যাদি দাবি জানিয়ে কতকগুলি প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

২৫ ফেব্রুয়ারি নারায়ণগঞ্জের শিল্প এলাকা ও শহরে পূর্ণ ধর্মঘট পালিত হয়। ঢাকাতেও ২৫ তারিখে যানবাহন, দোকানপাট, অফিস-আদালত সমস্ত বন্ধ থাকে। ঐ দিন ভোরেই আবুল হাশিম, খয়রাত হোসেন, আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, মনোরঞ্জন ধর, গোবিন্দলাল ব্যানার্জী প্রমুখকে গ্রেফতার করা হয়।[১৩৫] ২৬ ফেব্রুয়ারি খুব ভোরের দিকে পুলিশ ডক্টর পি. সি. চক্রবর্তী, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ চৌধুরী ও মুনীর চৌধুরী—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই তিন জন অধ্যাপককে গ্রেফতার করে। ঐ দিন আরও যাঁদেরকে গ্রেফতার করা হয় তাঁরা হলেন জগন্নাথ কলেজের অধ্যাপক অজিত গুহ এবং সতীন সেন এম.এল.এ।[১৩৬]

২৭ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের একটি জরুরি বৈঠক ভাইস-চ্যান্সেলর ডক্টর মোয়াজ্জেম হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় ২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয় এবং

১৩১. *দৈনিক আজাদ,* ৫.৩.১৯৫২।

১৩২. উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি,* ৩৭২-৩৮১।

১৩৩. *দৈনিক আজাদ,* ২৫.২.১৯৫২।

১৩৪. *উমর, পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি,* তৃতীয় খণ্ড, ৩৯৭-৩৯৮

১৩৫. ঐ, ৪০১-৪০৩; *The Statesman,* 26 2.1952, *দৈনিক আজাদ,* ২৬.২.১৯৫২।

১৩৬. *The Statesman,* 27 2.1952; *দৈনিক আজাদ,* ২৭.২.১৯৫২।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ২৩০০ ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ছাত্রাবাসগুলোতে অবস্থানকারী ৯০০ ছাত্র-ছাত্রীকে অবিলম্বে ছাত্রাবাস ত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়।[১৩৭]

নারায়ণগঞ্জ ছিল ভাষা আন্দোলনের একটি শক্তিশালী এলাকা। এজন্য সরকার নারায়ণগঞ্জের জনগণের উপর নানাভাবে হামলা করে। এই হামলার একটি বড় দৃষ্টান্ত ছিল ২৯ ফেব্রুয়ারির মিছিলের উপর পুলিশের আক্রমণ ও অসংখ্য লোককে গ্রেফতার। সেদিন নারায়ণগঞ্জে যে মিছিল বের হয় তাতে যাঁরা নেতৃত্ব দেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন স্থানীয় মর্গান হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী মমতাজ বেগম। পুলিশ মমতাজ বেগমকে ঐ দিন গ্রেফতার করে। ঐ দিনই তারা নারায়ণগঞ্জ থেকে নির্বাচিত ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ওসমান আলীকেও গ্রেফতার করে।[১৩৮] ১ মার্চ তারিখে নারায়ণগঞ্জে আরেকটি ঘটনা ঘটে। কোন এক গুপ্তঘাতকের গুলিতে একজন পুলিশ কনস্টেবল নিহত হয়। এই হত্যাকাণ্ডের পর সরকার তৎক্ষণাৎ পুলিশটির পরিবারের জন্য দশ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করে এবং এই হত্যাকাণ্ডের জন্য কমিউনিস্ট ও ভারতীয় এজেন্টদের দায়ী করে।[১৩৯]

ভাষা আন্দোলনের এই পর্যায়ে পূর্ব বাংলাব্যাপী ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হয়। ২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারির হত্যাকাণ্ডের পর পূর্ব বাংলার জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সর্বত্র ধর্মঘট, মিছিল ইত্যাদির মাধ্যমে পুলিশী জুলুম ও সরকারের ভাষানীতির বিরুদ্ধে একটানা বিক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকে। সকল বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক সংগঠনের কর্মী ও নেতাগণ এসব বিক্ষোভে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। এজন্য আন্দোলনে একটু ভাটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঢাকা এবং অন্যান্য জেলায় অসংখ্য রাজনৈতিক কর্মীকে গ্রেফতার করা হয় এবং অনেকের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়।[১৪০]

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে ৫ মার্চ সারা পূর্ব বাংলায় 'শহীদ দিবস' উদযাপনের এবং সেই সঙ্গে ধর্মঘটের আহ্বান জানানো হয়। এই ধর্মঘট ঢাকায় ব্যর্থ হলেও পূর্ব বাংলার প্রায় সর্বত্র সাফল্যের সঙ্গে পালিত হয়। এরপর সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের একটি বৈঠক ডাকা হয় ৭ মার্চ তারিখে। ৮২ নং শান্তিনগরে ডাক্তার মুত্তালিব নামে এক ব্যক্তির বাসায় এই বৈঠকের স্থান নির্ধারিত হয়। সন্ধ্যার সময় এই বৈঠকটি চলাকালে পুলিশ বাসাটি ঘেরাও করে এবং সেখান থেকে সংগ্রাম পরিষদের প্রায় সকল উপস্থিত সদস্যকে গ্রেফতার করে। সেদিন যাঁরা গ্রেফতার হয়েছিলেন তাঁরা হলেন মোহাম্মদ তোয়াহা, আবদুল মতিন, অলি আহাদ, মির্জা গোলাম হাফিজ, মুজিবুল হক, হেদায়েত হোসেন চৌধুরী এবং বাসায় উপস্থিত হাসান পারভেজ নামে এক ব্যক্তি। কাজী গোলাম মাহবুব বাসার মধ্যে এক স্থানে আত্মগোপন করে থাকার ফলে গ্রেফতার থেকে

১৩৭. *The Statesman*, 28 2.1952
১৩৮. উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, তৃতীয় খণ্ড, ৪১৭-৪১৮
১৩৯. ঐ, ৪১৯-৪২০।
১৪০. ঐ, ৪২১-৪২৩।

রক্ষা পান। সংগ্রাম পরিষদের যাঁদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছিল তাঁদের সকলের বিরুদ্ধেই ২৮ ফেব্রুয়ারি ঢাকা গেজেটের একটি বিশেষ সংখ্যায় গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়।[১৪১]

এভাবে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সদস্যদের গ্রেফতারের পর ঐ পরিষদ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়। পরে ১৪ মার্চ তারিখে অনুষ্ঠিত একটি বৈঠকে আতাউর রহমান খানকে আহ্বায়ক এবং কামরুদ্দীন আহমদ ও সৈয়দ আবদুর রহিমকে যুগ্ম-আহ্বায়ক করে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদকে পুনর্গঠিত করা হয়।[১৪২]

২৭ এপ্রিল, ১৯৫২ তারিখে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ঢাকার বার লাইব্রেরিতে একটি কনভেনশন আহ্বান করে। এই কনভেনশনে সারা পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জেলা ও প্রান্ত থেকে প্রায় পাঁচ শতাধিক প্রতিনিধি যোগদান করেন। এঁদের মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমানও ছিলেন। ইতিপূর্বে ২৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে ফরিদপুর জেল থেকে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। আতাউর রহমান খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কনভেনশনটিতে মোট ১৫টি প্রস্তাব গৃহীত হয়।[১৪৩]

১৯৫২ সালের ১৩ মার্চ একটি সরকারি গেজেট নোটিফিকেশনে বলা হয়, পূর্ব বাংলা সরকার এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, ঢাকা হাইকোর্টের একজন বিচারপতিকে ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখে ঢাকায় পুলিশের গুলিবর্ষণের ঘটনা তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হবে। তদন্তের বিষয় হবে : (১) পুলিশের গুলিবর্ষণ প্রয়োজন ছিল কিনা; এবং (২) সেই পরিস্থিতিতে সেইভাবে পুলিশের বলপ্রয়োগ সঙ্গত ছিল, না শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার পক্ষে প্রয়োজনাতিরিক্ত ছিল। তদন্ত যে গোপনে অনুষ্ঠিত হবে সে কথাও এই গেজেট নোটিফিকেশনে উল্লেখ করা হয়।[১৪৪] ১৭ মার্চ পূর্ব বাংলার গভর্নর ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি টি. এইচ. এলিসকে ২১ ফেব্রুয়ারির গুলিবর্ষণের ঘটনা তদন্ত করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।[১৪৫]

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে এলিস কমিশন এই যুক্তিতে বর্জন করা হয় যে, কমিশনটিতে কোন বেসরকারি সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি এবং তদন্তের বিষয় যেভাবে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে তার ফলে কোন প্রকৃত তদন্ত এই কমিশনের পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁরা এই তদন্ত প্রকাশ্যে অনুষ্ঠানেরও দাবি জানান।[১৪৬]

১৪১. ঐ, ৪৪১-৪৫৫।

১৪২. *সাপ্তাহিক ইত্তেফাক*, ১৭.৩.১৯৫২; *সাপ্তাহিক নওবেলাল*, ২২.৩.১৯৫২।

১৪৩. উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, তৃতীয় খণ্ড, ৪৭৩-৪৮১; *সাপ্তাহিক নওবেলাল*, ৫.৫.১৯৫২ ও ৮.৫.১৯৫২; *The Statesman*, 30.4 1952.

১৪৪. *Dacca Gazette Notification*, dated 13 March, 1952, Notification No. 943, Pl. (Quoted from *Ellis Commission Report*, Para 2.)

১৪৫. ঐ, Para 3

১৪৬. *সাপ্তাহিক নওবেলাল*, ২৭.৩.১৯৫২।

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে তদন্ত কমিশন সম্পর্কে উপরোক্ত মতামত জানানো হলেও পূর্ব বাংলা সরকার তদন্তের ব্যাপারে তাদের পূর্বসিদ্ধান্তই বহাল রাখে। এজন্য সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে আহ্বায়ক আতাউর রহমান খান কমিশন বর্জন করার সিদ্ধান্ত জানিয়ে কমিশনকে পত্র প্রদান করেন। ৩১ মার্চ ছিল তদন্তের ব্যাপারে লিখিত সাক্ষ্য পাঠাবার শেষ দিন। কাজেই তারপর বিচারপতি এলিস আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর তদন্তকাজ আরম্ভ করে তা শেষ করেন ১৯৫২ সালের ৩ মে।[১৪৭]

বিচারপতি এলিস তাঁর পুরো তদন্তকাজ সম্পন্ন করার পর যে হাস্যকর তথ্যের সন্ধান পান তা হলো, পুলিশ কনস্টেবলরা মাথায় লোহার হেলমেটের পরিবর্তে কাপড়ের টুপি পরিহিত ছিল এবং এই গুরুত্বহীন তথ্যের উপর ভিত্তি করে তিনি যে 'ঐতিহাসিক' বক্তব্য তাঁর রায় প্রসঙ্গে প্রদান করেন তা হলো, একুশে ফেব্রুয়ারি পুলিশরা যদি ইস্পাতের হেলমেট মাথায় পরে থাকতো, তা হলে তিনি যে তদন্তকাজ পরিচালনা করলেন তার কোন প্রয়োজনীয়তাই দেখা দিত না।[১৪৮]

বিস্মিত হওয়ার কিছুই নেই যে, এই 'প্রখর ঐতিহাসিক চেতনাসম্পন্ন' সরকারের ধামাধরা ইংরেজ বিচারপতি কমিশনের একমাত্র সদস্য হিসেবে যে রায় প্রদান করেন তা হলো, (ক) ২১ ফেব্রুয়ারি পুলিশ কর্তৃক গুলিবর্ষণের প্রয়োজন ছিল; (খ) সেই নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে পুলিশ কর্তৃক বলপ্রয়োগ সঙ্গত ছিল।[১৪৯]

১৪৭. উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, তৃতীয় খণ্ড, ৪৮২-৪৮৫

১৪৮. *Ellis Commission Report*, Para-50

১৪৯. ঐ, Para-51

# ১৬

## স্বায়ত্তশাসনের সন্ধানে

কামাল উদ্দিন আহমেদ*

১৯৪৭ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের ইতিহাস ছিল মুখ্যত ঘোরতর রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা এবং কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন এলিটগোষ্ঠীর সঙ্গে উঠতি বাঙালি কাউন্টার-এলিটের মর্মান্তিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ইতিবৃত্ত। পাকিস্তানের শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত এলিটগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বার্থকে উপেক্ষা করে কার্যত জাতীয় রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে বাঙালিদের একাত্মতাবোধ গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে 'উৎপাদনব্যর্থতা'র (ঈস্টন ১৯৬৫) কারণে পাকিস্তানের রাজনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে, যে ব্যর্থতার সূত্রপাত হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানের এলিট এবং পশ্চিম পাকিস্তানের এলিটের বিরোধ (সাঈদ ১৯৭২) থেকে।

বাস্তবিক পক্ষে পাকিস্তানের সিদ্ধান্তগ্রহণপ্রক্রিয়ায় বাঙালিদের অংশগ্রহণ করতে না দেয়া, অর্থনৈতিক বৈষম্য, পশ্চিম পাকিস্তানী এলিটদের সাংস্কৃতিক আধিপত্য এবং দমনমূলক ব্যবস্থাবলী পূর্ব পাকিস্তানে আঞ্চলিকতাবাদী রাজনীতির উদ্ভব ঘটায়। এ পর্যায়ে পূর্ব পাকিস্তানের এলিটেরা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে প্রবল গণআন্দোলন শুরু করতে বাধ্য হয়। পণ্ডিতগণ ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানে 'র‍্যাডিক্যাল রাজনীতি এবং আঞ্চলিকতাবাদী রাজনীতি'র জন্য দায়ী কতিপয় কারণ চিহ্নিত করেছেন। কারণগুলি হচ্ছে—

> (১) ভৌগোলিক অব্যবস্থা (anomaly); (২) পশ্চিম পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক আধিপত্য; (৩) প্রতিনিধিত্ব ও ক্ষমতা বণ্টনের ব্যাপারে সাংবিধানিক সংকট; (৪) অর্থনৈতিক বৈষম্য ও বঞ্চনা; (৫) সেনাবাহিনী ও আমলাতন্ত্রে অকিঞ্চিৎকর বাঙালি প্রতিনিধিত্ব; (৬) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে ঘন ঘন হস্তক্ষেপ এবং রাজনৈতিক অবদমন, ইত্যাদি।

* অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

যদিও ১৯৫১ সালে পূর্ব বাংলার আইন পরিষদের সাধারণ নির্বাচন প্রত্যাশিত ছিল, তথাপি ১৯৫৪ সালের পূর্ব পর্যন্ত তা স্থগিত থাকে। নানা অজুহাতে এই নির্বাচন অনুষ্ঠান বিলম্বিত করাটা আসলে মুসলিম লীগের সাংগঠনিক দুর্বলতারই পরিচয় বহন করে। এই দল পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচনের গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিল। এ কথা সর্বজনবিদিত যে, কংগ্রেসের মতো ১৯৪০-এর দশকের মুসলিম লীগ ছিল জাতীয়তাবাদী, বাম ও দক্ষিণপন্থী ইত্যাদি বহুমুখী স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী একটি মিশ্র প্রতিষ্ঠান। পাকিস্তান ছিল তাদের সাধারণ লক্ষ্য। আর পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মুসলিম লীগ পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে এবং দেশবিভাগ থেকে উদ্ভূত সমস্যা মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়। ফলে যেসব সামাজিক ও রাজনৈতিক গোষ্ঠী পাকিস্তান অর্জনের লক্ষ্যে এ দলে যোগদান করেছিল, তাদেরকে আর ধরে রাখা এ দলের পক্ষে সম্ভব হয় নি। এভাবে আমরা পর্যায়ক্রমে মুসলিম লীগের বিভক্তি ও তা থেকে নতুন নতুন রাজনৈতিক দলের উদ্ভব ঘটতে দেখতে পাই। ১৯৫৪ সালের নির্বাচন এসব দলের জন্য স্ব-স্ব জনসমর্থন যাচাইয়ের একটি সুযোগ সৃষ্টি করে। এই অধ্যায়ে এই নির্বাচনের পটভূমি, বিভিন্ন দলের নির্বাচনী কর্মসূচি, রাজনৈতিক তৎপরতা এবং এদের নির্বাচনোত্তর আন্তঃসম্পর্ক ইত্যাদি বিষয় পর্যালোচনা করা হয়েছে।

## নির্বাচনের পটভূমি

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর প্রথম কয়েক বছরেই (১৯৪৭-৫৪) জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলির, বিশেষকরে পাকিস্তান মুসলিম লীগের পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানভিত্তিক উপদলসমূহের মধ্যে ভাষা ও আঞ্চলিক রাজনৈতিক স্বাধিকারের প্রশ্নে অব্যাহত মতানৈক্য ও দ্বন্দ্ব আওয়ামী মুসলিম লীগ ও কৃষক শ্রমিক পার্টির মতো আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের জন্ম দেয়। পূর্ব বাংলার জনগোষ্ঠীর কাছে প্রায় অপরিচিত 'উর্দু'কে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার জন্য লীগ নেতৃবৃন্দের বিভিন্ন উদ্যোগ এই বিরোধকে আরো ঘনীভূত করে তোলে। পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সম্পদের অসম বণ্টন ভাষার প্রশ্নকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক সৃষ্ট পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তোলে। বস্তুত বাঙালিদের উপর পশ্চিম পাকিস্তানীদের রাজনৈতিক আধিপত্য ও সাংস্কৃতিক নিপীড়ন পাকিস্তানের পূর্বাংশে ব্যাপক অসন্তোষের সৃষ্টি করে এবং এ অঞ্চলে একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতাকে উৎসাহিত করে, যা পরিণতিতে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে রূপান্তরিত হয়। পার্ক ও হুইলারের মতে :

> ক্রমান্বয়ে পূর্ব পাকিস্তানীরা বুঝতে পারে যে, তাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং উন্নয়ন পশ্চিম পাকিস্তানীদের ইচ্ছার অধীন হয়ে পড়েছে; পূর্ব বাংলাকে কেন্দ্রীয় সরকার একটি 'উপনিবেশ' হিসেবে ব্যবহার করছে। ভাষাকে কেন্দ্র করে অর্থাৎ পাকিস্তান সরকার কর্তৃক বাংলাকে পরিহার করে উর্দুকে জাতীয় ভাষা হিসেবে জনপ্রিয় করার পদক্ষেপ গৃহীত হলে এই মনোভাব আরো পুঞ্জীভূত হয়।

> কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ সরকারের প্রতি এই অসন্তোষের পাশাপাশি প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সরকারের দুর্নীতি এবং অদক্ষতা পরিস্থিতিকে আরো ঘোলাটে করে তোলে।[১]

১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারির প্রথমদিকেই পাকিস্তান গণপরিষদে বেগম শায়েস্তা ইকরামুল্লাহ অভিযোগ করেন যে, পূর্ব বাংলার প্রতি চরম অবহেলা প্রদর্শন করা হচ্ছে এবং একে পশ্চিম পাকিস্তানের 'উপনিবেশ' হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।[২] যদিও পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫৬ ভাগ বাস করতো পূর্ব বাংলায়, তবু রাষ্ট্রীয় আনুকূল্যে অসম বণ্টনের প্রকৃত অবস্থা পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস ও সেনাবাহিনীতে বাঙালিদের নগণ্য অবস্থানের দৃষ্টান্তেই স্পষ্ট হয়ে উঠে। ১৯৫৫ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ৮৯৪ জন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার মধ্যে মাত্র ১৪ জন ছিলেন বাঙালি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকালে "সচিবালয়ে বাঙালি কর্মকর্তা ছিলেন না বললেই চলে এবং ঐ সময়ে কোন বিভাগেই সচিব পর্যায়ে কোন বাঙালি ছিলেন না।"[৩] সামাজিক-ঐতিহাসিক কারণ ছাড়াও সামরিক, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার বৈষম্য পাঞ্জাবী নিয়ন্ত্রণাধীন শাসক এলিট শ্রেণীর গৃহীত বিভিন্ন নীতির ফলে আরো ব্যাপক রূপ ধারণ করে।

১৯৪৯ সালে মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিন তাঁর নিজের জেলা ময়মনসিংহের একটি উপনির্বাচনে মুসলিম লীগ প্রার্থীর পরাজয়ের ফলে শূন্য আসনগুলির উপনির্বাচন অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত করে দেন। এটি যখন স্পষ্ট হয়ে গেল যে, তৃণমূল পর্যায়ে মুসলিম লীগের জনসমর্থন নেই, তখন তিনি ভবিষ্যতের সম্ভাব্য বিপর্যয় এড়াতে এ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ১৯৫৩ সালের শেষদিকে প্রাদেশিক আইনসভার ৩৪টি আসন ছিল শূন্য। এমন পরিস্থিতিতে একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মন্তব্য করেন, "এমনকি প্রাদেশিক আইনসভার কার্যকালও কেন্দ্রীয় আইনসভার নির্দেশে বাড়ানো হয়, অথচ কেন্দ্রীয় আইনসভা নিজেই স্বাধীনতার পূর্বে পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হয়েছিল।"[৪]

১৯৫৩ সালের ১৪ নভেম্বর ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে যুক্তফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর পরপরই আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাকালীন অন্যতম যুগ্মসম্পাদক এবং পরবর্তীকালে এর সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন যে, পূর্ব বাংলার জনগণের মুসলিম লীগের উপর আর কোন আস্থা নেই এবং তারা পূর্ব বাংলা থেকে মুসলিম লীগকে উচ্ছেদ করতে ঐক্যবদ্ধ।[৫]

১. Richard L. Park and Richard S. Wheeler, "East Bengal Under Governor's Rule," *Far Eastern Survey*, 23 (1954), 129.
২. *Constituent Assembly of Pakistan Debates*, Vol. 2, No. 1 (February 24, 1948), 7
৩. Khalid B. Sayeed, *Politics in Pakistan: The Nature and Direction of Change*, (New York 1980), 40
৪. G. W. Choudhury, *Democracy in Pakistan*, (Dacca 1963), 56-57.
৫. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, শেখ মুজিবুর রহমান, *সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট*, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশন, অক্টোবর ১৯৫৫, ২১।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ১৯৫৩ সালের কাউন্সিল অধিবেশন দুটি কারণে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমত, এই অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে সমমনাদের নিয়ে ঐক্যবদ্ধ নির্বাচনী মোর্চা গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং দ্বিতীয়ত, এই অধিবেশনেই পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি সম্বলিত ঐতিহাসিক ২১ দফা নির্বাচনী মেনিফেস্টো অনুমোদিত হয়। যুক্তফ্রন্ট মূলত চারটি বিরোধী রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠিত হয়। দল চারটি হলো— আওয়ামী মুসলিম লীগ (১৯৪৯ সালে জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত), কৃষক শ্রমিক পার্টি (১৯৫৩ সালে বাংলার অপর এক প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত), মওলানা আতাহার আলীর নেজাম-এ-ইসলাম এবং হাজি দানেশের নেতৃত্বাধীন বামপন্থী গণতন্ত্রী দল। অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাজনৈতিক দলগুলির সাথে আওয়ামী লীগের এই নির্বাচনী মোর্চা গঠন ছিল রাজনৈতিক দিক থেকে কৌশলগত পদক্ষেপ। ঐ সময়ে বামপন্থীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মওলানা ভাসানী সংশ্লিষ্ট দলগুলির একটি ঐক্যবদ্ধ নির্বাচনী মোর্চা গঠনের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন।[৬]

১৯৫৪ সালের নির্বাচন প্রাপ্তবয়স্কদের সর্বজনীন ভোটাধিকার এবং পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৫৩ সালে ভারত শাসন আইনের (১৯৩৫) পঞ্চম ও ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে প্রাদেশিক পরিষদের মোট সদস্যসংখ্যা ৩০৯ স্থির করা হয়। এই সংশোধনী অনুযায়ী ২৩৭টি আসন মুসলমানদের জন্য, ৩১টি সাধারণ আসন নিম্নবর্ণবহির্ভূত সাধারণ হিন্দুদের জন্য, ২৬টি আসন তফসিলী হিন্দুদের জন্য, ১টি আসন পাকিস্তানী খ্রিস্টানদের জন্য এবং ২টি আসন বৌদ্ধদের জন্য সংরক্ষিত করা হয়। মুসলমান, সাধারণ হিন্দু এবং তফসিলী হিন্দু এই তিন সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত আসন থেকে স্ব-স্ব সম্প্রদায়ের মহিলাদের জন্য যথাক্রমে ৯, ১ এবং ২টি আসন সংরক্ষণ করা হয়।[৭] কিন্তু নির্বাচনী সীমানা নির্ধারণ কমিটি যথাসময়ে সরকারের কাছে এর চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করতে না পারায় পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৫৩ সালে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে নি।[৮]

৬. M. Rashiduzzaman, "The Awami League in the Political Development of Pakistan", *Asian Survey*, X:7 (1970), 576. অধিকন্তু, যুক্তফ্রন্ট গঠনে কমিউনিস্টদের প্রভাব অগ্রাহ্য করা যাবে না। কমিউনিস্টরা, বিশেষকরে ময়মনসিংহ জেলার কমিউনিস্ট সদস্যরা আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে ঢুকে পড়েন এবং ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে সমস্ত বিরোধী দলগুলোর একটি নির্বাচনী ঐক্যজোট গঠনের প্রস্তাব পাস করানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

৭. Election Commission of Bangladesh, *Report on the Election to East Bengal Legislative Assembly 1954*, (May 1977), 2.

৮. এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৫২ সালের জুলাই-এ নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে এলাকা নির্ধারণ কমিটি গঠন করা হয়:
এইচ. এস. এম. ইসাহাক, সি. এস. পি. (চেয়ারম্যান), এনায়েতুর রহমান (অবসরপ্রাপ্ত জেলাজজ) এবং এমদাদ আলী (বিশেষ কর্মকর্তা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)। রিপোর্ট প্রণয়নের সমস্ত ব্যয় কেন্দ্রীয় সরকার বহন করে।

## প্রধান নির্বাচনী ইস্যু এবং প্রচারকৌশল

যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রচারণা ১৯৫৩ সালের নভেম্বরে গৃহীত এর ২১ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতেই পরিচালিত হয়। ২১ দফা কর্মসূচিকে 'ভার্নাকুলার এলিট'[৯] অর্থাৎ বাঙালি এলিট শ্রেণীর কর্মসূচি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তবে 'বাঙালি জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়াদের'[১০] চেয়ে সমাজের বিভিন্ন বৃহত্তর সামাজিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ভোটারসাধারণের প্রতি লক্ষ্য রেখেই খ্যাতিমান রাজনীতিবিদ আবুল মনসুর আহমদ এই কর্মসূচি প্রণয়ন করেন। পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ছাড়াও ২১ দফা কর্মসূচিতে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক বিষয় এবং মুদ্রা রেখে অন্যান্য বিষয় পূর্বাঞ্চলের হাতে ছেড়ে দেয়ার অঙ্গীকার করা হয়। এই কর্মসূচির মধ্যে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতিদান, রাজবন্দীদের মুক্তি, নূরুল আমিনের সরকারি বাসভবন বর্ধমান হাউসকে 'বাংলা একাডেমী'তে রূপান্তরিতকরণ, ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পুলিশের গুলিতে যে স্থানে ছাত্ররা শহীদ হন সেখানে 'শহীদ মিনার' নির্মাণ, ২১ ফেব্রুয়ারিকে সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা, ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়কে আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আই. এল. ও.) বিধান অনুযায়ী শিল্পশ্রমিকদের জন্য আর্থিক ও সামাজিক অধিকারের স্বীকৃতি, পাটশিল্প জাতীয়করণ ও উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্যের নিশ্চয়তাবিধান এবং সমবায় ও ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য সরকারি সাহায্য প্রদান ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত ছিল (পরিশিষ্ট দ্র.)।

এটি স্পষ্ট যে, যদিও ২১ দফা মূলত বাঙালি এলিট গোষ্ঠীরই কর্মসূচি ছিল, তবু এতে শ্রমিক ও কৃষকদের দাবিদাওয়াও অন্তর্ভুক্ত হয়-; ফলে এই কর্মসূচি—

> খুব সহজেই ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক ইতিবাচক সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়। এই কর্মসূচি পূর্ব বাংলায় যারা মুসলিম লীগ শাসনের অবসান কামনা করছিলেন তাদের জন্য ব্যাপক আশার সঞ্চার করে। সরকারপন্থী লোকজন কর্তৃক ২১ দফাকে একটি অবাস্তব কর্মসূচি হিসেবে প্রচার করা সত্ত্বেও জনগণ একে পূর্ব বাংলার 'মুক্তিসনদ' হিসেবে বিবেচনা করতে থাকে।[১১]

তবুও এ কথা বলা দরকার যে, যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা কর্মসূচির মধ্যে বৈপ্লবিক কোন কিছু ছিল না। কোন কোন দফায় অর্থনৈতিক বিষয়বস্তুর চেয়ে ভাবাবেগ ছিল বেশি।[১২] তা সত্ত্বেও ২১ দফায় অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি পূর্ব বাংলার জনগণের জন্য ছিল খুবই প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয়।

৯. Rounaq Jahan, *Pakistan: Failure in National Integration,* (Dacca 1977), 47.

১০. S. F. Levin, "The Peoples Party" in A. M. Yakov (ed.), *Pakistan: History and Economy,* (Moscow 1959), 86. 21 দফা সম্পর্কে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, পরিশিষ্ট।

১১. M. Rashiduzzaman, "The Awami League," 576.

১২. Abu Jafar Shamsuddin, *Sociology of Bengal Politics,* (Dacca 1973), 33.

যুক্তফ্রন্টের সুদক্ষ নির্বাচনী প্রচারণা নির্বাচকমণ্ডলীকে এ ধারণা দিতে সমর্থ হয় যে, মুসলিম লীগ 'গণবিরোধী', 'দুর্নীতিপরায়ণ' এবং এর শাসন পাকিস্তানকে প্রায় ধ্বংসের কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। তাছাড়া, যুক্তফ্রন্ট যে একটি শক্তিশালী নির্বাচনী জোট তা মুসলিম লীগ তেমন গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় আনে নি। এমনকি তারা জনগণের সামনে সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট কোন নির্বাচনী কর্মসূচি উপস্থাপন করতেও ব্যর্থ হয়। ভোটারদের কাছে মুসলিম লীগের একমাত্র বক্তব্য ছিল, তারা একটি 'ইসলামিক শাসনতন্ত্র' প্রণয়ন করবে। লীগের মূল শ্লোগান ছিল দুটি—এক, 'ইসলাম বিপন্ন', দুই, 'পাকিস্তান বিপন্ন'। কাজেই মুসলিম লীগের নির্বাচনী প্রচারণায় পূর্ব বাংলার জনগণের মৌলিক সমস্যা ও প্রয়োজন উপেক্ষিত হয়। ফলে মুসলিম লীগ ভোটারদের কাছে কোন প্রশংসনীয় বিকল্প তুলে ধরতে সক্ষম হয় নি।

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মুসলিম লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতারা নির্বাচনী প্রচারণার কাজে বিমান, বিশেষ ট্রেন ও স্টিমার ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেন। এছাড়া মুসলিম লীগ এর প্রার্থীদের পক্ষে ভোট চাওয়ার জন্য এক শ্রেণীর ভাড়াটে মওলানাকে নিয়োজিত করে। তা সত্ত্বেও মুসলিম লীগ পূর্ব বাংলার ভোটারদের আস্থা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়।

পূর্ব বাংলায় ১৯৪৬ সালের নির্বাচনের চেয়ে ১৯৫৪ সালের নির্বাচন গুণগতভাবে ভিন্ন ছিল। কেননা '৫৪ সালে অনেক নতুন ইস্যু নির্বাচনে প্রাধান্য পায়। বোধগম্য কারণেই পূর্ব বাংলার পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন, বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতিদান ইত্যাদি ছিল ভোটারদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উল্লেখ করা দরকার যে, নির্বাচনব্যবস্থার রূপ কি হবে তা নির্বাচনে কোন ইস্যুতে পরিণত হয় নি। কারণ যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলির মধ্যেই এই প্রশ্নে মতপার্থক্য ছিল। ফ্রন্টের প্রধান দুটি দল কৃষক শ্রমিক পার্টি এবং আওয়ামী লীগের 'নির্বাচনব্যবস্থা' সম্বন্ধে তখন পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট কোন নীতিমালা ছিল না।[১৩] অনুরূপভাবে, রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির প্রশ্নটিও নির্বাচনী প্রচারণার সময় পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়। যাহোক, যুক্তফ্রন্টের প্রধান শরিক দল আওয়ামী লীগ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সামরিক চুক্তির অধীনে যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক সামরিক সাহায্য গ্রহণের প্রচণ্ড বিরোধিতা করে। প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী যুক্তরাষ্ট্রের সাথে পাকিস্তানের সামরিক চুক্তিকে 'দাসত্বের চুক্তি'[১৪] বলে সমালোচনা করেন।

নির্বাচনের সময় মুসলিম লীগের নিয়ন্ত্রণাধীন সংবাদপত্রগুলি লীগকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসে। যেমন, *পাকিস্তান রিভিউ* পত্রিকা এক সম্পাদকীয়তে লীগকে এই মর্মে সতর্ক করে দেয় :

১৩. মুসলিম লীগও পৃথক নির্বাচনকে এই নির্বাচনের কোন ইস্যুতে পরিণত করে নি

১৪. *Keesings Contemporary Archives*, April, 10-17, 1954, 13514

> বিরোধীরা ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধে সাধারণ দাবিতে এমনিভাবে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে যাতে মনে করার কারণ রয়েছে যে, তারা কোন সূক্ষ্ম অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিতেই এভাবে একত্রিত হয়েছে এবং যেকোন প্রকারে ক্ষমতালাভই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।[১৫]

অন্যান্য যেসব পত্রিকা নির্বাচনে মুসলিম লীগের পৃষ্ঠপোষকতা করে, সেগুলি হলো *ডন* (করাচি), *মর্নিং নিউজ* (ঢাকা) এবং *দৈনিক আজাদ* (ঢাকা)। এসব পত্রিকায়ও পূর্ব বাংলার জনগণকে সতর্ক করে দিয়ে বলা হয় যে, মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে ভোট দেয়ার অর্থ হলো পাকিস্তানের শত্রুদের সহায়তা করা। কিন্তু রাজনৈতিকভাবে সচেতন পূর্ব বাংলার জনগণকে এভাবে বিভ্রান্ত করা সম্ভব হয় নি। পূর্ব বাংলার জনগণ চেয়েছিল, যুক্তফ্রন্ট যথেষ্ট শক্তি নিয়ে নির্বাচনে জয়লাভ করুক। কেননা তারা মনে করেছিল, যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতাসীন হলে তাদের দাবিসমূহ পূরণ করা সম্ভব হবে।

মুসলিম লীগ ছিল মূলত পশ্চিম পাকিস্তান ভিত্তিক এবং শিল্পপতি, ভূস্বামী, ব্যবসায়ী ও মুষ্টিমেয় শিক্ষিত জনগোষ্ঠীই ছিল এর সমর্থক। অন্যদিকে, যুক্তফ্রন্টের সমর্থনে ছিল পূর্ব বাংলার সাধারণ জনগণ, ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক এবং বিকাশমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী। অধিকন্তু, যুক্তফ্রন্টের নেতৃত্ব মুসলিম লীগের তুলনায় শক্তিশালী ছিল। এর নেতৃত্বে ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, এ. কে. ফজলুল হক এবং মওলানা ভাসানীর মতো অভিজ্ঞ ও সম্মোহনী ক্ষমতাসম্পন্ন নেতৃবৃন্দ। অন্যদিকে, পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগের নেতৃত্বে ছিলেন নূরুল আমিন, খাজা নাজিমুদ্দিন এবং সবুর খানের মতো বিতর্কিত ব্যক্তিবর্গ। তাছাড়া, মুসলিম লীগ প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলী, মিস ফাতেমা জিন্নাহ, আবদুল কাইউম খান এবং সরদার ইব্রাহিম খান প্রমুখ কেন্দ্রীয় নেতাদের উপরও নির্ভরশীল ছিল। এঁরাও নির্বাচনী প্রচারকাজে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

পশ্চিম পাকিস্তান ভিত্তিক পত্র-পত্রিকায় যুক্তফ্রন্টের নেতাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের কুৎসা রটনা করা হয় এবং বলা হয় যে, "যুক্তফ্রন্টের পক্ষে নির্বাচনের ফলাফলকে প্রভাবিত করার জন্য প্রচুর ভারতীয় অর্থ পূর্ব বাংলায় ছড়ানো হয়েছে", যার অর্থ হলো, ভারত আশা করছে যে, যুক্তফ্রন্ট বিজয়ী হলে সে লাভবান হবে। ২১ দফা কর্মসূচির বিরুদ্ধেও একই ধরনের আক্রমণ পরিচালনা করা হয়। উল্লিখিত পত্র-পত্রিকায় এমন অভিযোগও করা হয় যে, পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যাতায়াতের জন্য ভিসা ব্যবস্থার অবসান, পাকিস্তান-ভারত বাণিজ্য ক্ষেত্রে আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, পাকিস্তানী মুদ্রার অবমূল্যায়ন—এসব বিষয়ে যুক্তফ্রন্টের বক্তব্য উত্থাপন বিস্ময়করভাবে ভারতের স্বার্থরক্ষার জন্যই করা হয়। একজন বিশিষ্ট রাজনৈতিক বিশ্লেষকের মতে :

> যুক্তফ্রন্টের নেতাদের কৌশল ছিল মুসলিম লীগ সরকারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যর্থতা, বিশেষকরে ভাষাপ্রশ্নের উপর অধিকতর জোর দেয়া। এটা ছিল জনগণের কাছে স্পর্শকাতর বিষয় এবং এর

১৫. *The Pakistan Review,* 11: 3 (1954), 8.

মাধ্যমে জনসমর্থন অর্জন করা সহজতর ছিল। অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু ছিল পাটের নিম্নমূল্য। পাটের এই নিম্নমূল্য পূর্ব বাংলার পাটচাষীদের মধ্যে ব্যাপক হতাশার সৃষ্টি করে।[১৬]

অন্যান্য কতিপয় ইস্যুকেও যুক্তফ্রন্ট সামনে নিয়ে আসে, যেগুলি পূর্ব বাংলার জনগণের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগায়। যেমন, যুক্তফ্রন্টের নেতারা ঐ সময়ের 'লবণ সঙ্কটের' উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন। লবণের মতো একটি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম এত বেড়ে যায় যে, ঢাকায় তখন এক সের লবণ অসৎ ব্যবসায়ীরা ১৬ টাকা পর্যন্ত দামে বিক্রি করতো, অথচ স্বাভাবিক সময়ে প্রতি সের লবণের দাম ছিল দুই থেকে তিন আনা মাত্র। ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ নেতারা এই সঙ্কট সৃষ্টির জন্য দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তিদানের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি।

মুসলিম লীগ নেতাদের জন্য আরেকটি বিব্রতকর দিক ছিল ভাষার প্রশ্নে তাদের অসংবেদী মনোভাব। যেমন, ১৯৫৪ সালের ৩ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী ঢাকার পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় ইংরেজিতে বক্তৃতা দিতে শুরু করলে উপস্থিত ক্ষুব্ধ জনতার মধ্যে প্রচণ্ড উত্তেজনা দেখা দেয়। তারা দাবি করতে থাকে যে, প্রধানমন্ত্রীকে বাংলায় বক্তৃতা দিতে হবে। বিক্ষোভের মুখে তিনি ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা দিতে সক্ষম হন নি। জনসভায় সমস্বরে ধ্বনিত হয় : "মুসলিম লীগ ধ্বংস হোক, নিপাত যাক।" পুলিশ উত্তেজিত জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয় এবং জনসভা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, যদিও প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী নির্বাচনের সময় ব্যাপকভাবে পূর্ব বাংলা সফর করেন, তবুও তিনি ভোটারদের উপর প্রভাব বিস্তারে সফল হন নি।

যুক্তফ্রন্টের জন্য এর বিভিন্ন শরিক দলের কর্মীরা ব্যাপক নির্বাচনী প্রচারণায় অবতীর্ণ হয়। যুক্তফ্রন্টের প্রচারাভিযান ছিল অধিকতর আক্রমণাত্মক ও স্বতঃস্ফূর্ত। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ও পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীরা যুক্তফ্রন্টের পক্ষে জনসমর্থন আদায়ের জন্য শহর থেকে সুদূর লোকালয়ে গিয়েও কাজ করতে থাকে। এমনকি ছাত্ররা ঘরে ঘরে গিয়ে যুক্তফ্রন্টের কর্মসূচি প্রচার করার চেষ্টা করে। পূর্ব বাংলার খ্যাতিমান রাজনৈতিক নেতারা, যেমন মওলানা ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আতাউর রহমান খান, আবুল মনসুর আহমদ, শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ নেতা জেলা ও মহকুমা পর্যায়ে বহু জনসভায় বক্তৃতা দেন এবং পূর্ব বাংলার জন্য পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতিদানের দাবির পক্ষে বাঙালি জনমত সৃষ্টি করেন।[১৭] বাস্তবিকপক্ষে স্বায়ত্তশাসন ও ভাষার প্রশ্নে যুক্তফ্রন্টের প্রচারণা ভোটারদের মনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রচারণা আসলেই অত্যন্ত শক্তিশালী ও ব্যাপক ছিল। প্রসঙ্গত

১৬. M. Rashiduzzaman, "The Awami League," 577.

১৭. Talukder Maniruzzaman, *Radical Politics and the Emergence of Bangladesh*, (Dacca 1975), 33.

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মওলানা ভাসানী ও শহীদ সোহরাওয়ার্দী এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা থেকে বিরত থাকেন। কারণ, ভাসানী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, তিনি দলকে (পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ) সংগঠিত করার জন্য নিজেকে নিয়োজিত রাখবেন এবং সোহরাওয়ার্দী প্রাদেশিক রাজনীতির চেয়ে জাতীয় পর্যায়ের রাজনীতিতেই অধিক আগ্রহী ছিলেন।

## নির্বাচনের রায় : বাঙালি জাতীয়তাবাদের ইঙ্গিত

১৯৫৪ সালের মার্চে অনুষ্ঠিত পূর্ব বাংলার প্রথম অবাধ ও সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে। যুক্তফ্রন্ট আইন পরিষদের মোট ৩০৯টি আসনের মধ্যে এককভাবে ২২৩টি আসন লাভ করে। অন্যদিকে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ মাত্র ৯টি আসন লাভ করে। মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিনসহ মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার ৫ জন প্রভাবশালী সদস্যও পরাজয় বরণ করেন। মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিন আইনশাস্ত্রে স্নাতক ডিগ্রিধারী তরুণ ছাত্রনেতা খালেক নেওয়াজের কাছে পরাজিত হন। খালেক নেওয়াজ মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ে ৭ হাজারেরও বেশি ভোট পেয়ে বিজয়ী হন। শিল্পমন্ত্রী সৈয়দ আবদুস সেলিমের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়। মুসলিম লীগের অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় নেতা, যেমন মোনায়েম খান, টি. আলী, খান এ. সবুর, সৈয়দ মোহাম্মদ আফজল প্রমুখ যুক্তফ্রন্টের প্রার্থীদের কাছে পরাজিত হন। দেশবিভাগের পূর্ব পর্যন্ত যে মুসলিম লীগ পূর্ব বাংলায় খুবই জনপ্রিয় ছিল, সে মুসলিম লীগের জন্য এই নির্বাচনের ফলাফল ছিল একটি চরম আঘাত। এমনকি "ইসলামের দোহাই এবং পৃথক নির্বাচনের ওয়াদাও মুসলিম লীগকে '৫৪ সালের নির্বাচনে ব্যাপক ভরাডুবি থেকে রক্ষা করতে পারে নি।"[১৮] সরকারি প্রশাসনযন্ত্রকে অবাধে নিজেদের পক্ষে ব্যবহার করেও মুসলিম লীগ পূর্ব বাংলার গণরায়কে পরিবর্তন করতে পারে নি। যুক্তফ্রন্টের এই বিপুল বিজয় মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ ও পশ্চিম পাকিস্তানী কায়েমি স্বার্থবাদীদের মোহমুক্তিই শুধু ঘটায় নি, তাদের ভীত-সন্ত্রস্তও করে তোলে।[১৯] নির্বাচনী ফলাফলে ২১ দফা কর্মসূচির প্রতি জনসমর্থনের বহিঃপ্রকাশ ঘটে এবং পূর্ব বাংলার নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে এক ধরনের আশার সঞ্চার হয়।

সারণি ১-এ দেখা যায় যে, ৩০৪টি আসনের জন্য ১২৮৫ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত ২২৮টি আসনে ৯৮৬ জন প্রার্থী, ৩০টি সাধারণ আসনে ১০১ জন প্রার্থী এবং তফসিলী হিন্দুদের ৩৬টি আসনে ১৫১ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। অমুসলিম আসনগুলিতে মুখ্যত পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস, ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ পার্টি এবং সিডিউল্ড্ কাস্ট ফেডারেশন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।

১৮. M. Mahfuzul Huq, *Electoral Problems in Pakistan*, (Dacca 1966), 80.

১৯. A. K. Choudhury, *The Independence of East Bengal*, (Dhaka 1984), 14.

**সারণি ১ : পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন, ১৯৫৪-এর সারসংক্ষেপ**

| নির্বাচনী এলাকা | মোট আসন | বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত আসন সংখ্যা | মোট প্রার্থীর সংখ্যা | মোট ভোটারের সংখ্যা | প্রতিদ্বন্দ্বী এলাকার মোট ভোটার | প্রদত্ত ভোট | প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
| ১। মুসলমান | ২২৮ | - | ৯৮৬ | ১,৫১,৫৯,৮২৫ | ১,৫১,৫৯,৮২৫ | ৫৬,৯৯,৪২৭ | ৩৭.৬০ |
| ২। সাধারণ | ৩০ | ২ | ১০১ | ২০,৯৫,৩৫৫ | ২০,৯৫,৩৫৫ | ৭,৭৬,৭২৬ | ৩৯.১৯ |
| ৩। তফসিলী হিন্দু | ৩৬ | - | ১৫১ | ২৩,০৩,৫৭৮ | ২৩,০৩,৫৭৮ | ৭,৬৬,২৪৫ | ৩৩.২০ |
| ৪। মহিলা | | | | | | | |
| (ক) মুসলমান | ৯ | - | ৩২ | ১,৬১,৯৬৬ | ১,৬১,৯৬৬ | ৬০,৭৫২ | ৩৭.৩১ |
| (খ) সাধারণ | ১ | ১ | - | ২৫,৭২৬ | - | - | প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন |
| (গ) তফসিলী হিন্দু | ২ | ১ | ৩ | ১৪,৭৮৫ | ৫,০১৪ | ১,৭৭৯ | ৩৫.৪৮ |
| ৫। পাকিস্তানী খ্রিস্টান | ১ | ১ | - | ৪৩,৯১১ | - | - | প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন |
| ৬। বৌদ্ধ | ২ | - | ১২ | ১,৩৬,৪১৭ | ১,৩৬,৪১৭ | ৩৯,২৮৭ | ২৮.৮০ |
| মোট | ৩০৯ | ৫ | ১,২৮৫ | ১,৯৯,৪১,৫৬৩ | ১,৯৭,৪৮,৫৬৮ | ৭৩,৪৪,২১৬ | ৩৭.১৯ |

উৎস : পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন, ১৯৫৪-এর উপর প্রণীত রিপোর্ট থেকে সারণিকৃত।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে, এই নির্বাচনে মুসলমান মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ৯টি আসনে ৩৭জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন। এই আসনগুলির সব ক'টিতেই যুক্তফ্রন্টের প্রার্থীরা বিজয়ী হন। '৫৪ সালের নির্বাচনে সন্ত্রাস, প্রতারণা, কারচুপি প্রভৃতি অনুসৃত হয়েছে বলে কোন মহল থেকে অভিযোগ উঠে নি। বাকেরগঞ্জ জেলায় ভোটারতালিকায় কিছু অনিয়ম ধরা পড়লে অবৈধ পন্থা অবলম্বনকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।[২০] অমোচনীয় কালির ব্যবহার এবং 'পূর্ব বাংলা নির্বাচনী অপরাধ অধ্যাদেশ' জারি প্রার্থী ও ভোটারদেরকে নির্বাচনে অবৈধ উপায় ও কারচুপির আশ্রয় গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখে।[২১] মাত্র পাঁচটি নির্বাচনী এলাকায় নির্বাচনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদন করা হয়। পাঁচটি আবেদনের একটিকে গভর্নর 'ভারত (প্রাদেশিক নির্বাচন, দুর্নীতি ও নির্বাচন আবেদন) আদেশ, ১৯৩৬'[২২] -এর তৃতীয় খণ্ডের চতুর্থ অনুচ্ছেদবলে তাৎক্ষণিকভাবে বাতিল ঘোষণা করেন।

মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত আসনগুলিতে শতকরা ৩৭.৬০ ভাগ ভোটার ভোটদান করেন। সমসাময়িক রেকর্ডের তুলনায় এ হার কম হলেও পুরনো যোগাযোগব্যবস্থা এবং মুসলমান মহিলা ভোটারদের রক্ষণশীলতার কথা বিবেচনা করলে এ হার কোন মতেই কম ছিল না।

কৌশলগত কারণে কমিউনিস্টরা তাদের দলীয় প্রার্থী হওয়ার পরিবর্তে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন; এভাবে কমিউনিস্টরা ১৫টি আসনে জয়লাভ করেন। কমিউনিস্টদের মধ্য থেকে নির্বাচিত উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিগণ হলেন হাজি মোহাম্মদ দানেশ, সৈয়দ আলতাফ হোসেন, মোঃ আতাউর রহমান, মোঃ আবদুল মতিন, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, দেওয়ান মাহবুব আলী, সরদার ফজলুল করিম এবং মোহাম্মদ তোয়াহা। অন্যান্য যেসব কমিউনিস্ট প্রার্থী সাধারণ আসন (হিন্দু) থেকে নির্বাচিত হন তাঁরা হলেন বিজয় ভূষণ চট্টোপাধ্যায়, প্রসূন কান্তি রায়, পূর্ণেন্দু দস্তিদার এবং সুধাংশু বিমল দত্ত। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, মুসলমান মহিলা আসন থেকে সেলিনা বানু নামে একজন মহিলা কমিউনিস্ট প্রার্থী রাজশাহী-পাবনা আসন থেকে নির্বাচিত হন।

এই নির্বাচনের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে জাতীয় এলিট গোষ্ঠীর আধিপত্য নিঃশেষিত হয়ে যায়। পশ্চিম পাকিস্তানে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের রাজনীতি তখনো ভূস্বামী গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। কিন্তু পূর্ব বাংলায় জমিদারদের স্থলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় শিক্ষিত এলিট গোষ্ঠী, যেমন আইনজীবী, সাংবাদিক, শিক্ষক ও ব্যবসায়ীদের

২০. *Report of the Election to the East Bengal Legislative Assembly*, 1954, 18.

২১. ঐ।

২২. ঐ, ২০। হাইকোর্টের একজন বিচারপতি এবং দুজন অবসরপ্রাপ্ত জেলাজজের সমন্বয়ে নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়।

প্রভাব বৃদ্ধি পায়।[২৩] নির্বাচিতদের মধ্যে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যই ছিলেন নতুন, বয়সে অপেক্ষাকৃত তরুণ এবং এঁদের অনেকেরই পূর্ব-রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ছিল না। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচিত ২২৩ জন সদস্যের মধ্যে ১৩০ জনই ছিলেন আওয়ামী লীগের।

নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয়কে বিভিন্ন লেখক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক বিভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। নির্বাচন কমিশনার এম. আজফার সংবিধান কমিশনের সামনে এর ব্যাখ্যা প্রদান করতে গিয়ে বলেন যে, মুসলিম লীগ সরকারের জনপ্রিয়তা হারানোর প্রধান কারণ ছিল, এ সরকার পূর্ব বাংলার প্রধান জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি রেখে তাদের কর্মসূচি নির্ধারণ করে নি[২৪] এবং তারা এক অন্ধ বিশ্বাসে আচ্ছন্ন হয়ে মনে করে যে, ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ধারণাই ভোটারদের মুসলিম লীগকে ভোট দিতে উদ্বুদ্ধ করবে। কিন্তু নির্বাচনী ফলাফল নির্মমভাবে প্রমাণ করে মুসলিম লীগ তখন পূর্ব বাংলার জনগণ থেকে কি পরিমাণে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল।

পূর্ব বাংলায় যুক্তফ্রন্টের এই বিজয়ের "তিন মূল স্থপতি ছিলেন এ.কে. ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। তাঁরা জনগণকে বিপুলভাবে জাগিয়ে তোলেন।"[২৫] ভোটারদের উপর ছিল তাঁদের প্রচণ্ড প্রভাব। কামরুদ্দীন আহমদ তাঁর *A Social History of Bengal* গ্রন্থে মুসলিম লীগের এই বিপর্যয়ের কারণ বিশ্লেষণ করে নিম্নোক্ত বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন[২৬]:

এক. নির্বাচন সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হওয়ায় জনগণ মুসলিম লীগকে প্রত্যাখ্যান করার সুযোগ লাভ করে। সাধারণ জনগণের মধ্যে মুসলিম লীগের প্রতি তেমন কোন উল্লেখযোগ্য সমর্থন ছিল না। স্থানীয় পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের অনেকে মুসলিম লীগের সমর্থক হলেও এরা ছিলেন কায়েমী স্বার্থের প্রতিভূ।

দুই. জনগণ পাঞ্জাবীদের নিয়ন্ত্রণাধীন আমলাতান্ত্রিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে 'ব্যালট বাক্সের' মাধ্যমে তাদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়।

তিন. লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলার 'পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের' দাবি পূর্ব বাংলার জনগণের মধ্যে বিপুল সাড়া জাগায়।

চার. উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার জন্য মুসলিম লীগ ছিল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। মুসলিম লীগের এই মনোভাব সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিকভাবে সচেতন বাঙালিদের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ জাগিয়ে তোলে।

২৩. G W. Choudhury, *Democracy in Pakistan*, 58.
২৪. *Report of the Constitution Commission, Pakistan*, 1961, 67.
২৫. Syed Qamrul Ahsan, *Politics and Personalities in Pakistan*, (Dacca 1967), 94.
২৬. Kamruddin Ahmed, *A Social History of Bengal*, (Dacca 1970), 113-114.

পাঁচ. '৫২ সালে ছাত্রদের উপর পুলিশের গুলিবর্ষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে বাঙালিরা প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠে। অসাংবিধানিকভাবে নির্বাচনের তারিখ স্থগিত করার জন্যও বাঙালিদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়।

ছয়. লবণ, কেরোসিন তেল ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় গৃহিণীরাও সাধারণভাবে মুসলিম লীগ সরকারের প্রতি বিরূপ হয়ে পড়ে। এটাও মুসলিম লীগের পরাজয়কে ত্বরান্বিত করে।

মুসলিম লীগের মুখপত্র *দৈনিক আজাদের* মতে, রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নকে সঠিকভাবে মোকাবেলা করতে না পারা, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবির প্রতি একগুঁয়ে বিরোধিতা, পূর্ব বাংলার জনগণের অর্থনৈতিক দুর্গতি, সাধারণ জনগণ থেকে নেতৃবৃন্দের বিচ্ছিন্নতা ইত্যাদি পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগের পরাজয়ের প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায়।[২৭] মুসলিম লীগের পরাজয়ের আরো কারণ হলো, এ দল তখন যথাযথভাবে সংগঠিত ছিল না এবং ঐ সময় দলের কোন সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচি ছিল না। ফলে এই পরাজয় দলের মধ্যে সংস্কার ও এর পুনরুজ্জীবনের বিষয়টিকে সামনে নিয়ে আসে। পূর্ব বাংলায় যুক্তফ্রন্টের বিপুল বিজয় মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দকে এক কঠিন অবস্থার মুখোমুখি দাঁড় করায়। যেসব বড় বড় শিল্পপতি মুসলিম লীগকে আর্থিক সহায়তা দিয়েছিলেন তাঁরাও বেশ বিব্রত হয়ে পড়েন।

## কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ এবং যুক্তফ্রন্টে বিভক্তি

১৯৫৪ সালের ২৫ মার্চ পূর্ব বাংলার গভর্নর চৌধুরী খালেকুজ্জামান ফজলুল হককে সরকার গঠনের আহ্বান জানান। ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্য হলেন আশরাফউদ্দিন চৌধুরী (বেসরকারি সরবরাহ ও যোগাযোগ), আবু হোসেন সরকার (বিচার, স্বাস্থ্য ও স্থানীয় সরকার) এবং সৈয়দ আজিজুল হক (শিক্ষা, শ্রম ও শিল্প)। এখানে উল্লেখ্য যে, আবু হোসেন সরকার অবিভক্ত বাংলার আইনসভার একজন সদস্য ছিলেন। এ.কে. ফজলুল হকের ভাগিনা সৈয়দ আজিজুল হক কৃষক শ্রমিক পার্টির নেতা ছিলেন এবং বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক আশরাফউদ্দিন চৌধুরী ছিলেন তখন নেজাম-এ-ইসলাম পার্টিভুক্ত। হক মন্ত্রিসভার এমন কাঠামো 'যুক্তফ্রন্টের অধিকাংশ শরিক দলের মধ্যে মারাত্মক অসন্তোষ সৃষ্টি করে'।[২৮] বিশেষকরে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ তা কিছুতেই গ্রহণ করতে পারেন নি এবং এর পরিণতি হয় অশুভ।

নেতৃবৃন্দের মধ্যে ব্যক্তিগত রেষারেষি এবং শরিক দলগুলির মধ্যে রাজনৈতিক কর্মসূচিগত মতভিন্নতার কারণে যুক্তফ্রন্টে খুব শীঘ্রই বিভক্তি দেখা দেয়। যুক্তফ্রন্টের

২৭. *দৈনিক আজাদ*, ২২ মার্চ ১৯৫৪, সম্পাদকীয়।
২৮. Abu Jafar Shamsuddin, *Sociology of Bengal Politics*, 42.

বিভক্তি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে একজন লেখক বলেন, "যুক্তফ্রন্ট ছিল একটি নির্বাচনী মোর্চা, নির্বাচন এবং মুসলিম লীগবিরোধিতাকে কেন্দ্র করে এই মোর্চা গড়ে উঠে। কিন্তু ক্ষমতায় যাওয়ার পর নেতাদের মধ্যে মন্ত্রিত্ব নিয়ে বিরোধ দেখা দেয় এবং অতি দ্রুত যুক্তফ্রন্ট বিভক্ত হয়ে পড়ে।"[২৯]

১৯৫৪ সালের মে মাসের প্রথম সপ্তাহে কলকাতা সফরকালে ফজলুল হক রাষ্ট্রবিরোধী বক্তব্য রাখেন বলে বিভিন্ন পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয়। এ প্রসঙ্গে আয়ান স্টিফেন্স বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক কলকাতা সফরে গিয়ে অসতর্কভাবে এমন সব বক্তব্য রাখেন, যা পাকিস্তানের প্রতি রাষ্ট্রদ্রোহিতা হিসেবে ব্যাখ্যাত হয়।"[৩০] ফজলুল হকের বিরুদ্ধে অভিযোগ হলো, তিনি দেশে ফিরে "কেন্দ্রের সাথে পূর্ব বাংলার সমস্যা নিয়ে আলোচনাকালে স্বাধীনতার প্রশ্নটিকে অগ্রাধিকার দেবেন"—এই মর্মে তিনি কলকাতায় বক্তব্য রেখেছেন।[৩১] মুসলিম লীগ নেতাদের মালিকানাধীন পত্রিকাগুলি তাঁর এ বক্তব্যকে 'সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিত' বলে গণ্য করে। *পাকিস্তান রিভিউ*-এর সম্পাদকীয়তে বলা হয়, "কোন বিদেশী সরকারের সাথে উচ্চ পর্যায়ের নীতি সংক্রান্ত আলোচনা প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রীর কাজ নয়, ঢাকায় তাঁর আসন যতো সুদৃঢ় হোক না কেন কিংবা তিনি যতো জনপ্রিয় নেতাই হোন না কেন।"[৩২]

মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে ফজলুল হক আওয়ামী লীগ সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করে তাঁর মন্ত্রিসভাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেন। যুক্তফ্রন্ট গণপরিষদ বিলোপ এবং অচিরেই কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ সরকারের পদত্যাগ দাবি করে। এ দাবি প্রত্যাখ্যান করে প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী গণপরিষদে বলেন :

> গণপরিষদ বিলুপ্ত করার কোন প্রশ্নই উঠে না, কেননা এর সদস্যদের সংবিধান প্রণয়নের জন্যই ম্যানডেট দেয়া হয়েছে...তাছাড়া এমন কোন সাংবিধানিক বিধানও নেই যার অধীনে গণপরিষদ বিলুপ্ত করা যেতে পারে।... প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রাদেশিক সরকার কি ধরনের হবে তা নির্ধারণ করার জন্য। কেন্দ্রীয় সরকার অথবা কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের রূপ কি হবে সে সম্পর্কে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ কোনভাবেই মতামত দেয়ার জন্য ভোটদাতাদের আহ্বান করা হয় নি।[৩৩]

ইতিমধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল চক্র পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী বাঙালি ও বিহারীদের মধ্যে সংঘাতময় সম্পর্ক সৃষ্টি করে। ফলে নারায়ণগঞ্জের আদমজী জুট মিলস্ এবং চট্টগ্রামের

২৯. Najma Choudhury, *The Legislative Process in Bangladesh Politics and Functioning of the East Bengal Legislature, 1947-58,* (Dacca 1980), 22.
৩০. Ian Stephens, *Pakistan: Old Country New Nation,* (London 1963), 293.
৩১. *Round Table,* September 1954, 401-2.
৩২. *Pakistan Review,* 11:6 (1954), 9.
৩৩. *Keesings Contemporary Archives,* 13514.

চন্দ্রঘোনা পেপার মিল'স্ (চট্টগ্রাম)-এর অবাঙালি শ্রমিক ও বাঙালি শ্রমিকদের মধ্যে দাঙ্গা সংঘটিত হয়। এতে বহু শ্রমিক নিহত হয়। কেন্দ্রীয় সরকার দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের পরিবর্তে ১৯৫৪ সালের ৩০ মে ফজলুল হক মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করে এবং ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ৯২ ক ধারা অনুযায়ী পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রের শাসন জারি করে। হক মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করার সময় প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হককে একজন 'স্বঘোষিত রাষ্ট্রদ্রোহী' বলে আখ্যায়িত করেন। কেন্দ্রের শাসন জারি করার পর তৎকালীন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা সচিব মেজর জেনারেল ইস্কান্দর মির্জাকে পূর্ব বাংলার গভর্নর নিযুক্ত করে পাঠানো হয়। বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী কে.বি. সাঈদ-এর মতে :

> পূর্ব বাংলায় পাঞ্জাবের মতোই কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ ঘটে। পার্থক্য শুধু এইটুকু যে, পাঞ্জাবে মুসলিম লীগ নেতারা ধর্মীয় বিভেদ থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁদেরকে ক্ষমতা থেকে সরানো হয়, আর পূর্ব বাংলায় যুক্তফ্রন্ট নেতারা, যাঁরা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে নির্বাচিত হয়েছিলেন, তাঁদের ক্ষমতাচ্যুত করা হয়। উভয় ক্ষেত্রেই প্রকৃতপক্ষে সামরিক হস্তক্ষেপ ঘটে, যদিও শুধু পাঞ্জাবে সামরিক শাসন জারি করা হয় এবং পূর্ব বাংলায় প্রতিরক্ষা দপ্তরের একজন উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তার উপর বেসামরিক প্রশাসনের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।[৩৪]

বস্তুত পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক নেতারা অংশত কেন্দ্রের হস্তক্ষেপজনিত কারণে এবং আংশিকভাবে তাঁদের নিজেদের দুর্বলতার কারণে পূর্ব বাংলায় একটি গণতান্ত্রিক শাসন পরিচালনার সুযোগ হাতছাড়া করেন। কেন্দ্রের শাসন জারির পর সশস্ত্র পুলিশবেষ্টিত অবস্থায় এ. কে. ফজলুল হক নিজ বাড়িতে অন্তরীণ হন। হক মন্ত্রিসভা বাতিলের ২৪ ঘন্টার মধ্যে ঢাকাসহ অন্যান্য স্থান থেকে যুক্তফ্রন্টের প্রায় ১৬শ' নেতা, কর্মী ও সমর্থককে গ্রেফতার করা হয়।[৩৫] আটককৃতদের মধ্যে ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমানসহ প্রাদেশিক পরিষদের আরো ৩০ জন সদস্য। আওয়ামী লীগের মুখপত্র *দৈনিক ইত্তেফাকের* উপর কড়া বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়।[৩৬]

পূর্ব বাংলার পরবর্তী রাজনীতিতে বেশ ঘন ঘন কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ ঘটতে থাকে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, "১৯৫৪ সালের নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বিজয়ী হলেও প্রধানত অভ্যন্তরীণ উপদলীয় কোন্দলের কারণে যুক্তফ্রন্ট পাকিস্তানের রাজনীতিতে কোন মৌলিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয় নি।"[৩৭] পূর্ব বাংলায় এবং কেন্দ্রে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা থেকে যুক্তফ্রন্ট সরকারের ব্যর্থতা স্পষ্ট হয়ে উঠে। ১৯৫৪-৫৮

---

৩৪. Khalid B. Sayeed, *Politics in Pakistan*, 41.

৩৫. তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া), *পাকিস্তানী রাজনীতির বিশবছর*, (ঢাকা ১৯৮১), ৬১।

৩৬. ঐ।

৩৭. Talukder Maniruzzaman, *Radical Politics*, 33.

কালপর্বে পূর্ব বাংলায় তিনটি এবং কেন্দ্রে পাঁচটি সরকার গঠিত হয়। অধিকন্তু ঐ সময়ে দুই বছরের জন্য পূর্ব বাংলায় সরাসরি গভর্নরের শাসন জারি হয়।[৩৮]

১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন তৎকালীন পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসে বিভিন্ন কারণে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। প্রথমত, এই নির্বাচন ছিল পূর্ব বাংলা তথা বর্তমান বাংলাদেশে সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত প্রথম অবাধ নির্বাচন। দ্বিতীয়ত, এই নির্বাচনের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার জনগণের অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ ঘটে এবং এই নির্বাচন পূর্ব বাংলার জনগণকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তোলে এবং তাদের মধ্যে অভূতপূর্ব রাজনৈতিক উৎসাহ-উদ্দীপনা জাগিয়ে তোলে। তৃতীয়ত, এই নির্বাচনে পূর্ব বাংলার পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবির প্রতি ব্যাপক জনসমর্থনের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। চতুর্থত, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে শোষিত পূর্ব বাংলার জনগণের মধ্যে এটি প্রথমে বিপুল আশার সঞ্চার করে এবং পরবর্তীকালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতি তাদের বহুলাংশে মোহমুক্তি ঘটায়। শেষ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো, এই নির্বাচন পূর্ব বাংলায় আভিজাত্যিক মুসলিম লীগ শাসনের অবসান ঘটায়। বস্তুত এই নির্বাচনে মুসলিম লীগ এমনভাবে জনগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয় যে, পুনরায় জনসমর্থন লাভ করা মুসলিম লীগের পক্ষে আর কখনো সম্ভব হয় নি।

অসাংবিধানিকভাবে হক মন্ত্রিসভা বাতিল এবং পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে ক্রমাগত কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপের ফলে আঞ্চলিক অসন্তোষ ও অবিশ্বাস ঘনীভূত হতে থাকে। যুক্তফ্রন্টের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা এবং উপদলীয় কোন্দলের কারণে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক নেতারা পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে ঐক্যবদ্ধ হতে এবং রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে ব্যর্থ হন। তবুও '৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচন পরবর্তী রাজনৈতিক পরিবর্তনের গতিপ্রকৃতির উপর চূড়ান্ত প্রভাব ফেলে এবং স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করে তোলে।

এক দশকেরও অধিক কাল পরে পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ৬ দফা কর্মসূচিতে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা কর্মসূচির প্রতিফলন ঘটে। বিশেষত ২১ দফা কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত ১৯ নং দফাটি আংশিক পরিবর্তন করে ৬ দফা কর্মসূচিতে গৃহীত হয়। আওয়ামী লীগের ৬ দফায় জোর দিয়ে বলা হয় যে মাত্র দুটি বিষয়—দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্র সংক্রান্ত বিষয় কেন্দ্রের হাতে থাকবে এবং অন্য সকল বিষয়, যেমন মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ, বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, কর ও রাজস্ব সংগ্রহ থাকবে প্রদেশগুলোর এখতিয়ারে। ৬ দফা কর্মসূচি অনুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে দেখা যায় যে এর মধ্যে তিনটি দফা অর্থাৎ ৩, ৪ ও ৫ নং দফা স্থায়ীভাবে বৈষম্য দূর করার জন্য আঞ্চলিক সরকার কর্তৃক অর্থনৈতিক বিষয় প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পর্কিত। উল্লেখ্য, ১৯৫৪ সালের নির্বাচনী

৩৮. Rounaq Jahan, *Pakistan*, 48

মেনিফেস্টো বাস্তবায়ন করতে গিয়ে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ প্রদেশের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দাবি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। একইভাবে ৬ দফা কর্মসূচির মূল দাবিও ছিল পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন। ২১ দফা কর্মসূচির মতো ৬ দফা কর্মসূচিও বাঙালি জনগণের প্রাণের দাবি হয়ে দাঁড়ায়, তা এখানকার উদ্যোক্তা শ্রেণীর পূর্ণ সমর্থন লাভ করে এবং পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসে। শেখ মুজিব ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনকে ৬ দফার উপর গণভোট বলে ঘোষণা করেন এবং নির্বাচনে জয়লাভের পর তিনি ৬ দফা দাবি থেকে একচুল পরিমাণও সরে দাঁড়ান নি, কেননা ৬ দফার প্রশ্নে কোন আপোসরফা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। অন্য দিকে জেনারেল আইয়ুব খান, জুলফিকার আলী ভুট্টো, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অন্য নেতৃবর্গ ৬ দফা কর্মসূচির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। জেনারেল আইয়ুব ৬ দফা উত্থাপনকারী নেতৃবর্গকে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' বলে চিহ্নিত করেন এবং বলেন যে এরা বৃহত্তর সার্বভৌম বাংলার স্বপ্ন দেখছে। আইয়ুব এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন যে, ৬ দফা একটি নিতান্ত 'অনিষ্টকর অভিসন্ধি' এবং এটি দেশের ধ্বংস ডেকে আনবে। পাকিস্তানের এলিট শাসকরা ৬ দফাকে কেবল তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ নয়, দেশের সামাজিক কাঠামোর স্থায়িত্বের প্রতি হুমকি বলে মনে করেছিল, যার উপর তাদের ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধা পুরোপুরি নির্ভর করতো।[৩৯]

আইয়ুব সরকার সবচেয়ে বড়ো ভুল করলো যখন এ সরকার শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করলো এবং তাঁকে ও সিভিল সার্ভিস ও সামরিক বাহিনীর কতিপয় কর্মকর্তাকে ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িত করলো।[৪০] এই মিথ্যা মামলার ফল হলো সুদূরপ্রসারী। এটি পূর্ব বাংলার জনগণের জাতীয়তাবাদী চেতনাকে তীব্রতর করে এবং শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তাকে তুঙ্গে নিয়ে যায়। ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বরের শেষ দিকে আইয়ুব সরকার গুরুতর গণবিক্ষোভের সম্মুখীন হয় এবং ব্যাপক গণআন্দোলন সারা দেশকে আলোড়িত করে।

পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুববিরোধী অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেয় ছাত্র সমাজ। এ পর্যায়ে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগ, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন) এবং পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) একজোট হয়ে গঠন করে ছাত্র সংগ্রাম কমিটি এবং তারা সবাই আওয়ামী লীগের ১১ দফা দাবির প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে। পাকিস্তানের উভয় প্রদেশে তীব্র গণআন্দোলনের মুখে আইয়ুব মিথ্যা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করেন এবং ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ শেখ মুজিব ও অন্য সকল অভিযুক্তকে বিনাশর্তে মুক্তিদান করেন।

৩৯. M. Anisur Rahman, "East Pakistan: The Roots of Estrangment", *South Asian Review*, vol. 3, April 1970, 238-39.

৪০. দেখুন, *Pakistan Observer*, January 7 and 19, 1968.

অতঃপর আইয়ুব ১৯৬৯ সালের মার্চে উভয় প্রদেশের নেতৃবৃন্দের একটি গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করেন। এই বৈঠকে শেখ মুজিব পুনরায় ৬ দফা দাবি উত্থাপন করেন। গোলটেবিল বৈঠক রাজনৈতিক সংকট সমাধান করতে ব্যর্থ হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে আইয়ুব ২৫ মার্চ ১৯৬৯ জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বাধ্য হন এবং জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ ভেঙে দেন। ইয়াহিয়া ক্ষমতাগ্রহণ করেই প্রতিশ্রুতি দেন যে তিনি নিয়মতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করবেন।[৪১] তিনি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং এই লক্ষ্যে তিনি একটি আইনগত কাঠামো অধ্যাদেশ জারি করেন। এদিকে মওলানা ভাসানীও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রদানের দাবি জানান। মুজিব নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, কারণ তিনি নির্বাচনকে ৬ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে গণভোট বলে গণ্য করেন।[৪২] শেখ মুজিব ১৯৭০ সালের ২৮ অক্টোবর বেতার ও টেলিভিশনে তাঁর নির্বাচনী প্রচার পর্যায়ের ভাষণে ৬ দফার উপরই জোর দেন।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফলে আওয়ামী লীগের ৬ দফার প্রতি পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত হয়। এই নির্বাচনে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ ১৬৯টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৬৭টি আসনে জয়লাভ করে। আওয়ামী লীগের এই বিস্ময়কর বিজয় পশ্চিম পাকিস্তানী রাজনীতিক, সামরিক জেনারেল এবং রাজনৈতিক পরিদর্শকদের হতবাক করে দেয়। এমনকি শেখ মুজিব নিজেও এমন বিপুল বিজয় আশা করেন নি। স্পষ্টতই এই বিজয়ের ফলে আওয়ামী লীগের ভেতরে ও বাইরে ৬ দফা বাস্তবায়নের জন্য প্রচণ্ড চাপের সৃষ্টি হয়। ইতিমধ্যে মওলানা ভাসানীও শেখ মুজিবুর রহমানকে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করার আহ্বান জানান। ভূট্টো জোর দিয়ে বলেন যে তাঁর দলের নিকট "দুই বিষয়ভিত্তিক কেন্দ্র" ও "মুদ্রা" গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি আরও ঘোষণা করেন যে আওয়ামী লীগ ৬ দফা সম্পর্কে আপোস করার সুনির্দিষ্ট নিশ্চয়তা না দিলে তাঁর দল জাতীয় পরিষদের ৩ মার্চ অনুষ্ঠেয় অধিবেশনে যোগদান করবে না।[৪৩] ভূট্টো এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অন্য নেতৃবৃন্দ শেখ মুজিবের সঙ্গে আপোসমীমাংসা করতে অস্বীকৃতি জানান। পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবর্গের এই বিরোধ ও মতানৈক্য জেনারেল ইয়াহিয়াকে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মুলতবি করার অজুহাত যোগালো। এভাবে বাংলাদেশের পক্ষে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সরাসরি অংশগ্রহণ করে ৬ দফার ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক কাঠামো নির্মাণের শেষ আশাটুকু নস্যাৎ হয়ে গেল। যে ৬ দফা আন্দোলন মূলত আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের জন্য আন্দোলন হিসেবে শুরু হয়েছিল, তা এখন বাংলাদেশের জাতীয় স্বাধীনতার জন্য আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ

৪১. দেখুন, Dawn, March 27, 1969.

৪২. দেখুন, *Pakistan Observer,* October 26, 1970.

৪৩. Dawn, February 16, 1971.

করলো। তবু জেনারেল ইয়াহিয়া, মুজিব, ভূট্টো এবং অন্যান্য নেতাদের মধ্যে নিষ্ফল সংলাপ ও আলোচনা ১৯৭১ সালের ১৫ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

৬ দফা দাবি পাকিস্তানের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন পর্যায়ে সংকট আরো ঘনীভূত করেছিল, যেমন পরিচিতি সনাক্তকরণ, অংশগ্রহণ ও বন্টনের সংকট, যা সমাধান করা সম্ভব হয় নি। এই সংকটের মধ্যে পাকিস্তানের সামরিক শাসকবর্গ শক্তিপ্রয়োগ করে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। কিন্তু একটি সংকটাপন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থায়, যেখানে জনগণ রাজনৈতিক দাবিদাওয়ার রাজনীতি নিয়ে মরণপণ সংগ্রামে অবতীর্ণ, সেখানে দমনমূলক ব্যবস্থা বিপরীত ফল উৎপাদী ও ব্যর্থ হতে বাধ্য। পাকিস্তানের ক্ষেত্রে এটাই সত্য প্রমাণিত হয়েছে, যে দেশ প্রায় পঁচিশ বছর ঐক্যবদ্ধ অস্তিত্ব বজায় রাখার পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আভির্ভূত হয়েছে

## পরিশিষ্ট

## ২১ দফা কর্মসূচি*

### নীতি

কুরআন ও সুন্নাহর মৌলিক নীতির প্রতিকূল কোন আইন প্রণয়ন করা হবে না এবং ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে নাগরিকগণের জীবনধারণের ব্যবস্থা করা হবে।

১. বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হবে।

২. বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি ও সমস্ত খাজনা আদায়কারী স্বত্ব উচ্ছেদ ও রহিত করে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বিতরণ করা হবে এবং উচ্চহারের খাজনা ন্যায়সঙ্গতভাবে হ্রাস করা হবে এবং সার্টিফিকেটযোগে খাজনা আদায়ের প্রথা রহিত করা হবে।

৩. পাট ব্যবসায়কে জাতীয়করণ করার উদ্দেশ্যে তাকে পূর্ববঙ্গ সরকারের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনে আনয়ন করে পাটচাষীদের পাটের মূল্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে এবং লীগ মন্ত্রিসভার আমলের পাট কেলেঙ্কারির তদন্ত করে সংশ্লিষ্ট সকলের শাস্তির ব্যবস্থা ও তাদের অসদুপায়ে অর্জিত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে।

৪. কৃষির উন্নতির জন্য সমবায় কৃষিব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে ও সরকারি সাহায্যে সকল প্রকার কুটির ও হস্তশিল্পের উন্নতি সাধন করা হবে।

৫. পূর্ববঙ্গকে লবণশিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য সমুদ্র-উপকূলে কুটিরশিল্পের ও বৃহৎ শিল্পের লবণ তৈরির কারখানা স্থাপন করা হবে এবং মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার

* *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র* : প্রথম খণ্ড, (ঢাকা ১৯৮২), ৩৭৩-৭৪

আমলের লবণ কেলেঙ্কারি সম্পর্কে তদন্ত করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে ও তাদের অসদুপায়ে অর্জিত যাবতীয় অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে।

৬. শিল্প ও কারিগরি শ্রেণীর গরিব মোহাজেরদের আশু কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে।

৭. খাল খনন ও সেচের ব্যবস্থা করে দেশকে বন্যা ও দুর্ভিক্ষের কবল থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হবে।

৮. পূর্ববঙ্গকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিল্পায়িত করে ও কৃষিকে আধুনিক যুগোপযোগী করে শিল্প ও খাদ্যে দেশকে স্বাবলম্বী করা হবে এবং আন্তর্জাতিক শ্রমসংঘের মূলনীতি অনুসারে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক এবং সব ধরনের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা হবে।

৯. দেশের সর্বত্র একযোগে প্রাথমিক ও অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন করা হবে এবং শিক্ষকদের ন্যায়সঙ্গত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হবে।

১০. শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কার করে শিক্ষাকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কার্যকরী করে কেবলমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হবে এবং সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়সমূহের বর্তমান ভেদাভেদ উঠিয়ে দিয়ে একই পর্যায়ভুক্ত করে সব বিদ্যালয়সমূহকে সরকারি সাহায্যপুষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হবে এবং শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হবে।

১১. ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল কানুন বাতিল ও রহিত করে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে উচ্চশিক্ষাকে সস্তা ও সহজলভ্য করা হবে এবং অল্প ব্যয়সাপেক্ষ ও সুবিধাজনক ছাত্রাবাসের বন্দোবস্ত করা হবে।

১২. শাসনব্যয় সর্বাত্মকভাবে হ্রাস করা হবে এবং তদুদ্দেশ্যে উচ্চ বেতনভোগীদের বেতন কমিয়ে ও নিম্ন বেতনভোগীদের বেতন বাড়িয়ে তাদের আয়ের মধ্যে একটি সুসংহত সামঞ্জস্য বিধান করা হবে। যুক্তফ্রন্টের কোন মন্ত্রী এক হাজার টাকার বেশি বেতন গ্রহণ করবেন না।

১৩. দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি, ঘুষ-রিশওয়াত বন্ধ করার কার্যকরী ব্যবস্থা করা হবে এবং এতদুদ্দেশ্যে সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি পদাধিকারি ও ব্যবসায়ীর ১৯৪০ সাল হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ নেয়া হবে এবং সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিতে না পারলে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে।

১৪. জননিরাপত্তা আইন ও অর্ডিন্যান্স প্রভৃতি কালাকানুন রদ ও রহিত করে বিনাবিচারে আটক বন্দীদের মুক্তি দেয়া হবে ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত

ব্যক্তিদের প্রকাশ্য আদালতে বিচার করা হবে এবং সংবাদপত্র ও সভা-সমিতি করার অধিকার অবাধ ও নিরঙ্কুশ করা হবে।

১৫. বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথক করা হবে।

১৬. বর্ধমান হাউসকে আপাতত ছাত্রাবাস ও পরে বাংলা ভাষার গবেষণাগারে পরিণত করা হবে।

১৭. বাংলা রাষ্ট্রভাষার দাবিতে যাঁরা মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার গুলিতে শহীদ হয়েছেন, তাঁদের পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ ঘটনাস্থলে একটি শহীদ মিনার নির্মাণ করা হবে এবং তাঁদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে।

১৮. ২১শে ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস ঘোষণা করে একে সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করা হবে।

১৯. লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ববঙ্গকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হবে এবং দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা ব্যতীত আর সমস্ত বিষয় (অবশিষ্ট ক্ষমতাসমূহ) পূর্ববঙ্গ সরকারের হাতে আনয়ন করা হবে এবং দেশরক্ষা বিভাগের স্থলবাহিনীর হেডকোয়ার্টার পশ্চিম পাকিস্তানে ও নৌবাহিনীর হেডকোয়ার্টার পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপন করা হবে এবং পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র নির্মাণের কারখানা নির্মাণ করে পূর্ব পাকিস্তানকে আত্মরক্ষায় স্বয়ংসম্পূর্ণ করা হবে। আনসার বাহিনীকে সশস্ত্র বাহিনীতে পরিণত করা হবে।

২০. যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা কোন অজুহাতেই আইন পরিষদের আয়ু বাড়াবে না। আইন পরিষদের আয়ু শেষ হওয়ার ছয় মাস পূর্বেই মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে নির্বাচন কমিশন মারফত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করবেন।

২১. যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভার আমলে যখন যে আসন শূন্য হবে, তিন মাসের মধ্যে তা পূরণের জন্য উপনির্বাচনের ব্যবস্থা করা হবে এবং পর পর তিনটি উপনির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থী পরাজিত হলে মন্ত্রিসভা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করবে।

# ১৭

## স্থানীয় সরকার

ডালেম চন্দ্র বর্মন*

প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগের স্থানীয় শাসনের ছিল তিনটি স্তর : গ্রাম পঞ্চায়েত, জমিদারি কাছারি এবং পরগনা তহসিল। গ্রাম পঞ্চায়েত ছিল মুগল স্থানীয় সরকারের মূলভিত্তি। পরগনা তহসিল প্রতিনিধিত্ব করতো সরকারি স্বার্থের। গ্রামবাসী ও সরকারের মিলনস্থল ছিল জমিদারি কাছারি। জমিদার ছিল একাধারে গ্রাম পঞ্চায়েত ও সরকারের প্রতিনিধি। এ ধরনের স্থানীয় সরকার ছিল ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের জন্য অনুপযোগী। অতএব, কর্নওয়ালিস পরিকল্পনায় (১৭৯৩) মুগল স্থানীয় শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন করে ঔপনিবেশিক স্বার্থ সংরক্ষণ করতে পারে এমন কতিপয় পদ অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যেমন মুনসেফ, থানাদার ও জেলা কালেক্টর। যতোদিন রাজস্ব সংগ্রহই ছিল ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য, ততোদিন ঐ কর্নওয়ালিসী ব্যবস্থাই অনুসৃত হয়েছে প্রায় অন্ধভাবে। কিন্তু সিপাহি বিদ্রোহের পর বৃটিশদের ভারতনীতিতে লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটে। ১৮৬১ সন থেকে পর্যায়ক্রমে ভারতীয়দের প্রশাসনে অংশীদার করার নীতি গ্রহণ করা হয়। এই উদারনীতির সবচেয়ে বেশি প্রতিফলন ঘটে রিপন প্রশাসনে। রিপন প্রশাসনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে আধুনিক স্থানীয় প্রশাসনব্যবস্থার বিকাশ সাধন।

### পল্লীর স্থানীয় সরকার

ব্রিটিশ প্রশাসনকে বিশেষকরে পল্লী এলাকায় রাজস্ব আদায় এবং আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়। এই উভয় কাজই ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইনের মাধ্যমে সৃষ্ট জমিদারদের হাতে অর্পণ করা হয়। কিন্তু আর্থিক কারণে

* অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে জমিদারগণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাব্যবস্থা পরিচালনার কাজে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। এ অবস্থার ফলে ১৮৭০ সালে চৌকিদারি পঞ্চায়েত আইন পাস করা হয়। এ আইনের বিধানমতে জেলাকে বিভিন্ন 'ইউনিয়নে' ভাগ করা হয়। প্রত্যেকটি ইউনিয়নের আয়তন হয় প্রায় ১০ থেকে ১২ বর্গমাইল, যার আওতায় থাকতো কতকগুলি গ্রাম। প্রত্যেকটি ইউনিয়নের জন্য গঠিত হতো একটি কমিটি, যার সদস্যসংখ্যা হতো ৫ এবং এটি পঞ্চায়েত বলে পরিচিত হতো। এসব পঞ্চায়েত নিজ নিজ এলাকাধীন গ্রামসমূহে শান্তিরক্ষার জন্য দায়ী থাকতো এবং এ কাজে চৌকিদার বা গ্রাম-পুলিশের সহায়তা গ্রহণ করতো। চৌকিদারদের বেতন-ভাতা বাবদ প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহের জন্য এসব পঞ্চায়েতকে কর আদায়ের ক্ষমতাদান করা হয়।

পঞ্চায়েত কোন নির্বাচিত সংস্থা ছিল না। পঞ্চায়েতের সদস্যদেরকে মনোনয়ন দান করতেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, যিনি তাদের সদস্যপদ বাতিলও করতে পারতেন, এমনকি কোন কারণ না দর্শিয়েও। পঞ্চায়েতের সদস্যপদ গ্রহণ ছিল বাধ্যতামূলক প্রকৃতির এবং সদস্যপদ গ্রহণে অস্বীকৃতির কারণে জরিমানা আরোপসহ বিভিন্ন ধরনের শাস্তির ব্যবস্থা হতে পারতো। পঞ্চায়েতের মনোনয়নমূলক চরিত্র, পঞ্চায়েতের বাধ্যতামূলক সদস্যপদ গ্রহণ, সদস্যপদ বাতিলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের খামখেয়ালিপনা, কর্তৃত্বহীন দায়িত্ব এবং কোন রকম সেবার ব্যবস্থা না করে শুধুমাত্র কর আদায় পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে জনসাধারণের কাছে অপ্রিয় করে তোলে। পরিস্থিতি মোকাবেলায় পরে এই ব্যবস্থার আরো সংস্কার সাধন করা হয়।

## বেঙ্গল লোকাল সেল্‌ফ গভর্নমেন্ট এ্যাক্ট, ১৮৮৫

এ আইনটি ১৮৮৫ সালের ৬ এপ্রিল বঙ্গীয় আইন পরিষদ কর্তৃক পাস হয় এবং ঐ বছরেই ১১ জুলাই তা গভর্নর জেনারেলের অনুমোদন লাভ করে।[১] এ আইনটি ছিল তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড রিপনের সুপারিশের ফল। রিপনের শাসনামলের সবচেয়ে বড় সফলতা হচ্ছে 'স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংস্কার'।[২] তিনি ছিলেন একজন উদার চিন্তার মানুষ এবং তিনি বিশ্বাস করতেন যে স্থানীয় সরকারকে যদি প্রাণবন্ত হতে হয়, তবে তা স্থানীয় পরিবেশ হতে গড়ে উঠতে হবে; আর যদি তা কৃত্রিমভাবে গড়ে তুলতেই হয়, তাহলে কমপক্ষে তার পরিকল্পনা স্থানীয় প্রশাসকদের দ্বারা বিস্তারিতভাবে প্রণয়ন করাতে হবে এবং তা কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা তৈরি অবস্থায় চাপিয়ে দেয়া উচিত হবে না।[৩] সে সময়ে বৃটেনে উপযোগবাদী দর্শনের জোয়ার বইছিল এবং সেখানে উদারনৈতিক সরকার গঠন এই আইন প্রণয়নে সাহায্য করেছে।

১. *Report on the Administration of Bengal,* 1885-86, (Calcutta 1887), 80.

২. Hugh Tinker, *The Foundations of Local Self-government in India, Pakistan and Burma,* (London 1924), 43.

৩. ঐ।

এ আইনের উদ্দেশ্য ছিল বাংলার জনসাধারণকে তাদের স্থানীয় বিষয়াদি পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অর্থপূর্ণভাবে উৎসাহিত করা এবং দায়িত্ব গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা।[৪] এ আইন বাংলায় ত্রি-স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় শাসন প্রবর্তন করে। প্রতি জেলায় জেলাবোর্ড, প্রতি মহকুমায় লোকাল বোর্ড এবং প্রতি ইউনিয়নে ইউনিয়ন কমিটি গঠন করা হয়। চৌকিদারি পঞ্চায়েত আইনের অধীনে গঠিত পঞ্চায়েতের সদস্যদের মতো নতুনভাবে প্রবর্তিত ইউনিয়ন কমিটির সদস্যগণ মনোনীত ছিলেন না। তাঁরা ইউনিয়নের প্রাপ্তবয়স্ক জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হতেন। সদস্যসংখ্যা কোনভাবেই ৫ জনের কম বা ৯ জনের বেশি হতো না। ২৪ পরগনা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, যশোর, খুলনা, হুগলী, হাওড়া, বর্ধমান, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, ঢাকা, ফরিদপুর, রাজশাহী, পাবনা ও পাটনা এই ষোলটি জেলার লোকাল বোর্ডসমূহ দুই-তৃতীয়াংশ নির্বাচিত এবং এক-তৃতীয়াংশ সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হতো। অন্যান্য জেলার ক্ষেত্রে লোকাল বোর্ডের সদস্যগণ সরকার কর্তৃক মনোনীত হতেন। তবে লেফটেন্যান্ট গভর্নর তাঁকে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে যেকোন জেলাকেই আগে বর্ণিত ষোলটি জেলার তালিকার অন্তর্ভুক্ত করতে পারতেন।[৫] উভয় ক্ষেত্রেই লোকাল বোর্ডের সদস্যসংখ্যা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হতো, যদিও সংখ্যা কোনমতেই ৬-এর কম হতে পারতো না। বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে লেফটেন্যান্ট গভর্নর কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক সদস্য নিয়ে জেলাবোর্ড গঠিত হতো। লোকাল বোর্ড সম্বলিত জেলায় জেলাবোর্ডের সদস্যসংখ্যার অর্ধেক লোকাল বোর্ড কর্তৃক নির্বাচিত হতো এবং অন্য অর্ধেক অংশ সদস্য মনোনীত হতেন সরকার কর্তৃক।

রাস্তা ও যোগাযোগ, হাসপাতাল ও ঔষধালয়, স্বাস্থ্যব্যবস্থা, টিকাদান, দুর্ভিক্ষসাহায্য, আদমশুমারি গ্রহণ, বসবাসের জন্য বাংলো রক্ষণাবেক্ষণ, মেলা ও প্রদর্শনীর আয়োজন, জনস্বার্থ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে এই সব বোর্ড ও কমিটিকে এ আইনের অধীনে যথেষ্ট ক্ষমতা প্রদান করা হয়। নিজ নিজ এলাকায় সরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নকল্পে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে সরকারি অনুদান বিতরণের ব্যাপারেও তাদেরকে দায়িত্ব দেয়া হয়। ট্রামপথ, রেলপথ এবং পানি সরবরাহের কারখানা তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং সরকারের পক্ষে সরকারি ভবন নির্মাণ অথবা গ্রহণের ব্যাপারেও এসব কমিটিকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়।[৬]

জেলাবোর্ড স্থানীয় সরকারের প্রধান কর্তৃপক্ষে পরিণত হয় এবং লোকাল বোর্ড ও ইউনিয়ন কমিটিসমূহ তার অধীনে কাজ করে। লোকাল বোর্ড এবং ইউনিয়ন কমিটিসমূহ

৪. *Report on the Administration of Bengal*, 80.
৫. ঐ।
৬. ঐ।

অত্যন্ত সীমিত পরিমাণ কাজ করতে পারতো। কারণ অর্থের জন্য তাদেরকে জেলাবোর্ডের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতে হতো।[৭] তা ছাড়া জেলাবোর্ডসমূহেরও টাকার বড় অভাব ছিল, যে কারণে খুব কম অর্থই নিম্নতম বোর্ড ও কমিটিসমূহকে তারা দিতে পারতো। বেঙ্গল জেলা প্রশাসন কমিটির রিপোর্টে (১৯১২-১৩) মন্তব্য করা হয়, "জেলাবোর্ডকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের একটি ইউনিটে পরিণত করে এর মঞ্জুরির উপর অন্যান্য নিম্নবর্তী অনুরূপ প্রতিষ্ঠানকে নির্ভরশীল করা একটি ভুল ছিল।"[৮] অবশ্য ১৯০৮ সালের বেঙ্গল এ্যাক্ট (পঞ্চম আইন, ১৯০৮)-এর দ্বারা ১৮৮৫ সালের এ্যাক্টের বিভিন্ন ধারার বেশ কিছু পরিবর্তন সাধন করা হয়। যেমন ইউনিয়ন কমিটিগুলোকে পানি সরবরাহ ও পয়ঃপ্রণালী নিষ্কাষণ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন, বিভিন্ন ভবন ও নদী, অরণ্য ইত্যাদি সংরক্ষণ এবং বিভিন্ন প্রকাশ্য উপদ্রব প্রতিহতকরণের জন্য অধিক ক্ষমতা প্রদান করা হয়। এসবের ব্যয় বহন করার প্রয়োজনে কর আরোপের ক্ষমতাও তাদেরকে দেয়া হয়।[৯] তা সত্ত্বেও এসব প্রতিষ্ঠান জীবনীশক্তি পায় নি। ইউনিয়ন কমিটি এবং ১৮৭০ সালের চৌকিদার পঞ্চায়েত আইনের দ্বারা সৃষ্ট চৌকিদারি পঞ্চায়েতসমূহের গ্রামপ্রশাসন সংক্রান্ত কাজকর্ম মোটেই সন্তোষজনক ছিল না এবং অনেক ক্ষেত্রেই তাদের কাজ একই রকম হয়ে যেতো।[১০] তাই গ্রাম-কর্তৃপক্ষের একটি নেটওয়ার্ক স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়, যাতে ইউনিয়ন কমিটি চৌকিদার পঞ্চায়েতের কাজকর্ম সম্পাদন করবে এবং একটি গ্রাম বিচারব্যবস্থাও গঠন করবে। আরো প্রস্তাব করা হয় যে, লোকাল বোর্ডের স্থলে সার্কেল বোর্ড গঠন করা হোক, যার পরিধি হবে অপেক্ষাকৃত ছোট এবং যা গ্রাম-কর্তৃপক্ষের কাজকর্ম তদারক করবে, যেখানে সমগ্র ব্যবস্থাটিই সার্কেল অফিসার নিয়ন্ত্রণ করবেন।[১১]

১৯০৭ সালে সি. ই. এইচ. হবহাউসকে চেয়ারম্যান করে একটি কমিশন গঠন করা হয়। কমিশনের দায়িত্ব ছিল ভারত সরকার ও প্রাদেশিক সরকারসমূহ এবং তাদের অধীনস্থ বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের আর্থিক ও প্রশাসনিক সম্পর্ক পরীক্ষা করা এবং মতামত দেয়া যে, বিকেন্দ্রীকরণ বা অন্য কোন উপায়ে সরকারি ব্যবস্থাকে সহজতর ও উন্নতর করতে হবে।[১২] এই কমিশনের নাম ছিল বিকেন্দ্রীকরণ সম্পর্কিত রাজকীয় কমিশন এবং ১৯০৯ সালে এই কমিশন তার প্রতিবেদন উপস্থাপন করে। কমিশনের তদন্তে তথ্য উদঘাটিত হয় যে, রিপন যেমনটি আশা করেছিলেন স্থানীয় সংস্থাসমূহ সেভাবে গড়ে উঠে নি। প্রতিবেদনের মতে, প্রতিটি দিক থেকেই পল্লীবোর্ডসমূহকে অত্যন্ত সীমিত গণ্ডির মধ্যে

৭. *Report on the Administration of Bengal, 1921-22,* (Calcutta 1923), 80-81.
৮. *The Bengal District Administration Committee Report,* 1912-13, (Calcutta 1914), 85.
৯. *Report on the Administration of Bengal, 1921- 22,* 81.
১০. ঐ।
১১. ঐ।
১২. Tinker, *Foundations of Local Self-government,* 64.

কাজ করতে হয়েছে। অতএব এটি মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, ১৯০৮ সাল নাগাদও স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা শক্ত প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তির উপর স্থাপিত হতে পারে নি। স্থানীয় প্রতিষ্ঠানাদি কর্তৃক প্রতিনিধিত্বশীল 'সরকার পরিচালনায় প্রশিক্ষণ'-এর সঙ্গে গ্রামীণ জীবন তখনও সামিল হতে পারে নি। "গ্রামের জনসাধারণের মতামত সমন্বিত অভিযোগের আকারে প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয় যে, যদিও জেলাবোর্ড কর্তৃক আরোপিত কর তারা পরিশোধ করেছে, তথাপি তারা কখনো এর কোন উপকার পায় নি।"[১৩] কমিশনের সুপারিশে জোর দেয়া হয়, প্রশাসনের সাথে গ্রামের জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করবে এমন যেকোন স্থায়ী কাঠামোর ভিত্তি অবশ্যই হবে গ্রাম।[১৪] তাই নতুন ধরনের গ্রামসরকারের মাধ্যম হিসেবে পঞ্চায়েত পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথা বিবেচনা করা হয়, যার কাজ হবে ছোটখাটো আদালতি ও ফৌজদারি মামলা নিষ্পত্তিকরণ, গ্রামের স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থা সংরক্ষণ, অল্প-বিস্তর পূর্ত কর্মসূচি গ্রহণ এবং গ্রাম্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা। আরো সুপারিশ করা হয় যে, পঞ্চায়েতের উপর তদারকি করবেন জেলাকর্মকর্তাগণ, জেলাবোর্ড নয় এবং তাদেরকে কোনমতেই ছোট ছোট কর্মকর্তার স্বৈরাচারের শিকারে পরিণত করা যাবে না।

প্রথম মহাযুদ্ধের কারণে সুপারিশসমূহ তাৎক্ষণিকভাবে বাস্তবায়িত করা যায় নি এবং ১৯১৭ সালের আগস্ট মাসে সরকার স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানাদির ক্রমোন্নতির মাধ্যমে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতির কথা ঘোষণা করে।[১৫]

১৯১৯ সালে বেঙ্গল ভিলেজ সেলফ্ গভর্নমেন্ট এ্যাক্ট পাস হয় (পঞ্চম বি. সি. আর. ১৯১৯)। মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিফর্মস্-এর সুপারিশ ছিল এই এ্যাক্টটির ভিত্তি। এই রিফর্মস্ স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদেরকে স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার সুপারিশ করে[১৬] এবং স্থানীয় সংস্থাসমূহে জনগণের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ, বাইরের নিয়ন্ত্রণ থেকে যতোদূর সম্ভব এসব সংস্থার স্বাধীনতা ... বোর্ডসমূহে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রাখার এবং পল্লীবোর্ডসমূহ যাতে করদাতাদের প্রকৃত প্রতিনিধিরূপে পরিগণিত হতে পারে সেজন্য ভোটদানের অধিকার এবং যোগ্যতা যতোদূর সম্ভব নিম্ন পর্যায়ে নিয়ে আসার প্রস্তাব করে।[১৭] জেলা পর্যায়ে জেলাবোর্ড এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন বোর্ডের ব্যবস্থা রেখে এই আইন একটি দ্বি-স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। এই আইন মোতাবেক মহকুমা পর্যায়ের লোকাল বোর্ড বাতিল হয় এবং ইউনিয়ন পর্যায়ের সংস্থার নাম ইউনিয়ন কমিটির পরিবর্তে ইউনিয়ন বোর্ড রাখা হয়।

১৩. ঐ, ৮৪।
১৪. ঐ, ৮৫।
১৫. ঐ, ১০৫।

১৬. Atiur Rahman, "Rural Power Structure : A Study of the Union Parishad Leaders in Bangladesh", *The Journal of Social Studies*, 4 : 94.

১৭. Mohammad Shah, *The Emergence of a Muslim 'Middle Class' in Bengal : Attitudes and Rhetoric of Communalism, 1880-1940,* unpublished Ph. D. dissertation, (London University 1990), 221.

প্রায় ১০ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে এবং প্রায় ৮,০০০ লোক নিয়ে গঠিত হয় একটি ইউনিয়ন বোর্ড। ইউনিয়ন বোর্ডের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হতেন এবং বোর্ডসমূহকে তাদের সদস্যদের মধ্য হতে তাদের প্রেসিডেন্ট ও ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করার অধিকার দেয়া হয়। এসব বোর্ডকে প্রশাসনিক, মিউনিসিপ্যাল ও বিচারসংক্রান্ত কাজের অধিকার এবং এসব কাজের সমর্থনে তহবিল গঠনের জন্য মৌলিক অর্থনৈতিক ক্ষমতা প্রদান করা হয়।

এই এ্যাক্টের বিধান অনুযায়ী সহজ প্রকৃতির ফৌজদারি ও আদালতি মামলার মীমাংসার জন্য ইউনিয়ন বোর্ডের মধ্য থেকে সদস্য নিয়ে ইউনিয়ন আদালত গঠন করা যেতো।[১৮] গ্রামে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা এবং ছোটখাটো মামলা নিষ্পত্তি ছাড়াও রাস্তাঘাট এবং সেতু নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, নলকূপ বসানো ও রক্ষণাবেক্ষণ, দাতব্য চিকিৎসালয় ও প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা এবং আরো কিছু জনসেবা, যেমন বিভিন্ন সময়ে, বিশেষকরে দুঃসময়ে সরকার অনুমোদিত খাদ্য, বস্ত্র এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় সামগ্রী বিতরণের দায়িত্বও এর উপর বর্তায়। টিংকারের মতে, "সীমিত আকারে ইউনিয়ন বোর্ডসমূহের কাজকর্ম দ্বৈতশাসন প্রবর্তনের আগেই এর অধীনে প্রবর্তিত রাজনৈতিক কর্মসূচির একটি পূর্বাভাস দিয়েছিল, কেননা এসব কাজের মধ্যে সংরক্ষিত (পুলিশ, আইন-শৃঙ্খলা) এবং হস্তান্তরিত উভয় বিষয়ই অন্তর্ভুক্ত ছিল"।[১৯]

ন্যূনতম ৯ জন সদস্য নিয়ে জেলাবোর্ড গঠিত হতো, যদিও জেলার আকার ও জনসংখ্যা অনুসারে সাধারণত ১৮-৩৪ জন সদস্য নিয়েই জেলাবোর্ড গঠিত হতো। জেলাবোর্ডের উপর অর্পিত প্রধান দায়িত্বগুলো ছিল রাস্তাঘাট এবং যাতায়াতের অন্যান্য ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন, শিক্ষাব্যবস্থা সংক্রান্ত, বিশেষকরে প্রাথমিক পর্যায়ে চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান, টিকাদান, স্বাস্থ্যব্যবস্থা, পশু-চিকিৎসা ব্যবস্থা সংরক্ষণ, বিশ্রামাগার স্থাপন ও সংরক্ষণ, খোঁয়াড় এবং পারাপারের ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণ। দুর্ভিক্ষ ও সঙ্কট মুহূর্তে মানুষের দুঃখকষ্ট লাঘবের কাজেও এর তহবিল ব্যবহৃত হতে পারতো।[২০]

জমির উপর ধার্য খাজনা থেকেই প্রধানত জেলাবোর্ডের আয় আসতো। ১৯১২ সাল পর্যন্ত এ খাত থেকে প্রাপ্ত অর্থের অর্ধেক জনসেবাকর হিসেবে সরকারের বরাবর জমা দিতে হতো, কিন্তু ১৯১৩ সালে এ অর্থও জেলাবোর্ডকেই দেয়া হয়। জেলাবোর্ডের আয়ের অংশবিশেষ শিক্ষা ও চিকিৎসাপ্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত আয় এবং খোঁয়াড় ও পারাপারের আয় হতেও আসতো। তবে সরকার ছিল আয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস, যা শিক্ষা, যাতায়াতব্যবস্থার উন্নয়ন, পশুচিকিৎসা এবং অন্যান্য উদ্দেশ্যে তহবিল অনুমোদন

১৮. *Report on the Administration of Bengal, 1921-22*, 81.

১৯. Tinker, *Foundations of Local Self-government*, 199-200.

২০. *Report on the Administration of Bengal, 1921-22*, 82.

করতো।[২১] ইউনিয়ন বোর্ডের আয় ছিল মূলত নিজ নিজ এলাকায় অবস্থিত খোঁয়াড়ের আয়, জেলাবোর্ডের অনুদান এবং ইউনিয়নের অধিবাসীদের উপর ধার্যকৃত কর।

## মৌলিক গণতন্ত্র

মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থা নামে দেশে এক নতুন ধরনের স্থানীয় শাসন প্রবর্তন করা হয় ১৯৫৯ সালে। বৃটিশ শাসনের অবসান এবং ভারত ও পাকিস্তান নামক দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ সময়ের মধ্যে উপমহাদেশে এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করা হয়।

বেঙ্গল ভিলেজ সেলফ্ গভর্নমেন্ট এ্যাক্ট, ১৯১৯-এর ব্যবস্থাতেও এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করা হয়। ১৯৫৬ সালে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ও ভাইস-প্রেসিডেন্ট পদের জন্য সরাসরি নির্বাচনের বিধান করা হয়।

মৌলিক গণতন্ত্র আইন, ১৯৫৯-এর অধীনে প্রবর্তিত ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল এই আইনপ্রণেতাদের ঘোষণামতে, "জনগণের ইচ্ছাকে সরকারের কাছাকাছি এবং সরকারি কর্মকর্তাদেরকে জনগণের কাছাকাছি এনে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ" সাধন করা।[২২] ঘোষণা অনুযায়ী চার স্তরবিশিষ্ট একটি প্রশাসনিক কাঠামো চালু করা হয়, যেখানে ইউনিয়ন পর্যায়ে গঠিত হয় ইউনিয়ন কাউন্সিল এবং থানা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে গঠন করা হয় যথাক্রমে থানা কাউন্সিল, জেলা কাউন্সিল এবং বিভাগীয় কাউন্সিল।[২৩]

### *ইউনিয়ন কাউন্সিল*

প্রথমদিকে ইউনিয়ন কাউন্সিল নির্বাচিত এবং মনোনীত উভয় রকমের সদস্য নিয়ে গঠিত হতো। কিন্তু ১৯৬২ সালে প্রণীত অধ্যাদেশের এক সংশোধনী দ্বারা মনোনয়ন প্রথা বাতিল করা হয়। নির্বাচিত সদস্যগণ সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের জনগণের দ্বারা সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত হতেন। ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্যদের মধ্য থেকে পরোক্ষভাবে সভাপতি/চেয়ারম্যান নির্বাচিত হতেন। এক অর্থে বলা যায় যে, ইউনিয়ন কাউন্সিল যেন পূর্ববর্তী ইউনিয়ন বোর্ডেরই অবিকল প্রতিরূপ, তবে দুটোর মধ্যে কিছু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য ছিল। ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান পরোক্ষভাবে ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হতেন, কিন্তু ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট এবং ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতেন সরাসরি জনগণের ভোটে। ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্যগণ, যাঁরা আবার মৌলিক গণতন্ত্রী বা বেসিক ডেমোক্রেট (বিডি) বলে পরিচিত

২১. ঐ।
২২. Shah Nazrul Islam Chowdhury and M. A. Jabbar, "Development Orientation of Local Government in Bangladesh: The case of Union Parishad," *The Bangladesh Journal of Agricultural Economics*, 2: 1 (1979), 304.
২৩. There was a provision of the Provincial Advisory Council at the time of the promulgation of the Order in 1959 but it was abolished after the institution of Provincial Assembly under the 1962 Constitution of Pakistan.

ছিলেন, তাঁরা দেশের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা প্রেসিডেন্ট, জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনের নির্বাচকমণ্ডলী হিসেবেও কাজ করতেন। ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্যদের তেমন কোন বিশেষ অধিকার ছিল না। ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্যগণ এভাবে ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্যদের চেয়ে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন এবং অধিকতর ক্ষমতা উপভোগ করতেন। ১৯৬২-৬৩ সালে প্রবর্তিত পল্লী পূর্ত কর্মসূচি নামক একটি কর্মসূচি তাঁদের আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সহায়ক হয়। ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্যদের উৎসাহ বৃদ্ধি এবং পল্লীর জনগণকে তাদের নিজস্ব স্থানীয় প্রশাসন ও উন্নয়নধর্মী কাজে গঠনমূলক ও অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেবার উদ্দেশ্যেই পল্লী-পূর্ত কর্মসূচি প্রবর্তিত হয়। এ কর্মসূচি ইউনিয়ন কাউন্সিল সদস্যদের উপর স্থানীয় 'পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এই উভয় দায়িত্ব' অর্পণ করে। কর্মসূচির ম্যানুয়েলের নির্দেশানুযায়ী ইউনিয়ন উন্নয়ন পরিকল্পনা ইউনিয়নের জনসাধারণের সাথে পরামর্শক্রমে তৈরি হওয়ার কথা, যা বাস্তবায়নের দায়িত্ব একজন ইউনিয়ন কাউন্সিল সদস্যের নেতৃত্বে পরিচালিত প্রজেক্ট কমিটির উপর অর্পিত ছিল।

*থানা কাউন্সিল*

থানার অন্তর্গত ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানবৃন্দ, টাউন কমিটির চেয়ারম্যানবৃন্দ (যদি থাকে) এবং কমিশনার কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক সরকারি সদস্য সমবায়ে থানা কাউন্সিল গঠিত হতো। সরকারমনোনীত সদস্যসংখ্যা অবশ্য কোনক্রমেই 'প্রতিনিধি-সদস্য' নামে পরিচিত বেসরকারি সদস্যসংখ্যার বেশি হতো না।[২৪] কোন মহকুমার অধীনে থানা কাউন্সিলসমূহের চেয়ারম্যান হতেন উক্ত মহকুমার প্রধান কর্মকর্তা এবং সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) হতেন ভাইস-চেয়ারম্যান। মহকুমা কর্মকর্তার অনুপস্থিতিতে সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করতেন। তাঁরা উভয়েই পদাধিকারবলে থানা কাউন্সিলের সদস্য থাকতেন। থানা কাউন্সিল প্রধানত সমন্বয়কারী ও পর্যবেক্ষণকারীর ভূমিকা পালন করতো। থানা কাউন্সিলের অধীনে সকল ইউনিয়ন কাউন্সিল ও টাউন কমিটির কাজকর্ম সমন্বয়ের কাজ ছিল এই থানা কাউন্সিলের। এলাকাধীন সকল ইউনিয়ন কাউন্সিল এবং টাউন কমিটির উন্নয়ন পরিকল্পনার সমন্বয় ও বাস্তবায়ন তদারক করার দায়িত্ব পালন করতো থানা কাউন্সিল। জেলা কাউন্সিলের নির্দেশমতো থানা কাউন্সিল কাজ করতো এবং স্বীয় কাজকর্মের জন্য থানা কাউন্সিল জেলা কাউন্সিলের কাছে দায়ী থাকতো।

*জেলা কাউন্সিল*

জেলা কাউন্সিল ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পরিষদ এবং তা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক সরকারি ও নির্বাচিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হতো। এই কাউন্সিলের নির্বাচিত

---

২৪. Muzaffer Ahmed Chaudhury, *Rural Government in East Pakistan,* (Dhaka 1969), 139.

সদস্যসংখ্যা কোনমতেই সরকারি সদস্যসংখ্যার কম হতে পারতো না। কোন নির্দিষ্ট জেলার অধীনে ইউনিয়ন কাউন্সিল ও টাউন কমিটির চেয়ারম্যানদের দ্বারা সংশ্লিষ্ট জেলা কাউন্সিলের সদস্যগণ নির্বাচিত হতেন। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা। সেখানে তাঁরা ইউনিয়ন কাউন্সিল ও টাউন কমিটির সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হতেন।[২৫] জেলা কমিশনার পদাধিকারবলে জেলা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। তবে কাউন্সিল তার প্রথম সভাতেই নির্বাচিত সদস্যদের মধ্য থেকে একজনকে ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত করতো। চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে তিনি কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন ও সভায় সভাপতিত্ব করতেন এবং চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য দায়িত্বও পালন করতেন।

জেলা কাউন্সিলের তিন ধরনের কাজ ছিল— (১) বাধ্যতামূলক কাজ; (২) ইচ্ছামূলক কাজ এবং (৩) সমন্বয়মূলক কাজ। বাধ্যতামূলক কাজের মধ্যে এই কাউন্সিল জেলার মধ্যে আইন-শৃঙ্খলা, শান্তি ও স্বাস্থ্য সংরক্ষণমূলক কাজ করতো। এজন্য এই কাউন্সিলকে জনগণের চলাচলের রাস্তা, সেতু, রাস্তার নিচে আচ্ছাদিত পয়ঃনালী নির্মাণ, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সাধন, রাস্তার পাশে গাছ লাগানো এবং তা সংরক্ষণ, গণবাগান. গণখেলার মাঠ, গণস্থানের ব্যবস্থা করা ও সংরক্ষণ, পারাপারের ফেরির সংস্থান ও সংরক্ষণ পর্যায়ের দায়িত্ব পালন করতে হতো। গণস্বাস্থ্যের উন্নয়নের জন্য এই কাউন্সিল পশু-ঔষধালয় ও চিকিৎসালয়সহ মানুষের জন্য ঔষধালয় ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ, ক্ষতিকর কাজকর্ম প্রতিহত ও হ্রাসকরণ, স্বাস্থ্যসংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়নসাধন, সংক্রামক ব্যাধি প্রতিহতকরণ ও নিয়ন্ত্রণ, টিকাদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং খাদ্যদ্রব্যকে ভেজাল থেকে মুক্ত রাখার ব্যবস্থা করতো। শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নয়নকল্পে জেলা কাউন্সিল গণপাঠাগার সংরক্ষণ, খেলাধুলার আয়োজন এবং অন্যান্য উৎসবের ব্যবস্থা করতো। কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুহূর্তে একে ত্রাণকার্যসহ কৃষি, শিল্প ও সমাজকল্যাণমূলক কাজ করতে হতো। ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ এই কাউন্সিলের একটি বাধ্যতামূলক কাজ ছিল।

জেলা কাউন্সিলের ইচ্ছামূলক কাজের তালিকা ছিল অত্যন্ত বড় এবং তহবিলের অর্থবল অনুযায়ী যেকোন অথবা সকল কাজই এই কাউন্সিল করতে পারতো। এসব কাজকে শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজকল্যাণ, আর্থিক কল্যাণ, গণস্বাস্থ্য, গণপূর্ত ইত্যাদি ভাগে ভাগ করা যায়। শিক্ষার উন্নয়নের জন্য এই কাউন্সিল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ ও সংরক্ষণ, বৃত্তিদান, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য অনুদান ও ভর্তুকি প্রদান, শিক্ষামূলক সমিতি গড়ে তোলা ও

২৫. শুরুতে জেলা কাউন্সিলে ি সদস্য ছিল না। নির্বাচিত সদস্যের ব্যবস্থা হয় ১৯৬২ সালের সংশোধনী আইনের অধীনে

তাদেরকে সহায়তা দান, শিক্ষাসংক্রান্ত জরিপ পরিচালনা, শিক্ষাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, বয়স্কশিক্ষার উন্নয়ন সাধন, বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের জন্য দুধ ও খাদ্য সরবরাহ করা, পুস্তক প্রকাশ ও ছাপাখানার ব্যবস্থা করা, এতিম ও অভাবী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বিনামূল্যে অথবা ভর্তুকিমূল্যে পুস্তক দান, বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে বিক্রির জন্য বই-পুস্তক ও কাগজপত্রসহ অন্যান্য দ্রব্যের দোকান পরিচালনা ইত্যাদি কাজ সম্পাদন করতে পারতো। সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য এই কাউন্সিল যে কাজ করতো তার মধ্যে ছিল তথ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ, সাধারণ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের আয়োজন, গণস্থানে ও গণপ্রতিষ্ঠানে রেডিওর ব্যবস্থা, যাদুঘর, প্রদর্শনী ও চারুশিক্ষা প্রদর্শনশালা, সর্বসাধারণের মিলনস্থান এবং গণমিলনায়তন প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ, গণশিক্ষা সম্প্রসারণ এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, পল্লী পুনর্গঠন, স্বাস্থ্যবিধি, গণউন্নয়ন, কৃষি, শিল্প, গো-প্রজনন এবং জনকল্যাণমূলক অন্যান্য বিষয়ে তথ্যপ্রচার ইত্যাদি। জেলা কাউন্সিলের সমাজকল্যাণমূলক কাজের মধ্যে থাকতো কল্যাণগৃহ, আশ্রয়কেন্দ্র, এতিমখানা, বিধবাসদন এবং নিগৃহীতদের জন্য অন্যান্য প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ও সংরক্ষণ, নিঃস্বদের মৃতদেহ সমাহিত ও দাহকরণ, ভিক্ষাবৃত্তি, বেশ্যাবৃত্তি, জুয়া, ক্ষতিকর ঔষধ ও মাদকদ্রব্য সেবন, শিশুঅপরাধসহ অন্যান্য সামাজিক অপরাধ প্রতিহত করা; জনগণের মাঝে সামাজিক, নাগরিক এবং দেশপ্রেমমূলক গুণাবলীর বিকাশসাধন এবং সংকীর্ণতা, বর্ণবাদ, উপজাতিবাদ, সাম্প্রদায়িকতাবাদ এবং প্রাদেশিকতাবাদকে নিরুৎসাহিতকরণ, স্বেচ্ছামূলক সমাজসেবা সংগঠন প্রতিষ্ঠা, গরিবদের আইনগত পরামর্শদানের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সমাজকল্যাণে সহায়তাকারী অন্যান্য কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন। জনগণের আর্থিক উন্নয়ন সাধনের জন্যও জেলা কাউন্সিল বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করতো। যেমন আদর্শ কৃষিখামার সংগঠন ও সংরক্ষণ, কৃষির উন্নয়নপদ্ধতি জনগণের মধ্যে প্রচার ও বিস্তার, কৃষির উন্নত যন্ত্রপাতি সংরক্ষণ ও কৃষকদের ব্যবহারের জন্য ধার দেয়া এবং পতিত জমি চাষের অধীনে আনার ব্যবস্থা করা, কৃষিশিক্ষা বিস্তার এবং বাজারব্যবস্থাসহ কৃষি উন্নয়নের জন্য অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ। গণস্বাস্থ্যের উন্নয়নে এই কাউন্সিলের উল্লেখযোগ্য কাজ হলো গণস্বাস্থ্যমূলক শিক্ষাকার্যক্রম ও ম্যালেরিয়ানিরোধ প্রশিক্ষণপ্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, সংক্রামক ব্যাধি প্রতিহত ও নিয়ন্ত্রণকরণ প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপন ও সংরক্ষণ, চিকিৎসাসাহায্য দান সংক্রান্ত সমিতি গঠনে উৎসাহ প্রদান ও এর উন্নতিবিধান, পশুপাখির রোগ নিবারণ কর্মসূচি গ্রহণ, পশুপাখির মধ্যে সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণমূলক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

জেলার অন্তর্গত স্থানীয় কাউন্সিলসমূহ, মিউনিসিপ্যাল সংস্থাসমূহ এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডসমূহের সকল কাজের সমন্বয়সাধন জেলা কাউন্সিলের একটি দায়িত্ব ছিল। জেলা কাউন্সিল জেলার উন্নয়নের জন্য প্রকল্প প্রণয়ন করে তা বিভাগীয় কাউন্সিল বা অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণ করতো, জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগের কাজ

পর্যালোচনা করতো এবং সকল বিভাগের সমস্যা বিবেচনা করে সমস্যা সমাধান, অবস্থার উন্নয়ন বা সাধারণ উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ দান করতো।[২৬]

*বিভাগীয় কাউন্সিল*

১৯৫৯ সালের মৌলিক গণতন্ত্র অধ্যাদেশের অধীনে বিভাগীয় কাউন্সিল ছিল স্থানীয় সরকারের তৃতীয় স্তর। সরকারমনোনীত ও নির্বাচিত সদস্য নিয়ে গঠিত হতো এ কাউন্সিল। তবে অধ্যাদেশ জারির অব্যবহিত পরে বিভাগীয় কাউন্সিল ছিল সম্পূর্ণরূপে মনোনীত, যার অর্ধেক ছিল সরকারমনোনীত সদস্য এবং বাকি অর্ধেক ছিল মনোনীত বেসরকারি সদস্য—সরকারি সদস্যদের সংখ্যা কোনক্রমেই বেসরকারি সদস্যদের সংখ্যার চেয়ে বেশি হতে পারতো না।

বেসরকারি নির্বাচিত সদস্য গ্রহণের বিধান ১৯৬২ সালের সংবিধান চালু হবার সাথে সাথে প্রবর্তিত হয়। নির্বাচিত সদস্যগণ ছিলেন দু'ধরনের। এক গ্রুপ জেলা কাউন্সিলসমূহের প্রতিনিধিত্ব করতেন এবং অন্য গ্রুপ মিউনিসিপ্যাল কমিটি ও ক্যান্টনমেন্টবোর্ডসমূহের প্রতিনিধিত্ব করতেন। নির্বাচিত সদস্যদের সংখ্যা মনোনীত সদস্যদের সংখ্যার চেয়ে কম হতো না। বিভিন্ন সংস্থা, যেমন জেলা কাউন্সিল, মিউনিসিপ্যাল কমিটি এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডসমূহে আসনসংখ্যা নির্ধারিত হতো জনসংখ্যার ভিত্তিতে। তবে মিউনিসিপ্যাল এলাকার জন্য কমপক্ষে একটি আসন বরাদ্দ করা হতো।

বিভাগীয় কাউন্সিলের অফিসিয়াল সদস্য ছিলেন জেলা কাউন্সিলসমূহের চেয়ারম্যানগণ এবং সরকারনির্ধারিত অফিস-কর্মকর্তাগণ। এই কাউন্সিলের নির্বাচিত সদস্যগণ বিভাগস্থ জেলা কাউন্সিলের মিউনিসিপ্যাল কমিটি এবং ক্যান্টনমেন্টবোর্ডের নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হতেন। বিভাগীয় কমিশনার পদাধিকারবলে এই কাউন্সিলের সদস্য থাকতেন এবং এর চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করতেন। তিনি বিভাগের সকল সভায় সভাপতিত্ব করতেন এবং বিভাগের নিত্যদিনকার প্রশাসনিক কাজকর্মের জন্যও দায়ী থাকতেন। বিভাগীয় কাউন্সিলের কাজ ছিল মূলত সমন্বয়মূলক। বিভাগের সীমানাভুক্ত স্থানীয় সংস্থাসমূহ, মিউনিসিপ্যাল সংস্থা এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডসমূহের কাজকর্মের সমন্বয় সাধন ছিল এই কাউন্সিলের দায়িত্ব। এই কাউন্সিল বিভাগের উন্নয়নের জন্য প্রকল্প প্রণয়ন ও তা সরকারের কাছে প্রেরণ করতে পারতো, বিভাগীয় প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগের কাজকর্ম পর্যালোচনা করতে পারতো এবং বিভাগীয় প্রশাসনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানকল্পে প্রয়োজনীয় পরামর্শদান করতে পারতো। তাছাড়া এই কাউন্সিল মৌলিক

২৬. Article 34, *Basic Democracies Order*, 1959.

গণতন্ত্র অধ্যাদেশ অনুযায়ী জেলা কাউন্সিলসমূহের জন্য নির্ধারিত কাজের ভার কোন বিশেষ জেলা কাউন্সিল বা সকল জেলা কাউন্সিলের পক্ষে সরকার নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে বিভাগীয় কাউন্সিলের উপর অর্পণ করতে পারতো।[২৭]

## পৌর সরকার

বাংলা প্রদেশে প্রবর্তিত প্রথম মিউনিসিপ্যাল আইন ছিল ১৮৪২ সালের দি বেঙ্গল পিপলস্ এ্যাক্ট (১০ নং আইন, ১৮৪২)। এই আইনটি ছিল একটি আনুষ্ঠানিক পদক্ষেপ। তবে এর আগেও অনেক আইন পাস হয়েছিল। বাস্তবিক পক্ষে বাংলায় প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয় ১৮১৩ সালে শহর চৌকিদারের জন্য প্রথম স্থানীয় কর প্রবর্তনের মাধ্যমে। ঐ বছরের ১৩ নং রেগুলেশন ঢাকা শহরের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক চৌকিদার নিয়োগের জন্য সর্বপ্রথম একটি বিশেষ কর আরোপের বিধান প্রবর্তন করে। ১৮১৪ সালের ৩ নং রেগুলেশন অন্যান্য শহরের জন্যও অনুরূপ বিধান নির্দিষ্ট করে এবং ১৮১৬ সালের ২২ নং রেগুলেশন আরো অধিক সংখ্যক শহরের জন্য চৌকিদারের ব্যবস্থা দ্বারা প্রক্রিয়াটিকে ত্বরান্বিত করে। এ রেগুলেশনটি তাই ১৮১৩ সালের ১৩ নং রেগুলেশন ও ১৮১৪ সালের ৩ নং রেগুলেশনকে আরও শক্তিশালী করে। পরবর্তীকালে ১৮৩৭ সালের ১৫ নং আইনের মাধ্যমে এসব রেগুলেশনকে মার্জিত করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট শহরসমূহকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা ও মেরামতের জন্য আরোপিত করের একটি অংশ ব্যয়ের আইন করা হয়। যেমন একজন করদাতার সর্বোচ্চ করের পরিমাণ মাসিক ২.০০ টাকা ধার্য করা হয়। স্থানীয় উন্নয়নের জন্য এটাই ছিল সর্বপ্রথম কর।[২৮]

১৮৪২ সালের আইন মিউনিসিপ্যাল সংগঠন গড়ে তোলার সুযোগ এনে দেয়। তবে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হয় নি। কেননা এই এ্যাক্টের অধীনে মিউনিসিপ্যালিটি গঠনে উদ্যোগ গ্রহণের দায়িত্ব অর্পিত ছিল শহরের বাড়ির মালিকদের উপর, তাও আবার যদি দুই-তৃতীয়াংশ মালিক চাইতেন তবেই। ফলে খোদ বাংলাতেই এ্যাক্টটি অব্যবহৃত থেকে যায়। এ বিশেষ সমস্যাটি নিরসনের জন্য মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট, ১৮৫০ পাস করা হয়, যা ১৮৪২ সালের আইনের পরিমার্জন করে এবং এতে বলা হয় যে, বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে স্থানীয় পর্যায়ে মিউনিসিপ্যালিটি গঠনের উদ্যোগ সরকারি প্রশাসনযন্ত্রই গ্রহণ করবে। এই আইনটিও বাংলার জন্য তেমন সুবিধা সৃষ্টি করতে পারে নি যদিও অন্যান্য প্রদেশ আইনটির সদ্ব্যবহার করেছে। এই আইনের অধীনে মিউনিসিপ্যাল কমিটিসমূহ ময়লা ইত্যাদি নিষ্কাশনপূর্বক শহর পরিচ্ছন্ন রাখা, রাস্তা মেরামত ও তাতে আলোর ব্যবস্থা করা, উপবিধি প্রণয়ন এবং তা প্রয়োজনবোধে জরিমানা আরোপের মাধ্যমে পরিচালিত

---

২৭. Chaudhury, *Rural Government*, 165

২৮. S. D. Khan, "Place of Municipality in the Socio-Economic Structure of Pakistan", in M. A. Hussain (ed.), *Problems of Municipal Administration*, (Dhaka 1968), 55.

করার দায়িত্ব পালন করতে পারতো। পরোক্ষ কর ধার্যকরণ করারোপক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত ছিল।[২৯]

টাউন পুলিশ এ্যাক্ট নামে আরেকটি আইন পাস হয়েছিল ১৮৫৬ সালে। এ্যাক্টটির উদ্দেশ্য ছিল ১৮১৬ সালের ২২ নং রেগুলেশনের পরিবর্তন সাধন করা এবং বাসিন্দাদের মতামত ব্যতিরেকেই জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে তাদের উপর স্থানীয় কর আরোপ করার অধিকার প্রদান। সংশ্লিষ্ট শহরের জন্য পঞ্চায়েত নিয়োগের ক্ষমতাও এই এ্যাক্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে প্রদান করে। পঞ্চায়েত হোল্ডিং-এর মূল্যায়ন করতে পারতো এবং তার মূল্যের শতকরা ৫ ভাগ হারে কর ধার্য করতে পারতো। বাংলার বেশ কয়েকটি শহরে এই আইন প্রবর্তিত হয়। তবে বাংলায় মিউনিসিপ্যাল সংগঠন গড়ে তুলতে আরো কয়েক বছর সময় লাগে এবং একমাত্র জেলা মিউনিসিপ্যাল উন্নয়ন আইন, ১৮৬৪ পাস হবার পরই ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও হুগলীতে এসব সংগঠন গড়ে উঠে। এই আইন মিউনিসিপ্যাল কমিটি নিয়োগের মাধ্যমে যেকোন শহর বা উঠতি শহুরে এলাকার জন্য মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপনের ক্ষমতা সরকারকে প্রদান করে। বাসিন্দাদের দ্বারা আবেদনের আনুষ্ঠানিকতা বিলোপ করা হয়। মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করতেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, যেখানে বিভাগীয় কমিশনার, পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট, একজন নির্বাহী প্রকৌশলী, সংশ্লিষ্ট শহর বা শহরসমূহের কমপক্ষে ৭ জন বাসিন্দা ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নিজে কমিশনার হিসেবে কাজ করতেন। সম্পত্তিকর ছিল আয়ের প্রধান উৎস, যা একটি বাড়ির জন্য মাসে সর্বাধিক ৭.০০ টাকা হতে পারতো। অবশ্য, প্রয়োজনে জীবজন্তু, শকট ইত্যাদির উপর মিউনিসিপ্যালিটি কর আরোপ করতে পারতো। এই করের প্রথম অংশ শহরের পুলিশদের রক্ষণাবেক্ষণকাজে ব্যয় হতো এবং অবশিষ্ট অংশ রাস্তাঘাট, শহর পরিষ্কারপরিচ্ছন্নকরণ, ক্ষতিকর ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ, টিকাদান ও যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা যেতো।[৩০] ১৮৬৪ সালের আইনটি ছিল মূলত বড় বড় শহরের জন্য এবং তাই বিশেষকরে ছোট শহরে মিউনিসিপ্যাল ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ১৮৬৮ সালে দি ডিস্ট্রিক্ট টাউন এ্যাক্ট (৬ নং আইন) নামে একটি আইন বেঙ্গল কাউন্সিলে পাস হয়। এই আইন একদিকে যেমন ১৮৬৪ সালের আইনের তুলনায় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা গড়ে তোলার অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি করে, অন্যদিকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শহরে ১৮৫৬ সালের টাউন পুলিশ এ্যাক্টের প্রয়োগ রহিত করে তার পরিবর্তে এসব শহরে টাউন কমিটি গঠন করার ক্ষমতা প্রদান করে। সংশ্লিষ্ট শহরের কমপক্ষে ৫ জন সদস্য নিয়ে এই কমিটি গঠিত হতো এবং এর কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ সদস্য হতেন সরকারি কর্মকর্তা, যাঁদেরকে সাধারণত ম্যাজিস্ট্রেট মনোনীত করতেন। ম্যাজিস্ট্রেট পদাধিকারবলে চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করার জন্য কোন ব্যক্তিকে মনোনীত না করলে সংশ্লিষ্ট কমিটির সদস্যগণ তাঁদের চেয়ারম্যান এবং ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত করতেন।

২৯. Tinker, *Foundations of Local Self-government*, 29-33

৩০. Khan, "Place of Municipality ", 56.

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৮৬৮ সালের আইনের অধীনে গঠিত টাউন কমিটিসমূহ নির্বাহী সংস্থা ছিল না। তাদের দায়িত্ব ছিল পরামর্শদানের মাধ্যমে ম্যাজিস্ট্রেটকে সাহায্য করা এবং এভাবে এসব কমিটির উপর সরকারি প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ ছিল অত্যন্ত বেশি।[৩১]

তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড মেয়োর আর্থিক প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণপ্রক্রিয়ার চূড়ান্ত ফল হিসেবে ১৮৭১ সালে বেঙ্গল রোড সেস্ আইন পাস হয়। এই আইন পরিবহনব্যবস্থা নির্মাণ ও সংরক্ষণের জন্য সর্বোচ্চ শতকরা ৩ ভাগ রোড সেস্ আদায়ের ক্ষমতা প্রদান করে, যা জেলা অথবা তার নিচের পর্যায়সমূহে নিয়মিত সরকারি প্রশাসনযন্ত্রের বাইরে উপরোক্ত রোড সেস্ আরোপ ও সংগৃহীত অর্থ ব্যয় করার ক্ষমতাসম্পন্ন স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় ছিল। বাংলার স্থানীয় সংস্থাসমূহের জন্য পূর্বে প্রবর্তিত সকল আইনকে সংহত ও সুসম্বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ১৮৭১ সালের ৯ ডিসেম্বর বেঙ্গল কাউন্সিলে একটি বিল উত্থাপিত হয়। এই বিলে বিভিন্ন শ্রেণীর মিউনিসিপ্যালিটির কর আরোপের একটি কঠোর এবং সর্বোচ্চ মাত্রা নির্ধারণ করে করব্যবস্থাকে পুনর্গঠিত করার প্রস্তাবও ছিল।[৩২] কিন্তু তৎকালীন ভাইসরয় নর্থব্রুক সেই প্রস্তাবের উপর এই বলে ভেটো প্রদান করেন যে, প্রস্তাবিত মিউনিসিপ্যাল কর বৃদ্ধি ঐ সময়ে দৃশ্যত যুক্তিযুক্ত ছিল না—যদিও পরবর্তীকালে মিউনিসিপ্যাল আইনের কিছু কিছু উন্নয়ন সংক্রান্ত অন্য একটি বিলে তাঁর সম্মতি প্রদানে তাঁকে রাজি করানো গিয়েছিল। প্রস্তাবটি ১৮৭৩ সালের দি মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট (৬ নং আইন, ১৮৭০) নামে পরিচিত হয় এবং প্রথমবারের মতো বিশেষকরে ১৮৬৪ সালের দি ডিস্ট্রিক্ট মিউনিসিপ্যাল ইম্প্রুভমেন্ট এ্যাক্টের অধীনে প্রতিষ্ঠিত বড় বড় শহরে কর প্রদানকারীদের দ্বারা কমিশনার নির্বাচনের বিধান প্রবর্তন করে। এসব মিউনিসিপ্যালিটির জন্য একজন নির্বাচিত ভাইস-চেয়ারম্যান রাখার বিধানও এই আইনে ছিল।[৩৩] ১৮৭৪ সালে কিছু বর্ধিষ্ণু মিউনিসিপ্যাল কাজ, যেমন জবাইখানা সংরক্ষণ, ভাড়াটে গাড়ি নিয়ন্ত্রণ, জীবজন্তুর প্রতি অত্যাচার নিবারণ, জন্ম-মৃত্যু রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে কতিপয় বিশেষ আইন প্রবর্তন করা হয়। ১৮৭৬ সালে প্রবর্তিত মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্টের মাধ্যমে তখন পর্যন্ত প্রবর্তিত সকল মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্টকে সুসংগঠিত করার উদ্দেশ্যে আরেকটি প্রচেষ্টা গৃহীত হয়। এই আইনে চারটি আইনের অধীনে গঠিত মিউনিসিপ্যাল সংস্থাসমূহকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। ১৮৬৪ সালের আইনে গঠিত মিউনিসিপ্যাল সংস্থাসমূহকে প্রথম শ্রেণীর এবং ১৮৬৮ সালের আইনের

৩১. Rokeya Rahman Kabeer, *Administrative Policy of the Government of Bengal*, 1870-90, (Dhaka 1965), 7.

৩২. Syed Giasuddin Ahmed, *Emergent Leadership Pattern in the Pourasavas of Bangladesh : A study of the Administrative Proceedings of Candidates who contested for the Elective Offices in Municipalities in the Election 1973* (Monograph), Dhaka University 1974, 14

৩৩. Khan, "Place of Municipality", 57; also see Ahmed, *Emergent Leadership*, 15.

অধীন মিউনিসিপ্যালিটিসমূহকে দ্বিতীয় শ্রেণীর মিউনিসিপ্যালিটি হিসেবে ঘোষণা করা হয়। আর ১৮৫৬ সালের ২০ নং আইনের অধীন এবং ১৮৫০ সালের আইনের অধীন শহরসমূহকে যথাক্রমে ইউনিয়ন ও স্টেশন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এসব সংস্থার কাজ, দায়িত্ব, এমনকি গঠনপ্রকৃতি অপরিবর্তিতই থেকে যায়, যেখানে কতিপয় শহর ও নগর ব্যতীত সবক্ষেত্রে কমিশনারগণ সরকার কর্তৃক মনোনীত হতেন। অবশ্য কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ করদাতা লিখিতভাবে ইচ্ছা ব্যক্ত করলে যেকোন সংখ্যক অথবা সকল কমিশনারকে নির্বাচিত করার বিধানও ঐ আইনে ছিল।[৩৪] স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেট, মহকুমা কর্মকর্তা এবং স্বাস্থ্য কর্মকর্তা পদাধিকারবলে মিউনিসিপ্যাল সংস্থার সদস্যপদে বহাল থাকেন। বোর্ডের চেয়ারম্যান সরকার কর্তৃক মনোনীত হতেন। তবে কমিশনারগণ নিজেদের মধ্য থেকে ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত করতে পারতেন। পরবর্তী বছরসমূহে মিউনিসিপ্যালিটির কর্মপরিসর প্রসারিত করা হয় এবং প্রথম শ্রেণীর সকল মিউনিসিপ্যালিটিই ব্যক্তিগত শৌচাগার পরিষ্কারকরণ এবং সেস্-পুলের কর্তৃত্বের দায়িত্ব লাভ করে এবং সেই উদ্দেশ্যে ১৮৭৮ সালের আইনের অধীনে করারোপের কর্তৃত্বও লাভ করে। ১৮৮০ সালে টিকাদান বাধ্যতামূলক করার ফলে মিউনিসিপ্যালিটির কাজ আরো সম্প্রসারিত হয়।[৩৫]

পূর্বে প্রবর্তিত মিউনিসিপ্যাল আইনসমূহকে সমৃদ্ধ করার প্রধান উদ্দেশ্য নিয়ে ১৮৮৪ সালে আরেকটি আইন পাস হয় ভাইসরয় লর্ড রিপনের সময়, যিনি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের সংস্কার ও নবায়নকে তাঁর আমলের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ বলে দাবি করেন। আইনটি বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট, ১৮৮৪ (১৮৮০ সালের আইন) নামে খ্যাত এবং এই আইন প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যকার পার্থক্য নিরসন করতে প্রণীত হয়। তাছাড়া ইউনিয়ন ও স্টেশনসমূহ মিউনিসিপ্যালিটির সাদৃশ্য হারায়, যার জন্য স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইন, ১৮৮৫ প্রয়োজনীয় বিধান প্রবর্তন করে। সরকারের আদেশে নির্দিষ্ট মিউনিসিপ্যালিটি ছাড়া সকল মিউনিসিপ্যালিটিতেই নির্বাচনের বিধান করা হয় এবং উন্নত মিউনিসিপ্যালিটিসমূহের কমিশনারগণ নিজেদের মধ্য থেকে চেয়ারম্যান নির্বাচনের অধিকারপ্রাপ্ত হন। এই আইন প্রবর্তিত হওয়ার পর ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচনের জন্য সরকারি অনুমোদনের বিধানটিও রহিত করা হয়। নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচন ও নিজেদের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্বাধীনতার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটগণ যাতে কার্যকর নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করতে পারেন তারও ব্যবস্থা এই আইনে রাখা হয়।[৩৬] করারোপ ও অতিরিক্ত করারোপের জন্য সরকারের পূর্বানুমতি গ্রহণ মিউনিসিলিটিসমূহের জন্য

৩৪. ঐ।

৩৫. ঐ।

৩৬. Kabeer *Administrative Policy* 39

আবশ্যকীয় করা হয়। এসব সংস্থা যেসব অভিকর (rate) এবং কর আরোপ করতে পারতো তা ছিল নিম্নরূপ :

ক. মিউনিসিপ্যালিটির সীমানার মধ্যে বাড়িমালিকদের উপর কর;

খ. বাড়ির বার্ষিক মূল্যের উপর কর এবং তার অতিরিক্ত নিম্নরূপ কর :

১. গাড়ি, ঘোড়া ও অন্যান্য জন্তুর উপর কর ;

২. গাড়ি নিবন্ধনের উপর ফি ;

৩. ফেরি, পুল ও পাকা রাস্তার উপর কর ;

৪. পানিকর (একটি সর্বোচ্চ সীমা পর্যন্ত) ;

৫. আলোকিতকরণ বাবদ কর (বার্ষিক মূল্যের সর্বোচ্চ শতকরা ৩ ভাগ) ;

৬. শৌচাগার পরিষ্কারকরণের জন্য কর।[৩৭]

পরবর্তীকালে বাংলার মিউনিসিপ্যাল সংস্থার কার্য সম্প্রসারিত ও সুসমৃদ্ধ করে আরো অনেক আইন পাস হয়। ১৮৯৪ সালের ৪ নং আইন স্যানিটারি বোর্ড গঠন, পানি সরবরাহ এবং পানি নিষ্কাশনের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার বিধান প্রবর্তন করে। ১৮৯৬ সালের ২নং আইনে মিউনিসিপ্যালিটিসমূহকে তাদের তহবিলের কিয়দংশ কতিপয় জনকল্যাণমূলক কাজে, যেমন মুক্তস্থানের ব্যবস্থা, পাঠাগার, মাতৃসদন ও জীবজন্তুর জন্য যত্নকেন্দ্র স্থাপনের কাজে ব্যয় করতে ক্ষমতা দেয়া হয়। বিকেন্দ্রীকরণের উপর রাজকীয় কমিশন (১৯০৭-১৯০৯) মিউনিসিপ্যালিটির অন্যান্য স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় অধিকতর গণতান্ত্রিক বিধান প্রবর্তনের সুপারিশ করে। অবশ্য প্রথম মহাযুদ্ধের কারণেই সেসব সুপারিশ তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর করা সম্ভব হয় নি। ১৯১৭ সালের আগস্ট মাসে সরকার ঘোষণা করেন যে, সরকার স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ক্রমান্বয়ে উন্নয়নের মাধ্যমে ভারতে 'দায়িত্বশীল সরকার' প্রতিষ্ঠা করবেন। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্রে পরবর্তী উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গৃহীত হয় ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের মাধ্যমে, যাতে প্রদেশসমূহে গ্রামীণ ও শহুরে উভয় স্থানীয় শাসনের বিষয়টি নির্বাচিত মন্ত্রণালয়ের হাতে অর্পণ করা হয়। তবে পরবর্তীকালে উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের কারণে স্থানীয় সংস্থাসমূহের ক্রমবৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়—একবার ১৯২০ দশকের শেষদিকে আবার ১৯৩০-এর দশকে। জাতীয় রাজনীতির উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এসব সংস্থাকে ব্যবহার করা হয় এবং বিশেষকরে মিউনিসিপ্যালিটিসমূহকে জাতীয়তাবাদীগণ এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ তাঁদের রাজনৈতিক প্লাটফরমে রূপান্তরিত করেন। অবশ্য নির্বাচকমণ্ডলী ধীরে ধীরে বর্ধিত হারে স্থানীয় নির্বাচনের প্রতিও আগ্রহ প্রকাশ করতে শুরু করে বিশেষত রাজনৈতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে শহরাঞ্চলে। তবে একই কমিশনারদের বার বার নির্বাচিত করার

৩৭. S. D Khan, " Evolution of Municipality in Bangladesh," S. Hussain (ed.), *Urban Affairs*, (Dhaka 1972), XVI-XVII, also see Ahmed, *Emergent Leadership*, 18.

প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে, যাঁদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এবং পেশায় উকিলগণই ছিলেন সর্বাধিক।[৩৮]

রাজনৈতিক অস্থিরতার সময়ে বঙ্গীয় আইন কাউন্সিল বেঙ্গল মিউনিসিপ্যালিটি এ্যাক্ট, ১৯৩২ নামে একটি আইন পাস করে। এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল ১৮৮৪ সালের আইন ও তৎপরবর্তী সংশোধন-সংযোজনসমূহকে একটি 'কোড অব ল'তে সন্নিবেশিত করা এবং পূর্ববর্তী আইনসমূহের অপ্রয়োজনীয় ও অপ্রাসঙ্গিক বিধানসমূহ বাতিল করা। মিউনিসিপ্যালিটিসমূহকে অধিকতর ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পণের মাধ্যমে তাদের সীমানাভিত্তিক ক্ষমতাকে আরো বর্ধিত করাও এই আইনের লক্ষ্য ছিল। অবশ্য নতুন মিউনিসিপ্যালিটি গঠন, বর্তমান মিউনিসিপ্যালিটিসমূহের সীমানাও কমিশনারের সংখ্যা নির্ধারণ এবং নির্বাচনপদ্ধতি ১৮৮৪ সালের অনুরূপই থেকে যায়। ব্যতিক্রম যা সাধন করা হয় তা ছিল ঢাকা ও চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটির ক্ষেত্রে চার-পঞ্চমাংশ এবং অন্যান্য মিউনিসিপ্যালিটির ক্ষেত্রে তিন-চতুর্থাংশ নির্বাচিত সদস্যের বিধান। ব্যবসা ও শিল্পের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকার মনোনীত সদস্যদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারতো। নির্বাচন ছিল যৌথ প্রকৃতির। তবে নির্বাচিত আসন সংরক্ষণের মাধ্যমে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণের বিধান ছিল। ভোটদানের প্রক্রিয়াটি ছিল গোপনীয়। তবে নির্বাচনী কোন প্রতীকের প্রবর্তন করা হয় নি। কমিশনারগণ নিজেরা নিজেদের মধ্য থেকে চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত করতেন।[৩৯] অভিকর ও কর আরোপ এবং তহবিল ব্যবহার সংক্রান্ত মিউনিসিপ্যালিটির ক্ষমতা পরবর্তীকালে আরো বর্ধিত ও নির্দিষ্ট করা হয়। স্থানীয় সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণ ও পর্যবেক্ষণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যেও আইন প্রণীত হয়।[৪০] এভাবে স্থানীয় সরকারের বিকাশে গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসনের উপাদানের পাশাপাশি সরকারি নিয়ন্ত্রণ এবং পর্যবেক্ষণের উপাদানও পরিলক্ষিত হয়। অনুরূপভাবে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের মাধ্যমে প্রবর্তিত রাজনৈতিক সংস্কারও স্থানীয় সংস্থাসমূহের উপর প্রভাব বিস্তার করে। তবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং ১৯৪৭ সালের ভারতবিভক্তির পূর্বে রাজনৈতিক উত্থান-পতন বাংলায় মিউনিসিপ্যাল সংস্থার বিকাশে বাধার সৃষ্টি করে।

এভাবে ১৯৪৭ সালের ভারতবিভাগের মাধ্যমে এই উপমহাদেশে স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠার একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া সমাপ্ত হয়। ভারতবিভক্তি এই উপমহাদেশে বৃটিশ শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটায় এবং পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম দেয়। এর ফলে পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের একটি অংশে পরিণত হয়। আসাম মিউনিসিপ্যাল আইন, ১৯২৩ দ্বারা পরিচালিত সিলেট জেলার ৫টি মিউনিসিপ্যালিটিসহ পূর্ব বাংলা ৫০টি

৩৮. Tinker, *Foundations of Local Self-government*, 156-161, আরো দ্রষ্টব্য, Ahmed, *Emergent Leadership*, 20

৩৯. Khan, "Evolution of Municipality", XVIII-XIX.

৪০. Ahmed, *Emergent Leadership*, 21.

মিউনিসিপ্যালিটি লাভ করে। সিলেট জেলার ৫টি মিউনিসিপ্যালিটি ব্যতীত ৪৫টি মিউনিসিপ্যালিটি ১৯৩২ সালের বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল আইনের বিধানমতে পরিচালিত হতো। ১৯৩২ সালের মিউনিসিপ্যাল আইনের দ্বারা পরিচালনার বিধান সম্বলিত ৭টি নতুন মিউনিসিপ্যালিটি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ১৯৫৭ সালের মধ্যে এ সংখ্যা ৫২-তে (সিলেট জেলার ৫টি বাদে) উন্নীত হয়। এই অবস্থান বেশ দীর্ঘ সময়ের জন্য বলবৎ থাকে। অবশ্য ১৯৫৭ সালে স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়। দি ইস্ট পাকিস্তান আইন দ্বারা (পূর্ব পাকিস্তান আইন কাউন্সিল কর্তৃক ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাসকৃত) ১৯৩২ সালের ২২ নং বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল আইনে কতিপয় সংশোধনী আনা হয় : যেমন—(১) মনোনয়ন প্রথা এবং মিউনিসিপ্যালিটিসমূহে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত আসন রাখার ব্যবস্থা রহিত করা হবে; (২) এসব স্থানীয় সংস্থা সম্পূর্ণরূপে নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে গঠিত হবে; (৩) নির্বাচন সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হবে এবং ভোটাধিকার অর্জনের বয়স হবে ১৪ বছর। তাছাড়া মিউনিসিপ্যাল আইনের অধীন কতিপয় অপরাধের বিচার করার জন্য একজন বা একাধিক প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মর্যাদাসম্পন্ন বেতনভুক ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের মাধ্যমে প্রাদেশিক সরকারকে প্রথমবারের মতো ক্ষমতা প্রদান করা হয়।[৪১] ১৯৩২ সালের আইনের এসব পরিবর্তন তাই মিউনিসিপ্যালিটির ধরন ও কাজে অধিকতর স্বায়ত্তশাসিত সরকারের উপাদানের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করে। কিন্তু অর্থবহ কোন কিছু সংঘটিত হবার পূর্বেই ১৯৫৮ সালের অক্টোবরে সমগ্র দেশ সামরিক শাসনের গভীর সঙ্কটে নিমজ্জিত হয়। সামরিক শাসন দেশে সকল প্রকার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া রহিত করে এবং সকল স্থানীয় সংস্থাকে সরকারমনোনীত কর্মকর্তাদের শাসনাধীনে নিয়ে আসে।[৪২] সামরিক শাসনকালে ১৯৫৯ সালে মৌলিক গণতন্ত্র অধ্যাদেশ এবং ১৯৬০ সালে মিউনিসিপ্যাল-প্রশাসন অধ্যাদেশ জারি করা হয়।

এ পদক্ষেপসমূহ পৌর ও গ্রামীণ সকল স্থানীয় সংস্থার বিধানসমূহ পরিবর্তন করে। নতুন ব্যবস্থাধীনে মিউনিসিপ্যাল এলাকায় ইউনিয়ন কমিটি ও টাউন কমিটি গঠন করা হয়। টাউন কমিটি ১৯২৩ সালের আসাম মিউনিসিপ্যাল আইনের অধীনে সংগঠিত সিলেট জেলার শ্রীমঙ্গল টাউন কমিটির মডেল অনুসারে গঠন করা হয়। আসাম আইনের অধীনে একটি টাউন কমিটি ৪ জন নির্বাচিত এবং ২ জন মনোনীত মোট ৬ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হতো। এই আইনের অধীনে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের জন্য কোন পৃথক আসনের ব্যবস্থা ছিল না, তবে সম্প্রদায়ের বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য সরকার মিউনিসিপ্যাল আসনসমূহকে প্রয়োজনমতো ভাগ করতে পারতো। ১৯৫৯ সালের মৌলিক গণতন্ত্র অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী বর্তমান মিউনিসিপ্যালিটিসমূহকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। ১৫,০০০ অথবা তার চেয়ে কম জনসংখ্যা (১৯৫১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী) বিশিষ্ট শহরসমূহের পূর্বমর্যাদা বহাল রাখা হয় এবং ১৯৬০ সালের

৪১. East Pakistan (Amendment) Act XXII of 1957 , also see Khan, "Evolution of Municipality", XVIII-XIX

৪২. Ahmed, *Emergent Leadership*, 26.

মিউনিসিপ্যাল প্রশাসন অধ্যাদেশ অনুযায়ী একটি মিউনিসিপ্যাল কমিটি সংশ্লিষ্ট মিউনিসিপ্যালিটির ইউনিয়ন কমিটিসমূহের চেয়ারম্যানবৃন্দ (নির্বাচিত) এবং সমান সংখ্যক মনোনীত সদস্য নিয়ে গঠিত হতো। মনোনীত সদস্যদের আংশিক থাকতেন অফিসিয়াল সদস্য (মিউনিসিপ্যাল কমিটির চেয়ারম্যানসহ, যিনি একজন সরকারমনোনীত সদস্য) এবং আংশিক থাকতেন নন-অফিসিয়াল সদস্য (৭০%)। মনোনীত সদস্যগণ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত হতেন। চেয়ারম্যান সরাসরি সরকার কর্তৃক মনোনীত হতেন। কিন্তু ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত সদস্যদের মধ্য হতে মিউনিসিপ্যাল কমিটির সকল সদস্য কর্তৃক নির্বাচিত হতেন। চেয়ারম্যান 'সার্বক্ষণিক' বা 'খণ্ডকালীন' উভয়ই হতে পারতেন। 'খণ্ডকালীন' হওয়ার ক্ষেত্রে তিনি হতেন স্থানীয় কর্মকর্তা অর্থাৎ মহকুমা শহরের বেলায় মহকুমা হাকিম এবং জেলা শহরের বেলায় অতিরিক্ত জেলা কমিশনার। শ্রেণীকরণ সত্ত্বেও টাউন কমিটিসমূহকে মিউনিসিপ্যালিটি হিসেবে বিবেচনা করা যেতো। কারণ তাদের আর্থিক বিষয়াদি এবং কাজকর্ম ১৯৬০ সালের আইনের মিউনিসিপ্যাল প্রশাসন অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ীই পরিচালিত হতো।

১৯৬৪ সালে ইলেকটোরাল আইন পাস করা হয়, যা ইউনিয়ন ও টাউন কমিটির সদস্যদের উপর কতিপয় নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দায়িত্ব অর্পণ করে। গ্রামাঞ্চলে সংগঠিত সদস্যগণ সমেত তাঁরা দেশের প্রধান নির্বাহী অফিসার, প্রেসিডেন্ট এবং জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচনে নির্বাচক হিসেবে কাজ করতেন। ইলেকটোরাল কলেজ আইনের বিধান অনুযায়ী তাঁদেরকে পুনর্গঠিত করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে এবং ১৯৬৫ সালে পুনর্গঠনের কাজটি সম্পন্ন করা হয়। এ বিধানের ফলে একদিকে সাধারণ ভোটারগণ যেমন উচ্চতর স্তরে তাঁদের প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার হতে বঞ্চিত হন, অন্যদিকে তেমনি ভোটারদের মোট সংখ্যা কমে যাওয়ায় ক্ষমতাশীন দলের পক্ষে তাঁদেরকে প্রভাবিত করাও সহজ হয়ে পড়ে। এই ব্যবস্থা সরকার ও স্থানীয় সরকার কর্মকর্তাদের মধ্যে বিধিবহির্ভূত একটি সম্পর্ক স্থাপনেরও সুযোগ সৃষ্টি করে, যার ফলস্বরূপ জনসাধারণ ও তাদের প্রতিনিধিদের মধ্যে একটি দুরত্ব গড়ে উঠে। জনগণ তাঁদের প্রতিনিধিদের উপর সকল প্রকার আস্থা হারিয়ে ফেলে এবং সমগ্র ব্যবস্থাটি ধিকৃত হয়ে পড়ে।

১৮

# পাকিস্তান : রাজনীতিতে সামরিক বাহিনী (১৯৪৭-১৯৭১)

এনায়েতুর রহিম*

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পূর্ব পুর্য়ন্ত অধিকাংশ সময় জুড়ে পাকিস্তান ছিল সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে। এ পর্যায়ে প্রত্যক্ষ সামরিক আইন জারি অথবা অন্য কোন ব্যবস্থার মাধ্যমে রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় সামরিক বাহিনী আধিপত্য বিস্তার করেছিল। এমনকি ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর দেশব্যাপী সামরিক আইন জারির পূর্বেও বেসামরিক প্রশাসনে সহায়তা দানের জন্য সামরিক বাহিনীকে কয়েক বার ডাকা হয়েছিল এবং কোন কোন ক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ে স্বল্পমেয়াদী সামরিক আইনও জারি করা হয়েছিল। ১৯৫৬ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের সকল রাষ্ট্রপ্রধান এবং সামরিক বাহিনীর প্রধানকেও সামরিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে সরানো হয়েছিল। সামরিক বাহিনী রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকা অবস্থায়ই পাকিস্তানের দুই প্রদেশের মধ্যে তিক্ত সম্পর্ক এবং সিভিল-মিলিটারী সম্পর্কের ক্ষেত্রে টানাপড়েন ও জটিলতা বৃদ্ধি পায়। বস্তুত পাকিস্তানের ভাঙনের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে সামরিক বাহিনীই অনুঘটক এবং মূল শক্তি হিসেবে কাজ করে।

ভারতবিভাগের সময় বৃটিশ ভারতীয় সামরিক বাহিনীর জনবল, সরঞ্জাম এবং সুযোগ-সুবিধার হিস্যা নিয়েই নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের সামরিক সংগঠনের সূচনা ঘটে।

Professor of History, Georgetown University, Washington D.C.

## সামরিক সংগঠন

পাকিস্তানের সামরিক সংগঠন সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য বিবরণ এত সীমিত যে জনৈক গবেষক সম্প্রতি মন্তব্য করেছেন যে সেনাবাহিনীর রাজনৈতিক গুরুত্বের কারণে সামরিক বাহিনীর সকল দিক সম্পর্কে প্রচুর গবেষণাকর্ম আশা করা গেলেও বাস্তবে "এমনকি সবচেয়ে মৌলিক বিষয়েও তথ্য সম্পূর্ণ অনুপস্থিত…কোন পরিসংখ্যান নেই, কেবল আছে ঝাপসা সাধারণ উক্তি…কেউই জানে না পাকিস্তানী সেনাবাহিনী কিভাবে কাজ করতো"।[১] কিছু অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা যে বিবরণ দিয়েছেন, তাতে নিয়োগ, প্রশিক্ষণ ও সামরিক সংস্কৃতি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ব্যাখ্যা বা সংখ্যাগত উপাত্তের অভাব রয়েছে।[২] এছাড়া প্রচারণাধর্মী প্রকাশনায়ও সামরিক সংগঠন সংক্রান্ত কোন প্রামাণ্য তথ্য নেই বললেই চলে। তবুও এ বিষয়ে প্রণীত কিছু পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধে এর উপর সামান্য আলোকপাত করা হয়েছে।[৩]

ভারতবিভাগের ফলে সামরিক বাহিনীর জনবল, সরঞ্জাম এবং সরবরাহসমূহ ভাগাভাগি হয়ে যায়। ভারতীয় অঞ্চল থেকে আসা মুসলিম সৈনিকদেরকে দুটি রাষ্ট্রের যে-কোনো একটিকে বেছে নেয়ার সুযোগ প্রদান ছাড়াও সকল মুসলিম ইউনিটকে তাদের রেকর্ড ও পদবিসহ পাকিস্তানে বরাদ্দ করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় বৃটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীর এক-তৃতীয়াংশ পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগদান করে, যা সংখ্যায় ছিল প্রায় দেড় লাখ অফিসার ও সৈনিক। ভারত যেহেতু ধর্ম নির্বিশেষে সকল সৈনিককে গ্রহণ করেছিল, তাই কিছু মুসলমান সৈনিক ভারতেই থেকে যায়। ভারতবিভাগের ফলে নৌ ও বিমান বাহিনীর ক্ষেত্রেও একই প্রকার বিভাজন হয়, যাতে জনবল, সরবরাহ এবং সরঞ্জামের বড় অংশই ভারতে রয়ে যায়।

১৯৪৭ সালে যে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জন্ম হয়, তা "অবশ্যই ছিল বৃটিশ ধাঁচের"—সুসজ্জিত, সুশিক্ষিত এবং যুদ্ধবিদ্যায় অভিজ্ঞ।[৪] যদিও স্বাধীনতার লগ্নে নাড়ির বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়, পাকিস্তান বাহিনী তার ঔপনিবেশিক অতীতের সাথে ঘনিষ্ঠভাবেই সংযুক্ত ছিল। এটা না ছিল তরুণ তুর্কীদের মতো বিপ্লবী বাহিনী, না ছিল চীনের

১. Clive Dewey, "The Rural Roots of Pakistan Militarism." in D. A., Low (ed). *The Political Inheritance of Pakistan,* (New York: St. Martin's Press, 1991) 255-283. Deweyর মতে সেনাবাহিনী যত পরিসংখ্যান প্রকাশ করে ততই তার সমালোচনার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।'

২. একটি লক্ষণীয় ব্যাতিক্রম Fazal Muqueem Khan, *The Story of the Pakistan Army,* (Karachi 1990).

৩. এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল Hassan Askari Rizvi, *The Military and Politics in Pakistan,* (Lahore 1986. First published in 1974); Stephen P. Cohen, *The Pakistan Army,* (Berkeley: University of California Press) and Ayesha Jalal, *The State of Martial Rule: The Origins of Pakistan's Political Economy of Defence,* (New York 1990).

৪. William Frank Gutteridge, *Military Institutions and Power in New States,* (New York 1965), 148.

সৈন্যবাহিনীর মতো জাতীয় মুক্তিফৌজ।[৫] যদিও বৃটিশ সেনাবাহিনীর উত্তরসূরি পাকিস্তান সেনাবাহিনী সংগঠিত বাহিনী হিসেবে বৃটিশ ঐতিহ্যের অনুসারী ছিল, রাজনীতিতে বেসামরিক কর্তৃত্ব মেনে নেয়ার বৃটিশ সামরিক পেশাদারিত্বের ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখার কোনো প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ এক্ষেত্রে গৃহীত হয় নি। পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর দায়িত্বের পরিধিতে মূলত অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত ছিল রাষ্ট্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সেনাবাহিনীতে লোক নিয়োগ, তাদের প্রশিক্ষণ এবং শৃঙ্খলা ও রণকৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন। কিন্তু স্বাধীনতার পর পরই জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে তার দৃশ্যমানতা ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষী সেনাকর্মকর্তারা রাষ্ট্রের বেসামরিক কর্মপরিমণ্ডলে হস্তক্ষেপ শুরু করে। এতে করে যে সামরিক বাহিনীর পেশাদারি চরিত্র খর্ব হয়েছিল সেটা তারা অস্বীকার করে। বস্তুত যে কয়েকটি যুদ্ধে তারা অবতীর্ণ হয়েছিল তার কোনোটিতেই তারা চূড়ান্তভাবে জয়লাভ করতে পারে নি।

## বেসামরিক কর্তৃত্বের প্রতি প্রাথমিক চ্যালেঞ্জ

রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে বেসামরিক কর্তৃত্বের প্রতি প্রথম চ্যালেঞ্জ আসে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে যখন জনৈক শীর্ষ সেনাকর্মকর্তা জিন্নাহকে এই মর্মে পরামর্শ দেন যে প্রশিক্ষণ দানের উদ্দেশ্যে কিছু বৃটিশ অফিসারকে রেখে "জাতীয় মেধা ও প্রতিভাকে" কাজে লাগাতে হবে।[৬] জিন্নাহ তাৎক্ষণিকভাবে সেনাবাহিনীতে মেধা ও প্রতিভা সন্ধানের ধারণার বিরোধিতা করেন। জিন্নাহ দৃঢ়ভাবে জবাব দেন যে সামরিক বাহিনী হলো "জনগণের সেবক এবং জাতীয় নীতি প্রণয়নের কাজ সেনাবাহিনীর নয়; বেসামরিক ব্যক্তিরাই সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে এবং সেনাবাহিনীর দায়িত্ব হলো তাদেরকে প্রদত্ত কাজ সমাধা করা"। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে সকল আদেশ ও নির্দেশ রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক নির্বাহীর কাছ থেকেই আসা উচিত।[৭]

জিন্নাহর মন্তব্যগুলো অবশ্যই সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাদের মনঃপূত হয় নি। এমনকি পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতার জীবদ্দশাতেও সামরিক বাহিনী সুস্পষ্টভাবে রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ ও দুঃসাহসিক কার্য সম্পাদনের পথ বেছে নেয়। এরূপ কার্যের জন্য সব সময় যে কারণ দেখানো হতো তা ছিল জাতির নিরাপত্তা। দেশরক্ষা এবং পরিস্থিতি মোকাবেলার কারণ দেখিয়ে সেনাবাহিনী হস্তক্ষেপ করতো, যদিও একই সময়ে তারা দাবি করতো যে "এটি একটি পেশাদার সেনাবাহিনী এবং সেনাবাহিনীর সাধারণ অফিসার রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামায় না"।[৮] জনজীবনের কিছু দিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে খবরদারির যে ঐতিহ্য বৃটিশ

৫. Morris Janowitz, *The Military in the Political Development of New Nations: An Essay in Comparative Analysis*, (Chicago 1964), 10.

৬. M. Asghar Khan, *Pakistan at the Crossroads*, (Lahore 1969), 9-10.

৭. ঐ।

৮. Cohen, *Pakistan Army*, 285-308.

ভারতীয় সামরিক বাহিনীর ছিল, পাকিস্তান সেনাবাহিনীও তা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। লর্ড কর্নওয়ালিসের শাসনকাল থেকেই (১৭৮৬-১৭৯৩) সামরিক বাহিনীর প্রধান গভর্নর জেনারেলের পরিষদের নিয়মিত সদস্য ছিলেন। কিন্তু গভর্নর জেনারেল শাসিত সেই রাষ্ট্রটি ছিল একটি ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র, যেটা পরিচালিত হতো বহিঃশক্তির স্বার্থে। ঔপনিবেশিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হিসেবে পাকিস্তান সেনাবাহিনী বেসামরিক কর্তৃপক্ষের সাথে ক্ষমতা ভাগাভাগিতে মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু জিন্নাহ ছিলেন এ ধারণার ঘোর বিরোধী।

যদিও পাকিস্তান একটি বেশ বড় বাহিনীর উত্তরাধিকারী হয়েছিল, যাঁদের অনেকেই ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ, ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে ছিলেন কেবল একজন মেজর জেনারেল, দুই জন ব্রিগেডিয়ার এবং ছয় জন কর্নেল। বিমানবাহিনীতে পাকিস্তানের অংশে ছিল ৬৫ জন পাইলট, ২০০ গ্রাউন্ড অফিসার এবং ১,০০০ বৈমানিক। বৃটিশ নৌ-বাহিনীর যে অংশকে পাকিস্তানের কাছে হস্তান্তর করা হয় তাতে ছিল ক্ষুদ্র একদল অফিসার এবং কয়েকশ' তালিকাভুক্ত নাবিক। অধিকাংশ বৈমানিক ও নাবিকই ছিল অদক্ষ।

স্বাধীনতালগ্নে সামরিক সরঞ্জাম, অস্ত্রকারখানা এবং অন্যান্য সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ পাকিস্তানকে বরাদ্দ করা হয়েছিল, কিন্তু বাস্তবে পাকিস্তান দাবি করেছিল যে বরাদ্দকৃত সম্পদের একটি বড় অংশই তাকে প্রদান করা হয় নি।[৯] অফিসার পর্যায়ে পাকিস্তানে যে প্রাথমিক স্বল্পতা ছিল, তা বৃটিশ সরকার কর্তৃক ৫০০ বৃটিশ অফিসার অস্থায়ীভাবে পাকিস্তানে প্রেরণের মাধ্যমে আংশিকভাবে মেটানো হয়। এসব অফিসারের অধিকাংশকেই ১৯৫১ সালের শেষ নাগাদ প্রত্যাহার করা হয় যখন পাকিস্তানী অফিসারদের দ্বারা তাদের শূন্যস্থান পূরণ করা হয়। নতুনদের কেউ কেউ ছিল কাকুলে নবপ্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমীর স্নাতক, আর অন্যরা ছিল জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার পদমর্যাদা থেকে পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। কিছু জ্যেষ্ঠ পদ পূরণ করা হয় ত্বরান্বিত পদোন্নতির মাধ্যমে। স্বাধীনতার পর পরই জনৈক বৃটিশ ব্রিগেডিয়ারের নেতৃত্বে কাকুলে একটি সামরিক একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়।[১০] একই সময়ে কমান্ড ও কন্ট্রোলের উপর উচ্চতর প্রশিক্ষণ দানের জন্য কোয়েটায় স্থাপিত হয় একটি স্টাফ কলেজ।[১১]

পাকিস্তানের দুর্বল সামরিক অবকাঠামো শীঘ্রই তার নিজস্ব সম্পদ এবং যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে কয়েকটি দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সামরিক সহায়তা কর্মসূচীর আওতায় প্রাপ্ত সম্পদ দ্বারা মজবুত করা হয়। এর ফলে সামরিক সক্ষমতার যে বিকাশ ঘটে তার সাথে

৯. যেহেতু ৭৮টি সমরাস্ত্র কারখানার সব কটিই ভারতীয় এলাকায় স্থাপিত ছিল, তাই পাকিস্তানে সমরাস্ত্র কারখানা প্রতিষ্ঠায় ভারত আর্থিক সহায়তা দানে সম্মত ছিল।

১০. একাডেমী ১৯৪৮ সালে তার প্রথম কোর্স চালু করে।

১১. স্টাফ কলেজটি আদিতে ১৯০৫ সালে বৃটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনী কর্তৃক স্থাপিত হয়েছিল।

তাল মিলিয়ে সৈন্যসংখ্যাও দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৯ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর লোকবল ছিল ২,৬০,০০০।[১২] ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের পূর্বমুহূর্তে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৩ লক্ষ ছাড়িয়ে যায় এবং ১৯৭১ সালের যুদ্ধে ৫ লক্ষের কাছে এসে দাঁড়ায়।

ঔপনিবেশিক অতীতের সূত্র ধরে বিভিন্ন কারণে নতুন সংগঠিত পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে সংখ্যায় শীর্ষে ছিল পাঞ্জাবীরা। এরপর ছিল পাঠান এবং স্বল্পসংখ্যক বেলুচি।[১৩] স্বাধীনতার পর বৃটিশ রাজ প্রবর্তিত অসম এবং স্বেচ্ছাচারী নিয়োগনীতি বাতিল না করে পাকিস্তান পাঞ্জাবীদেরকে অগ্রাধিকার প্রদানসহ সেনাবাহিনীতে শ্রেণীভিত্তিক ইউনিট গঠনের ঔপনিবেশিক প্রথাই বহাল রাখে।[১৪] এমনকি পাঞ্জাবের অভ্যন্তরেও কয়েকটি বিশেষ জেলা এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পেশাওয়ার ও কোহাট জেলা থেকেই মূলত পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে লোক নিয়োগ করা হতো।[১৫] এসব জেলা থেকে নিয়োগ করা হতো সেনাবাহিনীর প্রায় ৯৫ শতাংশ আর বাকি ৫ শতাংশ নিয়োগ করা হতো অন্য অঞ্চল থেকে।[১৬] অন্যভাবে দেখতে গেলে, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ৯৫ শতাংশই এমন এলাকা থেকে নিয়োগ করা হতো, মোট জনসংখ্যায় যাদের হিস্যা ছিল ৯ শতাংশ।[১৭]

যেহেতু বৃটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীর অনুরূপ পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর লোকবল নিয়োজিত হতো মূলত উপরে উল্লেখিত চার-পাঁচটি পাঞ্জাবী জেলা থেকে, এর ফলে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পাঞ্জাবীকরণ ঘটেছিল। পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর সুগভীর ও স্থায়ী যে শেকড় প্রোথিত ছিল পাঞ্জাবের হাজার হাজার গ্রামে, সম্ভবত সেটিই ছিল পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর আধিপত্যের মূল চাবিকাঠি।[১৮] উত্তর পাঞ্জাবের যে অঞ্চল থেকে মূলত

১২. M. Asghar Khan, *Pakistan at the Crossroads,* (Lahore 1969), Introduction.

১৩. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে বৃটিশ ভারতীয় সেনাবহিনীর ২০ লাখ সদস্যের মধ্যে ৭ লাখই এসেছিল পশ্চিম পাকিস্তানের এলাকাগুলো থেকে।

১৪. সেনাবাহিনীতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব বজায় রাখার লক্ষ্যে ভারত স্বাধীনতার পরপরই বেশ কিছু সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সমন্বিত ইউনিট গঠনের জন্য জাতভিত্তিক সকল ইউনিট বিলুপ্ত করা হয়।

১৫. পাঞ্জাবী জেলাগুলোর মধ্যে সেনাবাহিনীতে ক্যাম্পবেলপুর-এর হিস্যা ছিল সর্বোচ্চ।

১৬. Khalid B. Sayeed, "The Role of the Military in Pakistan." in *Armed Forces and Society: Sociological Essays,* Jacques Van Doorn (ed.), (The Hague 1986), 274-297. সাইয়িদ এখানে সেনা রিক্রুটদেরকে স্বপ্রণোদিত মার্সিনারি হিসেবে অভিহিত করেছেন, যারা তাদের পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্য অনুসরণ করছিল।

১৭. Cohen, *Pakistan Army,* 285.

১৮. Dewey, "Rural Roots", 261. পাকিস্তান রাষ্ট্রে সামরিক বাহিনীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়ায় অভিজ্ঞতাকেন্দ্রিক ভিত্তি স্থাপনে এই চমৎকার বিশ্লেষণাত্মক গ্রন্থের সহায়তা নেয়া হয়েছে।

সেনা নিয়োগ করা হতো, সেখানকার জীবনমানে ছিল স্থবিরতা। কেবল সিয-সুৎলেয সেচ অঞ্চলে যারা জমির অনুদান পেয়েছিল, সেসকল ভাগ্যবান সৈনিক ছাড়া অন্যরা খাল অঞ্চলের সমৃদ্ধি থেকে ছিল বঞ্চিত। সেনা নিয়োগের এসকল বিশাল এলাকার যোদ্ধাশ্রেণী বেসামরিক সরকারি সূত্রের চেয়ে সামরিক সূত্র থেকেই অধিক অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা লাভ করতো। বিভিন্ন ধাপ ও স্তর অতিক্রমকারী হাজার হাজার সৈনিকের বাহিনীই ছিল বৃহত্তম নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান।

রাওয়ালপিন্ডির মতো জেলায় সমগ্র অর্থনীতিই আবর্তিত হতো সেনানিবাসকে ঘিরে। বংশপরম্পরায় যোদ্ধাশ্রেণী যে আকর্ষণীয় বেতন, পেনশন ও অন্যান্য সুবিধাদি পেতো, তাতে সেনাবাহিনীর সাথে তাদের একটি দৃঢ় যোগসূত্র এবং যোদ্ধা পরিবারগুলোর মধ্যে ভ্রাতৃপ্রতিম বন্ধন স্থাপিত হতো। নিয়োগের প্রক্রিয়ায় অধিকাংশ পরিবার যোদ্ধা সরবরাহ করতো এবং যে রেজিমেন্টে তারা চাকুরি করতো তার সাথে নিজের ইজ্জত বা সম্মানকে এক করে দেখতো। গ্রামে একটি পরিবারের অবস্থান নির্ভর করতো সেনাচাকুরিতে তার অতীত রেকর্ডের ওপর। যুদ্ধ এবং শান্তি উভয় সময়েই যোদ্ধাশ্রেণী এরকম ব্যাপক সুবিধা পেতো সামরিক শাসনের বদৌলতে। কাজেই তারা বেসামরিক শাসনের চেয়ে সামরিক শাসনকেই সাধারণত বেশি পছন্দ করতো।

সেনা সংগ্রহের এলাকা এবং সেনাবাহিনীর মধ্যে একটি মিথোজীবী সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল, যা ছিল জেনারেলদের ক্ষমতা গ্রহণের একটি শক্ত ভিত্তি।[১৯] ফলে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীতে ইতিপূর্বে পাঞ্জাবীদের যে সংখ্যাধিক্য ছিল তা আরো সম্প্রসারিত হয়। কালক্রমে একটি পাঞ্জাবী সামরিক দৃষ্টিভঙ্গি পশ্চিম পাকিস্তানে প্রাধান্য পায়। যখন কোনো অভ্যুত্থান সংঘটিত হতো তখনই তাকে স্বাগত জানানো হতো, এবং অভ্যুত্থানপরবর্তী জান্তাকে পর্যাপ্ত সমর্থন প্রদান করা হতো। প্রত্যেক সৈনিক পাঞ্জাবী অহমিকার বশবর্তী হয়ে মনে করতো যে সে দশজন ভারতীয় সৈন্যের চেয়েও উত্তম এবং পাকিস্তান তার চিরশত্রু ভারতের বিরুদ্ধে যে-কোন যুদ্ধে জয়ী হবে।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটি বড় অংশই নিয়োজিত হতো পল্লী অঞ্চল থেকে এবং এমন পরিবার থেকে, যাদের সামরিক পটভূমি ছিল। রেজিমেন্টাল প্রশিক্ষণকেন্দ্রে তাদেরকে যুদ্ধবিদ্যায় প্রশিক্ষণ প্রদান ছাড়াও বশ্যতা, শৃঙ্খলা, আনুগত্য এবং আত্মসম্মানবোধে দীক্ষিত করা হতো। যেহেতু নবীন সেনাদের শিক্ষা-দীক্ষা অল্পই থাকতো, তাই তাদেরকে সাক্ষরতাদান করতে প্রচুর সময় ব্যয় হতো। পাঠক্রমে আরো অন্তর্ভুক্ত থাকতো ইসলামিয়াত এবং ধর্মীয় শিক্ষা। একজন সৈনিক যে শপথ গ্রহণ করতো তাতে

১৯. Dewey, "Rural Roots," 261. Dewey'র মতে যোদ্ধা নিয়োগের এলাকাগুলোতে সফলভাবে ভোট প্রার্থনার কারণেই ভুট্টোর সাফল্য এসেছিল। এসকল অঞ্চলে যোদ্ধাশ্রেণীই ছিল সংখ্যাগুরু এবং ভারতবিভক্তির পূর্বে তারা রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করতো।

রাষ্ট্রের সেবা এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা ছাড়াও অন্তর্ভুক্ত থাকতো আল্লাহর সেবা এবং ইসলামের উচ্চতর গৌরবের প্রতি অঙ্গীকার।[২০] পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জনৈক শীর্ষ কর্মকর্তা বলেছিলেন, "সামরিক বাহিনীর চমৎকার নৈপুণ্যের পেছনে অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করে জেহাদের চেতনা।"[২১] এ ধরনের প্রণোদনার ফলে সামরিক বাহিনীতে হিন্দু জনসংখ্যা থেকে নিয়োগ আপনাআপনিই বাদ পড়ে গিয়েছিল; এ বাহিনী একদিকে যেমন ছিল অন্যতম বৃহত্তম জনশক্তি নিয়োগকারী সংগঠন, তেমনি ছিল রাষ্ট্রের অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান।

## নেতৃত্ব

পাকিস্তানের বিশাল সামরিক সংগঠনের নেতৃত্বে ছিলেন একদল বাছাই করা অফিসার, যাদেরকে বৃটিশ ভারতীয় ঐতিহ্যে প্রশিক্ষণ দেয়া হতো।[২২] অফিসারদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই আসতো পাঞ্জাবের পল্লী অঞ্চল থেকে, যেখানে জনসাধারণ ছিল রাজনৈতিক দিক দিয়ে অসচেতন, যে কারণে তাদেরকে নিরাপদ গণ্য করা হতো।[২৩]

স্বাধীনতার লগ্নে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সমগ্র অফিসারশ্রেণীকেই স্যানধার্স্ট, উলউইচ অথবা দেরাদুনে প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। ফলে বৃটিশ সামরিক ব্যবস্থার শিক্ষা, শৃঙ্খলা ও কারিগরি দক্ষতা এবং বৃটেনের সামরিক সংস্কৃতির আদর্শেই তারা দীক্ষিত হতো।[২৪] অন্তত প্রারম্ভিক বছরগুলোতে পাকিস্তানী অফিসারদের অ্যাংলোকরণ ঘটতো এবং বৃটিশ ঐতিহ্য অনুযায়ী তারা অফিসারস্ মেস ও সামাজিক অনুষ্ঠানে আনুষ্ঠানিক পোশাক পরতো এবং বৃটিশ শিষ্টাচার অনুসরণ করতো। একাডেমীতে অন্তত আড়াই বছরের কঠোর প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ছিল পেশার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় একজন অফিসারকে প্রস্তুত করে তোলা। কিন্তু পরিচারক দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং ক্ষমতার গর্বে গর্বিত থেকে তারা আরাম-আয়েশের জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। সামরিক উপর মহল হয়ে পড়ে একটি সুবিধাভোগী ছদ্ম সামন্ত শ্রেণী, যারা গলফ এবং পোলো খেলতে ভালোবাসতো। অবশ্য এ কথাও বলা হয়ে থাকে যে অধিকাংশ অফিসারই এসেছিল নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে।

২০. Sayeed, " Role of the Military", 283. সাইয়িদের মতে জওয়ানদের ধর্মীয় চেতনা ছিল এত প্রখর যে কিছু কিছু জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাকে ধর্মের ব্যাপারে তাদের ঢিলেমি ঢেকে রাখতে হতো।

২১. Mohammad Musa, *My Version: Indo-Pakistan War, 1965*, (Lahore 1983), 111.

২২. বলা হয়ে থাকে যে তাদের প্রশিক্ষণে এত সাদৃশ্য ছিল যে ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে উভয় সেনাবাহিনীই একই প্রকার কৌশলগত অগ্রাভিযান অনুসরণ করেছিল। See Sayeed, "Role of the Military", 281.

২৩. Sayeed, Role of the Military", 278.

২৪. পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগদানকারী এবং উচ্চপদে অধিষ্ঠিত কিছু অফিসারকে মেধাবী না হলেও দক্ষ বলা হতো, যদিও তারা আমুদে ছিল এবং পোলো খেলতে ভালোবাসতো। Sayeed, Role of the Military", 279.

সেনাকর্মকর্তাদের পদমর্যাদা, বেতন এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ছিল বেসামরিক আমলাতন্ত্রের উচ্চতর ধাপেরই অনুরূপ। সেনাকর্মকর্তারা বেসামরিক কর্মকর্তাদের তুলনায় উন্নততর জীবনযাপন করতো। এমনকি তালিকাভুক্ত জওয়ানরাও বেসামরিক কর্মীদেব চেয়ে ভালো অবস্থায় ছিল। চাকুরির ধরন আকর্ষণীয় হওয়ার কারণে নিয়োগপ্রাপ্তির জন্য প্রতিযোগিতা হতো বেশ কড়া। ১৯৫৭ সালে পাকিস্তান সামরিক একাডেমীর ৮০টি ক্যাডেট পদের জন্য প্রার্থী ছিল ৩০০০ জন।[২৫] সামরিক শাসন জারির পর প্রাতিযোগিতা হয়ে উঠলো আরো তীব্র, কারণ সামরিক পেশা তখন আরো আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল।

অফিসার পর্যায়ের অধিকাংশ সদস্যই নিযুক্ত হতো পাঞ্জাবী সামরিক পরিবার থেকে, যাদের অতীতে সামরিক বাহিনীতে চাকুরির সুদীর্ঘ ঐতিহ্য ছিল। তাই পাকিস্তানের সামরিক সংস্কৃতিতে পাঞ্জাবের সূক্ষ্ম সামাজিক দ্যোতনা ও বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটেছিল এবং এটা আশ্চর্যজনক কিছু ছিল না।[২৬] পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে পাঞ্জাবী নেতৃত্ব থাকায় একে পাঞ্জাব ও পাঞ্জাবী স্বার্থের সাথে এক করে দেখা হতো। পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর এই পাঞ্জাবীকরণের প্রতিফলন ঘটেছিল অর্থনৈতিক ও উন্নয়ন খাতে। সম্পদের সীমাবদ্ধতা আছে এমন একটি দেশে এটা তাই স্বাভাবিক ছিল যে পাঞ্জাব থেকে আসা সামরিক নেতৃত্ব তাদের নিজস্ব এলাকার উন্নয়নে তৎপর হবে, যা কার্যত সামরিক স্বার্থ রক্ষায় তাদের একমাত্র পরিমণ্ডল হয়ে পড়ে। এই গুরুত্বপূর্ণ সমর্থনের কারণে কেন্দ্রীয় চাকুরি ও ব্যয়বরাদ্দ এবং অর্থনৈতিক, শিল্প ও আর্থিক উন্নয়নের এক অসম বড় অংশ পাঞ্জাব লাভ করতো।

পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী, যাকে ক্ষমতাসীন এলিট গোষ্ঠীও বলা যেতো, তিনটি উপাদানে বিভক্ত ছিল। মেধা ও বন্দুকের সমন্বয়ে গঠিত সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্রের মোর্চা ছাড়াও এতে অন্তর্ভুক্ত ছিল উঠতি ব্যবসায়ী শ্রেণী। এই সংযোগের ফলে তিনটি উপাদানের মধ্যে গড়ে উঠেছিল পরস্পর নির্ভরশীল ব্যবসায়িক ও পারিবারিক সম্পর্ক। এ কথা সর্বজনবিদিত যে পারিবারিক সংযোগ ছাড়াও এরা সংযুক্ত ছিল বৈবাহিক বন্ধন দ্বারা।[২৭] একবার এই ত্রিভুজ মোর্চার আবির্ভাব ঘটার পর নিশ্চিতভাবেই সামরিক বাহিনী তার প্রাধান্য বিস্তার করে এবং রাজনীতিসহ জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে তার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। সিভিল সার্ভিসকে ক্ষমতার একটি জোটে টেনে আনার ক্ষেত্রে সামরিক নেতৃত্বের উদ্দেশ্য ছিল উচ্চতর পদগুলোতে বেসামরিক কর্মকর্তাদের একক আধিপত্য ভেঙে ফেলা। ১৯৬০ সালে সেনাকর্মকর্তাদের জন্য পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে যোগদানের সুযোগ উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। কিন্তু সেনাকর্মকর্তারা এ ব্যাপারে খুব একটা আগ্রহ দেখায় নি, কারণ তারা দেখেছিল যে তাদের ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধা ছিল

২৫. Janowitz, *The Military in the Political Development of New Nations: An Essay in Comparative Analysis*. (Chicago 1964), 298.

২৬. Coben, *Pakistan Army*, 42-44.

২৭. Sayeed, "Breakdown of Pakistan Political System." (Unpublished Paper, 1982).

তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। বস্তুত, বিশেষকরে ১৯৫৮ সালের সামরিক অভ্যুত্থানের পর চাকুরির ক্ষেত্রে অধিকাংশ পাঞ্জাবী যুবকের প্রথম পছন্দ ছিল সেনাবাহিনী।

## পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে বাঙালি

সামরিক বাহিনী থেকে বাঙালিদের বাইরে রাখার সুদীর্ঘ কালের বৃটিশ নীতির কারণে কেবল যুদ্ধকালে নিয়োজিত সীমিত সংখ্যক বাঙালি ছাড়া সামরিক বাহিনীতে তাদের কোন অস্তিত্ব ছিল না। বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে অযোদ্ধা জনগোষ্ঠীর জন্য নিয়োগবিধি শিথিল করা হয়েছিল এ যুক্তিতে যে যোদ্ধাশ্রেণী থেকে প্রয়োজন মোতাবেক সৈনিক পাওয়া যাচ্ছিল না। যদিও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ৭,১১৭ জন বাঙালিকে নিয়োগ করা হয়েছিল, যুদ্ধের পর তাদেরকে পুনরায় অব্যাহতিপ্রদান করা হয়।[২৮] উনিশশ' বিশের দশকে বাঙালিদের মধ্য থেকে নিয়োগ কোন কোন বছরে শূন্যের কোঠায় গিয়ে ঠেকেছিল।[২৯] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন নিয়োগবিধি আবারও শিথিল করা হয়, তখনও বাংলা থেকে নিয়োগের মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায়। তখন সমগ্র ভারত থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত ২০,৪৭,৮৩০ জনের মধ্যে বাংলা থেকে এসেছিল ১,৭১,২৫২ জন[৩০], যাদের মধ্যে ষাট হাজারের কিছু বেশি বেঙ্গল পাইওনিয়ার কোর-এ (নির্মাণ ইউনিট) কাজ করার সুযোগ পায়।[৩১] নতুন রিক্রুটদের অধিকাংশকেই আবার যুদ্ধের পর অব্যাহতি প্রদান করা হয়।

উত্তরাধিকার সূত্রে পাকিস্তান যে সেনাবাহিনী পায় তাতে বাঙালিদের প্রতিনিধিত্ব ছিল অতি অল্প। স্বাধীনতার সময় সেনাবাহিনীতে একটিও বাঙালি মুসলিম ইউনিট ছিল না এবং সীমিত সংখ্যক বাঙালিদের[৩২] মধ্যে আর্টিলারি ও সিগনালে কেউই ছিল না। অধিকন্তু, পূর্ববঙ্গে স্থায়ীভাবে মোতায়েন কোনো সৈন্যবাহিনী ছিল না[৩৩] বিধায় এখানে ক্যান্টনমেন্ট, রিক্রুটমেন্ট কেন্দ্র, প্রশিক্ষণ সুবিধা অথবা অন্যান্য সামরিক অবকাঠামোর কিছুই ছিল না। ১৯৪৮ সালের শুরুর দিকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী নবগঠিত ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের জন্য দুটি পদাতিক ব্যাটালিয়ন গঠন করে, যেটা সময়ের সাথে সাথে বেঙ্গল রেজিমেন্ট হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এই রেজিমেন্ট গঠনের অনুমোদন দেয়া হয়

২৮. Hasan Askari Rizvi, *The Military and Politics in Pakistan.* (Lahore 1986 edition, first published 1974), 137.

২৯. Government of India, India in 1929-30, (Calcutta 1930), 61. ১৯২৯ সালে সাইমন কমিশনের হিসাব অনুযায়ী তালিকাভুক্ত বাঙালির সংখ্যা ছিল ৭,০০০। দেখুন, Report of the Statutory Commission, Vol I: Survey, (London 1936), 97.

৩০. Nandan Prasad, *Expansion of the Armed Forces and Defense Organization 1939-45,* (Delhi 1956), Appendix 16, 463.

৩১. Cohen, Pakistan Army, 43.

৩২. ভারতবিভাগের সময় উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সেনাবহিনীতে বাঙালিদের উপস্থিতি অমুসলিম বাঙালিরা ভারতে চলে যাওয়ায় কমে যায়।

৩৩. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানী হুমকি ছাড়া বাংলায় কোন বাহ্যিক নিরাপত্তা হুমকি ছিল না।

১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে। প্রথম দুটি ব্যাটালিয়ন গঠিত হয় ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। পরবর্তী পর্যায়ে গঠিত হয় আরো ৬টি ব্যাটালিয়ন। নবম ব্যাটালিয়নকে চট্টগ্রাম রেজিমেন্টাল সেন্টারে আত্মীকরণের সময়েই মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। প্রথম দিকে বেঙ্গল পাইওনিয়ার থেকেই বেঙ্গল রেজিমেন্টের লোকবল নেয়া হতো। এদের অধিকাংশই ছিল সেসকল মুসলমান যারা ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিহার রেজিমেন্টে চাকুরি করেছে। নতুন রেজিমেন্টের অধিকাংশ অফিসার আসে পাঞ্জাব থেকে। পরবর্তী সময়ে বেঙ্গল রেজিমেন্টে কেবলমাত্র বাঙালিরাই ছিল। ফলে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে এটাই সম্ভবত ছিল একমাত্র একক শ্রেণীর ইউনিট।[৩৪] প্রথম দিকে হাইকোর্ট ভবনে স্থাপিত হওয়ার পর এর উন্নততর ডিভিশন সদর দপ্তর স্থাপিত হয় ঢাকার সন্নিকটে কুর্মিটোলায়।

বৃটিশদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বাঙালিবিরোধী নিয়োগনীতির কারণে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে বাঙালিদের নিয়োগ ছিল যৎসামান্য। পূর্ব পাকিস্তানে তেমন কোন সামরিক অবকাঠামো নির্মাণের প্রয়াসও নেয়া হয় নি। পাকিস্তানী সেনানেতৃত্ব বাঙালিদেরকে সামরিক উপাদান হিসেবে বিবেচনা করতো না। তাদের ধারণা ছিল, একটি শক্তিশালী পশ্চিম পাকিস্তান ব্যতীত ভারতীয় আগ্রাসন থেকে পূর্ব পাকিস্তানের সুরক্ষা সম্ভব নয়।[৩৫] প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান সামরিক বাহিনীতে পূর্ব পাকিস্তানীদের স্বল্প সংখ্যার কারণ নিরূপণ এবং প্রদেশ থেকে নিয়োগপ্রার্থী আকর্ষণের পন্থা নির্ধারণে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য একটি কমিটিও গঠন করেন। তবে কমিটির প্রতিবেদন কখনো সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ করা হয় নি[৩৬], পরিস্থিতির উন্নয়নের জন্য কেবল কয়েকটা নামমাত্র পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল। এগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল নিয়োগকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা এবং প্রি-ক্যাডেট স্কুল স্থাপন। ১৯৫২ সালে ঢাকায় স্কুলটি স্থাপিত হলেও এক বছর পর তালিকাভুক্তির স্বল্প হারের কারণে তা বন্ধ করে দেয়া হয়।[৩৭]

১৯৪৭ সালে পূর্ব পাকিস্তান যেখানে সামরিক বাহিনীর মোট সদস্যসংখ্যার ১ শতাংশের জোগানদাতা ছিল[৩৮], পরবর্তীতে পরিস্থিতির কোনো উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয় নি এবং পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব অতি অল্পই থেকে যায়। (সারণী -১ দ্র.) ১৯৫৬ সালে মোট ৮৯৪ জন সেনা-অফিসারের মধ্যে মাত্র ১৪ জন ছিল পূর্ব পাকিস্তানী। নৌ-বাহিনীতে পূর্ব পাকিস্তানের অংশ ছিল ৫৯৩ জনের মধ্যে ৭ জন এবং বিমানবাহিনীতে ৬৪০ জন অফিসারের মধ্যে ৮০ জন। এমনকি ১৯৬৫ সালেও সমগ্র পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে

৩৪. Cohen, *Pakistan Army*, 43, and Rizvi: Military and Politics, 138.

৩৫. অধিকাংশ পাকিস্তানী জেনারেল আইয়ুবের কৌশল অনুসরণ করতো, যেখানে বলা ছিল যে সমগ্র পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে আনলেও পূর্ব পাকিস্তানকে বাঁচানো সম্ভব ছিল না যতক্ষণ না পশ্চিমা ঘাঁটিকে শক্ত করা হয়। Dawn, Jan. 18, 1955.

৩৬. Rizvi, *Military and Politics,* 138

৩৭. *Dawn,* Oct. 23, 1953.

৩৮. *Dawn,* June 25, 1967.

বাঙালিদের সংখ্যা ছিল মাত্র ১৩,০০০।[৩৯] ১৯৬৪-৬৫ সালে সেনাবাহিনীর মোট ৮টি ডিভিশনে সৈন্যসংখ্যা ছিল ২,৩০,০০০; নৌ-বাহিনী ও বিমানবাহিনীর আনুমানিক সদস্যসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৭,০০০ এবং ১৭,০০০-২৫,০০০।[৪০] নিচের সারণিতে ১৯৬৩ সালে সেনাবাহিনীতে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্বের বিবরণ দেয়া হয়েছে। এতে দেখা যায় যে এমনকি পূর্ব পাকিস্তানের জন্য অনুমোদিত শতাংশ এখানে অতিক্রম করা সম্ভব হয় নি।

সারণি ১ : সামরিক বাহিনীতে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব

| সার্ভিস | অনুমোদিত শতাংশ | প্রকৃত শতাংশ |
|---|---|---|
| <u>সেনাবাহিনী</u> | | |
| অফিসার | ৭.৮১ | ৫ |
| জুনিয়র কমিশন্‌ড অফিসার | ৭.৮ | ৭.৪ |
| অন্যান্য পদবী | ৭.৮ | ৭.৪ |
| <u>বিমানবাহিনী</u> | | |
| অফিসার | | ১৬ |
| ওয়ারেন্ট অফিসার | | ১৭ |
| অন্যান্য পদবী | | ৩০ |
| <u>নৌবাহিনী</u> | | |
| অফিসার | | ১০ |
| ব্রাঞ্চ অফিসার | | ৫ |
| চীফ পেটি অফিসার | | ১০.৪ |
| পেটি অফিসার | | ১৭.৩ |
| লিডিং সীমেন ও তার নীচে | | ২৮.৮ |

সূত্র : Rizvi, *Military and Politics* , pp. 38-39; Pakistan Assembly, *Debates*, Vol. 1, March 8, 1963, pp. 29-31.

এখানে লক্ষণীয় যে কোটাব্যবস্থা না থাকায় নৌ-বাহিনী ও বিমানবাহিনীতে বাঙালিদের অংশ তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল। বিমানবাহিনী ও নৌ-বাহিনীতে নিয়োগের

৩৯. *Dawn*, July 20, 1965. সামরিক বাহিনীতে বাঙালিদের অংশগ্রহণের হার সংক্রান্ত হিসাবে পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায়। সরকারও সেনাবাহিনীতে বাঙালিদের উপস্থিতির অনুপাত সংক্রান্ত হিসাব প্রকাশে অনাগ্রহী ছিল।

৪০. Sayeed, "Role of the Military". 275.

ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বুদ্ধিমত্তা ভিত্তি হিসেবে কাজ করতো এবং যোদ্ধাশ্রেণীর বাধ্যবাধকতা তুলনামূলকভাবে শিথিল ছিল।

বাঙালিদের স্বল্প প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে পাকিস্তান সেনাবাহিনী যে ব্যাখ্যা দিত তার মধ্যে দুটো বিষয় সবচেয়ে বেশি উল্লেখ করা হতো। এগুলো ছিল শারীরিক চাহিদা পূরণে বাঙালিদের অসামর্থ্য এবং তাদের কাপুরুষতা। ১৯৬৫ সালে ভারতের সাথে যুদ্ধের পর অধিক সংখ্যক বাঙালি আকর্ষণে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দৃশ্যমান প্রয়াসের অংশ হিসেবে উচ্চতার মাপকাঠি ন্যূনতম ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি থেকে হ্রাস করে ৫ ফুট ৪ ইঞ্চিতে নামানো হয়। স্বল্পমেয়াদী কমিশনের ক্ষেত্রে উচ্চতা আরো হ্রাস করে ৫ ফুট ২ ইঞ্চি করা হয়।[৪১] ১৯৬০-এর দশকেই অফিসার শ্রেণীতে বাঙালি নিয়োগের ব্যাপারে সরকারি আগ্রহের নিদর্শন স্বরূপ পূর্ব পাকিস্তানে কয়েকটি ক্যাডেট কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। অধিকন্তু, নিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচারকার্যও সম্প্রসারিত হয়। কিন্তু এসকল পদক্ষেপ গ্রহণের সময় সরকার বাঙালিদের জন্য বরাদ্দকৃত কোটা বা শতাংশের মতো মৌলিক বিষয়কে এড়িয়ে যাচ্ছিল। বাঙালিদের জন্য পূর্বনির্ধারিত কোটাব্যবস্থা তখনো শুধরানো হয়নি, যে ব্যবস্থায় তাদের সর্বোচ্চ হিস্যা ছিল ৮ শতাংশেরও কম এবং বাদবাকি পদগুলো ছিল মূলত পাঞ্জাবী ও পাঠানদের জন্য সংরক্ষিত। ফলে বাঙালিদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করাও সম্ভব হয় নি।

১৯৬৫ সালে মোট ৬,০০০ সেনা-অফিসারের মধ্যে মাত্র ৩০০ ছিল বাঙালি এবং এদের মধ্যে মাত্র একজন মেজর জেনারেল পদে উন্নীত হয়েছিলেন।[৪২] বাঙালি অফিসারদের পদোন্নতির হার সব সময়েই কম ছিল এবং স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় অধিকাংশ বাঙালি কর্মকর্তাই ক্যাপ্টেন বা মেজরের উপরে উঠতে পারেন নি। বিমান ও নৌ-বাহিনীতে বাঙালি অফিসারদের শতকরা হারে কিছুটা উন্নতি দেখা যায়, কিন্তু তারা স্পষ্টত ছিল সংখ্যালঘু। বিমান ও নৌ উভয় বাহিনীতেই বাঙালি অফিসারেরা নেতৃস্থানীয় পদগুলোর পরিবর্তে মূলত কারিগরি ও প্রশাসনিক শাখায় কর্মরত ছিল।

জানা যায় যে, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সকল রেজিমেন্টে পূর্ব পাকিস্তানীদের জন্য কোটা নির্ধারণের ইঙ্গিত দিয়েছিল। কিন্তু এ বিষয়ে বিস্তারিত জানানো হয় নি। বাঙালিদের অভাব-অভিযোগের কথা বিশেষভাবে তুলে ধরা হয় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায়। এই মামলা শেষ হওয়ার পর ১৯৬৯ সালের শেষে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে বাঙালিদের কোটা প্রায় দ্বিগুণ করা হয়।[৪৩] আপাতদৃষ্টিতে বাঙালিদেরকে তুষ্ট করার জন্য সেনাসার্ভিসে বাঙালিদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার কথা সেনাবাহিনী স্বীকার করে। এমনকি পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈনিক নিয়োগ হ্রাসের

৪১. *Dawn*, November 16, 1965; *Pakistan Observer*, November, 5, 1965.

৪২. মেজর জেনারেল খাজা ওয়াসিউদ্দিন ঢাকার নবাব পরিবার থেকে এসেছিলেন বিধায় তাঁকে সাধারণ বাঙালিদের সাথে এক করে দেখা যথাযথ নয়।

৪৩. See Rizvi, *Military and Politics*, 141.

ব্যাপারেও পরিকল্পনা নেয়া হয়, কিন্তু পাঞ্জাবীদের আপত্তির মুখে তা বাস্তবায়ন করা যায় নি। সম্প্রসারিত কোটাব্যবস্থায় যে স্বল্প সংখ্যক অফিসার নিয়োগ করা হয়েছিল, তাদেরকে অরাজনৈতিক ধাঁচের জুনিয়র কমিশন্ড অফিসারদের মধ্য হতে নির্বাচন করা হয়, যার ফলে যোগ্য কলেজ-স্নাতকেরা বাদ পড়ে যায়। কঠোর নির্বাচন ও নিয়োগপদ্ধতির পরিবর্তে সাক্ষাৎকারপদ্ধতির মাধ্যমে পাকিস্তান সামরিক একাডেমীতে ভর্তির ব্যবস্থা করা হয়।[৪৪]

একইভাবে ১৯৬৮-৬৯ সালে অন্য দুটো সার্ভিসেও বাঙালিদের শতকরা হার বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বিমানবাহিনীর অফিসার ক্যাডারে কোন কোটা ছিল না, তবে বিমানসেনা ভর্তির নিয়োগকেন্দ্রসমূহের ৫০ শতাংশ পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ করা হয়। নৌ-বাহিনীর ক্ষেত্রে ৪০ শতাংশ শূন্য পদ পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ করা হয়; এর অতিরিক্ত ১০ শতাংশ পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের কয়েকটি অঞ্চলে স্থানান্তরযোগ্য ছিল।[৪৫] এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে যদিও বিমান ও নৌ-বাহিনীতে বাঙালিদের জন্য পদ বরাদ্দ ছিল, পদ পূরণের কোন বাধ্যবাধকতা না থাকায় এ সকল সার্ভিসে বাঙালিদের অনুপাত নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পায় নি। অধিকন্তু, যথেষ্ট সংখ্যক বাঙালি না পাওয়া গেলে অন্যান্য অঞ্চল থেকে লোক নিয়োগের উপর কোনো নিষেধাজ্ঞা ছিল না। বাঙালিদের অনুকূলে শতাংশ বরাদ্দ কাগজপত্রে ভাল মনে হলেও তা অনুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে দেখা যায় যে তাতে বাঙালিদের খুব একটা লাভ হয় নি। তবে এটা দুটো সার্ভিসে বাঙালিদের প্রমাণিত মানের প্রতি ইঙ্গিত দেয়। এ সকল সার্ভিসের সকল পদে প্রার্থিতার জন্য প্রয়োজন ছিল ভালো মানের শিক্ষা এবং কারিগরি দক্ষতা। এখানে আরো উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সময়ের সাথে সাথে যদিও সামরিক বাহিনীতে বাঙালিদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, কিন্তু সামরিক বাহিনীর মোট সংখ্যার বিপরীতে তাদের শতকরা হার বৃদ্ধি পায় নি।

পাক-ভারত যুদ্ধের পর পূর্ব পাকিস্তানে অপর্যাপ্ত প্রতিরক্ষাব্যবস্থার ব্যাপারে বর্ধিত ক্ষোভের প্রেক্ষিতে পাকিস্তানের সামরিক কর্তৃপক্ষ গণচীনের সহায়তায় ঢাকার অদূরে একটি সমরাস্ত্র কারখানা নির্মাণ ছাড়াও (যা ১৯৬৯ সালে আংশিক উৎপাদনে যায়) দুটি ক্যান্টনমেন্ট স্থাপন করে। একই সাথে পূর্ব পাকিস্তান মেশিন টুল ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠার কাজও শুরু হয়ে যায়। আপাতদৃষ্টিতে এসকল বিক্ষিপ্ত ব্যবস্থা ছিল লোক-দেখানো। আসলে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা পরিকল্পনাকারীরা পূর্ব পাকিস্তানে একটি টেকসই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিলেন না।[৪৬]

পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক ঐক্যের সমগ্র সময় জুড়েই সামরিক বাহিনীতে বাঙালিদের অংশগ্রহণ জনসংখ্যা অনুযায়ী তাদের প্রাপ্য পরিমাণের

৪৪. ব্রিগেডিয়ার (অব) শাহাবুদ্দিন আহমেদের সাথে সাক্ষাৎকার, ওয়াশিংটন ডি সি, এপ্রিল-মে, ১৯৯৭।

৪৫. Rizvi, *Military and Politics*, 141.

৪৬. ঐ, 41.

চেয়ে তাৎপর্যপূর্ণভাবে কম ছিল। স্বাধীনতার পর পাকিস্তান কখনোই অফিসার শ্রেণী ও অন্যান্য স্তরে ইসলামী সমতার নীতি মোতাবেক পাঞ্জাবীদের কর্তৃত্ব রহিত করার জন্য কোনো ঐকান্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে নি।[৪৭]

পূর্ব পাকিস্তানের উপর পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক আধিপত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যাগত বহিঃপ্রকাশ ছিল সামরিক বাহিনীতে অব্যাহতভাবে বাঙালিদের স্বল্প প্রতিনিধিত্ব। যেহেতু রাষ্ট্রযন্ত্রের ক্ষমতাকাঠামোর শীর্ষে সামরিক বাহিনী অবস্থান গ্রহণ করতে পেরেছিল, রাষ্ট্রের অতি গুরুত্বপূর্ণ এই পেশায় বাঙালিদের যথোপযুক্ত প্রবেশাধিকার না থাকায় এর ফলে কেন্দ্র এবং প্রদেশ উভয় স্তরে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় বাঙালিদের অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। বিশেষত এমন একটি শক্তিশালী মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠকে বাইরে রেখে একটি গোষ্ঠী অথবা অঞ্চলের শ্রেষ্ঠত্বের কারণে কালক্রমে পাঞ্জাবীদের অব্যাহত কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বাঙালিদের অসন্তোষ চরম আকার ধারণ করে। এরূপ অবস্থায় রাষ্ট্রকে টিকিয়ে রাখার জন্য কেবল প্রদেশের ভৌগোলিক অবস্থান নয়, অধিকতর লাভজনকভাবে এ অঞ্চলের জনগণের ভাষা, সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ও আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে পশ্চিমাঞ্চলের বোধগম্য মেলবন্ধন সৃষ্টির জন্য সামরিক বাহিনীতে পূর্ব পাকিস্তানের পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক ছিল। প্রকৃতপক্ষে, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত স্বল্প সংখ্যক বাঙালি সামরিক সদস্য প্রথম সুযোগেই পাঞ্জাবীদের নিপীড়নকৌশলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। সুদীর্ঘকাল যাবৎ বঞ্চিত বাঙালিদের হতাশার মাত্রা তখন বিস্ফোরনুখ পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল।

সামরিক বাহিনীর প্রভাবশালী পাঞ্জাবীরা বেসামরিক আমলাতন্ত্র ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর (যাদের অধিকাংশই ছিল পাঞ্জাবী) সাথে স্বাভাবিক আঁতাত একবার সুদৃঢ়ভাবে গড়ে তোলার পর তাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি হারাবার ভয়ে সামরিক বাহিনীতে অর্থবহ অংশগ্রহণ থেকে বাঙালিদের ইচ্ছাকৃতভাবে বঞ্চিত করেছিল। উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, বাঙালিদের স্বল্প নিয়োগের অনুপাত নিশ্চিত করার জন্য যে গুপ্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হতো, তার মধ্যে ছিল শ্রেণীসংমিশ্রণ বা জাতিগত সংমিশ্রণ রীতি, যাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গঠনকাঠামোতে বাঙালিদের কোটা রাখা হয়েছিল ৮ শতাংশেরও কম।[৪৮] পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে বাঙালিদের স্বল্প প্রতিনিধিত্বের উপর যেসব কাজ হয়েছে তার কোনোটাতেই এই তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়টির উল্লেখ নেই। সামরিক বাহিনীর অন্যান্য শাখার মতো পাকিস্তান সেনাবাহিনীও এককভাবে বাঙালিদের বাইরে রাখার নীতি অনুসরণ করতো, যার ফলে জনসংখ্যা অনুযায়ী বাঙালিরা প্রতিনিধিত্ব পেতো না। সিভিল সার্ভিসের ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির জন্য একটি কোটা নির্ধারিত ছিল; কিন্তু

৪৭. Cohen, "Pakistan Army", 42.

৪৮. শ্রেণীগত বিন্যাসকে শ্রেণীবিন্যাসকৃত তথ্য হিসেবে বিবেচনা করা হতো। দেখুন, Pakistan Army, *The Army Regulations*, (Rawalpindi 1960). section I, Class Composition

সেনাবাহিনীতে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য একটি পূর্বনির্ধারিত কোটা থাকার ফলে স্বাধীনতাযুদ্ধ পর্যন্ত তাদের অবস্থান প্রান্তিকীকৃতই থেকে যায়।

বিশেষত পাকিস্তানের মতো একটি দেশে, যেখানে প্রচুর সংখ্যক বিভক্তিমূলক সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তি ও উপাদান ছিল, সেখানে সামরিক বাহিনীর উপর বেসামরিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার বৃত্তিগত ও বস্তুগত পূর্বশর্ত ছিল এই যে সামরিক বাহিনী এ পর্যায়ে সমাজের সত্যিকারের প্রতিনিধিত্ব করবে, যে সমাজকে তা সামগ্রিকভাবে সেবা করেছে। বাঙালিদের অর্থবহ উপস্থিতির অবর্তমানে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশের কয়েকটি জেলা থেকেই লোক নিয়োগ করা হতো এবং এর চরিত্র ছিল প্রাচীন রোমের proconsul বা praetorian-এর অনুরূপ। সামরিক বাহিনীতে বাঙালিদের অপ্রতুল প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতারা, এমনকি মৌলিক গণতন্ত্র দ্বারা সৃষ্ট নব্য টাউটশ্রেণীও সর্বসম্মতভাব নালিশ জানাতো। মাঝে মাঝে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের পূর্ব পাকিস্তানী সদস্যরা ১৯৬২-৬৮ সময়কালে নিয়োগনীতি এবং প্রতিরক্ষাব্যয়ের ব্যাপারে ছাঁটাই প্রস্তাব আনতো। নৌ-বাহিনীর সদর দপ্তর করাচী থেকে চট্টগ্রামে স্থানান্তর এবং কাকুল ও রিসালপুরের অনুরূপ সামরিক একাডেমী পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপনের ব্যাপারেও দাবি উত্থাপিত হতো। ১৯৬২ সালের সাংবিধানিক বিধান অনুযায়ী মন্ত্রিসভায় প্রতিরক্ষা দপ্তরটি একজন জ্যেষ্ঠ সামরিক কর্মকর্তার জন্য বরাদ্দ ছিল। এটাকেও বাঙালিদেরকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বের বাইরে রাখার একটি কৌশল হিসেবে সমালোচনা করা হয়। এরকমও শোনা যায় যে আলোচ্য ইস্যু এবং এ ধরনের অনেকগুলো বিষয়ে বাঙালিরা যে সাম্প্রদায়িক ঐক্য দেখিয়েছিল তা ভাঙার উদ্দেশ্যেই আইয়ুব ১৯৬৩ সালে রাজনৈতিক দলগুলোর উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নিয়েছিলেন।

## কাশ্মীর বিরোধ, রাওয়ালপিন্ডি ষড়যন্ত্র মামলা এবং সিভিল সমাজ

স্বাধীনতার পর কাশ্মীর রাজ্য নিয়ে বিরোধ বাধার কিছু দিন পরেই সামরিক-বেসামরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে টানাপড়েন দৃশ্যমান হওয়ার নিদর্শন দেখা যায়। ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে পর পর কয়েকটি ঘটনায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সহায়তায় পাঠান গোত্রের অনিয়মিত যোদ্ধারা বিনা উস্কানিতে রাজ্যে কয়েকটি হামলা চালায়। বিশৃঙ্খল ভাড়াটে যোদ্ধাদেরকে নিয়োজিত করার অপরিণামদর্শী পদক্ষেপ হিতে বিপরীত হয়। এর ফলে ভারত সামরিক হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হয়। এরই ধারাবাহিক প্রতিক্রিয়ায় কাশ্মীরের মহারাজা ১৯৪৭ সালের ২৬ অক্টোবর ভারতে যোগদানের চুক্তি স্বাক্ষর করে। এরকম কৌশলগত দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় নিয়ন্ত্রণে চলে যাওয়া ঠেকাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী স্বঘোষিত আজাদ কাশ্মীর বাহিনীর সহায়তায় তাৎক্ষণিকভাবে উপত্যকায় আক্রমণ পরিচালনা করে। এর মাধ্যমে রাজ্যের একটি অংশ তারা পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করে নেয়, যার নাম দেয়া হয় তথাকথিত আজাদ কাশ্মীর।

তবে প্রাথমিক জয়ের স্ফুলিঙ্গ পরবর্তী পর্যায়ে নাগালের বাইরে মনে হতে থাকে। কাশ্মীরের অবশিষ্ট অংশকে সামরিকভাবে একীভূতকরণের উৎসাহ দ্রুত হ্রাস পায় যখন ১৯৪৭ সালের নভেম্বর/ডিসেম্বর নাগাদ সংখ্যাধিক এবং শ্রেয়তর সমরাস্ত্রে সজ্জিত ভারতীয় সামরিক বাহিনী প্রত্যাঘাত করার পরিকল্পনা চালু করে। ১৯৪৮ সালের মে মাসের মধ্যে যুদ্ধপরিস্থিতি নিশ্চিতভাবে ভারতের অনুকূলে চলে আসে এবং তারা কাশ্মীর পরিস্থিতির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রস্তুত হয়ে যায়।

এরপর পাকিস্তান সরকার নিঃশর্ত যুদ্ধবিরতিতে রাজি হলে একদল যুদ্ধবাজ সামরিক অফিসার সামরিক তৎপরতায় ব্যর্থতার জন্য এবং যখন শত্রু রক্ষণাত্মক অবস্থানে ও একটি চূড়ান্ত বিজয় সন্নিকটে এমন মুহূর্তে যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হওয়ায় খোলাখুলিভাবে সরকারের সমালোচনা করে। এই হাতে গোনা কিছু অফিসার কাশ্মীরে যুদ্ধবিরতি ভঙ্গ করে পুনরায় যুদ্ধ শুরু করার পক্ষে ছিল। সামরিক বাহিনীর এই যুদ্ধবাজ অংশই রাষ্ট্রযন্ত্রের সর্বত্র ধারাবাহিকভাবে ছড়িয়ে পড়ে বেসামরিক সমাজকে করায়ত্ত করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল।

ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধংদেহী অবস্থান নেয়ার সময় পাকিস্তান সেনাবাহিনী এ যুক্তি প্রদর্শন করেছিল যে ভারত রাজনৈতিকভাবে পাকিস্তানকে মেনে নিয়েছে কেবল পরবর্তীকালে তাকে সামরিকভাবে বিলোপ করার উদ্দেশ্যে। পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর মতে, পাকিস্তানকে ধ্বংস করাই দুরাত্মা ভারতের লক্ষ্য, যা পাকিস্তানের একমাত্র রক্ষক হিসেবে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর ভূমিকাকে নিশ্চিত করেছিল।

## রাওয়ালপিন্ডি ষড়যন্ত্র মামলা

পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠিত সরকারকে অবৈধ পন্থায় ক্ষমতাচ্যুত করার একটি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার কথা ছিল ১৯৫১ সালের মার্চ মাসে। একদল জ্যেষ্ঠ সামরিক কর্মকর্তা কিছু বিশিষ্ট বেসামরিক ব্যক্তির সহায়তায় এই পরিকল্পনা প্রণয়ন করে।[৪৯] তবে সামরিক ও বেসামরিক কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থানের চমকপ্রদ কাহিনীটিকে একটি তাৎপর্যহীন ঘটনা হিসেবে উড়িয়ে দিয়েছিল। এ বিষয়ে কোন কিছু প্রকাশিত না হওয়ায় ঘটনাটি রহস্যাবৃতই থেকে যায়। এ ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে অনেক কানাঘুষা হলেও জনসমক্ষে কোন বিস্তারিত তথ্য প্রকাশিত হয় নি। যতদূর জানা যায়, আদালতে মামলার বিবরণী শ্রেণীবিন্যাসকৃত হিসেবেই থেকে যায়।

৪৯. ১৯৪৯ সালের জুলাই মাসে এ পরিকল্পনা চালু হয়, যখন বিভিন্ন ধাপ ও পদের অফিসারদের সাথে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ১৯৪৯ সালের জনুয়ারি মাসে প্রশিক্ষণ উপলক্ষে পরিকল্পনার হোতা জেনারেল আকবর খানের যুক্তরাজ্যে গমনের ফলে সাময়িক ব্যাঘাত ঘটলেও আগস্ট মাসে তাঁর প্রত্যাবর্তনের পর পরিকল্পনা পুনরায় চালু হয়।

আকস্মিক ব্যর্থতা সত্ত্বেও এ অভ্যুত্থানপ্রচেষ্টাটি ছিল সামরিক-বেসামরিক বিরোধ এবং সামরিক বাহিনীর অফিসার শ্রেণীর অভ্যন্তরে দলাদলির একটি প্রতিফলন। যদিও সরকার এ ধারণা দেয়ার চেষ্টা করে যে অভ্যুত্থান পরিকল্পনাকারীরা কাশ্মীর বিষয়ে ভারতকে মোকাবেলায় লিয়াকতের অদক্ষতার কারণেই মূলত অভ্যুত্থানের তাগিদ অনুভব করেছিল, বাস্তবে এর স্বরূপ ছিল আরো মারাত্মক। কেননা, অভ্যুত্থানের আদর্শগত এবং রাজনৈতিক ভিত্তি ছিল বৈপ্লবিক এবং পাকিস্তান রাষ্ট্র যে ধারণা ও আদর্শিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। এমনও বলা হয়েছিল যে অভ্যুত্থানপ্রয়াসের বিপ্লবী নেতারা "অন্যান্য সামরিক সংগঠনের গঠনপ্রকৃতি দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিল; যুদ্ধের সময় তারা নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির সংস্পর্শেও এসেছিল"।[৫০] যদিও বৃটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীর মৌলিক কাঠামো ও তার সমাজবিচ্ছিন্নতা পাকিস্তানে বজায় রাখা হয়েছিল এবং অধিকাংশ নতুন পাকিস্তানী অফিসার তাদের বৃটিশ পূর্বসূরিদেরকেই যোগ্য পেশাদারি আদর্শ হিসেবে দেখছিল, রাজনীতি ও আদর্শের ছোঁয়া ক্রমে তাদের মধ্যে স্থান করে নিচ্ছিল। মনে হয়, বিপদের প্রথম সংকেত পেয়েই এমনকি ষড়যন্ত্র পরিপক্ব রূপ নেয়ার পূর্বেই কর্তৃপক্ষ আঘাত হানার সিদ্ধান্ত নেয়।

১৯৫১ সালের ২১ মার্চ আইন পরিষদে এক চাঞ্চল্যকর বিবৃতিতে লিয়াকত আলী খান জানান যে সরকার আবিষ্কার করেছে, সেনাবাহিনীর জ্যেষ্ঠ অফিসারদের একটি দল কমিউনিস্ট ও বিপ্লবীদের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় সহিংস পন্থায় সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্র করেছে।[৫১] লিয়াকত আলী জানান যে ষড়যন্ত্রকারীদের লক্ষ্য ছিল সামরিক ছত্রছায়ায় কমিউনিস্ট পদ্ধতির একটি বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠা।[৫২] প্রত্যক্ষ প্রমাণের ভিত্তিতে প্রধানমন্ত্রী ৭ মার্চ ষড়যন্ত্রের মূল হোতাদের গ্রেফতারের নির্দেশ দেন। এরপর রাওয়ালপিন্ডি ষড়যন্ত্র (বিশেষ ট্রাইবুনাল) আইন পাশ হওয়ার পর সিন্ধুর রাজধানী হায়দ্রাবাদে একটি বিশেষ

---

৫০. Coben, *Pakistan Army,* 161

৫১. অনেক বছর পর অভ্যুত্থানপ্রয়াসের নেতা জেনারেল আকবর সহিংসতা বা হত্যার পরিকল্পনার কথা অস্বীকার করেন। Rizvi, 4

৫২. Pakistan Constituent Assembly, (legislature), Debates, Vol. I, March 21, 1951, P. 34. লিয়াকত আইনসভাকে আরো জানান যে, একটি বিশেষ দেশ থেকে ষড়যন্ত্রকারীদের অর্থনৈতিক ও সংবিধান প্রণয়ন মিশন আমন্ত্রিত হওয়ার কথা ছিল। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, ১৯৫১ সালে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যসংখ্যা ছিল সীমিত এবং অভ্যুত্থানকে তারা কোন অর্থবহ সমর্থন দিতে পারতো না। এখানে আরো উল্লেখ্য যে, তাঁর প্রকাশিত স্মৃতিকথায় আইয়ুব খান অভ্যুত্থানপ্রয়াসের নেতাদের কথিত কমিউনিস্ট যোগাযোগের কথা কিছুই বলেন নি, যদিও তাঁর সকল নথি এবং গোয়েন্দা প্রতিবেদন দেখার সুযোগ ছিল। একইভাবে বৃটিশ জেনারেল ফ্রান্সিস ইনগাল—যিনি অভ্যুত্থান পরিকল্পনাকারীদেরকে ঘনিষ্ঠভাবে চিনতেন, তাঁর প্রকাশিত স্মৃতিকথায় কমিউনিস্ট যোগাযোগের কথা কিছুই উল্লেখ করেননি। বরং তিনি অনুশোচনা করেছিলেন যে, দেশের নবসৃষ্ট পেশাদার সেনাবাহিনী অত্যন্ত যোগ্য ও প্রতিশ্রুতিশীল কয়েকজন অফিসারকে চিরকালের জন্য হারাল। জিন্নাহ ইনগালকে পাকিস্তানের সামরিক একাডেমির প্রথম কমান্ডেন্ট নিয়োগ করেছিলেন।

বেসামরিক ট্রাইবুনাল গঠিত হয়। প্রকৃত বিচারকার্য প্রায় ১৮ মাস স্থায়ী হয় এবং ১৯৫৩ সালের ৫ জানুয়ারিতে ঘোষিত রায়ে অভিযুক্তদেরকে ১ থেকে ১২ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। ১৯৫৫ সালের অক্টোবরে সকল অভিযুক্তকে মুক্তি দেয়া হয়, যখন গভর্নর জেনারেল দণ্ডাদেশের বাকি অংশ মওকুফ করে দেন।

যদিও রুদ্ধদ্বার বিচার অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল, "এটা ছিল সবচেয়ে আলোচিত ও চমকসৃষ্টিকারী মামলা"।[৫৩] এর কারণ, ১৪ জন অভিযুক্তের মধ্যে ছিল পাকিস্তান সেনাবাহিনীর চীফ অব জেনারেল স্টাফ মেজর জেনারেল আকবর খান সহ কয়েকজন জ্যেষ্ঠ জেনারেল। এসব জেনারেলের অনেকেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বীরত্বের জন্য উপাধি পেয়েছিলেন [৫৪] এবং কাশ্মীর যুদ্ধের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বীর ছিলেন। অপর এক অভিযুক্ত— পাকিস্তান টাইমস-এর সম্পাদক এবং বামঘেঁষা বিখ্যাত উর্দু কবি ফয়েজ আহমেদ ফয়েজের গ্রেফতারে নাগরিকদের একাংশ ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। অন্য এক অভিযুক্ত সাজ্জাদ সাহের ছিলেন একজন বামঘেঁষা লেখক।[৫৫]

প্রধানমন্ত্রী আইয়ুবকে ষড়যন্ত্রের বিষয় অবহিত করার পর আইয়ুব অবিলম্বে এ-সম্পর্কে অনুসন্ধান চালান, নিশ্চিত হন এবং সামরিক আদালতে এর বিচার অনুষ্ঠানের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু বেসামরিক ব্যক্তিরা জড়িত থাকায় তা খারিজ করা হয়। বেসামরিক আদালতে বিচারে কয়েকজন জ্যেষ্ঠ সেনা অফিসারকে জেরা করার সময় সোহরাওয়ার্দী স্পষ্টত আক্রমণাত্মক ছিলেন। কিন্তু আদালত তাঁকে বাধা দেয়া থেকে বিরত থাকে। আইয়ুব এতে বেশ ক্ষুব্ধ হন এবং ১৯৫৪ সালে মন্ত্রীপরিষদের এক সভায়[৫৬] সোহরাওয়ার্দীর বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর গুরুতর ক্ষতি করার অভিযোগ এনে বলেন যে সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের বন্ধু নন।[৫৭] মন্তব্যটি যতই তেতো হোক না কেন, ১৯৫৬ সালে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সোহরাওয়ার্দীর দায়িত্ব গ্রহণের পরও আইয়ুব প্রধান সেনাপতি হিসেবে বহাল থেকে যান। ততোদিনে বেসামরিক কর্তৃপক্ষের সাথে আন্তরিক সম্পর্ক হয়ে পড়েছিল কেবল লোকদেখানো ব্যাপার। সামরিক বাহিনী তখন হয়ে পড়ে একটি প্রেইটোরীয় বাহিনী এবং কোন প্রধানমন্ত্রীরই সেখানে হস্তক্ষেপের সুযোগ ছিল না।[৫৮] ১৯৫৮ সালে সফল অভ্যুত্থানের পূর্বে রাওয়ালপিন্ডি ষড়যন্ত্র ছিল একমাত্র ঘটনা, যেখানে সামরিক বাহিনীর একটি অংশ রাজনীতিতে সরাসরি আগ্রহ দেখায়। এটা নিশ্চিতভাবেই

৫৩. Shaista Ikramullah, *Huseyn Shaheed Suhrawardy*, (Karachi 1991), 74.

৫৪. দেখুন, Rizvi, *Military and Politics*, 64

৫৫. দেখুন, Raymond A. Moorre, *Nation Building and the Pakistan Army, 1947-69*, (Lahore 1979), 68, বিরোধীদের সরিয়ে দেয়ার জন্য সামরিক আদালত হতে পারতো একটি পন্থা। কিন্তু মার্শাল থেকে নিবৃত করার মতো যথেষ্ট সেনাসমর্থন আকবরের ছিল।

৫৬. তথাকথিত মেধাবীদের মন্ত্রিসভায় সোহরাওয়ার্দী এবং আইয়ুব উভয়কেই নেয়া হয়েছিল।

৫৭. Mohammad Ayub Khan, *Friends Not Masters*, (London 1967), 37.

৫৮. পাকিস্তানের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করার অভিযোগে ১৯৬২ সালের ৩০ জানুয়ারি তারিখে আইয়ুবের নির্দেশে সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করা হয়। পরবর্তীতে তাঁকে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং ১৯৬৩২ সালের ৫ ডিসেম্বর বৈরুতের একটি হোটেলে তাঁর মৃত্যুর পেছনে কোন অদৃশ্য হাত ছিল বলে বাংলাদেশের কেউ কেউ এখনো সন্দেহ পোষণ করেন।

সেনাবাহিনীর অফিসার শ্রেণীর মধ্যে একটা শিথিল ভাবের ইঙ্গিত দেয় এবং আইয়ুব প্রথম সুযোগেই সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা কঠোরতর করেন এবং যেসব অফিসারের আনুগত্য সন্দেহজনক ছিল তাদেরকে বহিষ্কার করেন। প্রতিরক্ষা বাহিনীতে নিরাপত্তা এবং গোয়েন্দা ব্যবস্থাও জোরদার করা হয়। কিন্তু রাওয়ালপিন্ডি ষড়যন্ত্রের ঝামেলাপূর্ণ অবস্থা কাটিয়ে উঠতে সেনাবাহিনীর বেশ কিছুদিন সময় লেগে যায়। পরবর্তীতে সামরিক-বেসামরিক রাজনৈতিক সংযোগের সম্ভাবনা প্রতিরোধ করতে সামরিক বাহিনীকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়, যে সমাজকে ঘিরেই ছিল তাদের সেবার পরিধি। এরপর সামরিক বাহিনীর জন্য এমন একটি নিয়োগবিধি প্রণীত হয়, যার মাধ্যমে রাজনীতিসচেতন ব্যক্তিদেরকে অফিসার শ্রেণীতে প্রবেশ করতে দেয়া হতো না। রাওয়ালপিন্ডি ঘটনায় অপাতদৃষ্টিতে সামরিক বাহিনী বেসামরিক প্রশাসনের প্রতি অনুগত থাকে, কিন্তু তাদের বিবেচ্য বিষয়ের পরিধি শীঘ্রই বেসামরিক অঙ্গনে বিস্তৃত হয়। এমনকি আইয়ুব খান, যিনি ষড়যন্ত্রকারীদের ধিক্কার দিয়েছিলেন, তিনিও পরবর্তীকালে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ বেসামরিক সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে আকবর খানের সুশৃঙ্খল সরকার গঠনের আকাঙ্ক্ষার প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন।[৫৯] ঘটনাটি নিশ্চিতভাবেই ছিল শাসনকার্য পরিচালনায় বেসামরিক কর্তৃপক্ষের দক্ষতার ব্যাপারে সামরিক বাহিনীর প্রশ্ন তোলার একটি সুযোগ। ষড়যন্ত্রকারীরা চেয়েছিল একটি দুর্নীতিমুক্ত স্বচ্ছ সরকার প্রতিষ্ঠা করতে। সামরিক বাহিনীও সেসময় থেকে যখনই হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন বোধ করেছে, তখনই এই মহান লক্ষ্যের আড়ালে আত্মগোপন করেছে।

**পাঞ্জাব গোলযোগ, ১৯৫৩**

সামরিক শাসন জারির মাধ্যমে সামরিক বাহিনী কর্তৃক বেসামরিক শাসনক্ষমতা দখলের সবচেয়ে মোক্ষম সুযোগ এসেছিল ১৯৫৩ সালের মার্চ মাসে, যখন আহমদীয়াবিরোধী ধর্মীয় রাজনৈতিক সংঘাত পাঞ্জাবে ব্যাপক সহিংসতার জন্ম দেয়। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সরকারের ব্যর্থতার পর সামরিক বাহিনীকে ডাকা হয় এবং কয়েকদিনের মধ্যেই শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। বেসামরিক প্রশাসন পরিচালনায় সেনাবাহিনী পাঞ্জাবে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল এবং যে অকুণ্ঠ জনসমর্থন পেয়েছিল তার ফলে বেসামরিক বিষয়াদি ব্যবস্থাপনায় সামরিক বাহিনীর আত্মবিশ্বাস জন্মে। বিদেশী আক্রমণ থেকে বহিঃসীমান্ত সুরক্ষা ছাড়াও অভ্যন্তরীণ ভাঙন রোধে যে সামরিক বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, লাহোরের ঘটনাপ্রবাহ সে ব্যাপারে এক নতুন বোধোদয় সঞ্চার করে।

পাঞ্জাব গোলযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল আহমদীয়া নামে পরিচিত ভিন্ন মতাবলম্বী মুসলিম গোষ্ঠীর প্রতি গোঁড়া সুন্নি মুসলমানদের একটি অংশের বৈরিতা।[৬০] পাঞ্জাবের পূর্ব

৫৯. Ayub Khan, *Friends Not Masters*, 38.
৬০. যদিও এটা একটি পৃথক ধর্মীয় বিশ্বাস ছিল, এটাকে বাহাই এবং এক ঘরনের গোঁড়া শিয়াদের অনুরূপ বলে বিবেচনা করা হতো।

ও মধ্যাঞ্চলে কেন্দ্রীভূত এই গোষ্ঠীর সংখ্যা ছিল প্রায় ২ লক্ষ। অবস্থাপন্ন আহমদীয়া সম্প্রদায়ে স্যার মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খানের মতো কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ছিলেন। স্যার জাফরুল্লাহ সেসময় ছিলেন পররাষ্ট্র বিষয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। আহমদীয়া মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭৯ সালের দিকে। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কাদিয়ানের মির্জা গোলাম আহমদ (১৮৩৯-১৯০৮), যিনি নিজেকে একজন নবী এবং মাহদী হিসেবে দাবি করেন। এই দাবির ফলে গোষ্ঠীটিকে কট্টরপন্থীরা ধর্মদ্রোহী আখ্যায়িত করেছিল। আহমদীয়াবিরোধী উত্তেজনার সূচনা করেছিল মজলিস-ই-আহরার নামের একটি সামাজিক প্রগতিশীল কিন্তু ধর্মীয় মৌলবাদী গোষ্ঠী। আলেমদের নেতৃত্বাধীন এই বৃটিশবিরোধী মুসলিম জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠী আদিতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সাথে জোটবদ্ধ থাকলেও পরবর্তীকালে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেও তারা তাদের মুসলিম লীগ বিরোধী অবস্থান বজায় রাখে এবং ডোগ্রা মহারাজার শাসনে বঞ্চনা ও বৈষম্যের শিকার কাশ্মিরী মুসলমানদের সমর্থনে বিক্ষোভের আয়োজন করে। আদিতে পাকিস্তান সৃষ্টির বিরোধী হলেও নিজেদের পুনর্বাসনের প্রয়াসে আহরারেরা এই মর্মে দাবি জানায় যে আহমদীয়াদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করতে হবে এবং সকল দায়িত্বশীল পদ থেকে অপসারণ করতে হবে। বিক্ষোভকারীরা যুক্তি দেখায় যে এসকল পদক্ষেপের মাধ্যমে সরকার ইসলামের প্রতি তাদের অঙ্গীকার পালন করতে পারবে। অতীতে পাকিস্তানের বিরোধিতা করেছিল এমন অনেক উলেমাগোষ্ঠী এতে যোগ দেয়ায় আহমদীয়াবিরোধী আন্দোলন দ্রুত বেগবান হয়।[৬১] এসকল ধর্মীয় নেতা ১৯৫২ সালের জানুয়ারি মাসে করাচীতে নিখিল পাকিস্তান মুসলিম দলসমূহের একটি সম্মেলনের আয়োজন করে। এমনকি কিছু জ্যেষ্ঠ সরকারি কর্মকর্তাও সম্মেলনে যোগ দেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত তালিমায়াত-ই-ইসলামিয়ার সচিব এবং দুজন সদস্য।[৬২] আহমদীয়াবিরোধী আন্দোলন ধূমায়িত হয়েছিল ১৯৫২ সালের শেষ দিকে খাদ্য পরিস্থিতির অবনতি, প্রদেশে সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক অসন্তোষ, প্রশাসন পরিচালনায় মুসলিম লীগ সরকারের ব্যর্থতা এবং সাধারণভাবে একটি সরকারবিরোধী মনোভাব জাগ্রত হওয়ার প্রেক্ষাপটে। আহমদীয়া আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারের বিরুদ্ধে ধূমায়িত অসন্তোষেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল। যদিও আহমদীয়াদের প্রতি বিদ্বেষ ১৯৫৩ সালের পূর্বেও বিদ্যমান ছিল, আহমদীয়াদেরকে কেন্দ্র করেই সরকারের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত অভাব-

৬১. মওদুদির নেতৃত্বাধীন জামায়াত-ই-ইসলামী পাঞ্জাবের বিক্ষোভকে সমর্থন
মাসালা (আহমদীয়া প্রশ্ন) নামক তাঁর প্রকাশিত বইয়ে বিক্ষোভের পক্ষে যুক্তি দেখানো হয়। আহরারের উস্কানিমূলক তৎপরতার চেয়েও জামায়াতের সমর্থনকে সরকার আরও বিপজ্জনক ও অনিষ্টকর মনে করেছিল। Syed Vali R. Nasr, *Maududi and the Making of Islamic Revivalism,* (New York: 1996), 43

৬২. দেখুন, *Report of the Court of Inquiry to Inquire into the Punjab Disturbances of 1953* (Lahore 1954), 127. এ রিপোর্টকে সাধারণত *মুনির রিপোর্ট* হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

অভিযোগের অনুভূতি ১৯৫৩ সালে দানা বেঁধে উঠেছিল। পাঞ্জাবে মুসলিম লীগের মূল ভিত্তি ছিল জমির মালিকশ্রেণী। যেহেতু তাদের রাজনৈতিক আচরণে ইসলামী আবেগের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল, এটা প্রকাশের সুযোগও তারা সর্বদা খুঁজতো। ফলে আহমদীয়াবিরোধী আন্দোলন সহজেই তাদের সমর্থন পেয়েছিল। এক শ্রেণীর মধ্যবিত্ত এবং শহুরে সমাজবাদীও আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল।

ইসলামের কখনোই একক স্তম্ভ ছিল না, তবে *পাকিস্তান আন্দোলন* সাময়িকভাবে হলেও গোষ্ঠীগত মতানৈক্যকে ঢেকে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্র অর্জিত হওয়ার পরই জাতিগত এবং আঞ্চলিক পার্থক্যের পাশাপাশি ধর্মীয় উপদলীয় কোন্দলও ছড়িয়ে পড়ে। মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং তৃণমূল পর্যায়ের সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তোলার ব্যাপারে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করলে মৌলবাদীরা জনগণের উপর তাদের প্রভাব খাটানোর সুযোগ পেতো না। এতে করে আহমদীয়াদের বিরুদ্ধে সহিংস বিক্ষোভ এড়ানো যেতো অথবা অতি দ্রুত তা দমন করা যেতো। জিন্নাহ পাঞ্জাবের মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার অব্যবস্থাপনার জন্য এত ক্ষুব্ধ ছিলেন যে তিনি তাদের অনেকের সাথে সম্পর্ক চুকিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, যারা কয়েক দশক যাবৎ ষড়যন্ত্র ও হানাহানিতে রত ছিল এবং প্রায়শই বিরোধপূর্ণ মালিকানাধীন সম্পত্তি থেকে গবাদি পশু চুরিতে লিপ্ত হতো।[৬৩]

আহমদীয়াদের বিরুদ্ধে প্রাথমিক বিষোদগার শুরু হয় ১৯৫৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে করাচীতে, যখন এই ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক জনসভা ও মিছিলের আয়োজন করা হয়। এরপর প্রাণহানিসহ কয়েকটি নোংরা ঘটনা ঘটে। যখন ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে একটি *ডাইরেক্ট এ্যাকশন* দিবসের ডাক দেওয়া হয়, তখন গোলযোগ এড়াতে শক্তি প্রদর্শনের লক্ষ্যে সেনাবাহিনীকে ডাকা হয়। কিন্তু পাঞ্জাবে গোলযোগ অব্যাহতই থাকে; অধিকাংশ জেলাশহরেই বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। তবে পুলিশ মোটামুটিভাবে পরিস্থিতি শান্ত রাখতে সক্ষম হয়। ইতিমধ্যে লাহোরে পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটে এবং বেসামরিক সরকার তা নিয়ন্ত্রণের তেমন একটা চেষ্টাও করে নি। তখন দশ সহস্রেরও অধিক ক্ষিপ্ত জনতা নগরীর চারদিকে ঘুরে বেড়াতো এবং পুলিশকে আক্রমণসহ সরকারি ও বেসরকারি সম্পত্তি ধ্বংস করতো। মসজিদে আহমদীয়াদেরকে আক্রমণ করার জন্য ধর্মোপদেশ প্রচারিত হতো এবং সরকারের বিরুদ্ধে উগ্র বিক্ষোভমিছিলও অব্যাহত থাকতো। ৬ মার্চের মধ্যে দেয়ালঘেরা শহরের অংশবিশেষ জ্বালিয়ে দেয়া হয়, রেললাইন কেটে ফেলা হয়, বাণিজ্যিক ভবনগুলোতে হামলা চালানো হয় এবং সরকারি দপ্তরগুলো

৬৩. দেখুন, Khalid B. Sayeed, *Politics in Pakistan : the Nature and Direction for Change*, (New York 1980), 36. ১৯৪৭-৪৯ সময়কালে পাঞ্জাবের বৃটিশ গভর্নর স্যার ফ্রান্সিস মুডির সাথে লেখকের ব্যক্তিগত যোগাযোগ।

অচল হয়ে পড়ে। বাস্তবে লাহোর নগরী হয়ে পড়ে নিশ্চল। কিন্তু নগরী যখন পুড়ছিল, তখন মুখ্যমন্ত্রী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পরিবর্তে একটি বিবৃতি প্রদান করলেন, যার মাধ্যমে তিনি বিক্ষোভকারীদের এ দাবিই মেনে নিলেন যে আহমদীয়াদেরকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ঘোষণা করা উচিত এবং জাফরুল্লাহ খানের মতো আহমদীয়া নেতাদের বরখাস্ত করা উচিত। অবশ্য একই দিনে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে সামরিক আইন জারি এবং আইন-শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়। মেজর জেনারেল আজম খান, যিনি পরবর্তীতে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর নিযুক্ত হয়েছিলেন, তাঁকে নিযুক্ত করা হয় প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক পদে। লাহোর নগরীকে ছয়টি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয় এবং প্রতিটি অঞ্চলের জন্য নিযুক্ত হয় একজন সামরিক আইন প্রশাসক। সৈন্য নামানোর সাথে সাথে সান্ধ্য আইন জারি, সড়ক অবরোধ ও চেক পয়েন্ট স্থাপন এবং সংবাদ ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে সেন্সরশীপ আরোপ করা হয়। সামরিক আদালত চালু হয়। বারো জনের মতো নিহত এবং কয়েকশত আহত হওয়ার ঘটনাও ঘটে।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিনের সফরের পর মার্চের শেষ দিকে পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী মিয়া মমতাজ খান দৌলতানা পদত্যাগ করেন। কিন্তু নাজিমউদ্দিন নিজেই এরপর গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ কর্তৃক বরখাস্ত হন। তিনি নিঃসন্দেহে ক্ষমতার লড়াইয়ে পাঞ্জাবী দলাদলির শিকার হলেন।

১১ মার্চের মধ্যে নগরী আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলো। সেনাবাহিনী আবার নগরীর নিয়ন্ত্রণ বেসামরিক প্রশাসনের নিকট হস্তান্তর করে ব্যারাকে ফিরে যেতে প্রস্তুত হলো। কিন্তু কেন্দ্র দ্বিমত পোষণ করলো। এছাড়া সেনাবাহিনীকে ক্ষমতায় বহাল রাখার জন্য গণদাবিও ছিল।[৬৪] কয়েকদিন পর ২৩ মার্চ তারিখে পুনরায় সামরিক শাসন শুরু হয়, যাকে বলা যায় "লাহোরে দ্বিতীয় পর্যায়ের সামরিক শাসন"।[৬৫] এ সময় প্রশাসনের ক্ষমতা বৃদ্ধি, চোরাচালানি ও অন্যান্য সমাজবিরোধী কার্যকলাপ রোধ, বিবাহ ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে মাত্রাতিরিক্ত ব্যয় হ্রাস এবং জনগণের মধ্যে নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এছাড়া সামরিক প্রশাসন নগরীকে পরিষ্কার করে, সড়ক প্রশস্ত করে, পয়ঃপ্রণালী উন্নত করে, নতুন বিপণিকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে এবং প্রচুর নাগরিক সুবিধা সংযোজন করে। এসকল ত্বরিত পদক্ষেপ নেয়া হলো সামরিক বাহিনীর প্রতি জনসমর্থনের স্ফূরণ ঘটাতে। বাস্তবেও সেদিকে ব্যাপক অগ্রগতি অর্জিত হলো।

সামরিক আইন প্রশাসনের ব্যাপক জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করে বেসামরিক কর্তৃপক্ষ ১৯৫৩ সালের ১৫ মে তারিখে সামরিক আইন প্রত্যাহার করে এবং সৈন্যবাহিনীকে ব্যারাকে

৬৪. Raymond A. Moore, *Nation Building and the Pakistan Army,* (Lahore: 1979), 73.

৬৫. Fazal Muqueem Khan, *The Story of the Pakistan Army,* (Karachi : 1963), 186.

ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। সেনাবাহিনী বেসামরিক জনজীবনের সাথে তার এই স্বল্পকালীন মোকাবেলাতেই জনমনে প্রবলভাবে রেখাপাত করে এবং তার সাফল্যে নিজেই বিস্মিত হয়। সামরিক শাসন ছিল দক্ষ, সুশৃঙ্খল এবং প্রদত্ত সময়ের মধ্যেই উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম। প্রথম সামরিক শাসনের এই সাফল্যের অভিজ্ঞতা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ জনগণ ক্রমেই রাজনীতিকদের ব্যাপারে নিরাসক্ত হয়ে পড়ে, যারা অব্যাহতভাবে জনগণের স্বার্থকে উপেক্ষা করে নিজেদের মধ্যে বিবাদ ও চক্রান্তে লিপ্ত ছিল। জনগণ শীঘ্রই দেশোদ্ধারের জন্য আইয়ুবের মতো শক্ত মানবের নেতৃত্বাধীন সামরিক বাহিনীকে সমর্থন দিতে শুরু করলো। কিন্তু যেটা লক্ষ্য করা হলো না সেটা হলো, সামরিক আইনের অধীনে সামরিক বাহিনীর নিজের কাছে ছাড়া অন্য কারো কাছে জবাবদিহিতা থাকে নি। সামরিক বাহিনী শাস্তির ভয় ব্যতিরেকে এবং বেসামরিক রীতি বা বিচারপ্রক্রিয়া দ্বারা সীমাবদ্ধ না থেকে তার কার্যাবলী সম্পাদন করতে গিয়ে একক হুকুম ও নিয়ন্ত্রণকাঠামোর মাধ্যমে যুদ্ধের অনুরূপ পরিস্থিতিতে দ্রুত লক্ষ্য অর্জন করতে পারে, কিন্তু যে-কোন সামাজিক-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনব্যবস্থায় তার দীর্ঘকাল জড়িত থাকা নিশ্চিতভাবেই হিতে বিপরীত হতে বাধ্য। অধিকন্তু, লাহোরের অভিজ্ঞতা ছিল স্বল্প সময়ের জন্য, একটি ক্ষুদ্র এলাকার গণ্ডিতে আবদ্ধ এবং সুনির্দিষ্ট কর্মকেন্দ্রিক।

রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং মুসলিম লীগ দলীয় সরকার যে সংকটকালীন পরিস্থিতি মোকাবেলায়, এমনকি দৈনন্দিন প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ, লাহোরের ঘটনাবলী সে সত্যকে উন্মোচন করে দেয়। জাতীয় মঞ্চ থেকে জিন্নাহ এবং লিয়াকতের মতো দু'জন শ্রদ্ধাভাজন ও সক্ষম শক্তমানবের বিদায়ের পর মুসলিম লীগ নেতৃত্ব জাতীয় জীবনে বেসামরিক নিয়ন্ত্রণ ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সুশাসন কায়েমের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়। নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে তারা গোলযোগের সময় নিজেদেরকে উদ্ধারের জন্য সেনাবাহিনীর শরণাপন্ন হতে থাকে, যার ফলে সামরিক হস্তক্ষেপের প্যান্ডোরার বাক্সটিই উন্মুক্ত হয়ে যায়। আপাতদৃষ্টিতে বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে সহায়তা দান করার জন্যই সামরিক বাহিনী লাহোরে গিয়েছিল। কিন্তু তাদের সাফল্যের প্রেক্ষাপটে তাদেরকে প্রত্যাহারের সময় তারা জাতীয় মঞ্চের কেন্দ্রবিন্দুতে সামরিক বাহনীকে নিয়ে আসার ফন্দি আঁটতে থাকে। সরকারি কর্তৃত্ব বজায় রাখার ক্ষেত্রে সামরিক বাহিনী নিজেদেরকে অত্যাবশ্যক মনে করতে থাকে এবং দূর্বল কর্তৃপক্ষকে প্রতিস্থাপন করা তাদের জন্য সুবিধাজনক কিনা সেটাও বিবেচনা করা শুরু করে। সামরিক বাহিনী নিঃসন্দেহে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক অঙ্গনে বেসামরিক শ্রেষ্ঠত্বের বৃটিশ ঐতিহ্য উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিল, কিন্তু বেসামরিক নেতৃত্বই সে ঐতিহ্য বিনষ্ট করলো। অধিকন্তু পাঞ্জাব গোলযোগের একটি ফল ছিল এই যে, তা "সাংবিধানিক বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত" করেছিল[৬৬], যা সামরিক বাহিনীর জন্য সুবিধাজনক ছিল।

৬৬. Syed Vali R. Nasr, *Maududi and the Making of Islamic Revivalism,* (New York: 1996), 43.

১৯৬৮ সালের শেষে এবং ১৯৬৯ সালের শুরুতে এটা পরিষ্কার হয়ে উঠলো যে শাসকগোষ্ঠী প্রধানত পাঞ্জাবী বেসামরিক আমলাতন্ত্র এবং উদ্যোক্তাশ্রেণীর সাথে সুদক্ষভাবে আঁতাত গড়ে তুলতে পারলেও গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরা মূলত শহর অঞ্চলে যে শক্ত চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিল তা মোকাবেলা করতে তারা অক্ষম। ১৯৬৯ সালের মার্চে আইয়ুব কর্তৃক জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের পর সামরিক-বেসামরিক সম্পর্ক একটি নতুন ক্রান্তিলগ্নে পৌঁছে। প্রাথমিকভাবে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর ইয়াহিয়া শীঘ্রই নিজেকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা করলেন, সংবিধান বাতিল করলেন, মৌলিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠানটিকে বর্জন করলেন এবং পশ্চিম পাকিস্তানকে একক ইউনিট করার পূর্বে যে চারটি প্রদেশ ছিল সেগুলো পুনরুজ্জীবিত করলেন। তিনি রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আলোচনায়ও বসলেন এবং প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে শীঘ্রই জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রতিশ্রুতি দিলেন। কথা ছিল, জাতীয় পরিষদ সংবিধান প্রণয়ন করবে। পূর্ব পাকিস্তানকে তুষ্ট করার জন্যও ইয়াহিয়া কিছু অঙ্গীকার করলেন, যেগুলোতে স্বায়ত্তশাসন প্রদানের কথা থাকলেও তা অস্পষ্টতার আবরণে ঢাকা ছিল।

মন্ত্রিসভায় সামরিক ব্যক্তিদের আধিক্য থাকলেও ইয়াহিয়া কিছু বেসামরিক সদস্যও নিয়েছিলেন, তবে সামরিক আইন প্রশাসকদের একটি কমিটি সরকারের সকল বেসামরিক কাঠামোর উপরে সক্রিয় ছিল। ইয়াহিয়ার ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টারা ছিলেন জেনারেলদের একটি দল, যারা অন্ধের মতো উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে। পূর্ববর্তী শাসকগোষ্ঠী বেসামরিক পোষাক পরে সরকারের উপর সামরিক নিয়ন্ত্রণকে আংশিকভাবে আড়াল করতে পেরেছিল, কিন্তু নতুন শাসনব্যবস্থায় সামরিক ব্যক্তিরা বেসামরিক আমলাতন্ত্রকে খোলামেলাভাবে প্রতিস্থাপন করায় বেসামরিক আমলাতন্ত্রের সাথে তাদের জোটবদ্ধতায় টানাপড়েন দেখা দেয়।

১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে একটি বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা পুনরায় অর্জিত হয়। এরপর ইয়াহিয়া সামরিক বাহিনী ও জেড. এ. ভূট্টোর সমর্থন নিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী দল আওয়ামী লীগের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া থামিয়ে দেন। যে মুহূর্তে প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্রে উত্তরণের জন্য পাকিস্তান প্রস্তুত ছিল, সে মুহূর্তেই সামরিক বাহিনী তাদের প্রভাব হারানোর আশংকায় পুরো প্রক্রিয়াকেই নস্যাৎ করে দেয়। ভূট্টোর সহযোগিতা সামরিক বাহিনীর হাতকে আরো শক্তিশালী করলো। পশ্চিম পাকিস্তানের বৃহত্তম দলটির পূর্ণ সমর্থন পেয়ে সামরিক বাহিনীর পক্ষে পূর্ব পাকিস্তানে সন্ত্রাস ও নিপীড়ন চালানো সহজতর হয়ে উঠলো।

## উপসংহার

এ অধ্যায়ের সময়কাল বিবেচনায় রেখে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী সম্পর্কে যে-কোন সমীক্ষাকে দুটি ভিন্ন প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এর একটি পশ্চিম পাকিস্তানী প্রেক্ষিত ও অন্যটি পূর্ব পাকিস্তানী প্রেক্ষিত। এ দুয়ের মধ্যে সাধারণ ভিত্তি ছিল বিরল। আগেই বলা হয়েছে, বাঙালিরা পাকিস্তান সামরিক বাহিনীকে দেশপ্রেমের দৃষ্টিতে না দেখে সন্দেহের চোখে দেখতো। পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের অধিকাংশই যেখানে নিজেদেরকে সামরিক বাহিনীর সাথে এক করে দেখতো, সেখানে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের সাধারণ মনোভাব ছিল বিপরীত। পশ্চিম পাকিস্তানের নিরাপত্তাচাহিদা এবং প্রতিরক্ষা ধ্রুবক যে পূর্ব পাকিস্তানের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নতর ছিল তার উপরও বিশেষ জোর দেয়া প্রয়োজন। কাশ্মীর ও ভারত পশ্চিম পাকিস্তানীদের মনোযোগ আকর্ষণ করতো, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে এগুলো ছিল প্রান্তিক আগ্রহের বিষয়। এখানে আরো লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে সামরিক শাসকদের ক্ষমতার সহযোগী বেসামরিক আমলাতন্ত্র এবং শিল্পপতি-ব্যবসায়ীদের ঘাঁটি ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে।

বৃটিশ ভারতীয় সামরিক বাহিনীর উত্তরসূরি হিসেবে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী বেসামরিক কর্তৃপক্ষের অধীনে কাজ করার অপরিহার্য মূল্যবোধ উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিল। কিন্তু স্বাধীনতার কিছুদিন পরেই পাকিস্তান সামরিক বাহিনী ঐ বৃটিশ ঐতিহ্য পরিত্যাগ করে এবং ক্ষমতা দখলের পথে ধাবিত হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় পাকিস্তান আন্দোলনের সাথে জড়িত হওয়ার বা একে সমর্থন প্রদানের কোন রেকর্ড না থাকায় সামরিক বাহিনী ভারতীয় আগ্রাসন থেকে দেশকে রক্ষা এবং ভারতীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে মুসলিম কাশ্মীরকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা নতুন করে তুলে ধরার বাধ্যবাধকতা অনুভব করে। কাশ্মীর রাজ্যটিকে সামরিক আগ্রাসনের মাধ্যমে দখল করে ইসলামী আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত করেই সে লক্ষ্য অর্জনের প্রয়াস চালানো হয়। রাজনৈতিক নেতৃত্বের মৌন সম্মতি নিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কাশ্মীরে এই হঠকারী অভিযান সামরিক বাহিনীকে রাষ্ট্রীয় মঞ্চের কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করে। এর ফলে আর্থ-সামাজিক খাতসমূহের উন্নয়নে একান্ত প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ হ্রাস করে রাষ্ট্রীয় সম্পদের এক বিরাট অংশ সামরিক প্রয়োজনে ব্যয় করতে তারা সক্ষম হয়।

শ্রেয়তর অস্ত্রে সজ্জিত এবং একটি শক্তিশালী অর্থনীতির সহায়তাপুষ্ট ভারতের বৃহৎ প্রতিরক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে অরক্ষিত থাকা সত্ত্বেও সামরিক বাহিনী কাশ্মীরের ব্যাপারে আক্রমণাত্মক নীতি অনুসরণ করে। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ইসলামকে রক্ষা ও এর পক্ষে প্রচারণা ছাড়াও বহির্বিশ্বে ইসলামের স্বার্থ সংরক্ষণে পাকিস্তান রাষ্ট্রের আগ্রহ তুলে ধরে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা প্রেক্ষাপটকে দক্ষতার সাথে বহির্মুখী করা হয়েছিল। এতে দু'ধরনের ফল পাওয়া যায়। পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের কাছ থেকে ব্যাপক সমর্থন আসে, যাদের

ভারতভীতিকে গোঁড়া ধর্মীয় নেতৃত্বের সহায়তায় সামরিক বাহিনী অব্যাহতভাবে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলছিল।[৬৭] ধর্মনিরপেক্ষ ও প্রগতিশীলদের বিপরীতে ধর্মীয় গোষ্ঠী রাষ্ট্রকে গোঁড়া ইসলামী কায়দায় গড়ে তুলতে মনে-প্রাণে আগ্রহী ছিল। পাকিস্তানী বাহিনী ভারতীয় বাহিনীর চেয়ে নৈতিক দিক দিয়ে শক্তিশালী বলে একটি ভ্রান্ত ধারণা পাকিস্তান সামরিক বাহিনী পোষণ করতো। তবে বাঙালিরা যেমন কাশ্মীর মুক্ত করার জন্য *ডন কুইকসোটতুল্য* তাড়নার সাথে একাত্ম ছিল না, তেমনি ইসলামের আবেগময় রাজনৈতিক আবেদনের ব্যাপারেও তারা খুব একটা উৎসাহী ছিল না।

শীতল যুদ্ধবলয়ে পাকিস্তানের অবস্থানের সূত্র ধরে বহির্মুখিতার আরেকটি মাত্রা যুক্ত হয়েছিল। সোভিয়েত সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে একটি শক্ত ঘাঁটি বলে বিবেচনা করে পশ্চিমা মিত্ররা পাকিস্তানের সাথে একের পর এক প্রতিরক্ষাচুক্তি স্বাক্ষর করে। এর ফলশ্রুতিতে পাকিস্তানকে যে অর্থনৈতিক ও সামরিক সহায়তা প্রদান করা হয়, তাতে করে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর হাতে প্রচুর সম্পদ ও জনবল চলে আসে। তাই রাজনৈতিক নেতৃত্বের দুর্বলতার পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণে সামরিক বাহিনীকে খুব একটা বেগ পেতে হয় নি। ফলে অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক উভয় উপাদানই বেসামরিক কর্তৃপক্ষের তুলনায় সামরিক বাহিনীকে সুবিধাজনক অবস্থানে নিয়ে আসে। বেসামরিক কর্তৃপক্ষ উদ্যোগ হারিয়ে ফেলে এবং আসন্ন বিপরীত ভূমিকায় সামরিক নেতৃত্বের তুলনায় গৌণ হয়ে পড়ে।

পাকিস্তানকে প্রদত্ত মার্কিন সামরিক সাহায্য সামরিক-বেসামরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছিল। এটা নিশ্চিতভাবেই পাকিস্তানের সামরিক অস্ত্রবল সম্প্রসারিত ও শক্তিশালী করেছিল। কিন্তু এর ফলে পাকিস্তানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় বাঙালিরা যে পর্যাপ্ত নিয়ন্ত্রণক্ষমতার অধিকারী নয় এ উপলব্ধি তীব্রতর হয়েছিল, কারণ বিদেশী সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য থেকে উদ্ভুত অধিকাংশ সম্পদই পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যবহৃত হতো। এ সম্পদ ছিল সামরিক বাহিনীর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বিশাল বাজেটবরাদ্দের অতিরিক্ত, যা মূলত পশ্চিম পাকিস্তানেই বিনিয়োজিত হতো।

পাকিস্তান সামরিক বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। জনগণ থেকে সামগ্রিকভাবে পৃথক থাকার ফলে একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে সামরিক বাহিনী কার্যকরভাবে ভূমিকা রাখতে পারে নি। যোদ্ধাশ্রেণীর অনুকূলে বৃটিশ নিয়োগনীতি অব্যাহত রাখার ফলে রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এবং পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রার সিংহভাগ অর্জনকারী বাঙালিদের কোন তাৎপর্যপূর্ণ প্রতিনিধিত্ব পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে ছিল না।

৬৭. ভারতের মোকাবেলা করতে গিয়ে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী মধ্যযুগীয় ইসলামী অনুশাসন *জিহাদের* ধারণার শরণাপন্ন হতো—যা ছিল অনন্তকাল যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার মতবাদ। এতে প্রতিটি যুদ্ধ বিরতি বা সন্ধিকে শান্তির পরিবর্তে সাময়িক বিরতি মনে করা হতো।

চূড়ান্ত বিশ্লেষণে, পাকিস্তানের রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপের কোনো কারণ চিহ্নিত করা যায় না। তবে সম্ভবত প্রধান কারণ ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যর্থতা। রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছিল। যে মুসলিম লীগ পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিল, উভয় প্রদেশে কেবল সেই মুসলিম লীগেরই অনুসারী ছিল। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের পর পূর্ব পাকিস্তান থেকে সে দলটি অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর পাকিস্তানকে একসাথে জুড়ে রাখার মতো কোন বিকল্প রাজনৈতিক দলের উদ্ভব ঘটে নি। ১৯৫৪ সাল থেকে আঞ্চলিকতা ব্যাপ্তি পেতে থাকে এবং মূলত পশ্চিম পাকিস্তানী সংগঠন সামরিক যন্ত্রের দ্বারা এ প্রক্রিয়া আরো তীব্রতর হয়।

রাষ্ট্রের শাসনকার্যে পেশাজীবী রাজনীতিবিদদের ব্যর্থতা ছাড়াও শীতল যুদ্ধ এবং কাশ্মীরের মতো বাহ্যিক উপাদানসমূহ অবস্থার অবনতিতে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখে। সেনাবাহিনী তখন রাজনৈতিক শূন্যতা পূরণে প্রবৃত্ত হয়। এ প্রক্রিয়ায় বাস্তবতার সাথে সঙ্গতি রেখে তারা আত্মকেন্দ্রিক আমলাতন্ত্র এবং ব্যবসা ও বাণিজ্যিক স্বার্থগুলোকে সাথে নিয়ে ক্ষমতা ভাগাভাগি করে।



# রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় নৃগোষ্ঠী

আমেনা মোহসীন*

রাজনৈতিক ভৌগোলিক সীমানা নির্ধারণ এবং রাজনৈতিক পরিচিতি বিনির্মাণ হচ্ছে আধুনিক রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়ার এক অপরিহার্য ফলশ্রুতি বা অনুসিদ্ধান্ত। এটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে অথবা রাষ্ট্র ব্যতিরেকে ঘটতে পারে। উপরোক্ত প্রথম উপাদানটি সহজে বোধগম্য, তবে দ্বিতীয়টির জন্য আবশ্যক আধুনিক রাষ্ট্রের সক্রিয়তা ও রাজনীতি অনুধাবন। যা হোক, এ প্রক্রিয়াটি স্বাভাবিকভাবে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করে এবং বিশেষ জনগোষ্ঠীর আধিপত্যকে প্রাধান্য দেয়। কোন একটি গোষ্ঠীর রাজনৈতিক পরিচিতি নির্মাণের অর্থ হলো এই গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়কে অন্যগুলো থেকে পৃথক করে দেখা। জাতীয়তাবাদী ধারণার[১] উপর প্রতিষ্ঠিত আধুনিক রাষ্ট্র প্রভাবশালী বা সংখ্যাগুরু গোষ্ঠীর প্রতি পক্ষপাতমূলক অবস্থান গ্রহণ করে এবং এর পরিণতি হচ্ছে দুর্বল গোষ্ঠীর উপর সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রভাবশালী গোষ্ঠীর আধিপত্য। এ অবস্থার স্বাভাবিক পরিণতি হচ্ছে রাষ্ট্র কর্তৃক এমন কিছু মূলনীতি বা উন্নয়নমডেল তৈরি করা, যা দুর্বল সম্প্রদায়গুলোকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে এবং প্রান্তিক পর্যায়ে নিয়ে যায়। ফলে এক সময়ে দুর্বল গোষ্ঠীগুলো নিজেদের জন্য নতুন রাজনৈতিক পরিচিতি নির্মাণ ও দাবি করতে গিয়ে

* অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. অতিরিক্ত ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, আমেনা মোহসীন এবং ইমতিয়াজ আহমেদ, "Limits of the Nationalist Discourse: The Age of sub-State Nationalism", *Theoretical Perspecives, Vol 3, 1998*..

সংখ্যাগরিষ্ঠ গোষ্ঠীর বাকভঙ্গি ও রাজনীতি অবলম্বন করে। এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যখন আমরা বাংলাদেশের সংখ্যালঘু এথনিক গোষ্ঠীর অবস্থান বিশ্লেষণ করতে যাই। এ প্রবন্ধের লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশের এথনিক গোষ্ঠীগুলোর প্রান্তিকীকরণ প্রক্রিয়ার চিত্র তুলে ধরে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে তাদের বর্তমান সংকটময় অবস্থা সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোকপাত করা।

এ প্রবন্ধটি চারটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে জাতি-রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে প্রভাবশালী এবং অধস্তন পর্যায়ের রাজনীতির প্রেক্ষিতে এথনিক এবং জাতি বিষয়ক ধারণাগুলো বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু এথনিক গোষ্ঠীগুলোর সামাজিক-সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। তৃতীয় অংশে এসব এথনিক গোষ্ঠীর প্রতি রাষ্ট্রীয় বৈষম্যমূলক নীতিসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিসমূহ এবং গারোদের[২] বিষয়ে আলোচনা করেছি। শেষাংশে আমরা এ সকল এথনিক গোষ্ঠীর পরিচিতি বিনির্মাণ প্রক্রিয়ার সমস্যা পরীক্ষা করেছি এবং সংকট উত্তরণের উপায় নির্দেশের প্রয়াস পেয়েছি।

**(১)এথনিক বনাম জাতি :** জাতিগত পরিচিতি কোন প্রদত্ত বা পূর্বনির্ধারিত বিষয় নয় বরং মানব সমাজ সৃষ্ট, যা এক গোষ্ঠী থেকে অন্য গোষ্ঠীর পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্যের ইঙ্গিতবহ। যাহোক, এই আপাত স্বাভাবিক এবং সামাজিক ক্রিয়ার একটি নেতিবাচক রাজনৈতিক মাত্রা রয়েছে, যার উদ্ভব জাতি-রাষ্ট্রের উত্থান থেকে যা জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার বৌদ্ধিক প্রভাবজনিত সমপ্রকৃতির জনসংখ্যার ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। যেহেতু অধিকাংশ মানব সমাজ বহুবিধ প্রকৃতির, সেহেতু লক্ষ্য করা যায় যে আধুনিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় প্রভাবশালী গোষ্ঠী অনেকটা অন্যায্যভাবে বা ঔদ্ধত্যপূর্ণভাবে নিজেকে পূর্ণাঙ্গ জাতি হিসেবে তুলে ধরে এবং অন্য জনগোষ্ঠীগুলোকে 'এথনিক', 'উপজাতি', 'আদিবাসী' ইত্যাদি নামে অধস্তন পর্যায়ভুক্ত করে। যাহোক, 'জাতি' এবং 'এথনিক'শব্দদুটোর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে দুই শ্রেণীর মধ্যে খুব কম পার্থক্যই বিদ্যমান। আরো প্রতিভাত হবে যে এসব ধারণা প্রাকৃতিকভাবে প্রদত্ত নয়, বরঞ্চ মানবসৃষ্ট।

'nation' শব্দের উদ্ভব ল্যাটিন 'nasci' শব্দ থেকে, যার অর্থ জন্ম নেয়া।[৩] সাধারণভাবে এর দ্বারা বোঝানো হয় এমন এক মানবগোষ্ঠী, যাদের জন্মগত সাদৃশ্য রয়েছে এবং এ গোষ্ঠী একটি পরিবার থেকে বৃহৎ হলেও একটি ক্ল্যান (clan) বা গোত্র থেকে ক্ষুদ্রতর।[৪] শুরুতে এটি হীন অর্থে ব্যবহৃত হতো। রোমে একে বিদেশী জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ

২. সাধারণভাবে অন্যান্য এথনিক গোষ্ঠীসমূহ প্রান্তিক অবস্থানে রয়েছে, কিন্তু এ দুটি গোষ্ঠী প্রত্যক্ষ নীতিমালার ফলশ্রুতিতে তাদের নিজস্ব সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

৩. *International Encyclopaedia of the Social Sciences*, 8.

৪. Elie Kedourie, *Nationalism* (New York 1961). 13.

করা হতো, যারা একটা ভৌগোলিক অঞ্চল থেকে আগত ছিল, তবে ভিনদেশী হওয়ার কারণে তাদের মর্যাদা রোমান নাগরিকদের নীচে ছিল।[৫] একইভাবে 'এথনিক' শব্দটিও শুরুতে হীন অর্থবোধক ছিল। এটি গ্রীক শব্দ 'ethnikos' থেকে উদ্ভূত, যা কয়েকটি পরিচয় নির্দেশ করতো, যেমন—(ক) খ্রিস্টধর্মের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন জাতিসমূহ অর্থাৎ হীদেন এবং প্যাগানগণ; (খ) একই রীতি এবং বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন গোত্র বা বৃহৎ গোষ্ঠীসমূহ; এবং (গ) আদিম সংস্কৃতিসম্পন্ন গোষ্ঠীসমূহ।[৬] এভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে উপরোক্ত দু'টি শব্দই নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর সমরূপতা ও অধস্তন অবস্থান সম্পর্কে ইঙ্গিত করতো। কিন্তু অধিক গুরুত্বের সাথে এটি অন্য গোষ্ঠীর 'বৈসাদৃশ্য' তুলে ধরতো। 'জাতি' শব্দটির অর্থের ক্ষেত্রে অবশ্য পরিবর্তন এসেছে এবং এ পর্যায়ে এর হীন অর্থেরও অবলুপ্তি ঘটেছে।[৭] এর বর্তমান রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য ফরাসী বিপ্লব থেকে উৎসারিত হয়েছে। বিপ্লবীদের জন্য 'জাতি' ছিল বাস্তব এক রাজনৈতিক শ্রেণীবিশেষ। এবি সাইয়েস (Abbe Siey'es) যেমন বলেন,

> জাতি হচ্ছে এক সম্মিলিত গোষ্ঠী, যারা একই সাধারণ আইনের আওতায় বসবাস করে এবং একই আইনসভায় প্রতিনিধিত্ব করে।[৮]

এখানে জাতিকে রাষ্ট্রের এলাকাগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর প্রেক্ষিতে চিন্তা করা হয়েছে। এ অভিমতটি অবশ্য জার্মান এবং ইতালীয়দের দ্বারা স্বীকৃত নয়, তারা একে চ্যালেঞ্জ করেছে। হার্ডার (Herder), ফিশটে (Fichte) এবং ম্যাৎসিনী (Mazzini) জাতিকে একটি রাজনৈতিক শ্রেণী বলে গণ্য করেন নি; তাঁদের মতে, জাতি হচ্ছে প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে সংগঠিত একটি শ্রেণী। জাতি সংক্রান্ত এ সাংস্কৃতিক অভিমত অনুযায়ী জাতি আসলে সাংস্কৃতিক এবং ভাষাগত সমরূপতা ও স্বাতন্ত্র্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং শুধুমাত্র এ পর্যায়ের শ্রেণীকরণের মাধ্যমেই এর সংজ্ঞা প্রদান করা যায়।

এটা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ যে জাতিসত্তার আদিম ব্যাখ্যাতাগোষ্ঠী (Primordialist) সংস্কৃতির উপরও দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। এঁরা ধরে নেন যে জাতিসত্তার পরিচিতি আসলে প্রদত্ত ব্যাপার, তা পছন্দের কোন ব্যাপার নয় এবং সমগ্র প্রক্রিয়ায় অযৌক্তিক উপাদান জড়িত। হ্যারল্ড আর. আইজ্যাক (Harold R. Isaacs)-এর মতে :

> এই পরিচিতি আসলে একজন মানুষের জন্মগত অথবা জন্মের মাধ্যমে অর্জিত। কাজেই এটা জনগণের অর্জিত অন্যান্য বহুবিধ ও গৌণ পরিচিতি থেকে পৃথক।[৯]

৫. Liah Greenfeld. *Nationalism Five Roads to Modernity* (Cambridge 1992), 4
৬. Websters *Third New International Dictionary of the English Language*, 78
৭. Greenfeld. *Nationalism*. 4-6
৮. Kedourie. *Nationalism*, 15
৯. Harold R. Isaacs 'Basic Group Identity: The Idols of the Tribe' in Nathan Glazer & Daniel P. Moynitham (eds) *Ethnicity Theory and Experience* (Harvard 1975) 30

পণ্ডিতগণ 'জাতি'কে বিষয়কেন্দ্রিক (subjective) অর্থেও ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। যেমন আরনেস্ট রেনান (Ernest Renan) বলেন :

> জাতি বলতে সেই জনগোষ্ঠীকে বোঝায়, অতীতে যাদের একইরূপ অস্তিত্ব ছিল; অবশ্য বর্তমানে একটি বাস্তব তথ্য দ্বারা তার চুম্বক পরিচয় তুলে ধরা হয়, তা হচ্ছে সম্মতি তথা একই রকম জীবনযাপন অব্যাহত রাখার সুস্পষ্ট আকাঙ্ক্ষা। একটি জাতির অস্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে তাঁর প্রাত্যহিক গণভোট।[১০]

হ্যান্স কোহনও (Hans Kohn) মনে করেন, একটি জাতির সবচাইতে অপরিহার্য উপাদান হচ্ছে চলমান ও সক্রিয় ইচ্ছা।[১১]

জাতিসত্তা(ethnicity)-কেও বিষয়ভিত্তিক (subjectivist) দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করা হয়েছে। এখানে বক্তব্য হলো, এথনিক পরিচিতি সাংস্কৃতিক প্রতীকের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, এরা নিজস্ব তথা গোষ্ঠী সম্পর্কিত পরিচয়বৈশিষ্ট্যের অনুভূতি এবং অন্যদের দ্বারা তার স্বীকৃতির উপর গুরুত্ব আরোপ করে।[১২]

এই শাব্দার্থিক বিশ্লেষণ উক্ত দুই শ্রেণীর মধ্যকার সাদৃশ্য এবং তাদের কৃত্রিমতার প্রকাশ ঘটায়। তথাপি 'আধুনিক' ধারণার ভিত্তিতে এ দুই শ্রেণীর পার্থক্য নির্ণয় করা হয়েছে। লেখকগণ একমত প্রকাশ করেন যে 'জাতি'র মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কিছুই হচ্ছে এর 'আধুনিকতা'।[১৩] গেলনার (gellner)[১৪] জোর দিয়ে বলেন যে একটি কৃষিভিত্তিক সমাজের জন্য জাতি বা জাতীয়তাবাদের কোন প্রয়োজন নেই; আধুনিক সমাজগুলোর ক্ষেত্রেই যান্ত্রিক শিল্প স্থাপনের জন্য একই ধরনের এবং শিক্ষিত নাগরিকের প্রয়োজন হয়। এসব শিল্পায়ন ও আধুনিকীকরণের পদক্ষেপ সেসব বুদ্ধিজীবীদের উদ্ভব ঘটায়, যাঁরা একই সংস্কৃতিভিত্তিক জাতি প্রতিষ্ঠার দাবি জানান। অন্য কথায়, জাতির ধারণা কেবল আধুনিক প্রেক্ষাপটে অর্থবহ হয়।

বেনেডিক্ট এন্ডারসনও (Benedict Anderson)[১৫] আধুনিক বাস্তবতায় জাতির উদ্ভব হয়েছে বলে মনে করেন। তাঁর মতে, মানুষের ভাষাগত ভিন্নতার উপর পুঁজিবাদ এবং

১০. E. Renan. 'What is a Nation' in Homi K Bhabna ed. *Nation and Narration.* (London 1990). 19.

১১. Hans Kohn. *The Idea of Nationalism* (New York 1951). 15.

১২. Urmila Phandis, *Ethnicity and Nation-Building in South Asia* (New Delhi 1990). 14

১৩. E. J. Hobsbawm *Nations and Nationalism since 1780: Programme. Myth Reality* (Cambridge 1990). 14.

১৪. E. Gellner *Nations and Nationalism* (London 1983).

১৫. Benedict Anderson, *Imagined Communities. Reflections on the Orgin and Spread of Nationalism* (London 1991).

প্রকাশনা প্রযুক্তির সমন্বয় নতুন ধরনের এক সম্প্রদায় বা 'জাতি'র ধারণার উন্মেষ ঘটিয়েছিল। যাহোক, দ্বিবিভাজনের ধ্রুপদী ব্যাখ্যা এ. ডি. স্মিথ (A.D. Smith)-এর লেখায় পাওয়া যায়[১৬], যেখানে তিনি এথনিক-এর স্থলে এথনি (ethnie) শব্দ ব্যবহার করেন এবং এই এথনিকে 'জাতির' পূর্বগামী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি যুক্তি দিয়ে বলেন যে জাতি হচ্ছে এক আধুনিক বিনির্মাণ, যা কেবল আধুনিক সমাজপরিবেশে খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু এ জাতি গঠনের জন্য আবশ্যক নির্দিষ্ট কিছু প্রাক-আধুনিক জাতিগত (ethnic) উপাদান এবং তা ক্রমে ক্রমে পুরনো এথনিক ইমেজের উপরই গড়ে উঠে। স্মিথ (Smith) মনে করেন :

> একটি জাতি হচ্ছে একটি মানবগোষ্ঠীর নাম, যার রয়েছে পুরুষানুক্রমে প্রবহমান বংশগত ঐতিহ্য, ঐতিহাসিক স্মৃতিমালা ও গণসংস্কৃতি এবং যার রয়েছে পৃথক সীমারেখার অন্তর্ভুক্ত একটি ভূখণ্ড, সাধারণ অর্থনীতি, আইনগত অধিকার ও কর্তব্যসমূহ।[১৭]

অপর দিকে এথনি (ethnie)-এর কোন নির্দিষ্ট এলাকা, সাধারণ অর্থনীতি বা বৈধ অধিকার ও কর্তব্য বলে কিছু নেই।

অতএব এই বৌদ্ধিক পর্যালোচনা মানবসমাজগুলিকে (বর্তমানে জাতি-রাষ্ট্রে সংগঠিত) বিভিন্ন পর্যায়ের উন্নয়নের ভিত্তিতে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করেছে, যার ভেতর প্রভাবশালী সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়কে সর্বোচ্চ ধাপ অর্থাৎ 'জাতির' পর্যায়ভুক্ত করে বাকিদের নিম্ন ধাপে অবনমিত করে রাখা হয়েছে, যাকে ফানডিস (Phandis) ইতর, বিশেষায়িত এবং বৃত্তাবদ্ধ জনগোষ্ঠী বলে আখ্যায়িত করেছেন।[১৮]

এখানে উল্লেখ্য যে মানবসমাজগুলিকে 'জাতি' এবং 'এথনিক' হিসেবে শ্রেণী-বিভক্তকরণ এবং চিহ্নিতকরণ সমাজের অভ্যন্তরে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে কাঠামোগত বিভক্তি এবং অনৈক্য সৃষ্টি করে। আশংকাজনকভাবে এটি আধিপত্য এবং সন্ত্রাসের সংস্কৃতিকে নির্মাণ এবং লালন করে। এ সন্ত্রাস[১৯] প্রাথমিকভাবে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের

১৬. দেখুন, A.D. Smiths The Myth of the Modern Nationi and the Myths of Nations' *Ethnic and Racial Studies*. Vol. I. No. I 1988. The Ethnic Origins of Nations. (London 1986)

১৭. Urmila Phandis, 'Ethnic Tensions in South Asia Complications for Regional Cooperation' Paper presented at the Workshop on *Regional Cooperation & Development* Organised by the Centre for Policy Research New Delhi, India. 8-13 April, 1985 6

১৮. ঐ, 1986, 22.

১৯. এ ধারণা সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, ইমতিয়াজ আহমেদ, 'Communal conflict in Modern Sri Lanka : Search for a Resolution', *International Journal of Peace Studies* vol. 1, No. 2, 1996

মূলধারার উন্নয়নপ্রক্রিয়া থেকে উদ্ভূত। এখানে নিম্ন পর্যায়ভুক্তদের প্রতিবাদকে হয় অবজ্ঞা করা হয়, না হয় জাতি ও রাষ্ট্রের নামে দমন করা হয়।[২০] নিম্নে প্রদত্ত ব্যাখ্যায় এ বিষয়টির বিশদ বিবরণ পাওয়া যাবে :

## (২) সংখ্যালঘু এথনিক জনগোষ্ঠীসমূহ : সামাজিক-সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশের সংখ্যালঘু এথনিক গোষ্ঠী সম্পর্কে অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে লিখিত উৎসের স্বল্পতা রয়েছে, সে সঙ্গে এদের সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞানেরও অভাব পরিলক্ষিত হয়। এ ক্ষেত্রে আদি উৎস হচ্ছে ব্রিটিশ প্রশাসকদের রেখে যাওয়া বিস্তারিত বিবরণসমূহ।[২১] এসব বিবরণ যদিও বিভিন্ন গোষ্ঠীর পরিচয় প্রদান করে, তবুও তাদেরকে সত্যিকার অর্থে অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছে। পৃথকভাবে বিচার করলে দেখা যায়, এটি তৎকালীন সমাজের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের প্রতিফলন ঘটায়, যা একটি ভিন্নতর ও প্রয়োগবিদ্যার আওতাবহির্ভূত ঐতিহ্যকে 'সভ্য' হিসেবে গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং তাকে 'অসভ্য', 'আদিম', 'যাযাবর' এবং 'বন্য' হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। ইতিবাচক দিক দিয়ে অবশ্য এটি এসব গোষ্ঠীর স্বাধীন অস্তিত্বকে তুলে ধরেছে, যারা কারো কাছে মাথা নত করে নি, তবে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের ছত্রছায়ায় ঠাঁই নিয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর বিদ্রোহ[২২], বিখ্যাত সাঁওতাল বিদ্রোহ[২৩], মনিপুরি[২৪] ও গারোদের[২৫] বিদ্রোহ সবই এসব সম্প্রদায়ের সামরিক নৈপুণ্য, সাংগঠনিক ক্ষমতা এবং স্বাধীন অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করে।

পরবর্তীকালে বাঙালি লেখকদের লেখাতেও একই পক্ষপাতিত্ব ও সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়েছে।[২৬] এখানে মনে রাখা জরুরি যে আলোচ্য গোষ্ঠীগুলোকে এভাবে চিত্রিতকরণ তাদের ক্ষতির কারণ হয়েছে। এতে একটি গোষ্ঠীকে শুধু কালিমালিপ্ত করা

২০. আলোচ্য প্রসঙ্গে জাতি এবং রাষ্ট্রকে সমার্থক হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

২১. দেখুন, T H. Lewin *Wild Races of South Eastern India* (London 1870), Alexander Mackenzie *History of the Relations of the Government with the Hill Tribes of the North-East Frontier of Bengal* (Calcutta 1884) G. A. Grierson *Linguistic Survey of India.* Vol. 1 Part. 1 (Calcutta 1927), R. H. S. Hutchinson, An Account of the Chittagong Hill Tracts, (Calcutta 1906). W.W. Hunter. *A Statistical Account of Bengal. Vol 6 Chittagong Hil Tracts. Chittagong. Noakhali, Tipperah, Hill Tipperah* (London 1876) E T. Dalton. *Tribal History of Eastern India* (Calcutta 1872). Major A Playfair *The Garos* (London 1909).

২২. Sirajul Islam ed... *Bangladesh District Records Chattagong.* Vol. 1. 1760-1787. (Dhaka 1978-83-84)

২৩. Ranajit Guha. *Elementary Aspects of Peasant Insurgency in colonial India* (Delhi 1983).

২৪. A.K. Sheram. *Bangladesher Manipuri Teocc SangskritirTribence Sangame* (Dhaka 1996).

২৫. সুভাষ জেংচাম, বাংলাদেশের গারো সম্প্রদায় (ঢাকা ১৯৯৪); Willem van Sehendel, 'Madmeni of Mymensingh: Peasant Resistance and the Colonial Process in Eastern India 1824 to 1833; The Indian Economic and Social History Feview. Vol.. 22. No. (Delhi 1945)

২৬. Abdus Sattar. *In the Sylvon Shadows* (Dhaka B1983)

হয় নি, তদুপরি আরো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এই যে একটি আধুনিক রাষ্ট্রের প্রেক্ষিতে তা তার উন্নয়ন নীতিমালাকে সংখ্যাগুরুর চাহিদা মোতাবেক যুক্তিগ্রাহ্য করতে সহায়তা করেছে এবং তা করতে গিয়ে একটি সম্প্রদায়কে 'যাযাবর' বা 'অলস' হিসেবে চিত্রিত করেছে (তৃতীয় অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে)।

## বাংলাদেশে এথনিক গোষ্ঠীর সংখ্যা

বাংলাদেশে এথনিক জনগোষ্ঠীর প্রকৃত সংখ্যা সম্পর্কে বিতর্ক রয়েছে।[২৭] ১৯৯১ সালের বাংলাদেশ আদমশুমারি প্রতিবেদন[২৮] এথনিক জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ২৯ বলে উল্লেখ করেছে।

এ প্রসঙ্গে খালেক[২৯] যথার্থভাবে উল্লেখ করেন যে আদমশুমারি (census) প্রতিবেদনের দুটি স্থানে একই গোষ্ঠীকে দুটি পৃথক এথনিক গোষ্ঠী হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, যেমন তালিকায় টিপরা এবং ত্রিপুরা এ দুটি গোষ্ঠীকে পৃথক গোষ্ঠী হিসেবে দেখানো হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরা একই গোষ্ঠীভুক্ত। অনুরূপভাবে এক গোষ্ঠীভুক্ত বংশী এবং রাজবংশীকেও উক্ত প্রতিবেদনে পৃথকভাবে দেখানো হয়েছে। অতএব বলা যায় যে বাংলাদেশে অন্তত পক্ষে ২৭টি বিভিন্ন এথনিক গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় রয়েছে।

## জনসংখ্যা এবং স্থানগত (spatial) বণ্টন

১৯৯১ সালের আদমশুমারি (census) অনুসারে বাংলাদেশে এথনিক জনসংখ্যা ১.২ মিলিয়ন, যা দেশের সমগ্র জনসংখ্যার ১.১৩% ভাগ। দাপ্তরিক পরিসংখ্যান এবং বেসরকারি অনুমানের মধ্যে অবশ্য যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। ম্যালনী (Manoney)[৩০] উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন যে বাংলাদেশের মাসিক পরিসংখ্যান বুলেটিন (মার্চ, ১৯৮১) অনুযায়ী রাজশাহী বিভাগের পাঁচটি জেলার এথনিক জনসংখ্যা হচ্ছে ৬২,০০০। কিন্তু খ্রিস্টান মিশনের বেসরকারি শুমারিগুলোতে লক্ষ্য করা যায় যে প্রকৃত সংখ্যা দাপ্তরিক বুলেটিনে প্রদত্ত সংখ্যার দ্বিগুণ হতে পারে। এ সকল জনগোষ্ঠীর সদস্যসংখ্যাও আসলে অন্যান্য প্রাপ্ত সংখ্যা থেকে ভিন্ন রকম। এদের মতে, এখানে এক সরকারি হীন প্রচেষ্টা

২৭. এ বিতর্কের বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য মাহমুদ এস. কুরাইশী সম্পাদিত *Tribal Cultures in Bangladesh* (রাজশাহী, ১৯৮৪)-এর বিভিন্ন প্রবন্ধ দেখুন।

২৮. *Bangladesh Census Report* 1991. Vol. 1 Analytical Report (Dhaka Bangladesh Bereau of Statistics Govt. of the People's Republic Of Bangladesh (194). 195-198.

২৯. Kibriaul Khaleque. 'Ethnic Communities of Bangladesh'. In Philip Gain ed *Bagnladesh Land Forest and Forest People* (Dhaka 1995). 7.

৩০. C T. Maloney, "Tribes of Bangladesh and Synthesis of Bengali Culture", In M. S. Qureshi ed. Tribal Cultures, 8.

কাজ করেছে যাতে তাদেরকে 'সংখ্যালঘু' হিসেবে দেখিয়ে বাঙালিদের প্রভাবশালী অবস্থানকে আরো অধিক সুসংহত করা যায়।[৩১]

বাংলাদেশে এথনিক সংখ্যালঘুদেরকে ভৌগোলিক অবস্থানের ভিত্তিতে সমতলের গোষ্ঠী এবং পাহাড়ী গোষ্ঠী এ দু'ভাগে ভাগ করা যায়। সমতলের এথনিক সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলো দেশের উত্তর-পশ্চিম, উত্তর এবং উত্তর-পূর্বের সীমান্তে বাস করে। যেমন উত্তর সীমান্ত এলাকায় কোচ, মুন্ডা, ওরাঁও, পাহাড়িয়া, রাজবংশী এবং সাঁওতালরা ঐতিহ্যগতভাবে বগুড়া, দিনাজপুর, কুষ্টিয়া, পাবনা, রাজশাহী এবং রংপুর জেলার নির্দিষ্ট অংশে বসবাস করে আসছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্তের বৃহত্তর সিলেট জেলা হচ্ছে খাসি, মনিপুরী, পাথর এবং টিপরা সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যিক এলাকা। গারো, কোচ এবং হাজং জনগোষ্ঠী উত্তর সীমান্তের ময়মনসিংহ ও জামালপুর জেলায় এবং উত্তর-মধ্য অঞ্চলের টাঙ্গাইল জেলায় বাস করে। অধিকন্তু বিভিন্ন এথনিক গোষ্ঠীকে বিচ্ছিন্নভাবে বরিশাল, কুমিল্লা, ঢাকা, ফরিদপুর, খুলনা, পটুয়াখালী এবং বাংলাদেশের অন্যান্য জেলায় দেখতে পাওয়া যায়।[৩২]

পাহাড়ী গোষ্ঠীর এথনিক সংখ্যালঘুরা দেশের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে বাস করে, যা সাধারণভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম নামে পরিচিত। এসব অধিবাসী আবার দুটি পৃথক বাস্তব্য (ecological) অঞ্চলে বসবাসরত—একটি গিরিচূড়া (ridge-top) এবং অন্যটি উপত্যকা। চাকমা, মারমা এবং ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী উপত্যকায় বাস করে আর খুমী, ম্র, ম্রং, লুসাই, বনজোগী, কুকী, তনচংগ্যা, চাক এবং রিয়াং জনগোষ্ঠী পাহাড়ের চূড়ায় বাস করে। এ প্রেক্ষিতে বৃটিশ প্রশাসক টি. এইচ. লেউইন[৩৩] (T. H. Lewin) এদেরকে খিউনথা (Khyountha) এবং তুংথা (Toungtha) এ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিলেন। বর্মী ভাষায় এ দুই শব্দের অর্থ হলো যথাক্রমে 'নদীর সন্তান' ও 'পাহাড়ের সন্তান'।

## এথনিক পটভূমি

এখানে আমরা আদমশুমারি (census) প্রতিবেদনের তালিকায় উল্লেখিত গোষ্ঠীসমূহ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পেশ করবো।

## ক) পার্বত্য চট্টগ্রামের এথনিক গোষ্ঠীসমূহ

**চাকমা :** ১৮৬৯ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামকে পৃথক জেলা হিসেবে প্রতিষ্ঠার সময় চাকমাদের সংখ্যা ছিল ২৫,০০০-এর মতো। সংখ্যার দিক দিয়ে এরাই ছিল প্রভাবশালী

৩১. ভিন্ন এথনিক গোষ্ঠীর সদস্যবর্গ লেখকের নিকট এই মন্তব্য করেন।

৩২. T.H. Lewin. *The Hill Tracts of Cittagong and the Dwellers Therein. with cmparative* Vocabularies of the Hill Dialects (Calcutta 1869), 28.

৩৩. Kibria., *'Ethnic Communities', 1995. 13.*

এথনিক গোষ্ঠী। এরা গ্রামে বাস করতো। এদের ছিল বংশানুক্রমিক প্রধান (chief)। প্রতিটি গ্রামের নেতৃত্বে থাকতেন একজন 'দেওয়ান' অথবা 'তালুকদার'। এই পদও ছিল বংশানুক্রমিক।[৩৪] চাকমারা মঙ্গোলয়েড (mongoloid) গোষ্ঠীভুক্ত। কিন্তু এদের ভাষা ইন্দো-এরিয়ান গোষ্ঠীর। এ ভাষা বাংলা ভাষার অপভ্রংশ, যা বিকৃত বর্মী হরফে লেখা হয়ে থাকে।[৩৫] চাকমাদেরকে আরাকানের Task অথবা Tsek উপজাতির প্রশাখা হিসেবে গণ্য করা হয়।[৩৬] এরা বৌদ্ধ এবং ১৫০টি গোজা বা পিতৃতান্ত্রিক বংশে বিভক্ত। চাকমা সমাজ পিতৃতান্ত্রিক এবং এখন পর্যন্ত পাহাড়ী জনগণের মধ্যে প্রভাবশালী গোষ্ঠী।

**মার্মা :** ১৮৬৯ সালে মার্মাদের দুই জন গোত্রপ্রধান (clan chief) ছিলেন—একজন বান্দরবনের বোমাং এবং অন্যজন রামগড়ের মং রাজা। কর্ণফুলীর দক্ষিণের মার্মা গ্রামগুলোর প্রধান ছিলেন বোমাং রাজা। অন্যদিকে উত্তরের গ্রামগুলো মং রাজার অধীনে ছিল। প্রতিটি গ্রামের হেডম্যান (Headman)-কে বলা হতো রোয়াজা, যাকে নিয়োগদান করতেন প্রধান (chief)। কোন কোন সময় তিনি গ্রামবাসীদের দ্বারাও নির্বাচিত হতেন, তবে চূড়ান্ত নিয়োগ প্রধানের অনুমোদনের উপর নির্ভর করতো। আসলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এ পদটি পিতার কাছ থেকে পুত্রের উপর বর্তাতো।[৩৭] মার্মারা আরাকান থেকে এসেছিল। তারা আরাকানী ভাষায় কথা বলে এবং ধর্মীয়ভাবে বৌদ্ধ। মার্মা সমাজ পিতৃতান্ত্রিক।

**ত্রিপুরা :** ১৮৬৯ সালে ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ছিল ১৫০০। এদের নিজস্ব কোন প্রধান (chief) ছিল না। এরা মার্মা এবং চাকমা প্রধানদের আওতাধীন গ্রাম্য সম্প্রদায়ে বসবাস করতো। প্রতিটি গ্রাম নিজস্ব হেডম্যান (Headman) বা গ্রামপ্রধান নির্বাচিত করতো। ত্রিপুরাগণ বিশ্বাস করে যে পূর্বে তারা মাতামুহুরী নদীর দক্ষিণে বাস করতো এবং কিলে (Kilay) এবং মাংলে (Manglay) নামক দুই ভ্রাতার নেতৃত্বাধীন ছিল, যারা ত্রিপুরার রাজা উদয়গিরির পক্ষে কারবারী হিসেবে ঐতিহ্যিক নেতা ছিলেন।[৩৮] পার্বত্য চট্টগ্রামের ত্রিপুরাগণ নিজেদেরকে মানিক্য (Manikya) রাজার বংশধর হিসেবে বিবেচনা করে। এরা নিজেদেরকে হিন্দু বলে পরিচয় দেয়। এদের ভাষা বেডো (Bodo) গোষ্ঠীভুক্ত।[৩৯] এরা পিতৃতান্ত্রিক জনগোষ্ঠী।

৩৪. Lewin. *Hill Tracts* 67-68.

৩৫. G.A. Grierson *Linguistic Survey of India: Bengal* [Lower Provinces] (Calcutta 1898). 29

৩৬. Herbert Risley. *Tribes and Castes of Bengal. Ethnographic Glossary.* Vol 1. (Calcutta 1891). 168.

৩৭. Lewin ঐ, 1986, 36-37.

৩৮. R.H S. Hutchinson. *Eastern Bengal and Assam district Gazetteers.* CHT (Allahabad, 1909) 36

৩৯. Grierson. *Linguistic Survey.* 1927. 64

**তনচংগ্যা :** এরা চাকমাদের একটি প্রধান শাখা এবং চাকমা প্রধান ধরম বকশ্ খানের সময়কালে ১৮১৯ সালের দিকে চট্টগ্রামের পাহাড়ী অঞ্চলে আগমন করে। লেউইন[৪০] (Lewin)-এর মতে, সে সময় তারা আরাকানের ফাহ্প্রু (Phahproo) নামক প্রধানের নিকট তাদের আনুগত্য প্রকাশ করে। কিন্তু ধরম বকশ্ খান তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। ফলে তাদের অনেকেই আরাকানে ফিরে যায়। ১৮৬৯ সালে তাদের জনসংখ্যা ছিল ২৫০০। তনচংগ্যারা বৌদ্ধ ধর্মাবলী এবং এদের আচার-অনুষ্ঠান অনেকটা চাকমাদের মতো। এদের ভাষা কুকী-চীন গোষ্ঠীভুক্ত।[৪১]

**খামী :** ১৮৬৯ সালে খামীদের সংখ্যা ছিল ২০০০। এরা মার্মা বোমাং প্রধানের নিকট আনুগত্য প্রকাশ করতো এবং গ্রামপ্রধানের (village headman) মাধ্যমে তাঁকে বাৎসরিক কর প্রদান করতো।[৪২] এরা সপ্তদশ শতাব্দীতে আকিয়াব এবং আরাকানের পাহাড়ী এলাকা থেকে চট্টগ্রামের পাহাড়ী অঞ্চলে প্রবেশ করে। এরা বৌদ্ধ বলে নিজেদের পরিচয় দেয়, কিন্তু এদের বিশ্বাস এবং ধর্মীয় আচার সর্বপ্রাণবাদভিত্তিক (animistic)। এরা স্ত্রী-প্রদানকারী (wife-giving) এবং স্ত্রী-গ্রহণকারী (wife-taking) এ দুই গোত্রে (clan) বিভক্ত। পরিবারের জ্যেষ্ঠতম পুত্র সকল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। এদের মৌখিক ভাষা কুকী অংশের দক্ষিণ শাখাভুক্ত।[৪৩]

**ম্র :** ১৮৬৯ সালে ম্রদের সংখ্যা ছিল ১৫০০। এদের নিজস্ব কোন প্রধান ছিল না এবং এরা বান্দরবনের বোমাং প্রধানের নিকট আনুগত্য প্রকাশ করতো। এদের প্রতিটি গ্রামের একজন প্রধান ছিলেন, যিনি বোমাং চীফের জন্য প্রত্যেক পরিবারপ্রধানের নিকট থেকে কর সংগ্রহ করতেন। গ্রামপ্রধানের পদটি ছিল বংশগত।[৪৪] লেউইন (Lewin)[৪৫] এবং হান্টার (Hunter)[৪৬] বলেন যে আরাকানের খামী উপজাতি কর্তৃক পরাজিত হয়ে এরা চট্টগ্রামের পাহাড়ী অঞ্চলে আশ্রয় নেয়। এদের মধ্যে গোত্র (clan)-ব্যবস্থা বিদ্যমান। এরা সর্বপ্রাণবাদী (animist)। এদের কথ্য ভাষা তিব্বতী ভাষাপরিবারভুক্ত[৪৭] শ্যাকার (shafer)[৪৮], যাকে এরা এদের নিজস্ব এক প্রকারের (category) ভাষা হিসেবে বিবেচনা করে।

৪০. Lewin. *Hill Tracts.* 1986., 66

৪১. Maloney, *"Tribes of Bangladesh"*. 11.

৪২. ewin. *Hill Tracts.* 1986. 87-88.

৪৩. Robert Shafer. *'Classification of the Sino Tibetan Languages'*. Word No. 19. 1955. 105.

৪৪. Lewin. *Hill Tracts.* 1986 86-88

৪৫. ঐ, 29

৪৬. Hunter. *Statistical Account.* 56.

৪৭. Lucien Bernot. 'Ethnic Groups of CHT' in Pierre Bessaignet ed. *Social Research in East Pakistan* (Dhaka 1964). 159

৪৮. Shafer. *Sino-Tibetan Languages.* 107.

**লুসাই :** এরা ১৫০ বছর পূর্বে ভারতের লুসাই পাহাড় অঞ্চল থেকে চট্টগ্রামের পার্বত্য এলাকায় আগমন করে। ১৮৯২ সালে লুসাই পাহাড়গুলো বৃটিশ কর্তৃক অধিকৃত হওয়ার আগে এরা ভীষণ রকম হিংস্র গোষ্ঠী ছিল এবং পরস্পর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হতো। এরা মুণ্ডু শিকার (head-hunting)-কে শৌর্যের প্রতীক বলে মনে করতো। এরা পাহাড়ের চূড়াকে বাসস্থান হিসেবে বেছে নিয়েছিল। এদের গ্রামের প্রবেশপথ সুদৃঢ়ভাবে প্রহরাধীন থাকতো। গ্রামপ্রধানদের বলা হতো 'লাল' (Lal) এবং সামাজিক অনুষ্ঠানে 'লাল' গ্রামবাসীদের নেতৃত্ব দিতেন, তবে অন্যান্য ক্ষেত্রে 'লাল'-এর সাথে গ্রামবাসীদের কোন পার্থক্য থাকতো না।[৪৯]

লুসাইরা সর্বপ্রাণবাদী (animist)। এরা বিভিন্ন সেপ্ট (Sept)-এ বিভক্ত এবং এদের সমাজ হচ্ছে পিতৃতান্ত্রিক। সর্বকনিষ্ঠ পুত্র পিতার সকল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। 'লুসাই' বা 'দোলনে' (Dolne) নামে এদের নিজস্ব ভাষা রয়েছে।[৫০] বৃটিশ শাসনামলে এদের মধ্যে মিশনারিগণ কর্মরত ছিল। ফলে এদের অধিকাংশই খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে। এদের ভাষাও ল্যাটিন অক্ষরে লেখা যায়। ১৮৯২ সালে বৃটিশ কর্তৃক অধিকৃত হওয়ার পর এরা এদের জঙ্গি বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে।

**খিয়াং :** লেউইন (Lewin)[৫১]-এর বর্ণনায় জানা যায় যে ১৮৬৯ সালে খিয়াংরা সংখ্যায় অল্প ছিল। এদের সামাজিক সংগঠন ম্র ও খুমীদের সংগঠনের ন্যায় ছিল। এরা বার্মার চীফদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতো। এরা নিজেদেরকে হিউ (Hyou) বলে সম্বোধন করে। এরা বিশ্বাস করে যে ২০০ বছর পূর্বে যুদ্ধের সময় তাদের চীফ বার্মা থেকে চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এদের মধ্যে কোন সেপ্ট (sept) নেই। এরা বৌদ্ধ, কিন্তু এরা গৃহদেবতা নাদা গা (Nada ga) এবং জলদেবতা বগলীর (Bogley) প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে। এদের ভাষা কুকী-চীন গোত্রীয়।[৫২]

**পাংখো :** পাংখোরা বিশ্বাস করে যে তারা বার্মার শান (shan) জাতির বংশধর।[৫৩] 'পাংখো' শব্দের অর্থ 'শিমুল ফুল' এবং 'খোয়া' (khoa) শব্দের অর্থ গ্রাম। এরা পাংখো এবং ভ্যানজাং (Vanzang) নামক দুটি সেপ্টে (sept) বিভক্ত। অতীতে এরা হিংস্র ছিল এবং পর্বতচূড়ায় ঘর নির্মাণ করতো। এদের গ্রামগুলো ভারী অস্ত্র দ্বারা সজ্জিত ও প্রহরাধীন ছিল। যাহোক বৃটিশ কর্তৃক এগুলো অধিকৃত হওয়ার পর এরা এদের সামরিক নৈপুণ্য হারিয়ে ফেলে।

৪৯. Lewin. *Hill Tracts*. 1986 99-101.

৫০. Shafer. *Sino-Tibetan Languages*. 107

৫১. Lewin. *Hill Tracts*. 94

৫২. সুগত চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি ও সংস্কৃতি (রাঙ্গামাটি ১৯৯৩), ৭৮।

৫৩. Grierson. Linguistic Survey. 1927. 144

পাংখোরা সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাসী। তবে বৃটিশ আমলে মিশনারিদের কর্মকাণ্ডের ফলে এদের অধিকাংশই খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে। লুসাই ভাষার সাথে এদের ভাষার যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। এ ভাষা কুকী-চীন গোত্রীয়।[৫৪]

**সাক :** সাকদের চাকমা উপ-গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করা হয়।[৫৫] এদের ভাষার সাথে কাদু (Kadu) ভাষার সাদৃশ্য রয়েছে। এ ভাষা মায়ানমারের মিতখিইনা (Myitkhyina) জেলায় ব্যবহৃত হয় এবং ভারতের মনিপুর জেলার অন্তর্গত আন্দ্রো (Andro) ও সেংমাই (Sengmei) ভাষার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। সাক জনগোষ্ঠী আন্দো (Ando) এবং এনগারেক (Ngarek) নামে দুটি সেপ্টে (sept) বিভক্ত। এরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী।

**ম্রং :** ম্রং শব্দটি ত্রিপুরা থেকে এসেছে এবং শুধুমাত্র ত্রিপুরাদের একটি সেপ্টে এটি প্রযোজ্য যার অর্থ গোত্র (clan)। ম্রংদের মধ্যে গোত্র ব্যবস্থা বিদ্যমান এবং এদের অধিকাংশ নামের অর্থ ত্রিপুরা ভাষায়। এসব কারণে এরা ত্রিপুরাদের অংশ হিসেবে বিবেচিত।[৫৬]

**বম (Bawm) :** বমরা ১৮৩৮-৩৯-এর দিকে তাদের নেতা লিয়ানকুং-এর নেতৃত্বে আরাকান থেকে চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে আগমন করে। এরা বান্দরবন জেলায় বসতি স্থাপন করে। এদের ভাষা কুকী-চীন গোত্রীয়[৫৭] এবং এরা প্রধানত খ্রিস্টান।

## (খ) সমতলের এথনিক গোষ্ঠীসমূহ

**গারো :** গারোদের আদি নিবাস উত্তর-পূর্ব ভারতের আসাম রাজ্যের পাহাড়ী এলাকায়, যা তখন মেঘালয় নামে পরিচিত ছিল।[৫৮] এরা অবশ্য মনে করে যে এদের পূর্বপুরুষগণ তিব্বতের তরুয়া (Torua) প্রদেশে বসবাস করতো।[৫৯] গারো পাহাড় থেকে এদের নামকরণ করা হয়েছে। এরা নিজেদেরকে আচিক (পাহাড়ী মানুষ) অথবা মান্ডে (মানুষ) হিসেবে আখ্যায়িত করতে পছন্দ করে।[৬০] এদের ভাষা বোডো (Bodo) গোত্রীয়।[৬১]

৫৪. সুগত চাকমা, ঐ, ৭৮।

৫৫. Lewin. *Hill Tracts*. 65.

৫৬. Maloney. *'Tribes of Bangladesh'* 14

৫৭. সুগত চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি ও সংস্কৃতি, ৮৭-৯২।

৫৮. Zahidul Islam. *Social Organization among the Garos in Bangladesh: An Overview* Social Science Review. *The Dhaka University Studies* Part-D. vol. IX No. 2 Dec. 1992. 106.

৫৯. Playfair. *The Garos*. 9

৬০. ঐ, 7.

৬১. Grierson. *Linguistic Survey of India*. vol. III.. quoted in Kibriaul Khaleque. 'Adoption of Wet Cultivation and Changes in Property Relations Among the Bangladesh Garo'. *The Journal of Social Studies* (JSS). No. 20. 1983. 20.

গারোদের ঐতিহ্যবাহী ধর্ম সংসারেক (Songsarek) নামে পরিচিত। এ ধর্মমতে তারা অতিপ্রাকৃতিক বস্তুসমূহের (Mite) উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। তবে বর্তমানে শতকরা ৯০ ভাগ গারো খ্রিস্টান ধর্মাবলী।[৬২] গারো সমাজ মাতৃতান্ত্রিক।

**সাঁওতাল** : হান্টার (Hunter)[৬৩] এবং রিজলে (Risley)[৬৪] বলেন যে সাঁওতালরা অস্ট্রেলিয়া ও তৎসংলগ্ন এলাকা থেকে দেশান্তরী হয়ে এ অঞ্চলে এসেছে। শুরুতে তারা বাংলাদেশে এসেছিল জমি পরিষ্কার, রেলপথ নির্মাণ এবং অন্যান্য শ্রমের কাজ করতে। সাঁওতালরা সর্বপ্রাণবাদী (animist), তবে কিছুসংখ্যক সাঁওতাল বর্তমানে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছে। এদের নিজস্ব ভাষা রয়েছে, যাকে কোল (Kol)-এর প্রশাখা বলা যায়। গ্রিয়ারসন (Grierson) অবশ্য বিশ্বাস করেন যে এটি মুন্দারির (Mundari) এক উপ-গোষ্ঠী।[৬৫]

**খাসি** : এরা নিজেদের নাম খাসিয়া পার্বত্য অঞ্চল থেকে গ্রহণ করেছে। আদি খাসিগণ আসামের নির্জন খাসিয়া-জৈন্তা পার্বত্য অঞ্চলে বাস করতো। এরা ৫০০ বছর পূর্বে সিলেটে আগমন করে।[৬৬] এইচ. রবার্টস (Rev. H. Roberts) মনে করেন যে প্রথমে খাসিরা বার্মা থেকে এসেছিল। অন্য মতে তারা উত্তর থেকে সিলেটে অভিপ্রয়াণ করে।[৬৭] এদের ধর্মকে সর্বপ্রাণবাদ (animism) বলা হয়। এদের নিজস্ব গোত্র ব্যবস্থা রয়েছে। একই গোত্রের মধ্যে বিবাহ সম্ভব নয়। খাসি সমাজ মাতৃতান্ত্রিক। সর্বকনিষ্ঠ কন্যাসন্তান সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। এদের নিজস্ব ভাষা রয়েছে, যা অস্ট্রো এশিয়াটিক (Austroasiatic) গোষ্ঠীভুক্ত।[৬৮]

**মনিপুরী** : বাংলাদেশে মনিপুরীরা ভারতের মনিপুর রাজ্য থেকে এসেছিল। বার্মা এবং মনিপুরের সাত বছর (১৮১৯-২৬) ব্যাপী যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মনিপুরী রাজাসহ তারা পালিয়ে যেতে এবং আসাম, কাছার ও সিলেটে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়।[৬৯] ড্যাল্টন (Dalton)[৭০] বলেন যে মনিপুরীদের সাথে নাগা ও কুকীদের সম্পর্ক রয়েছে। শেকসপীয়ার (Shakespear)[৭১] মনে করেন যে তারা আসামের কুকী গোষ্ঠীভুক্ত। মনিপুরীরা অবশ্য

৬২. Kibriaul Khaleque. ঐ, 88.
৬৩. W.W. Hunter. *The Annals of Rural Bengal* (London 1868). 181.
৬৪. H.H. Risley. *People of India* (Calcutta 1887). 46.
৬৫. H.H. Risley. *People of India* (Calcutta 1887) 46.
৬৬. A. Sattar. *In The Sylvan Shadows*. 130
৬৭. P.R T. Gurdon. *The Khasis* (Delhi, 1975) 10.
৬৮. Maloney. '*Tribes of Bangladesh*' 17
৬৯. এ. কে. শিরাম, বাংলাদেশের মনিপুরী, ২১-২২।
৭০. Dalton. *Tribal History*. 48.
৭১. Col. J. Shakespear. *The Lusei-Kuki Clans* (London 1912). 150.

তাদেরকে মহাভারতের অর্জুনের বংশধর হিসেবে বিবেচনা করে।[৭২] এদের ভাষার নাম মেইথেই (Meithei) এবং আসামী অক্ষরের ন্যায় অক্ষরে তা লেখা হয়। এরা হিন্দুদের বৈষ্ণব (Vaisnavite) শাখাভুক্ত।

**পাহাড়িয়া** : এদের আদি বাসস্থান হচ্ছে বিহারের পূর্বাংশের জেলার সাঁওতাল পরগনা। জনসংখ্যার চাপে এরা বাংলা এবং বিহারের সমতলে চলে আসে। এরা মূলত রাজশাহী জেলায় কেন্দ্রীভূত রয়েছে। এদের মধ্যে কোন গোত্রব্যবস্থা নেই এবং এরা 'সুরিয়া' ও 'মল' এ দুই গোষ্ঠীতে বিভক্ত। কুমার বা কুমারভাগ মলের একটি শাখা। এ বিভক্তি পাহাড়িয়াদের মতে ভাষা ও খাদ্যাভ্যাসের কারণে হয়েছে। এরা দ্রাবিড় ভাষাভাষী লোক। এদের প্রায় অর্ধেক খ্রিস্টান এবং বাকীরা হিন্দুধর্ম মিশ্রিত নিজস্ব ধর্ম অনুসরণ করে।[৭৩]

**রাখাইন** : রাখাইনরা পটুয়াখালী জেলা, কক্সবাজার এবং রামুতে স্থায়ীভাবে বসবাস করে। প্রায় ২০০ বছর আগে এরা আরাকান থেকে বাংলাদেশে আসে। মায়ানমারে আরাকানীদের রাখাইন বলা হয়। একইভাবে বাংলাদেশেও এরা রাখাইন নামে অভিহিত হতে ইচ্ছুক। এরা জাতি (race) হিসেবে মঙ্গোলয়েড গোত্রীয় এবং বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী। এদের নিজস্ব রাখাইন ভাষা রয়েছে, যা আরাকানের রাখাইন ভাষার অনুরূপ। ভাষাটি ভট-ব্রাহ্মো (Bhot-Brahmo) শ্রেণীভুক্ত।[৭৪]

**রাজবংশী** : রাজবংশীরা কোচ (Koch) জনগোষ্ঠী থেকে এসেছে এবং পরে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেছে। এদের মধ্যে কিছু মুসলমানও রয়েছে। এরা নিজেদেরকে ছোট নাগপুরের রাজার জ্ঞাতি হিসেবে দাবি করে। এজন্য এদের বিশেষণ হলো রাজবংশী।[৭৫] ম্যালনি (Maloney)[৭৬] বলেন যে এদের ভাষা বোডো (Bodo) গোত্রীয় যদিও এরা এদের আদি ভাষা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়েছে। রাজবংশীদের ভাষাকে এখন বাংলার অপভ্রংশ বলা যায়।

**কোচ (Koch)** : ড্যাল্টন (Dalton)[৭৭] কোচদের ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন জনগোষ্ঠী হিসেবে গণ্য করেছেন। ভারতের কুচবিহারে কোচদের নিজস্ব রাজ্য ছিল। তাদের আদি ভাষা বোডো (Bodo) গোত্রীয় যদিও তাদের অনেকেই আসামী, হিন্দি অথবা বাংলায় কথা বলে। আদিতে তারা মাতৃতান্ত্রিক ছিল।

৭২. Dalton *Trbibal History*. 48.

৭৩. দেখুন, Father Stephen G Gomes. *The Paharias* (Dhaka 1988).

৭৪. মোস্তফা মজিদ, পটুয়াখালীর রাখাইন উপজাতি, (ঢাকা ১৯৯২)।

৭৫. Dalton. *Tribal History*. 135-136.

৭৬. Maloney. *Trbibes of Bangladesh* 16

৭৭. Dalton. *Tribal History*. 89.

**ওরাঁও :** এদের বিশ্বাস, এরা দক্ষিণ বিহারের রাঁচী থেকে বাংলাদেশে এসেছে। এরা কুরুখ (Kurukh) ভাষায় কথা বলে এবং এদের কিছু অংশ সাদরি (Sadri) ভাষায় কথা বলে। ওরাঁওরা সর্বপ্রাণবাদে (animism) বিশ্বাসী যদিও কিছু ওরাঁও খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে। এরা হাথ সাঙ্গিয়া (Hath Sangia), আপার সাঙ্গিয়া (Uper Sangia) এবং কাত্রিয় (Katrio) এ তিন গোষ্ঠীতে বিভক্ত।[৭৮]

**হাজং :** ড্যাল্টন (Dalton)[৭৯]-এর মতে, হাজংদের আদি নিবাস আসামে এবং তারা আসামের গোয়ালপাড়ার কাচারি জাতির বংশধর। কোন কোন সময় এদেরকে সমতলের কাচারি (Plain's Kachari) বলা হয়। এদের অধিকাংশ হিন্দু এবং এদের ভাষা বোডো (Bodo) গোত্রীয়। এরা বায়াবচারিস (Byab charis) এবং প্যারামারথিস (Paramartis) এ দুই গোত্রে বিভক্ত। দ্বিতীয়টিকে উঁচু জাতের বলে বিবেচনা করা হয়।

**মাহাত (Mahat) :** ম্যালনি (Maloney)[৮০] মনে করেন যে এরা ইন্দো-এরিয়ান ভাষাভাষী গোষ্ঠী। এরা পশ্চিম বঙ্গের বৃহৎ বর্ণগুচ্ছের অন্তর্গত। বাংলাদেশে এরা দিনাজপুরে বসতি স্থাপন করেছে এবং এরা সাদরি (Shadri) ভাষায় কথা বলে।

**মুন্ডা :** ড্যাল্টন (Dalton)[৮১] উল্লেখ করেন যে মুন্ডা বা মুন্ডারিরা এক সময় মগধনিবাসী ছিল এবং গৌতম বুদ্ধের জন্মের সময় পর্যন্ত সেখানে বাস করতো। পরে এরা ছোট নাগপুরে বসতি স্থাপন করে। মুন্ডাদের বিশ্বাস, সে সময় তাদের কোন রাজা ছিল না। প্রতিটি গ্রামে মুন্ডা নামে নিজস্ব চীপ ছিল, যার অর্থ সংস্কৃত ভাষায় হেড বা প্রধান। প্রায়শ একটি গ্রাম মাত্র একটি পরিবার নিয়ে গঠিত হতো এবং এভাবে পুরো সম্প্রদায় মুন্ডা নামে পরিচিত হয়। এরা বৃটিশ শাসনামলে দক্ষিণ বিহার থেকে সমতল বাংলায় আগমন করে। এরা মুন্ডা ভাষায় কথা বলে।

১৯৯১ সালের আদমশুমারিতে প্রথম বারের মতো বুমা, হরিজন এবং উরুয়াদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এসব গোষ্ঠী সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় নি।

## পেশা এবং অর্থনীতি

বাংলাদেশে এথনিক গোষ্ঠীসমূহের বেশির ভাগই কৃষিবিদ। উত্তর-পশ্চিম জেলাগুলোর এথনিক গোষ্ঠী জলা ধান (wet-rice) চাষে অভ্যস্ত। সিলেটে খাসিরা ঐতিহ্যগতভাবে

৭৮. Budla Orao. '*Oraons Among the Bangladesh Aboriginals*' in Mahmud. S. Qureshi ed. *Tribal Cultures. 131.*
৭৯. Dalton. *Tribal History.* 87.
৮০. Maloney. '*Trbibes of Bangladesh*' 22
৮১. Dalton. *Tribal History.* 163.

সীমান্তের ওপারের সাথে ব্যবসায়ে জড়িত। এটি তাদের প্রধান পেশা এবং কৃষি গৌণ বিষয়। মনিপুরীরা ঐতিহ্যগতভাবে কারিগর, যেমন ছুতোর (carpenter) এবং অলঙ্কার প্রস্তুতকারী (jeweler)। গারোরা জুম চাষ করতো, কিন্তু সরকারি নিষেধাজ্ঞার কারণে তারা জলা ধান (wet-rice) চাষে নিয়োজিত হয়। তারা আনারসের চাষও করে। পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম ছিল চাষের প্রধান উপায়। তবে জুম চাষে সরকারি নিষেধাজ্ঞা থাকায় এবং জমি ও বনাঞ্চল সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণের ফলে জুম চাষ দুরূহ হয়ে পড়ে। উপত্যকার জনগোষ্ঠী জলা ধান (wet-rice) চাষ করতো। এখনো পাহাড়ের শীর্ষে জুম চাষ করা হয়। অতীতে বেশির ভাগ এথনিক গোষ্ঠী জীবনধারণভিত্তিক অর্থনীতির (subsistence economy) অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু 'রাষ্ট্রের' অনধিকারপ্রবেশের ফলে তারা বাজার অর্থনীতির (market economy) অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এটা তাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনকে প্রভাবিত করেছে এবং তাদের অর্থনৈতিকভাবে প্রান্তিক পর্যায়ভুক্ত করেছে। নীচে এই প্রান্তিকীকরণ প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করা হলো।

### (৩) রাষ্ট্র এবং এথনিক গোষ্ঠীসমূহের প্রান্তিকীকরণ

আধুনিক রাষ্ট্র পশ্চিমা টেকনোক্রেটিক ধাঁচের 'উন্নয়ন' (developmet) এবং 'প্রগতি'র (progress) ধারণা গ্রহণ করেছে, যা চাকচিক্যমুখী। এভাবে রাষ্ট্র স্থানীয় জনগণের সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশকে পুরোপুরি উপেক্ষা করেছে। ফলে এথনিক সম্প্রদায়গুলোর অবস্থার প্রান্তিকীকরণ ঘটেছে এবং 'উন্নয়নের' নামে তাদের সম্পদ শোষণ করা হয়েছে। এখানে আমরা 'ভূমি', 'বনাঞ্চল' এবং 'জল'-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তিনটি বিশেষ বাস্তবতার নিরিখে এই বিশ্লেষণ করতে প্রয়াসী হবো। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে এ আলোচনা পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং গারোদের বিষয়ে সীমিত রাখা হবে।

**(ক) ভূমি :** ভূমিকে পাহাড়ী জনগোষ্ঠী সাম্প্রদায়িক সম্পত্তি বলে গণ্য করতো। তাদের বিশ্বাস, গ্রাম সম্প্রদায়, জ্ঞাতিত্ব (kinship)-গোষ্ঠী এবং কিছু ক্ষেত্রে আত্মারা (spirit) ছিল ভূমির চূড়ান্ত মালিক; ব্যক্তি মালিকগণ শুধুমাত্র ভূমি ভোগ করার অধিকারী।[৮২] যাহোক, বৃটিশ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ১৮৬৮ সালে সকল পাহাড়ী ভূমির উপর মালিকানা (ownership) প্রতিষ্ঠা করে। এথনিক চীফগণ নিজেদেরকে ভূমির স্বত্বাধিকারী হিসেবে দাবি জানিয়ে রাষ্ট্র কর্তৃক ভূমি অধিগ্রহণে বাধা দান করে। তাদের যুক্তি ছিল, তারাই বংশগতভাবে খাজনা সংগ্রহকারী এবং এমন কিছু সুবিধাভোগী, যা তাদের এ ভূমির মালিক হওয়ার অধিকার দিয়েছে। কিন্তু চীফদের এ অধিকার সরকার কখনো স্বীকার করে নি।

৮২. Wolfgang Mey. *Genocide in the CHT. Bangladesh.* IWGIA Document No 51. (Compenhagen 1984). 76.

এক্ষেত্রে যে যুক্তি দেখানো হয় তা হলো, ভূমিতে পাহাড়ী চীফদের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ এলাকাভিত্তিক ছিল না, বরং গোত্র এবং উপজাতিভিত্তিক ছিল। কাজেই চীফদের সার্বভৌম কর্তৃত্ব ছিল জনগণের উপর, ভূমির উপর নয়। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমির উপর সরকারের অসীম এবং চূড়ান্ত কর্তৃত্ব বর্তায়।[৮৩] এ ক্ষেত্রে নিজস্ব স্বার্থের প্রশ্নে সরকার স্ববিরোধী অবস্থানও গ্রহণ করে। এভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম ম্যানুয়্যাল চীফদের এখতিয়ারকে গোত্রভিত্তির পরিবর্তে এলাকাভিত্তিতে বর্ণনা করেছে। কারণ এ ব্যবস্থা কর সংগ্রহের ক্ষেত্রে সহায়ক। উপরোক্ত পদক্ষেপের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রের রাজস্ব বৃদ্ধি করা। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র দু'টি ব্যবস্থা গ্রহণ করে : (ক) জুমের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রদান এবং (খ) ভূমিমালিকানার বিদেশী ধারণা প্রয়োগ।

**(ক) জুম-এর উপর আক্রমণ :**

বৃটিশ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক জীবনধারায় তাদের উৎপাদনপদ্ধতির উপর প্রথম প্রত্যক্ষ আক্রমণ চালায়। এখানে যুক্তি প্রদর্শন করা হয় যে জুম পার্বত্য চট্টগ্রামের কৃষির বৈশিষ্ট্য হলেও এটি একটি মান্ধাতার আমলের কৃষিপদ্ধতি। বৃটিশদের বিবেচনায় এতে জমি দীর্ঘকাল অনাবাদী পড়ে থাকে এবং প্রাকৃতিক সম্পদের অপচয় হয়। বৃটিশরা জুম চাষের পরিবর্তে লাঙ্গল চাষ প্রবর্তনের চেষ্টা চালায়, কারণ লাঙ্গল চাষ জমি অনাবাদী বা পরিত্যক্ত রাখে না। ফলে তা অর্থনৈতিকভাবে অধিক লাভজনক এবং প্রযুক্তিগতভাবে উন্নততর। কিন্তু পাহাড়ী জনগণের জন্য জুম পদ্ধতি ছিল এমন এক জীবনব্যবস্থা, যার সাথে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ জড়িত এবং সেটি অর্থনৈতিক মূল্যবোধের সীমাবদ্ধ গণ্ডিকে ছাড়িয়ে যায়। সমগ্র জুম চাষ এবং এতে ফসল তোলার সমগ্র প্রক্রিয়াটি সম্প্রদায়ভিত্তিক মালিকানা, বিনিময় এবং ভাগাভাগির ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং আছে। জুম চাষ পর পর দুই বছর করা যায় এবং তারপর জমিকে দশ থেকে পনেরো বছর পরিত্যক্ত বা অনাবাদী অবস্থায় ফেলে রাখতে হয়। এ পদ্ধতি পাহাড়ী জনগণ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চর্চা করে আসছে এবং এটা তাদের প্রতিবেশের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

বৃটিশরা অবশ্য এ পদ্ধতিকে কঠোরভাবে নিরুৎসাহিত করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম ম্যানুয়্যাল (পরিচ্ছেদ-৫, অধ্যায়-১৮, ধারা-২) স্পষ্ট করে কৃষকদের এক সার্কেল থেকে অন্যত্র বসবাসের উদ্দেশ্যে গমন নিষিদ্ধ এবং নিয়ন্ত্রিত করেছিল। ১৮৬০ সালের পর পূর্বের মতো ব্যক্তিগত অনাবাদী (fallow) ভূমির পরিবর্তে এলাকাভিত্তিক কর দাবি করা হয়। এর

৮৩. Raja Devasish Roy. *'Land Rights of the Indigenous Peoples of the CHT Land.* vol 1 No 1 (Dhaka 1994). 13.

উদ্দেশ্য ছিল চাষীদেরকে নির্দিষ্ট এক এক খণ্ড জমির সাথে সম্পৃক্ত করে রাখা। ১৮৬৮ থেকে ১৮৭১ সালের মধ্যে জুমিয়াদেরকে লাঙ্গল চাষে উৎসাহিত করার এক সামগ্রিক প্রচেষ্টা নেয়া হয়। ১৮৭২ সালের মধ্যে সমগ্র সমতলের ভূমি লাঙ্গল চাষের জন্য ইজারা দেয়া হয়, যার পরিমাণ ছিল ১৭০২ হেক্টর এবং এজন্য প্রদত্ত নগদ ঋণের পরিমাণ ছিল ৩২৭৪ পাউন্ড।[৮৪]

এভাবে লাঙ্গল চাষ প্রবর্তনের মাধ্যমে বৃটিশরা পার্বত্য চট্টগ্রামে তাদের রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে সচেষ্ট হয়। এটি তাদের রাজনৈতিক অবস্থান সুসংহত করতেও সহায়ক হয়। কারণ জুম ব্যবস্থায় চাষীরা নিজেদের চীফের সাথে সম্পৃক্ত ছিল এবং তাঁর নিকট হেডম্যানের মাধ্যমে তাদের জুমকর প্রদান করতো। এই ব্যবস্থা সরকারকে রাজস্ব সংগ্রহের জন্য স্থানীয় কর্মচারীদের (indigenous functionaries) উপর নির্ভরশীল করেছিল। কিন্তু লাঙ্গল চাষের প্রবর্তন স্থানীয় কর্মচারীদের উপর রাষ্ট্রের নির্ভরশীলতা হ্রাস করে। স্থানীয় চীফগণ (chiefs) নিজেদের ক্ষমতা খর্ব হওয়ার কারণে এ পদক্ষেপের বিরোধিতা করে, কেননা নতুন ব্যবস্থাধীনে চাষীরা সরাসরি সরকারকে কর দিতে থাকবে।[৮৫] তাই চীফদের শান্ত করতে এবং তাদের আনুগত্য লাভের আশায় বৃটিশরা তাদেরকে সরকারি কর সংগ্রহকারী হিসেবে ঘোষণা দেয়। এ ব্যবস্থা অতঃপর পার্বত্য চট্টগ্রাম ম্যানুয়ালে স্বীকৃত হয় (পরিচ্ছেদ-৫, অধ্যায়-১৮, ধারা-২)। চীফদেরকে নিজেদের অনুসারীর সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য গ্রামের হেডম্যান নিয়োগ ও বরখাস্ত করার ক্ষমতাও প্রদান করা হয়। এ পদক্ষেপ স্থানীয় রীতির বিরোধী ছিল, কেননা হেডম্যানগণ সাধারণত গ্রামবাসীদের দ্বারা নির্বাচিত হতেন। স্থানীয় অধিবাসীরা এ নতুন ব্যবস্থার বিরোধিতা করে এবং নিদারুণ বিরক্ত হয়ে 'গ্রাম উঠিয়ে দিয়ে নতুন গ্রাম গঠনে প্রয়াসী হয়'।[৮৬] এমন প্রচেষ্টা প্রতিহত করতে বৃটিশরা চীফদের সহায়তা দানের জন্য এগিয়ে আসে, কারণ এ ক্ষেত্রে উভয়ের স্বার্থ সমান্তরাল ছিল।

কাজেই লাঙ্গল চাষের প্রবর্তন পাহাড়ী জনগণের জন্য সুদূরপ্রসারী ফলাফল বয়ে আনে। এটি প্রথমবারের মতো পাহাড়ীদেরকে নিজস্ব এলিটের শোষণ ও নির্যাতনের মুখোমুখি করে। লাঙ্গল চাষ বিভিন্ন পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর মধ্যে আর্থ-সামাজিক পৃথকীকরণ ঘটায়। উপত্যকায় জমির প্রকৃতির কারণে সহজেই লাঙ্গল চাষ প্রবর্তন করা সম্ভব হয়। লাঙ্গল চাষের জন্য প্রয়োজন হয় বাজারের। ফলে এ সকল এলাকায় স্থায়ী বাজার এবং

৮৪. Aditya K. Dewan. *Class and Ethnicity in the Hills of Bangladesh* Unpublished Ph.D. thesis. (McGill 1990). 152.

৮৫. পার্বত্য চট্টগ্রামে রাজস্ব প্রশাসনের পত্রাদি ১৮৮৬-১৮৮৭ (কোলকাতা ১৮৮৭) থেকে নির্বাচিত ৯৯।

৮৬. ঐ, 2.

শহর বা পৌর কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর ফলে পাহাড়ী জনগণের মধ্যে প্রভাবশালী গোষ্ঠীর (রাজনৈতিক ও বস্তুগতভাবে) আবির্ভাব ঘটে।

উপত্যকায় বসবাসরত জনগণের মধ্যে যারা লাঙ্গল চাষের জন্য ইজারার ভিত্তিতে ভূমি গ্রহণ করেছিল, তাদেরকে এই ভূমির উপর মালিকানার অধিকার দেয়া হতো। তারা কৃষিতে উদ্বৃত্ত উৎপাদনে সক্ষম হয়ে ধনিক শ্রেণীতে রূপান্তরিত হয়। অপর দিকে যারা তা করেনি তারা ভূমিহীন এবং দিনমজুরে পরিণত হয়। পরিবারভিত্তিক ভূমিবরাদ্দ হওয়ার ফলে সম্প্রদায়ভিত্তিক সম্পত্তির ধারণাও ভেঙে যায়। ১৯০০ সালের ম্যানুয়্যালের পরিচ্ছেদ-৪-এর ১৩ ধারা অনুসারে পরিবারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল শুধুমাত্র বাবা, মা, কন্যা এবং পুত্ররা।

লাঙ্গল চাষের প্রবর্তন বাঙালিদের জন্য পাহাড়গুলো উন্মুক্ত করে। পাহাড়ী এলাকায় সমতলের জনগণের প্রবেশে যে বাধানিষেধ ম্যানুয়্যালে বর্ণিত ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য সহজতর করার জন্য তা ১৯৩০ সালের মধ্যে প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। জুম অর্থনীতিতে সহায়ক হিসেবে কর্জগ্রহণ ও পণ্যবিনিময় প্রচলিত ছিল বলে পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর বাণিজ্যিক বা ব্যবসা সংক্রান্ত কোন পূর্ব-অভিজ্ঞতা ছিল না। ফলে ব্যবসার ক্ষেত্রটি সমতল থেকে আগত বাঙালিদের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। অধিকন্তু পাহাড়ী জনগোষ্ঠী লাঙ্গল চাষের জন্য বাঙালিদের ভাড়া করে। কাজেই জুমের স্থলে লাঙ্গল চাষ পদ্ধতি পাহাড়ীদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা খর্ব করে এবং তাদেরকে বাঙালিদের উপর নির্ভরশীল করে। পাহাড়ীদের উপর এ প্রযুক্তি চাপানোর ফলে তাদের জীবনের সংহতি বিনষ্ট হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে পাহাড়ীদের মূল্যবোধকে কোন বিবেচনায় আনা হয় নি। উৎপাদনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন অর্থাৎ জুম থেকে লাঙ্গল চাষের প্রযুক্তি প্রবর্তন এবং তৎসহ বাঙালি নিয়ন্ত্রিত বাজার-অর্থনীতি প্রবর্তন ভবিষ্যতে পাহাড়ীদের অধস্তন অবস্থানে নিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত প্রদান করে।

এই পরিণতি ছাড়াও নয়া চাষপদ্ধতির ফলে পাহাড়ীদের উপর নেমে আসে যাযাবরত্বের কলঙ্ক। এই কলঙ্ক (নিম্নের বিশ্লেষণে বর্ণিত) পাহাড়ীদের ভূমিবিচ্ছিন্ন হওয়ার একটি প্রধান কারণ হিসেবে কাজ করে।

**(খ) ভূমিমালিকানার বিদেশী ধারণা :** বৃটিশরা পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমিতে দুই ধরনের ভোগদখলের অধিকার প্রবর্তন করে : (১) ব্যক্তিগত অধিকার (Private rights) এবং (২) উপস্বত্বাধিকার (Usufruct)।

**(১) ব্যক্তিগত অধিকার (Private Rights) :** ১৮৬৮ সাল থেকে যারা লাঙ্গল চাষ গ্রহণ করে তাদেরকে এ অধিকার দেয়া হয়। এক্ষেত্রে অবশ্য আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান সাপেক্ষে সরকার কর্তৃক ভূমি অধিগ্রহণ করা যেতো। ব্যক্তিগত মালিকানার এ নতুন ধারণা

পাহাড়গুলিকে পণ্যে পরিণত করে, যা অর্থনৈতিক লাভের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যেতো এবং অলঙ্ঘনীয় পূতঃপবিত্র বস্তু (sacrosanct) হিসেবে বিবেচিত হতো না।

**(২) উপস্বত্বাধিকার (Usufruct)** : এর অর্থ হলো সেই ভূমি ব্যবহারের অধিকার, যার উপর রাষ্ট্রের স্বত্বাধিকার রয়েছে। এটি জুম ভূমির অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ অধিকার প্রথা এবং রীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

রাষ্ট্র কর্তৃক পাহাড়ী অঞ্চলকে বাণিজ্যিক শোষণের জন্য উন্মুক্ত করার ফলে পাহাড়ী জনগণ তাদের ভূমি হারায়। যদিও পার্বত্য চট্টগ্রাম ম্যানুয়্যাল পাহাড়ে বহিরাগত কর্তৃক ভূমি দখল করার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে (বিধি-৩৪), তথাপি তা পুরোপুরি নিষিদ্ধ ছিল না। নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যে ভূমি দখল (acquire) করা যেতো : বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বৃক্ষরোপণ [বিধি ৩৪ (খ)], শিল্পের উদ্দেশ্যে বৃক্ষরোপণ [বিধি ৩৪ (গ)]; আবাসিক উদ্দেশ্যে বৃক্ষরোপণ [৩৪ (ঘ)] এবং বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বৃক্ষরোপণ [৩৪ (ঙ)]। এভাবে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের লাভের জন্য পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর ভূমি বাণিজ্যিক শোষণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়।

ঔপনিবেশিক প্রশাসন এভাবে পাহাড়ীদের কাছ থেকে ভূমির মালিকানা কেড়ে নিয়ে তা রাষ্ট্রের অধীনে ন্যস্ত করে, যে রাষ্ট্রে তাদের কোন অংশগ্রহণ বা প্রতিনিধিত্ব ছিল না। অবশ্য পার্বত্য চট্টগ্রাম ম্যানুয়্যাল এর ৩৪ ও ৩৬ নং অনুচ্ছেদের মাধ্যমে পাহাড়ীদের স্বার্থ সংরক্ষণ করতে চেয়েছে। জেলা প্রশাসকের পূর্বানুমতি ছাড়া পাহাড়ী অঞ্চলে অস্থায়ী বাসিন্দাদের নিকট ভূমি বিক্রয় এবং তাদের বসতি স্থাপন নিষিদ্ধ ছিল। এ অবস্থা পাকিস্তান আমলেও অপরিবর্তিত ছিল।

পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি সর্বদাই দুষ্প্রাপ্য ছিল, যদিও প্রচলিত বিশ্বাস ছিল এর বিপরীত। এক বন সংক্রান্ত (forestal) প্রতিবেদনে লক্ষ্য করা যায় যে পার্বত্য চট্টগ্রামের শতকরা মাত্র ৩.২ ভাগ অর্থাৎ ১০৪,৩০৪,৬৪ একর জমি ছিল সব ধরনের কৃষিকাজের উপযুক্ত [ক শ্রেণীর জমি], শতকরা প্রায় ১৫ ভাগ অর্থাৎ ৫০৫,২২৫,৬০ একর জমি ছিল ফলচাষ ও বনায়নের জন্য উপযুক্ত [খ শ্রেণীর জমি] এবং শতকরা ৭৭ ভাগ অর্থাৎ ২,৫০৯,৮৩০,৪০ একর জমি ছিল শুধুমাত্র বনায়নের উপযোগী [গ শ্রেণীর জমি]।[৮৭]

এমনকি, ১৯১৮ সালে যখন পার্বত্য চট্টগ্রামের লোকসংখ্যা ২০০,০০০ ছিল, তখনও এখানে জীবন ধারণে সহায়ক জমি রক্ষার জন্য এবং এখানকার অর্থনীতিকে সংরক্ষণ

৮৭. Raja Devasish Roy. 'The Erosion of Legal and Constitutional Safeguards of the Hill Peoples of the CHT in Bangladesh: An Historical Account, Paper Presented at a seminar on the CHT Problem in Bangladesh. organised by the Manoghar Shishu Sadan. Rangamati. April 20-22, 1992, 10.

করার তাগিদে সমতল থেকে এ অঞ্চলে বসবাসের জন্য জনগণের গমন নিয়ন্ত্রণ করার ও সীমিত রাখার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম ম্যানুয়্যাল-এর ৩৪ এবং ৩৬ ধারা অনুসারে পাহাড়ীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য জেলা প্রশাসকের পূর্বানুমতি ব্যতীত অস্থানীয়দের এ অঞ্চলে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। এমনকি পঞ্চাশের দশকেও দেখা যায় যে পাহাড়ী জনসংখ্যার জন্য চাষযোগ্য ভূমি ছিল অপর্যাপ্ত, যার পরিমাণ ১৯৬১ সালে ছিল ৩৮৫,০৭৯ একর। ভূমির এ অবস্থার আরো অবনতি ঘটে যখন পাকিস্তান রাষ্ট্র পার্বত্য অঞ্চলে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে 'উন্নয়নমূলক' কর্মকাণ্ড শুরু করে (এটি শেষ হয় ১৯৬০ সালে)। কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে সৃষ্ট জলাধার ১০০,০০০ মানুষকে উচ্ছেদ ছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রামের ৫৪,০০০ একরের বেশি প্রধান আবাদী জমিকে প্লাবিত করে। এর বিনিময়ে সরকার শুধুমাত্র এক-তৃতীয়াংশ হারানো জমির ক্ষতিপূরণ প্রদানে সক্ষম ছিল। অদ্যাবধি উদ্বাস্তু জনগোষ্ঠীর অধিকাংশকে সুষ্ঠুভাবে পুনর্বাসিত করা হয় নি প্রধানত জমির দুষ্প্রাপ্যতার কারণে। ফলে তারা জঙ্গলের দিকে সরে গেছে এবং ভঙ্গুর (fragile) জমিতে জুম চাষ করছে।

সমতলের এথনিক সম্প্রদায়গুলোর ভূমিসমস্যা পাহাড়ীদের সমস্যার তুলনায় ভিন্ন ধরনের। এর কারণ হচ্ছে এদের কৃষিকর্মের পার্থক্য, বাঙালিদের মধ্যে কিংবা নিকটবর্তী অঞ্চলে তাদের কেন্দ্রীভূত অবস্থান, বহিঃস্থ রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ এবং প্রধানত গারোদের সমাজের মতো তাদের মাতৃতান্ত্রিক সমাজ।

সমতলের এথনিক সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলোকে তাদের নিজস্ব ভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। এদের ভূমি রক্ষার উদ্দেশ্যে ১৯০৮ সালের ছোট নাগপুর প্রজাস্বত্ব আইন (Chota Nagpur Tenancy Act of 1908) প্রণীত হয়। এ আইন জেলা প্রশাসকের অনুমোদন ব্যতীত উপজাতিদের ভূমি অ-উপজাতীয়দের নিকট হস্তান্তর নিষিদ্ধ করে। এ বিধান অবশ্য প্রায়শ লঙ্ঘন করা হয়েছে এবং উত্তরাঞ্চলের জেলাসমূহের এথনিক সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলো প্রায়ই সংকটের মূহূর্তে তাদের ভূমি বিক্রয় করেছে। এরা অভিযোগ করেছে যে ভূমি নিবন্ধন কার্যালয় থেকে ভুয়া নিবন্ধনকৃত কাগজপত্র বের করা বাঙালিদের জন্য বেশ সহজসাধ্য ব্যাপার, যেগুলো প্রায়ই ছিল প্রাক-তারিখযুক্ত। তারা আরো অভিযোগ করে যে ভূমি রাজস্ব কার্যালয় প্রায়ই তাদের কাছ থেকে ভূমিকর গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করে। এক্ষেত্রে আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে সংখ্যালঘুদেরকে তাদের নিজ ভূমি থেকে উৎখাত করা। আবার যখন তাদেরকে ঋণ প্রদান করা হয়, তখন হীন উদ্দেশ্যে সাদা কাগজে স্বাক্ষর নিয়ে ভূমি হস্তগত করার অপচেষ্টা লক্ষ্য করা গেছে।[৮৮]

৮৮. Philip Gain & Shishir Moral, 'Land Right, Land Use and Ethnic Minorities of Bangladesh', *Land* vol 2. No 2 (Dhaka) 1995). 53.

পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর মতো গারো সম্প্রদায়ও রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নীম্নের বর্ণনা থেকে এটি অধিক বোধগম্য হবে।

গারো জনগোষ্ঠী মূলত কৃষিজীবী। এরা কৃষিকাজে জুম পদ্ধতি প্রয়োগ করে। গারো পাহাড়ের মাটির প্রকৃতি পুরোপুরি লাঙ্গল চাষের উপযোগী নয়।[৮৯] গারো পাহাড়ের যেসব স্থানে জুম চাষ করা হতো, সেখানে সমগ্র গ্রামবাসী সম্প্রদায়ভিত্তিক আবাদ করতো। নীতিগতভাবে আকিং (Aking) নামে পরিচিত গ্রামের সাধারণ জমির মালিকানা ও ব্যবস্থাপনা থাকতো মাহারী বংশের দু'টি গোষ্ঠীর হাতে, যারা গ্রামটি প্রতিষ্ঠা করেছিল। সাম্প্রদায়িক ভূমির মালিকানা ন্যস্ত হতো পরিবারের নারী-সদস্যের হাতে এবং এ ভূমি ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ন্যস্ত হতো পুরুষ-সদস্যের হাতে। প্রত্যেক প্রজন্মের জন্য এ অধিকার বর্তাতো এ দুই বংশধারায় উত্তরাধিকারীর উপর।[৯০]

আকিং ভূমি বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত ছিল এবং এসব খণ্ড গ্রামের সকল গৃহস্থের জন্য গৃহের আকার অনুযায়ী বরাদ্দ করা হতো। কোন গৃহস্থকে একটি নির্দিষ্ট ভূমিখণ্ডের স্থায়ী মালিকানা প্রদান করা সম্ভব ছিল না। কারণ প্রতি বছর পালাক্রমে ভূমির বরাদ্দ দেয়া হতো।[৯১]

ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র অবশ্য এদের চাষাবাদ পদ্ধতিতে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করে নি। কিন্তু গারো গ্রামগুলোর উপর কার্যকরী নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা এবং রাজস্ব সংগ্রহ সুষ্ঠু করার লক্ষ্যে সীমিত পুলিশ, সিভিল ও ফৌজদারি ক্ষমতাসম্পন্ন লস্কর কার্যালয় প্রবর্তন করা হয়।[৯২] কাজেই লক্ষ্য করা যায় যে বৃটিশরা গারোদের ভূমিব্যবস্থায় কোন পরিবর্তন ঘটায় নি।

বাংলাদেশে উত্তর ময়মনসিংহ এবং মধুপুর গড় জঙ্গলে যেসকল গারো বসতি স্থাপন করে, তারা জুমসহ ভেজা ধান (wet-rice) চাষ করতো। এটি সম্ভব হয় একদিকে পরিবেশগত (ecological) চাপ এবং অন্যদিকে জনসংখ্যার চাপের কারণে। ভেজা ধান চাষের (wet-cultivation) কারণে ভূমির স্থায়ী মালিকানার সৃষ্টি হয়। যে গৃহস্থ প্রথম চাষ আরম্ভ করে, এটি তার উপর বর্তায়। কিছু সংখ্যক ভূমিকে ভেজা জমিতে (wet-field) রূপান্তরিত করায় গ্রামবাসীদের মধ্যে কোন দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় নি, কারণ যেসমস্ত ভূমি জুম চাষের অনুপোযোগী ছিল শুধুমাত্র সেগুলোরই রূপান্তর করা হয়। তথাপি, গারো

৮৯. Playfair *The Garos*. 35

৯০. Kibriul Khaluque. 'Change in Social Organization and its Implications for land and Tree Tenure Change The Case of the Garo Community of Madhupur Garh Forest' Unpublished Paper. n d., 3-4

৯১. Kibriaul Khaleque. ঐ, 94

৯২. বিস্তরিত জানার জন্য দেখুন, Milton S Sangma. *History and Culture of the Garos* (New Delhi 1981).

সমাজ ক্রমান্বয়ে ভূমির সম্প্রদায়ভিত্তিক মালিকানার ধারণা থেকে সরে আসে এবং ব্যক্তিগত মালিকানার ধারণা গ্রহণ করে। এটি পরবর্তীকালে এদের মাতৃতান্ত্রিক সমাজের ভিত্তিকে দুর্বল করে দেয় যখন জমির নিবন্ধীকরণ পরিবারের পুরুষ-সদস্যের নামে করা হয়।

## (খ) বনাঞ্চলের বাণিজ্যিকীকরণ

পার্বত্য চট্টগ্রামের শতকরা ৮২ ভাগ এলাকা নিয়ে বনাঞ্চল গঠিত।[৯৩] পাহাড়ী জনগোষ্ঠী ঐতিহ্যগতভাবে বনসম্পদ গৃহস্থালির কাজে ব্যবহার করে আসছে। এ সমস্ত বনে জুম চাষও করা হয়ে থাকে। তবে তা এলোমেলোভাবে করা হয় নি। বরঞ্চ সম্প্রদায়ভিত্তিক অনুমতি এ ব্যাপারে ক্রিয়াশীল ছিল। কারণ বনাঞ্চল সমগ্র সম্প্রদায়ের সম্পত্তি বলে গণ্য হতো। জুম চাষের ক্ষেত্রে অনাবাদী কাল (fallow period) কঠোরভাবে অনুসরণ এ ব্যাপারে একটি প্রধান দৃষ্টান্ত।

সামাজিক বনায়নের ধারণা ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র কর্তৃক বনাঞ্চলের বাণিজ্যিকীকরণের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে যায়। বাৎসরিকভাবে বনসম্পদের উপর টোল (toll) আদায় করে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করা হতো এবং এসব বনজ সম্পদ নদীপথে চট্টগ্রাম বন্দরে নিয়ে আসা হতো।[৯৪] বনজ দ্রব্যের উপর চাঁদা সংগ্রহের জন্য ১৮৬২ সালে প্রধান প্রধান নদীতে টোল-কেন্দ্র (toll station) বসানো হয়। প্রথম দিকে সরকারি কর্মকর্তাগণ টোল সংগ্রহ করতেন, তবে ১৮৬৪ সালে চীফদের এ ক্ষমতা প্রদান করা হয়। যা হোক, ১৮৭১ সালে বন বিভাগ পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল টোল-অফিসের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে।[৯৫]

১৮৬৫ সালে ভারতীয় বন সংরক্ষণ আইন প্রণীত হয়। এ আইন বনজ সম্পদ রক্ষার জন্য স্থানীয় জনগণের পাহাড়ে প্রবেশ এবং এর সম্পদ ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। এখানে মনে রাখা দরকার যে পাহাড়ী জনগোষ্ঠী এসব সম্পদ খুব সতর্কতার সাথে ব্যবহার করতো, কারণ তা এদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। আসলে স্বয়ং ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রই ধ্বংসপ্রক্রিয়া শুরু করেছিল। কোন কোন সময় নিজেদের রাজনৈতিক বিজয় উৎযাপনের জন্য বৃটিশরা বনাঞ্চল উজার করে। রাজকীয় নৌ-বাহিনীর জাহাজ নির্মাণের জন্য ভারতীয় জঙ্গলের কাঠ প্রয়োজন হতো। রাজস্ব সংক্রান্ত ঔপনিবেশিক ভূমিনীতি বন উজাড়ের জন্য দায়ী ছিল। রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষিকাজের জন্য বনাঞ্চল পরিষ্কার করা হতো। ১৮৫৩ সালের দিকে রেলপথ নির্মাণের প্রথম পর্যায়ে বন উজাড় প্রক্রিয়া ব্যাপকভাবে জোরদার করা হয়।

৯৩. Hunter *The Annals of Rural Bengal* 1876. 29.

৯৪. Lewin *The Hill Tracts of Chittagong*. 869 27.

৯৫. J.M. Cowan. *Working Plan for the Forests of CHT Division* (Calcutta 1923). 14-16

১৮৭৮ সালে আরেকটি আইনের বলে রাষ্ট্র সকল বনভূমির উপর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। এভাবে পাহাড়ী জনগোষ্ঠীকে বনসম্পদের উপর তাদের সম্প্রদায়ভিত্তিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। মজার ব্যাপার এই যে এ আইন প্রণয়নের পূর্বে রাষ্ট্র বনাঞ্চলকে সম্প্রদায়ের সম্পত্তি হিসেবে স্বীকার করেছিল।[৯৬]

১৮৬৯ সালে চট্টগ্রাম বিভাগে একজন সহকারী বন কনজারভেটর নিয়োগ করা হয় এবং ১৮৭০ থেকে বন সংরক্ষণের লক্ষ্যে সুষ্ঠু তদারকি ব্যবস্থা চালু হয়। ১৮৭১ সালের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার সবটুকু অর্থাৎ ৬৮৮২ বর্গমাইলের মধ্যে ৫৬৭০ বর্গমাইল এলাকাকে সরকারি সংরক্ষিত বন (government reserve forest) হিসেবে ঘোষণা করা হয়।[৯৭] স্থানীয় জনগণকে বনজ দ্রব্য শুধুমাত্র গৃহস্থালির কাজে ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয়। ১৮৭৫ সালে সংরক্ষিত বনভূমি (RF) এবং জেলা বনভূমি (DF) (বর্তমানে অশ্রেণীভুক্ত রাষ্ট্রীয় বনভূমি) এই দুই ধরনের বনাঞ্চল গঠনের মাধ্যমে আরো অধিক বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়। সংরক্ষিত বনভূমিকে পুরোপুরিভাবে বনবিভাগের ব্যবস্থাপনায় আনা হয়। জুম চাষ এবং গার্হস্থ্য প্রয়োজনে বনজ দ্রব্য ব্যবহার সামগ্রিকভাবে নিষিদ্ধ করা হয়। জেলা বনভূমিকে জেলা প্রশাসকের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। কোন কোন সময়ে জেলা প্রশাসকের আরোপকৃত বিধি-নিষেধের প্রেক্ষিতে এ বনভূমিতে জুম চাষ এবং গৃহস্থালীর কাজে বনজ সম্পদ ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হতো।[৯৮]

রাষ্ট্র থেকে ইউরোপীয় উদ্যোক্তাদেরকে (entrepreneur) উৎকৃষ্ট মানের ভূমি প্রদান করা হতো। ১৮৬০-এর দশকে চা, কফি ও কমলার আবাদ হয় এবং ১৮৭০-এর দশকে সেগুন চাষ করা হয়।[৯৯] ১৯৪০ সালে ৩,০০০ হাজার একর ভূমি সেগুন চাষের আওতাভুক্ত হয়।[১০০] ১৮৬০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে বাৎসরিকভাবে পাহাড়ী এলাকা থেকে বার্ষিক ৫০,০০০ কিউবিক ফুট কাঠ সংগ্রহ করা হয়।[১০১] সরকারি সংরক্ষিত বনভূমিতে কাঠ ও সেগুন চাষ করে বাৎসরিক গড় উদ্বৃত্ত ৭০,০০০ টাকা হিসাব করা হয়।[১০২]

৯৬. Ramachandra Guha *The Unquiet Woods: Ecological Change and Peasant Resistance in the Himalaya* (Delhi 1991), 56-57.

৯৭. Cowan, *Working Plan for the Forests of CHT*. 14

৯৮. Selections from the Correspondence on the Revenue Administraiton of the CHT. 1862-1927 (Calcutta 1929). 202-204

৯৯. W.V Schendel. 'The Invention of the 'Jummas': State Formation and Ethnicity in Southeastern Bangladesh'. *Modern Asian Studies* vol 26 Part. I (Cambridge 1992). 112.

১০০. Nafis Ahmad *A New Economic Geography of Bangladesh* (Delhi 1976) 110.

১০১. Lewin, *The Hill Tracts of Chittagong*, 1869, 8.

১০২. Cowan, *Working Plan for the Forests of CHT*, 36

বনভূমি থেকে পাহাড়ী জনগণকে উচ্ছেদের মাধ্যমে এদের প্রান্তিকীকৃত করা হয়। জুমের জন্য নির্ধারিত এলাকাকে এক-তৃতীয়াংশে সীমিত করা হয়। এর ফলে জুমিয়াদের প্রান্তিকীকরণ হয়, কারণ রাষ্ট্র জুমচাষীদেরকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের কোন পদক্ষেপ নেয়নি বা তাদের জন্য কোন রকম কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে নি। পরিবেশের উপর উপরোক্ত নীতির বিরূপ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়; ভূমি দুর্লভ হওয়ার কারণে জমি পতিত রাখার সময়কাল (following cyde) ১৫-২০ বছর থেকে ৮-১০ বছরে হ্রাস করা হয় যার ফলে মাটির ক্ষতি সাধন প্রক্রিয়া (degradation) ঘটতে থাকে।

পাকিস্তান রাষ্ট্রও পার্বত্য চট্টগ্রামের বনজ সম্পদ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতো। ১৯৫৩ সালে এশিয়ার বৃহত্তম কর্ণফুলী কাগজকল প্রতিষ্ঠা তথাকথিত 'উন্নয়ন'-এর আরেক দৃষ্টান্ত, যার ফলে পাহাড়ী জনগোষ্ঠী নিজস্ব ভূমি ও সম্পদ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। উক্ত কাগজকল নির্মাণের ফলে ঐ এলাকার অসংখ্য মার্মা (সঠিক সংখ্যা জানা যায় নি) াড়া হয়ে যায়। বর্তমানে এই কাগজকলের নিকটে স্থানীয়দের কোন বসতি নেই এবং কাছাকাছি বসবাসরত জনগণের শতকরা ১০০ ভাগই বাঙালি। অধিকন্তু ঐ কল কাঁচামাল হিসেবে পাহাড় থেকে সংগৃহীত বাঁশ এবং নরম কাঠ ব্যবহার করে এবং এতে পাহাড়ী জনগণ কোনভাবেই উপকৃত হয় নি। অপরদিকে ঐ কাগজকল বাঙালিদের জন্য চাকুরির সুযোগ সৃষ্টি করেছে, যারা এতে প্রধান পদগুলো দখল করেছে। এ ক্ষেত্রে স্থানীয় বাসিন্দাদের শতকরা মাত্র এক ভাগকে কাগজকলে নিয়োগ দান করা হয়েছে, তাও আবার নিম্নতর পদে।

১৯৬৭ সালে ফরেস্টাল ফরেস্ট্রি ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্টারন্যশনাল লিমিটেড (অতঃপর করেস্টাল বলা হবে)-এর সুপারিশক্রমে সরকার সংরক্ষিত বনাঞ্চল [Protected Forest (PF)] নামে এক বনভূমি প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেয়, যা বৃটিশ কর্তৃক ইতিমধ্যে সৃষ্ট দুটি বনভূমির অতিরিক্ত। এ বনভূমিতে জুম চাষ পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হয় এবং এর পরিবর্তে সরকার ২১,০০০ একরের নরম কাঠ সার্কেল (soft wood working circle) ও ১৪,০০০ একরের ফলবৃক্ষ (fruit wood working circle) সার্কেল গঠনের প্রস্তাব করে।[১০৩] এ পদক্ষেপ উক্ত এলাকার বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণকারী বাঙালি ব্যবসায়ীদের উপকারে আসে। কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ যোগাযোগব্যবস্থার উন্নতি ঘটায় এবং বাঙালিদেরকে অধিক হারে পাহাড়ী অঞ্চলের গভীরে অনুপ্রবেশের সুযোগ প্রদান করে। কিন্তু পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর উপর এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায়। সংরক্ষিত বনাঞ্চলে (PF) ধান উৎপাদন পুরোপুরি বন্ধ করে দেয়া হয় এবং এর ফল দাঁড়ায় এই যে অল্পকাল পরেই খাদ্যসামগ্রীর অভাবকে অনশনজনিত মৃত্যুর প্রথম কারণ বলে এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।[১০৪]

১০৩. ADB Report CHT Development Project (Dacca 1978). 53-55

১০৪. Anti-Slavery Society. The CHT. Militarization Oppression and the Tribes Series 2 (London 1984) 33

এটা ছিল স্বনির্ভর এক জনগোষ্ঠীর প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে পরিণত হওয়ার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। গারো জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও পরিস্থিতি পাহাড়ীদের থেকে খুব বেশি ভিন্ন নয়। ব্রিটিশ আমলে মধুপুর গড়ের সকল বনভূমি নাটোরের জমিদারের ভূসম্পত্তির (estate) অংশ ছিল। সেখানে গারোদেরকে বসবাস ও চাষবাদের অনুমতি দেয়া হয়। তবে শর্ত থাকে যে তারা জঙ্গলের যত্ন নেবে এবং জমিদারকে বাৎসরিক চাঁদা প্রদান করবে।[১০৫]

মধুপুর গড় এলাকায় অবশ্য জুমের জমি ব্যক্তিগত গৃহস্থালির অধীনে ছিল। সম্প্রদায়ভিত্তিক মালিকানা এ এলাকায় বিদ্যমান ছিল না। এখানে গারোদের দু'ধরনের ভূমিস্বত্ব লাভের অনুমতি দেয়া হয়। প্রথমটি পাট্টা (Patta) হিসেবে পরিচিত ছিল, যার মাধ্যমে ভূমির অধিকারীকে কর প্রদান সাপেক্ষে জমি চাষসহ নিজ উত্তরাধিকারীর নিকট ভূমি হস্তান্তরের অনুমতি দেয়া হতো। তবে তার জমি বিক্রি করার কোন অধিকার ছিল না। জমিদারগণ কোনরকম ক্ষতিপূরণ না দিয়ে জমি দখল করতে পারতেন।

জলা ধান চাষ (wet-rice cultivation) তীব্রতর করার পাশাপাশি পত্তন (Pattan) নামে অধিকতর স্থায়ী ধরনের এক ভূমিস্বত্ব চালু করা হয়। কয়েক বছর জলা ধান চাষের পর নিয়মিত কর প্রদান সাপেক্ষে একজন চাষীকে এই মালিকানা প্রদান করা হতো। পত্তন-এর অধীনে মালিকরা জমি বিক্রি করতে পারতো এবং জমিদারগণ জমির দখল নিলে ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারতো। পত্তন জুম চাষের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় নি।[১০৬] এ ধরনের ভোগস্বত্বভিত্তিক ভূমিব্যবস্থার বিকাশের নির্দিষ্ট সময়কালও জানা যায় নি।

পাকিস্তান রাষ্ট্রে ১৯৫০ সালে জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত করা হয়। মধুপুর গড়ের বৃক্ষশোভিত উঁচুভূমি সরকার কর্তৃক বন বিভাগের কাছে হস্তান্তর করা হয়।[১০৭] জলমগ্ন নিম্নভূমি বন বিভাগের কর্তৃত্বাধীনে থাকে। ১৯৫৫ সালে মধুপুর গড়কে সংরক্ষিত বন হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ১৯৬০ সালের প্রথম দিকে মধুপুর জঙ্গল জাতীয় বনাঞ্চল হিসেবে ঘোষিত হয়।[১০৮]

উল্লেখ্য যে গারোদের জন্য বৃক্ষকর্তন নিষিদ্ধ ছিল। জুম চাষের জন্য ব্যবহৃত জমি এবং জুমভূমির নিকটস্থ জলাভূমিকে সরকারের নিজস্ব খাস জমিভুক্ত করা হয়। গারোরা শুধুমাত্র খাস জমি বলে ঘোষিত হয় নি এমন জলাভূমিতে চাষাবাদ করতে পারতো। প্রথমে চাষের জন্য গারোদেরকে জলাভূমিতে অস্থায়ী পাট্টা নামে অস্থায়ী উপস্বত্বাধিকার

১০৫. Kibriaul Khaleque. *Change in Social Organization*. 99.

১০৬. Gain & Moral. 'Land Right'. 56.

১০৭. *Dacca Gazette*. Nov. 8. 1951.

১০৮. *Dacca Gazette* Sept. 29. 1955

(usufruct) দেয়া হতো। এভাবে জমি ব্যবহারকারীকে জমি চাষ ও নিজ উত্তরাধিকারীদের নিকট হস্তান্তরের অনুমতি দেয়া হলেও জমি বিক্রির অনুমতি দেয়া হয় নি। এ সকল ভূমিতে অবস্থিত বৃক্ষ কর্তনের একমাত্র অধিকার সরকার সংরক্ষিত রাখতো। সরকার বিনা ক্ষতিপূরণে ভূমি পুনর্দখলেরও অধিকার সংরক্ষণ করতো। চাষীদের বাৎসরিক কর দিতে হতো সরকারকে। বেশ কয়েক বছর চাষাবাদের পর চাষীদেরকে জমির পূর্ণ মালিকানা দেয়া হতো, যাকে স্থায়ী পাট্টা বলা হতো। কাজেই সরকার কিছু জলাভূমিতে গারোদের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়, কিন্তু জুমভূমির উপর তাদের কোন অধিকার স্বীকার করে নি।[১০৯]

১৯৫৫ সালে মধুপুর জঙ্গলে জুম চাষ পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হয় এবং গারোদেরকে জলা ধান চাষে বাধ্য করা হয়। কিন্তু সেই সময়ের মধ্যেই জলা ধান চাষের উপযোগী বেশীর ভাগ জমি অধিগ্রহণ করা হয়। ফলে গারোদের মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্তরবিন্যাস তীব্র হয়। মনে রাখা প্রয়োজন যে গারোদের মধ্যে অর্থনৈতিক স্তরবিন্যাস আগে থেকেই বিরাজমান ছিল। গৃহস্থরা অধিক সংখ্যক শ্রমশক্তির সহায়তায় অথবা যারা সুষ্ঠুভাবে জমি চাষে দক্ষ ছিল তারাই অন্যদের তুলনায় ধনী হতে থাকে। কিন্তু জুমব্যবস্থায় ভূমিহীনতা অজানা ছিল। শুধুমাত্র জুমের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের সাথে সাথে গারোদের মধ্যে ভূমিহীনতার সৃষ্টি হয়। ভূমির মালিকানা সামাজিক মর্যাদা ও প্রতিপত্তির প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়।

১৯৬২ সালে সরকার হাজার হাজার বাঙালিকে মধুপুর জঙ্গলে বসতি স্থাপনের অনুমতি প্রদান করে। ফলে গারোদের ভূমির ক্ষেত্রে সংকটের সৃষ্টি হয়। আবার গারোরা যেসব ভূমিতে শতাব্দীব্যাপী বসবাস করছিল, ১৯৬৪ সালে সরকার তার অধিকাংশ কেড়ে নেয়। ১৯৬৮ সাল থেকে সরকার বিভিন্ন সময়ে বনভূমিতে অবৈধ বাসিন্দা হিসেবে আখ্যায়িত করে তাদেরকে উচ্ছেদের নোটিশ প্রদান করে।[১১০]

**(গ) পানিসম্পদ :** পূর্ব বাংলায় শিল্পায়নের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের পানিসম্পদ ব্যবহারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ লক্ষ্যে রাঙ্গামাটিতে কর্ণফুলী নদীর উপর জলবিদ্যুৎ প্রকল্প বাঁধ নির্মাণ করা হয়। এজন্য মার্কিন আর্থিক ও প্রযুক্তিক সহায়তায় ১৯৫৭-৬২ সালের মধ্যে কাপ্তাই নামক স্থানে নির্মিত বাঁধের উত্তর ও পূর্ব পাশে এক বিশাল হ্রদ বা জলাধার তৈরি করা হয়। এ প্রকল্প থেকে সরকার নিম্নোক্ত সুবিধা প্রাপ্তির প্রস্তাব করেছিল :

১০৯. Kibriaul Khaleque. *Change in Social Organization*. 1983 101.

১১০. Gain & Moral. 'Land Rights', 57.

(ক) পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ব গ্রিডের জন্য ১,২০,০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন।
(খ) কর্ণফুলী নদীর ভাটিতে (downstream) বন্যা নিয়ন্ত্রণ।
(গ) পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্গম (inaccessible) অঞ্চলে নৌচলাচল সুবিধা সৃষ্টি।
(ঘ) জলাধারে মৎস্যচাষের মাধ্যমে দেশের চরম প্রোটিন ঘাটতিসম্পন্ন এলাকায় অতিরিক্ত প্রোটিন সরবরাহ।
(ঙ) এলাকার দুর্গম অঞ্চল থেকে ব্যাপক পরিমাণে কাঠ সংগ্রহ সহজতর করা।[১১১]

উপরোক্ত বাঁধ নির্মাণ পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর উপর সুদূরপ্রসারী ফলাফল বয়ে আনে। বাঁধ নির্মাণের আগে উক্ত প্রকল্পের সামাজিক প্রভাব সম্পর্কে কোন গবেষণা করা হয় নি। বাঁধটি পার্বত্য চট্টগ্রামের সমগ্র জমির শতকরা ৪০ ভাগ অর্থাৎ ৫৪,০০০ একর আবাদযোগ্য জমিসহ ৪০০ বর্গমাইল এলাকা প্লাবিত করে। প্রায় ৯০ মাইল সরকারি রাস্তা এবং সংরক্ষিত বনের দশ বর্গমাইল এলাকা পানির নীচে তলিয়ে যায়। এর ফলে ভূমিমালিকানাসম্পন্ন প্রায় ১০,০০০ চাকমা চাষিপরিবার এবং প্রায় ৮,০০০ চাকমা জুমিয়া পরিবারের প্রায় ১০০,০০০-এর অধিক চাকমা জনগণকে ভূমিহীন বা বাস্তুহীনে পরিণত হয়। এ বাঁধ প্রায় ৮,০০০ বাঙালি এবং ১,০০০ মার্মা বসতি স্থাপনকারীকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে।[১১২] সরকার তড়িঘড়ি তাদের পুনর্বাসনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। তবে এ পরিকল্পনার কথা আগে ভাবা হয় নি এবং তা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িতও হয় নি। কাসালং-এর সংরক্ষিত বনাঞ্চলের অংশবিশেষ অসংরক্ষিত ছিল এবং সরকার সেখানে ৫,৬৩৩টি পরিবারকে পুনর্বাসিত করে। এদের প্রত্যেকে ৩ একর করে নিম্নমানের জমি লাভ করে, যা ছিল গড়ে এদের পুরনো ভূ-সম্পত্তির অর্ধেক। পুনর্বাসন কর্মসূচিতে সরকার বাঙালিদের অগ্রাধিকার প্রদান করে। কাসালং অঞ্চলের উৎকৃষ্ট ভূমিতে ৫৭০টি বাঙালি পরিবারকে পুনর্বাসিত করা হয়।[১১৩]

এরপরও ৪,৫০০টি পাহাড়ী পরিবার অবশিষ্ট থেকে যায়, যাদেরকে সমপর্যায়ের ভূমি বরাদ্দ করা হয় নি। তাদেরকে নিম্নমানের জমিতে মিশ্র চাষের জন্য পুনর্বাসন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ প্রকল্পটি ব্যর্থ হয়, কারণ পাহাড়ী জনগোষ্ঠী এ ধরনের চাষাবাদে অভ্যস্ত ছিল না। সরকারও পচনশীল উৎপাদিত দ্রব্য গুদামজাত করতে বা বাজারজাত করার ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ হয়েছিল। সামগ্রিকভাবে সরকার ১৮,০০০ উদ্বাস্তু পরিবারের ১১,৭৬১টিকে পুনর্বাসনের জন্য নিম্নমানের মাত্র ২০,০০০ একর সমতল আবাদযোগ্য ভূমি

১১১. Nazmul Islam. 'The Karnafuli Project. Its Implications on the Tribal Population'. *Public Administration.* vol. 3. No. 2. (Dacca 1978). 3.

১১২. M.Q.Zaman. 'Crisis in CHT. Ethnicity and Integration'. EPW. (Bombay 1982).

১১৩. D.E. Sopher. 'The Swidden Wet Rice Transition in the Chittagong Hills', *Annals of the Association ofAmerican Geographers.* Vol. 54. 1964. 350-351.

বরাদ্দ করতে সক্ষম হয়। এর অর্থ হলো নতুন বসতিতে নেহাত ৩৪,০০০ একর ভূমি হাতছাড়া হওয়া[১১৪] অধিকন্তু কাসালং এলাকার জমির শতকরা ৭০ ভাগ বর্ষার সময় জলমগ্ন হয়ে যায় বিধায় ঐ সময়ে চাষাবাদ অসম্ভব ছিল। যেহেতু ভূমিতে জুমিয়াদের কোন স্বত্ব ছিল না, সেহেতু পাহাড়ী জনগণের যাযাবর বৃত্তির কারণে পুনর্বাসন কর্মসূচিতে তাদের পুনর্বাসনের বিষয়টি বিবেচনা করা হয় নি। এটি আসলে সত্যের অপলাপ ছিল, তাই সিরাজউদ্দিন উল্লেখ করেন :

> জুমিয়াদের চাষাবাদ অবশ্যই যাযাবরভিত্তিক ছিল, কিন্তু ব্যাপক ধারণার বিপরীতে তাদের পৈত্রিক গ্রামগুলি ছিল স্থায়ী। জুমের জন্য উপযুক্ত ভূমির সন্ধানে তারা দূর দুরান্তে চলে যেতো ... জুমভূমিতে তারা কুঁড়েঘর নির্মাণ করতো এবং শস্য দেখাশুনার জন্য পুরো মৌসুম সেখানে অবস্থান করতো। কিন্তু মৌসুম অতিক্রান্ত হলেই তারা নিজস্ব গ্রামে ফিরে যেতো।[১১৫]

কাপ্তাই বাঁধ পাহাড়ী জনগোষ্ঠীকে অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত করা ছাড়াও আন্তর্জাতিক শরণার্থীতে রূপান্তরিত করে। উদ্বাস্তু জনগণের প্রায় ৪০,০০০ ভারতে পাড়ি জমায়। এ অভিপ্রয়াণ ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রের উন্নয়নের রাজনীতির প্রতি পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর এক নিরব প্রতিবাদ।

সরকার কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের ফলে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দানের জন্য একটি রাজস্ব ক্ষতিপূরণ কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। ঐ কার্যালয়টি পুরোপুরিভাবে বাঙালি কর্মকর্তা সমন্বয়ে গঠিত ছিল। সরকার ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ৫১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বরাদ্দ করে, কিন্তু মাত্র ২.৬ মিলিয়ন ডলার বিতরণ করা হয়।[১১৬]

জনগণকে বাস্তুহারা করা ছাড়াও চাষিদেরকে ইতিমধ্যে দুর্লভ জমিতে জুমচাষ গ্রহণে বাধ্য করা হয়। ফলশ্রুতিতে জমির উর্বরতা হ্রাস পায়। জুম থেকে উৎপাদন কমে যায় এবং চাষীদের মধ্যে অনাগ্রহ সৃষ্টি হয়। যাহোক কাপ্তাই প্রকল্প পূর্ব বাংলার সমগ্র বিদ্যুৎ চাহিদার মাত্র শতকরা ০.৫ ভাগ এবং শিল্প ও বাণিজ্যের চাহিদার শতকরা মাত্র ৩ ভাগ সরবরাহ করতে সক্ষম হয়। যেখানে কাপ্তাই বাঁধ অবস্থিত সেখানে পূর্বাঞ্চল বিদ্যুৎ জোনে (zone) প্রাকৃতিক গ্যাস ও তেলের ভাণ্ডারসহ প্রধান বিকল্প শক্তির মজুদ ছিল।[১১৭] এই বাঁধ

১১৪. N. Islam, "*The Karnafuli Project*', 31-32

১১৫. A.M. Serajuddin. 'The Chakma Tribe of the CHT in the Eighteenth Century' *Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland*. No. 1 1984. 92

১১৬. S. Kamaluddin, ' A Tangled Web of Insurgency', *Far Eastern Economic Review*, May 23, 980. 34.

১১৭. Srijagdish, "পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন ও বাংলাদেশের ভূমিকা", জুম্ম সংবাদ বুলেটিন নং ৫ (জে এস এস প্রকাশনী ১৯৯১)।

নির্মাণের ফলে উৎপাদন হ্রাস এবং পার্বত্য জনগোষ্ঠীর দুর্ভোগ-দুর্গতির প্রেক্ষিতে পাহাড়ী জনগণ কাপ্তাই বাঁধকে একটি মৃত্যুফাঁদ বলে মনে করে।[১১৮] এ সমস্ত ধারণা ও মন্তব্যে রাষ্ট্রের উন্নয়ন পদক্ষেপের বিরুদ্ধে পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর সংশয়াকুল মনোভাবেরই প্রকাশ ঘটে।

কাপ্তাই হ্রদ সংশ্লিষ্ট এলাকাটিকে একটি আকর্ষণীয় পর্যটনকেন্দ্রে পরিণত করেছে। এটি রাষ্ট্রের জাতীয় রাজস্ব আয়ে অবদান রাখলেও পাহাড়ীদেরকে হাস্যকৌতুক ও বিনোদনের বস্তুতে পরিণত করেছে, যা সচেতন পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর মনে গভীর ক্ষোভের সঞ্চার করেছে। পাহাড়ী জনগণ আরো অভিযোগ করে যে সরকার তাদেরকে বিনা খরচে বিদ্যুৎ সরবরাহের অঙ্গীকার করেছিল, কিন্তু স্থানীয় জনগণ শতকরা মাত্র একভাগ বিদ্যুৎ পায় আর তাও বিনা খরচে নয়। বাঁধ নির্মাণের ফলে সৃষ্ট ব্যবসা এবং কর্মসংস্থানও একচেটিয়াভাবে বাঙালিদের করায়ত্ত হয়।

**উপসংহার :** এথনিক জনগোষ্ঠীর প্রান্তিকীকরণ এবং বিচ্ছিন্নকরণ বাংলাদেশ রাষ্ট্রে বাঙালি/বাংলাদেশী মডেলের জাতীয়তাবাদের অভিধার আড়ালে আরো ঘনীভূত ও তীব্র হয়েছে। এর গূঢ় অর্থ হলো ক্ষুদ্র সম্প্রদায়গুলোর উপরে প্রধান এথনিক গোষ্ঠীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা। এক্ষেত্রে দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, সংখ্যালঘু এথনিক গোষ্ঠীগুলো আধিপত্য প্রতিরোধের অস্ত্র হিসেবে নিজেদের পরিচিতি নির্মাণের রাজনীতি অবলম্বন করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বাস্তবতা এক্ষেত্রে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। প্রায় দুই দশক ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি স্বায়ত্তশাসিত এলাকা হিসেবে এবং পাহাড়ী জনগোষ্ঠীকে একটি জুম্ম জাতি হিসেবে স্বীকৃতি আদায়ের জন্য বিদ্রোহী আন্দোলন চলছে।[১১৯] সমতলের এথনিক গোষ্ঠীগুলো বাঙালিদের থেকে তাদের স্বাতন্ত্র্য দাবি করে আদিবাসী বলে নিজেদের পরিচয় দিতে গর্ব বোধ করে। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগোষ্ঠীগুলোও পাহাড়ের আদি বসতকারী হিসেবে নিজেদেরকে জাতি বলে বিবেচনা করে। একই সময়ে তারা দাবি করে যে তারা জাতির সকল বৈশিষ্ট্য ধারণ করে এবং প্রয়োজনবোধে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সে জাতীয়তা অর্জন করতে পারে। এই আত্মপরিচয়ের সন্ধান এসব গোষ্ঠীর সামনে শুধু সংকটই নয় বরং অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ও চাঞ্চল্যকরভাবে রাষ্ট্র থেকে এদের বিচ্ছিন্নতাকে

১১৮. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, Amena Mohsin. *Politics of Nationalism: The Case of the CHT. Bangladesh*. Unpublished Ph. D. thesis. (Cambridge University 1995).

১১৯. ব্যক্তিগত সাক্ষাতকারে (জুন-সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬) লেখকের কাছে বিভিন্ন এথনিক গোষ্ঠীর সদস্যবর্গ এই সুপারিশ করেন।

তুলে ধরে। কাজেই এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এ থেকে পরিত্রাণের উপায় কি? এ পরিপ্রেক্ষিতে বিম্নোক্ত সমাধান প্রস্তাব করা যেতে পারে :

(ক) ক্ষমতা অর্পণের মাধ্যমে রাষ্ট্রের গনতন্ত্রায়ণ;
(খ) সমাজ এবং সংস্কৃতির গণতন্ত্রায়ণ; এবং
(গ) সমাজ এবং সংস্কৃতির বিকেন্দ্রীকরণ।

উপরোক্ত জটিল পরিস্থিতির বিচারে এর চেয়ে কম কিছু করার চেষ্টা ব্যর্থ প্রয়াস হতে বাধ্য।

## সংযুক্তি (Appendix)

| এথনিক গোষ্ঠী | জনসংখ্যা |
|---|---|
| বম | ১৩৪৭১ |
| বংশী | ২১১২ |
| বুনা | ৭৪২১ |
| চাকমা | ২৫২৮৫৮ |
| সাক | ২১২৭ |
| গারো | ৬৪২৮০ |
| হাজং | ১১৫৪০ |
| হরিজন | ১১৩২ |
| খুমি | ১২৪১ |
| খাসি | ১২২৮০ |
| খিয়াং | ২৩৪৩ |
| কোচ | ১৬৫৬৭ |
| লুসাই | ৬৬২ |
| মাহাত | ৩৫৩৪ |
| মনিপুরী | ২৪৮৮২ |
| মার্মা | ১৫৭৩০১ |

| | |
|---|---|
| ম্র | ১২৬ |
| ম্রং | ২২১৭৮ |
| মুন্ডা | ২১৩২ |
| ওরাঁও | ৮২১৬ |
| পাহাড়িয়া | ১৮৫৩ |
| পাংখো | ৩২২৭ |
| রাজবংশী | ৫৪৪৪ |
| রাখাইন | ১৬৯৩২ |
| সাঁওতাল | ২০২১৬২ |
| তনচংগ্যা | ২১৬৩৯ |
| টিপরা | ১২৪২ |
| ত্রিপুরা | ৭৯৭৭২ |
| উরুয়া | ৫৫৬১ |
| অন্যান্য | ২৬১৭৪৩ |

# ২০

## মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্ব

এনায়েতুর রহিম*

### দ্বিজাতিতত্ত্বভিত্তিক পাকিস্তানের অবসান-সূচনা

১৯৪৭ সালে সৃষ্ট দ্বিজাতিতত্ত্বভিত্তিক পাকিস্তানের অবসানের সূচনা হয়েছিল কখন থেকে ? অবশ্যই ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের দিন থেকে নয়। দেশবিভাগকে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ বরণ করে নিয়েছিল অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। এ গ্রন্থের চতুর্দশ অধ্যায়ে কামাল দেখিয়েছেন কিভাবে পাকিস্তানের সকল শ্রেণীর নাগরিক পাকিস্তানকে তাদের নিজেদের রাষ্ট্র হিসেবে মেনে নিয়েছিল। তা হলে পরবর্তীতে পাকিস্তান পরিত্যক্ত হলো কিভাবে ? দ্বিজাতিতত্ত্বভিত্তিক পাকিস্তানের অবসানপর্ব কখন থেকে শুরু হলো ? ভাষা আন্দোলন থেকে ? আওয়ামী মুসলিম লীগের জন্ম থেকে ? পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের পতন থেকে ? যুক্তি দেখানো যেতে পারে যে, সকল ঘটনা ছিল মুসলিম লীগের শাসকচক্রের বিরুদ্ধে গণপ্রতিবাদের বহিঃপ্রকাশ এবং তা কোনোভাবেই পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ছিল না। পাকিস্তান গণপরিষদে (১৯৫৬-৫৮) শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ অথবা আওয়ামী লীগ বা অন্য কোনো দলের কোনো সদস্যের ভাষণ এ ইঙ্গিত দেয় না যে তাঁদের কারো মনে পাকিস্তান সত্তার ব্যাপারে কোনো দ্বিধা ছিল। সত্যিকার অর্থে, ১৯৭১ সালের মার্চের পূর্বে পাকিস্তান সত্তাকে কোনো রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীই চ্যালেঞ্জ করে নি, যদিও অনেক নেতা বা বুদ্ধিজীবীর মতে পাকিস্তানের পতন ছিল অবশ্যম্ভাবী।

বিপ্লবের মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ছিল একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। ইতিহাসের কোনো যুগান্তকারী ঘটনাই অকস্মাৎ বা কোনো বিশেষ তারিখে শুরু হয় না। এর বীজ অঙ্কুরিত হয় সহজে দৃশ্যযোগ্য নয় এমন এক সময়ে। সম্ভবত পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই

* Professor of History, Georgetown University, Washington D.C.

এর মধ্যে এর ধ্বংসের বীজ নিহিত ছিল। এই অনুমানের ভিত্তিতে আমরা আমাদের বিবরণ শুরু করবো সেই সময়কাল থেকে যখন পাকিস্তানকে ঘিরে উন্মাদনা স্তিমিত হয়ে পড়েছিল অর্থাৎ ১৯৫৪ সালের নির্বাচনকাল থেকে।

**১৯৫৪ সালের নির্বাচন এবং তারপর**

কয়েক দফা নির্বাচন পেছানোর পর অবশেষে ১৯৫৪ সালে তা অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনের ফলাফল ছিল ঐতিহাসিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। এ নির্বাচনে ১৯৪৭ সাল থেকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত মুসলিম লীগ নেতৃত্বের সার্বিক পরাজয় ঘটে। অথচ অর্ধশতাব্দী পূর্বে এই পূর্ববঙ্গেই মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আবার এই পূর্ববঙ্গেই দলটি প্রত্যাখ্যাত হলো। এই নির্বাচনী বিপর্যয়ের পর দলটি দ্রুত জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং অবশেষে প্রায় সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে বাঙালি নির্বাচকমণ্ডলী মুসলিম লীগের ক্ষমতার দুর্গে প্রথম আঘাত হানে। অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে, ১৯৫৪ সালের নির্বাচন ছিল প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে একটি সুস্পষ্ট গণরায়। এ ক্ষেত্রে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, বিশেষত যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসনের অস্পষ্ট ধারণাটি একটি সুনির্দিষ্ট রূপ পায়। স্বায়ত্তশাসন বিষয়ে গণবিতর্ক এবং সংলাপ অনুষ্ঠিত হওয়ার ফলে জনগণ প্রদেশের অভাব-অভিযোগের ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠে।

ক্ষমতাসীন দল ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে আঞ্চলিক রাজনৈতিক শক্তিকে খাটো করে দেখেছিল। ভাষা বিতর্ক ছাড়াও সংসদে প্রতিনিধিত্ব এবং ভোটাধিকার নিয়ে সাংবিধানিক অচলাবস্থা, কেন্দ্রে ক্ষমতার ভাগাভাগি, রাষ্ট্রের চরিত্র নির্ধারণে ইসলামের ভূমিকা এবং অন্যান্য বিবেচ্য বিষয়ের মধ্যে ছিল দুই অঞ্চলের মধ্যে প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য, সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্রে বাঙালিদের প্রতিনিধিত্ব এবং সম্পদ বণ্টনে অসমতা।[১]

প্রদেশে কর্মরত ঔপনিবেশিক ঐতিহ্যপুষ্ট আমলাদের অধিকাংশই ছিল অবাঙালি। এদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল এমন যে, প্রায়শ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের অগোচরেই এরা নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করতো। এ ধরনের ঔদ্ধত্যের কারণে সিনিয়র আমলা ও রাজনীতিবিদদের মধ্যে সংঘাত ছিল অবশ্যম্ভাবী। এর একটি উদাহরণ ছিল মুসলিম লীগ দলীয় মন্ত্রী হামিদুল হক চৌধুরীর সঙ্গে মুখ্য সচিব আজিজ আহমেদের বিরোধ, যিনি মন্ত্রীর অজ্ঞাতেই জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের নিয়োগ ও বদলি করতেন।[২] ১৯৪৯ সালের দি পাবলিক এ্যান্ড রিপ্রেজেন্টেটিভ অফিসার্স (ডিসকোয়ালিফিকেশন) এ্যাক্ট (PRODA)-এর অধীনে দুর্নীতির দায়ে সরকারি দপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিচার করা যেতো এবং দণ্ডিত হলে তারা নির্বাচনে

১. বিস্তারিত জানার জন্য এ সিরিজের দ্বিতীয় খণ্ডে রেহমান সোবহান রচিত অধ্যায় দেখুন।

২. দেখুন, Khalid Bin Sayeed, *Political System of Pakistan*, (Boston: Houghton Mifflin), 1961, 64.

কোনো পদের জন্য প্রার্থী হওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত হতো। ভিন্ন মতাবলম্বীদেরকে শায়েস্তা করার জন্য এই আইন নির্বিচারে ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে ১৯৫৪ সালে যখন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তখন প্রদেশের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, প্রশাসনিক এবং অর্থনৈতিক সকল ক্ষেত্রে বাঙালিদের উল্লেখযোগ্য প্রান্তিকীকরণ ঘটে।

জনগণ থেকে সর্বোচ্চ সমর্থন আদায় এবং ঐক্যের মাধ্যমে শক্তি সঞ্চয়ের প্রাক-নির্বাচনী কৌশল অবলম্বন করে মুসলিম লীগের বিরোধীরা একটি শক্তিশালী জোট গঠন করে, যা সদূরপ্রসারী রাজনৈতিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়। এ পর্যায়ে যে যুক্তফ্রন্ট[৩] মোর্চা গঠিত হয় তার একটি সাধারণ লক্ষ্য ছিল প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন অর্জন এবং আরেকটি যৌথ ও অবিচল লক্ষ্য ছিল প্রদেশে মুসলিম লীগের কর্তৃত্বের অবসান ঘটানো। স্বায়ত্তশাসনের আপোসহীন প্রবক্তা হিসেবে আবির্ভূত আওয়ামী লীগ ছাড়া জোটে অন্তর্ভুক্ত ছিল কৃষক শ্রমিক পার্টি, গণতন্ত্রী দল, নিজাম-ই-ইসলামী এবং কয়েকটি ক্ষুদ্রাকার বামপন্থী গোষ্ঠী। জোটের নেতৃত্বে ছিলেন সোহরাওয়ার্দী, ভাসানী এবং ফজলুল হকের মতো বয়োজ্যেষ্ঠ নেতা এবং তরুণ ও উদ্যমী নেতা শেখ মুজিবুর রহমান, যাঁর উপর ন্যস্ত ছিল জোটের সাংগঠনিক কাঠামো নির্মাণের কঠিন দায়িত্ব।

পূর্ব বাংলার রাজনীতির ভবিষ্যৎ গতিধারার ছায়াস্বরূপ জোটের ২১ দফা কর্মসূচির মূল উপাদান ছিল ফেডারেল কাঠামোর অধীনে রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসন এবং পশ্চিম পাকিস্তানী আধিপত্য প্রত্যাখ্যান করার বাঙালি অবস্থান। যদিও এতে কিছু বিপরীতমুখী লক্ষ্য ছিল, বিভিন্ন মতাদর্শে বিশ্বাসী সমগ্র বিরোধী নেতৃত্বই নিঃশর্তভাবে ২১ দফা কর্মসূচি মেনে নেয়।

শহর ও পল্লী উভয় অঞ্চলের প্রতিনিধিত্বের দাবিদার আওয়ামী লীগ মার্চে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে একক বৃহত্তম দল হিসেবে আবির্ভূত হয়। দ্বিতীয় স্থান দখল করে কৃষক শ্রমিক পার্টি। মুসলিম লীগ লাভ করে মাত্র ১০টি আসন।[৪] নির্বাচনী প্রতীক হিসেবে 'নৌকা' ব্যবহার করে যুক্তফ্রন্ট যে চমকপ্রদ বিজয় অর্জন করে, তা ছিল অসাধারণ এবং প্রকৃতিগত দিক দিয়ে বৈপ্লবিক মাত্রার, কারণ এ বিজয় একটি গণসমর্থনপুষ্ট সরকার গঠনের ভিত্তি গড়ে তোলে। তবে, এর মাধ্যমে গঠিত যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা অচিরেই সংবিধান এবং পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন বিষয়ে করাচীর সাথে বিবাদে জড়িয়ে পড়ে। ক্ষমতায় আরোহণের ছয় সপ্তাহের মধ্যে দেশদ্রোহিতা এবং পাকিস্তান রাষ্ট্র থেকে পূর্ববঙ্গকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ফজলুল হককে সরিয়ে দেয়া হয়।[৫] তাঁর মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যর্থতার অভিযোগও আনা হয়। একটি নির্বাচিত সরকারকে হটিয়ে গভর্নরের

৩. ফজলুল হককে সংসদীয় নেতা নির্বাচন করে ১৯৫৩ সালের মে মাসে যুক্তফ্রন্ট গঠন করা হয়।

৪. ৩০৯ সদস্য বিশিষ্ট সংসদে (পৃথক নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত) দলীয় সদস্য ছিলেন নিম্নরূপ : আওয়ামী লীগ—১৪০, কৃষক শ্রমিক—৩৪, নিজাম-ই-ইসলামী—১২, গণতন্ত্রী দল—১০, যুবলীগ—১৫, কমিউনিস্ট পার্টি—৪, মুসলিম লীগ—১০। অমুসলিম সদস্যদের মধ্যে ৬৮ জন যুক্তফ্রন্টকে সমর্থন দেন।

৫. *Pakistan Observer*, May 31, 1954.

শাসন জারির মাধ্যমে আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর স্বেচ্ছাচারী হস্তক্ষেপের উদ্দেশ্য ছিল যুক্তফ্রন্টে ভাঙন সৃষ্টি করা। ফ্রন্টের ভেতরে গোষ্ঠী ও স্বার্থের সংঘাত চরম আকারে বিরাজমান ছিল, যার সাথে যুক্ত ছিল ক্ষমতা ও অন্যান্য সুবিধালাভের প্রতিশ্রুতি।

১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারির পূর্ববর্তী কয়েকটি বছর প্রাদেশিক সরকার নিয়ন্ত্রণের জন্য যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলোর মধ্যে কোন্দল তাদের স্বায়ত্তশাসনের প্রয়াসকে বাধাগ্রস্ত করে। এই সময়কালে ছলচাতুরীর রাজনীতি দলগুলোর মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ করে। গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ নির্বাচিত যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বরখাস্ত করেছিলেন। হতবাক হওয়ার মতো বিষয় এই যে এর পর একই গভর্নর জেনারেল যখন ঢাকায় আসেন, তখন ঢাকা বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানিয়ে মাল্যভূষিত করার জন্য যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলো রীতিমতো প্রতিযোগিতা করেছিল।[৬]

এমন তথ্যও আছে যে গভর্নরের শাসন জারির নেপথ্যে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর হাত ছিল, যারা ভয় করেছিল যে ফ্রন্টের কিছু বামঘেঁষা সদস্য ১৯ মে তারিখে স্বাক্ষরিত যুক্তরাষ্ট্র-পাকিস্তান সামরিক মৈত্রীচুক্তির বিরোধী। রাজনীতিকদের ব্যাপারে, বিশেষত পূর্ববঙ্গের রাজনীতিকদের ব্যাপারে সামরিক বাহিনীর কোন ধৈর্য ছিল না। এসব রাজনীতিক পাকিস্তানের কিছু ভিত্তি নিয়েও প্রশ্ন তুলছিল। অধিকন্তু, হক মন্ত্রিসভার পতনে পাকিস্তানে অবস্থানরত মার্কিন কূটনীতিকদেরও হয়তো হাত ছিল। শোনা যায় যে, পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের ১৬২ জন সদস্য যুক্তরাষ্ট্র-পাকিস্তান সামরিক চুক্তির প্রতিবাদ করে বিবৃতি দিয়েছিলেন। শীতল যুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্র যখন পাকিস্তানকে মস্কোর বিরুদ্ধে মার্কিন স্বার্থের একটি মজবুত ঘাঁটি হিসেবে দেখছিল, তখন পাকিস্তানের সবচেয়ে জনবহুল প্রদেশে বামঘেঁষা দলগুলোর শাসন নিঃসন্দেহে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য অস্বস্তিকর ছিল।

এমন বিশ্বাসও কারো কারোর মধ্যে ছিল যে ১৯৫৪ সালের ১৭ মে তারিখে প্রদেশের গভর্নর হিসেবে চৌধুরী খলিকুজ্জামানের স্থলাভিষিক্ত করার জন্য মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জাকে প্রেরণের লক্ষ্য ছিল চুক্তিবিরোধী শক্তিকে নির্মূল করা। মির্জা খুব দ্রুততার সাথে একজন মন্ত্রীসহ যুক্তফ্রন্টের প্রায় এক হাজার নেতা ও সমর্থককে গ্রেফতার করেন, যাদের অনেকেই ছিলেন নিষিদ্ধ ঘোষিত কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। অন্যান্য বামপন্থী গোষ্ঠীকেও নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। ফজলুল হককে আটক এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়।

দু'টি শিল্প চন্দ্রঘোনা কাগজের কল ও আদমজী পাটকলে দাঙ্গার ফলে যে প্রাণহানি ঘটে এবং ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়, তাও এখানে বিবেচনায় আনা যায়। মার্কিন অর্থায়নে স্থাপিত কাগজের কলটির ব্যবস্থাপনা ছিল প্রধানত অবাঙালিদের নিয়ন্ত্রণাধীন। আদমজীর মালিকানা

৬. G. W. Chowdhury *Constitutional Development of Pakistan*, (London 1959), 143.

ও ব্যবস্থাপনা ছিল জনৈক অবাঙালি পুঁজিপতির হাতে। বাঙালি ও অবাঙালিদের মধ্যে উত্তেজনা অনেকদিন ধরেই বিদ্যমান ছিল। উভয় কারখানাতেই ব্যবস্থাপনা ছিল বাঙালি শ্রমিকদের দৃষ্টিতে কট্টর বাঙালিবিরোধী, কাজেই বহিরাগতদের শোষণের প্রতীক। উভয় বিরোধই পর পর ঘটে ১৯৫৪ সালের ২৩ ও ২৫ মে তারিখে, প্রথমটি নির্বাচনের সময় আর দ্বিতীয়টি মন্ত্রিসভা গঠনের প্রক্রিয়া চলাকালে। অনেকে সন্দেহ করেছিল যে পশ্চিম পাকিস্তানী ক্ষমতাশীল গোষ্ঠীই বাঙালি শ্রমিকদের শ্রেণীচেতনা ও ঐক্য বিনষ্ট করার জন্য এই সংঘাত দু'টি ঘটানোর জন্য ইন্ধন যুগিয়েছিল।[৭] উভয় কারখানাতেই বাঙালি শ্রমিকরা যুক্তফ্রন্টের কট্টর সমর্থক ছিল এবং নির্বাচনে একজোট হয়ে ফ্রন্টের পক্ষে ভোট দিয়েছিল। স্বায়ত্তশাসনের দাবিদার যুক্তফ্রন্ট সরকার ছিল কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন এলিটগোষ্ঠীর জন্য প্রদেশে তাদের অবাধ নিয়ন্ত্রণের প্রতি একটি সত্যিকারের হুমকি।

ধূর্ত প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী (বগুড়া) ফ্রন্টের ঐক্যে, বিশেষত আওয়ামী লীগ এবং কৃষক শ্রমিক পার্টির ঐক্যে ফাটল ধরাতে ফজলুল হককে পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং তাঁর বিশ্বস্ত অনুসারী হওয়ার আমন্ত্রণ জানান, যাঁকে কিছুদিন পূর্বেই বিশ্বাসঘাতক আখ্যা দেয়া হয়েছিল। আবু হোসেন সরকারকে মন্ত্রিসভা গঠনের সংকেত দেয়া হয়েছিল, যদিও প্রাদেশিক সংসদে কৃষক শ্রমিক পার্টির সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না। কৃষক শ্রমিক পার্টিতে যোগদান করলে মন্ত্রিত্ব লাভ করা যাবে এই আশায় ১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ধারাবাহিকভাবে উচ্চাভিলাষী সদস্যগণ কর্তৃক দলত্যাগের ঘটনা ঘটে, যার ফলে আওয়ামী লীগ সংসদে সংখ্যালঘিষ্ঠে পরিণত হয়। ইতিমধ্যে ১৯৫৪ সালের ২৪ অক্টোবর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণের সময় মোহাম্মদ আলী সোহরাওয়ার্দীকে আইনমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণে রাজি করাতে সক্ষম হন। এর ফলে আওয়ামী লীগের প্রগতিশীল অংশ আরো দুরবস্থায় পতিত হয়। মোহাম্মদ আলী ফজলুল হকের একজন প্রতিনিধিকে মন্ত্রিসভায় স্থান দেন। করাচীর গভর্নর হিসেবে ফজলুল হক ১৯৫৫ সালের জুন মাসে ঢাকা ফিরে আসেন এবং তাড়াহুড়ো করে কৃষক শ্রমিক পার্টির নেতৃত্বে গঠিত সরকারকে শপথ গ্রহণ করান। কাজেই আওয়ামী লীগ প্রাদেশিক পরিষদে বিরোধী দলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। ফলে শক্তিশালী যুক্তফ্রন্ট, যা প্রদেশে মুসলিম লীগের নিয়ন্ত্রণের অবসান ঘটায়, তা অবলুপ্ত হয়ে যায়, যদিও তার একটি খোলস আরো কিছুদিন নামেমাত্র টিকে ছিল।

### সংবিধান প্রণয়নের রাজনীতি

পাকিস্তানে সংবিধান প্রণয়নের প্রক্রিয়া ভারতের অনুরূপ না হয়ে ধীরগতিসম্পন্ন, বিবাদ-বিসংবাদে পূর্ণ এবং ক্লান্তিকর হয়ে উঠে। গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ প্রথম গণপরিষদ ১৯৫৪ সালের অক্টোবর মাসে ভেঙে দেন। বাহ্যত এর উদ্দেশ্য ছিল যেসব বিল রাষ্ট্রপ্রধানের সংসদ ও মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করার বিশেষ সুবিধা খর্ব করে সেসব বিল বলবৎ

---

৭. ঐ।

করতে না দেয়া। ১৯৫৫ সালে পাকিস্তানের ফেডারেল আদালত এই মর্মে নির্দেশ জারি করে যে একটি নতুন গণপরিষদ অবশ্যই গঠন করতে হবে। পরিষদটি অবশ্য গঠিত হবে উভয় প্রদেশের সমতা অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সমান সংখ্যক সদস্য নেয়ার ভিত্তিতে। গণপরিষদের নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫৫ সালের জুন মাসে। সমতার নীতি অনুযায়ী পূর্ব পাকিস্তান পায় ৪০টি আসন, যাদের অধিকাংশই ছিল যুক্তফ্রন্টের। জুলাই মাসে মারীতে অনুষ্ঠিত নব নির্বাচিত পরিষদের প্রথম সভায় সোহরাওয়ার্দী ও ফজলুল হকের মধ্যে মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও যুক্তফ্রন্টের নেতৃত্ব পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃত্বের সাথে এই মর্মে একটি অনানুষ্ঠানিক চুক্তি স্বাক্ষর করে : পশ্চিম পাকিস্তান একটি এককে পরিণত হবে; প্রতিটি প্রদেশেই পরিপূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন বিদ্যমান থাকবে; সকল ক্ষেত্রেই দু'টি প্রদেশের মধ্যে সমতা বিদ্যমান থাকবে। যুক্ত নির্বাচনের ভিত্তিতে ভোটাভুটি অনুষ্ঠিত হবে। বাংলা ও উর্দু উভয়ই হবে রাষ্ট্রভাষা।[৮] পরিষদে উভয় প্রদেশের জন্য সমান সংখ্যক আসনের ব্যাপারে ফজলুল হক সোহরাওয়ার্দীর বিরোধিতা করেন, যেহেতু জনসংখ্যা বেশি হওয়ায় পূর্ব বাংলার অধিক আসন লাভের অধিকার ছিল।

দ্বিতীয় গণপরিষদ সংবিধান প্রণয়নের দায়িত্ব যথারীতি পালন করে, যা ১৯৫৫ সালের ২৬ মার্চ পাশ ও কার্যকর হয়। সেই তারিখ থেকে পাকিস্তান একটি ইসলামী প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়। বাস্তবে এটি ছিল দু'টি বিপরীতমুখী শক্তি—স্বায়ত্তশাসনকামী পূর্ববঙ্গ এবং কেন্দ্রমুখী পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে একটি দায়সারা সমঝোতা। সংবিধান বাংলাকে দুটি রাষ্ট্রভাষার একটি হিসেবে স্বীকৃতি দান করে এবং পূর্ববঙ্গকে কিছুটা হলেও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান করে। এটি পৃথক নির্বাচন প্রবর্তনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ পিছিয়ে দেয়। যদিও প্রধানমন্ত্রীর পদ প্রত্যাশী সোহরাওয়ার্দী বিরোধী দলীয় নেতা হিসেবে এই দলিলে স্বাক্ষর করেন, দলের বামপন্থী সদস্যসহ মোট ২২ জন সদস্য দলিলে স্বাক্ষর করা থেকে কেবল বিরতই থাকেন নি, সংবিধানের ইসলামী নামকরণ এবং স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে ছাড় দেয়ার প্রতিবাদে পরিষদের অধিবেশন বর্জন করেন। পূর্ববঙ্গের ২২ জন সদস্যের[৯] সাহসী ভূমিকা প্রগতিশীলদের সম্মান বহুলাংশে বৃদ্ধি করে। এর একটি পরিণতি ছিল কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার প্রতি দ্রুত সমর্থন হ্রাস এবং ১৯৫৬ সালের গ্রীষ্মে এর পতন। এ সময় থেকে একটি অসাম্প্রদায়িক সংবিধান প্রণয়ন এবং যুক্ত নির্বাচন ইস্যুই সকল প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলের মুখ্য নীতি হয়।

যদিও আওয়ামী লীগের একটি কট্টর অংশ সংবিধানের বিরোধিতা করে, নতুন সংবিধানের অধীনেই আওয়ামী লীগ পূর্ববঙ্গ এবং কেন্দ্র উভয় স্থানে ক্ষমতা গ্রহণ করে। ১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বরে সোহরাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন আর আওয়ামী লীগের

৮. Talukdar Maniruzzaman, *The Bangladesh Revolution and its Aftermath*, Dhaka: Bangladesh Books International, 1980, 78.

৯. আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে যে ওয়াক আউট হয় তাতে সমর্থন জোগায় গণতন্ত্রী দল।

আতাউর রহমান খান পূর্ববঙ্গে একটি কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ঘটনার এই বিবর্তনে মনে হয়েছিল যে পাকিস্তানের ক্ষমতাকাঠামোতে পূর্ববঙ্গ কিছুটা স্থান করে নিয়েছে।

### আওয়ামী লীগে বিভক্তি এবং অতঃপর

কেন্দ্রে রিপাবলিকান পার্টির সাথে আওয়ামী লীগের ক্ষমতা ভাগাভাগি এবং কোয়ালিশন সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এইচ. এস. সোহরাওয়ার্দীর অনুসৃত অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র নীতির কারণে আওয়ামী লীগের মধ্যে বিভেদ দেখা দেয়। পূর্ববঙ্গে আওয়ামী লীগের সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ছিলেন সোহরাওয়ার্দীর নীতিগুলোর বিরুদ্ধে। ১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কাগমারীতে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে ভাসানী তাঁর অভিযোগগুলো উত্থাপন করেন এবং বলেন যে পূর্ববঙ্গের অভাব-অভিযোগসমূহ পূরণ করা না হলে ভবিষ্যতে এমন একটি সময় আসতে পারে যখন পাকিস্তানকে বিদায় জানানো হবে। কোনো রাজনৈতিক নেতার কাছ থেকে পাকিস্তানের ধারণার বিরুদ্ধে এরকম উক্তি ছিল এই প্রথম।[১০] ভাসানীর এই হুশিয়ারির পর ৩ এপ্রিল বঙ্গীয় সংসদে সর্বসম্মত একটি প্রস্তাব পাশ হয়, যাতে পররাষ্ট্র বিষয়াদি ও মুদ্রা ছাড়া অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি জানানো হয়।[১১] ১৯৫৭ সালের ১৩ জুন অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের পরবর্তী কাউন্সিল অধিবেশনে ভাসানীর এই আপোসহীন মনোভাব পরীক্ষার সম্মুখীন হয়, যখন সোহরাওয়ার্দী তাঁর পশ্চিমঘেঁষা পররাষ্ট্রনীতি ও প্রতিরক্ষাচুক্তির পক্ষে সমর্থন আদায়ে সক্ষম হন। দুই নেতা ও তাঁদের সমর্থকদের বিরোধের এই পর্যায়ে ভাসানী আওয়ামী লীগ থেকে পদত্যাগ করেন এবং ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠন করেন, যাকে পশ্চিম পাকিস্তানের কিছু দলছুট বামপন্থী রাজনীতিবিদও সমর্থন করেন।

পূর্ববঙ্গের রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতি সন্দেহ ও অবিশ্বাসের কারণে কেন্দ্রে আওয়ামী লীগের মেয়াদ সংক্ষিপ্ত হতে বাধ্য। বিতর্কের মূল বিষয় ছিল এক ইউনিট ইস্যুটি। ক্ষমতাধর ব্যক্তিরা যেখানে পশ্চিম পাকিস্তানের একক সত্তাকে ভেঙে ফেলার পক্ষে ছিলেন, সেখানে সোহরাওয়ার্দী ছিলেন এর ঘোর বিরোধী। তিনি আরো চেয়েছিলেন বৈপ্লবিক ভূমিসংস্কার, যেটা পাঞ্জাবের ভূস্বামীদের সুযোগ-সুবিধা অনেকাংশে হ্রাস করতো। সামরিক বাহিনীর সাথেও সোহরাওয়ার্দীর সখ্যতার অভাব ছিল। রাওয়ালপিন্ডি ষড়যন্ত্র মামলায় তিনি সফলতার সাথে লিয়াকত আলী খানকে হত্যার জন্য অভিযুক্ত জেনারেলদের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন। স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে সোহরাওয়ার্দী কিছুটা নরম অবস্থান নিলেও বাঙালিদের ব্যবসায়িক স্বার্থ রক্ষার জন্য তাঁর প্রবল আগ্রহ পশ্চিমা ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সন্দেহ তীব্রতর করে, যারা ইতিমধ্যে প্রশাসনযন্ত্রের উপর তাদের ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে।

১০. *Pakistan Observer*, Feb. 8, 1957.

১১. দেখুন, East Pakistan Assembly Proceedings, Vol. XVI, No. 6, 1957.

সংসদীয় পদ্ধতির রীতিনীতি নগ্নভাবে লঙ্ঘন করে গভর্নর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা সোহরাওয়ার্দীকে আস্থাভোটের সম্মুখীন হওয়ার সুযোগ না দিয়েই ১৯৫৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পদত্যাগ করতে বলেন। ফলে, তাঁর পূর্বসূরিদের মতোই সোহরাওয়ার্দীকে রাষ্ট্রপ্রধানের নির্দেশ মোতাবেক ক্ষমতা থেকে বিদায় নিতে হয়। তাঁর ১৩ মাসের প্রধানমন্ত্রিত্বের সময়েই স্বায়ত্তশাসন, সমতা এবং সংবিধানের মতো বিতর্কিত বিষয়গুলোর ব্যাপারে উভয় প্রদেশ সমঝোতার মনোভাব দেখায়। সোহরাওয়ার্দী কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভার জন্য অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রস্তুতিপ্রক্রিয়াও শুরু করেন। কিন্তু পাকিস্তানের ক্ষমতাধর মহল নির্বাচন ও সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনকে মনে করেছিল হুমকিস্বরূপ। ক্ষমতা থেকে সোহরাওয়ার্দীকে অপসারণ পূর্ববঙ্গের অনেক রাজনীতিকের জন্যই রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য বাধা স্বরূপ ছিল না। তাঁদের স্থির বিশ্বাস ছিল যে পূর্ববঙ্গে জনসংখ্যার আধিক্যের কারণে পাকিস্তানের কাঠামোতেও তাঁরা তাদের ন্যায্য স্থান লাভ করতে পারবেন। তখন কেবল আওয়ামী লীগই পশ্চিম পাকিস্তানে কিছু ডানপন্থী শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীর সমর্থন আদায়ের জন্য সচেষ্ট হয় নি, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিও পশ্চিমের বাম দলগুলোর সাথে ভ্রাতৃপ্রতিম সম্পর্ক গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়।[১২] কিন্তু এ জাতীয় যাবতীয় প্রয়াসই ১৯৫৮ সালের সামরিক হস্তক্ষেপের কারণে বিফল হয়ে যায়।

## ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতি

পূর্ববঙ্গের কথা বলতে গেলে, এ প্রদেশ দুটি বিপদের সম্মুখীন হয়েছিল। এ দুটির একটি ছিল এখানকার অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ভাঙন ও নেতৃত্বের সংঘাত এবং অন্যটি ছিল প্রদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া খর্ব করার জন্য প্রদেশের ব্যাপারে ঘন ঘন কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ। ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত এমনকি যখন নির্বাচিত আইনসভা বিদ্যমান ছিল, তখনও প্রায় দুই বছরের জন্য প্রদেশে গভর্নরের শাসন জারি করা হয়েছিল এবং মন্ত্রিসভা কয়েকবার রদবদল করা হয়েছিল।

জন্মের পর থেকেই ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ৩৬ জন সদস্য নিয়ে ৩০৯ সদস্যের সংসদে ছিল একটি ভারসাম্যবিধায়ক শক্তি। এ দলটি স্বায়ত্তশাসন অর্জনের লক্ষ্যে আন্দোলনে সমর্থন আদায়ের জন্য আওয়ামী লীগ ও কৃষক শ্রমিক পার্টির নিকট ধরনা দিত। তাদের দাবিগুলোর মধ্যে ছিল পশ্চিমা শক্তিগুলোর সাথে সকল মৈত্রীচুক্তি বাতিল, কালবিলম্ব না করে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট বাতিল।[১৩] গভর্নরের পদ হারানোর পর সংসদীয় জোট গঠনের আশায় ফজলুল হক ভাসানীর প্রস্তাব সহানুভূতির সাথে গ্রহণ করেন। আওয়ামী লীগের কাছেও ভাসানী অনুরূপ প্রস্তাব পেশ করেন। ক্ষমতার রাজনীতির পটপরিবর্তনে ১৯৫৮ সালের ১৮ জুন আওয়ামী লীগের মন্ত্রিসভা পরাজিত হয়

১২. Rounaq Jahan, *Pakistan's Failure in Regional Integration*, (New York 1972), 49.

১৩. *Pakistan Observer*, May 5, 1958.

এবং এরপর যে কৃষক শ্রমিক মন্ত্রিসভা গঠিত হয়, সেটাও ২৩ জুন আওয়ামী লীগ-ন্যাপ জোটের কাছে পরাজিত হয়। তবে ২৪ জুন আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা গ্রহণের আহ্বান না জানিয়ে ইস্কান্দার মির্জা সংবিধানের ৯২-ক ধারা মোতাবেক গভর্নরকে প্রাদেশিক প্রশাসনের দায়িত্ব গ্রহণের আহ্বান জানান।

রাজনৈতিক নাটকে আরেকটি দৃশ্যের অবতারণা ঘটে ৮ সপ্তাহ পর ২৪ আগস্ট তারিখে, যখন আতাউর রহমান খান ক্ষমতায় পুনর্বহাল হন। ন্যাপ বা কৃষক শ্রমিক ছাড়াই তখন মন্ত্রিসভায় আওয়ামী লীগের অনুসারীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। এই নতুন মন্ত্রিসভা পর পর কয়েকটি জঙ্গি আন্দোলনের সম্মুখীন হয়, যার কয়েকটি আওয়ামী মন্ত্রিসভাকে বেকায়দায় ফেলার জন্য ভাসানীই পরিচালনা করেছিলেন। এই টালমাটাল অবস্থায় কৃষক শ্রমিকও ন্যাপের সমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় যাওয়ার সুযোগ খুঁজছিল। করাচীর ক্ষমতাসীনেরা সাম্রাজ্যবাদীদের কবল থেকে মুক্তিলাভের জন্য ভাসানীর উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিতে আগ্রহী ছিল না।

এই জটিল পরিস্থিতিতে একটি নতুন উপাদান সংযোজিত হয় যখন করাচী সফরকালে কৃষক শ্রমিকঘেঁষা স্পীকার আবদুল হামিদ ইস্কান্দার মির্জার সাথে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে সমঝোতায়  উপনীত হন। স্পীকার ফেরত আসার পর ২৬ সেপ্টেম্বর তাঁর বিরুদ্ধে একটি অনাস্থাভোট অনুষ্ঠিত হলে তিনি সরে দাঁড়ান এবং আওয়ামী লীগঘেঁষা শাহেদ আলী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। সবচেয়ে লজ্জাকর ঘটনা ঘটে পরের দিন যখন আইনসভায় সভাপতিত্ব করার সময় স্পীকার কৃষক শ্রমিকের কয়েকজন সদস্য দ্বারা আক্রান্ত হয়ে শারীরিকভাবে আহত হন। মারাত্মকভাবে আহত হওয়ার কারণে তাঁর মৃত্যু হয়। পূর্ববঙ্গের সংসদীয় ইতিহাসে এ দিনটি ছিল সবচেয়ে কলংকিত একটি দিন এবং শাহেদ আলীর  করুণ মৃত্যুর কারণে সমগ্র প্রদেশে শোকের ঢেউ বয়ে যায়।

## সামরিক আইন, ১৯৫৮

শাহেদ আলী হত্যার ঘটনাটি সংসদীয় পদ্ধতির সরকারের ইতি টেনে দেয়। ইস্কান্দার মির্জা, যিনি সংসদীয় গণতন্ত্রের কার্যক্রমে অস্বস্তিবোধ করছিলেন, তিনি অবিলম্বে আওয়ামী লীগ সরকারকে বরখাস্ত করে সংসদ বিলুপ্ত করলেন। দুই সপ্তাহ পর ৭ অক্টোবর তারিখে মির্জা একটি আদেশ জারি করলেন, যার মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলো অবলুপ্ত হলো। ২ বছর পুরনো সংবিধান বাতিল হলো এবং দেশ সামরিক শাসনের আওতায় এলো। পূর্ব পাকিস্তান আইনসভায় উচ্ছৃঙ্খল আচরণ নিঃসন্দেহে সংবিধানবহির্ভূত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য মির্জাকে অজুহাত যুগিয়েছিল। কিন্তু এর পেছনে প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল বামপন্থী প্রভাবিত আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভাকে বাধ্যতামূলকভাবে অপসারণ। ভাসানী এতে বেশ কড়া প্রতিক্রিয়া

ব্যক্ত করেছিলেন এবং গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য জোরদার আন্দোলন গড়ে তুলতে পূর্ববঙ্গের জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন।[১৪] কিন্তু তখন একটি ঐক্যবদ্ধ জোট গঠন সম্ভব হয় নি; দলাদলি তখন পূর্ববঙ্গের গণমুখী রাজনীতির গতিময়তাকে খর্ব করেছে এবং পুনরায় দলবদ্ধ হতে এবং নতুন কৌশল গড়ে তুলতে বিচ্ছিন্ন শক্তিগুলোর আরো সময়ের প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

## আইয়ুব আমল

মাত্র কয়েক দিন পর ২৭ অক্টোবর তারিখে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করার পর জেনারেল আইয়ুব খান মির্জাকে লন্ডনে নির্বাসনে পাঠান এবং সরকারের সর্বময় কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। রাজনীতিবিদ এবং সংসদীয় প্রক্রিয়াকে ঘৃণা করতে অভ্যস্ত আইয়ুব সিভিল সার্ভেন্ট, সামরিক প্রতিষ্ঠান এবং ব্যবসায়িক স্বার্থের সাথে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে তাঁর সমর্থনের ভিত্তি তৈরি করেন। তবে বেসামরিক আবরণের নীচে সামরিক বাহিনীই তাঁর শাসনের লৌহকাঠামো গঠন করে। অদক্ষতা এবং দুর্নীতি নির্মূল করার জন্য তিনি কিছু লোকদেখানো পদক্ষেপ নেন। আইয়ুব নিজেকে একজন সংস্কারক হিসেবে তুলে ধরেন এবং তাঁর ক্ষমতাগ্রহণকে চোরাকারবারি, কালোবাজারি ও দুর্নীতির অসহনীয় অবস্থা দূর করতে একটি বিপ্লব বলে অভিহিত করেন।[১৫] তাঁর ক্ষমতাগ্রহণের যুক্তি হিসেবে তিনি জাতির জন্য প্রয়োজনীয় স্থিতিশীলতা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করার অজুহাত দেখান। অর্থনৈতিক উন্নয়ন, প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস, আইনগত ও সাংবিধানিক সংস্কার এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠনের জন্য তিনি কিছু নির্বাচিত কর্মসূচি গ্রহণ করেন। অবশ্য এ পদক্ষেপগুলো গ্রহণের লক্ষ্য ছিল তাঁর ক্ষমতা সুসংহত করা এবং বিরোধীদেরকে ভীতিপ্রদর্শন করা।

রাজনীতিবিদদের কোনঠাসা করে রাখতে আইয়ুব কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ১৯৫৯ সালের মার্চ মাসে জারিকৃত 'দি পাবলিক অফিস ডিসকোয়ালিফিকেশন অর্ডার' (পোডো)-এর মাধ্যমে দুর্নীতির কারণে সাজাপ্রাপ্তদের জন্য জনপ্রতিনিধিত্বমূলক পদে প্রবেশের ক্ষেত্রে ১৫ বছরের নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। ১৯৫৯ সালের আগস্ট মাসে জারিকৃত 'দি ইলেকটিভ বডিস ডিসকোয়ালিফিকেশন অধ্যাদেশ' (এবডো) অনুযায়ী অসদাচরণের জন্য বিশেষ আদালতে প্রাক্তন রাজনীতিবিদদের বিচারের ব্যবস্থা করা হয়। অভিযুক্ত ব্যক্তি কোনো ইলেকটিভ বডির প্রার্থী হবেন না বলে সম্মত হলেই কেবল তিনি বিচার এড়াতে পারতেন। এভাবে প্রায় ৭০০০ ব্যক্তিকে রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে অপসারণ করা হয়।[১৬] ১৯৬২ সালে রাজনৈতিক বন্দিদের নামে হেবিয়াস কর্পাস রীট মামলা দায়ের করা হয় এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করা হয়।

১৪. *Morning News*, Sept. 29, 1958.
১৫. Charles Peter O'Donnell, *Bangladesh: Biography of a Muslim Nation*, (Boulder, Colorado, 1984), 55.
১৬. Richard T Nyrop (ed.), *Pakistan: A Country Study*, (U.S. Government Press, 1984), 44.

একই সময়ে দৃশ্যমান সরকারবিরোধী সংগঠিত কার্যকলাপ বন্ধ করার লক্ষ্যে ১৯৬০ সালে প্রেস এন্ড পাবলিকেশান্স অধ্যাদেশ সংশোধন করা হয়, যাতে কি কি অবস্থায় সংবাদপত্র ও অন্যান্য প্রকাশনা বন্ধ অথবা বাজেয়াপ্ত করা যাবে তা সুনির্দিষ্ট করা হয়। বর্ণিত শর্তগুলো ছিল বেশ বিস্তৃত, যাতে সেসব প্রকাশনাও অন্তর্ভুক্ত ছিল যেগুলোতে সরকার বা সামরিক বাহিনীর প্রতি অশ্রদ্ধা দেখানোর প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। একদিকে যেমন কিছু সংবাদপত্র বন্ধ করে দেয়া হয়, তেমনি অন্য যেসব সংবাদপত্র সামরিক আইনের সমালোচনা করা থেকে বিরত থাকে সেগুলোকে পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া হয়। বাণিজ্যিক সংস্থাগুলোকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়, ইউনিয়নকে নিরুৎসাহিত করা হয় এবং মসজিদগুলোকে রাজনৈতিক আলোচনার মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার না করার জন্য হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়।

একদিকে বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করার এবং অন্যদিকে আইয়ুব বাস্তবেই প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রদানের ব্যাপারে আগ্রহী এ ধারণা দেয়ার দ্বিমুখী নীতি অবলম্বন করে আইয়ুব স্বায়ত্তশাসনের অনুকূল কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল সিভিল সার্ভিস ও সামরিক বাহিনীতে বাঙালিদের নিয়োগ বৃদ্ধি, ঢাকায় দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন, পূর্ববঙ্গে অধিকতর বিনিয়োগ, নিয়মিতভাবে পরিকল্পনা কমিশনের সভা অনুষ্ঠান এবং কিছু বাঙালিকে দৃশ্যমান জাতীয় পদে অধিষ্ঠিত করা। স্পষ্টতই এসকল লোকদেখানো পদক্ষেপের লক্ষ্য ছিল বিরোধীদের মনে আস্থার মনোভাব সৃষ্টি করা যাতে শাসকগোষ্ঠীকে প্রদেশগুলোর প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন মনে হয়। বাস্তবে সরকারের কাঠামো ছিল অত্যধিক কেন্দ্রীভূত, এবং অংশগ্রহণমূলক গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের অভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ ও রাজনীতিসচেতন বাঙালিরা বিভিন্ন কারণে নিজেদেরকে বঞ্চিত মনে করতে লাগলো। আইয়ুবের উন্নয়নের দশকে দুটি প্রদেশের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য অন্য যেকোন সময়ের তুলনায় বেড়ে গেল এবং পূর্ববঙ্গ তার সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের উপর সবচেয়ে বড় আঘাতের সম্মুখীন হলো।

**মৌলিক গণতন্ত্র**

সামরিক আইন জারির পর থেকে আইয়ুবকে অধ্যাদেশ, আদেশ এবং সরকারি ঘোষণার মাধ্যমে সরকার পরিচালনা করতে হয়, যেটা শাসকগোষ্ঠীর দখলদারি চরিত্রের প্রতিই ইঙ্গিত করে। সুতরাং সরকারকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি প্রদানের লক্ষ্যে আইয়ুব শঠতাপূর্ণভাবে স্থানীয় স্বশাসন এবং পল্লী উন্নয়নের একটি কদর্য কাঠামো সৃষ্টি করেন। ১৯৫৯ সালের 'দি বেসিক ডেমোক্রেসিস অর্ডার' মোতাবেক পাঁচ স্তর বিশিষ্ট একটি কাঠামো নির্মাণ করা হয়। এর নিম্নতম স্তর ইউনিয়ন কাউন্সিল ছিল ১০ জন প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত সদস্য দ্বারা গঠিত, যারা উচ্চতর ধাপের প্রতিষ্ঠান থানা, জেলা এবং বিভাগীয় কাউন্সিল গঠনের জন্য নির্বাচকমণ্ডলী হিসেবে কাজ করতো। ১৯৬০ সালে ইউনিয়ন কাউন্সিলগুলোকে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছাড়াই আইয়ুবকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করতে বলা হয়। ১৯৬২ সালের সংবিধান মোতাবেক প্রেসিডেন্ট, জাতীয় পরিষদ এবং প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনের জন্য ইউনিয়ন কাউন্সিলগুলোকে আবারও নির্বাচকমণ্ডলীতে রূপান্তরিত করা হয়।

এক সময়ে নির্দেশিত বা নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র বলে অভিহিত মৌলিক গণতন্ত্রের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল সরকারকে বৈধতা দান, যা ছিল বেসামরিকীকরণের একটি পদক্ষেপ এবং রাজনৈতিক দলগুলোর বিকল্প। শাসকগোষ্ঠী আশা করেছিল যে এ ব্যবস্থায় বিশেষত পল্লী অঞ্চলের জনগণকে সংগঠিত করা যাবে এবং স্থানীয় ব্যাপারে, বিশেষত উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে তাদের মধ্যে অংশগ্রহণের অনুভূতি সৃষ্টি করা যাবে। শাসকগোষ্ঠী আরো আশা করেছিল যে এ ব্যবস্থায় রাজনীতির স্থানীয়করণ ঘটবে এবং জাতীয় রাজনীতির ব্যাপারে জনগণের উৎসাহ হ্রাস পাওয়ার ফলে রাজনৈতিক ভাঙন দেখা দেবে ও জাতীয় নেতৃত্বের অবসান ঘটবে। অধিকন্তু, দলীয় রাজনীতি ও তার শহুরে ভিত্তিকে অচল করে দেয়াও এ ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল।

ইউনিয়ন কাউন্সিলগুলোর ব্যাপক ক্ষমতা ও দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল কৃষি ও জনপদ উন্নয়ন, পল্লীপুলিশের মাধ্যমে আইন-শৃংঙ্খলা রক্ষা, সালিশী আদালতে ছোট-খাটো মামলার নিষ্পত্তি করার জন্য কিছু মাত্রায় বিচারক্ষমতা এবং স্থানীয় প্রকল্পের জন্য স্থানীয় কর আরোপের ক্ষমতা। তবে, কাউন্সিলের কর্তৃত্বকে ভয়ানকভাবে স্থায়ী সিভিল সার্ভেন্টদের প্রভাববলয়ের অধীন করা হয়, যারা প্রায়শ কাউন্সিল-কর্তৃপক্ষকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিত না এবং তাদের বশ্যতা দাবি করতো।

১৯৬২ সালে জাতীয় পরিষদ এবং পূর্ব পাকিস্তান পরিষদ উভয়টি সৃষ্টির পর এগুলো সংবিধানেরই সমালোচনার মূল মঞ্চ হয়ে উঠলো, যে সংবিধানবলে এগুলোর সৃষ্টি হয়েছে। অধিকন্তু পরিষদগুলোর বাইরে আওয়ামী লীগ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান এবং দুই প্রদেশের মধ্যে বৈষম্য হ্রাসের ব্যাপারে চাপ প্রয়োগ করতে থাকলো। ১৯৬৩ সালে ময়মনসিংহের দু'টাকার ডানপন্থী উকিল মোনেম খানকে পেশাজীবী গভর্নর গোলাম ফারুকের স্থলাভিষিক্ত করার ফলে পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটে। মোনেম খানের সুদীর্ঘকালের স্বৈরাচারী শাসনকালে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাস দাবির প্রতি তাঁর কোনো সহানুভূতি ছিল না। জনপ্রিয় নেতাদের বিরুদ্ধেও তাঁর ছিল ব্যক্তিগত আক্রোশ। এর ফলে পূর্ব পাকিস্তানে বিচ্ছিন্নতাবোধ আরো বৃদ্ধি পায়। রাজনীতিবিদদের ক্রমবর্ধমান বিরোধিতার পাশাপাশি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালু করার জন্য পশ্চিমা দাতা দেশগুলোর চাপের কারণে আইয়ুবের পরবর্তী পদক্ষেপের লক্ষ্য ছিল এমন একটি সংবিধান প্রণয়ন করা, যা তাঁর প্রতিপক্ষদের এবং দাতাদেশগুলোকে তুষ্ট করবে।

### ১৯৬২ সালের সংবিধান

লাগামহীন ক্ষমতার মঞ্চে অধিষ্ঠিত থেকে ১৯৬২ সালের ১ মার্চ আইয়ুব একটি সংবিধান জারি করেন, যা একই বছর ৮ জুন কার্যকর করা হয়। এ সংবিধান ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ পর্যন্ত বলবৎ থাকে। যদিও আইয়ুব সংবিধানের খসড়া প্রণয়নের জন্য একটি কমিশন গঠন করেছিলেন, চূড়ান্ত দলিলে কমিশনের সুপারিশসমূহ স্থান পায় নি। প্রকৃতপক্ষে

এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো তাঁর নিজের অবদান বলে আইয়ুব দাবি করেছিলেন। এই সংবিধান সংসদীয় বা রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির কোনোটিই ছিল না এবং এতে কোনো সত্যিকারের গণতান্ত্রিক বিধানও স্থান পায় নি।

স্বৈরতন্ত্রের বিভিন্ন উপাদানযুক্ত এ সংবিধান পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার জন্য অত্যন্ত পশ্চাদ্মুখী প্রমাণিত হয়। নিয়ন্ত্রণহীন নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী হয়ে আইয়ুব তাঁর ব্যাপক ক্ষমতা সংরক্ষণে সদা তৎপর ছিলেন। শেষ পর্যন্ত এর ফলেই তাঁকে অসম্মানজনকভাবে ক্ষমতা থেকে বিদায় নিতে হয়।

এই সংবিধান কার্যকরভাবে রাষ্ট্রের নাগরিকদের ভোটাধিকার হরণ করে। এর দ্বারা ১০ কোটি জনসংখ্যার দেশের জন্য সৃষ্টি করা হয় একটি ১৫৬ সদস্যবিশিষ্ট ক্ষুদ্রাকৃতির জাতীয় পরিষদ, যা উভয় প্রদেশের মধ্যে সমানভাবে বিভক্ত ছিল। এই ঃ [illegible] ়াতর আহনসভাঢ সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচি[illegible] হতো না, উপরে বর্ণিত ৮০,০০০ মৌলিক গণতন্ত্রীর নির্বাচনী সভা কর্তৃক তা নির্বাচিত হতো। যেহেতু মৌলিক গণতন্ত্রীরা আইয়ুবেরই সৃষ্টি ছিল, তাই এ নব্য শ্রেণীটি স্বভাবতই তাঁর প্রতি অনুগত ছিল।

১৯৬২ সালের সংবিধান প্রধান নির্বাহীকে প্রচুর স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা প্রদান করে। সরকারপ্রধান এবং রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে দ্বৈত ক্ষমতার অধিকারী হয়ে তিনি আইনসভা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা, অধ্যাদেশ জারির ক্ষমতা, রেফারেন্ডাম অনুষ্ঠানের জন্য আবেদনের অধিকার, বাজেটের উপর নিয়ন্ত্রণক্ষমতা এবং নাগরিক অধিকার বাতিলসহ বিশেষ জরুরি ক্ষমতার অধিকারী হন। প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে অভিশংসনপ্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে ছিল কঠোর আইনি বিধান। এর মধ্যে ছিল যে "অভিশংসন প্রস্তাবের পক্ষে যদি জাতীয় পরিষদের অর্ধেকেরও কম সদস্য ভোট দেয়, তবে যারা প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেবে তারা অবিলম্বে সদস্যপদ হারাবে।" রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, জনস্বার্থ এবং নৈতিকতা সংরক্ষণের অজুহাতে সংবিধান মৌলিক অধিকার খর্ব [illegible] সংবিধানের একটি প্রশংসনীয় দিক ছিল, রাষ্ট্র "ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তান"-এর পরিবর্তে "রিপাবলিক অব পাকিস্তান" নাম নিয়ে একটি প্রজাতন্ত্র হবে। এর মুখবন্ধে ইসলাম সম্বন্ধে উল্লেখ এত অস্পষ্ট ছিল যে অনেক বিখ্যাত পণ্ডিত ১৯৬২ সালের সংবিধানকে "ধর্মনিরপেক্ষতা থেকে সামান্য দূরবর্তী" বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। সংবিধান পূর্ববঙ্গকে পূর্ব পাকিস্তান নামকরণ করে এবং পশ্চিম পাকিস্তানকে একক ইউনিট হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। যেমন আশা করা গিয়েছিল ১৯৬২ সালের সংবিধান বাঙালিদেরকে তেমন কোন ছাড় দেয় নি এবং দুই অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য বৃদ্ধিতে অবদান রাখে। ফলে পূর্ববঙ্গে তা প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। আইয়ুব ১৯৬১ সালে কয়েকটি আইন এবং অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন খর্ব করেন। এজন্যে ক্ষুব্ধ ছাত্রসমাজ সংবিধানবিরোধী সমালোচনায় নেতৃত্ব দেয়। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অধিকাংশ কারারুদ্ধ থাকার কারণে বিশেষত পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগ এবং পূর্ব

পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন হরতাল এবং বিক্ষোভের আয়োজন করে। সংবিধানের কপি প্রায় প্রতিদিনই ক্যাম্পাসে পোড়ানো হয়। যখন সংবিধানের একজন প্রণেতা মনজুর কাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সফরে আসেন, তখন জঙ্গি ছাত্রদের হাতে প্রহৃত হওয়ার উপক্রম হলে তিনি পালিয়ে যান।

নতুন সংবিধানের অধীনে পাকিস্তানে ১৯৬২ সালের এপ্রিলের শেষে জাতীয় পরিষদ এবং ১৯৬২ সালের ৬ মে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময়েও ১৯৫৮ সালে জারিকৃত সামরিক আইন বহাল ছিল, তবে ১৯৬২ সালের ৮ জুন তা প্রত্যাহার করা হয়। নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক দল এবং এবডোবলে অযোগ্য ঘোষিত রাজনীতিবিদদের উপর নিষেধাজ্ঞা বহাল ছিল। যদিও নির্বাচনকালে কিছু ব্যক্তি ও স্থানীয় বিষয়কে কেন্দ্র করে স্বতঃস্ফূর্ত গোষ্ঠী এবং দলের উদ্ভব ঘটে, সমালোচনা এবং জনমত গঠনের মাধ্যমের উপর নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলো শাসকদের বিরুদ্ধে তাদের তৎপরতা অব্যাহত রাখে।

পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ কর্তৃক সংবিধানের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানে নির্বাচন সাধারণভাবে বর্জন করা হয় নি। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলো এবং প্রথম সারির প্রতিষ্ঠিত রাজনীতিবিদদের উপর নিষেধাজ্ঞা থাকার কারণে কেবল দ্বিতীয় সারির রাজনীতিবিদরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। এর পরিণতি পরবর্তী পর্যায়ে মারাত্মক আকার ধারণ করে, কারণ শাসকগোষ্ঠী আইনসভাকে প্রতিনিধিত্বশীল বলে দাবি করতে পারে নি। কেন্দ্রীয় আইনসভায় পূর্ব পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত সদস্যরা ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ এবং তাঁদের শিক্ষার মান ছিল উচ্চতর। তাঁরা ধীরে ধীরে বিরোধী সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশে পরিণত হন। প্রথম দিকে জাতীয় বিষয়াবলীর ব্যাপারে কিছুটা আগ্রহ দেখানোর পর পূর্ব পাকিস্তানের বিরোধী সদস্যরা আঞ্চলিক সমস্যাবলী এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। তাঁদের কাছে তখন পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যাগুলো অগ্রাধিকার পেতে থাকে। ১৯৫০-এর দশকে বাঙালিদের বঞ্চনা ও শোষণের অভিযোগ থেকে শুরু করে ১৯৬০-এর দশকে দেখা দেয় একটি "তিক্ত পূর্ব-পশ্চিম বিরোধ"। জাতীয় পরিষদ এবং পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ এই উভয় পরিষদের নির্বাচনেই প্রধানত রক্ষণশীল এবং মুসলিম লীগপন্থী গোষ্ঠীগুলো প্রাধান্য বিস্তার করে। পূর্ব পাকিস্তান পরিষদের ১৫০ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ৮ জন আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন। যদিও ১৯৬২ সালের ১৪ জুলাই পাশকৃত "দি পলিটিক্যাল পার্টিস অ্যাক্ট" এবং ১৯৬৩ সালের ৭ জানুয়ারি এর সংশোধনীর মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলো পুনরুজ্জীবিত করা হয়, তথাপি এ আইনগুলোতে কিছু অযোগ্যতার ধারা থাকার কারণে পূর্ব পাকিস্তানের মূলধারার রাজনৈতিক দলগুলো অর্থাৎ আওয়ামী লীগ ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ১৯৬৪ সালের শুরুর দিকেও তাদের পূর্ণ কার্যক্রম শুরু করতে পারে নি। আওয়ামী লীগের পুনরুত্থানে শেখ মুজিব ছিলেন মুখ্য শক্তি।

শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে রাজনীতিবিদদের জঙ্গি কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি ছাত্র এবং বুদ্ধিজীবীরাও সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তনের দাবিতে সোচ্চার হয়ে উঠেন। ছাত্রবিক্ষোভ

এবং হরতাল হয়ে পড়ে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। আইয়ুব ছাত্রদের প্রতি সহানুভূতিশীল থেকে ১৯৬২ সালে এমনকি গভর্নর আজম খানকেও বরখাস্ত করেন। ১৯৬২ সালে আইয়ুবের পূর্ব পাকিস্তান সফরের সময় ছাত্র এবং কর্তৃপক্ষের মধ্যে প্রবল সংঘাত দেখা দেয়।[১৭] ছাত্ররা একই সাথে ১৯৬২ সালের জাতীয় শিক্ষা রিপোর্টের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ জানায়, যা স্নাতক কোর্সের সময় এক বছর বৃদ্ধি করে। এখানে লক্ষণীয় যে ছাত্র-অস্থিরতা আংশিকভাবে কলেজ-স্নাতকদের ব্যাপক বেকারত্বের সাথে সম্পর্কিত হলেও মৌলিক গণতন্ত্র এবং ১৯৬২ সালের সংবিধান প্রবর্তন শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজকে সংগঠিত করার নতুন কারণ তৈরি করে।

ছয় মাসের অধিককাল আটক রাখার পর ১৯৬২ সালের ১৯ আগস্ট সোহরাওয়ার্দীকে মুক্তিদান করা হয়। তাঁর মুক্তির পর ছয় সপ্তাহের মধ্যেই লাহোরে বিরোধী দলগুলোর এক সম্মেলনে সোহরাওয়ার্দী জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের ঘোষণা দেন। তিনি একে দল না বলে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলন বলে অভিহিত করেন।[১৮] সোহরাওয়ার্দীকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে আইয়ূব ১৯৬৩ সালের ৬ জানুয়ারি দুটি অধ্যাদেশ জারি করেন, যাতে দু'বছরের জেল ও জরিমানা বা উভয়ের বিধান রেখে এবডোবলে অযোগ্য ঘোষিত সকল রাজনীতিবিদকে যেকোন ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হতে বারণ করা হয়। এ কড়াকড়ি আরোপের প্রেক্ষিতে সোহরাওয়ার্দী স্বেচ্ছানির্বাসনে চলে যান। ১৯৬৩ সালের ৫ ডিসেম্বর তিনি বৈরুতে রহস্যজনকভাবে মৃত্যুবরণ করেন। এরপর রাজনৈতিক নেতৃত্ব চলে আসে শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে, যিনি স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের জন্য ইতিমধ্যেই সুপরিচিত হয়েছিলেন। এক জেলখানা থেকে আরেক জেলখানায় ঘন ঘন স্থানান্তরিত এই নেতা বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের একটি প্রতীক হয়ে দাঁড়ান।[১৯] একজন বিশিষ্ট রাজনৈতিক চিন্তাবিদ বা তাত্ত্বিক না হয়েও মুজিব ছিলেন একজন শক্তিশালী বক্তা, যিনি জনগণের আবেগকে আন্দোলিত করতে পারতেন। তাঁর সাংগঠনিক গুণাবলী ছিল অসাধারণ।

## ১৯৬৫ সালের নির্বাচন

শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বর্ধিত গণ অসন্তোষ এবং অব্যাহত ছাত্রবিক্ষোভের প্রেক্ষাপটে জাতীয় নির্বাচনের প্রস্তুতি হিসেবে আইয়ুব ১৯৬৪ সালের মার্চে নির্বাচনী সংস্কার বিল প্রবর্তন করেন, যাতে নির্বাচকমণ্ডলীর মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট এবং জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের পরোক্ষভাবে নির্বাচনের বিধান যুক্ত করা হয়। জেনারেল আইয়ুব সর্বদাই

১৭. *Pakistan Observer*, Dec. 17, 22, 23, 1962.। রাজশাহী কলেজের একজন শিক্ষক হিসেবে লেখক ছাত্রদের উপর পুলিশী নির্যাতন প্রত্যক্ষ করেছিলেন। জেরার সম্মুখীন হওয়ার জন্য কয়েকজন শিক্ষককে এমনকি থানায়ও যেতে হয়েছিল।

১৮. Mohammad H. R. Talukdar, *Memoirs of Huseyn Shaheed Suhrawardy*, (Dhaka 1987), 69

১৯. *Pakistan Observer*, Jan, 29, 1969.

রাজনীতি এবং রাজনীতিবিদদেরকে অবজ্ঞা করতেন। কিন্তু ১৯৬৩ সালের মে মাসে তাঁর নিজের নির্বাচন নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে তিনি মুসলিম লীগকে বিভক্ত করার ব্যবস্থা করেন এবং এর এক অংশের সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মুসলিম লীগের এই অংশটি কনভেনশন মুসলিম লীগ নামে পরিচিত হয়।

আরেকটি জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা দেখে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ও নিজাম-ই-ইসলামীকে নিয়ে আওয়ামী লীগ প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের দাবিতে একটি এডহক সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি গঠন করে। ১৯৬৪ সালের জুলাই মাসে সম্মিলিত বিরোধী দল নামে একটি নতুন জোট উক্ত এডহক কমিটির স্থলাভিষিক্ত হয়, যাতে জামায়াতে ইসলামীও যোগ দেয়। এই জোটের নয় দফা কর্মসূচিতে বয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটাধিকার, গণতান্ত্রিক সংবিধান এবং "কোমল ভাষায় ব্যক্ত"[২০] প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি অন্তর্ভুক্ত ছিল।

বিরোধী দলগুলো যখন একটি অভিন্ন মঞ্চ গড়ে তুলতে তৎপর ছিল, তখন ১৯৬৪ সালের আগস্ট মাসে ঢাকার চারপাশের পাটকলগুলোতে বাঙালি এবং উর্দুভাষী শ্রমিকদের মধ্যে দাঙ্গা বেঁধেছিল। এর আগে জানুয়ারিতে ঢাকায় অভূতপূর্ব হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেঁধে যায়, যার ফলে প্রাণহানি ঘটে, কলকাতায় প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং পরবর্তী মাসগুলোতে উভয়দিকেই বড়মাপের অভিবাসন ঘটে। এসব ঘটনা এবং ১৯৬৩ সালের শুরুতে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক সংঘাত শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক রাজনৈতিক সমস্যা লাঘবের উদ্দেশ্যেই ঘটানো হয়েছিল বলে মনে করা হয়।

১৯৬৫ সালের জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে আইয়ুবের আত্মবিশ্বাস প্রথমবারের মতো ঝাঁকুনি খায়। নির্বাচনে বিরোধী প্রার্থী ফাতেমা জিন্নাহ পেয়েছিলেন মোট ভোটের ৩৭ শতাংশ। বিরোধী দলগুলো সুসংগঠিত না হলেও ১৯৬৫ সালের জানুয়ারিতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ছিল আইয়ুবের বিরুদ্ধে বিরোধীদের প্রথম চ্যালেঞ্জ। নির্বাচনে আইয়ুব ৬৩.৩ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়ী হন। কিন্তু নির্বাচনী প্রচারণায় সরকারি সম্পদের ব্যবহার এবং মৌলিক গণতন্ত্রীদের উপর জেলা প্রশাসনের প্রভাব সত্ত্বেও নির্বাচনে বিরোধীদের আবেদন প্রতিফলিত হয়। পশ্চিমাঞ্চলের ২৬ শতাংশ বিরোধী ভোটের বিপরীতে পূর্ব পাকিস্তানে ৪৭ শতাংশ বিরোধী ভোট এখানে ধূমায়িত অসন্তোষেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। নির্বাচন প্রথম বারের মতো বিরোধীদেরকে শাসকগোষ্ঠীর সমালোচনা এবং তাদের কর্মসূচী প্রচারের সুযোগ করে দেয়।

পরবর্তীকালে আইয়ুব সরকারে যখন ভাঙন দেখা দেয়, তখনই নির্বাচনের প্রকৃত তাৎপর্য স্পষ্ট হয়ে যায়। যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা আইয়ুব কায়েম করেন এবং যে সীমিত

---

২০. ঐ, ৪০.

নির্বাচন তিনি অনুষ্ঠান করেন, তা বিশেষত পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিকদেরকে তুষ্ট করতে পারে নি, যেখানে বহুদলীয় গণতন্ত্র এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে রাজনীতিকরা ছিল দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ সময় থেকে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতি একটি আঞ্চলিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে এবং জাতীয় পদ্ধতির পরিবর্তন তার লক্ষ্য ছিল না। একটি ক্রান্তিকাল এসে গেল এবং বাঙালিরা পশ্চিম পাকিস্তানের তোয়াক্কা না করে স্বাধীনভাবে তাদের রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ধারণের সুযোগ পেল। আইয়ুবদশকের অবসানের শুরুটা দৃশ্যমান হয়ে উঠলো। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ কেবল এ প্রক্রিয়াটিকেই ত্বরান্বিত করলো।

**পাক-ভারত যুদ্ধ, ১৯৬৫**

জন্মের পর থেকেই পাকিস্তান ভারতের সাথে একটি প্রলম্বিত সামরিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিরোধে জড়িয়ে পড়ে, যা ১৯৬৫ সালে অঘোষিত হলেও একটি পূর্ণমাত্রার যুদ্ধে রূপ নেয়। পাক-ভারত বিরোধের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল কাশ্মীরে পাকিস্তানের হস্তক্ষেপ। কাশ্মীরে পাকিস্তানের জড়িত হওয়ার পেছনে ছিল ভারতের কবল থেকে কাশ্মীর উপত্যকার মুসলমানদের উদ্ধার করার আবেগজাত তাড়না এবং পাকিস্তানের নিরাপত্তার প্রতি হুমকি। দু'দেশের মধ্যে শত্রুতা চলতেই থাকে। পাকিস্তান কাশ্মীরের একটি বড় অংশ দখল করে তার নামকরণ করে আজাদ কাশ্মীর এবং যুদ্ধবিরতি চুক্তির মাধ্যমে তা পরোক্ষ স্বীকৃতি পায়।

১৯৬৫ সালের শুরুতে কাশ্মীরে যুদ্ধবিরতিরেখা বরাবর এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে রান অফ কাচ-এর নিকট পরপর কিছু সংঘর্ষ ঘটে। রান অফ কাচ-এর অবিভাজিত এলাকায় ১৯৬৫ সালের এপ্রিলে একটি বড় ধরনের সংঘর্ষের পর বৃটিশদের উদ্যোগে জুনের শেষে আরেকটি যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানানো হয় এবং বিরোধ মীমাংসার দায়িত্ব আন্তর্জাতিক সালিশের উপর অর্পণ করা হয়। যুদ্ধবিরতি সত্ত্বেও জাতিসঙ্ঘ পর্যবেক্ষকেরা পাকিস্তানের দিক থেকে অনুপ্রবেশের তৎপরতা চলেছে বলে রিপোর্ট প্রদান করে। বেশ কয়েকটি ছোটখাটো সংঘর্ষের পর ভারত সাঁড়াশি আক্রমণের মাধ্যমে দ্রুত লাহোর এবং শিয়ালকোটের প্রান্তসীমা পর্যন্ত এগিয়ে যায়। অবশ্য উভয় দেশেরই ছিল সীমিত লক্ষ্য এবং দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার মতো সীমিত সম্পদ। ১৯৬৩ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর জাতিসঙ্ঘের পৃষ্ঠপোষকতায় আরেকটি যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়। সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী আলেক্সি কোসিগিনের মধ্যস্থতায় ১৯৬৬ সালের জানুয়ারি মাসে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন, যাতে শত্রুতার অবসান ও পারস্পরিক সেনা প্রত্যাহারের বিধান রাখা হয়। বিজয় এবং নতুন এলাকা করায়ত্ত করার দাবি সত্ত্বেও ১৯৬৫ সালের যুদ্ধ ছিল আইয়ুব খান ও তাঁর সরকারের জন্য অত্যন্ত বিব্রতকর। যদিও পারস্পরিক সামরিক সহযোগিতার দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক ব্যবস্থাদির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে পাকিস্তানের মৈত্রীসম্পর্ক ছিল, যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে তার নিরপেক্ষতা প্রদর্শনের জন্য একতরফাভাবে

পাকিস্তানে তার সামরিক সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। যুক্তরাষ্ট্রের এ পদক্ষেপকে বিশ্বাসভঙ্গ হিসেবে দেখা হয়েছিল বিশেষত এ কারণে যে দেশটি ছিল পাকিস্তানের অন্যতম সমরাস্ত্র সরবরাহকারী। যে আইয়ুব-শাস্ত্রী চুক্তির মাধ্যমে দ্বিতীয় পাক-ভারত যুদ্ধ আনুষ্ঠানিকভাবে সমাপ্ত হয়েছিল, তাকে অনেকের কাছে পাকিস্তানের জন্য অবমাননাকর মনে হয়েছিল। পাকিস্তানের তেজস্বী ও উপস্থিতবুদ্ধিসম্পন্ন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভূট্টো যদিও তাসখন্দ আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন, তিনি এর প্রতিবাদে পদত্যাগ করেন এবং একজন সোচ্চার বিরোধী দলীয় নেতায় পরিণত হন। ভারতীয় প্রভুত্ব থেকে কাশ্মীরের মুসলমানদের মুক্ত করার ন্যায়সঙ্গত অবস্থান পরিত্যাগ করার জন্য তিনি জনসমক্ষে আইয়ুবের সমালোচনা করেন। এ যুদ্ধ থেকে পাকিস্তান কিছুই অর্জন করতে পারে নি। তবে সবচেয়ে বড় ক্ষতি যেটা হয়েছিল তা হলো, অজেয় হিসেবে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়। এছাড়া এ সময়ে বিশেষত পশ্চিম পাকিস্তানের শহরাঞ্চলে সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটা শুরু হয়।

**ছয় দফা**

পশ্চিম পাকিস্তানে বিশেষত সামরিক বাহিনীর অভ্যন্তরে আইয়ুববিরোধী অনুভূতি ছিল অত্যন্ত প্রবল। তাসখন্দকে মনে হয়েছিল একটি "করুণ ও অযৌক্তিক আত্মসমর্পণ"[২১] যদিও আইয়ুব তাসখন্দ থেকে উদ্ভূত ক্ষোভের ঝড় সামলাতে পেরেছিলেন, এমনকি তাঁর সমর্থনের মূল এলাকা পশ্চিম পাকিস্তানেও ক্ষমতা ও জনপ্রিয়তার শীর্ষবিন্দু থেকে তাঁর পতন শুরু হয়। শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ভিন্নমত ও বিক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ শুরু হলে প্রকৃত গণতান্ত্রিক সরকারে প্রত্যাবর্তনের দাবিও পরোক্ষভাবে বেগবান হয়।

আইয়ুব সরকারের বিপর্যয়ের এ মুহূর্তে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অসন্তুষ্ট রাজনৈতিক নেতারা ছাত্রকর্মীদের সহায়তায় আইয়ুবকে ক্ষমতাচ্যুত করার ও সামরিক বাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে দেয়ার একটি সুযোগ পেয়ে যায়। ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে লাহোরে আহূত সর্বদলীয় সম্মেলনে পশ্চিম পাকিস্তানী রাজনীতিবিদদের জন্য মুখ্য আলোচ্য বিষয় ছিল তাসখন্দ চুক্তি ও তার পরিণতি। যে ৭০০ জন প্রতিনিধি এতে অংশ নেয় তাঁদের মধ্যে মাত্র ২১ জন এসেছিলেন পূর্ববঙ্গ থেকে।[২২] শেখ মুজিব, যিনি পূর্ব পাকিস্তান প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তিনি তাসখন্দ চুক্তির ব্যাপারে অতি কম আগ্রহ দেখান, বরং পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন সংক্রান্ত ছয় দফা দাবি উপস্থাপনের জন্য তিনি সম্মেলনকে ব্যবহার করেন। মুজিবের প্রস্তাব লাহোরে গৃহীত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকলেও পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপারে তাঁর অবস্থান তুলে ধরার জন্য এটা নিঃসন্দেহে ছিল একটা সুযোগ। যদিও পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারা শেখ মুজিবের সাথে দরকষাকষি করতে চান নি, পূর্ব পাকিস্তানের অধিকার আদায়ের জন্য এমন একটি দাবিনামা পেশ করতে মুজিবের সাহস,

২১. Herbert Feldman, *From Crisis to Crisis: Pakistan 1962-1969*, (Karachi: Oxford 1972), 158.
২২. Richard T. Nyrop (ed.), *Pakistan: A Country Study*, (Washington 1984), 52.

সততা এবং ধৈর্য দেখে তারা বিস্মিত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে বোধোদয়ও ঘটেছিল যে, পূর্বাঞ্চলে সবকিছু ঠিক নেই। ছয় দফা কর্মসূচির প্রধান দিকগুলো ছিল : একটি ফেডারেল সংসদীয় সরকার গঠিত হবে, যা সার্বজনীন ভোটাধিকার ও জনসংখ্যা অনুযায়ী সংসদীয় প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে নির্বাচিত হবে, ফেডারেল সরকার দায়ী থাকবে কেবল প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয়ের জন্য; প্রতিটি প্রদেশের জন্য বিনিময়যোগ্য পৃথক মুদ্রা থাকবে; ফেডারেল সরকারকে অর্থায়নের নিশ্চয়তাসহ প্রদেশগুলোকে কর ও রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা প্রদান করা হবে; প্রতিটি প্রদেশের থাকবে পৃথক বৈদেশিক মুদ্রার হিসাব; প্রতিটি প্রদেশ একটি আধা-সামরিক বাহিনী গঠন ও পরিচালনা করবে।

শাসকগোষ্ঠীর ভয় ছিল যে যদি ছয় দফা বাস্তবায়ন করা হয়, তাহলে তা পাকিস্তানের ভাঙনের সূচনা করবে। মনে হয় ছয় দফা দাবি এমন একটি উপযুক্ত মুহূর্তে প্রণয়ন করা হয়েছিল, "যখন বাঙালিরা তাদের পুনরুজ্জীবিত জাতীয় গৌরব প্রকাশের জন্য এবং একটি কেন্দ্রীভূত রাজনৈতিক কাঠামোর আওতায় পর্যাপ্ত স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য একটি বাস্তব কাঠামো খুঁজছিল।[২৩] ছয় দফা ফর্মুলা কেবল বাঙালিদের অভিযোগেরই ফিরিস্তি ছিল না, এটি ছিল তাদের নিজেদের বিষয়াবলী নিজেদের হাতে তুলে নেয়ার সংকল্পেরই বহিঃপ্রকাশ। পূর্ব পাকিস্তান কাশ্মীর ইস্যু বা শক্তিশালী সামরিক বাহিনীর দাবির পেছনে অবস্থান নেয়ার কোনো যুক্তি খুঁজে পায় নি। ভারত থেকে কোনো সামরিক হুমকির অবর্তমানে পূর্ব পাকিস্তান একটি শক্তিশালী সামরিক বাহিনীর বিকাশকে গণতান্ত্রিক বেসামরিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য অর্জনের সহায়ক বলে মনে করতো না।

১৯৬৫ সালের যুদ্ধ পূর্ববঙ্গের রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে একটি অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছিল। "কেন্দ্রের সাথে পূর্ব পাকিস্তানের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এ যুদ্ধকে একটি সন্ধিক্ষণ হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।" এ যুদ্ধ প্রদেশের অধিবাসীদেরকে ভৌগোলিক হুমকির ব্যাপারে সচেতন করে তোলে। পূর্ববঙ্গের দূরবর্তিতা এবং যোগাযোগ ও সরবরাহব্যবস্থায় চরম অচলাবস্থা প্রদেশে ব্যাপক নিরাপত্তাহীনতার জন্ম দেয়। যুদ্ধশেষে একটি সম্ভাব্য অভিন্ন হুমকির মুখে দুই অঞ্চলের স্বল্পকালীন আবেগতাড়িত সংযোগ তিরোহিত হওয়ার পর বাঙালিদের বোধোদয় হয় যে তাদেরকে এমন একটি জনগোষ্ঠীর পক্ষ নিয়ে ভারতীয় আগ্রাসনের পথে জোর করে টেনে আনা হয়েছিল, যাদের সাথে তাদের কোনো দৈহিক বা মানসিক বন্ধন ছিল না। যদিও পূর্ববঙ্গের জন্য ভারত কোনো হুমকি ছিল না, তথাপি প্রধানত পশ্চিম পাকিস্তানীদের দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত ঢাকার একটি স্বল্প সমরাস্ত্র সজ্জিত সেনা ডিভিশিন প্রদেশকে বহিরাক্রমণ থেকে রক্ষা করতে বড় একটা সক্ষম ছিল না। এই বাস্তব অবস্থাটি পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন দাবির পক্ষে একটি বাস্তবভিত্তিক যৌক্তিকতা যুগিয়েছিল। সংখ্যায় অল্প হলেও যুদ্ধক্ষেত্রে বাঙালি সৈন্যদের দক্ষতা ও সাহসিকতা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মনে গর্বের সঞ্চার করেছিল। বাঙালিরা দীর্ঘদিন ধরে তাদের ক্ষমতাবলে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিধানের অধিকার দাবি করে আসছিল। অধিকন্তু,

২৩. Jahan, *Pakistan's Failure*, 167.

যুদ্ধসম্পর্কিত অর্থনৈতিক মন্দা প্রদেশটির অবস্থার আরো অবনতি ঘটায়, বিশেষত যখন মার্কিন সহায়তার অবর্তমানে পাকিস্তান অন্যান্য সামাজিক-সাংস্কৃতিক উন্নয়ন খাতে ব্যয় হ্রাস করে। যুদ্ধের সময় রবীন্দ্রসঙ্গীত নিষিদ্ধকরণ এবং পশ্চিম বঙ্গ থেকে সাংস্কৃতিক উপাদান ও প্রকাশনা আমদানি নিষিদ্ধকরণকে বাঙালি সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের উপর আঘাত হিসেবে গণ্য করা হয়। এতদ্ব্যতীত ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের তিক্ত অভিজ্ঞতাও বাঙালি সাংস্কৃতিক পরিচয়কে সামনে নিয়ে আসে।

১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাসে লাহোর থেকে ফেরার পর শেখ মুজিব ছয় দফার উপর দেশব্যাপী রেফারেন্ডাম দাবি করেন। তিনি "যাঁরা ক্ষমতাসীন এবং যাঁরা পূর্বে ক্ষমতায় ছিলেন তাঁদেরকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করে" প্রচারণার মাত্রা বৃদ্ধি করেন। এ আন্দোলনের গতি ও তীব্রতা ক্রমেই বৃদ্ধি পায়; এমনকি "হেঁয়ালিতুল্য" ভাসানীও স্বায়ত্তশাসনের দাবিদারদের দলে যোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন, কিন্তু "ক্ষমতাসীনদের গণ্ডগোল" এড়িয়ে চলেন। ফরিদ আহমদ এবং নূরুল আমীনের মতো ব্যক্তিদের জন্য ফর্মুলাটি ছিল অতি বৈপ্লবিক; কাজেই তাঁরা একে সমর্থন করেন নি।

আওয়ামী লীগের ছয় দফা বিরোধী দলগুলোর জন্য হয়ে পড়লো ঐক্যবদ্ধ হওয়ার মন্ত্র এবং মুজিবের বাগ্মিতা এবং জনমত গঠনে তার সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটলো। ছাত্র-বুদ্ধিজীবীগণ ছাড়াও শহরের বিত্তহীন শ্রমিক শ্রেণী স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনে যোগদান করে, এমনকি গ্রামাঞ্চলেও এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। কালক্রমে আন্দোলন জঙ্গি রূপ নেয়। থানা, ব্যাংক, সরকারি দপ্তর ও সরকারপন্থী সংবাদপত্রগুলো জনরোষের শিকার হয়। স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনে নেতৃত্ব দানের ক্ষেত্রে মুজিবের অবিশ্বাস্য সাফল্যে পাকিস্তান সরকার ভীত হয়ে পড়ে। ১৯৬৬ সালের মে মাসে অন্যান্য বিশিষ্ট জননেতাদের সাথে মুজিবকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় যে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছিল তা তখনো বলবৎ ছিল। নাগরিক অধিকার খর্ব করার জন্য সরকার একে বারংবার ব্যবহার করে। রাজনৈতিক বন্দিদেরকে কোন বিচার বা অভিযোগ ছাড়াই কারাভ্যন্তরে রাখা হয়। মার্চ মাসে যখন আইয়ুব এ প্রদেশ সফর করেন, তখন তিনি সংলাপের কোন উদ্যোগ না নিয়েই ধারাবাহিক বক্তৃতা ও বিবৃতিতে মুজিবকে বিচ্ছিন্নতাবাদী এবং সার্বভৌম বাংলা স্কীমের উস্কানিদাতা বলে আক্রমণ করেন এবং এর পরিণতি ভয়াবহ হবে বলে হুমকি দেন। এমনকি আইয়ুব এমন হুমকিও দেন যে তিনি স্বায়ত্তশাসনপন্থীদের বিরুদ্ধে "অস্ত্রের ভাষা" ব্যবহার করবেন এবং "চরম সন্ত্রাসী পন্থা" অবলম্বন করবেন। প্রাদেশিক গভর্নর মোনেম খানও ছয় দফাকে কঠোরতম ভাষায় সমালোচনা করেন। জুলফিকার আলী ভূট্টো মুজিবকে একটি উন্মুক্ত বিতর্কে তাঁর মোকাবেলা করার আহ্বান জানান বাস্তবে যেটা নিয়ে তিনি অগ্রসর হন নি।

একই সাথে পাকিস্তান সরকার আরেকটি প্রচারণায় নামে, যাতে বাংলাভাষা ও সাহিত্য এবং এর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে হিন্দুত্ব থেকে উদ্ভূত বলে দাবি করে খাটো করার চেষ্টা করা হয়। তবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ছয় দফা পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের

মাঝে কোনো আতংকের সৃষ্টি করে নি এবং সেখানকার সংবাদমাধ্যমগুলোও অধিকাংশ ক্ষেত্রে পূর্বাঞ্চলের ঘটনাবলীকে অগ্রাহ্য করেছে। শাসকগোষ্ঠীর অব্যাহত বিরোধী প্রচার সত্ত্বেও স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৬৬ সালের ৭ জুন ছয় দফা আন্দোলনের সমর্থনে আওয়ামী লীগ প্রদেশব্যাপী একটি ধর্মঘটের আয়োজন করে। এমনকি *নিউ ইয়র্ক টাইমস*, *দি লন্ডন অবজারভার* এবং *দি লন্ডন টাইমস*-এর বিদেশী সাংবাদদাতারাও তাদের এপ্রিল ও মে, ১৯৬৬-এর প্রতিবেদনসমূহে স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের শক্তিমত্তার কথা তুলে ধরেন। তাদের বিশ্লেষণে তারা এ কথার উপর জোর দেন যে এই আন্দোলন ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বরে পাক-ভারত যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি অথবা এ যুদ্ধ থেকে সর্বাধিক প্রণোদনা লাভ করেছে, যখন পূর্ব পাকিস্তান অরক্ষিত হয়ে যায় এবং ভারতের করুণার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

আন্দোলনের প্রচার-প্রচারণা রোধ করার উদ্দেশ্যে গভর্নর *ইত্তেফাক*, *আজাদ* এবং *ঢাকা টাইমস*-এর মতো জনপ্রিয় সংবাদপত্রগুলোর উপর কড়াকড়ি আরোপ করেন। বিরূপ রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে এবং জনগণের শান্তি বিঘ্নিত করতে পারে এমন যেকোন সংবাদ প্রকাশ করা তিনি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। অতিরিক্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপারে সহানুভূতিশীল অনেক সংবাদপত্রের জন্য আর্থিকভাবে লাভজনক সরকারি বিজ্ঞাপন প্রদানও বন্ধ করে দেয়া হয়।

অনেক দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পরেও আন্দোলনের অগ্রযাত্রা প্রতিরোধ করতে না পেরে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী শেষ অস্ত্র হিসেবে ১৯৬৬ সালের ১৭ এপ্রিল মুজিবকে গ্রেফতার করে। এরপর তাঁকে একবার মুক্তিদান করে পুনরায় গ্রেফতার করা হয়। এভাবেই এক জেলখানা থেকে আরেক জেলখানায় তাঁর দু'বছরের দুঃসাহসিক যাত্রা শুরু হয়, যা ১৯৬৮ সালে শেষ হয়, যখন তিনি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হয়ে যান। মুজিবের সাথে তাঁর দলের শীর্ষ নেতারাও গ্রেফতার হন। নানা দমন-নিপীড়ন সত্ত্বেও প্রচণ্ড গতিতে আন্দোলন চলতে থাকে, অবশেষে ১৯৬৭ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি ছয় দফা কর্মসূচির প্রথম বার্ষিকীতে এ আন্দোলন গণ-অভ্যুত্থানের রূপ পরিগ্রহ করে।

## আট দফা কর্মসূচি

১৯৬৪-৬৫ সালে আইয়ুবের বিরুদ্ধে নির্বাচনী যুদ্ধে অবতীর্ণ 'সম্মিলিত বিরোধী দল'-এর পথ ধরে আরেকটি বিরোধী দলীয় জোট গঠন করা হয় ১৯৬৭ সালের জানুয়ারি মাসে। পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলন নামক নতুন এ জোটের অন্তর্ভুক্ত ছিল আওয়ামী লীগ, নিজাম-ই-ইসলাম পার্টি, জামাত-ই-ইসলামী , পাকিস্তান পরিষদ মুসলিম লীগ এবং ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট। এর ঘোষিত লক্ষ্য ছিল গণআন্দোলনের মাধ্যমে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার। এ আন্দোলন ১৯৬৭ সালের মে মাসে একটি আট দফা কর্মসূচি গ্রহণ করে। এতে অন্তর্ভুক্ত ছিল পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, একটি সংসদীয় পদ্ধতির সরকার এবং

বয়স্কদের ভোটাধিকার। কিন্তু মূলত পাকিস্তানের সমর্থকদের কথা বিবেচনায় রেখে ছয় দফা কর্মসূচির কিছু দাবি বেশ কিছু পরিমাণে নমনীয় করা হয়। ১৯৬৭ সালের মে মাসে ঢাকায় আন্দোলনের একটি কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। আদি ছয় দফা থেকে বেশ কিছু ছাড় দেয়ার ফলে আট দফা কর্মসূচি প্রদেশে তেমন কোনো অগ্রগতি লাভ করতে পারে নি। এতে আওয়ামী লীগে ভাঙন দেখা দেয়। যারা ছয় দফার প্রশ্নে আপোস করতে আগ্রহী ছিলেন, দৃঢ়চেতা শেখ মুজিব ও তাঁর বিশ্বস্ত অনুসারী তাজুদ্দীন আহমদ তাঁদের থেকে দূরে সরে দাঁড়ান।

মুজিব কারারুদ্ধ থাকা অবস্থায়ই পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলন উভয় প্রদেশ থেকে সমর্থন নিয়ে ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসে একটি গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি গঠন করে। কমিটির নেতৃত্বে ছিলেন চরম বাম ও চরম ডানপন্থীসহ বিভিন্ন মতের দৃঢ়চেতা নেতৃবর্গ, যাঁদের অভিন্ন লক্ষ্য ছিল আইয়ুবকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ।[২৪] কমিটি সফলভাবে বেশ কয়েকটি প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করে। ফলে আইয়ুবের মধ্যে ক্লান্তির ছাপ প্রকাশ পায় এবং তিনি জনগণের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হন। দেশে বিরাজমান রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য আইয়ুব ১৯৬৯ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটির সভাপতি নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ্ খানকে ইসলামাবাদে আমন্ত্রণ জানান। কমিটি তাৎক্ষণিকভাবে এ রকম কোনো আলোচনা অনুষ্ঠানের পূর্বে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির জন্য পাঁচ দফা পূর্বশর্ত আরোপ করে। এ পূর্বশর্তগুলোর মধ্যে ছিল সকল রাজবন্দির মুক্তি, সভা ও মিছিল এবং অন্যান্য রাজনৈতিক তৎপরতার উপর কড়াকড়ি প্রত্যাহার, ছাত্রদের উপর লাঠিচার্জ ইত্যাদি পুলিশী নির্যাতনের অবসান, যেসকল বিধি, অধ্যাদেশ ও আদেশ স্বেচ্ছাচারী গ্রেফতার এবং ব্যক্তিবিশেষদের কর্মকাণ্ডে বিধি-নিষেধ আরোপের সুযোগ করে দিয়েছিল সেগুলো প্রত্যাহার।

## ১১ দফা আন্দোলন

যে সময়ে জনপ্রিয় রাজনীতিবিদদের অধিকাংশ কারাগারে আটক ছিলেন এবং সরকারবিরোধী আন্দোলনে ভাটার লক্ষণ দেখা যায়, তখন ছাত্র সম্প্রদায়ের মধ্যে নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার হয় এবং তারা চূড়ান্ত আঘাত হানার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসে সকল মত ও আদর্শের অনুসারী ছাত্রদের নিয়ে গঠিত হয় ছাত্র সংগ্রাম কমিটি। এ কমিটি ছয় দফাকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি এগার দফা কর্মসূচি প্রণয়ন করে। এর অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য দফাগুলোর মধ্যে ছিল শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার, শ্রমিক শ্রেণীর জন্য পর্যাপ্ত মজুরি, কৃষকদের জন্য প্রযোজ্য ভূমিকর হ্রাস, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার এবং শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দির মুক্তি।[২৫] এই ছাত্রআন্দোলন রাজনীতিবিদদের কাছ থেকে কেবল

২৪. কমিটির বিস্তারিত কর্মসুচি দেখুন, *Pakistan Times*, Jan. 9 1969.

২৫. Pakistan Observer, Jan 6, 1969.

বাহ্যিক সমর্থন পেলেও শিল্পশ্রমিক, কৃষক এবং মধ্যবিত্তসহ সমাজের সকল স্তরের জনগণের সক্রিয় সমর্থন পেয়েছিল। এমনকি চরম নির্যাতন ও হয়রানির মুখেও ঐক্যবদ্ধ ছাত্রসমাজ তাদের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয় নি। ছাত্রদের চাপে মৌলিক গণতন্ত্রীদের অধিকাংশ পদত্যাগ করেন, সরকারি কার্যক্রমে অচলাবস্থা দেখা দেয় এবং রেল ও অন্যান্য পরিবহনের চাকা থেমে যায়।

## আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

জনগণের সমর্থনপুষ্ট দুর্বার ছাত্র আন্দোলনের মুখে শেখ মুজিবকে কারাগারে রেখে বিরোধীদের সাথে আলোচনা ফলপ্রসূ হবে না বুঝতে পেরে আইয়ুব ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি মুজিবসহ অন্যান্য বিরোধী নেতাদেরকে বিনা শর্তে মুক্তি দেন। ১৯৬৮ সালের জানুয়ারিতে দায়েরকৃত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাও প্রত্যাহার করা হয়। এই ষড়যন্ত্র মামলায় ৬ জন বাঙালি বেসামরিক ও সামরিক কর্মকর্তাসহ মোট ২৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল, কারাবন্দি শেখ মুজিবকে ষড়যন্ত্রের মূল হোতা হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। প্রকাশ্য আদালতে সরকারপক্ষ শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে ভারতের সাথে বিচ্ছিন্নতাবাদী ষড়যন্ত্রে জড়িত থেকে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ আনলেও সরকার সে অভিযোগ প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়। জনসমক্ষে বিচার অনুষ্ঠিত হলে মুজিবের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হবে এবং তাঁকে অন্তত দীর্ঘ কারাদণ্ড প্রদান করা হবে বলে আইয়ুব আশা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর আশা পূর্ণ হলো না। এর পরিবর্তে মুজিব পূর্ব পাকিস্তানের সবচেয়ে শক্তিমান নেতা হিসেবে আবির্ভূত হলেন। এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে আইয়ুবই বানোয়াট অভিযোগের মাধ্যমে মুজিবের রাজনৈতিক জীবনের অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন। সকলেই বিশ্বাস করেছিল যে মুজিব ষড়যন্ত্র করেছেন বলে কোনো প্রমাণ থাকলে সরকার পক্ষ তার ক্ষমতা ব্যবহারের মাধ্যমে অবশ্যই তা উপস্থাপন করবে। আগরতলা ছিল আইয়ুবের অন্যায়ের বিরুদ্ধে নিয়তির প্রতিশোধ। সম্ভবত আগরতলার উপর অনুসন্ধানমূলক তদন্তই কেবল শাসকগোষ্ঠীর ষড়যন্ত্রের স্বরূপ উদ্ঘাটন করবে।

## গোলটেবিল সম্মেলন

আইয়ুবের আমন্ত্রণ পেয়ে শেখ মুজিব ১৯৬৯ সালের ২০ মার্চ রাওয়ালপিন্ডিতে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল সম্মেলনে যোগদান করেন। ডেমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটির সদস্যরাও এ সম্মেলনে যোগদান করেন। যদিও আইয়ুব সংসদীয় পদ্ধতিতে ফিরে যেতে এবং প্রাপ্তবয়স্কদের সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সম্মত ছিলেন, মুজিবের পক্ষে তখন আর পশ্চাদপসরণ করার উপায় ছিল না এবং ছয় দফা কর্মসূচি সম্পূর্ণরূপে মেনে নেয়া ছাড়া কোন রাজনৈতিক সমাধান সম্ভব ছিল না। সম্মেলনে বিরোধী দলকে ভয় দেখিয়ে রাজি করানোর এবং বোকা বানানোর প্রয়াসে আইয়ুব ব্যর্থ হন।

সম্মেলনে দৃশ্যত অনুপস্থিত ভূট্টো এবং ভাসানী মুজিবকে পাশ কাটিয়ে একটি পুরোদস্তুর চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করেন, যাতে বলা হয় যে তাঁরা একত্রে পাকিস্তানে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার, বিদেশী হস্তক্ষেপ বর্জন এবং সমাজতন্ত্র কায়েমের জন্য কাজ করবেন। কিন্তু এ কৌশল বিপরীত ফল উৎপাদী বলে প্রমাণিত হয় এবং এতে কেবল স্বায়ত্তশাসনের দাবিই জোরদার হয়। যখন গোলটেবিল সম্মেলন চলছিল ঠিক তখনই আদমজী পাটকল এবং পাকিস্তান টোব্যাকো কোম্পানির মতো পশ্চিম পাকিস্তানী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে ধারাবাহিক শ্রমিকধর্মঘট সারা প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ে। এ প্রক্রিয়ায় বিহারী ও বাঙালির পুরনো শত্রুতা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। তখন গণবিক্ষোভ হানাহানির রূপ নেয়, যখন পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে। অনেকের ধারণা, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় প্রদেশের রেকর্ডে কালিমা লেপনের জন্যই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক শ্রমিক ধর্মঘটের আয়োজন করা হয়েছিল। আইয়ুব পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনেম খানকে অপসারণ করে ডঃ এম. এন. হুদাকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন।

## আইয়ুবের পতন এবং পুনরায় সামরিক শাসন জারি

প্রদেশের সর্বত্র প্রতিবাদ ও হরতালসহ চরম বিশৃঙ্খল অবস্থা বিরাজ করার প্রেক্ষাপটে শিল্পোৎপাদন এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ হয়ে যায়, আইন-শৃঙ্খলার দ্রুত ঘটে, আমলাতন্ত্র অকার্যকর হয়ে পড়ে এবং খবর পাওয়া যায় যে এমনকি সামরিক বাহিনী নড়বড়ে সরকারকে সহায়তা করতে অসম্মতি জানায়। ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ আইয়ুব তাঁর দায়িত্ব পরিত্যাগ করে প্রতিরক্ষা বাহিনীকে "দেশের যাবতীয় বিষয় নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব প্রদান করেন"।[২৬] সামরিক বাহিনী কর্তৃক ক্ষমতা গ্রহণের পর সামরিক আইন জারি করা হয় এবং সৈন্যরা যুদ্ধপ্রস্তুতি নিয়ে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে দ্বিতীয় বারের মতো সামরিক বাহিনী দেশের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে, তবে কেবল রাষ্ট্রের বিভাজনে নেতৃত্ব করার জন্য। ক্ষমতা ত্যাগের মাধ্যমে আইয়ুব আরেকটি স্বৈরাচারী সরকারের হাতে ক্ষমতা তুলে দেন, যাকে বাঙালিরা তাদের কোনঠাসা করে রাখার আরেকটি কূটচাল হিসেবে দেখে বিশেষত তাদের বিজয় যখন ছিল হাতের মুঠোয়। আইয়ুব কর্তৃক জোরগলায় প্রচারিত 'উন্নয়নের দশক' প্রকৃতপক্ষে জাতির মূল রাষ্ট্রকাঠামোকেই ধ্বংস করে দেয় এবং পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে, প্রদেশের জনগণের সংবেদনশীলতা ও আকাঙ্ক্ষার প্রেক্ষাপটে যা ছিল অবধারিত। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ আইয়ুব ও তাঁর দোসরদের এবং তাদের স্বৈরাচারী শাসনপদ্ধতিকে দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিল। পক্ষান্তরে, প্রদেশের রাজনৈতিক গতিময়তার মধ্যে সক্রিয় মুজিব জনগণের চোখে তাদের অধিকারের রক্ষক হিসেবে আবির্ভূত হন।

২৬. *Pakistan Observer*, March 26, 1969.

## ইয়াহিয়া সরকার

আইয়ুবের পতনের পর সরকারবিরোধী আন্দোলনের জন্য প্রধানত দায়ী ১৯৬২ সালের সংবিধান বাতিল করা হয় এবং নতুনভাবে আলাপ-আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি হয়। জেনারেল ইয়াহিয়া খান সেনাপ্রধান হিসেবে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব পালনকালে ১৯৬৯ সালের ৩১ মার্চ নিজেকে রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা করেন। ইয়াহিয়া তাঁর প্রশাসনকে একটি অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে দেখেন এবং ক্ষমতাগ্রহণের পর পরই অনতিবিলম্বে সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রতিশ্রুতি দেন, যা একটি নতুন সংবিধান প্রণয়ন করবে। তিনি রাজনৈতিক দলসমূহের নেতৃবৃন্দের সঙ্গেও আলোচনা শুরু করেন। কিন্তু ইয়াহিয়ার দূরদৃষ্টির অভাব ছিল এবং ইতিমধ্যেই আটকে পড়া একটি তরীর কাণ্ডারী হওয়ার যোগ্যতা তাঁর ছিল না। চরিত্রহীন এবং গুটিকয়েক উপদেষ্টার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তি ইয়াহিয়া তাঁর প্রশাসনের জন্য কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করেন নি এবং কোনো জাতীয় কর্মসূচিও হাতে নেন নি। তাঁর পূর্বসূরির মতো তিনিও বেসামরিক জনগণকে ঘৃণার চোখে দেখতেন এবং সকল কর্তৃত্ব এমন একটি সামরিক গোষ্ঠীর হাতে ন্যস্ত করেন, যারা সমগ্র সরকারি প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করতো।[২৭] ক্ষমতাসীন সরকারের জন্য রাজনৈতিক সমর্থন লাভের লক্ষ্যে এবং ১৯৭০-এর ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনের প্রস্তুতি হিসেবে ইয়াহিয়া ১৯৬৯ সালের আগস্টে একটি সম্প্রসারিত মন্ত্রিসভা নিয়োগ করেন, যাতে কিছু বাছাই করা বেসামরিক ব্যক্তিও ছিলেন। তবে কিছু বেসামরিক ব্যক্তিকে নিয়ে গঠিত এই মন্ত্রিসভার কর্তৃত্ব ছিল একেবারে বাহ্যিক। প্রকৃত ক্ষমতা ছিল আবদুল হামিদ, নূর খান, এস. এম. আহসান এবং জি. এম. পীরজাদার মতো সামরিক কর্মকর্তাদের হাতে। এই সম্প্রসারিত মন্ত্রিসভায় বাঙালি সদস্যরা ছিলেন এ. মালিক, আহসানুল হক, হাফিজুদ্দিন, শামসুল হক এবং জি. ডব্ল্যু. চৌধুরী। এঁদের কেউই বাঙালিদের স্বায়ত্তশাসনের দাবির প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন না। একইভাবে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের মুখ্য সচিব হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত বাঙালি আমলা শফিউল আজমও বাঙালিদের স্বার্থের ব্যাপারে সহানুভূতিশীল ছিলেন না বলে জানা যায়।

ইয়াহিয়া দু'টি বিতর্কিত ও বিরোধপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৯৫৬ সাল থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের যে একক সত্তা কার্যকর ছিল, তা ১৯৬৯ সালের ২৮ নভেম্বর তিনি কলমের এক খোঁচায় বিলোপ করে দেন। এর ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের আদি চারটি প্রদেশের পুনরুজ্জীবন ঘটে। এভাবে ১৯৫৬ এবং ১৯৬২ সালের সংবিধানে বিধৃত পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সমতার নীতিটি কার্যকরভাবে পরিবর্তিত হয়। তিনি একই সাথে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সকল আসনে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের আদেশ জারি করেন।[২৮] এ সিদ্ধান্তের ফলে প্রথম বারের মতো জাতীয় পরিষদে

২৭. দেখুন, Fazl-i-Muqueem Khan, *Pakistan's Crisis in Leadership*, (Karachi: National Book Foundation, 1973), 19.

২৮. ১৯৬১ সালের আদমশুমারির ভিত্তিতে আসন বণ্টন করা হবে।

পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিত হয়। সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানকে এক কক্ষবিশিষ্ট জাতীয় পরিষদের ৩০০ আসনের মধ্যে ১৬২টি আসন বরাদ্দ করা হয়, যে পরিষদ গণপরিষদ হিসেবে কাজ করবে।[২৯]

## আইনগত কাঠামো আদেশ

১৯৭০ সালের ৩০ মার্চ ইয়াহিয়া একতরফাভাবে একটি আইনগত কাঠামো আদেশ[৩০] জারি করেন, যাতে নির্বাচনের পূর্বে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য জাতীয় পরিষদের জন্য নির্বাচনী বিধি এবং সংবিধানে সংযোজনার্থে কিছু বিধানের রূপরেখা অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ আদেশ প্রদেশ ও অঞ্চলসমূহের সমন্বয়ে একটি ফেডারেশনের ধারণা দেয় এবং "নিশ্চয়তা দেয় যে ফেডারেশনের ঐক্য কোনোভাবেই বিনষ্ট হবে না।" এ আদেশ জনসংখ্যা এবং প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ফেডারেল ও প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনের ব্যবস্থা করে গণতন্ত্রের নীতিমালাকে ঊর্ধ্বে স্থান দেয়। আদেশের আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিধিগত ও অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে প্রদেশসমূহ এবং প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য বৈষম্য হ্রাস করার অঙ্গীকার। এ আদেশে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপ্তি নির্দেশ করা না হলেও একথা বলা হয় যে প্রদেশগুলোর সর্বাধিক স্বায়ত্তশাসন থাকবে, যা ছিল একটি অস্পষ্ট শব্দ এবং এ আদেশে ছয় দফা অথবা পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের বিশেষ দাবির উল্লেখ ছিল না। আদেশের অন্য কয়েকটি ধারা ছিল পশ্চাদমুখী পদক্ষেপ এবং এগুলো পূর্ব পাকিস্তানে তেমন কোনো সমর্থন পায় নি। যেমন, এ পর্যায়ের একটি ধারায় বলা হয়, সাংবিধানিক বিলটি প্রেসিডেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে; জাতীয় পরিষদ নয়, বরং প্রেসিডেন্ট আদেশটি পরিবর্তন করতে পারবেন এবং আদেশের ব্যাখ্যাও প্রেসিডেন্ট প্রদান করবেন। আদেশটিতে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের কোনো সুযোগ রাখা হয় নি। এতে বলা হয় যে পাকিস্তান হবে একটি ইসলামী প্রজাতন্ত্র; যে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে তা সংরক্ষণ করা হবে, এবং রাষ্ট্রের প্রধান হবেন একজন মুসলিম। শেখ মুজিব কৌশলে আদেশটি এড়িয়ে যান, কারণ তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিপুল বিজয় ছয় দফার উপর একটি গণরায়ে রূপান্তরিত হবে।[৩১] ফলে আইনগত কাঠামো আদেশের মাধ্যমে

২৯. মহিলাদের জন্য ১৩টি আসন সংরক্ষিত ছিল, যেগুলো প্রদেশগুলোর নির্বাচিত সদস্য দ্বারা পূরণযোগ্য। সংরক্ষিত আসনের ৭টি পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ ছিল।

৩০. আদেশটির পূর্ণ বিবরণের জন্য দেখুন, *White Paper on the Crisis of East Pakistan,* (Islamabad.Government of Pakistan, August 1971), Appendix B: Legal Farmework Order.

৩১. *Pakistan Observer*, Oct. 26, 1970 এবং Sen, p. 252. আওয়ামী লীগ ছয় দফা দাবিকে তার ম্যানিফেস্টোতে আরো বিস্তারিত ও ধারালোভাবে পুনঃউপস্থাপন করে এবং ইয়াহিয়ার নিরপেক্ষ ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করে। আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার ১৯৭০-এর এপ্রিলে প্রকাশিত হয়। দেখুন, A.H.M Kamruzzaman, *The Manifesto of the Awami League*, Dhaka: Clory Printers, 1970, and *Morning News*, June 8, 1970.

অনেক কড়াকড়ি আরোপ করা হলেও বাঙালিরা বর্তমান ব্যবস্থায় থেকেই কাজ করতে আগ্রহী ছিল। অধিকন্তু, তাড়াহুড়ো করে প্রণীত এই দলিলে সাংবিধানিক বিলের উপর ভোটাভুটির পদ্ধতির মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে অস্পষ্টতা থাকায় সাংবিধানিক বিলটি সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পাশ হবে নাকি সকল ফেডারেল এককের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে গৃহীত হবে তা নির্ধারণ করার ক্ষমতা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে চলে যায়।

১৯৭০ সালের জানুয়ারি মাসে রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মকাণ্ডের উপর বিধিনিষেধ প্রত্যাহারের পর পূর্ব পাকিস্তানে প্রবল নির্বাচনপূর্ব প্রচারণা শুরু হয়। ঠিক তখনই ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস উপকূলীয় নিম্নাঞ্চলের ৮,০০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা এবং বঙ্গোপসাগরের দ্বীপসমূহে আঘাত হানে। স্মরণকালের এই সবচেয়ে ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ৩,৫০,০০০ মানুষ প্রাণ হারায়।[৩২] এছাড়া এতে যোগাযোগ অবকাঠামো এবং সম্পদেরও ব্যাপক ক্ষতি হয়। এই সময়ে ইয়াহিয়া সংক্ষিপ্ত সফরের উদ্দেশ্যে ১৫ নভেম্বর ঢাকায় আগমন করেন, কিন্তু প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি জরুরি ভিত্তিতে জাতীয় ত্রাণ ও পুনঃনির্মাণ কর্মসূচি গ্রহণ করেন নি। তাঁর এ অবহেলা ও নিষ্ক্রিয়তা বাঙালি জনগণকে হতবাক করে এবং প্রদেশ ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে একটি দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরের সৃষ্টি হয়। ঢাকার সংবাদমাধ্যমগুলো ঐক্যবদ্ধভাবে শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে চরম অবহেলা, অমনোযোগিতা, ঔদাসীন্য এবং আন্তর্জাতিক ত্রাণসংস্থার তৎপরতাকে বাধাগ্রস্ত করার অভিযোগ আনে। শেখ মুজিব আক্ষেপ করে বলেন যে "পশ্চিম পাকিস্তানে গমের বাম্পার ফলন হওয়া সত্ত্বেও আমাদের নিকট খাদ্যশস্যের প্রথম চালান আসে বিদেশ থেকে" এবং "বস্ত্রব্যবসায়ীরা আমাদের পরিধানের জন্য এক গজ কাপড়ও দেয় নি।"[৩৩] মুজিব দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, "আমাদের এক বিশাল সেনাবাহিনী আছে, কিন্তু আমাদের মৃতদেহগুলো কবর দেয়ার দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল বৃটিশ নাবিকদের উপর।" তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় পাকিস্তানের ঐক্যের ভিত্তি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন এবং বলেন : "সকল গ্রাম, গৃহ ও বস্তিতে এখন সকলের মনে এ অনুভূতি প্রবল হয়েছে যে আমরাই নিজেদেরকে শাসন করবো। সকল গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত আমরাই গ্রহণ করবো। আমরা আর আমলা, পুঁজিপতি ও পশ্চিম পাকিস্তানের সামন্তবাদী গোষ্ঠীর স্বেচ্ছাচারী শাসন মেনে নেব না।"[৩৪] ঘূর্ণিঝড়ের পরবর্তীকালে বাঙালিরা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আবেগের দিক দিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

## ১৯৭০-এর সংবিধান

ঘূর্ণিঝড়ের পর চার সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে বাঙালিদের অনুভূতিকে সম্পূর্ণরূপে অবজ্ঞা করে ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর ইয়াহিয়া প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে

৩২. *The Washington Post, Chicago Tribune, New York Times* এবং অন্যান্য সংবাদমাধ্যমে নভেম্বর থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত ঘূর্ণিঝড়ের উপর ব্যাপক কভারেজ দেয়া হয়।

৩৩. *Bangladesh: A Country Study*, 29

৩৪. ঐ।

প্রথমবারের মতো পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন; তবে পূর্ব পাকিস্তানের কোন কোন জেলায় ১৯৭১ সালের ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত নির্বাচন স্থগিত করা হয়।[৩৫] এই প্রথম বারের মতো জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যরা সরাসরি নির্বাচিত হন। ভোট প্রদানের হার ছিল বেশ উচ্চ এবং নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ বলে বিবেচিত হয়েছিল। আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের জন্য জাতীয় পরিষদে বরাদ্দকৃত ১৬২টি আসনের মধ্যে ১৬০টিতেই জয়লাভ করে।[৩৬] একইভাবে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনেও আওয়ামী লীগ বিরোধী পক্ষকে পরাজিত করে। প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের ঘোষিত ফলাফলে ৩০০ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৮৮টি লাভ করে। মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত বাকি ১০টি আসনের জন্য নির্বাচন তখনও হয় নি। ভূট্টোর নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান পিপল্‌স পার্টি পশ্চিম পাকিস্তানের ১৩৮টি আসনের মধ্যে ৮১টি লাভ করে এবং দ্বিতীয় বৃহত্তম দলে পরিণত হয়, যাদের অধিকাংশ ছিলেন পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশ থেকে নির্বাচিত। বেলুচিস্তান এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছাড়াই পশ্চিম পাকিস্তানের সর্ববৃহৎ দল হিসেবে আবির্ভূত হয়। কোনো দল উভয় প্রদেশ থেকে অর্থবহ সমর্থন লাভে সক্ষম না হওয়ায়[৩৭] পাকিস্তানের ঐক্য খুবই শিথিল হয়ে পড়েছিল বলে প্রতীয়মান হয়। বস্তুত ১৯৪৭ সালে যে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল, ১৯৭০ সালের নির্বাচন তার পতনের সূচনা করে। আওয়ামী লীগের বিস্ময়কর নির্বাচনী বিজয় জাতীয় পরিষদে তার নিয়ন্ত্রণ সুনিশ্চিত করে। একই সাথে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভের কারণে সংসদীয় পদ্ধতিতে মুজিবের সরকারপ্রধান হওয়া নিশ্চিত হয়। কিন্তু মুজিবের কাছে প্রধানমন্ত্রিত্ব গ্রহণের চেয়েও বড় বিষয় ছিল জাতীয় পরিষদ কর্তৃক প্রণীতব্য সংবিধানে ছয় দফা ফর্মুলা অন্তর্ভুক্ত করা, যাতে পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষমতাধরদের অনুমোদন প্রয়োজন হবে। ছয় দফার মৌলিক প্রসঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারা একটি ঐকমত্যে আসতে ব্যর্থ হওয়ায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হতে পারে নি, যেখানে একটি রাজনৈতিক সংলাপ অনুষ্ঠিত হতে পারতো। বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন শেখ মুজিবের কাছে আওয়ামী লীগের ছয় দফা ছিল নির্বাচনী ইশতেহারের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় এবং তাই পিছু হটার কোন সুযোগ ছিল না।[৩৮] ইশতেহারে অন্তর্ভুক্ত

৩৫. ইতিপূর্বে ৫ অক্টোবর , ১৯৭০ নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ নির্ধারিত হয়েছিল, কিন্তু আগস্টে ভয়াবহ বন্যার কারণে এই তারিখে ৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত পিছিয়ে দেয়া হয়।

৩৬. জাতীয় পরিষদের যে দুটি আসনে আওয়ামী লীগ পরাজিত হয় তার একটিতে পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী ও পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতা নূরুল আমিন জয়লাভ করে; আরেকটিতে জয়লাভ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় প্রধান রাজা ত্রিদিব রায়। রায়ের আসনে আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। এই উভয় ব্যক্তিই বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছিল।

৩৭. আওয়ামী লীগের ১৯ দফা নির্বাচনী ইশতেহার ছিল ছয় দফা এবং ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা কর্মসূচির যোগফল।

ছয় দফা কর্মসূচিকে সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ অনুমোদন দিয়েছিল এবং ভূট্টো তাঁর নির্বাচনী প্রচারণার সময় একে কখনো চ্যালেঞ্জ করেন নি।

আইনগত কাঠামো আদেশ অনুযায়ী জাতীয় পরিষদ কর্তৃক ১২০ দিন সময়কালের মধ্যে সংবিধান প্রণয়নের কথা ছিল। যদিও মুজিব যথাসময়ের পূর্বে অধিবেশন অনুষ্ঠানের অনুরোধ জানিয়েছিলেন, ইয়াহিয়া ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ ঢাকায় নব নির্বাচিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেন, যেখানে ইতিপূর্বে অধিবেশন অনুষ্ঠানের জন্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। নির্বাচনী ফলাফল জানার পরেই ভূট্টো জনসমক্ষে ঘোষণা দেন যে তাঁকে কেন্দ্রে ক্ষমতার ভাগ না দিলে তাঁর দল জাতীয় পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশনে যোগদান করবে না। সংসদে ভূট্টোর দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকলেও প্রতীয়মান হচ্ছিল যে তুরুপের তাস ছিল তাঁরই হাতে। সংসদ বর্জনের হুমকি দিয়ে ভূট্টো একে অকার্যকর করতে পারতেন। এক্ষেত্রে ভূট্টোর ছিল কৌশলগত সুবিধা। কিন্তু তাঁর ক্ষমতা বিদ্যমান ছিল সংসদের বাইরে, ভেতরে নয়। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসলে পাকিস্তানের প্রেক্ষাপটে আওয়ামী লীগের শক্তি কার্যকর হতো।

## নির্বাচনপরবর্তী ঘটনাবলী

আওয়ামী লীগের যুগান্তকারী নির্বাচনী বিজয় মুজিবকে বাঙালিদের অবিসম্বাদিত নেতায় পরিণত করে। আর আওয়ামী লীগের সর্বাত্মক বিজয় বাঙালি জাতীয়তাবাদের অবিচল অভিব্যক্তি হিসেবে গণ্য হয়। বাঙালির জাতীয় পরিচয়ের পুনরুজ্জীবিত ও সংকল্পদৃঢ় প্রেরণা এবং বাঙালি জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের দাবি সারা বাংলাদেশকে উদ্দীপ্ত করে। ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে এক বিশাল জনসভায় মুজিব বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন যে "কেউই আমাদেরকে ছয় দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে সংবিধান প্রণয়নে বাধা দিতে পারবে না।" তিনি এখানে নব নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদেরকে ম্যানিফেস্টো বাস্তবায়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকার জন্য শপথনামা পাঠ করান।[৩৯] এ ব্যাপারে যেকোন সন্দেহ দূর করার জন্য মুজিব তাঁর ভাষণে দৃঢ়কণ্ঠে বলেন যে ছয় দফা আমাদের পবিত্রতম ধ্রুব লক্ষ্য এবং আওয়ামী লীগের স্বায়ত্তশাসন কার্যক্রমে কোনো দ্ব্যর্থকতা নেই, এবং অতীতের মতো পর্দার অন্তরালে আওয়ামী লীগের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা পশ্চিম পাকিস্তানী স্বার্থের কাছে আত্মসমর্পণ করবে না অথবা দলত্যাগ করবে না। পরের দিন, ৪ জানুয়ারি শাসকগোষ্ঠীকে উদ্দেশ করে মুজিব পরিষ্কার ভাষায় বলেন যে বাঙালিরা নির্বাচনে

৩৮. পশ্চিম পাকিস্তানের চারটি প্রদেশে আওয়ামী লীগের প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার ছিল : পাঞ্জাব ০.০৭, সিন্ধু ০.০৭, বেলুচিস্তান ১.০, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ০.০২। পিপল্‌স পার্টি পূর্ব পাকিস্তানে কোন প্রার্থী দেয় নি।

৩৯. দেখুন, *ইত্তেফাক*, জুন ৪, ১৯৭১; আরো দেখুন, *Bangladesh Documents*, (New Delhi Government of India, Ministry of External Affairs, 1973), 137-8

দ্ব্যর্থহীনভাবে তাদের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছে এবং ছয় দফা পরিবর্তনের কোনো কর্তৃত্ব জাতীয় পরিষদের থাকবে না।[৪০] স্বায়ত্তশাসন ইস্যুতে সুদৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করে মুজিব পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার কোনো ইঙ্গিত অবশ্য দেন নি। আওয়ামী লীগের একদল সংবিধানবিশেষজ্ঞ ইতিমধ্যেই ছয় দফার ভিত্তিতে পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে একটি কার্যকর সংবিধান প্রণয়নের কাজে একাগ্রচিত্তে নিয়োজিত হন।

মুজিব যখন সতর্ক পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, ভাসানী তাঁর জনপ্রিয়তা পুনরুদ্ধারের আশায় এবং সম্ভবত ভূট্টোর সাথে সাংবিধানিক বিতর্কে জড়িত মুজিবকে চ্যালেঞ্জ করার উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেন যে আওয়ামী লীগের বিজয়কে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য জনগণের রায় হিসেবে গণ্য করা উচিত এবং আওয়ামী লীগ এ লক্ষ্য থেকে সরে গেলে তিনি আন্দোলনের হুমকি দেন।[৪১] তবে তোহা-হকের নেতৃত্বে বামদল স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের দাবিকে একটি ভিন্নমুখী পদক্ষেপ হিসেবে দেখে এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াকে একটি ইস্যু বলে গণ্য করে নি।[৪২] ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের জনসমর্থনের কাছে পরাজিত হওয়ার আশংকায় ভাসানী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে চান নি। নির্বাচনের পরে তাঁর প্রভাব প্রান্তিক পর্যায়ে নেমে আসে। অবশ্য মুজাফফর আহমদের নেতৃত্বে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির আরেকটি অংশ পশ্চিম পাকিস্তানের ওয়ালী খানের সাথে হাত মিলিয়েছিল, তবে তারা আওয়ামী লীগকে নিঃশর্ত সমর্থন জোগায়।

নির্বাচনের পরে পরিষ্কার হয়ে উঠলো যে রাজনৈতিক ত্রিভুজের তিন প্রধান নায়ক ইয়াহিয়া, মুজিব ও ভূট্টো তিনটি স্বতন্ত্র এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন এলাকার প্রতিনিধিত্ব করছেন। এই ত্রিভুজের ভঙ্গুর স্থানগুলোতে টান পড়লে তা পাকিস্তান রাষ্ট্রের কাঠামোকেই ধ্বংস করে দেবে। নির্বাচনের পরে প্রথম যে কাজটি করা উচিত ছিল তা হলো সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করা। কিন্তু আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় ভীত হয়ে শাসকগোষ্ঠী ভূট্টোর সহায়তায় মুজিবকে সংসদের বাইরে একটি দীর্ঘস্থায়ী ও ধ্বংসাত্মক আপোস-আলোচনায় নিয়ে আসার ষড়যন্ত্র করে। এরপর যে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় তাতে সুনির্দিষ্ট কোনো আলোচ্যসূচি ছিল না। এতে প্রমাণিত হয় যে রাষ্ট্রের দুই অংশের ঐক্য সংরক্ষণ করার মতো কোন অভিন্ন অবস্থান তাদের ছিল না।

আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয় শাসকগোষ্ঠীর নির্বাচনপূর্ববর্তী নীল নকশা বানচাল করে দিয়েছিল। তারা আশা করেছিল যে আওয়ামী লীগ বড় জোর সামান্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে, যার ফলে তা পশ্চিম পাকিস্তানী দলগুলোর সাথে জোট গঠনে বাধ্য হবে। ইয়াহিয়ার

৪০. *Pakistan Observer*, Jan. 5, 1971

৪১. *Far Eastern Economic Review*, Jan, 19, 1971.

৪২. Hasan Zaheer, *The Separation East Pakistan: The Rise and Realization of Bengali Muslim Nationalism*, (Karachi 1994), 131, এবং *Far Eastern Economic Review*, Jan. 16, 1971. পরে ভাসানীর অনুসারী মোহাম্মদ তোয়াহা এবং আবদুল হক পদত্যাগ করে একটি বামপন্থী দল গঠন করে। এখানে উল্লেখ্য যে ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের একটি ক্ষুদ্র অংশ ছাড়া ১৯৭১-এর শুরুতে এ দলের সমর্থন ছিল তাৎপর্যহীন।

গোয়েন্দা ব্যুরোর পরিচালক "বরাবরই বলছিল যে কোনো একটি দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না।[৪৩] অধিকন্তু ইসলামপছন্দ জোট হিসেবে আখ্যায়িত কিছু ডানপন্থী ধর্মভিত্তিক দল ও স্বার্থ শাসকগোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতা এবং পশ্চিম পাকিস্তানী ব্যবসায়ীদের অঢেল আর্থিক সহায়তা পায়। তারা দাবি করেছিল যে তাদের যথেষ্ট জনসমর্থন আছে এবং মুজিবের নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করতে তারা সক্ষম। বিশেষত জামায়াতে ইসলাম স্বায়ত্তশাসন কর্মসূচিকে ইসলামের বিরোধী বলে চিহ্নিত করে এর বিরোধিতা করেছিল।[৪৪]

সংসদীয় জোটভিত্তিক রাজনীতির প্রেক্ষাপটে শাসকগোষ্ঠী আশা করেছিল যে আওয়ামী লীগ তার স্বায়ত্তশাসন কর্মসূচি শিথিল করতে বাধ্য হবে এবং তারা পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়াবে না। জানা যায় যে সেনাবাহিনীর প্রতি আওয়ামী লীগের মনোভাব লক্ষ্য করে সকল জেনারেল ইতিমধ্যেই শংকিত হয়ে পড়েছিল এবং তারা নির্বাচনের ফলকে একটি "বিপর্যয়' বলে গণ্য করেছিল।[৪৫] এমনকি কয়েকজন সিনিয়র অফিসার এ আশংকাও প্রকাশ করেছিলেন যে বাঙালি অফিসার কর্নেল এম. এ. জি ওসমানী, যাঁকে পদোন্নতি প্রদান না করে অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়েছিল, তিনি আওয়ামী লীগ সরকারে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে তাঁর অপমানের শোধ নেবেন।[৪৬]

## ঢাকার মঞ্চে ইয়াহিয়া

ইয়াহিয়া কিছুকালের জন্য নিষ্ক্রিয় ছিলেন, যে সময়ে তিনি নির্বাচনপরবর্তী রাজনৈতিক বাস্তবতা অনুধাবনের চেষ্টা করছিলেন। এরপর মুজিবের সাথে ধারাবাহিক আলোচনা শুরু করার উদ্দেশ্যে ১৯৭১ সালের ১১ জানুয়ারি ইয়াহিয়া ঢাকায় আগমন করেন। ইয়াহিয়া ও তাঁর জেনারেলরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বীকার করেন যে জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় মুজিবই তখন দেশের রাজনীতিতে মুখ্য ব্যক্তি। মুজিব ইতিপূর্বে রাজনৈতিক আলোচনার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানে যেতে ইয়াহিয়ার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন। স্পষ্টতই মুজিব পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকদেরকে জানাতে চেয়েছিলেন যে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়েছে।

শীর্ষ পর্যায়ে মুজিব ও ইয়াহিয়ার তিনদিন ব্যাপী আলোচনা এবং তিন প্রধান নেতার মধ্যে পরবর্তী পর্যায়ের আলোচনার বিষয় সম্পর্কে বেশি কিছু প্রামাণ্য বিবরণ পাওয়া যায় না। এ পর্যায়ের আলোচনায় যেসকল বিশিষ্ট বাঙালি নেতা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের

৪৩. Zaheer, *East Pakistan*, 130
৪৪. দেখুন, Maudud Ahmed, *Bangladesh : Constitutional Quest for Autonomy*, Dhaka University Press, 1976, 93.
৪৫. Zaheer, *East Pakistan*, 130.
৪৬. ঐ।

মধ্যে ডঃ কামাল হোসেন ছাড়া আর কেউ এখন বেঁচে নেই। ডঃ কামাল হোসেন পরবর্তীকালে স্বাধীন বাংলাদেশের আইন ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। যতদূর জানা যায়, কামাল হোসেনও সেসব রূঢ় আলোচনার কোনো বিবরণ প্রকাশ করেন নি। আওয়ামী লীগের কয়েকটি বিবরণে আলোচনার সমস্যা সম্পর্কে যৎসামান্য উল্লেখ আছে, কিন্তু এর বিস্তারিত বিবরণ আজো প্রকাশিত হয় নি।[৪৭]

জানা যায় যে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের কয়েক মাস পূর্বে পাকিস্তান পরিকল্পনা কমিশনের ক্ষমতাবান ডেপুটি চেয়ারম্যান এম. এম. আহমেদ এক অত্যন্ত গোপনীয় পত্রে সুপারিশ করেছিলেন যে নির্বাচনের পরিবর্তে এখন দু'অংশের বন্ধুত্বপূর্ণ বিচ্ছেদের সময় এসেছে; অন্যথায় সমগ্র দেশে গুরুতর অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে বলে তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন।[৪৮] অনুরূপ মনোভাব ব্যক্ত করে পিপল্স পার্টি কর্তৃক জারিকৃত কিছু পুস্তিকায় স্বীকার করা হয়েছিল যে "পাকিস্তানে একটি অভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা বিদ্যমান আছে" এবং "পূর্ব পাকিস্তান তার দুর্দশা থেকে মুক্তি লাভের জন্য ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানকে প্রত্যাখ্যান ছাড়া কোন পথ দেখছে না" এবং পশ্চিম পাকিস্তানের কেউ কেউ মনে করেন যে পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানের চেয়ে প্রভূত উন্নতিলাভ করেছে বিধায় এখন তা পূর্ব পাকিস্তানকে পরিহার করে টিকে থাকতে সক্ষম।[৪৯] অন্যদিকে পিপল্স পার্টি উপলব্ধি করে যে আওয়ামী লীগ কর্তৃক উত্থাপিত স্বায়ত্তশাসনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রকাঠামোর পুরোদস্তুর পুনর্গঠন একান্ত প্রয়োজন। পিপল্স পার্টির এ উপলব্ধির বিপরীতে মুসলিম লীগের বাদ বাকি অংশসহ ইসলামপছন্দ দলগুলোর সমর্থন নিয়ে সামরিক বাহিনী একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার অব্যাহত রাখার পক্ষপাতী ছিল। সেনাবাহিনীর এই অভিমতের ভিত্তি ছিল সেই সাধারণ ধারণা যে উপমহাদেশের সকল মুসলমান একটি পৃথক জাতি এবং তাদের জন্য প্রয়োজন একটি একক রাজনৈতিক ব্যবস্থা।[৫০] সামরিক বাহিনী

৪৭. এ বিষয়ে আওয়ামী লীগের কাজে লাগার মতো প্রকাশনার মধ্যে আছে : *Bangladesh Contemporary Events and Documents*, 1971, and Tajuddin Ahmed, *Bangaldesh A Statement issued on April 17, 1971*. আলোচনার ধারাবাহিক বিবরণ আছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জনসংযোগ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত *Why Bangladesh* পুস্তিকায়, ১৯৭১ সালে ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত পাকিস্তান দূতাবাস কর্তৃক প্রকাশিত কালানুক্রমিক বিবরণ আছে Federal Intervention in Pakistan Background Report 1 এবং পাকিস্তান সরকার কর্তৃক প্রকাশিত পাকিস্তানের সংকটের উপর একটি শ্বেতপত্রে। অধিকাংশ সংবাদপত্রের প্রতিবেদন ছিল ভাসা ভাসা ও অনেক ক্ষেত্রে অনুমাননির্ভর। পাকিস্তন পিপল্স পার্টির প্রকাশনা *Great Tragedy*-তে ভুট্টোর নিজস্ব বিবরণ ছিল মূলত আলোচনা ভেঙে যাওয়ার জন্য তার নিজের সাফাই।

৪৮. Zaheer, *East Pakistan*, 129.

৪৯. J. A. Rahim, *Outline of a Federall Constitution for Pakistan*, (Karachi: Pakistan People's Party, Dec. 2969), 36-38.

৫০. দেখুন, David Dunbar (ছদ্মনাম), "Pakistan: the Failure of a Political Negotiations", *Asian Survey*, May 1972, 444-461.

একটি ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানে দীর্ঘকাল মুরব্বিয়ানা করেছে এবং তাদের ধারণা ছিল যে দেশের পূর্বাঞ্চলের উপর পশ্চিমাঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ শিথিল হলে তাদের অধিগত ক্ষমতা, সম্মান এবং বিপুল সুযোগ-সুবিধা হ্রাস পাবে।

যে ভাসা ভাসা তথ্য পাওয়া যায় তা থেকে মনে হয় যে মুজিব ও ইয়াহিয়ার প্রথম সাক্ষাৎটি ছিল "তিক্ততাপূর্ণ"।[৫১] মুজিব পরিষ্কার ভাষায় বলেন যে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অবিলম্বে আহ্বান করা উচিত এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রধান হিসেবে তাঁকে সরকার গঠন করতে দেয়া উচিত। কিন্তু তিনি একই সাথে পশ্চিমের সন্দেহ দূর করার উদ্দেশ্যে বলেন যে তিনি একজন গণতন্ত্রী এবং পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থকে অবজ্ঞা করতে পারেন না।[৫২] ইয়াহিয়ার প্রতিক্রিয়া ছিল এই যে ছয় দফা কর্মসূচির বিরুদ্ধে তাঁর কিছু বলার নেই, কিন্তু মুজিবকে পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের সমর্থন লাভ করতে হবে, এবং একথা তিনি বারবার বলেছিলেন।[৫৩] ইয়াহিয়া নিশ্চিত ছিলেন যে মুজিব সেই সমর্থন লাভ করতে পারবেন না। লিখিত বিবরণ থেকে জানা যায় যে ভূট্টো ছয় দফার প্রশ্নে নতিস্বীকার করেন নি, বারংবার এর বিরোধিতা করেছেন আপোসহীনভাবে; তাঁর মতে ছয় দফা ছিল বিচ্ছিন্নতাবাদের সমতুল্য।

সাত ঘন্টারও অধিক কাল স্থায়ী ইয়াহিয়া-মুজিব শীর্ষ বৈঠক ছিল অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। যদিও ধারণা করা হয়েছিল যে প্রধান বিষয়গুলোতে ইয়াহিয়া-মুজিব সমঝোতা হয়েছে, বাস্তবে তা ছিল ফাঁকা বুলি মাত্র। রাজনৈতিক সংকটের একমাত্র সমাধান ছিল অবিলম্বে জাতীয় পরিষদের বৈঠক আহ্বান করা; কিন্তু ইয়াহিয়া কালক্ষেপণ করলেন এবং কোন প্রকারে গোঁজামিল দিয়ে চললেন। এই কালক্ষেপণ মুজিবের বিরুদ্ধে ভূট্টো এবং জেনারেলদের একজোট হতে সহায়তা করলো।

ইয়াহিয়া মুজিবকে ধোকা দেওয়ার জন্য করাচীতে ফিরে এসে সাংবাদিকদের জানালেন, "শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী হতে যাচ্ছেন।"[৫৪] অথচ, ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ হঠাৎ অবস্থান পরিবর্তন করে ইয়াহিয়া দেশদ্রোহিতার জন্য মুজিবের নিন্দা করলেন .... তিনি বললেন, মুজিব এ দেশের সংহতি ও অখণ্ডতার মূলে আঘাত করেছেন।[৫৫]

## ভূট্টোর পালা

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ইয়াহিয়া একদল জেনারেলসহ ১৭ ফেব্রুয়ারি লারকানাতে ভূট্টোর বাড়ী গমন করেন পরিস্থিতিতে একজন প্রতিদ্বন্দ্বী নেতার

৫১. Zaheer, *East Pakistan*, 132. জহিরের চমৎকার সমীক্ষায় ইয়াহিয়ার কয়েকজন ঘনিষ্ঠ প্রত্যক্ষদর্শী উপদেষ্টার বিবরণ অন্তর্ভুক্ত আছে।

৫২. ঐ।.

৫৩. ঐ।.

৫৪. *Dawn*, Jan 15, 1971.

৫৫. *Dawn*, Mar. 26, 1971

ব্যয়বহুল আতিথ্য উপভোগ করে আলোচনা চালিয়ে যাওয়া ছিল অবশ্যই অশোভন ও অবিবেচনাসুলভ কাজ। এরই বিপরীতে রাষ্ট্রপতির ঢাকায় অবস্থানকালে রাষ্ট্রীয় প্রটোকল কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয়েছিল। লারকানায় অনুষ্ঠিত বৈঠক ছিল "ভূট্টো এবং জেনারেলদের একটি বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনাবৈঠক....বৈঠকে তাঁরা বাঙালিদের প্রচেষ্টা নস্যাৎ করার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানী কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন।"[৫৬] আওয়ামী লীগের ব্যাপারে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত কিছু জেনারেল তাঁদের কর্তৃত্ব বলবৎ রাখার জন্য ভূট্টোকে একজন বন্ধু হিসেবে গণ্য করেন।[৫৭] লারকানার এ বৈঠক মুজিবের বিরুদ্ধে ভূট্টোকে পশ্চিম পাকিস্তানের একমাত্র মুখপাত্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এবং জেনারেলদের সমর্থন পেয়ে ছয় দফার প্রতি ভূট্টোর দৃষ্টিভঙ্গি আরো কঠোর হয়ে দাঁড়ায়। ইয়াহিয়া ভূট্টোর এই অনিচ্ছাকৃত প্রতিশ্রুতি নিয়ে লারকানা থেকে ফিরে আসেন যে মুজিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা হবে, তবে ছয় দফার ব্যাপারে কোন আপোস করা হবে না। জানা যায়, লারকানায় ভূট্টো ক্ষমতার শীর্ষবিন্দুতে নিজেকে রেখে দুই প্রদেশের একটি গ্র্যান্ড কোয়ালিশন-এর প্রস্তাব করেছিলেন। উদ্ধত, আপোসহীন এবং প্রায়শ প্রতিবাদী ভূট্টো তখন অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারছিলেন না। ঢাকা এবং লারকানার মধ্যে ত্রিভুজের কেবল দুটি পক্ষ মিলিত হয়েছিল। ইয়াহিয়ার পরামর্শে ভূট্টো মুজিবের সাথে ধারাবাহিক আলোচনা শুরু করার জন্য এক বৃহৎ দলীয় প্রতিনিধিদল নিয়ে ২৭ জানুয়ারি ঢাকায় আগমন করেন। উপরেই উল্লেখ করা হয়েছে, যদিও ভূট্টো-মুজিব আলোচনার কোনো প্রামাণিক বিবরণ নেই, গুজব রটেছিল যে ভূট্টো মুজিবের সাথে ক্ষমতা ভাগাভাগির প্রস্তাব দেন, কিন্তু মুজিব তা প্রত্যাখ্যান করে আবার বলেন যে ছয় দফা নিয়ে দরকষাকষি করা চলবে না। নূরুল আমীন এবং খাজা নাজিমুদ্দিনের ন্যায় অন্য বাঙালি নেতার মতো না হয়ে মুজিব ছিলেন অন্য ধাঁচে গড়া; তাঁকে হয়তো ভাঙা যেতো, কিন্তু নীতির প্রশ্নে মচকানো যেতো না।

২৯ জানুয়ারি ভূট্টো যখন ঢাকা ত্যাগ করেন, তখন সংবাদমাধ্যমে কোনো অগ্রগতির খবর প্রকাশিত হয় নি। ঢাকায় অবস্থানকালে ভূট্টো ছয় দফাকে কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করাকে এড়িয়ে চলেন, কিন্তু করাচীতে আসার পর ইঙ্গিত দেন যে ছয় দফা মেনে নিতে তাঁর বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই।[৫৮] ১১ ফেব্রুয়ারি যখন ইয়াহিয়া ভূট্টোর সাথে সাক্ষাৎ করেন, তখন ভূট্টো ইয়াহিয়াকে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অবিলম্বে আহ্বান না করার পরামর্শ দেন, কারণ তাঁর দলের সাথে পরামর্শ করতে তাঁর আরও সময়ের প্রয়োজন। কিন্তু তিনি ভালোভাবেই জানতেন যে মুজিবের বেঁধে দেয়া সুনির্দিষ্ট তারিখ ছিল ১৫ ফেব্রুয়ারি।[৫৯]

---

৫৬. Zaheer, *East Pakistan*, 137

৫৭. আপাতঃদৃষ্টিতে পর্দার অন্তরালে এই জেনারেলরাই ভূট্টোর শরণাপন্ন হয়েছিল। Zaheer, *East Pakistan*, 137

৫৮. দেখুন, *Dawn*, Jan. 30, 1971.

৫৯. Bhutto, *The Great Tragedy*, 24-25

নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল পরিষদ প্রতিষ্ঠার জন্য, তবু ভূট্টো পরিষদের সম্মুখীন হতে ভয় পাচ্ছিলেন।

অধিবেশন আহ্বানে অত্যধিক বিলম্ব দেখে[৬০] ইয়াহিয়া-ভূট্টো ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে বাঙালিদের মনে যে সন্দেহ দেখা দেয় তা দূর করার জন্য ইয়াহিয়া ১৩ ফেব্রুয়ারি ঘোষণা করেন যে সংবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য ৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করা হবে। আওয়ামী লীগ এ তারিখ ঘোষণাকে স্বাগত জানায় এবং সংবিধানের তৎপ্রণীত ভাষ্য চূড়ান্তকরণের কাজে হাত দেয়। আইনগত কাঠামো আদেশে পিপল্‌স পার্টি অথবা পশ্চিম পাকিস্তানের অন্য কোন দলের সহযোগিতা নিয়ে অথবা না নিয়ে সংবিধান প্রণয়নে কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। আসন্ন অধিবেশনের কথা বিবেচনায় রেখে আওয়ামী লীগ নিজেকে সংগঠিত করা শুরু করে। এ পর্যায়ে মুজিব ছিলেন সংসদীয় দলের নেতা এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম ছিলেন উপনেতা। পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদে দলের নেতা নির্বাচিত হন মনসুর আলী।

পশ্চিম পাকিস্তানে অধিকাংশ ক্ষুদ্র দল ও উপদল পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করতে আগ্রহ প্রকাশ করে। কিন্তু ভূট্টো ১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে অবজ্ঞাভরে ঘোষণা করেন যে তাঁর দল ঢাকা অধিবেশনে যোগদান করবে না, যেটা হবে একটি "চাপিয়ে দেওয়া" সংবিধান প্রণয়নের জন্য "একটি কসাইখানার মতো"।[৬১] ভূট্টো ছয় দফা প্রত্যাখ্যানের কথা পুনরায় উল্লেখ করেন, ফেডারেশনের এককগুলোর ঐকমত্য দাবি করেন এবং দুটি প্রদেশের জন্য পৃথকভাবে সংবিধান প্রণয়নের জন্য পৃথক অধিবেশন অনুষ্ঠানের প্রস্তাব করেন।[৬২] ভূট্টো অন্তত নিজেকে পশ্চিম পাকিস্তানের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বের অধিকারী হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন এবং এজন্য তিনি পাকিস্তানের অখণ্ডতা বিসর্জন দিতে ইচ্ছুক ছিলেন।[৬৩]

ইয়াহিয়ার সাথে সাক্ষাতের পর ভূট্টো ঘোষণা করেন যে তিনি দেশের অর্ধেকের প্রতিনিধিত্ব করেন, সুতরাং অন্য অর্ধেকের প্রতিনিধি মুজিবের সাথে তারও সংবিধান প্রণয়নে সমান ভূমিকা থাকা প্রয়োজন।[৬৪] আওয়ামী লীগের কাছে ভূট্টোর এ প্রস্তাবকে মনে হয়েছিল

৬০. ৩০ জানুয়ারি কাশ্মীর থেকে ভারতগামী একটি বিমান ছিনতাই, বিমানটিকে লাহোর নিয়ে যাওয়া এবং ভূট্টো ও শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক ছিনতাইকারীদেরকে বীরোচিত সম্বর্ধনা প্রদান পূর্ব পাকিস্তানের দৃষ্টিতে পরিষদের সভা পিছিয়ে দেয়ার কৌশল হিসেবেই বিবেচিত হয়েছিল।

৬১. *Morning News*, Feb. 16 and Feb. 18, 1971.

৬২. *Dawn*, Feb 16, 1971.

৬৩. দেখুন, DAvid Dunbar, "Pakistan: the Failure of Political Negotiations", *Asian Survey*, Vol XI, No 5, may 1972, 444-461.

৬৪. Dunbar, ঐ, 451. ভূট্টোর নিকটজন এবং ১৯৭১ সালে করাচীতে অবস্থানরত এ্যাসোসিয়েটেড প্রেস-এর সাংবাদিক আর্নল্ড জাইটলিন লেখককে জানান (ওয়াশিংটন ডি সি, ২৯ জানুয়ারি, ১৯৯৭) যে ফেব্রুয়ারির শেষে পেশাওয়ারে তিনি যখন ভূট্টোর সাথে সাক্ষাৎ করেন, তখন ভূট্টো বলেন যে তিনি একটি শিথিল জাতীয় ফেডারেশনের অধীনে দেশের জন্য পৃথক প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাব করবেন।

ভেটোক্ষমতা প্রয়োগের মতো। ২৪ ফেব্রুয়ারি এক সংবাদ সম্মেলনে মুজিব ব্যাখ্যা করেন যে ভূট্টো যেভাবে দাবি করছেন ছয় দফা সেরকম বিভক্তিমূলক কর্মসূচি নয়, এবং ছয় দফার কাঠামোর মধ্যেই একটি টেকসই ফেডারেশন গঠন করা সম্ভব। ইতিমধ্যে ইয়াহিয়া ২২ ফেব্রুয়ারি তারিখে তাঁর বেসামরিক মন্ত্রিসভা ভেঙে দেন। এতে পূর্ব পাকিস্তানে এ আশংকার সৃষ্টি হয় যে ইয়াহিয়াজান্তার পরামর্শদাতার অবস্থানে আর কোন বাঙালি বোধ হয় থাকলো না। তবে ইয়াহিয়া তাঁর পদক্ষেপের পক্ষে যুক্তি দেখান যে এটা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আরেকটি পদক্ষেপ।

পরিষদ বর্জনের জন্য ভূট্টোর সিদ্ধান্ত পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষুদ্র দলগুলোর সমর্থন পায় নি। শুধু ব্যতিক্রম ছিল মুসলিম লীগের কাইয়ুম গ্রুপ। কিন্তু পরিষদের অধিবেশনের তারিখ ঘনিয়ে এলে কাইয়ুম গ্রুপ এবং ভূট্টোর নিজ দলের মধ্যে দলত্যাগের সম্ভাবনা দেখা দেয়। এক ভীতিপ্রদর্শনমূলক প্রচারাভিযানে ২৮ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত এক জনসভায় প্রদত্ত ভাষণে ভূট্টো খাইবার থেকে করাচী পর্যন্ত কেবল আইন অমান্য বা হরতালেরই হুমকি দেন নি, অধিকন্তু যাঁরা অধিবেশনে অংশগ্রহণ করবেন তাঁদের খতম করে দেয়া হবে বলে হুমকি দেন।[৬৫] জানা যায় যে ইয়াহিয়ার অনুগত জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি জেনারেল ওমর পিপল্‌স পার্টির সদস্য নয় জাতীয় পরিষদের এমন সব সদস্যকে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বর্জনের জন্য তাঁর প্রভুর নামে নির্দেশ দেন।[৬৬] ফলে মুজিবের বিরুদ্ধে একটি ইয়াহিয়া-ভূট্টো আঁতাত পরিষ্কারভাবে গড়ে উঠে।

### পরিষদের অধিবেশন স্থগিত

ভূট্টোর সাথে ঘনিষ্ঠ ও অভিন্ন স্বার্থজড়িত জেনারেল হামিদ, মিঠা, পীরজাদা, ওমর, টিক্কা এবং গুল হাসানের নেতৃত্বে একদল জেনারেলের পরামর্শ মোতাবেক ইয়াহিয়া ১ মার্চ তারিখে সংসদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন।[৬৭] এই পূর্বপরিকল্পিত পদক্ষেপের মাধ্যমে ইয়াহিয়া বাহ্যত আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পশ্চিম পাকিস্তানী ক্ষমতাশালী গোষ্ঠীরই একটি ষড়যন্ত্রের প্রতি সমর্থন জানালেন, যার উদ্দেশ্য ছিল আওয়ামী লীগকে ক্ষমতাগ্রহণের সুযোপ প্রদান না করা এবং তাদের কাছে অগ্রহণযোগ্য ছয় দফা দাবি বাতিল করতে কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করা। এই ঘোষণা প্রদানের সময় ইয়াহিয়া ভূট্টোর সংসদ বর্জনের ব্যাপারে আপোসহীন মনোভাবের কথা উল্লেখ করলেও কোন মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকেন; তবে ইয়াহিয়া সংবিধান প্রণয়নের ব্যাপারে একটা যুক্তিসঙ্গত সমঝোতায় আসার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।[৬৮]

৬৫. *Morning News*, March 1, 1971.
৬৬. Talukdar, *Bangladesh Revolution*, 89.
৬৭. পিরজাদার মত ছিল এই যে অধিবেশন পেছানো না হলে আওয়ামী লীগ স্বাধীনতা ঘোষণা করতো, Zaheer, *East Pakistan*, 141-42.
৬৮. দেখুন, *Dawn*, March 2, 1971.

ইয়াহিয়া কর্তৃক পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা মুজিবকে একেবারে হতবাক করে দেয়। রেডিওর ঘোষণা যখন ঢাকায় পৌঁছে, মুজিব তখন খসড়া সংবিধান চূড়ান্তকরণে ব্যস্ত। মুজিব ছিলেন পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা, তবু পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করার ব্যাপারটি তাঁকে আগে জানানো হয় নি। এই স্বেচ্ছাচারী পদক্ষেপের সংবাদ পাওয়া মাত্রই প্রদেশে অভূতপূর্ব গণবিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। তখন কিছু কট্টরপন্থী মহল এমনকি তাৎক্ষণিকভাবে স্বাধীনতা ঘোষণারও দাবি জানায়। সমগ্র প্রদেশে তখন এ জনমত গড়ে উঠে যে পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে বাঙালিদের অধিকার কখনো প্রতিষ্ঠিত হবে না। যখন বাঙালিদের অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়, তখন শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক ভীতিপ্রদর্শনও বৃদ্ধি পায়; বেসামরিক ছদ্মাবরণে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসা হয়।[৬৯] ইয়াহিয়া কঠোর ভাষায় কয়েকটি বক্তৃতা দেন এবং অতিরিক্ত দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এর অন্তর্ভুক্ত ছিল সংবাদমাধ্যম ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার উপর কড়াকড়ি আরোপ এবং সান্ধ্যআইন জারি, যা কদাচিৎই পালিত হয়েছিল। ইয়াহিয়া তাঁর হুমকি কার্যকর করতে গিয়ে অমায়িক ও জনপ্রিয় এ্যাডমিরাল আহসানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরের পদ থেকে প্রত্যাহার করেন এবং তাঁর পরিবর্তে জেনারেল টিক্কা খানকে গভর্নর নিয়োগ করেন, যিনি ইতিমধ্যেই বেলুচিস্তানের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কঠোর হস্তে দমনের মাধ্যমে নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী শাসক হিসেবে দুর্নাম কুড়িয়েছিলেন। একই সাথে পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুব খানকেও প্রত্যাহার করা হয়, যিনি সংকট উত্তরণের জন্য কঠোর নিপীড়নমূলক ব্যবস্থার পরিবর্তে রাজনৈতিক সমাধানের সুপারিশ করেছিলেন বলে শোনা যায়। এ কথা উপলব্ধি করতে বেশি চিন্তাভাবনা করার প্রয়োজন ছিল না যে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন ইস্যুটির নিষ্পত্তি করার জন্য সামরিক সমাধানেরই পাঁয়তারা করা হচ্ছিল।

## নিয়ন্ত্রণে আওয়ামী লীগ

সামরিক বাহিনী থেকে চরম উস্কানি এবং বাঙালি চরমপন্থীদের, বিশেষত ছাত্রদের প্রচণ্ড চাপের মুখে মুজিব একটি সতর্ক পন্থা অবলম্বন করলেন। তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার একতরফা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা থেকে বিরত থেকে তার পরিবর্তে ২ মার্চ তারিখে প্রতিবাদ-হরতালের ডাক দিলেন। পরের দিন তিনি ঘোষণা করেন যে তাঁর কর্মসূচি তিনি ৭ মার্চ উপস্থাপন করবেন। একই সাথে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে গান্ধীর অনুকরণে প্রদেশব্যাপী অহিংস আইন অমান্য এবং অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলেন, যা ২৫ মার্চ পর্যন্ত অব্যাহত থাকলো। আওয়ামী লীগ কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশনামা অনুসরণ করার ফলে পূর্ব পাকিস্তানের সরকার কার্যত অচল হয়ে পড়লো; সামরিক আইনের বিধানাবলীকে অগ্রাহ্য করা হলো, কর প্রদান বন্ধ হলো, আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়লো, পরিবহনসেবা মারাত্মকভাবে

৬৯. মার্চের আন্দোলন চলাকালে সৈন্যসংখ্যাবৃদ্ধি চলতেই থাকে এবং পূর্ব পাকিস্তানে একাধিক ডিভিশন সৈন্য মোতায়েন করে সেনাবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করা হয়।

ব্যাহত হলো এবং সকল আন্তঃপ্রদেশ লেনদেন বন্ধ হলো। বিপুল জনসমর্থন এবং সাংগঠনিক শক্তির অধিকারী হওয়ার কারণে আওয়ামী লীগ হয়ে পড়লো আইনসঙ্গত এবং প্রকৃত কর্তৃপক্ষ এবং ইসলামাবাদের নিয়ন্ত্রণবলয় ক্রমেই হ্রাস পেতে থাকলো। সরকারের বেসামরিক প্রশাসনে আওয়ামী লীগের কর্তৃত্ব এমন নিরঙ্কুশ হয়ে পড়লো যে ঢাকা হাই কোর্টের সকল বিচারক পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে জেনারেল টিক্কা খানকে শপথবাক্য পাঠ করাতে অস্বীকৃতি জানালেন এবং এ উদ্দেশ্যে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে একজন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে নিয়ে আসতে হলো। যখন অসহযোগ আন্দোলন শক্ত ভিত লাভ করলো, তখন শাসকগোষ্ঠী ভীতিপ্রদর্শন, সন্ত্রাস এবং কঠোর নিপীড়নমূলক পন্থা প্রয়োগ করলো, যার ফলে অনেক রক্ত ঝরলো। ২ ও ৩ মার্চের সন্ত্রাসী কার্যক্রমের ফলে অন্তত এক সহস্র মানুষ প্রাণ হারালো। গণঅভ্যুত্থানের প্রবল প্রতিরোধের মুখে[৭০] সামরিক বাহিনীকে ৫ মার্চ ব্যারাকে ফিরে যাওয়ার কৌশলগত নির্দেশ দেয়া হলো। কিন্তু তাদের নির্বিচার নির্যাতন-লুণ্ঠন অব্যাহত থাকলো। ফলে প্রাণহানি ও সম্পদের ক্ষতি হলো বিপুল পরিমাণে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী অরক্ষিত বেসামরিক জনগণকে আক্রমণ করছিল।

১ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ আওয়ামী লীগের নিয়ন্ত্রণের সময়কালে অধিকাংশ বিদেশী সংবাদদাতাই আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির গুরুতর অবনতির সংবাদ পাঠায় নি। তখন বাংলাদেশ সচিবালয়ের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছিল ধানমন্ডিতে অবস্থিত মুজিবের বাসভবন থেকে। সচিবালয় মার্চের ৪, ৭, ৯ ও ১১ তারিখে বেশ কিছু নীতিগত নির্দেশমালা জারি করে। মার্চে ক্ষমতার যে শূন্যতা বিরাজ করছিল তার প্রেক্ষিতে এ নির্দেশনামাগুলো আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় এবং অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রবাহে স্বাভাবিকতা নিশ্চিত করেছিল। পূর্ববর্তী নির্দেশগুলোকে ছাড়িয়ে ১৪ মার্চ যে সামগ্রিক নির্দেশনামা জারি করা হয় তা সরকারি প্রশাসনিক ম্যানুয়েলের মর্যাদা লাভ করে।[৭১]

প্রদেশে আওয়ামী লীগ কর্তৃক মোটামুটি ভালো প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা সত্ত্বেও কিছু অসামাজিক গোষ্ঠী সাধারণ গোলযোগের সুযোগ গ্রহণ করে। এ সময়ে ব্যক্তিগত জিঘাংসা চরিতার্থ করার এবং জেলভাঙার ঘটনাও ঘটে। পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাঙালিদের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ অবাঙালি স্থাপনাগুলোতে জনতার আক্রমণের রূপ নেয়, যাতে সম্পদের ক্ষতি এবং নির্দোষ মানুষের প্রাণহানিও ঘটে। পাকিস্তানী সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণের একতরফা যুক্তি ছিল বাঙালিদের ক্রোধ থেকে অবাঙালিদের রক্ষা করা। তবে এটা পরিষ্কার যে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী বাঙালিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের যুক্তি দাঁড় করানোর প্রয়াসে

৭০. সড়ক ব্যারিকেড, রেল লাইন অপসারণ এবং সরবরাহ প্রদানে বাঙালিদের অস্বীকৃতির ফলে সৈন্য চলাচল মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়েছিল।

৭১. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, White Paper, Appendix D, Awami League Directives, March 1971.

এ ধরনের অনেক সংঘর্ষের কথা জোরেসোরে প্রচার করেছিল।[৭২] বিহারীবিরোধী অপরাধমূলক ঘটনা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে মুজিব বার বার শান্তির আহ্বান জানান এবং এমনকি সামরিক সন্ত্রাসী অভিযানের মুখেও স্বায়ত্তশাসন কর্মসূচির অহিংস প্রকৃতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। মার্চ আন্দোলনের শুরুর দিনগুলোতে বাঙালি কর্মচারীরা রেডিও পাকিস্তানের ঢাকা কেন্দ্রকে 'ঢাকা বেতারকেন্দ্র' নামকরণ করে। এ বেতারকেন্দ্র আওয়ামী লীগের সংবাদ-বুলেটিন এবং অসাধারণ আবেগসঞ্চারী গান 'আমার সোনার বাংলা' প্রচার করা শুরু করে, যা জনগণের মনে দেশাত্মবোধ ও লড়াকু অনুভূতি জাগ্রত করে। প্রায় একই সময়ে জনগণের আবেগ যখন এক নতুন উচ্চতায় উপনীত, ঠিক তখনই বাংলাদেশের লাল ও সবুজ পতাকা পাকিস্তানী পতাকার স্থান দখল করে এবং 'জয় বাংলা' শ্লোগান এক ঐক্যের বন্ধন সৃষ্টি করে। এ সময়ে শেখ মুজিবকে ভক্তিভরে সম্বোধন করা হয় 'বঙ্গবন্ধু' হিসেবে। এই দ্রুত সংঘটিত ঘটনাবলীর মাঝে আ. স. ম. আবদুর রব, শাহজাহান সিরাজ ও অন্যদের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত 'স্বাধীন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' অসাধারণ অবদান রাখে। সমগ্র মার্চব্যাপী আন্দোলনে ছাত্র, শিক্ষক এবং নগরকেন্দ্রিক প্রোলেতারিয়েৎরাই সম্মুখভাগে ছিল এবং শত্রুর মোকাবেলা করেছিল। সামগ্রিকভাবে এক বৈপ্লবিক চেতনা ও উদ্দীপনা তখন বাঙালিদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। মার্চ মাসে রাজনৈতিক তৎপরতার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, বিশেষত সঙ্গীত, নাটক ও সাহিত্যকর্মের স্ফূরণ ঘটে।

ঢাকা এবং অন্যান্য শহরে যখন রক্ত ঝরছিল, তখন ইয়াহিয়া ৩ মার্চ একটি ব্যক্তিগত নিমন্ত্রণপত্র জারি করেন, যাতে তিনি ১২টি সংসদীয় দলের নেতৃবৃন্দকে ১০ মার্চ ঢাকায় তাঁর সাথে বৈঠকে বসার আহ্বান জানান। মুজিব একে একটি 'নিষ্ঠুর কৌতুক' বলে আখ্যায়িত করে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বিবেকের তাগিদে এমন একটি গোলটেবিল বৈঠকে অংশ নিতে পারেন না যখন "রাজপথে শহীদের রক্ত তখনো শুকায়নি। কিছু মৃতদেহ তখনো সমাহিত না হয়ে রাস্তায় পড়ে ছিল এবং শত শত আহত লোক হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে লড়ছিল।"[৭৩]

অব্যাহতভাবে সামরিক শক্তি বৃদ্ধির প্রতিবাদ করে মুজিব বলেন যে সৎ বিশ্বাসে বৈঠকে যোগদান করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। মুজিব আরো বলেন যে সংবিধান প্রণয়ন সংক্রান্ত সকল আলোচনা হওয়া উচিত পরিষদে, ব্যক্তিগত বৈঠকে নয়।

মুজিবকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য এবং সামরিক প্রস্তুতির জন্য আরো সময় নেয়ার লক্ষ্য সামনে রেখে ইয়াহিয়া ৬ মার্চ ঘোষণা দেন যে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ২৫ মার্চে

৭২. ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসরত অবাঙালি [illegible] সংখ্যা ছিল প্রায় পাঁচ লাখ, যাদের অনেকেই বাংলাদেশে বসবাস অব্যাহত রাখে। বাংলাদেশ [illegible] হওয়ার পর বিহারীবিরোধী কোনো সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে নি।

৭৩. Maudud Ahmed, *Bangladesh: Constitutional Quest for Autonomy*, (Dhaka 1976), 226.

আহ্বান করা হয়েছে। এটা ছিল মুজিবের পূর্বনির্ধারিত ৭ মার্চের জনসভার আগের দিন, যেদিন সমগ্র বাঙালি জনগোষ্ঠী তাদের নেতার ঐতিহাসিক নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করছিল। অতীতের মতোই ইয়াহিয়া কর্তৃক পরিষদের অধিবেশন পুনরায় আহ্বানকে "পাকিস্তানের অখণ্ডতা সম্পূর্ণ ও নিরঙ্কুশভাবে নিশ্চিত করার জন্য তাঁর দৃঢ় সংকল্পমিশ্রিত হুমকি বলে মনে করা হয়। তিনি রাষ্ট্রের অখণ্ডতা, ঐক্য এবং নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সামরিক বাহিনীর প্রতিও আহ্বান জানান।[৭৪]

এসব হুমকি এবং ভীতিপ্রদর্শন সত্ত্বেও মুজিব তাঁর পূর্বের অঙ্গীকার মোতাবেক ৭ মার্চ জনগণের সামনে আওয়ামী লীগের কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করেন। সেদিন মৃদুমন্দ বায়ুময় প্রশান্ত বিকেলে মুজিব এক অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষণ দিলেন, যেটা পরবর্তীকালের ইতিহাসের একটি মাইলফলক হয়ে থাকলো এবং পূর্ব পাকিস্তানের ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে দিল। ইয়াহিয়া কর্তৃক পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠানের আরেকটি নতুন তারিখ ঘোষণার জবাবে মুজিব সাহসিকতার সাথে চারটি পূর্বশর্ত তুলে ধরলেন, যেগুলো মেনে নেয়া হলে তিনি পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের বিষয় বিবেচনা করবেন বলে জানিয়ে দিলেন। শর্তগুলো হচ্ছে : সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে; সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে; সামরিক বাহিনীর গুলিতে প্রাণহানির ঘটনার তদন্ত করতে হবে এবং জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিকট অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। ঐতিহাসিক ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে সেদিনের বাগ্মিতাপূর্ণ ভাষণ তিনি এই আবেগমথিত ঘোষণা দিয়ে শেষ করেন : "এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" তাঁর উদাত্ত আহ্বানে তিনি জনগণকে তাদের কাছে যাকিছু আছে তা দিয়ে নিজেদের রক্ষা করতে নির্দেশ দিলেন। তিনি বেশ কিছু প্রশাসনিক নির্দেশনামাও জারি করলেন, যেগুলোর পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি পূর্ণাঙ্গ আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতাসীন হবে। যেসকল কট্টরপন্থী পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতার ঘোষণা আশা করেছিল, মুজিব তাদের হতাশ করলেন; আসলে সেই মুহূর্তে তিনি সাংবিধানিক পন্থার বাইরে যেতে চাচ্ছিলেন না। মুজিব দেখালেন যে তিনিই বিদ্যমান পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করছেন এবং আন্দোলনের গতিপথও তিনিই নির্ধারণ করছেন এবং পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের দায়িত্ব তিনি শাসকগোষ্ঠীর হাতেই ছেড়ে দিয়েছেন।

অসহযোগ আন্দোলনের বিস্ময়কর সাফল্য এবং সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের পশ্চাদপসরণ[৭৫] প্রাদেশিক প্রশাসন আওয়ামী লীগের হাতে তুলে দেয়। এতে শাসকগোষ্ঠী একটি রহস্যজনক আপোসনীতি অবলম্বন করতে বাধ্য হলো। কিন্তু একই সময়ে পরবর্তী সামরিক পুনর্মূল্যায়ন চলছিল, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল পুনরায় সংগঠিত হওয়া ও সৈন্য

৭৪. Government of Pakistan, *White Paper on the Crisis of Pakistan*, 1971, 11.

৭৫. সেনাবাহিনী যখন বেসামরিক জনগণের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হচ্ছিল এবং হতাহতদের নিয়ে যাচ্ছিল, তখন তারা কেবল বিশাল বহর নিয়ে বেরোতে পারতো। তাছাড়া সেনাসদস্যদের এবং পশ্চিম পাকিস্তানী ব্যবসায়ীদের পরিবারবর্গের প্রদেশত্যাগ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। সামরিক বিমান এবং বাণিজ্যিক পরিবহনের শূন্য ফিরতি ফ্লাইটগুলোকে ব্যবহার করা হয়েছিল সামরিক সদস্য ও সরবরাহ আনার জন্য।

মোতায়েন করা, মজুদমাল সরবরাহ করা, যুদ্ধ করার শক্তি বৃদ্ধি করা এবং শাসকগোষ্ঠীর সহযোগী স্থানীয় দালাল সংগ্রহ করা।

## ইয়াহিয়া আবার ঢাকায়

মুজিবকে পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করতে রাজি করানোর জন্য এবং নাগরিক আইন অমান্য আন্দোলনের অবসান ঘটানোর জন্য ইয়াহিয়া ১৫ মার্চ আবার ঢাকায় আগমন করেন। প্রায় একই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যালঘু দলগুলোর নেতারাও ঢাকায় আসেন, যাঁরা আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা দাবি করছিলেন।[৭৬] ঢাকায় ইয়াহিয়ার সাথে যোগ দেন প্রধান বিচারপতি এ. আর. কর্নেলিয়াস এবং এম. এম. আহমেদ সহ একদল উপদেষ্টা। মুজিবও একদল আলোচক নিয়োগ করেন, যাঁদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন কামাল হোসেন, তাজউদ্দীন আহ্‌মদ এবং নজরুল ইসলাম। এ পর্যায়ে প্রতিপক্ষকে তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে শাসকগোষ্ঠীর পক্ষে টিক্কা খান সেনাবাহিনী ও পুলিশের বাড়াবাড়ির ব্যাপারে অভিযোগসমূহ খতিয়ে দেখার লক্ষ্যে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করেন। কমিশন গঠন এবং এর কার্যপরিধির ব্যাপারে মুজিবের সাথে কোনো পরামর্শ করা হয় নি। তিনি তাই কমিশনের কাজের প্রতি সমর্থন জানাতে অস্বীকার করে ১৮ মার্চ এক বিবৃতি প্রদান করেন। এতে তিনি বলেন, "সামরিক আইনের আদেশের মাধ্যমে এটি গঠন করা এবং সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের নিকট এর প্রতিবেদন দাখিল করার বিধান আপত্তিকর।"[৭৭]

ইয়াহিয়া ঢাকায় আসার পথে করাচীতে ভূট্টোর সাথে দেখা করেন এবং তখন ভূট্টো পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলগুলোর কাছে স্ব স্ব প্রদেশের ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রস্তাব করেন। ১৫ মার্চ সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনের নীতিকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করে ভূট্টো এই মর্মে বিবৃতি দেন যে দুই অংশের ভৌগোলিক দূরত্বের কারণে "সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন প্রযোজ্য নয়।"[৭৮] ভূট্টো বস্তুত দেশকে দু'ভাগে বিভক্ত করে দু'টি সরকার গঠনের প্রস্তাব দিচ্ছিলেন। পাকিস্তানের ঐক্য বজায় রাখার চেয়েও ক্ষমতা ভাগাভাগিতে বেশি আগ্রহী ভূট্টো ইতিপূর্বে দুই প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাব দিয়েছিলেন। পশ্চিম পাকিস্তানের সংসদীয় দলগুলো পাকিস্তানের বিভাজনের জন্য ভূট্টোর ষড়যন্ত্রমূলক প্রস্তাবের বিরোধিতা করে।[৭৯] আওয়ামী লীগের মতো

৭৬. Jahan, *Pakistan*, 193. ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির একটি অংশের নেতা এবং আওয়ামী লীগের সম্ভাব্য মিত্র ওয়ালী খানও পাঠানদের জন্য স্বায়ত্তশাসন দাবি করছিল। একইভাবে বেলুচিস্তানের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাও তাদের প্রদেশে স্বায়ত্তশাসন দাবি করছিল এবং মুজিবের সাথে শলাপরামর্শের জন্য ঢাকায় এসেছিল।

৭৭. *White Paper*, 16.

৭৮. Choudhury, *Last Days*, 163.

৭৯. Zaheer, *East Pakistan*, 149.

তারাও সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানের পক্ষে ভূট্টোর বক্তব্য রাখার অধিকারকে চ্যালেঞ্জ করে, যেহেতু তাঁর দলের কেবল পাঞ্জাব ও সিন্ধুতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল।

মুজিব ও ইয়াহিয়া যখন রাজনৈতিক সমাধানের জন্য আলোচনা করছিলেন, তখন টিক্কা খানের বাহিনী তাদের সন্ত্রাসী অভিযান চালিয়ে যাচ্ছিল। আওয়ামী লীগের নির্দেশনামাকে অগ্রাহ্য করে সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ সরকারি কর্মচারীদেরকে কাজে ফিরে আসার আদেশ দেয়। যদিও এ আদেশ মান্য করার চেয়ে লঙ্ঘনের ঘটনাই বেশি ঘটেছিল, তবু এটা ছিল জনগণের জন্য উস্কানিমূলক। জানা যায় যে চট্টগ্রাম বন্দরের উদ্দেশ্যে চাল বহনকারী কয়েকটি জাহাজকে করাচীর দিকে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এতে বাঙালিদের মধ্যে উত্তেজনা প্রকাশ পায়।[৮০] কয়েকদিন যাবৎ চট্টগ্রাম বন্দরে অবস্থানকারী পাকিস্তানী জাহাজ এম. ভি. সোয়াত থেকে সরবরাহদ্রব্য খালাস করতে ২০ মার্চ ডকশ্রমিকরা অস্বীকার করে। এর ফলে সামরিক বাহিনীর সাথে জনসাধারণের যে সংঘর্ষ হয়, তাতে প্রচুর বেসামরিক লোক হতাহত হয়। এর পূর্বে ঢাকার অদূরে জয়দেবপুরে সামরিক যান চলাচল বাধাগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে ব্যারিকেড স্থাপনকারী গ্রামবাসীদের উপর সেনাবাহিনী গুলি বর্ষণ করলে প্রচুর রক্ত ঝরে। মুজিব যখন জেনারেল পীরজাদার কাছে এ সামরিক হামলার ব্যাপারে অভিযোগ করেন, তিনি তখন কেবল অভিযোগের বিষয় টুকে রাখেন। আস্থাসৃষ্টির মাধ্যমে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার একটি ন্যূনতম শর্ত ছিল যুদ্ধবিরতির আদেশ প্রদান। সামরিক অস্ত্রসম্ভার আঘাত হানার জন্য যখন বেরিয়ে আসা শুরু হলো, তখন পাকিস্তান রাষ্ট্রের ঐক্যের বন্ধন দ্রুত শিথিল হয়ে এলো।

## খসড়া ঘোষণা

১৬ মার্চ অনুষ্ঠিত মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনায় মুজিব ৭ মার্চ উপস্থাপিত তাঁর চার দফা দাবির ব্যাপারে ইয়াহিয়ার অবস্থান সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট জবাব চাইলেন। ইয়াহিয়া পরিষ্কার ইঙ্গিত দিলেন যে তাঁর কোন আপত্তি নেই এবং ঐ চারটি দফাকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধান রচনা করা যেতে পারে।[৮১] সুদীর্ঘ আলোচনার পর মুজিব আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের একটি অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চাপ দেন। এ আলোচনায় মুজিব পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যালঘু নেতাদের সমর্থন করেন। এই লক্ষ্যে ২০ মার্চ তারিখে ইয়াহিয়া সাময়িকভাবে একটি খসড়া ঘোষণা দানের ব্যাপারে সম্মতি জানান, যার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো ছিল : রাষ্ট্রপতির আদেশের মাধ্যমে সামরিক আইন প্রত্যাহার এবং রাষ্ট্রপতির ঘোষণা দ্বারা বেসামরিক সরকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর; প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলগুলোর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর; অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট এবং কেন্দ্রীয় সবকারের নিয়ন্তা

৮০. Dunbar, 'Pakistan', . 456.

৮১. তাজউদ্দীনের বিবৃতি। এর পূর্বে ইয়াহিয়া ৭ মার্চের দাবিগুলোর ব্যাপারে কোন অবস্থান নেয়া থেকে বিরত থাকেন।

হিসেবে ইয়াহিয়া বহাল থাকা; সংবিধান চূড়ান্তকরণের জন্য পরিষদের যৌথ অধিবেশনের পূর্বে পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের পরিষদ-সদস্যদের পৃথক প্রস্তুতিমূলক বৈঠক অনুষ্ঠান; ছয় দফার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বায়ত্তশাসন প্রদান এবং ১৯৬২ সালের সংবিধানের ভিত্তিতে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলোকে ক্ষমতা প্রদান, তবে তারা প্রেসিডেন্টের সম্মতি সাপেক্ষে এবং পারস্পরিক গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি মোতাবেক স্বাধীনভাবে নিজস্ব স্বায়ত্তশাসনের পরিমাণ নির্ধারণ করবে। স্থির হয় যে সম্পূর্ণ পরিকল্পনাটি রাষ্ট্রপতির ঘোষণা হিসেবে প্রকাশিত হবে।[৮২] কয়েকবার পরিবর্তনের পর খসড়ায় সম্মতি জানালেও ইয়াহিয়া মুজিবকে বলেন যে খসড়ার প্রতি অবশ্যই ভূট্টোর সম্মতি থাকতে হবে এবং তিনি আরো সন্তুষ্ট হবেন যদি পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য নেতারাও এর সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেন।

সংবাদপত্রে প্রকাশিত ছয় দফার মূল উপাদানগুলো অক্ষুণ্ন রেখে সাংবিধানিক ফর্মুলা হিসেবে মুজিব-ইয়াহিয়া সমঝোতার গুজব[৮৩] ভূট্টোকে আতংকিত করে তোলে। যদিও তিনি ইতিপূর্বে ঢাকায় আসার জন্য ইয়াহিয়ার একটি আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, এখন তিনি তাড়াহুড়ো করে ২১ মার্চ ঢাকায় এসে উপস্থিত হন। তাঁর ঢাকায় আগমনের পর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ইয়াহিয়ার সাথে তাঁর এক দীর্ঘ বৈঠকের পর তিন প্রধান পক্ষ পরের দিন (২২ মার্চ) বৈঠকে মিলিত হয়, যা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল।[৮৪] ভূট্টো খসড়ার অধিকাংশ বিধানেরই তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল পরিষদের প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠানের প্রস্তাব, যা আওয়ামী লীগের মৌলিক অবস্থান হিসেবে নয়, বরং ভূট্টোকে আমল দেয়ার জন্য প্রথমেই ইয়াহিয়া প্রস্তাব করেছিলেন। অধিকন্তু, সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হলে ক্ষমতার শূন্যতা সৃষ্টি হবে এ ধরনের আইনগত আপত্তিও তিনি তোলেন। ভূট্টো খসড়ার ফর্মুলাকে "কনফেডারেশন গঠনের এমন এক প্রচ্ছন্ন চার্টার বলে আখ্যায়িত করেন যাতে সাংবিধানিক বিচ্ছিন্নতাবাদের বীজ লুকিয়ে আছে।"[৮৫] তবে খসড়াটি প্রত্যাখ্যান করতে গিয়ে ভূট্টো নতুন কোনো আপোসপ্রস্তাব বা নতুন ধ্যানধারণা উপস্থাপন করেন নি। এই ফর্মুলা ভূট্টো কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় সেসকল হামসাচ্চা জেনারেল স্বস্তিবোধ করেন, যাঁরা মনে করেছিলেন যে ইয়াহিয়া খুব বেশি দূর এগিয়ে গেছেন এবং কেবল অস্ত্রের ভাষাই পাকিস্তানের সংহতি অক্ষুণ্ন রাখতে পারবে।

ইয়াহিয়া খসড়ায় ভূট্টোর সম্মতি নিতে কোনো প্রচেষ্টা চালান নি, কারণ তিনি জানতেন যে সামরিক বাহিনী প্রভূত পরিমাণে খসড়াটির বিরোধিতা করেছে এবং শক্তিশালী জেনারেলদের সমর্থনপুষ্ট হয়েই ভূট্টো খসড়াটি প্রত্যাখ্যানের সাহস পেয়েছিলেন।[৮৬]

---

৮২. ইয়াহিয়া, ভূট্টো এবং তাজউদ্দীনের বিবরণ মোটামুটি একই রকম। দেখুন, *White Paper*, Appendix E; Bhutto, *Great Tragedy*, 40, and Tajuddin Ahmed, *Statement*.

৮৩. সম্পূর্ণ খসড়ায় এমনকি নতুন প্রদেশ হিসেবে 'বাংলাদেশ'-এর নাম উল্লেখ করা হয়।

৮৪. এই শেষবার মুজিব ইয়াহিয়ার সাথে আলোচনা করেন।

৮৫. Bhutto, *Great Tragedy*, 11.

৮৬. Choudhury, *Last Days*, 106.

জনগণের উপর মুজিবের পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ এবং ছয় দফার ব্যাপারে তাঁর আপোসহীন সাহসী অবস্থানের কারণে ইয়াহিয়া, ভূট্টো এবং জেনারেলরা মুজিবকে সমীহ করতেন এবং তাঁর প্রশংসা করতেন।[৮৭] তবে স্পষ্টত মুজিবের চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের এসকল বৈশিষ্ট্যের কারণেই তারা তাঁকে জাতীয় নেতার অবস্থানে মেনে নিতে সম্মত ছিলেন না। ভূট্টো একবার বক্তব্য রাখেন যে মুজিব তাঁকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে বলেছিলেন যে সামরিক বাহিনীকে বিশ্বাস করা যায় না, অচলাবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার একমাত্র পথ হলো খসড়ার প্রতি ভূট্টোর সম্মতি জানানো, এবং এমনকি দুটি প্রদেশের জন্য দু'জন প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাবও তিনি রাখেন।[৮৮] এতে কোনো সন্দেহ নেই যে মুজিব বাস্তবিকই যদি এ প্রস্তাব রাখতেন, তা হলে ভূট্টো অবশ্যই তা মেনে নিতেন। যদিও এ ব্যক্তিগত আলাপচারিতার অন্য কোনো সাক্ষী ছিল না, এ কথা বলা যায় যে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রিত্ব ত্যাগ করে হলেও মুজিব ছয় দফা বাস্তবায়নের পক্ষপাতী ছিলেন। উক্ত খসড়া প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর এ অনিশ্চয়তার অবসান ঘটে।

জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিকট অন্তর্বর্তীকালীন ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া নির্ধারণে শাসকগোষ্ঠীর অনড় অবস্থানের কারণে হতাশ হয়ে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ২৩ মার্চ 'প্রতিবাদ দিবস' পালন করে। দিনটির জন্য পরিকল্পিত কর্মসূচি ছিল জনগণের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার আরেকটি বলিষ্ঠ নিদর্শন। এ দিনের জনসমাবেশ ও গণবিক্ষোভ এবং ভাষাগত ঐতিহ্যকে তুলে ধরে আয়োজিত কর্মকাণ্ড ও অনুষ্ঠান বাঙালি চেতনাকে নতুনভাবে উজ্জীবিত করে। ৩১ বছর পূর্বে এই দিনেই একজন বাঙালি নেতা কর্তৃক উপস্থাপিত পাকিস্তান প্রস্তাব লাহোরে গৃহীত হয়েছিল। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস, এই তারিখেই পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাঙালিদের দাবির মুখে নতশির হলো পাকিস্তান। এক বিশাল ও উত্থাল জনসমাবেশে মুজিবের উপস্থিতিতে সেদিন ছাত্ররা আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়েছিল এবং পাকিস্তানের পতাকা উড়তে দেয় নি। কিন্তু জনগণের প্রতিবাদ এবং বিরাজমান অস্থিরতা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ সরল বিশ্বাসে অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থার সংশোধনী বিবেচনার জন্য আলোচনা চালিয়ে যায়। আওয়ামী লীগের সদস্যরা যখন ২৪ মার্চ সন্ধ্যা ৬টায় ইয়াহিয়ার সাথে সাক্ষাৎ করেন তখনো আলোচনা ভেঙে যাওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা যায় নি। ২৫ মার্চ ভূট্টোর সংবাদসম্মেলনে প্রদত্ত বক্তব্য থেকে জানা যায় যে বিবদমান দলগুলো নীতিগত সমঝোতায় উপনীত হয়েছিল।[৮৯] ২৪ মার্চ রাতে আওয়ামী লীগের উপদেষ্টারা যখন ইয়াহিয়ার কাছ থেকে বিদায় নেন, পীরজাদা তখন উক্ত খসড়া

৮৭. পরবর্তীকালে ইয়াহিয়া ও ভূট্টো বলেছিলেন যে মুজিব তাঁদেরকে জানিয়েছিলেন যে ছয় দফা ছিল আলোচনার মাধ্যমে সমাধানযোগ্য বিষয়; কিন্তু তাঁরা এর কোন প্রমাণ দেখান নি। ১৯৬৬ সাল থেকেই ছয় দফা ছিল আওয়ামী লীগের মূল স্তম্ভ এবং এ থেকে যেকোন তাৎপর্যপূর্ণ বিচ্যুতি হতো আত্মহত্যার সামিল।

৮৮ .Choudhury, *Last Days*, 108.

৮৯. *Dawn*, March 26

চূড়ান্তকরণের জন্য পরের দিন সকালে একটি সম্ভাব্য চূড়ান্ত বৈঠকের পরিকল্পনার কথাও জানিয়েছিলেন।[৯০]

পরিস্থিতির আশাব্যঞ্জক অগ্রগতি এবং আশু আপোসরফার সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ইয়াহিয়া অকস্মাৎ ২৫ মার্চ অপরাহ্নে ইসলামাবাদ ফিরে যান এবং সেদিন সন্ধ্যায়ই টিক্কা খানের জরুরি পরিকল্পনার বাস্তবায়ন শুরু হয়। এই সময়ে আওয়ামী লীগের প্রতি কোনো চরমপত্র বা শেষ প্রস্তাব দেয়া হয় নি এবং কোনো সান্ধ্য আইনের আদেশও জারি করা হয় নি যখন পাক সেনাবাহিনী বাংলাদেশের অরক্ষিত জনগণকে আক্রমণ করে ইতিহাসের জঘন্যতম এবং নিন্দনীয় হত্যাযজ্ঞ ও ধ্বংসলীলা সম্পাদন করে।

ইয়াহিয়া ২৬ মার্চ প্রদত্ত ভাষণে ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে একটি সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু করার পরিকল্পনা করার জন্য আওয়ামী লীগকে অভিযুক্ত করেন। কিন্তু তাঁর সরকার কখনোই উক্ত পরিকল্পিত বিদ্রোহের কোনো প্রমাণ প্রদর্শন কবতে পারে নি। স্পষ্টত এটা ছিল সামরিক অভিযানের পক্ষে যুক্তি দেখানোর জন্য একটি ছলমাত্র। দেশদ্রোহিতার অভিযোগে ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে মুজিবকে গ্রেফতার করা হয়; আওয়ামী লীগকে বেআইনী ঘোষণা করা হয় এবং সংবাদমাধ্যমের উপর কড়া সেন্সরসীপ আরোপ করা হয়। ভূট্টো প্রায় সকল পর্যায়েই গঠনমূলক ভূমিকা রাখা থেকে বিরত ছিলেন। কিন্তু তিনি সামরিক অভিযানকে এই বলে স্বাগত জানান যে, " খোদাকে ধন্যবাদ, পাকিস্তান রক্ষা পেল"।[৯১] এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে ভূট্টোর সম্মতি ছাড়া সেনাবাহিনী সামরিক সমাধান বেছে নিত না। কারারুদ্ধ হওয়ার কয়েক মুহূর্ত পূর্বে অত্যন্ত সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে বঙ্গবন্ধু মুজিব বাংলাদেশকে একটি সার্বভৌম ও স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করেন এবং জনগণকে চূড়ান্ত ত্যাগস্বীকার করতে প্রস্তুত থাকার জন্য আহ্বান জানান। এরপর এক বীরত্বপূর্ণ মুক্তিযুদ্ধের পরিণতিতে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে।[৯২]

৯০. Zaheer, *East Pakistan*, 157.
৯১. *Dawn, March*, 27, 1971.
৯২. মুক্তিযুদ্ধের বিবরণের জন্য পরবর্তী অধ্যায়গুলো দেখুন।

# ২১

## মুক্তিযুদ্ধ : সামরিক ও বেসামরিক প্রতিরোধ

কে. এম. মোহসীন*
মেজর রফিকুল ইসলাম**

### ভূমিকা

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কালরাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বর্বর সৈন্যরা নিরস্ত্র বাঙালি জাতিকে আক্রমণ করার ফলে ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে সৃষ্ট অখণ্ড পাকিস্তানের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। ইতিহাসে নজিরবিহীন হত্যাযজ্ঞ ও ধ্বংসলীলা কবলিত সাড়ে সাত কোটি বাঙালি দুর্জয় আক্রোশে দখলদার পাকিস্তানী বাহিনীর বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়।[১]

সর্বস্তরের জনগণ বর্বরোচিত গণহত্যার বিরুদ্ধে পাকিস্তানী বাহিনীকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে হাতে অস্ত্র তুলে নেয় এবং বাংলাদেশের নগরে বন্দরে গ্রামে গঞ্জে অমিততেজে স্বতস্ফূর্তভাবে প্রতিরোধযুদ্ধ আরম্ভ করে। ছাত্র, রাজনৈতিক কর্মী, শ্রমিক, কৃষক ও লক্ষ লক্ষ মৃত্যুঞ্জয়ী তরুণ সমন্বয়ে মুক্তিবাহিনী গড়ে উঠে। তারা যার যা আছে তাই নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং মুক্তিবাহিনীর কেন্দ্রীয় শক্তিতে পরিণত হয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে চাকুরিরত বাঙালি সৈন্য, ইপিআর সৈন্য, পুলিশ, আনসার ও অন্যান্য আধা-সামরিক বাহিনীর সদস্যরা রাজনৈতিক নেতৃত্বের পেছনে একতাবদ্ধ হয়। মুষ্টিমেয় পাকিস্তানপন্থী দালাল ব্যতীত সমগ্র বাঙালি জাতি পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসনের যাঁতাকল থেকে মাতৃভূমিকে মুক্ত করার জন্য মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।[২]

---

* অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
** নিবন্ধকার ও গবেষক। রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞানে পিএইচ. ডি। সামরিক বাহিনীর অফিসার হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

১. The Editorial, *The Times*, London, 3 April 1971.

২. *The Saturday Review*, USA, 22 May, 1971.

পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ কেবলমাত্র বিপুল অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকারই হন নি, তাঁরা পেয়েছেন অসম ব্যবহার ও নিদারুণ অবহেলা। বাঙালির সমৃদ্ধ ভাষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতি থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তানী শাসকদের চোখে তাঁরা নিম্নশ্রেণী হিসেবে গণ্য হয়েছেন। এই বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতি ক্রমশ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অবহেলিত, বঞ্চনাক্লিষ্ট জনগণের একচ্ছত্র নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন। জনগণ সম্পদের সমান অধিকার, সুষম উন্নয়ন ও ন্যায়বিচার দাবি করে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে চাকুরিরত বাঙালি সৈন্যরাও নিদারুণ অবহেলার শিকার হয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে বাঙালিদের অস্তিত্ব ছিলনা বললেই চলে। বাঙালি অফিসার ও সৈন্যদের প্রতি পাকিস্তানীদের কোন আস্থা ছিল না। মেধা থাকা সত্ত্বেও বাঙালিকে সামরিক বাহিনীতে উচ্চ পদ দেয়া হয় নি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে দেয়া হয় নি।[৩]

সেনাবাহিনীর পশ্চিম পাকিস্তানী অফি ররা বাঙালি অফিসারদের সঙ্গে বিমাতাসুলভ আচরণ করে। পাকিস্তানের ২৪ বছরের তিহাসে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার যে স্ফূরণ ঘটে, বাঙালি সামরি ও তা সমভাবে উদ্দীপ্ত করে। ঐতিহাসিক রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের নির্বাচন, ১৯৬২ সালের শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বিরোধী ছাত্র আন্দোলন, ছয় দফা আদায়ের সংগ্রাম এবং ঊনসত্তরের মহান গণআন্দোলন সর্বস্তরের জনগণ ও বাঙালি সামরিক অফিসার ও সৈন্যদেরকে প্রবলভাবে আলোড়িত করে। বিশেষত সত্তরের নির্বাচনী রায় বানচাল করার হীন চক্রান্তে লিপ্ত সামরিক শাসক ও পশ্চিম পাকিস্তানী রাজনীতিবিদদের গভীর ষড়যন্ত্রের ফলে বাঙালি জাতিকে পাকিস্তানী গণহত্যা থেকে রক্ষা করার জন্য মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া ছাড়া বাঙালি সামরিক অফিসার ও সৈন্যদের সামনে আর কোন বিকল্প ছিল না।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পরিচালিত ঐতিহাসিক অহিংস অসহযোগ আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক পটভূমি পূর্বের অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। দীর্ঘ ন'মাসব্যাপী মুক্তিযুদ্ধে জনগণ এবং সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর বাঙালি সৈন্যরা অসীম বীরত্ব ও সুমহান দেশপ্রেমের অঙ্গীকারে পাকিস্তানী বাহিনীর বিরুদ্ধে যে দুর্জয় আক্রোশে রুখে দাঁড়িয়ে প্রতিরোধযুদ্ধ করেছিল, এ অধ্যায়ে শুধু সেই অগ্নিপ্রভ সময়ের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে।

## দখলদার পাকবাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর তুলনামূলক চিত্র

বাংলাদেশ অর্থাৎ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ১৬০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এ ভূখণ্ডের তিন দিক ভারতীয় এলাকা দ্বারা

৩. Major General K. M. Shafiullah, PSC, Bir Uttam, *Bangladesh at War* (Dhaka 1989), 7

বাংলাদেশ ও বার্মার মধ্যে সামান্য আন্তর্জাতিক সীমানা আছে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে। দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। পার্বত্য চট্টগ্রাম গহীন অরণ্য ও পর্বতমালায় পরিপূর্ণ থাকায় কোন পরিকল্পিত সামরিক অভিযান সম্ভব ছিল না। পশ্চিম দিকে বিশাল সমতল পলিভূমি। পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা নদী এই সমতল এলাকাকে চারটি প্রাকৃতিক অঞ্চলে বিভক্ত করেছে। এতদ্ব্যতীত কয়েক শত ছোট-বড় নদী-নালা মূল ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে প্রবাহিত। এ ছাড়াও রয়েছে অনেক জলাভূমি। দক্ষিণ-পশ্চিমে বিশাল বনভূমি সুন্দরবন এবং উত্তরে টাঙ্গাইলের মধুপুর জঙ্গল অবস্থিত।

সারাদেশে নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া বিদ্যমান। মে মাস থেকে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত বর্ষাকাল। প্রতিবছরই বন্যায় বিশাল এলাকা প্লাবিত হয় এবং দেশের যোগাযোগব্যবস্থা ব্যাহত হয়। তখন জলযান ব্যতীত গত্যন্তর থাকে না। বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পরও কিছু সময় অভিযানকারী দলের জন্য নরম মাটি অনুপযুক্ত থাকে। পরে অবশ্য সড়ক ও ট্রেন যোগাযোগ পুনরায় সচল হয়।

পূর্ব পাকিস্তানের উল্লিখিত ভূপ্রাকৃতিক অবস্থা বিবেচনা করে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের চতুর্দশ ডিভিশন সাঁজোয়া ও গোলন্দাজ বাহিনী দ্বারা সজ্জিত ছিল। ঢাকায় এক স্কোয়াড্রন ট্যাংকসহ ৫৭ ব্রিগেড অবস্থিত ছিল এবং যশোরে ছিল ১০৭ ব্রিগেড। বেসামরিক প্রশাসন অধিগ্রহণ করে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহের নিরাপত্তা বিধান করার দায়িত্ব এই দুই ব্রিগেডকে প্রদান করা হয়। পরে উভয় ব্রিগেডকেই বাঙালি সৈন্যদের নিরস্ত্র করার এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

৫৭ ব্রিগেডের ১৩ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সকে ঢাকা সেনানিবাসে রিজার্ভ হিসেবে মোতায়েন করা হয় এবং ঢাকা সেনানিবাসের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ৪৩ হাল্কা বিমান বিধ্বংসী রেজিমেন্টকে ঢাকা বিমান বন্দরে মোতায়েন করা হয়। ২২ বেলুচ রেজিমেন্টকে পূর্ব থেকেই পিলখানাস্থ ইপিআর সদর দপ্তরে মোতায়েন করা হয়েছিল। এই ব্যাটালিয়নকে পিলখানায় অবস্থানরত প্রায় ২৫০০ বাঙালি ইপিআর সৈন্যকে নিরস্ত্র করার আদেশ দেওয়া হয়। এদেরকে অয়ারলেস এক্সচেঞ্জ দখল করার আদেশও দেওয়া হয়। ৩২ পাঞ্জাব রেজিমেন্টকে রাজারবাগ পুলিশ লাইন আক্রমণ করে প্রায় ১০০০ বাঙালি পুলিশকে নিরস্ত্র করার আদেশ দেওয়া হয়। ১৮ পাঞ্জাব রেজিমেন্টকে পুরাতন ঢাকার নওয়াবপুর এলাকায় মোতায়েন করা হয় এবং শেরে বাংলা নগরে দ্বিতীয় রাজধানী এলাকায় ফিল্ড রেজিমেন্টকে পার্শ্ববর্তী মোহাম্মদপুর ও মিরপুর এলাকায় বসবাসরত বিহারীদের রক্ষা করার জন্য মোতায়েন করা হয়। এ ছাড়া ১৮ পাঞ্জাবের এক কোম্পানি, ২২ বেলুচের এক কোম্পানি ও ৩২ পাঞ্জাবের এক কোম্পানি সমন্বয়ে গঠিত বাহিনীকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা, বিশেষ করে ইকবাল হল ও জগন্নাথ হল আক্রমণ করার নির্দেশ দেওয়া হয় এবং

এক প্লাটুন কমান্ডোকে ৩২ নম্বর ধানমণ্ডিস্থ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বাড়ি আক্রমণ করে তাঁকে গ্রেফতারের আদেশ দেওয়া হয়। এম-২৪-এর এক স্কোয়াড্রন ট্যাংক ২৬ মার্চ রাতে ঢাকার নগরবাসীদের সন্ত্রস্ত করতে রাজপথ প্রকম্পিত করার জন্য প্রস্তুত রাখা হয়।[৪]

যশোর সেনানিবাসে অবস্থিত ১০৭ ব্রিগেডের পাকিস্তানী সেনাদল খুলনা এলাকা নিয়ন্ত্রণে আনে। কিন্তু যে পাকিস্তানী সেনাদল ঝিনাইদহ, ঈশ্বরদী ও বেনাপোল অভিমুখে যাত্রা করে, তারা যশোর থেকে ছয় মাইল অতিক্রম করার আগেই মারমুখী জনতার তীব্র প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। এই ব্রিগেডের কুষ্টিয়া শহরে অবস্থানরত ২৭ বেলুচ রেজিমেন্টের এক কোম্পানি সৈন্য মুক্তিবাহিনীর আক্রমণের ফলে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়। ২৫ বেলুচ রেজিমেন্টের সৈন্যরা বেনাপোল-যশোর বিমানবন্দর এলাকায় আটকে পড়ে। বিমানবন্দরটি বিমান অবতরণের জন্য অনুপযোগী হয়ে পড়ে। এভাবে এই ব্রিগেডটি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে এবং অতিরিক্ত সৈন্য পাঠানোর জন্য ঢাকা সদর দপ্তরকে অনুরোধ করে। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি ১২ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট ঢাকা থেকে যশোর আসে এবং এই ব্রিগেডের সঙ্গে যোগ দেয়।

রংপুর-সৈয়দপুর এলাকায় ২৩ ব্রিগেড অবস্থিত ছিল। রাজশাহী উপশহরে অবস্থিত ২৫ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট জনগণের স্বতস্ফূর্ত আক্রমণের মুখে পড়ে। ২৫ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের এক কোম্পানি সৈন্য পাবনা অভিমুখে অগ্রসর হয়। ২৬ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের এক কোম্পানি সৈন্য দিনাজপুরে যায়। ২৩ ফিল্ড রেজিমেন্টকে বগুড়া দখল করার নির্দেশ দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত ২৯ ক্যাভালরি, ইনজিনিয়র ব্যাটালিয়নের দুই কোম্পানি সৈন্য (এক কোম্পানি ১০ ইনজিনিয়র ব্যাটালিয়নের, অপর কোম্পানিটি ৬ ইনজিনিয়র ব্যাটালিয়নের), সিগন্যাল কোম্পানি এবং ফিল্ড এমবুলেন্স এই ব্রিগেডের অধীনস্থ ছিল এবং রংপুরে অবস্থান করছিল।

২৪ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স অবস্থিত ছিল কুমিল্লা সেনানিবাসে। ইনজিনিয়র সেনাদল এবং ১২০ মিলিমিটার মর্টার সজ্জিত ৮৮ মর্টার ব্যাটারি ২৬ মার্চ রাত ১টার সময় চট্টগ্রাম থেকে কুমিল্লা সেনানিবাসে পৌঁছে। ৫৩ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারি এবং ৩ কমান্ডো ব্যাটালিয়ন কুমিল্লাস্থ ৫৩ ব্রিগেডের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ৩১ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট সিলেটে ব্রিগেড সদর দপ্তর থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল। ২০ বেলুচ রেজিমেন্ট, ৩১ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের এক কোম্পানি এবং নেভাল বেইস চট্টগ্রামে অবস্থিত ছিল। ৩ কমান্ডো ব্যাটালিয়ন অবশ্য কুমিল্লা থেকে পরে চট্টগ্রামে স্থানান্তরিত হয়।[৫]

এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে পশ্চিম পাকিস্তানের খারিয়ান সেনানিবাস থেকে ৯ ডিভিশন ঢাকায় আসে। মেজর জেনারেল শওকত রেজা এই ডিভিশনের জিওসি নিযুক্ত হন। মে

৪. Siddiq Salik, *Witness to Surrender*, (Oxford 1977), 72-3
৫. Shafiullah, *Bangladesh at War*, 83

মাসের শেষ সপ্তাহে সিলেট থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা এই ডিভিশনের দায়িত্বে দেওয়া হয়। ১৪ ডিভিশনের আওতাধীন ২৭ ব্রিগেডকে ময়মনসিংহে পাঠানো হয় এবং ৩১৩ ব্রিগেডকে সিলেট প্রেরণ করা হয়। ৩১ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট পূর্ব থেকেই সিলেটে অবস্থান করছিল। ৫৩ ব্রিগেড কুমিল্লা থেকে চট্টগ্রামে স্থানান্তরিত হয় এবং তদস্থলে ১১৭ ব্রিগেডকে কুমিল্লায় পাঠানো হয়।

১১৭ ব্রিগেড কুমিল্লা সেনানিবাস এলাকা অধিকার করে এবং এই ব্রিগেডের ৩৩ বেলুচকে চাঁদপুর পুনর্দখল করার জন্য পাঠানো হয়। অপর একটি সেনাদলকে আখাউড়া দখলের নির্দেশ দেওয়া হয়। এই সেনাদলটি আখাউড়ায় তীব্র প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। এপ্রিল মাসে কোয়েটা সেনানিবাস থেকে ১৬ ডিভিশনকে ঢাকায় আনা হয় এবং সম্পূর্ণ উত্তর বাংলা এই ডিভিশনের আওতাধীন করা হয়। ময়মনসিংহ, ঢাকা ও যশোর এলাকা ১৪ ডিভিশনের যুদ্ধএলাকা হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হয়।[৬]

৫৭ ব্রিগেড ঢাকায় অপারেশনের পর যমুনা অতিক্রম করে যশোরস্থ নবম ডিভিশনের সঙ্গে যোগ দেয়। ২৭ ব্রিগেডকে ময়মনসিংহ অভিমুখে যাত্রার পূর্বে কুমিল্লা-সিলেট রেল ও সড়ক যোগাযোগ স্বাভাবিক করার দায়িত্ব প্রদান করা হয়। ভৈরব বাজারে প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হয়। বিশাল মেঘনা নদী অতিক্রমের জন্য পাকিস্তানী সৈন্যদের নদী অতিক্রম অপারেশন করতে হয়। ট্যাংক, হেলিকপ্টার, বিমান ও গানবোট ৭২ ঘন্টাব্যাপী এই যুদ্ধে ব্যবহৃত হয়।

৫৭ ব্রিগেডকে রাজশাহীতে বিধ্বস্ত ২৫ পাঞ্জাব রেজিমেন্টকে রক্ষা করার আদেশ দেওয়া হয়। সড়ক ও নদীপথে পাক সেনাদল ৮ এপ্রিল ঢাকা থেকে অগ্রসর হয় এবং ১৪ এপ্রিল রাজশাহী পৌঁছে। পূর্বে প্রদত্ত আদেশ অনুযায়ী ২৭ ব্রিগেড ময়মনসিংহ অভিমুখে অগ্রসর হয়।

লেঃ জেনারেল এ. এ. কে. নিয়াজি ১১ এপ্রিল, ১৯৭১ পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। টিক্কা খানকে এই কমান্ডের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। তাঁকে গভর্নর ও সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব দেওয়া হয়। নিয়াজি ইপিআর-এর স্থলে ইস্ট পাকিস্তান সিভিল আর্মড ফোর্সেস (ইপিসিএএফ) গঠনের সিদ্ধান্ত নেন।[৭] এই বাহিনী পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত ব্যক্তিবর্গ এবং বাঙালি রাজাকারদের সমন্বয়ে গড়ে উঠে। মেজর জেনারেল জামসেদকে এই নতুন বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত

৬. পূর্বোক্ত, ৪৪.

৭. পাকিস্তানপন্থী এবং ধর্মান্ধ লোকদের সমন্বয়ে পাকিস্তানী সৈন্যদের সহযোগিতা এবং বেসামরিক জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে রাজাকারবাহিনী গড়ে তোলা হয়। অনুরূপভাবে আলবদর ও আল সামস বাহিনী গঠন করা হয়। এসব পাকিস্তানী দালাল বাংলাদেশের অভ্যুদয় রোধ করার জন্য মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়।

করা হয়। মুক্তিবাহিনীর প্রতি সহানুভূতিশীল ও স্বাধীনতার সমর্থক ব্যক্তিদের ধ্বংস, নির্যাতন ও হয়রানি করার দায়িত্ব এই বাহিনীর উপর অর্পণ করা হয়। এই বাহিনীতে প্রায় ৪০,০০০ অশিক্ষিত, অল্প প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও ধর্মান্ধ ব্যক্তি যোগ দেয়, যাদের কোন আদর্শ ছিল না। পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ১৪ ডিভিশন ঢাকা, ময়মনসিংহ ও যশোরে, ৯ ডিভিশন মেঘনার পূর্বে চট্টগ্রাম ও সিলেটে এবং ১৬ ডিভিশন উত্তর বাংলায় মোতায়েন করা হয়। এ ছাড়া দেশের সর্বত্র ছিল নবগঠিত ইস্ট পাকিস্তান সিভিল আর্মড ফোর্সেস। সারাদেশে পাকিস্তানী সৈন্যরা ও তাদের সহযোগী দোসররা নিরপরাধ ও নিরস্ত্র জনগণকে হত্যা, লুটতরাজ, ধর্ষণ ও বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ শুরু করে, যা সমগ্র বিশ্ববাসীর সামনে সুপরিকল্পিত গণহত্যা হিসেবে প্রতিভাত হয়।

আধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের সৈন্যদের তুলনায় সাড়ে সাত কোটি বিদ্রোহী বাঙালি জনগণ ছিল সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে চাকুরিরত কয়েক হাজার বাঙালি সৈন্য, ইপিআর, পুলিশ, আধাসামরিক আনসার বাহিনীতে চাকুরিরত বাঙালি এবং অবসরপ্রাপ্ত বাঙালি সৈন্যরা ব্যতীত অবশিষ্ট জনগণ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য প্রশিক্ষিত ছিল না।

তথাপি বাঙালি জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে জনগণ অমিততেজে ও দুর্জয় আক্রোশে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে এক অসম যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় এবং দখলদার পাকবাহিনীকে ধ্বংস করে মাতৃভূমিকে শত্রুমুক্ত করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়। তারা অসীম সাহস আর দেশপ্রেমের সুমহান অঙ্গীকারে বাংলাদেশের স্বাধীনতার লক্ষ্যে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত হয়। সর্বস্তরের জনগণ, ছাত্র, রাজনৈতিক কর্মী, কৃষক, শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী, চাকুরিজীবী বাঙালি ও অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক সম্মিলিতভাবে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাংলাদেশের নগরে-বন্দরে, গ্রামে-গঞ্জে বিচ্ছিন্নভাবে জনগণ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মোকাবেলা করে এবং প্রচণ্ড প্রতিরোধযুদ্ধ সংঘটিত হয়। নিরস্ত্র জনগণ বাঁশের লাঠি, সড়কি ইত্যাদি দিয়ে পাকিস্তান বাহিনীর সঙ্গে মরণপণ সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। অসীম সাহস, সুগভীর দেশপ্রেম ও দৃঢ়চিত্তই ছিল জনগণের একমাত্র সম্বল।

১৯৪৮ সালে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট জন্মলাভ করে। এই রেজিমেন্টের জন্মলগ্ন থেকেই তা পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে বিমাতাসুলভ আচরণ পেতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যেখানে পাঞ্জাব ও বেলুচ রেজিমেন্টের ৪০টি ব্যাটালিয়ন ছিল এবং ফ্রন্টিয়ার ফোর্স ও আজাদ কাশ্মীর-এর ৩০টি ব্যাটালিয়ন ছিল, সেখানে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ব্যাটালিয়নের সংখ্যা ছিল মাত্র ৬টি। সপ্তম ও অষ্টম ব্যাটালিয়ন গঠিত হয় যথাক্রমে ১৯৬৯ ও ১৯৭০ সালে। কিন্তু এ দু'টি ব্যাটালিয়ন আধুনিক অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত ছিল না। সৈনিকদের প্রশিক্ষণও উন্নতমানের ছিল না। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের এই আটটি ব্যাটালিয়নের মধ্যে তিনটি ব্যাটালিয়ন অবস্থান করছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। পঞ্চম ব্যাটালিয়ন অবস্থিত ছিল শিয়ালকোটে এবং এর অধিনায়ক

ছিলেন লেঃ কর্নেল এম. এ. রউফ। মুক্তিযুদ্ধকালে এই ব্যাটালিয়নকে ওয়াগা সেক্টরে যুদ্ধ করার জন্য লাহোর ফ্রন্টে আনা হয়। যুদ্ধের সময় এই ব্যাটালিয়নের এক কোম্পানি সৈন্য সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করে এবং মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। লেঃ কর্নেল ফিরোজ সালাউদ্দিন ষষ্ঠ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক ছিলেন। ১৯৭১ সালের মাঝামাঝি তাঁকে ঢাকায় বদলি করা হলে লেঃ কর্নেল মাশুরুল হক এই ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক নিযুক্ত হন। সপ্তম ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক ছিলেন লেঃ কর্নেল এইচ. এম. এরশাদ। এই ব্যাটালিয়নটি করাচীর মালির সেনানিবাসে অবস্থিত ছিল। বাকী ব্যাটালিয়নগুলো পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত ছিল এবং এই ব্যাটালিয়নগুলো বিদ্রোহ করে মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। প্রথম ইস্ট বেঙ্গল যশোর সেনানিবাসে অবস্থিত ছিল এবং এই ব্যাটালিয়নটির অধিনায়ক ছিলেন লেঃ কর্নেল রেজাউল জলিল। দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল ঢাকা থেকে ২৫ মাইল দূরে জয়দেবপুরে অবস্থান করছিল। এই ব্যাটালিয়নটির অধিনায়ক ছিলেন লেঃ কর্নেল মাসুদুল হোসেন খান। ২৪ মার্চ, ১৯৭১ তাঁকে কমান্ড থেকে অপসারণ করে অপর একজন বাঙালি অফিসার লেঃ কর্নেল রকিবকে পদস্থ করা হয়। তৃতীয় ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক ছিলেন একজন পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসার লেঃ কর্নেল ফজল করিম এবং এই ব্যাটালিয়নটি সৈয়দপুরে অবস্থিত ছিল। চতুর্থ ব্যাটালিয়ন অবস্থিত ছিল কুমিল্লায় এবং এই ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক ছিলেন লেঃ কর্নেল খিজির হায়াত, একজন পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসার। অষ্টম ব্যাটালিয়ন অবস্থিত ছিল ষোল শহর, চট্টগ্রামে। একজন পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসার লেঃ কর্নেল আবদুর রশিদ জানজুয়া এই ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক ছিলেন। এই ব্যাটালিয়নটি পশ্চিম পাকিস্তানে স্থানান্তরিত হচ্ছিল এবং এর দুই কোম্পানি সৈন্য ইতিমধ্যে খারিয়ান সেনানিবাসে স্থানান্তরিত হয়েছিল। অবশিষ্ট সৈন্যদের পরবর্তী জাহাজে পশ্চিম পাকিস্তানের পথে যাত্রা শুরু করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছিল।

এতদ্ব্যতীত নতুন পদোন্নতিপ্রাপ্ত একজন বাঙালি অফিসার লেঃ কর্নেল মুশতাককে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের নবম ব্যাটালিয়ন সংগঠিত করার দায়িত্ব প্রদান করা হয়। অপর একজন বাঙালি অফিসার লেঃ কর্নেল মুইদউদ্দিনকে ঢাকা সেনানিবাসে দশম ইস্ট বেঙ্গল গঠনের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এই ব্যাটালিয়নটি জাতীয় সার্ভিস স্কীমের আওতায় কলেজের ছাত্রদের সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য নিযুক্ত করা হয়।

এ ছাড়াও পদাতিক বাহিনীর বাইরে অন্যান্য সার্ভিস ইউনিটে শতকরা পাঁচ ভাগ বাঙালি সৈন্য ছিল। সব মিলিয়ে ইস্টার্ণ কমান্ডের অধীনে প্রায় ছয় সহস্রাধিক বাঙালি সৈন্য চাকুরিরত ছিল। সেনাবাহিনী ছাড়াও তৎকালীন ইস্ট পাকিস্তান রাইফেল্‌স (ইপিআর)-এ কর্মরত বাঙালি সৈনিকরা মুক্তিবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয়। ইপিআর-এর প্রায় পনেরো হাজার বাঙালি সৈনিক সমগ্র দেশে, বিশেষত সীমান্ত এলাকায় মোতায়েন ছিল। সীমান্ত এলাকায়

অবস্থানের ফলে তাদের পক্ষে বিদ্রোহ করে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়া সহজ ছিল। এতদ্ব্যতীত প্রায় বিশ হাজার পুলিশ, কয়েক হাজার অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক, আনসার ও মুজাহিদ মুক্তিবাহিনীর শক্তি বহুলাংশে বৃদ্ধি করে। এই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈন্যরা মুক্তিযুদ্ধের সূচনাপর্বে সকল স্তরের জনগণের স্বতস্ফূর্ত সমর্থনের ফলে সংখ্যায় প্রায় দ্বিগুণ পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে। কিন্তু সম্ভবত যুদ্ধপরিকল্পনা ও সুস্পষ্ট রাজনৈতিক দিকনির্দেশনার অভাবে কোন সমন্বিত প্রয়াশ গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি।

## প্রাথমিক প্রতিরোধ

১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি ও মার্চের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক সংকট বাঙালি জাতিকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। জনগণ যেকোন পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সঙ্গে ইয়াহিয়া খানের সমঝোতাবৈঠক চলাকালে শহর ও গ্রামাঞ্চলে বিক্ষোভরত জনগণ যুদ্ধ করার মানসিকতা প্রদর্শন করছিল। অবসরপ্রাপ্ত সৈন্যরা পল্টন ময়দানে কেবল মার্চপাস্ট করেই ক্ষান্ত হলো না, তাঁরা উদ্দীপ্ত তরুণদের প্রশিক্ষণ দেওয়া আরম্ভ করলো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা অস্ত্রপ্রশিক্ষণ ও শারীরিক ব্যায়াম অনুশীলন করতে শুরু করলো। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিল সমগ্র জাতি যেন স্বাধীনতাযুদ্ধে যোগদানের আহ্বানের জন্য অত্যন্ত সচেতনভাবে অপেক্ষা করছিল।

পাকিস্তানী সৈন্যদের জন্য অস্ত্রশস্ত্রবোঝাই জাহাজ এম.ভি. সোয়াত চট্টগ্রাম বন্দরে এসে পৌঁছে। চট্টগ্রাম ডকইয়ার্ডের শ্রমিকরা অসহযোগ আন্দোলনের অংশ হিসেবে পূর্ণ হরতাল করার ফলে জাহাজটির বন্দরে নোঙ্গর করতে এক সপ্তাহ বিলম্ব ঘটে। পি.এন.এস. জাহাঙ্গীর ও অন্যান্য জাহাজগুলোও গভীর সমুদ্রে অপেক্ষা করছিল। এসব অস্ত্রসম্ভার বহনকারি জাহাজের সমাবেশে পাকিস্তানীদের হীন উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে উঠে। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টার (ই.বি.আর.সি)-এর কমান্ড্যান্ট ব্রিগেডিয়ার মজুমদারকে অপসারণ করে তাঁর স্থলে পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসার ব্রিগেডিয়ার এম.এইচ. আনসারীকে পদস্থ করা হয়, যিনি অস্ত্রবোঝাই জাহাজ খালাশ করার জন্য বেপরোয়াভাবে শক্তি প্রয়োগ করেন। বহু বেসামরিক ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়। ই.বি.আর.সি'র রিক্রুট সৈন্যদেরকে জাহাজ খালাশ করতে অস্বীকার করার কারণে হত্যা করা হয়। সামরিক ও বেসামরিক লোকদের এই নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞ চট্টগ্রামে অবস্থিত বাঙালি সৈন্যদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি করে।

১৯ মার্চ জয়দেবপুরে অবস্থিত দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সৈন্যদের নিরস্ত্র করার হীন উদ্দেশ্যে একদল পাকিস্তানী সৈন্যসহ ব্রিগেডিয়ার জাহানজেব আরবাব জয়দেবপুরে আসেন। বেলা ১টা ত্রিশ মিনিটে ব্রিগেডিয়ার আরবাব জয়দেবপুর পৌঁছেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন লেঃ কর্নেল জাহেদ, মেজর জাফর (ব্রিগেড মেজর), তিনজন ক্যাপ্টেন ও

সত্তর জন সৈন্য। পাকিস্তানী সৈন্যরা দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গলকে নিরস্ত্র করার জন্য জয়দেবপুর আগমন করেছে এই খবর চারিদিকে দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে। বাঙালি সৈন্যদের সচেতনতা ও প্রস্তুতি দেখে তাদের নিরস্ত্র করতে গেলে সংঘর্ষ হতে পারে এই ভয়ে ব্রিগেডিয়ার আরবাব বাঙালি সৈন্যদের নিরস্ত্র করার সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করেন। কিন্তু উত্তেজিত জনতা অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে রেলওয়ে ক্রসিং-এর উপর শক্ত বেরিকেড তৈরি করে। দিনটি ছিল শুক্রবার। সাপ্তাহিক বাজারের দিন হওয়ায় প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোকের সমাবেশ ঘটে।

জনতা বেরিকেডের উভয় পাশে অবস্থান গ্রহণ করে এবং বেরিকেড সরাতে অস্বীকার করে। এই বেরিকেড সৃষ্টির ফলে ব্রিগেডিয়ার আরবাব ও তাঁর সেনাদল জয়দেবপুর খেকে ঢাকা যেতে বাধাপ্রাপ্ত হয়। বাঙালি মেজর মঈনুল হোসেন চৌধুরী যখন উত্তেজিত জনতাকে শান্ত করতে চেষ্টা করছিলেন, ঠিক সেসময় ব্রিগেডিয়ার আরবাব তাঁর সেনাদলসহ হাজির হন। ব্রিগেডিয়ার আরবাব ও পাকিস্তানী সৈন্যদের দেখে জনতা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। পরিস্থিতি আরো ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করলো যখন দুইজন বাঙালি সৈন্য গাড়ির ড্রাইভার ও হেলপারসহ সেখানে এসে বর্ণনা করলো কীভাবে তারা জনতা কর্তৃক প্রহৃত হয়েছে এবং কোনভাবে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছে। তারা একটি ট্রাকে চড়ে টাংগাইল থেকে রেশন সংগ্রহের জন্য জয়দেবপুরে আসছিল। যখন ট্রাকটি রাজবাড়ির দিকে আসছিল তখন জনতা ট্রাকটি থামায় এবং পাঁচজন সৈন্যকে চাইনিজ রাইফেল ও সাব মেশিনগান সহ ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

ব্রিগেডিয়ার আরবাব মেজর মঈনকে গুলিবর্ষণ করে বেরিকেড সরিয়ে ফেলতে আদেশ দেন। সমবেত জনতাকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য যথারীতি ফ্ল্যাগ প্রদর্শন করে সকলকে সতর্ক করা হয়। মেজর মঈন গুলিবর্ষণের আদেশ দেন বটে কিন্তু বাংলায় পায়ের নীচে অথবা মাথার উপর দিয়ে গুলিবর্ষণের আদেশ দেন। এ সময় বাঙালিরাও পাল্টা গুলি বর্ষণ করে। ব্রিগেডিয়ার আরবাব এর ফলে অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হন এবং চিৎকার করতে থাকেন, "একটা গুলির বদলে আমি একটি মৃতদেহ চাই। তুমি যদি পরিস্থিতি সামাল দিতে না পার তাহলে আমি আমার সৈন্য নিয়োগ করব।" গুলিবর্ষণের ফলে দুইজন নিহত ও একজন গুরুতরভাবে আহত হওয়ায় পরিস্থিতি বিপজ্জনক মোড় নেয়। বিক্ষুব্ধ জনতা বেরিকেডের পেছন দিক দিয়ে মসজিদের ছাদ থেকে চাইনিজ সাব-মেশিনগান দিয়ে গুলি বর্ষণ করে। দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গলের কয়েকজন সৈন্য আহত হয়। ব্রিগেডিয়ার আরবাব অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান। এটাই ছিল জনতার প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ।[৮]

স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে ১৫ মার্চ থেকে ২৪ মার্চ পর্যন্ত ইয়াহিয়া-মুজিব বৈঠকের আড়ালে কালক্ষেপণ করে সৈন্য সমাবেশ করা হয় এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য ও

৮. Major General K M. Shafiullah, PSC Bır Uttam, *Bangladesh at War*, 21-22.

অস্ত্রসম্ভার এনে গণহত্যার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। এই সময়ে সামরিক অভিযানের পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয় এবং অনুমোদিত হয়। এই পরিকল্পনার নাম দেওয়া হয় অপারেশন সার্চলাইট। মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী এই পরিকল্পনার খসড়া তৈরি করেন। মেজর জেনারেল খাদিম রাজা তাঁর অধীনস্থ ব্রিগেড ও ইউনিটসমূহের মধ্যে অস্ত্রসম্ভার-রসদ বিতরণ ও দায়িত্ব বণ্টন করেন। পাঁচ পৃষ্ঠাব্যাপী ষোলটি অনুচ্ছেদ সম্বলিত অপারেশন সার্চলাইট পরিকল্পনাটি ২০ মার্চ অপরাহ্নে ফ্লাগ স্টাফ হাউজে জেনারেল হামিদ ও টিক্কা খানকে পড়ে শোনানো হয়। পরে ইয়াহিয়া খান সামান্য সংশোধন করে এই পরিকল্পনা অনুমোদন করেন।[৯]

বাঙালি জাতিকে আক্রমণ করার সময় নির্ধারিত হয় ২৬ মার্চ রাত ১টা। অনুমান করা হয়েছিল যে ততক্ষণে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া নিরাপদে করাচী অবতরণ করবেন। অপারেশন সার্চলাইট পরিকল্পনা অনুযায়ী দু'টি সদর দপ্তর স্থাপন করা হয়। মেজর জেনারেল ফরমানকে ঢাকা শহর ও সংলগ্ন এলাকায় অপারেশন পরিচালনা করার দায়িত্ব প্রদান করা হয়। ব্রিগেডিয়ার আরবাবের অধীনস্থ সাতান্ন ব্রিগেডকে এই অপারেশনের জন্য নিয়োগ করা হয়। অপরদিকে বাংলাদেশের অবশিষ্ট এলাকায় অপারেশন পরিচালনা করার জন্য মেজর জেনারেল খাদিমকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। অপারেশন পরিচালনার সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন লেঃ জেনারেল টিক্কা খান। দ্বিতীয় রাজধানী এলাকায় সামরিক আইন সদর দপ্তরে অবস্থান করে ২৬ মার্চ সারা রাত্রি টিক্কা খান অপারেশন সার্চলাইট পরিচালনা ও এর অগ্রগতি সমন্বয় করেন।[১০]

ঢাকা শহরের জঙ্গি ছাত্র ও রাজনৈতিক কর্মীরা সেনানিবাসের বাইরে প্রতিরোধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। পাকিস্তানী বাহিনীর অগ্রাভিযানে বাধা প্রদানের জন্য বড় বড় সড়কের উপর অসংখ্য বেরিকেড গড়ে তোলা হয়। আধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তানী সৈন্যরা অভিযান শুরু করার আদেশের জন্য অধীরভাবে অপেক্ষারত ছিল। এ সময় ঢাকা সেনানিবাসস্থ পাকিস্তানী সৈন্যদের বিভিন্ন স্তরে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে বিক্ষুব্ধ বাঙালি কর্তৃক সেনানিবাস আক্রমণ অত্যাসন্ন। পাকিস্তানী সৈন্যরা এ ধরনের গুজবে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। স্থানীয় অধিনায়করা অপারেশন শুরু করার সময় (H- hour)* এগিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাতে থাকে। রাত এগারটা ত্রিশ মিনিটে অয়ারলেসসজ্জিত জীপগুলো এবং পাকিস্তানী সৈন্য বহনকারী ট্রাকসমূহ বেরিয়ে পড়ে।

পাকিস্তানী বাহিনীর প্রথম দলটি সেনানিবাস থেকে এক কিলোমিটার দূরে ফার্মগেটে প্রথম বাধাপ্রাপ্ত হয়। বড় গাছের গুঁড়ি দিয়ে এখানে রাস্তার উপর বিরাট রোডব্লক তৈরি

* H. hour-এর অর্থ আপারেশন সার্চলাইট অনুযায়ী আঘাত হানার সময়।

৯. Siddiq Salik, *Witness to Surrender*, 218-224

১০. পূর্বোক্ত , 71.

করা হয়েছিল। ভাঙা গাড়ি এবং স্টীম রোলার রাস্তার ওপরে রাখা হয়েছিল। পাকিস্তানীদের বেরিয়ে আসতে দেখে শত শত বাঙালি 'জয় বাংলা' স্লোগান দিতে থাকে। এই প্রতিরোধ মাত্র পনের মিনিট স্থায়ী হয়। মেশিনগানের গুলিবর্ষণের প্রচণ্ড শব্দে জনতার 'জয় বাংলা' স্লোগান তলিয়ে যায়।

বর্বর পাকিস্তানী সৈন্যরা সামনে যা-কিছু পায় সবই ধ্বংস করে এবং যুবক, বৃদ্ধ, শিশু, নারী সবাইকে নির্বিচারে হত্যা করে। ফুটপাতে ঘুমন্ত আশ্রয়হীন দরিদ্র জনগণও রেহাই পায়নি। তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হল, জগন্নাথ হল ও রোকেয়া হল আক্রমণ করে এবং নির্বিচারে ছাত্রদের হত্যা করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু খ্যাতিমান ও যশস্বী শিক্ষককে হত্যা করা হয়। ডঃ জি. সি. দেব, ডঃ মনিরুজ্জামান, ডঃ জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা, সবার প্রিয় মধুদা ও অসংখ্য কর্মচারীকে হত্যা করা হয়। এটি ছিল ঠাণ্ডা মাথায় শিক্ষিত যুবক ও বুদ্ধিজীবীদের জঘন্য হত্যাকাণ্ড। পুরানো ঢাকার হিন্দু এলাকা আক্রমণ করে তারা নির্বিচারে গণহত্যা শুরু করে, বাড়িঘর ভস্মীভূত করে, সম্পদ লুটপাট করে এবং নারীধর্ষণ করে।[১১]

লেঃ কর্নেল জেড. এ. খান ও মেজর বেলাল পঞ্চাশ জন সৈন্যের একটি কমান্ডো গ্রুপ সঙ্গে নিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বাড়ি আক্রমণ করে এবং নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে। রাত প্রায় ১টা ত্রিশ মিনিটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সুপরিকল্পিত গণহত্যা সমগ্র বিশ্ববাসীকে আলোড়িত করে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সংবাদপত্রে রাশি রাশি মৃতদেহ ও ধ্বংসাত্মক কার্যাবলীর ছবিসহ মানব-ইতিহাসে বিরল এই গণহত্যার প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে থাকে।*

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে যখন গ্রেফতার করা হয় ঢাকা শহর তখন জ্বলছে। তখন স্বাধীনতার ঘোষণা ওয়ারলেসের মাধ্যমে ইথারে ছড়িয়ে পড়ে। পূর্বে রেকর্ডকৃত এই বাণীতে বলা হয়, শেখ মুজিব বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। স্বাধীনতার ঘোষণাটি ছিল নিম্নরূপ :

> এটাই আমার শেষ বাণী। আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। তোমাদের যার যা-কিছু আছে তাই নিয়ে যে যেখানে আছ দখলদার পাকবাহিনীকে প্রতিরোধ কর। বাংলাদেশের মাটি থেকে পাকিস্তানের দখলদার বাহিনীর সমস্ত সৈন্য অপসারিত না হওয়া পর্যন্ত এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের যুদ্ধ চলবে। জয় বাংলা।[১২]

১১. *Bangladesh Documents*, Foreign Ministry of India, Vol. 1, 402.

* সাইমন ড্রিং কর্তৃক প্রেরিত গণহত্যার প্রতিবেদন, ৩০ মার্চ '৭১, ওয়াশিংটন পোস্টে প্রকাশিত হয়। টাইম্‌স ও ডেইলি টেলিগ্রাফেও ১৬ এপ্রিল এইচ শ্যানবার্গ কর্তক প্রেরিত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। সমগ্র বিশ্বের জনগণ এই নৃশংস গণহত্যার কথা জানতে পেরে শিউরে উঠে।

১২. পূর্বোক্ত ,২৮৬।

স্বাধীনতা ঘোষণার এই বাণী ২৬ মার্চ মধ্যরাতে বিভিন্ন জেলার ডেপুটি কমিশনার, পুলিশ সুপার এবং পুলিশ স্টেশন কর্তৃক গৃহীত হয়।

চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক আবদুল হান্নান সর্বপ্রথম ২৬ মার্চ, ১৯৭১ অপরাহ্ন ২টা ৩০ মিনিটে কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।[১৩] পরদিন ২৭ মার্চ সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে সাতটার সময় মেজর জিয়াউর রহমান কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে একটি ঘোষণাপত্র পাঠ করেন। তাঁর ঘোষণায় বলা হয় যে তাঁরা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি নিজেকে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে ঘোষণা করেন। পরে মেজর জিয়াউর রহমান তাঁর প্রথম ঘোষণা সংশোধন করে নিম্নবর্ণিত ঘোষণা দেন :

> আমি মেজর জিয়া, বাংলাদেশ লিবারেশন আর্মির অস্থায়ী প্রধান সেনাপতি, আমাদের মহান জাতীয় নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি। আমি আরো ঘোষণা করছি যে আমরা ইতিমধ্যে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের বৈধ সরকার শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে গঠন করেছি, যা আইন এবং সংবিধান অনুযায়ী পরিচালিত হবে। নতুন গণতান্ত্রিক সরকার আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে জোটনিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ। আমরা সকল জাতির সঙ্গে বন্ধুত্ব এবং আন্তর্জাতিক শান্তির জন্য কাজ করে যাব। আমি সকল দেশের সরকারকে বাংলাদেশে বর্বরোচিত গণহত্যার বিরুদ্ধে তাদের নিজ নিজ দেশে জনমত গড়ে তোলার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।[১৪]

ঢাকা পিলখানায় প্রায় ২৫০০ জন ইপিআর (বর্তমানে বিডিআর) সৈন্য অবস্থান করছিল। এদের মধ্যে ২৫০ জন নিরাপত্তা বিভাগ, ৪৫০ জন সদর দপ্তর উইং এবং ২০০ জন সদর দপ্তরে কর্মরত ছিল। ঢাকা সেক্টরে তিনটি উইং যথাক্রমে ১৩, ১৫ এবং ১৬ উইং অবস্থিত ছিল। প্রত্যেক উইং-এ ৪৫০ জন সৈন্য কর্মরত ছিল। চারজন বাঙালি অফিসার ক্যাপ্টেন দেলওয়ার, ক্যাপ্টেন দানিয়াল ইসলাম, ক্যাপ্টেন লতিফ ও ক্যাপ্টেন আজাদ এখানে চাকুরিরত ছিলেন। ফেব্রুয়ারি মাসের শেষের দিকে ২২ বেলুচ রেজিমেন্টকে পিলখানায় মোতায়েন করা হয়।[১৫]

২৫ মার্চ ঢাকা সেনানিবাস থেকে পাকিস্তানী সৈন্যরা বেরিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পিলখানা আক্রমণ করা হয়। মধ্যরাতে নৃশংস হত্যাযজ্ঞ শুরু হয়। পিলখানায় অবস্থিত বাঙালি সৈন্যরা প্রতিরোধযুদ্ধ শুরু করে। বাঙালি সৈন্য ও দখলদার বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ

১৩. মেজর রফিকুল ইসলাম, বীর উত্তম, *লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে,* ৯৮।

১৪. Shafiullah, *Bangladesh at War,* 40.

১৫. বিরাজমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি পিলখানাস্থ ইপিআর-এর অফিসার ও সৈন্যদের মনে গভীর রেখাপাত করে। ইপিআর ঢাকা শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত হওয়ায় তাঁদের বেসামরিক জনগণের সংস্পর্শে আসার সুযোগ হয়। ২৩ মার্চ পাকিস্তান দিবসে তাঁরা বাংলাদেশের নতুন জাতীয় পতাকা পিলখানার একটি গাছের মাথায় উত্তোলন করেন। এই ছিল ইপিআর সৈন্যদের আবেগ ও সচেতনতার বহিঃপ্রকাশ।

আরম্ভ হয় এবং বিরামহীনভাবে সারারাত্রি অব্যাহত থাকে। শত শত বাঙালি সৈন্য নিহত হয়। একজন পাকিস্তানী অফিসারসহ বহু পাকিস্তানী সৈন্যও নিহত হয়। ২৬ মার্চ অপরাহ্নে ট্যাংক বাহিনী পাকিস্তানী সৈন্যদের সাহায্যার্থে পিলখানায় আসে। বাঙালি সৈন্যরা মুক্তিযুদ্ধের সূচনাপর্বে এই প্রতিরোধযুদ্ধে অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করে। কিন্তু পাকিস্তানী বাহিনীর সঙ্গে অসম যুদ্ধে টিকতে না পেরে তারা বুড়িগঙ্গা অতিক্রম করে জিনজিরায় অবস্থান গ্রহণ করে।

পাকিস্তানী সৈন্যরা তাৎক্ষণিকভাবে রাজারবাগ পুলিশ সদর দপ্তরও আক্রমণ করে। প্রায় ১০০০ বাঙালি পুলিশ প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এই বীরত্বমূলক প্রতিরোধযুদ্ধে মাত্র কয়েকজন বাঙালি পুলিশ ব্যতীত সবাই নিহত হয়। আগুনের লেলিহান শিখা ও ধুঁয়া সমগ্র শহর গ্রাস করে।

২৫ মার্চ রাত্রি সাড়ে ১১টায় ২০ বেলুচ চট্টগ্রাম সেনানিবাসে অবস্থিত ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টার (ইবিআরসি) সুপরিকল্পিতভাবে আক্রমণ করে। প্রায় ১০০০ রিক্রুট বাঙালি সৈনিককে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করা হয়। পাকিস্তানী সৈন্যরা আবাসিক এলাকা আক্রমণ করে, লুটপাট ও নারীধর্ষণ করে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল ষোল শহরে অবস্থান করছিল। পাঞ্জাবী কমান্ডিং অফিসার লেঃ কর্নেল আবদুর রশিদ জানজুয়া উপ-অধিনায়ক মেজর জিয়াউর রহমানকে চট্টগ্রাম বন্দরে যেতে নির্দেশ দেন। জিয়া বন্দর অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন, কিন্তু পথিমধ্যে দেওয়ানহাট স্কোয়ারে ভারি রোডব্লকের কারণে থেমে যেতে বাধ্য হন। কয়েকজন লোককে দিয়ে তিনি যখন রোডব্লক অপসারণ করতে ব্যস্ত, তখন সেখানে ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান ছুটে আসেন এবং ইবিআরসিতে নির্বিচারে বাঙালি হত্যার বিষয় জিয়াকে অবহিত করেন। বাঙালি নিধনযজ্ঞের কথা জানতে পেরে জিয়া ষোলশহরে ফিরে আসেন এবং তাঁর অধীনস্থ সৈন্যদের পাকিস্তানী সৈন্যদের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নিতে আহ্বান জানান। জানজুয়াকে বাসা থেকে ডেকে তোলা হয় এবং গ্রেফতার করা হয়। জিয়া ঐ রাতেই ব্যাটালিয়নসহ কালুরঘাটে অবস্থান গ্রহণ করেন।[১৬]

ইপিআর-এর চট্টগ্রাম সেক্টরের এডজুটেন্ট ক্যাপ্টেন রফিক ২৫ মার্চ রাতের প্রথম লগ্নে বিদ্রোহ করেন এবং অয়ারলেস কলোনী, রেলওয়ে হিল ও হালিশহরে অবস্থিত পশ্চিম পাকিস্তানী ইপিআর সৈন্যদের নিরস্ত্র করেন। রাতের অন্ধকারে ক্যাপ্টেন রফিক প্রায় সারা চট্টগ্রাম শহর নিজ দখলে আনেন। তিনি কাপ্তাই ও রামগড়ে অয়ারলেসবার্তা পাঠান এবং বাঙালি ইপিআর সৈন্যদের চট্টগ্রামে এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দিতে আহ্বান জানান। কিন্তু কাপ্তাই ও রামগড় থেকে আগত ইপিআর সৈন্যদের জিয়া কালুরঘাটে থামিয়ে দেন এবং

১৬. জিয়া ২৬ মার্চ, ১৯৭২ প্রকাশিত সাপ্তাহিক বিচিত্রায় এই ঘটনা বর্ণনা করেন।

অষ্টম ইস্ট বেঙ্গলের অন্তর্ভুক্ত করেন। জিয়া যখন ষোল শহর ছেড়ে কালুরঘাটে চলে যান, তখন রফিক চট্টগ্রাম শহরে একা হয়ে পড়েন। ৩-৪ দিন চট্টগ্রাম শহর দখলে রাখার পর রফিক তাঁর বাহিনীসহ রামগড়ে যান এবং সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে চলে যান।

কুমিল্লা সেনানিবাসে অবস্থিত ৫৩ ব্রিগেডের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফীর নেতৃত্বে ২৪ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের একটি সেনাদল ৮৮ মর্টার ব্যাটারির ১২০ মিঃ মিঃ মর্টার সহ চট্টগ্রাম অভিমুখে যাত্রা শুরু করে। তারা নিরাপদে এবং কোন বাধার সম্মুখীন না হয়ে বিকাল পাঁচটায় শুভপুর ব্রীজ অতিক্রম করে এবং কুমিরা এলাকায় প্রবেশ করে। এই সেনাদল ছোটখাট রোডব্লক অপসারণ করার জন্য এখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে। আকস্মিকভাবে তাদের উপরে মুক্তিবাহিনী ভারী মেশিনগান ও মর্টারের গোলাবর্ষণ শুরু করে। অপরাহ্ন ১টায় ইপিআর সৈন্যরা কুমিল্লায় পাকিস্তানী বাহিনীকে অ্যামবুশ করে। ক্যাপ্টেন এম.এস.এ. ভুঁইয়া প্রথম দিকে এই অপারেশনের নেতৃত্ব দেন। লেঃ কর্নেল শাহপুর খান এবং ১৫২ জন পাকিস্তানী সৈন্য কুমিরা সংঘর্ষে নিহত হয়। পরবর্তী দুইদিন কুমিরায় প্রচণ্ড যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। পাকিস্তানী বাহিনী সম্পূর্ণভাবে হতবুদ্ধি ও দিশেহারা হয়ে পড়ে। মনোবলহারা সৈন্যদের উৎসাহ প্রদানের জন্য মেজর জেনারেল মিঠ্‌ঠা খান হেলিকপ্টারে চড়ে কুমিল্লা সেনানিবাসে আসেন। ১৪ ডিভিশনের জি.ও.সি. মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা হেলিকপ্টারে চড়ে চট্টগ্রাম যাওয়ার পথে কুমিরায় মুক্তিবাহিনী কর্তৃক তার হেলিকপ্টারে গুলি বর্ষিত হয়। হেলিকপ্টারটি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও নিরাপদে চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টে অবতরণ করে। অনতিবিলম্বে গোলন্দাজ বাহিনীকে আনয়ন করা হয়। ২৪ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স ২৮ মার্চ নতুন করে আক্রমণ করে। মুক্তিযোদ্ধারা অসীম সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যায় এবং শত্রুসৈন্যের বিপুল ক্ষতিসাধন করে কুমিরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে চলে আসে।[১৭]

চট্টগ্রাম সেনানিবাসে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অনেক সৈন্য নিয়ে আসা হয়। ৫৩ ব্রিগেডকে সদর দপ্তরসহ চট্টগ্রামে স্থানান্তর করা হয়। ইতিমধ্যে দুইটি পদাতিক ব্যাটালিয়ন এবং দুই স্কোয়াড্রন ট্যাংক পি.এন.এস. জাহাঙ্গীর যোগে চট্টগ্রাম পৌঁছে। মুক্তিযোদ্ধারা হালিশহর ও কোর্টহিলের অবস্থান ২ এপ্রিল পরিত্যাগ করে।

চট্টগ্রাম শহর ছেড়ে মুক্তিযোদ্ধারা কালুরঘাটে সমবেত হয়। ক্যাপ্টেন হারুণ এবং লেফটেন্যান্ট শমসের মবিন চৌধুরীর নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা এখানে প্রতিরক্ষাব্যূহ রচনা করে। পাকিস্তানী বাহিনী ২৯ মার্চ মুক্তিযোদ্ধাদের কালুরঘাট প্রতিরক্ষা অবস্থান আক্রমণ করে। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধারা তা প্রতিহত করতে সমর্থ হয়। জিয়াউর রহমান এই সময় সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতীয় এলাকা সাবরুমে যান। ৩১ মার্চ সকালে ৩ কমান্ডো ব্যাটালিয়ন কালুরঘাট আক্রমণ করে। যুদ্ধ কয়েকদিন ধরে বিরামহীনভাবে চলে। অবশেষে

১৭. মেজর জেনারেল এম. এস. এ. ভূঁইয়া, *মুক্তিযুদ্ধে নয় মাস*, ২৮।

১১ এপ্রিল কালুরঘাটে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। পাকিস্তানী বাহিনী কালুরঘাট ব্রীজ এলাকা দখলের জন্য মরণপণ লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়। ক্যাপ্টেন হারুন এই যুদ্ধে গুরুতরভাবে আহত হন এবং লেফটেন্যান্ট শমসের মবিন চৌধুরী শত্রুর হাতে ধরা পড়েন। অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে পেছনে সরে আসে। মেজর মীর শওকত আলীর নেতৃত্বে একটি দল রাঙ্গামাটি, ক্যাপ্টেন মাহফুজের নেতৃত্বে দ্বিতীয় দলটি কাপ্তাই এবং ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামানের নেতৃত্বে তৃতীয় দলটি কক্সবাজারের দিকে অগ্রসর হয়। অবশেষে তাঁরা সবাই ভারতীয় এলাকায় গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করেন।[১৮]

মেজর শোয়েবের নেতৃত্বে ২৭ বেলুচ রেজিমেন্টের এক কোম্পানি সৈন্য ২৫ মার্চ রাতে কুষ্টিয়া পৌঁছে এবং প্রায় ৫০০ বাঙালি পুলিশকে নিরস্ত্র করে পাকিস্তানী সৈন্যরা কুষ্টিয়া জেলা স্কুল এবং টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ভবনে অবস্থান গ্রহণ করে। কয়েক হাজার ইপিআর সৈন্য, স্বেচ্ছাসেবক এবং ছাত্র সংঘবদ্ধ হয়ে পাকিস্তানীদের অবস্থানে আক্রমণ করে। জনতার মুহূর্মুহূ শ্লোগানে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হয়। হাজার হাজার মানুষ বাঁশের লাঠি, দাও, সড়কি নিয়ে যুদ্ধে যোগ দেয়। জনগণ মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ট্রাকভর্তি খাবার বহু দূরবর্তী গ্রাম থেকে পাঠাতে থাকে। মুক্তিযোদ্ধারা ৩০ মার্চ বিকাল সাড়ে চারটায় পাকিস্তানী বাহিনীর পাঁচটি অবস্থানের উপর যুগপৎ আক্রমণ চালায়। ক্যাপ্টেন এ. আর. আজম চৌধুরীর নেতৃত্বে এ আক্রমণ পরিচালিত হয়। মেজর আবু ওসমান চৌধুরী সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন এবং ডাক্তার আসহাবুল হক ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ এ যুদ্ধে প্রবল উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। মুক্তিযুদ্ধের সূচনালগ্নে এই বিজয় ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে।[১৯]

ভীত সন্ত্রস্ত পাকিস্তানী সৈন্যরা জনতার মহূর্মুহূ শ্লোগানের ফলে আরও আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত শত্রুসৈন্যরা আরও সৈন্য পাঠিয়ে তাদেরকে রক্ষা করার জন্য অনুরোধবার্তা পাঠাতে থাকে। কিন্তু তাদের প্রত্যাশিত সাহায্য আসেনি। ১ এপ্রিল ৭৫ জন পাকিস্তানী সৈন্যসহ মেজর শোয়েব পলায়ন করার চেষ্টা করেন। কিন্তু ক্রুদ্ধ জনতা তাদের সবাইকে হত্যা করে।

দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গলকে জয়দেবপুরে মোতায়েন করা হয়েছিল। আলফা কোম্পানি টাঙ্গাইলে এবং চার্লি কোম্পানি ময়মনসিংহে অবস্থান করছিল। ডেল্টা কোম্পানির এক প্লাটুন সৈন্য রাজেন্দ্রপুর অ্যামুনিশন ডিপোতে মোতায়েন ছিল। এক কোম্পানি পাকিস্তানী সৈন্য আগে থেকেই এখানে মোতায়েন করা হয়েছিল। ব্রেভো কোম্পানির এক প্লাটুন সৈন্য গাজীপুর অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরিতে অবস্থান করছিল। ব্যাটালিয়নের অবশিষ্টাংশ সদর দপ্তরসহ জয়দেবপুর রাজবাড়িতে অবস্থিত ছিল। ২৫ মার্চ টিক্কা খান নবনিযুক্ত কমান্ডিং

১৮. মেজর রফিকুল ইসলাম, বীর উত্তম, *লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে* (ঢাকা ১৯৮১),১২৪।

১৯. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১২৫-১২৮;আরও দেখুন, *Hindustan Standard*, Calcutta, 4 April, 1971.

অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল রকিবকে আরও এক কোম্পানি সৈন্য গাজীপুর অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরিতে মোতায়েন করতে নির্দেশ দেন। এর ফলে সবার মনে এই সন্দেহ ঘনীভূত হয় যে দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গলের বিভিন্ন কোম্পানিকে বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছে যাতে পাকিস্তানী বাহিনীর বিরুদ্ধে কোন সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারা না যায়। টিক্কা খানের নির্দেশ অনুযায়ী এক কোম্পানি সৈন্য গাজীপুরে প্রেরণ করা হয়।[২০]

ঢাকার গণহত্যার একজন প্রত্যক্ষদর্শী ২৭ মার্চ জয়দেবপুরে এসে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বর্বরোচিত হামলার বর্ণনা দেন। এ ভয়ঙ্কর কাহিনী শুনে দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের উপ-অধিনায়ক মেজর শফিউল্লাহ বিদ্রোহ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ব্যাটালিয়নের বাকী অংশকে সঙ্গে নিয়ে তিনি ময়মনসিংহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তিনি ময়মনসিংহে ব্যাটালিয়নের বিচ্ছিন্ন দলসমূহকে একত্রিত করতে সচেষ্ট হন। ২৯ মার্চ দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল ময়মনসিংহে পৌঁছে। ময়মনসিংহে অবস্থিত দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গলের এক কোম্পানি সৈন্যকে পাকবাহিনী আক্রমণ করলে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়।

মেজর শফিউল্লাহ ইপিআর সৈন্য ও পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়ে অয়্যারলেস বার্তা প্রেরণ করেন। এ সময় তিনি ঢাকা আক্রমণের পরিকল্পনা করেন। ৩১ মার্চ তিনি মেজর খালেদ মোশাররফের নিকট থেকে নিম্নবর্ণিত বার্তা পান : "ঢাকা অভিযান করলে দেওয়ালে মাথা ঠুকতে হবে। আমরা ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমা এবং সিলেটের কিছু অংশ মুক্ত করেছি। ঢাকা আক্রমণের পূর্বে আমাদের যৌথভাবে সম্পূর্ণ এলাকা মুক্ত করা সমীচীন হবে। আমি ইতিমধ্যে ভারতীয় বি.এস.এফ.-এর অফিসারদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি এবং তাঁরা আমাদেরকে সাহায্য করতে সম্মত হয়েছেন। আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করতে পারলাম না। কারণ আমাকে বি.এস.এফ-এর ব্রিগেডিয়ার পান্ডের সঙ্গে দেখা করতে হবে। তিনি আমাদেরকে সহায়তা করার অঙ্গীকার করেছেন।"[২১] মেজর শফিউল্লাহ্ এ বার্তাটি পাওয়ার পর ঢাকা আক্রমণ স্থগিত করেন।

মেজর খালেদ কুমিল্লা সেনানিবাসে ৫৭ ব্রিগেডের ব্রিগেড মেজর ছিলেন। তাঁকে চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গলের উপ-অধিনায়ক হিসেবে বদলি করা হয় এবং তিনি ২৩ মার্চ তাঁর নতুন কর্মস্থলে যোগদান করেন। চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গলের কমান্ডিং অফিসার ছিলেন একজন পাকিস্তানী অফিসার লেঃ কর্নেল খিজির হায়াত। খালেদকে ২৪ মার্চ আলফা কোম্পানিসহ শমসেরনগরে ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীদের মোকাবিলা করার জন্য শমসেরনগর যেতে নির্দেশ দেওয়া হয়। এই ব্যাটালিয়নের চার্লি এবং ডেল্টা কোম্পানি পূর্ব থেকেই বেসামরিক প্রশাসনের সহায়তায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অবস্থান করছিল। চার্লি কোম্পানির

২০. Shafiullah, *Bangladesh at War*, 25-26.
২১. পূর্বোক্ত, 53.

অধিনায়ক ছিলেন বাঙালি মেজর শাফায়াত জামিল এবং একজন পাকিস্তানী মেজর সাদেক নেওয়াজ ডেল্টা কোম্পানীর অধিনায়ক ছিলেন।

সাধারণত ব্যাটেলিয়নের উপ-অধিনায়ককে কোম্পানির অধিনায়কত্ব দেওয়া হয় না। খালেদকে বলা হয় যে ৩১ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের এক কোম্পানি ও ইপিআর-এর এক কোম্পানি সৈন্য তাঁর সঙ্গে শীঘ্রই যোগ দেবে। পরবর্তীকালে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে খালেদ ও তাঁর সঙ্গের বাঙালি সৈন্যদের বিচ্ছিন্ন পাহাড়ি এলাকায় হত্যা করার জন্য চক্রান্তমূলকভাবে শমসেরনগর পাঠানো হয়।

২৭ মার্চ সকাল দশটায় খিজির হায়াত অফিসারদের সঙ্গে এক সভায় মিলিত হন। এ সময় মেজর শাফায়াত জামিল, ক্যাপ্টেন হারুন, ক্যাপ্টেন কবীর ও অন্যান্য বাঙালি সৈন্যরা বিদ্রোহ করে এবং পাকিস্তানী অফিসার ও সৈন্যদের গ্রেফতার করে। খালেদ বেলা ১১টায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌঁছেন এবং ব্যাটেলিয়নের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন।

প্রথম ইস্ট বেঙ্গল যশোর সেনানিবাসে অবস্থিত ছিল। ২৫ মার্চ ব্যাটালিয়নটি যশোর সেনানিবাস থেকে ১৩ মাইল দূরে জগদীশপুর চৌগাছায় প্রশিক্ষণরত ছিল। বাঙালি কমান্ডিং অফিসার লেঃ কর্নেল রেজাউল জলিল ১০৭ ব্রিগেডের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার এস. এ. আর. দুররানীর আদেশে ২৯ মার্চ রাত ১১টায় যশোর সেনানিবাসে ফিরে আসেন। পরদিন সকাল আটটায় ব্রিগেডিয়ার দুররানী ব্যাটালিয়নে আসেন এবং অস্ত্রাগারের চাবি নিজ হাতে নিয়ে ব্যাটালিয়নটিকে নিরস্ত্র করতে সচেষ্ট হয়। ব্রিগেডিয়ার দুররানী চলে যাওয়া মাত্র বাঙালি সৈন্যরা অস্ত্রাগার ভেঙ্গে অস্ত্র ও গোলাবারুদ দখল করে নেয়। ২৫ বেলুচ, ২৭ বেলুচ ও ২২ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স তিন দিক থেকে এই ব্যাটালিয়নকে আক্রমণ করে। চতুর্থ দিক থেকে গোলন্দাজ, কামান ও মর্টারের গোলা বর্ষণ করা হয়। এই ব্যাটালিয়নের প্রায় সকল সৈন্যকে পাকিস্তানীরা হত্যা করে। লেঃ হাফিজ ও ১৫০ জন বাঙালি সৈন্য কোনভাবে প্রাণে বেঁচে যান এবং খিতিবদিয়ার পথ ধরে সেনানিবাস থেকে বেরিয়ে আসেন। দ্বিতীয় লেফটেন্যান্ট আনোয়ার (বাঙালি) এই যুদ্ধে নিহত হন।

সৈয়দপুর সেনানিবাসে তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল অবস্থিত ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসার লেঃ কর্নেল ফজল করিম এই ব্যাটালিয়নের কমান্ডিং অফিসার ছিলেন। বাঙালি অফিসার মেজর নিজামউদ্দিনের নেতৃত্বে আলফা ও ব্রোভো কোম্পানি ঘোড়াঘাটে মোতায়েন ছিল। এক প্লাটুন সৈন্য লেফটেন্যান্ট মোখলেসের নেতৃত্বে গাইবান্ধায় ভি.এইচ.এফ. স্টেশনে প্রহরায় নিয়োজিত ছিল। অবাঙালি অফিসার ক্যাপ্টেন শাফায়াত হোসেন ডেল্টা কোম্পানিসহ পার্বতীপুরে অবস্থান করছিল। বাঙালি অফিসার ক্যাপ্টেন আশরাফ-এর অধিনায়কত্বে চার্লি কোম্পানি ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তরে সৈয়দপুর সেনানিবাসে অবস্থান করছিল। অপর একজন বাঙালি অফিসার লেফটেন্যান্ট আনোয়ার কোয়ার্টার মাস্টার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ২৬/২৭ মার্চ মধ্যরাতে ২৬ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল

আক্রমণ করে। সারারাত্রি প্রচণ্ড যুদ্ধ চলে। আনোয়ার ডেল্টা কোম্পানি এবং সদর দপ্তর কোম্পানিসহ পার্বতীপুরে চলে যান। চার্লি কোম্পানি ব্যতীত সব সৈন্য ফুলবাড়ি এলাকায় সমবেত হয়। শত্রুর অগ্রাভিযান বিলম্বিত করার লক্ষ্যে আশরাফ রংপুর-বগুড়া মহাসড়কে প্রতিরক্ষা অবস্থান গ্রহণ করেন। মেজর নিজাম সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছিলেন। ফুলবাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে তিনি পাকিস্তানীদের সাথে যোগ দেয়ার প্রয়াস পান। বাঙালি সৈন্যরা এ কারণে তাঁকে হত্যা করে। প্রাথমিক প্রতিরোধযুদ্ধের পর ব্যাটালিয়নটি হিলি সীমান্তে পৌঁছে।

রাজশাহীতে ২৫ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট অবস্থিত ছিল। লেঃ কর্নেল শাফকাত বেলুচ এই ব্যাটালিয়নের কমান্ডিং অফিসার ছিলেন। মেজর আসলাম (পাকিস্তানী)-এর নেতৃত্বে এক কোম্পানি সৈন্য পাবনা অভিমুখে অগ্রসর হয়। দু'দিন পর পাকিস্তানীরা মর্টার ও মেশিনগানের সাহায্যে রাজশাহী পুলিশ লাইন আক্রমণ করে। ২৮ মার্চ বিকেল ৩টায় পাকিস্তানী সৈন্যরা আকস্মিকভাবে পুলিশ লাইনে আক্রমণ চালিয়ে মুষ্টিমেয় কয়েকজন বাঙালিকে হত্যা করে। ঢাকায় নির্বিচারে গণহত্যার খবর দাবানলের মতো রাজশাহীতে ছড়িয়ে পড়ে। সারদা ক্যাডেট কলেজের এ্যাডজুটেন্ট ক্যাপ্টেন রশীদ ২৬ মার্চ বিদ্রোহ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পাকিস্তানী সৈন্যরা পাবনায় ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করে এবং নর্থ বেঙ্গল সুগার মিলের ম্যানেজার ও শ্রমিকদের নৃশংসভাবে হত্যা করে। হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক, পুলিশ ও ইপিআর সৈন্য পাবনা অভিমুখে অগ্রসর হয়। পাকিস্তানী অফিসার সহ ৪০ জন পলায়নপর পাকিস্তানী সৈন্য নিহত হয়।

ক্যাপ্টেন রশিদ নবাবগঞ্জে অবস্থানরত ইপিআর-এর বাঙালি অফিসার ক্যাপ্টেন গিয়াসের সঙ্গে এবং নওগাঁয় অবস্থিত মেজর নাজমুল হকের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানী অবস্থান আক্রমণ করে এবং রাজশাহী শহর করায়ত্ত করে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ৫৭ ব্রিগেড ৮ এপ্রিল নগরবাড়ি হয়ে পাবনা ও রাজশাহী অভিমুখে অগ্রসর হয়। তারা গণহত্যা, অগ্নিসংযোগ ও ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হয়। ক্যাপ্টেন গিয়াস ও ক্যাপ্টেন রশীদ তাঁদের অধীনস্থ সৈন্যসহ ১৪ এপ্রিল ভারতীয় সীমান্ত অতিক্রম করে। এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত সারা বাংলাদেশব্যাপী প্রতিরোধযুদ্ধ অব্যাহত থাকে।[২২]

## মুক্তিবাহিনী পুনর্গঠন

মুক্তিবাহিনীর ইউনিটগুলো সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের নিরাপদ এলাকায় প্রবেশ করে। মুক্তিবাহিনীর পশ্চাদপসরণের মূল কারণ ছিল দু'টি। প্রথম, শত্রুবাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র ও প্রশিক্ষণ তুলনামূলকভাবে উন্নত ছিল এবং দ্বিতীয়, শত্রুবাহিনী সুসংগঠিত ছিল এবং

২২. রাজশাহী যুদ্ধ সম্পর্কে ব্রিগেডিয়ার গিয়াসউদ্দীন আহমেদ, বীর বিক্রম, পিএসসি -এর সঙ্গে দীর্ঘ সাক্ষাৎকার।

আধুনিক স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রশস্ত্র ছাড়াও গোলন্দাজ, সাঁজোয়া ও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার অধিকারী ছিল। এ সময় ভারতে অবস্থানকারী বিচ্ছিন্ন মুক্তিযোদ্ধাদের সমন্বিত ও একক কমান্ডের অধীনে এনে সুসংগঠিত বাহিনীতে পরিণত করার প্রয়োজন অনুভূত হয়।

মুক্তিবাহিনীকে সুসংগঠিত করার প্রথম উদ্যোগ হিসেবে ৪ এপ্রিল মুক্তিবাহিনীর সিনিয়র অফিসারগণ তেলিয়াপাড়ায় সমবেত হন। ইতিপূর্বে মেজর শফিউল্লাহ্ তাঁর অধীনস্থ দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গলের সৈন্যদের নিয়ে কিশোরগঞ্জ থেকে মেঘনার পূর্ব এলাকায় অবস্থান গ্রহণ করেন। তেলিয়াপাড়া একটি ছোট পাহাড়ি চা-বাগান এলাকা এবং পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে ছোটখাট অপারেশন চালানোর উপযোগী নিরাপদ ভূখণ্ড।

তেলিয়াপাড়ায় অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় যেসব সিনিয়র অফিসার উপস্থিত ছিলেন তাঁরা হলেন কর্ণেল এম. এ. জি ওসমানী, লেঃ কর্নেল এম. এ. রব, লেঃ কর্নেল সালাহউদ্দীন মোহাম্মদ রেজা, মেজর কাজী নূরুজ্জামান, মেজর খালেদ মোশাররফ, মেজর নূরুল ইসলাম, মেজর শাফায়াত জামিল, মেজর মঈনুল হোসেন চৌধুরী ও অন্যান্য। এই সভায় কমান্ডারদের মধ্যে অপারেশনাল এলাকা ভাগ করে দায়িত্ব বণ্টন করা হয়। সিলেট-ব্রাহ্মণবাড়িয়া এলাকার দায়িত্ব মেজর শফিউল্লাকে দেওয়া হয়। কুমিল্লা-নোয়াখালী এলাকার দায়িত্ব দেওয়া হয় মেজর খালেদ মোশাররফকে। মেজর জিয়ার উপর অর্পিত হয় চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের দায়িত্ব এবং মেজর আবু ওসমান চৌধুরীকে কুষ্টিয়া-যশোর এলাকার দায়িত্ব দেওয়া হয়। মেজর জিয়াউর রহমান এই সভায় উপস্থিত ছিলেন না। তিনি ২ এপ্রিল তেলিয়াপাড়ায় মেজর শফিউল্লাহ্ ও মেজর খালেদের সঙ্গে দেখা করে কিছু নিয়মিত সৈন্য তাঁর এলাকায় পাঠানোর অনুরোধ করেন। তাঁর অনুরোধ অনুযায়ী দুই কোম্পানি সৈন্য চট্টগ্রাম এলাকায় পাঠানো হয়।[২৩]

এই সভায় সর্বসম্মতভাবে কর্নেল এম. এ. জি ওসমানীকে মুক্তিবাহিনীর অধিনায়কত্ব করার আহ্বান জানানো হয়। বিভিন্ন অপারেশন এলাকা বিভাজন এবং অধিনায়কদের উপর এগুলোর দায়িত্ব বণ্টনের ফলে মুক্তিবাহিনীর সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে উঠে। এর ছয়দিন পরে ১০ এপ্রিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার গঠিত হয়। তাজউদ্দীন আহমদ প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপ-রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব প্রদান করে রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব প্রদান করা হয়। মন্ত্রিসভায় অন্য মন্ত্রণালয়সমূহের দায়িত্ব নিম্নোক্তভাবে বণ্টন করা হয় : খন্দকার মোশতাক আহমেদকে আইন, সংসদীয় ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামানকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং মনসুর আলীকে অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। কর্নেল এম. এ. জি. ওসমানীকে মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিয়োগ করা

২৩. Shafiullah, *Bangladesh at War*, 71.

হয়। তাজউদ্দীন আহমদ ১০ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রথম বেতারভাষণে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠনের কথা ঘোষণা করেন। 'মুক্তিবাহিনী' শব্দটিও তাঁর ঐ ভাষণে প্রথম উচ্চারিত হয়।[২৪]

১০ এপ্রিল, ১৯৭১ তাজউদ্দীন আহমদ ৪ জন আঞ্চলিক অধিনায়ক নিয়োগের বিষয় ঘোষণা করেন। এঁরা হলেন মেজর শফিউল্লাহ, মেজর জিয়াউর রহমান, মেজর খালেদ মোশাররফ ও মেজর ওসমান। পূর্বে উল্লেখিত এলাকাসমূহ এই অধিনায়কদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। পরদিন, ১১ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী আরও ৩ জন আঞ্চলিক অধিনায়ক নিয়োগ করেন। মেজর নাজমুল হকের উপর দিনাজপুর-রাজশাহী-পাবনা এলাকা, মেজর জলিলের উপর বরিশাল-পটুয়াখালী এলাকা এবং ক্যাপ্টেন নওয়াজেশের উপর রংপুর এলাকার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। এসব এলাকাকে পরবর্তীকালে সেক্টর হিসেবে অভিহিত করা হয়। ১০ এপ্রিল থেকে ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত মুজিবনগরে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বাংলাদেশকে এগারোটি সেক্টরে বিভক্ত করা হয় এবং সেক্টরকে কমান্ডার নিয়োগ করা হয়। এসব সেক্টরকে অপারেশনের স্বার্থে নিম্নবর্ণিতভাবে বিভিন্ন সাব-সেক্টরে বিভক্ত করা হয়[২৫] :

**এক নম্বর সেক্টর** : চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের পশ্চিম অঞ্চল এর অন্তর্ভুক্ত। শুভপুর ব্রিজ ও ফেনী নদী পর্যন্ত এই সেক্টর বিস্তৃত ছিল।

**(ক) সদর দপ্তর** : সাবরুম

**(খ) সেক্টর কমান্ড :**

(১) মেজর জিয়াউর রহমান, ১৯৭১ সালের জুন মাস পর্যন্ত।

(২) ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলাম, জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত।

**(গ) সাব-সেক্টর :**

(১) ঋষিমুখ সাব-সেক্টর : ক্যাপ্টেন সামসুল ইসলাম অধিনায়ক ছিলেন।

(২) শ্রীনগর সাব-সেক্টর : ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান এবং ক্যাপ্টেন মাহফুজুর রহমান পর্যায়ক্রমে এই সাব-সেক্টরটির অধিনাযকত্ব করেন।

(৩) মনুঘাট সাব-সেক্টর : এই সাব-সেক্টরের নেতৃত্ব দেন ক্যাপ্টেন মাহফুজুর রহমান।

(৪) তবলছড়ি সাব-সেক্টর : সুবেদার আলী হোসেন এই সাব-সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন।

২৪. ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম, *মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি*, কাগজ প্রকাশনী ১৯৯১, ৪৫।

২৫. Shafiullah, *Bangladesh at War*, 205-209.

(৫) ডিমাগিরি সাব-সেক্টর : একজন সুবেদার এই সাব-সেক্টরটির নেতৃত্ব দেন।

**(ঘ) বেসামরিক প্রশাসন উপদেষ্টা**

আবদুল মান্নান, এম.এন.এ.*

**দুই নম্বর সেক্টর :** সেক্টর ২ এর অন্তর্ভূক্ত ছিল নোয়াখালী, ফরিদপুরের অংশবিশেষ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমা বাদ দিয়ে কুমিল্লা এবং ঢাকার কিছু অংশ। সীমান্ত এলাকা বিস্তৃত ছিল ফেনী নদী বাদে আখাউড়া পর্যন্ত।

**(ক) সদর দপ্তর :** মেলাঘর

**(খ) সেক্টর কমান্ড :** মেজর খালেদ মোশাররফ অক্টোবর ১৯৭১-এর তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত, খালেদের অনুপস্থিতিতে নিম্নবর্ণিত অফিসারবৃন্দ অক্টোবর ১৯৭১-এর তৃতীয় সপ্তাহ থেকে এই সেক্টরের দায়িত্ব পালন করেন, কিন্তু দাপ্তরিকভাবে তাদেরকে সেক্টর কমান্ডারের দায়িত্ব প্রদান করা হয় নি। ক্যাপ্টেন সালেক চৌধুরী সেক্টর সদর দপ্তরের সবচেয়ে জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা হিসেবে সেক্টর কমান্ডারের দায়িত্ব পান। ক্যাপ্টেন এ. টি. এম. হায়দার খালেদের অনুপস্থিতিতে ঢাকা শহর এলাকায় গেরিলা অপারেশন পরিচালনা করেন।

**(গ) সাব-সেক্টর :**

(১) গঙ্গাসাগর, আখাউড়া ও কসবা সাব-সেক্টর : ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিন এই সাব-সেক্টরের নেতৃত্ব দেন।

(২) মন্দভাগ সাব-সেক্টর : এই সাব-সেক্টরের নেতৃত্ব দেন ক্যাপ্টেন গাফফার।

(৩) শালদানদী সাব-সেক্টর : মেজর আবদুস সালেক চৌধুরী ছিলেন এই সাব-সেক্টরের অধিনায়ক ।

(৪) মতিনগর সাব-সেক্টর : লেফটেন্যান্ট দিদারুল আলম এই সাব-সেক্টরটির নেতৃত্ব দেন।

(৫) নির্ভয়পুর সাব-সেক্টর : ক্যাপ্টেন আকবর এবং লেফটেন্যান্ট মাহবুব পর্যায়ক্রমে এই সাব -সেক্টরের অধিনায়কত্ব করেন।

(৬) রাজনগর সাব-সেক্টর : এই সাব-সেক্টরটির অধিনায়কত্ব করেন পর্যায়ক্রমে ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম, ক্যাপ্টেন শহীদ এবং লেফটেন্যান্ট ইমামুজ্জামান।

**(ঘ) বেসামরিক প্রশাসন উপদেষ্টা :**

১। নুরুল হক এম.এন.এ*

২। প্রফেসর খোরশেদ আলম, এম.এন.এ.

---

* এম. এন. এ. অর্থ মেম্বার অব ন্যাশনাল এসেম্ব্লি অর্থাৎ জাতীয় সংসদ সদস্য ।

**তিন নম্বর সেক্টর :** সেক্টর নং ৩-এর অন্তর্ভূক্ত ছিল সিলেট জেলার অংশবিশেষ, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল ও ঢাকা। সীমান্ত এলাকা বিস্তৃত ছিল আখাউড়া থেকে চোরামনকাঠি পর্যন্ত।

**(ক) সদর দপ্তর :** সিমনা

**(খ) সেক্টর কমান্ড :**

১। মেজর কে.এম. শফিউল্লাহ্ পিএসসি —সেপ্টেম্বর ১৯৭১ পর্যন্ত।

২। ক্যাপ্টেন এ.এন.এম. নূরুজ্জামান*— অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর ১৯৭১ পর্যন্ত

**(গ) সাব-সেক্টর :**

(১) আশ্রমবাড়ি সাব-সেক্টর : ক্যাপ্টেন আজিজ এবং ক্যাপ্টেন এজাজ এই সাব-সেক্টরটির অধিনায়ক ছিলেন।

(২) বাঘাইবাড়ি সাব-সেক্টর : ক্যাপ্টেন আজিজ এবং ক্যাপ্টেন এজাজ এই সাব-সেক্টরটিরও নেতৃত্ব দেন।

(৩) হাতকাটা সাব-সেক্টর : ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান ছিলেন অধিনায়ক।

(৪) সিমনা সাব-সেক্টর : ক্যাপ্টেন মতিন এই সাব-সেক্টরটির অধিনায়কত্ব করেন।

(৫) পঞ্চবটী সাব-সেক্টর : ক্যাপ্টেন নাসিম ছিলেন সাব-সেক্টটির অধিনায়ক।

(৬) মনতলা এবং বিজয়নগর সাব-সেক্টর : ক্যাপ্টেন এম.এস. এ. ভূঁইয়া উভয় সাব-সেক্টরের দায়িত্ব পালন করেন।

(৭) কালাছড়া সাব-সেক্টর : লেফটেন্যান্ট মজুমদার ছিলেন এই সাব-সেক্টরটির কমান্ডার।

(৮) কলকলিয়া সাব-সেক্টর : লেফটেন্যান্ট মোরশেদ ছিলেন এই সাব-সেক্টরের কমান্ডার।

(৯) বামুটিয়া সাব-সেক্টর : লেফটেন্যান্ট সাইয়িদ এর অধিনায়ক ছিলেন।

**(ঘ) বেসামরিক প্রশাসন উপদেষ্টা :**

(১) প্রফেসর খোরশেদ আলম, এম.এন.এ.

(২) লুৎফুল হাই সাচ্চু, এম.পি.এ.**

* ১৯৭০ সালের পূর্বে তিনি সেনাবাহিনী থেকে অবসব গ্রহণ করেন।

** এম. পি. এ অর্থ মেম্বার অব প্রভিন্সিয়াল এসেম্বলি অর্থাৎ প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য।

**চার নম্বর সেক্টর :** সেক্টর ৪ সিলেটের পূর্বাঞ্চল নিয়ে গঠিত। সীমান্ত এলাকা বিস্তৃত ছিল চুরামনকাঠি থেকে জকিগঞ্জ পর্যন্ত।

**(ক) সদর দপ্তর :** করিমগঞ্জ

**(খ) সেক্টর কমান্ড :** মেজর সি.আর দত্ত।

(গ) সাব-সেক্টর

১) জালালপুর সাব-সেক্টর : মাসুদুর রব শাদী, একজন বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধা এই সাব-সেক্টরটির নেতৃত্ব দেন।

২) বড়পুঞ্জী সাব-সেক্টর : ক্যাপ্টেন আবদুর রব অধিনায়ক ছিলেন।

(৩) আমলাশিদ সাব-সেক্টর : এই সাব-সেক্টরের নেতৃত্বে ছিলেন লেফটেন্যান্ট জহীর।

৪) কুকীতল সাব-সেক্টর : ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট কাদের এবং ক্যাপ্টেন শরীফুল হক পর্যায়ক্রমে এর নেতৃত্ব দেন।

(৫) কৈলাশপুর সাব-সেক্টর : লেফটেন্যান্ট ওয়াকীউজ্জামান ছিলেন এর অধিনায়ক।

(৬) কমলাপুর সাব-সেক্টর : ক্যাপ্টেন এনাম এই সাব-সেক্টরটির নেতৃত্ব দেন।

**(গ) বেসামরিক প্রশাসন উপদেষ্টা :** দেওয়ান ফরীদ গাজী, এম.এন.এ.

**পাঁচ নম্বর সেক্টর :** সিলেটের উত্তরাঞ্চল এই সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সীমান্ত এলাকা বিস্তৃত ছিল করিমগঞ্জ-জাকীগঞ্জ থেকে টেকেরঘাট পর্যন্ত। এই সেক্টর আগস্ট ১৯৭১-এর শেষ থেকে কার্যকর হয়।

**ক) সদর দপ্তর :** ডাউকী

**(খ) সেক্টর অধিনায়ক :** মেজর মীর শওকত আলী

**(গ) সাব-সেক্টর**

(১) মুক্তাপুর সাব-সেক্টর : সুবেদার নাজির হোসেন ছিলেন সাব-সেক্টর অধিনায়ক।

(২) ডাউকী সাব-সেক্টর : এই সাব-সেক্টরের অধিনায়ক ছিলেন সুবেদার মেজর বি.আর. চৌধুরী।

(৩) শেলা সাব-সেক্টর : ক্যাপ্টেন হেলাল এই সাব-সেক্টরের অধিনায়ক ছিলেন।

(৪) ভোলাগঞ্জ সাব-সেক্টর : লেফটেন্যান্ট তাহেরুদ্দীন আখঞ্জী ছিলেন এর অধিনায়ক।

(৫) বালাট সাব-সেক্টর : ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দীন, এনামুল হক চৌধুরী এবং সুবেদার আবদুল গণি পর্যায়ক্রমে এই সাব সেক্টরের নেতৃত্ব দেন।

(৬) বড়ছড়া সাব-সেক্টর : এই সাব-সেক্টরের নেতৃত্ব দেন ক্যাপ্টেন মুসলিম উদ্দীন।

**(ঘ) বেসামরিক প্রশাসন উপদেষ্টা :**

(২) আবদুল হক, এম. এন. এ.

(৩) দেওয়ান ওবায়দুর রেজা চৌধুরী. এম. এন. এ.

**ছয় নম্বর সেক্টর :** ছয় নম্বর সেক্টরের অন্তর্গত ছিল রংপুর এবং দিনাজপুর জেলা। সীমান্ত এলাকা বিস্তৃত ছিল রংপুরের ভুরুঙ্গামারী থেকে দিনাজপুরের হিলি পর্যন্ত।

**(ক) সদর দপ্তর :** তেঁতুলিয়া।

**(খ) সেক্টর কমান্ড :** উইং কমান্ডার এম.কে. বাশার।

**(গ) সাব-সেক্টর :**

(১) ভজনপুর সাব-সেক্টর : ক্যাপ্টেন নজরুল, স্কোয়াড্রন লীডার সদরউদ্দীন এবং ক্যাপ্টেন শাহরিয়ার এই সাব-সেক্টরের নেতৃত্ব দেন।

(২) পাটগ্রাম সাব-সেক্টর : ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান ছিলেন এর অধিনায়ক।

(৩) সাহেবগঞ্জ সাব-সেক্টর : ক্যাপ্টেন নওয়াজিশউদ্দীন এই সাব-সেক্টরের নেতৃত্ব দেন।

(৪) মোঘলহাট সাব-সেক্টর : ক্যাপ্টেন দেলোয়ার ছিলেন এর অধিনায়ক।

(৫) চিলাহাটী সাব-সেক্টর : ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট ইকবাল এই সাব-সেক্টরটির নেতৃত্ব দেন।

**(ঘ) বেসামরিক প্রশাসন উপদেষ্টা :**

(২) মতিউর রহমান, এম. এন. এ.

(৩) ফজলুল করিম, এম. পি. এ.

**সাত নম্বর সেক্টর :** এই সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত ছিল রাজশাহী, বগুড়া এবং পাবনা জেলা। সীমান্ত এলাকা বিস্তৃত ছিল পার্বত্য এলাকা বাদে হার্ডিঞ্জ ব্রীজ পর্যন্ত।

**(ক) সদর দপ্তর :** তরঙ্গপুর।

**(খ) সেক্টর কমান্ড :**

(১) মেজর নাজমুল হক—জুলাই ১৯৭১ পর্যন্ত।

(২) মেজর কাজী নুরুজ্জামান*— আগস্ট ১৯৭১ থেকে শেষ পর্যন্ত।

**(গ) সাব-সেক্টর :**

১) মালন সাব-সেক্টর : একজন সুবেদার এই সাব-সেক্টরের অধিনায়ক ছিলেন।

(২) তপন সাব-সেক্টর : মেজর নাজমুল হক প্রাথমিকভাবে এই সাব-সেক্টরের দায়িত্ব পালন করেন, পরে একজন সুবেদার অধিনায়ক হন।

(৩) মেহেদীপুর সাব-সেক্টর : ক্যাপ্টেন মহীউদ্দীন জাহাঙ্গীর অধিনায়ক ছিলেন ।

(৪) হামজাপুর সাব-সেক্টর : ক্যাপ্টেন ইদ্রীস এই সাব-সেক্টরের নেতৃত্ব দেন।

(৫) আঙ্গিনাবাদ সাব-সেক্টর : একজন বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন অধিনায়ক।

(৬) শেখপাড়া সাব-সেক্টর : ক্যাপ্টেন রশীদ ছিলেন কমান্ডার।

(৭) ঠোকরাবাড়ী সাব-সেক্টর : সুবেদার মোয়াজ্জেম ছিলেন অধিনায়ক।

(৮) লালগোলা সাব-সেক্টর : ক্যাপ্টেন গিয়াস উদ্দীন চৌধুরী এই সাব-সেক্টরটির অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেন।

(৯) ভোলাহাট সাব-সেক্টর : লেফটেন্যান্ট রফিকুল ইসলাম অধিনায়ক ছিলেন ।

**(ঘ) বেসামরিক প্রশাসন উপদেষ্টা :**

(১) আজিজুর রহমান, এম.এন.এ.

(২) আবদুস সালাম।

**আট নম্বর সেক্টর :** আট নম্বর সেক্টরের অন্তর্গত ছিল কুষ্টিয়া, যশোর, অংশত ফরিদপুর এবং খুলনা। সীমান্ত এলাকা বিস্তৃত ছিল হার্ডিঞ্জ ব্রিজ থেকে কালীগঞ্জ পর্যন্ত।

**(ক) সদর দপ্তর :** কল্যাণী।

**(খ) সেক্টর কমান্ড:**

(১) মেজর আবু ওসমান চৌধুরী—আগস্ট ১৯৭১ পর্যন্ত।

(২) মেজর এম.এ. মঞ্জুর—সেপ্টেম্বর ১৯৭১ থেকে শেষ পর্যন্ত।

**(গ) সাব-সেক্টর :**

(১) বয়রা সাব-সেক্টর : ক্যাপ্টেন নুরুল হুদা ছিলেন অধিনায়ক।

(২) হাকিমপুর সাব-সেক্টর : ক্যাপ্টেন শফীউল্লাহ্ অধিনায়ক ছিলেন।

(৩) ভোমরা সাব-সেক্টর : ক্যাপ্টেন সালাহ্ উদ্দীন ছিলেন অধিনায়ক

১৯৭১ সালের পূর্বে তিনি সেনাবহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

(৪) লালবাজার সাব-সেক্টর : ক্যাপ্টেন এ. আর. আজম চৌধুরী এই সাব-সেক্টরটির নেতৃত্ব দেন।

(৫) বানপুর সাব-সেক্টর : ক্যাপ্টেন মুস্তাফিজুর রহমান এর নেতৃত্ব দেন।

(৬) বেনাপোল সাব-সেক্টর : ক্যাপ্টেন তৌফিক এলাহী চৌধুরী এই সাব-সেক্টরের নেতৃত্ব দেন।

(৭) শিকারপুর সাব-সেক্টর : ক্যাপ্টেন আবদুল হালিম অধিনায়ক ছিলেন।

**নয় নম্বর সেক্টর :** নয় নম্বর সেক্টরের অন্তর্গত ছিল খুলনা, বরিশাল এবং পটুয়াখালী। সীমান্ত এলাকা বিস্তৃত ছিল কালীগঞ্জ থেকে সুন্দরবন পর্যন্ত।

**(ক) সদর দপ্তর :** টাকী।

**(খ) সেক্টর কমাণ্ড :** মেজর এম.এ. জলিল।

**(গ) সাব-সেক্টর :**

(১) টাকী সাব-সেক্টর : মেজর জলিল ছিলেন এই সেক্টরের অধিনায়ক ।

(২) হিঙ্গলগঞ্জ সাব-সেক্টর : ক্যাপ্টেন নুরুল হুদা এর অধিনায়ক ছিলেন।

(৩) শমসেরনগর সাব-সেক্টর : ফ্লাইট সার্জেন্ট সলিমুল্লাহ্ এই সাব-সেক্টরটির অধিনায়ক ছিলেন।

**(ঘ) বেসামরিক প্রশাসন উপদেষ্টা :**

(২) এম.এ.গফুর, এম.এন.এ.

(৩) নুরুল ইসলাম মঞ্জুর, এম.এন.এ.

**দশ নম্বর সেক্টর :** দশ নম্বর সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের পূর্বাঞ্চল থেকে টেকনাফ পর্যন্ত। এই সেক্টর কখনই অপারেটিভ ছিল না। পরে বিশেষ নৌ-কমান্ডো অপারেশন এলাকা নদীপথ দশ নম্বর সেক্টরের এলাকা হিসেবে চিহ্নিত হয়।

**এগারো নম্বর সেক্টর :** এগারো নম্বর সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত ছিল ময়মনসিংহ জেলার উত্তরাংশ এবং টাঙ্গাইল। সীমান্ত এলাকা বিস্তৃত ছিল টেকেরঘাট থেকে রাউমারী পর্যন্ত। এই সেক্টর কার্যকর ছিল আগস্টের শেষ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত।

**(ক) সদর দপ্তর :** তুরা।

**(খ) সেক্টর কমান্ড :** মেজর আবু তাহের আগস্টের শেষ থেকে নভেম্বর ১৯৭১ পর্যন্ত। ১৯৭১ সালের নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে যখন তাহের আহত হন, স্কোয়াড্রন লীডার হামিদুল্লাহ এই সেক্টরের সিনিয়র অফিসার হিসেবে সেক্টর কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি পরে ঢাকার পথে সৈন্যদলকে নেতৃত্ব দেন, কিন্তু তিনি সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত হন নি।

**(গ) সাব-সেক্টর :**

(১) মানকারচর সাব-সেক্টর : স্কোয়াড্রন লীডার হামিদুল্লাহ এই সাব-সেক্টরের নেতৃত্ব দেন।

(২) মহেন্দ্রগঞ্জ সাব-সেক্টর : লেফটেন্যান্ট মান্নান অধিনায়ক ছিলেন।

(৩) পুরাখাসিয়া সাব-সেক্টর : লেফটেন্যান্ট হাশেম এই সাব-সেক্টরের অধিনায়ক ছিলেন।

(৪) ঢালু সাব-সেক্টর : লেফটেন্যান্ট তাহের এবং লেফটেন্যান্ট কামাল পর্যায়ক্রমে এই সাব-সেক্টরের নেতৃত্ব দেন।

(৫) রংরা সাব-সেক্টর : ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান ছিলেন অধিনায়ক।

(৬) শিববাড়ী, বাঘমারা এবং মহেশখোলা সাব-সেক্টর : একজন সুবেদার সাব-সেক্টরটির নেতৃত্ব দেন।

**(ঘ) বেসামরিক প্রশাসন উপদেষ্টা :** রফিক উদ্দিন ভুঁইয়া, এম.এন.এ.।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের নবগঠিত প্রবাসী সরকার শতাধিক দেশী-বিদেশী সাংবাদিকের উপস্থিতিতে কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার অন্তর্গত বৈদ্যনাথতলা গ্রামের আম্রকাননে এক শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে প্রথম জনসমক্ষে আত্মপ্রকাশ করেণ। এই স্থানের নামকরণ করা হয় মুজিব নগর। অধ্যাপক ইউসুফ আলী শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। ইপিআর ও পুলিশের একটি সুসজ্জিত দল রাষ্ট্রপতি ও নতুন মন্ত্রীসভাকে গার্ড অব অনার প্রদান করেন। মেজর আবু ওসমান চৌধুরী, ক্যাপ্টেন এ. আর. আজম চৌধুরী, সিভিল সার্ভেন্ট তৌফিক এলাহী চৌধুরী, পুলিশ অফিসার মাহবুব উদ্দিন ও অন্যান্য স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ এই অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন।

সীমান্ত এলাকায় মুক্তিযোদ্ধা নির্বাচন করে প্রাথমিক প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য অসংখ্য যুবশিবির গড়ে উঠে। এসব যুবশিবিরে প্রথাগত যুদ্ধ এবং গেরিলাযুদ্ধ উভয় প্রকার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। পশ্চিম বাংলা, আসাম, বিহার, মেঘালয় এবং ত্রিপুরার রাজ্য সরকার অসংখ্য অভ্যর্থনা কেন্দ্র এবং শরণার্থী শিবির সীমান্ত এলাকায় গড়ে তোলে। ইতিপূর্বে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ২৭ মার্চ[২৬] ভারতীয় লোকসভায় বাঙালি জাতির সংগ্রামের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেন। আতঙ্কগ্রস্ত বাঙালি জনগণ যেন সীমান্ত অতিক্রম করে এসব নিরাপদ শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে সেজন্য ভারতীয় বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বি.এস.এফ.) ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত খুলে দেয়। এসব শিবির থেকে বহু তরুণকে মুক্তিবাহিনীর অর্ন্তভূক্ত করা হয়। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক এবং রাজনৈতিক কর্মীরা মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেয়। আত্মোৎসর্গ ও সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারে

২৬. *Bangladesh Documents,* Volume 1, 672.

প্রস্তুত হাজার হাজার স্বাস্থ্যবান যুবক মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করে। এসব যুবককে চূড়ান্ত যুদ্ধের জন্য শারীরিক ব্যায়ামসহ অস্ত্রশিক্ষা ও যুদ্ধবিদ্যায় প্রশিক্ষণ দিয়ে রণকৌশল ও অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারে পারদর্শী করে তোলা হয়। উপরন্তু পাঁচটি রাজ্যে অনেক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়। ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষকগণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। প্রশিক্ষণ শেষে এসব মুক্তিযোদ্ধাকে বিভিন্ন সেক্টরে নিয়োগ করা হয়। ১২ এপ্রিল থেকে বাংলাদেশ বাহিনীর সদর দপ্তর কাজ শুরু করে। মে মাসে কলকাতায় ৮ নম্বর থিয়েটার রোডে বাংলাদেশ বাহিনীর সদর দপ্তর স্থাপিত হয়।*

২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাঙালি জাতির উপর অতর্কিতভাবে ঝাঁপিয়ে পড়লে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী আসামের ধুবড়ি সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করেন। তিনি পৃথিবীর পরাশক্তিসহ সমস্ত সরকার প্রধানদের কাছে নির্যাতিত বাঙালি জাতির ন্যায়সঙ্গত স্বাধীনতা সংগ্রামে সহায়তা প্রদানের জন্য টেলিগ্রাম প্রেরণ করেন। পরে তিনি নবগঠিত বাংলাদেশ সরকারের উপদেষ্টা কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, কমিউনিস্ট পার্টির মনি সিং, কংগ্রেসের মনোরঞ্জন ধর এবং আওয়ামী লীগের তাজউদ্দীন আহমদ ও খন্দকার মোশতাক আহমদ উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হন। ছাত্র ইউনিয়ন, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর গ্রুপ) ও কমিউনিস্ট পার্টি (মনি সিং) মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে এবং নবগঠিত সরকারকে পূর্ণ সমর্থন দান করে। তাঁরা সীমান্ত এলাকায় বহু যুবশিবির গড়ে তোলেন। হাজার হাজার গেরিলা এসব যুবশিবিরে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করে।

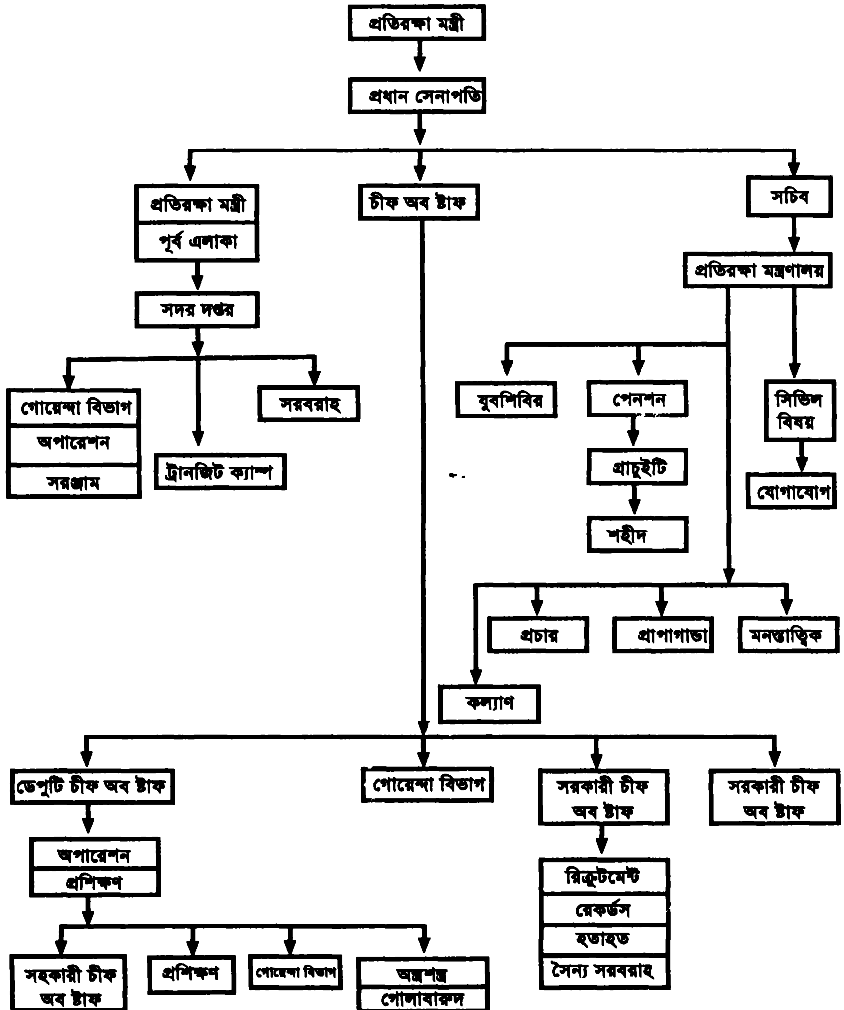
এতদ্ব্যতীত বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করার প্রয়াসে আরও অনেক বাহিনী গড়ে উঠে। এগুলোর মধ্যে টাঙ্গাইলে কাদের বাহিনী. সিরাজগঞ্জে লতিফ মির্জা বাহিনী, ঝিনাইদহে আকবর হোসেন বাহিনী, ফরিদপুরে হেমায়েত বাহিনী, পিরোজপুরে রফিক বাহিনী, বরিশালে কুদ্দুস মোল্লা ও গফুর বাহিনী এবং ময়মনসিংহে আফসার বাহিনী ও আফতাব বাহিনী অন্যতম। এসব বাহিনী নিজস্ব শক্তি ও লোকবলের উপর ভিত্তি করে দেশপ্রেমের সুমহান অঙ্গীকারে গড়ে উঠে এবং পাকিস্তানী সৈন্যদের সঙ্গে অসংখ্য সংঘর্ষে অংশগ্রহণ করে। সর্বহারা পার্টির নেতা সিরাজ সিকদারও দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে তাঁর বাহিনী সংগঠিত করেন।

১৯৭১ সালের ৯ অক্টোবর মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের এক মাইলফলক সৃষ্টি হয়। এদিন এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ বাহিনীর প্রথম ব্যাচের অফিসারদের পাসিং আউট প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, প্রধান সেনাপতি কর্নেল এম. এ. জি. ওসমানী ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ অফিসারবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। মুক্তিবাহিনীর ৬১ জন ক্যাডেটকে যুদ্ধক্ষেত্রে অসীম সাহস ও বীরত্ব

* মুক্তিবাহিনীর সাংগঠনিক কাঠামো পরিশিষ্ট-১-এ দেওয়া হয়েছে।

## পরিশিষ্ট-১

### বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো



প্রদর্শনের নিরিখে অফিসার ক্যাডেট হিসেবে নির্বাচন করা হয়। এসব অফিসার বিভিন্ন সেক্টরে যুদ্ধক্ষেত্রে নেতৃত্ব দান করেন এবং মুক্তিযুদ্ধে প্রবল গতি সঞ্চারিত করেন। ভূটান-ভারত সীমান্তে মূর্তি উপত্যকায় একটি প্রশিক্ষণ একাডেমী স্থাপন করা হয় এবং এখানে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অফিসারগণ প্রায় চৌদ্দ সপ্তাহ কঠোর প্রশিক্ষণ দান করে। এ পর্যায়ে যুদ্ধকৌশল, হালকা ও ভারী অস্ত্র প্রশিক্ষণ এবং মর্টার ও বিস্ফোরক দ্রব্য ব্যবহারে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই ৬১ জন অফিসারকে বিভিন্ন সেক্টরে ও নবগঠিত ব্রিগেডসমূহের নিয়মিত ইউনিটে নিয়োগ করা হয়। প্রথাগত যুদ্ধ ও গেরিলাযুদ্ধ উভয় ক্ষেত্রেই পারদর্শী এর সকল তরুণ অফিসার যুদ্ধে যোগদানের ফলে মুক্তিযুদ্ধের সাফল্য অনিবার্য হয়ে উঠে।

মুক্তিবাহিনী যখন প্রবল উদ্যমে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল, তখন মুজিব বাহিনী নামে অপর এক বাহিনী গড়ে উঠে।[২৭] ভারতীয় সেনাবাহিনীর গেরিলাযুদ্ধ বিশেষজ্ঞ অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল ওবানের নেতৃত্বে এবং ভারতীয় সরকারের কেবিনেট ভিভিশনের অধীনস্থ রিসার্চ এন্ড অ্যানালাইসিস উইং (র)-এর অনুমোদনক্রমে মুজিববাহিনী সংগঠিত করা হয়। মুজিববাহিনী রাজনৈতিক আদর্শে দীক্ষিত দেশপ্রেমিক ও শিক্ষিত বাঙালি তরুণ সমন্বয়ে গড়ে উঠে। দেরাদুনে প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে এদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। শেখ ফজলুল হক মনি, তোফায়েল আহমদ, আবদুর রাজ্জাক ও সিরাজুল আলম খান এ বাহিনীর নেতৃত্ব দান করেন।*

ভারতীয় সেনাবাহিনী মুক্তিবাহিনীকে সহায়তা করার জন্য ছয়টি সেক্টর প্রতিষ্ঠা করে। পশ্চিম বাংলার মূর্তি ক্যাম্পে আলফা সেক্টর, পশ্চিম বাংলার রাজগঞ্জে ব্রেভো সেক্টর, বিহারের চাকুলিয়ায় চার্লি সেক্টর, ত্রিপুরার দেউতামূরায় ডেলটা সেক্টর, আসামের মাসিমপুরে ইকো সেক্টর এবং মেঘালয়ের তুরায় ফক্সট্রট সেক্টর প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব সেক্টরের অধিনায়কত্ব করেন যথাক্রমে ব্রিগেডিয়ার বি.সি. জোশী , বিগ্রেডিয়ার প্রেম সিং, ব্রিগেডিয়ার এন.এ. সালিক, বিগেডিয়ার সাবেক সিং, বিগ্রেডিয়ার এম. বি ওয়াদকে ও বিগেডিয়ার সান্ত সিং।[২৮]

নিয়মিত এবং অনিয়মিত উভয়ের সমন্বয়ে মুক্তিবাহিনী গড়ে উঠে। নিয়মিত সৈন্যদের নিয়ে নিয়মিত বাহিনী এবং অনিয়মিত সৈন্যদের নিয়ে গণবাহিনী বা অনিয়মিত বাহিনী গড়ে উঠে। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং ইপিআর সৈন্যদের নিয়মিত বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অনিয়মিত বাহিনীর সদস্যরা প্রাথমিক প্রশিক্ষণের পরে বিভিন্ন সেক্টরে যোগদান করে।অনিয়মিত বাহিনীতে ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী এবং সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানকারী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[২৯]

২৭. Shafiullah, *Bangladesh at War*, 139-140.

* প্রধান সেনাপতির সম্মতি ব্যতিরেকেই মুজিব বাহিনী গড়ে তোলা হয় এবং মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মুজিব বাহিনী তাঁর নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল।

২৮. পূর্বোক্ত, 140.

২৯. দৈনিক বাংলা ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭২ সংখ্যায় প্রকাশিত হেদায়েত হোসেন মোরশেদ কর্তৃক গৃহীত জেনারেল ওসমানীর সাক্ষাৎকার।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গেরিলা অভিযান চালিয়ে শত্রুসৈন্য ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে অনিয়মিত সৈন্যদের প্রেরণ করা হয়। অপরদিকে নিয়মিত বাহিনীকে প্রথাগত পদ্ধতিতে সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ করা হয়। ৭ জুলাই প্রথম বিগ্রেড জেড ফোর্স গঠিত হয়। মেজর জিয়াউর রহমানকে এই ব্রিগেডের অধিনায়ক নিয়োগ করা হয় এবং জিয়ার নামের প্রথম অক্ষর দিয়ে এই ব্রিগেডের নামকরণ করা হয় জেড ফোর্স। প্রথম, তৃতীয় ও অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল নিয়ে এই ব্রিগেড গঠিত হয়। দ্বিতীয় নিয়মিত ব্রিগেড এস ফোর্স অক্টোবর মাসে গঠিত হয়। দ্বিতীয় এবং একাদশ ইস্ট বেঙ্গল এই ব্রিগেডের অন্তর্ভুক্ত হয়। মেজর শফিউল্লাহ্ এই ব্রিগেডের অধিনায়ক নিযুক্ত হন এবং তাঁর নামের প্রথম অক্ষর দিয়ে এই ব্রিগেডের নামকরণ করা হয় এস ফোর্স। অনুরূপভাবে নবম, দশম ও চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল সমন্বয়ে তৃতীয় নিয়মিত ব্রিগেড কে ফোর্স গড়ে উঠে। মেজর খালেদ মোশাররফকে এই ব্রিগেডের অধিনায়ক নিযুক্ত করা হয়। খালেদ মোশাররফের নামের প্রথম অক্ষর দিয়ে এই ব্রিগেডের নামকরণ করা হয় কে ফোর্স।

২৮ সেপ্টেম্বর নাগাল্যান্ডের ডিমাপুরে এয়ার কমোডোর এ. কে খন্দকার-এর নেতৃত্বে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী প্রতিষ্ঠা লাভ করে। স্কোয়াড্রন লিডার সুলতান মাহমুদ, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট শামসুল আলম, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট বদরুল আলম, ক্যাপ্টেন খালেক, সাত্তার, সাহাবুদ্দিন, মুকিত, আকরাম ও সরফুদ্দিন সহ প্রথম দিকে ৬৭ জন বিমানসেনা সমন্বয়ে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী গড়ে উঠে। প্রথম পর্যায়ে মাত্র কয়েকটি ডেকোটা, অটার ও এ্যালুভেট হেলিকপ্টার সম্বল ছিল।

নৌবাহিনীর বাঙালি সৈন্যদের সমন্বয়ে বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী গড়ে উঠে। ছোট আকারের প্রথম রণতরী দু'টি সমন্বয়ে বঙ্গবন্ধু নৌবহর ১৯৭১ সালের ৯ নভেম্বর উদ্বোধন করা হয়।

এভাবে বাংলাদেশ বিমানবাহিনী, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, সেনাবাহিনীর ব্রিগেডসমূহ, বিভিন্ন সেক্টর ও গেরিলা সমন্বয়ে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে মোকাবিলা করার জন্য এক বিশাল বাহিনী গড়ে উঠে।

## সেক্টরসমূহের যুদ্ধ

মুক্তিযুদ্ধে সংঘটিত অসংখ্য প্রথাগত যুদ্ধ ও গেরিলা অভিযানের বিস্তারিত বিবরণ এ নিবন্ধে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়। তবু বিভিন্ন সেক্টরে অপারেশনের প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার জন্য নিম্নে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধের বিবরণ প্রদান করা হলো।*

**এক নম্বর সেক্টর :** ২৪ মে এক কোম্পানি মুক্তিবাহিনী চাঁদগাজিতে সুদৃঢ় পাকিস্তানী প্রতিরক্ষা অবস্থানের উপর আক্রমণ করে। ক্যাপ্টেন অলি আহমদ এই যুদ্ধে নেতৃত্ব দান

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, অষ্টম খণ্ড এবং মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কমান্ডারদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে সেক্টরসমুহে যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো।

করেন। তিন ঘন্টা ব্যাপী প্রচণ্ড যুদ্ধের পর পাকিস্তানী সৈন্যরা পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়। মুক্তিবাহিনী চাঁদগাজিতে প্রতিরক্ষা অবস্থান গ্রহণ করে। ৬ জুন চাঁদগাজি পুনর্দখলের উদ্দেশ্যে পুনরায় পাকিস্তানী সৈন্যরা আক্রমণ করে, কিন্তু দারুণভাবে ব্যর্থ হয়। এই যুদ্ধে ৭৫ জন পাকিস্তানী সৈন্য নিহত হয়। ১৭ জুন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য পুনরায় ট্যাংক, মর্টার ও গোলন্দাজবাহিনীর সহায়তায় আক্রমণ করেও চাঁদগাজি পুনর্দখল করতে ব্যর্থ হয়। এবারও ৪৫ জন পাকিস্তানী সৈন্য নিহত হয়। ২৯ জুন পাকিস্তানী সৈন্যরা পুনরায় আক্রমণ করে। এ আক্রমণে পাঁচটি হেলিকপ্টার ব্যবহৃত হয়। মুক্তিবাহিনীর অবস্থানের পশ্চাতে দুই ব্যাটালিয়ন পাকিস্তানী সৈন্য হেলিকপ্টারযোগে অবতরণ করে। সারাদিন যুদ্ধ অব্যাহত থাকার পরে মুক্তিবাহিনী চাঁদগাজি থেকে পিছনে সরে আসে। চাঁদগাজি পাকিস্তানীদের দখলে চলে যায়। এ যুদ্ধে ১৫ জন পাকিস্তানী সৈন্য নিহত হয়।

ক্যাপ্টেন মাহফুজ ও তাঁর অধীনস্থ মুক্তিযোদ্ধারা ১০ জুন হিয়াকু-রামগড় সড়কে পাকিস্তানী সৈন্যদের এ্যামবুশ করে। ৪ জন পাকিস্তানী সৈন্য নিহত হয়। করলিয়াটিলায় ২৩ জুন মুক্তিবাাহিনী পুনরায় পাকিস্তানী সৈন্যদের এ্যামবুশ করে। কয়েকজন পাকিস্তানী সৈন্যসহ একজন অফিসার নিহত হয়। ১ জুলাই মুক্তিবাহিনী দেবীপুর বিওপি আক্রমণ করে। ক্যাপ্টেন শামসুল হুদা এই আক্রমণে নেতৃত্ব দেন। ১২ জন পাকিস্তানী সৈন্য নিহত হয় এবং ৫ জন গুরুতরভাবে আহত হয়। ক্যাপ্টেন মাহফুজ চিকনছড়ায় ৩ জুলাই পাকিস্তানী সৈন্যদের এ্যামবুশ করেন।

করইয়াবাজারে পাকিস্তানী সৈন্যদের প্রতিরক্ষা অবস্থানের উপর ১৯ জুলাই আক্রমণ করা হয়। ৩০ জন পাকিস্তানী সৈন্য নিহত হয়। হিয়াকুতে পাকিস্তানীদের সুদৃঢ় প্রতিরক্ষা অবস্থান ২৭ জুলাই মুক্তিবাহিনী আক্রমণ করে। ৪ জন পাকিস্তানী সৈন্য নিহত হয়।

২৯ আগস্ট অমালিকা বিওপিতে প্রচন্ড যুদ্ধ শুরু হয়। ১২ জন পাকিস্তানী সৈন্য নিহত হয়। একজন মুক্তিযোদ্ধা নিহত হয় এবং অন্য একজন মুক্তিযোদ্ধা গুরুতরভাবে আহত হয়। এক কোম্পানি মুক্তিবাহিনী ১৫ অক্টোবর ছাগলনাইয়া বিওপি আক্রমণ করে। ৪০ জন পাকিস্তানী সৈন্য এখানে অবস্থান করছিল। এই আক্রমণে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিহার রেজিমেন্ট গোলন্দাজ কামান থেকে পাকিস্তানী অবস্থানের উপর গোলাবর্ষণ করে। পাকিস্তানী সৈন্যরা টিকে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করে। এই যুদ্ধে ৩ জন মুক্তিযোদ্ধা নিহত হয় এবং ৮ জন গুরুতরভাবে আহত হয়। ৬ নভেম্বর মুক্তিবাহিনী শালিয়াদিঘিতে প্রতিরক্ষা অবস্থান গ্রহণ করে। পাকিস্তানী সৈন্যরা ৭ নভেম্বর এই অবস্থান আক্রমণ করে। তিন দিনব্যাপী প্রচণ্ড যুদ্ধ অব্যাহত থাকলেও মুক্তিবাহিনীকে টলানো সম্ভব হয় নি। মুক্তিবাহিনী অতঃপর বেলুনিয়াস্থ পাকিস্তানীদের শক্তিশালী প্রতিরক্ষা অবস্থান আক্রমণ করে। মুক্তিবাহিনী চম্পকনগর বিওপি ও বল্লমপুর আক্রমণ করে। ৫০ জন পাকিস্তানী সৈন্য এবং ৩ জন মুক্তিযোদ্ধা এই যুদ্ধে নিহত হয়।

**দুই নম্বর সেক্টর :** ১৯ জুলাই মন্দভাগে পাকিস্তানী সৈন্যদের সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচণ্ড সংঘর্ষ শুরু হয়। ক্যাপ্টেন গাফফার মুক্তিযোদ্ধাদের নেতৃত্ব দেন। এই যুদ্ধে ৩১ বেলুচ রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার লেঃ কর্নেল কাইয়ুম এবং ৫৩ আর্টিলারী রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন বোখারীসহ কয়েকজন পাকিস্তানী সৈন্য নিহত হয়। মে-জুন মাসে মুন্সিহাট, ছাগলনাইয়া ও বেলুনিয়া যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে শালদা নদী স্টেশনে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধ দুই সপ্তাহ ব্যাপী স্থায়ী হয়েছিল। বহু শত্রুসৈন্য নিধন করে মুক্তি বাহিনী ৮ অক্টোবর শালদা নদী দখল করে। ২২ অক্টোবর অনুষ্ঠিত কসবা যুদ্ধ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই যুদ্ধে খালেদ মোশাররফ গুরুতরভাবে আহত হন। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে লাতুমুরা যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধারা বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে। এই যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর ৩ জন অফিসার ও ৪০ জন সদস্য নিহত হয় এবং ৬০ জন গুরুতরভাবে আহত হয়। বেলুনিয়ার বিখ্যাত যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় ৮ নভেম্বর। এতদ্ব্যতীত গেরিলাদের ক্রাক প্লাটুন ঢাকা শহরে বহু সংখ্যক অপারেশন পরিচালনা করে। নবম ইস্ট বেঙ্গলের এক কোম্পানী সৈন্য লেঃ আজিজের নেতৃত্বে শালদা নদীর নিকটবর্তী পাকিস্তানী অবস্থানের উপর আক্রমণ চালায়। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর এই অবস্থান মুক্তিবাহিনী করায়ত্ত করে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, লেঃ আজিজের বুকে এবং মাথায় গুলি লাগে এবং তিনি রণক্ষেত্রে নিহত হন। পশ্চাদপসরণরত পাকিস্তানী সৈন্যরা তাঁর মরদেহ নিয়ে যায়।

**তিন নম্বর সেক্টর :** লেঃ মোর্শেদ ও তাঁর সৈন্যরা ১৪ মে মাধবপুরে পাকিস্তানী সৈন্যদের এ্যামবুশ করে। অনুরূপভাবে সিলেট মহাসড়কে ক্যাপ্টেন মতিয়র রহমান নালুয়া চা-বাগানের সন্নিকটে ১৬ মে পাকিস্তানী সৈন্যদের এ্যামবুশ করে। রায়পুরা, মাধবপুর, কাপাশিয়া, মনোহরদী, কুলিয়ারচর, কটিয়াদী, তেলিয়াপাড়া, মুকুন্দপুর ও কলেংগা জঙ্গলে সংঘটিত অসংখ্য গেরিলা অভিযান ও সম্মুখ যুদ্ধে পাকিস্তানী সৈন্যদের মনোবল ভেঙে পড়ে।

**চার নম্বর সেক্টর :** ২৪ মে সুতাকান্দি যুদ্ধ এবং ১৯ জুন লাঠিটিলা যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ক্যাপ্টেন রব উভয় যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন। জুন, জুলাই ও আগস্ট মাসে অসংখ্য গেরিলা অভিযান চালানো হয়। ১০ আগস্ট শাহবাজপুর (লাতু) রেলওয়ে ষ্টেশনে প্রচণ্ড সংঘর্ষ শুরু হয়। বিয়ানীবাজার, বড়লেখা ও জাকিগঞ্জে মুক্তিবানিহীর প্রতিরক্ষা অবস্থানের উপর ১৪ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানী সৈন্যরা আক্রমণ করে। এ যুদ্ধে অনেক মুক্তিযোদ্ধা নিহত হয়। অক্টোবর মাসে এই সেক্টরে প্রথম ও অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল উপস্থিত হয় এবং অসীম বীরত্বের সঙ্গে তাঁরা ২২ বেলুচ রেজিমেন্টের সঙ্গে যুদ্ধ করে। মুক্তিবাহিনী দক্ষিণগুল এলাকা দখল করে। ১০ নভেম্বর আটগ্রাম- জাকিগঞ্জে প্রচন্ড যুদ্ধ শুরু হয়। ক্যাপ্টেন রব সালামটিলা আক্রমণ করেন এবং লেঃ জহির রাজটিলায় ১০ নভেম্বর প্রতিরক্ষা অবস্থান গ্রহণ করে।

**পাঁচ নম্বর সেক্টর :** গহীন জঙ্গল ও পাহাড়-পর্বতের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা সীমিত হওয়ায় মুক্তিবাহিনীর চলাচল ব্যাহত হয়। বড়ছড়া, বালাট, ভোলাগঞ্জ, শেলা এবং ডাউকিতে জুলাই-আগস্ট মাসে অসংখ্য সংঘর্ষ হয়। রাধানগর, টেংরাটিলা ও ছাতক ব্যতীত সুরমা নদী পর্যন্ত দু'শ মাইল ব্যাপী বিশাল এলাকা সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে মুক্তিবাহিনী দখল করে। মুক্তিবাহিনী ৫০টি নৌযান দখল করে। অক্টোবর মাসে তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল এই সেক্টরে যোগদান করে, ছোটখিল গোয়েনহাট এবং ছাতকে যুদ্ধ করে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটি দলকে ৩ নভেম্বর তাহেরপুরে এবং ১৬ নভেম্বর আজমিরিগঞ্জে এ্যামবুশ করা হয়। ২৭-২৮ নভেম্বর মুক্তিবাহিনী টেংরাটিলায় পাকিস্তানী অবস্থানের উপর আক্রমণ করে। বহু শত্রুসৈন্য নিহত হয়।

**ছয় নম্বর সেক্টর :** প্রধানপাড়া, ডাংগাপাড়া ও নুনিয়াপাড়ায় মুক্তিবাহিনীর অবস্থানের উপর পাকিস্তানী সৈন্যরা আক্রমণ করে। ভজনপুর সাব-সেক্টরের অন্তর্গত জগদ্দলহাট এলাকা ৭ সেপ্টেম্বর মুক্তিবাহিনী দখল করে নেয় এবং চাওই নদী পর্যন্ত তাদের অগ্রাভিযান অব্যাহত রাখে। ক্যাপ্টেন নওয়াজেশউদ্দিন এবং তাঁর সৈন্যরা ৮ আগস্ট ফুলবাড়ী, ১৩ আগস্ট ভূরুংগামারী এবং ১৫ আগস্ট আলীপুর পুলিশ স্টেশন আক্রমণ করে। ৪ সেপ্টেম্বর নাগেশ্বরীতে অনুরূপ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ভূরুংগামারী ও জয়মনিরহাটে ১৪ অক্টোবর ভয়ংকর যুদ্ধ শুরু হয়। ১ জন পাকিস্তানী অফিসার ও ৭ জন সৈন্য মুক্তিবাহিনীর হাতে যুদ্ধবন্দি হিসেবে ধরা পড়ে এবং প্রায় ছয়শত বর্গমাইল এলাকা শত্রুমুক্ত হয়। ১৯ নভেম্বর মুক্তিবাহিনী বড়খাতা দখল করে নেয়। চিলমারী সাব-সেক্টরে মুক্তিযোদ্ধারা ডিমলা ও মোগলহাট সাব-সেক্টরে লালমনিরহাট শহরের চার মাইল পূর্ব পর্যন্ত বিশাল এলাকা দখল করে নেয়। ১৮ নভেম্বর জয়মনিরহাট যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুক্তিবাহিনীর তরুণ লেঃ আসফাকুস সামাদ এই যুদ্ধে নিহত হন।

**সাত নম্বর সেক্টর :** মুক্তিবাহিনী ১৮ জুন দিনাজপুর ঠনঠনিয়াপাড়ায় পাকিস্তানী অবস্থানের উপর মুক্তিবাহিনী আক্রমণ করে। ৪-৫ জুলাই মেজর নাজমুল হকের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনী কাঞ্চন ব্রীজ আক্রমণ করে। নবাবগঞ্জ জেলার কলাবাড়ীতে ১ আগস্ট প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়। ক্যাপ্টেন ইদ্রিসের নেতৃত্বে ২৩ আগস্ট কানসট আক্রমণ করা হয়। ৩ আগস্ট তাহেরপুরে এবং ২৬ আগস্ট দুর্গাপুরে পাকিস্তানী অবস্থানের উপর মুক্তিবাহিনী আক্রমণ করে। ময়মনসিংহ কৃষি বিদ্যালয়ের ছাত্র শিবলীর নেতৃত্বে একদল গেরিলা শারদায় পাকিস্তানী অবস্থানের উপর অতর্কিত হামলা চালায়। শিবলী এই সংঘর্ষে নিহত হন। মুক্তিবাহিনী ২২ আগস্ট চারঘাট থানায় মিরগঞ্জ বিওপি আক্রমণ করে। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে মেজর গিয়াসের নেতৃত্বে ইসলামপুরে পাকিস্তানী অবস্থানে আক্রমণ করে। এই যুদ্ধে ৮০ জন রাজাকার আত্মসমর্পণ করে।

১৮ নভেম্বর লেঃ রফিক ও তাঁর সৈন্যরা আলমপুরে পাকিস্তানী অবস্থানের উপর আক্রমণ করে।

শাহপুর গড়ে মুক্তিবাহিনীর অবস্থান পাকিস্তানীরা দখল করে নেয়। মুক্তিবাহিনী পুনরায় আক্রমণ চালিয়ে ২২ নভেম্বর শাহপুর দখল করে নেয়। সেক্টর কমান্ডার লেঃ কর্নেল কাজী নুরুজ্জামান এই আক্রমণের পরিকল্পনা করেন। বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর, লেঃ রশিদ, লেঃ রফিক, লেঃ কাইয়ুম, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নজরুল, স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা আলতাফ ও ডাঃ মিজানুর রহমান নিজ নিজ দলের নেতৃত্ব দান করেন। ১৩-১৪ নভেম্বর খানপুর বিওপি-তে সংঘঠিত যুদ্ধে ৩০ জন পাকিস্তানী সৈন্য নিহত হয়।

**আট নম্বর সেক্টর :** মুক্তিবাহিনী ২৭ মে বয়রা আক্রমণ করে। চৌগাছা ও মাসিলার মধ্যবর্তী স্থানে ক্যাপ্টেন নুরুল হুদার নেতৃত্বে ১০ মে মুক্তিবাহিনী পাকিস্তানী সৈন্যদের এ্যামবুশ করে। ক্যাপ্টেন হুদা ও তাঁর সৈন্যরা ১৫ মে কাশিপুর বিওপি আক্রমণ করেন এবং ৬ জন পাকিস্তানী সৈন্য হত্যা করেন এবং একটি হালকা মেশিনগান ও ৮টি চাইনিজ রাইফেল হস্তগত করেন।

৩ জুন মুজিবনগরে মুক্তিবাাহিনী ও পাকিস্তানী সৈন্যদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে ২০ জন পাকিস্তানী সৈন্য নিহত হয় এবং আরো ২০ জন গুরুতরভাবে আহত হন। ৫ আগস্ট বর্নি বিওপি আক্রমণ করা হয়। ১৭ জুলাই বাগুয়ান রতনপুর এলাকা আক্রমণ করা হয়। ১৭ আগষ্ট গয়েশপুরে পাকিস্তানী অবস্থানের উপর মুক্তিবাহিনী আক্রমণ চালায়।

এ সময় সাতক্ষিরা জেলার কলারোয়ায় ভয়ংকর যুদ্ধের সূচনা হয়। ১৫ অক্টোবর সংঘটিত বালিয়াডাঙ্গা যুদ্ধ উল্লেখযোগ্য। ২ জন পাকিস্তানী অফিসার ও ৭০ জন সৈন্য এই যুদ্ধে নিহত হয়। ক্যাপ্টেন হুদা ঝিকরগাছায় এ্যামবুশ করে ৩০ জন পাকিস্তানী সৈন্য হত্যা করেন। ৩ নভেম্বর হিজলী বিওপি আক্রমণ করা হয়। লেঃ কমল সিদ্দিকী নড়াইল সাব ডিভিশন দখল করে যশোরের দিকে অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখেন।

**নয় নম্বর সেক্টর :** সেক্টর কমান্ডার মেজর এম.এ. জলিল এই সেক্টরে গেরিলা যুদ্ধের বিস্তারিত পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ১২-১৩ জুন বসন্তপুর বিওপি আক্রমণ করা হয়। অনুরূপভাবে খানজি বিওপি ও হিংগলগঞ্জ বিওপি আক্রমণ করা হয়। মাত্র কয়েক ঘণ্টা যুদ্ধের পর গোাবিন্দপুর মুক্ত হয়। শ্যামনগরেও প্রচন্ড যুদ্ধ চলে। ২০ নভেম্বর কালিগঞ্জ যুদ্ধে চল্লিশ জন পাকিস্তানী সৈন্য আত্মসমর্পণ করে।

**দশ নম্বর সেক্টর :** সমুদ্র ও নদীপথে বাংলাদেশের নৌ-কমান্ডোরা বীরত্বের সঙ্গে অপারেশন চালায়। মুক্তিবাহিনী লিমপেট মাইন ব্যবহার করে এম.ভি. হরমুজ ও আল আব্বাস জাহাজ দু'টি ডুবিয়ে দেয়। উপর্যুপরি ধ্বংসাত্মক অভিযানের ফলে চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দর অকার্যকর হয়ে পড়ে। নৌ-কমান্ডোরা প্রধান সেনাপতির বিশেষ বাহিনীর অন্তর্গত আত্মঘাতী যোদ্ধা হিসাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে। একটি পাকিস্তানী সাবমেরিন পরিত্যাগ করে ৭ জন ফ্রগম্যান মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করে। বাংলাদেশের নদীপথ ও উপকূলীয় অঞ্চলে সফল গেরিলা অভিযান মুক্তিযুদ্ধে প্রবল গতি সঞ্চার করে। এই সব অভিযানের ফলে পাকিস্তানী সৈন্যরা হতাশাগ্রস্ত ও হতোদ্যম হয়ে পড়ে।

**এগার নম্বর সেক্টর :** সেক্টর কমান্ডার মেজর আবু তাহের এই সেক্টরে গেরিলা অভিযান বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। অসংখ্য সম্মুখযুদ্ধ ছাড়া ৪-৫ জুলাই নালিতাবাড়িতে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়।

কোদালকাঠি, চিলমারি, হালুয়াঘাট ও কামালপুর যুদ্ধ স্মরণীয় হয়ে আছে। ১ অক্টোবর থেকে ১১ অক্টোবরের মধ্যে এসব যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ৬ নভেম্বর ঢালু বিওপি. এবং ১২ নভেম্বর বন্দরকাটা আক্রমণ করা হয়।

উপরোক্ত সেক্টরসমূহের যুদ্ধ ছাড়াও জেড ফোর্স, এস ফোর্স এবং কে ফোর্স দখলদার বাহিনীর সঙ্গে অসংখ্য সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। জেড ফোর্সের অধীনে কামালপুর, বাহাদুরাবাদ ঘাট ও নকসী বিওপি আক্রমণ বিখ্যাত হয়ে আছে।

শালদা নদী, কসবা ও বেলুনিয়া যুদ্ধে কে ফোর্সের আক্রমণ এবং ধর্মনগর, মুকুন্দপুর, আখাউড়া, রাধানগর কমপ্লেক্স ও মনতলা যুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হবে।

**রণকৌশল, যুদ্ধপরিকল্পনা ও সৈন্য সমাবেশ**

পাকিস্তানী সমরনায়কদের ধারণা ছিল যে একটি বিশাল এলাকা দখল করে বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার ও শরণার্থীদের স্থানান্তর করাই ভারতের উদ্দেশ্য। এই দৃষ্টিকোণ থেকে যুদ্ধরত বাঙালি কর্তৃক বড় ধরনের এলাকা দখল প্রতিহত করার জন্য পাকিস্তানীরা সৈন্যসমাবেশ করে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রচলিত রণকৌশল ছিল যুদ্ধ করে কোন এলাকা দখল করে পুনরায় প্রস্তুতি গ্রহণ করে সমরপদ্ধতি অনুযায়ী অগ্রাভিযান অব্যাহত রাখা। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ইস্টার্ণ কমান্ড-এর অধিনায়ক লেঃ জেনারেল এ. এ. কে. নিয়াজী প্রথাগত যুদ্ধের এই পদ্ধতি মনে রেখে সৈন্য মোতায়েনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

জেনারেল নিয়াজীর কাছে চারটি পথ খোলা ছিল :

প্রথম : পদ্মা, মেঘনা ও যমুনার তীরে শক্ত ব্যূহ রচনা করে ঢাকা বৃত্তকে রক্ষা করা। এতে দুটো অসুবিধা ছিল— এক : ঢাকার বাইরে যশোর, কুষ্টিয়া, রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর, সিলেট, কুমিল্লা ও চট্টগ্রামের বিশাল এলাকা বিনা যুদ্ধে শত্রুর কাছে সমর্পণ করতে হবে। দুই : প্রতিরক্ষা এলাকা ছোট হলে ভারতীয়দের পশ্চিম পাকিস্তান সীমান্তে বেশি সৈন্য মোতায়েনের সুযোগ দেয়া হবে।

দ্বিতীয় : সীমান্ত এলাকায় প্রতিরক্ষা অবস্থান নেয়ার পর যুদ্ধ করতে করতে ঢাকা বৃত্তের দিকে পশ্চাদপসরণ করে সুদৃঢ় প্রতিরক্ষাব্যূহ রচনা করা। এতে অসুবিধা ছিল, শত্রুর

বিমানশক্তির আধিপত্য ও মুক্তিবাহিনীর তৎপরতার ফলে ঢাকা বৃত্তের দিকে পশ্চাদপসরণ সম্ভব নাও হতে পারে।

তৃতীয় : গতিশীল যুদ্ধ (mobile warfare) পরিচালনা করা। এটা ছিল সবচেয়ে উপযোগী, কিন্তু এতে মুক্তিবাহিনী কর্তৃক তাড়িত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল সবচেয়ে বেশী।

চতুর্থ : গুরুত্বপূর্ণ শহর ও বড় বড় রাস্তাগুলোর উপর শক্ত প্রতিরক্ষাব্যবস্থা গ্রহণ করে শত্রুর অগ্রগতিকে প্রতিহত করা (fortress concept of defence)। এই পরিল্পনায় দুটো বড় ধরনের সুবিধা ছিল। প্রথম ঃ সীমান্তের বিশাল এলাকা বিনা যুদ্ধে ছেড়ে দিতে হচ্ছে না, আর দ্বিতীয় : পাকিস্তানীদের সীমিত সম্পদ দিয়ে অগ্রসরমান শত্রুবাহিনীকে প্রতিহত করা সম্ভব ছিল।

যেভাবেই হোক, ভারতীয় বাহিনীকে সীমান্ত এলাকায় বাধা দিয়ে বিলম্ব ঘটানো ছিল নিয়াজীর পরিকল্পনা। সীমান্তে সব ক'টি পাকা রাস্তার উপরে শক্ত প্রতিরক্ষাব্যূহ রচনা করে অগ্রসরমান সম্মিলিত বাহিনীকে প্রতিহত করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। ১৪০০ মাইল বিস্তৃত সীমান্ত এলাকায় শত্রুঘাঁটিগুলোতে প্রচুর গোলাবারুদ ও রসদপত্র সরবরাহ নিশ্চিত করে নিয়াজী চতুর্থ পরিকল্পনা গ্রহণ করে অনির্দিষ্টকালের জন্য সম্মিলিত বাহিনীকে বিলম্বিত করতে চাইলেন।[৩০]

পাকিস্তানী জেনারেলরা যুদ্ধের গতি ও পরিণতি উপলব্ধি করতে সক্ষম হন নি। ফলে ঢাকা রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় বাধা দিতে ব্যর্থ হয় পাকবাহিনী। বড় ধরনের যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই পলায়নপর পাকসেনারা আত্মসমর্পণ করে।

পাকিস্তানীদের সৈন্য সমাবেশের বিবরণ[৩১] :

**যশোর এলাকা :** নবম ডিভিশন মেজর জেনারেল আনসারীর নেতৃত্বে যশোর এলাকায় মোতায়েন করা হয়। ১০৭ ব্রিগেড যশোর এবং ঝিনাইদহে অবস্থিত ছিল। এ ছাড়া ২টি ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারী ও একটি রেকি ও সার্পোট ব্যাটালিয়ন ছিল।

**উত্তর বাংলা :** মেজর জেনারেল নজর হোসেন শাহের নেতৃত্বে ১৬ ডিভিশনকে উত্তর বাংলা রক্ষা করার দায়িত্ব দেয়া হয়। ১৬ ডিভিশনের সদর দপ্তর নাটোরে অবস্থিত ছিলো। ২৩ ব্রিগেড রংপুরে এবং ২০৫ ব্রিগেড বগুড়া এলাকায় মোতায়েন করা হয। এর ১টি ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারী, ২টি মর্টার ব্যাটারি, ৯টি রেকি ও সাপোর্ট ব্যাটালিয়ন এবং ১টি আর্মার্ড রেজিমেন্ট ছিল।

---

৩০. Siddiq Salik, *Witness to Surrender*, 124-125.

৩১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা -১২৬।

**পূর্ব এলাকা :** মেজর জেনারেল আবদুল মজিদ কাজীর নেতৃত্বে ১৪ ডিভিশনকে পূর্বাঞ্চল রক্ষার দায়িত্ব দেয়া হয়। পরে মেজর জেনারেল জামসেদের নেতৃত্বে ৩৬ ডিভিশন ঢাকায় ও মেজর জেনারেল রহিমের নেতৃত্বে ৩৯ ডিভিশন চাঁদপুরে গড়ে তোলা হয়। অবশ্য এই দু'টি ডিভিশন কোনক্রমেই পাকশক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে নি। কারণ বিভিন্ন ইউনিট পুনর্বিন্যাস করেই এই ডিভিশন দু'টি গড়ে তোলা হয়। ১৭৭ ব্রিগেড কুমিল্লায়, ২৭ ব্রিগেড ময়মনসিংহে ও ৩১৩ ব্রিগেড সিলেটে মোতায়েন করা হয়। সিলেটে ১টি ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারী, ২টি মর্টার ব্যাটারী ও মাত্র ৪টি ট্যাংক ছিল।

**চট্টগ্রাম এলাকা :** চট্টগ্রামে ৯৩ ইন্ডিপেন্ডেন্ট বিগ্রেড অবস্থিত ছিল, যাব অধিনায়ক ছিলেন বিগ্রেডিয়ার আতাউল্লা।*

অন্যদিকে সম্মিলিত বাহিনী এইসব প্রতিরক্ষা-অবস্থানগুলো এড়িয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করে। প্রথম লক্ষ্য ছিল খুব কম সময়ের মধ্যে যুদ্ধ শেষ করার জন্য বিদ্যুৎগতিতে আক্রমণ পরিচালনা করা। দ্বিতীয়ত, সীমান্তে সবদিক দিয়ে আক্রমণ পরিচালনা করে পাকসেনাদের ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য করা। তৃতীয়ত, ছড়িয়ে পড়া পাকবাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করা। চতুর্থত, পাকা রাস্তা বাদ দিয়ে কাঁচা রাস্তা ধরে অগ্রসর হয়ে পাকিস্তানী প্রতিরক্ষাব্যূহকে এড়িয়ে যাওয়া। পঞ্চমত, মনস্তাত্ত্বিকভাবে যুদ্ধ চালিয়ে পাকিস্তানী বাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে দেওয়া যাতে তারা যুদ্ধ না করে আত্মসমর্পণ করে।[৩২]

ভারতীয় ইস্টার্ণ কমান্ডের অধিনায়ক লেঃ জেনারেল জগজিৎ সিং আরোরার অধীনে ছিল তিনটি নিয়মিত কোর ও একটি কমিউনিকেশন জোন। এ ছাড়া প্রায় এক লক্ষ মুক্তিযোদ্ধা ১১টি সেক্টরে বীরবিক্রমে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে।**

**দ্বিতীয় কোর :** কৃষ্ণনগরে ছিল দ্বিতীয় কোরের সদর দপ্তর। লেঃ জেনারেল টি. এন. রায়না ছিলেন কোর কমান্ডার। এতে ছিল নবম ও চতুর্থ পার্বত্য ডিভিশন। এছাড়া ছিল টি-৫৫ (রাশিয়ান) ট্যাংক সমন্বয়ে গঠিত একটি মাঝারি আর্মার্ড রেজিমেন্ট, পিটি-৭৬ (রাশিয়ান) ট্যাংক সজ্জিত একটি হালকা ট্যাংক রেজিমেন্ট, ১৩০ মিলিমিটার (রাশিয়ান) একটি মাঝারি গোলন্দাজ ইউনিট ও একটি ব্রিজিং ইউনিট।

**তেত্রিশ কোর :** তেত্রিশ কোরের সদর দপ্তর ছিল শিলিগুঁড়িতে। লেঃ জেনারেল এম. এল. থাপান ছিলেন এই কোরের কমান্ডার। ষষ্ঠ পাবর্ত্য ডিভিশন ও ২টি ব্রিগেড নিয়ে এই কোর গঠিত হয়। এ ছাড়া পিটি-৭৬ (রাশিয়ান) ট্যাংক সমন্বয়ে একটি হালকা আর্মার্ড রেজিমেন্ট, একটি মাঝারি গোলন্দাজ রেজিমেন্ট (বৃটিশ ৫.৫ ইঞ্চি) ও একটি ইঞ্জিনিয়ার ব্রিজিং ইউনিট ছিল।

* পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ইস্টার্ণ কমান্ডের সাংগঠনিক কাঠামো পরিশিষ্ট-২-এ দেওয়া হয়েছে।

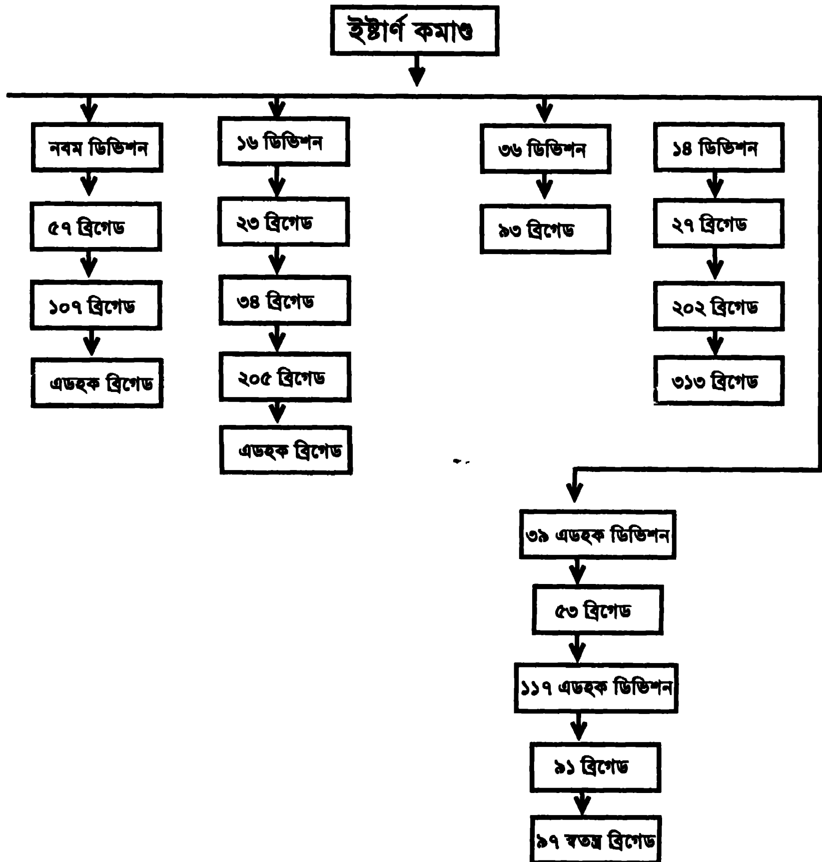
৩২. Major General D. K. Palit, *The Lightning Campaign* (New Delhi 1972), 101.

** ভারতীয় সেনাবাহিনীর ইস্টার্ণ কমান্ডোর সাংগঠনিক কাঠামো পরিশিষ্ট-৩-এ দেওয়া হয়েছে।

পরিশিষ্ট -২

## পাকিস্তান সেনসাবাহিনীর ইষ্টার্ণ কমাণ্ডের সাংগঠনিক কাঠামো

## (২১ নভেম্বর- ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১)



**চতুর্থ কোর :** চতুর্থ কোরের সদর দপ্তর ছিল আগরতলায়। লেঃ জেনারেল সাগত সিং এই কোরের কমান্ডার ছিলেন। অষ্টম, সাতান্ন ও তেইশ পার্বত্য ডিভিশন নিয়ে এই কোর গঠিত হয়। এ ছাড়া দুই স্কোয়াড্রন পিটি-৭৬ ট্যাংক ও একটি মাঝারি গোলন্দাজ রেজিমেন্ট (বৃটিশ ৫.৫ ইঞ্চি) ছিল।

**১০১ কমিউনিকেশন জোন :** ১০১ কমিউনিকেশন জোনের সদর দপ্তর ছিল গৌহাটিতে। মেজর জেনারেল জি. এস. গিল ছিলেন এর কমান্ডার। যুদ্ধে জেনারেল গিল আহত হলে মেজর জেনারেল নাগরা কমান্ডার নিযুক্ত হন। একটি পদাতিক বিগ্রেডের সমান ছিল এর আকার ও শক্তি।[৩৩]

মুক্তিবাহিনীর হাতে ছিল '৩০৩ রাইফেল, সাব মেশিন গান, সীমিত সংখ্যক হালকা মেশিন গান ও পাকিস্তানীদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া মর্টার। তাদের কোন গোলন্দাজ বাহিনী কিংবা সুসংগঠিত বিমান বাহিনী ছিল না। প্রাথমিক পর্যায়ে মুক্তিবাহিনী দখলদার বাহিনীর সঙ্গে প্রথাগত যুদ্ধ করে। মুক্তিযোদ্ধারা প্রিয় মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য উৎসর্গীকৃত ছিল। সূচনাপর্বে মুক্তিযোদ্ধারা অসীম বীরত্ব প্রদর্শনের ফলে বড় ধরনের সাফল্য অর্জন করে এবং তাঁদের মনোবল অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়। অসীম বীরত্ব ও সাহস, অমিত তেজ ও সুমহান দেশপ্রেমই ছিল প্রাথমিক পর্যায়ে সাফল্যের কারণ। মানব-ইতিহাসে সমগ্র জনপদে এমন সুকঠিন প্রতিরোধের দৃষ্টান্ত বিরল। কিন্তু আধুনিক মারণাস্ত্রে সজ্জিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে টিকে থাকা মুক্তিবাহিনীর পক্ষে সম্ভব হয় নি। মুক্তিযোদ্ধারা পশ্চাদপসরণ করে ভারতের মাটিতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। পরে এপ্রিলের শেষ সপ্তাহ থেকে মে মাসের মধ্যে মুক্তিবাহিনী পুনর্গঠিত হয়ে পাকিস্তানী সৈন্যদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করে।

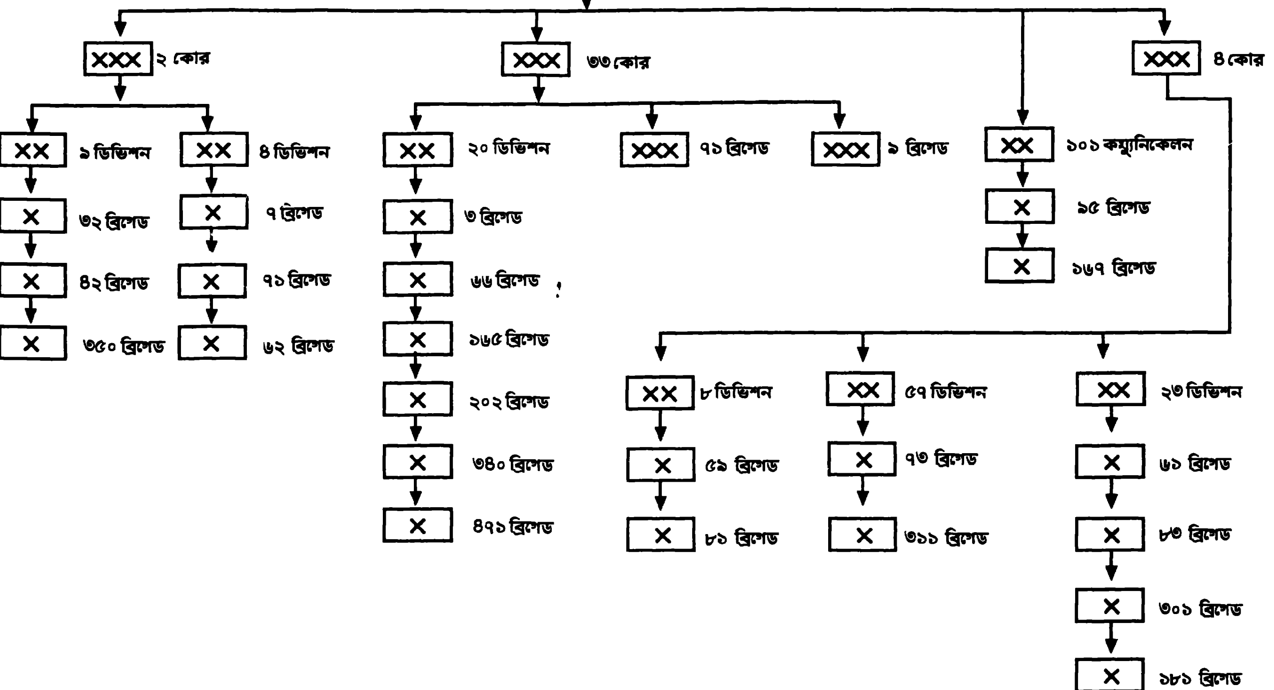
মুক্তিবাহিনীর হাই কমান্ড সম্যক উপলব্ধি করে যে শুধুমাত্র প্রথাগত যুদ্ধ করে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে পরাজিত করা সম্ভব হবে না। মে মাসের শেষদিকে বিশাল গেরিলা বাহিনী গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গেরিলাযুদ্ধ পাকিস্তানী সৈন্যদের হতাশাগ্রস্ত করে তোলে এবং বিচ্ছিন্ন এলাকায় মোতায়েন হতে বাধ্য করে। পাকিস্তানী সৈন্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র গেরিলা অভিযানের ফলে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। সদর দপ্তর থেকে প্রত্যেক সেক্টর কমান্ডারকে নিজ সেক্টর এলাকায় গেরিলা প্রশিক্ষণ দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অপারেশনের জন্য পাঠাতে নির্দেশ জারী করা হয়।[৩৪]

৩৩. ঐ, 103.
৩৪. দৈনিক বাংলা ০৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭২ সংখ্যায় প্রকাশিত হেদায়েত হোসেন মোরশেদ কর্তৃক গৃহীত জেনারেল ওসমানীর সাক্ষাৎকার।

পরিশিষ্ট-৩

## ভারতীয় সেনাবাহিনী ইষ্টার্ণ কমান্ডের সাংগঠনিক কাঠামো

(২১ নভেম্বর -১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১)



উল্লেখ্য যে কর্নেল (পরে জেনারেল) এম. এ. জি. ওসমানী প্রথাগত যুদ্ধে প্রবলভাবে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল, শুধু গেরিলাযুদ্ধ পরিচালনা করে বাংলাদেশ মুক্ত করতে অনেক সময় লাগবে। এমতাবস্থায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে ৬০-৭০ হাজার গেরিলা ছাড়াও ২৫০০০ নিয়মিত সৈন্য প্রথাগত যুদ্ধের জন্য গড়ে তোলা হবে। জুলাই-অক্টোবর মাসে এ কারণে 'জেড কোর্স', 'এস কোর্স' ও 'কে কোর্স' নামে তিনটি নিয়মিত ব্রিগেড গঠন করা হয়। আশা করা হয় যে নবগঠিত ব্রিগ্রেডসমূহ বিশাল এলাকা মুক্ত করতে সক্ষম হবে। কিন্তু বাস্তবে এটা সম্ভব হয় নি। কারণ মুক্ত এলাকা ধরে রাখার মতো গোলন্দাজ বাহিনী বা বোমারু বিমান বাংলাদেশ বাহিনীর ছিল না।

কতিপয় অফিসার অবশ্য নিয়মিত ব্রিগ্রেড গঠনে দ্বিমত পোষণ করেন। সেক্টর কমান্ডারদের সম্মেলনে মেজর আবু তাহের চল্লিশটি গেরিলা ডিভিশন গঠনের প্রস্তাব করেন। তিনি আরও বলেন যে সকল সেক্টর কমান্ডারকে তাঁদের অধীনস্থ সৈন্যসহ বাংলাদেশের মুক্ত এলাকায় স্থানান্তর করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ও অনেকে এই প্রস্তাব সমর্থন করেন এবং সেই মোতাবেক গেরিলা যুদ্ধকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য সেপ্টেম্বরে একটি নির্দেশনামা জারী করা হয়।

মুক্তিবাহিনীর রণকৌশল কী হবে সে বিষয়ে সেপ্টেম্বর মাসেই বিস্তারিত যুদ্ধপরিকল্পনা তৈরি করা হয়। যুদ্ধ পরিকল্পনা অনুযায়ী শত্রুসৈন্যদের সামনের দিক দিয়ে ব্যস্ত রাখা হয় এবং পশ্চাত দিক দিয়ে আক্রমণ পরিচালনা করা হয়। অবশ্য মুক্তিবাহিনীর সেক্টরসমূহ ও ব্রিগেসমূহের অবস্থান পরিবর্তন করা হয় নি।

## চূড়ান্ত অভিযান

নভেম্বরে মুক্তিবাহিনী সীমান্তসংলগ্ন অনেক গুরুত্বপূর্ণ এলাকা দখন করে। হতোদ্যম পাকিস্তানী সৈন্যরা সর্বত্রই পশ্চাদপসরণ করছিল। এই বিশাল মুক্ত এলাকা থেকে চূড়ান্ত অভিযান সহজতর হয়। উল্লেখ্য যে মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনী সমন্বয়ে যৌথ কমান্ড গঠনের বিষয়ে নভেম্বর মাস থেকে প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছিল। ভারতীয় সেনাবাহিনীর ইস্টার্ণ কমান্ডের অধিনায়ক লেঃ জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা যৌথ বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত হন।* ৩ ডিসেম্বর বিকেলে যৌথ কমান্ড কার্যকর হয়, যখন পাকিস্তান বিমান বাহিনী আকস্মিকভাবে অমৃতসর, শ্রীনগর ও কাশ্মীর উপত্যকায় অঘোষিত বোমাবর্ষণ করে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সেসময় কোলকাতায় অবস্থান করছিলেন। তিনি অবিলম্বে

অগ্রাভিযানের পূর্ণ বিবরণ মেজর জেনারেল ডি. কে. পালিত রচিত *The Lightning Campaign* গ্রন্থে দেওয়া হয়েছে।

দিল্লীর পথে যাত্রা শুরু করেন এবং ভারতীয় বাহিনীকে সর্বশক্তি দিয়ে পাকিস্তানী আক্রমণ প্রতিহত করার আদেশ দেন। যৌথ বাহিনী বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অগ্রাভিযান শুরু করে।*

মুক্তিবাহিনী ৭ নভেম্বর ৮ নম্বর সেক্টরে চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর এবং কালীগঞ্জ এলাকায় বিশাল ভূখন্ড মুক্ত করে। ৭ নম্বর সেক্টরে অনুরূপভাবে হিলি অভিমুখে মুক্তিবাহিনী অগ্রসর হয়। ৬ নম্বর সেক্টরে মুক্তিবাহিনী ভূরুঙ্গামারি দখল করে। উত্তরে কামালপুর যুদ্ধ এবং পূর্বে বেলুনিয়া যুদ্ধ পাকিস্তানী সৈন্যদের হতাশাগ্রস্ত করে। বহু পাকিস্তানী সৈন্য নিহত হয়। সিলেটে 'জেড ফোর্স' অধিকতর তৎপরতা দেখায়। প্রথম ইস্ট বেঙ্গল ২০ নভেম্বর আটগ্রাম দখল করে সুরমা নদীর পূর্বতীরে কানাইরঘাট এলাকায় অবস্থান সুদৃঢ় করে। তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল ছাতক দখল করে নেয়। একটি পাকিস্তানী ব্রিগেড ক্রমাগত ছয় দিন মুক্তিবাহিনীকে প্রতিহত করে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বহু হতাহতের পর অক্টোবরের শেষ দিকে পিছু হটে যায়। তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গলের কমান্ডিং অফিসার মেজর শাফায়াত জামিল ছোটখিল যুদ্ধে গুরুতরভাবে আহত হন। মেজর মহসিন এই ব্যাটালিয়নের অধিনায়কের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ২ নভেম্বর গোয়েঘাট দখল করে সিলেটের পথে অগ্রযাত্রা আব্যাহত রাখেন।

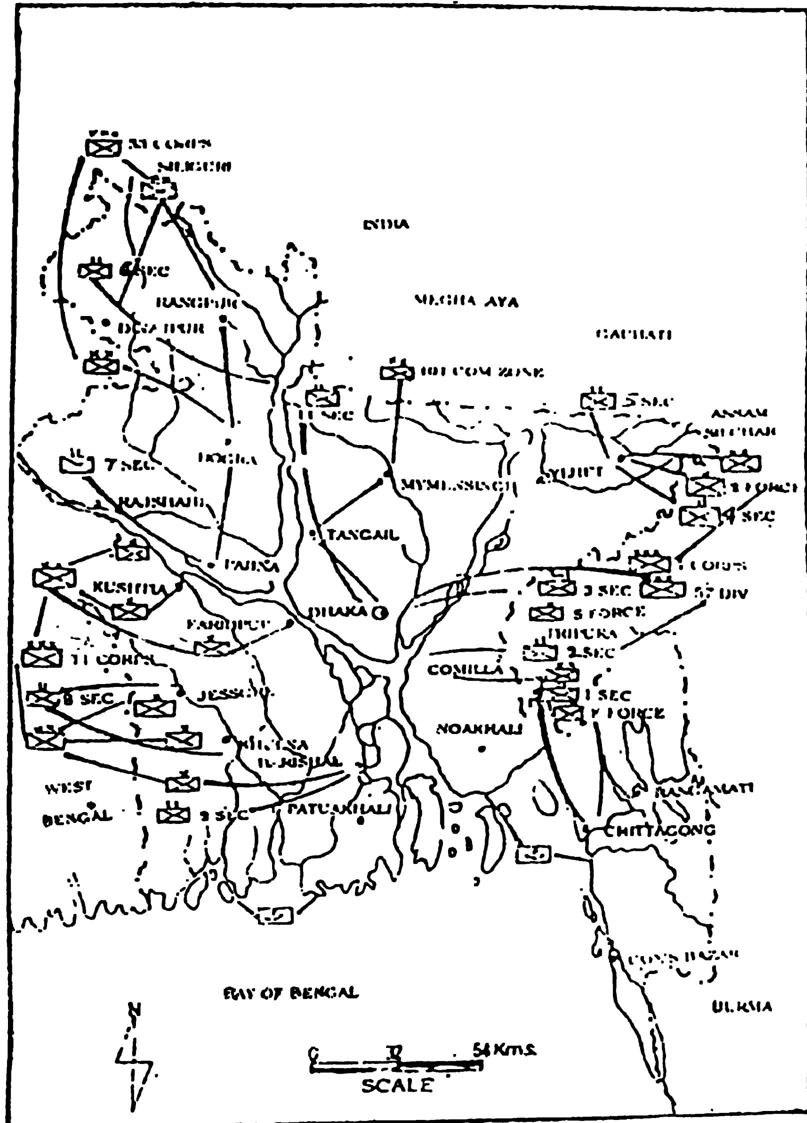
অষ্টম ইস্ট বেঙ্গলের অধিনায়ক মেজর আমিনুল হক নভেম্বরের মাঝামাঝি লাতু দখল করেন এবং ১ ডিসেম্বর কমলগঞ্জ মুক্ত করেন। পাকিস্তানী সৈন্যরা মুক্তিবাহিনীর অভিযানের ফলে মৌলভীবাজারের দিকে পশ্চাদপসরণ করে। এক নম্বর সেক্টরে পাকিস্তানী সৈন্যরা প্রায় সবক'টি যুদ্ধে পরাজিত হতে থাকে। দুই নম্বর সেক্টরে মুক্তিবাহিনী ডিসেম্বরের ১ তারিখে ফেনী দখল করে। চতুর্থ ও দশম ইস্ট বেঙ্গলের সৈন্যরা রেজুমিয়া ব্রীজ অভিমুখে অগ্রসর হয়। ক্যাপ্টেন মাহফুজের নেতৃত্বে এক নম্বর সেক্টরের সৈন্যরা এই ব্রীজে মিলিত হয় এবং ১ ডিসেম্বর যৌথভাবে ফেনী-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ধরে অগ্রসর হয়। একটি দল মুহুরী নদীর পাড় দিয়ে ডান দিকে অগ্রসর হয় এবং অপর একটি দল মহাসড়ক ধরে বামদিকে অগ্রসর হয়ে চট্টগ্রামের দিকে ধাবিত হয়। ১ ডিসেম্বর পাকিস্তানী সৈন্যরা ছাগলনাইয়া থেকে পিছু হটে যায়।

চতুর্থ ও দশম ইস্ট বেঙ্গলের সৈন্যরা এবং ক্যাপ্টেন মাহফুজের নেতৃত্বে অগ্রসরমান সৈন্যরা ৯ ডিসেম্বর জোরারগঞ্জ পৌঁছে। এখানে মিত্রবাহিনীর ৩২ মাহার রেজিমেন্টের সৈন্যরা মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে মিলিত হয় এবং পাকিস্তানী অবস্থানের উপর তীব্র আক্রমণ চালায়। গোলন্দাজ সহায়তায় পাকিস্তানী সৈন্যরা পশ্চাদপসরণ করে। জোরারগঞ্জ যুদ্ধে ১২ জন মুক্তিযোদ্ধা নিহত হয়। পাকিস্তানী সৈন্যরা পিছু হটার সময় শুভপুর ব্রীজসহ সকল ব্রীজ ধ্বংস করে দেয়। মিত্রবাহিনীর ৮৩ মাউন্টেন ব্রিগেড এবং মুক্তিবাহিনী যৌথভাবে

মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর অগ্রাভিযান পরিশিষ্ট-৪-এ দেওয়া হয়েছে।

# মুক্তিবাহিনী ও মিত্র বাহিনীর অগ্রাভিযান

পরিশিষ্ট-৪



অগ্রসর হয়ে ১১ ডিসেম্বর সীতাকুন্ড এলাকায় চন্দ্রকান্ত মন্দিরে পৌঁছে যায়। যৌথবাহিনী ১৬ ডিসেম্বর সকালে কুমিরা দখল করে এবং ঐ দিনই চট্টগ্রাম শহরে পৌঁছে। সেক্টর কমান্ডার মেজর রফিকুল ইসলাম সার্কিট হাউসে তাঁর সদর দপ্তর স্থাপন করেন এবং ক্যাপ্টেন মাহফুজ চট্টগ্রাম স্টেডিয়ামে তাঁর সৈন্যসহ অবস্থান গ্রহণ করেন। চট্টগ্রাম ক্লাবের বিপরীতে রেলওয়ে ভবনে ৮৩ মাউন্টেন ব্রিগেডের সদর দপ্তর স্থাপিত হয়।[৩৫]

দুই নম্বর সেক্টর এবং কে ফোর্সের দশম ইস্ট বেঙ্গল ৭ ডিসেম্বর নোয়াখালী দখল করে এবং চট্টগ্রাম অভিমুখে ধাবিত হয়। যৌথবাহিনী ১৩ ডিসেম্বর কুমিরার মাত্র ৪ মাইল পেছনে পৌঁছে যায়। নবম ইস্ট বেঙ্গল এবং চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল যথাক্রমে মেজর আইনউদ্দিন এবং ক্যাপ্টেন গাফফারের নেতৃত্বে অগ্রসর হয়। ১৪ ডিসেম্বর ক্যাপ্টেন জাফর ইমামের নেতৃত্বে দশম ইস্ট বেঙ্গল কুমিরা পৌঁছে এবং পাহাড়ী এলাকা দিয়ে হাটহাজারীর দিকে অগ্রসর হয়। ঐ দিনই তারা হাটহাজারী পৌঁছে এবং ১৫ ডিসেম্বর পাকিস্তানী অবস্থান আক্রমণ করে। ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের মেজর হাদি তাঁর অধীনস্থ এক কোম্পানী সৈন্যসহ আত্মসমর্পণ করে। তিন নম্বর সেক্টরে মুক্তিবাহিনী ৩০ নভেম্বর আখাউড়া পাকিস্তানী অবস্থানের উপর প্রচন্ড আক্রমণ করে। এ যুদ্ধ কয়েকদিন স্থায়ী হয়। মুক্তিবাহিনী আযমপুর রেলওয়ে স্টেশন ১ ডিসেম্বর ভোর ছটার সময় দখল করে নেয়। পাকিস্তানী সৈন্যরা ২ ডিসেম্বর পুনরায় আক্রমণ করে। মুক্তিবাহিনী সাময়িকভাবে পেছনে সরে আসে এবং ২ ডিসেম্বর আবার আক্রমণ করে। ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই যুদ্ধ স্থায়ী হয়। ৫৭ মাউন্টেন ডিভিশন আখাউড়া যুদ্ধে যোগ দেয়। ৪ ডিসেম্বর বহুসংখ্যক পাকিস্তানী সৈন্য নিঃশর্তভাবে আত্মসমর্পণ করে। অবশিষ্ট পাকিস্তানী সৈন্য ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে পলায়ন করে। লেফটেন্যান্ট বদিউজ্জামান, নায়েক সুবেদার আশরাফ আলী খান, সিপাহী রুহুল আমিন, সিপাহী শাহাবউদ্দিন ও সিপাহী মুস্তাফিজুর রহমান আখাউড়া যুদ্ধে নিহত হন।[৩৬]

আখাউড়া দখলের পর দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে মুক্তিবাহিনী ব্রাহ্মণবাড়িয়া অভিমুখে অগ্রসর হয়। প্রথম দলটি দক্ষিণ দিক থেকে ব্রাহ্মবাড়িয়া আক্রমণ করে এবং দ্বিতীয় দলটি উত্তর দিক থেকে সিলেট সড়ক দিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় প্রবেশ করে। ৮ ডিসেম্বর এস কোর্স-এর ১১ ইস্ট বেঙ্গল শাহবাজপুর নিয়ন্ত্রণে আনে। ইতিমধ্যে ৫৭ মাউন্টেন ডিভিশন ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌঁছে যায়। পাকিস্তানী সৈন্যরা পশ্চাদপসরণ করে আশুগঞ্জ-ভৈরব বাজারে অবস্থান গ্রহণ করে। ৯ ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনী এবং মিত্র বাহিনীর ৩১১ মাউন্টেন ডিভিশনের অধীনস্থ ব্যাটালিয়নসমূহ আশুগঞ্জের দিকে অগ্রসর হয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ১৪ ডিভিশনের সৈন্যরা আখাউড়ায় সুদৃঢ় প্রতিরক্ষা অবস্থান গড়ে তুলেছিল। মিত্র বাহিনীর ১৮ রাজপুত রেজিমেন্ট, এস কোর্স ও তিন নম্বর সেক্টরের সৈন্যরা প্রচণ্ড যুদ্ধের পর ১০ ডিসেম্বর পাকিস্তানী সৈন্যদের প্রতিরক্ষাব্যূহ ভেঙ্গে ফেলে এবং আশুগঞ্জে প্রবেশ করে।

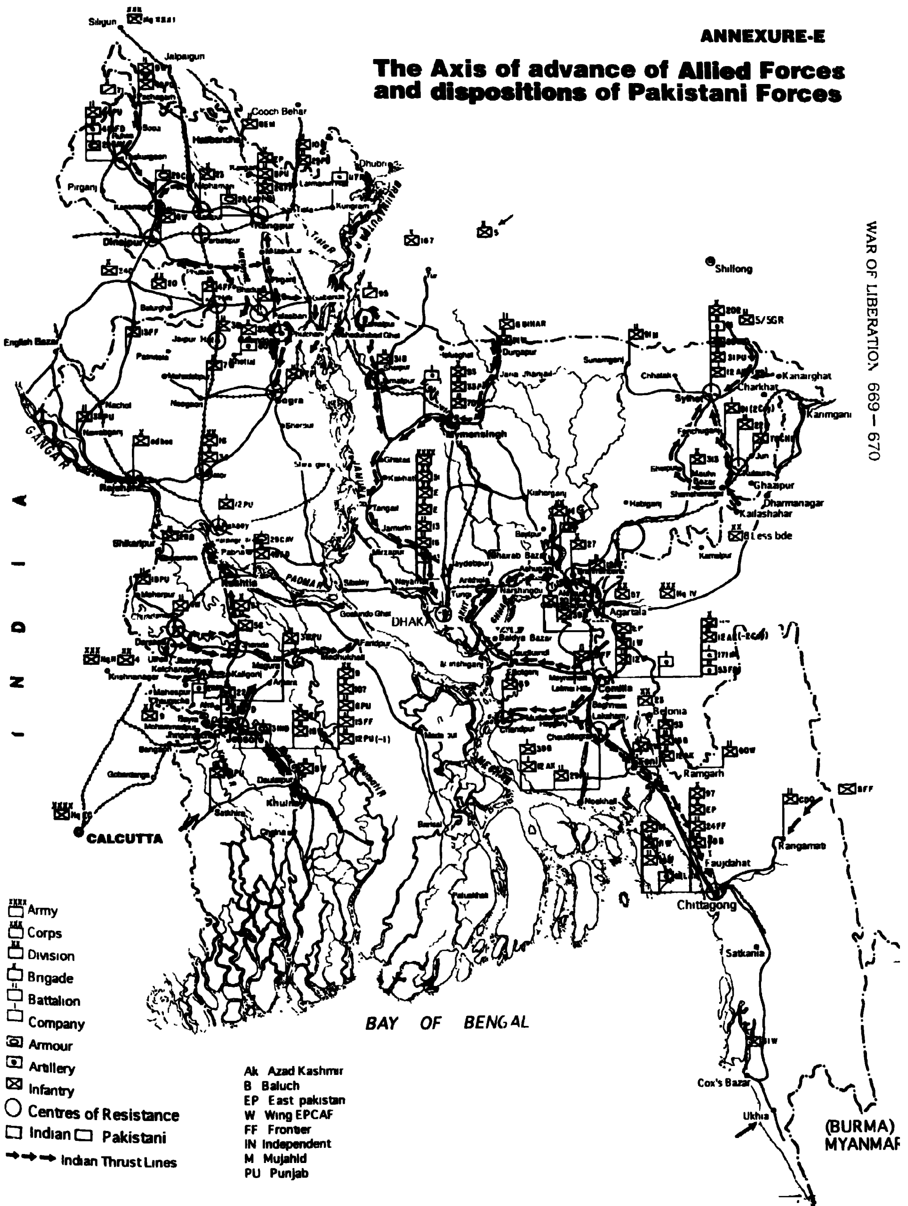
৩৫. Shafiullah,. *Bangladesh at War,* 201-203.

৩৬. পূর্বোক্ত, 180.

পরিশিষ্ট ৫

**ANNEXURE-E**

# The Axis of advance of Allied Forces and dispositions of Pakistani Forces




WAR OF LIBERATION 669 – 670

মিত্রবাহিনীর ১ স্কোয়াড্রন ট্যাংক এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। পাকিস্তানী সৈন্যরা ১০-১১ ডিসেম্বর আশুগঞ্জ থেকে পশ্চাদপসরণ করে ভৈরবে অবস্থান গ্রহণ করে।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর ১৯ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের সৈন্যরা ১১ ডিসেম্বর হেলিকপ্টারযোগে মেঘনার অপর তীরে অবতরণ করে। মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী অগ্রসরমান পাকিস্তানী সৈন্যদের গতিরোধ করে। অনন্যোপায় হয়ে পাকিস্তানী সৈন্যরা ভৈরব ব্রীজ ধ্বংস করে। মিত্রবাহিনীর ৭৩ মাউন্টেন ব্রিগেড এবং মুক্তিবাহিনীর এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য ভৈরববাজার ঘিরে ফেলে। অপরদিকে দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল ১০ বিহার ও ১৮ রাজপুত নরসিংদী অভিমুখে অগ্রসর হয়। দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল ১২ ডিসেম্বর রায়পুরা ও ১৩ ডিসেম্বর নরসিংদী পৌঁছে। মিত্রবাহিনীর ৪ জাট রেজিমেন্ট এবং মুক্তিবাহিনীর দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল নরসিংদী ডেমরা সড়ক ধরে বরপা পৌঁছে যায় এবং ভুলতা–মুরাপাড়া-রূপগঞ্জ হয়ে ঢাকার পথে অভিযান অব্যাহত রাখে। ১৪ ডিসেম্বর দ্বিতীয় এবং ১০ বিহার রেজিমেন্ট বালু নদী পর্যন্ত দখল করে। ১৬ ডিসেম্বর দুপুর বারোটা পর্যন্ত ঢাকা-ডেমরা সড়কে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলে। কর্নেল খিলজির নেতৃত্বে পাকিস্তানী সৈন্যরা অপরাহ্ন দুই ঘটিকার সময় মাতুয়াইলে যৌথ বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করে।

মিত্রবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার সাবেক সিং ও মুক্তিবাহিনীর লেঃ কর্নেল শফিউল্লাহ ১৬ ডিসেম্বর ৩টা ৩০ মিনিটে ঢাকা বিমানবন্দরে পৌঁছে যান।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে পাকিস্তানী সৈন্যদের শক্তিশালী অবস্থানগুলোকে পাশ কাটিয়ে তীব্র গতিতে সামনের দিকে অগ্রসর হওয়াই ছিল ভারতীয় যুদ্ধপরিকল্পনার মূল বিষয়। কলিকাতায় অবস্থিত দ্বিতীয় কোরের দুই ডিভিশন সৈন্য পদ্মার পশ্চিম তীরবর্তী এলাকা মুক্ত করার লক্ষ্যে ধাবিত হয়। লেঃ জেনারেল টি. রায়না দ্বিতীয় কোরের অধিনায়ক ছিলেন। একটি ব্রিগেড কুষ্টিয়ার দিকে, একটি ব্রিগেড মাগুরা-ফরিদপুরের দিকে এবং অপর একটি ব্রিগেড খুলনা-বরিশালের দিকে অগ্রসর হয়। অবশিষ্ট ব্রিগেডগুলো খুলনা-যশোর-ভেড়ামারা রেলওয়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে শত্রুসৈন্যদের অগ্রযাত্রা ব্যাহত করে।[৩৭]

মুক্তিবাহিনী ইতিমধ্যে চুয়াডাঙ্গা মুক্ত করেছিল। মিত্রবাহিনীর ব্রিগেডসমূহ কোন বাধা ছাড়াই ঝিনাইদহ দখল করে শত্রুর যোগাযোগব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে। ঝিনাইদহের পতনের পর পাকিস্তানী সৈন্যরা মাগুরায় অবস্থান গ্রহণ করে এবং যশোরের পতনের পর তারা খুলনায় অবস্থান নেয় এবং দক্ষিণ দিক থেকে যৌথ বাহিনীর সম্পূর্ণ এলাকা দখল করে। যৌথ বাহিনী কর্তৃক মাগুরা আক্রান্ত হলে পাকিস্তানী সৈন্যরা মধুমতি নদীর তীরবর্তী কামারখালী এলাকায় অবস্থান নেয় এবং ফরিদপুরে পশ্চাদপসরণের চেষ্টা করে। ইতিমধ্যে মিত্রবাহিনীর একটি ব্রিগেড ফরিদপুর দখল করেছিল। এমতাবস্থায় ১১ ডিসেম্বর নাগাদ পাকিস্তানী সৈন্যদের আত্মসমর্পণ ব্যতীত কোন গত্যন্তর ছিলনা।

৩৭. Palit, *The Lightning Campaign*, 139.

লেঃ জেনারেল এম.এল. থাপানের নেতৃত্বে তেত্রিশ কোরের এক ডিভিশন সৈন্য হিলি আক্রমণ করে এবং রংপুর ও দিনাজপুরে অবস্থানরত পাকিস্তানী সৈন্যদের শক্তিশালী প্রতিরক্ষা অবস্থানে মিত্রবাহিনীর দুইটি ব্রিগেড প্রচণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত হয়। ৭ নম্বর সেক্টরের মুক্তিবাহিনী চাঁপাই নবাবগঞ্জে সাঁড়াশি আক্রমণ চালায়। লেঃ রফিক ও লেঃ রশিদ তাদের বাহিনী সহ রহনপুর-আমনুরা-নবাবগঞ্জ অক্ষরেখা বরাবর অগ্রসর হয়।

অপর দিকে বীরশ্রেষ্ঠ কাপ্টেন জাহাঙ্গীর তাঁর বাহিনীসহ শিবগঞ্জ-নবাবগঞ্জ অভিযান অব্যাহত রাখেন। ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীর ১৩ ডিসেম্বর নবাবগঞ্জ বারঘোরিয়া নামক স্থানে শত্রুর পরিখায় গ্রেনেড নিক্ষেপকালে নিহত হন। নবাবগঞ্জ ১৪ ডিসেম্বর শত্রুমুক্ত হয়। মেজর গিয়াসের নেতৃত্বে ১৬ ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনী রাজশাহী পৌঁছে যায়। পলায়নরত পাকিস্তানী সৈন্যরা নাটোরে যৌথ বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করে। অন্যদিকে ১৪ ডিসেম্বর ক্যাপ্টেন ইদ্রিসের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনী দিনাজপুরে প্রবেশ করে। ১৬ ডিসেম্বর বগুড়া শত্রুমুক্ত হয়।

পাকিস্তানী ১৬ ডিভিশনের অধিনায়ক মেজর জেনারেল নজর হোসেন শাহকে ৮ ডিসেম্বর লেঃ তারেকের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনী পীরগঞ্জে এমবুশ করে। অল্পের জন্য তিনি প্রাণে বেঁচে যান এবং স্থানীয় বাসে চড়ে রংপুর পৌঁছেন।[৩৮]

এগারো নম্বর সেক্টরের সৈন্যরা কামালপুর শত্রুমুক্ত করে এবং পরবর্তী দুই দিনের মধ্যে বক্সীগঞ্জ ও মোরাপুর দখল করে। ৭ ডিসেম্বর দেওয়ানগঞ্জ এবং বাহাদুরাবাদ দখলের পর মুক্তিবাহিনী ট্রেনযোগে জামালপুরের দিকে অগ্রসর হয়। ১১ ডিসেম্বর জামালপুর মুক্তিবাহিনীর হস্তগত হয়। অতঃপর মুক্তিবাহিনী ময়মনসিংহ হয়ে ঢাকা অভিমুখে অগ্রসর হয় এবং ১৪ ডিসেম্বর ঢাকার উপকণ্ঠে পৌঁছে যায়। ১০১ কম্যুনিকেশন জোনের অধিনায়ক মেজর জেনারেল জি. এস. গিল এক ব্রিগ্রেড সৈন্যসহ ৯ ডিসেম্বর জামালপুর পৌঁছে যান।

যুদ্ধে মেজর জেনারেল গিল গুরুতরভাবে আহত হলে মেজর জেনারেল নাগরা অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন এবং অপর একটি ভারতীয় ব্রিগেড নিয়ে ঢাকার পথে যাত্রা শুরু করেন। টাঙ্গাইলের বিশাল এলাকা কাদেব সিদ্দিকীর বাহিনী শত্রুমুক্ত করে। ১২ ডিসেম্বর টাঙ্গাইল শহরের কয়েক মাইল উত্তরে একটি ভারতীয় প্যারা ব্রিগেড বিমান হতে অবতরণ করে। টাঙ্গাইলের পতন হয়। প্যারা ব্রিগেড এবং কাদের বাহিনী ঢাকা অভিমুখে অগ্রসর হয়।

৩৮. Major General Lachhman Singh PVSM VrC, *Indian Sword Strikes in East Pakistan* (1979), 93; Shafiullah, *Bangladesh at War*, 188.

লেঃ জেনারেল সাগত সিং-এর নেতৃত্বে চতুর্থ কোরের তিনটি ডিভিশন সুরমার দক্ষিণে এবং মেঘনার পূর্বে অবস্থিত এলাকা দখলের জন্য ধাবিত হয়। চট্টগ্রামের দিকে পাকিস্তানী সৈন্যদের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে মেঘনা নদী অতিক্রম করে ঢাকার পথে অগ্রসর হওয়া এদের উদ্দেশ্য ছিল। এক ডিভিশন সৈন্য শিলচর-করিমগঞ্জ অক্ষরেখা বরাবর সিলেট অভিমুখে, এক ডিভিশন সৈন্য আখাউড়া-আশুগঞ্জ অক্ষরেখা বরাবর ঢাকা অভিমুখে এবং এক ডিভিশন সৈন্য কুমিল্লা, লাকসাম ও ফেনী দখল করে চট্টগ্রামের দিকে যোগাযোগব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করার জন্য অগ্রসর হয়।

২-৩ ডিসেম্বর রাতে চার নম্বর সেক্টরের সৈন্যরা কানাইরঘাট দখল করে। যৌথ বাহিনী ১২ ডিসেম্বর হরিপুর আক্রমণ করে। প্রথম ইস্ট বেঙ্গল, ৪ নম্বর সেক্টরের সৈন্যরা ও মিত্র বাহিনী সিলেটের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল মৌলভীবাজার হয়ে সিলেটের পথে অগ্রসর হয়। পাঁচ নম্বর সেক্টরের সৈন্যরা এবং তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল গোয়েনঘাট ও ছাতক দখলের পর সিলেটের দিকে অগ্রসর হয়। ১৫ ডিসেম্বর খাদিমনগরে পাকিস্তানী সৈন্যদের আক্রমণ করা হয়। ১৬ ডিসেম্বর খাদিমনগরের পতন ঘটে।

১০১ কম্যুনিকেশন জোনের অধিনায়ক মেজর জেনারেল নাগরা এবং ১১ নম্বর সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধারা ১৪ ডিসেম্বর টঙ্গী এবং ১৬ ডিসেম্বর সকালে সাভার পৌঁছে যায়। পাকিস্তানী ৩৬ ডিভিশনের অধিনায়ক মেজর জেনারেল জামশেদ মিরপুর ব্রিজে মেজর জেনারেল নাগরাকে অভ্যর্থনা জানান। সকাল ১০-১০ মিনিটে শ্লোগানে শ্লোগানে মুখরিত লক্ষ লক্ষ মানুষের জয়ধ্বনির মধ্যে মুক্তিবাহিনী ও মিত্র বাহিনী ঢাকা শহরে প্রবেশ করে। অপরাহ্ন একটায় ভারতীয় ইস্টার্ণ কমান্ডের চীফ অব স্টাফ মেজর জেনারেল জ্যাকব আত্মসমর্পণের দলিলসহ ঢাকা বিমানবন্দরে অবতরণ করেন। ঐ দিনই বিকাল চারটায় লেঃ জেনারেল অরোরা ও তাঁর স্টাফ অফিসারগণ হেলিকপ্টারযোগে ঢাকা বিমানবন্দরে অবতরণ করেন।

বাংলাদেশ বাহিনীর ডেপুটি চীফ অব স্টাফ গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে. খন্দকার মুক্তিবাহিনীর প্রতিনিধি হিসেবে জেনারেল অরোরার সঙ্গে আসেন। পরাজিত পাকিস্তানী অধিনায়ক লেঃ জেনারেল এ. এ. কে. নিয়াজী বিমানবন্দরে লেঃ জেনারেল অরোরাকে অভ্যর্থনা জানান। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিকাল পাঁচটা এক মিনিটে রমনা রেস্‌কোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) লেঃ জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা এবং লেঃ জেনারেল নিয়াজী তাঁদের অধীনস্থ বাহিনীর পক্ষে আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষরদানের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর কবল থেকে মুক্ত হয় এবং স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।[৩৯]

৩৯. আত্মসমর্পণের মূলপাঠ সিদ্দিক সালিক প্রণীত *Witness to Surrender* গ্রন্থে পরিশিষ্ট ৩ হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে।

**উপসংহার**

অবশেষে বন্দুকের শক্তি পরাজিত হয় এবং বীর জনতার বিজয় হয়। পৃথিবীর মানচিত্রে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের মাধ্যমে এই বিজয় অর্জিত হয়। বাঙালি জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে লক্ষ লক্ষ শহীদের আত্মত্যাগ, সাহস ও দেশপ্রেম দৃষ্টান্তমূলক মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হবে।

এভাবে পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবি স্বাধিকার অর্জনের দাবিতে পরিণত হয় এবং অবশেষে শান্তিপূর্ণ সমঝোতার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে পাকিস্তানী সৈন্যদের জঘন্যতম গণহত্যার জবাবে বাঙালি জাতি পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

বেসামরিক জনগণ এবং সামরিক বাহিনীর সদস্যরা সম্মিলিতভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে। রাজনৈতিক নেতৃত্ব, জনগণের অংশগ্রহণ এবং বাঙালি সৈন্যদের সামরিক দক্ষতা বাংলাদেশ স্বাধীন করার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। এই বিজয় জনগণের সুদৃঢ় সংকল্প ও বাঙালি সৈন্যদের অংশগ্রহণের ফলে অর্জিত হয়। পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে পরিচালিত বেসামরিক জনতা ও সামরিক বাহিনীর সদস্যদের প্রতিরোধযুদ্ধ সফলতা লাভ করে এবং জাতীয় ইতিহাসে এক স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায় সৃষ্টি করে।

# ২২

# বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ : বৃহৎ শক্তি প্রতিক্রিয়া

আবুল কালাম*

একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর থেকে এ দেশের মুক্তযুদ্ধ বিষয়ে স্বাভাবিকভাবেই গবেষণা ও বিশ্লেষণের প্রবণতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে আসছে ; বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে গভীরতর আগ্রহের সঞ্চার হয়ে চলেছে।[১] মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বিশ্বশক্তিবর্গের রাজনৈতিক মেরুকরণ ও মৈত্রীসম্পর্কের দৃষ্টিকোণ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন (বর্তমানে রাশিয়া) ও গণচীনের মতো বিশ্বের বৃহৎ শক্তিসমূহের হস্তক্ষেপমূলক ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।[২] রাজনৈতিকভাবে অধিকার বা কর্তৃত্ব আরোপ না করা হলেও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বৃহৎ শক্তিবর্গ মহা দায়িত্বের দাবিদার। এটা বৃহৎ শক্তি মাত্রেরই স্বঘোষিত বা অঘোষিত ভাবমূর্তি। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বৃহৎ শক্তিবর্গ তা'দের নিজ নিজ ভাবমূর্তির

---

* অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. ভারত, জাতিসংঘ, বিশ্বের বৃহৎ শক্তিবর্গ ও বিশ্বজনমতের দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মতামত দ্রুত পর্যালোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল* (ঢাকা : তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২)। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে বৃহৎ শক্তিবর্গের ভূমিকা সম্পর্কিত লেখকের বিশ্লেষণধর্মী পূর্বেকার লেখালেখির মধ্যে রয়েছে, "Bangladesh Independence Movement, South Asia and the Great Power Triangle. A Strategic Re-assessment" in Emajuddin Ahamed and Abul Kalam (eds.), *Bangladesh, South Asia and the World* (Dhaka, 1992)

২. দৃষ্টান্ত হিসেবে দ্রষ্টব্য, Dilara Chowdhury, *Bangladesh and the South Asian International System* (Dhaka 1992); Richard Sisson and Leo E. Rose, *War and Secession : Pakistan, India and the Creation of Bangladesh* (New Delhi, 1990); A. M A. Muhith, *American Response to Bangladesh War of Independence* (Dhaka 1996); Rashid-ul Ahsan Chowdhury, "United States Foreign Policy in South Asia : 1971," *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh*, vol. 35, No. 1 (June 1990).

সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিটি ঘটনা মূল্যায়ন করে থাকে এবং তাদের প্রতিক্রিয়া নির্ধারিত হয় ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে। বাংলাদেশের জন্য ১৯৭১ সন ছিল যুগসন্ধিক্ষণ, ঘটনাবহুল। ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনের পর থেকে একের পর এক ঘটনা ঘটেছে পূর্ব পাকিস্তানকে ঘিরে এবং পরে ঘটেছে মার্চে পাকিস্তানী বাহিনীর নৃশংসতা। এসবের প্রত্যুত্তরে বাঙালিরা স্বাধীনতাযুদ্ধ শুরু করে। এসব ঘটনা যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে। ফলে বৃহৎ শক্তিবর্গ সাড়া না দিয়ে পারে নি। প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ সময় থেকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় পাকিস্তানের ব্যাপারে হস্তক্ষেপমূলক নীতি গ্রহণের তাগিদ অনুভব করে। পার্শ্ববর্তী দেশ হিসেবে ভারতের প্রতিক্রিয়া ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ক্রমান্বয়ে বিশ্বের অন্যান্য শক্তিবর্গও এ বিষয়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠে, এসব শক্তির প্রতিক্রিয়া কি ধরনের ছিল ? মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত আলোচনা ও বিশ্লেষণের পর্যায়ে মোটামুটি এসব বিষয় এ প্রবন্ধে পর্যালোচিত হয়েছে।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের রাত্রে পাকিস্তানের সামরিক সরকার পূর্ব পাকিস্তানে নৃশংস সামরিক অভিযান ('Operation Searchlight') পরিচালনা করে। এ ঘটনায় বিশ্বের তিনটি প্রধান শক্তি দৃশ্যত হতবাক হয় এবং এ ঘটনার পর থেকে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে প্রতিটি বিশ্বশক্তি বাংলাদেশ সংকটে জড়িয়ে পড়ে।[৩] তবে এমন বলা সমীচীন হবে না যে, বিশ্বের নীতিনির্ধারক শক্তিগুলোর বাংলাদেশ সংকট সম্পর্কিত কোনরূপ পরিকল্পিত নীতি ছিল। বরং লক্ষণীয় যে এ সংকট চলাকালে ওয়াশিংটন, মস্কো ও বেইজিং-এর প্রতিক্রিয়ায় বিভ্রান্তি, সংশয় ও দোদুল্যমানতার উপাদান পরিস্ফুট হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঘটনাপ্রবাহের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখে। এ প্রক্রিয়ায় ওয়াশিংটন বারবার পাকিস্তানী বাহিনীর হাতে প্রাণহানি, ধন-সম্পদের ক্ষয়-ক্ষতি এবং তাদের দ্বারা জনজীবনের জন্য কষ্টদায়ক পন্থা অবলম্বনের কারণে উদ্বেগ প্রকাশ করে। পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানে "ন্যায্য তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রমের" উপর বিধি-নিষেধ আরোপের কারণেও মার্কিন উদ্বেগ ব্যক্ত হয়। স্বাভাবিক কারণে আগ্রাসনের শিকার পূর্ব পাকিস্তানের বিক্ষুব্ধ ও আন্দোলনরত জনগণের জন্য আমেরিকায় যথেষ্ট সহানুভূতি পরিলক্ষিত হয় এবং সেই প্রভাব বাংলাদেশ সম্পর্কে মার্কিন নীতিতেও প্রতিফলিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানে খাদ্যঘাটতি পূরণে আন্তর্জাতিক ত্রাণসাহায্যে মার্কিন অবদান ও অনুদান এবং একই সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান থেকে বিতাড়িত ও ভারতীয় শরণার্থীশিবিরে আশ্রয়প্রাপ্ত লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশীর জন্য মার্কিন খাদ্যসাহায্যে মার্কিন জনগণের সহানুভূতি প্রকাশ পায়।[৪]

৩. শুধুমাত্র ১৯৭১-এর এপ্রিলের দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দ্রুত পর্যায়ে কয়েকটি 'Position Paper' এবং 'Report' তৈরী করা হয়। বিশেষত কিভাবে মার্কিন বাংলাদেশ সমস্যা মোকাবেলা করতে হবে সেই বিষয়ে সরকারের নীতি নির্ধারণ সম্পর্কিত সুপারিশমালা সংযোজিত হয়। দ্র : প্রাগুক্ত. পৃ : ৪৭-৬২।

৪. দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা চলে, "The Crisis in East Pakistan Statements by the Department of State Press Spokesman", March 26, 31, April 2, 5, 6, 7, 12, 13, 15, 27, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল*। Vol. 13 পৃঃ ২০১-২১৫।

পক্ষান্তরে, মস্কো ও বেইজিং-এর প্রতিক্রিয়া ছিল কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির, যদিও তা ছিল কম্যুনিস্ট কূটনীতির চিরাচরিত ভাবধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কার্যত, এ দু'টি সরকারের কোনটাই ভাষাগত উদ্বেগ ও আশংকার ঊর্ধ্বে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশে কি ঘটছে বা না ঘটছে সেই ব্যাপারে কোনরূপ উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণে অনীহার ভাব প্রদর্শন করে। দক্ষিণ এশিয়া, বিশেষকরে ভারত থেকে প্রকাশিত প্রায় সকল লেখায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের ভূমিকাকে প্রায়শই বিতর্কিতভাবে দেখাবার প্রয়াস মেলে; পক্ষান্তরে সোভিয়েত ভূমিকা ইতিবাচক দৃষ্টিতে তুলে ধরা হয়।

একথা সম্ভবত সত্য যে, বাংলাদেশের সংকটকালে দক্ষিণ এশীয় দেশসমূহের নীতি নির্ধারণে বিশ্বের বৃহৎ শক্তিবর্গ যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে; কিন্তু কিছু কিছু লেখক ও বিশ্লেষক এসব শক্তির প্রতিপত্তিকে অতিরঞ্জিত করে দেখাতে প্রয়াসী হন, এমনকি তাদের ক্ষমতার ভুল ব্যাখ্যাও প্রদান করেন।[৫] আজো অনেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বাঙালিদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি অবজ্ঞার ভাব প্রদর্শন করে পাকিস্তানী নৃশংস সামরিক জান্তার প্রতি অব্যাহত সমর্থন প্রদানের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করেন।[৬] তেমনি 'নীতিবিবর্জিত' ও পাকিস্তানপন্থী অবস্থান গ্রহণের দায়ে চীনও নিন্দাবাদের শিকার হচ্ছে।[৭]

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পর প্রায় তিন দশক অতিক্রান্ত হতে চলেছে। ইতিমধ্যে বিশ্বের রাজনীতির দাবাখেলায় অনেক নাটকীয় পরিবর্তনের ধারা পরিলক্ষিত হয়েছে। নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত রাষ্ট্রসমূহের অভ্যন্তরীণ সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থানের ক্ষেত্রেও। এসব পরিবর্তন সত্ত্বেও বিগত দশকগুলোতে স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে মোটামুটি সামঞ্জস্যপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করে আসছে। সেই নীতিগত অবস্থান বাংলাদেশের সংকটকালে বিশ্বসম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গির ইঙ্গিত বহন করে। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের অনেক দলিল ও প্রমাণপত্র এখন গবেষকদের সমীপে উপস্থাপিত হয়েছে। গবেষক ও বিশ্লেষকমাত্রই এসব থেকে লাভবান হতে পারেন, পুনর্মূল্যায়ন করতে পারেন সামগ্রিক সমস্যার। এই প্রক্রিয়ায় তাঁরা মুক্তিযুদ্ধোত্তর অনেকটা ভাবাবেগ ও অনুভূতিপ্রসূত অবস্থান পুনর্মূল্যায়ন করতে পারেন, উপস্থাপন করতে পারেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন বৃহৎ শক্তিবর্গের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে অধিকতর বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ।

---

৫. দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা চলে যে, একজন বিশ্লেষক "বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের বিষয়কে দুটো পরাশক্তি ও কয়েকটি বৃহৎশক্তির মিশ্র প্রক্রিয়ার ফল" বলে অভিহিত করেন। এ মতে, বৃহৎ শক্তিগুলোর একটি ছিল "প্রতিবেশী চীন এবং অতি উচ্চাভিলাষী কতিপয় মাঝারি ধরনের শক্তি, যাদের মধ্যে প্রতিবেশী ভারত ছিল একটি।" Dr. M. A. Aziz, "Bangladesh Relations with India", *Endeavor*, Vol 8, Nos. 10 and 11 (February 1989).

৬. Dilara Chowdhury, *প্রাগুক্ত*, 75, 82.

৭. দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ্য, "China and the Emergence of Bangladesh: Role of Great Power Global Perceptions", *India Quarterly*, Vol. 39, No, 2 (April-June 1983).

কোন কোন লেখক এরূপ বক্তব্য উপস্থাপন করে আসছেন যে, বৃহৎ শক্তিবর্গ ইচ্ছা করলে পূর্ব পাকিস্তানে সহিংসতা রোধ করতে পারতো, সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারতো দ্বন্দ্বের শান্তিপূর্ণ সমাধান বিধানে। কিন্তু এ ধরনের দায়িত্ব সম্পাদন করার সাধ্য বা সদিচ্ছা কি তাদের ছিল ? সম্ভবত না। কেননা বৃহৎ শক্তিবর্গ একে অপরের বিরুদ্ধে বিশ্বরাজনীতির শক্তিদ্বন্দ্বে মেরুকরণপ্রক্রিয়ায় বিজড়িত ছিল । এ কারণে শান্তি কিংবা সহিংসতা কিছুই তাদের স্বাভাবিক অভিন্ন অভিলাষ বা অভিরুচিতে ধরা পড়ে না। পূর্ব পাকিস্তানে শান্তি সংরক্ষিত হলে এক শক্তিজোটের জন্য তা স্বস্তির বিষয় হলেও পক্ষান্তরে বিরোধী জোটে পাল্টা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির অবকাশ থাকে। কোন কোন বিশ্লেষক প্রায়শ এ ধরনের অভিমত ব্যক্ত করে থাকেন যে, পাকিস্তানের ভাঙন ও স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ছিল আন্তর্জাতিক শক্তি-রাজনীতির ফসল। এ ধরনের বক্তব্যে বস্তুত বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভূমিকাকে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়ে থাকে, তুচ্ছ করে দেখা হয় পাকিস্তানী সরকারের নৃশংসতার প্রত্যুত্তরে বাঙালিদের আত্মত্যাগ ও তিতিক্ষার ইতিহাসকে। বাংলাদেশ-পাকিস্তান দ্বন্দ্ব ছিল শূন্যমান প্রকৃতির—'হয় হার, না হয় জিত' ভিত্তিক সেই শূন্যমানের খেলার প্রেক্ষাপটে একথা বলা সমীচীন নয় যে, বাংলাদেশ সংকটের শান্তিপূর্ণ সমাধানে বৃহৎ শক্তিবর্গের নিছক সৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত পারস্পরিক সহযোগিতাই যথেষ্ট ছিল।

উপর্যুক্ত বিষয়াদি প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে নিরাপত্তা, রণনীতি ও পররাষ্ট্রনীতির সমন্বিত দৃষ্টিকোণ থেকে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করে প্রবন্ধে এরূপ যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন বৃহৎ শক্তির দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তাদের পারস্পরিক নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক সম্পর্কের ফলশ্রুতিমাত্র; এতে প্রতিফলিত হয় তাদের নিজ নিজ জাতীয় স্বার্থের অন্বেষার প্রয়াস—বাঙালিদের ও পাকিস্তানীদের একত্রে নির্ভরশীল করে রাখা বা তাদের স্বাধীনতা আদায়ের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কোন প্রকার পরার্থী নীতিতে তারা কেউ অনুপ্রাণিত হয় নি। সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত দলিল-প্রমাণাদি ও গবেষণাকর্ম থেকে এরূপ দৃঢ় প্রত্যয় জন্মায় যে, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বৃহৎ শক্তিবর্গের কর্মকাণ্ড মার্চের গণহত্যা ও পরবর্তী স্বাধীনতা ঘোষণার পর্যায় থেকে কালক্রমে পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে বাঙালিদের অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ আন্দোলন জোরদার করে, এতে ব্যাঘাত ঘটায় নি । বস্তুত, এ সময় থেকে বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের স্বপ্নের মাতৃভূমি 'সোনার বাংলায়' পাকিস্তানী হানাদারদের বেআইনী দখলদার হিসেবে আন্তর্জাতিকভাবে তুলে ধরার প্রয়াস উত্তরোত্তর জনপ্রিয়তা লাভ করতে থাকে।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে বৃহৎ শক্তিবর্গের সম্পর্কের ক্ষেত্রে ১৯৭১ ছিল ক্রান্তিকাল। ১৯৬০-এর দশকব্যাপী এবং ১৯৭০ সন অবধি 'দক্ষিণ এশীয় কৌশলগত পরিবেশ সম্পর্কে মার্কিন ও সোভিয়েত দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে কিছু কিছু পরিবর্তন দেখা দেয়।

ফলে এ অঞ্চলে তাদের পররাষ্ট্রনীতির ব্যাপক প্রভাব পড়ে। তৎকালীন দু'টি পরাশক্তির ঐ সময়কার পরিবর্তনমুখী পররাষ্ট্রনীতি সূক্ষ্ম ও পরোক্ষভাবে একই সময়ে চীনকেও এ অঞ্চলের প্রতি তার ভূমিকা ও নীতি পুনর্নির্ধারণে প্ররোচিত করে। মার্কিন কৌশলগত নীতির ক্ষেত্রে এ সময়ে কিছু কিছু উপাদান চোখে পড়ার মতো। বিশ্বপরিমণ্ডলে আমেরিকার নিরাপত্তা দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে পরিবর্তন ছিল লক্ষণীয় এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে দক্ষিণ এশিয়ায় সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে গৃহীত নীতির ক্ষেত্রে তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। এসব সত্ত্বেও দক্ষিণ এশিয়ায় ঐতিহ্যগত মার্কিন কৌশলগত নীতির ধারায় এমন একটি ভাব বিদ্যমান ছিল, যাতে একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টির কোন কারণ ছিল বলে প্রতীয়মান হয় না

গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত পূর্বের দু'টি অধ্যায়ে মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর ঘটনাপ্রবাহ আলোচিত হয়েছে, যেসকল ঘটনা বা দুর্ঘটনায় পাকিস্তানী সরকার প্রবৃত্ত হয় ২৫ মার্চের নৃশংসতায়, বাধ্য করে বাংলাদেশের জনমানুষকে মুক্তিযুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে। উপর্যুক্ত ঘটনাবলীতে বিশ্বের বৃহৎ শক্তিবর্গ কিভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে এবং কিভাবে তারা তাদের নিজ নিজ নীতি নির্ধারণ করে বর্তমান অধ্যায়ে এসব বিষয়াদি বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

পূর্ব পাকিস্তান ও পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলেছিল বহুকাল থেকে। দ্বন্দ্ব নিরসনে দু'পক্ষের আলোচনায় অচলাবস্থা সৃষ্টি হয় ১৯৭১-এর মার্চ মাসে। সেই অচলাবস্থার পটভূমিতে ২৫ মার্চের রাত্রে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী অতর্কিতভাবে পূর্ব পাকিস্তানের বেসামরিক জনগণের উপর এক নিষ্ঠুর সামরিক হামলা পরিচালনা করে। সেই হামলার অন্তরালে মূল কারণ ছিল ১৯৭০-এর নির্বাচনে বিজয়ী রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের নিকট পাকিস্তানের সামরিক সরকার কর্তৃক ক্ষমতা হস্তান্তরে অনীহা। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ১৯৭০ সনে সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের জাতীয় সংসদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং ঐতিহ্যগত গণতান্ত্রিক রীতিনীতি অনুযায়ী আওয়ামী লীগেরই পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করার কথা। কিন্তু সামরিক সরকার গণতান্ত্রিক রায় অগ্রাহ্য করে সহিংসতার পথ বেছে নেয়। ফলে পূর্ব পাকিস্তান ও পাকিস্তানের সামরিক সরকারের মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়ে।

পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর মার্চের নৃশংসতার পরবর্তী নয় মাসকাল পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের সর্বত্র যে স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যুত্থান ঘটে, তা গ্রন্থের পূর্ববর্তী দুটি অধ্যায়ে সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ও তার সহযোগীদের নৃশংসতার শিকার হয়ে নিরাপত্তা অন্বেষণে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে। ইতিমধ্যে মুক্তিবাহিনী গঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তানে। এতে সামরিক বাহিনীর সদস্যদের

পাশাপাশি বেসামরিক জনগণও যোগ দেয়। দিকনির্দেশনা আসে নির্বাসিত সরকার থেকে। অভ্যন্তরীণভাবে পাকিস্তানে এভাবে সংগ্রাম শূন্যমানের রূপ পরিগ্রহ করে। অর্থাৎ বাংলাদেশ প্রশ্নে বিবদমান দু'পক্ষের দ্বন্দ্ব আলোচনার মাধ্যমে পান্তিপূর্ণ মীমাংসার ঊর্ধ্বে চলে যায়। ইসলামাবাদে অধিষ্ঠিত পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে রাজনৈতিক সমাধানে উপনীত হওয়ার বিষয় গ্রাহ্য করে বলে মনে হয় নি। পক্ষান্তরে, পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত প্রতিনিধিবর্গও বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে অনমনীয় হয়ে পড়ে। ফলে যুদ্ধ হয় অবধারিত।

বহিঃশক্তিবর্গ বাংলাদেশ প্রশ্নকে পাকিস্তানের গৃহযুদ্ধ পরিস্থিতি বলে মনে করে। বহিঃশক্তিবর্গের মধ্যে অবশ্যই ভারতের প্রসঙ্গ প্রথমেই আসে। ভারত হচ্ছে প্রধান আঞ্চলিক শক্তি। মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকে বাঙালিরা ভারত থেকে আশানুরূপ সাহায্য-সমর্থন লাভ করতে ব্যর্থ হয়, কেননা পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা আন্দোলন বা এ সম্পর্কিত ঘটনাপ্রবাহে জড়িয়ে পড়ার বিষয়ে নয়াদিল্লীতে খুব একটা উৎসাহের ভাব পরিলক্ষিত হয় নি। পরবর্তীকালে সংকট যতই ঘনীভূত হয়, দানা বেঁধে উঠে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, ভারত সরকারের আগ্রহ ততই বেড়ে চলে । শীঘ্রই নয়াদিল্লী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়ে। সুনির্দিষ্টভাবে সম্ভবত এটাও বলা চলে যে, পাকিস্তানের ভাঙনে নয়াদিল্লীর উত্তরোত্তর আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। ভারতের এ ধরনের আগ্রহের কারণ দু'ভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। রাজনৈতিকভাবে, পাকিস্তানের ভাঙন পাকিস্তানের স্রষ্টা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর দ্বিজাতিতত্ত্বের অসারতা প্রমাণ করবে; কেননা মুসলিমপ্রধান পূর্ব পাকিস্তান ভূখণ্ডে বাংলাদেশ গঠনের মাধ্যমে পাকিস্তানের কাঠামো ভেঙে দেয়ার অর্থ হবে, মুসলিম ও হিন্দু ধর্মের ভিত্তিমূলে বহুল প্রচারিত জাতীয়তাবাদের কোনরূপ বাস্তবতা নেই। কৌশলগত দৃষ্টিকোণ থেকে পাকিস্তান ভেঙে যাবার ফলে চিরতরে নির্ধারিত হবে দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক কর্তৃত্ব বা শ্রেষ্ঠত্বের হোতা কে হবে। দক্ষিণ এশিয়ায় এভাবে দ্বিতীয় শূন্যমান পরিস্থিতির উদ্ভব হয়—সেই হারজিতের খেলায় বিজড়িত হয় ভারত ও পাকিস্তান।

শীঘ্রই অন্যান্য বৃহৎ শক্তিবর্গও বাংলাদেশ সংকটে অবস্থান গ্রহণে প্ররোচিত হয়। মার্কিন ও চীনা সমর্থন লাভের জন্য পাকিস্তান বিশেষভাবে সচেষ্ট হয়। পক্ষান্তরে, বাংলাদেশ ও ভারত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অনুকূলে আন্তর্জাতিক সহানুভূতি লাভের জন্য সক্রিয় হয়। বিশ্বের জনমানুষ ও সরকারসমূহের সমর্থন লাভের জন্য উভয়ের পক্ষ থেকে এরূপ যুক্তির অবতারণা করা হয় যে, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাঙালিদের প্রতিরোধ আন্দোলনে সমর্থন প্রদানে কার্যত মানবতা ও মানবাধিকারের প্রতিই সমর্থন প্রদান করা হবে, যে মানবতাবোধ ও মানবাধিকারের প্রতি খোদ জাতিসংঘের সনদ নিশ্চয়তা প্রদান করে।

বৃহৎ শক্তিবর্গের পারস্পরিক সম্পর্কে ১৯৭১ সনের একটি চমকপ্রদ ঘটনা ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা। পাকিস্তান এতে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

রাজনৈতিকভাবে পাকিস্তান ছিল উভয় বৃহৎ শক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত এবং উভয় দেশের সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠায় পাকিস্তান মধ্যস্থের ভূমিকা পালন করে। স্বাভাবিকভাবেই পাকিস্তান তার সংকটকালে দু'টি বৃহৎ শক্তির সমর্থন প্রত্যাশা করে। অথচ দু'টি বৃহৎ রাষ্ট্রের একটিও পাকিস্তানকে প্রতীকধর্মী সমর্থনের ঊর্ধ্বে কার্যকর কোনরূপ সাহায্য প্রদান করে নি।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, দীর্ঘকাল থেকে পাকিস্তান ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে মৈত্রীসম্পর্কে আবদ্ধ। সেই মৈত্রীসম্পর্কের ঐতিহ্যগত সূত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইসলামাবাদে অবস্থিত পাকিস্তান সরকারকে কিছু কিছু সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহ করে। সেই সরবরাহ ছিল নিছক প্রতীকধর্মী বা নামেমাত্র সামরিক সাহায্য। পক্ষান্তরে, ১৯৬৫ সন থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক দ্বন্দ্বে অনেকটা মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। অথচ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন তার মধ্যস্থতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করে ভারতের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়।

বৃহৎ শক্তিবর্গের আচরণে পরিলক্ষিত এ ধরনের বৈপরিত্য ও দ্বিমুখী নিরাপত্তা দৃষ্টিভঙ্গির বা পররাষ্ট্রনীতির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ কিভাবে দেয়া যায় ? বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বৃহৎ শক্তিবর্গের গৃহীত নীতি ও আচরণ সম্পর্কে আরো প্রশ্নের অবতারণা করা চলে। তাদের ঐতিহ্যগত নীতিগত দৃষ্টিকোণের প্রতি তারা কতখানি অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিল ? বন্ধুত্ব বা মৈত্রীবন্ধনের প্রতি তাদের সার্বিক প্রতিশ্রুতি কি বিকশিত হয়, নাকি দক্ষিণ এশিয়ায় তাদের কৌশলগত চিন্তাধারার ধারণাগত ব্যাখ্যা ও বাস্তব অভিব্যক্তিতে ব্যতিক্রমধর্মী রূপ পরিলক্ষিত হয় ?

গ্রন্থের বর্তমান অধ্যায়ে এসব বিষয়াদি আলোচিত হয়েছে। প্রসঙ্গ হচ্ছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাঙালিদের স্বাধীনতা সংগ্রাম। এ প্রসঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে তিনটি বৃহৎ শক্তি—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্রনীতি ও নিরাপত্তা দৃষ্টিকোণ। আন্তর্জাতিক শক্তিসমূহের মৈত্রীযোগাযোগের ধারা ও নিরাপত্তা নীতি একটি বিশ্লেষণী রূপরেখার মাধ্যমে ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। সমগ্র বিষয়াবলীকে রীতিবদ্ধভাবে গুছিয়ে বলার প্রয়োজনে প্রবন্ধকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে তিনটি প্রধান বিশ্বশক্তির আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ও আঞ্চলিক আচরণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রথম ভাগে (ক) পররাষ্ট্রনীতি, নিরাপত্তা ও রণনীতির সমন্বয়ে একটি বিশ্লেষণী কাঠামো তুলে ধরা হয়েছে ; কেননা এসব ধারণাগত দৃষ্টিকোণ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে জাতি-রাষ্ট্রের মধ্যে আন্তঃক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং তাদের পারস্পরিক আচরণকে প্রভাবিত করে। পরবর্তী ভাগগুলোতে (খ, গ, ঘ) তিনটি বৃহৎ শক্তি, যথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের আচরণ বা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবলীতে তাদের নিজ নিজ ধারণাগত দৃষ্টিকোণ থেকে বিরচিত প্রত্যুত্তর পর্যালোচনা

করা হয়। বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, ঐ সময়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহে এই তিনটি শক্তিই মুখ্যত প্রভাব বিস্তার করে। এ অধ্যায়ের শেষ ভাগে (ঙ) লেখক তাঁর পরিকল্পিত বিশ্লেষণী ধারা, সিদ্ধান্ত ও তথ্যাদি সারাংশ হিসেবে উপস্থাপনে প্রয়াসী হন, এবং পরিশেষে বৃহৎ শক্তিবর্গের প্রত্যুত্তরের ধারা দক্ষিণ এশিয়ার আন্তঃআঞ্চলিক সম্পর্কে কি ধরনের প্রভাব রাখে তা পুনর্মূল্যায়ন করেন।

### (ক) পররাষ্ট্রনীতি, নিরাপত্তা ও রণনীতি : একটি বিশ্লেষণী রূপরেখা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া ছিল জটিল। এতে বৃহৎ শক্তিবর্গের পররাষ্ট্রনীতি, নিরাপত্তানীতি ও কৌশলগত বাধ্যবাধকতার জটিল সংমিশ্রণ ঘটে। তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের জটিলতার কারণেই তারা মুখ্যত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়। এ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ধারণাসমূহ কিছুটা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। 'পররাষ্ট্রনীতি' ধারণা হিসেবে এমন কিছু সিদ্ধান্ত ও গৃহীত ব্যবস্থা বোঝায়, যা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে "বহুমুখী উপাদানের সমন্বয় ঘটায়, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে রাষ্ট্রের ইতিহাস ও ঐতিহ্য, ভৌগোলিক অবস্থান, জাতীয় স্বার্থ ও উদ্দেশ্য এবং নিরাপত্তার প্রয়োজনীয় দিকগুলো।"[৮] রণনীতি বিষয়ক অভিধানে 'নিরাপত্তা' ও 'রণনীতি' সমার্থমূলক ধারণা বলে বিবেচিত। একই বিষয় প্রসঙ্গে নিরাপত্তা প্রায়শ প্রকৃত অবস্থার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং রণনীতি দ্বারা বোঝায় পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া। রণনীতি কলাকৌশল বা বিজ্ঞান হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। উভয়বিধ ক্ষেত্রে একটি জাতির ক্রান্তিকালীন বা যুদ্ধচলাকালীন নীতির প্রতি সর্বোচ্চ সমর্থন প্রদানকল্পে রাজনৈতিক, আর্থনীতিক, মনস্তাত্ত্বিক ও সামরিক শক্তির সমন্বয় করে থাকে রণনীতি। রণনীতি এভাবে বিবেচিত হয় জাতীয় উদ্দেশ্যাবলী অর্জনের হাতিয়ার হিসেবে; আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এর ব্যবহার চলে জাতীয় স্বার্থের স্থায়িত্ব বিধান বা সম্প্রসারণকল্পে।

রণনৈতিক বিজ্ঞানে বিশ্লেষকবৃন্দ জাতি বা রাষ্ট্রের রাজনৈতিক-সামরিক আশা-আকাঙ্ক্ষার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও পর্যায় বুঝাবার উদ্দেশ্যে 'কৌশলগত' ধারণা ব্যবহার করে থাকেন। উচ্চতম পর্যায় হচ্ছে নীতি, এরপর রণনীতি এবং নিম্নতম পর্যায়ে ব্যবহৃত হয় রণকৌশল। রণনৈতিক বিশ্লেষণে 'নীতি' হচ্ছে পরশপাথর স্বরূপ—এর ভিত্তিতে প্রণীত হয় রণনীতি এবং নীতিগত উদ্দেশ্যাবলী অর্জনে ব্যবহৃত পদ্ধতি বা উপায় রণনীতির মাধ্যমে রূপলাভ করে। রণনীতির নিম্নতর পর্যায়ে রণকৌশল রণনীতির প্রয়োগ হিসেবে চিহ্নিত হয়, যদিও রণনীতি ও রণকৌশলের মধ্যে পার্থক্য প্রায়শ অস্পষ্ট বলে মনে হয়। কেননা এদের একটি

৮. K. W. Thompson and Roy C. Macridis, "The Comparative Study of Foreign Policy", in Roy C. Macridis (ed.), *Foreign Policyt in World Politics* (N. J. Englewood Cliffs., 1962), 11.

অপরটিকে শুধু প্রভাবিত করে না, উভয়ে সংমিশ্রিতও হয়ে থাকে।[৯] উপর্যুক্ত আলোচনা ও বিশ্লেষণ থেকে এটাই প্রতিভাত হবে যে, পররাষ্ট্রনীতি, নিরাপত্তা ও রণনীতি পারস্পরিকভাবে সম্পর্কযুক্ত ও মিথষ্ক্রিয়ায় সংযুক্ত। বিশ্বের বৃহৎ শক্তিবর্গের নিরাপত্তা ও পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণে বেশ কিছু কৌশলগত বাধ্যবাধকতা থাকে, আর সেই বাধ্যবাধকতাই বাংলাদেশ সংকটকালে দক্ষিণ এশিয়ার দ্বান্দ্বিক পর্যায়ে বৃহৎ শক্তিবর্গের নিরাপত্তা ও পররাষ্ট্রনীতির আন্তঃক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়।

## (খ) মার্কিন প্রতিক্রিয়া

রণনীতি বা নিরাপত্তা কোনরূপ সর্বজনীন হাতিয়ার বলে পরিগণিত নয়; এ সম্পর্কে বিভিন্ন রাষ্ট্র বা শক্তির বিভিন্ন ধরনের ধারণাগত অভিব্যক্তি রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত আচরণ ও নিরাপত্তা দৃষ্টিভঙ্গি মার্কিন জাতীয় স্বার্থের ভিত্তিতে বিরচিত এবং সেই জাতীয় স্বার্থের বোঝাপড়া হয়ে থাকে উদ্ভূত বিভিন্ন পরিস্থিতির ভিত্তিতে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মার্কিন সরকারের সকল সিদ্ধান্ত ও গৃহীত প্রতিটি পদক্ষেপ উদ্ভূত পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তির পর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের সেরা শক্তিরূপে আবির্ভূত হয়। এ কারণে দক্ষিণ এশিয়া ও এশিয়ার অন্যত্র মার্কিন নিরাপত্তা দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্ব পর্যায়ে মার্কিন কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করতে হবে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, দূরপ্রাচ্য ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দিকে পূর্ব অভিমুখী সম্প্রসারণ সুনিশ্চিতকল্পে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার এশীয় নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে। দুই মহাসাগরের প্রান্তে অবস্থিত বিশ্বে আমেরিকার কৌশলগত পরিচয় স্বকীয়তায় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। উল্লেখ্য, আটলান্টিক মহাসাগর ইউরোপ ও আমেরিকার মধ্যে জলসংযোগ স্থাপন করে আছে, আর এশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে জলজ বন্ধন রেখে চলেছে প্রশান্ত মহাসাগর। ফলে আমেরিকার পক্ষে বিশ্বের সকল বাণিজ্যিক কেন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

এছাড়া কৌশলগত দৃষ্টিকোণ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের দু'টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের মাঝামাঝি অবস্থিত। এ দু'টি অঞ্চল হচ্ছে পশ্চিম ইউরোপ ও পূর্ব এশিয়া। বিশ্বরাজনীতির অনুকূল বিবর্তন ও নিজস্ব কৌশলগত গুরুত্ব ও প্রাধান্য বৃদ্ধির কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-উত্তরকালে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে সাহায্য-সমর্থন প্রদানে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়। এশিয়ায় মার্কিন অবস্থান সেই অঙ্গীকারেরই অংশবিশেষ এবং এ মহাদেশে মার্কিন উপস্থিতি তার অগ্র-প্রতিরক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

---

৯. Abul Kalam, *Peacemaking in Indochina 1954-1975* (Dhaka 1983), 292-293

**দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-উত্তরকালীন মার্কিন নীতিগত দৃষ্টিভঙ্গি**

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে বিশ্বব্যাপী মার্কিন নীতি প্রণীত হয় একটি ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত কম্যুনিস্ট জোটের প্রত্যক্ষ ভয়ভীতিজনিত হুমকির প্রেক্ষাপটে। মার্কিন দৃষ্টিতে, সেই সংগঠিত কম্যুনিস্ট জোট দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-উত্তরকালীন নতুন বিশ্বশক্তি সাম্যের প্রতি হুমকি প্রদর্শন করে চলছে। এ জোট ছিল সশস্ত্র, শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত ছিল এ জোটের সক্রিয় কম্যুনিস্ট পার্টির শাখা-প্রশাখা। সেই জোটের কেন্দ্রবিন্দু ছিল মস্কো এবং বিশ্বের সর্বত্র কম্যুনিস্ট পার্টিগুলোর মাধ্যমে মস্কোর কেন্দ্রীয় নির্দেশাবলী পালিত হতো। স্পষ্টতই ১৯৫০-এর দশকব্যাপী বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে মস্কোর পরিচালনায় কম্যুনিস্টদের বিজয় সূচিত হয় এবং ১৯৬০-এর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সোভিয়েত নেতৃত্বে বিশ্বব্যাপী ব্যাপক মনস্তাত্ত্বিক হুমকি সৃষ্টি হয়। স্বাভাবিকভাবেই আমেরিকা প্রয়াসী হয় কিভাবে সেই হুমকির মোকাবেলা করা চলে, একে প্রতিহত করা যায় যাতে বিবর্তমান শক্তিসাম্য সংরক্ষিত হয়। এসব উদ্দেশ্য সামনে রেখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি কম্যুনিস্ট শক্তি সীমিতকরণনীতি প্রণয়ন করে এবং পর্যালোচনা ও প্রচারণাপূর্বক তা প্রয়োগ করে। কম্যুনিস্টবিরোধী সেই নীতির বিঘোষিত উদ্দেশ্যই ছিল সোভিয়েত সম্প্রসারণবাদী প্রবণতা সীমিত করা। কার্যত মার্কিন প্রয়াসের লক্ষ্য ছিল সোভিয়েত শক্তিকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাতে আমেরিকার কৌশলগত স্বার্থের হানি ঘটাতে সোভিয়েত প্রয়াস সাফল্য লাভে ব্যর্থ হয় কিংবা আমেরিকার স্বার্থের প্রতি সোভিয়েত হুমকি হ্রাস পায়। ১৯৫০-এর দশকেই 'নিবারক' ধারণা ব্যাপ্তি লাভ করে। এ সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রকাশ্য বা গুপ্ত কম্যুনিস্ট সম্প্রসারণবাদ প্রক্রিয়া নিবারণে রাজনৈতিকবাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয় 'মুক্ত বিশ্বের' আদর্শের লালন ও সংরক্ষণে। প্রথমদিকে মার্কিন দৃষ্টিভঙ্গি ছিল চরম ও কঠোর মনোভাবসম্পন্ন; যেকোন প্রকাশ্য কম্যুনিস্ট হুমকির মোকাবেলায় স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়ায় "ভয়াবহ প্রত্যুত্তর" দেয়ার উদ্দেশ্যে আমেরিকা তার শ্রেষ্ঠতর কৌশলগত বিমান ও নিক্ষেপযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহারের প্রস্তুতিও গ্রহণ করে।

১৯৬০-এর দশকের দিকে অবশ্য পারমাণবিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়, কেননা সোভিয়েত ইউনিয়নও শক্তিশালী পাল্টা-জবাব দেয়ার ক্ষমতা অর্জন করে। ফলে আমেরিকা তার "ভয়াবহ প্রত্যুত্তরের" পরিবর্তে "নমনীয় প্রত্যুত্তর" নামে নতুন কৌশলগত নীতি ঘোষণা করে। নববিঘোষিত নীতির মধ্যে সীমিত অথচ দৃঢ় সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান রাখা হয়, রাখা হয় শক্তিশালী পারমাণবিক নিবারক ব্যবস্থাভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণের বিধানও। তবু নববিঘোষিত নীতি ছিল নমনীয়, কেননা ওয়াশিংটন ভয়াবহ পাল্টা-ব্যবস্থা গ্রহণের হুমকি প্রদান থেকে বিরত থাকে। কালে ভিয়েতনাম যুদ্ধে মার্কিন বিপর্যয় এবং এর ফলশ্রুতিতে পরবর্তী সময়ে ১৯৬৮-৬৯'র দিকে কৌশলগত

পুনর্মূল্যায়নের মাধ্যমে 'বাস্তবানুগ নিবারক' ধারণা গৃহীত হয়। এতে জোর দেয়া হয় 'পর্যাপ্ততার' উপর। এতে বলা হয়, কোথাও অত্যাবশ্যকীয় মার্কিন স্বার্থে আঘাত হানা হলে পর্যাপ্ত পরিমাণ সামরিক সরবরাহ দ্বারা সেই আঘাতকে প্রতিরোধ করা হবে, প্রতিহত করা হবে আমেরিকা ও তার মিত্রদের থেকে জোরপূর্বক কোনরূপ সুবিধা আদায় বা ভয়ভীতি প্রদর্শনপূর্বক কোন ধরনের স্বার্থোদ্ধারের অপপ্রয়াস।[১০] ১৯৭০-এর দশকের প্রথম অবধি এ ধরনের মার্কিন কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি আমেরিকার পররাষ্ট্র ও নিরাপত্তানীতির নির্ধারক হিসেবে কাজ করে, যদিও এ সময়ের দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার বিশ্বপ্রতিযোগী পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পর্ক অধিকতর স্বাভাবিক পর্যায়ে নিয়ে আসতে প্রয়াসী হয়। এমনকি অপর কম্যুনিস্ট শক্তি গণচীনের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ক পূর্বের চেয়ে উন্নততর হয়। আঞ্চলিক পর্যায়ে এ সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্রমশ কৌশলগত সাম্যাবস্থা বজায় রাখতে আগ্রহী হয়।[১১] অর্থাৎ আঞ্চলিক রাজনৈতিক কৌশলগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে মার্কিন নীতি ছিল শক্তিসাম্য-নীতির অনুকূলে। সম্ভবত মার্কিন কৌশল ছিল, সময় ও সুযোগ বুঝে সেই শক্তিসাম্য বজায় রাখার প্রয়োজনে একটি কম্যুনিস্ট শক্তিকে আরেকটির বিরুদ্ধে চাল হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।

### মার্কিন নীতির আঞ্চলিক পরিপ্রেক্ষিত

বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চল ও উপ-অঞ্চলের মতো দক্ষিণ এশিয়াতেও উপর্যুক্ত মার্কিন নীতির ধারা প্রযোজ্য বলে প্রতীয়মান হয়। এটাও অবশ্য সত্য যে, মার্কিন রণনীতি বা বিশ্বব্যাপী আমেরিকার নিরাপত্তা অন্বেষায় দক্ষিণ এশিয়া ব্যাপকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়নি। দক্ষিণ এশিয়ায় আমেরিকার বিজড়িত হবার পেছনে ইন্ধন যোগায় দক্ষিণ-পূর্ব, পূর্ব ও পশ্চিম এশিয়ায় অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত স্বার্থ সংরক্ষণের প্রবল অন্বেষা। মনে রাখা প্রয়োজন যে, ১৯৫০-এর দশকের মাঝামাঝি দক্ষিণ-পূর্ব ও পশ্চিম এশিয়ায় মার্কিন উদ্যোগে সৃষ্ট কম্যুনিস্টবিরোধী সামরিক মৈত্রীজোটে পাকিস্তানকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এটা ছিল বিশ্বব্যাপী মার্কিন নিবারক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অনেকটা একই প্রক্রিয়ায় ১৯৬২ সনের চীন-ভারত সীমান্তযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে চীনবিরোধী মৈত্রীকাঠামোয় আবদ্ধ করতে প্রয়াসী হয়।

পরবর্তীকালে কিন্তু "নমনীয় প্রত্যুত্তর" ভিত্তিক মার্কিন কৌশলগত নীতি গ্রহণের ফলে চীনের প্রতি ওয়াশিংটনের পক্ষে নমনীয় ভাব প্রদর্শন সম্ভব হয়। ফলে ১৯৭১-এর দিকে আমেরিকা চীনবিরোধী সীমিতকরণ নীতি প্রত্যাহার করে নেয় এবং চীনের সঙ্গে সম্পর্কের স্বাভাবিকীকরণপ্রক্রিয়া শুরু করে। এতে পূর্বেকার সীমিতকরণ নীতি বর্জন করা হয়। কিন্তু দ্বন্দ্বে রত দক্ষিণ এশিয়ার দু'টি প্রধান শক্তি এ সম্পর্কিত পরিবর্তিত মার্কিন নীতিকে ভিন্ন

১০. ঐ, 336-386.
১১. Henry Kissinger, *The White House Years* (Boston 1979), 261, 1474..

দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করে। পাকিস্তানের দৃষ্টিকোণ থেকে, দক্ষিণ এশিয়ায় ১৯৬২-উত্তরকালীন মার্কিন নীতির ক্ষেত্রে কৌশলমূলক পরিবর্তন ছিল পাকিস্তানের প্রতি মার্কিন মৈত্রী-অঙ্গীকার ভাঙার শামিল। পক্ষান্তরে, ১৯৭১ সনে চীনের প্রতি মার্কিন কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনকে ভারত তার নিজস্ব কৌশলগত স্বার্থের প্রতি হুমকি হিসেবে দেখে।

এটা উল্লেখ করা সমীচীন যে, ঐতিহ্যগতভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ এশিয়ার দু'টি প্রতিযোগী শক্তিকেই কম্যুনিস্ট শক্তি সীমিতকরণ কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ রাখতে আগ্রহী ছিল, সচেষ্ট ছিল একটি মাঝামাঝি অবস্থান বজায় রাখতে, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সমরূপ ব্যবধান প্রদর্শন করতে, যাতে উভয় পক্ষের কেউ আমেরিকাকে অন্ততঃপক্ষে পক্ষাবলম্বী হিসেবে না দেখে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি ও আঞ্চলিক শক্তিদ্বয়ের দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিত মনে রেখে মার্কিন নেতৃবৃন্দ এটাকেই সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য বিকল্প বলে বিবেচনা করেন। ১৯৫০-এর দশকের দিকে ভারত যেহেতু মার্কিন উদ্যোগে সৃষ্ট মৈত্রীজোটে যোগ দিতে অনীহা প্রদর্শন করে, সেহেতু ওয়াশিংটন একদিকে পাকিস্তানকে সামরিক সরবরাহ ও অন্যদিকে ভারতকে প্রচুর পরিমাণ অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদানের মাধ্যমে দু'দেশের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়। নয়াদিল্লী এ ধরনের ভারসাম্যমূলক মার্কিন নীতিকে ভালো চোখে দেখেনি। প্রকৃতপক্ষে, দক্ষিণ এশিয়ায় মার্কিন আঞ্চলিক নীতিকে ভারত পাকিস্তানপন্থী বলে বিবেচনা করে, যে নীতির লক্ষ্য ছিল ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সামরিক সমতা বজায় রা৷ ়া। পক্ষান্তরে, ১৯৬২ সনের পর থেকে ভারতে মার্কিন সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহের ফলে পাকিস্তান বিক্ষুব্ধ হয় এবং মনে করে যে আমেরিকা তার কৌশলমূলক স্বার্থ চরিতার্থতার প্রয়োজনে পাকিস্তানের সঙ্গে মৈত্রীসম্পর্কের জলাঞ্জলি ঘটায়।[১২]

## মার্কিন দক্ষিণ এশীয় নীতি ও চীন-মার্কিন সম্পর্কের সংযোগ

দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক পর্যায়ে মার্কিন আচরণ বিশ্বের বৃহত্তর পরিমণ্ডল বা এশিয়ায় কৌশলগত ভারসাম্য সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে পরিচালিত মার্কিন নীতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, বিশেষকরে চীনের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ক উঠা-নামা ও প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের বিষয়ে প্রাসঙ্গিক। প্রথমে ১৯৬২ সনে ভারতে মার্কিন সামরিক সাহায্যের বিষয় পুনর্বার উল্লেখ করতে হয়। কেননা ভারত সেই সামরিক সাহায্যকে তার নিরাপত্তার নিশ্চয়তার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে অনেকটা তাচ্ছিল্যভরে, কিন্তু পাকিস্তান সেই সাহায্যের পরিমাণকে ব্যাপক পরিমাণ সোভিয়েত সামরিক সাহায্য কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত করে একে দেখে আঞ্চলিক ভারসাম্যের প্রতি বিরাট হুমকি হিসেবে। সুতরাং বলা যায় যে, চীনকে সীমিত রাখা বা

১২. Sisson and Rose,"War and Secession," 254-255.

একঘরে করার মার্কিন নীতি কার্যত ভারতের চোখে ছিল অসন্তোষজনক এবং আঞ্চলিক দৃষ্টিকোণ থেকে পাকিস্তানের নিকট তা ছিল স্থিতিশীলতাবিরোধী।

১৯৬০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে বিশ্বের দু'টি পরাশক্তি তাদের পারস্পরিক উত্তেজনা প্রশমনের ফলে পরস্পরের কাছাকাছি আসে। দক্ষিণ এশিয়ায় এ সময় থেকে আমেরিকা তার ভূমিকা হ্রাস করে, সায় দেয় এ অঞ্চলে সোভিয়েত কূটনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণে। চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষের পরবর্তী পর্যায়ে এ ধরনের পরিবর্তিত মার্কিন কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি দক্ষিণ এশিয়ায় পরাশক্তির কৌশলগত উদ্দেশ্যাবলীর ক্ষেত্রে কিছুটা সমন্বয়মূলক উপাদান সংযোজন করে। দু'টি পরাশক্তিই ঐ পর্যায়ে দক্ষিণ এশিয়ায় তাদের উদ্দেশ্যাবলীর সংজ্ঞায়নে প্রয়াসী হয় নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে, যদিও উভয় শক্তি পারস্পরিকভাবে সমর্থনমূলক চীনকে সীমিতকরণ বা একঘরে করে রাখার দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে একমত পোষণ করে। অর্থাৎ চীনবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গিতে পরাশক্তিদ্বয়ের মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক সম্প্রীতি রক্ষার জন্য উভয় পরাশক্তি আগ্রহী হয়। এ সময়েই মস্কো পাকিস্তানের সঙ্গে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে এবং সার্বিকভাবে আমেরিকাও ভারতের ভূমিকার প্রতি ইতিবাচক সায় প্রদান করে। ১৯৬৫ সনের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ চলাকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দু'দেশেই সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদান স্থগিত রাখে। যুদ্ধের পর অর্থনৈতিক সাহায্য পুনরায় চালু করা হয়, যদিও পরিমাণে তা হ্রাস পায়। কিন্তু সামরিক সাহায্য সুনির্দিষ্ট প্রেক্ষিতে ও শর্তাধীন হওয়া ছাড়া বাতিল বলে বিবেচিত হয়। এ সময়ে ইন্দোচীনে ব্যাপকভাবে আমেরিকার বিজড়িত হবার কারণ, এশিয়ার অন্যত্র তার পক্ষে বড় ধরনের অঙ্গীকারে আবদ্ধ হবার ফুরসত ছিল না। ব্যতিক্রম ছিল জাপান, কোরিয়া ও তাইওয়ানের মতো দেশের ক্ষেত্রে, যেখানে গুরুত্বপূর্ণ মার্কিন স্বার্থ সংরক্ষণের বিষয় বিজড়িত ছিল। ফলে দক্ষিণ এশিয়ার মতো অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়। স্বাভাবিকভাবেই এ অঞ্চলের ঘটনাপ্রবাহে ভারত কিংবা পাকিস্তানকে প্রভাবিত করে বড় ধরনের ভূমিকা গ্রহণও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে অনুকূল ছিল না।[১৩]

## বাংলাদেশ সংকট ও মার্কিন নীতিতে মোড় পরিবর্তন

বাংলাদেশ সংকট যখন দানা বেঁধে উঠে, তখন এ অঞ্চলের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোনরূপ সুস্পষ্ট লক্ষণীয় নীতিগত অবস্থান ছিল না। এর প্রধান কারণ এশিয়াসহ বিশ্বের অন্যত্র ওয়াশিংটনের কৌশলগত ব্যস্ততা। পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তান সরকারের নৃশংস সামরিক অভিযানে অব্যবহিত মার্কিন প্রতিক্রিয়ায় ওয়াশিংটনের হতবাক ভাব ব্যক্ত হয়। তাৎক্ষণিকভাবে প্রকাশ্যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করাও হয়নি এ সময়ে। অব্যবহিত পদক্ষেপের মধ্যে ছিল ২৫ মার্চের পূর্বে ইসলামাবাদকে দেয়া মার্কিন উপদেশের পুনরুল্লেখ। তা হলো পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক সমাধানের পথ পরিহার করা।

১৩. ঐ, 255.

সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে অবশ্য ৭ অক্টোবর ১৯৭০-এর মার্কিন-পাকিস্তান চুক্তি দ্বারা পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে ওয়াশিংটন সামরিক সাহায্য প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। সেই বিঘোষিত ওয়াদা অনুযায়ী পাকিস্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে কিছু মারণাস্ত্র সহ "মৌলিকভাবে অনাধুনিক" সামরিক সরঞ্জাম ক্রয়ের সুযোগ লাভ করে। দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে সম্মত উপকরণের মধ্যে ছিল ৩০০টি সশস্ত্র সৈন্যবাহী বাহন, ৭টি পুরনো বি-৫৭-এর পরিবর্তে নতুন বি-৫৭, ৬টি এফ-১০৪ বিমান, ৪টি নৌ-প্রহরী বিমান এবং কতিপয় "প্রাণহানিকর নয়" এমন সরঞ্জাম। এসবের সর্বমোট মূল্য ছিল আনুমানিক ৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। [১৪]

উল্লেখ্য, প্রতিশ্রুত সৈন্যবাহী বাহন বা বিমানসমূহ সরবরাহ করা হয় নি, কিন্তু ৩৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সমমূল্যের সামরিক সরঞ্জাম বাংলাদেশ সংকট শুরু হবার পূর্বেই ক্রয়ের উদ্দেশ্যে লাইসেন্স প্রদান করা হয়। অন্যান্য উপকরণ সরবরাহের বিষয়েও আলাপ-আলোচনা চলছিল। বাংলাদেশে পাকিস্তানী বাহিনীর সামরিক অভিযান শুরু হবার পর অন্যান্য সামরিক সরবরাহের উদ্দেশ্যে নতুন লাইসেন্স প্রদান বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত ওয়াশিংটনে গৃহীত হয়। ৬ এপ্রিল ১৯৭১ তারিখে মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় নতুন লাইসেন্স প্রদানের উপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। এটা অবশ্য বলে দেয়া হয় যে, পূর্বে এক বছরের জন্য প্রদত্ত লাইসেন্স মোতাবেক যেসব মালামাল ইতিমধ্যে প্রেরণ করা হয়েছে সেগুলো ফেরত নেয়া সমীচীন হবে না। ২৩ এপ্রিল আরেকটি নির্দেশ দেয়া হয় যে, মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরের উপমন্ত্রীর সম্মতি ছাড়া পাকিস্তানে কিছু কিছু শ্রেণীর সরঞ্জাম পাঠানো যাবে না, কিন্তু পাকিস্তান সরকারের হাতে রয়েছে প্রাণহানিকর নয় এমন কিছু অস্ত্রশস্ত্রের খুচরাংশ পাঠানো যেতে পারে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সন নিজে তাঁর ২৫ জুন ১৯৭১-এর স্মারকলিপিতে পাকিস্তান সংক্রান্ত মার্কিন নীতি আপাতত অব্যাহত রাখার সপক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন, কেননা এতে পাকিস্তান সরকারের কর্মকাণ্ডের উপর মার্কিন প্রভাব অটুট রাখা সম্ভব হবে। কিন্তু একই সঙ্গে ওয়াশিংটন প্রয়োজনবোধে বিকল্প নীতির পথও উন্মুক্ত রাখে এবং প্রকৃতপক্ষে ১৯৭১ সনের ডিসেম্বর অবধি পাকিস্তানের নিকট আমেরিকার সরবরাহকৃত সামরিক উপকরণের মূল্য পাঁচ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের নিম্নে ছিল। উল্লেখ্য, ডিসেম্বরের দিকে পাকিস্তানে সামরিক সরবরাহের উপর পূর্ণাঙ্গ নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, পাকিস্তান ছিল আমেরিকার ঐতিহ্যগত মিত্রদেশ এবং ১৯৭১-এর দিকে আঞ্চলিক পর্যায়ে মার্কিন রণনীতি ছিল সাম্যাবস্থা বিধানভিত্তিক। কিন্তু

১৪. ঐ, 256। পাকিস্তানকে প্রদত্ত মার্কিন সাহায্য ভারতীয় বিশ্লেষক ও ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে কঠোরভাবে সমালোচিত হয়েছে। এমনকি কিছু কিছু বাংলাদেশী বিশ্লেষকও বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানকে প্রদত্ত মার্কিন সামরিক সাহায্য সম্পর্কে ব্যাপকভাবে অতিরঞ্জিত চিত্র তুলে ধরতে প্রয়াসী হন। এ বিশ্লেষণ প্রায়শই ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে পরিচালিত এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তথ্যজ্ঞানশূন্য।

মিত্রদেশের বিশ্বাসযোগ্যতার বিষয় অবজ্ঞা করে, এমনকি তার নিজস্ব সাম্যাবস্থার রণনীতিরও পরিপন্থী ব্যবস্থা সত্ত্বেও ১৯৭১-এর আর্থিক বছরে ওয়াশিংটন পাকিস্তানকে প্রতিশ্রুত আনুমানিক ৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সাহায্য প্রদান স্থগিত রাখে। শুধু তাই নয়, একমাত্র খাদ্যসাহায্য ছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের প্রতি সকল প্রকারের অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য কর্মসূচি স্থগিত করে। উল্লেখ্য, খাদ্যসাহায্য চালু রাখার অনুকূলে মুখ্য যুক্তি ছিল খাদ্যে ঘাটতি পূর্ব পাকিস্তানে মারাত্মক দুর্ভিক্ষের বিপর্যয় এড়ানো।

## মার্কিন প্রতিক্রিয়ার ইতিবাচক দিক

ইতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশ সংকটকালে মার্কিন নীতি বিচার্য। ১৯৭১ সনে পূর্ব পাকিস্তানে খাদ্যসাহায্য কর্মসূচির অধীন মার্কিন সাহায্য বরাদ্দ ছিল ৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর মধ্যে ৫৫ মিলিয়ন ডলার ছিল পি. এল. ৪৮০-এর অধীন, আর বাদবাকি ৩৫ মিলিয়ন ডলার ছিল নগদ সাহায্য। ১৯৭১ সনের ১ অক্টোবর নিক্সন অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন বিবেচনা করে অতিরিক্ত ২৫০ মিলিয়ন ডলার পৃথকভাবে বরাদ্দ আদায করে। ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী বাংলাদেশী শরণার্থীদের সাহায্য এবং পূর্ব পাকিস্তানে ত্রাণসাহায্য হিসেবে এ অর্থ ব্যবহৃত হয়। আরো উল্লেখ্য, ইতিমধ্যে ভারতে স্বাভাবিক অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য অব্যাহত থাকে। শুধুমাত্র ডিসেম্বর ১৯৭১-এর ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হবার পর উভয়বিধ সাহায্য স্থগিত করা হয়।

সার্বিকভাবে উপর্যুক্ত বিষয় ছিল মানবিক সাহায্য ও অর্থনৈতিক সমর্থন সংক্রান্ত। এটা অজানা নয় যে, বাংলাদেশে পাকিস্তানের নৃশংস সামরিক অভিযানের বিরুদ্ধে মার্কিন রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া বৃহত্তর রণনৈতিক কাঠামোর কারণে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়। তা হচ্ছে বিশ্বরাজনীতির বৃহত্তর প্রেক্ষিতপ্রসূত। চীন-মার্কিন যোগাযোগের কারণে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে আঞ্চলিক ও বিশ্ব পর্যায়ে কৌশলগত প্রতিযোগিতা এ সময়ে কিছুটা তীব্রতর হয়। এটা খোদ দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিকভাবে প্রতিফলিত হয় এবং এর সঙ্গে সংযুক্ত হয় পাকিস্তানের সঙ্গে আমেরিকার ঐতিহ্যগত মৈত্রীসম্পর্ক।[১৫] বিশ্বপ্রতিযোগী সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা মার্কিন দৃষ্টিতে এ সময়ে ছিল 'অগ্নিসজ্জিত মানসিক বিকারগ্রস্ত খেপাটে ব্যক্তির' মতো। সেই শত্রু আমেরিকার আন্তঃহিমালয় নিরাপত্তাকাঠামোর ব্যূহ ভেঙে পাকিস্তানের মতো একটি 'ঐতিহ্যগত মিত্রের প্রতি অশুভ ধরনের হুমকি দিয়ে চলেছে'। ওয়াশিংটন মনে করে যে, মস্কো পাকিস্তানকে হীনবল করতে এবং বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছে এবং পশ্চিম পাকিস্তানকে নিরাপত্তাহীন করে তুলতে চেয়েছে। তাই একটি পরাশক্তি মিত্রদেশ হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষুণ্ন হচ্ছে এবং যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের কাছে হেয় প্রতিপন্ন হতে বাধ্য। এ সকল কারণে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে রাজনৈতিকভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মুক্তিযুদ্ধের অনুকূলে

---

১৫. Muhith,"American Response," 206.

প্রকাশ্য ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সমর্থ হয় নি।[১৬] কেননা তার অর্থ দাঁড়াতো, পাকিস্তানের ভাঙনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো মিত্রদেশের সরকারিভাবে প্রকাশ্য ভূমিকা রাখা। বিকল্প পন্থা হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের সংযত আচরণের বিষয়ে বেসরকারি পর্যায়ে কূটনৈতিক যোগাযোগ রক্ষা করে চলে।

উল্লেখ্য, ১৯৭১-এর এপ্রিলে ওয়াশিংটন পাকিস্তান সরকারকে দু'দেশের মধ্যে ১৯৫৯ সনে স্বাক্ষরিত আঙ্কারা চুক্তির শর্তাদি স্মরণ করিয়ে দেয়। ঐ চুক্তিতে মার্কিন অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগের ক্ষেত্রে কতিপয় বিধি-নিষেধ আরোপিত ছিল। বিশেষকরে দেশের অভ্যন্তরীণ গোলযোগের ক্ষেত্রে মার্কিন অস্ত্রসামগ্রী ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞার শর্তের বিষয় আমেরিকার পক্ষ থেকে উল্লেখ করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অবশ্য পাকিস্তানের অতীত আচরণ থেকে জানতো যে, ইসলামাবাদ সম্ভবত এ সকল বিধিনিষেধ অমান্য করতে পারে, কেননা ইতিপূর্বে পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেও পাকিস্তান সরকার এসব বিধিনিষেধ উপেক্ষা করে অভ্যন্তরীণভাবে সামরিক অভিযান পরিচালনা করে।[১৭]

## আঞ্চলিক পর্যায়ে মার্কিন উদ্দেশ্যাবলী

২৫ মার্চ ১৯৭১ তারিখ থেকে প্রায় সারা বছরব্যাপী মার্কিন সরকারি নীতি ছিল এমন যে, পূর্ব পাকিস্তানের দ্বন্দ্ব হচ্ছে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়। মাকিন দৃষ্টিতে, এ ধরনের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে কোন বহিঃশক্তির জড়িয়ে পড়া সমীচীন নয়। এ সময়ে পরিলক্ষিত মার্কিন কৌশলগত উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল তিনটি নীতিগত বিষয়। প্রথমত, বাংলাদেশ সংকটের একটি রাজনৈতিক সমাধানে পৌছাতে উৎসাহ প্রদান করা যাতে পাকিস্তানের কোনরূপ ঐক্যবদ্ধ কাঠামো ধরে রাখা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু তা সম্ভব না হলে এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করা যাতে শান্তিপূর্ণ উপায়ে দেশটিকে বিভক্ত করে দু'টি সার্বভৌম দেশ সৃষ্টি করা যায়। দ্বিতীয়ত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এমন ধরনের ত্রাণসহায়তামূলক ভূমিকা গ্রহণ করে যাতে পূর্ব পাকিস্তানে দুর্ভিক্ষের অবস্থা এড়ানো যায় বা পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসকারী বা স্বদেশ থেকে অভিবাসী এবং ভারতে আশ্রয়প্রাপ্ত কোটি কোটি বাঙালিকে মানবিক সাহায্য প্রদান করা যেতে পারে। জাতিসঙ্ঘের বিভিন্ন সংস্থা, মার্কিন সরকারি সংগঠন বা বেসরকারি সংস্থাসমূহও এতে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে।[১৮] পরিশেষে, বাংলাদেশ সংকটকে কেন্দ্র করে ভারত ও পাকিস্তানের একটি নতুন যুদ্ধের সম্ভাবনা পরিহার করাও ছিল মার্কিন উদ্দেশ্যাবলীর অংশবিশেষ, কেননা এ ধরনের যুদ্ধের সম্প্রসারণ ঘটলে বাইরের বৃহৎ শক্তিবর্গও জড়িত হবার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে।[১৯]

১৬. Christopher Van Hollen, "The Tilt Policy Revisited: Nixon-Kissinger Geopolitics and South Asia", *Asian Survey* (April 1980), ঐ, 239-245.

১৭. Sisson and Rose, *প্রাগুক্ত*, "War and Secession", 258.

১৮. বিশদ দেখুন, Muhith, *প্রাগুক্ত*, "American Response," 202, 222-232..

১৯ Sisson and Rose, ঐ, 258.

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, পাকিস্তানের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মৈত্রীসম্পর্ক দীর্ঘকালের। তাই আমেরিকা দ্বিধান্বিত ছিল এ বিষয়ে কিভাবে দক্ষিণ এশিয়ায় এ সময়ে পাকিস্তানকে একঘরে না করে তার উদ্দেশ্যাবলী অর্জন সম্ভব হয়। কোনরূপ প্রকাশ্য সমালোচনা কিংবা সরকারিভাবে পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানের সামরিক নৃশংসতা ও নিপীড়নমূলক ব্যবস্থার নিন্দা করা হলে শুধুমাত্র একটি দীর্ঘকালীন মিত্রদেশের সঙ্গে সম্ভবত অহিনকূল সম্পর্ক সৃষ্টি হতো, অথচ এক্ষেত্রে রাজনৈতিকভাবে পাকিস্তানের নীতি পরিবর্তন আদৌ কোন প্রভাব ফেলতো কিনা সন্দেহ। এ সকল দিক বিবেচনা করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রকাশ্যে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নিন্দাজ্ঞাপন থেকে বিরত থাকে। বাংলাদেশে পাকিস্তানের নিপীড়নমূলক নীতি প্রসঙ্গে মার্কিন নীতির অভিব্যক্তি ঘটে বেসরকারি পর্যায়ে ব্যক্ত আশংকা-উদ্বেগে, পাকিস্তানের প্রতি সাহায্যের পরিমাণ সীমিতকরণে এবং একই সঙ্গে ইসলামাবাদের সঙ্গে সরকারি পর্যায়ে যোগাযোগ বজায় রাখার প্রয়াসে। এ সময়ে ওয়াশিংটন ইসলামাবাদে পাকিস্তান সরকারকে জানিয়ে দেয় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তান সরকারের মধ্যে সম্পর্ক পুরোপুরি সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না যদি পূর্ব পাকিস্তানে গৃহীত পাকিস্তানের সামরিক ব্যবস্থা অব্যাহত থাকে।

কার্যত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান ছিল কৌশলমূলক। ওয়াশিংটন মনে করে যে, ঐ ধরনের রাজনৈতিক অবস্থান থেকেই বাংলাদেশ সংকটে আমেরিকা সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে, সম্প্রীতিমূলক পর্যায়ে সম্পর্ক রেখে চাপ সৃষ্টির ক্ষমতা রাখতে পারে পাকিস্তানের সামরিক সরকারের উপর এবং একই সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের মানবিক প্রয়োজন ও আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্পূরণেও ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে। বিশ্বের সেরা পরাশক্তি হিসেবে আমেরিকা তার ভূমিকাকে আঞ্চলিক স্থিতি ও সাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে মুখ্য বলে বিবেচনা করে, আর এ কারণেই প্রকাশ্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করাকে দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজের শামিল বলে মনে করে। কেননা, মার্কিন দৃষ্টিতে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কে একটি মিত্রদেশের ঐক্য ও সংহতির বিরুদ্ধে এ ধরনের আচরণ বিবেচিত হতো দুর্ভাগ্যজনক দৃষ্টান্ত হিসেবে।

মার্কিন দৃষ্টিতে আরো গুরুতর বিবেচ্য বিষয় জড়িত ছিল। অনেকটা পাকিস্তানের মতো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও একদা গৃহযুদ্ধের অভিজ্ঞতা লাভ করে এবং আমেরিকার জাতীয় সংহতি এতে বিপন্ন হয়। এছাড়া, ইতিমধ্যে বাংলাদেশ সংকটকে ঘিরে দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত-সোভিয়েত মৈত্রীসম্পর্ক গড়ে উঠার সুস্পষ্ট প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। এসকল উদ্ভূত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানের প্রতি সরাসরি মার্কিন বিরুদ্ধাচরণ বিভিন্ন ধরনের প্রভাব ফেলতে পারতো। প্রথমত, এ ধরনের মার্কিন আচরণ তার নিজস্ব কৌশলগত চিন্তাধারার পরিপন্থী হতো; এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তার নিজস্ব একটি মিত্রদেশের সংহতির বিরুদ্ধে পরাশক্তিদ্বয়ের ঐক্যবদ্ধ চক্রান্তে লিপ্ত হবার দায়ে দোষারোপ করা হতো এবং মিত্রদেশ হিসেবে বিশ্বব্যাপী মার্কিন বিশ্বাসযোগ্যতা মারাত্মকভাবে প্রশ্নের মুখোমুখি

দাঁড়াতো। দ্বিতীয়ত, পাকিস্তানেব ভাঙন ও বাংলাদেশের মুক্তি অন্দোলনে মার্কিন সমর্থনের ফলে এ অঞ্চলে একই ধরনের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে ইন্ধন যোগানো হতো, এমনকি দক্ষিণ এশিয়ার বাইরে আন্তর্জাতিক সিস্টেমের অন্যত্রও একই ধরনের আন্দোলনে মার্কিন সমর্থনের প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা ছিল।

যা হোক, বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মার্কিন সরকারি তৎপরতা, বেসকারি পর্যায়ে উপদেশ কিংবা মানবিক সাহায্য-সহানুভূতি পাকিস্তানের সরকারি নীতিতে কোনো প্রকার প্রভাব রাখতে সমর্থ হয় নি। প্রকৃতপক্ষে, ১৯৭১ সনে পাকিস্তানকে প্রতিশ্রুত মার্কিন সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্যের পরিমাণ বিরাট ধরনের এমন কিছু ছিল না যে পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক তার পছন্দসই কৌশলগত উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা পরিবর্তনে চাপ সৃষ্টি করার মতো রাজনৈতিক ক্ষমতা ওয়াশিংটন প্রয়োগ করতে পারতো। পাকিস্তানের দৃষ্টিতে, ১৯৬৫ সনের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় সামরিক সরঞ্জামাদি প্রেরণে মার্কিন ব্যর্থতার কারণে ইতিমধ্যেই পাকিস্তানের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধায়ক হিসেবে আমেরিকা তার বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে। ১৯৭১-এর মধ্যে বাংলাদেশের মতো একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে ওয়াশিংটন ইসলামাবাদে তার রাজনৈতিক নৈপুণ্য প্রয়োগের ক্ষমতা হারাতে বসে, কেননা পাকিস্তানের দৃষ্টিকোণ থেকে, বাংলাদেশ প্রশ্ন মূলত পাকিস্তানের জাতীয় সংহতি ও অস্তিত্বের ভিত্তিমূলে আঘাত হানে।

তবে এও সত্য যে, বাংলাদেশ বিষয়ে ১৯৭১-এর ডিসেম্বরে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হবার পূর্বকাল অবধি ওয়াশিংটন ইসলামাবাদকে সামরিক পন্থার পরিবর্তে রাজনৈতিক সমাধান অন্বেষণের বিষয়ে তাগিদ দিয়ে আসে। এ কাজ মার্কিন নেতৃত্ব করে অনেকটা কূটনৈতিক প্রক্রিয়ার অন্তরালে, অনানুষ্ঠানিকভাবে। সংকটের শেষের দিকে যুদ্ধদ্বন্দ্বরত উভয় পক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে ওয়াশিংটন এমনকি মধ্যস্থের ভূমিকা পালনের আগ্রহও প্রকাশ করে, কিন্তু এ বিষয়ে নয়াদিল্লীর বিরূপ ভাব ও ইসলামাবাদের আগ্রহের অভাব দেখে মধ্যস্থতার উদ্যোগগ্রহণ থেকে আমেরিকা বিরত হয়। তবু বাংলাদেশ প্রসঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রহে ঘাটতি ছিল না। ওয়াশিংটন যে শুধুমাত্র বাংলাদেশ সংকটের রাজনৈতিক সমাধান চেয়েছে তা নয়, শেখ মুজিবুর রহমানকে রাজনৈতিক সমাধানের সেই কাঙ্ক্ষিত প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত করতে চেয়েছে। স্পষ্টতই পাকিস্তান সরকার আমেরিকার প্রস্তাবিত রাজনৈতিক সমাধানের বিষয়ে ইতিবাচক সাড়া প্রদান করে নি। কিন্তু ন্যূনপক্ষে মার্কিন হস্তক্ষেপমূলক ভূমিকার কারণে পাকিস্তানীদের নৃশংসতা থেকে বাংলাদেশের নেতা শেখ মুজিবের জীবন রক্ষা পায়।[২০]

বাংলাদেশ সংকটকালে দক্ষিণ এশিয়ায় শেষ মার্কিন কৌশলগত উদ্দেশ্য ছিল আরেকটি ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ এড়ানো এবং সেই যুদ্ধের সম্ভাব্য সম্প্রসারণ এড়ানো।

২০. ঐ, 260.

সেই লক্ষ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনেক ক্ষেত্রে নির্ভরশীল ছিল আন্তর্জাতিকভাবে চাপ সৃষ্টির প্রক্রিয়ার উপর। কিংবা যুক্তরাষ্ট্র সুযোগমতো পক্ষদ্বয়কে নানাভাবে প্রলুব্ধ করতে প্রয়াসী হয়; এমনকি ওয়াশিংটন তার শ্রেষ্ঠতর সামরিক ক্ষমতা প্রদর্শনমূলক ব্যবহারের মাধ্যমেও দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তর শক্তি ভারতকে সহিংস প্রক্রিয়ার পথ থেকে নিবৃত্ত করতে চায় এবং একই সঙ্গে বাংলাদেশ আন্দোলনের অনুকূলে ইসলামাবাদ থেকে সুবিধা আদায়ে সচেষ্ট হয়। এ ধরনের মার্কিন কৌশলগত চাল কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে অসমর্থ হয় বটে, কিন্তু সেই চাল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাঁচে প্রয়োগ করা হলে এর চেয়ে অধিকতর সাফল্য আসতো কিনা সন্দেহ। কেননা, পূর্বেই বলা হয়েছে, বাংলাদেশ সংকটকালে এ বিষয়ে ভারত কিংবা পাকিস্তানকে প্রভাবিত করার মতো মার্কিন ক্ষমতায় সীমাবদ্ধতা ছিল—দু'পক্ষই বাংলাদেশ প্রসঙ্গে শূন্যমান রণনীতির চালের মাধ্যমে নিজ নিজ অবস্থানকে অপরিহার্য সাফল্যের বিষয় বলে বিবেচনায় রাখে এবং সেই সাফল্য সুনিশ্চিত করতে প্রতিদ্বন্দ্বী উভয় শক্তি বদ্ধপরিকর ছিল। এ প্রসঙ্গে বঙ্গোপসাগরে মার্কিন রণতরী "ইউএস এন্টারপ্রাইজ"-এর বহু বিতর্কিত উপস্থিতির বিষয় অবতারণা করা যেতে পারে। সেই রণতরীর উপস্থিতি ছিল নিছক কৌশলমূলক, প্রতীকধর্মী: মার্কিন উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের বিস্তৃতি এড়ানো যাতে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশকে ঘিরে যে দ্বন্দ্ব ও সংকটের সৃষ্টি হয় তা যেন বাংলাদেশের সীমারেখার মধ্যে সীমিত থাকে।

## পক্ষাবলম্বন নয়, স্থিতিবিধায়ক হিসেবে মার্কিন ভূমিকা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছিল বিশ্বের সেরা পরাশক্তি এবং স্বাভাবিকভাবেই মার্কিন কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বিশ্বধর্মী। আঞ্চলিক পর্যায়ে আমেরিকা ছিল পাকিস্তানের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ। এ সকল কারণে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের অনুকূলে প্রকাশ্যভাবে পক্ষাবলম্বন ওয়াশিংটনের পক্ষে অনেকটা কঠিন ছিল, যদিও মার্কিন জনমত ছিল বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনের অনুকূলে। পাকিস্তানের সঙ্গে ঐতিহ্যিক মার্কিন মৈত্রীবন্ধন ও মার্কিন জনমতের সাম্প্রতিক ধারা বিবেচনায় রেখে ওয়াশিংটন মধ্যপথ বেছে নেয়, তা হলো স্থিতিবিধায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া। কার্যত, এর অর্থ হচ্ছে বাংলাদেশে পাকিস্তান সরকারের সামরিক অভিযান থেকে নিজস্ব দূরত্ব বজায় রাখা, সহিংসতার ধারা সীমিত রাখা এবং দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণে রাখা।

বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, এ ধরনের মার্কিন কৌশলগত অবস্থান বিক্ষুব্ধ বাঙালিদের তৎকালীন ভাবাবেগতাড়িত প্রত্যাশা সম্পূরণের পক্ষে অবশ্যই যথার্থ ছিল না। কেননা পাকিস্তানের নৃশংসতার শিকার হয়ে স্পষ্টতই বাঙালিমাত্রই তখন ছিল অতিষ্ঠ। লক্ষ-কোটি বাঙালি তখন নিজ নিজ ঘরবাড়ি ও আবাসভূমি থেকে বিতাড়িত। তাই তাঁরা মরিয়া হয়ে উঠে প্রত্যাশিত স্বাধীনতা অর্জনের জন্য।

পক্ষান্তরে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মার্কিন কৌশলগত আচরণ ছিল পাকিস্তানের সঙ্গে আমেরিকার ঐতিহাসিক মৈত্রীবন্ধনের ধারা পুনর্মূল্যায়নের এক বেদনাদায়ক পর্যায়ে নিক্ষিপ্ত। সম্ভবত পাকিস্তান তার চরম এক রাজনৈতিকভাবে সংকটময় মূহূর্তে মার্কিন আচরণকে দেখে একটি অতি "বন্ধুপ্রতিম মিত্রের" নিদারুণ বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে। এতে পাকিস্তানী নেতৃত্বের রাজনৈতিক বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে মারাত্মক বিপর্যয় ঘটে এবং বিপর্যয়ের প্রভাব পড়ে পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক অভিযানের ক্ষেত্রে। ফলে সংগ্রামরত বাঙালিদের কৌশলগত উদ্দেশ্যাবলী অর্জন সহজতর হয়। শুধু তাই নয়, পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরে ও বাইরে স্বাধীনতা অভিলাষী বাঙালিরা তাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে মার্কিন মানবিক-অর্থনৈতিক সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়ে লাভবান হয়। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, রাজনৈতিক-সামরিক বিষয়াদিতে আপেক্ষিকভাবে স্থিতিবিধায়ক মাঝামাঝি মার্কিন অবস্থান কার্যত পূর্ব পাকিস্তানে গৃহীত পাকিস্তানী সামরিক সরকারের কৌশলগত উদ্দেশ্যাবলীর বিপক্ষে চলে যায়, বিপন্ন হয় পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি।

## চীনের প্রতিক্রিয়া

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে চীনের দক্ষিণ এশীয় নীতির মূল্যায়ন করতে হলে প্রথমে প্রয়োজন চীনা নীতির কৌশলগত বৈশিষ্ট্যাবলী চিহ্নিত করা। চীনের অভ্যুদয় থেকে চীনের কৌশলগত দৃষ্টিকোণে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা যায়। অবশ্য এতে উল্লেখযোগ্য বেশ কিছু ধারাবাহিকতার উপাদানও ছিল। ১৯৪৯ সনের পহেলা অক্টোবর যখন নতুন চীনের অভিযাত্রা শুরু হয়, চীন তার শির উন্নত করতে সমর্থ হয়, বিঘোষিত হয় গণপ্রজাতান্ত্রিক চীন "একমাত্র চীনা সরকার" হিসেবে, ঐতিহ্যবাহী চীনের অনুকরণে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বেইজিং উপস্থাপন করে এক নতুন নীতিগত ভাবমূর্তি।[২১] চীন চায় নিজকে শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে, চীনা জাতি বিশ্ব পরিমণ্ডলে স্বদেশকে একটি অতি শক্তিধর রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত হয় যাতে বিশ্বের অন্যান্য দেশ একে সমীহ করে, করে অনুকরণ। চীন আর কখনো মাথা নীচু করবে না, কাউকে দেবে না চীনের দর্পচূর্ণ করতে। চীন চায় তার নিজ সীমারেখার বাইরে তার ভাবমূর্তি ও প্রভাব-প্রতিপত্তির বিস্তার ঘটাতে। চীন চায়, সাম্রাজ্যবাদ ও আগ্রাসনের মোকাবেলায় তৃতীয় বিশ্বে চীনের দৃষ্টান্ত অনুকরণীয় হয়ে থাকবে।[২২] সমকালীন কূটনীতি ও পররাষ্ট্রনীতির অঙ্গনে আপেক্ষিকভাবে চীন হচ্ছে নবাগত। আন্তর্জাতিক আচরণের ক্ষেত্রে চীনের আত্মগত বিবেচনায় ছিল সমাজতন্ত্রের সংজ্ঞায়িত রূপ, যার অভিব্যক্তি ঘটে কার্ল মার্ক্স, লেনিন ও মাও জেদং-এর রাজনৈতিক তত্ত্ব ও চিন্তাধারার রূপরেখার মাধ্যমে। এছাড়া চীনের বস্তুগত প্রয়োজন বা উদ্দেশ্যাবলীও বিদ্যমান ছিল। এর মধ্যে ছিল প্রতিরক্ষা বা আত্মসংরক্ষণ বা

২১. "China Stands Up", *Asia Week* (2 June, 1989), 23.
২২. Abul Kalam, "China's Self-image in the Post-Cold War Era", *The Daily Star* (3 January 1997)

চীনের জাতীয় প্রতিরক্ষা সুদৃঢ়করণ, জাতীয় শক্তির উন্নয়ন এবং জাতীয় ঐক্যের বা দেশের পুনরেকত্রীকরণের কাজ সমাধা করা।২৩

## চীনের পররাষ্ট্রনীতি ও নিরাপত্তা ধারণা

উপর্যুক্ত উপাদানসমূহ চীনের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন ও কৌশলগত অভিব্যক্তিতে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আসছে বটে, কিন্তু নেতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে চীন দু'দিক থেকে ব্যাপকতর সমস্যার সমুখীন হয়। চীনা দৃষ্টিতে, একদিক থেকে "মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা" আগ্রাসনপ্রক্রিয়ায় প্রবৃত্ত, অন্যদিক থেকে পরবর্তীকালে সোভিয়েত "সামাজিক সাম্রাজ্যবাদীরা' এশিয়া সহ বিশ্বের অন্যত্র "আধিপত্যবাদ" প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হয়। ষাটের দশকে চীন-সোভিয়েত বিরোধ ব্যাপকতা লাভ করতে থাকে। ফলে এক সময়কার মিত্রদেশ সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে চীনের দ্বান্দ্বিক সংঘর্ষের সম্ভাবনা দেখা দেয়। চীনের উত্তরাঞ্চলীয় সীমানাপ্রান্তে প্রায় দশ লক্ষের মতো সোভিয়েত সৈন্য মোতায়েন থাকে। এ ছাড়া ছিল শ্রেষ্ঠতর সোভিয়েত পারমাণবিক শক্তিসম্ভার। এসব কারণে প্রতিবেশী দেশসমূহ সহ পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি চীন তার পররাষ্ট্র ও কৌশলগত নীতি নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে প্রয়োগে সচেষ্ট হয়। বিশ্ব ও আঞ্চলিক রাজনীতির ক্ষেত্রে নতুন মোড় চীনকে বাধ্য করে এমন এক নীতি গ্রহণে যাতে চীনের দক্ষিণ প্রান্তে চীনকে কৌশলগতভাবে বৃত্তায়নের উদ্দেশ্যে আরেকটি শক্তিজোট গঠিত না হয়। বিশেষ করে চীন চায় যে তার প্রতিবেশী অঞ্চল দক্ষিণ এশিয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়ন যেন কোনো প্রকার স্থায়ী সামরিক উপস্থিতি স্থাপনের সুযোগ লাভ না করে।

এ সকল উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য ১৯৬০-এর দশকের শেষপাদে বেইজিং কৌশলগত চাল হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সমঝোতা স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এবং সেই উদ্দেশ্য অনুযায়ী কূটনৈতিক প্রয়াস অব্যাহত রাখে। ঐ সময়কালীন চীনা আধিপত্যবাদবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি এবং রাজনৈতিক-সামরিকভাবে দ্বি-মেরুকেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থার বিরুদ্ধে পরিচালিত কৌশলগত নীতি ছিল উভয় পরাশক্তির বিরুদ্ধে পরিচালিত। কিন্তু ১৯৭০-এর দশকের প্রারম্ভ থেকে এ ধরনের চীনা কৌশলগত নীতি বাস্তবে উত্তরোত্তর পরিচালিত হতে থাকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে।

## চীনের কৌশলগত আচরণ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের কৌশলগত আচরণ নিরাপত্তা দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে বেইজিং-এর উপর্যুক্ত রূপান্তরের পটভূমিতে বিবেচনা করতে হবে। এক্ষেত্রে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে, বিশ্ব রাজনীতির পরিমণ্ডলে পরাশক্তিদ্বয়ের আধিপত্যবাদের বিরোধিতা এবং তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশসমূহের জাতীয়

---

২৩. Abul Kalam, "China's Foreign Policy and Security Perceptions", *BIISS Journal* (1996), আরো দ্রষ্টব্য তৎরচিত *The Communist Triangle: Foreign Policy Interactions* (Dhaka 1987), especially ch, 3; Allen S. Whiting, "Foreign Policy of Communist China", in Roy C. Macridis (ed ), *Foreign Policy in World Politics* (Englewood Cliffs, N J Prentice-Hall, Inc., 1967), 314-328

মুক্তিসংগ্রামে আদর্শগত সাহায্য প্রদানের প্রতিশ্রুতির ক্ষেত্রে চীন এক ধরনের কৌশলগত উভয়সংকটমূলক সমস্যার সমুখীন হয়। স্পষ্টতই তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের মুক্তিসংগ্রামে সাহায্য প্রদান থেকে সম্ভাব্য সোভিয়েত হুমকির মোকাবেলা করা চীনের কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গিতে অগ্রাধিকার লাভ করে। এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ করা চলে যে, বিশ্বব্যাপী জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের প্রতি চীনা সমর্থন সর্বদাই ছিল নিছক তাত্ত্বিক পর্যায়ের, কেননা চীন জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে স্বনির্ভরতার উপর জোর দিয়ে আসে প্রথম থেকে।

উপরন্তু, একদিকে চীন-মার্কিন দ্যঁতত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও অন্যদিকে বিপ্লবী আন্দোলনসমূহের সদিচ্ছা অর্জনে চীন-সোভিয়েত আদর্শগত প্রতিযোগিতাপ্রসূত উভয়-সংকটমূলক পরিস্থিতির মোকাবেলায় বেইজিং একটি বিপ্লবী দ্বৈত রণকৌশল অবলম্বন করে। কূটনৈতিক পর্যায়ে এটি এক সংমিশ্রিত রূপ পরিগ্রহ করে, যাকে শ্লোগানে রূপ দেয়া হয় "মৈত্রী ও সংগ্রাম" নামে। আদর্শিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটি বিবেচিত হয় নিষ্কণ্টক বলে, অথচ কৌশলগত পর্যায়ে বিকল্প চালের প্রয়োজনীয়তার স্বীকৃতিও মেলে এতে। কূটনীতির কলাকৌশলের ক্ষেত্রে বিবেচনায় রাখা হয় সর্বপ্রকার ফন্দি-ফিকিরের মধ্যে কৌশলগত সমন্বয় বিধান করা এবং এমনভাবে চাল খেলা যাতে "সকল দ্বন্দ্ব, ফাঁক ও শত্রুপক্ষের অভ্যন্তরীণ কলহের সুযোগ নেয়া যায় এবং এসবকে আজকের মুখ্য শত্রুর বিরুদ্ধে ব্যবহার করা চলে"।[২৪] এসকল কলাকৌশলে চীনের বাস্তবমুখী রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে, কেননা বাহ্যত চীন তার বিপ্লবী নীতির প্রতি কঠোর আনুগত্য বর্জন না করেও আন্তর্জাতিক কূটনীতির প্রচলিত ধারার সঙ্গে নমনীয় সম্পর্ক বজায় রেখে চলে। বেইজিং-এর তৎকালীন দৃষ্টিকোণ থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরিবর্তনশীল সম্পর্কের পটভূমিতে এধরনের কৌশলগত চালের কোনরূপ বিকল্প ছিল না।

বাংলাদেশ সংকটকালে চীন-সোভিয়েত সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে বেইজিং তার দ্বৈত বিপ্লবী রণকৌশল প্রয়োগ করে বলে মনে হয়। কেননা চীনা দৃষ্টিকোণ থেকে ঐ সময়ে সোভিয়েত শাসকগোষ্ঠী ছিল "নব্য-জারদের সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী" চিন্তা-চেতনা দ্বারা প্রভাবিত। চীনের প্রতি তৎকালীন সোভিয়েত দৃষ্টিভঙ্গি ছিল চীনকে ঘিরে বৃত্তাঙ্কিত রণনীতিপ্রসূত—চীনের বিরুদ্ধে সোভিয়েত সরকার পরিচালিত একের পর এক রণনৈতিক কৌশলমূলক চাল স্বাভাবিকভাবেই সরাসরি সোভিয়েত হুমকি সম্পর্কে বেইজিংকে আশংকিত করে তোলে। চীনের বিরুদ্ধে পরাশক্তির দ্যঁতত সম্পর্ক জোরদার করার জন্য মস্কো বিশেষভাবে প্রয়াসী হয়। চীন স্পষ্টতই অনুধাবন করে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহকারে চীনবিরোধী শক্তিজোট গঠন করাই হচ্ছে সোভিয়েত লক্ষ্য। এছাড়া, মস্কো একটি "এশীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা" গড়ে তুলতেও প্রয়াসী হয়। চীনের দৃষ্টিতে, প্রকৃত অর্থে এটা ছিল চীনবিরোধী

২৪. Abul Kalam, *Superpower Rivalry in the Middle East* (Unpublished M A. Thesis, Carleton University, Ottawa, Canada, 1975).

মৈত্রীজোট। এর পেছনে পুরো ইন্ধন যোগায় এমন একটি শক্তি যে-শক্তি আসলে এশীয় নয়, অথচ এর উদ্দেশ্য ছিল এশীয় শক্তি চীনকে বৃত্তাঙ্কিত রণনীতির চাল দিয়ে ঘিরে রাখা।

## চীনের দক্ষিণ এশীয় নীতির পরিবর্তনশীল ধারা

চীনের বিশ্বভিত্তিক কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গিপ্রসূত রূপরেখার প্রেক্ষাপটে এখন দক্ষিণ এশিয়ায় চীনা রাজনৈতিক কৌশলগত আচরণ মূল্যায়নের অপেক্ষা রাখে। গণপ্রজাতান্ত্রিক চীনের আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে দক্ষিণ এশিয়ায় কয়েকটি কৌশলগত বিকল্প নিয়ে চীন দ্বিধান্বিত ছিল, যদিও উনিশ শতকে দক্ষিণ এশিয়ায় অবস্থিত বৃটিশ আগ্রাসী শক্তির শিকার হয় বলে চীন নিরাপত্তা দৃষ্টিকোণ থেকে এ অঞ্চলকে যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করে। স্বাধীনতা-উত্তর কালে ভারতকে ঘিরে চীনের প্রত্যক্ষ অনুভূতির ক্ষেত্রে উভয়বলতা পরিলক্ষিত হয়, এমনকি সেই দক্ষিণ এশীয় বৃহৎ শক্তি সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে চীনা পরিবর্তনশীল মনোভাবও লক্ষ্য করা যায়। ১৯৪৯ সনে মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের পর নয়াদিল্লীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনে বেইজিং-এর তেমন একটা আগ্রহ ছিল না। কেননা চীনের দৃষ্টিতে ভারতের নতুন 'বুর্জোয়া' সরকার সাম্রাজ্যবাদীদের 'লেজুড়' ছাড়া আর কিছু ছিল না। কিন্তু কালে কোরিয়া ও তিব্বতের মতো চীনের স্বার্থসংশ্লিষ্ট দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ভারতের নির্জোট দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের ফলে নয়াদিল্লীর প্রতি বেইজিং-এর মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে। শীঘ্রই দু'দেশেরই এশীয় বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের হস্তক্ষেপমূলক নীতি সীমিতকরণ বিষয়ে ঐকমত্যধর্মী প্রবণতা দেখা যায়। ১৯৫২ থেকে ১৯৫৪ পর্যন্ত দুই প্রতিবেশী বৃহৎ শক্তির মধ্যে সংলাপ চলে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে দু'দেশ স্বাক্ষর করে ১৯৫৪-এর তিব্বত চুক্তি। তিব্বত সহ অন্যান্য বিষয় ছাড়া এ চুক্তিতে প্রখ্যাত 'পঞ্চশীলা' নীতি গৃহীত হয়, যে-নীতিতে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান সম্পর্কিত পারস্পরিক সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৫০-এর দশকে দু'টি এশীয় বৃহৎ শক্তি চীন ও ভারতের মধ্যে একটি অলিখিত মৈত্রীসম্পর্ক গড়ে উঠে। এ সময়ে ভারত নববিঘোষিত 'বান্দুং নীতি'র ধারক ও বাহক হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করে এবং সেই আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি সহকারে ভারত এশিয়া · নব স্বাধ দেশসমূহের মুখপাত্র হিসেবে উপস্থাপনে প্রয়াসী হয়। চীনও স্বয়ং আফ্রো-এশীয় অনেক অকম্যুনিস্ট দেশের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে নয়াদিল্লীকে ব্যবহার করে। এমনকি ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সুবাদে পঞ্চশীলা নীতিমালার ভিত্তিতে অনেক আফ্রো-এশীয় দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কও স্থাপন করে। দু'দেশের সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতার আমেজ প্রদর্শনে দু'দেশ এ সময়ে 'হিন্দি-চীনী ভাইভাই' শ্লোগানও ব্যবহার করে। অবশ্য এও মনে রাখা প্রয়োজন যে, নয়াদিল্লীকে অবজ্ঞা না করেও

বেইজিং সতর্কতার সঙ্গে পাকিস্তানের মতো অন্যান্য দক্ষিণ এশীয় দেশের সঙ্গেও সুসম্পর্ক গড়ে তোলে। অতি শীঘ্রই 'হিন্দি-চীনী ভাইভাই' ভিত্তিক উষ্ণতায় শীতল ভাব পরিলক্ষিত হয়। সহসা দুই মিত্র দেশ দু'দেশের সীমান্ত অঞ্চল নিয়ে নিজ নিজ অধিকার ও কর্তৃত্বের বিষয়ে বিরোধে জড়িয়ে পড়ে।

১৯৫০-এর দশকের শেষ পাদে চীন-ভারত বিরোধ তিক্ত রূপ ধারণ করে। এই তিক্ততার প্রক্রিয়া চলে চীন-সোভিয়েত সম্পর্কের অবনতির পাশাপাশি এবং সেই প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত পরিণতি হিসেবে সংঘটিত হয় ১৯৬২ সনে চীন-ভারত সীমান্তে স্বল্পকালীন অথচ এক তীব্র যুদ্ধ। চীন-ভারত সীমান্তযুদ্ধ চলাকালে ও এর পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন উভয় পরাশক্তি ভারতকে কূটনৈতিক সমর্থন ও সামরিক সরবরাহ প্রদান করে। এতে বেইজিং-এ নিশ্চিত ধারণা জন্মে যে, নয়াদিল্লী বান্দুং নীতিমালা পরিত্যাগ করে সম্প্রসারণবাদী মনোবৃত্তি গ্রহণ করেছে এবং এই জাতীয় অভিলাষ সাধনে ভারত উভয় পরাশক্তির সমর্থন লাভে ব্যতিব্যস্ত হয়েছে।

### সোভিয়েত দোসর হিসেবে ভারত সম্পর্কে চীনের ধারণা

১৯৬২ সনের চীন-ভারত সীমান্তযুদ্ধের পর থেকে দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের কৌশলগত উদ্দেশ্যাবলীর ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন দেখা যায়। এ ঘটনার পূর্বাবধি ভারত সম্পর্কে চীনের ধারণা ছিল পরাশক্তির নিয়ন্ত্রণমুক্ত একটি জোটনিরপেক্ষ শক্তি হিসেবে এবং সেই ভাবমূর্তি থাকার কারণে সাধারণভাবে ভারতের প্রতি বেইজিং সমর্থনমূলক নীতি গ্রহণ করে আসছিল। কিন্তু ১৯৬২ সনের পর থেকে নয়াদিল্লীকে চীন দেখে পরাশক্তিদ্বয়ের দোসর হিসেবে, দেখে বিশেষত সোভিয়েত লেজুড় হিসেবে। চীন-ভারত সীমান্তযুদ্ধের পরবর্তীকালে দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের কৌশলগত উদ্দেশ্য ক্রমশ সোভিয়েত 'আধিপত্যবাদী' কর্মকাণ্ডকে প্রতিহত করার রূপ পরিগ্রহ করে। চীন-ভারত সম্পর্ক, এমনকি দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের সার্বিক নীতি সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে। চীনকে ঘিরে সোভিয়েত বৃত্তাঙ্কিত রণনীতিতে ভারতের অবস্থান কোথায় থাকছে সেটাই ছিল বেইজিং-এর নিকট বিচার্য। চীনের দৃষ্টিতে, মস্কো-নয়াদিল্লী সম্পর্কের অন্তরালে ইন্ধন যোগাচ্ছে তাদের পারস্পরিক স্বার্থের সামঞ্জস্য। এ দু'দেশের জাতীয় স্বার্থের অন্বেষা ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে সম্ভবত ভিন্ন ভিন্ন খাত থেকে উৎসারিত বলে মনে হতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও ঐ পর্যায়ে দু'দেশের স্বার্থ এক অভিন্ন ধারায় সম্মিলিত হয়।

ব্রেজনেভ মতবাদ বিঘোষিত হয় ১৯৬৯ সনের জুনে। কিন্তু সেই মতবাদের অন্তরালে ছিল ১৯৬৯ সনের মার্চের চীন-সোভিয়েত সীমান্তসংঘর্ষ। দু'টি কম্যুনিস্ট দেশের সীমান্তসংঘর্ষের ফলশ্রুতিতে ব্রেজনেভ মতবাদে উত্থাপিত হয় এশিয়ায় সোভিয়েতপন্থী যৌথ নিরাপত্তাব্যবস্থা। এ ধরনের নিরাপত্তাব্যবস্থায় আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রসঙ্গ

বিবেচিত হয় নি; বরং এতে জোর দেয়া হয় সোভিয়েত বন্ধনে আবদ্ধ প্রতিরক্ষাচুক্তির মতো বিষয়াদির উপর। মস্কোর উদ্দেশ্য ছিল দ্বিমুখী: প্রাচ্যের এলাকাসমূহ থেকে বৃটিশ বাহিনী প্রত্যাহারের পর শক্তিশূন্যতা পূরণ করা, চীনকে বৃত্তায়িত করা এবং এশিয়াকে মস্কোর প্রাধান্যে আনা। এ বিষয়ে বেইজিং-এ অবশ্যই একটা আত্মতৃপ্তির ভাব পরিদৃষ্ট হয়। মস্কো তার "চীনবিরোধী সামরিক মৈত্রীর জীর্ণ পতাকা" নিয়ে বেশিদুর এগুতে পারে নি, সোভিয়েত শাসকশ্রেণী সমর্থ হয় নি এশিয়ার দক্ষিণ প্রান্তে তার প্রভাব বিস্তার করতে। তবু চীন-সোভিয়েত বিরোধের ফলে দক্ষিণ এশিয়াতেও দু'টি কম্যুনিস্ট শক্তির প্রভাববলয় সৃষ্টির প্রক্রিয়া দেখা যায়। চীন স্পষ্টতই বুঝতে পারে যে, মস্কো ভারতকে হাত করতে প্রয়াসী এবং এ প্রয়াস অবশ্যই ছিল চীন-ভারত দ্বন্দ্বের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।[২৫]

## চীনের দক্ষিণ এশীয় রণনীতির কার্যকর নীতিমালা

এ পর্যায়ে দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের রণনীতির মৌলিক কার্যকর নীতিমালা তুলে ধরা যেতে পারে। এসব প্রচ্ছন্ন নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত ছিল : (১) ভারতের সঙ্গে অন্যান্য দক্ষিণ এশীয় দেশের সম্পর্ক ব্যাহত করা, নয়াদিল্লীর সঙ্গে তাদের বিরোধে ইন্ধন যোগানো এবং এসব বিরোধের সমাধানে ভারতের শর্তাবলী প্রত্যাখ্যানে উৎসাহ প্রদান করা; (২) দক্ষিণ এশিয়ায় সোভিয়েত কৌশলগত ফন্দি-ফিকির জটিল করে তোলা, ভারতকে সোভিয়েতদের দোসর হিসেবে দেখানো এবং (৩) পরিশেষে মস্কোপন্থী পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণের দায়ে ভারতের উপর অব্যাহত চাপ সৃষ্টি করে চলা, যেমন ভারতে বিপ্লবী বা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের প্রতি চীনের সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করা এবং সময়-সুযোগ মতো মাঝে-মধ্যে বিরোধপূর্ণ চীন-ভারত সীমান্ত অঞ্চলে চাপ সৃষ্টি করা।[২৬]

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ১৯৬০-এর দশকে চীনের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের সম্পর্কের ক্ষেত্রে যুগপৎ সংকটাপন্ন অবস্থার সৃষ্টি হয়। সেই সংকটের কারণেই বেইজিং পাকিস্তানের সঙ্গে উন্নততর সম্পর্ক স্থাপনে প্রবৃত্ত হয়, এমনকি দু'দেশের সম্পর্ক জোরদার করতেও প্রয়াসী হয়। চীন-পাকিস্তান সম্পর্ক গভীরতর হওয়ার পেছনে তিনটি উপাদান কাজ করে : (১) পাকিস্তান তার নিরাপত্তার বিকল্প দিকগুলো, বিশেষকরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তার মৈত্রীসম্পর্কের বিষয় পুনর্মূল্যায়ন করতে বদ্ধপরিকর হয়। কেননা তখনো চীনের দৃষ্টিতে আমেরিকা ছিল তার এক নম্বর শত্রু। (২) পাকিস্তান তার কাঙ্ক্ষিত অভিলাষ অনুযায়ী একটি বিকল্প নিরাপত্তা সমর্থনের উৎস লাভ করে, যা ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিকল্প। এক্ষেত্রে অবশ্যই পাকিস্তানের চাহিদা ছিল কোনরূপ সোভিয়েত চাপের

২৫. Shirin Tahir-Kheli, "Chinese Objectives in South Asia "Anti-Hegemony" vs "Collective Security", *Asian Survey*, Vol. XVIII, No. 10 (October 1978), 998-999, 1006

২৬. Sisson and Rose, *War and Secession*, 247-248

মুখে নতিস্বীকার না করা। চীনা সমর্থনের ফলে পাকিস্তানের পক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের পরিবর্তে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সমঝোতা স্থাপনের জন্য মস্কোর প্রস্তাবাবলী প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব হয়। (৩) পরিশেষে, এ সময়ে ভারতবিরোধী এক "চীনা-পাকিস্তানী যোগসাজশমূলক চক্রান্ত" নয়াদিল্লীর চোখে পরিদৃষ্ট হয়। ফলে কৌশলগতভাবে প্রতিবেশী দু'টি শত্রুরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এককভাবে বা উভয়ের বিরুদ্ধে সম্মিলিত কোনরূপ রাজনৈতিক ও রণনৈতিক কর্মপন্থা গ্রহণ দুষ্কর হয়ে পড়ে। ১৯৬৫ সনের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ চলাকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন পাকিস্তানের প্রতি সকল প্রকার সামরিক সাহায্যকর্মসূচি বন্ধ করে দেয়, চীন তখন বহিঃসাহায্যবঞ্চিত পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সামরিক সরবরাহের প্রধান উৎসরূপে পরিগণিত হয়। এভাবে ১৯৬৫ সনের দিকে বৃহৎ শক্তিসমূহের মধ্যে চীনই শুধুমাত্র পাকিস্তানের বিশেষ বিশ্বাসযোগ্য মিত্রদেশ বলে বিবেচিত হয়।

চীন স্বয়ং পাকিস্তানের সঙ্গে তার সুসম্পর্ক বজায় রাখতে আগ্রহী ছিল, এমনকি পাকিস্তানের সঙ্গে সেই সম্পর্ক গভীরতর করতেও তৎপর হয়। ১৯৬০-এর দশকের সূচনা থেকে সাংস্কৃতিক বিপ্লব চলাকাল অবধি চীন বহির্বিশ্বের সঙ্গে, বিশেষকরে মুসলিম দুনিয়ার দেশসমূহ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে পাকিস্তানকে ব্যবহার করে কূটনৈতিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করে। এসব সত্ত্বেও আরেকটি ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটলে পাকিস্তানের সাহায্যে হস্তক্ষেপ করার বিষয়ে কোনরূপ সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকার প্রদান থেকে নিঃশব্দে চীন বিরত থাকে।

এ প্রসঙ্গে আরো মনে রাখা প্রয়োজন যে, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বছরগুলোর (১৯৬৬-৬৯) বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার কারণে চীনা পররাষ্ট্রনীতিতে স্বাতন্ত্র্যপ্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। ১৯৬৯ সনে চীন-সোভিয়েত সম্পর্কের ক্ষেত্রে সংকট, বিশেষকরে দু'দেশের সীমান্তঅঞ্চলে ব্যাপক আকারের সংঘর্ষ দক্ষিণ এশিয়ার প্রতি চীনের দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে প্রচণ্ড প্রভাব ফেলে। ঐ সময়ে চীনের বহিঃসম্পর্কে মস্কো কেন্দ্রবিন্দু রূপে আবির্ভূত হয়।[২৭] ভারত চিহ্নিত হয় সোভিয়েত ইউনিয়নের বড় ধরনের সমর্থক হিসেবে। প্রকৃত অর্থে চীন ভারতকে চীনবিরোধী সোভিয়েত বৃত্তাঙ্কিত রণনীতির অবিচ্ছেদ্য অংশবিশেষ বলে বিবেচনা করে। মস্কো চায় ভারতকে দক্ষিণ এশিয়ার কর্তৃত্বধর শক্তি বা কর্ণধার হিসেবে দাঁড় করাতে। পক্ষান্তরে, পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে চীন দক্ষিণ এশিয়ায় শক্তির ক্ষেত্রে ভারসাম্যমূলক ব্যবস্থার অনুকূলে ছিল যাতে ভারত এই অঞ্চলে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার সুযোগ লাভ না করে।[২৮] এভাবে যে ভারতবিরোধিতা ১৯৬০-এর দশকের দিকে চীনের দক্ষিণ এশীয় রণনীতির কৌশলমূলক উপাদানের রূপ পরিগ্রহ করেছিল, কালক্রমে তা বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে শক্তিসাম্যের রূপ পরিগ্রহ করে।

২৭. Tahir-Kheli,"Chinese Objectives," 996.

২৮. Bhabani Sengupta, *Fulcrum of Asia* (New York: Praeger, 1970), 36; Kamal Siddiqui, *The Political Economy of Indo-Bangladesh Relations* (Unpublished M. A. Thesis, The School of Oriental and African Studies, University of London, September 1975), 118.

## চীনের পরিবর্তনবিরোধী দক্ষিণ এশীয় নীতি

দক্ষিণ এশিয়ায় সম্ভাব্য ভারত-সোভিয়েত কৌশলগত চালের বিপক্ষে চীনের পররাষ্ট্রনীতিতে নিঃসন্দেহে পরিবর্তনবিরোধী প্রবণতা দেখা দেয়, যা ছিল আঞ্চলিক পর্যায়ে শক্তির ভারসাম্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু তা সত্ত্বেও ১৯৭১-এর মার্চে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানে সৃষ্ট ঘটনাবলীর কারণে চীন এ অঞ্চলে পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনায় কঠিন পরীক্ষার সমুখীন হয়। চীন সম্ভবত অনুধাবন করতে পারে যে, এসব ঘটনাবলীর ফলে চীনের লাভের কিছুই নেই, বরং ক্ষতির সম্ভাবনা ব্যাপক। কেননা, পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর ব্যাপকতর নৃশংসতা বুর্জোয়াবাদী আওয়ামী লীগপন্থীদের পাশাপাশি চীনপন্থী বাম রাজনীতিকদের বিরুদ্ধেও পরিচালিত হয়। ফলে বাঙালিদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দমনে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর নিপীড়নমূলক কর্মকাণ্ড সমর্থন করা বেইজিং-এর পক্ষে কঠিন ছিল। সাধারণ তত্ত্বগত দিক থেকে বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের নির্যাতনমূলক ব্যবস্থার প্রতি সমর্থন হতো বাস্তবে "জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের" প্রতি চীনের আদর্শগত একাত্মতার পরিপন্থী।

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ আন্দোলনের সমস্যাকে চীনের নিজস্ব কৌশলগত স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকেও দেখতে হবে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে চীনের বড় ধরনের একটি উদ্বেগের বিষয় বিজড়িত ছিল। চীন চায় নি যে পাকিস্তানের মতো একটি মিত্রদেশ দুর্বলতর হয়ে পড়ুক বা চীনের আচরণে পাকিস্তান খুব ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ুক অথবা উভয় দেশের অভিন্ন শত্রু ভারত সামরিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে বাংলাদেশ সংকট নিরসনে উৎসাহিত হোক। চীনের দৃষ্টিতে, ভারতের এ ধরনের হস্তক্ষেপ হতো ভারত ও চীন কর্তৃক স্বীকৃত পঞ্চশীলা নীতির পরিপন্থী, কেননা পঞ্চশীলা নীতির মর্মকথাই ছিল শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান।

## চীনের হস্তক্ষেপবিরোধী মনোভাব

উপর্যুক্ত বিশ্লেষণ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশ সংকটকালে চীন ছিল বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে। এ কারণে ১৯৭১-এর মার্চে পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী কর্তৃক হত্যাকাণ্ড পরিচালনা করার পর চীন সরকারিভাবে কোনরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেনি, কিন্তু চীনা সংবাদসংস্থা *New China News Agency* ৪ এপ্রিল এমন একটি সংবাদ পরিবেশন করে যে পূর্ব পাকিস্তানে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের স্তব্ধ করার উদ্দেশ্যে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এ প্রসঙ্গে *People's Daily* তার ১১ এপ্রিলের সম্পাদকীয় বক্তব্যে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে ভারতীয় হস্তক্ষেপের সমালোচনা করে, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে কোনরূপ সুনির্দিষ্ট বক্তব্য রাখা থেকে বিরত থাকে। একই তারিখে চীনের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জুয়েনলাই কর্তৃক পাকিস্তানের সামরিক সরকারপ্রধান ইয়াহিয়াকে লিখিত সরকারি পত্র ছিল "কূটচাল ও

ধাপ্পাবাজির কৌশলমূলক" প্রমাণপত্রবিশেষ। কেননা এতে সরাসরি পাকিস্তান সরকার বা বাংলাদেশ মুক্তি আন্দোলনের কোন সমালোচনা করা হয় নি, অথচ পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের দায়ে ভারত সরকারকে অভিযুক্ত করা হয়। একই সঙ্গে ঐ পত্রে একই ধরনের হস্তক্ষেপমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন উভয় দেশের সরকারের উপর দোষারোপ করা হয়। চীনের সেই পত্রে আরো রাজনৈতিক চালের পরিচয় মেলে; কেননা চীন "পাকিস্তানী জনগণের" প্রতি সমর্থনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে, অথচ পাকিস্তানের সামরিক সরকারের প্রতি কোনরূপ সুস্পষ্ট সমর্থন প্রদান থেকে বিরত থাকে।[২৯] বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রারম্ভিক মুহূর্তগুলোতে এভাবে চীনের রণনৈতিক তত্ত্বীয় অভিব্যক্তিসমূহ দক্ষিণ এশিয়ায় প্রতিফলিত হয়। চীনের দৃষ্টিভঙ্গিতে স্পষ্টতই সোভিয়েত ও ভারতবিরোধিতা পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু পাকিস্তানের সামরিক সরকারের কর্মকাণ্ডে বেইজিং ইতিবাচক সায় প্রদান থেকে বেশ সতর্ক থাকে।

বিষয়টি প্রকারান্তরে এভাবেও বলা চলে : বাহ্যত বেইজিং-এর অবস্থান ছিল পাকিস্তানের প্রতি সমর্থনমূলক, কিন্তু অপ্রকাশ্যে চীন ইসলামাবাদকে জানিয়ে দেয় যে দক্ষিণ এশিয়ায় কোনরূপ সহিংস বিরোধে তার পক্ষে হস্তক্ষেপমূলক ভূমিকা রাখা সম্ভব হবে না। এ প্রসঙ্গে আরো মনে রাখা সমীচীন যে, পাকিস্তান ও ভারত উভয় সরকারই চীনের কৌশলগত অবস্থান সম্পর্কে অবহিত ছিল এবং তদনুযায়ী উভয় দক্ষিণ এশীয় শক্তি নিজ নিজ রাজনৈতিক ও সামরিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে তৎপর হয়।

২৫ মার্চ ১৯৭১-এর পর চীন নিঃসন্দেহে পাকিস্তানের জন্য প্রতিশ্রুত তার অর্থনৈতিক ও সামরিক সরবরাহ অব্যাহত রাখে। পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর জন্য প্রেরিত ব্যাপক চীনা সামরিক সরঞ্জাম জাহাজ থেকে খালাশ করার বিষয়েও বেইজিং আপত্তি তোলে নি। তবে উল্লেখ্য বিষয় এই যে, এসব সামরিক সরঞ্জাম ২৫ মার্চের পূর্বেই জাহাজবোঝাই করা হয়, যদিও চট্টগ্রাম নৌ-বন্দরে এসব সরঞ্জামাদি এপ্রিলের দিকে পৌঁছে। এভাবে চীন তার পূর্বে ওয়াদাকৃত সামরিক সরবরাহ পাকিস্তানকে প্রদান করে, কিন্তু ১৯৭১-এর বসন্ত ও গ্রীষ্ম কালের নতুন সামরিক সাহায্য প্রদানের বিষয়ে অনীহার ভাব প্রদর্শন করে। পাকিস্তান চীন থেকে বিশেষকরে কিছু জঙ্গি বিমানের জন্য আবেদন করে। এসকল আবেদন বিবেচনার প্রক্রিয়ায় বেইজিং বেশ কালক্ষেপণ করে এবং পরবর্তীকালে কয়েক মাস সময় নিয়ে যখন পাকিস্তানকে ঐ সকল জঙ্গি বিমান পাঠায়, বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে যুদ্ধ তখন শেষ হয়ে যায়।[৩০]

এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ্য, প্রায় ১৯৭১ সন ব্যাপী পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলী সম্পর্কে বেইজিং সতর্কতা সহকারে নীরবতা পালন করে, একমাত্র পরোক্ষভাবে প্রয়োজনবোধে সময়মতো প্রতিবেশী দেশসমূহে ভারতের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে চিরাচরিত ভাষায় নিন্দাবাদ

২৯. Sisson and Rose, প্রাগুক্ত, 250.
৩০. ঐ, 251-252.

জ্ঞাপন করে। ১৯৭১ সনের শেষপাদে অবশ্য চীনের নিকট স্পষ্ট হয় যে, সোভিয়েত সমর্থনপুষ্ট ভারত পূর্ব পাকিস্তানে শক্তি প্রয়োগে বদ্ধপরিকর।

### চীনের পররাষ্ট্রনীতিতে বাস্তববাদী প্রবণতার লক্ষণ

বাংলাদেশ সংকটকালে চীনের পররাষ্ট্রনীতিতে সুস্পষ্ট বাস্তববাদী চিন্তা-চেতনার অভিব্যক্তি ঘটে ভারত-সোভিয়েত মৈত্রীচুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর। এ সময় পাকিস্তান সরকার পুনর্বার চীনের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হয়। চীন তখন ছিল সম্পর্কের দিক থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছাকাছি। উভয় শক্তি এ সময়ে পাকিস্তানকে কূটনৈতিক সমর্থন প্রদানে এগিয়ে আসে। চীনের দৃষ্টিতে, ভারত-সোভিয়েত মৈত্রীচুক্তির কারণে ভারতের জোটনিরপেক্ষতা শুধু ক্ষুণ্ন হয়নি, বরং এতে চীনের নিরাপত্তাগণ্ডীর চারপাশে বেড়াজাল সৃষ্টির সোভিয়েত পাঁয়তারা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হয়। তাই চীন মনে করে, ভারত-সোভিয়েত মৈত্রীজোটকে শুধুমাত্র আঞ্চলিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা সমীচীন হবে না, একে মূল্যায়ন করতে হবে চীনবিরোধী সোভিয়েত কৌশলগত চালের অংশবিশেষ হিসেবে। মস্কোর সেই চালের বিরুদ্ধে পাল্টা রাজনৈতিক চাল হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠাই ছিল তখন চীনের জন্য শ্রেয়।

উপর্যুক্ত আলোচনা ও বিশ্লেষণ থেকে বাংলাদেশ সংকটকালে চীনের পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে প্রতিফলিত নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক স্থাপনের পরিপ্রেক্ষিত সুস্পষ্টরূপে বোঝা যায়। চীনের উদ্দেশ্য ছিল একটাই—চীনবিরোধী সোভিয়েত কূটচাল মোকাবেলা করা।

এসব থেকে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের পররাষ্ট্রনীতিতে কোনরূপ আদর্শগত ভিত ছিল না, এতে চীনের নিজ স্বার্থগত যুক্তিযুক্ততাই বাহন হিসেবে কাজ করে। ১৯৭১-এর নভেম্বরের ৭ তারিখ জুলফিকার আলী ভূট্টো একটি উচ্চ পর্যায়ের পাকিস্তানী প্রতিনিধিদল সহকারে চীনের নিকট জরুরি সামরিক সরবরাহের দাবি নিয়ে বেইজিং সফরে যান। ভূট্টোর নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধিদল ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের ক্ষেত্রে চীনা সমর্থনও কামনা করে। চীনের সেই সময়কার অবস্থান ছিল উভয়সংকটমূলক, বিপরীতধর্মী। জুয়েনলাই নাকি বোঝাতে চান যে, যুদ্ধ না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, কিন্তু যুদ্ধ সংঘটিত হলে চীন পাকিস্তানকে রাজনৈতিকভাবে সাহায্য প্রদান করবে, সামরিক সাহায্যও প্রদান করা হবে প্রয়োজনমতো। কিন্তু তিনি পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন যে, যুদ্ধ সংঘটিত হলে পাকিস্তানের সপক্ষে চীন সামরিকভাবে হস্তক্ষেপ করবে না।[৩১]

৩১ বাংলাদেশ সংকটের শেষ পর্যায়ে পাকিস্তান মরিয়া হয়ে আরেকটি পাক-ভারত যুদ্ধের মুখোমুখি হয়। সম্ভবত এক্ষেত্রে তা নিজ সামরিক বাহিনীসমূহের নৈতিক বল বৃদ্ধির প্রয়াস চালায় যাতে ভারত পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক হস্তক্ষেপের পদক্ষেপ গ্রহণ থেকে নিবৃত্ত হয়। এ সকল উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে পাকিস্তান স্বয়ং এমন একটা ভাব দেখায় যে পাকিস্তানে ভারত হামলা চালালে চীন হস্তক্ষেপ করবে। এটা ছিল নিছক চাল মাত্র, এর বাস্তাবিক কোন ভিত্তি ছিল না।

বস্তুত, ১৯৬৫ সনের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সঙ্গে বাংলাদেশ সংকটকালীন ১৯৭১-এর যুদ্ধের সময়ে চীনা আচরণের তুলনামূলক আলোচনা করা হলে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে। ১৯৭১ সনে চীনে কোন ধরনের রণসমাবেশ বা যুদ্ধের প্রস্তুতি পরিলক্ষিত হয় নি, যা থেকে ধারণা করা যেতো যে চীন ভারতের সঙ্গে সম্ভাব্য যুদ্ধের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে। কিন্তু ১৯৬৫ সনে চীন ঐ ধরনের প্রস্তুতির ভাব প্রদর্শন করে। সম্ভবত এমনও বলা চলে যে, ঐ সময়ে চীন কোনরূপ বিদেশী অভিযানে জড়িয়ে পড়ার মতো অবস্থায় ছিল না। তিব্বত কিংবা পূর্ব বা পশ্চিম সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় চীন তার সামরিক বাহিনী জোরদার করে নি বা অতিরিক্ত কোন সরঞ্জামাদির সরবরাহও প্রদান করা হয় নি। উপরন্তু, ১৯৭১-এর শেষের দিকে চীনের সামরিক প্রতিষ্ঠানাদি সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সৃষ্ট অরাজকতার কারণে মারাত্মক বিপত্তির পর্যায়ে পৌছে। ১৯৭১-এর সেপ্টেম্বরে মাও'র উত্তরসূরি বলে পরিচিত এবং তাঁর রাজনৈতিক আশীর্বাদে আশ্রিত লিন বিয়াও বিদ্রোহের প্রয়াস চালান বলে জানা যায়। সেই বিদ্রোহী প্রয়াসে চীনা বিমানবাহিনী ও সেনাবাহিনীর অংশবিশেষ যোগ দেয়। সেই ঘটনার কারণে কিছুকাল সময়ের জন্য চীনের বিমানবাহিনীকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়। এমনকি ভারতও এ ধরনের ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে অবহিত ছিল এবং তদনুযায়ী তার নিজস্ব কৌশলগত পথ বেছে নেয়।[৩২] নয়াদিল্লীর কৌশলগত মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় ভারতীয় রণনৈতিক নেতৃবৃন্দ বুঝতে সমর্থ হন যে, চীন পূর্ব পাকিস্তানে ভারতীয় হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করবে; এমনকি বাংলাদেশ সংকটকে কেন্দ্র করে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ বেধে গেলে সেক্ষেত্রে চীনের মৌখিক নিন্দাবাদেও ঘাটতি পড়বে না, কিন্তু চীন স্বয়ং সেই সম্ভাব্য যুদ্ধে জড়াবে না।

## পাকিস্তানের প্রতি চীনের প্রচারণামূলক সমর্থন ও মধ্যপন্থী নীতি

বাংলাদেশ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে চীনের সম্ভাব্য আচরণ সম্পর্কে যা ভাবা হয় বেইজিং ঠিক তাই করে— ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের পর চীন জোর গলায় সোচ্চার হয়ে ভারতের নিন্দা জ্ঞাপন করে, কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন বানচাল করার উদ্দেশ্যে পাকিস্তানের সামরিক অভিযানে বিজড়িত হওয়া থেকে সতর্কতার সঙ্গে বিরত থাকে।

এসব বিশ্লেষণ থেকে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না যে, চীনের দক্ষিণ এশীয় কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি এই অঞ্চলে ভারত-সোভিয়েত যৌথ প্রাধান্য ও হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে পরিচালিত ছিল। চীন প্রকাশ্যে পাকিস্তানের নিন্দা জ্ঞাপন করে নি, কেননা চীন মনে করে যে তার ফল দাঁড়াতো "ভারত-সোভিয়েত হস্তক্ষেপমূলক পরিকল্পনার প্রতি সমর্থন প্রদান এবং তাতে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের লাভ হতো নিতান্তই তুচ্ছ।"[৩৩] পাকিস্তানের প্রতি

৩২. Sisson and Rose, প্রাগুক্ত, 251-252.

৩৩. উদ্ধৃত, Siddique, প্রাগুক্ত, 50

কূটনৈতিক ও প্রচারণামূলক চীনা সমর্থন এমনভাবে পরিচালিত হয় যাতে ইসলামাবাদে বেইজিং-এর রাজনৈতিক প্রতিপত্তি ও প্রভাব বিদ্যমান থাকে।

এ প্রসঙ্গে এটাও মনে রাখা সমীচীন যে, চীন সম্ভবত স্বাধীনতা সংগ্রামরত বাঙালিদের বিরুদ্ধাচরণ করে নি; বরং চীন নিঃসংকোচে বক্তব্য রাখে যে, "অন্যান্য যেকোন দেশের জনগণের মতো নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিপ্লব করার ন্যায্য অধিকার পূর্ব পাকিস্তানের জনগণেরও রয়েছে।" চীনের প্রশ্ন ছিল ভারতের উদ্দেশ্য সম্পর্কে এবং সে কারণেই চীন ভারতের হস্তক্ষেপের নিন্দা করে। চীনের দৃষ্টিকোণ থেকে, "একটি বিদেশী সামরিক বাহিনী অভিযান চালিয়ে সৃষ্টি করবে একটি বুর্জোয়া রাষ্ট্র—এটা সঠিক হতে পারে না এবং তদুপরি সেই রাষ্ট্রে আপন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাই সর্বদা ভারতের উদ্দেশ্য ছিল।" চীনা নেতৃত্ব সম্ভবত আরো চেয়েছে পাকিস্তানের সঙ্গে তাদের সুসম্পর্ক ও এর উপর তাদের প্রভাবের সুযোগ নিয়ে পাকিস্তানকে বাংলাদেশের সঙ্গে বিরোধ মিটিয়ে ফেলার জন্য প্রণোদিত করতে। বস্তুত, পাকিস্তানকে তার কঠোরতর অবস্থান নমনীয় করার জন্য বেইজিং পরামর্শ দান করে, চাপ সৃষ্টি করে যাতে ইসলামাবাদ বুঝতে পারে কারা "পূর্ব পাকিস্তানকে ভারতীয় কর্তৃত্বে ঠেলে দিতে চায়" এবং কারা জনগণের ন্যায্য দাবিদাওয়া আদায়ে নিয়োজিত।[৩৪]

এ ক্ষেত্রে অবশ্য মনে রাখা প্রয়োজন যে, বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে ইসলামাবাদের সামরিক মতবাদ ছিল সুস্পষ্টরূপে শূন্যমানপ্রসূত, হারজিতভিত্তিক। এ কারণে বাংলাদেশের প্রতি ঐ সময়ে পাকিস্তানী সামরিক সরকারের নীতি কোন প্রকারে নমনীয় হবে এটা আশা করা ছিল নিরর্থক। অন্যদিকে, চীনের দৃষ্টিতে, ভারত-সোভিয়েত কৌশলগত চালের মুখে তার পক্ষে ভিন্ন পথ ধরাও কঠিন ছিল এবং একই সঙ্গে পাকিস্তান যে মিত্রদেশ তাও বিবেচনায় রাখতে হয়। এ সকল কারণে চীনের পক্ষে বাংলাদেশ স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হওয়া সহজ ছিল না।

তাই চীন বাংলাদেশ আন্দোলনের প্রতি কৌশলগত সমঝোতামূলক মধ্যপথ অবলম্বন করে। একদিকে বেইজিং নয়াদিল্লী-মস্কো কৌশলগত পরিকল্পনা থেকে দূরত্ব বজায় রাখে, অন্যদিকে পাকিস্তানের প্রতি সমর্থন মৌখিক ও কূটনৈতিক পর্যায়ে মোটামুটি সীমাবদ্ধ রাখা শ্রেয় মনে করে। চীনের কৌশলগত উদ্দেশ্য ছিল আঞ্চলিক পর্যায়ে শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখা। ভারত-সোভিয়েত কৌশলগত পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে সেই ভারসাম্য ভেঙে পড়তে পারে এবং এ অঞ্চলে উভয় শক্তির প্রাধান্য বিস্তার লাভ করতে পারে এই ভয়ে চীন উভয় শক্তির কৌশলগত চালের বিরুদ্ধে জোর গলায় নিন্দাবাদ ব্যক্ত করে।

### (ঘ) সোভিয়েত প্রতিক্রিয়া

পরিশেষে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিক্রিয়া প্রসঙ্গে আসা যাক। সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল তৎকালীন এক পরাক্রমশালী পরাশক্তি। স্বাভাবিক

---

৩৪. ঐ।

কারণেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মস্কোর ভূমিকা গভীর পরীক্ষা-নিরীক্ষার অপেক্ষা রাখে। এছাড়া, সোভিয়েত ভূমিকা সম্পর্কে একটি সাধারণ জনশ্রুতি ও প্রত্যয় রয়েছে যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মস্কো ছিল একমাত্র বিশ্বশক্তি, যা অকৃত্রিম আন্তরিকতা সহকারে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সমর্থন প্রদান করে।[৩৫] প্রকৃতপক্ষে এক্ষেত্রে মস্কো স্বয়ং "যথার্থভাবে আন্তর্জাতিক দায়িত্ব পালন করেছে" বলে দাবি করে এবং মনে করে যে এ দায়িত্ব পালনে সোভিয়েত ইউনিয়ন "মুক্তিসংগ্রামে নিয়োজিত বাংলাদেশের জনগণের প্রতি নৈতিক ও বস্তুগত উপাদান সহকারে সকল প্রকার সাহায্য ও সমর্থন দিয়ে তাদের স্বাধীনতা অর্জনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে।"[৩৬]

### মস্কোর স্বীয় ভাবমূর্তি প্রদর্শন

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সেভিয়েত ইউনিয়নের নিজস্ব ভূমিকা সম্পর্কে মস্কোর বক্তব্য থেকে এরূপ একটি ধারণা জন্মে যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সমর্থন প্রদান করতে গিয়ে একটি বিপ্লবী শক্তি হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়ন তার "আন্তর্জাতিক দায়িত্ব" পালন করেছে। এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, বাংলাদেশ মুক্তিসংগ্রামের এক অত্যন্ত সংকটময় পর্যায়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশের বিষয়ে ভারতের পক্ষাবলম্বন করে। এটাও পরম সত্য যে, আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি প্রদান সহ সম্পর্ক স্থাপনকারী দেশগুলোর মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল অন্যতম। এসব বিষয়ের সত্যতা সত্ত্বেও একথা বলা অমূলক হবে না যে, বাংলাদেশের প্রতি সোভিয়েত সমর্থন আসে সংকটের প্রায় শেষ পর্যায়ে, আর সেই সমর্থনের অন্তরালে ছিল সোভিয়েত আঞ্চলিক ও বিশ্ব-কৌশলগত স্বার্থ এবং ঐ সমর্থনের সঙ্গে কোনরূপ আদর্শ বা নৈতিক অবস্থান বিজড়িত ছিল না।

সম্ভবত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন মস্কোর কৌশলগত আচরণের প্রকৃত মূল্যায়ন করতে হলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-উত্তরকাল থেকে ১৯৭০-এর দশক অবধি সোভিয়েত কৌশলগত চিন্তার বিবর্তন মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। ঐ সময়কার সোভিয়েত নিরাপত্তা চিন্তাধারা মস্কোর বিশ্বকৌশলগত আচরণ বির্ধারণ করে, প্রভাবিত করে দক্ষিণ এশিয়ায় বিজড়িত হবার পেছনে গৃহীত প্রতিটি সোভিয়েত পদক্ষেপ।

৩৫. সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে নিষ্ঠার সাথে সমর্থন প্রদান করেছিল—এ ধরনের বক্তব্য বাংলাদেশের স্বাধীনতা-উত্তরকালে একটি ভারত ও সোভিয়েতপন্থী গোষ্ঠী উদ্দেশ্যমূলকভাবে প্রচার করে আসছে। এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রয়েছে এমন কতিপয় রাজনৈতিক দল, যারা তাদের সুপরিচিত রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পেশাজীবী বিশেষ কিছু মুখোশে সংগঠনের মাধ্যমে দুটো আঞ্চলিক ও বিশ্বশক্তির সঙ্গে লেজুড়ে সম্পর্ক গড়ে তুলতে চেয়েছে।

৩৬. *Kommunist*, No. 14, 1975, 8, quoted in A. A. Gromyko and B.N. Ponomarev (eds.) "Soviet Foreign Policy 1945-1980," Vol. II (Moscow 1980), 401.

## সোভিয়েত কৌশলগত উদ্দেশ্যাবলী

মস্কোর কৌশলগত ধারণা ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের বৈশ্বিক উদ্দেশ্যাবলী ও আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত। বলশেভিক বিপ্লব ও সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্মলগ্ন থেকে মস্কো দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধ সম্পর্কে ক্লজভিৎসের মতবাদে আস্থাবান। সোভিয়েত তত্ত্বে সামরিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে কোনরূপ সুস্পষ্ট বিভেদ তুলে ধরা হয় না। নীতিনির্দেশক পর্যায়ে আন্তর্জাতিকভাবে মস্কো সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিপত্তি ও প্রভাব বিস্তারে সর্বদাই সচেষ্ট।

উপর্যুক্ত বক্তব্যের সঙ্গে সোভিয়েত কৌশলগত আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে কতিপয় উপাদান সম্পৃক্ত বলে মনে হবে। প্রথমত, বিশ্বরাজনৈতিক পরিমণ্ডলে একটি পরাশক্তি হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়ন বাদবাকী বিশ্বের সঙ্গে তার ক্ষমতার দাপট বজায় রাখতে সচেষ্ট হয়। দ্বিতীয়ত, একটি বড় ধরনের যুদ্ধের ঝুঁকি দেখা দিতে পারে এ ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীন উদ্দেশ্যমূলক কাজ থেকেও মস্কো নিজকে নিবৃত্ত রাখতে চায়। তৃতীয়ত, নিজস্ব জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ ও চীনের সম্ভাব্য হুমকি মোকাবেলায় মস্কো ইউরোপ ও এশিয়া মহাদেশে একটি শক্তিশালী সামরিক-কৌশলগত অবস্থান বজায় রাখতে আগ্রহী হয়। চতুর্থত, তৃতীয় বিশ্বে আপন স্বার্থের সমর্থনে ও বিশ্বপ্রতিযোগী পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নিজ অবস্থান সুসংহত করার উদ্দেশ্যে মস্কো একটি দ্রুত সচল ও বহুমুখী ক্ষমতাসম্পন্ন নৌবাহিনী ও সামুদ্রিক যানবাহন গড়ে তোলার প্রয়াস পায়। পঞ্চমত, রাজনৈতিকভাবে মস্কো নিজেকে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানে বিশ্বাসী বলে উপস্থাপন করে এবং তার ক্ষমতাকে শান্তি, প্রগতি ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সহায়ক বলেও উপস্থাপনের প্রয়াস পায়। পরিশেষে, মস্কো "পাল্টা-নিবারক" সুযোগেরও অন্বেষণে ব্যাপৃত থাকে, তার মানে শত্রুপক্ষের শ্রেষ্ঠতর নিবারক ব্যবস্থা অচল রাখতে সচেষ্ট থাকে। কিন্তু কোন কারণে যদি সোভিয়েত পাল্টা-নিবারক ব্যবস্থা নিষ্ক্রিয় হয় বা ভেঙে পড়ে, সেক্ষেত্রে "সাম্রাজ্যবাদীদের শুরু করা" যুদ্ধে বিজয়ের নিশ্চয়তাবিধান ছিল মস্কোর চূড়ান্ত লক্ষ্য।৩৭

এ প্রসঙ্গে আরো মনে রাখা প্রয়োজন যে, যে দুটি উপাদান সোভিয়েত কৌশলগত নীতিকে প্রভাবিত করে, তার মধ্যে ছিল সোভিয়েত রাজনৈতিক ব্যবস্থার দ্বৈত উদ্দেশ্য— জাতীয় সরকার হিসেবে খোদ সোভিয়েত স্বার্থ রক্ষা করা এবং আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলনের নেতা হিসেবে আপন অবস্থান সমুন্নত রাখা। তদুপরি একটি শ্রেষ্ঠ পারমাণবিক শক্তি হিসেবে যুদ্ধবিগ্রহের ক্ষেত্রে এর প্রভাব বিবেচনায় রাখা। একটি বিশাল পারমাণবিক ক্ষমতাসম্পন্ন পরাশক্তি হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়নকে দু'ধরনের সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়। প্রথমত, দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় না দিয়ে কিভাবে মস্কো সোভিয়েত কৌশলগত নীতির প্রতিরক্ষা ও অগ্রগামিতামূলক চাহিদা সম্পূরণে তার

---

৩৭. Kalam, *Superpower Rivalry*, 71-76.

পারমাণবিক ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারে, এবং দ্বিতীয়ত, কিভাবে আদর্শগত উদ্দেশ্যাবলীকে পররাষ্ট্রনীতি ও ভূ-কৌশলগত চাহিদার সঙ্গে সমন্বিত করতে হয়। অন্য কথায়, বিশ্বরাজনীতির পরিমণ্ডলে আদর্শগত প্রতিশ্রুতি ও ভূ-কৌশলগত উপাদান এ দু'টির মধ্যে মস্কোকে সমন্বয়বিধান করতে হয়, কেননা সোভিয়েত নিরাপত্তাব্যবস্থায় দু'টির উপরই সমান জোর দেয়া হতো।

## সোভিয়েত কৌশলগত চিন্তাধারার রূপান্তর

উপর্যুক্ত কারণে বিশ্বপর্যায়ে বিপ্লব ঘটানো সম্পর্কিত পূর্বেকার সোভিয়েত অঙ্গীকারে ভাটা পড়ে। বাস্তব কৌশলগত-রাজনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এর অর্থ দাঁড়ায় এরূপ : স্টালিনের আমলে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে গড়ে উঠা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনসমূহকে তাত্ত্বিক পর্যায়ে যেভাবে বুর্জোয়া মতবাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হতো তা পরিত্যক্ত হয় এবং ক্রমান্বয়ে মস্কো এমন একটি কৌশলগত ধারা চিহ্নিত করে, যাতে মোটামুটি সকল ধরনের জাতীয়তাবাদী শক্তিকে সমাজবাদের ছায়াতলে তাৎপর্যবহ বলে বিবেচনা করা হয়। স্পষ্টতই মস্কোর কৌশলগত নীতিতে এ ধরনের রূপান্তর ছিল উদ্দেশ্যমূলক। সোভিয়েত উদ্দেশ্য ছিল নব্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলোতে যথাসম্ভব পশ্চিমা প্রভাব দূর করা এবং বিশ্বের যত এলাকায় সম্ভব মস্কোর নিজস্ব প্রভাব বিস্তার করা। এ ধরনের উদ্দেশ্য সাধনেই মস্কো জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি সাহায্য-সমর্থন প্রদানে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয় এবং এক্ষেত্রে শুধুমাত্র কৌশলগত ঝুঁকির দিকটাই বাচ-বিচারে রাখে।

উল্লেখ্য, সোভিয়েত কৌশলগত চিন্তাধারার ক্ষেত্রে এ ধরনের পরিবর্তন ১৯৫০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে পরিলক্ষিত হয়। ঐ সময় থেকে পরবর্তীকালে পর পর কয়েকটি সরকারিভাবে প্রকাশ্য বক্তব্যে নতুন নীতিগত পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। প্রথমে ১৯৫৫-এর প্রথম পাদে, পরে বান্দুং সম্মেলনের প্রাক্কালে এবং পরিশেষে সোভিয়েত কম্যুনিস্ট পার্টির বিংশতিতম কংগ্রেসের প্রাক্কালে ক্রুশ্চেভ-এর তথাকথিত "গোপন বক্তৃতায়" মস্কোর নতুন নীতি ক্রমান্বয়ে স্পষ্টতর হয়। সেই নতুন নীতির দৃষ্টিকোণ থেকে তৃতীয় বিশ্বের জাতিসমূহকে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সঙ্গে "শান্তির এলাকা' বলে একাত্ম করা হয়, কেননা পাশ্চাত্যবিরোধী ভাবধারা ও নীতির দিক থেকে তাদের মধ্যে অভিন্ন সাদৃশ্য ও একাত্মতাবোধ রয়েছে বলে ধরা হয়। ফলে অনুন্নত দেশগুলোর প্রতি "সমতা ও পারস্পরিক স্বার্থের ভিত্তিতে" বস্তুগত সাহায্য ও সমর্থন প্রদান করা হয়। এ অঞ্চলের পরাধীন ও স্বাধীনতাকামী জনগণের মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্যও গভীর আগ্রহ ও উদ্বেগ ব্যক্ত হয়। এর বিশেষ কারণও ছিল, কেননা অনেক ক্ষেত্রে এসব দেশ সোভিয়েত স্বার্থবলয়ের কাছাকাছি বলে বিবেচিত হয়। এরূপ "নতুন দৃষ্টি" সম্বলিত নীতি প্রণয়নে উদ্যোগ নেন ক্রুশ্চেভ এবং এ থেকেই সোভিয়েত ইউনিয়ন একটি বিশ্বশক্তির রূপ পরিগ্রহ করতে থাকে। সেই প্রক্রিয়া চলতে থাকে ব্রেজনেভ-এর আমলে এবং ক্রমান্বয়ে তাতে গতি সঞ্চারিত হয়।

## সোভিয়েত জাতীয় স্বার্থ ও দক্ষিণ এশীয় নীতি

লক্ষণীয় যে, এভাবে সোভিয়েত কৌশলগত ধারণা নমনীয় রূপ পরিগ্রহ করে: কেউ একে হয়তো দোদুল্যমান, এমনকি সুবিধাবাদী বলেও অভিহিত করতে পারেন, কিন্তু মস্কো মনে করে যে তার নীতিগত রূপান্তরের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাজনৈতিক কৌশলগত উপাদানসমূহের পারস্পরিক যোগসূত্রের হিসেব-নিকেশ করেই নীতিগত পরিবর্তনের সূচনা করা হয়।[৩৮] প্রকৃতপক্ষে, মস্কো তার আদর্শগত দায়িত্ব সীমিত করতে চায়। ক্রেমলিন চায় এমন কিছু দেশ বা জাতির প্রতি সমর্থন যোগাতে যেখানে সোভিয়েত কৌশলগত স্বার্থ জরুরি বলে বিবেচিত, যার ফলে আন্তর্জাতিকভাবে মস্কোর বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে, এবং একই সঙ্গে কম্যুনিস্ট শক্তি হিসেবে সোভিয়েত পররাষ্ট্রনীতির আদর্শগত ভাবধারাও পরিত্যক্ত বলে বিবেচিত হবে না। ১৯৬০-এর দশকের দিকে চীন-সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরোধ যতই প্রখর রূপ পরিগ্রহ করে, দু'টি কম্যুনিস্ট শক্তির মধ্যে প্রভাববলয় সৃষ্টির কৌশলগত প্রতিযোগিতা ততই বেড়ে চলে। এই প্রক্রিয়ায় কম্যুনিস্ট আদর্শ তার প্রাসঙ্গিকতা হারাতে বসে। সোভিয়েত জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মস্কো তখন দক্ষিণ এশিয়ার মতো অঞ্চলে চীনা প্রভাব ক্ষুণ্ন করতে জোরসোর প্রয়াস চালায়, কেননা দক্ষিণ এশিয়া হচ্ছে চীনের সীমানাসংলগ্ন।

এ প্রসঙ্গে এও মনে রাখা প্রয়োজন যে, ১৯৫০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকেই মস্কো দক্ষিণ এশিয়ায় তার কৌশলগত আগ্রহ প্রদর্শন করে। কেননা ঐ সময় থেকে যুক্তরাষ্ট্র এ অঞ্চলে সোভিয়েতবিরোধী বেষ্টনী সৃষ্টি করতে প্রয়াস পায়। সেই প্রয়াসের মধ্যে ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে সংগঠিত মৈত্রীচুক্তিব্যবস্থায় পাকিস্তানকে টেনে আনা, ছিল ভারতকে বিপুল পরিমাণ অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদানের মাধ্যমে বশে আনা। দক্ষিণ এশিয়ায় সেই কম্যুনিস্টবিরোধী মার্কিন বেষ্টনীর বাঁধ ভাঙতে গিয়ে মস্কো প্রথমে ভারত-পাকিস্তান দ্বন্দ্বের সুযোগ গ্রহণ করার প্রয়াস পায়। পরের দশকে ১৯৬০-এর দিকে এশিয়া ও আফ্রিকার অকম্যুনিস্ট দেশগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে মস্কো ভারতকে ব্যবহার করতে প্রয়াসী হয়। তাই মস্কোর দৃষ্টিকোণ থেকে সোভিয়েত কৌশলগত স্বার্থের অন্বেষায় দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের সঙ্গে বন্ধুপ্রতিম সম্পর্ক বজায় রেখে চলা ছিল বিশেষভাবে জরুরি। ঐ সময় থেকেই ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোন ধরনের বেসামাল অবস্থা পরিহার করা জরুরি বলে বিবেচিত হয়। এরপর থেকে মস্কোর কৌশলগত বিবেচনায় ভারতকে প্রাধান্য দেওয়া বা সোজা কথায় "ভারত সমর্থন" সোভিয়েত দক্ষিণ এশীয় রণনীতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে যায়। একই সঙ্গে সোভিয়েত সাহায্যপুষ্ট দেশগুলোর মধ্যে মস্কো ভারতকে একটি অনুকরণীয় 'আদর্শ দেশ' হিসেবে তুলে ধরার প্রয়াস পায়, সগর্বে বোঝাতে চায় যে সোভিয়েত সাহায্য-সমর্থনের আনুকূল্যেই

৩৮. ঐ, 75-76.

প্রযুক্তি ও শিল্পখাতে ভারত নৈপুণ্য লাভে সমর্থ হয়। অতএব, মস্কো ভারত-সোভিয়েত সম্পর্ককে দৃষ্টান্ত হিসেবে ব্যবহার করে তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশকেও মস্কোর ছায়াতলে টেনে আনতে চায়।[৩৯]

## মস্কোর "ভারত সমর্থন" রণনীতি

মস্কো দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতপন্থী রণনীতি মোটামুটিভাবে অব্যাহত রাখে। শুধুমাত্র ১৯৬৫ সন থেকে ১৯৬৯ সন অবধি কিছুকালের জন্য মস্কোর "ভারত সমর্থন" রণনীতিতে খানিকটা পরিবর্তনের আভাস দেখা দেয়। এই অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে মস্কো ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে অধিকতর ভারসাম্যমূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় ইচ্ছুক। তবু সেই প্রয়াস ছিল অনেকটা কৌশলমূলক, বাস্তবে কৌশলগত দিক থেকে সোভিয়েত নীতিতে ভারতপ্রীতির ধারা অব্যাহত থাকে। এ সময়ে এই উপমহাদেশে ক্রেমলিনের অধিকতর ভারসাম্যমূলক নীতি গ্রহণের পেছনে কিছু কারণ ছিল। ১৯৬০-এর দশকের শুরু থেকে চীন-সোভিয়েত বিরোধের গুপ্ত ধারা ক্রমান্বয়ে প্রকাশ্য রূপ ধারণ করে। স্বাভাবিক কারণেই মস্কো দক্ষিণ এশিয়ায় চীনা প্রভাব রোধ করতে প্রয়াসী হয় এবং চীনের বিরুদ্ধে ভারতের শক্তি বৃদ্ধি করে চীনের সঙ্গে কৌশলগত মোকবেলার বিষয়ে আগ্রহী হয়। কিন্তু চীন যেহেতু উত্তরোত্তর তার শক্তি বৃদ্ধি করে চলে, মস্কো বুঝতে পারে যে দক্ষিণ এশিয়ায় সোভিয়েত রণনীতিতে একমাত্র ভারতকে নিয়ে চীনবিরোধী বেষ্টনী গড়ে তোলা হলে তা কার্যকর নাও হতে পারে। কেননা পাকিস্তানও চীনের সীমান্তসংলগ্ন দেশ। তাই সোভিয়েত ইউনিয়ন পাকিস্তানকেও চীনবিরোধী কৌশলগত বেষ্টনীর চালে জড়াতে সচেষ্ট হয়। চীনের সঙ্গে পাকিস্তানের ছিল অনানুষ্ঠানিক মৈত্রীসম্পর্ক। যদিও পাকিস্তান ঐ সময়ে সোভিয়েতপ্রদত্ত অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য বেশ আগ্রহ সহকারেই গ্রহণ করে, কিন্তু চীনের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধন খাটো করার সোভিয়েত প্রয়াস দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করে। ক্রেমলিন এতে হতাশ হয়, তবে হাল সহজে ছাড়েনি।

এটা অবশ্য সত্য যে, ১৯৬৯-এর মাঝামাঝি থেকে মস্কো প্রায় দু'বছর কালের জন্য ভারতপন্থী দক্ষিণ এশীয় রণনীতিতে ফিরে যায়। কিন্তু এর পাশাপাশি ক্রেমলিন পাকিস্তানকে সোভিয়েত কৌশলগত ধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত করার কৌশলমূলক প্রয়াস অব্যাহত রাখে। এ ধরনের কৌশলমূলক পন্থা অবলম্বনের কারণও বর্তমান ছিল। প্রথমত, পাকিস্তানের রাজনৈতিক ব্যবস্থার মৌলিক অস্থিতিশীল ধারা সম্পর্কে ক্রেমলিন নেতৃবৃন্দ ওয়াকেবহাল ছিলেন, যে-ব্যবস্থায় অন্তর্নিহিত অনিশ্চয়তার পাশাপাশি পাকিস্তান সরকার ঝুঁকিপূর্ণ, এমনকি ব্যয়বহুল কর্মকাণ্ডে জড়াতে পারে। এসব ক্ষেত্রে, ১৯৬৫ সনের তাসখন্দ শান্তি সম্মেলনের মতো মস্কোর পক্ষে সুবিধা হাসিলের সুযোগ আসতে পারে। দ্বিতীয়ত,

৩৯. Shirin Tahir-Kheli, *Soviet Moves in Asia* (Lahore: Firoz Sons, 1976), 80-130.

বিকল্প হিসেবে মস্কো ভারতীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিবর্তনও পর্যবেক্ষণ করে আসছিল। মস্কোর দৃষ্টিতে, ভারতীয় রাজনৈতিক মঞ্চে "প্রগতিবাদী" শক্তিসমূহের মৈত্রীজোট সম্পর্কের ধারা ভিন্ন প্রবাহে সংগঠিত হতে পারে যাতে মস্কোপন্থী ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি (সি. পি. আই) ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (ইন্দিরা) দলের সঙ্গে সোভিয়েত প্রভাববলয় সৃষ্টিতে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে। এ ধরনের সম্ভাবনা অবশ্যই সোভিয়েত স্বার্থের পক্ষে অনুকূল হতে পারে, কিন্তু ঐ পর্যায়ে কৌশলগত কারণে মস্কো সকল বিকল্প পথ উন্মুক্ত রাখতে চায়।

অবশ্য মস্কোর দৃষ্টিকোণ থেকে ঐ সময়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল সোভিয়েত প্রস্তাবিত "এশীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থায়" ভারতীয় সমর্থন লাভ। সোভিয়েত নেতা ব্রেজনেভ-এর স্বপ্ন ছিল দক্ষিণ এশিয়া সহ এমন একটা নিরাপত্তা কাঠামো গড়ে তোলা যাতে "আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সার্বিকভাবে সোভিয়েত কৌশলগত কর্মকাণ্ড গতি বিস্তার করে।" বাস্তবে এ ধরনের সোভিয়েত কৌশলগত প্রয়াস ছিল মস্কোর চীনবিরোধী বেষ্টনী গড়ে তোলার হাতিয়ারবিশেষ মাত্র।[৪০]

এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ্য যে, প্রকাশ্যে ভারত যেহেতু জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের হোতা বলে দাবিদার, সেহেতু তার পক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে মস্কোর উত্থাপিত ও সোভিয়েত যোগসূত্রের বন্ধনে আবদ্ধ এশীয় নিরাপত্তাব্যবস্থায় জড়িত হওয়া কঠিন ছিল, কিন্তু চীনকে বাইরে রেখে কোন এক প্রকার নিরাপত্তাব্যবস্থায় মস্কোর সঙ্গে একাত্ম হতেও নয়াদিল্লীর তেমন একটা অনীহা ছিল না। পক্ষান্তরে, চীন-সোভিয়েত বিরোধে পাকিস্তান মোটামুটি বেশ চীনপন্থী অবস্থান গ্রহণ করে, এমনকি পাকিস্তান যে সোভিয়েতদের চীনবিরোধী নিরাপত্তা অভিযানে অংশ গ্রহণ করতে অপারগ সেই ইঙ্গিতও প্রদান করে। তাই ১৯৭০-এর শেষের দিকে, বিশেষকরে বাংলাদেশ সংকটের প্রারম্ভের দিকে মস্কোর ভারতপন্থী রণনীতি পুনরায় আবির্ভূত হয়।[৪১]

## মস্কোর চীনবিরোধী বেষ্টনী চাল

ইতিমধ্যে অবশ্য মস্কো পাকিস্তানে অধিকতর প্রভাবশালী ভূমিকা লাভের ব্যাপারে সহজে হাল ছাড়েনি। ক্রেমলিনে শেষাবধি এরূপ প্রত্যাশা বিরাজ করে যে, চীনবিরোধী বেষ্টনীতে পাকিস্তানের সমর্থনও পাওয়া যাবে। এক্ষেত্রে বার বার বিভিন্ন প্রকার কৌশল প্রয়োগে পাকিস্তানকে চীনের প্রভাববলয় থেকে বের করে আনতে ব্যর্থমনোরথ হয়ে শীঘ্রই মস্কো ভারতের পেছনে পুরো সমর্থন প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। মস্কোর ভারতপন্থী রণনীতি যথার্থ ব্যাপকতা লাভ করে যখন ১৯৭১-এর মাঝামাঝি হেনরী কিসিঞ্জার

৪০. আরো বিশদ দ্রষ্টব্য, Gromyko and Ponomarev (eds ), প্রাগুক্ত, 509-511.

৪১. Sisson and Rose, প্রাগুক্ত, 237-238.

গোপনে বেইজিং সফর করেন। এটা অজানা ছিল না যে, সেই সফর আয়োজনে পাকিস্তান মাধ্যম হিসেবে কাজ করে যার ফলে চীনের পক্ষে দু'দশকের অধিক কালীন সময়ের রাজনৈতিক-কূটনৈতিকভাবে একঘরে অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব হয়। ক্রেমলিনের দৃষ্টিকোণ থেকে, চীনের সেই সাফল্য মস্কোর প্রণীত চীনবিরোধী বেষ্টনী নীতির প্রতি ছিল মারাত্মক হুমকি স্বরূপ। কেননা, পরাশক্তিদ্বয়ের কৌশলগত চালের মোকাবেলায় চীন পাল্টা-চাল খেলার সুযোগ লাভ করে। ওয়াশিংটনের সঙ্গে যোগাযোগ ছাড়াও সম্ভাব্য পরাশক্তির আধিপত্যের বিরুদ্ধে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর অভিন্ন স্বার্থে হাত মেলাবার সুযোগও চীনের আয়ত্তে আসে। এ সকল কারণে পাকিস্তানের আঞ্চলিক ভূমিকাকে হেয় প্রতিপন্ন করার কাজে মস্কো তৎপর হয়, এগিয়ে আসে দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের কর্তৃত্ব স্থাপনে।

উপরন্তু, পাকিস্তান ভেঙে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় হলে তা নিশ্চিতভাবে হবে ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ, হবে তা চীনবিরোধী। স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশের অভ্যুদয় রাজনৈতিক চাল হিসেবে মস্কোর কাছে গুরুত্ববহ বিষয় বলে বিবেচিত হয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে সোভিয়েত প্রতিক্রিয়া উপর্যুক্ত কৌশলগত পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করতে হবে।

## পাকিস্তানের সামরিক সরকারের নৃশংসতার বিরুদ্ধে সোভিয়েত প্রতিক্রিয়া

বাংলাদেশ আন্দোলন মুক্তিযুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করে একটি বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে—তা ছিল পূর্ব পাকিস্তানের বেসামরিক জনগণের উপর ২৫ মার্চ ১৯৭১-এর রাতে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর অতর্কিত ও নৃশংস আক্রমণ। বিশ্ব ও আঞ্চলিক পর্যায়ে রাজনৈতিক ও কৌশলগত সম্পর্কের বিবর্তনের আলোকে বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে একমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল বাংলাদেশের অনুকূল প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা। ঐ বছর ২ এপ্রিল সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট পডগর্নী পাকিস্তানের ইয়াহিয়া খানকে উদ্দেশ করে এক পত্রে আবেদন করেন "যাতে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে পরিচালিত রক্তক্ষয়ী ও নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা জরুরি ভিত্তিতে বন্ধ করা হয় এবং এর পরিবর্তে শান্তিপূর্ণ উপায়ে রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গৃহীত হয়।" একই পত্রে ইয়াহিয়াকে আরো অনুরোধ জানানো হয় যাতে " যে-উদ্দেশ্যে এই আবেদন জানানো হয় তা যেন সঠিকভাবে দেখা হয়"। অর্থাৎ মস্কো তার উদ্দেশ্যের মধ্যে উল্লেখ করে "সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রে উল্লেখিত ও সাধারণভাবে স্বীকৃত মানবতাবাদী নীতিমালা এবং বন্ধুপ্রতিম পাকিস্তানের জনগণের কল্যাণে নিয়োজিত অভিন্ন আশংকা বা উদ্বেগ।"[৪২]

ইয়াহিয়া খান সেই পত্রের উত্তর দেন ৬ এপ্রিল। তিনি জোরালো ভাষায় ক্রেমলিনের পত্রের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন এবং বোঝাতে প্রয়াসী হন যে, শুধু সোভি

৪২. "The New York Times"(5 Arpil 1971). উদ্ধৃত, Sisson and Rose, প্রাগুক্ত, 240

নয়, কোন দেশই তাঁর দেশের মতো একটি স্বাধীন দেশকে ধ্বংস করতে প্রয়াসী "জাতিবিরোধী ও দেশপ্রেমবিরোধী" গোষ্ঠীসমূহকে সুযোগ দিতে পারে না, প্রসন্নভাবে দেখতে পারে না এসব গোষ্ঠীর নাশকতামূলক কাজকে।" ইয়াহিয়া ক্রেমলিনকে স্মরণ করিয়ে দেন খোদ সোভিয়েত ইউনিয়নের নিজের মানবাধিকারের প্রতি তুচ্ছতাচ্ছিল্যের বিষয় এবং এরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন যে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বহিঃশক্তিবর্গের হস্তক্ষেপ হবে জাতিসঙ্ঘ সনদের লঙ্ঘন। ইয়াহিয়ার এ ধরনের প্রত্যুত্তরের পর সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সোভিয়েত সংবাদমাধ্যমে পাকিস্তানের ঘটনাবলীর উপর গুরুত্ব কমিয়ে আনা হয়। মস্কো থেকে আসা পরবর্তী মতামত ছিল নমনীয় পর্যায়ের। পরবর্তীকালে কয়েক বার মস্কো প্রকাশ্যে উল্লেখ করে যে, পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যাবলী পাকিস্তানের "অভ্যন্তরীণ বিষয়"। উপরন্তু, ১৯৭১ সনে সোভিয়েতরা প্রায় ক্ষেত্রেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে তাদের বিবৃতিতে এ দেশকে "পূর্ব বাংলা" না বলে "পূর্ব পাকিস্তান" বলে উল্লেখ করতো। কেননা বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন প্রসঙ্গে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ ও সংবাদমাধ্যম কর্তৃক বাংলাদেশকে "পূর্ব বাংলা" বলে উল্লেখ করাটা মস্কোর কাছে তখনো গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি। স্পষ্টতই এই ভাষার চাল ও শব্দচয়ন ছিল কৌশলমূলক—মস্কো কর্তৃক "পূর্ব পাকিস্তান" কথাটি ব্যবহার ছিল দক্ষিণ এশিয়ায় তার সার্বিক নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তা হলো চীনকে বেষ্টনীতে আবদ্ধ রাখা এবং সেই বেষ্টনীতে ভারত ও পাকিস্তান উভয়কেই সম্ভাব্য অংশগ্রহণকারী বলে বিবেচনা করা হয়।

## সোভিয়েত নিরাপত্তা বিবেচনার প্রাধান্য

সোভিয়েত কূটনৈতিক অবস্থান শুধুমাত্র ভাষার চাল বা শব্দচয়নে সীমাবদ্ধ ছিল না। এটা সম্ভবত অস্বীকার করার উপায় নেই যে পাকিস্তানকে সামরিক সাহায্য ও সরবরাহ প্রদানের ক্ষেত্রে মস্কো একই ধরনের কৌশলগত বিবেচনা দ্বারা পরিচালিত ছিল। উল্লেখ্য, ১৯৬০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকেই পাকিস্তান সোভিয়েত সামরিক সাহায্য লাভ করে আসছিল। বাংলাদেশ আন্দোলনের প্রতি কথিত সোভিয়েত সমর্থন বা সহানুভূতি সত্ত্বেও পাকিস্তানকে প্রদত্ত সামরিক সরবরাহ বন্ধের ক্ষেত্রে মন্থর গতি পরিলক্ষিত হয়। পাকিস্তান সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে সামরিক সাহায্য, বিশেষকরে পূর্বে প্রদত্ত সামরিক উপকরণের যন্ত্রাংশ এপ্রিল ১৯৭১-এর শেষাবধি, এমনকি তারপরেও লাভ করে, যদিও সংখ্যা বা পরিমাণের দিক থেকে তা ছিল কম। এসব সম্পর্কে সোভিয়েত ব্যাখ্যা ছিল এই যে, ঐসব সম্পর্কিত চুক্তি বা জাহাজে অস্ত্র বোঝাই ২৫ মার্চের পূর্বেই করা হয়েছিল। তার পরবর্তী সামরিক সরবরাহের জন্য আমলাতান্ত্রিক অদক্ষতাকে দায়ী করা হয়, বলা হয় ঐসব ক্ষেত্রে ক্রেমলিন থেকে উৎসারিত কোনরূপ স্থির সরকারি সিদ্ধান্ত ছিল না।

বাস্তবে পাকিস্তানকে সামরিক সাহায্য সরবরাহের বিষয়ে সোভিয়েত অবস্থান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিংবা চীনের চাইতে তেমন একটা ভিন্ন ছিল না। বরং পাকিস্তানে অব্যাহত সামরিক সাহায্যের ধারা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার বা সম্প্রসারিত করার আগ্রহ সত্ত্বেও মস্কো সেই প্রক্রিয়ায়

পাকিস্তানকে সম্পূর্ণরূপে দূরে ঠেলে দিতে চায় নি। প্রকৃতপক্ষে, বাংলাদেশ সংগ্রামের প্রথম পর্যায়ে তাসখন্দ শীর্ষ বৈঠকের মতো পুনরায় মধ্যস্থতার ভূমিকা গ্রহণের বিষয়ে সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ আগ্রহ প্রকাশ করেন—এক্ষেত্রে অবশ্য মধ্যস্থতার প্রস্তাব ছিল পাকিস্তানের দু'প্রদেশের মধ্যে। কিন্তু যখন বাংলাদেশ দ্বন্দ্বের শূন্যমান প্রকৃতি তারা অনুধাবন করতে পারে, তখন অতি দ্রুত মস্কো তার সেই ধরনের চিন্তাধারা গুটিয়ে ফেলে এবং তার চেয়েও বড় বিষয় হলো, কৌশলগত স্বার্থের অন্বেষায় ক্রেমলিন অধিকতর সুযোগের সন্ধান লাভ করে।

### ভারত-সোভিয়েত মৈত্রীচুক্তি, আগস্ট ১৯৭১

১৯৭১ সনের ৯ আগস্ট তারিখে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর করে। এ চুক্তিতে অন্যান্য বিষয় ছাড়া একটি "উপদেশক" ধারা (ধারা ৯) সন্নিবিষ্ট হয়, যাতে কৌশলগত পরিস্থিতির উদ্ভব হলে একে অপরের সঙ্গে তাৎক্ষণিকভাবে পরামর্শ করার বিধান রাখা হয়। এই চুক্তি স্বাক্ষরের পরই বাংলাদেশ বিষয়ে ও ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কে মস্কো তার তথাকথিত ভারসাম্যমূলক অবস্থান পরিত্যাগ করে। এটা অজানা নয় যে, এ ধরনের একটি চুক্তিই ছিল ১৯৬৯ সন থেকে ভারত-সোভিয়েত কূটনৈতিক আলোচনার বিষয়। এ চুক্তিতেই স্পষ্টভাবে এক অভিন্ন লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন দিকদর্শনের ক্ষেত্রে বা নীতিগত সামঞ্জস্য বিধানে ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ হয়। জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের হোতা ভারতকে মস্কো কখনো ইতিপূর্বে এতোখানি ঘনিষ্ঠভাবে সোভিয়েত নীতিগত অবস্থানের কাছাকাছি লাভ করে নি। তাই ক্রেমলিন অতি দ্রুত সোভিয়েত মৈত্রীসম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ভারতীয় অভিলাষের সুযোগ গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে ক্রেমলিনের সিদ্ধান্ত ছিল, বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে যে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ অত্যাসন্ন, সেই যুদ্ধে মস্কো সম্ভাব্য চীনা হস্তক্ষেপ প্রতিহত করবে।[৪৩]

এসকল কৌশলগত চালের পরিপ্রেক্ষিত সত্ত্বেও মস্কো পাকিস্তানকে সুসম্পর্কের ছায়ায় ধরে রাখার বিষয়ে হাল ছেড়ে দেয় নি। উল্লেখ্য, পাকিস্তানের পররাষ্ট্র সচিব ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ তারিখে মস্কো সফরে যান। সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ তাঁর সঙ্গে এক "সময়োপযোগী ও কার্যকর" আলোচনায় সম্মিলিত হন। এমনকি ঐ পর্যায়েও সোভিয়েত সংবাদমাধ্যম ও ক্রেমলিনের নেতৃবর্গ বাংলাদেশ সমস্যাকে "পূর্ব পাকিস্তানের উদ্ভূত" সমস্যা বলে অভিহিত করে। শুধু তাই নয়, ৯ অক্টোবর ১৯৭১ তারিখ অবধিও "তাসখন্দের চেতনা" পুনরায় জাগরুক করার কথা উত্থাপিত হয়। এসব থেকে মনে হয় যে, মস্কো তখনো বাংলাদেশ সমস্যাকে ভারত-পাকিস্তান দ্বিপাক্ষিক আলোচনাকাঠামো ও ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে।[৪৪]

৪৩. ঐ, 240-241.
৪৪. Dilara Chowdhury, "Bangladesh", 37.

প্রশ্ন হতে পারে, মস্কোর এ ধরনের পাকিস্তানপ্রীতির কারণ কি ? পাকিস্তান তখন ছিল বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুসলিম দেশ। সম্ভবত ক্রেমলিন পরাশক্তি হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়নকে এ ধরনের একটি রাষ্ট্র ভেঙে দেয়ার দায়ে অভিযুক্ত দেখতে চায় নি। মুসলিম বিশ্বের বেশির ভাগ দেশ মস্কো সম্পর্কে বিরূপ ধারণা গ্রহণ করতে পারতো। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধীর মস্কো সফরের (২৭-২৯ সেপ্টেম্বর) পর দক্ষিণ এশিয়া সম্পর্কিত ক্রেমলিনের চিন্তাধারা স্পষ্টতই ভারতপন্থী রূপ পরিগ্রহ করে। ফলে এর পর থেকে পাকিস্তানের প্রতি সোভিয়েত মনোভাব কঠোরতর হতে থাকে। ইন্দিরা গান্ধী যখন মস্কো ত্যাগ করেন তার মধ্যেই সোভিয়েত নেতৃত্ব বুঝতে পারে যে, ভারত সুযোগমতো অতি সত্বর পূর্ব পাকিস্তানে শক্তি প্রয়োগে বদ্ধপরিকর। এক্ষেত্রে অবশ্য ক্রেমলিনকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে তার প্রেক্ষিতে মস্কোর কৌশলগত বিকল্প প্রতিক্রিয়া কি কি হতে পারে। মস্কোর সবচেয়ে বড় ভয় এই যে, ঘটনাবলী সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে; বাংলাদেশে একটি প্রলম্বিত যুদ্ধ দেখা দিলে সেক্ষেত্রে উদারপন্থী আওয়ামী লীগকে এক পাশে রেখে অধিকতর জঙ্গিবাদী চীনপন্থী গোষ্ঠী শক্তি অর্জন করতে পারে। সোভিয়েত সমর্থনের অভাবে এ ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হলে ভারত-সোভিয়েত সম্পর্কে মারাত্মক ধরনের বিপর্যয় দেখা দিতে পারে।[৪৫]

এ ধরনের বিভিন্ন কৌশলগত বিকল্প নিয়ে ভাবনা-চিন্তায় মস্কো কয়েক সপ্তাহ নেয়, কিন্তু পরিশেষে অক্টোবর ১৯৭১-এর শেষের দিকে সোভিয়েত উপ-পররাষ্ট্র মন্ত্রী এন. ফেরউবিনকে ভারত-সোভিয়েত মৈত্রীচুক্তির নয় নম্বর 'উপদেশক' ধারা মোতাবেক পরিকল্পিত পরামর্শের জন্য ভারতে পাঠানো হয়।

### ভারতের সঙ্গে সর্বাত্মক সোভিয়েত একাত্মতা

সেপ্টেম্বর ১৯৭১-এ ইন্দিরা গান্ধীর মস্কো সফরকালে ভারত সোভিয়েত ইউনিয়নকে অবিলম্বে ব্যাপক পরিমাণ সামরিক সাহায্য ও সরবরাহ প্রদানের জন্য অনুরোধ জানায়। ভারতের অনুরোধে সাড়া দিয়ে মস্কো এক বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ মূল্যের সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহ ও অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদানে সম্মত হয়, কিন্তু সাহায্যসামগ্রীর মধ্যে কি কি অন্তর্ভুক্ত তার কোন সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করে নি। তবে নভেম্বরের দিকে মস্কো তার পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে এবং ভারতে সোভিয়েত সাহায্যসামগ্রী প্রেরণ জোরদার করে। এর মধ্যে তিনটি জাহাজবোঝাই অস্ত্রশস্ত্র এবং জরুরি বিমানবহরে ভারতীয় প্রতিরক্ষা বিভাগের ফরমায়েশ অনুযায়ী সীমিত পরিমাণ গুরুত্বপূর্ণ সামরিক উপকরণ ও খুচরা যন্ত্রাংশ প্রেরণ করা হয়।

বস্তুত, ১৯৭১-এর নভেম্বরের দিকে সোভিয়েত উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ ছিল না। এ সময়ের দিকে ক্রেমলিন দক্ষিণ এশিয়ায় তার কৌশলগত রূপরেখা বাস্তবায়নে পুরোপুরিভাবে তৎপর হয়ে উঠে এবং ভারতের পেছনে পূর্ণ সমর্থন দানে এগিয়ে

৪৫. ঐ, 37-38

আসে। এ পর্যায়ে মস্কো তার কৌশলগত সিদ্ধান্তসমূহ এমনভাবে বাস্তবায়ন করে যে নয়াদিল্লী তাকে উষ্ণভাবে স্বাগত জানায়।

এ প্রসঙ্গে মনে রাখা সমীচীন যে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী তাঁর মস্কো সফরকালে ইতিপূর্বেই যথেষ্ট ইঙ্গিত প্রদান করেন যাতে পূর্ব পাকিস্তানে ভারতের সামরিক হস্তক্ষেপ সম্পর্কে কোন প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দের অবকাশ ছিল না, এক্ষেত্রে ক্রেমলিনের অবস্থান যাই হোক না কেন ; বরং ক্রেমলিনে ভারতীয় সূত্রের পক্ষ থেকে এরূপ আভাস দেয়া হয় যে, বাংলাদেশ সংকটের ঐ পর্যায়ে মস্কো সমর্থন প্রদানে ব্যর্থ হলে ভবিষ্যতে কৌশলগত বিষয়ে নয়াদিল্লীর সিদ্ধান্তগ্রহণপ্রক্রিয়ায় এর দারুণ বিরূপ প্রভাব পড়বে। সোভিয়েত দৃষ্টিতে, ভারতের এ ধরনের বিরূপ অবস্থান দক্ষিণ এশিয়ায় সোভিয়েত কৌশলগত স্বার্থের পরিপন্থী হবে, বিঘ্ন ঘটাবে এ অঞ্চলে মস্কোর রণনৈতিক উদ্দেশ্য অর্জনের অন্বেষায়। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশ সংকটে ভারতের অবস্থানের অনুকূলে মস্কো ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ না করলে ভারত-সোভিয়েত সম্পর্কের ক্ষেত্রে "অপূরণীয় ক্ষতির" আশংকা দেখা দিতে পারে। তাই এ বিষয়ে ক্রেমলিন সকল দিক বিবেচনা করেই ভারতপন্থী অবস্থান চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করে।[৪৬]

## সোভিয়েত প্রতিক্রিয়ার পুনর্মূল্যায়ন

উপর্যুক্ত আলোচনা ও বিশ্লেষণ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ১৯৫০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে দক্ষিণ এশিয়ায় সোভিয়েত আচরণ আঁকাবাঁকা গতিতে মোড় নেয়। তবে সেই আঁকাবাঁকা গতিতে তিনটি মোড় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মস্কো দক্ষিণ এশিয়ায় অনুপ্রবেশ করে মেরুকরণ সৃষ্টি করে অর্থাৎ ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে আঞ্চলিক বিবাদের সুযোগ গ্রহণ করে মস্কো দক্ষিণ এশিয়ায় মেরুকরণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। পরবর্তীকালে, বিশেষকরে ১৯৬০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে মস্কো মধ্যস্থতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়; কিন্তু একেবারে শেষের দিকে বাংলাদেশ সংকটের চূড়ান্ত পর্যায়ে একটি পরোক্ষ অংশগ্রহণকারী হিসেবে মস্কো আঞ্চলিক দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে। এতে দৃশ্যত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অনুকূলে ভারতের পক্ষ অবলম্বন করে মস্কো একটি নৈতিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শন করে।

এ সম্পর্কে ক্রেমলিনের প্রকাশ্য বক্তব্য যাই হোক না কেন, দক্ষিণ এশিয়ায় মস্কোর কৌশলগত সম্পর্কের পুরোটা সময়ের কোন পর্যায়ে আদর্শগত সূত্রের কোনরূপ বন্ধন বা সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতি পরিলক্ষিত হয় নি, যা দিয়ে ক্রেমলিনের দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক আচরণকে বোঝা যাবে। মস্কোর কৌশলগত পরিকল্পনায় ছিল সোভিয়েত জাতীয় স্বার্থের

৪৬. Sisson and Rose, প্রাগুক্ত, 243-244.

অন্বেষা, ছিল তার বিশ্ব প্রতিযোগী শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে আপন প্রভাববলয় সৃষ্টি ও সুবিধামত অবস্থান লাভের প্রয়াস। বস্তুত, দক্ষিণ এশিয়ায় সোভিয়েত কৌশলগত আচরণ ছিল সোভিয়েত রণনীতির পরিবর্তনশীল ধারার মতো সুযোগসন্ধানী। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মনে হয়, মস্কো কৌশলমূলক চালে বাজিমাত করতে ব্যতিব্যস্ত ছিল, দু'দিকেই গুটির চাল খেলতে থাকে, প্রত্যাশায় থাকে যে তার বিশ্বপ্রতিযোগী শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে সম্ভবত দক্ষিণ এশিয়ায় দ্বন্দ্বরত দু'টি আঞ্চলিক রাষ্ট্রকেই হাতের মুটোয় রাখা যাবে। মস্কোর এই কৌশলগত চাল অব্যাহত থাকে সেই চূড়ান্ত মূহূর্ত অবধি, যখন মস্কো স্পষ্টত বুঝতে পারে যে বিজয় কোন পক্ষের অবধারিত এবং সেই সুযোগলগ্নে বিজয়ী পক্ষের পক্ষাবলম্বনই শ্রেষ্ঠ উপায়। কিন্তু এর পর থেকেই মস্কো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তারই রাজনৈতিক-কূটনৈতিক বিজয় হয়েছে বলে দাবি করে আসছে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত লগ্নে কৌশলগতভাবে বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রীজোটের সঙ্গে একাত্ম হওয়া সত্ত্বেও মস্কোর পক্ষ থেকে এরূপ দাবি করার কোন অবকাশ নেই যে, ক্রেমলিন প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার অথবা মুক্তিবাহিনীকে একটি বন্দুক বা একটি টোটা বন্দুকের গুলি দিয়ে সাহায্য করেছে। বাংলাদেশের অনুকূলে সোভিয়েত রাজনৈতিক বা সামরিক সমর্থন প্রকৃত অর্থে আসে ভারতের চাহিদা বা প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে। কেননা ভারতই ছিল তাদের প্রধান আঞ্চলিক মক্কেল এবং স্পষ্টত সোভিয়েত দক্ষিণ এশীয় রণনীতির প্রধান হিতভোগী। জাতিসজ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের আলোচনামঞ্চে ভারতের পক্ষাবলম্বন করেই মস্কো কূটনৈতিক বিতণ্ডায় লিপ্ত হয়। দু'দুবার অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি ও ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার সম্পর্কিত নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্তে মস্কো ভিটো প্রদান করে, কূটচাল দিয়ে দীর্ঘায়িত করে যুদ্ধবিরতি সম্পর্কিত নিরাপত্তা পরিষদের আলোচনা যাতে নয়াদিল্লী সদর্পে বাংলাদেশে তার সামরিক বিজয় দাবি করতে পারে। একমাত্র ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখে পাকিস্তানী বাহিনীর আত্মসমর্পণের পর সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধবিরতি সম্পর্কিত বিষয়ে তার ভিটোর অধিকার প্রয়োগ থেকে বিরত থাকে। মস্কো-নয়াদিল্লীর উদ্দেশ্য যাই হোক, উভয় শক্তির কৌশলগত হস্তক্ষেপের প্রক্রিয়ায় স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ত্বরান্বিত হয়।

এদিকে বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের দুর্যোগকালে সামরিক সরবরাহের নিশ্চয়তা লাভের পর নয়াদিল্লী দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে তার কৌশলগত পরিকল্পনা ও কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে সমর্থ হয়। ভারত তার চরম আঞ্চলিক শত্রু পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তার নিজস্ব সামরিক-কৌশলগত অভিলাষ সম্পূর্ণ করতে সফল হয়। পক্ষান্তরে, পাকিস্তান তার ঐতিহ্যিক মিত্রদেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা চীন থেকে প্রত্যাশিত উল্লেখযোগ্য সামরিক সাহায্য লাভে ব্যর্থ হয়। তা সত্ত্বেও অবশ্য মস্কো চীনকে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রতি

বিশ্বাসঘাতকতা প্রদর্শনের দায়ে অভিযুক্ত করতে দ্বিধা করে নি। এমনকি চীনের বিরুদ্ধে এমনও অভিযোগ আনা হয় যে, চীন পাকিস্তানকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে এশিয়ায় তার বৃহৎ শক্তিসুলভ আধিপত্যবাদী নীতি বাস্তবায়নে তৎপর থাকে।[৪৭]

### ঙ. উপসংহার

প্রবন্ধে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বিশ্বের তিনটি বৃহৎ শক্তির প্রতিক্রিয়া পর্যালোচনা করা হয়েছে। ঐতিহাসিক দিকদর্শন লাভের প্রয়াসে প্রবন্ধে স্নায়ুযুদ্ধকাল থেকে ১৯৭১ সন অবধি দক্ষিণ এশিয়ায় তিনটি বিশ্বশক্তির কৌশলগত বিচরণের পটভূমি মূল্যায়ন করা হয়েছে যাতে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে তাদের ভূমিকা সঠিকভাবে জানা যায়। মনে রাখা প্রয়োজন যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভিন্ন রাষ্ট্রের ভূমিকা সম্পর্কে বাংলাদেশীদের ভাবনা-চিন্তা আবেগমুক্ত নয়। পক্ষান্তরে, এ সম্পর্কিত বিষয়ে বৃহৎ শক্তিবর্গের নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ রয়েছে। উভয় দৃষ্টিকোণ মনে রেখেই স্বতন্ত্রধর্মী ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ উপস্থাপন করা প্রয়োজন।

বাঙালিদের স্বাধীনতা আন্দোলনে বিশ্বশক্তিবর্গের ভূমিকা সম্পর্কে এমন একটি সাধারণ ধারণা প্রচলিত রয়েছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের ভূমিকা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি অত্যন্ত বিরূপ মনোভাবসম্পন্ন ছিল। এমনকি প্রায়শ এই দুই বৃহৎ শক্তিকে বাঙালিদের স্বার্থের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন বলেও বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। বর্তমান প্রবন্ধে এ ধরনের তত্ত্ব নাকচ করা হয়েছে। প্রবন্ধকার যুক্তি উপস্থাপন করেন যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বৃহৎ শক্তিবর্গের প্রতিক্রিয়া ছিল বৃহৎ শক্তিসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারাপসৃত, তাদের নীতি ও প্রত্যক্ষজ অনুভূতির পেছনে ইন্ধন যোগায় তাদের নিজ নিজ জাতীয় স্বার্থ। প্রবন্ধে বাংলাদেশ আন্দোলনের প্রতি সোভিয়েত সমর্থন প্রসঙ্গে এরূপ অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, বাংলাদেশের প্রতি সোভিয়েত সমর্থন ছিল বিভিন্ন ধরনের কূটচালে আবর্তিত; তবু সোভিয়েত সমর্থন যতই আপন স্বার্থে পরিচালিত হোক না কেন, তা মুক্তিযুদ্ধের এমন এক ক্রান্তিলগ্নে আসে যার ফলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ত্বরান্বিত হয়। ১৯৭১ সনে বাঙালিদের স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের কৌশলগত আচরণও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সহায়ক হয়, তবে তা হয় পরোক্ষভাবে।

উপর্যুক্ত যুক্তি উপস্থাপনকল্পে প্রবন্ধে একটি সংমিশ্রিত বিশ্লেষণী রূপরেখা ব্যবহৃত হয়েছে। এই রূপরেখায় সন্নিবিষ্ট হয় পররাষ্ট্রনীতি, নিরাপত্তা ও কৌশলগত ধারণাবলী। এই কাঠামোতে তিন পর্যায়ে বৃহৎ শক্তিবর্গের পররাষ্ট্রনীতি, নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী, রণনীতি ও রণকৌশল প্রভৃতি চিহ্নিত করা হয়েছে। বাংলাদেশ সংকটকে কেন্দ্র করে এই তিন পর্যায়ের বিরোধের মধ্যে ছিল বিশ্ব ও এশীয় পর্যায়, দক্ষিণ এশীয়-আঞ্চলিক এবং

৪৭. Victor Mayevsky নামক জনৈক সোভিয়েত পর্যবেক্ষকের মন্তব্য, উদ্ধৃত, Dilara Chowdhury, প্রাগুক্ত, 39.

পরিশেষে দ্বিপাক্ষিকভাবে ভারত-পাকিস্তান পর্যায়। প্রথম পর্যায়ের বিশ্লেষণে সংশ্লিষ্ট বৃহৎ শক্তিবর্গের মৌল বা সার্বিক নীতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে ; দ্বিতীয় পর্যায়ে আঞ্চলিক রণনীতি সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি চিহ্নিত করা হয়েছে এবং তৃতীয় পর্যায়ে ভারত ও পাকিস্তানকে ঘিরে বাংলাদেশ সংকটের একেবারে চরম ক্রান্তিলগ্নে শক্তিবর্গের কৌশলমূলক চাল তুলে ধরা হয়েছে। প্রবন্ধে এভাবে তিনটি বিশ্বশক্তির প্রতিক্রিয়া ও ভৌগোলিক স্থানসংক্রান্ত বিষয়াবলী সময়কালের নিরিখে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

আলোচনা ও বিশ্লেষণ থেকে এটা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, তিনটি বিশ্বশক্তি তাদের নিজ নিজ কৌশলগত ও নিরাপত্তাস্বার্থের অন্বেষা এবং তাদের ভিন্নমুখী আদর্শগত ও হুমকিজাত চেতনার কারণে প্রধানত দক্ষিণ বাংলাদেশকে ঘিরে এশিয়ার দ্বন্দ্বে বিজড়িত হয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তাদের প্রতিক্রিয়া কার্যত তাদের অবস্থানগত সুবিধা ও আঞ্চলিক প্রভাববলয় সৃষ্টির প্রয়াস থেকে উদ্ভূত হয়।

একথা সম্ভবত বলা সঠিক হবে না যে, বহির্বিশ্বের শক্তিবর্গ দক্ষিণ এশিয়াকে তাদের কৌশলগত স্বার্থের অন্বেষায় মধ্যমণি বলে চিহ্নিত করে; অথবা এমনও মনে করা সমীচীন নয় যে, দক্ষিণ এশিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তারা নিরবচ্ছিন্নভাবে তিক্ত সংগ্রামে লিপ্ত হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে একথা বলা ভালো যে, বিশ্বশক্তিবর্গের পরিবর্তনশীল সার্বিক বিশ্বব্যাপী সম্পর্কের রূপরেখার বাইরে ঐ শক্তিসমূহের কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গিতে দক্ষিণ এশিয়ার কৌশলগত প্রাসঙ্গিক গুরুত্ব অতি সামান্যই। ১৯৬০-এর দশকের পর থেকে ক্রমান্বয়ে প্রাচ্য-প্রতীচ্য স্নায়ুযুদ্ধের প্রক্রিয়া তার তীব্রতা হারাতে থাকে এবং ত্রিকোণ পর্যায়ের বিশ্ব কৌশলগত দ্বন্দ্ব আদর্শিকতার লেবাস পরিহার করে অধিকতর জাতীয়তাবাদী রূপ পরিগ্রহ করে। মৈত্রীবন্ধনের ধারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালীন আদর্শগত সীমারেখা ভেদ করে নতুন যোগসূত্রের দিকে মোড় নেয়, এমনকি নীতিগত ক্ষেত্রেও বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয়। এভাবে ১৯৬০-এর দশকেই দ্যঁতত সম্পর্কের কারণে বেইজিং-এর বিরুদ্ধে ওয়াশিংটন ও মস্কো পরস্পর ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপন করে। একইভাবে, ১৯৭০-এর দশকের শুরুতেই সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে চীন-মার্কিন নীতিগত ঘনিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠা লাভ করে ; তারাও একই ধরনের দ্যঁতত সম্পর্ক গড়ে তোলে উভয়ে পরস্পরের কাছাকাছি আসে। বিশ্ব পর্যায়ে বৃহৎ শক্তিবর্গের চিহ্নিত অভিন্ন শত্রুর বিরুদ্ধে পরিবর্তনশীল মৈত্রীধারা ও নীতিগত একাত্মতাবোধ আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ে তাদের রণনৈতিক-কৌশলগত আচরণে প্রতিফলিত হতে বাধ্য।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের বিশ্বকৌশলগত নীতির দৃষ্টিকোণে বৈপরিত্যমূলক উপাদান ছিল নিঃসন্দেহে, কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক নিরাপত্তাবন্ধনের একই পাশে দু'শক্তিই অবস্থান নেয়, কেননা দু'টি শক্তিই এ অঞ্চলের আঞ্চলিক ভারসাম্য রক্ষার বিষয়ে সমরূপ

মত পোষণ করে। ফলে তাদের আঞ্চলিক রণনীতিও প্রণীত হয় আঞ্চলিক স্থিতাবস্থার অনুকূলে। এ কারণে উভয় শক্তি পাকিস্তানের সঙ্গে মৈত্রী-সংযোগ রক্ষা করে চলে, যদিও এটা অবিদিত ছিল না যে আঞ্চলিক শক্তিদ্বন্দ্বে পাকিস্তান হারতে চলেছে।

পক্ষান্তরে, বাংলাদেশ সংকটের শেষ লগ্নে প্রণীত মস্কোর দক্ষিণ এশীয় রণনীতি ছিল অপ্রতিসম ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, যদিও তা বাংলাদেশ সংগ্রামের অনুকূলে আসে। মস্কো তার ভারতপন্থী রণনীতির মাধ্যমে এমনভাবে ভারতের শক্তিবৃদ্ধি করতে প্রয়াসী হয় যাতে ভারত শক্তিদাপট সহকারে দক্ষিণ এশিয়ায় তার আধিপত্য বিস্তার করে ক্রেমলিনের চীনবেষ্টনী নীতিতে ভূমিকা রাখতে পারে। বস্তুত, ঐ সময়কার সোভিয়েত আঞ্চলিক রণনীতিতে একটা অন্তর্নিহিত স্থিতাবস্থাবিরোধী ভাবধারা পরিলক্ষিত হয়, দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক ভারসাম্য বিনষ্ট করার কাজে যা ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অন্য দু'টি বৃহৎ বিশ্বশক্তির ভূমিকা উপর্যুক্ত কৌশলগত নিরাপত্তাবাস্তবতার নিরিখে মূল্যায়নের অপেক্ষা রাখে, যদিও সেই সোভিয়েত রণনীতি ছিল বাংলাদেশ আন্দোলনের অনুকূলে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয় মার্চ ১৯৭১-এ পাকিস্তানী বাহিনীর নৃশংসতার পটভূমিতে। অতি শীঘ্রই সেই সংগ্রাম শূন্যমান রূপ পরিগ্রহ করে। এতে অভ্যন্তরীণভাবে এক পক্ষ ছিল ইসলামাবাদে অবস্থিত পাকিস্তানী সরকার ও দ্বিতীয় পক্ষ ছিল বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার। বাংলাদেশকে ঘিরে আঞ্চলিক পর্যায়ে ভারত ও পাকিস্তান আরেক শূন্যমান সংগ্রামে রত হয়। স্পষ্টতই সেই সংগ্রাম দক্ষিণ এশিয়ার তৎকালে প্রচলিত শক্তির ভারসাম্যকে ভেঙে দেয়ার পর্যায়ে ঠেলে দেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন উভয় শক্তিই দেখতে পায় যে, পূর্ব পাকিস্তান পৃথক হয়ে গেলে বাদবাকি পাকিস্তানের পক্ষে পূর্ব পাকিস্তানে হস্তক্ষেপ করে বিজয়ীর বেশে সামরিকভাবে শক্তিসম্পন্ন ভারতকে কৌশলগতভাবে মোকাবেলা করা কোনভাবে সম্ভব হতে পারে না। অন্যদিকে নব স্বাধীনতালব্ধ বাংলাদেশের পক্ষে নয়াদিল্লীর আধিপত্য-কর্তৃত্বাধীন সম্পর্কের রূপরেখার বাইরে আসা খুব কঠিন হবে। একই সঙ্গে খোদ ভারতও তার বিশ্বমিত্র সোভিয়েত ইউনিয়নের নিকট থেকে সামরিক নিরাপত্তা সমর্থন লাভের কারণে কৌশলগতভাবে দায়বদ্ধতার নাগপাশে বন্দি হয়ে থাকবে।

দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক শক্তির ভারসাম্যের ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রভাব পড়তে পারে ভেবে স্বাভাবিকভাবেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন এমন কোন উদ্যোগ গ্রহণ থেকে বিরত থাকে যার ফলে এ অঞ্চলের শক্তিসাম্য অধিকতর ক্ষুণ্ন হতে পারে। বাঙালিদের স্বাধীনতা সংগ্রামের যথার্থতা সম্পর্কে দু'টি শক্তিই সজাগ ছিল, আর সে কারণেই উভয় শক্তি বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের একেবারে ক্রান্তিলগ্নে তাদের নিজ নিজ কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তাদের ঐতিহ্যিক মিত্রদেশ পাকিস্তানের অবস্থান থেকে কৌশলমূলক দূরত্ব বজায় রাখে। মুক্তিযুদ্ধরত বাঙালিদের পক্ষে, এমনকি বাংলাদেশকে সমর্থন প্রদানকারী মিত্রশক্তির পক্ষেও এটা ছিল বিরাট গুরুত্বের বিষয়। কেননা অতীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও

চীনই ছিল পাকিস্তানের কৌশলগত রক্ষাকবচ। এটা সহজে অনুমেয় যে, পূর্ব পাকিস্তানে শূন্যমানের রণনীতিতে নিজকে ব্যাপৃত করতে গিয়ে ইসলামাবাদ নিশ্চয়ই তার ঐতিহ্যগত পৃষ্ঠপোষকদের থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ সাহায্য ও সমর্থন আশা করছিল। সেই প্রত্যাশিত রণনৈতিক রক্ষাকবচ বলে পরিচিত উভয় বৃহৎ শক্তি থেকে প্রকৃত সহায়তা লাভের ব্যাপারে ইসলামাবাদকে ব্যর্থমনোরথ হতে হয়। ফলে বাংলাদেশ আন্দোলনকে বানচাল করার সকল পাকিস্তানী পরিকল্পনা ও প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য।

এ প্রসঙ্গে আরো মনে রাখা সমীচীন যে, পাকিস্তানের সামরিক-কৌশলগত পরিকল্পনা ও প্রয়াস থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের দূরত্ব বজায় রাখার ফলে স্বাধীনতা সংগ্রামরত বাঙালি ও তাদের মিত্রশক্তির পক্ষে স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ার রাজনৈতিক লক্ষ্যে উত্তরণ সহজতর হয়, সম্ভব হয় তাদের পক্ষে সেই লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজনীয় কূটনৈতিক সমর্থন আদায় করা বা প্রয়োজন অনুযায়ী সামরিক সরবরাহ লাভ করা। উপরন্তু, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যকার আঞ্চলিক দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে দৃশ্যত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও দু'টি শক্তির একটিও যুদ্ধদ্বন্দ্ব সম্প্রসারণে কারক বা সামরিক বাহকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় নি; বরং উভয় শক্তি চায় ইসলামাবাদের কূটনৈতিক প্রভাব অব্যাহত রাখতে যার ফলে তাদের পক্ষে পাকিস্তানকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয়। এভাবে দু'টি শক্তিই বাংলাদেশকে ঘিরে একটি প্রলম্বিত সংগ্রামের পথ পরিহার করতে পরোক্ষভাবে সহায়তা প্রদান করে। তা না হলে একটি অবাঞ্ছিত প্রলম্বিত যুদ্ধের প্রক্রিয়া এ অঞ্চলের সকল দেশের জনগণের জন্য মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনতে পারতো।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা সম্পর্কে আরেকটি বাস্তব সত্যও স্মরণযোগ্য। ঐতিহ্যিকভাবে পূর্ব পাকিস্তান ছিল খাদ্যঘাটতি এলাকা। পাকিস্তান আমলে দীর্ঘকাল থেকে এ প্রদেশে মার্কিন খাদ্যসাহায্য অব্যাহত ছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে সেই মার্কিন মানবিক সাহায্য অধিকতর জোরদার করা হয়। সম্প্রসারিত মার্কিন মানবিক সাহায্যের মধ্যে ছিল পি. এল. ৪৮০-এর অধীন খাদ্যসাহায্য কর্মসূচি। এছাড়া ছিল ভারতকে প্রদত্ত অব্যাহত খাদ্য ও অর্থনৈতিক সাহায্য। এসব সাহায্যের ফলে শুধুমাত্র লক্ষ লক্ষ বাঙালি, যারা পাকিস্তানী বাহিনীর দুঃসহ নৃশংসতা এড়ানোর জন্য ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে, তারাই লাভবান হয় নি, দেশের অভ্যন্তরে অবস্থানরত কোটি কোটি মানুষও ত্রাণসাহায্য লাভ করে—এদের মধ্যে এমনকি ধরা যায় সংঘবদ্ধ বাঙালি গেরিলা বাহিনীকেও, যারা পাকিস্তানীদের নৃশংসতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়। একই সঙ্গে এও মনে রাখা প্রয়োজন যে, অগণিত মার্কিন ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সাহায্যসংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারী পূর্ব পাকিস্তানে ও সীমান্তের ওপারে মানবিক ত্রাণসাহায্য প্রদানকল্পে আসে। এদের উপস্থিতির কারণে পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি "খোলা জানালা" সদৃশ হানাদার বাহিনীর নৃশংস রূপ বহির্বিশ্বের নিকট

উন্মোচিত করে, জাগিয়ে তোলে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সতর্ক চেতনা। এর ফলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অনুকূলে বিশেষকরে পশ্চিমা জনমত প্রভাবিত ও সংগঠিত হয়।

উপর্যুক্ত বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা সঙ্গত যে, দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত-সোভিয়েত যৌথ প্রাধান্য ও আধিপত্য লাভের অন্বেষার মুখেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের কৌশলগত আচরণে এক উল্লেখযোগ্য অব্যাহত ধারা পরিলক্ষিত হয়। এ দু'টি শক্তিই দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের মাধ্যমে কর্তৃত্ব স্থাপনের সোভিয়েত পরিকল্পনার বিরোধিতা করে; দু'টিই এ অঞ্চলে রাজনৈতিক ও সামরিক ভারসাম্য রক্ষাকল্পে ঘনিষ্ঠভাবে যোগাযোগ রক্ষা করে চলে এবং উভয় শক্তিই তাদের নিজ নিজ কৌশলগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যদিও পৃথকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় নি, তথাপি পরোক্ষভাবে হলেও সহায়তা প্রদান করে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা-উত্তর কালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন স্বাধীন বাংলাদেশকে ভারত-সোভিয়েত গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখার পরিকল্পনায় আশঙ্কা প্রকাশ করে। তাই নব স্বাধীনতালব্ধ দেশটি থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারের পূর্বে একে কূটনৈতিক স্বীকৃতি প্রদানে উভয় শক্তি দ্বিধাবোধ করে। বস্তুত, এই অঞ্চলে "রাজনৈতিক ও সামরিক পরিস্থিতি" সম্পূর্ণরূপে সুস্পষ্ট হওয়া অবধি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে নি।[৪৮] ওয়াশিংটন এ ধরনের ইঙ্গিত প্রদান করে যে, বাংলাদেশকে মার্কিন স্বীকৃতি প্রদান সেই দেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য পরোপুরি প্রত্যাহার করার পূর্বে সম্ভব নয়।

বাংলাদেশে ভারত-সোভিয়েত চক্রের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে চীন অধিকতর জোরালো ভূমিকা গ্রহণ করে।[৪৯] প্রকৃতপক্ষে, ১৯৭৫ সনে বাংলাদেশে ভারতপন্থী সরকারের পতনের পূর্বাবধি ঢাকা ও বেইজিং-এর মধ্যে যথার্থ কোনরূপ সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্ভবত বাংলাদেশে স্থায়ী কোনরূপ কৌশলগত স্বার্থের বন্ধন গড়ে তোলে নি ; তবু ১৯৭২ সনে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃতির পর থেকে বাংলাদেশে দুর্যোগ ও অব্যাহত খাদ্যসংকট মার্কিন মানবিক উদ্বেগের কারণ বলে বিবেচিত। একটি গণতান্ত্রিক, স্বনির্ভর ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ, মার্কিন দৃষ্টিতে, দক্ষিণ এশিয়ায় রাজনৈতিক বিবর্তনে স্থিতিশীল উপাদান হিসেবে ইতিবাচক অবদান রাখতে পারে। ১৯৭৫-এর পর থেকে চীনও একইভাবে বাংলাদেশের সঙ্গে ভ্রাতৃপ্রতিম সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক স্থাপন করেছে এবং

৪৮. American Foreign Relations 1972 : A Documentary Record, Richard P. Stebbins and Elaine P. Adams (eds.) New York. Council of Foreign Relations, 1972, উদ্ধৃত, Ishtiaq Hossain, "Bangladesh-United States Relations: The First Decade" in Emajuddin Ahamed (ed.), *Foreign Policy of Bangladesh: a small state's imperative* (Dhaka 1984), 71.

৪৯. আরো বিশদ বিশ্লেষণের জন্য দ্রষ্টব্য, আবুল কালাম, "চীন, দক্ষিণ এশিয়া ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা: চীনের দৃষ্টিকোণ", **ইতিহাস পরিষৎ পত্রিকা** (১৩৯৮ সাল), নং ১-৩, ৫-১৯।

দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিকভাবে শক্তির ভারসাম্য সংরক্ষণে বাংলাদেশের সঙ্গে একযোগে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার বিষয়ে গভীর আগ্রহ প্রদর্শন করে চলেছে।৫০

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হওয়ার পর দক্ষিণ এশিয়ায় সোভিয়েত আচরণ পরিকল্পিত নীলনকশা অনুযায়ী অব্যাহত থাকে। বাংলাদেশ সংকট উত্তরণের পর মস্কো অন্যান্য বৃহৎ শক্তির মতো দক্ষিণ এশিয়ায় রাষ্ট্রিক সম্পর্কের স্বাভাবিকীকরণ চায়, কিন্তু সেই স্বাভাবিকীকরণ অবশ্য ক্রেমলিন চায় সোভিয়েত স্বার্থের অনুকূলে রাখতে। তখন সোভিয়েত উদ্দেশ্য ছিল এই অঞ্চলে তার বিশ্বপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিদ্বয়ের কার্যকর ভূমিকা সীমিত রাখা। সেই ধরনের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার লক্ষ্যে মস্কো ভারতের সঙ্গে গভীরতর বন্ধুপ্রতিম সম্পর্ক ও সর্বব্যাপী সহযোগিতামূলক সম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্রিয় হয়। এ ধরনের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মস্কো ভারত-সোভিয়েত মৈত্রীচুক্তিকে এশিয়ায় উভয় দেশের যৌথ কৌশলগত কর্মকাণ্ডের হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করে। এভাবে বাংলাদেশ সংকট উত্তরণের পরও মস্কো তার ভারতপন্থী রণনীতিতে অব্যাহতভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকে যাতে দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের আধিপত্য সুসংহত হয়। ভারত-সোভিয়েত মৈত্রীসম্পর্ককে এশীয় মহাদেশের "স্থিতিশীলতার একমাত্র উপাদান" বলেও প্রচার করতে ক্রেমলিনের নীতিনির্ধারকদের কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল না। কেননা, মস্কোর দৃষ্টিতে, দু'দেশের সম্পর্ক কোনরূপ অব্যবহিত কৌশলমূলক বিবেচনার ভিত্তিতে গড়ে উঠে নি; বরং এর পেছনে দু'দেশের দীর্ঘমেয়াদী ও গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় বিজড়িত রয়েছে।৫১

ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে গড়ে উঠা সেই গভীরতর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে এটাও মনে রাখা সমীচীন যে, দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠাকল্পে মস্কো উদ্দেশ্যমূলকভাবে বাংলাদেশের সঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ কোন সম্পর্ক স্থাপন থেকে বিরত থাকে; এক্ষেত্রে ক্রেমলিন শুধুমাত্র ভারতের প্রতি সমর্থনমূলক সম্পর্ক অব্যাহত রাখে। মস্কো প্রকাশ্যে ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রীচুক্তি স্বাক্ষরকে (সেপ্টেম্বর ১৯৭২) স্বাগত জানায়, কিন্তু নয়াদিল্লীর সঙ্গে পূর্বে স্বাক্ষরকৃত চুক্তির অনুরূপ কোন মৈত্রীচুক্তি কখনো ক্রেমলিন ঢাকার সঙ্গে স্বাক্ষর করার প্রস্তাব রাখে নি।

এভাবে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, একমাত্র ভারতই প্রধান আঞ্চলিক দোসর হিসেবে সোভিয়েত কৌশলগত পরিকল্পনায় স্থায়ী আসন লাভ করে, আর বাংলাদেশকে দেখা হয় একটি রাজনৈতিক সম্পূরক বা ভারতের কর্তৃত্বাধীন একটি লেজুড়ে দেশ হিসেবে। ৯ আগস্ট ১৯৯১ তারিখে ভারত-সোভিয়েত মৈত্রীচুক্তি নবায়ন করা হয়। ফলে দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতভিত্তিক সোভিয়েত কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গির অব্যাহত ধারা প্রতিফলিত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনের পর অর্থাৎ ১৯৯১ সনের পর থেকে আন্তর্জাতিক সিস্টেমে

---

৫০. আরো ব্যাখ্যার জন্য দ্রষ্টব্য, Abul Kalam, "China's Forign Policy and Security Perceptions," *BIISS Journal*, Vol. 17, No. 2 (1996), 205-206.

৫১. "Relations between the USSR and the Countries of South and Southeast Asia", in Gromyko and Ponomarev (eds.), প্রাগুক্ত, 622.

মস্কোর পরাশক্তির পদমর্যাদা লোপ পায়। নয়াদিল্লীর নিকট তা ছিল শোচনীয় আঘাত স্বরূপ। কিন্তু উভয় দেশে পালাক্রমে সরকার পরিবর্তন সত্ত্বেও নয়াদিল্লী ও মস্কো দ্বিপাক্ষিক মৈত্রীচুক্তির উপর পুনর্বার আস্থা ব্যক্ত করে চলছে। সেই চুক্তির "উপদেশক" ধারা বিলোপ করা হলেও দু'পক্ষের কৌশলগত ভাববিনিময় ও ভারতের প্রতি অব্যাহত রুশ সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহ থেকে উভয়ের স্থায়ী মৈত্রীবন্ধনের ধারা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়।[৫২]

পরিশেষে তিনটি বিশ্বশক্তির দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক রণনীতি সংক্ষেপে পুনরায় পর্যালোচনা করা যেতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের আঞ্চলিক রণনীতি ইতিহাসের ভিন্নতর সময় ও ধারা থেকে উদ্ভূত হয়েছে বটে, কিন্তু উভয়ের কৌশলগত উদ্দেশ্য মোটামুটিভাবে একই লক্ষ্যে পরিচালিত; তা হলো আঞ্চলিক শক্তিসাম্য বজায় রাখা। সেই শক্তিসাম্য ব্যাহত হতে পারে এ ভয়ে উভয় শক্তি বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি সমর্থন প্রদানের বিষয়ে সংযত আচরণ করে, কিন্তু বর্তমানকালে উভয় শক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে একটি স্বাধীন, সার্বভৌম ও শক্তিশালী বাংলাদেশ সেই আঞ্চলিক শক্তির ভারসাম্যে ইতিবাচক অবদান রাখতে পারে। বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ায় এ ধরনের কৌশলগত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করলে তা হবে এ অঞ্চলের জাতিসমূহের, এমনকি দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর প্রতিসম আশা-অকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ কারণে এই ধরনের কৌশলগত দৃষ্টিকোণ এ অঞ্চলের সাধারণ জনমানুষের অন্তর স্পর্শ করে, অপেক্ষা রাখে সমর্থন লাভের। কেননা এর ফলে এ অঞ্চলের সকল দেশ তাদের নিজ নিজ সার্বভৌম রাজনৈতিক সত্তার সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার সুযোগ লাভ করবে।

পক্ষান্তরে, মস্কোর আঞ্চলিক রণনীতি কিছুকালের জন্য দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক দু'মেরুর দিকে দোলা দেয়, কিন্তু চূড়ান্ত পর্যায়ে দু'শক্তির নীতিগত সাদৃশ্য ও মৈত্রীবন্ধন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অনুকূলে হলেও কালের ব্যাপকতর দৃষ্টিকোণ থেকে অন্তর্নিহিতভাবে দু'শক্তির মৈত্রীবন্ধন এক অপ্রতিসম রূপ পরিগ্রহ করে। নয়াদিল্লীর আঞ্চলিক আধিপত্যবাদের প্রতি মস্কোর একাত্মতা এতে প্রকাশ পায় বলে তা ভারত ছাড়া দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের স্থায়ী স্বার্থের প্রতিকূল—এমনকি এ অঞ্চলের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সার্বভৌম ও উন্নয়নমূলক আশা-আকাঙ্ক্ষাবিরোধী। সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনের পর স্নায়ুযুদ্ধোত্তর কালে আন্তর্জাতিক সিস্টেমের রূপান্তর, মস্কোর ঐতিহ্যগত আধিপত্যবাদী পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে পরিবর্তনের ধারা এবং এসবের ফলে ভারতের আঞ্চলিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সম্ভাব্য পরিবর্তন প্রভৃতি ভারতের ক্ষুদ্রতর প্রতিবেশী দেশসমূহের প্রতিসম আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্পূরণে সহায়ক হবে, কালে দক্ষিণ এশিয়ার আন্তঃরাষ্ট্রিক সম্পর্কে শান্তিপূর্ণ বিবর্তন ঘটাবে—এরূপ প্রত্যাশা করা অমূলক নয়।

৫২. Abul Kalam, *Japan and South Asia: Subsystemic Linkages and Developing Relationships* (Dhaka 1996), পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

# পরিশিষ্ট ১

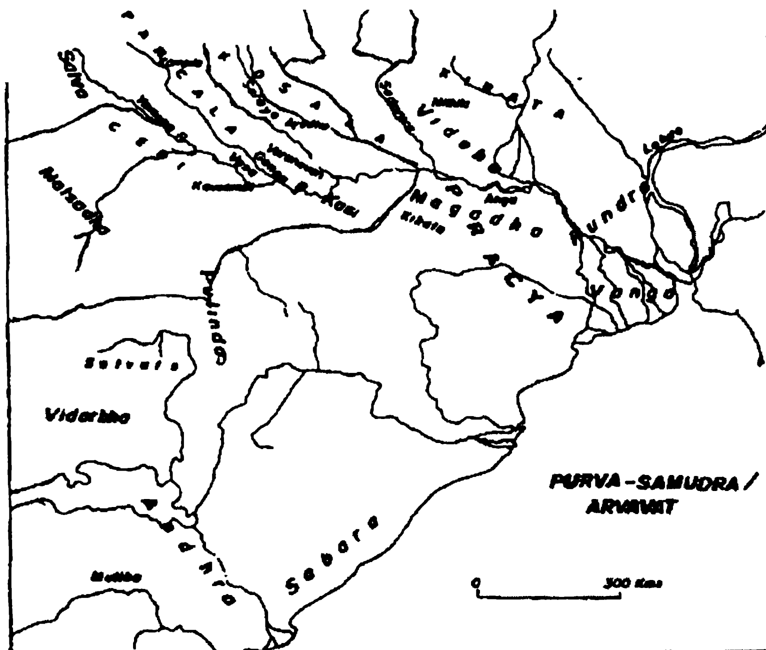
# মানচিত্রে বঙ্গ থেকে বাংলাদেশ

কে. মউদুদ ইলাহী*

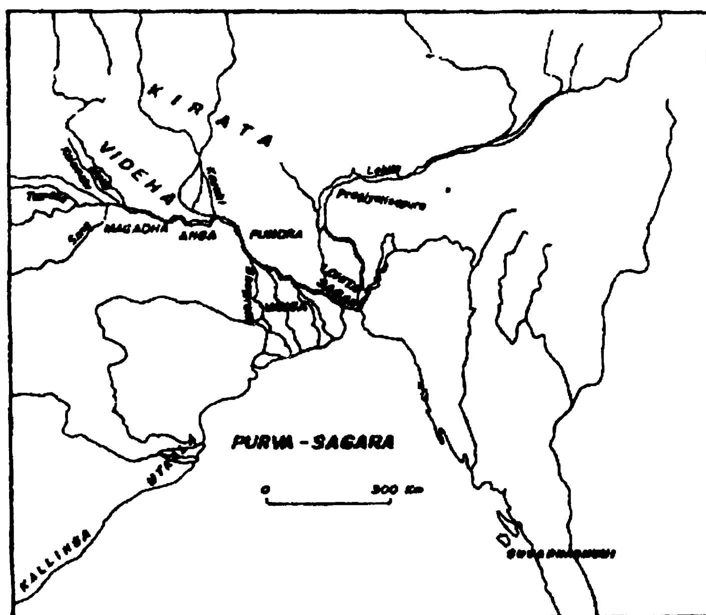
ভূগোলবিদ এবং ইতিহাসবেত্তা উভয়ের জন্য ঐতিহাসিক মানচিত্র একটি অঞ্চলের প্রাচীনত্বের ধারণা প্রদান করে থাকে। এই ধারণা কেবলমাত্র প্রাচীনকালের পরিসর, অবস্থান এবং দূরত্ব সম্পর্কীয় নয়, বরং একটি জাতি বা রাজ্যের আয়তনগত বিবর্তন, সাংস্কৃতিক সম্পর্কের পরিবর্তন, রাজনৈতিক আধিপত্য অথবা এর অভাব কিভাবে একটি দেশের জন্য গুরুত্ববহ তার ধারণা প্রদান করে থাকে। এই প্রবন্ধে "বঙ্গ থেকে বাংলাদেশ"-এর ভূ-ঐতিহাসিক বিবর্তনের পর্যায়সমূহ মানচিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে।

স্বভাবতই প্রযুক্তিগত এবং অন্যান্য কারণে বর্তমানে যে অঞ্চলকে বাংলাদেশ বলা হয় সেই ভূখণ্ডের এবং এর সন্নিহিত এলাকার সুনির্দিষ্ট সীমানা চিহ্নিতকরণ করা সহজসাধ্য নয়। কাজেই মানচিত্রে নির্দিষ্ট সীমানাকে সামগ্রিক বা মোটামুটিভাবে এই এলাকার সীমানা হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। এরূপ পরিস্থিতির কারণগুলির মধ্যে প্রাচীনকালের মানচিত্রে খাত পরিবর্তনশীল নদীসহ, পাহাড়-পর্বত এবং উপকূলরেখা অঙ্কিত হয় নাই। তদুপরি, প্রাচীনকাল থেকে অনেক ভূরূপ এবং প্রাকৃতিক নিদর্শনের পরিবর্তন স্বাভাবিকভাবে ঘটেছে। কাজেই, এই প্রবন্ধে মানচিত্রায়নে প্রকৃত মাপনী (স্কেল) ব্যবহার করা হয়েছে যাতে বাংলাদেশ ও সন্নিহিত অঞ্চলের সীমানা বিবর্তন পর্যায়সমূহ তুলনা করা যায়। তবে কিছু মূল/প্রাচীন মানচিত্রও ব্যবহার করা হয়েছে, যার মাধ্যমে তৎকালীন মানচিত্রায়ন অভিজ্ঞান এবং আলোচ্য অঞ্চল সম্পর্কে ধারণার মাত্রা অনুধাবন করা যায়।

* অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।




মানচিত্র-১ক




মানচিত্র- ১খ

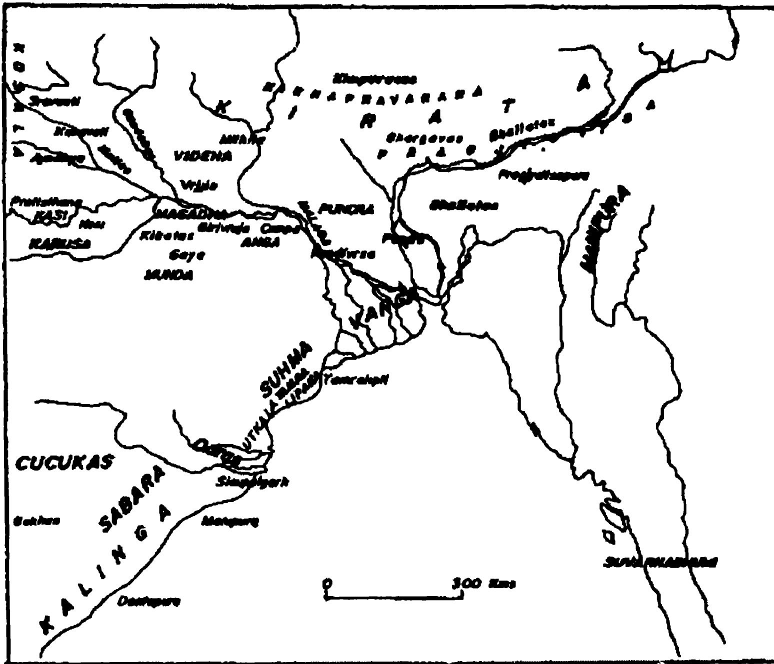
মানচিত্রসমূহের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যায় কোন ঐতিহাসিক মানচিত্রায়নের বা ঐতিহাসিক কালিক পারম্পর্য সম্পর্কীয় মৌলিকত্ব এখানে দাবি করা হচ্ছে না। এগুলিতে কেবল বাঙ্গালা, বেঙ্গল এবং পরে বাংলাদেশের আয়তনগত বিস্তৃতি এবং/অথবা সীমানার বিবর্তনগত বিবরণ বিধৃত হয়েছে। একই সাথে অঞ্চলটির পরিসরগত ধারণা এবং দূরত্ব প্রকাশের জন্য আনুমানিক স্কেল (মাপনী) ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাক-পাল আমলের মানচিত্রের পর পরবর্তীকালের মানচিত্রে উপকূলীয় ভূমিগঠনের প্রমাণ মেলে অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে নিম্ন গাঙ্গেয় অঞ্চলে ব-দ্বীপ গঠনের প্রমাণ পাওয়া যায়। কাজেই, এই সময়কার মানচিত্রের সাথে সাম্প্রতিককালের মানচিত্রের যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। এরূপ পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও প্রবৃদ্ধিসূচক মানচিত্রায়নে বিভিন্ন উৎস, যেমন, ভৌগোলিক মানচিত্রবিদ্যা এবং ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। এই সমস্ত তথ্য-উৎস প্রবন্ধের শেষে সন্নিবেশ করা হয়েছে এবং প্রবন্ধের মধ্যে বারবার নির্দেশ করা হয় নি।

## মানচিত্র ১ (ক-গ) : ১০০ থেকে ৭০০ খৃঃ পূর্ব

প্রাচীন বৈদিক সূত্রে প্রথম বাংলার উল্লেখ পাওয়া যায়। তখন এই এলাকা 'বঙ্গ' নামে পরিচিত ছিল—এলাকাটিতে সম্পূর্ণ নিম্ন গাঙ্গেয় এবং গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ অন্তর্ভুক্ত ছিল। এলাকাটির নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এবং এর অধিবাসীদের নির্দিষ্ট নৃতাত্ত্বিক পরিচিতি ছিল। সন্নিহিত রাজনৈতিক এবং/অথবা ভৌগোলিক এলাকাগুলি ছিল পুন্ড্র, প্রাচ্য, বিদেহ এবং কিরাতা। বঙ্গসহ এই এলাকাগুলির প্রাক-আর্য অবস্থান ছিল।

উত্তর-পশ্চিম ভারতে আর্যদের আগমনকালে (১৫০০-৮০০ খৃঃ পূর্ব) বঙ্গের বেশিরভাগ অংশ অরণ্যভূমি ছিল এবং বঙ্গসহ সন্নিহিত এলাকা আদিবাসী বা ভূমিজ অধিবাসী সমৃদ্ধ ছিল। সামগ্রিকভাবে এই সমস্ত এলাকা নদীজ ভূমিরূপ এবং অরণ্যময় থাকার কারণে আর্য প্রভাবমুক্ত ছিল (মানচিত্র ১ক)। রামায়ণকালে (৮০০-৭০০ খৃঃ পূর্ব) বাঙ্গালার আয়তনগত বিস্তৃতিকে বৃটিশ উপনিবেশকালীন বাঙ্গালার সাথে তুলনা করা যেতে পারে। বঙ্গ এবং পুন্ড্র প্রখ্যাত জনপদ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। অঙ্গ সমগ্র প্রাচ্য অঞ্চলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল। লোহিতসাগর নামে একটি লোকালয়ের বিকাশ ঘটে গঙ্গা ও লোহিত (ব্রহ্মপুত্র) নদীর সঙ্গম এলাকায়। ঠিক এর দক্ষিণেই পূর্বসমুদ্র বা আর্ভাভত (বঙ্গোপসাগর)-এর অবস্থান ছিল (মানচিত্র ১খ)।

মহাভারতকালে (৬০০-৩০০ খৃঃ পূর্ব) বাঙ্গালা এবং সন্নিহিত এলাকার একটি অঞ্চলগত ধারণা সুস্পষ্ট ধরা পড়ে। অঙ্গ এবং পুন্ড্রের তুলনায় বঙ্গের আয়তনগত অবস্থান দৃঢ় ছিল (মানচিত্র ১গ)।

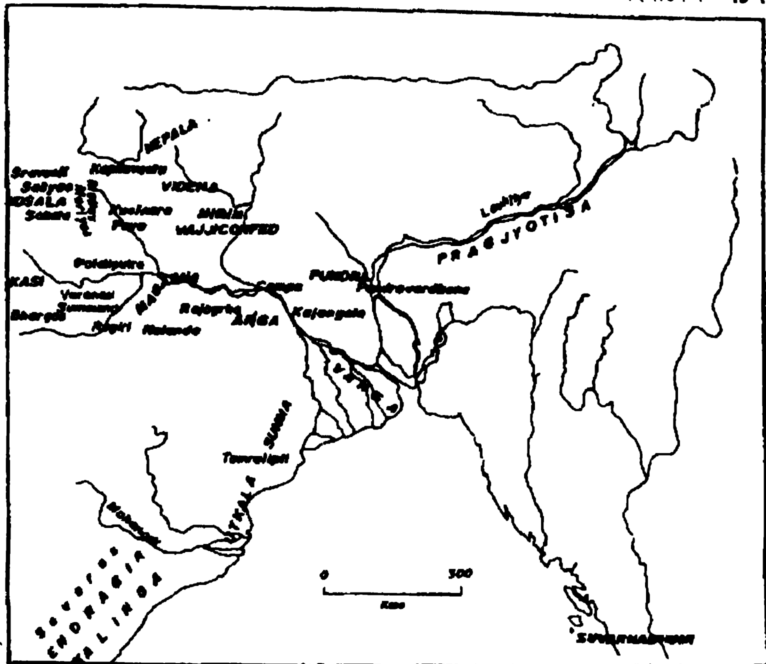



মানচিত্র- ১গ

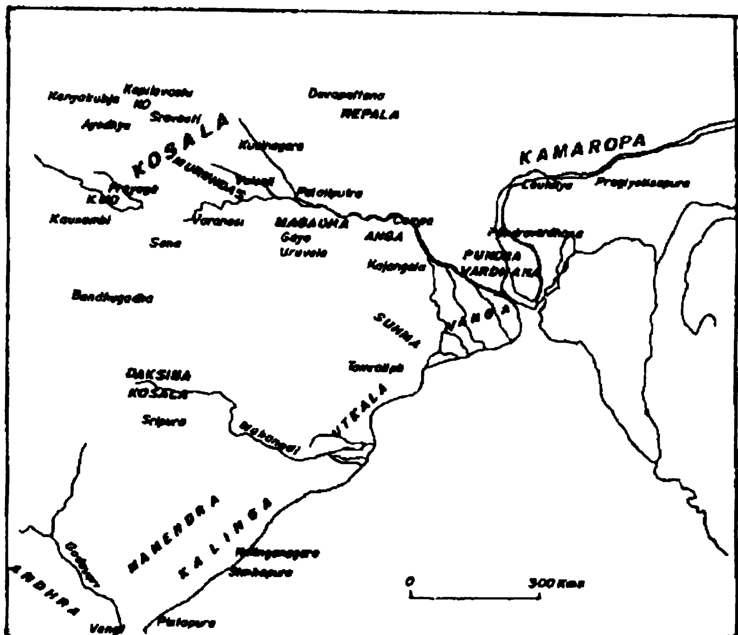
**মানচিত্র ২ : মগধ যুগে বাঙ্গালা : ৫৬০-৩২৫ খৃঃ পূর্ব**

বর্তমানকালের উত্তর-মধ্য ভারত বা তৎকালীন মধ্যদেশে অতীতে বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক শক্তির বিকাশ ঘটে। এই অঞ্চলের পূর্বে প্রাচ্য নামে একটি বৃহদায়তন এলাকার মধ্যে বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক অবস্থান, যেমন, অঙ্গ, পুন্ড্র, সুহ্ম এবং বিশেষ করে বঙ্গের বিকাশের সাথে সাথে উত্তর-পূর্বভাগে লোহিত নদী (ব্রহ্মপুত্র) বরাবর প্রাগজ্যোতিষ রাজ্যের উত্থান ঘটে। অঙ্গ ও পুন্ড্রের ব্যাপক অংশ এবং বঙ্গের কিছু অংশ মগধ রাজ্যভুক্ত হয় (৫৪৫ খৃঃ পূর্ব)।

পরবর্তীকালে মৌর্য শাসনামলে (৩২১-১৮১ খৃঃ পূর্ব) অঙ্গ, পুন্ড্র এবং প্রাগজ্যোতিষের তুলনায় বঙ্গ অধিকতর ভূ-রাজনৈতিক খ্যাতি লাভ করে। এর কারণ হিসেবে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে নিম্ন গাঙ্গেয় নদীমালার নৌ-পথ ব্যবহার এবং নৌ-পথ সংলগ্ন বেশ কিছু জনপদ ও নগরের বিকাশ উল্লেখ করা যেতে পারে। এই সময়কালটি বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির বিকাশের জন্য বিখ্যাত ছিল, আর তৎকালে বৌদ্ধরা পরিকল্পিত সড়কপথ, পর্যবেক্ষণ টাওয়ার, শহর এবং বৌদ্ধ চর্চার জন্য পাঠকেন্দ্র (বা বিশ্ববিদ্যালয়) নির্মাণের জন্য বিশেষ খ্যাতিলাভ করে।



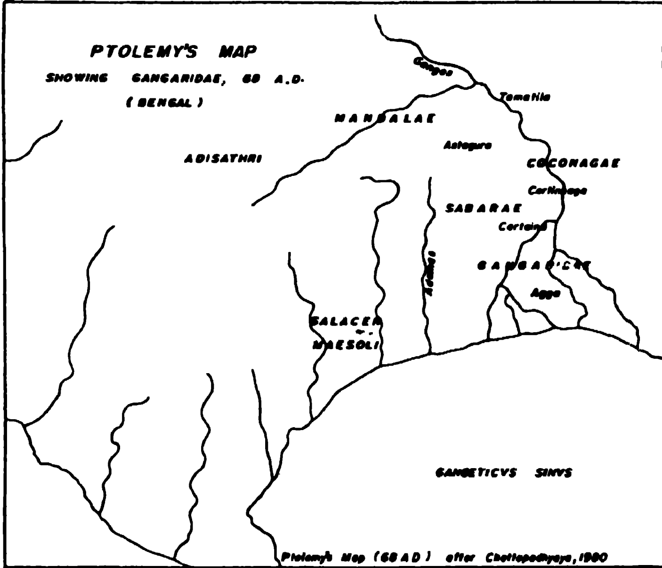

মানচিত্র - ২




মানচিত্র- ৩

## মানচিত্র ৩ : কুষাণ যুগে বাঙ্গালা: ৩০০-১০০ খৃঃ পূর্ব

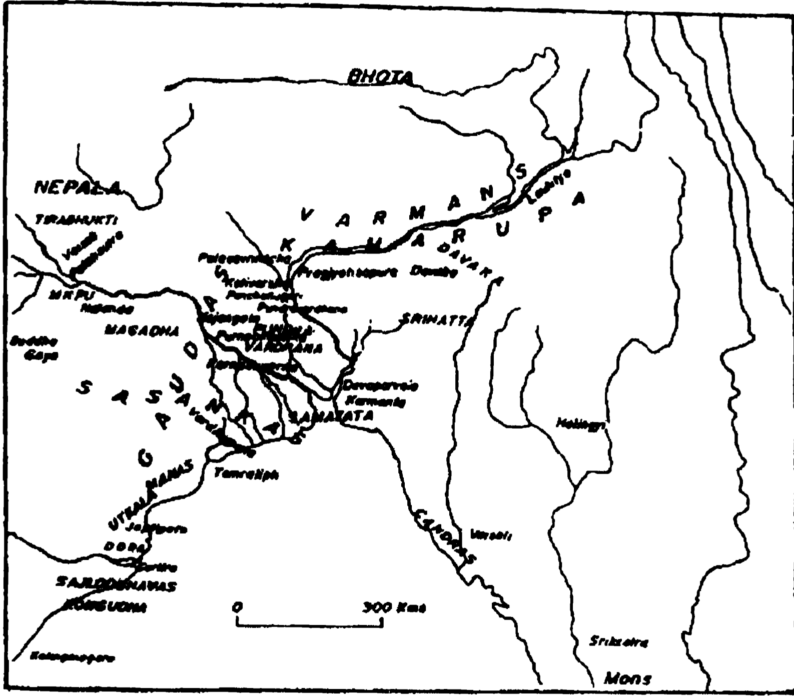
উত্তর-পশ্চিম চীন থেকে মূলত যাযাবরবৃত্তিক কুষাণগণ খৃঃ পূর্ব ২য় শতাব্দীতে মধ্য এশিয়ায় আগমন করে এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের উন্নত সভ্যতার সংস্পর্শে আসে। কালক্রমে এদের এই সভ্যতার সাথে পরিপূর্ণ সংস্কৃতায়ন ঘটে এবং এরা উত্তর ভারতে গঙ্গানদী বরাবর ব্যাপক এলাকায় বিস্তৃতি লাভ করে এক রাজশক্তির উদ্ভব ঘটায়। তবে কুষাণগণ মগধ পর্যন্তই তাদের রাজ্যবিস্তৃতি সীমিত রাখে। ফলে, অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্ম এবং পুন্ড্রদের স্বকীয় অবস্থান অপরিবর্তিত থাকে। তবে এদের মধ্যে পুন্ড্র অঞ্চলের ভূ-রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় অবস্থানের চূড়ান্ত পরিণতি এই সময় লক্ষণীয়। এই বিকাশমান রাজনৈতিক বিস্তৃতি পুন্ড্রবর্ধন নামে পরিচিতি লাভ করে। কিন্তু অপরদিকে প্রাগজ্যোতিষের অবনতি ঘটে।




মানচিত্র- ৪

## মানচিত্র ৪ : টলেমীকৃত বাঙ্গালার মানচিত্র : ৬৮ খৃঃ

বঙ্গ বা বাঙ্গালার কালিক ইতিহাস শুরু হয খৃঃ পূঃ ৩২৪ থেকে, যখন আলেকজান্ডার ভারত আক্রমণ করতে এসে সিন্ধুনদের তীরে এসে গঙ্গারিদে এবং প্রাস্য (প্রাচ্য) অঞ্চলের যোদ্ধাদের বীরগাথা সম্পর্কে অবগত হন এবং তাঁর অভিযান শেষ করেন। গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ অঞ্চলকে গঙ্গারিদে নামকরণ টলেমী'র মানচিত্রে (৬৮ খৃঃ) পাওয়া যায়। এর অধিবাসীরাও একই নামে পরিচিত ছিল। গঙ্গারিদের আয়তনগত বিস্তৃতি ছিল নিম্ন গঙ্গার বঙ্গ এবং অঙ্গ অঞ্চলে, যদিও প্রকৃত ভৌগোলিক সীমারেখা নির্দেশ করা এখন কঠিন।




মানচিত্র- ৫

## মানচিত্র ৫ : হর্ষ-শশাঙ্ক অন্তর্বর্তীকালে বাঙ্গালা : ৫০০-৭০০ খৃঃ

এই সময়কালে বাঙ্গালার দক্ষিণ-পশ্চিমে (বর্তমান উড়িষ্যা) শশাঙ্ক এবং উত্তর-পূর্বে (বর্তমান কামরূপ) বর্মনরা প্রভূত রাজনৈতিক সাফল্য অর্জন করে। কামরূপের শশাঙ্কের গৌড় আক্রমণের ঘটনায় সন্দিহান হয়ে ভাস্করবর্মন হর্ষবর্ধনের সাথে মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ হন। এর ফলে হর্ষবর্ধন পুন্ড্রবর্ধনে অনুপ্রবেশের সুযোগ পান। এই যুগের প্রারম্ভে বাঙ্গালার রাজনৈতিক গুরুত্বও কমে যায় এবং সমতটের রাজশক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটে। সমতটের বিস্তৃতি পূর্বে গঙ্গা-লোহিত সঙ্গমস্থল থেকে পশ্চিমে সমগ্র গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ পর্যন্ত ঘটে। লক্ষণীয় যে, এ সময় কামরূপের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক খ্যাতি পুন্ড্রবর্ধন, এমন কি মগধকেও অতিক্রম করে।

## মানচিত্র ৬ : বিদেশী পরিব্রাজকের দৃষ্টিতে বাঙ্গালা : ৩০০-৭০০ খৃঃ

হর্ষ-শশাঙ্ক অন্তর্বর্তীকালে বেশ কিছু চীনা পরিব্রাজকের ভারতে আগমন ঘটে। এঁদের কয়েকজন বাঙ্গালায় আগমন করেন। এঁদের লিখিত বিবরণ থেকে বাঙ্গালার অধিবাসীদের

মানচিত্র- ৬

মানচিত্র- ৭

সংস্কৃতি, ধর্ম এবং আর্থ-সামাজিক বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধারণা লাভ করা যায়। এই সময়টি বৌদ্ধধর্মের বিস্তারের ফলে সাংস্কৃতিক রেনেসাঁ এবং উত্তর ভারতে গুপ্ত সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য বিশেষ সুপরিচিত ছিল। চীনা পরিব্রাজকদের মধ্যে ফা হিয়েন (৩৯৯-৪১৫ খৃঃ) এবং হুয়েন সাং (৬২৯-৬৫০ খৃঃ) উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। উভয়েই মধ্য এশিয়া থেকে উত্তর-পশ্চিম ভারতে সড়কপথে আগমন করেন এবং বাঙ্গালা পর্যন্ত ভ্রমণ করেন। গৌড়ের অন্তর্গত তাম্রলিপ্তি নামক নৌ-বন্দর থেকে তাঁরা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এই সময়ে পুন্ড্রবর্ধন এবং বঙ্গের বেশ কিছু অংশ গৌড়ের (মগধের পূর্বে) অন্তর্ভুক্ত হয়। সমতট আরও পূর্বে ত্রিপুরা থেকে আরাকান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

চীনা পরিব্রাজকের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, বাঙ্গালা অঞ্চলে নদীতীরে বহু বর্ধিষ্ণু শহর ছিল। সমগ্র এলাকা জনঅধ্যুষিত ছিল এবং কৃষি ও বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। বাঙ্গালার নৌ-বন্দরের বিকাশ থেকে অনুমান করা যায় যে এখানকার অধিবাসীগণ নৌ-পারদর্শী ছিল। ফা হিয়েন প্রধানত পশ্চিম গৌড় পরিভ্রমণ করেন এবং পাটলীপুত্র, নালন্দা, কাজঙ্গলা এবং তাম্রলিপ্তি দর্শন করেন। তিনি পাটলীপুত্র এবং নালন্দাকে বৌদ্ধধর্ম শিক্ষার প্রধান পাদপীঠ বলে উল্লেখ করেন, যাকে বর্তমান কালের বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে তুলনা করা যায়। কামরূপ, পুন্ড্র, কোটিবর্ষ এবং কামান্তা (কুমিল্লা ?) সম্পর্কে হুয়েন সাং অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেন।

**মানচিত্র ৭ : পাল যুগে বাঙ্গালা : ৭০০-৯২৫ খৃঃ**

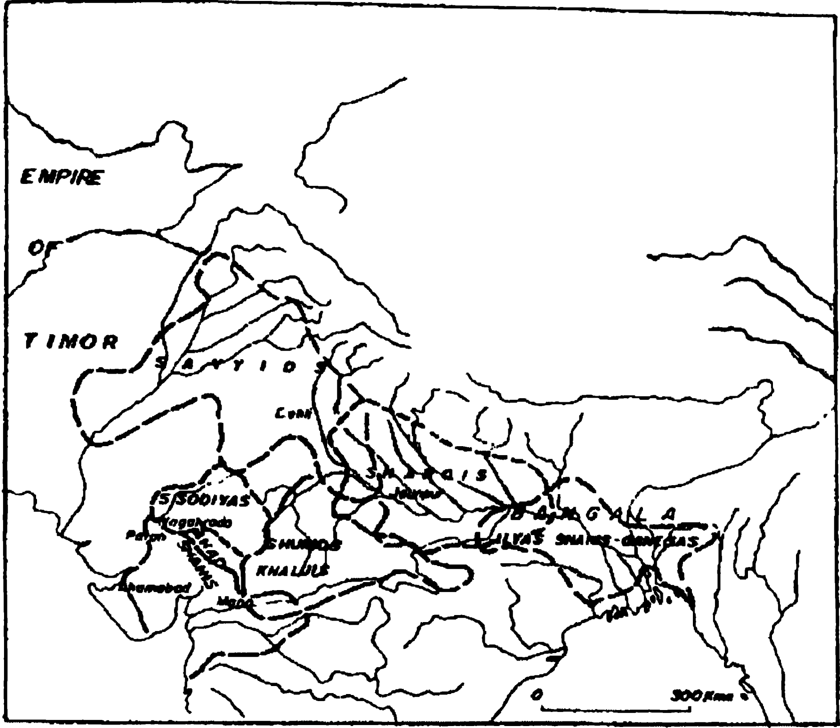
এই সময়কালে সমগ্র এশিয়া তথা বাঙ্গালায় বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির চরম বিকাশ ঘটে। পরবর্তীতে এই কালে পশ্চিম ভারতে আরব মুসলমানদের অভিযানের ফলে ইসলাম ধর্মের বিস্তার ঘটতে থাকে; কিন্তু বাঙ্গালায় ইসলাম ধর্মের প্রসার এরূপ অভিযানের ফলে ঘটে নি, বরং ধীর গতিতে ও অহিংস পরিবেশেই ঘটেছে।

পূর্বে যেমন লক্ষ্য করা গেছে, রাজনৈতিক বৈরিতা, স্থানীয় যুদ্ধাবস্থা এবং সামাজিক অস্থিরতা গুপ্ত আমলের শেষের দিকে বাঙ্গালায় সামগ্রিকভাবে এক অরাজকতার সৃষ্টি করে স্থানীয় বহু বিবদমান রাজ্যের সৃষ্টি করে। এই পরিস্থিতিতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জানা যায় যে, স্থানীয় নেতৃবর্গ এক পর্যায়ে ৭৫৬ খৃষ্টাব্দে গোপাল নামীয় পাল বংশের এক ব্যক্তিকে বঙ্গের শাসনকার্য পরিচালনার জন্য মনোনীত করেন। এই সময় থেকে পাল রাজবংশের আবির্ভাব ঘটে। গোপাল তাঁর শাসনামলে ক্ষমতা সুসংহত করে সমগ্র বাঙ্গালায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর রাজ্য উত্তরে হরিকেল এবং পুন্ড্রবর্ধন, পূর্বে কামান্তা, এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে উৎকল পর্যন্ত বিস্তারলাভ করে। পালগণ, বিশেষকরে গোপাল বৌদ্ধ সংস্কৃতির বিকাশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং বিক্রমশীলাসহ বিভিন্ন স্থানে বৌদ্ধ জ্ঞানচর্চার জন্য বিদ্যাপীঠ নির্মাণ করেন।

মানচিত্র- ৮

**মানচিত্র ৮ : সেন যুগে বাঙ্গালা : ১০০০-১২০০ খৃঃ**

বাংলায় পাল আমলে স্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থা বিদ্যমান থাকলেও মহিপাল (৯৯৫-১০৪৩ খৃঃ ) এবং রামপালের রাজত্বকালে (১০৮২-১১২৪ খৃঃ) চান্দেলা, কোল, চালুক্য এবং কালকুরিদের সাথে যুদ্ধ ও কোন্দল চলতে থাকে। পাল আমলের শেষদিকে অভ্যন্তরীণ দলীয় কোন্দল ও অস্থিতিশীলতা বিরাট বাঙ্গালা রাজ্যকে দুর্বল করে ফেলে। এই পরিস্থিতিতে ব্রাহ্মণ্য-হিন্দু ধর্মের ধারক দাক্ষিণাত্যের বংশোদ্ভূত সেন রাজাগণ বাঙ্গালায় প্রভুত্ব বিস্তার করে। ফলে মগধ থেকে বঙ্গ, পুন্ড্র এবং সমতট সেনরাজ্যভুক্ত হয়। তবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, বাঙ্গালায় বৌদ্ধ ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীরা সেনদের অত্যাচারের শিকার হয় এবং এই অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এই সময় ইসলাম ধর্মের প্রচারকগণ আরব ও পার্সি বণিক সম্প্রদায়ের সাথে সমুদ্রপথে সমতট ও আরাকান অঞ্চলে আগমন করেন। এঁদের সংস্পর্শে বহু অত্যাচারিত বৌদ্ধ ও নিম্নবর্ণের হিন্দু অধিবাসী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে সেনদের উৎপীড়ন থেকে রক্ষা পায়।



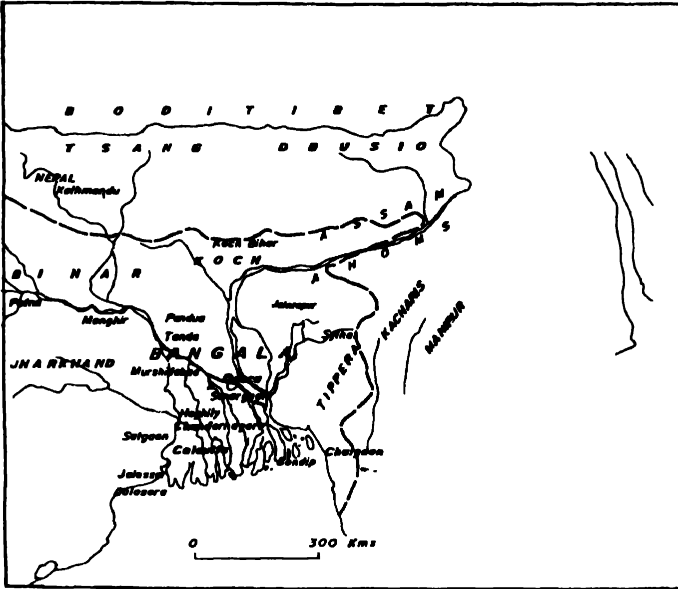

মানচিত্র- ৯

**মানচিত্র ৯ : শাহী-গণেশ আমলে বাঙ্গালা : ১৩৪০-১৪৯০ খৃঃ**

১২০৪ সালে মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজীর হাতে সেনরা পরাভূত হয়। খিলজী অযোধ্যাশাসকের সম্ভবত একজন জায়গিরদার ছিলেন। ইতিপূর্বে তিনি কিছু পেশাদার মুসলিম যোদ্ধার সাহায্যে বিহারের কিছু ক্ষুদ্র হিন্দুরাজ্য দখল করেন। এরপর তিনি বাঙ্গালায় আগমন করেন।

বখতিয়ার খিলজীর আক্রমণের ফলে সেন রাজা লক্ষণ সেন গৌড় থেকে বঙ্গের বিক্রমপুরে পলায়ন করেন এবং সেখান থেকে ১২৪৫ সাল পর্যন্ত শাসন পরিচালনা করতে থাকেন। পরবর্তী রাজাগণ প্রধানত বঙ্গেই অবস্থান করে বৈরী পরিবেশে কোন রকমে ১২৮৯ সাল পর্যন্ত শাসনকাজ চালাতে থাকেন। তবে ধর্মপ্রচারকদের তৎপরতায় ইসলাম ধর্ম ক্রমাগত সুদৃঢ় ভিত্তি লাভ করে এবং পশ্চিম দিক হতে ইসলাম ধর্মাবলম্বীগণ বাঙ্গালার প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকেন। এর ফলে মুসলিম শাসনামলের শুরুতেই এক নতুন বাঙ্গালার বিস্তৃতি রূপলাভ করে।

উত্তর ভারতে ঘুরী রাজবংশ ১২০৬ সালে দিল্লীতে শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। এই রাজ্যের বিকাশ ১৫২৬ সালে মুগল রাজত্ব প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত চলতে থাকে। এইরূপ উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া বাঙ্গালা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। ফলে ১৩৪২ সালে বাঙ্গালা ইলিয়াস শাহের নেতৃত্বে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এই শাহী আমলে বাঙ্গালার স্বাধীন অবস্থা ১৩৫৭ সাল পর্যন্ত অক্ষুণ্ন ছিল।

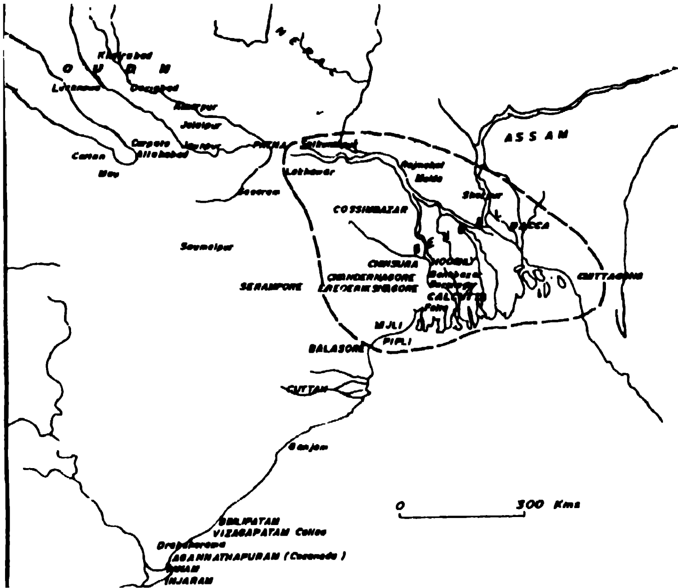



মানচিত্র- ১০

ফিরোজ শাহ তুঘলগ কর্তৃক বাঙ্গালায় অসফল অভিযানের পর তিনি এক সন্ধিচুক্তিবলে ১৩৫৯ সালে বাঙ্গালার স্বাধীনতা স্বীকার করেন। ১৪১৫ সালে দিনাজপুরের শাসক রাজা গণেশ শিহাব উদ্দীনকে পরাভূত করে শাসনক্ষমতা দখল করেন। তবে গণেশের বংশধরগণ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ১৪৩৫ সাল পর্যন্ত সেখানকার শাসনভার চালিয়ে যান। ইলিয়াস শাহী বংশ ১৪৩৬ থেকে ১৪৮৭ সাল পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে বাঙ্গালায় শাসনকাজ চালান। সেন শাসনের পরবর্তী সময় থেকে (১২০০ খৃঃ) শাহী আমল পর্যন্ত ভূ-রাজনৈতিকভাবে বাঙ্গালার সুনির্দিষ্ট সীমারেখা অক্ষুণ্ন ছিল। অর্থাৎ, এই সময় বাঙ্গালার বিস্তৃতি ছিল উত্তরে নেপাল সীমান্ত থেকে দক্ষিণে উত্তর উড়িষ্যা পর্যন্ত এবং আরও দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত, এবং পশ্চিমে বিহার থেকে পূর্বে আসামের পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত।

**মানচিত্র ১০ : মুগল আমলে বাঙ্গালা : ১৫৭৬-১৭০৭ খৃঃ**

মুগল আমলে প্রধান ভূ-রাজনৈতিক বিকাশের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিক ছিল বাবরের শাসনামলে ১৫২৬ সালে সাম্রাজ্যের আয়তনগত সম্প্রসারণ থেকে ১৮ শতকের শেষের দিকে আওরঙ্গজেবের শাসনামলে এই সম্প্রসারণের চূড়ান্ত পরিণতি। একই সাথে ১৮ শতকের শেষার্ধে রাজনৈতিক সংঘাত, স্থানীয় বিপ্লব ইত্যাদি দ্বারাও সাম্রাজ্যটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিল। উল্লেখ্য যে, এই ধরনের রাজনৈতিক টানাপড়েন বাঙ্গালাকে বিশেষ প্রভাবিত করে নি। কেননা, মুগল শাসনের বশ্যতা স্বীকার করলেও 'সুবা বাঙ্গালা' হিসেবে অঞ্চলটি মোটামুটি স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল।




মানচিত্র- ১১

বাঙ্গালায় মুগলরা বরং বিলম্বেই আগমন করেছিল, আকবরের মৃত্যুর পর। বাঙ্গালা যুদ্ধ জয়ের মাধ্যমে ১৬১২ সালে এবং পুনরায় ১৬৬১ সালে কুচবিহার এবং ১৬১২-৬৩ সালে অহম ও আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। পশ্চিমে সীমানা সুস্পষ্ট না থাকলেও বিহার-ঝড়খন্ড বাঙ্গালার অধীনে ছিল। দক্ষিণে উত্তর উড়িষ্যা পর্যন্ত বাঙ্গালার সীমান্ত ছিল। এই সময়ে সমগ্র বাঙ্গালায় মুসলিম সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে বেশ কিছু নগরের পত্তন ঘটে। এগুলোর মধ্যে পাটনা, মুঙ্গের, পাভুয়া, মুর্শিদাবাদ, সোনারগাঁও, সিলেট, চট্টগ্রাম (চাটিগাঁও) এবং সন্দ্বীপ উল্লেখযোগ্য।

## মানচিত্র ১১ ও ১২ : ইউরোপীয় সংযোগকালে বাঙ্গালা : ১৬ - ১৭ শতক

১৬ শতকের শেষার্ধে মুগল রাজদরবারে বৃটিশ দূত প্রেরণের মাধ্যমে সর্বপ্রথম ইউরোপীয় সংযোগ স্থাপিত হয়। ১৬০০ সালে বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি স্থাপনের মাধ্যমে তারা বাণিজ্যিক সুবিধাদি লাভ করে। ১৬১২ সালে তারা সুরাটে ফ্যাক্টরী কুঠি নির্মাণের অনুমতিলাভ করে। ১৬৫১ সালে বৃটিশরা বাঙ্গালায় হুগলী নদীতীরে বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করে। এ সমস্ত সুবিধাদির পরিবর্তে আওরঙ্গজেব শুল্ক লাভ করেন। কিন্তু মুগল ভারতে তথা বাঙ্গালায় বৃটিশ স্বার্থ কেবল বাণিজ্যকেন্দ্রিক ছিল না। প্রধানত হুগলী নদীতীরে বেশ কিছু দুর্গ নির্মাণের মাধ্যমে বাঙ্গালা বৃটিশ স্বার্থের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায়। কালক্রমে তারা তাদের বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ সুসংহত করার উদ্দেশ্যে নদীপথের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। বৃটিশ ভূ-জরিপবিদ জেমস্ রেনেল (১৭৮৪) সর্বপ্রথম ভারতের মানচিত্রে বাঙ্গালাকে 'বেঙ্গল' বলে চিহ্নিত করেন (মানচিত্র ১২ক)। এই মানচিত্র অনুযায়ী বেঙ্গলের বিস্তৃতি পশ্চিমে অযোদ্ধ্যার সীমান্তবর্তী বেনারস এবং বিহার থেকে পূর্বে নিম্ন আসাম ও সিলেট এবং উত্তরে নেপাল ও ভুটান সীমান্ত থেকে দক্ষিণে উত্তর উড়িষ্যার নিকট মেদিনীপুর এবং বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত ছিল। বেঙ্গলের নদ-নদীসমূহ গুরুত্বপূর্ণ পরিবহনপথ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল।

এর কিছু আগে ফরাসী পানিবিদ জে. এন. বেলিন (১৭৬৪) একটি বিরাট রাজ্য হিসেবে বাঙ্গালার মানচিত্রায়ন করেন (মানচিত্র ১২ খ)। রাজ্যটি বহু জনপদপূর্ণ ছিল।

উক্ত মানচিত্র দু'টি রীতিবদ্ধভাবে অঙ্কিত হয়েছিল বিধায় এখানে দেখানো হলো।

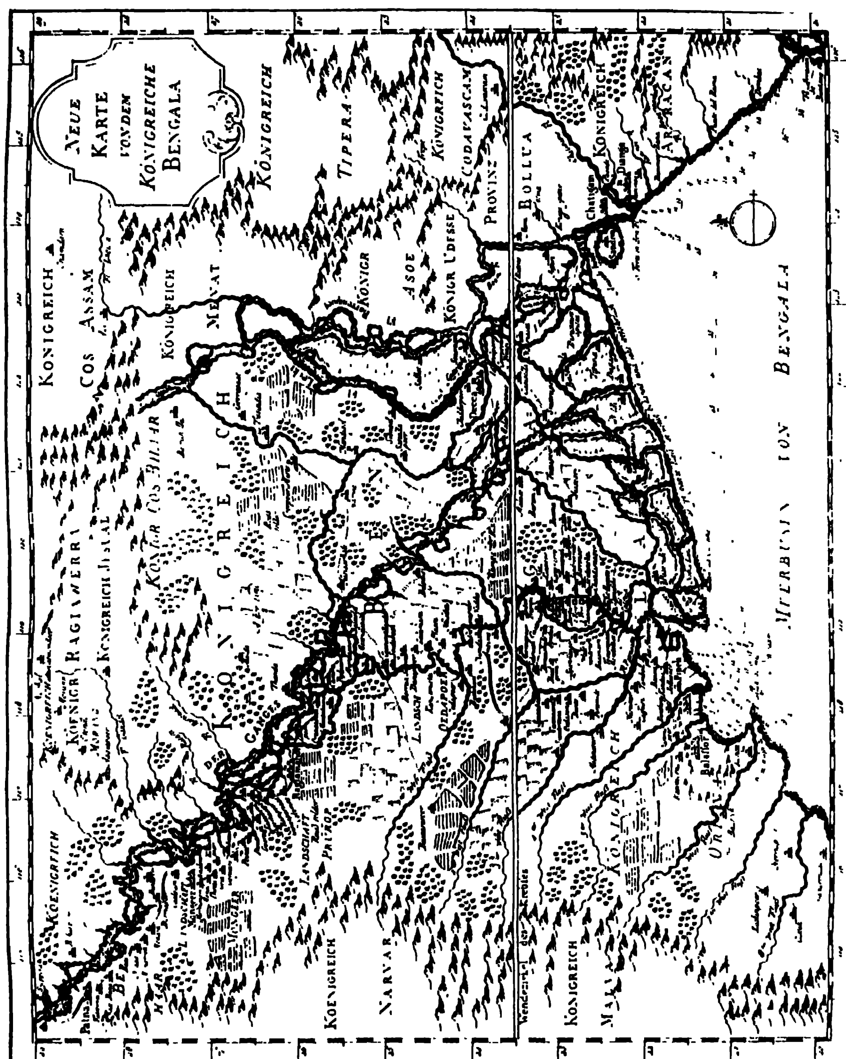
## মানচিত্র ১৩ : মুগল সাম্রাজ্যের পতন এবং বৃটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির উত্থানকালে বাঙ্গালা : ১৭০৭-১৭৬৬

মুগল আমলে বাঙ্গালায় স্বায়ত্তশাসনের কারণে দিল্লীর প্রত্যক্ষ শাসনের বাইরে এই প্রদেশের পৃথক একটি মর্যাদা ছিল। এই পরিস্থিতি বৃটিশদের কেন্দ্র ও প্রদেশ থেকে অধিকতর রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক সুবিধা আদায়ের পথ প্রশস্ত করেছিল। বৃটিশরাও ক্রমাগত স্থানীয় রাজনৈতিক ক্ষমতার বলয়ে ষড়যন্ত্র ও কূটচাল দ্বারা অনুপ্রবেশ করতে থাকে। ফলে ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে বৃটিশদের কাছে বাঙ্গালার নবাবের পতন ঘটে। বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রকারান্তরে বাঙ্গালার শাসনক্ষমতা দখল করে। ১৭৬৫ সালে মুগলদের নিকট হতে সুবা বাঙ্গালার 'দীউয়ানি' ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে বৃটিশরা প্রদেশটির রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব এবং বিচার আচার পরিচালনার ক্ষমতা লাভ করে।

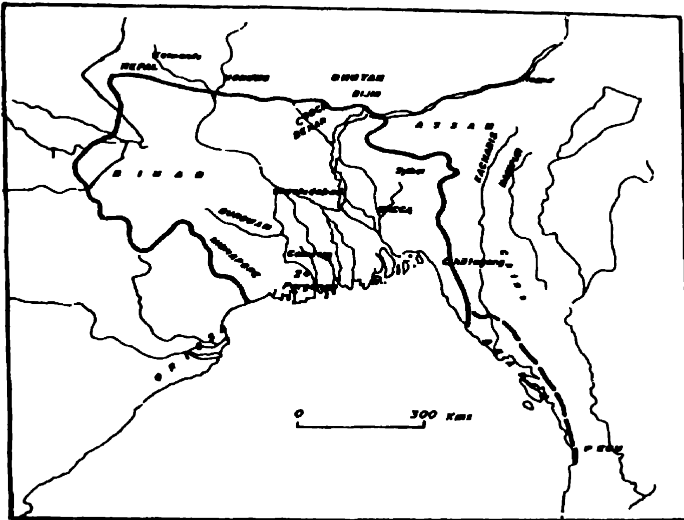
এই সময়ে বাঙ্গালায় সীমানার বিস্তৃতি মানচিত্র ১৩-তে দেখানো হয়েছে।

Rennell's Map of Bengal

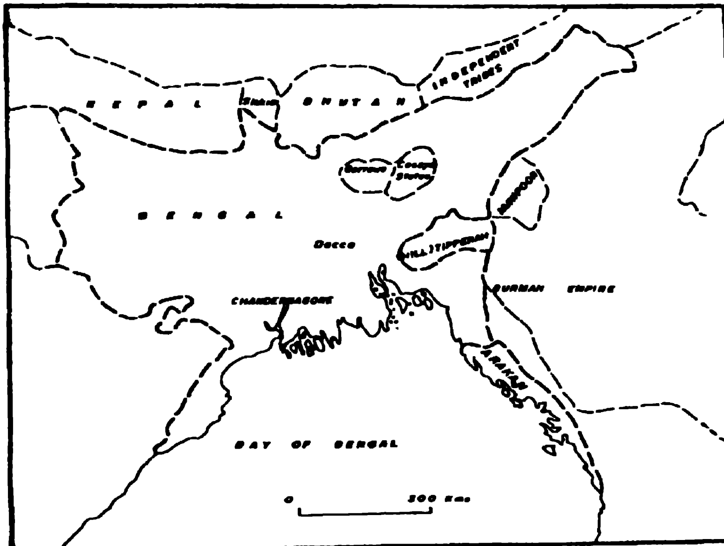
মানচিত্র- ১২ক


NEUE KARTE VON DEN KÖNIGREICHE BENGALA
KONIGREICH
COS ASSAM
TIPERA
KÖNIGREICH
CODAVASCAM
PROVINZ
BOLLUA
KONIGREICH
ARRACAN
KÖNIGR COS BILIAR
KONIGREICH JESUAL
NARVAR
KOENIGREICH
KÖNIGREICH
ORIXA
MEERBUSEN VON BENGALA

মানচিত্র- ১২খ




মানচিত্র- ১৩




মানচিত্র- ১৪

### মানচিত্র ১৪ : ১৮৫৭ খৃস্টাব্দে বাঙ্গালা

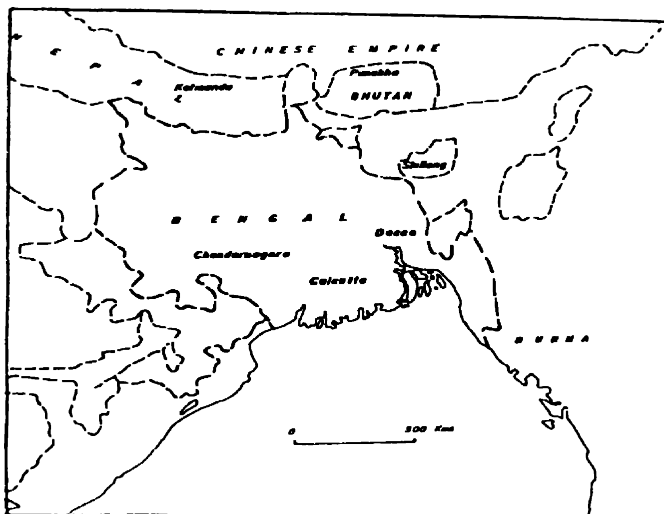
১৮৫৭ সালের মধ্যে বৃটিশরা ভারতে তাদের প্রশাসনিক ক্ষমতাবলয় পাকাপোক্ত করে তুলে। বাঙ্গালার এই প্রশাসনিক ব্যবস্থায় 'বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি'র সৃষ্টি হয়। এই প্রশাসনিক ব্যবস্থায় বাঙ্গালার বিস্তৃতিকে পাল আমলের বাঙ্গালার সাথে তুলনা করা চলে। 'বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি' সমগ্র বিহার, উত্তর-পূর্ব উড়িষ্যার অংশবিশেষ, মূল বাঙ্গালা প্রদেশ, সমগ্র আসাম এবং আরাকানের অংশবিশেষ নিয়ে গঠিত হয়। পূর্বদিকে বেশকিছু উপজাতীয় এলাকা এই এলাকার বাইরে রাখা হয়।

### মানচিত্র ১৫ এবং ১৬ : ১৮৫৭-১৯০৪ খৃস্টাব্দে বাঙ্গালার আয়তনগত পরিবর্তন এবং ১৯০৫ খৃস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ

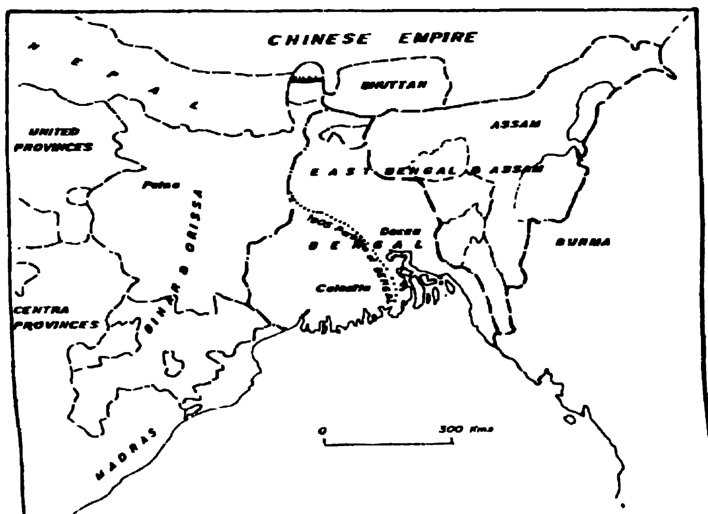
১৮৫৭ সালের মহাবিপ্লব (সিপাহি বিপ্লব) ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের সমাপ্তি ঘটায় এবং এরপর বৃটিশরাজ শাসন শুরু হয়। ফলে ভারতের বিভিন্ন স্থানে আয়তনগত এবং সীমানাগত পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনের কারণ কিছুটা রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক ছিল। এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ছিল প্রশাসনিক সংস্কারের নামে ১৯০৫ সালে বাঙ্গালার বিভক্তি। এই পুনর্গঠনের মধ্যে পরবর্তীকালে গঠিত 'পূর্ব বাংলা'র বীজ রোপিত হয়েছিল। 'পূর্ব বাংলা এবং আসাম' নামে গঠিত এই নতুন প্রদেশের বিস্তৃতিকে ইয়েট্স (ভারতীয় আদমশুমারি কমিশনার)-এর ১৯০১ সালে প্রণীত 'নদী উপত্যকা পরিকল্পনার সাথে তুলনা করা যায়। তখন এই প্রদেশের আয়তন ছিল ২৭৬,০০০ বর্গ কি. মি. এবং জনসংখ্যা ছিল ৩১ মিলিয়ন (৫৯.৩% মুসলমান, ৩৯.০% হিন্দু এবং ১.৭% অন্যান্য)।

### মানচিত্র ১৭ ও ১৮ : বৃটিশ শাসনের শেষলগ্নে বাংলা, ১৯১২-১৯৪৭ এবং পাকিস্তান আমলে বাংলা, ১৯৪৭-১৯৭১

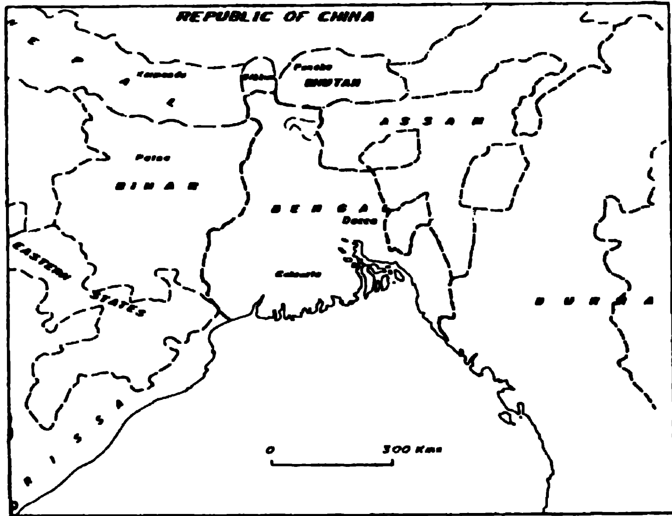
কলকাতাকেন্দ্রিক হিন্দু মধ্যবিত্তদের প্রচণ্ড বিরোধিতার মুখে বৃটিশরা ১৯১২ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু তখন একীভূত বাংলা ১৯০৫পূর্ব আকার লাভ করে নি। খণ্ডিত বাংলা পুরোপুরি বাংলা ভাষাভাষী অধ্যুষিত এলাকায় পরিণত হয় এবং আসাম, বিহার ও উড়িষ্যা পৃথক প্রদেশের মর্যাদা লাভ করে। ফলে খণ্ডিত নতুন বাংলা সমভাষাসম্পন্ন কিন্তু ধর্মীয়ভাবে পৃথক দু'টি বাংলায় অর্থাৎ হিন্দুপ্রধান পশ্চিম বাংলা এবং মুসলমানপ্রধান পূর্ব বাংলায় বিভক্ত হয়ে যায়। হিন্দুপ্রধান পশ্চিম বাংলা অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত অবস্থা বিবেচনায় সুবিধাজনক অবস্থান লাভ করে।



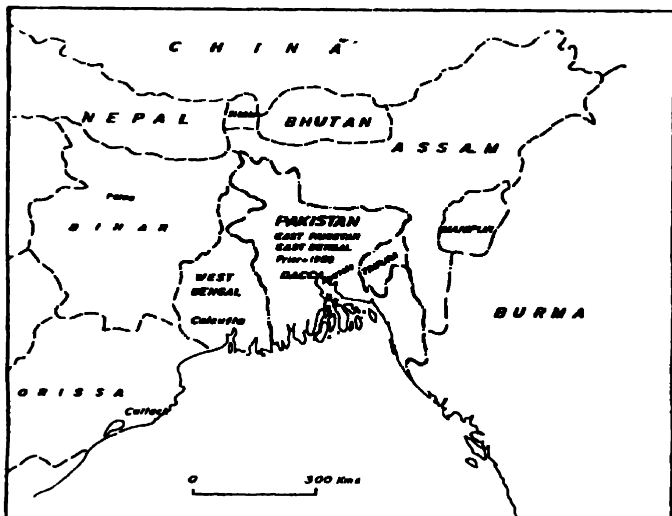

মানচিত্র- ১৫



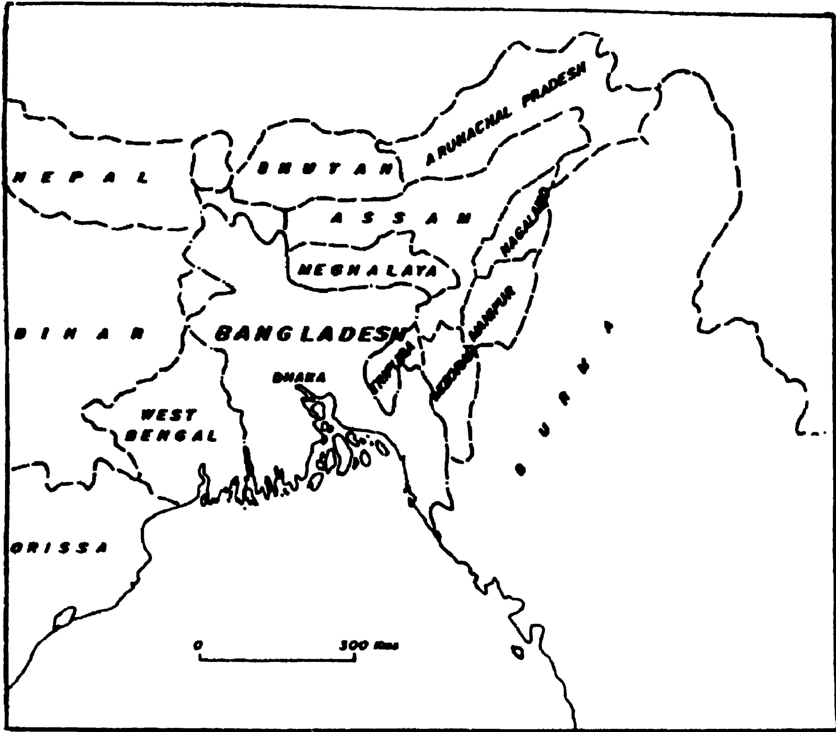

মানচিত্র- ১৬




মানচিত্র- ১৭




মানচিত্র- ১৮




মানচিত্র- ১৯

উপরোক্ত পরিস্থিতি পূর্ব বাংলার অধিবাসীদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি করে, যা বাংলার ইতিহাসে প্রথম ধর্মকেন্দ্রিক রাজনৈতিক ধারার সূচনা করে। মুসলমানরা এ সময় 'পাকিস্তান' নামে পৃথক রাষ্ট্র অর্জনের আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়। কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার এই যে, উপরোক্ত আন্দোলনে বাংলার ভৌগোলিক বিবেচনা সম্ভবত কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে নি এবং র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে তড়িঘড়ি বাংলাকে বিভক্ত করার পর বাংলার নতুন রাজনৈতিক এলাকা নিয়ে গঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান। বৃহত্তর বাংলার ঘনবসতিপূর্ণ এবং কৃষিনির্ভর ১৪৪ বর্গ কি. মি. আয়তন এবং ৪২ মিলিয়ন জনসংখ্যাবিশিষ্ট এলাকাকে অপেক্ষাকৃত জনবিরল ও অর্থনৈতিক দিক থেকে সম্ভাবনাময় অঞ্চল, যেমন, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা, উত্তরের চা-বাগান এলাকা এবং হুগলী-কলকাতার শিল্পএলাকার একাংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়।

'র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল : (ক) জটিল এবং অনিয়মতান্ত্রিক এলাকা ও রাজ্যসমূহের সীমানা সহজতর করা, (খ) প্রধান ধর্মীয় জনগোষ্ঠী অর্থাৎ হিন্দু ও ইসলাম

ধর্মাবলম্বীদের সুবিন্যস্ত করা, এবং (গ) রাজনৈতিক বিভাগ ও রাজ্যগুলির শাসকদের ধর্ম অনুযায়ী উপমহাদেশ ভাগ করা।

পাকিস্তান আমলে (১৯৪৭-৭১) পূর্ববঙ্গ বা পূর্ব বাংলা নামটি ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত বহাল ছিল। ১৯৫৬ সালে এর নামকরণ করা হয় পূর্ব পাকিস্তান। অতঃপর ১৯৭১ সাল পর্যন্ত তা পাকিস্তানের একটি প্রদেশ হিসেবে পরিচিত ছিল।

**মানচিত্র ১৯ : বাংলাদেশ, ১৯৭১**

ষাটের দশকের শেষের দিকে এবং সত্তরের দশকের প্রারম্ভে পাকিস্তানে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ব্যাপক রূপ লাভ করে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ দলের ছয় দফা আন্দোলনের ভিত্তিতে নিরঙ্কুশ বিজয় সত্ত্বেও পাকিস্তানের সামরিক শাসক নির্বাচনের রায় অনুযায়ী রাজনৈতিক ক্ষমতা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে অর্পণ করতে গড়িমসি করতে থাকে। তারা ক্ষমতা হস্তান্তরের বদলে পূর্ব বাংলায় সামরিক অভিযান শুরু করে। ফলে পাকিস্তানের এই অঞ্চলে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। ১৯৭১-এর ডিসেম্বরে এই যুদ্ধে বাঙালিদের বিজয়ের মাধ্যমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের উদ্ভব হয়।

**উপসংহার**

দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত উপমহাদেশের পূর্বদিকের রাজ্যসমূহে প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকাল পর্যন্ত রাজনৈতিক ভূগোলের পরিবর্তন লক্ষণীয়। এক সময় প্রায় সমগ্র এলাকায় মুসলিম আধিপত্য নিরঙ্কুশ ছিল। পরবর্তীকালে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন সমগ্র অঞ্চলে বিস্তৃতি লাভ করে। ঔপনিবেশিক শাসন বাংলার জন্য ঐক্য এবং অনৈক্য উভয়ই সৃষ্টি করে। এক সময়কার বাংলার রাজনৈতিক বিস্তৃতি বিহার থেকে বার্মা (মায়ানমার) পর্যন্ত ছিল। এরপর বাংলার আয়তনের সঙ্কোচন শুরু হয়। ১৯০৫ সালে বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করা হয়। দ্বিতীয়বার এই বিভাজন ঘটে ১৯৪৭ সালে। বর্তমান বাংলাদেশের বিস্তৃতি ও সীমারেখা এই ভূ-ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফল মাত্র। সুবা বাংলার ৫১৬,০০০ বর্গ কি. মি. বিস্তৃতি, যা বিহার থেকে আসাম এবং নেপাল থেকে উড়িষ্যা পর্যন্ত জুড়ে ছিল, তার স্থানে বর্তমান বাংলাদেশ মাত্র ১৪৮,৩৯৩ বর্গ কি. মি. -এ পরিণতি লাভ করেছে। ১৯ শতকের প্রথম দিকে বৃটিশ বাংলার জনসংখ্যা ছিল ১৫ মিলিয়ন, কিন্তু বর্তমান বাংলাদেশ তথা ক্ষুদ্রাকার বাংলায় জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১২০ মিলিয়নে। এই বৈশিষ্ট্যের ভূ-রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া ভবিষ্যতে গবেষকদের জন্য নিরীক্ষার বিষয়।

বর্তমানে বাংলাদেশ ছয়টি প্রশাসনিক বিভাগ এবং ৬৪টি জেলায় বিভক্ত (মানচিত্র ২০)।

BANGLADESH

International Boundary
Division Boundary
District Boundary
Capital
Divisional Headquarters
District Headquarters
Rivers

0 60 Km

BAY OF BENGAL

মানচিত্র- ২০

## তথ্যসূত্র

চৌধুরী, সি. ই. ১৯৮৭, *বাংলাদেশে আদি বসতির উৎপত্তিস্থল*, দ্বাদশ বাংলাদেশ বিজ্ঞান সম্মেলন, ঢাকা : জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

জলিল, শে. আ. ১৯৮২, *স্বদেশ আমার, স্বজন আমার*, জামালপুর।

বন্দোপাধ্যায়, রা. দা. ১৯৭১, *বাঙ্গালার ইতিহাস* (১ম খন্ড), কলিকাতা।

মজুমদার, র. চ. ১৯৭৪, *বাংলাদেশের ইতিহাস* (১ম খন্ড), কলিকাতা।

রহিম, মু. আ., চৌধুরী, আ. ম. মাহমুদ, এ. বি. এম এবং ইসলাম, সি (সম্পা.) ১৯৯৫। *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ঢাকা।

রায়, নী. র. (১৩৮৬ ব), *বাঙ্গালীর ইতিহাস* (১ম খন্ড), কলিকাতা।

সুর, অ. ১৯৭৭, *বাঙ্গালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়*, কলিকাতা।

হাসান, ফা. ১৯৮২, *পিতৃভূমি ও স্বরূপ অন্বেষণ* (১ম খন্ড), ঢাকা।

Chakladar, H. C. 1963, *Geography of Kalidasa,* Calcutta: Indian Studies.

Chottopadhyaya, S. 1980, *The Periplus of Erythrean Sea and Ptolemy of Ancient Geography of India,* Calcutta: Prajna.

Dey, N. 1979, *The Geographical Dictionary of Ancient and Mediaeval India,* New Delhi: Cosmo.

Law, B. C. 1941. *India as Described in Early Texts of Buddhism and Jainism.* London: Luzac.

Majumder, R. C. 1963, *The History of Bengal,* Dacca, Dacca University Press.

Morrison. B. M. 1970, *Political Centres and Culture Regions in Early Bengal,* Tucsan: University of Arizone Press.

Rennell. J. 1976, *Memoir of a Map of Hindoostan on the Mughal Empire,* Calcutta: Editions Indian. (reprinted from 1793 edition).

Sarker, D. C. 1971, *Studies in the Geography of Ancient and Mediaeval India,* Delhi.

Schwartzberg. J. E. 1978, *A Historical Atlas of South Asia,* Chicago: Chicago University Press.

Shafer, P. 1954, *Ethnography of Ancient India,* Wiesbaden: Ottohartassowitz.

Sultana. S. 1993, *Rural Settlements in Bangladesh*, Dhaka: Graphosman.

Tarafdar, M. R. 1965, *Husain Shahi Bengal: A Socio-Political Study*, Dacca : Asiatic Society of Pakistan.

VER Hermann Haack, *Cartographic Archives, Selected Maps on Bengal and South Asia,* Gotha, Germany. (Selected collections).

# ঘটনাপঞ্জি

১৬৯০ জব চার্নক কর্তৃক সুতানুটি মৌজার চৌহদ্দিতে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যিক বসতি স্থাপনের বাদশাহী ফরমান লাভ। সরকারকে বাৎসরিক তিন হাজার টাকা রাজস্ব প্রদানের বিনিময়ে কোম্পানির বাংলায় বিনাশুল্কে বাণিজ্যের নতুন অধিকার লাভ।

১৬৯৫-৯৬ চন্দ্রকোনার (মেদিনীপুর) জমিদার শোভা সিংহ ও উড়িষ্যার আফগান নেতা রহিম খানের বিদ্রোহ এবং দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গে তাঁদের স্বাধীনতা ঘোষণা। বিদ্রোহ দমনে সুবাদার ইব্রাহিম খানের (১৬৯৫-৯৬) ব্যর্থতা।

১৬৯৮ বাংলার ক্রমাবনতিশীল আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁর পৌত্র মোহাম্মদ আজিম-আল-দীনকে (ওরফে আজিম-উশ-শান) বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন। নতুন সুবাদার মাত্র ষোল হাজার টাকার বিনিময়ে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে কলকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর এই তিনটি মৌজার মালিকানাস্বত্ব প্রদান করেন।

১৬৯৮-৯৯ স্থানীয় বিদ্রোহের পটভূমিতে মুগল সরকার কর্তৃক ইউরোপীয় বাণিজ্যিক বসতিসমূহে প্রতিরক্ষা দুর্গ স্থাপনের অনুমতি দান। বৃটিশ বসতি কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ, ফরাসী বসতি চন্দননগরে অরলিন্স দুর্গ এবং ওলন্দাজ বসতি চুঁচুড়ায় গুস্তাবাস দুর্গ স্থাপন।

১৭০০ কলকাতা ফোর্ট উইলিয়মকে কেন্দ্র করে বাণিজ্য-ব্যবস্থাপনার জন্য মাদ্রাজ থেকে পৃথক হয়ে কোম্পানির নতুন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি স্থাপন। কারতালাব খান ওরফে মুর্শিদকুলী খানকে দিল্লীর বাদশাহ কর্তৃক বাংলার দীউয়ান নিয়োগ।

১৭০২ দু'টি প্রতিদ্বন্দ্বী ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একত্রিত হয়ে একটি যৌথ কোম্পানি গঠন। পূর্ণ নাম UNITED COMPANY OF MERCHANTS OF ENGLAND TRADING TO THE EAST INDIES। সুবা বাংলায় অবস্থিত সকল ইংরেজ বাণিজ্যকুঠি, যথা কলকাতা, কাশিমবাজার, বালাসোর, পাটনা, মালদহ এবং ঢাকা পুনর্গঠিত কোম্পানির অধীনে ন্যস্ত।

১৭০৪ সুবাদার আজিম-উশ-শান এবং দীউয়ান মুর্শিদকুলী খানের মধ্যে দ্বন্দ্ব মারাত্মক রূপ ধারণ করলে মুর্শিদকুলী তাঁর দীউয়ানি দপ্তর মুর্শিদাবাদে স্থানান্তর করেন। সম্রাটের নির্দেশে সুবাদার আজিম-উশ-শান ঢাকা ছেড়ে পাটনায় বসবাস শুরু করেন।

১৭০৭ সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যু। দিল্লীর মসনদ নিয়ে শাহজাদাদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ।

১৭১২ বাদশাহ শাহ আলমের মৃত্যু। পাঞ্জাব ও উত্তর ভারত থেকে আমলা-মুৎসুদ্দি আমদানি বন্ধ করে বাংলা থেকে আমলা-মুৎসুদ্দি শ্রেণী সৃষ্টি করে দেশ শাসনের নীতি গ্রহণ।

১৭১৩ বাংলায় মনসবদারি প্রথা বিলুপ্ত করে চুক্তিবদ্ধ চাকলাদারের মাধ্যমে রাজস্ব সংগ্রহ ও আইন-শৃংখলা রক্ষা করার ব্যবস্থা প্রবর্তন। এরপর থেকে মনসব একটি আলঙ্কারিক উপাধি হিসেবেই পরিগণিত হয়। এই নতুন ব্যবস্থায় বাংলায় অনেকগুলি বিশালায়তনের জমিদার পরিবার সৃষ্টি হয়। উদীয়মান অতিকায় জমিদারিগুলির মধ্যে ছিল রাজশাহী, বর্ধমান, দিনাজপুর, নদীয়া, চাচড়া, ইউসুফপুর, রুকুনপুর, মোমেনশাহী, রাজনগর, বীরভূম, বিষ্ণুপুর, ইত্যাদি। কালক্রমে সবক'টি পরিবারকে রাজা, মহারাজা, মহারাজাধিরাজ প্রভৃতি সামন্ত উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এদের মধ্যে একমাত্র বীরভূম পরিবার ছিল মুসলমান আর বাকি সব ছিল উচ্চবর্ণের হিন্দু।

১৭১৭ ইংরেজ কোম্পানিকে বাদশাহ ফররুখশিয়রের বিখ্যাত ফরমান প্রদান। উক্ত ফরমানবলে কোম্পানি বাংলায় বাণিজ্য করার জন্য অভূতপূর্ব সুযোগ-সুবিধা লাভ করে। ইতিপূর্বে প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধার অতিরিক্ত আরো অনেক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়। যেমন, কলকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর

মৌজার অতিরিক্ত আশেপাশে অবস্থিত আরো আটত্রিশটি মৌজার জমিদারি স্বত্ব বাৎসরিক আট হাজার টাকা রাজস্ব প্রদানের শর্তে কোম্পানিকে প্রদান; কোম্পানির মালামাল চুরি হলে তা উদ্ধার করে কোম্পানিকে ফেরৎ দিতে সরকারের বাধ্যবাধকতা; কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ থেকে পালিয়ে যাওয়া দেনাদার ও অন্যান্য অপরাধীদের কোম্পানির কাছে সোপর্দের জন্য সুবা সরকারের বাধ্যবাধকতা; মুর্শিদাবাদ টাঁকশাল থেকে কোম্পানির আমদানিকৃত ধাতব দিয়ে মুদ্রাকরণের অধিকারলাভ ইত্যাদি। মীর জাফর পর্যন্ত সব নবাবই নানা অজুহাতে এই সার্বভৌমত্ববিরোধী ফরমান কার্যকর করা থেকে বিরত থাকেন। কোম্পানি ও নবাবের মধ্যে ক্রমশ খারাপ সম্পর্কের এক বড় কারণ ছিল এ ফরমান।

১৭১৮ প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের জন্য মুর্শিদকুলী বাংলাকে ১৩টি চাকলা এবং চাকলাগুলিকে ১৬৬০টি গরগনায় বিভক্ত করেন। চাকলাগুলির নাম : বন্দর বালাসোর, হিজলী, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, হুগলী বা সাতগাঁও, ভূষণা, যশোর, আকবরনগর (রাজমহল), ঘোড়াঘাট, কুড়িবাড়ি, জাহাঙ্গীরনগর (ঢাকা), সিলেট, ইসলামাবাদ (চট্টগ্রাম)।

১৭২৩ মুর্শিদকুলীর সুপারিশে ফতেহচান্দ সম্রাট মোহম্মদ শাহ থেকে জগৎশেঠ উপাধি লাভ করেন। ইতিপূর্বে ফতেহচান্দ সম্রাট ফররুখশিয়রের কাছ থেকে লাভ করেন শেঠ উপাধি (১৭১৫)। ফতেহচান্দের পিতা ফররুখশিয়রের কাছ থেকে পেয়েছিলেন নগর শেঠ উপাধি।

১৭২৫-২৬ ব্যাপক মগ হামলা শুরু হয় ১৭২৫ সনের নভেম্বরে। চট্টগ্রাম ও ফেনী অঞ্চল পরপর দু'বার মগ লুটপাট ও হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়। মগ আক্রমণের মুখে জুগদিয়া (নোয়াখালী, বর্তমানে সাগরবক্ষে) থেকে কোম্পানির কুঠির লোকেরা ঢাকায় এসে আশ্রয় নেয়।

১৭২৬ কলকাতা নগরীর রাজস্ব বকেয়া (৪০০০ রুপী) রাখার দায়ে কোম্পানির উকিলকে মুর্শিদাবাদে আটক রাখা হয়। এ ইস্যুতে কোম্পানি ও নবাবের মধ্যে সম্পর্কের মারাত্মক অবনতি ঘটে এবং পরিশেষে ফতেহচান্দের মধ্যস্থতায় সঙ্কট নিরসন হয়।

১৭২৭ নবাব মুর্শিদকুলী খানের মৃত্যু এবং তদীয় পৌত্র (কন্যা পক্ষের) সরফরাজ খানের মসনদে আরোহণ। কিন্তু অচিরেই পিতা শুজাউদ্দিন খান তাঁকে উৎখাত করে সিংহাসন দখল করেন।

১৭২৮ রাষ্ট্র পরিচালনায় সাহায্য করার জন্য নবাব শুজাউদ্দিন কর্তৃক একটি পরামর্শক পরিষদ গঠন।

১৭৩৩ বিহারকে বাংলা সুবার অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং এর ফলে সর্বপ্রথম বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা একটি কেন্দ্রীয় সরকারের অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রশাসনিক সুবিধার জন্যে সমগ্র সুবাকে চারটি বিভাগে বিভক্ত করা হয়। যেমন— (১) সদর বিভাগ (পশ্চিম, মধ্য ও উত্তর বঙ্গের কিছু অংশ); (২) জাহাঙ্গীরনগর বা ঢাকা বিভাগ (পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গ ও উত্তর বঙ্গের কিয়দংশ, সিলেট ও ইসলামাবাদ বা চট্টগ্রাম; (৩) বিহার, এবং (৪) উড়িষ্যা। প্রথম বিভাগ সরাসরি উপদেষ্টা পরিষদ দ্বারা শাসিত এবং অন্যান্য প্রদেশের জন্য নিযুক্ত হয় নায়েব নাজিম।

১৭৩৯ নবাব সুজা খানের মৃত্যু এবং তদীয় পুত্র সরফরাজ খানের পুনরায় সিংহাসনলাভ।

১৭৪০ বিহারের শাসনকর্তা এবং সুজা খানের পরামর্শক পরিষদের অন্যতম সদস্য আলিবর্দী খান কর্তৃক ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সরফরাজকে উৎখাত করার পরিকল্পনা এবং গিরিয়ার যুদ্ধের মাধ্যমে সুবা বাংলার মসনদ দখল।

১৭৪২ ভাস্কর পণ্ডিতের নেতৃত্বে মারাঠা বা বর্গী হামলা—প্রথম আক্রমণের শিকার বর্ধমান ও বীরভূম।

১৭৪৫ নবাব আলিবর্দী খানের আফগান সেনাদের বিদ্রোহ।

১৭৪৮ নবাবের আফগান সেনাদের পুনরায় বিদ্রোহ।

১৭৫৬ নবাব আলিবর্দী খানের মৃত্যু এবং সিরাজউদ্দৌলার সিংহাসনে আরোহণ। শওকত জং নিজে সিংহাসনের দাবিতে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। মুর্শিদাবাদ দরবার অঘোষিতভাবে দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি সিরাজের পক্ষে, আরেকটি তাঁর বিপক্ষে।

১৭৫৬ বিক্রমপুরের রাজনগর পরগনার জমিদার রাজা রাজবল্লভ হিন্দু পণ্ডিতদের সম্মেলন ডেকে হিন্দু বিধবা বিবাহের পক্ষে শাস্ত্রবাণী লাভ করেন।

১৭৫৬ নবাব সিরাজউদ্দৌলা কর্তৃক কলকাতা দখল (১৬ জুন)।

১৭৫৭ কোম্পানির সঙ্গে সিরাজউদ্দৌলার সন্ধি, ফেব্রুয়ারি ৯। শর্ত : মুগল সরকার কর্তৃক কোম্পানিকে প্রদত্ত পূর্বেকার সকল চুক্তি পুনর্বহাল; সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত কোম্পানির কলকাতা, কাশিমবাজার ও ঢাকা কুঠিসমূহ কোম্পানিকে যথাবিহিত ফেরত প্রদান; কোম্পানির কুঠি ও সম্পত্তি দখল করার ফলে যে ক্ষতি সাধিত হয়েছে তা পূরণ। ১৯ মে কোম্পানির সঙ্গে মীর জাফর-জগৎশেঠের ষড়যন্ত্রচুক্তির শর্ত : ৯ ফেব্রুয়ারি সন্ধির অতিরিক্ত ২৪-পরগনা দান, আরো উদার হারে ক্ষতিপূরণ দান, কোম্পানির বিভিন্ন সামরিক-বেসামরিক নেতাদের আর্থিক পুরস্কার প্রদানের অঙ্গীকার।

১৭৫৭ জুন ২৩ পলাশীর যুদ্ধ।

১৭৫৮ ২৪-পরগনা কোম্পানিকে হস্তান্তর।

১৭৬০ কোম্পানিকে দেয় সমুদয় ঋণ পরিশোধ বাবদ চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর ও বর্ধমান এই তিনটি জেলা কোম্পানিকে হস্তান্তর করার শর্তে মীর কাশিম নবাব হন।

১৭৬০-১৮০০ ফকির মজনু শাহ এবং তাঁর অনুসারীদের বৃটিশবিরোধী তৎপরতা। ফকির-সন্ন্যাসিদের প্রতিরোধ তুঙ্গে উঠেছিল ১৭৭০ ও '৮০-এর দশকে। ১৭৮৭ সনে মজনু শাহের মৃত্যুর পর বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন মুসা শাহ, চেরাগ শাহ, করম শাহ প্রমুখ। সর্বশেষ ফকির বিদ্রোহ ঘটে ১৭৯৯ সনে, যখন কোন এক শাহ বাহার 'স্বাধীনতা' ঘোষণা করে নিজেকে ভারতের 'বাদশাহ' বলে দাবি করেন।

১৭৬২ কোম্পানি ও কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বে-আইনি ও উৎপীড়নমূলক কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য কলকাতা ফোর্ট উইলিয়ম কর্তৃপক্ষের কাছে নবাব মীর কাশিমের চরমপত্র।

১৭৬৩ স্বাধীনচেতা নীতি অনুসরণের জন্য অচিরেই কোম্পানির সঙ্গে মীর কাশিমের বিবাদ শুরু।

১৭৬৪ দিল্লীর বাদশা ও আযোধ্যার নবাবের সাহায্যে মীর কাশিম ইংরেজদের উৎখাত করার শেষ চেষ্টা চালান। কিন্তু বক্সারের যুদ্ধে তিনি চূড়ান্তভাবে পরাজিত হন।

| | |
|---|---|
| ১৭৬৪ | সন্দ্বীপে জমিদার-তালুকদার বিদ্রোহ। জমিদার আবু তোরাব চৌধুরীর নেতৃত্বে কোম্পানির অত্যাচারমূলক রাজস্ব বন্দোবস্ত নীতির বিরুদ্ধে সন্দ্বীপ, হাতিয়া ও বামদি দ্বীপের জমিদার ও তালুকদারগণ বিদ্রোহ করে। |
| ১৭৬৫ | রবার্ট ক্লাইভ কর্তৃক দিল্লীর বাদশার কাছ থেকে কোম্পানির জন্য বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দীউয়ানি লাভ। শর্ত এই যে, সুবার রাজস্ব থেকে কোম্পানি দিল্লীর বাদশাকে প্রদান করবে বাৎসরিক ২৬ লক্ষ টাকা এবং নবাবকে দিবে ৫৩ লক্ষ টাকা। |
| ১৭৬৫-৭২ | সৈয়দ মোহাম্মদ রেজা খানকে নায়েব দীউয়ান এবং নায়েব নাজিম (যেহেতু নবাব নজমুদ্দৌলা নাবালক) নিযুক্ত করে ইঙ্গ-মুগল যৌথশাসন প্রতিষ্ঠা। |
| ১৭৬৯ | মুর্শিদাবাদ দরবারে একজন বৃটিশ 'রেসিডেন্ট' নিয়োগ ও রাজস্ব সংগ্রহ ব্যবস্থা পরিদর্শনের জন্য প্রতি জেলায় একজন ইংরেজ জেলাসুপারভাইজার নিয়োগের মাধ্যমে শুরু হয় বৃটিশ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগঠনের প্রাথমিক প্রক্রিয়া। |
| ১৭৬৯-৭০ | মহা দুর্ভিক্ষ, যার ফলে বাংলার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ মারা যায়। কিন্তু ঐ দুর্ভিক্ষে বাংলার পূর্বাংশ তেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি। |
| ১৭৭০ | রাজস্ব বন্দোবস্ত ও রাঁজস্ব সংগ্রহ ব্যাপারে কোম্পানির কর্তৃত্ব আরো সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে মুর্শিদাবাদে কম্পট্রোলিং কাউন্সিল অব রেভিনিউ স্থাপন। |
| ১৭৭১ | নায়েব দীউয়ান রেজা খান পদচ্যুত। জেলা সুপারভাইজারদের নতুন পদবি জেলা কালেক্টার। জেলা কালেক্টারকে রাজস্ব বন্দোবস্ত ও রাজস্ব সংগ্রহে ক্ষমতা প্রদান। |
| ১৭৭২ | ওয়ারেন হেস্টিংস ফোর্ট উইলিয়মের গভর্নর নিযুক্ত। কোম্পানি কর্তৃক সরাসরি দীউয়ানি শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ। |
| ১৭৭২-১৭৭৭ | ভূমিরাজস্ব সংগ্রহের চিরাচরিত প্রথা পরিত্যাগ করে নিলামের মাধ্যমে ইজারাদারদের সঙ্গে পাঁচ বছর মেয়াদি ভূমি বন্দোবস্ত। |
| ১৭৭৩ | রেগুলেটিং এ্যাক্টের আওতায় ওয়ারেন হেস্টিংস ফোর্ট উইলিয়মের গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত এবং রাষ্ট্র সাহায্য করার জন্য চার সদস্যের একটি কাউন্সিল গঠন। |

১৭৭৩ রেভিনিউ বোর্ড গঠন। সুবাকে পাঁচটি প্রদেশে বিভক্ত করে প্রতি প্রদেশের জন্য একটি প্রাদেশিক কাউন্সিল গঠন।

১৭৭৮ নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড (১৭৫১-১৮৩৯) প্রকাশ করেন প্রথম বাংলা ব্যাকরণ—গ্রামার অব দি বেঙ্গলি ল্যাংগুয়েজ।

১৭৭৬-৮৭ চাকমা রাজা জুয়ান বকশ ও রানু খানের নেতৃত্বে (প্রাক-বৃটিশ যুগে চাকমা ও অন্যান্য আদিবাসী অভিজাতেরা মুসলমানী নাম গ্রহণ করতো) পার্বত্য অঞ্চলের উপজাতীয়গণ বৃটিশ ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং গেরিলা পদ্ধতিতে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলে।

১৭৭৯-১৮০২ হেনরি পিটস্ ফরস্টার প্রণীত প্রথম বাংলা-ইংরেজি অভিধান—ভুকাবুলারি প্রকাশ।

১৭৮০-৮৩ হোমনাবাদ (কুমিল্লা) জমিদারদের বিদ্রোহ। পঞ্চসনা বন্দোবস্তের অধীনে ইজারাদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রায়তেরা আলি গাজী ও মুজাফফর গাজীর নেতৃত্বে হোমনাবাদ পরগনার কৃষকগণ কোম্পানি সরকারকে খাজনা দেয়া বন্ধ করে দেয় এবং 'নাসারা'দের দেশ থেকে উৎখাতের জন্য জেহাদ ঘোষণা করে।

১৭৮০ সিলেটে জাহাজ নির্মাণ শিল্প প্রতিষ্ঠা। উদ্যোক্তা, রবার্ট লিন্ডসে।

১৭৮০ গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস-এর উদ্যোগে কলকাতা মাদ্রাসা নামে একটি সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন। এর উদ্দেশ্য ছিল মূলত মুসলিম আইন বিষয়ে সরকারকে সাহায্য করার জন্য মুফতি-মৌলবি তৈরি করা। মুফতি মজিদ-আল-দীন মাদ্রাসার প্রথম অধ্যক্ষ।

১৭৮১ পরগনা দান্দ্রার (নোয়াখালী) জমিদার মোহাম্মদ আলি পার্শ্ববর্তী সকল জমিদারকে কোম্পানি সরকারের বিরুদ্ধে সংগঠিত করেন। তাঁর রচিত প্রতিরোধ আন্দোলনে সাড়া দেন বলদাখাল, গঙ্গামণ্ডল, পিটকারা, কড়োয়া, বিদ্যারবাদ, আমনাবাদ, সরাইল এবং হোমনাবাদ পরগনার জমিদরগণ।

১৭৮১ প্রাদেশিক কাউন্সিল ব্যবস্থা বিলুপ্ত। নিলামি ভূমি-বন্দোবস্ত রদ করে বার্ষিক বন্দোবস্ত ভিত্তিতে পুনরায় জমিদারি ব্যবস্থা প্রবর্তন।

| | |
|---|---|
| ১৭৮৩ | রংপুর কৃষক বিদ্রোহ। কোম্পানির রাজস্ব ইজারাদারদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ রায়তেরা ইজারাদার রাজা দেবী সিংহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। রাজস্ব বিদ্রোহ পরে বৃটিশ খেদা আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। বিদ্রোহীরা তাদের নেতা নূরলদীনকে 'নবাব' বলে ঘোষণা করে। |
| ১৭৮৩ | পূর্ববঙ্গে দুর্ভিক্ষ। |
| ১৭৮৪ | প্রাচ্যবিদ স্যার উইলিয়ম জোনস-এর উদ্যোগে এশিয়ার মানুষ ও প্রকৃতির উপর গবেষণার জন্য কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা। |
| ১৭৮৩-৯০ | সিলেটের খাসী উপজাতিদের সঙ্গে কোম্পানির সংঘর্ষ শুরু হয় যখন কালেক্টার লিন্ডসে তাদের সনাতন স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন। থেকে থেকে খাসীদের বিদ্রোহাত্মক কর্মকাণ্ড অব্যাহত থাকে ১৭৯০ সন পর্যন্ত, যখন তাদের অভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা মেনে নিয়ে একটি অলিখিত চুক্তি করা হয়। |
| ১৭৮৪ | পিটস ইন্ডিয়া এ্যাক্ট-এর অধীনে সর্বপ্রথম ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোর একটি স্থায়ী রূপরেখা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ। |
| ১৭৮৬ | গভর্নর জেনারেল হিসেবে লর্ড কর্নওয়ালিসের যোগদান এবং একটি স্থায়ী প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান-উপকরণ সংগ্রহের জন্য তাঁর নির্দেশ। |
| ১৭৮৭ | হাতিয়া দ্বীপের জমিদার মোহাম্মদ আকবর চৌধুরীর নেতৃত্বে রায়তেরা বিদ্রোহ করে। কোম্পানির ঠিকাদারের জন্য লবণ তৈরি না করার জন্য মুলঙ্গী বা লবণ শ্রমিকদের আহ্বান জানানো হয় এবং সাধারণ রায়তেরা কোম্পানির কোন ইজারাদারকে খাজনা না দেবার জন্য ঘোষণা প্রদান করে । |
| ১৭৮৮-৮৯ | একাধারে মহাপ্লাবন, জলোচ্ছ্বাস ও ভূমিকম্প পূর্ববঙ্গের প্রাকৃতিক পরিবেশে পরিবর্তন ঘটায় এবং দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করে। |
| ১৭৯০ | বার্ষিক রাজস্ব বন্দোবস্ত ব্যবস্থা রহিত করে জমিদারের সঙ্গে দশ বছর মেয়াদি ভূমি বন্দোবস্ত করা হয় এবং একই সঙ্গে ঘোষণা দেয়া হয় যে, কোর্ট অব ডিরেক্টর্স চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পরিকল্পনা অনুমোদন করলে এই দশসনা বন্দোবস্তকেই চিরস্থায়ী ব্যবস্থা হিসেবে ঘোষণা করা হবে। |

১৭৯১ হিন্দু আইন বিষয়ে দেশী পণ্ডিত তৈরি করার জন্য জোনাথান ডানকানের উদ্যোগে বেনারসে স্থাপিত হয় হিন্দু সংস্কৃত কলেজ।

১৭৯২ বাকেরগঞ্জের ফকির বলাকি শাহ ফিরিঙ্গি শাসনের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন।

১৭৯৩ দশসনা বন্দোবস্তকে চিরস্থায়ী ঘোষণা করা হয়। এর প্রধান প্রবক্তা গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিস। এ ব্যবস্থাধীনে জমিদারকে জমির একচ্ছত্র মালিক ঘোষণা করা হয়। জমিদার কর্তৃক সরকারকে প্রদেয় ভূমিরাজস্বের হার চিরকালের জন্য ধার্য করে দেয়া হলেও প্রজার উপর জমিদারের খাজনার হার পরিবর্তনশীল থাকে।

১৭৯৩-১৮০০ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অপারেশনে নবাবি যুগে উত্থিত প্রায় সব রাজা-মহারাজা-জমিদার পরিবারের পতন এবং এদের ধ্বংসস্তূপের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় বহু নতুন পরিবার, ইতিপূর্বে যারা ছিল ইউরোপীয়দের বানিয়া-মুৎসুদ্দি এবং জমিদারি আমলা।

১৭৯৯ 'হাফতম' (সপ্তম রেগুলেশন) আইনবলে ভূস্বামীরা খাজনা সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনে প্রজাদের দৈহিক নির্যাতন, এমনকি বাস্তুহারা করার অধিকার লাভ করে।

১৭৯৯ 'ফিরিঙ্গি হুকুমত'-এর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন সিলেটের মির্জা আগা মোহাম্মদ রেজা বেগ। জেহাদি বাহিনী নিয়ে তিনি প্রথম কাছাড় দখল করে সেখানে সামরিক ঘাটি স্থাপন করেন। বহু কামান-বন্দুক সংগ্রহ করে ১৪ জুলাই তারিখে থানা বিন্দাশালে তিনি কোম্পানির সেনাবাহিনীর সঙ্গে এক সম্মুখ সমরে লিপ্ত হন। যুদ্ধে তাঁর বাহিনী পরাজিত হয় এবং তিনি আহতাবস্থায় বন্দি হন। কলকাতায় তাঁর বিচার হয় এবং রাষ্ট্রদ্রোহিতার জন্য তিনি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

১৮০০ নবাগত বৃটিশ সিভিলিয়ানদের এদেশের প্রশাসন, ইতিহাস-ঐতিহ্য ও ভাষা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেবার জন্য লর্ড ওয়েলেসলি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ।

১৮০০ দেশের সকল বিক্ষুব্ধ জমিদার, তালুকদার এবং বিহার ও উত্তর ভারতের বৃটিশবিরোধী পরিবারদের সঙ্ঘবদ্ধ করে একটি দেশব্যাপী বৃটিশবিরোধী অভ্যুত্থান ঘটানোর জন্য পরিকল্পনা করেন ঢাকার নায়েব নাজিম নসরত জং-এর ভ্রাতা নবাব শামসউদ্দৌলা। কিন্তু পরিকল্পনাটি ফাঁস হয়ে গেলে তিনি বন্দি হন এবং রাষ্ট্রদ্রোহিতার জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। কয়েক বছর কারাবাসের পর মানবিক কারণে তাঁকে মুক্তি দিয়ে ঢাকায় নজরবন্দি করা হয়।

১৮১৩ মুগল আমলে শিক্ষাদান ছিল একটি সরকারি দায়িত্ব, কিন্তু সে দায়িত্ব পালনে কোম্পানিসরকার বিরত থাকে। কোম্পানির চার্টার আইন নবায়নকালে বৃটিশ দার্শনিক ও রাজনীতিক উইলবারফোর্সের তদবিরে আইন করে কোম্পানিসরকারকে বাধ্য করা হয় জনগণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য বছরে ন্যূনতম এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ দিতে।

১৮১৩ ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য-সুবিধা বিলোপ দ্বারা অবাধ বাণিজ্যের জন্য ভারতকে উন্মুক্ত করে দেয়া হয় এবং ভারতের উপর বৃটিশ সার্বভৌমত্ব ঘোষিত হয়।

১৮১৫ আত্মীয় সভা গঠনের মাধ্যমে রামমোহন রায়-এর সংস্কার আন্দোলন শুরু।

১৮১৭ হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষাবিস্তারের লক্ষ্যে রাজা রাধাকান্ত দেব ও কলকাতার আরো অনেক নেতৃস্থানীয় হিন্দু ভদ্রলোকের উদ্যোগে স্থাপিত হয় হিন্দু কলেজ।

১৮১৭ ডেভিড হেয়ারের প্রচেষ্টায় স্থাপিত হয় কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি।

১৮১৭-১৮ কলকাতায় প্রথম কটন মিল স্থাপন।

১৮১৮ *বেঙ্গল গেজেটি* নামে প্রথম বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশ। একই সনে প্রকাশিত হয় *সমাচার দর্পণ*, বাংলা মাসিক *দিগদর্শন*, সাপ্তাহিক *সমাচার দর্পণ* এবং মাসিক *ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া*।

১৮১৯ পত্তনি আইন জারি। এর ফলে ভূমিনিয়ন্ত্রণে মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীর বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

| | |
|---|---|
| ১৮২৩ | শিক্ষানীতি নির্ধারণ ও শিক্ষাপ্রসারের উদ্দেশ্যে জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন স্থাপন। |
| ১৮২৩ | কলকাতায় রক্ষণশীল হিন্দু ভদ্রলোকদের দ্বারা গৌড়ীয় সমাজ স্থাপিত। |
| ১৮২৩ | কলকাতা খিদিরপুর ডকই 'ডায়না' নামক প্রথম বাষ্পীয় জাহাজ নির্মাণ। |
| ১৮২৪ | বারাকপুর সিপাহি বিদ্রোহ। |
| ১৮২৫ | ঢাকা নগরের রমনা রেসকোর্স (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান)-এর পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন। এর পরিকল্পক ঢাকা জেলা কালেক্টার মি. ডোস। |
| ১৮২৪-৩৩ | বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার উত্তরাংশে বিশেষকরে বর্তমান জামালপুর-শেরপুর জেলায় দেওয়ানা বা পাগলপন্থী নামে পরিচিত ফকিরদের নেতৃত্বে কৃষক বিদ্রোহ। এর কারণ ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর নব্য জমিদার ও ইজারাদারদের ক্রমাগত খাজনাবৃদ্ধির প্রবণতা। বিদ্রোহের নেতা ছিলেন টিপু শাহ। |
| ১৮২৭-৩১ | বাংলায় তরিকায়ে মুহাম্মদীয়া মতবাদের প্রবর্তক সৈয়দ নিসার আলী ওরফে তিতুমীরের সংস্কার আন্দোলন এক পর্যায়ে কৃষক বিদ্রোহের রূপ নেয় এবং ইংরেজের বিরুদ্ধে এক সশস্ত্র সংগ্রামে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। |
| ১৮২৮ | রামমোহন রায় কর্তৃক ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা। |
| ১৮২৮ | ডিরোজিও কর্তৃক একাডেমিক এ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা। |
| ১৮২৮ | লর্ড উইলিয়ম বেন্টিংক গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত। |
| ১৮২৮ | বাদশাহী যুগে প্রদত্ত লাখেরাজ বা নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্ত করার আইন প্রণয়ন। |
| ১৮২৮ | হিন্দুধর্মের সতী প্রথাকে মানবিক ও সামাজিক অপরাধ ঘোষণা করে আইন প্রণয়ন। |
| ১৮২৯ | সরকারের নির্দেশে মুসলমান সমাজে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের জন্য কলকাতা মাদ্রাসার পাঠ্যক্রমে ঐচ্ছিক এবং অতিরিক্ত বিষয় হিসেবে ইংরেজি ভাষা চালু। |

| | |
|---|---|
| ১৮২৯ | সর্বপ্রথম দেশীয় বিদগ্ধজনেরা কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি'র পূর্ণ সদস্যপদের জন্য আবেদন করার অধিকার লাভ করেন। এ বছর চারজন বাঙালি এই প্রতিষ্ঠানের সদস্যপদ লাভ করেন। তাঁরা হলেন প্রসন্নকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, শীবচন্দ্র দাস, রাসময় দত্ত ও রামকমল সেন। |
| ১৮৩০ | কলকাতায় রক্ষণশীল হিন্দু ভদ্রলোকগণ কর্তৃক ধর্মসভা প্রতিষ্ঠা। সভাপতি রাজা রাধাকান্ত দেব। |
| ১৮৩০ | বাষ্পীয় জাহাজের উন্নয়নে ক্যালকাটা ডকিং কোম্পানি প্রতিষ্ঠা। |
| ১৮৩০ | কোল উপজাতি বিদ্রোহ। |
| ১৮৩৩ | প্রশাসনিক সুবিধার জন্য বাংলায় একজন ডেপুটি গভর্নর নিয়োগ। |
| ১৮৩৩ | ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যিক কার্যক্রম বিলুপ্ত। |
| ১৮৩৪ | প্রিন্সিপাল সদর আমিন নামে দেশীয় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ। |
| ১৮৩৪ | কলকাতা চেম্বার্স অব কমার্স প্রতিষ্ঠা, ১৮৫৩ সালে এর নামকরণ করা হয় বেঙ্গল চেম্বার্স অব কমার্স। |
| ১৮৩৫ | প্রাচ্যভাষায় প্রাচ্যবিদ্যা শিক্ষাদানে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা প্রত্যাহার করে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষাদান নীতি গ্রহণ। |
| ১৮৩৫ | কলকাতা মাদ্রাসা ও সংস্কৃত কলেজে প্রাচ্য ঔষধশাস্ত্র শিক্ষাদান বিলুপ্ত করে পাশ্চাত্য ঔষধশাস্ত্র শিক্ষাদানের জন্য কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন। |
| ১৮৩৬ | কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা। |
| ১৮৩৬ | মোহসীন ট্রাস্ট ফান্ডের আয় থেকে হুগলী কলেজ স্থাপন। |
| ১৮৩৭ | জমিদারি এ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা। বাংলা তথা ভারতের প্রথম রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রণোদিত সমিতি। উদ্যোক্তা রাজা রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, ভবানীচরণ মিত্র। ১৮৩৮ সনে এর নতুন নামকরণ হয় ল্যান্ডহোল্ডার্স সোসাইটি। সম্পাদক, প্রসন্ন কুমার ঠাকুর। |

১৮৩৮ ইয়ং বেঙ্গলগণ কর্তৃক তাদের সংগঠন সোসাইটি ফর দি একুইজিশন অব নলেজ প্রতিষ্ঠা।

১৮৩৯ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠা।

১৮৩৯ আসাম কোম্পানির উদ্যোগে প্রথম চা-বাগান পত্তন।

১৮৪০ ফরায়জী আন্দোলনের নেতা হাজি শরীয়তউল্লাহর মৃত্যু।

১৮৪০ ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল প্রতিষ্ঠা।

১৮৪১ ঢাকা কলেজ প্রতিষ্ঠা।

১৮৪৩ বেঙ্গল বৃটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি প্রতিষ্ঠা। উদ্যোক্তা জর্জ টমসন (সভাপতি), প্যারীচাঁদ মিত্র (সম্পাদক)। উদ্দেশ্য, বৃটিশ শাসনের মঙ্গলকামনা, বৃটিশ ও দেশীয়দের মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপন।

১৮৪৩ দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা* প্রকাশ।

১৮৪৪ সরকারি চাকুরির জন্য ইংরেজি ভাষায় জ্ঞান অত্যাবশ্যক ঘোষণা।

১৮৪৫ কৃষ্ণনগর কলেজ প্রতিষ্ঠা।

১৮৪৭-৪৮ বিশ্ববাজারে মন্দা। ব্যাঙ্কিং ব্যবসায় সঙ্কট, ইউনিয়ন ব্যাঙ্কসহ অনেক অর্থপ্রতিষ্ঠান দেউলিয়া ঘোষণা।

১৮৪৮ লর্ড ডালহৌসী গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত।

১৮৪৯ বেথুন ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে কলকাতায় হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন।

১৮৫১ বাঙালিদের মধ্যে জাতীয় চেতনা সৃষ্টির জন্য ন্যাশনাল এ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা। সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। বৃটিশ এবং কলকাতার ভদ্রলোকদের কাছে 'ন্যাশনাল' শব্দটি গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় অচিরেই এর নামকরণ করা হয় বৃটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন।

১৮৫৩ কলকাতায় রাজেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ প্রতিষ্ঠা।

১৮৫৩ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে নিয়োগ শুরু।

১৮৫৪ সরকারের শিক্ষানীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন আনয়ন। পরিবর্তনের মধ্যে ছিল শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি শিক্ষা পরিদপ্তর স্থাপন; কলকাতায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা; নিম্ন পর্যায়ে দেশী ভাষার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে আর্থিক সাহায্যসহ নানাভাবে উৎসাহিত করা; বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারি মঞ্জুরি দেয়া; প্রতি জেলা ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে একটি করে সরকারি স্কুল বা কলেজ বা উভয়ই স্থাপন করা।

১৮৫৪ বাংলার ডেপুটি গভর্নরের পদ বিলুপ্ত করে অধিকতর ক্ষমতা প্রদান করে একজন লেফটেন্যান্ট গভর্নর নিয়োগ।

১৮৫৪ ন্যায্যমূল্যের স্ট্যাম্পে ডাক যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রবর্তন।

১৮৫৫ কলকাতা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন।

১৮৫৫ কলকাতা থেকে হুগলী নদীর কয়েক মাইল উজানে রিশরা নামক স্থানে পাটকল স্থাপন। উদ্যোক্তা, বিশ্বম্ভর সেন ও জর্জ

১৮৫৫ হিন্দু কলেজের নতুন নামকরণ করা হয় প্রেসিডেন্সী কলেজ।

১৮৫৫-৫৭ সাঁওতাল বিদ্রোহ। প্রাথমিকভাবে এ বিদ্রোহ ছিল মহাজন ও ইজারাদারদের বিরুদ্ধে। পরে তা বৃটিশবিরোধী বিদ্রোহে রূপ নেয়।

১৮৫৬ দি মোহামেডান এ্যাসোসিয়েশন (আঞ্জুমান-ই-ইসলামী) প্রতিষ্ঠা। এটি ছিল বাংলা তথা ভারতের মুসলমানদের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন। সভাপতি ফজলুর রহমান, সম্পাদক মোহাম্মদ মাজহার। উদ্দেশ্য বৃটিশের প্রতি মুসলমানের আস্থা জ্ঞাপন, মুসলমান সমাজে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার।

১৮৫৭ সিপাহি বিদ্রোহ। বাংলায় কোম্পানিসরকার এবং সিপাহিদের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ প্রায় ঘটে নি বললেই চলে। তবে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেটে সিপাহিরা সরকারি প্রতিহিংসার ভয়ে দলবদ্ধভাবে ক্যান্টনমেন্ট ত্যাগ করেছিল। জমিদারসমাজ, পত্র-পত্রিকা ও ভদ্রলোক জনমত ছিল বিদ্রোহের বিপক্ষে।

১৮৫৮ কোম্পানি শাসন অবলুপ্ত করে বৃটিশ ভারত সরাসরি বৃটিশ সরকারের অধীনে ন্যস্ত।

১৮৫৮ বৃটেনের ভারত নীতি বিষয়ে রাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা— রাজ্যবিস্তার নীতি পরিত্যক্ত, ধর্মনিরপেক্ষতা, সকল ধর্ম-বর্ণের ভারতীয়দের অধিকার সংরক্ষণ, রাজনৈতিক, ধর্মীয় বা অন্য কোন কারণে দলন ও দমননীতির বিরুদ্ধে অঙ্গীকার।

১৮৫৯ ভূমিতে কোন কোন শ্রেণীর প্রজার সীমিত স্বত্ব স্বীকার করে খাজনা আইন পাশ (Rent Act X, 1859)।

১৮৫৯-৬১ নীল বিদ্রোহ। নীলকরদের অত্যাচার ও শোষণমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নীলচাষীদের ব্যাপক প্রতিরোধ আন্দোলন। এ বিদ্রোহের পক্ষে জমিদার-জোতদার সমাজের সহানুভূতি থাকলেও পত্র-পত্রিকা ও পেশাদার মধ্যবিত্ত শ্রেণী তেমন সমর্থন দেয় নি। বিদ্রোহের ফলে অচিরেই বাংলায় নীলচাষের অবসান ঘটে।

১৮৬০ ঢাকায় দীনবন্ধু মিত্রের *নীল দর্পণ* নাটক বেনামে প্রকাশ। নাটকটির পুরো নাম *নীলদর্পনং নাম নাটকম।*

১৮৬০ ইন্ডিয়ান পেনাল কোড প্রণীত।

১৮৬১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম। মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধকাব্য' প্রকাশ।

১৮৬১ ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস এ্যাক্ট পাশ।

১৮৬১ ইন্ডিয়ান কাউন্সিল এ্যাক্ট-এর অধীনে বেঙ্গল লেজিসলেটিভ এসেম্বলি প্রবর্তিত। মনোনীত বারো সদস্যবিশিষ্ট এই পরিষদে চার জন সদস্য ছিলেন সরকারি কর্মকর্তা, চার জন সরকারবহির্ভূত ইউরোপীয় এবং চার জন ভারতীয়। উক্ত চার জন হলেন মৌলবি আবদুল লতিফ, রাজারাম, প্রতাপচন্দ্র, ও প্রসন্ন কুমার ঠাকুর। পদাধিকারবলে লেফটেন্যান্ট গভর্নর এসেম্বলির সভাপতি।

১৮৬১ সাপ্তাহিক *ঢাকা প্রকাশ* প্রতিষ্ঠা। পত্রিকাটি প্রায় একশ' বছর টিকে থাকে। এটা ছিল পূর্ববঙ্গের সবচেয়ে প্রভাবশালী পত্রিকা। এর প্রথম সম্পাদক কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।

১৮৬২ কলকাতা হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠা।

১৮৬২ ইস্টার্ন বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ে লাইন স্থাপন (কলকাতা থেকে কুষ্টিয়া)।

১৮৬২ ফরায়জী আন্দোলনের নেতা দুদু মিঞার (হাজি শরীয়তউল্লাহর পুত্র) মৃত্যু।

১৮৬৩ মৌলবি আবদুল লতিফ কর্তৃক দি মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি প্রতিষ্ঠা। উদ্দেশ্য, মুসলমান সমাজে রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি। কলকাতা ১৬, তালতলা লেনে সোসাইটির মাসিক সভা হতো এবং বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতার আয়োজন করা হতো। বক্তৃতার ভাষা ছিল উর্দু, ফার্সি, আরবি ও ইংরেজি।

১৮৬৪ বাংলা গদ্যসাহিত্যে নতুন মোড় আনয়নকারী হুতোম পেঁচার নকশা প্রকাশ। লেখক কালীপ্রসন্ন সিংহ।

১৮৬৫ ইউরোপের সঙ্গে টেলিযোগাযোগ স্থাপন।

১৮৬৫ ঢাকা জ্ঞান প্রদায়নী প্রতিষ্ঠা। উদ্দেশ্য, সাধারণের মধ্যে জ্ঞানার্জনের স্পৃহা সৃষ্টি।

১৮৬৭ রাজনারায়ণ বসু এবং নবগোপাল মিত্রের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় হিন্দু মেলা।-এর উদ্দেশ্য ছিল প্রতি বছর দেশীয় পণ্যের প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক মেলা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হিন্দু জাতির বর্তমান অবস্থা ও অতীত গৌরব ও ভবিষৎ সম্ভাবনাকে তুলে ধরা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর জীবনে প্রথম জনসমক্ষে একটি স্বরচিত দেশাত্মবোধক কবিতা আবৃত্তির সুযোগ পান এই হিন্দু মেলার এক অনুষ্ঠানে (১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫)।

১৮৬৮ শিশির কুমার ঘোষের সম্পাদনা ও মালিকানায় প্রকাশিত হয় *অমৃত বাজার পত্রিকা*। এর পূর্বসূরি *অমৃত প্রবাহিনী* পত্রিকাটি প্রথম তিনি প্রকাশ করেছিলেন স্বগ্রাম যশোহরের পুলুয়ামাগুরা থেকে।

১৮৬৯ চট্টগ্রাম কলেজ প্রতিষ্ঠা।

১৮৭০ বঙ্গচন্দ্র রায়-এর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক বঙ্গবন্ধু।

১৮৭১ ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টারের *দি ইন্ডিয়ান মুসলমান্‌স* প্রকাশ। এ গ্রন্থের একটি উক্তি "A hundred and seventy years

ago it was almost impossible for a well-born Musalman in Bengal to become poor, at present it is almost impossible for him to continue rich." মুসলিম রাজনীতিতে অপরিসীম প্রভাব ফেলেছিল।

১৮৭১ গভর্নর জেনারেল ইন কাউন্সিল মুসলমান সমাজে শিক্ষা বিস্তার ও অগ্রগতির জন্য সরকারি স্কুল-কলেজগুলিতে আরবি-ফার্সি-উর্দু প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয় এবং শিক্ষা বিভাগে ইংরেজি শিক্ষিত মুসলমানদের নিয়োগে প্রাধান্য দেবার প্রস্তাব গ্রহণ করে।

১৮৭২ প্রথম আদমশুমারি অনুষ্ঠিত। এতে দেখা যায়, বাংলার সর্বমোট লোকসংখ্যা ৩৪ মিলিয়ন। বর্তমান বাংলাদেশ ভূখণ্ডের লোকসংখ্যা প্রায় ১৮ মিলিয়ন। প্রতি বর্গমাইলে লোকসংখ্যার ঘনত্ব ৪২২। ঢাকা শহরের লোকসংখ্যা ৬৯২১২।

১৮৭২ ঢাকা পিপল্স এ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা।

১৮৭২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় *বঙ্গদর্শন* সাময়িকী প্রকাশ।

১৮৭২ দীনবন্ধু মিত্রের *নীল দর্পণ* নাটক মঞ্চায়নের মাধ্যমে কলকাতায় ন্যাশনাল থিয়েটার-এর উদ্বোধন।

১৮৭২ নবাব আবদুল গণি কর্তৃক আহসান মঞ্জিল নির্মাণ।

১৮৭৩ জমিদারদের লাগামহীন খাজনাবৃদ্ধির প্রবণতার বিরুদ্ধে পাবনা জেলার জোতদার শ্রেণীর গ্রামপ্রধানদের নেতৃত্বে সাধারণ কৃষক বিদ্রোহ।

১৮৭৩ বেঙ্গল জুট কমিশন রিপোর্ট তথ্য দেয় যে, কৃষকরা আড়তদারদের কাছ থেকে নগদ আগাম নিয়ে পাটচাষ করে এ যুক্তি ঠিক নয়; বরঞ্চ চাষীরা তাদের নিজেদের উদ্যোগেই পাটচাষ করে থাকে। তবে বহু জায়গায় দাদনের প্রচলন আছে।

১৮৭৩ রাজশাহী কলেজ প্রতিষ্ঠা।

১৮৭২-৭৫ বাকেরগঞ্জের খাসমহল তুষখালী এলাকার ইউরোপীয় ইজারাদার মোড়েলের খাজনাবৃদ্ধি নীতি চ্যালেঞ্জ করে

| | |
|---|---|
| | কৃষকরা খাজনা প্রদান বন্ধ করে দেয়। নানা অত্যাচার-উৎপীড়ন চালিয়েও খাজনা সংগ্রহে ব্যর্থ হলে সরকার মোড়েলের ইজারা বাতিল করতে বাধ্য হয়। |
| ১৮৭৪ | আসামকে বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে একজন চীফ কমিশনারের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। |
| ১৮৭৪ | উনিশ শতকের বাংলার শ্রেষ্ঠতম আরবি ভাষাজ্ঞ আল্লামা উবায়দুল্লাহ-আল-উবায়দি কর্তৃক ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা। |
| ১৮৭৫ | বাঙালি জাতিত্ববোধ সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশের কলেজছাত্রদের নিয়ে দি স্টুডেন্টস এ্যাসোসিয়েশন গঠন। |
| ১৮৭৬ | ড্রামাটিক পারফরমেন্সেস এ্যাক্ট-এর মাধ্যমে যাত্রা ও নাট্য কর্মকাণ্ডে নানা বিধিনিষেধ আরোপ। |
| ১৮৭৬ | দেশে অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন গঠন। প্রধান উদ্যোক্তা আনন্দমোহন বসু, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী। |
| ১৮৭৭ | মুসলমান সমাজে আধুনিক চিন্তাধারা প্রবর্তন ও ভারতের সকল জাতির মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে সৈয়দ আমির আলি কর্তৃক ন্যাশনাল মোহামেডান এ্যাসোসিয়েশন স্থাপন। বাংলাসহ ভারতের বিভিন্ন স্থানে এর অনেক শাখা স্থাপিত হবার পর ১৮৮৩ সনে সর্বভারতীয় রূপ দেবার জন্যে এর নামকরণ করা হয় সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এ্যাসোসিয়েশন। |
| ১৮৭৭ | দিল্লী দরবার। রাণী ভিক্টোরিয়াকে ভারতের সম্রাজ্ঞী ঘোষণা। |
| ১৮৭৮ | ব্রাহ্ম সমাজে বিভক্তি। মূল ব্রাহ্ম সমাজ থেকে বেরিয়ে এসে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ গঠন। |
| ১৮৭৮ | ভার্নাকুলার প্রেস এ্যাক্ট জারি করে দেশীয় ভাষার সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করা হয়। |
| ১৮৮০ | লর্ড রিপন গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত। |
| ১৮৮০ | ফেমিন কমিশন। কৃষিভূমিতে অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপ সম্পর্কে উৎকণ্ঠা প্রকাশ। |

| | |
|---|---|
| ১৮৮০-৯০ | ঢাকা শহরের পূর্ব দিকে ওয়ারী, গেণ্ডারিয়া, তোপখানা প্রভৃতি আবাসিক এলাকা প্রতিষ্ঠা। |
| ১৮৮২ | বঙ্কিমচন্দ্রের *আনন্দমঠ* প্রকাশ। গ্রন্থের স্লোগান 'বন্দে মাতরম' পরবর্তীকালে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে বিশেষ অবদান রাখে। |
| ১৮৮৩ | ইলবার্ট বিল বিতর্ক। ভারতীয় জনমতের প্রতিবাদী ভূমিকার মুখে বিলটি সংশোধিত হয়। |
| ১৮৮৩ | যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোতে অনুষ্ঠিত ওয়ার্লড'স পার্লামেন্ট অব রিলিজিয়নস-এ স্বামী বিবেকানন্দের বিখ্যাত বক্তৃতা। |
| ১৮৮৩ | ফেমিন কোড প্রণীত। |
| ১৮৮৪ | ইন্ডিয়ান জুট মিলস এ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা। |
| ১৮৮৪ | লর্ড ডাফরিন গবর্নর জেনারেল নিযুক্ত। |
| ১৮৮৪ | ঢাকা জগন্নাথ কলেজ প্রতিষ্ঠা। |
| ১৮৮৫ | দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা। |
| ১৮৮৫ | বেঙ্গল লোকাল সেল্ফ গভার্নমেন্ট এ্যাক্ট প্রণয়ন। |
| ১৮৮৫ | ভূমিতে সাধারণ প্রজা ও অন্যান্য ভূভিত্তিক শ্রেণীর অধিকার সংজ্ঞায়িত করে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়ন। |
| ১৮৮৫-৯০ | মীর মশাররফ হোসেনের *বিষাদ সিন্ধু* প্রকাশ। |
| ১৮৮৭ | বাঙালিদের মধ্যে ব্যবসায়ের উদ্যোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার্স অব কমার্স প্রতিষ্ঠিত। |
| ১৮৮৮ | ডাফরিন রিপোর্ট প্রকাশিত। এ রিপোর্ট অনুসারে গ্রামীণ লোকসংখ্যার এক বড় অংশ ইতিমধ্যেই ভূমিহীন হয়ে পড়েছিল এবং এদের জীবিকা নির্বাহের একমাত্র উৎস ছিল কৃষিখামারে শ্রম বিক্রয়। ভূমিহীন সমস্যা সবচেয়ে প্রকট ছিল পূর্ববঙ্গের চেয়ে পশ্চিমবঙ্গের জেলাসমূহে। |
| ১৮৮৯ | বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ স্থাপন। |
| ১৮৮৯ | সৈয়দ আমির আলি কর্তৃক প্রণীত মুসলমানদের মধ্যে সাড়া জাগানো *A Short History of the Saracens* প্রকাশিত। |
| ১৮৮৭-৯০ | পূর্ব বাংলায় আকাল ও দুর্ভিক্ষ। |

| | |
|---|---|
| ১৮৯১ | ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৃত্যু। |
| ১৮৯১ | সিলেট এম. সি. কলেজ প্রতিষ্ঠা। |
| ১৮৯১ | সৈয়দ আমির আলির *The Spirit of Islam* প্রকাশিত। |
| ১৮৯২ | আসাম বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ে উদ্বোধন। |
| ১৮৯৩ | পূর্ববঙ্গে, বিশেষকরে ঢাকা ডিভিশনে দুর্ভিক্ষ। |
| ১৮৯৪ | বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর মৃত্যু। |
| ১৮৯৫ | রক্ষণশীল মুসলমানদের মধ্যে প্রভাব সৃষ্টিকারী খন্দকার ফজলে রাব্বী কর্তৃক ফার্সি ভাষায় রচিত *হকিকত-ই-মুসলমান-ই-বাঙ্গালা* (বাংলার মুসলমানদের উৎপত্তি) প্রকাশিত। এই গ্রন্থে তিনি তত্ত্ব দেন যে, "বাংলার মুসলমানদের বৃহৎ অংশের আদি পরিচয় হচ্ছে আরব, ইরানী, তুর্কী, পাঠান ও পাঞ্জাবী, অতএব বাংলার মুসলমানরা স্থানীয় নিম্নশ্রেণী-উদ্ভূত নয়"। |
| ১৮৯৬-৯৭ | বাংলাদেশসহ সারা ভারতে দুর্ভিক্ষ। |
| ১৮৯৮ | পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ প্রতিষ্ঠা। |
| ১৮৯৯ | বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম। |
| ১৮৯৯ | কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠা। |
| ১৮৯৯ | লর্ড কার্জন গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত। |
| ১৯০২ | কলকাতা অনুশীলন সমিতি গঠন। প্রতিষ্ঠাতা, সতীশ চন্দ্র বসু ও প্রমথ নাথ মিত্র। |
| ১৯০২ | লর্ড কার্জনের বিতর্কিত শিক্ষানীতি ঘোষণা। |
| ১৯০৩ | সৈয়দ এমদাদ আলীর সম্পাদনায় মাসিক *নবনূর* প্রকাশিত। এর উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গীয় মুসলিম সুধীসমাজে বাংলা ভাষার চর্চা বৃদ্ধি। |
| ১৯০৪ | কোঅপারেটিভ সোসাইটিজ এ্যাক্ট-এর মাধ্যমে বাংলায় সমবায় আন্দোলনের সূচনা। |
| ১৯০৩-৮ | স্বদেশী আন্দোলন। বিদেশী পণ্য বর্জন, দেশীয় শিল্পের বিকাশ, অখণ্ড বাংলার জয়গান, 'জাতীয় শিক্ষা' প্রসার, অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক স্বনির্ভরতা প্রভৃতি অর্জন ছিল এই |

আন্দোলনের লক্ষ্য। তবে এ আন্দোলনে মুসলমান সমাজের অংশগ্রহণ ছিল নগণ্য।

১৯০৫ বঙ্গবিভাগ। এই ব্যবস্থা দ্বারা পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামে নতুন প্রদেশ গঠন। এর প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় থেকেই এই ব্যবস্থার বিরোধিতা করা হয়, কিন্তু পরে নবাব স্যার সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে পূর্ববঙ্গের মুসলমান নেতৃত্ব বঙ্গবিভাগের পক্ষে জনমত সৃষ্টি করে।

১৯০৫ কার্জন হল নির্মাণ। ১৯০৪ সনে এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন ভাইসরয় লর্ড কার্জন নিজে।

১৯০৬ বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মুখপত্র *যুগান্তর* প্রকাশ।

১৯০৬ ঢাকা অনুশীলন সমিতি গঠন। প্রতিষ্ঠাতা, পুলিন বিহারী দাস।

১৯০৬ অক্টোবর ১ সিমলা ডেপুটেশন। কার্যসূচিতে বঙ্গবিভাগ ইস্যুটি তুলতে অবাঙালি মুসলিম নেতারা অস্বীকার করায় বঙ্গীয় মুসলিম নেতাদের অসন্তুষ্টি প্রকাশ। ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে স্যার সলিমুল্লাহ ডেপুটেশনে যোগদান থেকে বিরত থাকেন।

১৯০৬ ডিসেম্বর ১০ মুসলমানদের একটি নিজস্ব রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা দেখিয়ে ভারতীয় নেতাদের কাছে নবাব সলিমুল্লাহর পত্র। তিনি প্রস্তাবিত দলের নাম দেন অল ইন্ডিয়া মুসলিম কনফেডারেসি।

১৯০৬ ডিসেম্বর ২৬-৩০ ঢাকার শাহবাগে অনুষ্ঠিত হয় মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্সের বার্ষিক সভা ।

১৯০৬ ডিসেম্বর ৩০ এডুকেশনাল কনফারেন্সের সমাপনী সভায় নবাব স্যার সলিমুল্লাহর প্রস্তাবে এবং হাকিম আজমল খান কর্তৃক উক্ত প্রস্তাবের সমর্থনে অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত।

১৯০৬-৭ বঙ্গবিভাগ ও স্বদেশী কর্মকাণ্ডকে কেন্দ্র করে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা।

১৯০৮ নবাব স্যার সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগ গঠিত।

১৯০৫-১০ পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের রাজধানী ঢাকার রমনা এলাকায় বহু সুরম্য অট্টালিকা ও রাস্তাঘাট নির্মাণ।

| | |
|---|---|
| ১৯০৯ | মোর্লি-মিন্টু সংস্কার। বেঙ্গল লেজিসলেটিভ এ্যাসেম্বলি আরো সম্প্রসারিত। ৪৮ জন সদস্য, এদের মধ্যে ১৭ জন সরকারি কর্মকর্তা এবং ৩১ জন বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মনোনীত। |
| ১৯১০ | রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যগ্রন্থ *গীতাঞ্জলি* প্রকাশ। |
| ১৯১১ | বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি গঠন। সম্পাদক, মুহম্মদ |
| ১৯১১ | দিল্লী দরবারে রাজা পঞ্চম জর্জের ঘোষণা—বঙ্গবিভাগ রদ, শুধু বাংলাভাষী অঞ্চল নিয়ে একটি মাত্র প্রদেশ গঠন, বাংলা থেকে বিহার পৃথক, আসামকে বাংলা প্রদেশ থেকে পৃথক করে একজন চীফ কমিশনারের অধীনে ন্যস্ত। ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তর। |
| ১৯১২ | নবাব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জের কাছে ঢাকা ডেপুটেশন। পূর্ব বাংলার সমস্যা পেশ। ভাইসরয় আশ্বাস দেন যে, বাংলার গভর্নর বছরে অন্তত একবার ঢাকায় কিছুদিন অবস্থান করবেন, বেঙ্গল কাউন্সিলের বছরে অন্তত একটি অধিবেশন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে এবং অচিরেই ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। |
| ১৯১৩ | রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল পুরস্কার লাভ। |
| ১৯১৬ | লখনৌ চুক্তি। কংগ্রেস প্রয়োজনীয় মেয়াদ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচন মেনে নেয়। কিন্তু চুক্তিটি বাংলার মুসলমান নেতৃত্বের সমর্থন পায় নি, কারণ এই চুক্তির অধীনে তারা বঙ্গীয় কাউন্সিলে মাত্র ৪০ শতাংশ আসন পায়, যদিও জনসংখ্যা অনুপাতে মুসলমানরা ছিল মোট জনসংখ্যার ৫২.৬ শতাংশ। |
| ১৯১৮ | কলকাতায় *সওগাত* প্রকাশ। |
| ১৯১৮ | কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। |
| ১৯১৯-২২ | খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন। বাংলায় প্রধান খেলাফতী নেতা ছিলেন মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মুজিবুর রহমান খান ও মওলানা আবদুল্লাহেল বাকী। |

১৯১৯ মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার। সীমিত সরাসরি নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তন।

১৯১৯ ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি কমিশন (স্যাডলার কমিশন) রিপোর্ট প্রকাশ। রিপোর্টে দেশের উচ্চশিক্ষা ব্যাপারে ব্যাপক তথ্যানুসন্ধান এবং ভবিষ্যৎ শিক্ষানীতি সম্পর্কে সুপারিশ প্রদান।

১৯২০ ভারতীয় কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে দেশের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ছাত্রসমাজের জড়িত হবার আহ্বান।

১৯২১ অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক আদলে আবাসিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, যেজন্য প্রাথমিক স্তরে এই বিশ্ববিদ্যালয়কে আলঙ্কারিকভাবে বলা হতো 'অক্সফোর্ড অব দি ইস্ট'।

১৯২২ চিত্তরঞ্জন দাসের নেতৃত্বে কংগ্রেস-খেলাফত স্বরাজ্য দল গঠন।

১৯২৩ বেঙ্গল প্যাক্ট। প্রধান উদ্যোক্তা সি. আর. দাস, স্যার আবদুর রহিম, আবদুল করিম। উদ্দেশ্য, আপেক্ষিকভাবে পশ্চাৎপদ মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা।

১৯২৩ রেলওয়ে ব্যবস্থাপনায় ব্যক্তিগত মালিকানা বিলুপ্ত করে একে পর্যায়ক্রমে জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত।

১৯২৪ মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার আইনের অধীনে মন্ত্রিসভা গঠন। মন্ত্রীরা হলেন এ. কে. ফজলুল হক, এ. কে. গজনভী ও সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক। কিন্তু স্বরাজ্য দলের অনাস্থাভোটে ছ'মাস পরই মন্ত্রিসভার পতন ঘটে।

১৯২৬ কলকাতায় বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতি গঠন।

১৯২৬ ঢাকায় মুসলিম সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠা। সংগঠনের সাধারণ পরিচিতি ছিল 'শিখা গোষ্ঠী' নামে।

১৯২৬ কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা।

১৯২৬ স্যার আবদুর রহিম কর্তৃক বেঙ্গল মুসলিম পার্টি গঠন।

১৯২৮ কলকাতায় সর্বপ্রথম ছাত্রসংগঠন অল বেঙ্গল স্টুডেন্টস এ্যাসোসিয়েশন গঠিত। এর গঠন-সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন

| | |
|---|---|
| | জওহরলাল নেহেরু এবং বিশেষ অতিথি বক্তা ছিলেন সুভাষ চন্দ্র বসু। |
| ১৯২৯ | সুভাষ বসুর সমর্থক ছাত্রগোষ্ঠী মূল অল বেঙ্গল স্টুডেন্টস এ্যাসোসিয়েশন থেকে বেরিয়ে এসে প্রতিষ্ঠা করে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি স্টুডেন্টস এ্যাসোসিয়েশন। |
| ১৯২৮ | কতিপয় অভিজাত মুসলিম নেতার প্রভাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলমান ছাত্রদের জন্য উর্দু ভাষা বাধ্যতামূলক করার প্রতিবাদে মাসিক *মোহাম্মদী* ও *শিখা* পত্রিকার চরম ভাষায় প্রতিবাদ জ্ঞাপন। |
| ১৯২৮ | বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন (সংশোধন) পাশ। ভূমিতে প্রজাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে বেঙ্গল কাউন্সিলের সদস্যরা দলগতভাবে না হয়ে সাম্প্রদায়িকভাবে বিভক্ত হয়ে পড়ে। হিন্দু সদস্যরা ভূস্বামী শ্রেণীর স্বার্থের পক্ষে মতপ্রকাশ করে। |
| ১৯২৯ | এ. কে. ফজলুল হক, খান বাহাদুর আবদুল মোমেন ও স্যার আবদুর রহিমের নেতৃত্বে নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি প্রতিষ্ঠা। |
| ১৯২৯ | ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হল নির্মাণ। |
| ১৯২৯ | বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের গ্রামোফোন কোম্পানি হিজ মাস্টারস ভয়েস-এ যোগদান। এখানে কর্মরত অবস্থায় তিনি রচনা করেন নানা শ্রেণীর প্রায় তিন হাজার গান। |
| ১৯৩০ | বেঙ্গল রুরাল প্রাইমারি এডুকেশন এ্যাক্ট পাশ। এই আইন পাশের প্রক্রিয়ায় কাউন্সিল সদস্যগণ সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বিভক্ত হয়ে পড়েন। |
| ১৯৩০ | গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলন। |
| ১৯৩০ | মাস্টারদা সূর্যসেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন। |
| ১৯২৯-৩৫ | অর্থনীতিতে মহামন্দা। পাট অর্থনীতির পতন। কৃষককুল ঋণগ্রস্ত। |
| ১৯৩০-৩২ | ভারতের শাসনতান্ত্রিক সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নিয়ে লন্ডনে রাউন্ড টেবিল বৈঠক। |
| ১৯৩২ | সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ। ধর্ম, বর্ণ ও পেশাভিত্তিক পৃথক সাধারণ ভোটে নির্বাচনের ব্যবস্থা। এর বিরুদ্ধে বর্ণহিন্দু |

শ্রেণীর তীব্র সমালোচনা। এই আইনের দ্বারা সাম্প্রদায়িক রাজনীতির শাসনতান্ত্রিক ভিত্তি স্থাপিত হয়।

১৯৩২ ঢাকায় অল বেঙ্গল মুসলিম স্টুডেন্টস এ্যাসোসিয়েশন গঠিত।

১৯৩৩ দি বেঙ্গল বোর্ড অব ইকনমিক ইনকুয়ারি তথ্য প্রকাশ করে যে, তখন বাংলার গ্রামীণ পরিবারগুলির ৭৭% মহাজন ও ভূস্বামীদের কাছে ঋণগ্রস্ত।

১৯৩৫ সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের (১৯৩২) ভিত্তিতে ভারত শাসন আইন। কংগ্রেস সর্বতোভাবে এই আইন প্রত্যাখ্যান করে এবং মুসলিম লীগ সমালোচনা করে এর ফেডারেল অংশ।

১৯৩৫ বেঙ্গল এগ্রিকালচারাল ডেটার্স এ্যাক্ট পাশ। গ্রামীণ সালিশের মাধ্যমে প্রজার ঋণের বোঝা হালকা করা ছিল এর উদ্দেশ্য। ফজলুল হক মন্ত্রিসভার আমলে (১৯৩৭-৪১) আইনটির কার্যকারিতা জোরদার করা হয়।

১৯৩৬ বেঙ্গল এগ্রিকালচারাল ডেটার্স এ্যাক্ট-এর অধীনে জেলায় জেলায় ঋণ সালিশী বোর্ড গঠন।

১৯৩৬ নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতির ময়মনসিংহ সম্মেলনে (১৯৩৫) নেতৃবর্গ পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গ আঞ্চলিক ভিত্তিতে বিভক্ত হয়ে পড়েন। পূর্ববঙ্গ অংশের নেতৃত্ব দেন এ. কে. ফজলুল হক। তাঁর নেতৃত্বাধীন প্রজা সমিতিকে এর ঢাকা সম্মেলনে (১৯৩৬) কৃষক প্রজা পার্টি নামে রাজনৈতিক দলে রূপান্তরিত করা হয়।

১৯৩৬ ঢাকার নবাব হাবিবুল্লাহর নেতৃত্বে প্রজা সমিতির এক অংশ ও কতিপয় মুসলিম জমিদার ও পেশাজীবী নিয়ে গঠিত হয় ইউনাইটেড মুসলিম পার্টি। কিন্তু জিন্নাহর আহ্বানে সাড়া দিয়ে এ দলের অবলুপ্তি ঘটিয়ে সব সদস্য মুসলিম লীগে যোগদান করেন।

১৯৩৬ বাংলা প্রদেশ থেকে উড়িষ্যাকে বিচ্ছিন্ন করে একটি পৃথক প্রদেশ গঠন।

১৯৩৭ সর্বপ্রথম বর্ধিত ভোটাধিকারসহ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান। দলগতভাবে কংগ্রেসের সংখ্যারিষ্ঠতা অর্জন। প্রাপ্ত আসনের

| | |
|---|---|
| | দিক থেকে মুসলিম লীগ দ্বিতীয় এবং তৃতীয় কৃষক প্রজা পার্টি। |
| ১৯৩৭ | এ. কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন। কোয়ালিশনে অংশী হয় কৃষক প্রজা পার্টি, মুসলিম লীগ, হিন্দু ও মুসলিম স্বতন্ত্র সদস্য, তফসিলী সদস্য ও এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান গ্রুপ। মন্ত্রিসভার সদস্যসংখ্যা এগারো। |
| ১৯৩৮ | বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন (সংশোধন)-বলে ভূমিতে প্রজার অধিকার আরো জোরদার করা হয়। জমিদারকে সেলামি প্রদান ছাড়াই প্রজা তার স্বত্ব হস্তান্তরের অধিকার লাভ করে। |
| ১৯৩৮ | জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের লক্ষ্যে ফজলুল হক মন্ত্রিসভা কর্তৃক ফ্লাউড কমিশন গঠন। |
| ১৯৪০ | মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাব। ভারতের মুসলিম সংখ্যাগুরু প্রদেশগুলি নিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্রপুঞ্জ গঠনের দাবি। |
| ১৯৪০ | বেঙ্গল মানিলেন্ডার্স এ্যাক্ট। এই আইন প্রণয়ন দ্বারা গ্রামীন মহাজনি ঋণের সুদের সর্বোচ্চ হার বেঁধে দিয়ে মহাজন-খাতক সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা করা হয়। ঋণ সালিশী বোর্ডের কার্যবিধি নিয়ন্ত্রিত হয় এই আইনের অধীনে। |
| ১৯৪১ | বৃটিশ সরকারের দৃষ্টি এড়িয়ে সুভাষ চন্দ্র বসুর ভারত ত্যাগ করে জার্মানি গমন। |
| ১৯৪১ | ফজলুল হক মন্ত্রিসভার পতন। তাঁর নেতৃত্বে নয় মন্ত্রীর (পাঁচ জন মুসলমান ও চার জন হিন্দু) দ্বিতীয় কোয়ালিশন সরকার গঠন। |
| ১৯৪১ | মুসলিম লীগ থেকে ফজলুল হককে বহিষ্কার। |
| ১৯৪২ | কংগ্রেস ও লীগ উভয় দল কর্তৃক ক্রিপ্স মিশন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান। |
| ১৯৪২ | গান্ধীর ভারত ছাড় আন্দোলন। |
| ১৯৪৩ | সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণের সুযোগ না দিয়ে ফজলুল হককে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বে লীগ মন্ত্রিসভা গঠন। |

| | |
|---|---|
| ১৯৪৩-৪৪ | মহাদুর্ভিক্ষ। প্রায় তিরিশ লক্ষ লোকের প্রাণহানি। দুর্ভিক্ষের চরম দিনগুলি ছিল আগস্ট ('৪৩) থেকে ফেব্রুয়ারি ('৪৪) পর্যন্ত। |
| ১৯৪২ | কলকাতায় পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি প্রতিষ্ঠা। |
| ১৯৪৩(?) | ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ গঠন। |
| ১৯৪৫ | নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভার পতন। |
| ১৯৪৫-৪৬ | সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান। |
| ১৯৪৬ | বাংলায় সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে মুসলিম লীগের নির্বাচনী বিজয় এবং মন্ত্রিসভা গঠন। |
| ১৯৪৬ | এপ্রিল ৭-৯ দিল্লী মুসলিম লেজিসলেটর কনভেনশনে জিন্নাহর সভাপতিত্বে লাহোর প্রস্তাবের (১৯৪০) 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেটস' পরিবর্তন করে 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেট' করা হয়। |
| ১৯৪৬ | জুন ৬ মুসলিম লীগ কর্তৃক কেবিনেট মিশন পরিকল্পনা গ্রহণ কিন্তু কংগ্রেস কর্তৃক আংশিক প্রত্যাখান। |
| ১৯৪৬ | জুলাই ২৭ কেবিনেট মিশনের ব্যর্থতার পটভূমিতে লীগের পাকিস্তান রাষ্ট্র দাবি নিয়ে আন্দোলন ঘোষণা। |
| ১৯৪৬ | আগস্ট ১৬ মুসলিম লীগ কর্তৃক ডিরেক্ট এ্যাকশন ডে পালন, বাংলায় সরকারি ছুটি ঘোষণা। ১৬-১৮ আগস্ট, কলকাতায় হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় মহা হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত হয়। |
| ১৯৪৬ | অক্টোবর ২৫ কেন্দ্রে কংগ্রেস-লীগ অন্তবর্তীকালীন মন্ত্রিসভা গঠন। |
| ১৯৪৭ | ফেব্রুয়ারি ২০ যেকোন অবস্থায়, এমনকি প্রয়োজনে প্রাদেশিক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে সর্বশেষ ১৯৪৮ সনের জুনের মধ্যে ভারত ত্যাগ করার ব্যাপারে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা। |
| ১৯৪৭ | এপ্রিল ২০ নেহেরু কর্তৃক পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণ। |
| ১৯৪৭ | এপ্রিল ২৭ সোহরাওয়ার্দী কর্তৃক অখণ্ড স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা পেশ । |
| ১৯৪৭ | এপ্রিল ২৮ কনস্টিটুয়েন্ট এসেম্বলিতে (দিল্লী) ভারত বিভাগের প্রস্তাব গ্রহণ। |

| | |
|---|---|
| ১৯৪৭ | জুন ৪ ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন কর্তৃক ১৫ আগস্টে ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘোষণা। |
| ১৯৪৭ | জুন ১৩ অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কর্তৃক পার্টিশন কমিটি গঠন। |
| ১৯৪৭ | জুন ২০ বাংলা ভাগের পক্ষে বেঙ্গল লেজিসলেটিভ এসেম্বলিতে প্রস্তাব গ্রহণ। |
| ১৯৪৭ | জুলাই ঢাকায় মুসলিম লীগের কিছু সংখ্যক বামপন্থী কর্মীদের উদ্যোগে গণ-আজাদী লীগ গঠন। আহ্বায়ক, কামরুদ্দীন আহমদ। |
| ১৯৪৭ | জুলাই ৬-৭ গণভোটের মাধ্যমে সিলেট জেলার পূর্ববঙ্গে যোগদান। |
| ১৯৪৭ | জুলাই ১৬-২৪ বেঙ্গল বাউন্ডারি কমিশন-এর অধিবেশন। |
| ১৯৪৭ | জুলাই ১৮ বৃটিশ পার্লামেন্টে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্স এ্যাক্ট পাশ। |
| ১৯৪৭ | জুলাই ১৯ ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন কর্তৃক এই উপমহাদেশকে বিভক্ত করে ভারত ও পাকিস্তান নামে দু'টি পৃথক রাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা। |
| ১৯৪৭ | আগস্ট ১৩ র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ ঘোষণা। |
| ১৯৪৭ | আগস্ট ১৪ পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি। |
| ১৯৪৭ | সেপ্টেম্বর ৬-৭ ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে গণতান্ত্রিক যুব লীগ নামে একটি অসাম্প্রদায়িক যুব সংগঠন প্রতিষ্ঠা। |
| ১৯৪৭ | সেপ্টেম্বর ১ তমদ্দুন মজলিস নামে একটি সাহিত্য-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গঠন। সম্পাদক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যা-লয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আবুল কাশেম। |
| ১৯৪৮ | জানুয়ারি ৪ সরকারবিরোধী ও সোহরাওয়ার্দী সমর্থক ছাত্র সংগঠন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ-এর প্রতিষ্ঠা। আহ্বায়ক, নাইমউদ্দীন আহমদ (রাজশাহী)। |
| ১৯৪৮ | ফেব্রুয়ারি ২৩ পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতিদানের পক্ষে প্রস্তাব উত্থাপন। |

১৯৪৮ মার্চ ১১ পাকিস্তান গণপরিষদ কর্তৃক বাংলাকে কেন্দ্রের সরকারি ভাষা হিসেবে গ্রহণ না করার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সমগ্র পূর্ব বাংলায় সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান।

১৯৪৮ মার্চ ১৫ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ও পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের মধ্যে বাংলা ভাষা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চুক্তি

১৯৪৮ মার্চ ২১ ঢাকার রেসকোর্স (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ময়দানের জনসভা ও ২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ কর্তৃক উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার সপক্ষে বক্তব্যদান। উভয়স্থানে জিন্নাহর এ ঘোষণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

১৯৪৯ পূর্ববঙ্গ সহ সমকালীন বিশ্বের একাত্তরটি দেশের মাথাপিছু গড় আয়ের ভিত্তিতে দেখা যায় যে, তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছিল প্রথম এবং ইন্দোনেশিয়া সর্বনিম্ন (একাত্তর)। জরিপভুক্ত কতিপয় দেশের আপেক্ষিক স্থান যথাক্রমে বৃটেন ৬, সোভিয়েট রাশিয়া ২৩, জাপান ৪৫, শ্রীলঙ্কা ৫৪, ভারত ৫৫, পাকিস্তান (সমগ্র) ৫৭, আফগানিস্তান ৫৮, পূর্ব বাংলা (পূর্ব পাকিস্তান) ৫৯, ফিলিপাইনস ৬০, দক্ষিণ কোরিয়া ৬৯।

১৯৪৯ জুন ২৩ আওয়ামী মুসলিম লীগ-এর প্রতিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, সাধারণ সম্পাদক, শামসুল হক (টাঙ্গাইল) এবং যুগ্ম-সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান, খোন্দকার মোশতাক আহমেদ, ও এ. কে. রফিকুল হোসেন (ব্রাহ্মণবাড়ীয়া)। ১৯৫৫ সালের ২৪ অক্টোবর ঢাকার রূপমহল সিনেমা হলে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল অধিবেশনে আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগ নাম গ্রহণ।

১৯৫০ ইস্ট বেঙ্গল স্টেট একুইজিশন এ্যান্ড টেনান্সি এ্যাক্ট-এর অধীনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলুপ্ত।

১৯৫০ মূলনীতি কমিটির (Basic Principles Committee) রিপোর্টে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের স্থলে কেন্দ্রের হাতে অধিক ক্ষমতাদানের সুপারিশ।

| | |
|---|---|
| ১৯৫০ | ঢাকায় গ্র্যান্ড ন্যাশনাল কনভেনশনে উর্দু ও বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা এবং পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিনামাসহ বিকল্প মূলনীতি প্রস্তাব গ্রহণ। |
| ১৯৫১ | মার্চে পূর্ব পাকিস্তান যুব লীগ-এর প্রতিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি মাহমুদ আলী, সাধারণ সম্পাদক অলি আহাদ। |
| ১৯৫২ | জানুয়ারি ২৬ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ-এর সঙ্গে স্বাক্ষরিত চুক্তি ভঙ্গ করে পল্টন ময়দানের জনসভায় খাজা নাজিমুদ্দিনের ঘোষণা—'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হইবে উর্দু'। |
| ১৯৫২ | জানুয়ারি ৩০ সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ গঠন। আহবায়ক, কাজী গোলাম মাহবুব। |
| ১৯৫২ | ফেব্রুয়ারি ২১ সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ কর্তৃক বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতির দাবিতে প্রদেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান। সরকার কর্তৃক ১৪৪ ধারা জারি। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ছাত্রদের বিক্ষোভ মিছিল। মিছিলে পুলিশের বেপরোয়া গুলি বর্ষণ। পুলিশের গুলিতে শহীদ হন আবদুল জব্বার, রফিক উদ্দিন আহম্মদ ও আব্দুল বরকত। |
| ১৯৫২ | এপ্রিল পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন-এর প্রতিষ্ঠা। |
| ১৯৫৩ | জানুয়ারি গণতন্ত্রী দলের প্রতিষ্ঠা। সভাপতি, হাজী মোহাম্মদ দানেশ। |
| ১৯৫৩ | ফজলুল হক কর্তৃক কৃষক শ্রমিক পার্টি প্রতিষ্ঠা। |
| ১৯৫৪ | মার্চ পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন। এ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে ২১-দফা কর্মসূচি নিয়ে হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্ট-এর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিরাট বিজয়। ৩০৯টি আসনের মধ্যে মুসলিম লীগের মাত্র ৯টি আসন লাভ। |
| ১৯৫৪ | এপ্রিল এ. কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠন। |
| ১৯৫৪ | মে ৩০ কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল এবং ৯২-ক ধারা জারি। মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা পূর্ব বাংলার গভর্নর নিযুক্ত। |

১৯৫৪ অক্টোবর ২৫ গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ কর্তৃক পাকিস্তান গণপরিষদ বাতিল ঘোষণা।

১৯৫৪ পাকিস্তানের বাগদাদ প্যাক্ট (পরবর্তীতে সেন্টো)-এ যোগদান।

১৯৫৫ জুন ৯ আবু হোসেন মন্ত্রিসভা গঠন।

১৯৫৫ জুলাই ১০ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের মধ্যে ৫-দফা শর্তযুক্ত মারী চুক্তি সম্পাদিত।

১৯৫৫ পশ্চিম পাকিস্তানের চারটি প্রদেশকে একীভূত করে এক ইউনিট গঠন।

১৯৫৫ পাকিস্তানের সিয়াটো সামরিক জোটে যোগদান।

১৯৫৬ মার্চ পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্র প্রণীত। পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্র হিসেবে আখ্যাত হয় এবং এক ধরনের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাধীনে পার্লামেন্টারি সরকার পদ্ধতি প্রর্বতন করা হয়। বাংলা ভাষা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

১৯৫৬ আগস্ট জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে যুক্তনির্বাচন (Joint Electorates) ব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষে আওয়ামী লীগের আহ্বান।

১৯৫৬-৫৭ কেন্দ্রে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে ১৯৫৬ সালের ১২ সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগ-রিপাবলিকান কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন। মন্ত্রিসভায় প্রথমবারের মতো পাকিস্তানের উভয় অংশ থেকে সমসংখ্যক সদস্য নেয়া হয়। কিন্তু পশ্চিমা কায়েমী স্বার্থান্বেষী মহলের ষড়যন্ত্রের কারণে এক বছরের অধিককাল মন্ত্রিসভা ক্ষমতাসীন থাকতে সক্ষম হয় নি।

১৯৫৬ সেপ্টেম্বর আতাউর রহমান খান-এর নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন।

১৯৫৬ অক্টোবর পাকিস্তানের জাতীয় সংসদে যুক্ত নির্বাচন আইন পাশ।

১৯৫৬ ডিসেম্বর সলিমুল্লাহ মুসলিম হল-এর ছাত্রদের উদ্দেশে সোহরাওয়ার্দীর বক্তৃতায় পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতি, বিশেষকরে পশ্চিমা সামরিক জোটে যোগদানের সপক্ষে যুক্তি প্রদান।

১৯৫৭ ফেব্রুয়ারি ৬-১০ আওয়ামী লীগ-এর কাগমারী (টাঙ্গাইল) সম্মেলন অনুষ্ঠিত। এই সম্মেলনে বৈদেশিক নীতির প্রশ্নে পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। স্বাধীন ও জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির সমর্থক এবং প্রগতিশীল হিসেবে পরিচিত অংশ মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়। একই বছর ২৫ জুলাই এরা ঢাকার রূপমহল সিনেমা হলে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গঠন করে।

১৯৫৮ অক্টোবর ৭ মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা কর্তৃক ক্ষমতা দখল ও সামরিক আইন জারি।

১৯৫৮ অক্টোবর ২৭ জেনারেল আইয়ুব খান-এর ক্ষমতা দখল। ইস্কান্দার মির্জা বিতাড়িত।

১৯৫৯ আগস্ট ৬ জেনারেল আইয়ুব খান কর্তৃক নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অযোগ্যতা সম্পর্কিত আদেশ এবডো (Elective Bodies Disqualification Order) ঘোষণা। এর অধীনে সোহরাওয়ার্দীসহ ৭৮ জন রাজনৈতিক নেতা ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত অযোগ্য ঘোষিত হন।

১৯৫৯ অক্টোবর ২৬ জেনারেল আইয়ুব খান কর্তৃক মৌলিক গণতন্ত্র অধ্যাদেশ ঘোষণা। এর অধীনে চার স্তর বিশিষ্ট একটি কাঠামো প্রবর্তন এবং ইউনিয়ন পরিষদ ব্যতীত অন্যসব নির্বাচন (দেশের প্রেসিডেন্ট ও জাতীয় সংসদসহ) পরোক্ষ পদ্ধতিতে একটি বিশেষ নির্বাচকমণ্ডলী (Electoral College ) কর্তৃক সম্পন্নের ব্যবস্থা।

১৯৬১ ইউনিভার্সিটি অর্ডিন্যান্স জারি। এর অধীনে বিশ্ববিদ্যা-লয়ের স্বায়ত্তশাসন হরণ করে সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

১৯৬২ জানুয়ারি ৩১ পাকিস্তান নিরাপত্তা আইনে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী গ্রেফতার।

১৯৬২ এপ্রিল ২৭ এ. কে. ফজলুল হকের মৃত্যু।

১৯৬২ জুন পাকিস্তানের দ্বিতীয় শাসনতন্ত্র প্রণীত, যা আইয়ুব সংবিধান নামে আখ্যাত। এর দ্বারা প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতির শাসন ব্যবস্থাধীনে ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনসহ সামরিক-বেসামরিক আমলা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠালাভ করে এবং ক্ষমতা কাঠামোর সকল স্তরে বাঙালিদের অংশগ্রহণ উপেক্ষিত হয়।

| | |
|---|---|
| ১৯৬২ | জুন ২৪ 'আইয়ুব সংবিধান' প্রত্যাখ্যান করে একটি নতুন শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দাবিতে ৯ নেতার বিবৃতি। এঁরা হচ্ছেন শেখ মুজিবুর রহমান, হামিদুল হক চৌধুরী, আবু হোসেন সরকার, নূরুল আমিন, আতাউর রহমান খান, মাহমুদ আলী, ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া), সৈয়দ আজিজুল হক, পীর মোহসেন উদ্দিন আহমেদ (দুদু মিয়া)। |
| ১৯৬২ | জুলাই ১৫ রাজনৈতিক দল গঠন ও সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাজনৈতিক দলবিধি আইন পাশ। |
| ১৯৬২ | সেপ্টেম্বর ১৭ হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন। সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল পালিত। পুলিশের গুলিতে একজনের মৃত্যু, অনেককে গ্রেফতার। |
| ১৯৬২ | সেপ্টেম্বর ২৫ আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, জামায়াত-ই-ইসলাম, নেজামে ইসলাম এবং মুসলিম লীগের একটি অংশের সমন্বয়ে লাহোরে আইয়ুববিরোধী মোর্চা ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (এন. ডি. এফ.) গঠিত। |
| ১৯৬২ | অক্টোবর ২৬ পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর পদে মোনায়েম খানের নিযুক্তি। |
| ১৯৬৩ | সেপ্টেম্বর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন অর্ডিন্যান্স জারি। এর অধীনে সরকার যেকোন প্রকাশনা বন্ধ বা বাতিল ঘোষণার ক্ষমতা লাভ করে। এই আইন প্রয়োগ করে ১৯৬৬ সালের জুন মাসে *ইত্তেফাক* পত্রিকার প্রকাশনা নিষিদ্ধ এবং এর স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। |
| ১৯৬৩ | ডিসেম্বর ৫ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যু। |
| ১৯৬৪ | জানুয়ারি ঢাকায় হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি গঠন। |
| ১৯৬৪ | মার্চ সর্বজনীন ভোটাধিকার আদায়ের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের নেতাদের দাবি। |
| ১৯৬৪ | আইয়ুব সরকারের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় ছাত্র সংগঠন ন্যাশনাল স্টুডেন্টস ফেডারেশন (এন. এস. এফ.) প্রতিষ্ঠা। |
| ১৯৬৪ | জুলাই ২১ আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম ও জামায়াত-ই-ইসলাম—এই পাঁচটি দল নিয়ে সম্মিলিত বিরোধী দল (কপ) |

গঠিত। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে 'কপের' মনোনয়নে আইয়ুবের বিরুদ্ধে ফাতেমা জিন্নাহর নির্বাচনী প্রতিযোগিতা ।

১৯৬৪ খাজা নাজিমুদ্দিনের মৃত্যু।

১৯৬৫ জানুয়ারি ২ একটি নির্বাচকমণ্ডলীর মাধ্যমে পরোক্ষ পদ্ধতিতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠান। মিস ফাতেমা জিন্নাহকে পরাজিত করে আইয়ুব খান নির্বাচিত।

১৯৬৫ সেপ্টেম্বর ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ। এ সময়ে 'পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষার ভার পশ্চিম পাকিস্তানের উপর'—এ 'তত্ত্বের' অসারত্ব প্রমাণিত হয়।

১৯৬৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় বৈঠকে শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ঐতিহাসিক ৬ দফা কর্মসূচি পেশ।

১৯৬৬ জুন ৭ রাজবন্দিদের মুক্তি ও পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্ত-শাসনের দাবিতে আওয়ামী লীগ আহূত হরতাল পালিত। ৬ দফা আন্দোলন শুরু।

১৯৬৬ সরকার কর্তৃক রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রচার হ্রাস কিংবা বর্জনের সিদ্ধান্ত। এর প্রতিবাদে কুদরত-ই-খোদা, কাজী মোতাহার হোসেন, বেগম সুফিয়া কামাল, জয়নুল আবেদীনসহ বেশ কয়েকজন শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীর বিবৃতি দান।

১৯৬৬-৬৭ আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে মস্কো ও পিকিং কেন্দ্রিক বিভক্তি এবং পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও আন্দোলন প্রশ্নে মতপার্থক্য থেকে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি এসময়ে দ্বি-ধারায় আনুষ্ঠানিকভাবে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এক অংশের নেতৃত্বে থাকেন মওলানা ভাসানী (পিকিংপন্থী) এবং অন্য অংশের নেতৃত্ব দেন অধ্যাপক মোজাফফর আহম্মদ (মস্কোপন্থী )।

১৯৬৭ মে কাউন্সিল মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলাম, নেজামে ইসলাম, কৃষক শ্রমিক পার্টি, এন. ডি. এফ. ও আওয়ামী লীগ-এর একটি অংশ নিয়ে পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট (পি. ডি. এম.) গঠিত।

১৯৬৮ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। এতে ৩৩ জন বাঙালি আমলা, সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য ও রাজনীতিকের বিরুদ্ধে ভারতের

সহযোগিতায় পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগ এনে এঁদের গ্রেফতার করা হয়। এঁদের মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমান, লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন, আহমেদ ফজলুর রহমান সি. এস. পি., রুহুল কুদ্দুস সি. এস. পি. ও সার্জেন্ট জহরুল হক অন্যতম। এঁদের বিচার অনুষ্ঠান সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালিদের মধ্যে পাকিস্তানবিরোধী এক অভূতপূর্ব জাতীয়তাবাদী চেতনার স্ফূরণ ঘটায়।

১৯৬৮ জুন 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থনে শেখ মুজিবুর রহমানের জবানবন্দি : 'পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবি দাবাইয়া রাখার জন্য এই ষড়যন্ত্র মামলা।'

১৯৬৮ ডিসেম্বর ডাকসুর সহ-সভাপতি তোফায়েল আহমেদ-এর নেতৃত্বে ১১-দফা কর্মসূচিভিত্তিক আইয়ুব শাসন বিরোধী ছাত্র মোর্চা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত।

১৯৬৯ জানুয়ারি ৮ পাকিস্তানে পূর্ণাঙ্গ গণতন্ত্র ও জনগণের পূর্ণ রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আইয়ুব শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন তীব্র করার অঙ্গীকার নিয়ে আওয়ামী লীগ সহ ৮টি রাজনৈতিক দলের ডেমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটি (ডাক) গঠন।

১৯৬৯ জানুয়ারি ২০ পুলিশের গুলিতে ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান (আসাদ)-এর মৃত্যু।

১৯৬৯ ফেব্রুয়ারি ১৫ বন্দি অবস্থায় ঢাকার ক্যান্টনমেন্টে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলার অন্যতম আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হকের মৃত্যু।

১৯৬৯ ফেব্রুয়ারি ১৮ ই. পি. আর-এর গুলিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ডঃ শামসুজ্জোহা নিহত।

১৯৬৯ ফেব্রুয়ারি ২২ দেশব্যাপী প্রচণ্ড আন্দোলন ও গণ-অভ্যুত্থানের মুখে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব কর্তৃক 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' প্রত্যাহার। শেখ মুজিবুর রহমান সহ সকল অভিযুক্তদের মুক্তিলাভ।

১৯৬৯ ফেব্রুয়ারি ২৩ 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' থেকে মুক্তিলাভের পর সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ-এর পক্ষ থেকে রেসকোর্স

| | |
|---|---|
| | ময়দানে দেয়া গণসম্বর্ধনা সভায় শেখ মুজিবুর রহমানকে বঙ্গবন্ধু উপাধি প্রদান। |
| ১৯৬৯ | মার্চ ২৫ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যাপক আন্দোলনের মুখে প্রধান সেনাপতি জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের পদত্যাগ। |
| ১৯৬৯ | নভেম্বর ২৮ গণপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর, এক ব্যক্তি এক ভোটের ভিত্তিতে নির্বাচন ও অধিক স্বায়ত্তশাসনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে জাতির উদ্দেশে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের ভাষণ। |
| ১৯৭০ | ফেব্রুয়ারি ২২ পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন গ্রুপ) কর্তৃক পল্টনের জনসভা থেকে 'স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা' প্রতিষ্ঠার ১১-দফা কর্মসূচি ঘোষণা। |
| ১৯৭০ | মার্চ 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার' দুই নম্বর আসামী লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন-এর নেতৃত্বে লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়ন কমিটি গঠিত। |
| ১৯৭০ | মার্চ ৩০ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান কর্তৃক দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে আইনগত কাঠামো আদেশ (এল. এফ. ও.) জারি। |
| ১৯৭০ | অক্টোবর ২৮ রেডিও ও টেলিভিশনে জনগণের উদ্দেশে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান-এর নির্বাচনী ভাষণ। |
| ১৯৭০ | নভেম্বর ১২ এক প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে পূর্ব পাকিস্তানের উপকূলীয় অঞ্চলে কয়েক লক্ষ মানুষের মৃত্যু। এই দুর্যোগ মোকাবেলায় কেন্দ্রীয় সরকারের ঔদাসীন্য বাঙালি জনমনে তীব্র ক্ষোভ সৃষ্টি করে। |
| ১৯৭০ | ডিসেম্বর ৭ ও ১৭ যথাক্রমে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। পশ্চিম পাকিস্তানে জুলফিকার আলী ভূট্টোর পাকিস্তান পিপলস পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আবির্ভূত হয়। নির্বাচনের পর পর ইয়াহিয়া খান কর্তৃক শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী আখ্যাদান। |

১৯৭০ ডিসেম্বর ২০ পাকিস্তান পিপলস পার্টি জাতীয় পরিষদে বিরোধী দলের আসনে বসবে না বলে লাহোরে ভূট্টোর ঘোষণা।

১৯৭১ জানুয়ারি ৩ রেসকোর্স ময়দানে আওয়ামী লীগ দলীয় নব নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের শপথগ্রহণ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন দলীয় প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৭১ মার্চ ১ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান কর্তৃক ৩ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা। প্রতিবাদে শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক দেশব্যাপী ৩ মার্চ ধর্মঘট পালনের আহ্বান।

১৯৭১ মার্চ ২ ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ের কলাভবন চত্বরে অনুষ্ঠিত এক সমাবেশে ডাকসু'র সহ-সভাপতি আ. স. ম. আবদুর রব কর্তৃক স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন।

১৯৭১ মার্চ ৩ ছাত্রলীগ আয়োজিত পল্টনের জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমানের উপস্থিতিতে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান সিরাজ কর্তৃক স্বাধীন বাংলাদেশের ইশতেহার পাঠ।

১৯৭১ মার্চ ৩-২৫ শেখ মুজিবুর আহ্বানে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে অহিংস অসহযোগ

১৯৭১ মার্চ ৭ রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

১৯৭১ মার্চ ৭ ছাত্রলীগের উদ্যোগে স্বাধীন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত।

১৯৭১ মার্চ ১৬-২৩ ইয়াহিয়া-মুজিব আলোচনা ব্যর্থ।

১৯৭১ মার্চ ২৩ 'পাকিস্তান দিবসে' পাকিস্তানের জাতীয় পতাকার পরিবর্তে পূর্ব পাকিস্তানের অফিস-আদালতসহ সর্বত্র স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড্ডয়ন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কর্তৃক ২৫ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের আধিবেশন আবার অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা।

১৯৭১ মার্চ ২৫ মধ্যরাতের কিছু আগে ঢাকায় নিরস্ত্র বাঙালিদের উপর পাকিস্তানী সশস্ত্র বাহিনীর আক্রমণ, নির্বিচার গুলি, হত্যা, অগ্নিসংযোগ। এসবের বিরুদ্ধে বাঙালিদের জাতীয় প্রতিরোধ সংগ্রামের সূচনা।

১৯৭১ মার্চ ২৬; ২৫ মার্চের মধ্যরাতের কিছু পরে পাকিস্তানী বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হওয়ার পূর্বমুহূর্তে শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা। এটি স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র (তখন চট্টগ্রামে) থেকে ২৬ মার্চ প্রচারিত হয়।* ২৭ মার্চ মেজর জিয়া (জিয়াউর রহমান) কর্তৃক একই বেতারকেন্দ্র থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের নামে স্বাধীনতা ঘোষণা। ১০ এপ্রিল মুজিব নগরে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে অধ্যাপক ইউসুফ আলী কর্তৃক স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণাপত্র পাঠ।

উৎস : বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র, তৃতীয় খণ্ড, (ঢাকা ১৯৮২), পৃঃ ১

# নির্ঘণ্ট